স্ব নি র্বা চি ত
একশো গল্প
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্ব নি র্বা চি ত

একশো গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

শুরু করেছিলাম কবিতা দিয়ে, তারপর এসেছি গদ্যে। প্রথম ছোট গল্পটি লেখার সময় মনে হয়েছিল, এটা নিছক সখের লেখা, নিয়মিত গল্প লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পাকে চক্রে আমাকে গদ্য লিখতেই হয়েছে বেশি। শত শত ছোটগল্প যে লিখে ফেললাম কী করে, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। নিজের জীবন এবং আশেপাশের যে-জীবন প্রতিদিন দেখি, তার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে অনেক গল্প, কিন্তু সব গল্পই লেখা যায় না। কোথা থেকে গল্পটা শুরু হবে, সেটাই প্রধান সমস্যা। হঠাৎ কারুর মুখের একটা কথা কিংবা কোনো একটা দৃশ্য দেখে ঝলসে ওঠে একটা গল্পের রূপ।

আমার প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্য থেকে একশোটি গল্প বেছে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে এই সংকলন। এর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে। জীবনের প্রথম লেখা গল্পটি এর মধ্যে নেই, সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে, বহু খুঁজেও সে পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে লেখা সর্বশেষ গল্পটি এই বইতে যুক্ত হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প

ওরা আসে নিশুতি রাতে। প্রতি অমাবস্যায়।

তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিক শুনশান অদৃশ্য। মনে হয় এখানে কেউ বেঁচে নেই, কোনো বাড়িঘর নেই। বাতাসে গাছের ডগাগুলো কাঁপে, বাঁশবনে একটা বাঁশের সঙ্গে আর একটা বাঁশের ঘষা লেগে শব্দ হয় কর-র-র কর, কর-র-র কর! লিচু গাছে ঝাঁক বেঁধে এসে বসে বাদুড়, দুএকটা প্যাঁচা খ্যারখেরে গলায় ডাকে, পাঁচলা মোড়ের বড় অশথ গাছটায় একটা তক্ষক ঠিক সাতবার তক্খো তক্খো করে। ওই তক্ষকটা নাকি সাড়ে তিনশো বছর ধরে বেঁচে আছে।

সেই সময় ওরা আসে। ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় কাঁপতে থাকে কয়েকটা ছায়া।

তখন শোনা যায় খকর খকর খক করে কোনো পুরোনো রুগীর কাশির শব্দ, দুএকটা শিশু তেড়ে কেঁদে ওঠে। তখন বোঝা যায়, এই অন্ধকার-ঢাকা নিস্তব্ধ ভূমিতেও মানুষের জীবন বহমান।

দুএকটা জানলা খুলে যায়। দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় কয়েকটি ছায়ামূর্তি। আলো ও ঝুমঝুম শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তারা পাঁচলা মোড়ের অশথতলায় থামে।

মোট এগারোজন উঠতি বয়েসের ছেলে। তাদের সঙ্গে দুটি লণ্ঠন। দুজনের হাতে দুটি বর্শা, চারজনের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। লণ্ঠন দুটো মাটিতে রেখে তারা প্রথমে শীত কাটাবার জন্য হাতে হাত ঘষে, শরীরের যেখানে সেখানে ধপাধপ করে চাপড়ে মশা মারে। তারপর তারা সকলে মিলে বিকট মোটা গলায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে :

হে রে রে রে রে রে রে
জাগো রে, গ্রামবাসিগণ জাগো রে।

পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারিদিকে ফিরে ফিরে তারা চারবার হুঙ্কার দেয় এরকম। তারপর অন্যরা, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালে তার মধ্যিখানে এসে ঘুঙুর পরা চারজন পা ঝুমঝুমোয়। সবাই তালে তালে হাততালি দেয়। হঠাৎ শুরু হয়ে যায় গান :

ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
বিপিন খুড়োর নতুন কলে
তুলসীপাতা গঙ্গাজলে
ভূতের কেঠো হাড়ের গুঁড়ো মিশায়ে রস খেয়েছি
ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনতে এয়েছি।

তাদের সেই তারস্বরে গান ও ঘুঙুরের শব্দে অশথগাছের কয়েকটি কাক হঠাৎ ঘুম ভেঙে কা-কা-কা করে ওঠে। দু'তিনটে শেয়াল ছুটে পালায়। কাছেই কোনো বাড়ির দাওয়ায় তামাক টানার মটমট শব্দ শোনা যায়। ওরা আবার গায় :

ভূতের নাতি ভূতের পুতি বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি
যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই হবে না আর ছাড়াছাড়ি।
মামদো ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যি
দেখাও যদি তিন সত্যি
দশটি করে টাকা পাবে হাতে হাতে দোকানদারি,
সেই টাকায় খাও মণ্ডা মিঠাই করে সবে কাড়াকাড়ি।
ভূত জিনিতে, ও ভাই ভূত জিনিতে
ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে
ভূত জিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
দশ টাকা। দশ টাকা। দশ টাকা।
এক এক ভূত দশ টাকা। হাতে হাতে গরমা গরম। দশ টাকা।

গান শেষ করার পরও নাচ থামতে চায় না। বিশেষত বেঁটে নিতাইয়ের। সে নাচতে ভালবাসে। সুরেন্দ্র তার দিকে একটি বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, খা। তখন নিতাই থামে। সুরেন্দ্রর বুকখানা লোহার দরজার মতন। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বর্শা। তার চোখে মুখে বেশ একটা তৃপ্ত ভাব। গানখানি সেই বেঁধেছে, কিন্তু নিজে গাইতে পারে না। অন্যরা যখন গায়, তখন সে হাততালি দেয় চোখ বুজে।

আর একটি বর্শা বিনোদের হাতে। সে বর্শাটিকে পতাকা দণ্ডের মতন সামনে ঝুঁকিয়ে ধরে আছে। সেই বর্শার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি জন্তু। জন্তুটা একবার ছটফট করতেই বিনোদ বলে, আরে শালা, এখনো তেজ যায়নি।

বর্শাটা ঘুরিয়ে সে জন্তুটাকে একবার মাটিতে আছড়ায়। ঝনঝন করে শব্দ ওঠে।

সকলে বিড়ি ধরিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়। এর পরের গান হবে মালো পাড়ায় বটগাছের নিচে।

সুরেন্দ্র রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাঁক মারে, ও পবন ঠাউদ্দা, জেগে আছো নাকি?

যে বাড়ির দাওয়া থেকে তামাক টানার মটমট শব্দ আসছে, সেখান থেকে উত্তর আসে, আছি রে! আয়, আয় ইদিকে!

পবনের বয়েস চার কুড়ি, না পাঁচ কুড়ি তা সে নিজেই জানে না। শরীরটা বেঁকে গেছে। সব কখানা হাড় পরিষ্কার গোনা যায়। তার পাঁচ ছেলের মধ্যে তিনজন মারা গেছে, দুটি নাতিও গত হয়েছে, কিন্তু পবনের আর যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

সবাই এসে ওই দাওয়ায় বসে। লণ্ঠন দুটো নামিয়ে রাখে পাশে। যে যে নেচেছিল, এই শীতের মধ্যেও তাদের গায়ে চকচক করে ঘাম।

নিতাই জিজ্ঞেস করে, জলের কলসিটা কোথায়, ঠাকুদ্দা? বাইরে আছে নাকি?

পবনের ছোট ছেলে নিবারণও উঠে এসেছে চোখ মুছতে মুছতে। সে এক ঘটি জল নিয়ে আসে। নিতাই আলগোছে টাগরা ভিজিয়ে প্রায় অর্ধেকটা জল শেষ করে দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটো দরজার পাশ থেকে কুতকুত করে চেয়ে দেখে।

পবন একবার হুঁকোটা পাশে নামিয়ে রাখতেই বিনোদ সেটা তুলে নিয়ে টান মারে। তারপরই মুখ বিকৃতি করে বলে, এ রাম রাম। এটা কি ঠাউদ্দা? একি তামাক?

পবন ফোকলা দাঁতে ফ্যাকফ্যাক করে হাসে। খুব মজা পেয়েছে সে।

নিতাইয়ের পাশে বসা ঘনাই বলল, কেন, কি হয়েছে। দেখি তো?

ঘনাইও হুঁকোতে টান মারে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক থু থু করে ওঠে।

পবন হাসতে হাসতে বলে, তোরা পারবি না। একেলে ছেলে তো। আমার সহ্য হয়।

—এ তো তামাক নয়, এটা কী খাচ্ছো তুমি?

তামাক পাবো কোথায়? তামাকের দাম কত জানিস? আমার ছেলে আমাকে তামাক কিনে দেবে? একটা পয়সা ঠেকায় না।

তবে কল্কেতে তুমি কী ভরেছো?

—অনেক কালের তামাক টানা অভ্যেস, না মলে যাবে না। তামাক পাই না। তাই শুকনো আমপাতা আর একটুখানি গোবর দিয়ে মশলা তৈরি করেছি। আমার তো বেশ লাগে।

—অ্যাঁ।। থুঃ। অভক্তি।

তামাকের বদলে দুজনকে গোবর খাইয়ে খুব হাসতে থাকে পবন।

নিবারণ তার বাপের উদ্দেশে বলে, মরণকালে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে একেবারে।

নিতাই আর ঘনাই কয়েকটা চোখাচোখা গালাগাল দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি দরজার পাশ থেকে হি হি করে হাসে।

পবন অন্যদের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ছেলের উদ্দেশে বলে, মরার খোঁটা দিচ্ছিস কেন রে? আয়ু যখন ফুরোবে, তখন মরবো। তার আগে কথা কী?

নিবারণ বলল, ফের যদি তোমাকে গোবর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখি—

সুরেন্দ্র মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বলল, আহা থাক। এই নাও ঠাউদ্দা, একটা বিড়ি খাবে নাকি?

পবন বিড়িটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল, বেঁচে থাক, বাবা। ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। আর একটা বিড়ি দিবি? কাল সকালে খাব।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলে, ঠাউদ্দা, ভূত-টুতের সন্ধান পেলে না একটাও? তুমি তো জানতে অনেক?

পবন বলল, জানতাম তো। দেখিছিও কত। নিজের চোখে দেখিছি। বাড়ির কাছে, এই পাঁচলা অশথতলায় পেত্নি

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিছি। একবার পড়েছিলাম মেছোভূতের পাল্লায়। হিজলমারির বিল থেকে মাছ ধরে নে আসছি। অমনি সেই শালার ভূত আমার পেছু নেছে। দুকদম যাই আর সে বলে, মাঁছ দেঁ নাঁ— ও পঁবন , মাছ দেঁ না— তারপর দেখি একটা না তিনডে ভূত, শেষমেষ আমি মাছ ফেলে-ফালে দে দৌড়—

—তা একটাও ভূত ধরে দিতে পারলে না?

—এখন তো আর দেখি না। তোদের দেখলি বোধ হয় ভয় পায়। এই তো পরশুদিন সন্ধেবেলা আমি এই দাওয়ায় বসে বসে হুঁকো টানছি, দেখি কি গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে লাল্‌ বেনারসী শাড়ি পরা এক বউ পিদিম হাতে নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছে। পষ্ট দেখলাম। আমি ডাকলাম, ও মা, তুমি কে? কোথায় যাও? তা কোনো সাড়াও দেয় না।

—সে তুমি নিবারণকা'র বউকে দেখেছ।

—হা আমার পোড়া কপাল! আমার ছেলে বউ বেনারসী শাড়ি পাবে কোথায় রে ছোঁড়া! তার একখানাও জ্যান্ত শাড়ি আছে কিনা সন্দেহ। এ দেখলাম এক সোন্দর বউমানুষ, গা-ভর্তি গয়না।

—দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলে না কেন?

—আমার কি পায়ে সে জোর আছে? নেবারণও তখন বাড়িতে ছেল না—আমি তারে দুবার ডাকতে না ডাকতেই চোখের সামনে অদ্দিরিশ্যি হয়ে গেল। হ্যাঁরে সুরেন, সত্যিই ভূত ধরলে তুই দশ টাকা দিবি?

—নিশ্চয়ই দেব। পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরছি। নগদানগদি দাম পাবে।

পবন তার ঘোলাটে চোখ মেলে নিজের ছেলের দিকে তাকায়। লোভীগলায় ঝামটা দিয়ে বলে, একটু বনবাদাড়ে ঘুরলেও তো পারিস। নগদা-নগদি দশ টাকা এই বাজারে কে দেয়? দশখানা তাগড়াই মানকচুরও দশ টাকা দাম ওঠে না। হাত খালি, বসেই তো আছিস।

নিবারণ বললে, তুমি চুপ কর। ভূত আবার ধরা যায় নাকি? আমি কোনোদিন ভূত দ্যাখলামই না এখন পর্যন্ত!

পবন বিড়বিড় করে বলল, চোখ থাকলেই দেখা যায়। এ গেরামে মোট সতেরোডা সতেরো রকমের ভূত আছে, আমি নিজের চক্ষে দেখিছি। এক একটা দশ টাকা, কম কথা?

বিনোদের বর্শার সঙ্গে বাঁধা প্রাণীটা আবার নড়ে-চড়ে উঠল।

নিবারণ চমকে উঠে বলল, ওটা কি?

বিনোদ বলল, ওটা একটা স্যাজা। ওলাইচণ্ডীতলার সামনে রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেললাম। কড়া জান শালার, এখনো মরে নি।

নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি এবার দরজার কাছে দৌড়ে দৌড়ে এল শজারুটাকে দেখতে। বড় বড় কাঁটাগুলো ফুলিয়ে মাটির ওপরে থুবু হয়ে বসে আছে শজারুটা। মেয়েটির পরনে একটা ইজের। ছেলেটি একেবারে ন্যাংটা। নিবারণ ওদের তাড়া দেয়, যা ঘরে যা, যা। মেয়েটির বয়েস তেরো। সে দুহাত আড়াআড়ি করে রেখেছে বুকের ওপরে। এক পলক শজারুটাকে দেখে নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল। ছেলেটা নড়লো না।

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, কী করবি এটাকে নিয়ে?

বিনোদ বলল, কেটে মাংস খাব।

—জ্যান্ত রাখতে পারলে বিককিরি করতে পারতি, ভালো দাম পেতি।

—জ্যান্ত স্যাজা ধরা কি সোজা কথা? কলাগাছের খোল থাকলে হত। তা তখন পাই কোথায়? শালা এখনও নড়াচড়া করছে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর বাঁচবে না। পেটটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছি!

—শালারা আমার ওঠোনের কচুগাছের তলা খুঁড়ে খেয়ে যায়। কখন আসে, টেরও পাই না। এক একদিন শেষরাতে ঝমঝম শব্দ শুনি, উঠে এসে আর দেখি না।

—ভূত ধরার ঠেঙে স্যাজা ধরা সোজা। তাও পারিস না?

পবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শজারুর মাংসের ভারি চমৎকার স্বাদ। লাল লাল মাংস, কত নরম, আর তেলে ভরা। ইস, কতকাল সে মাংসই খায়নি। এখান থেকে বিনোদের বাড়ি প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। কাল দুপুরবেলা যদি হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায়, গিয়ে বলবে, অ বিনোদ, একটু মাংস চাখতে এলাম। তাহলে কি আর দেবে না একটু?

কথায় কথায় বেশ সময় গেল। সুরেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো এবার যাওয়া যাক। ঠাউদ্দা, তুমি কাছাকাছি বাড়িরসব লোকদের ডেকে বল, ভূত খুঁজে দেখুক, এক এক ভূত দশ টাকা—ধরতেও হবে না, দেখিয়ে দিলে আমরাই ধরে নেবো, কিন্তু একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে হবে।

ভূত কিনে তুই কী করবি রে? সত্যিই ভূতের তেল হয়?

সুরেন্দ্র মুচকি হেসে বলল, দেখই না কী হয়। কত লোকের কত রোগ সারিয়ে দেব।

—তোর জন্য আমার ভয় হয় রে। শেষে তুই-ও ভূতের হাতে মারা যাবি। ওনাদের রাগ তো জানিস না, কোনোদিন বাগে পেলে তোর ঘাড়টা মটকে দেবে।

সুরেন্দ্র হা-হা করে হাসে। কিছুদিন আগে হলেও সে সদর্পে অনেক কথা বলতো। বুক চাপড়ে জানিয়ে দিত, কোনো ভূতের বাপের সাধ্য নাই তার ধারে কাছে আসে। কিন্তু এখন আর সে ওসব কিছু বলে না। ফাদার পেরেরা তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

পবন আবার বলল, তোর বাপকেও ভূতে ঘাড় মটকেছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি, খাল পাড়ে পড়েছিল মানুষটা, চোখ দুটো ওল্টানো, ভয়ে কালসিঁটে পড়ে গিয়েছিল মুখে।

সে কতকাল আগেকার কথা। ও কথা শুনলে সুরেন্দ্রর আর দুঃখ হয় না। সে বলল, সেইজন্যেই তো ভূত ধরার ব্যবসা খুলিছি। বিনোদের মা শাঁকচুন্নি দেখে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল জলে। নেতাইয়ের বাপকে তাড়া করেছিল আলেয়া ভূত। ঘনাইয়ের মামা ভির্মি খেয়েছিল তিনবার। চল, চল, উঠে পড় সবাই।

কিন্তু ওরা উঠতে গিয়ে দেখল, দুটো হ্যারিকেনের মধ্যে একটা নেই।

নিতাই বলল, আরে, আর একটা হ্যারকেন কোথায় গেল? এই তো রাখলাম এখানে।

পবন বলল, দুটো তো আনিস নি, একটাই তো ছিল।

বিনোদ জোর দিয়ে বলল, এঃ! দুটো হ্যারকেন এনে রেখেছি আমরা।

—তা হলে যাবে কোথায়? দ্যাখ না, অশথতলায় ফেলে এসেছিস কিনা। ভুলও তো হতে পারে।

—মোটেই এত ভুল হয় না। নেতাই একটা হ্যারকেন এনেছে আর সুখেন একটা।

নিবারণ মিনমিন করে বলল, তা হলে হ্যারকেন যাবে কোথায়? চোখের সামনে থেকে তো ভূতে নিয়ে যায়নি।

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ছেলেমেয়ে স্যাজা দেখতে এয়েছিল। ওদেরই কেউ হাতে বাঝিয়ে নিয়ে গেছে।

নিবারণ ঘরের মধ্যটায় উঁকি দিয়ে বলল কই, ওরা তো নেয় নি ঘরের মধ্যে অন্ধকার।

নিতাই বলল, ওসব চালাকি কর না নিবারণকা। আমরা ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখব। একি মামদোবাজি?

নিবারণ বলল, ঘরের মধ্যে তোর কাকি শুয়ে আছে, আর তুই ঘরে ঢুকবি? আমাদের চোর ভেবিচিস?

—তা হলে হ্যারকেন গেল কোথায়?

—আমরা হ্যারকেন নিয়ে কী করবো রে শুয়োরব্যাটা? এক ফোঁটা ক্রাচিন কেনার মুরোদ আছে আমার? ঘরে একটা পয়সা নেই। দুদিন চাল কিনিনি।

ছেলেকে সমর্থন করে পবন বলল, পয়সা থাকলে আমি গোবর পুড়িয়ে খাই।

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাক নিবারণকা। আমি ওদের জিজ্ঞেস করব।

গলার আওয়াজ পিতা-উচিত গম্ভীর করে নিবারণ ডাকল, পান্তি, গেনু, ইদিকে একবার শুনে যা।

মেয়েটি বেরুলো না, এল ছেলেটি।

সুরেন্দ্রর আগে নিবারণই জিজ্ঞেস করল, হ্যারকেন নিয়েছিস? ছেলে দুদিকে মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বলল, আমি নিইনি।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, এই গেনু, তোর দিদি কোথায়?

গেনু বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে হাত দেখিয়ে উত্তর দিল, ওই সেথায় গেছে।

কেন, ওই দিকে গেছে কেন?

মা'র সঙ্গে গেছে।

নিতাই ঠাট্টার সুরে বলল, নিবারণকা, তোমার বউ-মেয়েতে মিলে ভূত খুঁজতে গেছে নাকি?

পবন ধমক দিয়ে বলল, অমন অনাছিষ্টি কথা কবিনে নেতাই! পোয়াতি বউ রাতবিরেতে যাবে ভূতের সন্ধানে? আঁটকুড়ি পেত্নির নজর লাগলে পেটের ছেলে পেটেই মরে থাকবে। বাহ্যিখানার ওধারে আমি কতদিন পেত্নি দেখিছি!

নিতাই ঝংকার দিয়ে বলল, তাহলে পুতের বউ রাতবিরেতে ওদিকে যায় কেন?

নিবারণ বলল, তোর কাকির উদুরি অসুখ আছে।

—তা আমাদের হ্যারকেন নিয়ে গেছে, বলে গেলেই পারতো।

—কে তোদের হ্যারকেন নেছে? নিলে আমরা দেখতে পেতাম না?

—আরে, এ তো মহাজ্বালা! আমাদের হ্যারকেন কি শূন্যে উড়ে গেল?

সুরেন্দ্র বলল, চল, ওদিকে গিয়ে দেখে আসি।

পবন কিংবা নিবারণ নড়লো না। অন্যরা দল বেঁধে গেল বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে।

খানিকটা দূরেই একটা আমলকী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে পান্তি। এই শীতের মধ্যেও তার কোমরে ইজের

আর খালি গা। কিশোরী মেয়ের বুকে যে জিনিস শব্দ করে তার যৌবনের আগমন জানান দেয়, সে সেখানে তার দুহাত চাপা দিয়ে আছে।

ওদের দেখেই সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ইদিকে আসবেন নে, ইদিকে আসবেন নে!

কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে হ্যরিকেনের ক্ষীণ আলো। সেদিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুরেন্দ্র বলল, হ্যারকেনটা জিজ্ঞেস করে আনিস নি কেন? আমরা পাঁচলা মোড়ে দাঁড়াচ্ছি, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যাবি।

নিতাই রসিকতা করে বলল, আর ওদিকে পেত্নি-টেত্নি দেখলে আমাদের চেঁচিয়ে ডাকিস, কপাৎ করে গিয়ে ধরে নে আসবো। দশ টাকা পাবি!

ঘরের দাওয়ায় বসে পবন বলল, খালধারে চৌধুরীবাড়ির বাবু একবার একটা ভূত ধরিছিলেন, জিয়ন্ত কঙ্কাল। কত ঝটাপটি করিছিল, কিন্তু কর্তাবাবু দড়ি দিয়ে বেঁধে ফ্যাললেন। আহা, আমাদের ভাগ্যে ওরকম হয় না। নগদ দশটা টাকা, সাতসের চাল খরিদ করা যায়।

গেনু জিজ্ঞেস করল, দাদু, তুমি সত্যি ভূত দেখেছ?

পবন বললো, হাঁরে দাদু, কতবার?

—আমাকে একবার দেখাবে? দূর থেকে একবারটি দেখব!

—দেখবি, ভাগ্যে থাকলে ঠিকই দেখবি। তবে না দেখাই ভাল।

দুরের দলটার দিকে তাকিয়ে নিবারণ বলল, শালাদের বড় টাকার গরমাই হয়েছে।

একটু পরে ঘুঙুরের রুনুরুনু শব্দ তুলে ওরা আবার চলে গেল দূরে। হ্যরিকেনের আলোও মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়িটা।

সুরেন্দ্রকে নিয়ে গ্রামের লোক খুব ধন্দে পড়েছে। বেশ কিছুদিন সবাই ভুলেই ছিল ওর কথা। ওর বাপ মারা যাবার পর ওদের বংশটাই মরে হেজে যেতে বসেছিল। ওর যখন বারো তেরো বছর বয়েস, তখন চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে রাখালি করতো। একদিন মেজোবাবুর চটিজোড়া পড়েছিল বৈঠকখানার সিঁড়িতে, ও ছোঁড়াটা সেটা হাত দিয়ে না সরিয়ে পা দিয়ে সরাতে গিয়েছিল, অমনি চোখে পড়ে গেল মেজোবাবুর। প্রচণ্ড ঠ্যাঙানি খেয়ে ধুঁকতে লাগল উঠোনে পড়ে। ছোঁড়ার নাকি চুরি-টুরির হাতটানও হয়েছিল। ঠ্যাঙানি খাবার দিন বিকেলবেলা ছোঁড়াটা গ্রাম ছেড়ে পালালো। তারপর শোনা গিয়েছিল ছোঁড়াটা শহরে গিয়ে সাইকেলের দোকানে পাম্প দেয়। তারপর কেউ ওর খোঁজ রাখে নি।

সে এখন আবার ফিরে এসেছে মস্তো জোয়ান মদ্দ হয়ে। কোন ফেকটরিতে নাকি কাজ করে, গায়ে রঙিন রঙিন জামা, হাতে ঘড়ি। বিড়ির বদলে সিগ্রেটই বেশি খায়। একদিন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির সামনে গিয়ে থুক করে থুতু ফেললে। একবার না, তিনবার। এমন কাণ্ড এ গ্রামে কেউ কক্ষনো করে নি।

ও-বাড়িতে অবশ্য কত্তাবাবুরা কেউ থাকেন না এখন। এক গোমস্তা শুধু টিমটিম করছে। গোমস্তাবাবু বুড়োমানুষ, তিনি আর কী করবেন, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখলেন শুধু। পাইক বরকন্দাজ তো নেই আর একটাও। এখন সংবৎসরের ধানই ওঠে না।

গ্রামে কতকগুলান চ্যালা-চামুণ্ডা জুটেছে সুরেন্দ্রর। ফি-হপ্তায় শনি-রবিবার সে বাড়ি আসে। নিজেদের পোড়ো ভিটেয় আবার ঘর তুলেছে, সেখানে চ্যালাগুলাকে নিয়ে হল্লোট করে। খাওয়া-দাওয়া ভালোই জোটে বিনা ওখানে। গত মাসে ওরা পুবপাড়ার বহুকালের মজা দীঘিটা সাফ করতে গিয়েছিল। সাফ হয়েছে না ঘেঁচু হয়েছে, শুধু জলে নেমে দাপাদাপি। সবাই জানে, ওই দীঘিতে যখ আছে, প্রতি বছর একজন করে মানুষ টেনে নেয়। ওদের দলেরও একজন মরতে বসেছিল। মাঝপুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে আর দম পায় নি। হাঁক-পাঁক করতে করতে যখন উঠলো তখন মুখখানা নীল হয়ে গেছে। তবু ওদের আক্কেল হয় নি, আবার সামনের হপ্তায় নামবে।

আর এক ঢং হয়েছে, অমাবস্যার রাত্তিরে দল বেঁধে কেত্তন গাইতে গাইতে ঘোরা। গাঁয়ের অকর্মা ছোঁড়াগুলো এই এক কাজ পেয়েছে। সুরেন্দ্র নিশ্চয় ওদের নেশাভাঙের খরচাপাতি দেয়। কয়েকজনকে নাকি শহরের ফেকটরিতে চাকরিও জুটিয়ে দেবে বলেছে। সেটাই বড় টোপ।

ভূত কেনার অছিলায় সুরেন্দ্র কী বলতে চায়, তা অনেকেই বুঝেছে। সবাই তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে থাকে না। কিন্তু এতকাল এতলোক যা নিজের চক্ষে দেখেছে, তা মিথ্যে হয়ে যাবে? আর ভূতগুলোও হয়েছে মহা ফেরেববাজ, সুরেন্দ্রর দল দেখলে কিছুতেই সামনে আসে না। ভূতেরাও ওকে ভয় পায়? যা ষণ্ডামার্কা চেহারা, ভূতের বাবাও ওকে ভয় পাবে।

দিন দিন তেজ বাড়ছে সুরেন্দ্রর। ক্রমাগতই রেট বাড়াচ্ছে সে। আগে ছিল দশ টাকা, তারপর বিশ, তারপর

পঞ্চাশ, এখন একেবারে একশো টাকায় তুলেছে। এক ভূত ধরায়ে দিলে একশো টাকা। ধরাতেও হবে না, দূর থেকে দেখায়ে দিলেই হবে, আর দুজন সাক্ষী রেখে দেখালেই হবে। একশো টাকা শুনলেই মাথার রক্ত ছনছন করে। এ বাজারে একশো টাকা কে দেয়? মানুষের জীবনেরই দাম নাই, আর একখানা ভূতের দাম একশো টাকা। শালাকে ভূতে ঘাড় মটকায় না কেন? নাকি ভূতেরাই নিজেদের দাম চড়াচ্ছে আর আড়ালে বসে মিটিমিটি হাসছে।

সুরেন্দ্র নাকি প্রথম প্রথম গাঁয়ে এসে নিতাইদের বলেছিল, মানুষের আত্মা বলে কিছু নাই। কথাটা শুনলেই গা ছমছম করে। মানুষের আত্মা নাই? তাহলে কোথা থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া? এ-জন্মে দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেও পরকালে সুখের আশা থাকে। আত্মাই যদি না থাকে, তা হলে আর পরকাল কী? হারামজাদা। এসব কথা যে বলে, মেরে তার মুখ ভেঙে দিতে হয়। প্রথমটা শুনেই মনে হয়েছিল, সুরেন্দ্র নিশ্চয়ই কেরেস্তান হয়েছে। তাহলে শালাকে একঘরে করার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কেরেস্তান তো নয়, গত বছর যে ও ধুমধাম করে দুর্গোপুজো করলে।

দুর্গোপুজো নিয়ে গত বছর একটা কাণ্ডই হয়েছিল। এ-গাঁয়ে একখানাই দুর্গোপুজো হয়, চৌধুরীবাবুদের বারবাড়িতে। চিরটাকাল যেমন হয়ে আসছে। গত পাঁচ সাত বছর ধরে বাবুরা কেউ গাঁয়ে আসেন না। জমিদারি লাটে উঠেছে, আয়পত্তর কিছু নেই, তাহলে আর আসবেন কেন? শুধু আছে ওই এক পেল্লায় ভাঙা বাড়ি। বাবুরা আর পুজোর খরচাও দেন না। কিন্তু মায়ের পুজো তো আর বন্ধ হতে পারে না। তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে ভাগাভাগি করে খরচাপত্তর দিয়ে পুজোটা সারা হয় নমো নমো করে।

গত বছর সুরেন্দ্র আর তার দলবল বললে, গাঁয়ের লোকের পয়সাতেই যদি পুজো হয়, তো সে পুজো হবে গাঁয়ের মাঝখানে চালা বেঁধে। জমিদারদের বাড়িতে হবে কেন? যে জমিদারদের কানাকড়ির মুরোদ নেই, সে কেন শুধু শুধু পুণ্যি লুটবে?...ব্যাটার এখনো রাগ আছে চৌধুরীদের ওপরে। যে বাড়িতে বরাবর দুর্গোৎসব হয়, হঠাৎ একবার বন্ধ হয়ে গেলে, সে বাড়ির ওপর মায়ের অভিশাপ নেমে আসে। সে কথা সুরেন্দ্র জানে। আরে ব্যাটা, জমিদারবাবুরা এখন তো মরমে মরেই আছে, তুই আর এখন কতটা মারবি। অমন দুর্দান্ত ছিলেন মেজোবাবু তাঁর ছোটছেলে এখন জেল খাটছে। কলেজে পড়ার সময় মার-দাঙ্গা করতে গিয়েছিল। মেজোবাবুর আর এক ছেলে রেলের গার্ড। হে-হে-হে-হে।

শেষপর্যন্ত সুরেন্দ্র প্রাইমারি স্কুলের মাঠে দুর্গোপুজো করিয়ে ছাড়লে। শহর থেকে চাঁদার বই ছাপিয়ে এনে পয়সা তুললে সব ঘর থেকে। দুর্গোপুজোর ঠিক আগেই ধান ওঠে, লোকের হাতে দু-পাঁচটা পয়সা থাকে। গাঁয়ের যে পাঁচটা ভদ্দরলোক আগের বছর পুজোর সময় সদ্দারি করতেন, তেনারাও ওদের সঙ্গে কোনো তক্কো-ঝঞ্ঝাটে গেলেন না। যে-বাবুরা আগের বছর চাঁদা দিতেন পঁচিশ টাকা, তাঁরা দিলেন পাঁচ টাকা। সুরেন্দ্রর চেলারাই মাঠের মাঝখানে ছাউনি বেঁধে মাকে নিয়ে এল।

অষ্টমী পুজোর দিন মাঝরাতে সুরেন্দ্রর সে কি নাচ। ক বোতল মাল টেনেছিল কে জানে। চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মোষের মতন চেহারা, ব্যাটাকে দেখাচ্ছিল নন্দি-ভৃঙ্গীর মতন। দুহাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে নাচতে নাচতে সে কি মা মা বলে চেল্লানি। নেশার ঝোঁকে পায়ের ঠিক নেই, এক একবার ঢলে পড়ছে, ধুনুচিতে গনগনে আগুন, একবার তো সবসুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আগুন লেগে যে ওর চোখ দুটো কানা হয় নি, সে ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি। পড়লো তো আর ওঠেই না। ওর শাগরেদরা ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করে, হাত ধরে টানাটানি করে, তবু কোনো সাড়া নেই। অতবড় লাশকে টেনে তোলে কার সাধ্যি। শেষপর্যন্ত নেতাই যখন এক কলসি জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দিতে যাবে, সেই সময় নিজেই লাফিয়ে উঠে হো-হো করে হাসতে লাগলো। ঢং। এতক্ষণ ঢং করছিল। যত সব নেশাখোরের কাণ্ড।

মেজোবাবুর যে ছেলে এখন জেল খাটছে, গত বছর পুজোর ঠিক পরপরই সে এসেছিল একবার গাঁয়ে। সঙ্গে দুই বন্ধু। আগে বাবুরা আসতেন মোটরগাড়িতে, এ ছেলে এলো মোটর সাইকেলে। তা ভালই করেছে, মোটর সাইকেলের বেশ একখানা জমিদার জমিদার শব্দ আছে। অতবড় চৌধুরীবাড়ির দুতিনখানা ঘরও এখন আস্তো আছে কিনা সন্দেহ। উঠলো সেখানেই। বুড়ো গোমস্তাবাবু নিশ্চয় ছোটবাবুর কাছে সব লাগানি-ভাঙানি দিয়েছে। পরদিন পাঁচুমুদির দোকানে ছোটবাবু নিজে এসে জিজ্ঞেস করলো, বলতে পারো, সুরেন কোথায় থাকে?

পাঁচুমুদি সাবধানে বললো, কোন্ সুরেন?

ছোটবাবু বলল, যে এবার গাঁয়ে বারোয়ারি পুজো করিয়েছে। সে নাকি আবার ভূত ধরার দলও গড়েছে?

পাঁচুমুদি বলল, তার বাড়ি তো পাঁচলা মোড় ছাড়িয়ে আরও এক মাইল, গাঁয়ের একেবারে কিনারে। কিন্তু রোজ তো সে গাঁয়ে থাকে না।

কিন্তু সেদিন রবিবার, সুরেন্দ্র ঠিকই থাকবে।

সবাই ভাবলো, এবার সুরেন্দ্রর সঙ্গে লাগবে ছোটবাবুর। অবস্থা পড়ে গেছে, তবু তো জমিদারি রক্ত শরীরে,

ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। এরকম চেহারার মানুষ আজকাল গাঁ দেশে একদম দেখাই যায় না। যখন জমিদারি ছিল, তখন দুচারজন অন্তত ছিল। এখন সব শহরে।

আগেকার দিন তো নেই যে ছোটবাবু পাইক পাঠিয়ে সুরেন্দ্রকে ধরে এনে জুতো পেটা করবে! বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই মোটর সাইকেলে চলে গেল ফটফটিয়ে। তারপর সুরেন্দ্রর সঙ্গে তার যে কী কথা হল, তা কেউ জানে না। তবে খানিকবাদে দেখা গেল, ছোটবাবু আর তার বন্ধুরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর ঘর থেকে। দু একটা কথার পর ছোটবাবু সুরেন্দ্রর কাঁধ চাপড়ে দিতে চায়, কিন্তু সুরেন্দ্র অত্যধিক লম্বা বলে ছোট-বাবুর হাত ঠিক মতন পৌঁছোয় না। বরং ছোটবাবু পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বার করতেই কিছু জিজ্ঞেস না করে সুরেন্দ্র তার থেকে একটা তুলে নিল। একেই বলে কলিকাল! দূর থেকে নিবারণ এটা নিজের চোখে দেখেছে।

কোনো কারণ না থাকলেও ছোটবাবুর প্যাকেট থেকে সুরেন্দ্রর ওই সিগ্রেট তুলে নেওয়া দেখে নিবারণের মনে পড়েছিল সুরেন্দ্রর সেই কথা, 'মানুষের আত্মা নেই।' ওঃ, ভাবলেই যাতনা হয়। অবশ্য সুরেন্দ্র পরে একথা স্বীকার করতে চায়নি। যোগেন মাস্টার জিজ্ঞেস করেছিল।

পাশাপাশি দু গাঁয়ের মাঝখানে একটা ইস্কুল। সেই ইস্কুলে সরকারি নতুন মাস্টাররা আসে আর দু এক বছর বাদেই চলে যায়। আবার অন্য মাস্টার আসে। শুধু থেকে গেল যোগেন মাস্টার। যোগেন মাস্টার বিকেলের দিকে নদীর ধারে একা-একা বসে থেকে সূর্য ডোবা দেখে। ভাবুক মানুষ।

সেই যোগেন মাস্টার হাটবারে একদঙ্গল লোকের মাঝখানে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁ গো সুরেন, তুমি নাকি বলেছো, মানুষের আত্মা নেই?

সুরেন্দ্র কখনো পড়েনি যোগেন মাস্টারের কাছে। সে বিড়ি লুকোয় না। কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও বলল না। ঘাড় চুলকে জবাব দিল, সে তো আপনারাই ভাল জানেন। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমি কি অত বুঝি? আমি কখনো আত্মা দেখি নাই।

যোগেন মাস্টার গোঁফ-এঁটো-করা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, আরে পাগল, এই যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, সে বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাই? তার মানে কি বাতাস নেই?

যারা শুনছিল, তারা মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, জব্দ করেছে বটে যোগেন মাস্টার। এবার বল ব্যাটা, বাতাস নাই।

সুরেন্দ্র বলল, বাতাস চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ধরা যায়। যোগেন মাস্টার বলল, বাতাস ধরা যায়? বল কি হে? কেউ কখনো তা পেরেছে? বুকের মধ্যে একটুখানি বাতাস ধরে রাখো, অমনি প্রাণ-পাখি ছটফট করে উঠবে। কী, উঠবে না? তোমরা কী বল?

সকলে মাথা নাড়লো।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা বেলুনওয়ালা। সুরেন্দ্র একটা নেতানো বেলুন খপাৎ করে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে সেটাকে লাউ করে ফেলল। তারপর সেটার ঠুঁটো চেপে ধরে হাত উঁচিয়ে বলল, এই দ্যাখেন মাস্টারমশাই, বাতাস ধরলাম। আপনি বুঝিয়ে দ্যান তো, আত্মাকে ধরা যায় এই ভাবে? আপনি বুঝিয়ে দিলেই আমি মেনে নেবো!

মাস্টার বলল, আত্মাকে ধরবে? ও চিন্তাও করো না বাপ। উনি কখনো ধরা-ছোঁওয়া দেন না। নৈনং ছিন্দন্তি অং বং চং। তার মানে হল গে, আত্মাকে কখনো ছ্যাঁদা করা যায় না, তাঁকে আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ডোবানো যায় না। আত্মা অজয় অমর।

সুরেন্দ্র বলল, মানুষ মরে গেলে যখন তাকে পোড়ানো হয়, তখন কি ফুস করে আত্মাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? কোথায় যায়?

মাস্টার বলল, তখন তা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। পরমাত্মা হলেন ঈশ্বর।

সুরেন্দ্র বলল, অ।

মাস্টার বলল, কি, কথাটা পছন্দ হলো না? তুমি মানলে না?

সুরেন্দ্র বলল, মানবো না কেন? আপনার মতন পড়া-লেখা জানা লোক যখন বলছেন, তখন কি আর ভুল বলবেন?

যোগেন মাস্টারের জয়ে সবাই বেশ খুশি হয়ে অবাকও হয় খানিকটা। সকলেই ভেবেছিল, সুরেন্দ্র ফাটাফাটি তর্কো করবে মাস্টারের সঙ্গে। বেলুনটা ফুলিয়ে সে বেশ একটা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে এত সহজে মেনে নিল লক্ষ্মী ছেলের মতন?

যোগেন মাস্টার বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে সুরেন্দ্রর গা চাপড়ে দিলেন। যেন সে একটি বেশ ভাল ছাত্তর। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন তুই নাকি ভূত ধরার ব্যবসা খুলেছিস?

সুরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের এক বাবু আমাকে অর্ডার দেছেন। একটা ভূত যোগান দিলেই আড়াই শো টাকা পাব। আমি কিনবো একশো টাকায়। আমার মোটা লাভ। এই দ্যাখেন না, এই হাট থেকে ব্যাপারিরা

প্যাঁজ কিনে নে যাচ্ছে সাতাশ টাকা মণ দরে। শহরে পাইকারি রেটে ছাড়বে পঁয়তিরিশ টাকায়। আমিও তেমনি চালানি ব্যবসা ধরেছি।

যোগেন মাস্টার এ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ করে হেসে উঠলেন।

সুরেন্দ্রও ঠিক সেই তালে তাল মিলিয়ে হাসতে লাগল। যেন সে সত্যিই বেশ একটা মজার কথা বলেছে।

—পেয়েছিস, একটাও?

—না।

—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ। একি ছেলেখেলা? ভূতের ব্যবসার কথা বাপের জন্মে শুনিনি। এসব কথা মন থেকে বাদ দাও। এ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস, কখন কী হয়ে যায়, বলা যায় না।

সুরেন্দ্র আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, আপনার বাড়িতে একদিন যাব মাস্টারমশাই। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কথা হয় না। আপনি জানেন, আমার বাবাকে ভূতে গলা টিপে মেরেছিল।

মাস্টার বলল, হ্যাঁ শুনেছি।

সুরেন্দ্র বলল, আমার বাবার ট্যাঁকে সেদিন ধান-বেচা টাকা ছিল। তার এক আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিল সেই টাকা, আত্মা না পরমাত্মা? কার বেশি টাকার দরকার? আপনার ঠেঙে জেনে আসব। গাঁয়ের একটা লোকও সেদিন সাক্ষী দেয়নি।

পুরোনো খালটা মজে হেজে গেছে। সরকার থেকেই সেই খালটা নতুন করে কাটাচ্ছে এবার। পাশের গাঁয়ের রহমান সাহেব সেই খাল কাটার ইজারা নিয়েছেন। এ-খাল দিয়ে আবার জল বইলে এ-তল্লাটে চাষের সুবিধে হবে। এই কথাটা ভেবে নিবারণ নিজেকে নিজে ভ্যাঙচায়।

আড়াই বিঘে জমি ছিল, গত ফাগুনে তা বন্ধক রাখতে হয়েছে। না রেখে উপায় ছিল না, নিবারণ নিজেই বড় শক্ত অসুখে পড়েছিল। যদি তার ছেলে, মেয়ে, বউ বা বাপের অসুখ হতো, সে জমি বন্ধক দিত না কিছুতেই, কিন্তু সে নিজে তাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে পুরুষ, সে মরে গেলে আর সকলকে বাঁচাতো কে? তার বাপ তো তিনকেলে বুড়ো। কুটোটি নাড়াবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু এখনো রাক্কুসে খিদে আছে। মরেও না কিছুতে। তার অন্য ভাইরা কেউ বাপকে নেয়নি নিজেদের সংসারে। শুধু নিবারণেরই যত জ্বালা।

মহাজনকে সে বলে রেখেছে, ভাগচাষের স্বত্ব তারই থাকবে। নিজের জমিতেই সে ভাগচাষি হবে। ধান উঠে গেলে ওই জমিতে সে ফুলকপি বসাবে।

সরকার বাহাদুর খাল কাটাচ্ছেন। আর দুবছর আগে কাটাতে পারেন নি, যখন জমিটুকুন নিবারণের নিজেরই ছিল? এখন ভাগচাষ করে সে সংসারের পেট ভরাবে, না বন্ধকি দেনা শুধবে?

দৈনিক পঞ্চাশজন লোক লাগে খাল কাটার জন্য। সারা গাঁয়ের লোক গিয়ে হামলে পড়েছিল। কারুর হাতে এখন কাজ নেই। নিবারণরা বংশ-পেশায় ঘরামি। এখন কাজ জোটে না। এক কাহন খড়ের দাম চব্বিশ টাকা। যাদের হাতে দুপয়সা আছে, তারা টালি দিয়ে চাল ছাইছে, সেজন্য শহর থেকে মিস্তিরি আসে।

রহমান সাহেব নিজের গাঁ সোনামুড়ি থেকেই মাটি কাটার মজুর নিয়েছিলেন পঞ্চাশজন। সেই নিয়ে পরশুদিন খুব হাল্লা হয়ে গেল। খালটা দু গাঁয়ের মাঝখানে, তা হলে শুধু এক গাঁয়ের লোক কাজ পাবে কেন? এ-গাঁয়ে কাজের মানুষ নেই?

রহমান সাহেব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সব শুনেটুনে উনি ঠিক করে দিয়েছেন, প্রতিদিন এ-গাঁ থেকে পঁচিশজন, ও-গাঁ থেকে পঁচিশজন কাজ পাবে। এক লোক পরপর দুদিন কাজ পাবে না। সাড়ে চার টাকা রোজ, আর একবেলা খোরাকি।

নিবারণ গতকাল কাজ পেয়েছিল; আজ পাবে না। ঘরামির ছেলে শেষ পর্যন্ত মাটি কাটা কুলি। আজকাল অত কিছু ভাবলে চলে না। ভাত এমন চিজ, খোদার সঙ্গে উনিশ বিশ।

আজ তার কাজ নেই, তবু নিবারণ খালধারের দিকে যাচ্ছে। অন্য কোনো কাজও তো নেই এখন, তবু ওসব দেখতে ভাল লাগে।

যেতে যেতে তার বারবার মনে পড়ছে সুরেন্দ্রর কথা। সুরেন্দ্রকে সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। সুরেন্দ্রর স্বাস্থ্য ভাল। পকেটে পয়সা ঝমঝমিয়ে বেড়ায়। এসব মানুষ একবার গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে আর ফেরে না। সুরেন্দ্র ফিরল কেন? আবার বিদায় হলেই তো পারে। পকেটে তার শয়ে শয়ে টাকা, কিন্তু এমনি তো সে কারুকে দেবে না। ভূত কেনার বায়না! নিবারণের গা জ্বালা করে। একশোটা টাকা পেলে তার এখন কতদিকে সুরাহা হত। সেই টাকা একজনের পকেটে আছে, অথচ সে পাবে না। এই পৃথিবীতে কারুর থাকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি,

আর কেউ প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারে না, এটাই বুঝি ভাগ্যের নিয়ম! কতজনে কত ভূত দেখে, তার ভাগ্যে জোটে না একটাও! সন্ধের পর সে এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজে, চমকে ওঠে দু একবার, তারপর ভাল করে চোখ কচলে দেখে। না, একটা কলাগাছ, কিংবা বেল গাছ। দূর, দূর!! তখন আরও রাগ হয় সুরেন্দ্রর ওপর।

খাল পাড়ের উঁচু বাঁধটার ওপরে এসে দাঁড়ায় নিবারণ। বুক চিতিয়ে নিশ্বাস নেয়। খালি পেটে বেশি হাওয়া খেলে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। মন খারাপ লাগে। পঞ্চাশটা লোক একসঙ্গে মাটি কাটছে, ওরা যেন সবাই আলাদা, নিবারণ ওদের কেউ নয়। আর খানিকবাদেই ওরা নগদ সাড়ে চারটা টাকা পাবে, নিবারণ পাবে না। কদিন ধরেই তার বউটা পেট ব্যথায় কাতরাচ্ছে। রাত্তিরবেলা ঘুঙিয়ে ঘুঙিয়ে কাঁদে। এইসময় ওর একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার দরকার। একটু দুধ পেলে শরীরের পুষ্টি হত, পেটের বাচ্চাটা...। কিন্তু দুধ...কতদিন আগে পয়সা দিয়ে দুধ কিনেছে, মনেই পড়ে না নিবারণের। পুকুরের ধারে কলমিশাকপাতা আপনি জন্মায়, ক'দিন ধরে সেই কলমিশাক সেদ্ধ আর ফ্যান ভাত চলছে।

আকাশটাকে গাঢ় লাল রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। এই সময় আকাশটাকে ভগবানের রাজবাড়ির মতন মনে হয়। সেদিকে হাত তুলে মনে মনে নিবারণ বলল, এ-জন্মে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে গেলাম, হে ভগবান, পরজন্মে একটুখানি সুখ দিও, যেন দুবেলা পেটপুরে দুটো ভাত খেতে পাই। আর ছেলেপুলেগুলোদের হাতে একটু নাড়ু-বাতাসা দিতে পারি।

ডানদিকে, খানিকটা দূরে নিমগাছটার তলায় একটা ছোটোখাটো জটলা। বিনা পয়সায় দু এক টান বিড়ি খাওয়ার লোভে নিবারণ সেইদিকে এগিয়ে গেল। এবং গিয়েই একটা চমকপ্রদ খবর শুনল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিংস্র আনন্দে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। সে যেন এবার তার সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে।

উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে জোর করে মাথা গলিয়ে নিবারণ জিজ্ঞেস করল, ওসব কথা ছাড়ো দিকিনি! কেউ নিজের চোখে দেখেছে?

সোনারং গ্রামের বাঙাল চারু বলল, নিজের চোখে দেখিনি কি চাটাম মারছি নাকি?

নিবারণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, এখনো আছে?

—এই তো ভানু দেখে এয়েছে একটু আগে। মাটিতে গইড়ে ছটফটাচ্ছে!

—সত্যি রে, ভানু?

ভানু অতি সরল নির্বোধ লোক। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস থেকেই তার মাথায় টাক। সবাই জানে, মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই ভানুর।

ভানু বলল, হ্যাঁ দেখিছি, কালো জামগাছটার তলায়। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ওঝা এয়েছে। এমন ধুনো জ্বেলেছে না, চোখ জ্বালায় আমি আর তিষ্ঠুতে পারলাম না।

নিবারণ রাগ করে বলল, ওঝা? তোদের শালার কি ঘটে বুদ্ধি হবে না কোনোদিন? সুরেন্দ্রকে খবর দিস নি কেন? সে বাপ্পোৎ যে বড় তড়পায়! সে হারামির বাচ্চাটা আজ দেখাক তার কতখানি মুরোদ।

ভানু বলল, সুরেন্দ্র তো টাউনে?

—শালাকে টাউন থেকে ধরে নিয়ে আয়। ওর ইচ্ছে মতন তেনারা কী শুধু ছুটির দিনে দেখা দেবেন?

—মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলা সুরেন্দ্র টাউন থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কোন মাগিকে নাকি ওর মনে ধরেছে।

—তবে ডাক না শালাকে!

সকলে হৈ-হৈ করে খালপাড়ের বাঁধ থেকে নেমে গ্রামের দিকে ছুটে গেল। সুরেন্দ্রর বাড়ি গ্রামের এক টেরেয়। বাড়ির লপ্তের ধানি জমি এককালে তাদেরই ছিল। তার বাপ ছিল খুব শক্ত হাতের চাষি। কথাবার্তায় কাউকে রেয়াৎ করতো না। অল্প জমিতে গায়ে খেটে সে নিজের বউ-ছেলেকে দুবেলা খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিল।

সে জমি-জেরাত সব গেছে, কিন্তু বাড়িটি এখনো আছে। গ্রামের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। সব সময় ফন্দি-ফিকির করে এ ওর জমি কিংবা বাগান নিজের ভাগে নিয়ে নিতে চায়। মিথ্যে মোকদ্দমা লাগে। তা ছাড়া গা-জুয়ারি দখল তো আছেই। কিন্তু অন্যের বসতবাড়ি কেউ চট করে দখল করতে চায় না। সব গ্রামেই একখানা দুখানা বসতবাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, মালিকের কোনো পাত্তা নেই, দিনেরবেলা ঘুঘু চরে সেখানে, তবু অন্য কেউ সে বাড়িতে চট করে বাস করতে আসে না। তাতে বাস্তুদেবতা অসন্তুষ্ট হন। অভিশাপ দেন। সেইজন্যই, এমনকি পাশের বাড়ির লোকও আত্মীয়-কুটুম হঠাৎ এসে পড়লে নিজেদের বাড়িতে জায়গা না থাকলেও তাদের সেই ফাঁকা বাড়িতে থাকতে পাঠায় না। বরং সেটা পোড়োবাড়ি হয়ে যাক, তাও ভাল। লোকে জানালা দরজাগুলো খুলে নিয়ে জ্বালানি করে।

সুরেন্দ্র নিজেদের বাড়িটাতে জানালা কপাট বসিয়ে আবার বাসযোগ্য করে তুলেছে। শহরে তার ফ্যাকটরির পাশে নিজস্ব কোয়ার্টার আছে। সেখানে পাকা নর্দমা আর কলের জল। তবু সুরেন্দ্র আজকাল প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে এসে

থাকতে ভালোবাসে। এই মাটি তাকে টানে। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে নিজের ঘরে একা শুয়ে থেকে সুরেন্দ্র আপনমনে কাঁদে। গলগল করে চোখের জল বেরোয়। অত বড় দশাসই লোকটা যে কাঁদতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করবে না। সুরেন্দ্র কাঁদে একা। তার খুব কষ্ট হয় তার মায়ের কথা ভেবে। একদিন নিষ্ঠুরের মতন সে তার মাকে ছেড়ে চলে যায়। চৌধুরীবাবুরা বিনা দোষে তাকে শুয়োর পেটা করার ফলে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। মায়ের কথাও তখন তার মনে পড়েনি। সে পালিয়েছিল। তার মা খেতে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে মরে গেছে। এই ঘরে। তার মায়ের নাকি ওলাউঠা হয়েছিল বলে গাঁয়ের কেউ তাকে ছোঁয়নি, তিনদিন ধরে বাসি মড়া পড়েছিল এখানে। তারপর থেকে আর ভয়ে কেউ এ-বাড়ির পাশ মাড়াতো না।

সুরেন্দ্র এতদিন বাদে ফিরে এসেছে এই গাঁয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। এখন তার পকেটে টাকা আছে, শরীরে বল আছে, মনে জোর আছে—তবু সে আর তার মাকে ফিরে পাবে না।

নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সুরেন্দ্র এক একবার ভাবে, একদিন সে এ গ্রামেরই কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে। তাহলে, তখন হয়তো এ গ্রামের ওপর তার রাগ পড়ে যাবে। কিন্তু সেরকম মেয়ে কই? কারুকেই চোখে ধরে না। রূপের কথা ছেড়েই দাও, একটারও স্বাস্থ্য ভাল নয়। কারুর ভাল করে বুকটুকুও ওঠেনি।

বাইরে থেকে কে যেন মোটা গলায় ডাকে, সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্র!

ঠিক যেন তার বাবার গলা।

সুরেন্দ্র শুয়ে শুয়ে হাসে। গাঁয়ের উটকো ছেলেরা তাকে নানারকম ভাবে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে অনেকবার। টিনের চালে ঢেলা ছুঁড়েছে, জলে ডোবানো বেড়াল ছেড়ে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। একদিন তক্কে তক্কে থেকে সুরেন্দ্র কয়েকটা ছোঁড়াকে ধরে ফেলে বেধড়ক ধোলাই দিয়েছিল। তারপর থেকে ওসব উৎপাত অনেকটা কমেছে, কিন্তু দু-চারজন এখনো তার পেছনে লেগে আছে। আবার ধরতে পারলে হয়।

আবার সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র বলে ডাক উঠতেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ নেই। আকাশে তৃতীয়ার ফালি চাঁদ। কয়েকটা চামচিকে উড়তে উড়তে চাঁদের দিকে চলে যাচ্ছে। পরপর চারটে নারকোল গাছের সব কটা পাতা এখন হাওয়ায় উত্তরমুখো।

কেউ নেই, তবু কে ডাকল?

সুরেন্দ্র চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়। খানিক আগে সন্ধে হয়েছে। এর মধ্যেই গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে মোহনিদ্রা। সুরেন্দ্র নিজের কপাটবুকে হাত বুলিয়ে মনে মনে বলল, ওরকম হয়। একলা থাকলে ওরকম শোনা যায়। আর বেশিদিন একলা থাকতে ইচ্ছে করে না।

অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে কারা যেন হেঁটে আসছে। সাত আটজন মানুষ। তারা আসছে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে, এ বাড়ির দিকেই। সুরেন্দ্র স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দলের প্রথমেই আছে নিতাই। সে লাফাতে লাফাতে এসে বলল, সুরেনদা, ও সুরেনদা জবর খবর আছে। আমি তোমার কাছেই আসছিলাম, পথে এনাদের সঙ্গে দেখা হল। জবর খবর।

সুরেন্দ্র বিনা উত্তেজনায় বলল, কী খবর?

—সোনারং গাঁয়ের সর্বানন্দ দাসের পুতের বউকে ভূতে ধরেছে।

সুরেন্দ্র ঠাট্টা করে বলল বটে? কতখানি ভাং খেয়েছিস?

এবার অন্য চার পাঁচজন এগিয়ে এসে বলল, সাচ্চা কথা! সর্বানন্দের ছেলে বিভূতির বউকে পেত্নিতে ধরেছে। সকাল থেকে মাটিতে পড়ে ছটফটাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কথা বলছে পেত্নিটা। কী সব কুচ্ছিত কথা।

ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখেই সুরেন্দ্র বলল, বটে! কী কুচ্ছিত কথা বলতো শুনি?

—সে তুমি গেলেই নিজের কানে শুনতে পাবে।

—আপনারা কেউ শোনেন নি? কেউ চোখে দেখেছেন?

নিবারণ উগ্র গলায় বলল, আলবত দেখেছে। এই তো চারু আর ভেনো—দুজনেই দেখেছে। ওঝা এসেও সে পেত্নিকে ভাগাতে পারছে না।

—সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি কোথায়?

—সে তো দুর্গাপুরে কাজ করে।

—ওদের বাড়ির কেউ আছে এখানে? ওদের বাড়ির কেউ তো ডাকতে আসে নি আমাকে।

—কেন, আমরা বললে তুই যাবি না? আমাদের কথা কথা নয়? আমরা কি ফ্যালনা?

—দ্যাখো, আমি সাফ কথা বলি। সর্বানন্দের বাড়ি দুআড়াই মাইলের রাস্তা। অতখানি রাস্তা উড়ো কথা শুনে যদি শুধুমুধু যেতে হয়, তার চেয়ে ঘরে বসে কেত্তন গাওয়া অনেক ভাল!

—নাকি তুই ভয় পাচ্ছিস এখন?

সুরেন্দ্র এবার হাসল। এত বয়স্ক বয়স্ক লোকদেরও তার খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। এদের মাথায় গোবর। সে বলল, আমার এমন লাভের কারবার, তাতে কী ভয় পেলে চলে? কিন্তু খাঁটি মাল পাচ্ছি কোথায়?

এবার গিয়েই দ্যাখ না।

—যাচ্ছি তা হলে। কিন্তু গিয়ে যদি দেখি ভাঁওতা, তা হলে কিন্তু উস্তম ফুস্তম করে ছাড়বো আমি। আমার সঙ্গে মাজাকি কর না। আমি সরল কথার মানুষ।

সুরেন্দ্র ঘরের মধ্যে ফিরে গেল রেডি হয়ে নিতে। অন্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু নিতাইয়ের অধিকার আছে ঘরে ঢোকার।

সুরেন্দ্র একটা ঝোলার মধ্যে কয়েকটি জিনিস ভরে নিচ্ছে। একটা ছোট টিনের বাক্স, তার মধ্যে কী আছে, নিতাই জানে না। একটা টর্চ। এক বান্ডিল ব্যান্ডেজের কাপড়। আর একটা বিলিতি মদের (দিশী-বিলিতি) খালি বোতল।

নিতাই জিজ্ঞেস করল, সুরেনদা, খালি বোতলটা নিচ্ছো কেন?

এক গাল হেসে সুরেন্দ্র বলল, জানিস না? এই বোতলের মধ্যেই পেত্নিটাকে ভরবো। ভূত-পেত্নিরা বোতলকে বড় ডরায়। যেই বোতলটা তুলে ধরবো, অমনি তার মধ্যে সুরুত করে এসে ঢুকে পড়বে। শালা! তুইও ওদের কথায় নেচেছিস!

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুরেন্দ্র বলল, চল। কয়েক পা এগিয়েই নিবারণ তাকে জিজ্ঞেস করল, টাকা এনেছিস তো সুরেন? একশো টাকা দিবি বলে কথা দিয়েছিস, আজ তোর টাকা খসবে।

সুরেন্দ্র নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিল, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন নিবারণকা? ভাল মাল পেলে আমি দাম দেব। টাকা যদি পায় তো পাবে সর্বানন্দ দাস, তোমাকে কি তার থেকে একটা পয়সাও দেবে?

নিবারণ খানিকটা চুপসে গেল। তবু সে মনে মনে বলল, তা আমি পেলাম আর না পেলাম, তবু তোর পকেট থেকে টাকা খসতে দেখলেই আমার আনন্দ হবে। হারামির বাচ্চা, তোর তেজ আজ ভাঙবে!

সর্বানন্দ দাসের অবস্থা এককালে বেশ স্বচ্ছল ছিল। এখন আর তেমন রমরমা নেই, জমি-জায়গা বেহাত হয়ে গেছে, তবু তার বড় ছেলে শহরে চাকরি করে বাড়িতে টাকা পাঠায়। বাড়িটি বেশ সুন্দর। মস্তবড় উঠোনের চারপাশে চারটি ঘর। আর সে বাড়ি ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো সুপুরিগাছ। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটি সুপুরিগাছ ঘেরা পথ চলে গেছে পুকুর পাড় পর্যন্ত। উঠোনের এককোণে একটি বড় কালোজাম গাছ।

বাড়িটি এখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ভিড় সামলাবার চেষ্টাও কারুর নেই। যার যা খুশি করছে, লোকের চ্যাঁচামেচিতে কান পাতা যায় না। সেই সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া। একটা হ্যাজাকের আলো ঘিরে উড়ছে অসংখ্য পোকা।

সর্বানন্দের পুত্রবধূ শান্তি শুয়ে আছে উঠোনে। তার সর্বাঙ্গের পোশাক ভেজা, মাথার চুল জল কাদায় মাখামাখি। চোখ দুটি বন্ধ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে অনবরত। শরীরটা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে হঠাৎ বেঁকে দুমড়ে উঠছে, যেন অসহ্য যন্ত্রণায়।

বড় একটা মাটির মালসায় টিকের আগুন জ্বেলে তাতে একটু একটু ধুনো দিচ্ছে সর্বানন্দ নিজে। আর শান্তির পাশে বসে ওঝা অনবরত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে চোখ বুজে, তার হাতে একটা ঝাঁটা।

ওঝাটি বেঁটে বাঁটকুল। এ গ্রামের মহাদেব ওঝার ছিল দারুণ নাম ডাক। আশপাশের দশ বিশখানা গাঁ থেকে তার বায়না হত। চেহারাও ছিল সাঙ্ঘাতিক, দেখলে ভয় ও ভক্তি—দুটোই জাগতো। মেয়েমানুষের মতন কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, এদিকে গালভর্তি চাপদাড়ি, টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা, চোখ দুটিও সেইরকম লাল, হাতে একটা ডাণ্ডা। এই মহাদেব ওঝা নাকি মন্ত্রের জোরে ভূত-প্রেতদের তিড়িংবিড়িং করে নাচাতে পারতো। মাস ছয়েক আগে সেই মহাদেব ওঝা মারা গেছে। সে নাকি নিজের শরীরের মধ্যে এক সঙ্গে দুটো ভূত ঢুকিয়ে আটকে রাখতে গিয়েছিল।

পুরুতের ছেলে যেমন পুরুত হয়, তেমনি ওঝার ছেলেও ওঝা হয়েছে। কিন্তু বাপের চেহারা পায় নি ছেলে। বয়েস তার মাত্র কুড়ি-বাইশ, দেহটি নাদুস নুদুস। তা হোক, বাপের কাছ থেকে মন্ত্রগুলো তো সব পেয়েছে। তার আর একটি বড় গুণ আছে, সে জিভ দিয়ে নিজের নাক ছুঁতে পারে।

মহাদেবের ছেলের নাম সুবল। সে মাটিতে জোড়াসন করে বসে খুব ভাব দিয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে, আর বউটি যেই মাঝে মাঝে বেঁকে দুমড়ে উঠছে, অমনি সে হাতের ঝাঁটা দিয়ে সপাং সপাং করে পিটোচ্ছে। মহাদেব ওঝা নাকি মারের চোটে রক্ত বার করে দিত। সুবল অতজোরে মারতে না পারলেও তার গালাগালির জোর আছে। শান্তি একবার বেশি করে হাত-পা ছুঁড়তেই সুবল ওঝা এক হাতে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারতে মারতে বলল, যা, যা, আবাগির বেটী, শতেক ভাতারি, দূর হ! দূর হ!

সুরেন্দ্র ভিড় ঠেলে এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়াল। মিশমিশে কালো যমদূতের মতন তার চেহারা। রাগে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে। প্রথমেই তার ইচ্ছে হল, সুবল হারামজাদাকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দুটো লাথি কষায়। শুয়োরের বাচ্চাটা মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে! সুরেন্দ্র দুপা এগিয়েও গেল তার দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারলো না। তার মনে পড়লো ফাদার পেরেরার কথা। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া কারুকে মারতে নেই। যখন তখন মারামারি করে জন্তুরা। তুমি তো মানুষ, সুরেন্দ্র!

সে ঝুঁকে সুবলকে বলল, দেখি কর্তা, ছাড় ছাড়! আমি একটু দেখব।

আজ যদি মহাদেব ওঝা থাকতো, তাহলে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেত একটা। মহাদেব ওঝার কাজে কেউ কখনো বাধা দিতে সাহস করে নি। সুরেন্দ্রর মতন সা-জোয়ানকেও গ্রাহ্য করতো না সে, তার গায়েও শক্তি কম ছিল না। কিন্তু ছেলেটি হয়েছে অকালকুষ্মাণ্ড!

সুবল মিনমিন করে বলল, আমার কেস, তুমি দেখবার কে? বেটিকে এই তাড়ালুম বলে! আর একটুখানি!

সুরেন্দ্র তাকে পোকামাকড়ের মতন অগ্রাহ্য করে বলল, সরো, সরো!

তারপর সর্বানন্দকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল?

সর্বানন্দ বিবর্ণ মুখে একটা হাত তুলে বলল, ওই জামগাছটা—

সুবলই এবার বাকিটা বলে দিল। আজ ভোরবেলা বাসি কাপড়ে এই বউটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। তখনও ভাল করে সূর্য ওঠে নি। ঘর থেকে উঠোনে পা দিয়েই দেখলো, তিনটে কই মাছ। একটা বড় মাটির হাঁড়িতে কাল রাত থেকে কইমাছ জিয়োনো ছিল। এ বাড়িতে প্রায় এরকম জিওল মাছ রাখা থাকে। কোনোক্রমে হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে- ছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা মাছ। বেড়ালে যে খেয়ে ফেলে নি, তাই ভাগ্যি। বেড়াল অবশ্য জ্যান্ত কই মাছকে ভয় পায়। বউ তাড়াতাড়ি মাছগুলোকে ধরে হাঁড়িতে ভরলো। সেই আঁশ হাত না ধুয়েই মুছে ফেলল কাপড়ে। তারপর ঘুমচোখে জল খালাস করে আবার ঘরে ফিরে শুতে যাবে, এমন সময়—

এই পর্যন্ত বলে সুবল থামল। উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্রায় বার পঞ্চাশেক শুনেছে, তবু সুবল খানিকটা নাটকীয় করবার জন্য বলল, ওই জামগাছটা, ওই জামগাছে ওঁত পেতে বসেছিল দুটিতে, দুই দুষ্টু আত্মা, ওরা তো এইসব সুযোগই খোঁজে! বাসি কাপড়ে আঁশ হাত মুছেচে, তার ওপর পেচ্ছাপ করে এসে পায়ে জল দেয় নি, বউ যেই জামগাছতলা দিয়ে আসছে, অমনি গাছের একটা ডাল নিচু হয়ে নেমে এসে মারলো তার মাথায় একটা ঝাপটা। ব্যস, সেই যে পড়ে গেল উঠোনে, তার তাকে নড়ানো যায় না।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, অত ভোরে আর কেউ জেগেছিল? কেউ দেখেছে যে বউ কইমাছ ধরেছিল? কিংবা পায়ে জল দেয় নি?

সুবল বিজ্ঞের মতন বলল, দেখতে হবে কেন? আমি তো কেস দেখেই বুঝে নিয়েছি। ওই যে বারান্দায় জিওল মাছের হাঁড়িটা এখনো রয়েছে।

সুরেন্দ্র বলল, হুঁ!

সুবল বলল, প্রমাণ চাও? দেখবে?

হাতের ঝাঁটা দিয়ে শান্তিকে খুব জোর একটা বাড়ি মেরে বলল, হারামজাদি, ছোটলোকের বাচ্চি, বল বল, বউ বাসি কাপড়ে মাছ ধরে নি?

শান্তির মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুলো, উঁ উঁ।

ওই দ্যাখো, স্বীকার পেয়েছে। আরও শুনবে?

আবার সে শান্তিকে ঝাঁটা মেরে বলল, গুখাগি, বল, গাছের ডাল নিচু হয়ে এসে ওর মাথায় মারে নি? বল, মারে নি?

এবার শান্তির মুখ দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বেরুলো, মেঁরেচে, মেঁরেচে!

সুবল সগর্বে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

সুরেন্দ্র সুবলের হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

শান্তি এ-গ্রামের মেয়ে নয়। সর্বানন্দের মামার বাড়ি রসাপাগলা গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সর্বানন্দ এই মেয়ে পছন্দ করে এসেছিল। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে। সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি মহকুমা শহর থেকে বি-এ পাস দিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে এ মেয়েকে মানিয়েছিল ভাল। ঘরের বউ হয়েও শান্তি জোড়াবিনুনি করতো অনেকদিন। শহরে খরচ বেশি বলে বিভূতি এই দুবছর হল বউকে গ্রামের বাড়িতে রেখেছে; সে নমাসে ছমাসে একবার আসে। এখনো বাচ্চাকাচ্চা হয় নি, ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে বউ বাঁজা।

সুরেন্দ্র তাকিয়ে রইলো শান্তির দিকে। একটু আগে উপুড় হয়েছিল এখন সে চিৎ হয়েছে, একটা হাত চাপা পড়েছে

পিঠের তলায়, মুখটা মাটির দিকে ফেরানো। ভরা যৌবনের এক নারী এতগুলো লোকের চোখের সামনে পড়ে আছে মাটিতে, ভিজে কাপড় সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে, আঁচলটা অজগর সাপের মতন গোল হয়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে পায়ের কাছে, কোমরের কষিও আলগা। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু সে চোখে কোনো দৃষ্টি নেই।

বাঁজা মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। সুরেন্দ্র এ পর্যন্ত দু গাঁয়ের মধ্যে শান্তির মতন সুন্দরী আর দেখেনি।

সুবল বললো, এক সঙ্গে দু দুটো দুষ্টু আত্মা এসে বসেছিল ওই জামগাছে। মদ্দাটা এখনো বসে আছে ওখানে, আমি গাছটার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিয়িছি, এদিকে আসতে পারবে না। পেত্নিটা সেঁধিয়েছে বউয়ের শরীলে। এক সঙ্গে ছাড়া দুটোতে যাবে না।

সুরেন্দ্র এগিয়ে গেল জামগাছটার দিকে। সুবল চেঁচিয়ে বলল, ওদিকে যেও নি, গায়ে বাতাস লেগে যাবে, তোমার গাছে বাতাস লেগে যাবে বলে দিচ্ছি। মদ্দাটা এখনো বসে আছে। দ্যাখো না হাওয়া বাতাস নেই, তবু ডগার ডালটা আপনা আপনি নড়ছে।

ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় সত্যিই মনে হয়, জামগাছের ডগার ডালটা দুলছে একটু একটু।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল, ও যেতে চায় যাক না।

সুরেন্দ্র নিচু হয়ে তার খাকি প্যান্ট গুটিয়ে ফেলল হাঁটু পর্যন্ত, তারপর তরতর করে উঠে গেল জামগাছে। সবচেয়ে মোটা ডালটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় সে?

সুবল বলল, আরো ওপরে, একেবারে ডগায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হাসছে ব্যাটা। আর একটু ওপরে ওঠ, টেরটি পাবে।

সুরেন্দ্র বুঝল ওর চালাকিটা। জামগাছের ডাল তেমন মজবুত নয়। তাদের বাড়িতে একটা জামগাছের পিঁড়ি ছিল, কথা নেই বার্তা নেই একদিন এমনিই সেটা মাঝখান থেকে ফেটে দুভাগ হয়ে গেল। এখন সে তার এতবড় শরীরটা নিয়ে যদি আরও ওপরে ওঠে, তাহলে হঠাৎ ভেঙে পড়ে যাবে। আর না উঠলে ওরা বলবে, সে হেরে গেল!

কোমরের বেল্টটা খুলে সে একটা গোল ফাঁস করলো। তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে যতটা লম্বা হওয়া সম্ভব লম্বা হয়ে, সে বেল্টের ফাঁস দিয়ে ধরার চেষ্টা করলো ডগার ডালটা। একবার ধরতে পেরেই সে মট করে ডাল ভেঙে সেটা হাতে নিয়ে নেমে এলো নিচে।

গাছের ডালটা সে সুবলের নাকের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললো, এর মধ্যে তোমার মদ্দা ভূতটা বসে আছে?

সুবল ভয় পেয়ে মাথাটা পিছিয়ে নিল খানিকটা।

শান্তি এর মধ্যে উঠে বসেছে আর ফিকফিক করে হাসছে। সুরেন্দ্রর দিকে হাতছানি দিয়ে বললো, এই শোনো, শোনো।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, ডেকেছে, ডেকেছে, পেত্নিটা ওকে ডেকেছে।

সুরেন্দ্র খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ঠিক যেন স্বাভাবিক মানুষের মতন গলা। তবে কি বউটা এতক্ষণ নকল যাত্রা করছিল? সুবলের হাতে এত মার খেয়েও?

পাকানো আঁচলটা তুলে নিয়ে শান্তি গায়ে জড়িয়ে ভদ্র হলো। সেই রকমই ফিকফিকিয়ে হেসে হাতছানি দিয়ে সুরেন্দ্রকে বলতে লাগলো, এই শোনো, শোনো, শোনো না—

সুরেন্দ্র এগিয়ে বললো, কী?

—শোনো। আরও কাছে এসো—

আর একটু এগিয়ে সুরেন্দ্র বললো, কী?

শান্তি মাটির ওপর চাপড় মেরে বললো, বসো, এখানে এসে বসো। লজ্জা কি? আমাকেও তোমার লজ্জা? তুমি যে আমার নাগর। বসো—

সুরেন্দ্র মাটিতে বসলো।

শান্তি বললো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কানে কানে বলবো—

সুরেন্দ্র বললো, ওইখান থেকেই বলো—

পা ঘষটে ঘষটে শান্তি নিজেই চলে এলো সুরেন্দ্রর কোলের কাছে। তার মাথাটা ধরে টানলো। সুরেন্দ্র খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে। শান্তি তার কানে কানে কী যেন বলতে চায়।

সুরেন্দ্রর কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে শান্তি ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগলো। সুরেন্দ্র বুঝতে পারলো না তার একটাও বর্ণ। এক সময় সে উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলো। শান্তি তার কান কামড়ে ধরেছে। সুরেন্দ্র ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল শান্তিকে। তার কান দিয়ে দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে।

জনতা হেসে উঠলো হো-হো করে। সুরেন্দ্রর দুর্দশা দেখে তারা দারুণ মজা পেয়েছে। সেইদিন থেকে তার নাম হয়ে গেল, 'কানকাটা সুরেন!'

কিন্তু জনতার হাসিও থেমে গেল শান্তির অকস্মাৎ হাসিতে। শান্তি হি হি হি হি করে হেসে উঠলো, তার ঠোঁটের পাশে রক্ত। তারপর একটা অদ্ভুত বিকট গলা বার করে বললো, এই সুরেন্দ্র, আমাকে বিয়ে করবি? আয় না! বিয়ে করবি? তোতে আমাতে পাটক্ষেতে লুকিয়ে থাকবো। বিয়ে করবি? এই সুরেন্দ্র! আয় না!

সবাই জানে, সর্বানন্দের ছেলের বউ শান্তি বড় লাজুক মেয়ে। পাঁচজনের সামনে সে কক্ষনো রা কাড়ে না। বিশেষত শ্বশুরের সামনে সে কোনোদিনও এরকমভাবে খারাপ কথা বলবে না। তা ছাড়া এ তো শান্তির গলা নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে।

শান্তি আবার হাসতে লাগলো হি হি হি হি করে। মানুষে সেরকম হাসতে পারে না। ঠিক যেন দুটো ছুরিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। শুনলেই গা ছমছম করে। অনেকেই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সুরেন্দ্র রুমাল দিয়ে তার কানটা চেপে ধরে আছে। রক্তে ভিজে গেছে তার ঘাড়ের কাছের জামা।

শান্তি এবার সুরেন্দ্রর বুকের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, খেলবি? আমার সঙ্গে খেলবি? এই সুরেন্দ্র, আয় না, খেলবি? হি-হি-হি-হি।

স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা বিষয়ক বিধিনিষেধ ভুলে গেল সুরেন্দ্র। সে নিজেই এবার শান্তির চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দু গালে সপাটে দুটো থাপ্পড় কষালো। সুরেন্দ্রর মাথায় রাগ চড়ে গেছে।।

চড় খেয়ে শান্তি আবার নেতিয়ে পড়লো মাটিতে।

যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। সুরেন্দ্র রক্ত মুছচে কান থেকে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে নিবারণ বললো, এই সুরেন্দ্র, এবার টাকা বার কর, টাকা দে।

আর পাঁচজন বললো, হ্যাঁ, এবার টাকা দিতে হবে। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, কিসের টাকা?

—তুই যে বলেছিলি, চোখের সামনে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি? দে শালা সেই টাকা। এই মাত্তর কী দেখলি?

সুরেন্দ্র বললো, কী দেখলাম?

—এখন ন্যাকা সাজছিস? সবাই সাক্ষী দেবে, তুই পঞ্চাশবার বলেছিস নিজের চোখে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি। এই মাত্তর দেখলি না?

সুরেন্দ্র বললো, না দেখিনি।

—মিথ্যে কথা। টাকা মারবার মতলব! দে টাকা। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো, আজ আর ছাড়ান ছুড়িন নেই। বড় টাকার গরমাই দেখায়—

অনেকে মিলে গোল হয়ে এগিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর দিকে। ওরা সুরেন্দ্রকে এক সঙ্গে চেপে ধরবে। রোগা, খেতে না-পাওয়া, ভীতু নিবারণের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশি। সে ওই টাকার একটা আধলাও পাবে না, তবে তো সুরেন হারামজাদার দেমাক ঠাণ্ডা করা যাবে! সুরেন্দ্রর নিজের দলের ছেলে নিতাই পর্যন্ত এই কাণ্ড দেখে পেছনে লুকিয়েছে, সে আর মুখ খুলছে না। শান্তি বউদির ব্যাপার স্যাপার দেখে তার বুক কাঁপছে।

সুরেন্দ্র সামনের দুজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, তারপর জামার তলায় কোমর থেকে একটা মস্ত বড় ভোজালি টেনে বার করে বললো, খবরদার, আমার সঙ্গে এঁটেলবাজি করতে এসো না, তা হলে আমি রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবো!

এবার দৌড়ে পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ের ওপর উল্টে পড়লো। সুরেন্দ্রটা একটা খুনে, ঠিকই বোঝা গিয়েছিল আগে।

সুরেন্দ্র হাওয়ায় ভোজালি ঘুরিয়ে বললো, আমি এক কথার মানুষ। একশো টাকা দেবো বলিছি, আসল মাল পেলে ঠিকই দেবো। তা বলে আমাকে বাজে মাল, ভূষি মাল গছাবে? একটা মৃগী রুগী, তাই দেখিয়ে টাকা চাইছো? অ্যাঁ!

ভাঙা জামগাছের ডালটা মাটিতে তিনবার আছড়ে বললো, এর মধ্যে মদ্দা ভূত আছে? কোথায় সে শালা? নাকি আমাকে দেখেই পালিয়েছে?

ঝোলা থেকে খালি বোতলটা বার করে সুবলের সামনে ঠকাস করে রেখে সে বললো, সাপুড়েরা যেমন সাপ ধরে, সেই রকম একটা ভূত ধরে দাও দিখি আমাকে! তুমি তো ভূত ধরে বেড়াও। এই বোতলটার ছিপি আটকে দেবার পর যদি আপনা আপনি লাফায়, তবে আমি এক্ষুনি তোমাকে একশো টাকা দেবো। এক্ষুনি। এই দেখো টাকা।

সুরেন্দ্র পকেট থেকে একগোছা এক টাকার নোট বার করে দেখালো।

কিছু না পেরে সুবল বললো, যা যা।

মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে সুরেন্দ্র ভোজালিটা পাশে নামিয়ে রাখলো। তারপর শান্তির নেতিয়ে পড়া একটা হাত তুলে নাড়ি দেখতে লাগলো।

সর্বানন্দ এতক্ষণে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললো, এই, তুমি আমার বউয়ের গায়ে হাত ছুঁইয়ো না।

সুরেন্দ্র তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ! একটু আগে তোমার ছেলের বউ আমার কানে কানে কী বলেছে জানো? যদি সবার সামনে বলে দিই, তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।

সর্বানন্দ চুপসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওঝার ছেলে ওঝা সুবল কিন্তু এত সহজে তার দাবি ছাড়তে চায় না। দর্শকদের মধ্যে যে-কজন দূর থেকে তখনও উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাদের উদ্দেশে সে বলল, তোমরা দেখলে, তোমরা পাঁচজনা দেখলে, ও আমার কেস কেড়ে নিচ্ছে। এ বাড়ি থেকে আগে আমার ডাক পড়েছিল—

সুরেন্দ্র বললো, এতক্ষণ ধরে তো ভ্যাজর ভ্যাজর করলে, ধরতে পেরেছো পেত্নিটাকে?

সুবল বললো, তুমি সরো। এবার আমি ভূতডামরতন্ত্র শুরু করবো। বেটি ধরা না পড়ে যাবে কোথায়?

সুরেন্দ্র বললো, রাখো তোমার ভূতডামরতন্ত্র! তুমি তোড়লতন্ত্রের নাম শুনেছো? সে হলো গে সব তন্ত্রের বাবা। এইবার দ্যাখো, আমি সেই তোড়লতন্ত্র শুরু করছি!

সুরেন্দ্র তার ঝোলা থেকে টিনের বাক্সটা বার করে খুললো। তার মধ্যে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আর টুকিটাকি ওষুধ। একটা অ্যাম্পিউল ভেঙে সবটা ওষুধ ভরে নিল সিরিঞ্জে। তারপর ডগাটা উঁচু করে হাওয়া বার করলো।

সবাই শঙ্কিত বিস্ময়ে চুপ।

সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বললো, ভয় পেয়ো না, আমার সুঁই দেওয়ার অভ্যাস আছে। ফাদার পেরেরার নাম শুনেছো? মস্ত বড় ডাক্তার। আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। খাইয়ে পরিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তেনার কাছ থেকে সুঁই দেওয়া শিখেছি।

প্যাট করে সিরিঞ্জের সুচটা সে ফুটিয়ে দিল শান্তির ডান বাহুতে। পাকা কম্পাউণ্ডারের মতন তার ভঙ্গি। শান্তি একটুও শব্দ করলো না। সবটুকু ঢেলে দিয়ে সুচটা বার করে সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বললো, তোমার ছেলের বউয়ের হিস্টিরি অসুখ হয়েছে। এখন দশ বারো ঘণ্টা ঘুমোবে। তারপর জেগে উঠলে ভাল করে খেতে দিও। সেরে যাবে। যাও, এবার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাওগে! উঃ, কানটা একেবারে ফালা ফালা করে দিয়েছে।

সর্বানন্দ বললো, বউয়ের গায়ে এখন এত শক্তি যে পাঁচজন মিলেও ওকে আগে ধরে রাখতে পারে নি। ঘরে নিয়ে যাবো কী করে?

সুরেন্দ্র বললো, হুঁঃ!

তারপর দক্ষযজ্ঞের শিবের মতন সে শান্তিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মাটি থেকে। সর্বানন্দকে বললো, কোন্ ঘরে শোয় দেখিয়ে দাও, বিছানায় রেখে আসছি।

বারান্দা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে সে সর্বানন্দর দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে তাকালো। তারপর নিচু গলায় বললো, পোয়াতি বউটাকে বুঝি এইভাবে মেরে ফেলতে চাও? ছিঃ। তোমরা না ভদ্রলোক!

তিনদিন ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বিশ্বাসই হয় না যে এটা শীতকাল। ঠিক যেন বর্ষার ধারা।

সারা গায়ে জল-কাদা মেখে সন্ধের সময় টলতে টলতে বাড়ি ফিরছে নিবারণ। নেশাভাঙ কিছু করে নি, তবু তার পায়ে জোর নেই। শরীর যেন আর বয় না। যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় পড়ে যাবে। তার বুকে সারা বিশ্বের হতাশা।

মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে নিবারণ তার বন্ধকি জমিতে ফুলকপির চারা লাগিয়েছিল মাত্র পাঁচদিন আগে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। এই সময় এত বৃষ্টির কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। এ যেন ঈশ্বরের অভিশাপ। আজ আবার পাশের জমির আল ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে পড়লো। কপির চারাগুলো সব পচে যাবে। কিছু কিছু চারা তুলে ফেলার চেষ্টা করেছিল নিবারণ, কিন্তু অর্ধেকের বেশিই বাঁচাতে পারে নি। মহাজনের সঙ্গে শর্ত ছিল পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

সে তো গেল ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আজ! কাল দুপুর থেকে মাটি কাটা বন্ধ হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে মাটি কেটে কোনো লাভ নেই। অথচ আজই ছিল নিবারণের পালা। আজ কাজ থাকলে সে নিজের খোরাকির ভাত আর নগদ সাড়ে চারটে টাকা পেত। এখন মনে হচ্ছে সাড়ে চার টাকায় কত কিছু কেনা যায়। মাত্র সাড়ে চার টাকায় এক পৃথিবী ভর্তি সুখ।

রহমান সাহেব বলেছেন, আজ যারা কাজ পেলো না, কাল যদি বৃষ্টি থামে, তবে তারাই কাজ পাবে আগে। আর কালও যদি বৃষ্টি থাকে তাহলে পরশু। মোট কথা নিবারণের কাজ বাঁধা। এখন কাল বা পরশু পর্যন্ত নিবারণকে পেটে কিল মেরে বেঁচে থাকতে হবে।

নিবারণ ক্রুদ্ধ দু'চোখে আকাশের দিকে তাকালো। মেঘও মানুষের এত শত্রুতা করে? ছোট ছোট ফুলকপির চারাগুলো দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়, ঠিক যেন মায়ের কোলে মুখ লুকোনো শিশু, আকাশের দেবতাদেরও একটু মায়া হলো না তাদের মেরে ফেলতে? ফুলকপির চারাগুলো কাঁদছিল ডুকরে, নিবারণ শুনেছে।

কাদার মধ্যে পা হড়কে যেতেই নিবারণের কোমরের কষি একটু আলগা হয়ে গেল, আর অমনি তার ট্যাক থেকে টুপুস করে খসে পড়লো একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি। তার মধ্যে রয়েছে কালো-হলদে রঙের লম্বা লম্বা ছখানা ওষুধ। অন্ধকারে কাদার মধ্যে শিশিটা আবার গেল কোথায়? নিবারণ রোগা রোগা আঙুল দিয়ে সেটাকে খুঁজতে লাগলো। বিরক্তিতে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। তার কিছুই ভাল লাগছে না। .

পাওয়া গেল শিশিটা। ভেতরে কাদা ঢোকে নি তো? না, ওপরে একটা রবারের ছিপি আছে, হাওয়াও ঢুকতে পারে না। শিশিটা খুঁজে পেয়ে আনন্দ হবার বদলে নিবারণের ইচ্ছে হলো সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সোনারং-এর হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুর খুব মাছ ধরার শখ। এক এক রোববার এক এক পুকুরে মাছ ধরতে যান। গত রোববার এসেছিলেন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির পেছনের মজা দীঘিতে। পান্তি আর গেনু ঘুরঘুর করেছে সেখানে। মাছ ধরারই ঝোঁক ডাক্তারবাবুর, মাছ খাওয়ার লোভ নেই। একটার বেশি মাছ ধরা পড়লে বাকিগুলো অন্যদের বিলিয়ে দেন। সবাই জানে। সেদিন ডাক্তারবাবুর ছিপে একটাও মাছ ধরা পড়ে নি অবশ্য, কিন্তু তিনি একবার এসেছিলেন নিবারণের বাড়িতে। অল্প-বয়েসি ডাক্তারবাবুটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করেন খুব। পান্তি আর গেনুই টেনে এনেছিল ডাক্তারবাবুকে। ওরা ওদের দাদুকে ভালোবাসে। ক'দিন ধরে পবন খুবই অসুস্থ, কথা বলার ক্ষমতাও প্রায় নেই।

তা ডাক্তারবাবু পবনকে দেখে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলে গিয়েছিলেন। এটা খাওয়াতে হবে, সেটা খাওয়াতে হবে। নিবারণ সে সব কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার বাপ বুড়ো হয়েছে, এবার মরবে। তা নিয়ে আর আদিখ্যেতা করার কি আছে? শীতের শেষটাতেই পুরোনো রুগীরা টপাটপ মরে। গতবারেও এই সময়ে পবন শয্যা নিয়েছিল। সেবার খুব আশা করেছিল নিবারণ যে, বাবা এবারেই যাবে। শুধু শুধু বেঁচে থেকে তো পৃথিবীর এক রত্তি উপকারে আসে না। ওমা, বুড়ো কদিন বাদেই হাত-পা ঝেড়ে আবার উঠে বসলো। অবশ্য এবার আর পার পাবে না।

আজ বৃষ্টির মধ্যেও খালধারে ঝাড়া দু ঘণ্টা নিবারণ বসেছিল গাছতলায়। যদি হঠাৎ বৃষ্টি থামে, যদি মাটিকাটা শুরু হয়। সে সময় ছাতা মাথায় দিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে কলে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু।

নিবারণকে দেখে থামলেন। ডাক্তারবাবুটি আবার সবার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে তিনি নিবারণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাবা কেমন আছেন?

এসব জায়গায় শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই নিবারণ বলেছিল, ভালো।

—আমার ওখানে একবার আসবেন। আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দেবো, আপনার বাবাকে একটা টনিক খাওয়ানো দরকার—

নিবারণ চুপ করেছিল।

ডাক্তারবাবু আবার বলেছিলেন, আজই আসতে পারেন। এই ধরুন ঘণ্টাখানেক বাদে। আমি তার মধ্যেই ফিরে আসবো।

সেই সময়, যেন নিবারণ নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলে উঠেছিল, ডাক্তারবাবু, আমরা গরিব, ভগবান আমাদের দুবেলা পেটের ভাতও দেন নি, আমরা কি ওই সব দামি ওষুধ খেতে পারি?

ডাক্তারবাবুটির জোড়া ভুরু। তিনি তাঁর বড় বড় কালো দুটি চোখ নিবারণের মুখের ওপর স্থিরভাবে রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন। তারপর নিজের হাতের মস্তোবড় ব্যাগটা খুলে এই ওষুধের শিশিটা নিবারণকে দিয়ে বললেন, এটা দিনে দুটো করে খাওয়াবেন। ভাত খাওয়ার পর। আজ না হোক, কাল পরশু আমার ওখানে একবার আসুন, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি।

নিবারণ কোনো কথা বলছে না দেখে তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, কখনো আশা ছাড়তে নেই।

তখনও নিবারণের আনন্দ হয় নি। রাগই হয়েছিল। এক এক সময় মানুষের দয়া দেখলেও রাগ হয়। ডাক্তারবাবু যদি আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বড় বড় উপদেশের কথা বলতেন, তা হলে নিশ্চয়ই নিবারণ মনে মনে তাঁকে বাপ মা তুলে গাল দিত। সহ্য হয় না, কিছুই সহ্য হয় না।

অন্ধকারে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে নিবারণের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, যা না-ক্রোধ, না-ঘৃণা, না-উপহাস, না-দুঃখ, না-করুণার। সে হাসিটা অন্যরকম, বড় দুর্বোধ্য। ডাক্তারটি বললেন, ওষুধটা দুবেলাতে ভাত খাওয়ার পর খাওয়াবে। ডাক্তারটা বোকা, কিছুই শেখে নি। এখন নিবারণ যদি ওষুধটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কি তার পাপ হবে?

ওষুধটা ফেললো না নিবারণ। যাই হোক, দামি জিনিস তো। সে আবার হেঁটে চললো। মাঝারি ধারায় অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় পৃথিবীতে নিবারণ ছাড়া কেউ নেই। সে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এখন পৃথিবীতে তার সবচেয়ে ঘৃণার জায়গা তার নিজের বাড়ি, তবু সে সেখানেই যাবে।

আর বেশি দূর নেই। রাস্তার মাঝখানেই খানিকটা জল জমে আছে, সেইখানে নিবারণ তার পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। তারপর সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠলো সে।

তার বাড়ির সামনে বাতাবিলেবু গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে? বৃষ্টির মধ্যে ভাঙা ভাঙা অন্ধকারে দেখা যায় এক প্রেত। নিবারণের প্রাণটা যেন এসে আটকে গেল গলার কাছে। প্রথমেই তার মনে হলো, পিছন ফিরে দৌড় দেয়। প্রেতের বুকের পাঁজরার সবকটা হাড় স্পষ্ট, কঙ্কালসার একটা হাত সামনে বাড়ানো। নিবারণ মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করলো, আঁ আঁ।

প্রেতমূর্তি তখন নাকি ভাঙা গলায় বললো, কে নিবারণ এঁলি?

পেছন ফিরে পালাতে গিয়েও থেমে গিয়ে নিবারণ বললো, ধুর শালা।

সকালবেলাও নিবারণ যাকে দেখে গেছে বিছানার সঙ্গে একেবারে লাগা ওঠার ক্ষমতা নেই, কথা বলার শক্তি নেই, সে যে এই বৃষ্টির মধ্যে রাত্তিরে উঠে এসে বাইরে এসে দাঁড়াবে—একথা তো নিবারণ কল্পনাই করে নি। এ যে কইমাছের মতন কড়া জান। হারামির বাচ্চা, শালা।

নিবারণ এক ধমক দিয়ে বললো, তুমি আবার বাইরে এয়েছো কেন?

পবন কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। তার গলাও খোনা খোনা মনে হয়। সে বলল, তুই এখনো ফিরিস নি। যা বৃষ্টি বাদলা, আমি চিন্তা করছিলাম। নিবারণ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এ যে স্পষ্ট কথা বলে। তাহলে কি এ যাত্রাতেও বেঁচে গেল? হা ভগবান, আরও কতদিন এ বোঝা বইতে হবে?

পবন জিজ্ঞেস করলো, কিছু এনেছিস।

নিবারণ বললো, কী?

—চাল-আটা কিছু আনিস নি?

—কোতা থেকে আনবো? তোমার বাপের কাছ ঠেঙে? আজ মাটি কাটার কাজ হয় নি। আজ আমার যে-টুকু সব্বোনাশ বাকি ছিল, তাও হয়ে গেছে।

—কিছুই আনিস নি?

ট্যাক থেকে শিশিটা বার করে নিবারণ বললো, ওষুধ এনেছি। ডাক্তারবাবু বিনিপয়সার ওষুধ দিলেন তোমার জন্য। নাতি-নাতনি দুটোকে খুব জপিয়েছো তো, তারা ডাক্তারবাবুকে ধরেছিল।

পবন ওষুদের ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই না দিয়ে বললো, চাল-আটা কিছুই আনিস নি? আজ সারাদিন বাড়িতে আখা ধরে নি।

সেই মুহূর্তে নিবারণ তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললো। সে দৃঢ় গলায় বললো, আমাদের আর এখানে কোনো আশা নেই। কাল চলে যাবো। টাউনে গিয়ে রেল ইস্টেশনে ভিক্ষে করে খাবো।

পবন খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, তাই চল।

—তুমি যেতে পারবে?

—কেন পারবো না? একটু ধরে নিয়ে যাবি।

—যেতে পারো ভালো, না হলে তুমি বাড়ি পাহারা দেবে।

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, বউ শুয়ে শুয়ে জেগে আছে। চোখ দুটি বিবর্ণ। সারা শরীরের মধ্যে শুধু পেট ছাড়া আর সব জায়গাতেই স্বাস্থ্যহীনতা প্রকট।

ঘরে ঢুকে নিবারণ গম্ভীরভাবে বললো, আজ কিছু আনতে পারিনি।

বউয়ের মুখে কিছু ভাবান্তর দেখা গেল না।

—ঘরে কিছু আছে?

বউ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, না।

নিবারণ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বললো, নেই কেন? আমি এখন খাবো কি? কাল রাত্তিরে যে খানিকটা আটা বেঁচেছিল?

বউ একটুও উত্তেজিত হলো না। সেই রকমই মুখ ফিরিয়ে থেকে বললো, বিকেল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, তারপর পান্তি আর গেণু জল দিয়ে গুলে সেই আটা খেয়ে ফেলেছে।

ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে দিয়ে পবন শুয়ে পড়েছিল, সে হঠাৎ উঠে বসে ছেলের পক্ষ নিয়ে আলাদা একটা দল পাকাবার চেষ্টা করলো। কুটিল চোখে সে একবার তার পুত্রবধূ, একবার তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, দ্যাখ না, আমাকে পর্যন্ত একটু দেয় নি। নিজেরাই সব খেল। আমি কতবার বললাম, ও বউ, আমাকে একটু দে। আজ আমার জ্বর ছেড়েচে, আজ আমার খিদে বেশি হবে, অন্তত আমাকে ছটাক খানেক দে। কিংবা আমাকে না দিস, ছেলেটার জন্য একটু রাখ, সারাদিন খেটে-খুটে আসবে—সেকথা গ্রাহ্যই কবলো না। নিজেরাই গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে—

বউ এবার দেয়াল থেকে চোখ ফেরালো। শ্বশুরের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সেই দৃষ্টিতেই তাকে ভস্ম করে দেবে। কনুইতে ভর দিয়ে আধা-বসা হয়ে কণ্ঠে বিষ ঝরিয়ে সে বললো, খালভরা, তোমার মরণ নেই? একথা বলার আগে তোমার জিভ খসে গেল না? ছেলেমেয়ে দুটো খেয়েছে, আমি নিজে একটা দানাও ছুঁয়েছি? আমার পেটে একটা শত্তুর, তবু আমি কিছু খাইনি। আর তোমার নোলাটাই বড় হলো? ভারি যে ছেলের জন্য দরদ! নিজে তিনবার রান্নাঘরে গিয়ে ঘুটঘাট করে আসো নি? ছেলের জন্য তুমি রাখতে? সব জানা আছে আমার! অলপ্পেয়ে, তুমি মরতে পারো না? মরলে আমার হাড় জুড়োয়!

পবন ছেলের দিকে চেয়ে বললো, দেখলি? দেখলি?

নিবারণ কোনো পক্ষই নিল না। তার ইচ্ছে হলো, ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটোকে জোরে জোরে লাথি কষায়, বাপকে লাথি কষায়, বউকেও। খাবার দরকার ছিল তার একার। কাল যদি ভগবান করেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়, তাহলে না-খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে সে মাটি কাটতে যাবে কী করে? সে নিজে না বাঁচলে আর কেউ বাঁচবে! সেকথা এরা কেউ বোঝে না। সকলেই রাক্ষুসে খিদে নিয়ে হাঁ করে আছে।

কাল যদি বৃষ্টি না থামে, তাহলে যেতেই হবে টাউনে। রেল ইস্টিশানে মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে। টাউনে কেউ না খেয়ে মরে না। টাউনের লোকদের ওপর ভগবানের অশেষ দয়া।

বউ তখনও গজগজ করে যাচ্ছিল, নিবারণ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ!

দরজার বাইরে থেকে জল গড়িয়ে আসে ঘরের ভেতরে, তাই সেই জল আটকাবার জন্য দরজার কাছে একটা ন্যাতা পেতে রাখা আছে। সেই ভেজা ন্যাতাটা তুলে নিয়ে নিবারণ হাত পায়ের কাদা মুছলো। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে তার পুকুরে যাবার ইচ্ছে নেই। ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে সে শুয়ে পড়লো।

পাশাপাশি একখানা বড় ঘর আর ছোট ঘর। মাঝখানের দরজাটা আজকাল খোলাই থাকে। ছোটঘরের জানালাটা নিশ্চয়ই খোলা রয়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাঁট আসছে এ ঘর পর্যন্ত। নিবারণ ভাবলো, তার বাপ ভিজছে। ভিজুক। আজও তো চলাফেরার ক্ষমতা রয়েছে, নিজে উঠে বন্ধ করতে পারে না? নিবারণের গায়ে যদি বেশি ছাঁট লাগে, সে পা দিয়ে ঠেলে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেবে।

কোন শব্দ নেই, শুধু টিনের চালে কাকের পায়ের আওয়াজের মতন বৃষ্টি। ছেলেমেয়ে দুটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর জাগে নি। তারপর ঘুমোয় গর্ভিণী, কিন্তু খালি পেট নিয়ে নিবারণের কিছুতেই ঘুম আসে না। আর এক অসুস্থ বৃদ্ধের তো সহজে ঘুম আসবার কথা নয়।

খানিকবাদে পবন কোঁ কোঁ শব্দ করে ওঠে।

নিবারণ জিজ্ঞেস করলো, কী হলো আবার?

পবন শ্বাস টেনে টেনে বলে, কিছু না। দুদিন ভাত খাইনে, বড় খিদে পায়।

নিবারণ ওষুধের শিশিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, এই নাও, খাও।

পবন শ্বাস টেনে টেনে বলে, কিছু না। দুদিন ভাত খাইনে, বড় সত্যি সবকটা ক্যাপসুলই মুখে পুরে চিবোতে থাকে। খচর মচর শব্দ হয়।

একটু পরে সে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, উফ। কতদিন তামাক খাই না। বউয়ের কাছে একটু আগুন চাইলাম, দিল না।

—তুমি চুপ করবে?

বুড়ো চুপ করে যায়, তবু মুখ থেকে চাপা কোঁ কোঁ শব্দ বেরোয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

তারপর আরও অনেকক্ষণ বাদে, তখনও নিবারণ ঘুমোয়নি, জানালা দিয়ে একফালি আলো ঢুকে দেওয়ালের গায়ে দু-এক পলক কাঁপে, আবার মিলিয়ে যায়। কিছু দূরে শোনা যায় ক্ষীণ ঝুনুঝুনু শব্দ।

নিবারণ কান খাড়া করে থাকে। ওরা আসছে। আশ্চর্য, এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যেও বেরিয়েছে ওরা? নিবারণের পেটের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলে অহেতুক রাগ। ওদের পকেটে টাকা আছে, গায়ে শক্তি আছে, তাই ওরা এইসব

আমোদ আহ্লাদ করতে পারে। ওরা নিবারণের মতন লোকদের আরও কষ্ট দেবার জন্য আসে। কান-কাটা সুরেন্দ্রটা মরে না কেন? কত লোক বে-ঘোরে মরে, ওর মরণ হয় না?

ওরা পাঁচল্যার মোড়ের গাছতলায় এসে পৌঁছে গেছে মনে হয়। ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে ভেসে আসে টুকরো টুকরো গান :

ভূতের নাতি ভূতের পুতি...বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি
যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই...
ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে...
শটাকা শ টাকা...
এক এক ভূত এক এক শো টাকা...

পবন দুবার কেশে ওঠে। বোঝা যায় সেও জেগে আছে। নিবারণ জিজ্ঞেস করে, বাবা, ও বাবা? তোমার কষ্ট হচ্ছে?

পবন বলে, না।

—বাবা, তুমি ভূত দেখেছো কখনো, সত্যি করে কও তো।

—হ্যাঁ, দেখিছি। অনেকবার দেখিছি।

—কারা মলে ভূত হয়? সকলেই মলে ভূত হয়?

—যারা অপঘাতে মরে, মরার পরেও যাদের আহিকে থেকে যায়।

নিবারণ হঠাৎ উঠে পড়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দেখা যায় তার শরীরটা।

পবন জিজ্ঞেস করে, ওঠলি যে? বাইরে যাবি?

নিবারণ বললো, না। বাবা তুমি মলে...

পবন বলে, হ্যাঁ আমি ভূত হবো নিশ্চয়। সে কি আর তোকে বলতে হবে...নাতি নাতনি দুটোর মুখ চেয়েও...সুরেন্দ্রকে ডেকে আনিস...আমি বোতলে ঢুকে যাবো, তুই একশো টাকা...

তারপরই চিৎকার ও কান্না মিশিয়ে সে বলে ওঠে, ও বাবা নেবারণ আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, আমি দুটো দিন... একটু গরম গরম ভাত দিস...দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই...এক ছিলিম তামাক...ও বাবা নেবারণ, তোর পায়ে পড়ি...আর দুটো দিন...একটু গরম ভাত...তোর পায়ে পড়ি, ও বাবা নেবারণ, আর দুটো দিন...

হরিণ শিশু

বারান্দার সিঁড়িতে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে চুপ করে বসে থাকে এসে। ওরা কিছু চায় না, নিজেদের মধ্যেও কোনও কথা বলে না, শুধু নিঃশব্দে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কুচকুচে কালো রং, দশ থেকে বারোর মধ্যে বয়েস, ধুলো রঙের নেংটি মালকোঁচা করে পরা, ওদের মধ্যে একটি মেয়েও আছে, মেয়েটিকে দেখলে অড্রি হেপবার্নের কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। ওঁরাও না মুণ্ডা কোন জাতের মেয়ে যেন, দশ-এগারো বছর মাত্র বয়েস—তার সঙ্গে অড্রি হেপাবার্নের কোনই মিল নেই, তবু মুখের কোথাও কিছু একটা আছে, যেজন্য মনে পড়েই। সেজন্যই হয়তো একটু মায়া হয়, তা ছাড়া ভিতরে ভিতরে একটা কিছু কাঁটার খোঁচা রয়ে গেছে, তাই ওদের উঠে যেতেও বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের অস্বস্তি হয়, নেতারহাটের ডাক-বাংলোর বারান্দায় বসে, সামনে বিশাল উপত্যকা ও মহিমার মতন গাঢ়নরম সূর্যালোক, সুবিমল এবং তার স্ত্রী ও শ্যালিকা অরুণা এবং বরুণার সঙ্গে চা খেতে খেতে সামনের ওই সিঁড়িতে-বসা মলিন বাচ্চাগুলোকে দেখে আমাদের অস্বস্তি হয়। পরশু বিকেলে আমরা এখানে আসার পর থেকেই, ওরা আমাদের সঙ্গে আছে, সবসময়।

সামনের সুরকি বেছানো লনে একটা কুকুর, বেশ দেখতে, শীতের জায়গায় পারিয়া কুকুরেরও বেশ ভরাট স্বাস্থ্য ও লোম-ভরতি গা হয় যেমন, কুকুরটা গ্রামোফোন রেকর্ডের কুকুরের মতন ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে বসে প্রতীক্ষায় থাকে। আমি পাঁউরুটির মাথার দিকটা পছন্দ করি না বলে টোস্টের শেষটুকু শূন্যে ছুঁড়ে দিই, কুকুরটা শূন্য থেকেই লাফিয়ে, সেটাকে মুখে পুরে নেয়। আর তখন সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো আমার হাতের দিকে চেয়ে থেকে দৃষ্টি দিয়ে টোস্টের টুকরোটাকে শূন্যে অনুসরণ করে—একেবারে কুকুরটার মুখ পর্যন্ত।

শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া, কলকাতার লোকেরা এখন কী রকম গরমে ভুগছে ভেবে ঠাণ্ডাটা আরও ভালো লাগে, সামনে পাতলা বাষ্পের মতন উড়ে যাচ্ছে মেঘ, মেঘ কিনা অবশ্য সন্দেহ হয়—কেননা শুনেছিলাম, প্রায় দুবছর এখানে বৃষ্টিই হয় নি, অথচ এ-রকম মেঘের ওড়াওড়ি এখানকার পাহাড়ের চূড়ায় তো রোজই দেখা যায়। ডিমের পোচটায় চামচ বসাতে গিয়ে অরুণা অসাবধানে নিজের শাড়িতে খানিকটা তরল হলদে লাগিয়ে ফেললো। তাড়াতাড়ি জলে রুমাল ভিজিয়ে সেইখানটা মুছতে মুছতে অরুণা স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ঝাঁঝালো গলায় বলে, তার চেয়ে চলো ঘরে বসে খাই, সব সময় মুখের দিকে ওরকম তিন চারজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে কেউ খেতে পারে? বরুণা বললো, তাই বলে এমন সুন্দর সকালটা ঘরে বসে নষ্ট করবো নাকি? সব জায়গাতেই তো এরা—। টুরিস্ট স্পটগুলোতে অন্তত ভিখিরি আসাবন্ধ করতে পারে না কেউ?

সুবিমলের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সিগারেট ধরিয়ে সে অন্যমনস্ক গলায় বললো, এরা ভিখিরি নয় বোধহয়। লোকাল লোক। এবার যা অবস্থা হয়েছে এদিকে।

অরুণার শাড়িতে ডিমের কুসুমের চটচটে আঠা হয়ে গেছে, কিছুতেই উঠছে না, তার বিরক্তি তখনও লেগে আছে, বললো, গভর্নমেন্টও যা হয়েছে, লেফটই বলো, আর রাইটই বলো—এই, এই নে, এদিকে আয়।

অরুণা নিজের প্লেট থেকে দুটো এবং আমার ও বরুণার প্লেট থেকে একটা করে টোস্ট তুলে নিয়ে ওদের দিকে হাত এগিয়ে বললো, এই নে, নিয়ে তোরা এবার যা বাপু।

ছেলেমেয়েগুলো পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। একজন দুর্বল ও লাজুকভাবে এগিয়ে এসে টোস্ট চারটে নিয়ে ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিলি করে দেয়—ওরা সবাই অত্যন্ত ভদ্র ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে বিনা শব্দ করে খেতে থাকে।

সুবিমল উদারভাবে হেসে বলে, এদের কজনকে আর তুমি কতদিন খাওয়াতে পারবে বলো।

কুকুরটাও এবার ছোট্ট ঘেউ শব্দ তুলে কাছে এগিয়ে আসে। অরুণা এবার হেসে ফেলে। আবার তুই-ও আছিস! নে—। বরুণার বাকি টোস্টটাও অরুণা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে, কুকুরটা সেটা ছুটে গিয়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে আবার রেকর্ডের ছবির মতন বসলো।

বরুণা বললো, ওরা কিন্তু গেল না।

অর্থাৎ ছেলেমেয়েগুলো তখন সিঁড়িতে বসে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। আমি অরুণাকে রাগাবার জন্য বললুম, এই একটা মুশকিল, আমাদের খাবার সময় যদি একটা কুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—তা হলে খারাপ লাগে না। কিন্তু যদি আর কয়েকটা মানুষ তাকিয়ে থাকে, তা হলেই বিশ্রী লাগে।

বরুণা আশানুরূপ বেগে উঠলো এবং দর্পিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এইবার বুঝি আপনার লেকচার শুরু করবেন? আমরাই যেন সব দোষ করেছি, না? এরা খেতে পাচ্ছে না বলে আমাদেরও বুঝি না খেয়ে থাকতে হবে?

—তোমার অনন্ত তাই-ই থাকা উচিত। দিনদিন যা স্বাস্থ্যখানা করছো।

—আর আপনার নিজের কি? জন্মেও বুঝি আয়না দেখেন না?

—আমার আবার আয়না দেখার দরকার কি? তোমার চোখের মণিতেই তো আমি নিজেকে দেখতে পাই।

—ভালো হচ্ছে না বলছি। সব সময় যদি এরকম করেন, আমি তা হলে আজই চলে যাবো একা একা।

সুবিমল ও অরুণা হাসতে থাকে, আমি বরুণার দিকে তাকিয়ে বললুম, সে কি, চলে যাবে কি? তোমাতে-আমাতে যে আজ আলাদা ওয়াচ টাওয়ারে যাবো দুপুরবেলা, কথা ছিল! কাল যে বললে, মনে নেই!

—কখন বললুম? কী মিথ্যুক! বয়ে গেছে আপনার সঙ্গে আলাদা যেতে।

—তা হলে যাওয়াই হবে না। এখানকার নিয়ম জানো না, ওয়াচ টাওয়ারে দুজন করে আলাদা যেতে হয়।

—মোটেই সে রকম কোনো নিয়ম নেই। ভ্যাট্! যদি থাকেও তা হলে আমি জামাইবাবুর সঙ্গে যাবো।

কিন্তু সুবিমল কি ওর বউকে আমার সঙ্গে ছাড়বে?

সুবিমল গম্ভীরভাবে বললো, আমি ওর সঙ্গে আমার বউকে কিছুতেই একা যেতে দেবো না! অরুণা ঠোঁট উলটে স্বামীকে এক খোঁচা মেরে বললো, ইস—। বরুণা তার সতেরো বছরের ছেলেমানুষি সিরিয়াসনেসের সঙ্গে বললো, তাও যেতে হবে না। প্রথমে আমি আর জামাইবাবু যাবো, তারপর ফিরে এসে জামাইবাবু আর দিদি, তারপর আপনি আর জামাইবাবু কিংবা আপনি একা—

—দিদি আর জামাইবাবু যখন ওপরে যাবে, তুমি তখন নিচে আমার সঙ্গে—এ যে বাঘ, ছাগল আর পানের ধাঁধা হয়ে গেল। জানো ধাঁধাটা?

বরুণা শব্দ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার ধাঁধা জানার সময় নেই। —তারপর রাগ প্রকাশের তীক্ষ্ণ গলায় সেই ছেলেমেয়েগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, আভি যাও না! সব সময় জ্বালাতন।

আমি মুচকি হেসে বললুম, দেখো, আমি জানি ওদের কী রকমভাবে বিদায় করতে হয়। দেখবে?

পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললুম, এই বাচ্চা, ইধার কাঁহাপর সিগরেট মিলতা হ্যায়?

ওরা পরস্পরের দিকে আবার তাকালো। একজন উত্তর দিল, হাঁ সাব, কোপরিটিব মে।

আমি একটা খালি সিগারেট প্যাকেট দেখিয়ে বললুম, এইসা সিগ্যারেট চার প্যাকেট লে আও। চার আদমি চলা যাও, লানে সে সবকইকো দশ নয়া করকে বকশিশ মিলে গা। না, এই লেড়কি—অড্রি হেপবার্নকো পনেরো নয়া।

অরুণা অবাক হয়ে বললো, অড্রি হেপবার্ন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, বাচ্চা মেয়েটাকে ঠিক অড্রি হেপবার্নের মতন দেখতে না? চোখগুলো দেখো?

বরুণা চূর্ণ হাসিতে ভেঙে পড়ে বললো, ইস, অড্রি হেপবার্নকে আপনি ভিক্ষে দেবেন, কী অহংকার? আমি বললুম, ভিক্ষে তো নয়, পারিশ্রমিক।

—দেখবো, কতবার আপনি ওদের দিয়ে সিগারেট আনান।

দুপুরের খাবারটা আমরা ভেতরের ডাইনিং রুমে বসেই খেলুম। ডাকবাংলোর মুসলমান খানসামার রান্নার হাতটা বড় ভালো, চমৎকার বিরিয়ানি আর মুর্গির রোস্ট বানিয়েছে।

আজ সারাদিনেই রোদের তাপ হলো না, মিহিন বাতাসে আজ নরম ছায়ার দিন, এই সব দিনে বেঁচে থাকা বড় রমণীয় মনে হয়। বরুণা ঘরের মধ্যে থাকা একেবারে পছন্দ করে না, তার সতেরো বছরের চঞ্চল বয়েস তাকে সব সময় বাইরে টানে। দূরের পাহাড়ের আলোছায়ার গাঢ়ত্ব সারাদিন অনবরত পালটায়, বহুদূরবিস্তৃত উপত্যকা দেখেও পুরোনো হয় না, চোখ ক্লান্ত হয় না, সুতরাং এই সব দিনে, দুর্লভ ছুটির বেড়াতে আসায় বরুণার ঘরের মধ্যে না থাকার ইচ্ছেটাই স্বাভাবিক! সুবিমলের অবশ্য তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে এখনো নানা অজুহাতে অরুণাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘরে থাকতে চায়। সুতরাং চা খাবার পর, আমি একাই বরুণাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জংলা পথ দিয়ে রেঘু ওয়াচ টাওয়ারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম দুজনে। ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে—যতদূর চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর পাহাড় চোখে পড়ে, বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য, তা এখানেই।

আরও দু-একটা জিনিস চোখে পড়ে, অসংখ্য গাছ রোদ্দুরে একেবারে ঝলসানো, এ-বছর তাদের নতুন পাতা জন্মায় নি। বনের মধ্যে একটা শুকনো রেখা—এককালে ওখানে ঝর্ণা বা নদী ছিল বোধহয়। বৃষ্টিহীন রুক্ষতার চিহ্ন চারদিকে ছড়ানো। দূরে দেখা যায়, কোথাও কোথাও পাহাড়ের ঢালুতে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমি। সেখানে শুকনো, রং-জ্বলা ধান বা ভুট্টার চারাগুলো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। আমার চোখ এমন, সেই রুক্ষতার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে। রুক্ষতার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথা মনে আসে না। শুধু একদিকে মাত্র একটা

জলাশয়, লেকের মতন, পাড় বাঁধানো,—বুঝলুম, আমাদের ডাকবাংলোয় ওখান থেকেই জল আসছে, এখানকার ইস্কুলেও বোধহয় ওই জায়গা থেকেই জল যায়। যতদূর চোখ যায়, ওই একমাত্র জলের জায়গা—অনেক কষ্টে বোধহয় ওটা বাঁচানো। অবিরাম পাম্পের ফটফট শব্দ কানে আসছে।

বরুণা বলেছিল, দেখেছেন, কী সুন্দর পাহাড়ের ওপরে একটা লেক? বিকেলে আমরা সবাই ওখানে বসবো, অ্যাঁ? আচ্ছা, এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার নেই?

আমি বললুম নিশ্চয়ই আছে। এই পালামৌ জেলার সেই বাঘের কথা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় পড়ো নি? এসব জঙ্গলে হাতি পর্যন্ত আছে শুনেছি! হরিণ-টরিণ তো অজস্র!

—এখান থেকে একটা বাঘ দেখা গেলে বেশ হতো না?

আমি উৎকটভাবে চিৎকার করে উঠলুম, 'হালুম!' তারপর বললুম, এই তো বাঘ, তোমার এত কাছে, এইবার!

বরুণা কৃত্রিম কোপে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, যাঃ! এমন জোর চেঁচিয়েছেন। তারপরই ওয়াচ টাওয়ারের নিচের দিকে তাকিয়ে বরুণা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এখানেও এসেছে? পাগল করে ছাড়বে—সত্যি ভালো লাগে না।

সেই তিন চারটে বাচ্চা ওয়াচ টাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে, ওপরে মুখ করে আমাদের দেখছে। সেইরকম শব্দহীন, কথাহীন, তাদের চেয়ে থাকা। বরুণা বলেছিল, এখানেও কি আমরা খাবার খেতে এসেছি নাকি? সব সময় আমাদের সঙ্গে। কেন?

আমি আলতোভাবে বরুণার কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললুম, অত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছো কেন তুমি? ওদের দিকে না তাকালেই তো হয়। কত ভালো জিনিস রয়েছে, এসো, আমরা সেইগুলো দেখি।

—তা মোটেই পারা যায় না। সব সময় ওরকম বুভুক্ষুর মতন চেয়ে আছে—কী দেখে বলুন তো? সব সময় আমরা খাচ্ছি নাকি? সকালেই তো পয়সা দিলেন।

—পয়সা চাইছে না, হয়তো আমাদেরই দেখছে। আমাদের দেখতে ওদের ভালো লাগে। আমরা যেমন এই পাহাড়, খোলা আকাশ, জঙ্গল দেখতে এখানে এসেছি—তেমনি ওরাও আমাদের চোখ ভরে দেখছে। আমাদের ভালো ভালো পোশাক, আমরা ভালো ভালো খাবার খাই, আমাদের দেখলে তো ওদের ভালো লাগবারই কথা। ওদের তো জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার কথা নয়।

—যাই বলুন, এসব ভালো লাগে না। তা বলে কেউ বেড়াতে আসবে না? বেড়াতে এসেও যদি সব সময় এ-রকম—

—বেড়াতে এসে আমাদের পক্ষে দুএকটা ব্যাপারে চোখ বুজে থাকাই ভালো। আনন্দ ফুর্তি করতে গেলে দুএকটা ছোটোখাটো জিনিসকে বিদায় দিতেই হয়, মনের ভেতরের দু একটা ব্যাপারকে মেরে ফেলাই ভালো। তুমি ছেলেমানুষ তো, বুঝতে পারছো না। বেড়াতে আসা তো মানুষের পক্ষে দরকারই। আমরা বেড়াতে এসেছি, আমরা এখন ছুটিতে আছি, আমরা এখন শুধু আনন্দ করবো। বেড়াতে এসেও না-খেতে পাওয়া মানুষের কথা ভাবলে চলে নাকি? তাহলে তো সবই মাটি—সেজন্য ওসব ভুলে থাকতে হয়, দেখো না, আমরা বড়রা কী-রকম ভুলে থাকতে পারি, বড়জোর দুচার পয়সা বকশিশ তার বেশি আর আমাদের কারবার কীই-বা আছে।

বরুণা তবু মুখ ভার করে থাকে। বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না। এক এক সময় ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে গুম গুম করে ওদের পিঠে কিল মারি!

ফেরার পথেও সেই বাচ্চাগুলো আমাদের পিছু নেয়। ডাকবাংলো পর্যন্ত এসে আবার বিশ্বস্তভাবে সিঁড়িতে বসে থাকে, একটুও গোলমাল করে না। কিছু চায় না, দুএকজন নতুন বাচ্চা এসেও ওদের দলে যোগ দেয়।

শীতের জায়গায় খিদে বেশি পায়, তাছাড়া অনেকখানি হেঁটে আসার ফলে চনচন করছিল খিদে, পাঁচ সাত মিনিটেই খাওয়া শেষ হয়ে যায়। ডাইনিং রুমের পর্দা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে সিঁড়িতে বসে-থাকা এখন আট ন'টি কচি মুখ, আমি সেদিক পিছন ফিরে বসি। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সুবিমল ওর সাউথ ইন্ডিয়া ভ্রমণের গল্প শোনায়। সেই গল্প শেষ হলে, নেতারহাট থেকে আমাদের যে মাকল্লাস্কিগঞ্জে যাবার প্রোগ্রাম—কিন্তু আমাদের ফান্ডে কুলোবে কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা করি। আবার এসব অঞ্চলে কবে আসা হয় কে জানে, এবারেই দেখে যেতে পারলে ভালো হতো!

বিকেলবেলা ফ্লাস্কে চা ভরে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলুম। মানস সরোবরের হাঁসেরা এই লেকেরও খবর রাখে, বেশ বড় একটা হাঁসের ঝাঁক সাতনরি হারের মতন জলে ভাসছে। একদিকে উঁচু বাঁধানো পাড়, পাহাড়ের চূড়ায় এরকম একটা বড় পুকুর দেখতে পাওয়া সত্যি আশ্চর্যের, বোধহয় পাম্প পাহাড় খুঁড়ে জল বার করেছে।

সুবিমল অরুণাকে গান গাইবার জন্য খুব খোঁচাচ্ছে, আর অরুণা নানান ওজর আপত্তি তুলছে। রাঁচীতে পচা দই খেয়ে তিনদিন ধরে নাকি তার গলা ভেঙে আছে। আসলে খালি গলায় গান করলে নাকি অনবরত স্কেল বদলে

যায়—আর সেটা গলার পক্ষে খারাপ, অরুণার এই ধারণা। অরুণার গান যাতে আমাকে না শুনতে হয়, তাই বারবার আমি নানান গল্পের প্রসঙ্গ টানছিলুম। বরুণা গান জানে না, সে উদয়শঙ্করের স্কুলে নাচ শিখছে, আমি ভাবছিলুম, তাকে এখানে একটু নাচ দেখাতে বলে রাগিয়ে দেব কিনা। বরুণা আপনমনে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে জলে ছুঁড়ছিল।

সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে মাত্র দুজন এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। সেই মেয়েটি, আর একটা ছেলে খানিকটা দূরে চুপ করে বসে আছে। এটা ঠিক, ওরা আমাদের কাছে ভিক্ষে চায় না, কিছু দিলে নেয় বটে, কিন্তু মুখ ফুটে খাবারও চায় না। শুধু চুপচাপ আমাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

সুবিমল হঠাৎ বললো, সুনীল, তুই ঠিকই বলেছিস, ওই মেয়েটার সঙ্গে অড্রি হেপবার্নের বেশ মিল আছে। কী সুন্দর চোখ দুটো।

অরুণা বললো, আহা দেখলে মায়াও হয় কিন্তু আমরা কি করবো বলো, কষ্টও লাগে, অথচ কত আর খেতে দিতে পারি বলো, এই খুকি শোন তো এদিকে—

মেয়েটা সেই রকম বসে বসেই চেয়ে রইলো। অরুণা আবার বললো, এই খুকি, শোন না, হিঁয়াপর আও, আও ভয় কি।

মেয়েটি অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে এবার আস্তে আস্তে উঠে এলো, অরুণা তার হাত ধরে বললো, কী সুন্দর ঢলোঢলো মুখখানা, রংটা যদি ফর্সা হতো, তা কালোই বা খারাপ কী—। কথার শেষ অংশে অরুণা তার স্বামীর দিকে ভ্রূভঙ্গি করলো। সুবিমলের গায়ের রং প্রায় আমারই মতন, সুতরাং সে উদার সুরে বললো কালোই তো জগতের আলো।

এই সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। বরুণা হঠাৎ বিষম অবাক হয়ে ফিসফিস করে বললো, ওমা ওকি, দেখো, ছাগলছানা, না হরিণ? হরিণ!

আমরাও ঘুরে তাকিয়ে দেখলুম, একটা সত্যিকারের বাচ্চা হরিণ আমাদের থেকে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে আছে। তখনও সন্ধে নামেনি, চারপাশে স্পষ্ট আলো, তার মধ্যে একটা হরিণ এসে আমাদের অত কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। হরিণটা এক পা এক পা করে জলের দিকে এগোচ্ছিল। আমরা সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, বরুণা খুব আস্তে আস্তে আমাকে বললো, কী সুন্দর! এত কাছে, ধরা যায় না? কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তা হলে পুষবো।

সেই অড্রি হেপবার্ন মেয়েটা সুবিমলের আড়ালে ছিল বলে প্রথমটায় হরিণটাকে দেখতে পায় নি তারপর দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ একটা দুর্বোধ্য ভাষায় সাঙ্ঘাতিক চিৎকার করে উঠলো। মেয়েটাকে এর আগে আমি কথা বলতেই শুনিনি, সে যে গলা দিয়ে অত জোর শব্দ করতে পারে ভাবিনি—সেই রকম, চিৎকার করতে করতে মেয়েটা দৌড় লাগালো।

চিৎকার শুনে হরিণটাও ভয় পেয়ে পেছন ফিরে ছুটলো, বাঁধ পেরিয়ে মাঠে নামলো, কিন্তু আশ্চর্য, বেশি দূর গেল না, খানিকটা দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার এক পা এক পা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। হরিণটার কাণ্ড দেখে আমি থ, মানুষের এত কাছে আসবার ওর এত ইচ্ছে কেন কে জানে! সুবিমল দুঃখিত গলায় বললো, পুয়োর থিং! হরিণটা আজই মারা যাবে।

বরুণা চেঁচিয়ে উঠলো, মরে যাবে? কেন?

—বুঝতে পারছো না? ও তো মরীয়া হয়ে এখানে এসেছে জল খেতে। জঙ্গলে কোথাও তো এখন জল নেই, বোধহয় তিন চার দিন এক ফোঁটাও জল পায় নি—ছোটা দেখলে না, কী রকম নড়বড়ে, ওই কি হরিণের ছোটা?

বরুণা ভয়ার্ত গলায় বললো, জল খাবে? চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই, তা হলে ও জল খেতে পারবে, চলুন।

—আমরা সরে গেলেই ও জল খেতে পাবে ভেবেছো? ওর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আহা, ভালো জাতের হরিণ, স্পটেড ডিয়ার—

সুবিমলের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেরি হলো না, সেই মেয়েটার সঙ্গে আট-নটা বাচ্চা ছুটে এলো, সবারই হাতে ছোটখাটো লাঠি, দুজনের সঙ্গে তীর ধনুক, হরিণটা ততক্ষণে আবার বাঁধের ওপর উঠে এসেছিল। এবার আবার ভয় পেয়ে ছুটলো, বাঁধের ওপাশে অনেকখানি মাঠ, ছোট ছোট গাছে ভরা, বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাচ্চাগুলো হৈ-হৈ করে হরিণটাকে তাড়া করলো।

বরুণা বললো, ওরা হরিণটাকে মারবে? সুনীলদা বারন করুণ, উঃ না— না, বারণ করুন। কী সুন্দর তুলতুলে হরিণটা। সুনীলদা, আপনি ওটাকে ধরে আনুন না—

যেন বরুণা আমাকে সোনার হরিণ ধরে আনতে বলছে, সেই হিসেবে আমি শুধু বললুম, পাগল। হরিণ কখনো ধরা যায়.

—তাহলে, ওদের মারতে বারণ করুন!

আমি বললুম, আমি বারণ করলেই বা ওরা শুনবে কেন?

সিনেমা দেখার মতন আমরা সমস্ত দৃশ্যটা দেখলাম। হরিণটা এত দুর্বল যে, মোটেই জোরে ছুটতে পারছিল না। বাচ্চাগুলো তীর, পাথর লাঠি অনবরত ছুঁড়ছে, এবার লাঠির ঘা লেগে হরিণটা মাটিতে পড়ে গেল, আবার উঠে ছুটলো, তারপর একটা মোক্ষম তীর লাগলো ঘাড়ে, এবার চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো, তীর সমেত আবার খানিকটা ছোটার চেষ্টা করেছিল, ততক্ষণে বাচ্চারা ওর কাছে পৌঁছে গেছে, দুজনে দমাদম করে লাঠি দিয়ে পেটাতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গেই ছটফটানি শেষ। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পাঁচ মিনিটও লাগলো না।

অরুণা বললো, ইস—এইমাত্রও বেঁচে ছিল, কী রকম করুণভাবে জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। চলো এবার বাংলোয় ফিরে যাই।

সুবিমল বললে, দাঁড়াও না, দেখি।

—না, চলো, রুনিটা একেবারে ছেলেমানুষ, এসব সহ্য করতে পারে না একটুও। আরে, কান্নার কি আছে।

বরুণা মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি কাঁদছি না।

—কাঁদছিস না তো চোখটা মুছে নে। সত্যি এসব দেখাও পাপ, চলো চলো, আমরা এখান থেকে যাই।

বরুণা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কঠিন গলায় বললো, না, আমি এখন যাবো না।

সুবিমল শ্যালিকার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললো, আমার রুনিসোনার বড় মনে লেগেছে, না? অত মন খারাপ করো না, দেখো বাচ্চাগুলো কী রকম আনন্দ করছে। আজ অনেক দিন বাদে ওরা বোধহয় পেট পুরে মাংস খাবে। ওরকম আনন্দের জন্য তো দু একটা জিনিস মাঝে মাঝে মারতেই হয়। চোখের সামনে বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমাকেও যদি হরিণের মাংস দেওয়া হতো—

বাচ্চাগুলোর উল্লাস তখন দেখবার মতন, হরিণটাকে টানতে টানতে বাঁধের কাছে নিয়ে এসে ওরা প্রায় নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে, হরিণটার ঘাড় ভেঙে গেছে, মুখে টাটকা গাঢ় রক্ত, তখনও বোধহয় একটু একটু প্রাণ ছিল, সে মেয়েটা তীরের ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেটটা ফুটো করে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেললো, কী জ্বলজ্বলে হাসি মেয়েটার মুখে তখন। নিজেদের মধ্যে হাত পা নেড়ে কী যেন আলোচনা করলো ওরা, আন্দাজে বুঝতে পারলুম, হরিণটাকে ওরা বোধহয় গ্রামের মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না—তাহলেই তো আবার অন্যদের ভাগ দিতে হবে। ওরা সেখানেই, মাঠ থেকে ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালালো।

আমরা বাঁধের ওপর বসে ওদের দেখতে লাগলুম। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো, উজ্জ্বল হয়ে এলো আগুনের রং, হরিণটাকে ওরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলসাতে লাগলো। বরুণা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে একদৃষ্টে সেই হরিণটার মসৃণ চামড়ায় আগুন লাগা দেখছে। ওদের আর দেরি সইছে না, মহানন্দে চেঁচামেচি করতে করতে একটু বাদে বাদেই এক এক টুকরো কেটে নিয়ে চিবিয়ে দেখছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা।

আমি সুবিমলকে বললুম, এবার সত্যিই আমাদের চলে যাওয়া উচিত। ওদের খাবার সময় আমরা যদি এরকম একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাহলে ওদেরও বোধহয় অস্বস্তি লাগবে।

সুবিমল বললো, যা বলেছিস। চল উঠে পড়ি, আমারও লোভ লেগে যাচ্ছিল, জিভে জল এসে গেছে প্রায়।

রাতপাখি

কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় সবাই চুপ করে গেল। তখন একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। এরকম হয় মাঝে মাঝে। এর নাম নাকি গর্ভবতী নিস্তব্ধতা।

বাচকুন ঘড়িতে দেখলো, ঠিক আটটা চল্লিশ বাজে।

কালকেও ঠিক এই সময়। সকলেই যখন কথা বলছিল, সকলেই গল্প, সামনে চায়ের কাপ, অনেক রকম হাসি, তারই মধ্যে একবার থেমে গিয়েছিল সবাই। তখন এমনিই আপন মনে ঘড়ির সাদা ব্যান্ডটা ঠিক করতে করতে বাচকুন সময় দেখেছিল। আটটা চল্লিশ। তার মনে আছে।

বাচকুনের একটু খটকা লাগলো। পর-পর দুদিন। ঠিক একই সময়। অথচ কেউ আগে থেকে ঠিক করে নি কিছুই। বাচকুন সকলের মুখের দিকে তাকালো। দেবকুমার, সোহিনী, ছোটকু-দা, রোজমেরি, অশোক। কেউ কারুর দিকে তাকিয়ে নেই, সকলেরই নত মুখ। যেন একটা শোকসভা। সকলে মিলে এক সঙ্গে কেন চুপ করে আছে? সাতচল্লিশ... আটচল্লিশ...উনপঞ্চাশ...বাচকুন গুনছে। ঠিক পুরো এক মিনিট।

তারপরই ছোটকু-দা বললো, গত সোমবারে একটা থিয়েটার দেখতে যাবো ভেবে রেখেছিলাম, শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না, গেলাম একটা সিনেমায়। তবু সিনেমা দেখতে দেখতে সারাক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল থিয়েটারই দেখছি।

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবু সবাই হেসে উঠলো। ছোটকুদার কথা শুনলেই হাসি পায়। ছোটকুদা তারপরই বললো, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল ভাবলাম বেরিয়ে এসে একটা আইসক্রিম খাবো, ওমা, একটাও আইসক্রিমওয়ালা নেই। যত রাজ্যের বাদাম আর ঝালমুড়ি আর চানাচুর। যখন যেটা চাইব কিছুতেই সেটা...

দেবকুমার বললো, ছোটকুদা, তুমি বুঝি আজকাল গলা শুকিয়ে গেলে শুধু আইসক্রিম খাচ্ছো?

অশোক বললো, যখন তোমার ট্যাক্সির দরকার নেই, তখন চোখের সামনে দিয়ে অনবরত খালি ট্যাক্সি...কিন্তু যখন তোমার সত্যিই খুব দরকার...

দেবকুমার বললো, ধানবাদে দেখেছিলে? বারোজন...ট্যাক্সিতে...

সোহিনী বললো, অনেক ছোটবেলায় আমরা একবার ঝরিয়া গিয়েছিলাম...

বাচকুন কোনো কথারই কোনো মানে বুঝতে পারছে না যেন। কথাগুলো কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে? যেন সকলের আলাদা আলাদা কথা। সে একটাও কথা বললো না। নীরবে উরুর ওপরে শাড়ির আঁচলটা প্লেস করতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি একটু আসছি।

বসবার ঘরের পেছনে একটা সরু বারান্দা। সেটা পেরিয়ে গেলে খাবার ঘর। সেখানে এখন কেউ নেই, তবু দুটো আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপরে স্বচ্ছ কাচের জারে কানায় কানায় ভর্তি জল। ওপরে লেসের ঢাকনা। সাজানো টেবল ম্যাটের ওপর উপুড় করা কাচের গেলাস। একটা গেলাস তুলে নিয়ে বাচকুন খুব সাবধানে জল নিলো। তারপর ঠোঁটে লাগিয়ে একটু চুমুক দেবার পর তার মনে হলো, ঠিক আটটা চল্লিশে কেন কথা থেমে যায়? ঠিক এক মিনিটের জন্য? এটা কার নির্দেশ?

গেলাসটা নামিয়ে রেখে সে আবার বললো, ধুৎ, ওসব কিছুই নয়। একেই বলে কাকতালীয়।

বাচকুন জানলার ধারে আসে। আজ সামান্য জ্যোৎস্না আছে। কাল মেঘলা মেঘলা দিন ছিল, শেষ রাতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। জ্যোৎস্না রাত বাচকুনের সবচেয়ে প্রিয়। বিশেষত এই রকম বাইরের খোলা জায়গায়। পেছন দিকের এই জানলাটা দিয়ে চোখের সামনে অনেকখানি—অনেকখানি পৃথিবী। এদিকে আর কোনো বাড়ি নেই। বেশ দূরে, ডান দিকে পাহাড়ের আভাস। আবছা নীল রঙের জ্যোৎস্না। বড় দেবদারু গাছটা এখন যেন খুব গর্বিত হবে।

ওই দেবদারু গাছটার পরেই একটু ঢালুতে নেমে, একটা যা অপূর্ব সুন্দর জায়গা। ওখানে আজ রাত্রেই একবার গেলে...আজ রাত্রেই, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

জ্যোৎস্না খুব ফ্যাকাশে, যেন যখন তখন চলে যাবে। দূরে ভাল্লুকের দঙ্গলের মতন মেঘ। এত অল্প আলোয় এখান থেকে সেই সুন্দর জায়গাটা দেখাই যায় না। বাচকুনের একটু মন কেমন করলো। কেন দেখা যাচ্ছে না! ধুৎ ভাল লাগে না!

বাচকুন আবার ফিরে এলো বসবার ঘরে। ছোটকুদা দারুণ জমিয়েছে। বাচকুন নিজের চেয়ারে বসে, ডান দিকের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে থুতনিটা রাখলো তালুতে। গল্পে মন দেবার জন্য দুচোখের মাঝখানে মনটাকে নিয়ে এলো।

ছোটকুদা বললো, দোকানটায় আমাকে তো দারুণ ঠকিয়ে দিল। সস্তার লোভে বিলিতি আফটার শেভ বলে যেটা কিনলাম, হোটেলে ফিরে দেখি সেটার মধ্যে স্রেফ ভেটেল। পরদিন ভোরবেলাই আমার ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার কথা ছিল। ফ্লাইট ক্যানসেল্‌ড হয়ে গেল। থাকতে হলো আর একদিন। পরদিন আমি সেই দোকানে আবার গেলাম। কেন গেলাম, বল তো? কোনো দরদাম না করে ঠিক সেই জিনিসই আর একটা কিনলাম। দোকানের লোকটা আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। ও ভেবেছে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, তাই মনের আনন্দে ঠকাচ্ছে। কিন্তু আমি যে সবই বুঝে গেছি, তা তো ও জানে না! কাজেই আমিও ওকে ঠকালাম! এঃ হেঃ হেঃ হেঃ...

সোহিনী বললো, ওঃ ছোটকুদা, তুমি সত্যি অদ্ভুত? ভেজাল জেনেও তুমি দুবার একই জিনিস কিনলে?

ছোটকুদা বললো, বাঃ, আমার মত আর কেউ ওকে কখনো ঠকিয়েছে? জেনে-শুনেও কেউ ভেজাল জিনিস ওর দোকান থেকে আগে কিনেছে? আমি পরপর দুদিন গিয়ে দুটো কিনেছি বলেই ও আমার ব্যাপারটা একদিন না একদিন ঠিক বুঝতে পারবে! আমি দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় লক্ষ করেছিলুম, লোকটা খুব যেন চিন্তায় পড়ে গেছে। এঃ হিঃ হেঃ হেঃ হেঃ...

অশোক বললো, ছোটকুদা, তুমি সেই বোম্বের গল্পটা বলো! সেই যে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে...বউদি, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্যাট ওয়ান? অ্যাবাউট দ্যাট স্ট্রিট আরচিন?

ছোটকুদার স্ত্রী রোজমেরি সব বাংলা বোঝে। তবু অশোক তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলবেই। রোজমেরি উত্তর দেয় বাংলায়।

রোজমেরি বললো, আমার বর কক্ষনো এক গল্প দুবার বলে না।

ছোটকুদা হেসে বললো, দেখলি তো! আচ্ছা শোন, তোদের একটা আর্মেনিয়ান বুড়ির গল্প বলি, পার্ক সার্কাসে একটা বাড়িতে আলাপ হয়েছিল।

সোহিনী বললো, বাচকুন আজ এত চুপচাপ আর অন্যমনস্ক কেন?

বাচকুন ঘোর ভেঙে সজাগ হয়ে বললো, অ্যাঁ? কই না তো?

দেবকুমার বললো, অন্যমনস্ক থাকলেই বাচকুনকে বেশি সুন্দর দেখায়!

দেবকুমারের এই হালকা কথায় বাচকুন কোনো গুরুত্বই দিল না। তার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তারপর বললো, আমি তো গল্প শুনছিলাম। কিংবা, আমার বোধহয় খিদে পেয়েছে।

কেউ একজন বললো, বোধ হয় মানে কি? খিদে পেলে টের পাওয়া যায় না।

সোহিনী বললো, বাচকুনটা ওই রকম উল্টোপাল্টা কথা বলে। খিদে তো পাবেই, বেশ রাত হয়েছে। চলো—

ছোটকু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, ঠাকুর! ঠাকুর!

খাবার ঘরে এসে টেবিলের ডান দিকে দ্বিতীয় চেয়ারটাতে বসলো বাচকুন। কাল দুপুরে, এখানে প্রথম এসে, ওই চেয়ারটাতেই সে বসেছিল। তারপর থেকে প্রত্যেকবারই ওইখানে বসছে। অন্যরাও সবাই ঠিক যে যার একই চেয়ারে। কেউ তো কিছু ঠিক করে দেয় নি কাকে কোন চেয়ারে বসতে হবে, তবু প্রত্যেকের জন্য একটি চেয়ার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বাচকুনের চেয়ার থেকে খোলা জানলা দিয়ে দেবদারু গাছটাকে দেখা যায়। দেবদারু গাছটাও বাচকুনকে দেখতে পায়।

সোহিনী বললো, বাচকুন, তোর কথাতেই এখানে এলাম। তবু এই মনমরা হয়ে আছিস কেন?

—না তো।

—কাল থেকেই তো দেখছি।

—কাল এসেই দেখলাম কিনা, মেঘলা মেঘলা, তারপর বৃষ্টি, তাই কি রকম খারাপ লাগলো?

—বৃষ্টি হয়েছে তো কি হয়েছে?

—এই সময় বৃষ্টি...ভালো লাগে? এরকম কথা ছিল না।

রোজমেরি অশোককে বললো, ডালটা এগিয়ে দাও তো।

তারপর খুব মন দিয়ে ডাল ঢালতে ঢালতে বললো, বাচকুন খুব চমৎকার কথা বলে, একটু ইনকোহেরেন্ট, সেই জন্যই। তোমার সঙ্গে কার কথা ছিল না, বাচকুন?

পুরুষরা খুকখুক করে হাসলো। অশোক বললো, তুমি ঠিক ধরতে পারলে না বউদি। বাচকুন বলতে চাইছে, শীতকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না, সেই জন্যই, কথা ছিল না।

রোজমেরি জোর দিয়ে বললো, সেটা আমি জানি, শীতকালে বৃষ্টি হয় না জানি, তবু যেন ও আর একটু বেশি কিছু বলেছে। তাই না বাচকুন?

—না তো!

দেখলে বউদি দেখলে।

রোজমেরি বাচকুনের দিকে হাসি ভরা চোখে তাকালো। সে বেশ উপভোগ করছে বাচকুনের অন্যমনস্কতা।

দেবকুমার বললো, আজ আর বৃষ্টি পড়বে না।

বাচকুন জানলা দিয়ে তাকালো। একটু আগের জ্যোৎস্না এখন মুছে গেছে। আকাশ ময়লা। দেবদারু গাছটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

সে বললো, খেয়ে উঠে একটু বাইরে বেড়াতে যাবে?

—এখন, এত রাত্রে? বেশ শীত...

—খুব বেশি না...

ছোটকু বললো, চলো, একটু ঘুরে আসা যাবে। মাছের ঝোলটা বেশ ভালো হয়েছে, না?

ছোটকুদা তুমি আর একটু নেবে? নাও না।

—না। ভাল লাগলেই বুঝি বেশি খেতে হয়?

হাত ধোয়ার জন্য জল গরম করা আছে। শীতের রাত্রে এই একটা বেশ চমৎকার বিলাসিতা। খুব আরাম। হাত ধুতে ধুতে বাচকুনের মনে হলো, এই যে একটু আগে ছোটকুদা মাছের ঝোলের প্রশংসা করলো, সোহিনী তখন তাকে আর একটু নিতে বললো, তার উত্তরে ছোটকুদা বললো, ভালো লাগলেই বুঝি বেশি খেতে হয়—ঠিক এই কথাগুলোই সে যেন আগে কোথায় শুনেছে। কোথায় ঠিক মনে করতে পারছে না। ঠিক এইরকমই একটা খাওয়ার টেবিলে। এইরকম লোকজন, এইসব কথাবার্তা নিয়ে যে ঘটনা তা আগে একবার ঘটে গেছে। স্পষ্ট মনে হয়।

আবার বসবার ঘরে এসে সিগারেট ধরবার পর পুরুষদের আর বেড়াতে যাবার বিশেষ ইচ্ছা দেখা গেল না। খাওয়ার পরে বেশি শীত করে। ছোটকু পা গুটিয়ে বসেছে।

—কই যাবে না বাইরে?

—আজ ছেড়ে দে। কাল সকালে খুব বেড়ানো যাবে।

সোহিনী বললো, তোমরা বড্ড কুঁড়ে হয়ে গেছ। বেচারার একটু ইচ্ছে হয়েছে, চলরে, আমরাই যাই। বউদি এস।

ভালো করে শাল জড়িয়ে তিনটি মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে কাচের দরজা খুলে গাড়ি বারান্দায়, তারপর একটু এগিয়ে লোহার গেট খুলে সুরকি বেছানো রাস্তায়।

তেসরা ডিসেম্বর সকালে, কলকাতার বাড়িতে, বিছানায় ঘুম ভেঙেই বাচকুনের প্রথম মনে পড়েছিল হাজারিবাগ। কেন মনে পড়েছিল তার কোনো কারণ নেই। দুএকটা শব্দ দুএকটা গানের লাইন যেমন হঠাৎ হঠাৎই মনে পড়ে। তেমনি মনের মধ্যে একটা নাম ঘুরতে লাগলো হাজারিবাগ। সকালের কথা অনেক সময়ই বিকেলে আর মনে থাকে না। কিন্তু সন্ধ্যেবেলাতেও মনে রইলো। পরের দিনও। পরের দিন বাচকুন সোহিনীকে বলেছিল, দিদি এবার হাজারিবাগ বেড়াতে যাবি?

—হাজারিবাগ? হাজারিবাগ কেন?

—এমনিই।

—হাজারিবাগ কি এমন জায়গা?

সত্যিই, হাজারিবাগ এমন কিছু আহা মরি জায়গা নয়। বাচকুনও তা জানে। বেশ কয়েকবছর আগে সে একবার হাজারিবাগে গিয়েছিলও। তবু নামটা মনে এসেছে বলে কথার কথা হিসেবে বলেছিল মাত্র।

শীতকালে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়। ছোটকুদের বাড়ি আছে রাঁচিতে। সোহিনীর ইচ্ছে ছিল রাজগীর। তবু ঠিক মনস্থির হয় না। তারপর দেবকুমার জানতে পারে হাজারিবাগে তার এক বন্ধুর লোভনীয় বাড়ির কথা। তা হলে হাজারিবাগেই। যদি এখানে ভালো না লাগে তাহলে রাঁচি তো বেশি দূর নয়। এখানে এসে বাড়িটা সকলেরই পছন্দ হয়ে গেছে। বেশ গাম্ভীর্যময় প্রাচীন বাড়ি। চার পাশটা ফাঁকা। আসলে যে-কোনো জায়গায় গিয়ে ছুটির আড্ডাটা জমালেই হলো।

রাত দশটায় হাজারিবাগের রাস্তা একেবারেই নির্জন। এদিকটা আরও। তিন নারী সুরকির পথ ধরে লঘু পায়ে এগোচ্ছে। একটু বাদেই বাচকুন রাস্তা ছেড়ে ডান পাশে নামলো।

সোহিনী বললো, তুই মাঠের মধ্যে কোথায় যাচ্ছিস?

—চলো না। দেবদারু গাছটার পেছন দিকটায় একটা ঢালু জায়গা আছে।

—সেখানে কি?

—কিছুই না এমনিই।

—রাত্তিরবেলা মাঠের মধ্যে আর যেতে হবে না।

রোজমেরি বাচকুনকে সমর্থন করে বললো, চলো, চলো মাঠে বেড়াতেই ভালো।

কয়েক পা গিয়ে অবশ্য রোজমেরিই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখ বড় বড় করে বললো, যদি সাপ থাকে? আমার সাপের বড় ভয়।

সোহিনী হেসে বললো, সাপের ভয় সকলেরই আছে। কিন্তু শীতকালে সাপ থাকে না।

—ঠিক, তাহলে তো ভয় নেই।

বাচকুন অনেকটা এগিয়ে গেছে। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বলে তাকে আর দেখা যায় না। মেঘলা আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া আলো। সোহিনী রোজমেরিও ঢালু জায়গাটা দিয়ে নামতে লাগলো।

এখানে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। কিংবা নালা। কিন্তু জল বেশ পরিষ্কার, যদিও ছিরছিরে।

রোজমেরি বললো, এখন আমি সারারাত বেড়াতে পারি।

সোহিনী বললো, তুমিও তো বাচকুনের মতন একটু পাগল।

বাচকুন নালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে। যেন সে একটা কিছু গভীরভাবে দেখছে। যদিও দেখবার মতন বিশেষ কিছুই নেই। তার পেছনে দেবদারু গাছটা অন্ধকারে জয়স্তম্ভের মতন উঁচু হয়ে আছে।

সোহিনী নালাটা পার হবার জন্য পা বাড়িয়েছে, বাচকুন তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরলো। বললো, দিদি, ওদিক যাস নি।

—কেন?

—ওদিকটা খুব সুন্দর না?

—সুন্দর বলে...যাবো না?

—আমি সকালে এখানে একবার এসেছিলাম, কী অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা, ছোট ছোট পাথর, ঝকঝকে তকতকে, কী রকম যেন পবিত্র পবিত্র একটা ভাব—মনে হয় যেন আমাদের জন্য নয়।

—তুই কী যে বলিস, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।

—কোনো কোনো জায়গা, কিংবা কোনো সুন্দর জিনিস দেখে তোর মনে হয় না, এটা আমাদের জন্য নয়?

রোজমেরি হাত ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করলো। ফটাস করে লাইটার জ্বালাবার শব্দটা কর্কশ শোনালো একটু। প্রথম ধোঁয়াটুকু উপভোগ করে সে বললো। এদিকের থেকে ওদিকের জায়গাটা বেশি সুন্দর কি-না তা আমি জানি না। শুধু বাচকুনই এসব দেখতে পায়। বাচকুন সব সময় শুধু সুন্দর জিনিস দেখে।

বাচকুন তীক্ষ্ণ গলায় বললো, না।

রোজমেরি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি?

না, আমি সব সময় সুন্দর জিনিস দেখি না।

বাচকুনের ভুরু কুঁচকে গেছে। সোহিনী সেদিকে তাকিয়েই বুঝলো। সে বললো, চল এবার ফিরি।

—আমি শুধু সুন্দর জিনিস দেখি না। আমি অনেক খারাপ জিনিসও দেখি।

সোহিনী একটু ধমক দিয়ে বললো, থাক আর বলতে হবে না। ওরকম সবাইকেই দেখতে হয়। রাস্তাঘাটে ঘুরতে গেলে।

তিনজনেই বাড়ির দিকে ঘুরেছে। তবু রোজমেরি একটু কৌতূহলের সঙ্গে নালার উল্টো দিকটা আর একবার দেখলো।

বাচকুন রোজমেরির ওপর যেন একটু রেগে গেছে। যে কবারই সে রোজমেরির দিকে তাকাচ্ছে তার দৃষ্টিতে বেশ ধার।

রোজমেরি জিজ্ঞেস করলো, নার্ভ, নার্ভের বাংলা কী?

—স্নায়ু।

রোজমেরি বাচকুনের বাহুতে সস্নেহ হাত রেখে বললো। তোমার স্নায়ু কি একটু চঞ্চল হয়ে আছে?

—না তো।

—জানো বাচকুন, লন্ডনে যখন দারুণ ভারি ভারি বোমা পড়ছে, নাইনটিন ফরিটি থ্রি, সেই সময় আমার জন্ম...সেই জন্যই, আমার স্নায়ু দুর্বল...

বাচকুন কিছু শুনছে না। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

সেটা হয়েছিল মাইথন থেকে ফেরার পথে। মাস দুএক আগে। কী একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল, সেখানে থামার কথা নয়, লাইনের দুপাশে অনেক লোক সকলেরই মুখ অন্যলোকের মুখের মতন। ট্রেনের কামরার লোকরা কৌতূহলী ছিল ট্রেন থামবার জন্য। বাচকুন বসেছিল কামরার বাঁ পাশের জানলার পাশে, ডান পাশের জানলা থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ইস, দেখো দেখো! তার চিৎকারের মধ্যে এমন একটা আকস্মিকতার জোর ছিল যে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সকলেই সেই দিকে দৌড়ে গেল, বাচকুনও গিয়েছিল, কিছু না বুঝেই। অন্যরাও

দেখছে বলে সেও মুখ বাড়িয়েছিল। সেই সময় কেউ যেন তার বুকে একটা ধাক্কা মারলো। কেউ মারে নি, একটা দৃশ্য।

স্টেশনের উল্টো দিকে একটা থেমে থাকা ট্রেনের ছাদে একটি মানুষের দেহ পুড়ছে। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, পাশে দুটো চালের বস্তা, হুমড়ি খেয়ে আছে ইলেকট্রিক তারের ওপর। বোধহয় লাফাতে গিয়েছিল, হাত দুটো ঠিক সেই অবস্থায় বাড়ানো, শক্ত—মাথার চুলগুলো পুড়ে গেছে, শরীরটা প্রায় সাদা, পেটের কাছে তখনও চিড়িক চিড়িক করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ...। বাচকুন দুএক মুহূর্তের জন্য দেখেই মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল, তারপর কিছু না ভেবেই আবার ওদিকে ফিরলো এবং আর এক পলক দেখেই সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলো।

তার মুখখানা বিবর্ণ, চোখে আর পলক পড়ছে না। কেন সে দেখতে গেল। কেন দ্বিতীয়বার তাকালো। ওরকম বীভৎস দৃশ্য দেখেও সে কেন দ্বিতীয়বার আবার মুখটা ফিরিয়ে নিল। বাচকুন ফিরে এসে বসেছিল নিজের জায়গায়, কিন্তু সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ওই দৃশ্যটা ছাড়া।

কামরায় সবাই নিচু গলায় তখন ওই বিষয়েই আলোচনা করছিল। কে কোথায় আর কত বীভৎস রকমের...বাচকুনের মনে হচ্ছিল সব শব্দই ক্রমশ আস্তে হয়ে যাচ্ছে।

কেউ একজন বলেছিল, চালের বস্তাগুলো কিন্তু ঠিকই আছে।

আর একজন কেউ বলেছিল, ওই চাল হয়তো আবার মানুষে খাবে।

—একেবারে পুড়ে যাবে, পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাবে, কেউ নামাতে পারবে না...

ওই ছেলেটার বাড়ির লোকজন...ইস।

বাচকুনের এক বান্ধবী জয়া তখন বাথরুমে ছিল। সে দেখে নি। সে ফিরে এসে বাচকুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই শর্মিলা, কি হয়েছে তোর? কি হয়েছে এখানে?

বাচকুন শূন্য চোখে তাকিয়েছিল বান্ধবীর দিকে। তার মনে হয়েছিল, জয়া তার চেয়ে কত সুখী?

এর একমাস পরেও যখন ছেলে, চাল কিংবা ট্রেন এই শব্দগুলো শুনলেই তার মনে পড়তো ওই দৃশ্যটা, তখন বাচকুন একদিন কাতরভাবে বলেছিল, কেন আমি শুধু শুধু এত কষ্ট পাবো? আমার কি দোষ? তবু কেন আমার এই শাস্তি? কেন আমার চোখের সামনে যখন তখন ওই ছবিটাই...। একথা বাচকুন কাকে বলেছিল? কারুকে না। এতো অন্য কারুকে বলার নয়। ঈশ্বরকেও না। শুধু নিজের মনে মনেই বারবার বারবার...।

রাস্তার ওপরে এসে ওরা দেখলো পুরুষ তিনজন গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটকু বললো, আমরা ভাবলাম, তোমরা আবার হারিয়ে-টারিয়ে গেলে নাকি।

সোহিনী বললো, আমরা কতক্ষণ আর গেছি, বেশিক্ষণ তো বেড়াই নি।

রোজমেরি বললো, আমরা একটা খুব সুন্দর জায়গা দেখে এলাম।

বাচকুন আবার ধারালো ভাবে রোজমেরির দিকে তাকালো।

রোজমেরি বললো, আমার সত্যি খুব সুন্দর লেগেছে!

দেবকুমার বললো, তাহলে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলে না কেন?

রোজমেরি বললো, তোমরা যাও নি ভালই হয়েছে। তোমরা পুরুষরা গেলে বড় গোলমাল করতে। তোমরা সব জায়গায় জোরে জোরে কথা বলো। অনেকক্ষণ বাদে বাচকুন রোজমেরির সঙ্গে একমত হলো।

দেবকুমার বললো, চলো বাচকুন, তোমাতে আমাতে আর একবার ঘুরে আসি।

বাচকুন বললো, না।

মনে মনে সে বললো, তোমার সঙ্গে আমি ওই জায়গাটায় কক্ষনো যাব না। যদি তোমার মনে হয় জায়গাটা এমন কিছুই নয়। যদি তুমি হাসো।

দেবকুমার তবু বাচকুনের বাহু ছুঁয়ে বললো, চলো না।

বাচকুন কাতরভাবে বললো, আমার খুব শীত করছে।

সে আকাশের দিকে তাকালো। জ্যোৎস্না নেই।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে টানা লম্বা, পুরোনো আমলের শ্বেতপাথরের ঢাকা বারান্দা। ঝাড়লণ্ঠন লাগানো আছে, কিন্তু জ্বলে না। তার বদলে নিয়ন। বারান্দায় এক পাশে তিনটি শোবার ঘর। ঘরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার আমলের নকশাকাটা জাঁদরেল পালঙ্ক।

ছোটকু বারান্দার কোলাপসিবল গেট টেনে বন্ধ করলো। তারপর বললো, কী, এক্ষুনি শুয়ে পড়া হবে?

—সাড়ে দশটা প্রায় বাজে।

—কিছুই না।

—তবু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত। একটু শব্দ নেই।

বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেবকুমার বললো। আবার মেঘ জমেছে। আজ রাত্তিরেও বোধহয় বৃষ্টি হবে! ঠাণ্ডাটা আরও পড়বে।

সোহিনী বললো, না আর বৃষ্টি হবে না।

যেন বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ভার তার ওপর, এইভাবে সোহিনী একটা হুকুম দিয়ে দিল। তারপর বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি বাবা শুতে যাই। তুই আসবি, বাচকুন?

সোহিনী আর বাচকুন এক ঘরে। দুই বোন বাইরের শাড়ি ছেড়ে রাতপোশাক পরে নিল। মুখে ক্রিম ঘষলো। চুলে লম্বা করে চিরুনি চালালো। সোহিনীরই তো সব কিছু শেষ হয়ে গেল আগে। মুখ দিয়ে শীতের উঃ হু হু হু শব্দ করতে করতে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে বললো, তুই কি বই পড়বি নাকি?

—এই খানিকক্ষণ।

—মনে করে আলো নিবিয়ে দিস।

এক পাশের ঘরে ছোটকু আর রোজমেরি অন্য পাশের ঘরে বাকি ছেলেরা। ছেলেদের ঘর থেকে এখনো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাচকুন। সে এখন না ঘুমোতেও পারে। ইচ্ছে করলে গল্প করতে যেতে পারে পাশে, ঘরে ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু কি গল্প? হয়তো ছেলেরা এখন ছেলেদের গল্প করছে। ছেলে? একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে হুমড়ি খেয়ে আছে ট্রেনের ছাদে... হাত দুটো বেঁকে শক্ত হয়ে গেছে...পাশে দুটো চালের বস্তা, সেই চাল অন্য কেউ খাবে। কেন রোজমেরি বললো।

সব কটা জানলাই বন্ধ। এত শীতে জানলা খুলে শোওয়া যায় না। তবু বাচকুন একটা জানলার পাশে এসে খড়খড়ি তুলে একটু দেখলো। আকাশে বিশ্রি খসখসে কালো রঙের মেঘ। এরকম কথা ছিল না।

খড়খড়ি দিয়ে শাণিত হাওয়া এসে লাগছে বাচকুনের গালে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। বাচকুন গালে হাত রাখলো। যেন নিজের নয়, অন্য কারুর।

বাচকুন একটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে বসলো। কিন্তু একটু বাদেই সে বুঝলো তার একটুও মন বসছে না। শীতের রাতে, সামনে বিছানা থাকলে কিছুতেই একটু দূরে চেয়ারে বসে থাকা যায় না। তার শুতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে গেলে হঠাৎ এক সময় ঘুম এসে যায়। উঠে আর আলো নেবানো হয় না। সারা রাত আলো জ্বলে।

বাচকুন বই মুড়ে রেখে আলো নিবিয়ে দিল। লেপের তলাটা সোহিনী আগেই গরম করে রেখেছে। মস্তবড় লেপ, দুজনের বদলে চারজনকেও ঢাকা দিতে পারে।

চোখ বুজে সে একটু অপেক্ষা করলো, কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা। সে দেখলো শুধু অন্ধকার। কলকাতার থেকে এদিককার অন্ধকার বেশি গাঢ়। সে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেললো।

তারপর খুব আস্তে আস্তে ঘুম আসতে লাগলো। নরম আদরের মতন, সারা গায়ে ছড়িয়ে যায় ঘুম, ঘুমের ওজনে শরীরটা একটু ভারি হয়ে যায়। তারপর ঠিক যেন অতল জলে ডুবে যাওয়ার মতন...কী সুন্দর আরাম। বুকের ওপর একটা হাত রেখে ঘুমিয়ে রইলো বাচকুনের তেইশ বছরের শরীর। তার চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে। ঠোঁটে খুব পাতলা একটা দুঃখ দুঃখ ভাব।

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল বাচকুনের। কেন? কোনো শব্দ হয় নি, গা থেকে লেপ সরে যায় নি, তবু। পুরো চোখ মেলে তাকাবার মতন ঘুম ভাঙা। এবং মনে হয়, সহজে আর ঘুম আসবে না। কেন এরকম হলো? তার কি জলতেষ্টা কিংবা বাথরুম পেয়েছে? কোনোটাই তো পায় নি।

তবু খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর বাচকুন উঠে পড়ে জল খেল। এবং শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে গেল। না হলে আর ঘুম আসবে না। অন্য দুঘরের সবাই গভীর ঘুমে। সে কেন একা জেগে থাকবে?

বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা সরু সুতো দিয়ে কে যেন বেঁধে ফেললো বাচকুনকে। সে থমকে দাঁড়ালো। সুতো নয়, মাকড়সার জাল। এত মাকড়সার জাল এলো কোথা থেকে? বোধ হয় বাথরুমের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু মুখ তুলে সে দেখলো, বারান্দায় লম্বালম্বা মাকড়সার জাল উড়ে বেড়াচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম হলেও স্পষ্ট দেখা যায়। হয়তো বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত টানা কোন জাল ছিল, কোনো কারণে একটু আগেই ছিঁড়ে গেছে।

তারপরেই বাচকুন টের পেল, সে বারান্দার আলো জ্বালে নি, তবু মাকড়সার জাল দেখতে পাচ্ছে। ঘর থেকে যখন বেরিয়েছিল, অন্ধকার ছিল, এখন কোথা থেকে যেন আলো আসছে। কোথা থেকে আবার, আকাশ থেকে!

মেঘের মধ্যে ফাটল ধরেছে, তার ভেতর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ছলাৎ ছলাৎ করে উঠে আসছে জ্যোৎস্না, শীতকালের জ্যোৎস্নার সবটুকু তীব্রতা নিয়ে।

মাকড়সার জালটা যেদিকে উড়ছে, সেদিকে এগিয়ে গেল বাচকুন। বারান্দাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট্ট একটা ব্যালকনি। সেখান থেকে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যায়। সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার যেন প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। তার চোখের সামনে মহৎ উদ্ভাসনের মতন একটা কিছু ঘটে গেল যেন।

নিবিড় নীল রঙের জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। বিরাট দেবদারু গাছটা সহাস্যমুখে চেয়ে আছে তার দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নালার ওপাশের সেই সুন্দর পবিত্র জায়গাটা। সত্যি ও জায়গাটা যেন কারুর জন্য নয়। ভাগ্যিস তার ঘুম ভেঙে ছিল।

দেয়ালে হেলান নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাচকুন। তার চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে কিংবা দেবকুমারকে ডেকে তুলে এনে দেখাবে? না থাক, ওদের যদি ভালো না লাগে!

বাচকুনের শরীরটা কাঁপলো। তার শীত করছে খুব। পাতলা রাত-পোশাকের ওপর শুধু শাল জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল, পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তবু সে ঘরে ফিরে যেতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, যেন আরও কিছু আছে। সে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে আছে দেবদারু গাছটার দিকে।

তারপর একটি পাখি ডেকে উঠলো। প্রথমে আস্তে, তারপর ক্রমশ বেশ জোরে। টিট্রিউ! টিট্রিউ।

বাচকুন অবাক হয়ে গেল। রাত্রে কি পাখি ডাকে? সে তো আগে কোনোদিন শোনে নি! কে যেন বলেছিল, অনেক সময় সাপ গাছ বেয়ে উঠে, পাখির বাসায় ছানা চুরি করতে গেলে পাখিরা ভয় পেয়ে ডেকে ওঠে। কিন্তু শীতে তো সাপ বেরোয় না। কে যেন খানিকক্ষণ আগেই বললো কথাটা। তাছাড়া এ তো ভয় পাওয়া ডাক নয়। এ তো একলা আপন মনে ডেকে ওঠা। ওর মিষ্টি সুরের ঝাপটা ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে। পাখিটা যেন বাচকুনকে শোনাবার জন্যই—

হঠাৎ বাচকুনের শরীরে একটা শিহরণ এসে গেল। প্রতিটি রোমকূপে সে টের পেল এমন একটা কিছুর, যার ঠিক মানে সে জানে না। যেন সব কিছুই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। এই রকম মাঝরাতে সে বারান্দায় এসে জ্যোৎস্নার মধ্যে দেবদারু গাছটার দিকে তাকাবে। দেবদারু গাছটা তাকে একটা পাখির ডাক উপহার দেবে। সেই জন্যই তেসরা ডিসেম্বর সকালে তার মনে পড়েছিল হাজারিবাগের কথা। সেইজন্যই মাঝরাত্তিরে তার ঘুম ভেঙে যাওয়া, সেইজন্যই মেঘ সরে গেল। এইসব কিছুর মধ্যেই যেন অদৃশ্য পরিকল্পনা আছে, এমনকি মাকড়সার জালও তার মধ্যে আছে। সে পাছে ভুলে যায় তাই মাকড়সার জাল তাকে মনে করিয়ে দিল। এই পাখির ডাক শুধু একা তার জন্য।

সে একদিন হঠাৎ একটা সাংঘাতিক, ভয়াল, দম বন্ধ করা কষ্টের দৃশ্য দেখেছিল পাশের ট্রেনের ছাদে। সেই দৃশ্যটি কি তার প্রাপ্য ছিল? এই কথা ভেবে ভেবে সে যন্ত্রণা পেয়েছে। সেই জন্যই যেন তার বদলে, তাকে কলকাতা থেকে ডেকে এনে, মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে এই অনির্বচনীয় রূপময় ছবিটি দেখানো হলো তাকে।

বাচকুনের চোখে সামান্য জল এসে গেল। এত শীতেও চোখের জল কী গরম। এক আঙুল দিয়ে সে চোখ মুছলো। কেউ বুঝবে না এই চোখের জলের মানে।

এটা কোন পাখির ডাক?

কোকিল ও লরিওয়ালা

আমি সন্তর্পণে এদিক ওদিকে তাকাই। আমাকে কেউ দেখেনি তো?

দেখছে তো অনেকেই, কিন্তু কেউ চেনা নয়। আমার জামার বাঁ দিকের হাতাটা সম্পূর্ণ ছেঁড়া, তাই সেদিকে অনেক কৌতূহলী চোখ।

কার্জন পার্কের রেলিং ধরে আমি দুমিনিট। আমার বুকের মধ্যে পাতলা অভিমানের বাষ্প। কার বিরুদ্ধে অভিমান? লরিওয়ালার? যে আমায় চেনে না, আমি যাকে চিনি না, তার সঙ্গে অভিমানের সম্পর্ক হয়? অনেক মানুষ ঈশ্বরকে চেনে না, ঈশ্বরও বহুদিন মানুষকে চিনতে ভুলে গেছেন, তবু তাদের মধ্যে মান-অভিমান, কান্নাকাটির সম্পর্ক থাকে। পিতল-মূর্তির পা ভেসে যায় চোখের জলে।

কিন্তু ঈশ্বর তো লরিওয়ালা নন।

আমি এক যুবকের পাশে চলন্ত এক যুবতিকে দেখি। প্রথমে তার মুখ, তারপর পর্যায়ক্রমে তার বুক, কোমরের খাঁজ ও চলার ছন্দ, আবার তার বুক। তারপর যুবকটিকে। আবার সেই যুবতির কোমরের খাঁজ, বুক ও মুখ। একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ও আমার কেউ নয়। অথচ একটা নিষিদ্ধ ঈর্ষা থেকে যায়। যে-কোনো সুশ্রী রমণী দেখলেই। সাড়ে সাত লক্ষ বছরের এই আকাঙ্ক্ষা, এখনো গেল না।

শুধু শার্টের হাতটাই ছেঁড়েনি, বাহুতে চিরেও গেছে খানিকটা। সরু, লম্বা একটা লালচে রেখা, রক্ত বেরুবে কি বেরুবে না, এ বিস্ময়ে এখনো মনস্থির হয়নি, অনেকটা বিকেল ও সায়াহ্নের মাঝামাঝি অবস্থা। আমি খুব আলতোভাবে আমার বাঁ হাতকে আদর করি।

আমার অনেক কাজ, আমার অনেক জায়গায় যাবার কথা। আজ থেকে দশ-এগারো বছর আগে যে অলসভাবে যতক্ষণ খুশি কার্জন পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো, সে তো আর আমি নেই। সে ছেঁড়া জামা, দাড়ি না-কামানো মুখে, যেখানে সেখানে যখন খুশি। পৃথিবী তাকে বদলে দিয়েছে।

রাজভবনে কোনো রাজা থাকে না। বাগানে খুব বড় বড় গাছ, সেখানে অদেখা থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠেছিল। একটু চমকে উঠেছিলাম। কোকিলের স্বর আমার তেমন পছন্দ হয় না, বড় বেশি মিষ্টি। কিন্তু সেই ডাক শুনে আমার অন্য একটা। আমি খুব আস্তে গুনগুন করে সা-রে-গা-মা-পা করেছিলাম কয়েকবার। 'গাহিছে কোকিল পঞ্চম সুরে'—এরকম পদ্য আছে। কোকিলের স্বর কি সত্যিই পঞ্চমে লাগে? আমার যেন মনে হলো কড়ি-মধ্যম?

কোকিলটার ওপরেই অভিমান করা উচিত। কেননা, অন্যমনস্কভাবে রাস্তা পার হতে গিয়ে, সেই ভয়ংকর রাস্তা, যেখানে প্রত্যেকটি গাড়িই দৈত্য, যেখানে পথ পথিকের জন্য নয় সেখানে আমি একটা লরির সঙ্গে।

শিবরামবাবু হলে লিখতেন লরির সঙ্গে লড়ালড়ি। কিন্তু হাসির নয় ব্যাপারটা। পৌনে তিনশো টাকা মাইনে পাওয়া একটা লোক তিন-পথের কেন্দ্রমণিতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে রাখার জন্য লক্ষ্মীছেলের মতন অন্য সব গাড়ির সঙ্গে লরিটাও দাঁড়িয়ে। সেই সুযোগে আমি পাশ দিয়ে সুরুৎ করে। কিন্তু লরিটার পেছন থেকে বেরিয়ে ছিল একটা হুক, সেটা গাঁথলো আমার জামার হাতায়, আর ঠিক তখুনি কেন্দ্রমণির হাত-তোলা লোকটা হাত নামালো। লরি চলতে শুরু করতেই মনে হলো, আমাকেও টেনে নিয়ে যাবে। দু তিন মুহূর্ত মৃত্যু ভয়। হ্যাঁচকা টানে আমার জামার হাতটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল, আমি রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, পেছনের গাড়িটা যে আমাকে চাপা দিল না, সেটা তার দয়া। তৎক্ষণাৎ উঠে ওরাংউটাং-এর ভঙ্গিতে ছুটে এসে আমি ওই কার্জন পার্কের রেলিং-এর পাশে।

হাতাটা গোটাবারও উপায় নেই, কারণ ছিঁড়েছে একেবারে গোড়া থেকে। তখনো একবার কোকিলটার কথা ভাবি। কড়ি-মধ্যম না?

আমার অনেক কাজ, আমার অনেক জায়গায় যাবার কথা। আমি একটা ট্যাকসি নিয়ে বাড়ি ফিরে জামা বদলে আসতে পারি। তাতে খানিকটা দেরি হবে কিন্তু পৃথিবী উল্টে যাবে না। কিন্তু আমার অভিমান আরও বাড়তে থাকে। কেন এ রাজাহীন রাজভবনের কোকিল কিংবা ওই লরিওয়ালা আমাকে এমন একটা অবস্থায় ফেললো? কোকিল বা লরিওয়ালা, কারুরই মুখ আমি দেখিনি।

এরকম আরও দুএকবার হয়েছে আমার। একবার বাসের পাদানির কাছেই একজন হিন্দুস্থানি গোয়ালা—তখন

দুধের বালতি সমেত, গোয়ালাদের বাসে ওঠার বাধা ছিল না—পরিবহণ ব্যবস্থা তখনো এত সুসভ্য হয়নি, কনুই দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছিল আমার কপালের সাদা রঙের টুসটুসে ব্যথাভরা ব্রণ। গোয়ালার চেহারা ছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্যান্ডেলের মহিষাসুরের মতন সুঠাম ও সুন্দর, সে অজান্তে কনুইটা একবার উঁচু করতেই। রক্তে আমার জামায় হোলিখেলা হয়। গোয়ালাটাকে আমি ক্ষমা করেছিলাম, কেননা আমার কপালে ওরকম একটি ব্রণ থাকাই ছিল বিশেষ অপরাধ। দুধের বালতি নিয়ে বাসে ওঠা যদি অনুচিত হয়, তা হলে পাকা ব্রণ নিয়ে ভিড়ের বাসে ওঠাও তো দোষের।

আর একবার, গোয়াবাগানে একটি শ্রাদ্ধবাড়িতে যাবার পথে একটি বারুদ-রঙা বাড়ির দোতলার ঝুল বারান্দা থেকে হলুদ শাড়ি পরা একুশ বছর তিন মাস বয়েসি একটি কুমারী মেয়ে পানের পিক ফেলে আমার পাঞ্জাবি ও ধুতিতে খুন-খারাবি রং ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি আমাকে এবং তার সদ্য কৃত কাণ্ডটি স্পষ্ট দেখে এবং দৌড়ে বাড়ির ভেতরে পালিয়ে যায়। সেটা ছিল তার অমার্জনীয় অপরাধ। আমি সে বাড়ির কলিংবেল টিপে কারুকে ডেকে অভিযোগ জানাই নি। বরং, মোড়ের পানের দোকানে গিয়ে সাহায্য চাইতে তিনটি ছেলে আমাকে দেখে হেসেছিল এবং পানওয়ালা আমার গায়ে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে আরও কেলেঙ্কারি বাধায়।

তারপর টানা তিন বছর আমি সেই মেয়েটিকে ছায়ার মতন অনুসরণ করেছি। কথা বলিনি কোনোদিন। সে আমাকে চিনেছিল ও জেনেছিল। কখনো কখনো সে খুব কাতর ও মিনতিভরা নিঃশব্দ চোখে তাকাতো আমার দিকে। আমি হাসতাম। ততটা বেশি হাসি নয়, যা পরিচয় দাবি করে। পাতলা, সরু মতন হাসি, যা হাওয়ায় উড়ে যায়। তারপর একদিন বাথরুমে মেয়েটির সঙ্গে নিবিড় ও প্রবলভাবে সঙ্গম করে (মনে মনে) তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম। আর পাঁচদিন পরেই ছিল তার বিবাহ। একথা ঠিক, আসলে মেয়েটির ওপরে আমি কোনোদিনই রাগ করিনি, কারণ, প্রকৃতপক্ষে সে সেদিন আমার সেই শ্রাদ্ধবাড়িতে না-যাবার কারণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। শ্রাদ্ধবাড়িতে কে যেতে চায়?

কিন্তু আজ এই শেষ বিকেলে ওই কোকিল ও লরিওয়ালাকে আমি কোন্ যুক্তিতে ক্ষমা করবো? কোকিল আপন মনে ডাকে ডাকুক, কিন্তু সে বেসুরো নোট লাগাবে কেন? আর, লরির পেছনে হুক? অথচ মুশকিল এই, ওদের দুজনের কারুকেই অনুসরণ করার উপায় নেই।

কার্জন পার্কের মধ্যে সজনে গাছের ছায়ায় একজন পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণ বয়স্ক মানুষ শুয়ে আছে। লোকটির দিকে এক এক পলক তাকিয়েই আমি চোখ ফিরিয়ে নিই।

জামার বাঁ হাতটার কিছু অংশ ফালা ফালা হয়ে ঝুলছে। সেগুলি টেনে টেনে ছিঁড়লাম। এখন পরিষ্কার। ডান হাতটা পুরো আছে, বাঁ হাতটা নেই। এইভাবে কোথাও যাওয়া যায়? ধরা যাক, একটা ফিল্ম কোম্পানির অফিসে? যেখানে গিয়ে সাতখানা টাইপ করা কাগজের আসল ও ডুপ্লিকেটে চোদ্দবার সই করলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। তারা হাসবে? তারা পাগল ভেবে আমার দাম কমাবে?

কেনই বা যাওয়া যাবে না? জামার একহাতা আছে, আর একহাতা নেই, এরকম একটা ফ্যাসান চালু করলেই হয়। এক্ষুনি এই অবস্থায় আমার একটা ছবি তুলিয়ে ফ্রান্সের লা ফিগারো পত্রিকায় জসিউ জাঁ-পীয়েব দা বরামে-কে যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই এটাকে লুফে নিয়ে সারা পৃথিবীময় এই ফ্যাসানটা চালু করে দেবেন।

পার্কের মধ্যে সজনে গাছের নিচে শুয়ে থাকা লোকটির দিকে আমি আর একবার তাকালাম।

আমার অনেক কাজ, আমার অনেক জায়গায় যাবার কথা।

আমার নিজস্ব যুবতি আছে, আমার বন্ধুবান্ধব আছে। আড্ডাস্থল আছে, একটি নির্দিষ্ট বাড়ির মধ্যে সংসার আছে। এ ছাড়া আছে লেলিহান অতৃপ্তি। লোভ। লরির পেছনের গাড়িটি যে-হেতু আমায় একটু আগে চাপা দেয়নি, তাই আমাকে আরও অনেক কিছু ভোগ করে যেতে হবে। আমি হাঁ করে গিলবো ক্ষমতা। আমি নারীর কোমরে হাত রাখবো। এরকম ঘোর বিকেলে পার্কের রেলিং-এ ভর দিয়ে সময় কাটানো আমাকে মানায় না। সে অধিকার ছিল দশ এগারো বছর আগেকার একজন যুবকের।

আমার পাশ দিয়ে একজন লম্বা মতন লোক হেঁটে গেল। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু ও ঈষৎ ঝোঁকা, লোকটির মুখ তেলতেলে, রোগামুখে অতিরিক্ত লম্বা নাক, ঠোঁটে বিরক্তি। অফিস থেকে ফিরছে। আমি এই লোকটার মতন নই। এই লোকটার যেন আর কিছুই পাবার নেই, হাল ছেড়ে দিয়েছে। এই এক ধরনের মানুষ, যারা চোখ খুলে চলে কিন্তু কিছুই দেখে না। এই সব মানুষকে নিয়েও লেখা হয় গল্প-উপন্যাস। কিন্তু এরা তা পড়ে না কোনোদিন। রিল্‌কের গোলাপ বিষয়ক কবিতাটিও কি পৃথিবীর কোনো গোলাপগাছ পড়েছে?

এরপর ঠিক ওই রকম আর একটি লোক গেল। অত লম্বা নয়, মুখটা গোল, তবু মুখটা ওই রকম। তারপর আর একজন। আবার একজন। বিকেলবেলা এই রকম মানুষই বেশি।

সজনে গাছের নিচে শুয়ে থাকা লোকটি দুচোখে হাত চাপা দিয়ে আছে। রোদের জন্য। কিন্তু এখন আর রোদ নেই ও জানে না, ও ঘুমন্ত।

অফিস-ভাঙা ভিড়ে এখন রাস্তায় অনেক মানুষ। অনেকেই বাড়িমুখো, আবার অনেকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে নদী তীরের উদ্দেশ্যে। যারা বাড়িমুখো তারা কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না, যারা বিপরীত দিক থেকে আসছে, তারা কেউ কেউ আমার দিকে তাকায়, কেউ হাসে, কেউ অপরের কানে কানে কিছু বলে। কেউ আমাকে চিনে ফেলতেও পারে এই শহরের কিছু মানুষ তো আমাকে চেনে।

আমার ছেঁড়া হাতটাতেই ঘড়ি বাঁধা। এ যেন উলঙ্গ লোকের পায়ে মোজা। ঘড়িটা খুলে প্যান্টের পকেটে রাখলাম। ছটা দশ। আমার ছটার সময় পৌঁছোবার কথা ছিল, যেখানে যাবার।

কত বছর হবে, দশ, বারো কি তারও বেশি, যখন আমি শেষবার পার্কের ঘাসের ওপর শুয়ে থেকেছি একা। যখন কোনো কাজ থাকতো না, কোথাও যাবার কথাও না। এমনি এমনিই হাতে অজস্র সময়।

সজনে গাছের নিচে ঘুমন্ত লোকটির গায়ে ফতুয়া। এই পড়ন্ত বিকেলে এমন নিশ্চিন্ত ঘুম ও পায় কি করে?

তিনটি শিশু বালিকা ও একটি চেন-বাঁধা কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে এক দম্পতি। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই মুখ গম্ভীর, ওদের বোধ হয় আজ ঝগড়া হয়েছে, তবু বেড়াতে বেরিয়েছে। কুকুরটা ঘুমন্ত লোকটির মুখ শুঁকে গেল।

আমার অনেক কাজ, আমার অনেকে জায়গায় যাবার কথা। আজ শ্রাদ্ধবাড়ি নয়। প্রথমে সিনেমা কোম্পানির অফিসে তারপর সংবাদপত্রের অফিসে, তারপর জার্মান দুতাবাসের নিয়মমাফিক নেমন্তন্নে। একটা ইঁদুর-প্রতিযোগিতা আছে, আমি তার মধ্যে খুব গেরেমভারিভাবে জড়িত।

কার্জন পার্কের এই কোণটায় এক সময় প্রচুর ধেড়ে ইঁদুর থাকতো না? সবাই ভিড় করে দেখতো, কেউ কেউ পাউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে ইঁদুর নাচাতো। এখন সেইসব ইঁদুরগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে, ক্যাকটাসের ঝোপটি এখন বেশ স্বাস্থ্যবান, তার পাশেই প্রচুর ফুল।

এক হাতাওয়ালা জামা পরার চেয়ে ফতুয়া পরা লোকেরা বোধ হয় বেশি সুখী হয়। আমার ঠাকুর্দা পরতেন, তিনি আমার বাবার চেয়ে বেশি সুখী ছিলেন যে, তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণই নেই।

হুকটা জামার হাতায় গেঁথে না গিয়ে যদি আমার ঘাড়ের কাছে কলারে আটকাতো? তাহলে ছিঁড়তো কি এত সহজে? কটি বেড়ালছানার মত আমাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত লরিটা। আমি হাত-পা ছুঁড়ে চ্যাঁচাতাম,আর রাস্তার সমস্ত লোক। ভাবতেও গা জ্বালা করে। হতচ্ছাড়া কোকিল।

ডান হাতটা বাঁ হাতে চিমটে ধরে জোরে টান দিতেই ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল খানিকটা। জামাটা আসলে পুরোনোই হয়েছিল। এক একটা পুরোনো জামা খুব প্রিয় হয়। তাছাড়া একটা বোধহয় কিনেছিলাম কোনো 'সেল' থেকে। সেলের জিনিসমাত্রই তো খানিকটা পচা। তবে দেখতে বাহারি ছিল খুব, নীল রং আমার বড় পছন্দ।

এদিকের হাতাটাও পুরো ছিঁড়ে ফেললে দিব্যি একটা ফতুয়া হয়ে যায়। কলারওয়ালা ফতুয়া। কিন্তু যা চাই, তা কি ঠিকঠাক হবার উপায় আছে সব সময়। বেশি টানাটানি করতে গিয়ে বুকের কাছের একটা চাকলা সমেত ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের গায়ের জামাও ইচ্ছে মতন ছিঁড়তে পারো না। তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি দেশলাইয়ের বাক্সের সব কটি কাঠি পর পর জ্বালিয়ে যেতে পারো না। এমনি এমনি। তুমি একা দাঁড়িয়ে হাসতে পারো না। তুমি বড় জোর হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে পারো। এসবই রাস্তার নিয়ম।

রেলিং টপকে আমি চলে এলাম পার্কের মধ্যে। অমনি সবকিছু আলাদা হয়ে গেল। রাস্তার সঙ্গে পার্কের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা একটা অন্য জগৎ। এখানে বিকেলবেলাও একটা লোক চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে।

ছেঁড়া শার্টটা খুলে ফেললাম গা থেকে। পকেট থেকে পয়সা কড়ি, কলম ও সিগারেট বার করে নিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম একটা ঝোপের মধ্যে। কেউ আপত্তি জানালো না। অদ্ভুত একটা মুক্তির স্বাদ। ছেঁড়া জামাটা শরীরে একটা মূর্তিমান অস্বস্তি হয়ে সেঁটে ছিল। ওটা জামা না স্ট্রেট জ্যাকেট?

এবার ধীরে সুস্থে ঘাসের ওপর বসে নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট খাওয়া যায়। হঠাৎ বিকেল চলে গিয়ে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। সিনেমা কোম্পানির অফিস এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঝাঁপ বন্ধ করে ফেলেছে। যাক নিশ্চিন্ত। একটা জায়গা বাদ গেল।

যেন দেখা না হয়!

যেন দেখা না হয়, এরকম একটা অনুভূতি আমার বহুদিনের। খুবই দরকার, যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি আমার অনেক উপকার করতে পারেন। তবু তাঁর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে মনে হয়েছে, উনি বোধ হয় বাড়িতে নেই, না থাকলেই ভালো। সত্যিই তিনি বাড়িতে না থাকলে আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস। যখন চাকরি চাইতে যেতাম, তখন এরকম যে কতবার!

ঘুমন্ত লোকটার থেকে খানিকটা দূরে আমি আর একটা গাছের নিচে। এখান থেকেও রাস্তা দেখা যায়, রাস্তার মানুষ, এখন ক্লান্ত মানুষের চেয়ে খুশি মানুষের যাতায়াত বেশি।

বাকি রইলো সংবাদপত্রের অফিস ও দূতাবাসের নেমন্তন্ন। এখনো উপায় আছে। ঝাঁ করে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি থেকে জামা পাল্টে। গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখলে বাড়ির লোক অবাক হবে কিন্তু অবিশ্বাস করবে না, যদি বলি, একটা লোক আমার জামায় শিকনি ঝেড়েছিল বলে ঘেন্নায় আমি জামাটা খুলে ফেলে দিয়েছি। এরকম তো হতেই পারে। তাহলে গেঞ্জিটাই এখন বাধা। যতক্ষণ গায়ে গেঞ্জি আছে, ততক্ষণে মনে হবে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় তারপর আবার সব কিছুই সহজ।

অনেক সময় নষ্ট করা গেছে, এবার সেটাই করা উচিত আমার। বাড়ি যাওয়া। আমার অনেক কাজ। বিশেষত ইঁদুর দৌড়ের ব্যাপারটা কি আর চেষ্টা করলেই ভোলা যায়? বেকার বা নৈরাশ্যবাদীদেরই এমন মানায়। আমি জোর করে সেরকম হতে যাবো কেন?

সিগারেটটা শেষ করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম, তখন আর একটা কথা মনে পড়লো। হয়তো এমন হলো, আমি ট্যাক্সি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি গেলাম, গিয়ে দেখলাম সব তালাবন্ধ। বাড়ির মানুষ বাইরে গেছে। যেতে পারে না? আমার তো রাত বারোটার আগে ফেরার কথা নেই। তখন সেখান থেকে কোথায় যাবো? কোনো বন্ধু-বান্ধবের কাছে? আমার কোন্ বন্ধু সন্ধেবেলা বাড়ি থাকে? একজনকে পাওয়া গেল না, তারপর আর একজনের বাড়িতে, কিংবা আর একজনের—উদ্যমী পুরুষরা এরকমই করে।

কিংবা, নিজের বাড়ি তালাবন্ধ দেখে অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। দেখলাম সেই বন্ধুও বাড়ি নেই, কিন্তু তার স্ত্রী আছে। তখন সেই বন্ধু-স্ত্রীকে বলবো যে, আমাকে একটা জামা দাও, এক্ষুনি, দেরি করছো কেন? অবাক হচ্ছো কেন? ওগো, দাও আমাকে একটা জামা, আমার খুব দরকার, আমাকে ইঁদুর-দৌড়ে যেতে হবে।

তাহলে গেঞ্জিটাই বাধা। ঝট করে গেঞ্জিটা খুলে ছুঁড়ে ফেললাম।

খুব বেশি দূরে পড়লো না সেটা। সুতরাং উঠে গিয়ে আবার সেটা তুলে নিয়ে, কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার পর, অন্ধকার রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে সেটা ছুঁড়ে দিলাম রাস্তায়। যাক, এবার মানুষের পায়ে পায়ে ওটা কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই।

এবার? খালি গায়ে বাড়ি ফেরা যায় না। জামা ও গেঞ্জি দুটোই বিসর্জন দিয়ে এই ভরসন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার কোনো যুক্তিই দেখাতে পারবো না। তা ছাড়া খালি-গায়ে লোককে কি ট্যাক্সিতে নেয়? সঙ্গে এমন বেশি টাকাও নেই যাতে দোকান থেকে নতুন একটা জামা কিনে নিতে পারি। পাঁচ-সাত টাকায় জামা হয় না। পকেটে বেশি টাকা রাখবো কেন, আজই তো কয়েক হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিল। একটা কোকিল ও লরিওয়ালার জন্য সেটা। কিংবা ওরা চেক দিত? অথবা ওরা মন বদলে ফেলেছে? এরকম কতবার হয়েছে। গরজ থাকলে ওরা আবার আসবে।

এই শহরে এত লোক থাকতে সজনে গাছের নিচে শুয়ে থাকা ওই লোকটিকেই বা আমি ঈর্ষা করছি কেন? না, ঈর্ষা নয়তো, আত্মীয়তা।

ট্রাম লাইনে ট্রামের শব্দ মাঝে মাঝে হঠাৎ খুব কর্কশ হয়ে ওঠে। দুতিনটে ট্রাম পরপর যাবার পর যে বিরতি, সেই নিস্তব্ধতা বড় রমণীয়। তার মধ্যে আমি শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণতম করি, যদি রাস্তার ওপারের রাজভবনের বাগান থেকে কোকিলের ডাক আবার শোনা যায়। যায় না। অন্ধকার হয়ে গেছে, আর কোকিল ডাকবে না, কোকিল তো রাতপাখি নয়। আমার অভিমান আরও বাড়ে।

সজনে গাছের নিচের লোকটি হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসেই ডাকলো, চায়ে, এ চায়ে!

পেতলের কলসিভরা চা নিয়ে একজন ফেরিওয়ালা কাছ দিয়ে যাচ্ছিল বটে, আমি তাকে লক্ষ্য করিনি, তার ডাকও শুনিনি। ঘুমন্ত লোকটি ঠিক শুনেছে! উঠে বসে এক ভাঁড় চা খেল। তারপর পকেট থেকে টিনের কৌটো বার করে তার থেকে পয়সা দিল গুণে। সেই টিনের কৌটো থেকে বেরুলো বিড়ি, চাওয়ালাকে তার একটি দিয়ে নিজে একটি ধরালো।

একটু পরে সে এবং চাওয়ালা দুজনে চলে গেল দুদিকে।

লোকটা হঠাৎ চলে গেল? আশ্চর্য তো! কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ চলে গেলেই হলো? লোকটা তো আমাকে দেখেনি, তবে? সব কিছুরই তো একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

এবার আমার পালা। এই ব্যস্ত শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকার ঠিক মাঝখানে কোনো একজন লোককে বিনা কারণে অত্যন্ত নিশ্চিন্তে তো শুয়ে থাকতেই হবে। না হলে ভয়ংকর বিপদ হয়ে যাবে যে। হঠাৎ বিকট শব্দে সবকিছু ফেটে পড়তে পারে।

জুতো-মোজা খুলে আমি শুয়ে পড়লাম। পার্কে এখন বিশেষ ভিড় নেই—এদিক ওদিক কারা যেন ঘুরছে, কোথাও কোথাও দেখা যায় পাশাপাশি বসে থাকা দুটি করে ছায়ামূর্তি, পুরুষ সঙ্গীহীন দুএকটি স্ত্রীলোককেও শ্লথ পায়ে এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে দেখি। আমার এদিকটা বেশ অন্ধকার-অন্ধকার মতন। দুএকজন এদিকে আসে, আমি জায়গা জুড়ে আছি দেখে চলে যায়। কেন আমার খালি গা, সে সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে না। কিংবা দেখে না। দেখতে চায় না।

গাছের ফাঁক দিয়ে আমি দেখি আকাশ। চাঁদ ওঠেনি, এদিকে ওদিকে দুএকটি তারা আর কিছু ভ্রাম্যমাণ ছেঁড়া মেঘ। এই সময় আমার সংবাদপত্রের অফিসের টেবিলে বসে থাকার কথা ছিল। দুনিয়ার ঠাণ্ডা গরম খবরের ঝাঁক আমাকে ঘিরে থাকতো। এখানে কোনো খবর নেই। পাশেই রাস্তা দিয়ে যে গাড়িগুলো ছুটছে তারাও সবাই কোনো না কোনো খবর নিয়ে যাচ্ছে। যে সব মানুষ হাঁটছে, তাদেরও সকলেরই কিছু না কিছু। আমি ওদের কেউ নই। আমি এই শহরের কেউ নই, আমি শুধু একজন নিশ্চিন্তে শুয়ে-থাকা মানুষ।

লরিওয়ালা, তুমি এখন কোথায়? সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে হাওড়া পেরিয়ে মুম্বাই বা দিল্লির পথ ধরেছে। মিশমিশে অন্ধকার পথ, তার ওপর দিয়ে হেড লাইট জ্বেলে গাঁক গাঁক শব্দে ছুটছে ট্রাক, পেছনে ঝুলছে সেই মারাত্মক হুক, সেটা দুলছে, সেটা দুলছে...

লরিওয়ালা, তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও। আমি এখানে শুয়ে থাকবো। আমি সাড়ে সাত লক্ষ বছরের একজন পুরোনো মানুষ, এইরকম ভাবেই কোথাও কোনো প্রান্তরে, আকাশের নিচে, গাছের নিচে শুয়ে থাকতাম। আমাকে ঘিরে উঠে এসেছে ইট কাঠের এত দেওয়াল, এত ট্রাম লাইন, এত গাড়ি ও ট্রাক, পেছনে ঝুলছে হুক। আমরা লোভ ও বাসনা চাপা দেবার জন্য এত পোযাক। আমি আজ মুক্ত ও স্বাধীন হয়েছি।

আরও বেশি স্বাধীন, সম্পূর্ণ মুক্ত হবার জন্য আমি বেল্ট খুলে, প্যান্ট ও জাঙ্গিয়া খুলে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। যদি কেউ দেখে, ভাববে কোনো পাগল ছাগল। পাগলের কাছে ঘেঁষে না কেউ।

সাড়ে সাত লক্ষ বছর আগে আমরা তো সবাই পাগলই ছিলাম।

সীমান্ত প্রদেশ

দরজার আড়াল থেকে হীরেন দেখতে পেল, ওর স্ত্রী ললিতাকে ওর বন্ধু হেমকান্তি চুমু খাচ্ছে। হীরেন একটু হাসলো।

হীরেন চিঠি ফেলতে গিয়েছিল, কাল বিকেলবেলা বেড়াতে গিয়ে ওরা যে দোকান থেকে ঢাকাই পরোটা খেয়েছে, তার পাশেই অশ্বত্থগাছের সঙ্গে লাগানো ডাকবাক্স, হেমকান্তির কাছে ডিরেকশন শুনে নিয়ে হীরেন সেটা ঠিকই চিনতে পারতো, এবং তাহলে চিঠিটা ফেলে আসতে হীরেনের সময় লাগতো বারো মিনিট, মেরে কেটে দশ মিনিট তো বটেই। তা বলে হীরেন যে অন্য সময় অনুপস্থিত থাকে না তা নয়, বা কালকে বিকেলেই তো বেড়াবার সময়, একটা লোকের হাতে বেতের তৈরি ব্যাগ দেখে হীরেন এমন মোহিত হয়ে যায় যে, সেই লোকটির সঙ্গে বেত-শিল্প বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা জুড়ে দেয়, বিরক্ত হয়ে সেই মন্থর অবসন্ন সন্ধ্যায় ললিতা ও হেমকান্তি আলাদা হাঁটতে থাকে মাঠের মধ্যে, অনেক দূর চলে গেলে হেমকান্তি চেঁচিয়ে বলেছিল, এই হীরেন, আমরা খালের ধারে গিয়ে বসছি! তুই আয়—এ কথা বলারও অনেকক্ষণ পর হীরেন এসেছিল।

সুতরাং এখন এই চিঠি ফেলতে যাবার দশ মিনিটের কোনো আলাদা মূল্য নেই, শুধু, হীরেন যদি সত্যি সত্যি দশ মিনিট ব্যয় করতো, তাহলে এই দৃশ্যটা তাকে দেখতে হতো না। কারণ, ললিতা ও হেমকান্তি এ বিষয়ে মুখে কিছু আলোচনা না করে নিলেও দুজনের মনে মনে নিশ্চিত ছিল, এখন সময় আছে দশ মিনিট এবং ললিতা ঝটকা মেরে হেমকান্তিকে ঠেলে দেবার সময় বলেছিল, কি করছেন কি! আপনি পাগল, এক্ষুনি ও এসে পড়বে—। হেমকান্তি বলেছিল, না, আসবে না, একবার, একবার—

কিন্তু হীরেন দশ মিনিট খরচ করে নি। সেটা ঠিক তার দোষও নয়। হীরেনের হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু বোধ হয় ও সাড়ে তিন কি চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসেছে। এই অসময়ে ফিরে আসার জন্য পরোক্ষে হেমকান্তিই দায়ি। পিসিমাকে বলে এসেছিল পৌঁছ-সংবাদ দেবে, কিন্তু যে দিন হীরেনরা হেমকান্তির কাছে এসে পৌঁছোয় সেদিন শনিবার বিকেল, পরদিন রবিবার ডাক বন্ধ, আজ সোমবার সকালে চা-পর্ব শেষ করার পর, হীরেনেরই মনে পড়ে চিঠি লেখার কথা, ওর সুটকেসেই পোস্টকার্ড ছিল, হীরেন একপিঠে লেখার পর অন্যদিকে ললিতা পিসতুতো বোন বুলুকেও কয়েক লাইন লিখে দেয়, হেমকান্তি তখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, ললিতা মুর্গির মাংসের গা থেকে পালক ছাড়াচ্ছে, সে-সময় হীরেনের ঠিক কিছুই করার নেই ভেবে সে নিজেই চিঠিটা ফেলে আসার কথা ভাবলো, চাকর এই মাত্র বাজার থেকে এসেছে, তাকে আমার এখুনি পাঠানো ঠিক নয়।

পরনে সিল্কের লুঙ্গি ছিল, তার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিয়ে হীরেন যখন বেরুবে, তখন হেমকান্তি চেঁচিয়ে বলেছিল, সিগারেট নেই, দুপ্যাকেট সিগারেটও আনিস তো। হীরেন আচ্ছা বলে বেরিয়ে যায়, ভুজাওয়ালার দোকান পর্যন্ত পৌঁছেই ওর মনে পড়ায় পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে পকেট ফাঁকা। কাল রাত্তিরে, হেমকান্তি বলেছিল এখানে বড় চোরের উপদ্রব, তাই হীরেন পকেট থেকে টাকাকড়ি ও খুচরো পয়সা পর্যন্ত সবই সুটকেসের মধ্যে রেখেছিল। তাহলে সিগারেট কেনার পয়সা আনার জন্যই তাকে ফিরতে হয়।

হীরেন ভেবেছিল বাড়িতে আর না ঢুকে জানলা দিয়েই পয়সা নেবে। কিন্তু তখন মনে পড়ে, উঠোনের রোদে বসে হেমকান্তিকে ও দাড়ি কামাতে দেখে এসেছে, ললিতাও রান্নাঘরের সামনে বারান্দায়, সুতরাং ওরা কেউ শুনতে পাবে না। হীরেন তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে বৈঠকখানা পেরিয়ে, হেমকান্তির ঘর পেরিয়ে, নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় হেমকান্তির ঘরের একপাল্লা ভেজানো দরজা দিয়ে একেবারে ওপাশের দেয়ালের কাছে সেই চুম্বনের দৃশ্য দেখতে পায়।

ঠিক ওদের না দেখলেও, হয়তো আলমারি—জোড়া আয়নায় ওদের ছায়া দেখেছিল, মোট কথা হীরেন দেখেছিল মাত্র এক ঝলক, ললিতার চুলের মধ্যে হেমকান্তির হাত ও মুখের কাছে মুখ! আর হীরেন কয়েকটা কথাও শুনতে পেয়েছিল, সে কথাগুলো ছবির মতন, সব দেখতে পাওয়া যায়। উঠোনে হেমকান্তির দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ছড়িয়ে আছে, রান্নাঘরের বারান্দায় রাখা আছে আনাজ ও মাংস, চাকর বাথানি বাইরের কুয়ো থেকে জল তুলছে। হীরেন একটু হাসলো।

অন্তত দশ মিনিট হীরেনের বাইরে থাকার কথা ছিল, তার মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন কি চার মিনিটে ফিরে এসেছে।

না এলেই ভালো হতো। এই দশ মিনিটের দাম বড় কম নয়, হয়তো সারাজীবন। দশ মিনিট বাদে এলে ওরা নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে যেতো, ওরা দুজনের কেউই তো কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়।

হীরেন এক মিনিট কি দেড় মিনিট ওখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরই মনে পড়লো, হঠাৎ ওরা ওকে এখন দেখতে পেলে ব্যাপারটা বিশ্রী লজ্জাজনক হয়ে পড়বে। ওরা দুজন হয়তো ভাববে, হীরেন আগে থেকেই ওদের সন্দেহ করেছিল বলেই গোপনে ফিরে এসে চোরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে হীরেনের এই কথাই মনে হয়, সে মোটেই এমন খুঁতখুঁতে ও অনুদার নয় যে বন্ধুকে সন্দেহ করবে। বন্ধুর সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে একা রেখে সন্দেহবশে আড়ি পেতেছে— ওরা যদি তাকে দেখে এখন সেই কথা ভাবে, সেটা খুবই অন্যায় হবে। হীরেন ঘুণাক্ষরেও এ সব কিছু ভাবে নি, সেইটা প্রমাণ করার জন্যই যেন তার সেখান থেকে তখুনি চলে যাওয়া দরকার।

তাছাড়া, দ্বিতীয় কারণটি এই, এখুনি যদি তারা দুজনে তাকে দেখে ফেলে, তা হলেই ব্যাপারটা সারা জীবনের মত স্থায়ী হয়ে গেল, হেমকান্তির সঙ্গে সে ঝগড়া করতে বাধ্য হবে। ঘটনাটা দুজনের কাছেই জানাজানি হয়ে গেলে— তারপর আর শান্তভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, ললিতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক কি দাঁড়াবে কে জানে—শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা আত্মহত্যায় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকতে পারে। অথচ সামান্য একটা চুমুর জন্য, দেখে ফেলার জন্য—।

এখানেই হীরেন একবার হাসলো। ভাবতে ভাবতেই আরও তিন-চার মিনিট কেটে যায়, চুম্বন শেষ করে ললিতা ও হেমকান্তি একটু দূরে সরে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। এই অবসরে হীরেন খুব সাবধানে আবার উঠোন পেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। নিজের বাড়ি থেকে তাকে সন্তর্পণে লুকিয়ে বেরুতে হচ্ছে, এটাও একটা হাসির ব্যাপার।

এখন আর সিগারেট খাবার কোনো উপায় নেই জেনে সামান্য অস্বস্তি হলো, শরীরটার মধ্যেও খানিকটা চিনচিন করছে, কাছে সিগারেট না থাকলে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটাই কি সাংঘাতিক প্রবল হয়, বস্তুত হীরেন শরীরে এক ধরনের অবসাদ বোধ করতে থাকে, ললিতার চুলের গুচ্ছ হেমকান্তির একটা হাত মুঠো করা—হেমকান্তির মুখখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে আনছে—এই দৃশ্যটাই শুধু তার চোখে ভাসছে। হীরেন লক্ষ্য করলো, ওর কপালের কাছে ও নাকের ডগাটা একটু গরম গরম লাগছে অর্থাৎ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, হীরেন ভাবলো; কিছুই এতে আসে যায় না, সামান্য একটু চুমু, সে নিজেও কি আগে একাধিক মেয়েকে চুমু খায়নি? সে কি তাদের জন্য বিরলে দুঃখ বোধ করে? মোটেই না—তারা কোথায় হারিয়ে গেছে, বিশেষ বিশেষ সেই সব চুমু খাবার মুহূর্তে খানিকটা আকর্ষণ বোধ করেছিল—এই পর্যন্ত। একমাত্র অরুণা, মাঝে মাঝে অরুণার ব্যাপারটা একটু খটকা লাগে, কিন্তু সে ঘটনাই তো অন্য রকম। অরুণাকে তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে, মনে পড়লেই একটু খারাপ লাগে। কিন্তু অরুণা তাকে ভুলে গেছে নিশ্চয়ই, ভুলে যাওয়াই ভালো। ললিতাও হেমকান্তিকে ভুলে যাবে—এবার হেমকান্তির জন্য একটা ভালো পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে দেখছি।

লাল ডাকবাক্সটার গায় এমন একটা মরচে ধরা তালা লাগানো যে দেখলে সন্দেহ হয়—কোনোদিন এটা খোলা হয় কি না। হীরেন একটু ইতস্তত করলো। এ সব মফস্বল শহরের ডাক ব্যবস্থায় ঠিক বিশ্বাস নেই, সে মিষ্টির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে গেল। দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে কয়েকজন যুবক আড্ডা দিচ্ছে; চায়ের দোকানে আড্ডা মারার স্বভাব কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার মতন শহরেও পৌঁছে গেছে। হীরেনের খুবই লোভ হলো ওই দোকানে বসে একটু চা খায়, আরও খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরতে চায়, কিন্তু উপায় নেই, পকেটে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। সিগারেটের তৃষ্ণাও তাকে আকুল করে তোলে। এখানে একা বসে চায়ের সঙ্গে সিগারেট খেতে পারলে তার মুখখানা স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারতো, তখন সে ওদের দুজনের মনে সামান্যতম সন্দেহ না জাগিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতো।

স্বাভাবিক তাকে হতেই হবে, হীরেন খুব মনের জোর দিয়ে কথাটা ভাবলো, একটা চুমুর জন্য কিছু আসে যায় না। হেমকান্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব সে নষ্ট করতে পারবে না। আর, ললিতার ভালোবাসা হারালে পৃথিবীতে সে আর কোথায় আশ্রয় পাবে? হীরেন তখন একটু আগে দেখা সেই দৃশ্য ও ওদের দুজনের যা সামান্য কথা সে শুনতে পেয়েছে তাই মনে করার চেষ্টা করলো।

হীরেন যখন দরজার কাছাকাছি এসেছিল, তখন ললিতার কাঁধে হেমকান্তির হাত। তা দেখে হীরেনের একটুও খটকা লাগে নি, এমন কি একথাও ভাবে নি, মাত্র সাড়ে তিনমিনিট আগে ওরা দুজন ছিল উঠোনে ও রান্নাঘরে, এরই মধ্যে দুজনে দুজনের কাজ ফেলে ঘরের মধ্যে চলে এলো কি করে? তবে কি আগে থেকেই ওদের ঠিক করা ছিল, হীরেন বেরিয়ে যাবার পরই চোখাচোখিতে কথা ঠিক হয়ে যায়? হীরেন তখনও এ কথা ভাবে নি, ভেবেছিল পরে, তার আগে সে অন্যমনস্কভাবে দরজা পেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পেলো, কি করছেন। কি? আপনি পাগল! এক্ষুনি ও এসে পড়বে!—আর, তারপরই হেমকান্তির ব্যাকুল মিনতিপূর্ণ গলা, না আসবে না, একবার, একবার!

হীরেন তখনি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, যেন নিজের স্ত্রী ভেবে নয়, কোথাও কোনো যুবতিকে কোনো যুবক চুমু খাচ্ছে—এই দৃশ্য দেখে ফেললে যেমন আড়াল থেকে আরও দেখতে ইচ্ছে হয়—অনেকটা সেইরকম। ললিতা বলেছিল, না, একবারও না, ছিঃ।

হেমকান্তি বলেছিল, এসো, একবার, শুধু একবার!

—না! না!

—হ্যাঁ! এসো!

—না! কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন!

—আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, তুমি জানো না!

এরপর হেমকান্তি একহাত ললিতার কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছে ডুবিয়ে অন্য হাতে ললিতার চিবুক ধরে এবং ললিতার সকালবেলার ফোলা ঠোঁটে প্রগাঢ় চুম্বন করে। একবার মাত্র। চুম্বনের পর দুজনই কয়েক সেকেণ্ড একেবারে নিঃশব্দ। তারপর, ললিতা খানিকটা কাতর গলায় বলেছে, কেন এ রকম করলেন?

হেমকান্তি চাপা গলায় স্বীকার করে, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু আমি আর পারছিলাম না, তুমি এত সুন্দর—

—ও কথা আর বলবেন না।

—ওকথা বারবার বলবো। কিন্তু এইমাত্র যা করলুম, তার জন্য আমার অনুতাপ হচ্ছে, হীরেনকে আমি দুঃখ দিতে চাই না।

—সত্যি এ রকম আর কখনো করবেন না বলুন? ও আপনার কতদিনের বন্ধু।

—আমার ওপর রাগ করো না, আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনো না।

এই সময় হীরেন চলে এসেছিল।

চিঠি ফেলার পর হীরেন স্টেশনের দিকে বেড়াতে যায়। মাত্র একটা ট্রেন ছেড়ে গেল। এই ট্রেনে খবরের কাগজ এসেছে, কিন্তু তার তো কাগজ কেনারও উপায় নেই। সে উঁকি মেরে প্রথম পাতার খবরগুলো দেখে নেবার চেষ্টা করে। চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ ও সিগারেট খাওয়া—কলকাতার এই বাঁধা অভ্যেস আজ কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানকার রোদ্দুরটা এত ভালো, কলকাতার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না, বেশ গাঢ় ধরনের শীতের সকালে এমন সাদা রোদ্দুর, সারা শরীরটাকে বেশ মোলায়েম করে তুলেছে। এই রোদ্দুরে বুড়ি ভিখারির মুখও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনের বাইরে পুরানো ডাকবাংলো, সাহেব-মেম বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রোদ্দুরে আরাম করছে। ওদিকে বোকারোর কাজ শুরু হয়েছে বলে, এ পথ দিয়ে আবার অনেক খাঁটি সাহেব-মেমের যাতায়াত শুরু হয়েছে। টুকটুকে লালরঙের সোয়েটার পরা দুটি ফুটফুটে বাচ্চা, বল নিয়ে খেলা করছে মাঠের মধ্যে, একটা অষ্টাদশী মেম-তরুণী কি-যেন খেলার নিয়ম বোঝাচ্ছে ওদের। নীল-রঙা গাউন, মাথায় হলদে স্কার্ফ বাঁধা, কি স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য মেয়েটির, মসৃণ চামড়া, ঝকঝকে সাদা দাঁত, নরম রক্তিম ঠোঁট। হীরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ খেলা দেখতে লাগলো। ওদের তো ওসবে কিছুই আসে যায় না। অনেক সময় স্বামীর সামনেও বউকে চুমু খেলে সেটা হয় টাট্টা। কি যেন একটা রুমাল-চোর ধরনের খেলা আছে ওদের? যে জিতবে, সেই পাশের মেয়েটিকে একবার চুমু খাবে—

দরজা খোলা ছিল কেন? ওরা দরজাটা বন্ধ করে নিলেই পারতো। কিন্তু সকালবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করা দৃষ্টিকটু। সাড়ে তিন কি চার মিনিটেই ওরা ব্যাপারটা ঠিক করে ফেললো কি করে? আসলে যা মনে হয়, ওরা কিছুই আগে ঠিক করে নি, রান্নাঘরের বারান্দায় ছিল ললিতা, উঠোনে বসে হেমকান্তি দাড়ি কামাতে কামাতে দু-একটা ফষ্টিনষ্টি করছিল। কিছু একটা দরকারে ললিতা এসেছিল ঘরের মধ্যে, সেই সময় হেমকান্তিও টপ করে উঠে এসে ঝোঁকের মাথায় ওকে জড়িয়ে ধরে। একটা অন্ধ আবেগের ব্যাপার। ছবিটা ভেবে নিয়ে নিজের যুক্তিবাদী কল্পনা শক্তিতে হীরেন বেশ খুশি হয়ে ওঠে। অন্ধ আবেগের ব্যাপার, হঠাৎ করে ফেলে—দুজনেই এখন অনুতপ্ত, তা তো ওদের কথা শুনেই বোঝা গেল। ললিতা তো রাজী হয়নি, হেমকান্তিটা বরাবরই একগুঁয়ে, যখন যা মনে হয় না করে ছাড়ে না, কিন্তু পরে অনুতাপ করে।

হেমকান্তির অন্যায় আবদারে ললিতা যে চেঁচিয়ে ওঠে নি, কান্নাকাটি করে নাটক বাধায় নি, এতে ললিতার প্রতি হীরেনের কৃতজ্ঞতাই বোধ হয়, নাটকীয় ব্যাপার সে একেবারেই পছন্দ করে না। ...ওদের যে-কটা কথা শুনেছে, তাতে হীরেন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে, ললিতা আগাগোড়াই হেমকান্তিকে বাধা দিয়েছে, হেমকান্তির ছেলেমানুষি দৌরাত্ম্যির কাছে একবারের মত আত্মসমর্পণ করলেও মন থেকে সায় দেয় নি কিছুতেই। ললিতার কথার সুরে একথাও ফুটে উঠেছে যে, হেমকান্তির অন্যায় আবদারের জন্য—হীরেনকে বলে দিয়ে সে কোনো শাস্তি আদায় করতেও পারবে না।

হেমকান্তি হীরেনের প্রায় জন্ম থেকে বন্ধু, গোটা ইস্কুল আর কলেজ জীবন একসঙ্গে কাটিয়েছে, হীরেনের বিয়ের সাতপাকের সময় হেমকান্তি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। সেই হেমকান্তির সঙ্গে হীরেনের বিচ্ছেদ কল্পনাও করা যায় না, ললিতাও তা জানে। তার বদলে, সামান্য একবার—।

'কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছেন?' ললিতা একথা বলেছিল কেন? 'হীরেন আবার একটু হাসলো। পরপুরুষের মুখে রূপের স্তুতি শুনে একটু অন্তত বিচলিত বোধ করবে না—এমন মেয়ে আবার হয় না কি? ওটা তো স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক যত প্রিয় বন্ধুই হোক, তার সুন্দরী স্ত্রীকে আড়ালে পেলে যে কোনো পুরুষের পক্ষেই একটু ফষ্টিনষ্টি করার লোভ জাগে। দুজনের মধ্যে কেউ যদি একটু বদ হতো, তা হলেই ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াতো। কিন্তু হীরেন হেমকান্তিকে জানে ওর চরিত্রে হঠকারিতা থাকলেও মলিনতা নেই এক ছিটে। আর—ললিতা, সাড়ে চার বছর বিয়ে হয়ে গেছে, তবু হীরেন জানে—ললিতাকে ছাড়া তার জীবনটা শূন্য হয়ে যাবে, ললিতা ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই। স্ত্রীর কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, ললিতার স্বভাবের মধ্যে একটা গভীর সমবেদনা আছে।

ললিতার প্রথম কথাটাতেও একটু খটকা লাগতে পারে। 'কি করেছেন কি? এক্ষুনি ও এসে পড়বে!' হীরেনের এসে পড়াতেই একমাত্র আপত্তি। একমাত্র না হোক, হীরেন ভাবলো সত্যিই তো এইটাই প্রধান। দেখে ফেলাটাই তো সবচেয়ে ভয়ংকর। অন্য কেউ দেখে না ফেললে, আর সব কিছু মিটিয়ে ফেলা যায়, ভুলে যাওয়া, দূরে যেতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার কেউ দেখলেই তা শাশ্বত হয়ে গেল। ভাগ্যিস, হীরেন যে দেখে ফেলেছে, তা ওরা দেখে নি।

অজান্তেই হীরেন মনে মনে হিসেব করে, সাত না আট? আটজন—এ পর্যন্ত ললিতা ছাড়া আরও আটটি মেয়েকে চুমু খেয়েছে হীরেন, সেজো মামিমাকে ধরেই, বিয়ের পরই তো দুজনকে, একবারও কেউ দেখে নি, কেউ সন্দেহও করে নি, তাই কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। দীপ্তির সঙ্গে এখনো দেখা হয়, ললিতার সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েও তো দীপ্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কত স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা হলো, মুখের একটি রেখাও বদলায়নি। কল্যাণী বিয়ের পর মুম্বাইতে আছে, তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে না কি। নীলি, মানে নীলিমা—হীরেনের পিসতুতো বোন, তাকে তো চুমু ছাড়াও আরও কত কি। সে তো এক আই এ এস-কে বিয়ে করে এখন খুব সমাজসেবিকা হয়েছে—সুবাসে সেজোমামিমা এখনো নিরালায় দেখলেই চোখের ইঙ্গিত জানায়—এসব তো আর কেউ দেখেনি, তাই কোথাও অশান্তি নেই। দেখাটাই তো একমাত্র দোষের, তাছাড়া কোথায় কি ঘটছে—কে জানে। ওদের কারুর জন্য হীরেনের পিছুটানও নেই, শুধু, একমাত্র অরুণা, অরুণার কথা ভাবলেই হীরেনের বুক শিরশির করে—। না, অরুণাকে চুমু খাবার সময়েও কেউ দেখে নি, কিন্তু, একমাত্র অরুণাকেই ও চুমু খেয়েছিল জোর করে।

তখন হীরেনেরা থাকতো কোন্নগরে, ওদের পাশের বাড়ির পরিবারটা ছিল ছন্নছাড়া। অরুণার বাবা গগনবাবু ছিলেন রেসের বুকি, লোকের কাছ থেকে পাঁচ আনা-দশ আনা পয়সা নিয়ে রেসের বাজি ধরতেন, প্রত্যেক শনিবার ওদের বাড়ির সামনে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লেগেই থাকতো। গগনবাবুকে দেখলেই মনে হতো লোকটা ভালো নয়, মানুষ ঠকানোই ওঁর কাজ, তাছাড়া স্টেশনের পাশে রিক্‌শাওলাদের সঙ্গে বসে গগনবাবুকে দিশি মদ খেতে হীরেন নিজের চোখে দেখেছে। অরুণার দাদা সাধনটা তো ছিল এক নম্বরের গুণ্ডা, শুধু পাড়ায় বখামিই নয়, রাত্তিরবেলা ছিনতাই, জোচ্চুরির কাজেও ওস্তাদ ছিল, দু-তিনবার পুলিশেও ধরা পড়েছিল, পাড়ার এক রাজনৈতিক নেতা বারবার ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। অরুণার ছোট ভাইবোনরা বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে রাস্তায় ছিপি খেলতো, কি কুৎসিত গালাগালি শিখেছিল দশ বারো বছরেই—অরুণার মা বালিশের ওয়াড় আর ফ্রক-পায়জামা সেলাই করে বিক্রি করতেন। সেই বাড়ির মেয়ে অরুণা, অরুণা কলেজে পড়তো। অসম্ভব তেজ ছিল তার। পাড়ার কারুর সঙ্গে, বাড়ির কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলতো না, নিরেট মুখ করে সোজা হয়ে হেঁটে যেতো রাস্তা দিয়ে। পাড়ার ছেলেরা, অনেক সময় সাধনের বন্ধুরাও অরুণাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য করেছে, সিটি দিয়েছে, অরুণা কোনোদিন ঘাড় তুলে তাকায় নি। সন্ধেবেলা দুটো টিউশানি করতো, তাই দিয়ে পড়ার খরচ চালিয়েছে। হীরেন চেয়েছিল অরুণার কাছাকাছি আসতে। গোড়ার দিকে অরুণাকে শ্রদ্ধা করতো সে, ক্রমে এক ধরনের মায়া এক শারীরিক আকর্ষণ জাগে। বছর সাতেক আগের কথা, হীরেন তখন সদ্য পোর্ট কমিশনার্স অফিসে চাকরি পেয়েছে, হীরেন চেয়েছিল অরুণাকে বিয়ে করে তাকে ওই পরিবেশ থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু অরুণা হীরেনকে গ্রাহ্য করে নি, কিছু যেন একটা ব্রত ছিল তার। অরুণা একমাত্র কিছুটা কথাবার্তা বলতো হীরেনের দিদির সঙ্গে, হীরেনের দিদি তখন উইমেন্স কলেজে পড়ান, অরুণা মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসতো পড়াশুনো দেখে নিতে। হীরেন চেষ্টা করছিল অরুণার সঙ্গে ভাব করতে, অরুণা ঠাণ্ডা গলায় কাটাকাটা উত্তর দিয়েছে শুধু, অরুণার চোখ দুটো অসম্ভব জ্বলজ্বলে, সব সময় চোয়াল শক্ত, ভেতরে ভেতরে যেন সর্বক্ষণ একটা তীব্র ক্রোধ জ্বলছে। হীরেন একদিন বলেছিল, বাগবাজারে একটা মেয়েদের স্কুলে একটা চাকরি খালি আছে—

আমার এক বন্ধু বলছিল, তুমি করবে নাকি? আমার বন্ধুর কাকা সেই স্কুলের সেক্রেটারি—। অরুণা শুধু সংক্ষেপে জানিয়েছিল আমি কারুর চেনাশুনোর জোরে কোনো চাকরি নিতে চাই না!

হেমকান্তির মতন হীরেন অমন হঠকারী নয়, কিন্তু অরুণার ব্যাপারে হীরেন কিছুদিনের জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। সে যে সৎ এবং ভালো উদ্দেশ্যেই অরুণার সঙ্গে মিশতে চায়—অরুণা এটুকুও বুঝতে চায়নি বলেই যেন হীরেন ক্রমশ বেশি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। একদিন দিদির ঘরে অরুণাকে একা পেয়ে, দিদি তখন নিচে বাথরুমে গেছে, হীরেন একস্মাৎ এসে অরুণার হাত ধরে আবেগবিহ্বল গলায় বলেছিল, অরুণা, শোনো—। অরুণা এক ঝটকায় সরে গিয়ে তিক্ত গলায় বলেছিল হাত ধরছেন কেন? হীরেন তখুনি কাঁচুমাঁচুভাবে বলেছিল, অরুণা, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই।—অরুণা ওর দিকে না তাকিয়েই বলে, আমি কারুর বন্ধুত্ব চাই না। হীরেন আহতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেন? সত্যি, বিশ্বাস করো! অরুণা অস্থির হয়ে জ্বলে ওঠে, আপনি কি চান, আমি এখান থেকে চলে যাই?

আরও দু তিনটি কথা বলার পর অরুণার তিক্ততা আরও বাড়তে দেখে হীরেন উন্মত্তের মতন হয়ে যায়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অরুণাকে জড়িয়ে ধরেছিল, অরুণা সমগ্র শক্তিতে বাধা দিয়ে হীরেনের চুল ধরে টানতে থাকে, এক হাতে সরিয়ে দিতে চায় হীরেনের মুখ, তবু হীরেন জোর করে অরুণার ঠোঁট কামড়ে ধরে, একহাত নেমে আসে অরুণার বুকের কাছে, তখনও কাতরভাবে বলতে থাকে, অরুণা আমায় বিশ্বাস করো—কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অরুণা বলে, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করবেন? আপনারা সবাই—অরুণা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে এবং তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে ঘটনাও কেউ দেখে নি, দিদি জানতে পারে নি, কেউই জানে নি, কিন্তু অরুণা আর কখনো ওদের বাড়িতে আসে নি এবং মাসখানেকের মধ্যেই বাঁকুড়া না কোথায় ইস্কুলের কাজ নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে অরুণা ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে বিষম ঝগড়া করেছিল।

রোদের তাপ বেশ চড়া হতে হীরেনের খেয়াল হয় অনেকক্ষণ আগেই তার ফেরা উচিত ছিল। এতক্ষণ না ওরা আবার তার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এবং ডাকবাংলোর কাছ থেকে সরে এসে কখন যে সে চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও খেয়াল করে নি। একটু দ্রুত বাড়ি ফেরার পথ ধরতেই কিছুটা দূরে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সামনে হেমকান্তির সঙ্গে তার দেখা হয়। হেমকান্তির স্নান করা চেহারা, পুরোদস্তুর স্যুট-টাই ও পালিশ-করা জুতো। হেমকান্তি এখানকার আদালতের হাকিম। হীরেনকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? হীরেন আলগাভাবে বললো, ঘুরে-ফিরে শহরটা দেখছিলাম—ছোট হলেও মন্দ না শহরটা, বেশ ছিমছাম।

—তোকে সিগারেট কিনতে বলেছিলুম, ললিতা বললো, তুই পয়সা নিয়ে বেরোস নি।

হীরেন সহাস্য উত্তর দিল, এই পর্যন্ত এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখি যে খালি! দে, সিগারেট দে!

হেমকান্তির কাছ থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তোর ছুটি পাওনা নেই?

—আজ সোমবার তো, আজ অ্যাটেন্ডন্স দিয়ে তারপর টানা চারদিন ছুটি নিয়ে নেবো। কাল অযোধ্যা পাহাড় যাবি?

—সেটা কতদূরে? পুরুলিয়ায় আবার পাহাড় আছে নাকি?

—পাহাড় মানে টিবি আর কি। বেশি দূরে না, তবে জায়গাটা সুন্দর, একটা চমৎকার বাংলো আছে। দেখি লাহিড়ীকে বলে একটা স্টেশন ওয়াগন জোগাড় করতে পারি কি না। না হলে, কোনো ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে রাখবো—

—তুই খেয়েছিস?

—না, ললিতা মাংস চাপিয়েছে। দুপুরে এসে খাবো এখন।

হেমকান্তির হনহন করে হেঁটে যাওয়া চেহারার দিকে হীরেন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পাতলার ওপর চেহারা, হেমকে দেখলে এখনো তিরিশের নিচে বয়েস মনে হয়।

বারান্দাতেই তোলা উনুন এনে ললিতা মাংস চাপিয়েছে। এর মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে তার, একরাশ কোঁকড়া চুল পিঠময় ছড়ানো, রোদ্দুরে এখন আর অমন ধপধপে সাদা নেই, এখন একটু হলদেটে, তবু এই মফস্বল রোদ্দুরে ললিতার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর মনে হয়। উনুনের আঁচে খানিকটা লালচে ছায়াও পড়েছে।

হীরেনের দিকে চোখ তুলে ললিতা জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

হীরেন বললো, ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। এখানে বেতের জিনিস বেশ সস্তা। ভাবছি যাবার সময় এখান থেকে কয়েকটা বেতের চেয়ার নিয়ে যাবো।

—হ্যাঁ! এ্যাদ্দুর থেকে আর বেতের চেয়ার নিতে হবে না। তা ছাড়া বেতের চেয়ার বেশি দিন টেকে নাকি?

—বরং কয়েকটা বেড কভার নিয়ে যাবো। ঠাকুরপো বললো, এখানকার বেড কভার নাকি ভালো?

কথা বলতে বলতে হীরেন এসে রান্নাঘরের বারান্দাতেই বসে পড়ে। বাথানি এক কোণে বসে শিল-নোড়ায় পেঁয়াজ

বাটছে আর গামছা দিয়ে চোখের জল মুছছে। বড় সাইজের দু তিনটে দাঁড়কাক কি জন্য চিৎকার করছে কে জানে? হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তোমার রান্নার কত দেরি?

ললিতা মুখ টিপে হেসে বললো, তোমার এর মধ্যেই খিদে পেয়েছে নাকি?

—তা মন্দ পায় নি! এখানকার জলে বেশ খিদে হয়!

—কলকাতার জলেও তো তোমার খিদে কম দেখি না।

—তা বলে তুমি মোটেই আমাকে পেটুক বলতে পারো না। কতক্ষণ চাপিয়েছো, দাও একটু চেখে দেখি।

—বেশিক্ষণ চাপে নি, এখনো কাঁচা। তুমি বরং ততক্ষণ স্নান করে নাও না। আর একটা উনুনে ভাত বসিয়ে দিয়েছি।

—দাঁড়াও, এখুনি কি চান করবো? খবরের কাগজ দেয় নি, না?

—উঁহু।

—হেমটা বোধ হয় কাগজের পয়সা বাঁচায়। কোর্টে গিয়ে কাগজ পড়ে।

—তোমার বন্ধু বোধহয় একটু কৃপণ আছে, না?

—কৃপণ? হেম? মোটেই না—

—চারজন খাবো দু বেলা, মোটে একটা মুরগি আনতে দিয়েছে কেন? তুমি কিন্তু কাল সকালে নিজে বাজার করবে? সবকটা দিন বন্ধুর ঘাড়ে চালিও না।

—হেম মোটেই কৃপণ নয়। ও খাওয়া-টাওয়া বেশি পছন্দ করে না, কিন্তু অন্য অনেকরকম শৌখিনতা আছে। দেখছো না, ঘরে কত রকম স্নো-পাউডার সেন্টের শিশি! ব্যাচেলার মানুষ, বেশ আছে!

—তোমার বুঝি লোভ হচ্ছে? তুমি খুব খারাপ আছো, না?

—আমার মতন ওর তো কোনো বন্ধন নেই!

—আমি তোমার বন্ধন?

—বন্ধনই তো—

এ কথা বলে হাসতে হাসতে অভ্যাস বশে হীরেন ললিতার দিকে হাত বাড়ায়। ললিতা ত্রস্তে সরে গিয়ে চাকরকে ইশারায় দেখিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কি হচ্ছে কি? যত দিন যাচ্ছে তত তোমার লোভ বাড়ছে।

কথা শেষ করে ললিতাও ছোট্ট করে মধুরভাবে হাসে। দাঁড়িয়ে উঠে হীরেন বলে, ভাগ্যিস ও বেচারা একবর্ণ বাংলা বোঝে না।

বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে হীরেন আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভারি মনোরম এই ছুটি, এই সকাল, দূরে ট্রেনের হুইশ্‌ল বেজে উঠলো, বাইরে একটা ছাগলের বাচ্চা তখন থেকে একটানা ডাকছে—কোথাও কোনো গরমিল নেই। হঠাৎ হীরেনের মনে হলো, সকালে ওই দৃশ্যটা ওকি সত্যিই দেখেছিল, নাকি তার দিবাস্বপ্ন? রাস্তায় দেখা হলো হেমকান্তির সঙ্গে, ওই তো ললিতা বসে পিঠে চুল মেলে, কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই, জড়তা নেই, সবই স্বচ্ছন্দ, সারা পৃথিবী কি তার সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছে নাকি আজ সকালে? নাঃ, ও রকম কিছু সত্যিই ঘটে নি, সবটাই হীরেনের কল্পনা। দিবাস্বপ্নকে কে গুরুত্ব দেয়?

আস্তে আস্তে হীরেন এসে হেমকান্তির ঘরে ঢুকলো। খুব সন্তর্পণে দরজাটা তখন যেমন ছিল, সেইরকম আধখোলা রাখলো। বন্ধ জানলাটার কাছে আলমারি, এখানে ললিতা দাঁড়িয়েছিল, আলমারির দুটো পাল্লাজোড়া আয়না, আয়নায় ছায়া পড়ছিল। হয়তো আলমারি থেকে মাখনের টিন নিতেই ললিতা তখন ঘরে ঢুকেছিল। ওইখানে দাঁড়িয়েছিল হেমকান্তি, হীরেন নিজে এসে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়ালো না, এখান থেকে দরজা দেখা যায় না। হীরেন ফিসফিস করে বললো, একবার! একবার!—একথা কি বাইরে থেকে শোনা যায়? শুনতে পাবারই তো কথা।

হঠাৎ হীরেনের মনে হলো, হেমকান্তি আর ললিতা যেন দুজনেই তাকে উকিল হিসেবে নিয়োগ করেছে, সে যেন প্রাণপণে ওদের দুজনের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করছে।। আর ওদিকে আদালতে বসে হেমকান্তি এতক্ষণে অন্য লোকদের শাস্তি দিচ্ছে।

এই সময় ললিতা এসে ঘরে ঢুকলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটা হাল্কা করে হীরেন বললো, তোমায় আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, লতু!

ললিতা ওর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে, বুকে শরীরটা হেলান দিয়ে একটু আদুরে গলায় বলে, মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে এলে, বেশ হয়, না?

এবার থেকে আমরা বছরে একবার করে আসবো—

—খরচ কম নয়—

এমন কিছু খরচ নয়। সারা বছর চেষ্টা করলে ঠিকই হয়।

হীরেন দু হাত দিয়ে ললিতাকে বেষ্টন করে। ললিতার বুকের ওপর ওর হাতের চাপ পড়লেও ললিতা বিশেষ আপত্তি করে না, শুধু বলে, চাকরটা যদি এদিকে আসে আবার—

হীরেন নিজের মুখটা ললিতার কাছে এগিয়ে এনেও ভাবে, আচ্ছা এখন থাক, অন্তত একটা দিন থাক না—। সে তার গালটা রাখে ললিতার গালে, আঃ কি ঠাণ্ডা, কি শান্তি, গরিবের ঘরের বৌ হয়েও ললিতা স্বাস্থ্যটা ভালো রেখেছে। গালে গাল রেখেই হীরেন ললিতার শরীরটা দোলাতে থাকে, এবং ইয়ার্কি করার মতন লঘু গলায় বলে, হেম আবার তোমার সঙ্গে প্রেম-টেম করার চেষ্টা করে নি তো?

ললিতা বললো, কেন, ভয় আছে নাকি তোমার? আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে?

হীরেন বললো, তা নয়, হেমটা আবার একটু কবি-কবি স্বভাবের আছে। ও যদি কখনো একটু বেশি গদগদ হয়ে ওঠে, তুমি আবার সেটা খুব সিরিয়াসলি নিও না।

কলহাস্য করে উঠে ললিতা বলে, বত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, এখন আর এ চেহারা দেখে কারুর কবিত্ব জাগবে না—তোমার ছাড়া।

গাল সরিয়ে এনে, উদাসীনভাবে হীরেন বলে, বাথরুমে জল দিয়েছো?

—হ্যাঁ জল আছে। আমি দেখি, মাংসটা ধরে গেল নাকি! ছাড়ো—

হেমকান্তির বাথরুমও খুব শৌখিনভাবে সাজানো। সিঙ্ক, বেসিনগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে। এরকম মফস্বল শহরের বাড়িতেও এরকম আধুনিক কায়দার বাথরুম আশা করা যায় না। তাকে সারি সারি সাজানো সাবান, শেভিং ক্রিম, পেস্ট, শ্যাম্পু। র‍্যাকে দু তিনটে তোয়ালে। হীরেন নিজের তোয়ালে নিয়ে এসেছিল, একটু বাদে ও খেয়াল করলো, তোয়ালে কাঁধে নিয়ে ও বাথরুমের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেন দাঁড়িয়ে আছে, নিজেই প্রশ্ন করলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো, এরকমভাবে তো সে কোনো দিনই স্নান করে না। একে শীতকাল, তার ওপর কুয়ো থেকে তোলা কনকনে ঠাণ্ডা জল, এরকম জলে হীরেন কখনো স্নান করতে পারে না। তার বিষম ঠাণ্ডার ধাত, বারো মাস সে গরম জলে স্নান করে, শীতকালে তো কথাই নেই। সে পুকুরে কিংবা নদীতে পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে স্নান করতে পারে না।

ললিতা আজ তাকে গরম জল দিতে ভুলে গেছে। কালও গরম জলে স্নান করার ব্যাপারে হেমকান্তি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গরম জল না করিয়ে হীরেন কিছুতেই স্নান করেনি। আজ, ললিতার গরম জলের কথা মনেই পড়েনি। হীরেন একবার ভাবলো চেঁচিয়ে ললিতাকে গরম জলের কথা বলে, কিন্তু মনে পড়লো, দুটো উনুনেই রান্না চাপানো—এখন জল গরম করা অনেক ঝঞ্ঝাট! যেন ললিতার সঙ্গে ঠাট্টা করার লোভেই হীরেন আজ বহুকাল বাদে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করবে ঠিক করে ফেললো। ব্রাসে পেস্ট নিয়ে মুখ ঘষতে লাগলো সে।

সেই দারুণ ঠাণ্ডা জল বালতির পর বালতি মাথায় ঢেলে অল্পক্ষণে স্নান সেরে ফেলে হীরেন, সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেছে, দাঁত ঠকঠক করছে তার। তাড়াতাড়ি গা মুছে দরজার সামনে আসে, পা-টা তখনও ভিজে বলে তোয়ালে দিয়ে পা মুছতে থাকে বারবার। তারপর, বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরজা না খুলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় একটু। বাথরুমের মধ্যে এইমাত্র কি যেন একটা ঘটে গেল! কি ঘটলো? হীরেন ভাববার চেষ্টা করে এবং একটু বাদেই সেটা বুঝতে পেরে অপরাধীর মতন লাজুকভাবে হাসে। হেমকান্তির ওপর সত্যিই তার রাগ হয়েছে তা হলে। কেননা, হীরেন বুঝতে পারলো, অন্যমনস্কভাবে সে হেমকান্তির পেস্ট থেকে দাঁত মাজতে গিয়ে, টিউবের প্রায় অর্ধেকটা টিপে অনেকখানি পেস্ট মাটিতে ফেলে নষ্ট করেছে। হেমকান্তির দামি চন্দন সাবানখানা গায়ে মাখার পর সে সাবানটা মাটিতেই ফেলে রেখেছে— জলের মধ্যে সাবানটা ক্ষয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবং এতক্ষণ সে নিজের তোয়ালের বদলে হেমকান্তির দামি তোয়ালেটা দিয়েই পায়ের তলা মুছছিল। সাবানটা তুলে রেখে, তোয়ালেটা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে হীরেন আপন মনে সস্নেহে বললো, না, হেম, আমি তোর ওপর রাগ করিনি। ওসব কিছু না, মুহূর্তের ভুল। ওতে কিছু যায় আসে না। সেজোমামাও তো বউয়ের একেবারে আঁচল ধরা, আমার সঙ্গে সেজোমামির ব্যাপারটা কখনো জানতে পারেননি বলেই তো।

দুপুরে হেমকান্তি এসে খেয়ে চলে যাবার পর, ললিতা চাকরটাকে পাঠিয়েছে পান আনতে এবং গরম কাপড়ের ব্লাউজটা হীরেনের সামনেই খুলতে আরম্ভ করে। শুধু ব্রেসিয়ার পরা বুকে ললিতা যখন মাটিতে উবু হয়ে বসে সুটকেস খোলে—তখন হীরেন খানিকটা অস্থির বোধ করে। দিন কয়েক ধরে ওদের দাম্পত্য ব্যাপারটা হয়নি। শনিবার ট্রেন জার্নি করে এসে খুব ক্লান্ত ছিল, এসেই মড়ার মতন ঘুমিয়েছে। কালকেও বেড়িয়ে ফেরার পর, তিনজনে অনেকরাত পর্যন্ত গল্প করেছে ঘরে বসে, শেষের দিকে ললিতারই চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। সুতরাং আজ দুপুরবেলা, এখনই

তো ঠিক সময়, কিন্তু হীরেন চঞ্চল হয়ে ভাবে—একটা দিন থাক না! হীরেন উঠে জামাটা গায় দিতে দিতে বলে, এখানে আমার এক পিসেমশাই থাকেন, একটু খোঁজ নিয়ে আসি বুঝলে? তুমি দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ো।

ললিতা অবাক হয়ে বললো, এখন এই দুপুরবেলা যাবার দরকারটা কি?

—যদি শোনেন, দুদিন ধরে এখানে এসেছি, অথচ খোঁজ করিনি, আমি চট করে ঘুরে আসছি। তুমি দরজা বন্ধ করে থেকো।

হীরেনের ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধে হয়ে যায়। ললিতা ও হেমকান্তি তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল, হীরেনের চেহারা দেখে আঁৎকে ওঠে দুজনেই। হীরেনের চোখ দুটো টকটকে লাল, সারা শরীরটা কাঁপছে। বারান্দার মেঝের ওপরই বসে পড়ে হীরেন আস্তে আস্তে বলে, দেখো তো, আমার বোধ হয় খুব জ্বর এসেছে! কথা বলতে বলতেই হীরেন সেখানে শুয়ে পড়ে। ললিতা ছুটে এসে হীরেনের মাথাটা কোলে তুলে নেয়, সত্যি জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। হেমকান্তি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

হীরেন চোখ দুটো বন্ধ করে অস্পষ্টভাবে বলে, এই একটু ওই দিকে গিয়েছিলাম। আজ ঠাণ্ডা জলে চান করেছি তো, তাই বোধহয় জ্বর এসে গেল।

দেখতে দেখতে হীরেনের জ্বর বাড়তে থাকে, জ্বরের ঘোরে ছটফট করে। ওর খুবই কষ্ট মনে হয়। একটা তীব্র যন্ত্রণা পাওয়া চাপা গলায় শুধু বলে, আঃ, আঃ।

কপালের জলপট্টি বারবার ভিজিয়ে দিতে দিতে ললিতা কাঠ হয়ে বসে থাকে। ওর শিয়রের কাছে। হেমকান্তি ডাক্তার ডাকতে চলে যায়। হীরেন বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছটফট করে, খালি সেই যন্ত্রণাসিক্ত গলায় বলে, আঃ আঃ। ললিতা বিপন্ন আকুলভাবে ওর বুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, তোমার ব্যথা করছে? কোথায়? পেটে না বুকে? হীরেন কোনো উত্তর দিতে পারে না।

ডাক্তার এসে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। বললেন, আর তো কোনো খারাপ লক্ষণ দেখছি না, কিন্তু একশো পাঁচ জ্বর উঠে গেলো হঠাৎ! ওই ঠাণ্ডা জলের জন্যই—নিউমোনিয়া না হয়ে যায়! জ্বর আজ কমে গেলে আর ভয় নেই।

জ্বরের ঘোরে হীরেনের সারা শরীর দুমড়ে-মুচড়ে উঠতে থাকে, আর ওর দুপাশে হেমকান্তি আর ললিতা বসে থাকে নিঃশব্দে। ললিতা এক সময় বললো, কোনোদিন ওর ভুল হয় না, অথচ আজ যে কেন ঠাণ্ডা জলে চান করলো।! হেমকান্তি বললো, একদিন ঠাণ্ডা জলে চান করলেই ওরকম জ্বর হবে তার কোনো মানে নেই। অসুখ কেন হয়, তা কেউ জানে না! ফুড পয়জন হয় নি তো?

—তাহলে তো তিনজনেরই হতে পারতো। একই খাবার—

—তা ঠিক। অনেক সময় হঠাৎ একজনেরও হয়—

—ঠাকুরপো, তুমি তো ওঁকে অনেকদিন জানো, এরকম হঠাৎ এত জ্বর ওঁর আগে কখনো হয়েছে?

—এরকম তো কখনো দেখিনি। অবশ্য এটাও এমন কিছু না, ডাক্তার তো বললোই, দু একদিনে সেরে যাবে—

—তবু, কেন যে এরকম হলো—

ঘণ্টা চারেক ছটফট করার পর হীরেন খানিকটা আচ্ছন্নের মতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ওর মুখখানা ভারি করুণ আর অসহায় দেখায়। ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে ওর মুখখানা কুঁচকে আসছে। এতক্ষণ টানা উৎকণ্ঠার মধ্যে থেকে ললিতা আর হেমকান্তির মুখও শুকিয়ে এসেছে। ললিতার আর খাওয়া-দাওয়া করার কোনো ইচ্ছেই নেই, হীরেনের শিয়র ছেড়ে সে আর উঠলোই না। খানিকক্ষণ বাদে হেমকান্তিও নিজের ঘরে চলে গেল।

হীরেনের ঘুম ভাঙলো মাঝরাত্তিরের দিকে। তখনও গায়ে বেশ জ্বর, বুকে ব্যথা। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে হাত বাড়িয়ে হীরেন ডাকলো,—লতু! লতু! মশারি গুঁজে এতক্ষণ বসেই ছিল ললিতা, কোন এক সময় ঘুমের মধ্যে এক পাশে লুটিয়ে পড়েছে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি জেগে উঠলো, হীরেনের মুখের কাছে মুখ এনে বললো,—এখন কেমন আছো? ভাল লাগছে একটু? ইস, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে এখনো।

হীরেন ক্লিষ্ট স্বরে বললো—লতু, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

ললিতা জিজ্ঞেস করলো,—কোথায়?

—তা ঠিক জানি না, দম আটকে আসছে যেন মনে হচ্ছে।

—ডাক্তার এসেছিলেন, বলেছেন, ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একটু ঘুমোও।

হীরেন একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর কি ভেবে আবার ছটফট করে উঠে বলে,—লতু! লতু! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আর পারছি না, যদি মরে যাই—

—ওকি অলুক্ষুণে কথা! চুপ! না-না-কিছু হয় নি তোমার—

ললিতা প্রায় হাহাকার করে। জোর করে একহাতে হীরেনের মুখ চাপা দেয়। অন্য এক হাতে হীরেনের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হীরেন একটু শান্ত হয়ে মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আঃ, এখন আরাম লাগছে। আগে হাত বুলিয়ে দাওনি কেন?

—দিচ্ছি তো, অনেকক্ষণ থেকে। এখন কম লাগছে?

—অনেক কম লাগছে। হঠাৎ আমার এমন অসুখ হলো কেন বলো তো?

—কি জানি!

হীরেন একটা অনেক বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হঠাৎ ওর চোখ ভিজে এলো। পাশ ফিরে ললিতার জানু দুটো চেপে ধরে বললো,—না, মরবো কেন? এমনি বলছিলাম, যদি হঠাৎ মরে যাই।

—আবার ওই কথা? তুমি চুপ করে ঘুমোও বলছি।

—লতু, তোমায় আমি কতটা যে সত্যি ভালোবাসি, তুমি জানো?

—জানি।

—তোমায় যদি একটা কথা বলি, তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে?

—কি কথা?

—লতু, কথা দাও আগে, সে কথা শুনেও আমায় তুমি ভালোবাসবে?

ললিতা সমস্ত শরীর নিয়ে হীরেনের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। ভয় পাওয়া গলায় বলে, ওকি, তুমি ওরকম করছো কেন? তোমার ঠোঁট কাঁপছে। আজ আর কিছু বলতে হবে না—কাল বলো—

—না, কথা দাও, সে কথা শুনেও—

—কথা দিচ্ছি। তুমি তো জানোই, তোমায় আমি চিরদিনই ভালোবাসবো।

—না, আজ সকাল থেকে একটা কথা মনে পড়ে এমন মন খারাপ লাগছে। আমি একবার খুব অন্যায় করেছিলুম, ওঃ! জানো লতু, অরুণা বলে একটা মেয়েকে আমি একবার জোর করে চুমু খেয়েছিলাম। তার একটুও ইচ্ছে ছিল না, সে আমায় পছন্দ করতো না, তবু আমি গায়ের জোরে, জন্তুর মতন, ওঃ, আমার জন্যই মেয়েটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। একথা শুনেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে বলো? বলো?

হঠাৎ দু হাতে মুখ চাপা দিয়ে হীরেন শিশুর মতন কাঁদতে শুরু করে।

স্বর্গ দর্শন

মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। মাথার ওপরে শুধু আকাশ। এতবড় আকাশের নিচে মানুষের নিঃসঙ্গতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পথে পড়ে আছে তাঁর চার ভাই ও স্ত্রীর মৃতদেহ। যুধিষ্ঠির আর পেছন ফিরে তাকালেন না। সঙ্গের কুকুরটি একটু ছটফট করছে। তিনি তাঁর কাঁধের ঝুলি থেকে এক টুকরো পিষ্টকখণ্ড তাকে দিয়ে বললেন, দাঁড়া, আর একটু অপেক্ষা কর।

একটু বাদেই আকাশে থেকে অগ্নিময় শকট নেমে এল। তার থেকে একজন নভোচারী বেরিয়ে আসতেই যুধিষ্ঠির হাঁটু মুড়ে অভিবাদন জানালেন। নভোচারী বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি পৃথিবীর সামান্য মানুষ হলেও তোমার ধৈর্য ও শুভবোধের জন্য তোমাকে আমরা সশরীরে নক্ষত্রলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছি। এসো—!

যুধিষ্ঠির বললেন, আগে এই কুকুরটিকে ভেতরে নিয়ে যান।

নভোচারী একটু অবাক হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, এই সারমেয়টিকে? কেন?

যুধিষ্ঠির নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, সেটাই আমার অভিপ্রায়।

একটুক্ষণ চিন্তা করে নভোচারী হাসলেন। তারপর বললেন, বুঝেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান তুমি আগে পরীক্ষা করে দেখতে চাও যে আমাদের এই নক্ষত্রযান পৃথিবীর প্রাণীদের উপযোগী কিনা। তোমার আগে জীবিত অবস্থায় কেউ এই যানে চড়ে নি। সেইজন্যই এত দূরের পথ কুকুরটাকে সঙ্গে করে এনেছ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমার সন্দেহ নিরসনের জন্যই ওকে এনেছি। ও যাতে মাঝপথ থেকে চলে না যায়, সেইজন্য মাঝে মাঝে ওকে এক টুকরো করে পিষ্টকখণ্ড ছুঁড়ে দিতে হয়েছে।

নভোচারী আর বাক্যব্যয় না করে কুকুরটিকে নিয়ে যানে চড়লেন এবং মহাশূন্যে উড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

একদণ্ড পর যানটি ফিরে এল, কুকুরটি তার থেকে বেরিয়ে এল লেজ নাড়তে নাড়তে। যুধিষ্ঠির তাঁর ঝুলির বাকি পিষ্টকখণ্ডগুলি সবই কুকুরটিকে দিয়ে বললেন, যাঃ। তুই অনেক উপকার করেছিস আমার। আমি বর দিলাম, এখন থেকে কুকুর মানুষের পোষ্য হবে।

নভোচারী যুধিষ্ঠিরের মাথায় স্বচ্ছ হেলমেট পরিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?

যুধিষ্ঠির বললেন, না।

—তাহলে এস।

যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে স্বর্গীয় রথ উড়ে চলল। যুধিষ্ঠির শেষবারের মতন তাকালেন পৃথিবীর দিকে। তাঁর বুক একটু টনটন করতে লাগল। যদিও আত্মীয়-পরিজন আর কেউই প্রায় বেঁচে নেই, তবু এই পৃথিবী বড় প্রিয় জায়গা ছিল।

নভোচারী বললেন, তুমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পার। আমাদের পৌঁছতে দেরি হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, বাইরের এই শোভা তো আর দেখতে পাব না। শুধু শুধু ঘুমিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন?

—তা ঠিক। বৎস, তুমিই এই পৃথিবীর প্রথম নভোচারী। তোমার আগে কারুকে আমরা এই সুযোগ দিই নি। তোমার কীর্তির জন্যই আমরা আর তোমাকে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে দিই নি। তোমার ভয় করছে না?

—ভয়? কেন, ভয় করবে কেন?

—হাজার হোক, আমাদের স্বর্গ নামক গ্রহটি তোমার অচেনা।

—অচেনা হবে কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই সেখানে গেছেন, তাঁরা স্বর্গের গুণকীর্তন করেছেন। আমি সারাজীবন নিজেকে বহুভাবে বঞ্চিত করেও ধর্মপালন করে গেছি স্বর্গে আসবার জন্য। সেখানে যেতে ভয় পাব কেন?

—ভাল কথা! দেখা যাক!

—আপনি আমাকে প্রথম নভোচারীর সম্মান দিলেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা পুরুরবাও স্বর্গে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এরকম আরও কারুর কারুর কথা জানি।

—অনেক ওরকম মিথ্যে গল্প করে। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে আগে আনা হয় নি। তোমাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। প্রশ্নটা অতি জটিল, তুমি সব বুঝবে না। তবু সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি। শরীরটা হচ্ছে একটা বস্তু আর প্রাণ হচ্ছে শক্তি। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা কিংবা শক্তিকে বস্তুতে—এ কৌশল আমরা জানি, পৃথিবীর মানুষ এখনও জানে না। আমরা পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পর প্রাণগুলো ওপরে নিয়ে আসি। আবার বস্তুতে রূপান্তর করলেই তারা শরীর ফিরে পায়। তার আগে আমরা তাদের লোভ, মোহ, হিংসা ইত্যাদি পৃথিবীর বাজে স্বভাবগুলো মুছে দিই। এখন চেষ্টা হচ্ছে, মৃত্যু-টৃত্যুর ঝামেলা না করে যদি তোমার মতন এরকম সশরীরেই নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেও ওই লোভ, মোহ ও হিংসা-টিংস্যগুলো মুছে ফেলা যায় কিনা।

যুধিষ্ঠির একটু দুঃখিত হলেন। তারপর হঠাৎ অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন, হে দেব, পৃথিবীতে থাকার সময়েও আমার চরিত্রে কেউ কখনও লোভ, মোহ, মাৎসর্যের চিহ্নমাত্র দেখে নি।

—সেজন্যই তো তোমাকে বাছা হয়েছে। তবে তুমি যতটা নিজেকে দোষ-শূন্য ভাবছ, ততটা নয়। পৃথিবী গ্রহটারই কিছু দোষ আছে, তা তোমাকে স্পর্শ করবেই। আমি তো পারতপক্ষে এখানে বেড়াতে আসতেই চাই না। বিষ্ণু মাঝে মাঝে আসেন বটে। পৃথিবীর খর্বকায় মেয়েদের তাঁর খুব পছন্দ। বেছে বেছে প্রত্যেকবার কি রকম খর্বকায় সুন্দরীদের বিয়ে করেছেন, দেখেছ?

দেবতাদের লীলা বিষয়ে যুধিষ্ঠির কোনো মন্তব্য করলেন না। মুখ নিচু করে রইলেন।

মহাশূন্যযানের গতি কমে এসেছে। নভোচারী বললেন, শিগগিরই আমরা নরক নামে একটা উপগ্রহে থামব একটুক্ষণের জন্যে। দেখো, ওখানেই যেন থেকে যেতে চেও না। অনেকে আবার ওই জায়গাটাই বেশি পছন্দ করে।

যুধিষ্ঠির সেখানে যান থেকে নামলেনই না। এবং চোখ বুজে রইলেন। তবু অসংখ্য মানুষের চিৎকার ও ডাকে তাঁর কানে প্রায় তালা লাগবার উপক্রম। তিনি দুহাত দিয়ে কানও চেপে রইলেন।

নরক থেকে স্বর্গ অতি অল্পক্ষণের পথ। স্বর্গে পৌঁছবার পর নভোচারী বললেন, আমার কর্তব্য এখানেই শেষ। এরপর অন্য বিশেষজ্ঞরা তোমার ভার নেবেন, তা আজ আর কিছু হবে না বোধহয়। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার, আর এও শুনে রাখ এখানে যে কোনো গৃহই তোমার বাসগৃহ, প্রত্যেক জায়গাতেই খাদ্য আছে, কোনো খাদ্য বা পানীয়ই অপরের নয়, যে কোনো নারীকেও তুমি তোমার বল্লভা হবার জন্য আবেদন জানাতে পার।

যুধিষ্ঠির নেমে রকেট স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। যখন নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, তখন রাস্তা হারাবারও কোনো ভয় নেই। এখানে সব কটি পথই সোজা, জটিল গলি-ঘুঁজির অস্তিত্ব নেই, দুপাশে সারি সারি গাছ, তবে তাদের পাতা সবুজ নয়, নীল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন নীল রং দেবতাদের এত প্রিয়। চতুর্দিকেই নীলের সমারোহ। যুধিষ্ঠিরের চোখ সবুজ দেখা অভ্যেস বলে একটু একটু পীড়িত বোধ করছিল।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যই যুধিষ্ঠির বেশি ব্যগ্র হয়েছিলেন। বিশেষত তিনি দেখা করতে চান পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে। যে-কোনো সংকটে তিনি পিতামহের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। স্বর্গের হাল-চালও পিতামহের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া ভাল।

কিন্তু অদূরেই তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিশাল গাছের নিচে পাথরের লম্বা আসনে বসে আছে দুর্যোধন এবং কর্ণ। যুধিষ্ঠির একটু চমকে উঠলেন। সামান্য বিষাদও অনুভব করলেন। এরা আগে থেকেই এসে স্বর্গসুখ ভোগ করছে? তাঁর আপন ভাইরা এবং পরম আদরণীয়া দ্রৌপদী এখনও এসে পৌঁছয় নি।

ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়নি। যুধিষ্ঠির ভাবলেন ওদের এড়িয়ে রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে চলে যাবেন। তারপরই চমকে উঠলেন। তিনি কি ওদের ভয় পাচ্ছেন? না ঈর্ষা? কেউ টের পায় নি তো?

তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে এসে কর্ণকে প্রণাম করলেন এবং দুর্যোধনকে স্নেহ সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, তোমার উরুর ব্যথা সেরেছে তো?

ওরা দুজনেই একটু চমকে উঠেছিলেন প্রথমে। তারপর দুর্যোধন বললেন, কে ধর্মরাজ, এসে গেছ? বাঃ বাঃ। না, ব্যথা-ট্যথা আর কিছু নেই। এখানে ওসব কিছু থাকে না। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা।

কর্ণ নীরব। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠিরের বুক দুর দুর করছে। যদিও কর্ণ তাঁর আপন সহোদর দাদা, তবু এ পর্যন্ত তিনি কখনো ওঁর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলেন নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ একবার

তাঁকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য যুধিষ্ঠির জানতেন না যে কর্ণ তাঁর দাদা হন। অনেক কটুভাষা করেছেন কর্ণের উদ্দেশে তখন।

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে কর্ণের পাদবন্দনা করে বললেন, হে জ্যেষ্ঠ, আপনার কুশল তো?

কর্ণ দুর্বিনীত এবং কর্কশভাষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল। তিনি যুধিষ্ঠিরের মস্তকের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, হে অনুজ, তোমাকে দেখে আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছি। তুমি পৃথিবীর গৌরব ছিলে এবং এই স্বর্গভূমি তোমাকে পেয়ে গৌরবান্বিত হল।

দুর্যোধন জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মরাজ, তুমি খেয়েছ-টেয়েছ তো? বেরিয়েছ তো সেই কবে! তার ওপর আবার পাহাড় ভেঙে এসেছ। আমরা টেলিভিশনে তোমাদের পাহাড় চড়া দেখছিলাম।

কর্ণ ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ওই দিকে পান্থশালা আছে, তুমি ভোজন সেরে নিতে পার।

দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে বললেন, যা খুশি খেতে পার। এমন রান্না কখনও খাও নি। দাম-টাম কিছু দিতে হবে না।

কর্ণ বললেন, ভাই, পাহাড়-ভাঙার পরিশ্রমে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। যে-কোনো ভবনে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পার।

দুর্যোধন বললেন, পা টিপে দেবার জন্য কিংবা সম্ভোগের জন্য যদি কোনো নারী চাও, দূরভাষণীতে শুধু কার্যালয়ে জানিয়ে দিও। যাকে ইচ্ছে, তাকেই পাবে।

কর্ণ মৃদুহাস্যে বললেন, শুধু উর্বশীকে চেও না। যদিও তিনি চিরযৌবনা এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—কিন্তু সূর্যবংশের কেউ ওঁকে পাবে না। উনি দাবি করেন, উনি আমাদের সকলের দিদিমা। কারণ সূর্যবংশের পূর্বপুরুষ পুরুরবার উনি বউ ছিলেন কিছুদিন। যুধিষ্ঠির ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নন। নারী-সঙ্গের জন্যও উন্মুখ নন। তিনি চান আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পেতে।

তিনি বললেন, আপনারা বসুন, আমি আগে একবার পিতামহের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুর্যোধন বললেন, তা যাও। পিতামহ বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এখানে আর তাঁকে জিতেন্দ্রিয় থাকতে হবে না। এখানে তো বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নেই, বাচ্চা-টাচ্চাও হয় না, তাই ওনাকে আর প্রতিজ্ঞা মানতে হবে না।

—পিতামহকে কোথায় পাব?

—খুঁজে দেখ, পেয়ে যাবে। আমরা এখানে বসে আছি, কারণ শুনছি আজই যাজ্ঞসেনী আসবেন। তাঁকে দেখব বলেই তো...

যুধিষ্ঠির চমকে উঠলেন। দ্রৌপদী আসবেন! তা তো ঠিকই। মধুরহাসিনী দ্রুপদ-তনয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে আসবার অধিকারিণী।

দুর্যোধন বললেন, অন্য কেউ দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করার আগেই আমার আবেদনটা জানিয়ে রাখব। দ্রৌপদীকে পাওয়ার সাধ আমার বহুদিনের। জুয়া খেলায় ওকে তো জিতেই নিয়েছিলাম, তবু বাবার বকুনি খেয়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিতে হল। ওর জন্য এতবড় যুদ্ধটা করলাম। এখন আর মনে কোনো রাগ নেই। পরম রমণীয়া দ্রৌপদীকে আমি সপ্রেমে কোলে বসাব।

যুধিষ্ঠিরের মনে হল, তার সর্বাঙ্গে যেন ক্ষত, সেখানে কেউ নুনের ছিটে দিচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে হল ছুটে এখান থেকে চলে যান। চাই না স্বর্গ। দ্রৌপদীকেও তিনি পথে আটকাবেন।

দুর্যোধন আপন মনে অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্ণের দিকে চোখ পড়ায় থেমে গেলেন। লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলেন এবং কান মুললেন। তারপর বললেন, না, না, আমি প্রথম না, আমি দ্বিতীয়। দ্রৌপদীর ওপর সর্বাগ্রে অধিকার মহাত্মা কর্ণের। দ্রুপদ রাজার স্বয়ংবর সভায় আমরা কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারি নি বটে, কিন্তু মহাধনুর্ধর কর্ণের কাছে ও তো ছেলেখেলা! অর্জুনের অনেক আগেই কর্ণ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হল না। ইনি স্বয়ং সূর্যের পুত্র, রাজমাতা কুন্তী এঁর জননী, অর্থাৎ মহাক্ষত্রিয়, অথচ এঁকেই সূতপুত্র বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন। সেই মিথ্যের আজ অবসান হবে। স্বর্গে মিথ্যের কোনো স্থান নেই।

কর্ণ কোনো কথা না বলে মৃদু মৃদু হাসছেন। যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত, নির্বাক। তাঁর মস্তিষ্ক মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাবার মতন অবস্থা। যে দ্রৌপদীর জন্য তাঁরা পাঁচ ভাই এত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেই দ্রৌপদী আজ দুরাত্মা দুর্যোধনের অঙ্কশায়িনী হবে! এবং কর্ণ? দাদা হয়েও তিনি ছোটভাইদের স্ত্রীকে কামনা করবেন!

যুধিষ্ঠির আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দুএকটি শুকনো ভদ্রতার কথা বলে বিদায় নিলেন তাড়াতাড়ি। আর একটু হলে তাঁর ক্রোধের প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। কিংবা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা আজ আসবে না, সে এখনও মরে নি। মিথ্যে কথা! কিংবা পুরো মিথ্যে নয়, দ্রৌপদীর আর এক নাম কৃষ্ণা হলেও ওই নামে আরও অনেক নারী আছে

পৃথিবীতে। রথচালক বাহ্লিক-এর স্ত্রীর নামই তো কৃষ্ণা, সে এখনও বেঁচে। অর্থাৎ ইতি গজের মতন ব্যাপার। কিন্তু স্বর্গে এসেও মিথ্যের ছলনা!

যুধিষ্ঠির বেশি দূর যেতে পারলেন না। পিছন দিকটা তাঁকে চুম্বকের মতন টানছে। পিতামহ কিংবা অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পরে দেখা করলেও হবে। তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। দ্রৌপদীকে যদি আগে থেকে কোনোক্রমে সতর্ক করে দেওয়া যায়।

তাঁর খুব আশা হল, দ্রৌপদীর আগেই ভীম বা অর্জুন এসে পড়তে পারে। তখন দেখা যাবে! ভীমার্জুনের কাছ থেকে দ্রৌপদীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া দুর্যোধন-কর্ণের সাধ্য নয়! কিন্তু যদি ওরা আগে না আসে! অর্জুনটা তো আবার অতি ভদ্র কিনা! নরক থেকে স্বর্গে যখন রথ আসবে, তখন অর্জুন হয়তো বলবে, মহিলারই অগ্রাধিকার, দ্রৌপদীই আগে যাক!

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন, এটা তাঁর ঈর্ষা! প্রথমেই এরকম কঠিন পরীক্ষায় পড়বেন, তিনি ভাবতেই পারেন নি। শুধু ঈর্ষা নয়, স্বর্গে এসে তিনি যুদ্ধেরও চিন্তা করছেন। তিনি ভাবছেন দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করে আবার ভীমার্জুন আর দুর্যোধন-কর্ণের একটা লড়াই বাধাবেন। ছিঃ ছিঃ! আত্মগ্লানিতে যুধিষ্ঠিরের মন ভরে গেল। তিনি গাছতলায় বসে পড়ে চোখ বুজে চিত্তশুদ্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে দ্রৌপদীর মুখ। পাহাড়ি পথে চলতে চলতে দ্রৌপদী যখন ঢলে পড়েছিলেন, তখন তিনি তাকে তোলার চেষ্টা করেন নি। পাথরের ওপর সেই রাজনন্দিনীর কোমল তনু না জানি কত ব্যথা পেয়েছে! মৃত্যুর আগে দ্রৌপদী জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহারাজ, কোন্ পাপে আমি এইভাবে মৃত্যুবরণ করছি? তিনি বলেছিলেন, তোমার কাছে তোমার পাঁচ স্বামীই সমান, তবু তুমি অর্জুনকে বেশি ভালবাসতে!

এই কথাটা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে কি একটু শ্লেষ ফুটে উঠেছিল? তিনি বহুদিন ধরেই জানতেন যে দ্রৌপদী অর্জুনকেই বেশি ভালবাসে—তবু কোনো দিন মুখ ফুটে বলেন নি। এই জন্য তাঁর মনের মধ্যে একটা কাঁটা ছিল। তিনি কি এজন্য অর্জুনকেও হিংসে করতেন? না, না, না, তা হতেই পারে না! অর্জুন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে? না, দ্রৌপদীর চেয়ে বেশি নয়। দ্রৌপদীর মন পাবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গায়ের জোর বা বীরত্বের দিকেই দ্রৌপদীর ঝোঁক বেশি। মেয়েদের এই এক দোষ! তাঁর যে এত শাস্ত্রজ্ঞান, এত ধর্মবোধ—এসব দ্রৌপদী বেশি পাত্তাই দেয় নি কখনও। ব্যাসদেব যখন এসে বলেছিলেন, এক বউকে নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের যাতে মনোমালিন্য না হয় সেই জন্য তোমরা প্রত্যেকে একটা করে দিন ঠিক করে নাও, সেইদিন অন্য কেউ আর তার কাছে যাবে না—তখন যুধিষ্ঠির নিজের জন্য রবিবারটা ঠিক করে নিয়েছিলেন আগেই। রবিবারে কোনো রাজকার্য থাকে না, সারাদিন অখণ্ড অবসর। সারাদিন ধরে তিনি দ্রৌপদীকে পেতেন। অন্য ভাইদের অন্যান্য দিন শাসনকার্যের জন্য বেশ কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হতই। একবার তিনি যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে রতিক্রীড়া করছিলেন, তখন অর্জুন হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এজন্য অর্জুনকে এক বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল। তিনি তখন মুখে অনেকবার তাকে নিষেধ করলেও মনে মনে খুশি হয়েছিলেন একটু। সেই একটা বছর দ্রৌপদীকে বেশি করে পাওয়া গিয়েছিল।

হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের ঘোর ভেঙে গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাকিয়ে দেখলেন দূরে দ্রৌপদী আসছেন, একা। দুর্যোধন আর কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করছেন। যুধিষ্ঠির হাত নেড়ে দ্রৌপদীকে ইশারা করতে লাগলেন, যাতে তাড়াতাড়ি এইদিকে চলে আসে। কিন্তু দ্রৌপদী দেখতেই পেলেন না। দ্রৌপদী যেন আরও বেশি রূপসী হয়েছেন। বয়সের কোনো ছাপ নেই। চিক্কণ মসৃণ ত্বক। কোমর পর্যন্ত ছড়ানো চুল। সুগোল বর্তুল দুই স্তন। সিংহের মতন সরু কোমর। গুরু নিতম্ব। দ্রৌপদীর দাঁত এত সুন্দর যে হাসলেই মনে হয় যেন চারিদিকটা আলো হয়ে গেল। তাঁর ওষ্ঠ ও অধর পাকা আঙুর ফলের মতন।

যুধিষ্ঠির দেখলেন, কর্ণ ও দুর্যোধন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন দ্রৌপদীর দিকে। তিনি শুনতে পেলেন, কর্ণ বলছেন, হে বরবর্ণিনী, তোমার আগমনে সুরলোক ধন্য হল। আমরা তোমার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। হে সুন্দরী, তোমার রূপের ছটায় আমি বিমোহিত। তোমার তুল্যা মোহময়ী নারী আমি দুই জীবনে দেখে নি। দ্রৌপদী মধুর হাস্যে বললেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কথা আমার কানে সুধাবর্ষণ করছে। আপনার মতন তেজোদীপ্ত পুরুষের সামনে দাঁড়ালেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

দুর্যোধন বললেন, হে যাজ্ঞসেনী, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না নাকি? আমিও তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি যে—

দ্রৌপদী বললেন, হে সখা, তোমাকে দেখব না কেন? তোমার ওই সহাস্য সুন্দর মুখ কোনো নারী কি না দেখে থাকতে পারে?

যুধিষ্ঠির বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলেন। জন্ম-শত্রুদের সঙ্গে দ্রৌপদী এরকম আদুরে আদুরে ভাবে কথা বলছে কেন? সে কি ঘৃণাভরে ওদের এড়িয়ে চলে আসতে পারত না?

তারপরেই সেই নভোচারী দেবতার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রৌপদী—ওরা তিনজনেই মৃত্যুর পর স্বর্গে এসেছে। তাই শরীর থেকে রাগ, হিংসা, দ্বেষ সব মুছে দেওয়া হয়েছে। চিরকালের আনন্দ ও সম্ভোগসুখেই ওরা নিমজ্জিত থাকবে শুধু।

দুর্যোধন বললেন, হে দ্রুপদ-নন্দিনী, তোমাকে দেখে আমরা অধীর হয়েছি। রাজসভায় তোমাকে একদিন আমার ঊরু প্রদর্শন করে বলেছিলাম, তোমাকে এইখানে এসে বসতে হবে। কিন্তু তখন সে কার্যে সক্ষম হই নি। কিন্তু তখন থেকেই আমার সেই বাসনা রয়ে গেছে। এবার কি তুমি একবার সেখানে এসে বসবে?

দ্রৌপদী বললেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। এখনি!

দুর্যোধন বললেন, এখনি নয়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণও তোমার প্রার্থী। এবং একথা কে না জানে, তোমার প্রতি কর্ণের প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। তুমি যতকাল ইচ্ছা কর্ণের সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ কর—আমি প্রতিক্ষায় থাকব। স্বর্গে কোনো নারীই উচ্ছিষ্টা নয়। এখানে অমৃত এবং নারী সমতুল্য।

দ্রৌপদী কর্ণের দিকে ফিরে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন, হে সূর্যপুত্র, এই দেখুন, আপনার সন্দর্শনেই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমি বহুকাল ধরেই মনে মনে আপনাকে কামনা করেছি। আপনি আমাকে ধন্য করুন।

দ্রৌপদী নিজেই কর্ণের প্রশস্ত বক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজের বক্ষদ্বয় কর্ণের শরীরে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে ব্যগ্র মুখখানি তুললেন ওপরের দিকে। তারপর তাঁর পাকা আঙুরের মতন অধর ডুবে গেল কর্ণের ওষ্ঠের মধ্যে।

যুধিষ্ঠির আর দেখতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি চোখ ঢাকলেন। স্বর্গে এসে তাঁর এ-কি বিরাট পরাজয় হল। তিনি পারলেন না। ক্রোধে কম্পিত হচ্ছে তাঁর শরীর, বুকের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছে হিংসা। দেবতারা কি এই অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলেছেন? দেখুক।

নিতান্ত পৃথিবীর মানুষের মতন যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়ে টপ টপ করে কান্না ঝরে পড়তে লাগল।

স্বপ্নের একটি মুখ

ছেলেটিকে একটু বেশি রূঢ় কথাই বলে ফেলেছিলেন নবজীবন চৌধুরী। তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন নি।

চাকরি আর চাকরি, এ ছাড়া বাঙালি ছোকরারা আর কিছু জানে না! প্রত্যেক দিন সকালবেলা বারবার এই কথা শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে যায়। পৃথিবীটা কোন দিকে যাচ্ছে? যুবকদের মধ্যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, নতুন কিছু করার প্রেরণা নেই, কোনো রকম বি এ পাস করে, তাও আজকাল পাস করা খুব সোজা, তেমন ইংরিজি শিখতে হয় না, টুকলি করারও ঢালাও ব্যবস্থা আছে, সেই রকম ভাবে পাস করেই চাকরির চেষ্টা। একে তাকে ধরাধরি, লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে জুতোর হাফ সোল ক্ষইয়ে ফেলা, তারপর কোনো ক্রমে একটা যে কোনো রকম কেরানিগিরি পেয়ে গেলেই সারা জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত। এরপর শুধু বিয়ে করা ও ছেলেপুলের জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

নবজীবন চৌধুরী আজ সঙ্গতিসম্পন্ন, সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, এক ডাকে দেশের মানুষ চেনে। দুএকটি ছেলেকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত কিছু নয়। কিন্তু দু একজনকে চাকরি দিয়ে কী আর নিস্তার আছে? দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার। প্রত্যেক দিন তাঁর কাছেই ডজন ডজন উমেদার আসে। তিনি তো আর চাকরির খনি নন। আর সকলেরই এক গল্প—বাবা রিটায়ার করেছে কিংবা মায়ের অসুখ কিংবা বোনের বিয়ে দিতে পারছে না—অসহ্য! একটা ছেলেও তো এসে বলে না, সে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে, সেটা বাজারে চালাতে চায় কিংবা পাহাড়ে উঠতে চায় কিংবা গ্রামে গিয়ে রাস্তা বানাবে। শুধু একটা কেরানিগিরি।

পরপর অনেকের সঙ্গে এ রকম কথা বলে নবজীবন চৌধুরীর মেজাজ গরম ছিল। প্রত্যেকদিন সকালবেলাই তিনি বাইরের লোকের জন্য কিছুটা সময় দেন। কিন্তু এরা কেউ বোঝে না যে তাঁর সময়ের দাম আছে। ছেলেটির রোগা লম্বা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, ধুতি আর একটা মলিন হাফ শার্ট পরা, কাঁধে ঝোলানো একটা থলে। এই সব চেহারার ছেলেদের গায়ে কাপড়কাচা সাবানের গন্ধ থাকে।

—বলো, কী ব্যাপার তোমার?

ছেলেটি চট করে কিছু কথা বলতে পারলো না। কানের পাশে একটা হাত নিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো। এরা কেউই সপ্রতিভভাবে পরিষ্কার করে কথা বলতে জানে না। ভিখিরির মতন কাঁচুমাচু হয়ে থাকে।

—বলো, কী ব্যাপার তোমার?

—স্যার, আমার একটা থাকার জায়গা, মানে কোথাও যদি কোনো রকমে একটা থাকার জায়গা পাই।

—থাকার জায়গা? —কেন, এখন কোথায় আছো, রাস্তায়?

—আজ্ঞে না, মাঠে। আমি গ্রামে থাকি, অনেক দূরে কলকাতায় একটা থাকার জায়গা পেলে—

—কলকাতায় কে তোমায় থাকার জায়গা দেবে? কেন দেবে? গ্রাম থেকে সবাই তো কলকাতায় এসে থাকতে চায়।

—না, মানে, যদি একটা চাকরি পাই, তাহলে নিজের খরচটা—

—বটে? আর রাজকন্যা চাই না?

—স্যার...

—থাকার জায়গা চাই, চাকরি চাই, সেই সঙ্গে একটি রাজকন্যা পেলে তো আরও ভালো হয়। এজন্য আমার কাছে এসেছো কেন?

—স্যার, আপনার অনেক নাম শুনেছি, আপনি অনেকের জন্য অনেক কিছু...

সেই সময় নবজীবন চৌধুরী আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরোও। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। তোমাদের লজ্জা করে না? আমি তোমাদের জন্য সব কিছু করে দেবো? কেন? নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোনো চেষ্টা নেই, কোনো ঝুঁকি নেবার সাহস নেই, যাও, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও।

—স্যার!

—যাও, দূর হয়ে যাও! থাকার জায়গা, চাকরি, সব অন্য লোক জোগাড় করে দেবে? যাও, বেরিয়ে যাও!

ছেলেটি মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। নবজীবন চৌধুরী এত রেগে গিয়েছিলেন যে ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দারোয়ান ডাকতেন। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে তাঁর। এরকম হঠাৎ রেগে ওঠা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ। উঁচু ব্লাড প্রেসার আছে তাঁর। সেইজন্যই বোধ হয় আকস্মিক ভাবে রাগ বেড়ে যায়।

মিনিট দুএক বাদে ছেলেটি আবার ফিরে এলো। টেবিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললো, স্যার—

নবজীবন চৌধুরী মুখ তুললেন। ততক্ষণে আত্মসংযমে রাগটা কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন।

—আবার কী চাই! বললাম না, আমি কিছু করতে পারবো না?

ছেলেটি তার কাঁধে ঝুলানো থলি থেকে একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট বার করে বললো, স্যার, আপনার জন্য...ইয়ে, মানে, একটা বই এনেছিলাম...

অনেকেই তাঁকে খুশি করার জন্য কিছু কিছু জিনিস আনে। নবজীবন চৌধুরী প্রত্যেকটি জিনিস ফিরিয়ে দেন। ওসব জিনিস রাখা মানেই বাড়িতে আবর্জনা জমিয়ে তোলা। কিন্তু এই জিনিসটা ফেরত দেওয়া যায় না।

এ রকম বই কেউ কেউ তাঁকে দেয়। বেকার ছেলে ছোকরাদের মধ্যে অনেকেই কবিতা লেখে। এই কাব্যি রোগটার জন্য দেশটা গেল। আইন করে এসব বেকার ছোকরাদের কবিতা লেখা বন্ধ করা দরকার। শুধু শুধু কাগজের অপচয়। এই কাব্যি রোগের জন্যই যুবকদের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। রবিঠাকুর যে কী ক্ষতিই করে গেছেন দেশের!

তবু কেউ নিজের লেখা বই উপহার দিতে এলে প্রত্যাখান করা সভ্যতার নিয়ম নয়। রাগটা খানিকটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, কী বই? তুমি লিখেছো?

ছেলেটি বললো, না স্যার, বইটা বোধহয় আপনারই—

—আমার বই? কিসের বই?

তিনি বিস্মিতভাবে হাত বাড়ালেন। ব্রাউন প্যাকেটা খুলে ফেললেন তক্ষুণি। একটা অতি পুরোনো ইংরিজি বই, পাতাগুলো আলগা হয়ে এসেছে। পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি। ইংরেজি কবিতার সংকলন।

—এ বই দিয়ে আমি কী করবো?

—স্যার, বইটা আপনার নয়? আমি ভাবলাম...

প্রথম পাতা উল্টে দেখা গেল বিবর্ণ সবুজ কালিতে নাম লেখা : নবজীবন চৌধুরী, মেট্রোপলিটান কলেজ, থার্ড ইয়ার, বি এ ক্লাস। রোল সেভেন। ১৯২৭। বইটির ফ্লাইলিফে, নানান পাতায় আরও অসংখ্য হিজিবিজি লেখা।

নবজীবন চৌধুরী ভুরু কুঁচকে রইলেন। হাতের লেখাটা তাঁরই মনে হচ্ছে। যদিও তাঁর এখনকার হাতের লেখার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। সাল তারিখ মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, হ্যাঁ, ওই সময়ে তিনি কলেজে পড়তেন বটে। কবেকার কথা!

—এ বই নিয়ে আমি কি করবো?

ছেলেটি সঙ্কুচিতভাবে বললো, একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে পেলাম, মনে হলো আপনারই বই, তাই ভাবলাম, যদি আপনার...

নবজীবন চৌধুরী ভাবলেন, যাই হোক। এনেছে যখন থাক। বাড়িতে বইপত্তর রাখার আর জায়গাই নেই যদিও।

—কত দাম?

—না, না, স্যার সে কিছু না।

নবজীবন চৌধুরী আবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ছেলেটা এই একখানা বই জোগাড় করে এনে ভেবেছে, তিনি এতে খুশি হয়ে উঠবেন আর টপ করে একটা চাকরি দিয়ে দেবেন। চাকরি অত সোজা নয়।

তিনি রুক্ষ গলায় বললেন, তুমি তো বইটা কিনে এনেছো। দামটা নিয়ে যাও। কত দাম?

—না, স্যার, দাম চাই না। ফুটপাথ থেকে কেনা, মাত্র বারো আনায়।

—তা হলেও তুমি পয়সা খরচ করবে কেন? তোমার নাম কী?

—অনিমেষ ভট্টাচার্য।

নবজীবন চৌধুরী পকেটে খুচরো পয়সা রাখেন না। বারো আনা পয়সা পাবেন কোথায় এখন? যদি চাকরের কাছে থাকে। তিনি হাঁক দিলেন, রঘু, রঘু! ছেলেটির মুখখানা তাঁর যেন চেনা মনে হচ্ছে। কোথাও দেখেছেন কি আগে? নামটা তো আগে কখনো শোনেননি।

ছেলেটি কিন্তু দাম নেবার জন্য দাঁড়ালো না। টপ করে নমস্কার করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে গেল।

নবজীবন চৌধুরী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আরে ছেলেটা গেল কোথায়?

তিনি এবার বেশ বিরক্ত হলেন। রঘু, এই রঘু! যাই হোক একটা বেকার ছেলের বারো আনাই বা তিনি খরচ করাবেন কেন? ছেলেটি কেন তাঁকে দিয়ে গেল বইটা? তিনি অত ধমক দেওয়া সত্ত্বেও। ছেলেটি কি তাঁকে বিদ্রূপ করতে চায়?

রঘু এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, কোথায় থাকিস? কখন থেকে ডাকছি। দ্যাখ তো একজন বাবু, রোগা মতন, ধুতিপরা, এই মাত্র বেরিয়ে গেল, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

রঘু ফিরে এসে বললো। কোনো বাবু তো নেই। চলে গেছেন।

অপ্রসন্ন মুখে তিনি বইটা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। দশটা বেজে গেছে, এবার তাঁকে স্নান করে, খেয়ে বেরুতে হবে। বইটা শোবার ঘরের টেবিলে রেখে তিনি ঢুকলেন বাথরুমে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পান মুখে দিয়ে ইজি চেয়ারে এলিয়ে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। ড্রাইভার গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করছে, তিনি আর এটুকু পরেই বেরুবেন, এই সময় তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। তিনি দুর্বল বোধ করলেন খুব।

বড় মেয়ে আর জামাইয়ের সঙ্গে স্ত্রী গেছেন নেপালে বেড়াতে। মেজ ছেলে বিলেতে। বড় ছেলের নিজেরই আলাদা বড় ব্যবসা, সে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। ছোট ছেলে দিল্লিতে। একমাত্র ছোট মেয়েটি এখন বাড়িতে আছে, বিয়ের পরও সে শ্বশুর বাড়ি যায় না।

তিনি ছোট মেয়েকে ডেকে বললেন, অফিসে একটা টেলিফোন করে দে। ম্যানেজারকে বল, এ বেলা আর আমি যাবো না। শরীরটা ভালো লাগছে না।

নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন তিনি। প্রেসারটা নিশ্চয়ই আবার খুব বেড়ে গেছে। সকালবেলা রাগারাগি করবার জন্যই বোধহয়। কেন যে ছেলেগুলো এমন বিরক্ত করে। সন্ধের দিকেও শরীরটা ঠিক না হলে ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। ঘন ঘন ডাক্তার ডাকা তিনি পছন্দ করেন না। এতে মনের জোর নষ্ট হয়ে যায়।

প্রেসারের ওষুধ খেয়ে খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকেও তাঁর ঘুম এলো না। একটা ছটফটানির মতন ভাব। একটু অন্যমনস্ক হওয়া দরকার। টেবিলের ওপর থেকে তিনি হাত বাড়িয়ে সেই বইটা তুলে নিলেন।

ছেলেটা বারো আনা পয়সা খরচ করেছে বইটার জন্য। বেকারের পয়সা। নবজীবন চৌধুরী কারুর কাছে ঋণী থাকতে চান না। যা বকুনি খেয়েছে, ছেলেটা কি আর আসবে?

বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন তিনি। থার্ড ইয়ার, উনিশ শো সাতাশ সাল। তার ঠিক এক বছর আগে বরিশালের বি এম কলেজ থেকে এফ এ পাস করে তিনি কলকাতায় এসেছেন। গ্রামের ছেলে, এখানে বিশেষ কাউকে চিনতেন না। বাঙাল বলে বন্ধুরা ক্ষেপাতো। থাকতেন মীর্জাপুরের একটা মেসে, চোদ্দ টাকা খরচ ছিল। বাবা মাসে মাসে কুড়ি টাকা পাঠাতেন, তার মধ্যেই কলেজের মাইনে, হাত খরচ, সব কিছু। এখনকার ছেলেরা জানে না। তাঁকেও বড় হবার জন্য কত স্ট্রাগল করতে হয়েছে।

বই কেনার শখ ছিল খুব, কিন্তু পয়সা জুটতো না। রেজাল্ট ভালো ছিল, তার জোরে একটা টিউশানি পেয়ে গেলেন। সেই সময়ই নিশ্চয় এই বইটা কেনা।

অনেক কবিতার লাইনের নিচেই সবুজ কালির দাগ। সেই সময় সবুজ কালি ব্যবহার করা ফ্যাসান ছিল। পেন ছিল না তাঁর, তিনি দোয়াত কলমে লিখতেন। কোনো পাতাতেই একটুও সাদা জায়গা খালি নেই। কত রকম মন্তব্য! এই একটা বদ স্বভাব ছিল তাঁর বইয়ের পাতায় হিজিবিজি লেখা।

এক জায়গায় তাঁরই হাতের লেখা, "Out of all your life give me but a single moment" ব্রাউনিং-এর না? হ্যাঁ, এখনো মনে আছে। তার পাশেই লেখা, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।" ইংরেজি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বাংলা কবিতার লাইন খুঁজে বার করাও ছিল তাঁর প্রিয় শখ।

"Oh leave me not in this eternal woe"—এই লাইনটা বারবার অনেক পাতায় লেখা। যেন কোনো ব্যক্তিগত দুঃখের ব্যাপার। হয়তো কিছু ছিল, সে সময় তো দুঃখকষ্টই ছিল জীবনের সঙ্গী। লাইনটা কীটসের। মনে পড়লো, এক সময় কীটসের জীবনী পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে ছিলেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েসে মারা গেছেন কীটস, ক্ষয়রোগে, প্রেমিকার অবহেলায়। কীটস ছিলেন নবজীবনের বন্ধু।

বইয়ের একেবারে শেষে সাত লাইনের একটা বাংলা পদ্য, তার নিচে নবজীবন চৌধুরীর নাম লেখা। কী সর্বনাশ, এটা তিনিই লিখেছিলেন নাকি? তাঁর এই রোগ ছিল? একটু একটু যেন মনে পড়ছে। তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে। তিনি ভাবের যে জোয়ার এনেছিলেন তাতে বাঙালি ছেলে মাত্রই গোঁফ গজাবার সময় কয়েক লাইন পদ্য লেখার চেষ্টা করেছে।

নবজীবন চৌধুরীর মুখে কুঞ্চন পড়লো। তিনি হাসছেন। কী ছেলেমানুষি দুঃসাহস! গোল্ডেন ট্রেজারির শেষ পৃষ্ঠায় তিনি নিজের হাতের লেখা কবিতা জুড়ে দিয়েছিলেন, যেন ওই অমর কবিদের সঙ্গে স্থান পাবার চেষ্টা। ভাগ্যিস এ রোগটা বেশিদিন থাকে নি।

তার লেখা ওই সাত লাইন কবিতার মধ্যে একটি লাইন, "তুমি আমার দিনের স্বপ্ন, তুমি রাতের মায়া।" মায়া কথাটার নিচে লাল কালির দাগ টানা, কেন? কেন? মায়া, মায়া, ওহ হো, সেই মায়া। মায়া মুখার্জি। যার জন্য তিনি জীবন পণ করেছিলেন।

বিডন স্ট্রিটে দুটি ছেলে মেয়েকে পড়াতেন তখন নবজীবন চৌধুরী। এম এ পরীক্ষার আগে টাকার দারুণ টানাটানি।

দেশে বাবা অসুখে পড়েছিলেন, টাকা পাঠাতে পারছিলেন না। তাঁর পড়াশুনাই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। সে সময় তিনি পাগলের মতন দু তিন জায়গায় টেলিফোন করতেন। বিডন স্ট্রিটের ওই বাড়িতে তাঁর ছাত্রদের দিদি ছিল মায়া। বড় সুন্দর মেয়েটি, টলটলে দুটি চোখ, একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মায়াও তখন কলেজে পড়তো, বুদ্ধি ছিল খুব মেয়েটির, কবিতা পড়ার ঝোঁক ছিলও খুব। সেই সূত্রেই ভাব হলো। তারপর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মনে পড়ছে যেন, একদিন কী একটা উপলক্ষে তিনি ওই বাড়ির ছাদে বসেছিলেন, ছাত্র দুটিও কাছেই ছিল, আর ছিল মায়া, সে জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যেই একটা বই খুলে কবিতা পড়ছিল। তা দেখে বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল নবজীবন চৌধুরীর। বোধ হয় মায়ার জন্যই তিনি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। একদিন মায়ার হাত ধরেছিলেন, গড়ের মাঠে, দুজনে আলাদা আলাদা বেড়াতে বেড়াতে...অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে যেন।

আই সি এস দেবপ্রসাদ তালুকদারের স্ত্রী মায়া তালুকদারের কী মনে আছে এসব কথা। মাঝে মাঝে দুএকটা পার্টিতে দেখা হয়েছে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে। শেষ দেখা হয়েছিল বছর সাতেক আগে। এখন দারুণ মোটা হয়েছে মায়া, বড়লোকের বউরা সাধারণত যে-রকম হয়। তবু মুখে সেই আগেকার সৌন্দর্যটুকু রয়ে গেছে।

এই বইটা তিনি মায়াকে পড়তে দিয়েছিলেন। তারপর কী মায়া আর সেটা ফেরত দিয়েছিল? মনে পড়ে না। বইটা পুরোনো বইয়ের দোকানে গেল কী করে? কে দিয়েছিল? কে জানে?

এম এতে ফার্স্টক্লাস পাবার পর তিনি একদিন সাহস করে মায়ার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মায়ার বাবা ছিলেন একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। এদিকে আবার বাড়িতে খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। রোজ পুজো-আচ্চা করতেন। নবজীবন চৌধুরীর কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই রোগা চেহারার গ্রামের ছেলেটি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়?

তিনি হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, ছিঃ! একথা তুমি বলতে পারলে? তোমার ওপর আমার ছেলেদের পড়ানোর ভার দিয়েছিলাম। আর এই তোমার বিশ্বাসের কাজ হলো? তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে—

—স্যার, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

—বিয়ে করতে চাও? কী যোগ্যতা আছে তোমার? তোমার চালচুলো ঠিক আছে?

—আমি শিগগির একটা চাকরি জোগাড় করে নেবো।

—চাকরি? কী চাকরি পাবে তুমি? তা ছাড়া, তুমি কি ব্রাহ্মণ? অব্রাহ্মণ হয়েও এতখানি সাহস...বেরোও, দূর হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—

মায়ার বাবা রাগে কাঁপছিলেন। নবজীবন আর একটু দেরি করলে তিনি বোধহয় গুলিই করে দিতেন। নবজীবন ক্ষুব্ধ, অপমানিত ভাবে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মায়ার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তারপর কতদিন তিনি ঘোরাঘুরি করেছেন ওই বাড়ির সামনে দিয়ে।

—খুকু, খুকু।

—কী বাবা, শরীর খারাপ লাগছে?

—শিগগির ডাক্তারকে খবর দে। আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে, ভালো করে নিশ্বাস নিতে পারছি না।

খুকু দৌড়ে চলে গেল টেলিফোন করতে। নবজীবন চৌধুরীর খুব ইচ্ছে করছে বাথরুমে যেতে কিন্তু এসময় একদম নড়াচড়া করা উচিত নয়। বই খসে পড়লো হাত থেকে। তিনি দু হাতে বুক চেপে ধরলেন। এবার কি এলো সে? এতদিন ধরে যার প্রতীক্ষা করছেন, সেই সব অসুখের রাজা—যার নাম হার্ট স্ট্রোক?

ব্যথাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা গায়ে। দুটো হাতও অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ঘোর লাগছে চোখে। ডাক্তার এসে পৌছানো পর্যন্ত নিশ্বাস রাখতে পারবেন তো? মাথার মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ করছে একটা নদীর ঢেউ। ঠিক জলের ওপর ছায়ার মতন চোখে ভেসে উঠছে এক একটা দৃশ্য। ময়দানে শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে, পাশে চিনে বাদামের ঠোঙা। চাকরির জন্য এর কাছে, ওর কাছে...মায়ার বিয়ে, শানাই বাজছে, আর নবজীবন ঘোরাঘুরি করছেন সামনের রাস্তা দিয়ে...।

—বাবা, বাবা।

তাঁর মেয়ে ডাকছে। কিন্তু গলার আওয়াজটা যেন আসছে বহুদূর থেকে। তিনি চোখ মেলে তাকাতে পারলেন না। উত্তর দিতেও আলস্য বোধ হলো।

—বাবা, ডাক্তারকে ফোন করেছি, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

নবজীবন চৌধুরী আর সে কথা শুনলেন না। তাঁর মাথার মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ করছে জলের ঢেউ। আর দৃশ্যের পর দৃশ্য। তিনি নেশাগ্রস্তের মতন সেই ছবিগুলো দেখছেন। কিন্তু একটি দৃশ্যই ঘুরে ঘুরে আসছে বারবার। মায়াদের বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে আসছেন, অপমানিত বিহ্বল মুখ...। মায়ার বাবা তাকে বলছেন, বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। তিনি চলে যাচ্ছেন, রোগা লম্বা চেহারা, হাতে-কাচা শার্ট আর ধুতি পরা তাঁর চব্বিশ বছরের মূর্তি।

কিন্তু নবজীবন চৌধুরী অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর সেই সময়কার চেহারা, এমনকি মুখখানি পর্যন্ত অবিকল অনিমেষ ভট্টাচার্যের মতন। সকালে যে এসে তাঁকে বইটা দিয়ে গেল।

পূজারী

কলিং বেলটা বেশ মিষ্টি ভাবে টুং টাং টুং টাং শব্দে বাজে।

সুপ্রিয়া একটি ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে গভীর ভাবে ডুবে ছিল, দুপুরবেলাটা এই সময় সে বিছানায় শুয়ে বই পড়ে, কিন্তু ঘুমোয় না। কলিং বেলের শব্দ শুনে সে শিয়রের কাছে ঘড়িটা দেখল। তিনটে বাজে। এই সময় তো কারুর আসবার কথা নয়।

অনেক সময় ফেরিওয়ালারা এসে বিরক্ত করে। কিন্তু দরজা না খোলা পর্যন্ত বেল বাজিয়েই যাবে। উপায় নেই, বই মুড়ে রেখে সুপ্রিয়াকে উঠতে হল।

সুপ্রিয়া খেয়াল করেনি, বাইরে কখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বারান্দায় অনেক জামা-কাপড় মেলা আছে, সেগুলো এক্ষুনি না তুললে একেবারে ভিজে যাবে। অথচ কলিং বেলটা বাজল তৃতীয়বার।

সুপ্রিয়া দৌড়ে গিয়ে আগে দরজাটা খুলল।

হাতে একটা ছাতা, ধুতির ওপর শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে শশধর। মুখে বিগলিত হাসি। সে বলল, অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম নাকি?

সুপ্রিয়া অবাক হবারও সময় পেল না। আপনি বসুন—বলেই সে ছুটে গেল বারান্দায়।

এর মধ্যেই জামা-কাপড়গুলো একটু একটু ভিজে গেছে। আকাশ কালো, বৃষ্টি আরও বাড়বে, তাই সুপ্রিয়া জামা-কাপড়গুলো তুলে ফেলাই ঠিক করল। ঘরের মধ্যে মেলে দিতে হবে। কাপড় তুলতে তুলতে সুপ্রিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। হঠাৎ এই সময় ওই লোকটা এসেছে কেন?

শশধর সুপ্রিয়ার স্বামী সিদ্ধার্থর বন্ধু। ঠিক বন্ধুও বলা যাবে না, এক সময় সিদ্ধার্থ আর শশধর একসঙ্গে স্কুলে পড়ত। তারপর দুজনের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু স্কুলের পুরোনো বন্ধুকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না সিদ্ধার্থ। রাস্তায় দেখা হলে দু-চারটে কথা বলে। সিদ্ধার্থর খুব তাস খেলার নেশা। ছুটির দিনে কোথাও না কোথাও তাস খেলতে যাবেই। মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতেও সে তাসের আসর বসায়। সেই রকমই দু-একটা তাস খেলার আসরে শশধরকে দেখেছে সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া আবার ভাবল, অফিসের দিনে দুপুরবেলা লোকটা কি মনে করেছে যে এখানে তাস খেলা চলছে? অদ্ভুত তো।

পরক্ষণেই তার মনে হল, লোকটা টাকা ধার চাইতে আসেনি তো? সিদ্ধার্থর কাছে যেন দু-একবার শুনেছে যে ওই লোকটার অবস্থা ভালো নয়। ওর চেহারা এবং পোশাকও সিদ্ধার্থর বন্ধু হিসেবে একেবারে বেমানান। সিদ্ধার্থর আর কোনো বন্ধু ধুতির ওপর শার্ট পরে রাস্তায় বেরোয় না। হাতে আবার একটা পুরোনো ছাতা।

কাপড়-টাপড়গুলো গুছিয়ে সুপ্রিয়া এলো বসবার ঘরে।

শশধর একটি পত্রিকার ছবি দেখছিল, সেটা নামিয়ে রেখে সে আবার ঠোঁটে বিগলিত হাসিটুকু এঁকে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, ছেলে কেমন আছে?

ছেলে? কেন?

শশধর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, পরশুদিন অজয়বাবুর বাড়ি থেকে সিদ্ধার্থ তাস খেলা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলো। বলল, ওর ছেলের জ্বর। আমি কালই আসব ভেবেছিলাম, হয়ে ওঠেনি। আজ এ পথ দিয়ে যাবার সময় মনে করলাম, আপনার ছেলেকে একবার দেখে যাই।

সুপ্রিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হঠাৎ কেউ এসে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেই বুক কেঁপে ওঠে। সে হেসে বলল, বাবলু! হ্যাঁ পরশু বিকেল থেকে ওর গা-টা একটু গরম গরম হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভেজে তো...কিন্তু কালই কমে গেছে...আজ তো বাবলু স্কুলে গেছে।

স্কুলে গেছে? দু-একদিন বিশ্রাম দিলে পারতেন। এই সময়টা ভালো না, বাচ্চাদের প্রায়ই জ্বর-জারি হচ্ছে শুনতে পাই।

ওরা কি আর এমনি বিছানায় শুয়ে থাকতে চায়। ছটফটে ছেলে, বাড়িতে থাকতেই চায় না।

না না, তবু সাবধান হওয়া ভালো। বুকে ঠান্ডা বসে গেলে অনেক ঝামেলা হতে পারে, এই তো আমার এক ভাগ্নে ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছে।

শশধরের কাছ থেকে সুপ্রিয়া এসব ব্যাপারে কোনো উপদেশ শুনতে চায় না। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ছেলের কি করে যত্ন নিতে হয় সে জানে। বন্ধুর ছেলের সাধারণ একটু জ্বর হলেই কেউ এমন দুপুরবেলা দেখতে আসে? অদ্ভুত!

শশধর এক পায়ের চটি থেকে পা বার করে অন্য পায়ের ওপরে উঠিয়ে বসল।

এই রে, লোকটা আরও অনেকক্ষণ বসবে নাকি? সুপ্রিয়ার মন টানছে রহস্য গল্পের বইটি।

কিছুদিন সিদ্ধার্থ মুম্বাইতে বদলি হয়েছিল। প্রায় বছর তিনেক। মুম্বাইয়ের বেশির ভাগ মেয়েই আজকাল বাড়ির মধ্যে শাড়ি পরে না। সেই থেকে সুপ্রিয়ারও অভ্যেস হয়ে গেছে, কলকাতাতেও সে বাড়িতে একটা লম্বা ঢোলা ম্যাক্সি পরে থাকে। এই গরমে, লোড শেডিং-এ শাড়ির চেয়ে ম্যাক্সি অনেক আরামের। বিশিষ্ট কোনো লোক এলে সুপ্রিয়া এর ওপর একটা মোটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি।

কোনো ফেরিওয়ালা-টেরিওয়ালা বেল দিয়েছে ভেবে সুপ্রিয়া ড্রেসিং গাউনটা না চাপিয়েই দরজা খুলেছিল। এখন তার একটু অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু এখন আবার ড্রেসিং গাউনটা পরে এলে এ লোকটা ভাবতে পারে, সে তাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে বলছে। তা ছাড়া এ তো আর বিশিষ্ট লোক নয়। চলে গেলেও কিছু যায় আসে না। সুপ্রিয়া চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে রইল।

শশধর সরাসরি সুপ্রিয়ার শরীর বা মুখের দিকে তাকায় না। লাজুক ভাবে মুখ নিচু করে আছে। সে আবার বলল, বৌদি, কখনো দরকার হলে বলবেন, আমার চেনা খুব ভালো ডাক্তার আছে, ডঃ জি. সি. দাস, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

সুপ্রিয়া বলল, আমার নিজের দাদা ডাক্তার।

ও, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। তবু বলে রাখলাম, যদি কখনো দরকার হয় ডঃ জি. সি. দাসকে আমি ডাকলে না বলতে পারে না কখনো।

সুপ্রিয়া বুঝল লোকটা নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। কে কোথাকার জি. সি. দাস তার ঠিক নেই। সুপ্রিয়ার দাদা নাম করা ডাক্তার। কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা তাঁকে চেনেন।

সুপ্রিয়ার একটুও ইচ্ছে করছে না লোকটার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু মুখের ওপর তো বলা যায় না, আপনি এখন চলে যান!

শশধর পকেট থেকে একটি কাগজের ঠোঙা বার করল। তার মধ্যে একটি লাল টুকটুকে আপেল। খুব সলজ্জ ভাবে সেটি টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনার ছেলের জন্য এনেছিলাম। ভাবলাম, জ্বর মুখে যদি ভালো লাগে।

সুপ্রিয়া হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। তার বাড়িতে সব সময় আপেল থাকে। বাবলু একদম খেতে চায় না। আজকালকার ছেলেরা ভালো জিনিস পছন্দ করে না, আপেল এক কামড় দিয়ে ফেলে দেবে, কিন্তু ফুচকাওয়ালা আসুক কিংবা ঝালমুড়ি অমনি গপাগপ করে খাবে।

এই লোকটা আপেল নিয়ে এসেছে, তাও একটা। মোটে একটা আপেল কেউ কারুর বাড়িতে নিয়ে যায়? তাছাড়া ওই লাল টুকটুকে আপেলগুলো ভীষণ টক হয়। লোকটা আপেলও চেনে না।

এ কি, আপনি আবার এসব আনতে গেছেন কেন?

এমনিই, ভাবলাম, খালি হাতে যাব। রেখে দিন, ওকে খেতে বলবেন।

সুপ্রিয়া আরও দু-একবার আপত্তি জানাল। কিন্তু কেউ ছোটদের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এলে তা জোর করে ফেরত দেওয়া যায় না।

এবার লোকটাকে কিছু একটা খেতে-টেতে বলা উচিত। সুপ্রিয়া দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। কাজের লোকটি ছুটি নেওয়ায় এমন মুশকিল হয়েছে। গতকাল তার ফেরার কথা ছিল, ফেরেনি। ওরা একদম কথা রাখে না।

ফ্রিজে মিষ্টি-টিষ্টি কিছুই নেই। থাকলে বড্ড ভালো হত। থাকবার মধ্যে আছে কিছু আপেল আর কলা। ও আপেল এনেছে, এখন ওকেও আপেল খেতে বলা যায় না। আপনি একটা কলা খাবেন? এ কথাও কি বলা যায়। ধুৎ।

বাধ্য হয়েই সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি চা খাবেন?

শশধর বলল, না, থাক। আপনার অসুবিধে হবে, এই অসময়ে।

না, অসুবিধে আর কি?

তাহলে খেতে পারি আপনার হাতের চা।

সুপ্রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। রহস্য গল্প পড়তে পড়তে উঠে আসা যে কি কষ্টকর। এখন আবার তাকে চা বানাতে হবে। বাড়িতে কফিও নেই। কফি চায়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি বানানো যেত।

গ্যাস স্টোভে গরম জল চাপিয়ে সুপ্রিয়া এবার ড্রেসিং গাউনটা পরে নিতে গেল। যতই এলেবেলে হোক, তবু একজন পুরুষ মানুষ তো, বেশিক্ষণ এই পাতলা ম্যাক্সিটা পরে সহজভাবে ঘোরাফেরা করা যায় না।

শশধরের চেহারা রোগা-পাতলা, মুখখানাও শুকনো, নাকের নিচে সরু গোঁফ। সে অধিকাংশ সময়ই মাটির দিকে চেয়ে থাকে, দু-একবার চকিতে সুপ্রিয়াকে দেখে নেয়। এখনো কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে অনেকে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে, ওই সুন্দরী মহিলাটি কে?

চা তৈরি হবার আগেই খুব ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। বারান্দার দরজাটা বন্ধ করার পরও খানিকটা জল গড়িয়ে এলো ভেতরে। বৃষ্টির ছাট লেগে লেগে দরজাটার অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। সুপ্রিয়া আপন মনেই বলল, এই এক ঝামেলা, যখন তখন বৃষ্টি আর অমনি ভেতরে জল আসবে!

শশধর উঠে গিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করল। তারপর বিজ্ঞ ভাবে বলল, খানিকটা অ্যালমুনিয়ামের পাত দরজার নিচের দিকে লাগিয়ে দিলে বৃষ্টি আটকাতে পারে। তাতে আর জল ঢুকবে না।

এই উপদেশ সুপ্রিয়াকে আরও দু-একজন দিয়েছে। এর বিরুদ্ধেও বলেছে কয়েকজন। সে চুপ করে রইল।

লাগাবেন অ্যালমুনিয়ামের পাত? আমি জোগাড় করে দিতে পারি।

তাতে কোনো লাভ হবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। আমি নিয়ে আসব। চেনা মিস্তিরিও আছে, সে-ই দেবে ঠিকঠাক করে।

নাঃ, দরকার নেই। দরজাটাই পাল্টে ফেলতে হবে।

পুরো দরজাটা পাল্টাবেন? কেন, আগে খানিকটা অ্যালমুনিয়ামের পাত লাগিয়ে দেখুন না? তাতে খরচ কম পড়বে—আমার চেনা আছে।

বসবার ঘরের দরজার খানিকটা অংশে অ্যালমুনিয়ামের পাত লাগালে যে বিচ্ছিরি দেখায়, তা বোঝবার ক্ষমতা নেই এই লোকটার।

সুপ্রিয়া দৃঢ় ভাবে বলল, না, দরজাটাই পাল্টাব ঠিক করে ফেলেছি।

মাত্র এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এলো সুপ্রিয়া।

শশধর জিজ্ঞেস করল, এ কি, আপনি খাবেন না?

না। আমি বেশি চা খাই না। আপনার বন্ধু ফিরলে ছটার সময় ওর সঙ্গে একসঙ্গে এক কাপ খাই।

সিদ্ধার্থ তো খুব চা খায়।

হ্যাঁ, ও খায়।

ইস, শুধু শুধু আমার জন্য আপনকে চা বানাতে হল কষ্ট করে।

না এতে কষ্টের কি আছে?

লোকটা বুঝি ভেবেছিল, সুপ্রিয়াও ওর সামনে চায়ের কাপ নিয়ে বসবে। তাতে ও আরও গল্প জমাবার সুযোগ পাবে। সুপ্রিয়া এ পর্যন্ত একবারও ওর সামনে বসেনি। এই ধরনের লোকদের সঙ্গে সুপ্রিয়ার গল্প করার মতন কিছুই নেই।

শশধর একটি সিগারেট ধরাল।

এই রে, আরও কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে! এই ধরনের লোকদের যে কি ভাবে বিদায় করা যায়, তা সুপ্রিয়া জানে না। এর চেয়ে আর কত বেশি ঠাণ্ডা ব্যবহার করবে।

আপনি নিজেই চা নিয়ে এলেন, আপনাদের সেই কাজের লোকটি কোথায়?

সে ছুটি নিয়েছে। এমন মুশকিলে পড়েছি।

ওরা ছুটি নিলে সহজে ফিরতে চায় না। কত দিনের জন্য গেছে?

বলেছিল সাত দিন, এই তো বারো দিন হয়ে গেল।

তাহলে দেখুন, ফেরে কিনা সন্দেহ।

ছেলেটা খুব বিশ্বাসী ছিল। এখন লোক পাওয়া এমন শক্ত।

আর কথা না বাড়িয়ে সুপ্রিয়া চলে গেল অন্য কোনো ঘরের জানলা দিয়ে জল ঢুকছে কিনা দেখতে।

শশধর উঠল বৃষ্টি ধরে যাবারও দশ মিনিট পরে। টেবিলের ওপর পড়ে রইল তার আনা টুকটুকে লাল রঙের আপেলটা। ওটা সুপ্রিয়া তার ঠিকে ঝিকে দিয়ে দেবে ঠিক করল। তারপর আবার সে ফিরে গেল ওর গল্পের বইয়ে।

রাত্রে সুপ্রিয়া তার স্বামীকে বলল, আজ দুপুরে তোমার এক বন্ধু এসেছিল।

কে?

ওই যে শশধর না কি যেন নাম?

সিদ্ধার্থ হাসতে আরম্ভ করল উঁচু গলায়।

হাসছ কেন?

আমি ভাবলুম আমার কোনো বন্ধু বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরবেলা আসছে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী থাকার বিপদ অনেক।

বাজে কথা বোলো না।

তাহলে শশা এবার তোমার ওপর ভর করবে মনে হচ্ছে।

তার মানে?

রমেন বলছিল, কিছুদিন ওর বাড়িতে ও যাতায়াত শুরু করেছিল শশা। রমেন যখন থাকে না, সেই সময় যায়। রমেনের বউ রত্না তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল। অথচ মজা কি জানো, শশা কক্ষনো কোথাও খারাপ ব্যবহার করে না, কোনো অসভ্যতা করে না, দুচোখ দিয়ে বিশ্রী ভাবে মেয়েদের শরীর চাটে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকে।

আজ দুপুরেও সেই রকম বসে ছিল!

ওই তো বললুম। আমরা স্কুলে ওকে বলতুম, শশা। শশা জিনিসটার কোনো গুণও নেই, দোষ নেই। ও ঠিক সেই রকম।

রত্না শেষ পর্যন্ত কি করল?

রত্না তোমার থেকে অনেক বেশি ভদ্র। রোজ দুপুরে ওকে চা করে খাওয়ায় বেচারির আবার দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস। রত্নাকে ছেড়ে এখন তোমার কাছে কেন এসেছে তা অবশ্য বুঝতে পারছি না।

একদিনই তো মোটে এসেছে। বাবলুকে দেখতে এসেছিল। তুমি পরশু বলেছিলে না বাবলুর জ্বর?

হ্যাঁ, তা বোধ হয় বলেছিলাম। আমাদের তাস খেলার আসরে ও চুপচাপ বসে থাকে। আজকাল তো ওকে খেলতে নেওয়া হয় না।

কেন, খেলতে নাও না কেন?

আমরা তো স্টেকে খেলি। ও পয়সা পাবে কোথায়?

উনি চাকরি-টাকরি করেন না?

করপোরেশানে কী যেন একটা সামান্য চাকরি করে। শুনেছি ওদের ডিপার্টমেন্টে খুব ঘুষের ব্যাপার আছে। তা শশধরটা এমনই অপদার্থ যে ঘুষও নিতে পারে না। শুধু ওই অফিসে কাজ করার একটা সুবিধে, যখন তখন বেরিয়ে পড়া যায়।

বাবলুর জন্য একটা আপেল এনেছিলেন।

ওরেব্ বাবা! পয়সা খরচ করেছে শশা? ও যে হাড়কিপটে। তা হলে খুব গুরুতর ব্যাপার বলতে হবে। তুমি এর মধ্যে খুব সেজেগুজে কোনো দিন বেরিয়ে ছিলে? আর সে সময় ও তোমায় দেখেছে?

ধ্যাৎ।

পরদিন দুপুরে লোডশেডিং। কলিং বেল বাজবে না। দরজায় আওয়াজ হচ্ছে ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

সুপ্রিয়া শিয়রের দিকে চেয়ে দেখল ঠিক তিনটে বাজে। উঠে এসে সে দরজার ম্যাজিক আই দিয়ে দেখল। কোনো সন্দেহ নেই, আজও শশধর এসেছে!

দরজা না খুললে তো ঠুক ঠুক করতেই থাকবে। আজ কোন্ ছুতোয় এসেছে লোকটা? শুধু যেন সেই জানার কৌতূহলেই দরজা খুলল সুপ্রিয়া।

আজও সেই একই পোশাক, হাতে ছাতা, মুখে বিগলিত হাসি।

আজও প্রথম কথাটি একই, অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম—

সুপ্রিয়া আজ আগেই মোটা হাউস কোটটা পরে শরীর ভালো করে ঢেকে নিয়েছে। সে কোনো কথা বলল না।

একটু দূরে দাঁড়ানো কাকে যেন ডেকে শশধর বলল, এই আয়, এদিকে আয়— দেখুন তো একে আপনার পছন্দ হয় কি না!

সুপ্রিয়া সবিস্ময়ে তাকাল। মলিন ধুতি ও গেঞ্জি পরা আর একটি লোক দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। —এ কে?

আমাদের অফিসের একজন বেয়ারার ভাই। সবে দেশ থেকে এসেছে, চাকরি খুঁজছে। তাই আমি ভাবলাম, আপনার এখানে নিয়ে আসি। আপনার রান্নার লোক নেই...একে দিয়ে কাজ চালানো যায়।

লোকটির চেহারা দেখে মনে হয় না সে কোনো দিন কোনো গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করেছে। কেমন যেন বুনো বুনো ভাব। গ্রামের দিকে কোনো নৌকোর মাঝি কিংবা মোষের পালের রাখাল হলেই যেন একে মানায়।

আমতা আমতা করে সুপ্রিয়া বলল, এ কি রান্না-বান্নার কাজ পারবে?

হ্যাঁ সব পারবে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না।

এই যে, তোমার নাম কী?

জীবনকৃষ্ণ দাস।

তুমি কোথাও রান্নার কাজ করেছ কখনও?

আজ্ঞে না।

সুপ্রিয়া শশধরের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তবে? শশধর সঙ্গে সঙ্গে বলল, কখনও করেনি বলে যে পারবে না তার তো কোনো মানে নেই। শিখিয়ে নিলে সবই পারবে। বৌদি, ভালো করে শেখালে বাঘকে দিয়েও হাল চাষ করানো যায়। ঠিক কি না?

শশধর বোধহয় সিদ্ধার্থের চেয়ে বয়েসে বড়ই হবে, অন্তত চেহারায় সেই রকম দেখায়। সে সুপ্রিয়াকে বৌদি বলে ডাকে বলে সুপ্রিয়ার বেশ অস্বস্তি হয়।

এই শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা সুপ্রিয়ার ঠিক পছন্দ নয়। ঝি, চাকর, রান্নার লোককে অনেক চেষ্টায় কাজ-টাজ ঠিক মতন শেখালে তারপর সে একদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। তখন রাগ ধরে দারুণ। তার চেয়ে বাবা তৈরি লোক নেওয়াই ভালো।

শশধর সেই লোকটিকে বলল, তুই একটু বাইরে বোস।

তারপর সুপ্রিয়াকে বলল, ভেতরে চলুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুপ্রিয়া এতক্ষণ শশধরকে ভেতরে আসতে বলেনি। কথাবার্তা সব হচ্ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে।

ভেতরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল শশধর। তারপর যেন একটা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, মাইনে দিতে হবে খুব কম। এমন কি প্রথম মাসে কিছু না দিলেও চলবে!

সুপ্রিয়া হেসে ফেলল।

শশধর বলল, হ্যাঁ, ও কিছু চাইবে না। ওর তো এখন খাওয়া থাকারই জায়গা নেই।

আজকাল কোনো লোককে মাইনে না দিয়ে কাজ করানো যায়?

আমি বলছি বৌদি, ও বর্তে যাবে। এমন ভালো বাড়িতে থাকবে—

শশধর চেয়ার টেনে বসল। এবার বোধ হয় সে চায়ের আশা করবে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে বলল, আমার এখন লোক দরকার নেই।

শশধরের কণ্ঠে থেকে বেরিয়ে এলো, অ্যাঁ!

আমি এখন লোক রাখব না।

আপনার লোক নেই, আপনার এত অসুবিধা হচ্ছে—

শুনুন, আমার যে লোক আছে, সে খুব বিশ্বাসী।

এও খুব বিশ্বাসী বৌদি। আমি গ্যারান্টি।

আমার লোকটি কাজকর্ম খুব ভালো জানে। ছুটি নিয়ে গিয়ে ফিরতে দু-চারদিন দেরি করছে বটে, কিন্তু আমি জানি, সে ঠিকই ফিরে আসবে। এখন আমি নতুন লোক রাখব না।

অন্তত দু-চারদিনের জন্য রাখুন। আপনার অসুবিধে হচ্ছে ভেবেই ওকে এনেছি।

নতুন লোক রাখার অসুবিধে আছে। তাতে কাজের ঝঞ্ঝাট আরও বাড়ে।

ও। বলে শশধর একটুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে সুপ্রিয়ার দিকে একবার কাতর ভাবে তাকাল। সে যেন সুপ্রিয়ার কাছ থেকে কিছু একটা দয়া চায়।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে এই ফ্ল্যাটটা একেবারে আলাদা হয়ে যায় গোটা বাড়ি থেকে। পর পর কয়েকটা দুপুর সুপ্রিয়া একদম একা আছে। শশধর কি তা জেনে শুনেই এসেছে?

অবশ্য শশধরকে দেখে একটুও ভয় পায় না সুপ্রিয়া।

শশধর তার দৃষ্টি, সুপ্রিয়ার মুখে নয়, তার নগ্ন ডান বাহুর ওপর স্থির রেখেছে। খুব ফর্সা রং বলে সুপ্রিয়ার হাতখানি মাখনের তৈরি বলে মনে হয়।

সুপ্রিয়া জানে শশধরের ওই লোকটিকে রাখলে আবার কাল দুপুরে আসবে শশধর। তখন তো ও ভালো রকম ছুতো পেয়ে যাবে। তার দেওয়া লোক কেমন কাজ করছে, সে খবর নিতে শশধর তো আসতেই পারে।

তা হলে ওকে রাখবেন না বৌদি?

না।

শশধর কি এখন চায়ের জন্য অপেক্ষা করছে? রোজ রোজ সুপ্রিয়া কাউকে চা তৈরি করে খাওয়াতে পারবে না।

আমার দিদির জ্বর। একবার দেখতে যাব...আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে।
শশধর আবার বলল, অ্যাঁ?
আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে আজ।
শশধর এমন বোকা নয় যে এই ইঙ্গিত বুঝবে না। সে খুব লজ্জিত ভাব করে বলল, ও। আপনাকে অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম।
সুপ্রিয়া ভদ্রতা করেও কোনো উত্তর দিল না। শশধর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাহলে আজ যাই। আপনাকে বেরুতে হবে যখন।
দরজার কাছে গিয়েও মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করে শশধর আবার বলল, আপনি কোন্ দিকে যাবেন?
সুপ্রিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, যোধপুর পার্কে—
আপনি কিসে যাবেন? একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?
ট্যাক্সির দরকার নেই, আমি রিক্শা করে চলে যাব।
তাহলে রিক্শা ডেকে দিই?
আমাদের বাড়ির নিচেই রিক্শা পাওয়া যায়। আমার তৈরি হতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে।
ও। আচ্ছা চলি, বৌদি।
এবার সত্যি সত্যি চলে গেল শশধর।
দরজা বন্ধ করে হাউস কোটটা খুলে ফেলল সুপ্রিয়া। লোডশেডিং-এর গরমের মধ্যে এই মোটা জিনিসটা এতক্ষণ পরে থাকতে তার রীতিমতন কষ্ট হচ্ছিল।
দুপুরবেলা এই ধরনের উটকো জ্বালাতন কারুর ভালো লাগে না।
বিছানায় ফিরে গিয়ে গল্পের বই খোলার একটু পর সুপ্রিয়ার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। লোকটা বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই তো?
হয়তো শশধর যাচাই করতে চায় সুপ্রিয়া সত্যিই এখন বাড়ি থেকে বেরুবে কি না! অথবা মিথ্যে কথা বলে তাকে বিদায় করা হল! কথাটা মনে পড়া মাত্র সুপ্রিয়া আবার উঠে বাইরের দিকের বারান্দাটায় চলে এলো।
এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখতেই চোখে পড়ল মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শশধর। সিগারেট টানছে আর এই বাড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল পর্যন্ত। শশধরের কী তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি!
সুপ্রিয়া দৌড়ে চলে এলো ভেতরে।
হাউস কোট ছাড়া শুধু এই একটা পাতলা জামা পরে সে কখনও বাইরের দিকের বারান্দায় দাঁড়ায় না। পাড়ার ছেলেরা হ্যাংলা ভাবে তাকায়। সুপ্রিয়া সেটা খেয়ালই করেনি।
বিছানায় ফিরে এসে সে আপন মনে হাসতে লাগল। একলা একলা হাসতে অনেক সময় দারুণ ভালো লাগে। শশধর দাঁড়িয়ে থাক যতক্ষণ খুশি। সে কি আবার জিজ্ঞেস করবে, কই বৌদি, বেরুলেন না তো! এতখানি সাহস তার হবে?
ঘণ্টাখানেক বাদে সুপ্রিয়া আর একবার গায়ে হাউস কোট চাপিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে এলো। না, শশধর নেই।
সেদিন রাত্রে সিদ্ধার্থকে সুপ্রিয়া বলল, তোমার বন্ধু আবার এসেছিল।
সিদ্ধার্থ বলল, কে? শশা! এত ঘন ঘন!
সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, ওদের কি অফিসে কাজ-টাজ কিছুই থাকে না? ঠিক তিনটের সময়।
ওদের কাজকর্ম না করলেও চলে। আজ কি ছুতো নিয়ে এসেছিল?
আমার জন্য রান্নার লোক জোগাড় করে এনেছিল।
শশাটা করিৎকর্মা আছে তো। একদিনে লোক জোগাড় করে ফেলল! লোকে আজকাল মাথা কুটেও চট করে একজন রান্নার লোক পায় না। তাকে রাখলে না?
একদম গাঁইয়া। আমাদের কাজ চলবে না।
তোমার দিদির বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে না কেন? তার তো একদম লোক নেই।
হ্যাঁ দিদির বাড়িতে ওকে পাঠাই, তারপর তোমার বন্ধু শশধর রোজ দুপুরে দিদির কাছে গিয়ে উৎপাত করুক আর কি। দিদিও দুপুরে একলা থাকে।
তোমাকে ছেড়ে ও এখন চট করে অন্য কোনো মহিলার কাছে যাবে না। তোমাকেই ওর পছন্দ।
আমি আজ ওকে চা দিইনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিদায় করে দিয়েছি।
কী করে তাড়ালে?

সুপ্রিয়া সবিস্তারে ঘটনাটি খুলে বলল।

সিদ্ধার্থ আফশোসের সুরে বলল, ইস, বেচারাকে তাড়িয়ে দিলে! তোমার এলেম আছে বলতে হবে...মাত্র দু দিনেই। রমেনের বউ রত্না কিন্তু দু মাসের মধ্যেও ওকে কিছু বলতে পারেনি।

আমি রত্নার মতন অমন ভালোমানুষ নই।

শশাটা এমনিতে খুব নিরীহ। বিয়ে-টিয়ে করেনি, নিরালায় সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করাটা ওর নেশা। সুন্দরী মেয়েদের ও মনে মনে পুজো করে।

বিয়ে করেনি কেন?

খুব সুন্দরী মেয়ে ছাড়া ওর অন্য কোনো মেয়ে পছন্দ নয়। আমাদের একদিন বলেছিল। যে সে মেয়েকে ও বিয়ে করবে না। খুব সুন্দরী মেয়ে ওর মতন একটা লোককে বিয়ে করবেই বা কেন? তাই বেচারার বিয়েই করা হল না।

ইস, ওই চেহারায় আবার সুন্দরী বিয়ে করার শখ! ও বুঝি নিজের চেহারা কোনো দিন আয়নায় দেখেনি?

ও কথা বলো না। দ্যাখ, দুর্গাঠাকুর কিংবা সরস্বতী পুজো করে কারা? অধিকাংশই তো রোগা, সিড়িঙ্গে, বিচ্ছিরি চেহারার পুরুষ। দেবীরা খুব রূপসী, তা বলে পূজারীকেও যে সুন্দর হতে হবে, তার তো কোনো মানে নেই। ও আগে প্রত্যেক দিন দুপুরের শো-তে হিন্দি সিনেমায় যেত, সুন্দরী অভিনেত্রীদের দেখবার জন্য। এখন বোধহয় জ্যান্ত সুন্দরীদের দেখতে চায়।

আমার কাছে আর আসবে না। রোজ রোজ দুপুরে ও সব ন্যাকামো আমার ভালো লাগে না। দুপুরে একটু পড়াশুনো করি।

সুপ্রিয়া ফিলজফিতে এম. এ. পাস। আজকাল অবশ্য তার পড়াশুনা বিলিতি হালকা গল্পের বইতেই সীমাবদ্ধ।

সিদ্ধার্থ পাশ ফিরে ঘুমোবার আগে বলল, দেখ, ও ঠিক আর একটা কোনো ছুতো খুঁজে আসবে। তোমাকে ওর খুব পছন্দ। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, তোমার নাম শুনলেই ওর মুখখানা কেমন গদগদ হয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে সুপ্রিয়া আবার দরজায় খুট খুট শব্দ শুনল। সেদিনও লোডশেডিং। রীতিমত রেগে গেল সুপ্রিয়া। আজ আর শশধরকে ভেতরে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। দরজার কাছ থেকেই তাকে কড়া কথা বলে বিদায় দিতে হবে। হাউস কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুপ্রিয়া এসে দরজা খুলল। কেউ নেই।

সুপ্রিয়া বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। কই, কেউ নেই তো? কোনো দুষ্টু ছেলে দরজায় টোকা দিয়ে পালিয়েছে। আগে তো কোনো-দিন এ রকম হয়নি! তা হলে কি সুপ্রিয়ার মনের ভুল! কেউ টোকা দেয়নি! আশ্চর্য।

দরজা বন্ধ করে কাছেই দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া একটুক্ষণ অপেক্ষা করল, না, আর কেউ টোকা দিল না। বিনা কারণে সুপ্রিয়া একবার রাস্তার দিকের বারান্দাটাতেও ঘুরে এলো। রাস্তায় কেউ নেই।

এমন ভুল করার জন্য সুপ্রিয়া নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল।

হাউস কোটটা খুলে সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছে। আবার দরজায় টোকা। সুপ্রিয়া উৎকর্ণ হয়ে রইল। এবারেও মনের ভুল?

এরপর বেশ জোরে শব্দ হল দরজায়। এটা কিছুতেই মনের ভুল হতে পারে না।

ফের এসে রাগত ভঙ্গিতে দরজা খুলেই সুপ্রিয়ার মুখটা খুশির হাসিতে ভরে গেল। দরজার সামনে অপরাধীর মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে রঘু। ওদের রান্নার লোক।

খুশির চোটে তাকে বকুনি দিতেও ভুলে গেল সুপ্রিয়া। স্নেহের স্বরে বলল, তোরা কী করিস? এমন চিন্তায় ফেলিস! আমি ভাবলুম, দেশে গিয়ে তোর আবার কোনো অসুখ বিসুখ হল নাকি!

রঘু কোনো উত্তর দিল না।

আয় ভেতরে। কী হয়েছিল?

রঘু আমতা আমতা করে বলল, এবার দেরিতে বৃষ্টি হল, জমিতে ধান রোওয়া বাকি ছিল...

ধান রোওয়া-টোওয়ার ব্যাপার সুপ্রিয়া কিছু বোঝে না। রঘু ওকে যা খুশি মিথ্যে বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু খুশির আতিশয্যে সে-সব ভুলে গিয়ে সুপ্রিয়া বলল, ইস! কদিনেই দেশে গিয়ে এমন রোগা হয়েছিস? ওখানে ভালো করে খেতে পেতিস না বুঝি? রান্নাঘরে দ্যাখ আলুর দম আর রুটি আছে। খেয়ে নে।

সুপ্রিয়ার স্বস্তির কারণ, রঘু এসে গেছে। আর তাকে নিজে এসে দরজা খুলতে হবে না। এই যে ধোপা কিংবা ডিমওয়ালা কিংবা ঠিকে ঝি এলেও সুপ্রিয়াকে গিয়ে দরজা খুলতে হয়েছে এই কদিন, এটা তার কাছে বিরক্তিকর।

সুপ্রিয়া নিজের ঘরে ফিরে এলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল পাখা। রঘু আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে সুসময়।

একটু পরে বেজে উঠল কলিং বেল।

এখন তো বাবলুর ফেরার সময় হয়নি! তা হলে কি—

সুপ্রিয়া শুয়ে শুয়ে টের পেল, রঘু দরজা খুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

কে রে রঘু?

রঘু বলল, ইস্তিরিওয়ালা। যে জামা কাপড় মেলা ছিল আমি দিয়ে দিচ্ছি—

যাক, রঘু এসে গেছে, এখন সব নিশ্চিন্ত। রঘুই সব ব্যবস্থা করবে।

রঘুকে বলে দিতে হবে, দুপুরবেলা যে-সে এসে দরজায় ধাক্কা দিলে রঘু যেন জানিয়ে দেয়, বাড়িতে কেউ নেই। চেনা লোক হলেও রঘু যেন হুট করে তাকে ভেতরে না ঢুকতে দেয়।

পরদিন কিংবা তার পরদিনও শশধর আর এলো না।

কিন্তু পরের শনিবার সুপ্রিয়া তার দিদির সঙ্গে নিউ মার্কেটে শাড়ি কিনতে গেছে, হঠাৎ দেখল একটা স্টলের পাশে শশধর দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়ার দিকে তার পিঠ ফেরানো। সে যেন সুপ্রিয়াকে দেখছে না। দোকানের জিনিস দেখছে খুব মন দিয়ে। সুপ্রিয়া ওকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেল।

ফেরার পথে সুপ্রিয়ার মনে একটা খটকা লাগল। ওই শশধরটা কি ওখানে হঠাৎ গেছে? পুরুষ মানুষ দুপুরবেলা নিউ মার্কেটে একলা একলা ঘুরে বেড়ায়? অথবা সে জানে যে সুপ্রিয়া ওখানে যাবে? কি করে জানল? শশধর ওদের বাড়ির কাছ থেকে অনুসরণ করেছে?

যাক গে, এটা এমন কিছু মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়, এই ভেবে সুপ্রিয়া চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিল।

দুপুরবেলা কলিং বেল বাজলেই কিংবা দরজায় খুটখাট শব্দ হলেই সুপ্রিয়া চমকে চমকে ওঠে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসে। ধোপা কিংবা কোনো ফেরিওয়ালা কিংবা পাশের ফ্ল্যাটের কেউ। আগেও যে প্রায় দুপুরেই এ রকম কেউ না কেউ আসত, সুপ্রিয়ার যেন মনেই ছিল না।

একদিন সকাল এগারোটায় সুপ্রিয়া লেডিজ কর্ণার থেকে তার অর্ডারি ব্লাউজ ও শায়া আনতে গেছে, দেখল যে পাশের পানের দোকানের সামনে ধুতি ও নীল রঙের শার্ট পরা একজন রোগা, চিমসে চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা খয়েরি হয়ে আসা ছাতা। খুব মন দিয়ে দেশলাই কিনছে শশধর।

সুপ্রিয়া না-দেখার ভান করে দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল। এই দোকানটা শুধু মেয়েরাই চালায়। লোকটা এখানে এই মেয়েদের দেখতে আসে? সকাল এগারোটায়? অফিসে যাওয়া কি একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে? এই দোকানের কোনো মেয়েকেই তো খুব সুন্দরী বলা যায় না—

সে দোকানে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল সুপ্রিয়ার। মাপ-টাপ মিলিয়ে নেবার ব্যাপার আছে।

যখন সে দোকান থেকে বেরুল, তখন চকিতে একবার দেখে নিল, শশধরের এখনো যেন দেশলাই কেনা শেষ হয়নি। সেই একই ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে।

শশধর একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো সুপ্রিয়ার দিকে।

কিন্তু চোখাচোখি হবার আগেই সুপ্রিয়া উঠে পড়ল একটা রিক্শায়। সুপ্রিয়ার হাসিও পায়, রাগও হয়। এ কি শুরু করেছে লোকটা? পাগল হয়ে গেছে নাকি? সুপ্রিয়ার যেন মনে পড়ছে, এর মধ্যে আরও কয়েকবার সে শশধরকে তার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। লোকটা সব সময় তাকে অনুসরণ করে? কিন্তু এজন্য রাস্তার মাঝখানে তো ওকে গিয়ে ধমক দিতে পারে না।

মেট্রো সিনেমায় ছবি ভাঙার পর ওপরের সিঁড়ি দিয়ে সুপ্রিয়া তার দিদি ও দুই বান্ধবীর সঙ্গে নামছে, এমন সময় সে বলে উঠল, এই রে!

সিঁড়ির নিচে কাঁচের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শশধর। সেই একই রকম পোশাক, ক দিন ধরে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই, তবু হাতে সেই ছাতা। করুণ তৃষ্ণার্ত চোখ মেলে চেয়ে আছে সুপ্রিয়ার দিকে।

দিদি জিজ্ঞেস করল, কি হল?

সুপ্রিয়া বলল, কিছু না। ভাবছিলাম, বুঝি চাবিটা ফেলে এসেছি। না। ব্যাগের মধ্যে আছে।

দিদি কিংবা বান্ধবীদের কাছে কথাটা বলা যায় না। ওরা নিশ্চয়ই হাসিঠাট্টা করবে।

শশধর কিন্তু সরে গেল না। সুপ্রিয়ারা নিচে নেমে যখন কাঁচের দরজা পেরিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সুপ্রিয়ার দিকে। যেন তার উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগল সুপ্রিয়ার ঘাড়ে। সুপ্রিয়া মুখখানাকে সোজা রাখল, ওর দিকে একবারও তাকাল না।

যখন সঙ্গে সিদ্ধার্থ থাকে, কিংবা জামাইবাবু কিংবা যে কোনো পুরুষ মানুষ, তখন কিন্তু শশধরকে কক্ষনো দেখা যায় না। সে সুপ্রিয়াকে একা দেখতে চায়। কিংবা অন্য মেয়েরা সঙ্গে থাকলেও ক্ষতি নেই। এটা সুপ্রিয়া লক্ষ্য করেছে।

কিন্তু রাস্তায় বেরুলেই যদি মনে হয়, দূর থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে, তাহলে খুব অস্বস্তি লাগে না? এর একটা প্রতিকার করা দরকার। এ ব্যাপারটা সিদ্ধার্থকে বলবে কি বলবে না, সুপ্রিয়া মনস্থির করতে পারে না। সিদ্ধার্থ হয়ত হেসে উঠবে। যা হালকা স্বভাব ওর।

একদিন মুখোমুখি হয়ে গেল।

সুপ্রিয়ার পরনে গাঢ় লাল শাড়ি। পায়ে লাল চটি, মাথায় লাল ছাতা। তার গৌরবর্ণ এই রক্তিম আভরণে যেন সোনার মতন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুপ্রিয়ার দিকে রাস্তায় অনেক মানুষই তাকায়। সেটা সুপ্রিয়ার ভালোই লাগে, কিন্তু একজন বিশেষ কেউ তাকিয়ে থাকলেই আর স্বাভাবিক হওয়া যায় না।

গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে দিয়ে হাঁটছে সুপ্রিয়া, বিকেল পৌনে ছ টা আকাশটাও তার পোশাকের মতন রক্তবর্ণ, সেই সময় উল্টো দিক থেকে ঠিক মুখোমুখি হেঁটে এলো শশধর। চোখে সেই একই রকম করুণ, তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি।

সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়িয়ে সোজা তাকাল ওর দিকে।

শশধর আরও দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। তার মুখে যেন একটা আলো ফুটে উঠেছে। সুপ্রিয়ার মুখে সে হাসি দেখতে পেয়েছে।

একেবারে কাছাকাছি এসে সে কথা বলার জন্য সবে ঠোঁট ফাঁক করেছে, সুপ্রিয়া সেই সময় তার পোশাকের মতন চোখও রক্তবর্ণ করে ফেলল, তারপর দারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলল, ছিঃ!

ওই একটি মাত্র শব্দ, আর কিছু না। তারপরই সুপ্রিয়া ডানদিকে ফিরে একটা রিক্শা ডাকল। রিক্শায় উঠে আর একবারও পিছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত।

ইচ্ছে করেই একটু বেশি খারাপ ব্যবহার করতে হল সুপ্রিয়াকে। ওই লোকটাকে আর বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। দিনের পর দিন পথেঘাটে একজন লোককে নিয়ে ঘোরা, এ যেন একটা দারুণ বোঝা। এ অন্য কেউ বুঝবে না। সবাই শুনলে বলবে, এতে আর এমন কি হয়েছে, লোকটা তো কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু এ যে এক সাঙ্ঘাতিক মানসিক চাপ। সব সময় একটা লোক তাকিয়ে থাকবে? ওর লোভী দৃষ্টি যেন সুপ্রিয়ার পিঠে ফোটে।

আজ একটু হেসে কথা বললেই আর কোনো উপায় ছিল না। আবার ঠিক বাড়িতে আসতে আরম্ভ করত। এরা এক ধরনের রোগী, এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। সেই জন্যই সুপ্রিয়া আজ ইচ্ছে করে বেশি সাজগোজ করে বেরিয়েছিল।

ক দিন বাদে রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রিয়ার মনে হল, তার শরীরটা যেন বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। মেজাজটাও ভালো লাগছে। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। না, শশধর কোথাও নেই। সত্যিই নেই। সুপ্রিয়া ঠিক বুঝতে পেরেছে।

তারপর আর কোনো দিনই শশধরকে দেখা গেল না।

রাস্তায় এমনিই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। শশধরের সঙ্গে সে রকমও দেখা হয় না কখনো। সুপ্রিয়ার পথ থেকে শশধর নিজেকে যেন সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলেছে। যাক নিশ্চিন্ত।

নিছক কৌতূহলেই সুপ্রিয়া একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই বন্ধুর কি খবর? ওই যে শশধর না কি যেন নাম? তোমাদের তাসের আড্ডায় আর আসে-টাসে না?

সিদ্ধার্থ বলল, শশা? না, সে তো আর অনেক দিনই আসে না। সবাই মিলে ওর পেছনে খুব লাগা হত তো। রমেন বলেছিল, ওরে শশা, ইংলন্ডের রাজকুমারীর ডিভোর্স হয়েছে তুই তাকে বিয়ে করবি নাকি? বল তা হলে সম্বন্ধ করি।

যাঃ, একটা নিরীহ লোককে নিয়ে তোমরা এ রকম নিষ্ঠুর রসিকতা কর।

নিরীহ ভালোমানুষদেরই তো পিছনে লাগে সবাই। আমাকে নিয়ে কি কেউ ও রকম বলতে পারবে?

আর আসে না?

নাঃ! একদম যেন হারিয়েই গেছে। আগে বলত, আমি ভাই ব্যাচেলার মানুষ, সন্ধের পর সময় কাটে না। তাই তোমাদের কাছে আসি। তাস খেলায় ওকে নেওয়া হত না, তবু চুপচাপ বসে থাকত। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

এরপর শশধর মুছে গেল ওদের জীবন থেকে। তবে, পেন্সিলের লেখাও ইরেজার দিয়ে খুব ভালো করে মুছলেও একটু না একটু সূক্ষ্ম দাগ থেকে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রিয়া এখনো হঠাৎ পিছন ফিরে তাকায়। সেই শুকনো মুখওয়ালা মানুষটা চট করে কোথাও সরে পড়ল না তো? পানের দোকানের পাশ দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল না? কিন্তু না, এ সব ব্যাপার বুঝতে ভুল হয় না। মেয়েদের পিঠেও চোখ থাকে।

সুপ্রিয়া মাঝে মাঝেই ভাবে, লোকটা গেল কোথায়?

পরক্ষণেই সে ভাবে, এ কি, আমি লোকটার কথা ভাবছি কেন? লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে! কম জ্বালান জ্বালিয়েছে এই ক মাস!

দুপুরবেলা কেউ কলিং বেল বাজালে সুপ্রিয়া এখনো চমকে চমকে ওঠে। সুপ্রিয়া যেন শশধরের জন্য প্রতীক্ষাই করে। লোকটা যে সত্যিই আর আসবে না কিংবা রাস্তায় অনুসরণ করবে না, সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে, এটা সুপ্রিয়ার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়।

একদিন নির্জন দুপুরে আবার বেল বাজে। দরজা খুলে দেয় রঘু। অচেনা বা অল্প চেনা লোক হলে দুপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এ রকম নির্দেশ আছে রঘুর ওপর। কিন্তু একজন অচেনা আগন্তুক রঘুকে গ্রাহ্যই না করে দরজা খোলামাত্র সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ে করুণ গলায় ডাকে, সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া!

সেই ডাক শুনে সুপ্রিয়ার বুক ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। খাট থেকে নেমে ড্রেসিং গাউন পরতে ভুলে গিয়ে, প্রায় দৌড়েই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। তারপর থমকে গিয়ে বলে, তুমি?

সব সুন্দরী রমণীদেরই একাধিক প্রেমিক থাকে। রূপের কিছু স্তাবক না থাকলে রূপ কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শুধু নিজের স্বামীর জন্য কোনো বিবাহিতা রমণী বছরের পর বছর রূপচর্চা বা সৌন্দর্যচর্চা করে? মেয়েরা প্রসাধন করে বাইরে বেরুবার সময়।

চেনাশুনোদের মধ্যে সুপ্রিয়ার চার পাঁচজন ঘনিষ্ঠ স্তাবক আছে বটেই, তা ছাড়া আছে একজন বাল্য প্রেমিক।

সেই সব মেয়েরাই ভাগ্যবতী, যাদের একজন বাল্য প্রেমিক থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হয় না, বিয়ে হয় একজন বেশ স্বাস্থ্যবান, স্বচ্ছল, নির্ভরযোগ্য মানুষের সঙ্গে, তারপর বাকি জীবন সেই বাল্য প্রেমিকটির সঙ্গে কাছাকাছি বা দূরত্বে একটি মধুর সম্পর্ক থেকে যায়। সুপ্রিয়া সেই রকম ভাগ্যবতী।

তার বাল্য প্রেমিকটির নাম অভিজিৎ। সব দিক থেকেই রোমান্টিক প্রেমিক হবার যোগ্যতা আছে তার। সে শুধু সুদর্শন নয়, তাকে দেখা যায় খুব কম। সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য চাকরির কারণে। এবং সে বিয়ে করেনি।

অভিজিৎ আসে ন মাসে ছ মাসে একবার। এবার এলো ঠিক পৌনে দু বছর পর।

সুপ্রিয়া খুশি ও অভিমান মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল, মনে আছে, তা হলে?

চিঠি লেখার অভ্যেস নেই অভিজিতের। তা ছাড়া চিঠি লেখার অসুবিধেও আছে। সে বলল, তুমি জানতে না, আমি ব্যাঙ্গালোরে আছি এখন?

অভিজিতের সঙ্গে একটা ক্ষীণ সূত্র আছে যোগাযোগের। অভিজিতের মাসতুতো বোন স্বপ্না আবার সুপ্রিয়ার বান্ধবী। তবে স্বপ্নার সঙ্গেও আজকাল বেশি দেখা হয় না আর দেখা হলেও সুপ্রিয়া মুখ ফুটে তার কাছে অভিজিতের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না।

ব্যাঙ্গালোর বুঝি পৃথিবীর ওপারে? সেখান থেকে এতদিন পর পর আসতে হয়?

অভিজিৎ বলল, সত্যিই এর মধ্যে একবারও কলকাতায় আসতে পাইনি। তুমি কেমন আছ?

কেমন দেখছ?

আগের চেয়েও সুন্দর।

অভিজিৎ পূজারী নয় এবং নিছক স্তাবক। সে বাল্য প্রেমিক। বাল্য প্রেমিকরা হিংস্র হয়, শুধু মুখের কথা নয়, তারা আরো অনেক কিছু চায়।

'আগের চেয়েও সুন্দর' কথাটা উচ্চারণ করে অভিজিৎ গাঢ়ভাবে বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে সুপ্রিয়ার দিকে। তারপর সে বলে, আমাকে কি বসতে বলবে না?

তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে বুঝি?

অভিজিৎ একটা চেয়ারে বসে পড়ে আর একটা চেয়ার টেনে কাছে এনে বলে, তুমি বস এটাতে।

সুপ্রিয়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে। সে দেখে অভিজিতের মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুল ঠিক দশ বছর আগে যেমন ছিল, এখনো সেই রকমই আছে।

অভিজিতের ব্যবহার অত্যন্ত সাবলীল। সে সুপ্রিয়ার উরুতে ডান হাতের পুরো পাঞ্জাটা রেখে বলে, এসো আমার কাছে এসে একটু বস।

যেন আগুনের স্পর্শ লেগেছে, এইভাবে ভয় পেয়ে সুপ্রিয়া ছিটকে সরে যায়।

চোখ দিয়ে সে ভর্ৎসনা করে অভিজিৎকে। অভিজিতের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। রঘু আছে না?

অভিজিৎ লজ্জা না পেয়ে হাসে।

রঘু দুপুরবেলা দরজার কাছে যেখানে শুয়ে থাকে, সেখান থেকে বসবার ঘরের কথাবার্তা ঠিক শোনা যায় না।

কিন্তু রঘু যদি এখানে হঠাৎ এসে পড়ে? সুপ্রিয়া কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। অভিজিৎ যদি আগে খবর দিত তাহলে সুপ্রিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করত। সবচেয়ে সুবিধে, বাইরে কোথাও দেখা করা।

দুপুরবেলা আগন্তুক সম্পর্কে যাতে রঘুর কোনো কৌতূহল না জাগে সেই জন্য সুপ্রিয়া সাড়ম্বরে রঘুকে ডেকে বলল, রঘু দু কাপ চা দে তো। কিংবা কফি থাকলে কফি করে দে।

রঘু যতক্ষণ কফি বানায়, ততক্ষণ অভিজিৎ টুকিটাকি কথা বলে সুপ্রিয়ার সঙ্গে। কিন্তু তার ভেতরটা ছটফট করে। অনেক দিন পর, অনেক দূর থেকে এসে দেখা করলে তার একটুও দূরত্ব পছন্দ হয় না। সুপ্রিয়া কেন অত দূরে বসে আছে?

রঘু কফি দিতে এলে অভিজিৎ প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বলে, যাঃ, সিগারেট আনতে ভুলে গেছি। তারপর সে রঘুর দিকে চেয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করে ভাই, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে পারবে?

সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করে কেন, কাছে সিগারেট নেই?

না, একদম ভুলে গেছি।

তাহলে আর সিগারেট নাই বা খেলে! এখন খেতে হবে না।

চা কিংবা কফি খাওয়ার পর সিগারেট না পেলে চলে? আজকাল অনেক কমিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কফির পর একটা—

সুপ্রিয়া শোবার ঘরে খুঁজতে গেল। এবং সত্যিই সিদ্ধার্থর কোনো সিগারেট খুঁজে পেল না। একটা প্যাকেট আছে, তা-ও খালি।

ততক্ষণে অভিজিৎ টাকা বার করে ফেলেছে। সুপ্রিয়া ফিরে আসা মাত্র সে টাকাটা রঘুকে দিয়ে বলল, ভাই, চট করে এক প্যাকেট নিয়ে এসো। কাছেই দোকান আছে না?

রঘু দরজা টেনে বেরিয়ে গেল। এ এমনই দরজা, একবার টেনে দিলে বন্ধ হয়ে যায়, বাইরে থেকে খোলা যায় না।

রঘু বাইরে যাওয়া মাত্র অভিজিৎ লাফিয়ে উঠল।

অভিজিতের আলিঙ্গনের মধ্য থেকে চুম্বন ভেজানো ঠোঁটে সুপ্রিয়া বলল, শোন, তোমাকে আমি শশধর বলে ডাকব।

অভিজিৎ ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, শশধর? সে কে?

কেউ নয়?

হঠাৎ ওই বিদঘুটে নামটাই বললে কেন?

এমনিই। বিদঘুটে কেন হবে, শশধর মানে চাঁদ। চাঁদও তো তোমারই মতন। রোহিণীকে ভুলে থাকে।

তুমি বুঝি রোহিণী?

সময় খুব কম, রঘু এক্ষুনি ফিরে আসবে, তাই, অভিজিৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সেই অবস্থার মধ্যেও সুপ্রিয়া মনে মনে একটা সংলাপ তৈরি করে রাখে।

সাবধানতার জন্য আজ রাত্রেই সে খাওয়ার টেবিলে তার স্বামীকে হাসতে হাসতে বলবে, আজ দুপুরে তোমার সেই বন্ধু হঠাৎ আবার এসে হাজির হয়েছিল।

ওই যে শশধর না কি যেন নাম?

ভয়

'তোমাকে তো আমি বললাম, আমার খুব দরকারি একটা কাজ ছিল! আর থাকতে পারব না। সেইজন্যই হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম। আসলে কিন্তু আমার কোনো কাজই ছিল না। দেখ না, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে এখন তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি।'

'কেন যে চলে এলাম! আসল কারণটা বলব? রাগ করবে না? আসলে আমার ভয় করছিল।'

এই পর্যন্ত পড়েই শান্তনু এমন রেগে গেল যে চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

সব সময় খালি ভয় আর ভয়! এই ভয়ের জ্বালায় আর পারা যাবে না। ওরা কি চুরি ডাকাতি কিংবা মানুষ খুন করেছে যে সব সময় ভয় পেতে হবে?

যেদিনকার কথা লিখেছে স্নিগ্ধা, সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সকাল এগারোটার সময়। সেই সময় চেনাশুনো অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। অফিস পালিয়ে আসতে হয়েছিল শান্তনুকে। অফিসেরই কাজ নিয়ে ডালহৌসিতেই যাবার বদলে চলে এসেছিল আলিপুরে।

কলকাতা শহরের যে-কোনো জায়গায় দেখা করতেই ভয় পায় স্নিগ্ধা। সারা কলকাতাতেই নাকি ওর আত্মীয়-স্বজন ছড়ানো। সেই সব আত্মীয়রা ধারালো চোখ নিয়ে সব সময় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্নিগ্ধাকে দেখে ফেলার জন্য। স্নিগ্ধার বাড়িতে ফোন করার উপায় নেই, চিঠি লেখার উপায় নেই। বাইরে দেখা করতে গেলে তো প্রায় একটা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা করতে হয়।

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে। প্রত্যেক চিঠিতেই সে আকুতি জানায়, কখন শান্তনুকে দেখবে। শান্তনুকে সে প্রত্যেকদিন দেখতে চায়, অথচ দেখা করতেও ভয়। এ তো মহা মুশকিল!

একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার উপায় নেই। কোনো প্রকাশ্য জায়গায় পাশাপাশি বেড়াবার তো প্রশ্নই ওঠে না। একটা মাত্র জায়গা আছে, মিউজিয়াম, যেখানে কলকাতার বাঙালিরা সাধারণত যায় না। কিন্তু সেখানেও যাওয়া চলে না বারবার, স্নিগ্ধার ধারণা, দারোয়ান, চাপরাশিরা তাকে চিনে ফেলেছে। চিনে ফেললেই বা যে কি বিপদ, তা বোঝে না শান্তনু। চিনুক না। তারা তো মিউজিয়ামে কিছু চুরি করতে যাচ্ছে না।

আর একটা জায়গা হচ্ছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি। এখানে স্নিগ্ধাকে মাঝে মাঝে বই নিতে আসতে হয়। বাড়ির অনুমতি আছে। তাও স্নিগ্ধা আসবে সকালের দিকে। বিকেলে বা সন্ধেবেলা এখানে অনেক ভিড় হয়ে যায়, তাদের মধ্যে চেনাশুনো কেউ কেউ তো থাকতেই পারে। অফিসের দিনে সকাল সকাল আসতে গেলে শান্তনুকে যে কী অসুবিধেয় পড়তে হয়, তা সে শুধু নিজেই জানে, স্নিগ্ধাকে বলে নি কখনো।

শান্তনু এটাই শুধু বুঝতে পারে না, কেউ দেখে ফেললেই বা ভয়ের কী আছে? সে স্নিগ্ধাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করার জন্য বদ্ধপরিকর। স্নিগ্ধাও অন্য কারুকে বিয়ে করবে না, বাড়ির যদি খুব অমত থাকে, স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে চলে আসতেও রাজি।

অবশ্য স্নিগ্ধার বাড়ি থেকে আপত্তি করার বিশেষ কোনো কারণও নেই। শান্তনু পড়াশুনোয় ভালো ছিল, এখন মোটামুটি ভালোই চাকরি করে। পরিচ্ছন্ন সচ্ছল পরিবারের ছেলে। স্নিগ্ধাদের বাড়িতে জাত-বিচারের বাড়াবাড়ি নেই, স্নিগ্ধার জ্যাঠতুতো দাদা অসবর্ণ বিয়ে করলেও বাড়ির লোক তাদের ভালোভাবেই মেনে নিয়েছে।

মুশকিল বাধিয়েছে স্নিগ্ধার বাবা। ভদ্রলোক বেশ ভালোমানুষ, অর্থনীতির অধ্যাপক, বেশ সুরসিক। কিন্তু তিনি হঠাৎ ইরানে ভিজিটিং প্রফেসারের চাকরি নিয়ে চলে গেছেন এক বছরের জন্য। ওঃ, সেই এক বছরটা কি অসম্ভব লম্বা। স্নিগ্ধার বাবাকে এখনো কথাটা জানানোই হয় নি।

স্নিগ্ধা চিঠি লিখে বাবাকে জানাতে চায় না। বাবা ভাববেন, তিনি নেই বলে মেয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। শান্তনুকে চোখে না দেখে বাবা বুঝবেন কি করে যে কোন্ রকম ছেলে সে। বাবা ফিরে এলে সে বাবাকে নিজের মুখে বলবে। এই জন্য মাকেও কিছু জানতে দিচ্ছে না। কারণ মা তাহলেই বাবাকে চিঠি লিখবেন। অতদূর ইরান থেকে তো শুধু শুধু হঠাৎ চলে আসা যায় না। বাবা যদি চিঠি পেয়ে চলে আসেন, সেটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।

শান্তনু অবশ্য এক বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছে। কি আসে যায় এক বছরে। কিন্তু তা বলে কি এই এক বছর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ থাকবে? স্নিগ্ধার যুক্তি হচ্ছে, যদি কোনো রকমে কোনো আত্মীয়-স্বজন একবারও স্নিগ্ধাকে শান্তনুর সঙ্গে ঘুরতে দেখে, তাহলেই তারা কথাটা মায়ের কানে তুলবে। মা অমনি বাবাকে চিঠি লিখবেন।

বাবা অতদূরে বসে দুঃখ পাবেন। বাবাকে যে দারুণ ভালবাসে স্নিগ্ধা!

শান্তনু ঠাট্টা করে, তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে তোমার পাশে কোনো ছেলেকে হাঁটতে দেখলেই অমনি তোমার মায়ের কাছে নালিশ করতে যাবেন?

স্নিগ্ধা বলে, নালিশ নয়, এমনি যদি কথায় কথায় বলে দেয় কেউ—

—বলুক না। তোমার মাকে তুমি বুঝিয়ে বলবে!

—আমার লজ্জা করে!

লজ্জা আর ভয়। এই দুটো জিনিসই যেন ভালবাসার প্রধান শত্রু। সব সময় দুজনে তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে একটু দেখা করার জন্য, কাছাকাছি বসে একটু কথা বলার জন্য—আর কেউ এতে বাধা দিচ্ছেও না। যত বাধা এই লজ্জা আর ভয়।

সেদিন অত কষ্ট করে শান্তনু গেল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ভেতরে কথা বলার সুযোগ নেই, তাই ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে একটা গাছের নিচে। পাতলা রোদ সবুজ ঘাসে মোলায়েম হয়ে ছড়িয়ে আছে।

স্নিগ্ধার হাতে দুটি বই। একটা শান্তনুকে দিয়ে বলল, এটা তোমার হাতে রাখো।

—কেন?

—তাহলে সবাই ভাববে, তুমিও বই নিতে এসেছ লাইব্রেরিতে।

শান্তনু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, এখানে সবাইটা কোথায়? কেউ তো নেই! আমাদের শুধু দেখছে ওই বড় বড় গাছগুলো! স্নিগ্ধা বলল, আস্তে আস্তে তো লোকজন আসবে।

শান্তনু বলল, চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।

স্নিগ্ধা একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, না।

—কেন, এতে আবার কি অসুবিধে?

—এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই তো ভালো লাগছে।

স্নিগ্ধা কারণটা না বললেও শান্তনু বুঝল। ঘাসের ওপর বসলে দৃশ্যটা অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বললে, কেউ দেখে ফেললেও মনে করবে, দুজন ছাত্রছাত্রী বুঝি পড়াশুনোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

একটা উজ্জ্বল লাল রঙের সোয়েটার পরে ছিল স্নিগ্ধা। মাথার চুল এক বেণি করে বাঁধা। নামের সঙ্গে তার মুখটার খুব মিল আছে। চোখ দুটোর দিকে তাকালেই কি রকম যেন ঠাণ্ডা লাগে। মুখে সব সময় একটা লজ্জা ভাব।

একটুবাদেই স্নিগ্ধা বলল, তুমি এবার যাবে না?

শান্তনু অবাক হয়ে বলল, চলে যাব? এক্ষুনি? কেন?

—বাঃ, তোমার অফিস নেই?

—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করব।

—না, না, অফিসে যদি তোমার নামে কেউ কিছু বলে, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

—কে কি বলবে? আমি তো একটা কাজেই বেরিয়েছি, কাজটা ঠিকই সেরে ফিরব।

কাজটার জন্য এক ঘণ্টার বেশি দেরিও তো হতে পারে।

স্নিগ্ধা ঠিক যেন মানলো না। তার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে রইল। ঘাসে বসা হল না বলে শান্তনু প্রস্তাব করল একটু হেঁটে বেড়াতে। স্নিগ্ধা তাতেও রাজি হতে চায় না। অনেক পীড়াপীড়িতে সে এক পাক মাত্র ঘুরতে রাজি হল।

একবার স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখার জন্য শান্তনুর বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু তার উপায় নেই। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে স্নিগ্ধার শরীরের সুন্দর গন্ধটা উপভোগ করে শান্তনু। সবচেয়ে কি স্বাভাবিক ছিল না, স্নিগ্ধাকে এখন একবার জড়িয়ে ধরা। এখানে, প্রকাশ্যে, আকাশের নিচে তাকে একবার চুমু খাওয়া? কিন্তু সে তো কল্পনাই করা যায় না।

শান্তনু খপ করে স্নিগ্ধার একটা হাত চেপে ধরল।

স্নিগ্ধা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিল হাতটা। চোরা চোখে তাকে একবার বকুনি দিল।

তারপর যেখান থেকে হাঁটতে শুরু করে ছিল, সেইখানে এসেই স্নিগ্ধা বলল, এবার তুমি যাও।

—এ কি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো?

—বাঃ, তোমার অফিসের কত দেরি হচ্ছে।

—হোক।

—না। না, আমার ভয় করে।

—আবার ভয়! স্নিগ্ধাও হেসে ফেলল এবার। তারপর বলল, আমার মতন একটা বাজে বিচ্ছিরি মেয়েকে নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছো, তাই না?

শান্তনু বলল, খুব। দারুণ বিপদ! ওই দ্যাখো। ওই একজন আত্মীয় আসছে তোমার।

কোথাও একজনও মানুষ দেখা যায় না। শুধু বড় বড় গাছপালা ওদের দর্শক।

শান্তনু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, শোনো, আমরা যদি ওইখানে সরে গিয়ে ওই রাধাচূড়া গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

—কেন, ওখানে কি আছে?

—কিছুই না। ওখানে দাঁড়ালে আমাদের সহজে দেখা যাবে না।

—ওখান দিয়ে লোকজন হাঁটে না বুঝি?

—ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি, যদি একটি লোককেও ওখানে আসতে দেখি, এক্ষুনি আমরা চলে আসবো? লোক না-আসা পর্যন্ত আমরা ওখানে দাঁড়াবো। রাজি?

স্নিগ্ধাকে রাজি হতেই হল। জায়গাটা সত্যি নির্জন। তবু এই নির্জনতার মধ্যেও শান্তনু স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখলো না। চুমু খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একটু বেশি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, এক একবার কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যায়, শান্তনু সিগারেট মুখে দিলে স্নিগ্ধা দেশলাই জ্বেলে দেয়? এইটুকুতেই অনেকখানি পাওয়া।

স্নিগ্ধা এক সময় বলল, বাঃ, লোক না এলেও বুঝি আমরা এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবো?

—আমি এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তুমি পারো না?

—শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

—আমার তো শুধু তোমাকে দেখতেই ভালো লাগে।

—আমার ভয় করে।

—আবার ভয়? এখানেও ভয়?

স্নিগ্ধার চোখ দুটি আরও বেশি চঞ্চল। সে সুস্থির হতে পারলে না কিছুতেই। এবার অনুনয় করে বলল। শোনো, লক্ষ্মীটি, আমার একটা দারুণ কাজ আছে, আমাকে বারোটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

—বারোটার মধ্যে? তাহলে তো এক্ষুনি যেতে হয়।

—হ্যাঁ, বই দুটো বদলেই...

—মোটে এইটুকু সময়ের জন্য আমি এলাম?

—লক্ষ্মীটি রাগ করো না, আর একদিন।...

—কি কাজ তোমার?

—বিশ্বাস করছো না? মাকে বলে এসেছি, মাকে এক জায়গায় যেতে হবে...

স্নিগ্ধাকে আর আটকানো যায় নি কিছুতেই। শান্তনু খানিকটা ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এসেছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো সন্দেহ করত, স্নিগ্ধা বুঝি শান্তনুকে তেমন ভালবাসে না। সে বুঝি শান্তনুর কাছে মিথ্যে কথা বলে অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিন্তু স্নিগ্ধা সম্পর্কে সেরকম সন্দেহ কিছুতেই করা যায় না। কারুকে ঠকাবার কোনো ক্ষমতাই নেই স্নিগ্ধার।

মেঝে থেকে শান্তনু স্নিগ্ধার দলা পাকানো চিঠিটা আবার তুলে নিল। পড়তে লাগল পরের অংশটুকু।

...রাগ করবে না? আসলে, আমার ভয় করছিল। কিসের ভয় জানো? কারুর দেখে ফেলার ভয় নয়। ভয় করছিল নিজেকেই। আমার মনে হচ্ছিল বেশিক্ষণ থাকলে, আমাকে যদি তোমার আর দেখতে ভালো না লাগে? আমি তো সুন্দরী নই। তুমি কত সুন্দর। তোমার সামনে আমাকে কেমন যেন...আমি বেশি সাজতেও পারি না, আমার ভয় হয়, যদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুমি হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নাও। আমার চিবুকটা বিচ্ছিরি, তাই না?

শান্তনু আবার অবাক হল। এ আবার কী রকম ভয়? স্নিগ্ধাকে তার দেখতে খারাপ লাগবে? যাকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করে, হঠাৎ কোথাও আচমকা দেখা হয়ে গেলে সে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যায়, সেই স্নিগ্ধাকে দেখতে তার খারাপ লাগবে? স্নিগ্ধার মতন সুন্দরী আর কে আছে? ওর চিবুকে একটা ছোট্ট কাটা দাগ, সেই জন্যই মুখটা আরও মিষ্টি দেখায়, ইচ্ছে করে ওই কাটা জায়গাটায় চুপুস করে একটা চুমু খেতে। এই জন্য স্নিগ্ধা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। কোনো মানে হয়!

পরে কোথায় আবার দেখা হবে, সে সম্পর্কে স্নিগ্ধা কিছু লেখে নি। তার মানে এখন দু তিন দিন আর স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে বেরুবে না। স্নিগ্ধার অন্য ভাইবোনরা ছোট ছোট। বাবা এখানে নেই বলে স্নিগ্ধাই যেন এখন বাড়ির

অভিভাবক। ওর মতন নরম মেয়েকে কি ভাইবোনরা মানে একটুও? বাবা এখন এখানে নেই বলেই, সেই সুযোগে স্নিগ্ধা এখন প্রেম করে বেড়াচ্ছে—এই অপবাদটাকেই স্নিগ্ধার বেশি ভয়।

এদিকে অফিসের কাজে তিনদিন পর আবার শান্তনুকে পাটনা যেতে হবে। তার মানে এর মধ্যে আর স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হবে না।? পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতেও তো তিন চারদিন লাগবে। পাটনা যাওয়ার কথাটা স্নিগ্ধাকে জানাবেই বা কি করে?

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে কিন্তু শান্তনুর চিঠি লেখার উপায় নেই। টেলিফোন করাও চলবে না। স্নিগ্ধাই কখনো সখনো, বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকলে শান্তনুকে টেলিফোন করে, বাড়িতে কিংবা অফিসে। যদি স্নিগ্ধা সেরকম ফোন করে।...

পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনুর পাঁচ দিন লেগে গেল। ফেরার পথে আর এক ঝামেলা। ট্রেন কলকাতায় এসে পৌছোবার কথা ভোরে, কিন্তু এঞ্জিনে গণ্ডগোল হওয়ায় গাড়ি মাঝ-রাস্তায় থেমে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আগের জংশনে খবর দিয়ে নতুন এঞ্জিন আনতে আনতে পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। অতক্ষণ থেমে থাকা ট্রেনে অপেক্ষা করা এক বিরক্তির ব্যাপার। তাও মাঠের মধ্যে। কিছুই করার নেই। নেমে পায়চারি করতে গেলেও চড়া রোদ গায়ে বেঁধে। হঠাৎ শীত চলে গিয়ে গরম পড়ে গেছে। প্রথম গ্রীষ্ম দারুণ চিটচিটে হয়। ট্রেনের মধ্যে বসে থাকলেও গরম, বাইরে রোদ্দুরে ঘোরাও অসম্ভব। ঘামে জামা-টামা চিটচিটে হয়ে গেল। মুখে বিরক্তির ভাঁজ।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেও আর এক ঝামেলা। ট্যাক্সি নেই। অনেক দৌড়োদৌড়ি করেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত, এক ভদ্রলোকের প্রাইভেট গাড়ি ওকে হাজরা মোড় পর্যন্ত নামিয়ে দিতে রাজি হল।

হাজরায় পৌঁছে, হাতের ছোট ব্যাগটা নিয়ে শান্তনু গাড়ির ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে যেই মুখ তুলল, অমনি দেখল এক অপরূপ দৃশ্য।

রাস্তার ওপারে, বাস গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধা। সঙ্গে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সেই মেয়েটিও বোধহয় এক্ষুনি চলে যাবে, কেননা, একবার একটুখানি চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে কি যেন বলল। স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করার এমন আকস্মিক সুযোগ পাওয়া যায় না। বুকের মধ্যে থেকে একটা খুশি লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু শান্তনু তার চিবুকে হাত বুলোল। দাড়ি কামানো হয় নি, বেশ খোঁচাখোঁচা দাড়ি টের পাওয়া যাচ্ছে। মুখে চটচটে ঘাম। জামাটাও ঘামে জবজবে। সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনে পাজামা পরে ছিল, তার ওপরেই শার্ট পরে নিয়েছে। এই চেহারায় সে স্নিগ্ধার সামনে দাঁড়াবে?

শান্তনু আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে সামনের চলন্ত মিনিবাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাড়িতে এসেই কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল আবার। এরকম দুর্লভ সুযোগ পেয়েও সে স্নিগ্ধার কাছে যেতে পারল না? আজ যা দেরি হয়ে গেছে, অফিসে যাবার কোনো প্রশ্নই নেই—স্নিগ্ধার সঙ্গে দুটো চারটে কথাও বলতে পারত অন্তত, তবু কেন গেল না? তার লজ্জা করছিল? কিংবা ভয়?

পরদিনই স্নিগ্ধার চিঠি এল।

'জানো, কাল তোমাকে দেখলাম? নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। হঠাৎ মনে হল যেন স্বর্গ থেকে দেবতারা আমার জন্য একটা পুরস্কার পাঠালেন। তুমি একটা কালো রঙের গাড়ি থেকে হাজরা মোড়ে নামলে। আমি হাত তুলে তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার বোধহয় খুব তাড়া ছিল, তুমি একটা মিনিবাসে উঠে পড়লে। তুমি আমায় দেখতে পাও নি, আমি কিন্তু তোমায় দেখে নিয়েছি। আমার ভাগ্যটা কত ভালো বল তো!

দাড়ি কামাও নি, মুখে নীল নীল দাড়ি, পাজামার ওপরে একটা লাল চেক চেক শার্ট পরেছিলে। তোমাকে কি ইয়াং আর কি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দেবতা

পুকুরের ঘোলাটে জলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিমগাছের ছায়ায় বসে ছিল নিরাপদ। বিড়িটা নিভে গেছে, সেটাকেই ঠোঁটে চেপে আদর করছে সে। তার লুঙির ট্যাঁকে দেশলাই আছে, বিড়িটা আবার জ্বালতে পারে, কিন্তু জ্বালবে না। নিমগাছের ছায়ায় বড় শান্তি, মনে হয় ঈশ্বরের স্নেহ। পাশেই চড়চড়ে চামড়া-পোড়া রোদ।

পুকুরটায় বড় জোর এক কোমর জল। অবশ্য মোটকু গড়াইয়ের ডুব জল হবে। তাও যে এই জল আছে, যথেষ্ট। গোটা বৈশাখ মাসে এক ছিটেও বৃষ্টি হয় নি। গত হাটবারে এই পুকুরে জাল দিয়ে মেজোবাবু মাছ বিক্রি করে গেছে আঠার শো টাকার। চোরের রাজত্ব, সব শালা চোর, চতুর্দিকে চোর, আমার এত মাছ, মোটে আঠার শো টাকা, এই বলে বার বার আক্ষেপ করছিল মেজোবাবু। একবার নয়, তিনবার জাল টানা হয়েছে, যাতে আর একটাও মাছ বাকি না থাকে। মেজোবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত, কাজ বোঝে, দরকার হলে নিজে পুকুরে নেমে জাল টানতে পারে।

নিরাপদ জানে, এ পুকুরে আর মাছ নেই। সে-ও সেদিন জাল ধরেছিল, নগদ পেয়েছে চারটে টাকা আর আধ কিলোটাক মৌরলা মাছ। কিন্তু একটা ব্যাপারে নিরাপদর খটকা রয়ে গেছে। সবাই জানে, এ পুকুরে কচ্ছপ ছিল দুটো, একটা সেদিন ধরা পড়ল, আর একটা গেল কোথায়? সে শালা আগে-ভাগেই পালিয়েছে? কিন্তু কচ্ছপ তো ডেরা ছেড়ে নড়ে না। সেদিন থেকে নিরাপদর একটা নেশা হয়ে গেছে, যখন-তখন পুকুর ধারে এসে বসে থাকে। এই কচ্ছপের সমস্যাটার মীমাংসা না করতে পারলে তার জীবনে আর সুখ নেই। যাবে কোথায় গু-খেগোর ব্যাটা। পুকুরে থাকলে একবার না একবার মাথা তুলবেই। কচ্ছপের জাত, মানুষের হাতে ধরা পড়ে চিৎ না হলে ওদের নিয়তি পূরণ হয় না।

পুকুর বেচা হয়ে গেছে, এখন এই পুকুরে হঠাৎ নেমে পড়লে চুরির দায় দিতে পারবে না কেউ।

অনেকক্ষণ ঘোলা জলের দিকে চেয়ে থাকলে চোখও যেন ঘোলা হয়ে আসে।

এই সময় নিরাপদ এসে উপস্থিত। এ হল আরেক নিরাপদ, এর নাম নিরাপদ মিস্তিরি, আর যে বসে আছে সে নিরাপদ সাঁপুই। অন্যরা বলে এক নম্বর দু নম্বর।

দু নম্বর নিরাপদ অত্যন্ত উত্তেজিত। চেঁচিয়ে বলল, ওরে যাচ্ছে, যাচ্ছে, নদী দিয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছে? অ্যাঁ?

হ্যাঁ রে, নদী দিয়ে। দেখতে যাবি না?

নিরাপদ ধড়মড় করে উঠে পড়ল এবং এই সংবাদের সৌজন্যে বিড়িটি ধরিয়ে ফেলল আবার। তারপর দুজনেই ছুটল।

সুধন্য বসে ছিল বাগানে। এ বাগানে ফুল ফোটে না, এখানে কোনো ফলবান বৃক্ষ নেই, বাঁধের ধারের জমি। বছরের এ সময়টায় বাগান চাষ শেষ করার কথা, সুধন্য লাগিয়েছিল উচ্ছে আর রাশিয়ান বীট্। বৃষ্টি হল শীতকালে, যখন কেউ বৃষ্টি চায় না। আর চৈত্র-বৈশাখে এক ফোঁটা জল নেই। বোঝ তা হলে বাগান চাষের কী অবস্থা। তরতরিয়ে বেড়েছিল উচ্ছের চারা আর মোটা গোছ করে উঠেছিল রাশিয়ান বীটের ডগা, গোসাবার কো-অপ এ জিনিসের ভালো দাম দেবে বলেছিল, কিন্তু এখন নুন-লাগা কেঁচোর মতন সেগুলো নেতিয়ে পড়ে আছে। এমন ছন্নছাড়া বাগান সুধন্য তার বাপের জন্মে দেখে নি।

সুধন্য আপন মনে কথা বলে। হে ভগবান, ক্যানিংয়ের নেত্যানন্দর ব্যানো কলেরা হয়। ওর বউটা যেন বিধবা হয়। বুঝুক সে মাগি বিধবা হওয়ার কী যন্তোন্না। ওর বড় মেইয়েটাকে ব্যানো কোনো মোল্লার ছেলে ভাগিয়ে নিয়ে যাক। মোটে বিশ টাকা হাওলাৎ চেয়েছি, তাও দিলে না। উল্টে মুখ ঝামটা দিলে, পাঁচ জনের সামনে। নেত্যানন্দর মেজো ছেলেটা অন্ধ হোক। ওর ছোট ছেলেটা লোকালের নিচে কাটা পড়ুক। শুধু বড় ছেলেটাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখ, হে ভগবান, সে দুটো বিয়ে করেছে, সে বেঁচে থেকে নরক যন্তোন্না ভোগ করুক, নিত্যানন্দ মলে আমি পাঁচসিকের পুজো দেব, কেউ জানবে না কিসের পুজো দিচ্ছি। বলব, সে একটা মানত ছিল আমার, সাধুবাবার কাছে এ কথাটা বলা যায় না। সাধুবাবা তুমি কেন নেত্যানন্দর পেট-জ্বালা রোগের জন্য মাদুলি দিলে, এটা ধর তোমার উচিত হল? ওরা যাক না। ক্যানিং-এ কত ডাক্তার কোবরেজ আছে—

কাছারি-বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে আরেকজন সুধন্য। বুকের খাঁচাটা দেখলেই বোঝা যায় এক সময় চেহারাটা কী ছিল। একবার নাকি একটা মাঝবয়েসি বাকি গাছ সে খালি হাতে টেনে উপড়ে তুলেছিল। এই সুধন্য দাস, বাগানের একলা আলাপচারি সুধন্য বৈরাগী।

কোথায় যাচ্ছ গো?

তুই যাবি না? বসে আছিস যে? নদী দিয়ে যাচ্ছে।

নদী দিয়ে যাচ্ছে? এখনো তো উজোন পড়ে নি!

আরে হ্যাঁ, যাচ্ছে। দেখবি তো ছুটে আয়—

বাগানের সুধন্য একটু দ্বিধা করল। তার কথা এখনো শেষ হয় নি। তবু সে উঠে পড়ল, একটু জোরে পা চালিয়ে ধরে ফেলল অন্য সুধন্যকে।

মজা খালের কানাচে কানাচে ঢোল কলমি শাক তুলছে মঙ্গলা। এক আঁটি শাক তোলে আর একটু করে বসে জিরোয়। তার নিজের পেটটাই ফুলে ঢোল। যে-কোনো দিন যে-কোনো সময় তার সপ্তম সন্তানের জন্ম হবে। এখন-ওখন অবস্থা। কাছেই বসে নিষ্কর্মার মতন কাদা ঘাঁটছে তার পঞ্চমা মেয়ে। মঙ্গলা মাঝে মাঝে ধমকাচ্ছে তাকে, আরে এ ছুঁড়ি, এ পেত্নি এদিকে আয় শাকগুলো তোল বলছি। সে কথা কানে নেই, দাঁড়া, আজ তোর মুখ ভাঙব, খেতে চাস, মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব—

মেয়েটা তার মাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। গলায় এখন সে রকম জোর নেই মঙ্গলার, তাছাড়া মেয়ে জানে, মা এখন আর ছুটে এসে তাকে ধরতে পারবে না।

এখান থেকে সিকি মাইল দূরে মঙ্গলার ঘর। মাঝে মাঝে খর চোখে মঙ্গলা তাকাচ্ছে তার বাড়ির দিকে। এত দূর থেকে কিছুই দেখা যাবে না। তবু মঙ্গলা নজর রাখতে চায়। এ সময়টা বড় খারাপ, এই সময় পুরুষ মানুষ বারমুখো হয়। প্রত্যেকটা বাচ্চা জন্মাবার সময়ই মঙ্গলা দেখেছে তার স্বামী আড়ম্বর সে সময় অন্য মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে ছুঁক ছুঁক করে। সে আঁতুড়ে ঢুকলেই বৈরাগীপাড়ার বিধবা শৈলীকে ডেকে আনে বাড়ির কাজের জন্য। কেন, সে ছাড়া কি আর কেউ নেই? ওই শৈলীটা তো পুরুষখাগি। সে তো ঘুরঘুর করে সময় বুঝে।

শাকের বোঝাটা মাথায় তুলে উদরভারে অলসগমনা হয় মঙ্গলা। মেয়ের দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকায়। আসুক না একবার খাবার সময়—

খালের উল্টো পার দিয়ে ছুটে যাচ্ছে এক দঙ্গল নারী-পুরুষ। মঙ্গলা সে দিকে তাকায়। কী ব্যাপার, কারুকে সাপে কেটেছে নাকি? গতকালই বাঁধের ধারে একটা কালার দেখেছিল। এই গরম পড়ল, এবার শুরু হল ওনাদের উপদ্রব।

—এই, তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে?

ওই দঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন মঙ্গলা। এর শরীরে এখনো চাঞ্চল্য আছে, কারণ এর গর্ভের সপ্তম সন্তানটির বয়স মাত্র ছমাস।

—ও কাকি, দেখতে যাবে না? আমরা সবাই নদীর ধারে যাচ্ছি।

—আমার মাথায় যে বোঝা, বাড়িতে রেখে না এলে—

—ওইখানেই ফেলে রাখ না, পরে এসে নেবে।

মঙ্গলা এবার করুণভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ও কুড়োই, একটু এসে ধর মা, দুজনে হাত লাগিয়ে ঝাঁ করে বাড়িতে রেখে আসি—

কিন্তু মেয়ে ততক্ষণে তার কাদার তৈরি খেলাঘর নিজেই পায়ে মাড়িয়ে ছুট দিয়েছে নদীর দিকে।

ঢাউস শাকের বোঝাটি মাথায় নিয়ে মঙ্গলা এদিকে ওদিক তাকায় অসহায়ভাবে। এখানে ফেলে যাবে? যদি অন্য কেউ নিয়ে যায়? যদি মানে কি, কেউ দেখলে নিয়ে যাবেই। কথায় কথায় দোখনো লোককে বিশ্বাস নেই। এতক্ষণ পরিশ্রম করে সে শাকগুলো তুলেছে।

এই সময় তার স্বামী আড়ম্বর ছুটে যায় তার পাশ দিয়ে। তাকে দেখে মঙ্গলা বলল, ওগো, এটা একটু ধরো না, ঝটতি বাড়িতে রেখে এসো—

আড়ম্বর দাঁড়ায় না। ধমক দিয়ে বলে, তুই বাড়ি যা। তোকে আসতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা মাথা থেকে বোঝাটা ফেলে দিল মাটিতে। খাওয়ার বেলা সবাই, আর কাজের বেলা সে একা? সবাই যাবে, সে যাবে না? এই-সব দোখনো লোকগুলো এমনই হয়। মঙ্গলা মেদিনীপুরের মেয়ে, তার শরীরে রাগ আছে। যথাসম্ভব জোরে জোরে সে হাঁটতে থাকে নদীর দিকে।

শুক্রবার ছাড়া বাকি দিনগুলো হাটতলা খাঁ খাঁ করে। শুধু খোলা থাকে বিষ্টুর মুদিখানা, সেখানে চা পাওয়া যায়,

সামনে একটি বেঞ্চ পাতা। ওই মুদিখানারই একপাশে পার্টি অফিস, আর এস পি'র। প্রতি হাটবারেই সি পি এম ও কংগ্রেসের কয়েকজন এসে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু এখনো পার্টি অফিস খুলতে পারে নি এখানে।

এই মুদিখানায় হাটবার ছাড়া অন্যদিন দুটি একটি খদ্দেরও আসে কি না সন্দেহ। বিশেষত এই বৈশাখ মাসে। কিছুই করার নেই বলে বিষ্টু এমনিই দোকান খুলে রাখে। ধারে দুচার কাপ চা বিক্রি হয়।

হাটখোলার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের একটি বন্ধ দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে প্রত্যেকদিন সকাল থেকে বিক্রি হয় হাঁড়িয়া। এক গেলাস আট আনা। ফড় খেলার পয়সা লেনদেনও হয় সেখানেই। ফড় খেলায় ধার চলে না, কিন্তু হাঁড়িয়া ধারে পাওয়া যায়, ধান দিয়ে শোধ করা চলে। খরা ঋতুতে কেউ কেউ এক বস্তা ধানও খেয়ে ফেলে।

হাঁড়িয়ার দোকানে তিনজন, চায়ের দোকানে তিনজন। চায়ের দোকানে বসে আছে প্রাইমারির মাস্টার জয়হরি, কাঠের কারবারি জয়হরি, আর কিছু-করে-না জয়হরি।

প্রাইমারির মাস্টার জয়হরি বলল, লঞ্চের আওয়াজ শুনছি, সাড়ে নটা বেজে গেল নাকি?

দোকানদার ভেতর থেকে উত্তর দিল, না, ও কোনো ইরিগেশান না, পুলিশের লঞ্চ-টঞ্চ হবে।

কাঠের কারবারি জয়হরি বলল, হ্যাঁগো, কাল সাতটায় মাছের লঞ্চ গিইছিল?

দোকানদার উত্তর দিল, 'ফুলমালা'র ইঞ্জিন বিগড়ে ছোট মোল্লাখালির ধারে বসে গেছে শুনলাম।

কিছু-করে-না জয়হরি বলল, মেজোবাবু পুকুর বেচল, তিন হাজার মাটি কাটল, চার টাকা করে রোজ দিয়েছে, এর একটা বিচার হবে না?

—সবাইকে তো বলে দিয়েছি, আট টাকার কম নেবে না। ওরা চার টাকায় মানল কেন?

—সেই তো কথা।

—বাসন্তীর লঞ্চ-ঘাটায় নন্দবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—

—কে কে চার টাকায় কাজ করতে রাজি হয়েছে, তাদের নাম লিখে রেখেছ?

—নন্দবাবু আমায় বললেন...

—ও তো নিরাপদ মিস্তিরি, আর নিরাপদ সাঁপুই, আর নিরাপদ দাস আর নিরাপদ জানা, এই চারজন।

—কেন ওরা চার টাকায় রাজি হল?

—নন্দবাবু আমায় বললেন, মাঝে মধ্যে এখানে আসি যাই, লোকেরা বলে, হাতে কোনো কাজ নেই, ঘরে ভাত নেই, তাই আমার কোনো দরকার না থাকলেও দু চারজনকে কাজ দিই।

—তা বলে চার টাকায় খাটাবে?

—স্বভাব, স্বভাব। জমিদারি নেই, তবু এখনো মেজাজটা আছে।

—তুমিও তো নন্দবাবুর সামনে মেজোবাবু মেজোবাবু বলে হাত কচলে নমস্কার করলে দেখলুম।

—আমার একবস্তা ধানের দরকার ছিল, তাই মেজোবাবুর কাছে—

—দিয়েছে ধান?

—বাবু বললে, তুই পাগল হয়েছিস, জয়হরি! আর আমি এখানে ধান রাখি! চতুর্দিকে লোভী আর চোর গিসগিস কচ্ছে, দ্যাখ গে, আমার গোলায় চার পাঁচটা এতটা বড় বড় ফুটো—

দোকানদার ভেতর থেকে হেসে উঠল।

—সবাইকে বলে দিতে হবে, আট টাকা রোজের কমে কেউ যেন এবার মাঠে না নামে।

—এদিকের লোকেরা শুনলেও ওই বাঙালপাড়ার লোকগুলো শুনবে না, ওরা যা পায় তাতেই রাজি হয়ে যায়।

—নন্দবাবুর জমিতে কেউ যেন চাষে হাত না দেয়।

—বাঙালপাড়ার লোকগুলো ভারি তেড়িয়া।

—বাঙালপাড়ার সাধুবাবা কিন্তু আমার ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন।

—মহাদেবের কী খবর গো? সেরে উঠেছে?

—না গোসাবায় নিয়ে গেছে, যদি কিছু হয়, বাঁচার আশা কম।

—নন্দবাবু চার টাকা রোজে কাজ করিয়ে গেল, আর তোমরা অমনি মেনে নিলে?

—নন্দবাবু বলল লোকগুলোর ঘরে ভাত নেই, তাই কাজ দিলাম, নইলে আমার এখন মাটি কাটাবার দরকার ছিল না।

—সে কথা তোমরা বিশ্বাস করলে অমনি?

—আমি তো যাই নি, নিরাপদ গেছে কাজ করতে।

দোকানদার আবার হেসে উঠল।

—এই, তুমি ফিকিফিকি হাসছ কেন গো?

দোকানদার বলল, ভূপেন গড়াই মেজোবাবুর কাছ থেকে বারো বিঘের প্লট কিনেছে।

—এর মধ্যে হাসির কী আছে?

—মেজোবাবুর চেয়েও ভূপেন গড়াই-এর টাকার জোর বেশি।

—ও কিসের শব্দ?

—অত লোক ছুটছে কেন?

—তাহলে কি এসে গেল?

—তাই তো মনে হচ্ছে, চলো, চলো দেখে আসি—

ঠকাঠক্ করে চায়ের গেলাসগুলো নামিয়ে রেখে ছুটে গেল ওরা তিনজন। দোকান খোলা রেখে দোকানদারও। তাড়ির দোকান থেকেও ওরা ছুটে এল।

হেলে গরুগুলোকে স্নান করানো হচ্ছে ভূপেন গড়াইয়ের পুকুরে। দশটি বেশ স্বাস্থ্যবান বলদ। স্নান করাচ্ছে ওবাড়ির রাখাল। তার নাম কেনো। বয়স এগার। কিন্তু কেনোকে দেখায় সাত বছরের বালকের মতন। বলদগুলো কিন্তু তাকে বেশ মানে। রোদ্দুরে পোড়া পিঠগুলো পরম আরামে ভিজিয়ে নিচ্ছে গরুরা। পুকুরের অন্য পারে স্নান করছে তিন-চার জন নারী পুরুষ। পাড়ার লোকেরা এই পুকুরে স্নান করে।

কাছেই এত বড় নদী। কিন্তু কোনো কাজে লাগে না। কামটের ভয়ে কেউ স্নান করতে নামে না নদীতে। জলের অভাবে ফসল শুকিয়ে গেলেও এ নদীর জল আনা যায় না জমিতে। এমন নুন-পোড়া জল। শুধু মাছ চাষের কিছু সুরাহা হয়, এই যা।

খড় ফেলে টালি বসানো হচ্ছে ভূপেন গড়াইয়ের বাড়িতে। বর্ষা আসবার আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। কাজ করছে তিনজন ঘরামি। নিত্যানন্দ জানা, নিত্যানন্দ দলুই আর নিত্যানন্দ দাস। উঠোনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে তদারকি করছে ভূপেন গড়াই নিজে। খালি গা, চেক লুঙি, বাঁ হাতের মধ্যমায় একটা পলার আংটি, ভূপেন গড়াইয়ের পিঠের ডান দিকে অনেকখানি মাংস খুবলে নেওয়ার দাগ। ওইখানে তাকে বাঘে থাবা মেরেছিল। সে অনেককাল আগের কথা, যখন ভূপেন গড়াই অন্যদের সঙ্গে নৌকো নিয়ে জঙ্গল মহলে যেত কাঠ আনতে। তখন ওই-সব কারবারে ঝুঁকি যেমন ছিল, লাভও ছিল তেমন।

দুজন ঘরামি ঘরের চালে বসে কাজ করছে, আর বুড়ো যোগানদার ঘ্যাঁসঘ্যাঁস করে চুলকে যাচ্ছে উরু। গরম পড়লেই এই বৃদ্ধের সারা গা পাঁজরায় ভরে যায়, সেইজন্য লোকে এর নাম দিয়েছে ঘেয়ো নিতাই।

ভূপেন গড়াই বলল, অ নিতাইদা, একটু হাত লাগাও, চটপট করো, কখানি টাইল তুলতে যে সারাদিন লাগিয়ে দিলে।

ওপর থেকে একজন নিত্যানন্দ বলল, তোমার ছাউনির দুখানা বাঁশও পাল্টানো দরকার গো বাবু! কমজোরি হয়ে গিয়েছে।

ভূপেন গড়াই বলল, সে কি রে, একেবারে নতুন বাঁশ, এই তো গত ১লা বোশেখে ধরিয়েছি।

ঘেয়ো নিতাইয়ের বেশ রসবোধ আছে। চুলকুনি থামিয়ে সে বলল, তুই কী বলছিস রে নিতাই! গত ১লা বোশেখে ভূপেনের বংশ বৃদ্ধি হল মনে নেই? তুই বলছিস সে বাঁশ পাল্টাতে?

ভূপেন গড়াই-ও হাসিতে যোগ দিল। পাঁচটি কন্যা-সন্তানের পর গত বৎসরই তার প্রথম ছেলে জন্মেছে। কেউ সে কথার উল্লেখ করলেই সে খুশি হয়।

ভূপেন ওপরের উদ্দেশে বলল, কী গো, আজই শেষ হবে তো? মনে হচ্ছে আজ বিকেলের দিকেই বাদলা নামবে।

—আজ বৃষ্টি নামবে? তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক গো গড়াইদা!

—আজ শেষ হবে না। দু দিনের কাজ।

—আট টাকা করে দিচ্ছি, একটু ভালো করে মন দিয়ে কাজ কর, আজ বৃষ্টি নেমে গেলে—

—আজ বৃষ্টি নামবে? হেঃ!

—দেখিস, আমি বলছি।

—এক বান্ডিল বিড়ি বাজি রইল।

পাঁচখানা টালি ওপরে তুলে দিয়ে ঘেয়ো নিতাই বলল, বাজির একটা বিড়ি এখন আগাম দেবে নাকি গো?

ভূপেন গড়াই তখন সদ্য একটা বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল। তার এই একটা স্বভাব, কেউ বিড়ি চাইলে সে মুখের ওপর না বলতে পারে না। কিন্তু এখন বিড়ি দিলেই এরা কাজ বন্ধ করবে! ফ্যাসাদ কম নয়, মজুরি ঠিক গুণে নিবি, কিন্তু কাজও দ্বিগুণ না হোক, দেড়া তো করবি অন্তত!

বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে ভূপেন গড়াই বলল, যত রাতই হোক, আজ কিন্তু কাজ শেষ করে দিয়ে যেতে হবে এই আমার সাফ কথা!

—এ তো তিনদিনের কাজ গো। একদিনে হয় কখনো?

—আমায় কাজ শেখাচ্ছ? আমি কাজ জানি না? নিজে হাত লাগাব, দেখবে?

ওপর থেকে একজন নিত্যানন্দ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এসে গেছে! ও গড়াইদা, সব লোক ছুটছে!

—কী হল, কী হল? কী বললি?

—এসে গেছে! আমি এখেন থেকে দেখতে পাচ্ছি, এসে গেছে!

—এসেছে তো কী হয়েছে? মাথা কিনে নিয়েছে নাকি! নে, কাজ কর!

—সবাই দৌড়চ্ছে নদীর ধার দিয়ে!

—যাক না! তোরা কাজ কর। দুপুরে মুড়ি দেব, এক বান্ডিল করে বিড়ি দেব সব্বাইকে যদি আজই কাজ তুলে দিস।

কে শোনো কার কথা। ঘরের চাল থেকে প্রায় গড়িয়ে নেমে এল দুই নিত্যানন্দ। ঘেয়ো নিতাই দৌড় দিয়েছে তার আগেই। ভূপেন গড়াই আর কী করে, সে-ও ছুটল ওদের পিছু-পিছু। পুকুরে গরুগুলোকে ফেলে রেখে কেমোও চলে গেছে একটু আগে।

হুড়মুড় করে সব বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে নারী-পুরুষ। এ-সব জায়গায় মুহূর্তে খবর রটে যায়। তা ছাড়া লঞ্চের আওয়াজ তো আছেই। শিশু, বৃদ্ধ, নারী এমন কী অসুস্থরাও বাদ রইল না। এমন দৃশ্য তো কেউ কোনোদিন দেখে নি!

কাতারে কাতারে মানুষ নদীর দুধারে। প্রবল বাতাস দিচ্ছে ক দিন ধরে, যে বাতাসে মেঘ উড়ে যায়। আকাশ পরিষ্কার।

পর পর তিনটি লঞ্চ আসছে নদী দিয়ে। একটা পালতোলা নৌকো ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে ফেলে তীরের দিকে ভেড়বার চেষ্টা করল। অনর্থক একজন সময় কাটাবার জন্য খ্যাপলা জাল ফেলেছিল, সে-ও জাল তুলে নিয়ে স্থির চিত্র।

তিনটি লঞ্চেই অনেক সুসজ্জিত মানুষ। রয়েছেন রাজপুরুষেরা, তাঁদের অনুগত ঠিকাদারেরা এবং পুলিশ-বাহিনী। মাঝখানের লঞ্চটিতে ঘুমিয়ে আছেন দেবতা। তাঁর পাশে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ দেহরক্ষী। সামনের ও পেছনের লঞ্চে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, রেডিও, টিভির কর্মীদের সর্বক্ষণ ব্যস্ত ভঙ্গি। একটা শুশুক একসঙ্গে তিনটি লঞ্চের উপদ্রবে দিশেহারা হয়ে হঠাৎ মাথা তুলেই আবার ডুব দিল।

দু পাড়ের লোকজন হাত পা ছুঁড়ে পাগলের মতন চিৎকার করছে। ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল দেবতার। তিনি অর্ধেক নিমিলিত চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে দুপাশ দেখলেন। তার পর এত অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি জলদ গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন, হালুম!

মর্মবেদনার ছবি

লেক মার্কেটে নাকি অন্য বাজারের চেয়ে ভালো মাছ পাওয়া যায়। যত সব বাজে কথা! এক একজন আছে, নিজের পাড়াটাকে সব ব্যাপারে বড় করে দেখাতে চায়। মর্নিং ওয়াকের সময় রোজ রোজ ধরণীধরের কাছে লেক মার্কেটের নানান গুণপনার কথা শুনে কিশোর আজ গিয়েছিলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন কিসের কী। মাছের বদলে মাছির দৌরাত্মই বেশি। পড়ে আছে কিছু আড় মাছ আর বড় বড় নোনাজলের ভেটকি, যার কোনো স্বাদ নেই।

মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে বাজার সারলেন কিশোর। এর মধ্যে অনেকবার ধরণীধরের মুণ্ডুপাত করা হয়ে গেছে। জগুবাবুর বাজার এর চেয়ে অনেক ভালো, সেখানে দোকানিরা সবাই চেনা, কেউ খারাপ জিনিস দেয় না। কিশোর ঠিক করে ফেলেছেন, আর কোনোদিন পরের কথায় নাচবেন না। জীবনের আর যে-কটা দিন বাকি আছে, নতুন করে আর অচেনা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার দরকার নেই। মানুষের জীবনের একটা সময়ে গণ্ডিটা ছোট হয়ে আসে। তখন অল্প কয়েকজনকে নিয়েই খুশি থাকতে হয়। যাক, এই একটা শিক্ষা হল আজ।

ফলের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা ঝুড়ির দিকে চোখ পড়ল। দোকানের বাইরে রাখা আছে, ঝুড়িটা তাতে ভর্তি কামরাঙা ফল।

কিশোর থমকে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন কামরাঙাগুলোকে। তারপর নিচু হয়ে একটা তুলে নিলেন হাতে। ঠাণ্ডা সবুজ রঙের কামরাঙা ছুঁয়ে তাঁর হাতের অদ্ভুত আরাম হল। সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন যে ঠিক পঁয়ত্রিশ কিংবা তারও বেশি, বোধহয় চল্লিশ বছর বাদে তিনি কামরাঙা ফল হাতে ছুঁচ্ছেন। একটা চেনা জিনিস জীবনে এতদিন বাদ ছিল?

কোনোদিনই কিশোর কামরাঙা কেনেন নি। তাই দাম সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। এ দেশে কামরাঙা দুর্লভ জিনিস নিশ্চয়ই, নইলে এতদিন চোখে পড়ে নি কেন?

—এগুলো কত করে?

দোকানদারটিও বেশ বয়স্ক। গোঁফটি পুরো পাকা। বেশ ভরাট মুখ। দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য আছে।

—আশি পয়সা জোড়া। তিনটে এক টাকা।

কিশোর খুশি হলেন। বেশ সস্তাই বলতে হবে। পাঁচ টাকা জোড়া শুনলেও তিনি আশ্চর্য হতেন না। মনে মনে হিসেব করে তিনি বললেন, আছে, তা হলে ন টা দিন। ন টা শুনে দোকানদারটি বিস্মিতভাবে তাকালেন কিশোরের দিকে। তারপর কিছু যেন বুঝতে পেরে হাসলেন। কিশোরের সঙ্গে তার একটা সমমর্মিতা স্থাপিত হল। তিনি বললেন, ন্যান্ আপনে দশটাই ন্যান, তিন টাকা দেবেন।

বেশ মন দিয়ে বেছে বেছে একটা একটা তুলতে লাগলেন কিশোর। কয়েকটা আছে আধপাকা, কিন্তু সেই রং কিশোরের পছন্দ নয়। স্বচ্ছ সবুজ রংটাই চোখকে স্নিগ্ধ করে। পাকা কামরাঙা কিশোর কখনো দেখেছেন কি না ঠিক মনে করতে পারলেন না। এগুলো বেশ ভালো জাতের, পাঁচটা শিরাই বেশ উন্নত।

মাছের ব্যাপারের দুঃখটা ভুলে গিয়ে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে গেল। একটা নতুন জিনিস, বাড়ির সবাই অবাক হবে, ট্রাম ধরে তিনি চলে এলেন ভবানীপুরে।

ওপরের বারান্দা থেকে সুনন্দা তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, দাঁড়াও কানাইকে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন আগে হৃৎপিণ্ডে একটা ছোট্ট খোঁচা লেগেছিল বলে ডাক্তার তাঁকে ভারী জিনিস বইতে বারণ করেছেন। কিন্তু কিশোর সব সময় সে নির্দেশ মানেন না। বাজার করা তাঁর বরাবরের অভ্যেস, এটা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। সুনন্দা কানাইকে সঙ্গে দিতে চান, তাও কিশোরের পছন্দ নয়। বাজারে তিনি নানা রকম রঙ্গ-রসিকতা করেন, চাকর সঙ্গে থাকলে কি তা চলে?

কানাই আসবার আগেই তিনি দুটো থলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। রিটায়ার করার পর শরীরটা একটু ভাঙলেও মনের জোর আছে যথেষ্ট। তিনতলায় উঠতে একটু হাঁপ ধরে গেলেও সুনন্দার সামনে সেটা গোপন করে গেলেন।

সুনন্দার হাতে তোয়ালে, এক্ষুনি বাথরুমে ঢুকবেন। এটা কিশোরের পছন্দ নয়। কানাই রান্না করে, সেই সব জিনিস গুছিয়ে রাখে, তবু বাজার এলে বাড়ির গিন্নি একবার তা দেখবে না? সুনন্দার এসব ব্যাপারে আগ্রহই নেই। কিশোর যে কত খুঁজে খুঁজে অসময়ের এঁচোড় কিংবা কাঁচা আম নিয়ে আসেন, সুনন্দা তা খেয়ালও করেন না। বাড়িতে কোনো গুণগ্রাহী না থাকলে বাজার করার আনন্দ নেই। কিশোরের মনে আছে, বাবা বাজার করে ফিরলেই মা সব কিছু ঢেলে ফেলতেন রান্নাঘরের সামনে, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে মন্তব্য করতেন। বাবার ভুল ধরতেন। যেমন, পুঁইশাক আনলে কুমড়োও আনতে হয়, কই মাছের দিনে ফুলকপি না আনলে চলে না, শোল মাছের সঙ্গে মূলো চাই আর পাবদা মাছের সঙ্গে বড়ি। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে একটা উড়ো দৃষ্টি দিয়ে সুনন্দা জিজ্ঞেস করলেন, ও গুলো কী?

কৃতার্থ হয়ে গিয়ে কিশোর এক গাল হেসে বললেন, কামরাঙা। তুমি চেনো না? সুনন্দা বললেন, চিনবো না কেন? কিন্তু অতগুলো......কী হবে ও গুলো দিয়ে?

—খাবে! সবাই মিলে খাবে। রেয়ার জিনিস। আচ্ছা তুমি মনে করে দ্যাখো, এই যে আমরা কতলোকের বাড়িতে যাই, কোনো দিন, কারুর বাড়িতে তুমি কামরাঙা খেতে দেখেছো? কেউ তোমায় অফার করেছে? তা হলেই বুঝতে পারছো, এরকম একটা ভালো জিনিস চট করে পাওয়া যায় না।

সুনন্দা প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন।

মা বাবা শখ করে এঁর নাম দিয়েছিলেন কিশোর। তখন খেয়াল করেন নি, তাঁদের ছেলে একদিন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হবে, তখন এই নামটা কত বেমানান হবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গ উঠলেই কিশোর বলেন, কেন, বোম্বাইতে এই নামে আমার চেয়েও অনেক বুড়ো বুড়ো লোক আছে।

বয়েস প্রায় বাষট্টি হলেও কিশোরের মনের মধ্যে একটা ছেলেমানুষির ভাব রয়ে গেছে এখনো। নানান ছোটখাটো জিনিস থেকে আনন্দ পান। বাজার থেকে এক একদিন এক একটা অদ্ভুত জিনিস এনে মহা উৎসাহ দেখান, যেমন একদিন নিয়ে এলেন ঢেঁকির শাক, খুবই নাকি অপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু কিশোর ছাড়া সেই শাক আর কেউ খেতে চায় নি।

কামরাঙার ব্যাপারেও প্রায় তাই হল।

দুই মেয়ে মিলি আর জুলি, একজনের বয়েস তেইশ, অন্যজনের বয়েস একুশ। ওরা কেউ বাড়িতে শাড়ি পরে না, অন্তত সকালের দিকটা ঢোলা হাউস কোট পরেই কাটিয়ে দেয়।

পড়ার ঘর থেকে দুই মেয়েকে ডেকে আনলেন কিশোর। বেছে বেছে সব চেয়ে বড় দুটি কামরাঙা তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন দ্যাখ, খেয়ে দ্যাখ, কোনোদিন তো খাস নি।

দুজনেই গভীর সন্দেহের চোখে ফল দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

জুলি বলল, এটা কী?

কিশোর রহস্য করে বললেন, কী বল তো? কখনো দেখিস নি তো?

মিলি বলল, আমি দেখেছি। একবার শান্তিনিকেতনে একটা বাড়িতে দিয়েছিল।

কামরাঙা না কী যেন নাম?

কিশোর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললেন, শান্তিনিকেতন? সেখানে পাওয়া যায়? আশ্চর্য! এসব আমাদের পূর্ববঙ্গের ফল, আমরা ছেলেবেলায় কত—

—এখন খেতে ইচ্ছে করছে না, বাবা।

—খেয়ে দ্যাখ না! খেয়ে দ্যাখ না! একটা ফল খাবি।

—একটু আগে চা খেয়েছি!

—তাতে কী হয়েছে? চা খাবার পর অন্য কিছু খেতে নেই?

—পরে খাবো। বিকেলে খাবো।

দুই বোনের মধ্যে ছোটজনের ব্যক্তিত্ব বেশি। সে কামরাঙাটা রেখে দিল ফ্রিজের মাথায় বেতের ঝুড়িতে। মিলি এখনো সেটা হাতে ধরে আছে।

কিশোর ভাবলেন, শহরে মানুষ হবার এই দোষ। কোনো নতুন জিনিস খেতে চায় না, খাবার নিয়ে পরীক্ষা করতেও চায় না। ধরা-বাঁধা কয়েকটা জিনিস খেয়ে গেলেই হল। গ্রামে যারা মানুষ হয়, তারা নিত্য নতুন কত কিছু আবিষ্কার করে। কতরকম ফল তিনি খেয়েছেন ছেলেবেলায়। ডউয়া বলে একটা ফলের কথা তিনি কারুকে বোঝাতেই পারেন নি। কেউ কেউ ডউয়া দেখে নি, নামও শোনে নি। এখানকার বাজারে ওঠেই না। অথচ কী চমৎকার স্বাদ ডউয়ার।

শহরের ছেলে মেয়েরা আপেল খায়, আর আপেল জিনিসটা কিশোরের অখাদ্য লাগে। ঠিক মনে হয় রুগীর পথ্য। তিনি ক্ষীণ অভিমানের সুরে বললেন, খাবি না?

মিলি তার বাবার এই অভিমানটুকুর মূল্য দেয়। সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আচ্ছা আমি খাচ্ছি। একটা কামড় দিয়েই সে বলল, ও মা গো! ভীষণ টক।

কিশোর বললেন, টক তো হবেই। কামরাঙা টক হবে না? তবে কী রকম অন্যরকম টক সেটা বল? কাঁচা আম কিংবা তেঁতুল কিংবা পাতিলেবু কিংবা চালতা—কোনো কিছুর সঙ্গেই মিল নেই। কামরাঙার টক স্বাদটা একেবারে নিজস্ব। সেইটাই তো এর মজা। এই দ্যাখ, আমি খাচ্ছি।

কিশোর একটা কামরাঙাকে ঠিক মাউথ অর্গানের মতন মুখের সামনে ধরে সযত্নে একটি কামড় বসালেন।

মিলি বলল, না, বাবা, তুমি খাবে না। তোমার না অ্যাসিডিটি। এতটক খেলে—

কিশোর বললেন, কিচ্ছু হবে না। ফেভারিট জিনিস খেলে কখনো শরীর খারাপ হয় না।

—কামরাঙা তোমার ফেভারিট। আগে কোনোদিন খেতে দেখি নি তো।

—তোদের জন্মের আগে.....

ছোট ছেলে বাবুসোনা ছাদে খেলছিল। এই সময় নিচে এল সে জল খেতে। কিশোর খুব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, এই, তুই খাবি। এই দ্যাখ কামরাঙা, কোনোদিন খাস নি, খেয়ে দ্যাখ—

বাবা ও দিদিদের পারিবারিক দৃশ্যটি বাবুসোনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কারণ, তার হাতে এখন একটুও সময় নেই।

তবু বাবার কথা শুনে সে সবুজ রঙের পাঁচ কোনা জিনিসটা হাতে নিয়ে কিছুই না দেখে ঘ্যাক করে এক কামড় দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা কুঁচকে বলল, এঃ, বাজে! কামরাঙাটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কিশোর দুহাত তুলে বললেন, ফেলবি না, ফেলবি না, আমাকে দে। একটি বিস্মিত দৃষ্টি সমেত এঁটো ফলটি বাবার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার দৌড়ে চলে গেল বাবুসোনা।

মিলি বলল, বাবা তোমার এ জিনিস চলবে না।

এরই মধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুনন্দা। তিনি স্বামীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে মেয়েদের বললেন, তোরা ওগুলো নষ্ট করিস না, রেখে দে। কানাইকে বলবো চাটনি করে দিতে। কিশোর প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, চাটনি। কক্ষনো না। সুনন্দা বললেন, কেন?

—কামরাঙা কক্ষনো রান্না করতে নেই।

—রান্না করতে নেই, তার মানে?

—অনেক ফল আছে, যা রান্না করা চলে না। যেমন আমলকি, পেয়ারা, বেল, কামরাঙা.......

সুনন্দা বললেন, কেন, বেলের মোরব্বা হয় না?

মিলি বলল, পেয়ারার জেলি হয়।

কিশোর বিরক্তভাবে বললেন, ওসব এদেশে হয়—

সুনন্দা বললেন, তোমার বাঙাল দেশের কথা ছাড়ো তো। টক জিনিস দিয়ে ভালো চাটনি হবে।

কিশোর দুঃখ পেলেন। তিনি কোনোদিন কামরাঙার চাটনি খান নি। আর খেতেও চান না। নিজের হাতের কামরাঙাটা তিনি খেতে খেতে, আর একটিও কথা না বলে বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

এত টক জিনিস তিনি আর খেতে পারেন না, লেবুর রস খেলেও পেট জ্বালা করে, তবু তিনি কামরাঙাটা ফেলবেন না, যেমন করেই হোক শেষ করবেনই।

এখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে তাঁর প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে কাগজ পড়ার সময়। তিনখানা কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়া চাই। যত রোদ বাড়বে, তত চেয়ারটা টেনে টেনে সরিয়ে নিতে হবে ছায়ায়।

একটু নুন পেলে ভালো হতো, কিন্তু নুন চাওয়া মানেই পরাজয়। আশ্চর্য, আজকাল অল্পবয়েসি ছেলে মেয়েরা টক খেতে ভালবাসে না। অথচ তাঁদের ছেলেবেলা টক জিনিসগুলোই ছিল ছোটদের সবচেয়ে প্রিয়। নুন দিয়ে কাঁচা আম মেখে খাওয়া, তারপর চাল্‌তা করমচা। দিশি আমড়া, কাঁচা তেঁতুল......

টুসটুসে কামরাঙার রস গড়িয়ে পড়ল তাঁর জামায়। পাঁচটা দিক খাওয়া হয়ে যাবার পর মাঝখানটা চুষলেন খানিকক্ষণ, তারপর ভেজা হাতটাও তিনি পরম সন্তোষে তাঁর ধুতিতে মুছলেন।

তারপর চোখের সামনে লম্বা করে মেলে ধরলেন ইংরিজি কাগজটা। হেড লাইন কয়েকটা দেখতে না দেখতেই তাঁর মন উধাও হয়ে গেল। তিনি আর অক্ষর দেখছেন না। তিনি সবুজ রঙের ছবি দেখছেন।

দুটো গাছ ছিল। বেশি বড় নয়, তবে অনেক ডালপালা, পাতাগুলো মিহিন। কামরাঙা ফুল কী রকম যেন হয়? মনে পড়ছে না। সাদা নয়? করমচার ফুল শাদা, আমড়ার সাদা—।

একটা গাছ ছিল দত্ত বাড়ির পেছনে, আর একটা ওদেরই পুকুরে যাবার পথে। কিশোর দ্বিতীয় গাছটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট মনে আছে তিনি এই গাছটার ওপরের ডালগুলোর নাগাল পেতেন না। লাফিয়ে লাফিয়ে ফল পাড়তে হল। কিন্তু এখন তিনি নাগাল পাচ্ছেন, তাঁর বাষট্টি বছরের শরীরটি ওই গাছটার প্রায় সমান। কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন? তাঁর সেই ছেলেবেলার চেহারাটা কোথায়? সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, কী রকম দেখতে ছিলেন তিনি তখন? কই মনে পড়ছে না তো। পুকুর ধার থেকে হেঁটে আসছেন বেণুদি। বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, ঠিক সেদিনকার চেহারা। বুলুদির এক মাথা চুল, দুর্গা ঠাকুরের মতন মুখ, চোখ দুটিতে সব সময় অবাক-অবাক ভাব। কামরাঙা গাছটার পাশে একজন বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেণুদি মুখটা নিচু করে চলে গেলেন। তাঁর দুহাতে এক গাদা ভিজে কাপড়।

প্রায় হাহাকার গলায় কিশোর বললেন, বেণুদি, বেণুদি, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি কিশোর! আমি চ্যাটার্জিদের বাড়ির কিশোর!

বেণুদি শুনলেন না, মুখও ফেরালেন না।

একটা শব্দ পেয়ে কিশোর মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরালেন। তাঁর বড় মেয়ে মিলি।

কিশোর মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, সেই সময়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বেণুদিও তো মিলির বয়েসিই ছিল। অথচ, মিলি তো একটা বাচ্চা মেয়ে, হাবভাবে কত ছেলেমানুষ, কিন্তু বেণুদিকে কত বড় মনে হতো। চেহারায়, ব্যবহারে পরিপূর্ণ এক নারী। তিনি মিলির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

মিলি এসব লক্ষ্য করল না, সে রেলিং দিয়ে উঁকি মেরে কী যেন দেখতে লাগল।

কাগজের দিকে চোখ ফিরিয়েও কিশোর আর সেই কামরাঙা গাছটার ছবি ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। মিলির উপস্থিতির জন্যই এরকম হচ্ছে? নিজের ছেলে মেয়ের কাছে নিজেকে সব সময় বয়স্ক বাবা মনে হয়। যদিও একথা স্বীকার করতে নিজের কাছে অন্তত বাধ্য যে মিলির বয়েসি অন্য কোনো মেয়ে দেখলে তিনি বেশ একটা সুখের উত্তেজনা বোধ করেন।

বেণুদি তাঁর চেয়ে বয়েসে চার পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। গ্রামে ওই বয়সি সব মেয়েরই বিয়ে হয়ে যায়, বেণুদির হয় নি। কেউ কেউ যেন বলতো, অল্প বয়েসেই বেণুদির এক জায়গায় বিয়ের সব ঠিকঠাক হবার পর ভেঙ্গে গিয়েছিল। বেণুদির ছোট বোন রেণু, কিশোরের চেয়ে এক বছরে ছোট, কিন্তু সেই রেণুর কথা মনে নেই। রেণু নয়, বেণুদিকে দেখলেই কিশোর যখন সত্যিকারের কিশোর ছিলেন, তখন বুক কাঁপতো।

—কী দেখছিস রে মিলি?

—সুরঞ্জন আসবে বলেছিল ন টার সময়। এখনো এল না। মহা ক্যাবলা ছেলে। কিছুতেই কথার ঠিক রাখতে পারে না।

—সুরঞ্জন কি তোর বন্ধু? আমি তো ভেবেছিলুম জুলির।

—জুলিরও বন্ধু না, আমারও বন্ধু না। সুরঞ্জন হল আমাদের জিপ গাড়ি! যখন ইচ্ছে ওকে নিয়ে যেখানে খুশি যাওয়া যায়।

—কী অদ্ভুত কথা তোদের।

—তোমরা এসব বুঝবে না।

—কেন বুঝবো না রে?

—তোমাদের আমলে তো ছেলে-মেয়েদের মেলামেশাই ছিল না। ওই যে, সুরঞ্জন এসে গেছে—

কিশোরকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই মিলি ছুটে চলে গেল।

কিশোর মনে মনে বললেন, তোরা কি আমাদের গত শতাব্দীর মানুষ ভাবিস। কে বললে মেলামেশা ছিল না? আমাদের পূর্ব বাংলার গ্রামে.....কই পথে দাঁড়িয়েও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার বাধা ছিল না তো? মেয়েরাও বন্দি থাকতো না ঘরের মধ্যে। এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত করত। ওরে মিলি, তোরা কি বুঝবি, তখন অনেক ভালো ব্যাপার ছিল, গ্রামের প্রত্যেকটি সুন্দরী মেয়েরই একজন দুজন প্রেমিক থাকত, জাতের মিল না হলে বিয়ে হতে পারতো না বটে, কিন্তু প্রেম কি কেউ আটকাতে পারত? প্রেমের পর বিরহ আর সারাজীবন তার মধুর স্মৃতি। হ্যাঁ, আমারও ছিল একজন প্রেমিকা, চৌধুরীদের বাড়ির মাধুরী, এখন সে লক্ষ্ণৌতে থাকে। তোরা দেখিস নি তো তাকে, তোদের মায়ের চেয়েও অনেক সুন্দরী।

কিশোর এবারে দেখতে পেলেন চৌধুরী বাড়িটি। পাকা বাড়ি, দোতলা। তাদের গ্রামের সবচেয়ে ঝকঝাকে বাড়ি।

ডান পাশের দিঘিটা পদ্মপাতায় ভরা। সেই দিঘীর ঘাটটায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে তিনটি ছেলে মেয়ে। তার মধ্যে গোলাপি রিবন বাঁধাটিই মাধুরী না? কত বয়েস, বড় জোর ন-দশ? এর থেকে অনেক বড় বয়েসেও তো মাধুরীকে দেখেছেন কিশোর। মাধুরীর সেই চেহারা কোথায়?

চৌধুরীদের বাড়ির প্রতিটি ঘর মনে আছে কিশোরের। কিন্তু কোনো ঘরেই তিনি বড় বয়েসের মাধুরীকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এ যেন ফ্রেমটি রয়েছে অটুট, ভেতরে ছবিটি নেই। এতো বড় অস্বস্তি।

সিনেমার দৃশ্যান্তরের মতন আবার কামরাঙা গাছটির ছবি ফিরে এল। পুকুর ঘাট থেকে আসছেন বেণুদি। একেবারে পরিষ্কার, জীবন্ত। ভিজে কাপড়ে তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট, ঠিক যেন কুমোরের তৈরি নিখুঁত কোনো মূর্তি, দেখলে এখনো মাথা ঘুরে যায়।

—বেণুদি, বেণুদি, চিনতে পারছেন না, আমি কিশোর?

পাশেই একটা সুপুরি গাছ, তার আড়ালে নিজেকে ঢাকা দিয়ে বেণুদি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর কিশোরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে নিয়ে বললেন, কে, ধীরেনকাকা? আপনি এখানে?

ছবিটা আবার খবরের কাগজ হয়ে গেল। কিশোরের বুকে কেউ যেন আঘাত করেছে। বেণুদি চিনতে পারলেন না। বেণুদি তাঁকে ধীরেনকাকা ভাবলেন?

ধীরেন তো ছিলেন কিশোরের জ্যাঠামশাই, কত বছর আগে মারা গেছেন। কিশোরকে কি ধীরেন জ্যাঠামশাইয়ের মতন দেখতে হয়েছে এখন? আগে কেউ বলেনি তো এরকম কথা।

ধীরেন জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বেণুদির বাবার কী নিয়ে যেন একটা ঝগড়া ছিল। তাই তিনি এ বাড়িতে যেতেন না। সেই জন্যই বেণুদি অবাক হয়েছেন।

কাগজটা হাত থেকে পড়ে গেল কিশোরের। তিনি অন্য একটা কাগজ তুলে নিলো। নিজের সতরো-আঠারো বছরের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন না বলে মন খারাপ লাগছে। পুরোনো স্মৃতিতে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে একটা মাদকতা আছে, কিন্তু সেখানে তাঁর এই বুড়ো বয়েসের শরীরটা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে কেন?

মিলি এসে জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি চা খাবে? কিশোর মুখ না ফিরিয়েই বলল, হঠাৎ এত দয়া?

—সুরঞ্জন চা খেতে চাইছে। মায়ের এখন ইস্কুলে যাবার তাড়া, চা করতে বললে কানাই চ্যাঁচাবে। তবু তোমার নাম করলে যদি দেয়।

—বেশ, তা হলে বলো আমার নাম করে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ, বাবা।

—শোন মিলি, সুরঞ্জন যদি তোদের জিপ গাড়ি হয়, তা হলে আমি তোদের কী হলুম রে।

—তুমি হচ্ছ আমাদের গুড ওল্ড ম্যান, তোমার সঙ্গে কার তুলনা।

—সব সময় বুড়ো বুড়ো করিস, জানিস বাষট্টি বছর বয়েসে অনেকে নতুন করে......

—ওল্ড ম্যান মানে বুড়ো নাকি? ওল্ড ম্যান মানে বাবা। কে তোমায় বুড়ো বলেছে? দেবানন্দ আর তুমি সমান বয়েসি।

কিশোর আবার ঝিম মেরে বসে রইলেন, কিন্তু কোনো ছবি ফিরে এল না।

একটু পরেই সুনন্দা সেজেগুজে এসে বললেন, আমি চললুম। তুমি দুপুরে কোথাও বেরুবে না তো। কিশোর দুদিকে মাথা নাড়লেন। এই সময় সুনন্দাকে বেশ কম বয়সি দেখায়। কিশোর রিটায়ার করে গেলেও সুনন্দার এখনো পাঁচ বছরের চাকরি আছে স্কুলে। খুব যে একটা দরকার আছে তা নয়। তবু সুনন্দা চাকরি করতে ভালবাসে। সুনন্দাকে খানিকটা হিংসে করেন তিনি এজন্য।

পূর্ব বাংলার সেই গ্রাম থেকে কিশোর কত দূরে চলে এসেছেন। যেন অন্যগ্রহে। মাস্টারের বাড়ির ছেলে, তাই অভাব অনটন কম দেখেন নি। শৈশবের কত সাধ অতৃপ্ত থেকে গেছে। মা কত পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা শুনিয়েছেন বাবাকে।

শেষ বয়েসে বাবা-মাকে খানিকটা সুখের মুখ দেখিয়েছেন কিশোর। প্রথমে বেহালায় বাড়ি, তারপর সেটা বিক্রি করে ভবানীপুরে বড় রাস্তার ওপর এই বাড়িটা কিনেছেন। তা ছাড়া ঘাটশিলায় একটা বাড়ি আছে, বিবেকানন্দ রোডে একটা ওষুধের দোকান। এজন্য অবশ্য কিশোরকে খাটতে হয়েছে অনেক। যৌবনের মাঝামাঝি থেকে হঠাৎ হুস করে এতগুলো বছর কী করে যে কেটে গেল। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেছে, কিশোরের খেয়ালই হয় নি এতদিন.......

.....কামরাঙা খেলেই জ্বর হতো। একটা তো নয়। এক সঙ্গে তিনটে, চারটে, পাঁচটা। কচুপাতায় খানিকটা নুন আর কয়েকটা কাঁচালঙ্কা নিয়ে এসে পুকুর ধারে বসে বসে খাওয়া। পরদিনই জ্বর। সত্যি কি কামরাঙা খাওয়ার সঙ্গে

ওই জ্বরের কোনো সম্পর্ক ছিল? মা বারণ করতেন, জ্বর হলেই বলতেন, আবার দত্তদের বাড়ি থেকে চুরি করে কামরাঙা খেয়েছিস?

কামরাঙা, কী সুন্দর না। অবশ্য কেন ওই নাম তো কে জানে। এ ফল তো কোনোদিন লাল হয় না। অবশ্য রাঙা মানে লালই হবে কেন, যে-কোনো রং। কামরাঙার পাতলা সবুজ রংটা কিশোরকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ফলগুলো, হঠাৎ একটা পেয়ে গেলে...যে গুলো উঁচু ডালের সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে....

বেণুদি একটা আঁকশি নিয়ে এসে বলেছিলেন, ওরে গাছটা ভেঙে ফেলবি নাকি? কটা চাস বল, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

শুধু বেণুদিকেই দেখা যাচ্ছে, কিশোরকে নয়। গাছ কোমর বাঁধা শাড়ির আঁচল। পিঠের ওপর খোলা চুল, বেণুদি আঁকশি দিয়ে কামরাঙা পাড়ছেন। সেই বয়েসটায় পুরুষের চোখ অসম্ভব মাংস লোভী হয়, তাই বেণুদির শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশই শুধু ঝলসে উঠছে, গাছ থেকে ফল-পাড়া নয়, যেন একটা নাচ, কিশোর দেখছে, চারদিকের নানা রকমের সবুজের মধ্যে এক গৌরবর্ণ মাংস প্রতিমা, আকাশটা নিচু হয়ে এসেছে চাঁদোয়ার মতন, একটা কুবো পাখি ডাকছে অবিশ্রাম সুরে, বেণুদির পায়ের ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সেই ডাক। হীরের গয়নার মতন এত উজ্জ্বল হয় স্মৃতির ছবি?

আজ কামরাঙা কিনে এনেছেন বলেই সে কিশোরের মনে পড়ছে বেণুদির কথা, তা নয়, বেণুদির মুখ তাঁর জীবনে বরাবরই ফিরে ফিরে এসেছে। যেন বেণুদিকে ঘিরে তাঁর মধ্যে রয়েছে এক গভীর মর্মবেদনা। অথচ, বেণুদির সঙ্গে সে রকম তো সম্পর্ক কিছু ছিল না। পাড়ার আর পাঁচটা কমবয়েসি ছেলের চেয়ে কিশোরকে তিনি কখনো আলাদাভাবে দেখেন নি। সেরকম মনোযোগই দেন নি।

একদিন, কিংবা হয়তো কয়েকদিন হবে, বেণুদির সঙ্গে প্রতাপদাকে দেখেছিলেন কিশোর। ধুতির ওপর ঢোলা পাঞ্জাবি পরা, তার বুকের বাঁ দিকে বোতাম, সবাই বলত প্রতাপকে প্রমথেশ বড়ুয়ার মতন দেখতে। সেই প্রতাপদা বেণুদির কাছ থেকে আঁকশিটা নিয়ে বলেছিলেন, দাও, আমি পেড়ে দিচ্ছি। একটা মাত্র ফল পেড়ে, সেটা কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রতাপদা বলেছিলেন, এই নে। এখন যা পালা।

কী সাংঘাতিক অপমান লেগেছিল সেই কথাটায়। এখনো যেন কানে ঝনঝন করে বাজে। কামরাঙা ফল পেকে পেকে গাছের নিচে পড়ে যায়। পাড়ার ছেলেরা যার যখন ইচ্ছে পেড়ে নিয়ে যায়, কেউ আপত্তি করে না। সেই ফল একটা মাত্র দিয়ে একটি সতেরো বছরের ছেলেকে অবহেলার সঙ্গে বিদায় করে দেওয়া। আশ্চর্য, বেণুদিও কোনো প্রতিবাদ করেন নি তখন। বরং, খানিকবাদে, পুকুর ধারে মুখ গোঁজ করে বসে থাকার সময় কিশোর শুনতে পেয়েছিলেন বেণুদি আর প্রতাপদার সম্মিলিত হাসি।

বাষট্টি বছর বয়েসেও এই কথা মনে পড়ায় কিশোরের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ যেন সচকিত হয়ে উঠল। প্রতাপদাকে হাতের কাছে পেলে যেন তিনি এক মুহূর্তে তাঁর গলা চেপে ধরতে পারেন।

তারপরেই তিনি অবাক হলেন। প্রতাপদার ওপরে এখনো এত রাগ রয়ে গেছে কেন? প্রতাপদাকে তিনি আর বেশি দেখেন নি, দিল্লি না কানপুর কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন তিনি। বেণুদিকে তিনি বিয়ে করেন নি। কিশোরও তার পরের বছরই গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন।

মিলি চা দিয়ে বলল, বাবা, আমি আর জুলি একটু বেরুবো সুরঞ্জনের সঙ্গে।

—নিশ্চয়ই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবি!

—কী করে বুঝলে?

—ওই জায়গাটার নাম বলাই তো সবচেয়ে সুবিধে, তাই না?

—মোটেই না, আমরা যাচ্ছি অনাময়দার বাড়ি।

—সে আবার কে?

—ও একটা স্কাউন্ড্রেল। ওকে তোমার না চিনলেও চলবে।

—তা একটা স্কাউন্ড্রেলের বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে কেন দল বেঁধে?

—অনাময়দা আমার বন্ধু ভাস্বতীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। ভাস্বতী বেচারা আর লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুতেই পারে না।

—তা সেখানে গিয়ে কি মারামারি হবে নাকি?

—দরকার হলে মারতেও পারি। সেই জন্যই তো সুরঞ্জনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

—থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াবে না তো? দেখিস।

—না, না, সে সব কিছু নয়। স্রেফ ভয় দেখাবো। ওর নামে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো। তুমি আবার বসে বসে চিন্তা করতে যেও না যেন আমাদের জন্য।

কিশোর প্রসন্ন ভাবে হাসলেন। ছেলে-মেয়েদের কোনো গতিবিধিতে বাধার সৃষ্টি করেন না তিনি। ওদের সঙ্গে ইয়ার্কি ঠাট্টা হয়। তার সুফল এই যে ওরা কখনো মিথ্যে কথা বলে না তাঁর কাছে। সত্যি কথার সৌরভই আলাদা। শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।

সুরঞ্জন ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো, অথচ জুলি মিলি তাকে মনে করে জিপ গাড়ি। এরা দল মিলে যাচ্ছে এদের একজন বান্ধবীর পক্ষ নিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে ঝগড়া করতে। এদের ধরন-ধারনই আলাদা।

হঠাৎ কিশোর ভাবলেন, এই যে মিলি, জুলি, সুরঞ্জন আর ভাস্বতী আর অনাময়, এরা কি কেউ কারুকে ঈর্ষা করে? দেখলে তো বোঝা যায় না। একালের ছেলে মেয়েরা বুঝি ঈর্ষা ভুলে গেছে।

নারীদের ব্যাপারে কিশোরের মনে সে রকম কোনো গুপ্ত অতৃপ্তি নেই। কাজের খাতিরে তাকে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। নিজের স্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য কয়েক নারীদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক হয়েছে কোনো কোনো সময়ে। সুনন্দার সঙ্গে বিয়ের আগে অন্তত আরও দুজনকে চেয়েছিলেন। আর তাঁর প্রথম প্রেমিকা সেই চৌধুরীদের বাড়ির মাধুরী, বেশ একটা মধুর বাল্যপ্রেম জমেছিল তার সঙ্গে।

কিন্তু সেই মাধুরীর মুখখানাও ঠিক মতন মনে পড়ে না। অন্যান্য মেয়েদেরও তেমন করে মনে রাখেন নি কারুকে। প্রথম যৌবনের খেলার সঙ্গীদের অনেকের নাম বা চেহারা অনেক কষ্ট করে স্মৃতিতে আনতে হয়। নিজের চেহারাটাই মনে নেই।

কিন্তু বেণুদি আর প্রতাপদা, বেণুদির হাত থেকে প্রতাপদার সেই আঁকশি নিয়ে নেওয়ার ছবি তার স্মৃতিতে যেন আগুনে ঝলসানো উল্কির মতন দগদগ করছে। সেই প্রথম অপমান, সেই প্রথম তীব্র ঈর্ষা, তা কিছুতে ভোলা যায় না।

পুকুর ধারের পায়ে-চলা রাস্তাটাতে কাঁচা পাকা চুলের প্রৌঢ় মানুষটি দাঁড়িয়ে কাকুতি-মিনতি ভরা গলায় বলতে লাগলেন, বেণুদি, একবার আমার দিকে তাকাও, একবার আঁকশি-ধরা হাতখানি উঁচু করো, কুবো পাখিটার ডাকের ছন্দে তোমার পা উঠুক-নামুক, শুধু আমার জন্য। এখন তো প্রতাপদা কাছে নেই।

ছবি

ক্যারোলিন তখন দেশে ফিরে যাবে। জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে। মেয়েদের ডর্মিটারিতে ক্যারোলিনের একটা সীট ছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ কয়েক মাস ক্যারোলিন আমার ঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে। ছুটির দিনে সারাদিন, রাত্তিরেও বারোটা-সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, ছাত্রীদের ডর্মিটারিতে রাত একটার মধ্যেই ফেরার নিয়ম।

আমার ঘরেই ছড়ানো রয়েছে ক্যারোলিনের বইপত্র, কিছু কিছু পোশাক, ওর চিরুনি, স্নানের তোয়ালে, চিঠিপত্র, গয়নার বাক্স। ক্যারোলিন সব খুঁজে খুঁজে গোছাচ্ছে। আমার নিজের সব জিনিসপত্র কোথায় আছে—তাও আমি এখন জানি না—শেষের কয়েক মাস আমি ক্যারোলিনের উপর নির্ভরশীল ছিলাম।

খাটের তলা থেকে ও টেনে বার করেছে আমার নিরুদ্দেশ জুতো জোড়া, ওয়ার্ডরোবের অন্ধকার কোণ থেকে বেরুলো আমার মায়ের হাতে বোনা সোয়েটার, ঘরে কোথায় কি আছে, তাও ক্যারোলিন দেখিয়ে দিতে লাগলো—এই যে দ্যাখো, এটায় আছে চিনি, চায়ের প্যাকেট অনেকগুলো জমা আছে—এখন আর কিনো না, দুরকম চাল রইলো দুজায়গায়—মিশিয়ে ফেলো না—এই কৌটায় টারমেরিক (হলুদ গুড়ো)—যা না হলে তোমাদের কোনো রান্নাই হয় না, রেফ্রিজারেটারের হ্যাণ্ডেলটা আলগা হয়ে গেছে বাড়িওয়ালাকে বলো, হুইস্কির বোতল আর বিয়ার ক্যান এগুলো জমে গেছে—এগুলো এবার একদিন বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।

এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম দুজনে। এবার ক্যারোলিন ক্যানাডায় ফিরে যাবে—আর হয়তো ইহজীবনে দেখা হবে না। আমি ফেরার পথে কয়েকদিন নিউইয়র্ক থামবো—তখন মনট্রিয়েল থেকে এসে ক্যারোলিন আমার সঙ্গে আবার দেখা করবে—আশ্বাস দিয়েছে, তাও তো কয়েকদিনের জন্য, তারপর সারা জীবনের ব্যবধান।

দুজনেরই বুকের মধ্যে চাপা দুঃখ—কিন্তু আর কোনো উপায়ও তো নেই। বিয়ের কথা বলিনি। ক্যারোলিনের মা চিররুগ্না, মাকে বিষম ভালোবাসে ক্যারোলিন, মাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। আমার পক্ষেও, ওকে বিয়ে করে এদেশে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। আর বেশিদিন এদেশে থাকতে হবে ভাবলেই আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। বিদেশে থেকে যাওয়ার চিন্তাটাই আমার পক্ষে অসহ্য।

যাবার আগে ক্যারোলিন ওর এক বান্ধবীকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে চায়। আমার ঘরে। ক্যারোলিন বললো, আমি চলে গেলে তোমার তো কয়েকদিন অন্তত একা একা লাগবে, তাই লিণ্ডার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। লিণ্ডার সঙ্গে তুমি মাঝে মাঝে দেখা করো—ও বেচারি বিষম একা।

সেদিন পর্যন্ত আমি ক্যারোলিনের একনিষ্ঠ প্রেমিক। অথচ, এইসব মেয়েরাই পারে নিজের প্রেমিককে অন্য মেয়ের হাতে তুলে দিতে। ক্যারোলিন জানে, আমি সারাজীবন ওর বিরহে সন্ন্যাসী হয়ে থাকবো না, ক্যারোলিনও অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশবে না—এটা আমি দুঃস্বপ্নেও আশা করি না।

যেদিন নেমন্তন্ন, সেদিন ক্যারোলিন আমাকে সকাল থেকেই শাসিয়ে রাখলো, শোনো, আজ কিন্তু তুমি দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। ঘরদোর গুছিয়ে রাখছি—খবরদার নোংরা করবে না! টাই যদি না পরতে চাও, পরো না, কিন্তু প্যান্টের সঙ্গে চটি পরতে পারবে না বলে দিচ্ছি। সু-জোড়া পালিশ করে নাও।

ক্যারোলিন এমনভাবে বলতে লাগলো যেন ওর বান্ধবী এক মহামান্য অতিথি। কোনো রাজকুমারী কিংবা রাজদূত কন্যা। ক্যারোলিন আরও বললো, শোনো আমি লিণ্ডাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো—সাতটার সময় আসবার কথা তো, আমি ইচ্ছে করেই দুতিন মিনিট দেরি করে আসবো—তুমি খুব ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলবে, কি ব্যাপার দেরি হল কেন? আমি অস্থিরভাবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আর একটু হলেই টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম—এইসব বলবে, বুঝেছো?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, কি ব্যাপার? তোমার বান্ধবী কি আমার বাড়িতে এসে আমাকে ধন্য করে দেবেন নাকি?

ক্যারোলিন হাসলো না। চোখ মুখ নিবিড় করে বললো, ওরকম বলো না। লিণ্ডা খুব অভিমানী মেয়ে। ও একটুকুতেই মনে আঘাত পায়—সেজন্য ওকে একটু বেশি খাতির যত্ন দেখাতে হয়।

ক্যারোলিনের মুখে লিণ্ডার নাম আগে দুএকবার শুনেছি—ভালো করে মনোযোগ দিইনি। এই শিকাগো শহরে আমি তিনজন লিণ্ডাকে চিনি। ক্যারোলিনের বান্ধবীর নাম লিণ্ডা ডারনেল। পুরো নামটা মুখস্থ রাখতে হবে—মেয়েদের নাম ভুলে যাওয়া খুবই অভদ্রতা।

সন্ধে-সাতটা আন্দাজ আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। বিকেল পর্যন্ত ক্যারোলিন রান্নাটান্না সেরে, টেবিল সাজিয়ে তারপর ওর বান্ধবীকে আনতে গেছে। মার্কির রোস্টটা শুধু ওভেনে বসিয়ে গেছে, আমাকে বলেছে ঠিক চল্লিশ মিনিট বাদে গ্যাস নিভিয়ে দিতে।

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় দেখলাম ক্যারোলিন একটা মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে। মেয়েটিকে আগে আমি কখনো দেখিনি। ক্যারোলিনেরই সমবয়েসি, স্বাস্থ্য আরও ভালো, হাঁটার ভঙ্গিতে একটা অহংকারের ভাব আছে। গাঢ় লাল রঙের স্কার্ট পরেছে মেয়েটি, মাথায় সাদা পালকের টুপি, হাতে একটা সরু লম্বা লাঠি। ক্যারোলিন আর সে দুজনেই হাসছে।

দরজা খুলেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ওরা এসে পৌঁছুতেই আমি ক্যারোলিনের শেখানো মতন অতি নম্র স্বরে বললুম, 'হ্যালো, মিস ডারনেল। ওয়েলকাম টু মাই প্লেস। আই ওয়াজ জাস্ট গেটিং অ্যাংকশাশ—'

মেয়েটি স্থির দুচোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, ইউ আর সেরিমোনিয়াস! হেই, জাস্ট কল্ মি লিণ্ডা। গ্লাড টু মীট ইউ!

প্রথম পরিচয়ে মেয়েদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য পুরুষদের আগে হাত বাড়াতে নেই। আমি সেইজন্য হাত গুটিয়ে ছিলাম। লিণ্ডা নিজেই হাত বাড়াতে আমিও হাত বাড়ালাম। লিণ্ডা আবার হাতটা ঠিক ধরতে পারলো না। হাতটা ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে, আমার হাতটা খুঁজে পেয়ে উষ্ণভাবে ঝাঁকুনি দিল।

ওর হাতে সাদা লাঠিটা দেখেই আমার অস্পষ্টভাবে খটকা লেগেছিল, এবার ওর হাতের ভঙ্গি ও স্থির চোখ দেখে আমি বুঝতে পারলাম, লিণ্ডা মেয়েটি সম্পূর্ণ অন্ধ। ক্যারোলিন একথা আমায় বলে নি কি আমাকে চমকে দেবার জন্য? ক্যারোলিনের হয়তো ধারণা ও আমাকে আগেই কখনো বলেছে, সুতরাং আর বলবার দরকার নেই। হয়তো সত্যিই বলেছে, আমি খেয়াল করিনি।

একটি অন্ধ মেয়েকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্য ঘরদোর গুছিয়ে রাখা, আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে দাড়ি কামিয়ে থাকতে বলার ব্যাপারটা খুব মজার—কিন্তু ক্যারোলিন নিজেও আজ বিশেষ রকমের সাজ-পোশাক করেছে—যেন লিণ্ডা একজন সম্মানিত অতিথি।

লিণ্ডাকে দেখলে সহজে বোঝা যায় না, তার হাঁটা চলা এত সাবলীল। চোখ দুটিও হুবহু সত্যিকারের মতন। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, মানুষ যখন হাসে—তখন তার চোখ দুটোও হাসে, কিন্তু হাসির সময় লিণ্ডার চোখ দুটি অনড়। তা ছাড়া, ওই সাদা লাঠি—এদেশে প্রত্যেক অন্ধের হাতে সাদা লাঠি থাকবেই, ওই লাঠি দেখলে মোটর চালকেরা গাড়ির গতি আস্তে করে দেয়, পুলিশ এগিয়ে আসে সাহায্য করার জন্য। হাতের লাঠি ঠুকেই লিণ্ডা বুঝতে পারে—ঘরের কোন দিকটা ফাঁকা; কোনদিকে আসবাব আছে। স্বচ্ছন্দে নিজেই গিয়ে সোফায় বসলো। তারপর হাতব্যাগ থেকে সিগারেট বার করে, নিজেই দেশলাই জ্বালাতে যাচ্ছিল—আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জ্বেলে দিলাম।

বাইশ-তেইশের বেশি বয়েস নয়, কিন্তু বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে তার। আমার বিস্ময়ের ঘোর একটু বেশি ছিল, লিণ্ডা নিজেই প্রশ্ন করলো, রবি, তুমি জানতে, আমি অন্ধ?

আমি থতমত খেয়ে বললুম, হ্যাঁ, মানে ক্যারোলিন বলেছিল—

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে লিণ্ডা বললো, আচ্ছা আগে প্রথম ব্যাপারগুলো সেরে ফেলা যাক। তোমার ঘরের একটা বর্ণনা দাও তো! তাহলে আমি বুঝতে পারবো, কোথায় কি আছে। কী রকম জায়গায় বসে আছি—বুঝতে না পারলে আমার অস্বস্তি লাগে।

আমি অবাক হয়ে গেলুম আবার। আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল, চেয়ার টেবিল, আলমারি বলতে ঠিক কি বোঝায়—তা কি অন্ধরা বুঝতে পারে? যে কখনো চেয়ার দেখে নি সে কি করে বুঝবে চেয়ার জিনিসটা আসলে কি রকম?—আমার সমস্যা সমাধান করে দিয়ে লিণ্ডা ফের বললো, আমি জন্মান্ধ নই, মাত্র তিন বছর আগে একটা অ্যাকসিডেন্টে আমার এ-রকম হয়েছে—আমি জানি, কোনটা কি রকম। আমি তো একটা সোফায় বসে আছি, তাই না? ঘরে আর কি আছে?

আমি বললুম, ঘরটা খুবই ছোট আর সাধারণ, তুমি যে সোফাটায় বসে আছো—ওটা আসলে ডেভেনপোর্ট—রাত্রিবেলা ওইটাই টেনে খুলে নিলে খাট হয়ে যায়, ডানদিকে একটা জানালা—বাইরে ইস্ট ফিফটি নাইনথ্ স্ট্রিট, জানালার পাশে আমার পড়ার টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা বড় লাইট স্ট্যাণ্ড, যে-দরজা দিয়ে ঢুকলে তার পাশে বুক কেস, এর ওপরে ফুলদানিতে টুকটুকে লাল গোলাপ সাজিয়ে রেখেছে ক্যারোলিন, ডানদিকের দরজা দিয়ে আমার রান্নাঘর আর খাবারঘর একসঙ্গে, তার ওপাশে টয়লেট বাথরুম—এই সামান্য।

লিণ্ডা বললো, বা চমৎকার। নাইস অ্যাণ্ড কোজি রুম। এবার আর একটা ব্যাপার বাকি। তুমি কি রকম দেখতে, সেটা বলো।

আমি হেসে উঠে বললুম, সেটা খুব শক্ত! আমি কিরকম দেখতে—তা আমি কি জানি! ক্যারোলিনকে জিজ্ঞেস করো বরং—

—না, ক্যারোলিন বললে হবে না। ও তোমাকে ভালোবাসে, ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলবে!

ক্যারোলিন বললো, ইস্, মোটেই না। যা বিচ্ছিরি চেহারা—ও আবার বাড়িয়ে কি বলবো!

আমি ক্যারোলিনের দিকে জিভ দেখিয়ে বললুম, আর তোরই বা কি সুন্দর চেহারা রে? তুই তো একটা শাঁকচুন্নি!

লিণ্ডা বললো, ক্যারোলিন আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ওকে কি রকম দেখতে, তা আমি ভালো করেই জানি! ও অসাধারণ সুন্দরী। আচ্ছা শোনো, আমি যদি নিজস্ব উপায়ে তোমাকে দেখে নিই, তোমার আপত্তি আছে? আমার নিজের একটা—

ক্যারোলিন বললো, সেই ভালো রে লিণ্ডা! তুই নিজেই দেখে নে। রবি, একটু কাছে এগিয়ে এসো তো! আর একটু কাছে!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এগিয়ে গেলুম। লিণ্ডা উঠে দাঁড়ালো। ক্যারোলিন লিণ্ডার এক হাত এনে আমার গালে রাখলো। তারপর লিণ্ডা আমার শরীরে হাত বুলোতে লাগলো।

নরম পালকের মতন আঙুল আমার কপাল ছুঁয়ে চোখে নামল, তারপর নাক, ঠোঁট, চিবুক, আমার বুকে হাত রাখলো লিণ্ডা—আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। যেন কোনো আদিম ধর্মীয় প্রথা কিংবা ম্যাজিক। প্রথম পরিচয়ে সব মানুষের শরীর ছুঁয়ে আমরাও যদি মানুষ চিনতে শিখতাম—তাহলে পৃথিবীতে বোধ হয় কেউ কারুর শত্রু হতো না। লিণ্ডা আমার সারা শরীরে হাত বুলানো শেষ করে বললো, তুমি ভালো দেখতে কি না তা বলতে পারবো না—কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি ভালো লোক। ইউ আর আ গুড ম্যান!

—কি করে বুঝলে?

—আমি ছুঁয়ে বুঝতে পারি।

—যাদের সঙ্গে আলাপ হয়, সবাইকেই কি তুমি এরকম ছুঁয়ে দ্যাখো?

—যাদের ছুঁতে পারি না, তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না। আচ্ছা, তোমার গায়ের রং কি রকম? আমি আগে কখনো কোনো ভারতীয় দেখিনি।

—আমার গায়ের রং কালো, একেবারে কুচকুচে কালো, ছাতার কাপড়ও আমার কাছে লজ্জা পায়।

লিণ্ডা হাসলো। চোখ দুটি বাদ দিয়ে তার সারা মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে বললো, 'জানো, সত্যিকথা বলতে কি—আমার যখন চোখ ছিল, তখন আমি কালো লোকদের তেমন পছন্দ করতুম না, আমাদের পরিবারটা খুব গোঁড়া—নিগ্রোদের কখনো আমাদের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখন আমার চোখ নেই, এখন সব আমার অন্ধকার, এখন কালো রং-ই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

খাবার টেবিলে বসে আমরা লিণ্ডার দুর্ঘটনার গল্প শুনলাম। ক্যারোলিন অনেকখানি জানে—সে বলছিল, লিণ্ডা মাঝে মাঝে দুএকটা কথা যোগ করে দিয়েছিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে, লিণ্ডার যখন চোখ ছিল—তখন ওকে সবাই বলতো দারুণ সুন্দরী, খুব ছটফটে স্বভাবের মেয়ে ছিল লিণ্ডা। তার ছেলে বন্ধু অনেক, সব সময় পার্টি আর হৈ-হল্লা নিয়ে মেতে থাকতো, সে যখন যে গাড়িতে চাপতো—সে গাড়ির স্পীড হতো দুর্দান্ত।

সেই রকমই একদিন আটাত্তর নম্বর হাইওয়ে দিয়ে ওর ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ঘণ্টায় নব্বই মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। এই সময় হলো অ্যাক্সিডেন্ট, ওর সঙ্গের ছেলেটি তক্ষুনি মারা যায়। আর দেড়মাস বাদে যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল লিণ্ডা তখন পৃথিবী ওর কাছে অন্ধকার। দুটো চোখই গেছে। বাঁ দিকের গালের বিরাট এক চাকলা মাংসও নাকি উড়ে গিয়েছিল—কিন্তু সে জায়গাটা গ্র্যাফটিং করে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য। লিণ্ডার মুখ দেখলে কিছুই বোঝা যায় না; সারা মুখে কোথাও এতটুকুও দাগ নেই। পরিষ্কার টলটলে মুখখানি, শুধু চোখ দুটোই ভালো হয় নি।

ক্যারোলিন বললো, 'লিণ্ডার মতন এমন মনের জোর আর কারুর দেখিনি। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়, যে ওর অন্য কারুর চেয়ে কিছু অংশে কম। কোনো বিষয়ে কারুর সাহায্য নিতে চায় না! পড়াশুনো ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকসিডেন্টের ফলে ইনসিওরেন্স থেকে দশ হাজার ডলার পেয়েছে, সেই টাকায় নিজের খরচ চালাচ্ছে। একটি মেয়েকে মাইনে দেয়—সে ওকে প্রতিদিন ছ ঘণ্টা করে বই আর খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। নিজে লিখতে পারে ঠিক লাইন সোজা রেখে। অবিশ্বাস্য শক্ত মেয়ে!

লিণ্ডা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কয়েক বছর বাদেই তো আবার আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে—আবার আমি দেখতে পাবো—মাঝখানের এই বছরগুলো নষ্ট করে কী লাভ?'

—আবার ভালো হয়ে যাবে?

—নিশ্চয়ই। আমি সারাজীবন অন্ধ থাকবো নাকি?

—তবে যে শুনলাম—তোমার চোখ দুটোই তুলে ফেলা হয়েছে। এ দুটো পাথরের চোখ।

—তা হোক না। আধুনিক বিজ্ঞান আছে কি করতে! চক্ষু-ব্যাঙ্কে নাম লিখিয়ে রেখেছি। ঠিক মতন দুটো চোখ পেলেই ওরা আমাকে অপারেশন করে সেই চোখ দুটো বসিয়ে দেবে। পাঁচ হাজার ডলার খরচ হবে অপারেশনে—সে টাকা আমি সরিয়ে রেখেছি!

ক্যারোলিন আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো, ও বিষয়ে আর কথা না বলতে।

হয়তো এটা লিণ্ডার একটা স্বপ্ন। দুটো চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবার পরও আবার সেখানে অপারেশন করে চোখ বসিয়ে দেওয়া যায় কি না আমি জানি না। যদি যায়ও, অত্যন্ত কঠিন অপারেশন—সব কটা সার্থক হয় কিনা তার কোনোই ঠিক নেই—কিন্তু লিণ্ডা এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলছে যে তার সেই বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত বলে মনে হলো না।

এর দু দিন বাদে ক্যারোলিন চলে গেল আমার বুকে মোচড় দিয়ে। যাবার সময় আমাকে আবার বলে গেল, লিণ্ডার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে। প্লেনে ওঠার সময় ক্যারোলিনের চোখে জল—তবু সে মুখে বলছে, ভালো করে মিশে দেখো, লিণ্ডাকে তোমার ভালো লাগবে। ওর চোখ নেই কিন্তু ও অনেক কিছু দেখতে পায়—যা অনেক মেয়েই পায় না।

ক্যারোলিন যেন নিজের দাবি ছেড়ে লিণ্ডার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল। ক্যারোলিনের ধারণা আমি অতিরিক্ত ভালো মানুষ—এর পর কোনো রক্তখেকো ডাকিনীর হাতে পড়তাম, তার চেয়ে লিণ্ডার সাহচর্যে আমি নিশ্চিন্ত থাকবো।

সত্যি লিণ্ডাকে আমার ভালো লেগেছিল। ওর ওই স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন মুখে আমি একটা নতুন সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলাম। লিণ্ডার প্রবল আত্মবিশ্বাস আর মনের জোর দেখতেও আমার ভালো লাগতো। লিণ্ডার সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে দেখা করতাম।

প্রথম প্রথম খুব সাবধানে ওকে টেলিফোন করতাম—এক সময় দলে দলে ছেলে ওর জন্য পাগল ছিল, এখন আর কেউ যায় না। সেই জন্য লিণ্ডাও বড় বেশি সজাগ—কেউ ওকে দয়া দেখাতে আসছে কিনা। আমি ওকে নিয়মসম্মতভাবে মঙ্গলবার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতাম, শুক্রবার ওর সময় হবে কিনা। লিণ্ডা এতে খুশি হতো। লিণ্ডাকে নিয়ে আমি যেতাম মিসিগান হ্রদের পাড়ে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। লিণ্ডা আমাকে জিজ্ঞেস করতো, এখন কি সূর্য ডুবছে? মিসিগান হ্রদের নীল জলে কি পড়েছে আঁকাবাঁকা লাল ছায়া? দূরে সাবান কোম্পানির বিজ্ঞাপনের আলোটা কি জ্বলছে? ঘস ঘস করে শব্দ হচ্ছে—ওটা কোনো মোটর বোটের আওয়াজ? আঃ এক সময় আমি ওয়াটার স্কি করতে এত ভালোই যে বাসতাম!

ওকে নিয়ে একদিন আমি থিয়েটার দেখতেও গিয়েছিলাম। ওথেলো। প্রধান তিনজন অভিনেতা-অভিনেত্রী ওর আগে থেকেই চেনা—তারা কি রকম পোশাক পরেছে—সেটুকু আমার কাছ থেকে জেনে নিল, বাকি নাটকটা ও শান্ত সমাহিতভাবে বসে দেখলো। শুনলো না, দেখলোই বলা উচিত, আমার মনে হচ্ছিল, ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এমন কি ডেসডিমোনাকে হত্যার দৃশ্যে আমার মনে হয়েছিল, লিণ্ডার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হয়তো ভুল দেখেছিলাম, পাথরের চোখ দিয়ে কি জল পড়ে?

একমাত্র আমার সম্পর্কেই বলতো, রবি, তোমাকে কি রকম দেখতে—আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না। কোনো ভারতীয়কে আমি আগে নজর করে দেখিনি। তোমার গায়ের রং কালো? চুল কালো? চুল কোঁকড়ানো নয়? তোমার গোঁফ নেই জানি, দাড়ি রাখো না জানি, তোমার হাইট পাঁচ ফুট আট ন ইঞ্চি হবে, তাই না। তুমি শার্ট-প্যান্ট পরো তাও জানি—তবু সব মিলিয়ে মানুষটাকে কি রকম দেখতে কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না। চোখে-দেখা ছাড়া কিছুতেই মানুষের চেহারার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। তোমার একটা ছবি দেবে? যেদিন আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে—সেদিন আমি তোমাকে দেখবো। তার আগেও, মাঝে মাঝে তোমার ছবির দিকে চেয়ে থাকবো।

কৌতূহলবশত আমি লিণ্ডা সম্পর্কে চেনাশুনো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা সবাই বলেছিল, না, লিণ্ডার চোখ ফিরে পাবার কোনো আশাই নেই। 'আই ব্যাঙ্কের' লোকেরা ইচ্ছে করেই ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। যাতে যে-কটা দিন সম্ভব ও মনের সুখে থাকতে পারে। অন্তত যৌবনকালটা আশা নিয়ে বেঁচে থাকুক। বার্ধক্যে তো অনেকেরই অনেক কারণে হতাশা আসে।

তারপর একদিন আমারও শিকাগো ছেড়ে যাবার সময় এলো। লিণ্ডাকে যেদিন সে কথা বললাম, লিণ্ডা অনড় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। কোনোরকম ভাবাবেগ দেখালে না।

আস্তে আস্তে বললো, তুমি আমার খাঁটি বন্ধু ছিলে। তুমি চলে গেলে আমার মন খারাপ লাগবে অনেক দিন!

আমি বললাম, লিণ্ডা, তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে। তুমি একটি আশ্চর্য অপরূপ মেয়ে!

যাবার দুদিন আগে লিণ্ডাকে আমার ঘরে ডিনারের নেমন্তন্ন করলাম। আগের বার আমরা তিনজন ছিলাম, এবার ক্যারোলিন নেই, এবার শুধু আমরা দুজন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলাম দুজনে। এক বোতল স্যাম্পেন কিনেছিলাম—

কখন সেটা খেয়ে ফেললাম খেয়ালই নেই। অতখানি স্যাম্পেন খেয়ে লিণ্ডাও খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমার হাতটা ছুঁয়ে খানিকটা ব্যাকুলভাবে বলল, ইস, আজ দুঃখ হচ্ছে, যদি চোখে দেখতে পেতাম! যদি তোমাকে দেখতে পেতাম! তোমার মুখখানাও দেখিনি, কি দিয়ে তোমাকে মনে রাখবো?'

আমি বললাম, 'লিণ্ডা, চোখে যা দেখা যায় না, তা সবই তো তুমি দেখেছো!'

তা হোক, তা হোক! তবু মানুষের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। মুখের ছবি ছাড়া মানুষের স্মৃতি থাকে না।

বারবার লিণ্ডার ঠোঁট থেকে সিগারেট পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলুম, লিণ্ডার মন আজ খুবই অশান্ত। বললুম 'লিণ্ডা, চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

—আর কোনোদিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে?

—না, লিণ্ডা। যদি আবার কোনোদিন এদেশে আসি, তবে অবশ্য, তুমি যেখানেই থাক—তোমাকে খুঁজে বার করবো। ততদিনে নিশ্চয়ই তুমি চোখ ফিরে পাবে।

—যদি তখন তোমাকে চিনতে না পারি? তোমার মুখ তো আমি দেখিনি।

—গলার আওয়াজ? সেটা মনে থাকবে নিশ্চয়ই।

—না, গলার আওয়াজ মনে থাকে না। দাঁড়াও, রবি, তুমি কাছে এসো, প্রথম দিন তোমাকে যে-ভাবে দেখেছিলাম, আজ আর একবার সেরকম করে দেখে নি।

আমি ওর কাছে এগিয়ে এলাম। লিণ্ডা ওর নরম হালকা হাতটা আমার কপালে ছোঁয়ালো, তারপর নেমে এলো চোখের পাতায়, নাকে, ঠোঁটে—লিণ্ডা আবার কাতরভাবে বলে উঠলো, ওঃ, যদি মুখটা দেখতে পেতাম। কেন দেখতে পাবো না? কেন? কেন? আমি কি দোষ করেছি?

লিণ্ডা আমার বুকে মাথা গুঁজলো। আমি ওর মুখখানা উঁচু করে তুলে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। তারপর বললাম, 'লিণ্ডা, এটা মনে থাকবে?' হঠাৎ আবেগে লিণ্ডা একেবারে ভেঙে পড়লো, ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমার বুকে কিল মেরে বললো, 'না', না, না, আমি মুখ দেখতে চাই। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই।'

আমি লিণ্ডাকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। ওর উষ্ণ শরীরটা আমার শরীরে মিশে রইলো। একটু বাদেই লিণ্ডা নিজেকে সামলে নিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে শান্ত গলায় বললো, 'না, এবার আমি বাড়ি যাই, অনেক রাত হয়েছে বোধহয়। তোমার একটি ছবি আমাকে দাও।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ছবি দিয়ে কি করবে?—তক্ষুণি বুঝতে পারলুম, এটা জিজ্ঞেস করা অন্যায় হবে। শুধু বললাম, 'আমার ছবি?'

লিণ্ডা বললো, 'যাবার আগে তুমি আমাকে একটা কিছু উপহার দেবে না? তোমার একটা ছবিতে তোমার নাম সই করে আমাকে উপহার দিয়ে যাও। আমি মাঝে মাঝে ছবিটা দেখবো।'

সকালবেলা কয়েক রোল ফিল্ম কিনেছিলাম, সেগুলো মুড়ে দিয়েছিল একটা চকচকে কালো শক্ত কাগজে। আমি কাঁচি দিয়ে খুব সাবধানে সেটা থেকে একটা চৌকো টুকরো কেটে বার করলাম। এক টুকরো নিকষ কালো কাগজ, কোনো মলিনতা নেই সেটাতে—লিণ্ডার হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও।

লিণ্ডা পরম আদরে সেটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমি মাঝে মাঝেই এটার দিকে তাকিয়ে থাকবো। একদিন ঠিক দেখতে পাবো—তোমার মুখ।'

কোনোদিন চোখ ফিরে পাবে না লিণ্ডা, দৃষ্টিহীন পাথরের চোখ দিয়ে ও আমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে, আমি আমার কোন্ মুখের ছবি ওকে আর দিতে পারি? কালো শূন্যতা ছাড়া? তাই ছবির বদলে কালো কাগজটাই দিয়েছিলাম।

নাম নেই

দেখতে গিয়েছিলাম জঙ্গল, দেখে এলুম অন্য অনেক কিছু। সেই জঙ্গলে অনেক রকম ফুল ফুটেছিল, কত ফুলের নাম জানি না, কিন্তু সেখানকার কোনো বিশেষ ফুলের কথা আমার মনে নেই, মনে আছে শুধু একটি কিশোর বয়েসি ছেলের মুখ।

ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে রহস্যময় লাগে।

ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম বড় সুন্দর একটা পরিবেশে। এইসব দৃশ্য আমরা ছবিতে দেখি। কিংবা নিজেরা যখন এই দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হই, তার চেয়েও বেশি ভালো লাগে যখন পরে সেই দৃশ্যটার কথা ভাবি।

খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা ঢালু উপত্যকা, সেখানে একটি লাল রঙের নদী। 'সবুজ বন, রক্ত নদী', এরকম বলা যেতে পারতো, আসলে নদীটি একটি খুবই ছোট ঝর্ণা। লাল রঙের মাটি ধুয়ে ধুয়ে আসে বলে জলের রং ঠিক রক্তবর্ণ নয়। অনেকটা গেরুয়া গেরুয়া।

দুপুরের ঝলমলে রোদ, অথচ গরম নেই। দুদিন খুব টানা বৃষ্টির পর সেদিন রোদ উঠেছে, এইসব দিনে মন খুব ভালো লাগে।

আমরা নদীটা পেরিয়ে এবং ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেখানে নরবলি হয়। কথাটা শুনে অবশ্য আমরা খুবই অবিশ্বাস করেছিলুম। নরবলি? এই যুগে? হয়তো অতীত কালে কখনো হতো। স্থানীয় দুএকজন লোককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। কেউ কেউ আকাশের দিকে মুখ করে বলেছে, কী জানি! এটা অবশ্য কোনো দূর-দুর্গম অঞ্চলের কাহিনী নয়, এই জায়গাটা মাত্র দেড়শো কি দুশো মাইল দূরে, মেদিনীপুরে।

মন্দিরটি জনশূন্য। খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, সামনে একটা কাঠগড়া, খুব সম্ভবত সেখানে পাঁঠা কিংবা মোষ বলি হয়। খানিকটা টাটকা রক্ত এখনো পড়ে আছে।

ফেরার পথে আমরা লাল রঙের ঝর্ণাটার পাশে একটু বসলুম। আমরা অর্থাৎ আমরা দুই বন্ধু এবং বাংলোর চৌকিদার। সে-ই আমাদের গাইড।

যাবার পথেও দেখেছিলুম যে ঝর্ণাটার পাশে কতকগুলি ছাগল চরছে, আর সেগুলিকে পাহারা দিচ্ছে একটি ছেলে। বছর দশ এগারো বয়েস। রাখাল গরু চরায়, কিন্তু যে ছাগল চরায়, তাকেও রাখাল বলা যায়?

পরনে একটা ইজের খালি গা। ছেলেটি ছপ ছপ করে ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমার বন্ধু বললে, ছেলেটির মুখখানা ভারি সুন্দর দেখতে না?

আমি হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডাকলুম।

ছেলেটি অপলকভাবে তাকিয়েই রইলো, কোনা সাড়া দিল না। কাছেও এলো না।

চৌকিদারকে বললুম, ওকে ডাকো তো!

চৌকিদার ধমকের ভঙ্গিতে একটা হাঁক দিল, তাতে ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফুটল শুধু, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ছেলেটা খুব গোঁয়ার। আমরা অনেকবার ডাকাডাকি করতেও সে গ্রাহ্যই করলো না।

আমি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুন, তুমি চেনো ওকে?

চৌকিদার বললো, ও তো মহাদেব মাহাতোর ভাতুয়া!

তখনই জিজ্ঞেস করিনি, তবে ভাতুয়া কথাটার মানে পরে জেনেছিলাম।

আমি আবার ছেলেটিকে বললাম, এই, তোর নাম কী রে? তুই ডাকলে আসিস না কেন?

ছেলেটি তবু উত্তর দিল না। আমার বন্ধু বললো, আমরা শহরের লোক তো, তাই ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে।

আমি চৌকিদারকে বললুম ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে কেন? আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলবো? ওর নাম কী?

চৌকিদার বললো, স্যার, ওর নাম নেই। ও বোবা, কথা বলতে পারে না, তাই ওর নাম কেউ দেয় নি। সবাই ছোঁড়া ছোঁড়া বলে, কেউ কেউ শুধু বোবা বলেই ডাকে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল এই জঙ্গল খুব গহন, নিবিড়, নির্জন। আসলে জঙ্গলটি বেশ গভীর হলেও নির্জন নয়। ফাঁকে ফাঁকে অনেক মানুষজন বাস করে। কিছু কিছু চাষবাসও হয়। এই জঙ্গলে বাঘ নেই, তবে বাঘের চেয়ে অনেক বড় আকারের জানোয়ার আছে।

লাল রঙের ঝর্ণার পাশে ছাগল চরানো কিশোরটির সঙ্গে আমার একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে বোবা শুনে একটু মন খারাপ হয়ে গেল। বোবা বলেই বোধ হয় ও মানুষের কাছে আসে না।

আমরা যেই উঠে পড়লুম, অমনি ছেলেটি ঝর্ণা পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো আমাদের। যেন ও লুকোচুরি খেলছে।

বাংলোয় ফিরে এলাম খিদের টানে।

সেদিনই সন্ধেবেলা বেশ কিছু লোকের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাংলোর সামনে।

কিছু কিছু জঙ্গলের মানুষ জানতে এসেছে যে আমাদের কাছে বন্দুক আছে কিনা। আমরা জিপে করে এসেছি বলে ওরা আমাদের হোমরাচোমরা কেউ ভেবেছে। আমি জীবনে কখনো, খুব শখ থাকা সত্ত্বেও, বন্দুক ছুঁয়েই দেখিনি।

বন্দুক দরকার হাতি তাড়াবার জন্য।

প্রত্যেকবারই এইখানে একপাল হাতি আসে ফসল খাবার জন্য। এ বছর খরা, তাই জমিতে এখনও ফসল বোনা হয় নি, সেই জন্য হাতিরা এসে ফসল নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

অন্য বছর টিন পিটিয়ে এবং মশাল ছুঁড়ে হাতির পালকে তাড়ানো হয়, এ বছর তাতেও হাতিরা যাচ্ছে না। তারা তাদের খাদ্য পায় নি।

কাছাকাছি কোথাও হাতি এসেছে শুনে রোমাঞ্চ লাগে। শহুরে মানুষ জঙ্গলে এসে সত্যিকারের জংলি জানোয়ার দেখতে চায়।

আমরা তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু চৌকিদার আমাদের উৎসাহে বাধা দিয়ে বললে, আজ আর রাত্তিরের দিকে যাবেন না, স্যার। সকালে যাবেন।

সে আমাদের কিছুতেই বেরুতে দেবে না সন্ধেবেলা। তার তো একটা দায়িত্ব আছে।

বাংলোর সামনে কিছু লোক তখনও জটলা করছে। আমরা সেখান থেকে চলে গিয়ে বাংলোর পেছন দিকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ালুম। সেখান থেকে হাতি দেখা না গেলেও তাদের ডাক যদি অন্তত শোনা যায়।

কিছুই শোনা গেল না অবশ্য। খানিক বাদে ফিরে এলুম বাংলোয়। অন্য লোকেরাও চলে গেছে।

চৌকিদার বললো, একজনকে পাঠানো হয়েছে বাঁশপাহাড়িতে। থানায় খবর দেবার জন্য। গভর্নমেন্ট কোনো ব্যবস্থা না করলে হাতির উপদ্রবে অনেক ঘর বাড়ি এবার নষ্ট হবে। তিনটে হাতি এসেছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একা একজন গেল? সাহস আছে তো লোকটার? কে গেল?

চৌকিদার বলল, ওই গুরু মুখিয়ার ভাতুয়া গনাই!

আমি বললুম, লোকটা অন্ধকারের মধ্যে একা একা গেল, যদি হাতির সামনে পড়ে যায়? ওকে তো হাতিরা মেরে ফেলতে পারে!

চৌকিদার এ কথার কোনো উত্তর দিল না!

হাতির গল্প নয়, এটা ভাতুয়ার কাহিনী!

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, বারবার ভাতুয়া ভাতুয়া শুনছি। ভাতুয়া মানে কি?

তখন আমাদের বোঝান হলো যে ভাতুয়া এক ধরনের ক্রীতদাস। শুধু ভাত খাওয়ার বিনিময়ে তারা কোনো

বাড়িতে কাজ করে। খেতে পায় বলে তারা সব রকম কাজ করতে বাধ্য, এমন কি রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে থানায় খবর দেওয়া পর্যন্ত।

এর পরের খবরটি আরও চমকপ্রদ।

সকালে যে ছাগল-চরানো কিশোরটিকে দেখেছিলুম, সে এই ভাতুয়ারই ছেলে। ভাতুয়ার ছেলেও ভাতুয়া।

যে লোক শুধু ভাতের বিনিময়ে এক বাড়িতে জীবন বাঁধা দেয়, তারও স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি আছে? কিসের ভরসায় সংসার পাতে?

—ওর ছেলে ভাতুয়া, আর ওর বউ?

সেও আর এক বাড়িতে ভাতুয়া।

ওদের কোনো নিজস্ব বাড়ি আছে?

কী করে থাকবে, স্যার? ভাতুয়াদের চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয়। ওই গনাইয়ের এক টুকরো জমি আর বাড়ি ছিল, মেয়ে বিয়ে দেবার সময় বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলুম। বাড়ি নেই, সংসার নেই, তবু একটা পরিবার আছে। মাঝে মাঝে দেখা হয় নিশ্চয়ই ওদের। তখন কী কথা হয়?

লাল রঙের ঝর্ণার পাশের সেই কিশোরটির কথা আমার মনে পড়তে লাগলো বারবার। বোবা বলে তার একটা নামও দেওয়া হয়নি। এই পৃথিবীতে জন্মে একটা নামও কি তার প্রাপ্য নয়? বাড়িতে পোষা গোরু-ছাগল-কুকুরেরও একটা করে নাম থাকে। ওই ছেলেটির কোনো নাম নেই।

গাছের আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। কী ভাবছিল, কে জানে?

একটি পুরনো বই

ছেলেটি অনেকক্ষণ বসেছিল এক কোণে। ঘর-ভর্তি লোক। দিবানাথ চৌধুরী এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন, এখন বড় ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত সমাজসেবক। সুতরাং বহু লোক আসে তাঁর কাছে। কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানায়, অনেকেই নানারকম চাকরি-বাকরি বা অনুগ্রহ চায়, কেউ কেউ শুধু একবার করে দেখা দিয়ে পুরনো পরিচয় ঝালিয়ে রাখে—কখন কি দরকার পড়বে তার তো ঠিক নেই।

কলকাতায় যে কদিন থাকেন, দিবানাথ সকালের কয়েক ঘণ্টা এই সব লোকের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন। তাঁর অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব—তবু এদিকটাও উপেক্ষা করা যায় না, জনসংযোগ রক্ষা করাও তো দরকার।

দিবানাথের বসবার ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি পাতা, হঠাৎ দেখলে কোনো বড় ডাক্তারের চেম্বার বলে মনে হয়। এর পাশেও একটি ছোট ঘর আছে, সেখানে দিবানাথের সেক্রেটারি বসেন। সেক্রেটারিই দর্শনার্থীদের নাম ধাম লিখে ভিতরে পাঠান।

দিবানাথ এক এক করে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন—এক সঙ্গে অনেকের সঙ্গে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়, ঠিক ডাক্তারদেরই মতন। তবে, কারুর সঙ্গে একটু বেশিক্ষণ কথা বললেই বক্তৃতার মতন শোনায়—কলেজে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই এই অভ্যাসটা হয়ে গেছে।

এত লোকজনের ভিড়ে দিবানাথ ছেলেটিকে লক্ষ্যই করেন নি।

দিবানাথের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, বেশ রাশভারি চেহারা, মুখ দেখে মনে হয়, পৃথিবীর ওপর তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগই নেই। তবে, অন্যান্যদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

চাকরির আবেদন প্রার্থীই বেশি। এদের সঙ্গে একঘেয়েভাবেই কথা বলতে হয়। সবার আবেদনপত্রের ওপর তো তিনি আর সুপারিশ করে দিতে পারেন না। সেটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। তিনি সবাইকে বোঝাতে চান যে, সবাইকেই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে শিল্প বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা তো চলছেই। কিন্তু বাঙালি যদি শুধু চাকরি লোভী হয়েই থাকে—ইত্যাদি।

কেউ কেউ আসে হাসপাতালে সীট কিংবা সরকারি ফ্ল্যাট যোগাড় করার চেষ্টায়। কারুর কারুর গোপন কথাও থাকে।

ছেলেটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তাকে কেউ ডাকে নি, সামনে যেতেও বলে নি। এক সময় সে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে দিবানাথের সামনে এগিয়ে বললো, স্যার।

দিবানাথ মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেটির রোগা দোহারা, চেহারা, এক মাথা অবিন্যস্ত চুল, আধ ময়লা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে আছে—বয়স একুশ-বাইশের বেশি না।

দিবানাথ তখন আর একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, হাত তুলে বললেন, একটু পরে। একে একে আসবে।

ছেলেটি বললো, স্যার, আমি কিছু চাইতে আসি নি। আপনাকে একটি জিনিস দিতে এসেছি।

—কি, দরখাস্ত?

—না, একটা বই।

দিবানাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন, অনেকেই তাঁকে বই-টই উপহার দেয় বটে। এককালে তাঁর বই পড়ার খুবই নেশা ছিল, কিন্তু সে নেশা অনেকদিন ঘুচে গেছে। এখন সময় কোথায়? সব সময়ই তো লোকজন ঘিরে থাকে। গত এক বছরের মধ্যে সরকারি রিপোর্ট আর খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বই উল্টে দেখেছে কিনা ঠিক নেই।

ছেলেটির হাতে একটি ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট ছিল—সেটি খুলে একটি বই দিবানাথের টেবিলের ওপর রাখলো। খুব বিনীতভাবে বললে, একবার উল্টে দেখবেন, আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। বইখানা বহুদিনের পুরনো। অতি সাধারণ চেহারা, মলাট পর্যন্ত ছেঁড়া। একজন এত বড় বিখ্যাত ব্যক্তিকে আর কেউ কোনো দিন এরকম একটি পুরনো। অকিঞ্চিৎকর বই উপহার দেয় নি।

দিবানাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি?

ছেলেটি বললো, কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানে পেলাম।

একবার চোখ না বুলিয়ে পারা যায় না। নিয়ম রক্ষার জন্য দিবনাথ একবার বইয়ের পাতা ওল্টালেন। একটি ইংরেজি কবিতার সংকলন, পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' এই বই হঠাৎ তাঁকে দেবার মানে কি?

পরের পাতা উল্টে দেখলেন অতি অস্পষ্ট কালিতে লেখা আছে, 'তোমাকে দিলাম'— দিবানাথ চৌধুরী।

দিবানাথ এক দৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইলেন। হাতের লেখাটা তাঁর নিজেরই মনে হচ্ছে। অবশ্য, বহুদিন তার বাংলায় কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। তবু চেনা যায়। কিন্তু সেটা দেখে দিবানাথের কিছু মনে পড়ে না।

আর একটি পাতা উল্টে দেখলেন গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখা আছে, 'শ্রীমতী আশা বন্দ্যোপাধ্যায়, দোল পূর্ণিমা'।

দিবানাথের ষাট বছরের বুকটা ধক করে উঠলো। একি! এটা তো সত্যিই তিনি একদিন একজনকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

—তুমি এ বই কোথায় পেলে?

কেউ উত্তর দিল না। দিবানাথ চোখ তুলে দেখলেন, ছেলেটি নেই।

ঘরের অন্য লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেল ছেলেটি?

—দেখলুম তো স্যার, বেরিয়ে গেল।

—আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল? রতন, রতন।

পাশের ঘর থেকে দিবানাথের সেক্রেটারি হন্তদন্তভাবে ছুটে এলো। দিবানাথ বললেন, একটি ছেলে এখানে ছিল এই মাত্র, রোগা মতন, সে কোথায় গেল দেখ তো!

রতন জিজ্ঞেস করলো, কি নাম স্যার?

—নাম তো বলে নি। পাঞ্জাবি পরা, বড় চুল—

সেক্রেটারি ছুটে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুতিনজন। একটু বাদেই ফিরে এসে বললো, নেই তো। চলে গেছে। পুলিশে খবর দেবো?

দিবানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, তার দরকার নেই।

আর কারুর সঙ্গে কথা না বলে দিবানাথ বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এক সময় এইসব কবিতা মুখস্থ ছিল তাঁর। আশাকে এর থেকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। অতি কষ্টে দুপয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে এই বইটা কিনে উপহার দিয়েছিলেন আশাকে। তখন বইটার দাম ছিল মাত্র দুটাকা। বইটা পেয়ে আশা খুব খুশি হয়েছিল—দিবানাথ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আশার হাস্যোজ্জ্বল মুখ—এই চল্লিশ বছর পরেও।

তখন বৃটিশ আমল, দেশ জুড়ে অত্যাচার চলছে, চাকরি-বাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। সহায় সম্বলহীন দিবানাথ এই কলকাতায় কতদিন কলের জল খেয়ে কাটিয়েছেন। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন কত লোকের কাছে। কেউ পাত্তা দেয় নি। সামান্য একটি টিউশনিই ছিল সম্বল। সেই সূত্রেই আশার সঙ্গে আলাপ। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আশাকে। কিন্তু আশার মা-বাবা জানতে পেরে দিবানাথকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনায় ভালো ছিলেন দিবানাথ তবু পাত্র হিসেবে তাঁকে পছন্দ করে নি তাঁরা। আশার বিয়ে দিয়েছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। আজ ওরকম কত ইঞ্জিনিয়ার দিবানাথের কাছে হাতজোড় করে বসে থাকে। দিবানাথের বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগলো। আশা কোথায় আছে এখন। বেঁচে আছে কিনা তাও তিনি জানেন না।

কিন্তু এতকাল পরে তাঁর এই দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কি? ছেলেটি কে? কেন এসেছিলেন? এমনও হতে পারে—ছেলেটি হয়তো আগে দু একবার এসেছিল, চাকরি বা কোনো সাহায্য চেয়েছিল, পায় নি, তাই এমন ভাবে প্রতিশোধ নিয়ে গেল? একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মনে আঘাত দেবার সুখও তো কম নয়।

কিংবা দিবানাথের আর একটা কথাও মনে হলো। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন চল্লিশ বছর আগে তাঁর নিজের চেহারাও ওই ছেলেটিরই মতন ছিল। ওই রকম রোগা, এক মাথা চুল, জামা ময়লা। ওই ছেলেটা কি তাঁরই বিবেক? একটা ছেলের ছদ্মবেশ ধরে তাঁর বিবেক এসেছিল তাঁকে সচেতন করে দিতে?

দিবানাথ আপন মনে একটু হাসলেন। তাঁর যে বিবেক আছে বা কোনোদিন ছিল—এই কথাটাই যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন অনেক দিন।

প্রতিশোধের একদিক

অবিনাশ আমাকে ওরকম অপমান করে গেল, আমি ওর ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবো ঠিক করলুম। প্রতিশোধের কথা ভাবতে ভাবতে আমার এমন রাগ এলো শরীরে, যেন সমস্ত শরীরে বিষম জ্বর। কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। বেশী রাগ করলে আমারই ক্ষতি, তাহলে অবিনাশই জিতে যাবে— অবিনাশই প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর।

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য আমি খবরের কাগজ পড়া শুরু করি। তখন আবার অবিনাশকে ছেড়ে পৃথিবীর আরও অনেকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়। এত প্রতিশোধের চিন্তায় অবশ্য আমার সামান্য হাসিও পায়, তারপর চায়ের বদলে এক কাপ কফি খাবার শখ হলো হঠাৎ। গৌরীদের বাড়িতে গিয়ে একসময় কফি খেতাম। গৌরী, তুমি সাবধান, জানো না তোমারা কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

বাথরুমে দাড়ি কামাতে গিয়ে গালটা খরখর করে। শীতের সময় সাবান লাগাতে না লাগাতে শুকিয়ে যায়। আসলে ব্লেডটা পুরোনো। এই একটাই শৌখিনতা আছে আমার, সস্তা ব্লেডে দাড়ি কামাতে পারি না। কয়েকদিন ধরেই ব্লেড কিনতে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু এখন এই অবস্থায়, মুখে সাবান-মাখা, জুলপির কাছে খানিকটা কামানো, আমি কি করবো? বেরিয়ে গিয়ে এখন তো আর ব্লেড কিনে আনা যায় না, অথচ সেফটি রেজারটা টানতে গেলেই গালে অসম্ভব জ্বালা করছে। প্রায় কান্না এসে যাবার মতো। আমারই ভুলের জন্য এই আমার কষ্ট, কিন্তু নিজের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করা যায় না, তাই অবিনাশের প্রতি রাগটা আবার ফিরে এলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবিনাশের কথা ভেবে আমার মুখে বেশ খানিকটা ক্রোধ ও হিংস্রতা জেগে উঠলো। আমি ভুরু দুটো কুঁকড়ে, বাঁ চোখটা ছোট করে, ঠোঁট কামড়ে ভয়ংকর মুখে খুনি সেজে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ খেয়াল হলো, ছেলেমানুষের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটছি দেখলে বড় বৌদি হয়তো হেসে উঠবেন। তাড়াতাড়ি দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলাম। এইবার আমি আবার আয়নার কাছে, এই আয়নাটাই অবিনাশ, এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন প্রকৃত খুনি। নিজের মুখে যদিও এখন অর্ধেকটা সাবান লেগে আছে, কিন্তু আয়নার ওপাশে আমার মুখ পরিষ্কার এবং কঠিন। নিজের ওরকম চেহারা দেখে আমারই ভয় করতে থাকে, রাগের সময় আমার চোখ ওরকম ভয়ংকর ঠাণ্ডা ও মর্মভেদী হতে পারে, আগে তো জানতুম না। ডান হাত সেফটি রেজারটা ছুরির মতো তুলে ধরা। এই রকমভাবে অবিনাশের সামনে দাঁড়ালে.......

হঠাৎ মনে পড়লো, দার্জিলিঙে গিয়ে আমি একবার একটা ভোজালি কিনেছিলাম। বেশ বড়ো সাইজের, সুন্দর চামড়ার খাপে মোড়া। কিছুদিন সেটাকে ঘর সাজাবার জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিলাম দেয়ালে, তারপর ধুলোয় ওর খাপটা ময়লা হয়ে যেতে দেখে বাক্সে ভরে রেখেছি, ওটাকে তো কখনও ব্যবহার করাই হয়নি। কোনো রকমে দাড়ি কামানো শেষ করে বাক্স খুলে ভোজালিটা বার করলুম। এখনো বেশ চকচকেই আছে, রাখার সময় বোধহয় বুদ্ধি করে ভেসলিন মাখিয়ে রেখেছিলাম। ফলাটার চারপাশে হাত দিলেই বোঝা যায় বেশ ধার। এরকম ধারালো জিনিসে হাত দিলেই শরীর কেমন শিরশির করে। ব্লেডে ধার না থাকলে বিরক্ত লাগে, কিন্তু ছুরিতে অতটা ধার থাকা যেন সহ্য হয় না। শুধু চকচকে এবং বাঁকানো ফলা থাকাই যথেষ্ট ছিল। সমস্ত শরীরে অসহ্য অপমানের রাগ, হাতে মারাত্মক ভোজালি—এ কি অন্যরকম চেহারা আমার আজ। এই অস্ত্রটা কিনেছিলাম ছ-সাত বছর আগে, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—খাপ শুধু ছুরিটা দেখতে বেশ সুন্দর ছিল বলেই কিনেছিলাম। তখন কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই আত্মসাৎ করার ইচ্ছে হতো। গৌরীকে পাবার জন্য তখন যেমন উন্মুখ হয়ে ছিলাম। গৌরীকে ধরার চেষ্টায় আমার হাত দুটো তখন কম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে?

কিন্তু, এই ভোজালি দিয়ে অবিনাশকে আমি খুন করবো না কি? ঠিক অতখানি....ধরা পড়ার অবশ্য ভয় নেই। জীবনে হাজার হাজার গোয়েন্দা গল্প পড়েছি, ভালো ভালো বইতে দেখেছি,—খুনির কাজ প্রায় নিখুঁত শুধু সামান্য একটা ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। আমি আগাগোড়া ওদের কারুকে অনুসরণ করে, সাবধানে শুধু সেই ভুলটা এড়িয়ে যাবো। তাহলে কে ধরবে? না, ওসব ধরা-টরা পড়ার কথা আমি ভাবি না। কাগজেও তো দেখেছি, বাংলাদেশে বছরে গড়ে সাড়ে চারশো খুন হয়, তার মধ্যে মাত্র শ দেড়েক খুনি ধরা পড়ে। তাহলে আমাকে ধরা, আমি সব সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে!....অবিনাশকে খুন করার অবশ্য অন্য একটা বিপদ আছে, যদি ওকে খুন করার পর আমার অনুতাপ আসে? সে এক ঝঞ্ঝাট! অনুতাপে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি, প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরুচ্ছে, কয়েক মণ বোঝা বয়ে বেড়াবার মতো বুকের মধ্যে গোপনতার দুঃখ, তাহলে অবিনাশই জিতে যাবে।

অপমানের পর সেটা হবে আবার অবিনাশের নিজস্ব প্রতিশোধ।

তাছাড়া সত্যিকথা বলতে কি অবিনাশের সামনে আমি যখন ছুরি তুলে দাঁড়াবো—তখন যদি হঠাৎ গৌরী এসে পড়ে, নিশ্চয়ই গৌরী আমাকে দেখে হি-হি করে হেসে উঠবে। হাসতে হাসতে দুলে দুলে উঠবে, হাসির দমকে মুখচোখ লাল হয়ে যাবে, বলা যায় না—বোধহয় আমার আর অবিনাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসি কুলকুচো করে বলবে, ইস, বীরপুরুষ, আমাকে মারো তো, দেখি কতখানি সাহস হয়েছে আজ কাল! সেই বিশ্রি নাটকীয় পরিস্থিতি আমি কি করবো, ঠিক করাই মুশকিল। অবিনাশটা নিশ্চিত সেই সুযোগে মিটি-মিটি হাসবে। পেশাদারি খুনিদের মতো ধাক্কা মেরে আমি মাঝখান থেকে গৌরীকে সরিয়ে দিতেও পারবো না, কারণ গৌরীর শরীর আর আমি কখনো ছোঁবো না, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। না ছুঁয়েও, ছুরির এক খোঁচায় গৌরীকে সরিয়ে দেওয়া যায়, কিংবা ছুরির ভোঁতা দিকটা দিয়ে ওর মাথায় মারলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে! এমন আর শক্ত কি, এই তো আমি ভোজালিটা ধরে আছি; কব্জিটা ঘুরিয়ে নিলেই উল্টো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মারলুম গৌরীর মাথায়। আমার হাত তোমাকে আর কখনো ছোঁবে না, গৌরীকে বলেছিলাম, ছুরি দিয়ে ছুঁলে প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না।

কিন্তু, গৌরী যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসবে, সেইটাই সমস্যা। গৌরীর ওপর আমার কোনো রাগ নেই, তবে আমার শখ হয় গৌরীর মনে দুঃখ দিতে। কিন্তু কোন্ অস্ত্র দিয়ে মনের মধ্যে দুঃখ দেওয়া যায়, তাও তো জানি না। শরীরে আঘাত করার ঠিক কোনো কারণ নেই। গৌরী শেষ মুহূর্তেও আমাকে বিশ্বাস করবে না, কারণ ও জানে আমি কাপুরুষ। ওর ধারণা, আমি জীবনে কখনো কোনো দুঃসাহসের কাজ করতে পারবো না। যে আমাকে হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত কাপুরুষ বলে জানে, তার সামনে কি আমি কখনো সাহসী হয়ে উঠতে পারবো?

ছেলেবেলায় একবার, তখন দশ-এগারো বছর বয়েস আমার, খুব ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল, ছোটমামার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছিলাম। না, একবার নয়, তার আগেও দু-তিনবার ছোটমামার পকেট থেকে সিকি তুলে নিয়েছি, তিনি একটু উদাসীন প্রকৃতির লোক বলে হয়তো খেয়াল করতেন না। একদিন সদ্য তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছি, তিনি এসে পড়ে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে ফেললেন! আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ছোটমামা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। চড়-চাপড় বকুনি কিছুই দিলেন না, শুধু ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, এরকম কাজ জীবনে আর কখনো করো না। মাঝে মাঝে আমার কাছে দু-এক আনা চেয়ে নিয়ে যেও ঃ—ছোটমামা ওই ঘটনা আর কারুকে বলেন নি, জীবনে আর কখনো উল্লেখও করেন নি। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে, সেই পকেট মারার পর থেকে আমি আর পকেট মারা শিখিনি, আমি বড় চোর কিংবা ব্যাঙ্কডাকাত কিংবা কালোবাজারি কিছুই হইনি। এখন অন্যদেরই মতো সাধারণ মানুষ, এমনকি দোতলা বাসে আমি একদিন একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে প্রায় তিনশো টাকা ছিল এবং মালিকের নাম লেখা কার্ড ছিল বলে আমি টাকা-শুদ্ধু ব্যাগ ভদ্রলোকের বাড়িতে ফেরত দিয়ে প্রভূত কৃতজ্ঞতা এবং পুণ্য সঞ্চয় করেছি। ছোটমামার ছেলেটা একটু বখাটে ধরনের হয়েছে, সে আমার কাছ থেকে প্রায়ই দু-পাঁচ টাকা নিয়ে যায়, কিন্তু এত সবের পরেও, এখনও আমি যখন ছোটমামার ঠাণ্ডা চোখের সামনে দাঁড়াই আমার ভঙ্গি অবিকল চোরের মতো সঙ্কুচিত, আমি ছোটমামার চোখের দিকে আজও তাকাতে পারি না।

আমি কখনো কোনো সাহসের কাজ করিনি তা নয়, কিন্তু গৌরীর কাছে কাপুরুষ বলে চিহ্নিত হয়ে আছি। একবার, সেই যখন গৌরীর ছোট বোন শান্তা জলে ডুবে যায়.....। বারাসতে পিকনিকে গিয়েছিলাম, উনিশশো চুয়ান্নর শীতে, দলবল মিলে অনেকে। শান্তা বয়সে তখন সাত, শান্তাকে নিয়ে আমি আর গৌরী বাগানের অনেক ভেতরে চলে গেছি, একটা ছোট্ট পাড়বাঁধানো টলটলে পুকুরের পাড়ে বসেছি,-আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার আর গৌরীর বসে থাকা, গৌরী খুব চড়া হলুদ রঙের শাড়ি পরে ছিল, কমলা রঙের ব্লাউজ—গৌরীর রং খুব ফর্সা বলে ও পোশাকের রং নিয়ে লণ্ডভণ্ড খেলা খেলতে ভালোবাসে, আমি বোধ হয় একটা কর্ডের প্যান্ট ও গেঞ্জি পরেছি, গৌরী শাড়ি থেকে চোরকাঁটা তুলছে, আমি এক টুকরো নারকোল চিবিয়ে সাদা ছিবড়েগুলো ফু-র-র করে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। আমাদের সেই বসে থাকার দৃশ্যের মধ্যে শান্তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শান্তা ছিল না, শান্তা টোপাকুল কুড়োতে কুড়োতে কখন জলে পড়ে গেছে। হঠাৎ শব্দ পেলাম, পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে জলের আলোড়ন এবং শান্তার ক্ষীণমূর্তি। তৎক্ষণাৎ দুজনে দাঁড়িয়ে উঠেছি, গৌরী হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্যরকম গলায় তীক্ষ্ণভাবে ডেকে উঠলো, সুনীলদা!—মনস্থির করতে আমার দেরি হয় নি। আমি এক ঝটকায় গৌরীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছিলুম, অবিনাশ! তাপস! কেষ্টবাবু! কেষ্টবাবু! শিগগিরি—। আমার সেই চিৎকার এমন অসম্ভব ছিল যে, বোধ হয় তিনশো মাইল দূরে থেকেও শোনা গেছে।

এতক্ষণে গৌরী নিজেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং কেষ্টবাবু এসে লাফিয়ে পড়ার মধ্যে শান্তাকে গৌরীই প্রায় নিয়ে এসেছে পাড়ের কাছে। শান্তা মরেনি। অল্প চেষ্টাতেই ভালো হয়ে ওঠে। বিপদ কেটে যাবার পর আমরা যখন সবিস্তারে গল্প করছি, আমি খানিকটা কৃতিত্ব নেবারও চেষ্টা করছিলুম, আমি কি রকম মাথা ঠাণ্ডা রেখে মুহূর্তের

মধ্যে দলবলকে ডেকে জড়ো করতে পেরেছি—হঠাৎ গৌরী আমাকে থামিয়ে দিয়ে শ্লেষের সঙ্গে বললো, থাক, থাক, বীরপুরুষ! খুব বোঝা গেছে, গলার জোর ছাড়া আর কিছুই নেই!—সকলে একথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। আমার মুখের ওপর সপাং করে চাবুকের আঘাত পড়লো যেন। এতক্ষণে আমি একবারও ভাবিনি, আমি কোনো কাপুরুষতার কাজ করেছি! আমি যে সাঁতার জানি না—তা তো সবাই জানে। শান্তার জন্যে আমি নিজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে কী লাভ হতো? আরও কিছু বিপদ বাড়তো। সাঁতার না জানা দোষের হতে পারে, কিন্তু সাঁতার না-জেনেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়া কি খুব গৌরবের? সাঁতার জানি না বলেই আমি পুকুরে না নেমে ছুটে গেছি অন্যের সাহায্যের জন্য। আমার কাছে সেইটাই মনে হয়েছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেরই চোখে সেটা হাস্যকর ও কাপুরুষতা বলে মনে হয়েছে।

তারপর আমি গোপনে সাঁতার শিখে নিয়েছি। এখন আমি অনায়াসে যেকোনো পুকুর এপার-ওপার হতে পারি, কিন্তু এ পর্যন্ত আর করুকে জল থেকে উদ্ধার করার সুযোগ পাই নি। এমন কি গৌরীর সঙ্গেও আর কোনো নির্জন জলাশয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সুযোগ গৌরী আমাকে আর দেবে না, যাতে আমি নিজেই ওকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে পরে আবার উদ্ধার করে বীরত্ব দেখাতে পারি।

শান্ত বেঁচে উঠেছিল বলেই, সে-ঘটনা গৌরী বেশিদিন মনে রাখেনি। কিন্তু পরের আর-একটি ঘটনায় গৌরীর বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়। রাজা বসন্ত রায় রোডের এক গানের জলসা শুনে ফেরার পথে, তখন রাত দশটা, দোতলা বাস থেকে আমি আর গৌরী নেমে পড়েছিলাম এসপ্লানেডে। ইচ্ছে ছিল, গৌরীর সঙ্গে ময়দানের অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসি। তখন আমি খুব বেশি অস্থির ধরনের ছিলাম। তখন আমার অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস ছিল, কোনো মেয়েকে কোনো আন্তরিক কথা বলতে গেলে সেই সময় তাকে জড়িয়ে ধরতে হয়। বুক স্পর্শ না করে বুকের মধ্যে ঢোকা যায় না। এতদিন ধরে গৌরীর সঙ্গে আমার চেনা, অথচ, গৌরীকে কিছুই মনের কথা বলা হয়নি। কী আমার মনের কথা, জানি না। কিন্তু কিছু একটা যেন আমার বলার আছে। সেদিন আমার ইচ্ছে ছিল, দুহাত দিয়ে গৌরীর সারা শরীর জড়িয়ে ধরবো, যাতে এমন কোনো কথা আমার মুখে আসে, যা খুব আন্তরিক শোনাবে। এতদিন গৌরীকে তেমনভাবে জড়িয়ে ধরিনি বলেই কোনো কথা মনে আসে নি। গৌরীর মুখও সেদিন খানিকটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, ওর বাবা তখনও গানের জলসা শুনছেন, আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে—মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছি, এমন সহজে রাজী হবার মেয়েও নয় গৌরী। সেদিন ওর মুখচ্ছবি অন্য রকম।

কিন্তু, সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে, আমার মনে হতো একটি মেয়েকে নিরালায় আলিঙ্গন করার মতো জায়গা, সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। সব সময়েই এক হাজার চোখ চেয়ে আছে। কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে এসে দুজনে শহীদ স্তম্ভের ওখানটায় এসে পৌঁছলুম। সেখানেও চার-পাঁচজন লোক। আরও কিছু দূর এসে, বললুম, চলো গঙ্গার পাড়ে যাই।

—না, অতদূর না। ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে।

ফিরে, রেড রোড ধরে হাঁটতে লাগলুম। কিছুটা এগিয়েই যেন গা ছমছম করে, অল্প শীতের আকাশের নিচে ফাঁকা, কালো রাস্তা। কোথাও কোনো মানুষজন নেই। এখানে প্রায়ই গুণ্ডা-বদমাসের উপদ্রব হয় শুনেছিলাম। আবার খানিকটা ফিরে এসে, র‍্যামপ্যার্টের মাঠের অন্ধকারে আমি গৌরীর হাত টেনে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিলাম। বড় রাস্তা খুব বেশি দূর নয়, আমরা সেখানকার গাড়ি চলাচল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি গৌরীর হাতটা তুলে নিয়েছি আমার দু হাতের মুঠোয়। আহা, সেই তেইশ বছর বয়েস, যখন হাত ছুঁলেও বুক কেঁপে উঠতো। গৌরী চুপ, যেন আমার কাছ থেকে কিছু প্রতীক্ষা করছে। প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে শিরশিরে হাওয়া, আমি ওর হাতটা ধরে আলতো টান দিয়ে ডাকলুম, গৌরী।

গৌরী খুব চটপটে এবং সরু জিভের মেয়ে, জেদী ধরনের। অধিকাংশ সময়েই ওর খেয়াল অনুযায়ী আমাকে চলতে হয়, কিন্তু সেদিন ও কিছুই বলছিল না। আমার ডাকের উত্তরে শুধু বললো, উঁ? আমি গৌরীর সম্পূর্ণ দেহটা দু হাতে ধরে আমার বুকের ওপরে নিয়ে আসি, ও কিছুই বাধা দিলো না, বরং ওর শরীর থেকে গরম হলকা যেন আমার চোখেমুখে লাগছিল। আমি গৌরীকে বুকে জড়িয়ে আছি, কিন্তু সেই যে কী যেন একটা আন্তরিক কথা ওকে বলবো, তার কিছুই মনে এলো না। কী কথা আমার বলা উচিত ছিল। গৌরীকে বুকের ওপরে পেয়েছি, আরও নিবিড়ভাবে, প্রবলভাবে ওকে জড়িয়ে ধরার কথাই শুধু মাথায় আসছিল। একটাও কথা বলছি না, একটা কিছু বলা উচিত, কিন্তু গৌরী তোমাকে আরও জড়িয়ে ধরতে চাই, এ কথা মুখে বলা যায় না। তা ছাড়া তখনও আমি বুঝতেই পারি নি, গৌরী কতখানি আমাকে শুধু প্রশ্রয় দিচ্ছে, কতখানি নিজে থেকে চাইছে। আমার যে-কোনো কাজেই গৌরী কখনও না কখনও কিছুটা বাধা দিয়েছে, কিন্তু আগে কখনও ওকে ওভাবে আলিঙ্গন করি নি, অথচ সেদিন ক্ষীণতম বাধাও দেয় নি, তাতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ছিলুম। মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে কিছু একটা যেন ধাঁধা আছে।

গৌরীই প্রথম পায়ের শব্দ শুনতে পায়। একটা সাদা পোশাকপরা লোক মাঠের ভেতর দিক থেকে দৌড়ে আসছে। আমরা দুজন ছিটকে আবার পাশাপাশি বসলাম। লোকটা বললো, সাবধান, পালাবার চেষ্টা করলেই হুইসল বাজাবো।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছি। গৌরী আমার হাত ধরেছে। লোকটা এসে বললো, চলুন থানায়। খুব ফুর্তি হচ্ছে! অ্যাঁ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে আপনি?

লোকটা বক্রভাবে হাসলো, হেসে পকেট থেকে কার্ড বার করলো। আমি গুণ্ডার ভয় করছিলুম, কিন্তু এ যে দেখছি লালবাজারের পুলিস ইন্সপেক্টর। লোকটার মুখে তখনও হুইসল, হাতের ছোট টর্চ জ্বেলে আমায় কার্ডটা পড়ালো তারপর বললো, অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের ফলো করছি। ওই মোড়ের কাছে ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, চলুন।

আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলুম, কেন, কী অন্যায় করেছি?

—থানায় গিয়েই জিজ্ঞেস করবেন। লক্ষ্য করেছি তখন থেকে শহীদ স্তম্ভ, রেড রোড ঘুরে এখানে এসেছেন। এ জায়গাটাই বুঝি পছন্দ হলো? যত্তো সব—এক রাত্তির তো হাজতে থাকুন, তারপর কাল সকালে দুজনের বাবা মাকে খবর পাঠাবো—

আমি শুনে শিউরে উঠেছিলাম। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। থানা হাজতে দুজনে আটকে থাকবো, সারা রাত গৌরীর বাবা পাগলের মতো কোথায় খুঁজবেন কে-জানে, পরদিন থানার লোকেরা যতদূর সম্ভব কুৎসিত কথা বলবে নিশ্চিত, হয়তো এ খবর কাগজে ছাপা হবে—গৌরীর মতো অভিমানী মেয়ের কি যে অবস্থা হবে তখন....। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, গৌরী মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পুলিসের লোকটির হাত জড়িয়ে ধরে বললুম, দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন! দয়া করে.....। আমরা জানতুম না, এখানে বসা বে-আইনী।

—হুঁ শুধু বসা? বসে বসে ধর্ম আলোচনা, না? কলকাতা আজকাল ভরে যাচ্ছে এই সবে। চলো থানায়, তারপর—

লোকটা খপ করে গৌরীর একটা হাত চেপে ধরলো। লোমশ ধরনের বিশ্রি হাতে গৌরীকে ধরেছে, আমার রক্ত ছলাৎ করে উঠলো, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, পুলিসকে মেরে কেউ কোনোদিন নিস্তার পায় না। তা ছাড়া লোকটার মুখে তখনও হুইসল, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিল। গৌরীর কথা ভেবে লজ্জায় অপমানে আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, থানায় নিয়ে গেলে তার ফল যে কী হবে, ভাবতেও পারি না। আমি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি আমার যথাসম্বল চারটে টাকা বার করে বললুম, এই নিয়ে দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন, আপনার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো। নইলে আমাদের এমন বিপদ হবে, দয়া করুন—

পুলিসের লোকটি সেই রকম চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, মোটে চাড্ডাকা? ঘড়ি-ফড়িও তো হাতে নেই দেখছি! ফুর্তি করা আজকাল খুব সস্তা হয়েছে, না? গুতো না খেলে লাল গড়ানো বন্ধ হবে না—

গৌরী তখন এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বললো, হাত ছেড়ে কথা বলুন।

—ইস। এখনও ফোঁস করা—

আমি চরম মিনতির ভঙ্গিতেই বললুম, আপনাকে দয়া করতেই হবে। আর কোনোদিন আমরা—

লোকটা দুহাতে গৌরীকে জড়িয়ে ধরলো। গৌরী পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো ছেড়ে দিন, খবরদার ছেড়ে দিন—। ঝটাপটির মধ্যে লোকটা—'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলো। গৌরী ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমি তখন দুর্নামের দারুণ ভয়ে, যে রকম ভয়, বাইশ-তেইশ বছরেই পাওয়া সম্ভব, তখনও লোকটাকে তোষামোদ করার চেষ্টা করছি। দেখুন, আমাদের জীবনটা নষ্ট করে দেবেন না। লোকটা বললো, চুপ! কিন্তু সেই সময় অন্য শব্দ শোনা গেল। কোথা থেকে হুস করে একটা পুলিসে ভ্যান এসে দূরে রাস্তায় দাঁড়ালো, তিনজন পোশাক পরা পুলিস দৌড়ে আসতে লাগলো এদিকে। আমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিমূঢ় হয়েছিলুম। তা হলে সত্যি আর উপায় নেই? থানায় যেতেই হলো। গৌরী অমন ফুঁসে না উঠলে হয়তো ছাড়া পাওয়া যেতেও পারতো। হঠাৎ দেখি সেই লোকটা অন্ধকারের মধ্যে ছুটে পালাচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। গৌরীকে ফেলে রেখেই আমি ছুটলাম লোকটার পিছনে, লোকটার জামাও ধরে ফেলেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে আচমকাঁ একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। লোকটার জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে গেল আমার হাতের মুঠোয়, আমি উঠে দাঁড়াবার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি ফিরে এলাম গৌরীর কাছে, একজন মধ্যবয়স্ক পুলিস ইন্সপেক্টর ও দুজন সেপাই দাঁড়িয়ে। পুরো ঘটনাটা শুনে ইন্সপেক্টার একজন সেপাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, এ তো দেখছি রামেশ্বরের কাণ্ড। আবার শুরু করেছে। কবে ছাড়া পেলো?

—লাস্ট মান্থ-এ স্যার।

—ওটাকে আবার পুরে দিতে হবে। আপনারা বাড়ি যান—এ দিকটায় রাত্রে বেশিক্ষণ থাকবেন না, এমনিতেই নানা উৎপাত হয়।

—আমরা জানতুম না। আপনারা যে ঠিক সময় এসে পড়েছেন, সত্যিই.......লোকটাকে একটুও সন্দেহ করিনি।

—যাক গে—। ডানদিক দিয়ে সোজা বড় রাস্তা দিয়ে চলে যান—ওখান থেকে বাস ধরুন। আর কোনো ভয় নেই—। আচ্ছা, আপনাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে যান। রামেশ্বর ধরা পড়বেই—ওর কেস উঠলে আপনাদের সাক্ষীর জন্য ডাকবো।

আমি তখন অম্লান মুখে ভুল নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। গৌরী কিন্তু নিজের নামই বললো।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে একটু খুঁজতেই গৌরীর হাত-ব্যাগটা পাওয়া গেল। আমার চারটে টাকাও লোকটা নিয়ে যেতে পারে নি। কয়েক মিনিট আগে কী বিরাট বিপদের মুখে পড়েছিলাম, হঠাৎ কী রকম সহজে মিটে গেল। দুজন নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলুম। আমার বুকে মধ্যে তখনও ধকধক করছে। প্রায় মিউজিয়ামের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আমি হাসি মুখে আলতোভাবে গৌরীর কাঁধে আমার হাত রাখলাম। গৌরী সামান্য শরীর মুচড়ে আমার হাত সরিয়ে দিলো। আমি ভেবেছিলাম, গৌরী তখনও উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে আছে। আমি তখন ওর একটা হাত ধরতে যাই। গৌরী মৃদু অথচ দৃঢ় হেঁচকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, না!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী গৌরী?

—নীলুদা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

আমি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লুম, তখনও কিন্তু বুঝতে পারি নি। বললুম, সত্যি কী বিশ্রি কাণ্ড! লোকটা এমনভাবে—

—নীলুদা, তুমি আর কোনোদিন আমাকে ছুঁয়ো না।

—কেন?

—তোমার সামনে অন্য একজন লোক আমার গায়ে হাত দিয়েছে, তবু তুমি সহ্য করেছো? তুমি আমাকে ছুঁয়ো না আর—

যেন আমি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে পথ হাঁটছিলুম, এমন সময় পিছন থেকে একটা বিষাক্ত তীর আমার পিঠে বিঁধে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি মরে গিয়েছিলুম। আমি রক্তহীন বিহ্বল গলায় প্রেতের মতো বললুম, এই তোমার ধারণা হলো? লোকটা যে পুলিস নয়, আমি এক মুহূর্তেও বুঝতে পারি নি। আমি কি পুলিসের সঙ্গে মারামারি করবো, তুমি চেয়েছিলে?

—ও কথা থাক। আর না, চলো বাড়ি যাই।

প্রচণ্ড অভিমানে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম। গৌরী শেষ পর্যন্ত এই রকম অর্থ করলো? লোকটা এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমি একটুও ভয় পেতুম না। আমি তো আগাগোড়া শুধু গৌরীর কথাই ভাবছিলুম। থানা, গৌরীর বাবা, খবরের কাগজ, পাড়ার ছেলেদের হাসাহাসি, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি হিসেবে গৌরীর সম্মান। আমি ভেবেছিলাম বড় কেলেঙ্কারির বদলে ছোট অপমান সহ্য করা অনেক ভালো। অন্ধকারে, আর কেউ নেই—আমি লোকটার কাছে ওরকম দীন হয়েছিলাম, যাতে দিনের আলোয় হাজার লোকচক্ষুর সামনের অপমান থেকে বাঁচা যায়। অনুনয় করে বা ঘুষ দিয়ে পুলিসের হাত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু মারামারি করলে.....আমার সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো ঈশ্বর নামে একজনের থাকা দরকার, যে-কিনা অন্তর্যামী, সে এসে এখন বলুক, সাক্ষী দিক যে আমি শুধু গৌরীর সম্মানের কথাই ভাবছিলাম। লোকটা যখন গৌরীর গায়ে হাত দেয়, তখন আমার রাগে শরীর জ্বলেছিল, কিন্তু ভেবেছিলুম সে আমার স্বার্থপরতা, গৌরীকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে আরও ছোট হতে হবে, শুধু গৌরীর জন্যই আমাকে একা থানায় নিয়ে গেলে কিছুই আসতো যেতো না, কিন্তু.....

সারা রাস্তা গৌরী আর আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। গৌরীর মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টি দূরের দিকে স্থির। আমি পাংশু বিবর্ণ মুখে বসেছিলাম, তখন আমার বুক রাগে জ্বলছিল, গৌরীকে আর কিছু বুঝিয়ে বলার ইচ্ছেও ছিল না। সেই রাগ ক্রমশ বাষ্প হয়ে, পাতলা অভিমানের রঙ নিয়ে আমার বুকের কাছেই আটকে রইলো বহুদিন। সেই শেষ, গৌরীর কাছে আমি কাপুরুষ রয়ে গেলাম। গৌরীর সঙ্গে আর কোনোদিন আমার দেখা করতে ইচ্ছা হয় নি। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে নানা লোকের মধ্যে দেখা হয়েছে হয়তো, কিন্তু আমি ওর চোখের দিকে তাকাইনি আর। আজ যদি আমি বিশ্ববিজয়ী হয়েও ওর সামনে দাঁড়াই, গৌরী ভাববে আমি কোনো নাটকে অভিনয় করছি। গৌরীর সামনে যদি আমি পৃথিবীর বৃহত্তম শত্রুকেও আঘাত করি—গৌরী ভাববে ও আমার নিজস্ব আঘাত নয়, কোনো দম দেওয়া স্প্রিংয়ের পুতুলের কাণ্ড।

যাক। গৌরীর ওপর আমার আর কোনো রাগ নেই। গৌরীর সামনে নিজের বীরত্ব প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছেও নেই। গৌরীর সামনে কে বীরপুরুষ কে কাপুরুষ হয়ে রইলো—তাতে আমার আর কিছু আসে যায় না। যে খেলা থেকে আমি আমার নাম তুলে নিয়েছি—সে খেলায় এখন কে জেতে কে হারে—তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। অবিনাশের সঙ্গে গৌরীর যা ইচ্ছে সম্পর্ক থাক—কিন্তু অবিনাশ আমার বাড়িতে সকালে এসে কেন আমায় অপমান করে গেল। কেন আমার বাড়ির সামনে অত বড়ো একটা মটরগাড়ি থামিয়ে সমস্ত পাড়া জানিয়ে ঢুকলো আমার

ঘরে? অবিনাশ এসেছিল বলেই, হঠাৎ এখন গৌরীর কথা মনে পড়লো আবার। সেই সকাল থেকেই মুখের মধ্যে নিমপাতা। পৃথিবীতে অনেক অপমান সহ্য করা হলো, এবার একজন কারুর ওপরে প্রতিশোধ নিতেই হবে। অবিনাশ, অবিনাশই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। আজ আর অফিসে যাবো না।

স্নান করে চটপট খাওয়া সেরে নিলুম। তেমন শীত নেই, তবু কোটটা গায়ে চাপিয়ে ভোজালিটা খাপশুদ্ধু রাখলাম কোটের ভেতরের পকেটে। একটু উঁচু হয়ে রইলো, থাক কেউ বুঝবে না। ছুরি-ছোরা মেরে প্রতিশোধ নেওয়া ব্যাপারটা বড়ই স্থূল, নিজেই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার যে শুরু করতে দেরি হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জাগতে আজ সকাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো কেন?

ভোজালিটা ব্যবহার করি আর না করি, সঙ্গে রাখা ভালো। একটা অস্ত্র শরীরে লুকোনো থাকলে, সামান্য একটা চড়ও জোরালো হয়। তার প্রমানও পেলুম সঙ্গে সঙ্গে। মোড়ের দোকানে গিয়ে দুটো সিগারেট চাইতেই, অন্য লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকেই আগে দিয়ে দিলো। অন্যদিন দেখেছি, আমি এক প্যাকেট সিগারেট চাইলেও লোকটা অনেকক্ষণ ধরে অন্য লোকের জন্য পান সাজে। গ্রাহ্যই করতে চায় না। আজ হয়তো আমার গলার আওয়াজটাই বদলে গেছে। বাসে উঠেও আমি মনস্থির করে রেখেছিলাম। প্রায়ই দেখেছি, আমি বাস থেকে নেমে আসার সময় কণ্ডাক্টার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, টিকিট হয়েছে? আমি ঘাড় নাড়া সত্বেও বলে দেখি? রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যায়। কত লোক ওঠে কত লোক নেমে যায়, শুধু আমারই বেলা গাঢ় অবিশ্বাস নিয়ে কণ্ডাক্টাররা জিজ্ঞেস করে, দেখি তো, দেখান। আজ আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। প্রথমেই উঠে টিকিট কেটে, সারা রাস্তা প্রতীক্ষায় ঘাড় শক্ত করে ছিলাম। মাঝে মাঝে কোটের বুকের কাছে ঠেলে ওঠা ভোজালির বাঁটে হাত বুলিয়েছি। কেউ এলো না। নেমে আসার সময় বরং বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, কটা বাজে? আমি গম্ভীরভাবে বললুম, জানি না। ঘড়ি নেই। ওরা বোধহয় ভাবে, কোটপরা লোক মাত্রেই হাতঘড়ি থাকে।

এসপ্লানেড অঞ্চলের দুপুরে ফটফট করছে রোদ। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরই আমি টের পেলুম, আমি অনেক বদলে গেছি। কত লক্ষবার এসেছি এখানে, তেতো মুখে, শুকনো মুখে, ভয়ে, ফুর্তির ঝোঁকে,—আজ আমি এখনো দাঁড়িয়ে আছি অতর্কিত আক্রমণকারীর ভঙ্গিতে। গাড়ি বারান্দার নিচে, থামের আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে আছি। কেউ হয়ত আমাকে লক্ষ্যই করছে না, কিন্তু আমি একটা উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কৃপার চোখে দেখছি সকলকে। শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাধীন। আদর করে কোটের ওপরে হাত বুলোচ্ছি ভোজালি ছুঁয়ে। কেউ জানে না, এখনও একবারও ব্যবহার করিনি, অথচ এমন সুখ। আশ্চর্য, এমন ভালো জিনিসটা আমি এতদিন বাক্সে ফেলে রেখেছিলাম! শুধু শুধু ভিড়ের মধ্যে সরু হয়ে ঘুরেছি! এখন বুঝতে পারছি, পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র তুলে ধরা দরকার তাহলে পৃথিবীটা শাসনে থাকে। প্রতিশোধ কথাটা মনে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, তাহলেই বুকের মধ্যে এমন অসম্ভব জোর এসে যায়। আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে আমি পথের মধ্যে নেমে দিনের রোদ্দুরে ভোজালিটা ঝলসে মাথার ওপর তুলে পৃথিবীকে বলতে পারি, সাবধান!

কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে সাতটায় সময়। তার এখনও ঢের দেরি। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, এতক্ষণ খুনি সেজে থাকাও সম্ভব নয়, হয়তো এর মধ্যেই আমার মন নরম হয়ে যাবে। দু-একটি সুন্দরী মেয়ে এমন চোখে আটকে যাচ্ছে যে, বহু দূর পর্যন্ত তাদের চলে যাওয়া দেখতে ইচ্ছে করে—সেই সময়টা অবিনাশের কথা মনেও থাকে না। অথবা কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেও মুশকিল, হয়তো টানতে টানতে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। অফিসে একটা টেলিফোন করাও দরকার, টেবিলের ওপর একটা জরুরি ফাইল আছে। আমার উচিত ছিল ওই ফাইলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে আসা অথবা আগুনে পোড়ানো। ও-সব জরুরি ফাইল ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেললে কিছুই হয় না, কিন্তু টেবিলের ওপর ফেলে রাখা অপরাধ। খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে একটা টেলিফোন করতে ঢুকলুম চায়ের দোকানে।

গজেনবাবুও আজ অফিসে আসেন নি। তাহলে তো চুকেই গেল। সোমবার দেখা যাবে.....সে দিন যদি গজেনবাবু জিজ্ঞেস করে, আজ কেন অফিসে যাইনি, স্রেফ বলে দেবো, রেস খেলতে গিয়েছিলাম। দেখি, তারপর কি বলে। আজ শনিবার ওই গজকচ্ছপটা নিজে নিশ্চয়ই অফিস না এসে রেসের মাঠে গেছে, আমি জানি।

রিসিভারটা রেখে দিয়েই পরমুহূর্তে আবার তুলে নিলাম। তৎক্ষণাৎ মনে হলো, গৌরীর সঙ্গে একবার কথা না বলে আমার উপায় নেই। অন্তত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে গৌরীকে টেলিফোন করিনি, বছর দুয়েকের মধ্যে তো একবারও দেখা হয়নি, কিন্তু ওর টেলিফোন নাম্বার দেখলুম আমার স্পষ্ট মনে আছে। কোথায় থাকে এ সব স্মৃতি? এতদিনে একবারও মনে করিনি, কত জরুরি নম্বর ভুলে গেছি কিন্তু গৌরীর টেলিফোনের নম্বর ভুলিনি! ঝুঁকে ডায়াল করতে গিয়ে কোটের ফাঁক দিয়ে ভোজালির বাঁটটা প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার ঢুকিয়ে দিলাম। কাউন্টারের লোকটা দেখতে পায় নি বোধ হয়। একটুক্ষণ বেজে ওঠার পরই ওপাশ থেকে অন্যরকম গলা। কে? না উনি তো এখন বাড়িতে নেই, কলেজে আছেন। আপনার নাম কী বলুন?

শান্তার গলা। শান্তা অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি। আমি তো জানতুমই গৌরী এখন কলেজে পড়ায়। শান্তাকে কিছু না বলে রেখে দিলাম। হয়তো কলেজে খোঁজ করলেও পাবো না। এক একদিন এই রকম হয়, টেলিফোনে একবার একজনকে না পেলে তারপর প্রত্যেকটি ডাকেই আর কারুকে পাওয়া যায় না। চায়ের দোকানের টেলিফোনে এতগুলো কল করাও বোধহয় নিয়ম নয়। লোকটি অসহিষ্ণুভাবে তাকাচ্ছিল, আমি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে গম্ভীরভাবে বললুম, এর থেকে তিনটে কলেজ চার্জ কেটে নিন। তারপর আবার ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছি।

এবার একটু নার্ভাস লাগছে। বাড়িতে গৌরীকে পেয়ে গেলেই ভালো হতো। এখন হয়তো ক্লাস নিচ্ছে বা টেলিফোন থেকে অনেক দূরে আছে। কোনো কেরানি বা বেয়ারার মুখে আমার নাম শুনে যদি ভুরু কুঁচকে বলে, কে? আচ্ছা বলে দাও, এখন ব্যস্ত আছে! কিংবা কেরানিরাই যদি খবর পাঠাতে না চায়? কিন্তু সে রকম হতেই পারে না, আমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছি, আজ আমার পকেটে ভোজালি আছে, আমাকে আজ সকলেই মানতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে পাওয়া গেল, আমার নাম শুনে সত্যিকারের খুশিতে আশ্চর্য হয়ে বললো, এতদিন পরে মনে পড়লো আমাকে? তুমি এখন কোথায়?

—গৌরী, তুমি যদি খুব ব্যস্ত না থাকো, একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে?

—কোথায়? কতদূরে? আমি আসতে পারি।

—আমি চৌরঙ্গীর এই চায়ের দোকানে আছি। ঢুকেই বাঁ দিকের ক্যাবিনে বসে থাকবো। তুমি পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে—

—আসছি। সত্যি, ভারি আশ্চর্য লাগছে। আচ্ছা—

আসলে অবিনাশের ওপর যদি আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, তখন মাঝপথে গৌরীর এসে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু গৌরী থাকলে অবিনাশের অপমান সম্পূর্ণ হবে না, আমি বুঝতে পেরেছিলুম। যতই সময় যাচ্ছে, ততই আমার উত্তেজনা আসছে। এখন আর মনের মধ্যে কোথাও কোনো গ্লানি নেই, কুয়াশা নেই, সব স্পষ্ট। এতদিনে আমি অস্ত্র হাতে নিয়েছি। কিন্তু এতদিন পর হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

গৌরীর মুখের সেই ধার ধার ভাবটা আর নেই। অনেকটা কোমল এখন। চোখের পাশে খানিকটা ক্লান্তি ওকে আরও সুন্দরী করছে। চেহারাও একটু ভারী। রেস্টুরেন্টটায় ঢুকে মুহূর্ত দ্বিধা করে, তারপর আবার এগিয়ে এসে পরদা তুলে আমার ক্যাবিনে ঢুকলো। ঢুকে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, বাবাঃ, কী লোক! এতদিনে?

—তুমি কেমন আছো, গৌরী?

—ভালো নেই। তুমি কেমন আছো?

—তুমি ভালো নেই কেন?

—মরতে বসেছিলাম তো, খবর নিয়েছিলে? প্লুরিসিতে ভুগলাম এক বছর। এখন আবার বুকে ব্যথা।

—যাঃ আমি শুনেছিলাম তোমার সামান্য হয়েছিল।

—প্রথমে আমি ভেবেছিলাম টি বি। ভেবেছিলাম, মরেই যাবো।

—টি বি তেও আজকাল কেউ মরে না।

পিঠে অসহ্য ব্যথা, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে যখন কান্না আসতো, তার চেয়ে মরে যাওয়া কম কী? আর দুধ, ডিম, আপেল মসলা ছাড়া মাংস—যতসব অখাদ্য খাবার? খুব খিদে পেয়েছে, আজ অনেক কিছু খাবো এখানে—পয়সা আছে তো তোমার কাছে?

—প্রচুর টাকা আছে! অবিনাশ আজ সকালে বাড়িতে এসেছিল, ও নাকি কবে আমার কাছ থেকে সত্তর টাকা ধার নিয়েছিল, আজ শোধ করে গেল।

—ওর এসবও মনে থাকে বুঝি? আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে শুনেছি।

—শুনেছি মানে? তুমি জানো না বুঝি? তোমার সঙ্গে দেখা হয় না?

—হ্যাঁ হয়। আচ্ছা, ওর কথা থাক। তোমার কথা বলো, কতদিন পর দেখা, কী পাগল তুমি! এতো অভিমান—

গৌরী তোমাকে টেলিফোন করতে আমার ভয় করছিল। যদি আমার নাম শুনেই তুমি ফোন রেখে দাও! যদি গম্ভীরভাবে বলতে, কী চাই?

—আমি এতই খারাপ বুঝি?

—না, তা নয়, তবু কতদিন দেখা হয়নি, আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক কথাটা কি খারাপ শুনতে!

—না সত্যি, এই কবছরে তোমার কথা একবারও মনে পড়েনি, হঠাৎ টেলিফোনে।

—কি বিশ্রি স্বভাব হয়েছে তোমার? কোনো মেয়ের সামনে বুঝি বলতে হয়, আমি তোমাকে ভুলে গেছি। একটু খুশি করে বলতেও পারো না?

—কিন্তু আমি তো সত্যিই তোমাকে মনে রাখিনি। তোমার কাছে হেরে গিয়ে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে এসেছি, এখন চারদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে। যেন আমি আনমনে হঠাৎ কোনো উপত্যকার মধ্যে এসে পড়েছি, সামনেও পাহাড়, পিছনেও পাহাড়। সামনেও দেখতে পাই না, পেছনেও কিছু দেখতে পাই না।

—থাক্ ওসব বাজে কথা। কিন্তু আজ হঠাৎ তবে টেলিফোন করার সাহস পেলে. কোথা থেকে?

—আজ সকালে আমি বদলে গেছি। আজ আমি প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

—প্রতিশোধ? আমার ওপরে না কি?

গৌরী কৃত্রিম হেসে উঠলো। আমি খুব লক্ষ্য করে ওর হাসির শব্দ শুনলুম। না, ওর হাসিতে আগেকার মতো শ্লেষ নেই। বরং বেশ মধুর। অসুখের পর গৌরী, খানিকটা বদলে গেছে। অসুখ হয়েছিল বলেই তাহলে গৌরীর সঙ্গে এতদিন অবিনাশের বিয়ে হয়নি? কিন্তু গৌরীকে দেখে আমার একবারও বুক টনটন করে নি। একটুও পুরোনো দুঃখ জাগে নি। গৌরীর জন্য আমার বুকের মধ্যে সত্যি তাহলে কোনো দুঃখ ছিল না। কিছু একটা থাকা যেন উচিত ছিল। লোভ কিংবা রাগ। এতদিন আমি ভুল জানতাম। আমি বললুম, না, তোমার ওপরে ঠিক কি জন্য প্রতিশোধ নিতে হবে আমি এখনও জানি না। তবে আমি পৃথিবীর অনেকেরই ওপর প্রতিশোধ নেবো। অবিনাশকে দিয়ে শুরু করতে চাই।

—অবিনাশ? কেন?

অবিনাশ আজ আমার কাছে এসে বিষম অপমান করে গেছে।

—অবিনাশের কি ক্ষমতা আছে তোমাকে অপমান করার? আমি ছাড়া আর তো কেউ পারে নি।

—গৌরী, তুমি আঁতে ঘা দিয়ে বলছো।

—না থাক, অবিনাশ কি করেছে?

—অবিনাশ এসেছিল আমার উপকার করতে। প্রায় বছরখানেক বাদে ওকে দেখলুম, দেখেই বুঝতে পারলুম অবিনাশের চেহারার মধ্যে একটা চোরের ছাপ ফুটেছে। অবিনাশ বড়লোকও হয়েছে চোরও হয়েছে। দেখলেই চেনা যায়। যেদিন থেকে ও ওর কাকার ইনজিনিয়ারিং ফার্মে পার্টনার হয়ে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই জানি ও বদলে যাবে। তা যাক। কিন্তু ও আমার উপকার করতে এসেছিল। ও আমাকে চাকরি দিতে চায়।

—এতে অপমানের কী আছে?

—সেইটাই তো কথা। ও এসে নানা কথা বললো। কাজের জন্য পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাই করা হয় না।.....এইসব...। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কী করছি এখন। তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, আমি একটা ভালো চাকরি পেলে নেবো কিনা। ফরাক্কা বাঁধে স্টোন চিপ্‌স সাপ্লাই করছে এক মাড়োয়ারী কোম্পানি, তারা একজন বিশ্বস্ত লোক চায়। প্রত্যেকদিন দশ ওয়াগন করে পাথর কুচি সাপ্লাই করে। এখন বিহারের ধলভূমগড় কোয়ারি থেকে সাপ্লাই চলছে। কয়েক মাস বাদে যাবে বেথুয়াডিহি থেকে। একজন ম্যানেজার শ্রেণীর লোক চাই, ঠিক মতো চালান যাচ্ছে কি না দেখবে, রেলওয়ের সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখব। অবিনাশ আমাকে ওই চাকরিটা করে দিতে চায়। মাইনেই সাড়ে পাঁচ শো টাকার বেশি, ফ্রি কোয়ার্টার্স। ওখানে নাকি আমি লেখাটেখারও অনেক সময় পাবো।

—শুনতে তো খারাপ লাগছে না। এতে তুমি এত রেগে উঠছো কেন?

—সেই তো। কেন? শুনতে একটুও খারাপ নয়। আমি এখানে ভালো চাকরি করি না। অবিনাশ আমার উপকারই করছে। বন্ধুর কাছে কেউ কখনো উপকার চায় না মুখ ফুটে, খাঁটি বন্ধুরাই নীরবে উপকারের সুযোগ এনে দেয়। সব ঠিক। কলকাতা শহর আমার ভালো লাগে না আর, আমি বাইরেই যেতে চাই। আমার কিছু বেশি টাকা দরকার। সব ঠিক, কিন্তু কেন?

—বাঃ, এর কোনো মানে নেই! এ তোমার—

—অনেকগুলো কেন ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এনজিনিয়ারের সঙ্গে কন্ট্রাক্টরের কেন এত খাতির? অবিনাশ মাইনে না বলে 'মাইনেই' বলে কেন একটা অতিরিক্ত ই-কার জুড়ে দিলো? এসব সরল ব্যাপার সারা দেশেই চলছে। আমার কী আসে যায়, আমি শুধু আমার অংশটুকু খুঁটে নিতে পারলেই হলো। অবিনাশের প্রস্তাবে আমি প্রথমে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। খুব লজ্জা করছিল, শুধু একবার চকিতে মনে হয়েছিল। ওই চাকরিটা নেবার পর যদি কখনো আমি একটু দামি সুট পরি, অবিনাশ যখন সেটার প্রশংসা করবে তখন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকবে, আমি চাকরিটা দিয়েছিলাম বলেই তো। সেটাও এমন কিছু না। প্রথমে আমার রাগ এলো আমার এখনকার অফিসের গজেনবাবুর ওপরে।

গৌরী হেসে উঠে বললো, অদ্ভুত নাম। তিনি আবার কী করলেন?

—তিনি আমার চাকরিটা এখনো পাকা করেন নি। পাকা চাকরি থাকলে প্রথমেই না বলতে পারতুম। দেখো, কেরানির চাকরি করছি, এতে কোনো লজ্জা নেই। আমি কেরানি বলে অন্য কোনো বড়ো অফিসার-কে ঈর্ষা করি না। কিন্তু টেমপোরারি চাকরি বড়ো অপমানজনক। কেউ চাকরির কথা জিজ্ঞেস করলেই ভয় ভয় করে। এসব অফিসে, বছরের শেষে সি—সি-আর বলে একটা ব্যাপার আছে। তাতে ওই লোকটা মুচকি হেসে আমার নামে কী যেন লিখে রাখে। প্রোমোশ্যান তো দূরের কথা, আমার চাকরিটাই এখনো পার্মানেন্ট করে নি, তা হলে আমি অনায়াসে ফুঃ করে অবিনাশের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে পারতুম। কারুর কাছ থেকে দয়া নেওয়ার চাইতে দয়া উপেক্ষা করায় আনন্দ বেশি না? গজেন আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে—

—তুমি জিনিসটাকে এত ঘোরালো করছো কেন? কেউ কোনো ভালো চাকরির খোঁজ পেলে বন্ধু-টন্ধুদের বলে না?

—এর নাম ভালো চাকরি? এঁদো গ্রামে গিয়ে কুলির সর্দারি? যাই হোক, আমার তুলনায় ভালো। আমার না নেবার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু আর একটা কেন-র কথা বলি। এই চাকরির পুরো প্রস্তাবটাই কি রকম ফাঁকা ফাঁকা নয়? যেন, মনে হয় আমারই জন্য তৈরি করা? অবিনাশকে আমি অবিশ্বাস করি না— কিন্তু প্রথম থেকে শুরু করি, অবিনাশ আজ সকালে আমার বাড়ি এলো কেন? তুমি এর উত্তর দিতে পারো? ও তো আমায় টেলিফোন করতে পারতো? তা ছাড়া, অবিনাশ আর আমি এখন সত্যিকারের বন্ধু নই, এ কথা আমরা দুজনেই মনে মনে জানি। তবু ওর এত গরজ কেন? একজন ব্যস্ত লোক, বড় চাকরি করছে, সে কেন অফিসের দিনে সকালে অতদূরে কোনো সাধারণ বন্ধুর বাড়িতে যায়? তাও বহু বছর আগে ধার করা টাকা শোধ দেওয়ার ছুতো করে? তার মানে অবিনাশ বেশ কয়েকদিন ধরে আমার কথা ভেবেছে। আমার চাকরির চেষ্টা করেছে। কেন?

—কেন?

—তার কারণ, গৌরী, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, অবিনাশ চায় আমি কলকাতা থেকে দূরে থাকি। কোনো কারণে এখন অবিনাশ আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অবশ্য, ওর সঙ্গে আমার কোনোই যোগাযোগ নেই, তবু কেন চাইছে জানি না। কিন্তু চাইছে ঠিকই। এই কথা বুঝতে পেরে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অপমানে। তখন আমার মনে হয় অবিনাশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমার একটা প্রবল যুক্তি চাই। তা খুঁজে না পেয়ে আমার রাগ বাড়তে শুরু করে অবিনাশ ওপর, গজেনের ওপর, দুনিয়ার যাবতীয় কন্ট্রাকটার এবং এঞ্জিনিয়ারদের ওপর। আমি মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম, কিন্তু আমার রাগ সারা ঘর ভরে হা—হা করছিল।

—নীলুদা, তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায় নিতো? তুমি তো ঠাণ্ডা ভাবে কথা বলছো, কিন্তু তোমার কথায় কি রকম পাগল পাগল যুক্তি আছে।

—তা নয়, আসলে কোনো যুক্তিই নেই। এইটাই আজ সকালে আমি আবিষ্কার করলুম। আজ বুঝতে পারলুম, যে-কোনো যুক্তিই আসলে কাপুরুষতা। এ পৃথিবীর যে-কোনো সাহসিকতাই অযৌক্তিক। আমি যুক্তি মানার চেষ্টা করেছি এতকাল, আর প্রত্যেকটা লোক আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে। আমি মানুষের কাছ থেকে ভদ্রতা, বিনয়, স্বাভাবিকতার চেয়ে নিজে ভদ্র, বিনয়ী স্বাভাবিক হয়ে থেকেছি, আর তারা ঠা-ঠা করে হেসে কাদামাখা নোংরা পায়ে আমার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে। পিছিয়ে যেতে যেতে আজ আমি কোথায় চলে এসেছি একটা ঝাপসা অস্বস্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, বত্রিশ বছর বয়েস—জুলপিতে সাদা ছোপ, এক একদিন বিকেলবেলা পথে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়, আমার কোথাও যাবার নেই। এরকম ভাবে চললে আমি মাটির নিচে ঢুকে যাবো।....আজ সকালে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি আজ থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো। অবিনাশই প্রথম!

গৌরী টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললো, তুমি অবিনাশকে নিয়ে কি করতে চাও?

আমি সামান্য হেসে বললুম, এখনও জানি না। অবিনাশের জন্য ভয় পেয়ে তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে?

—কেন, তোমাকে ছোঁয়া বারণ না কি?

—অন্যরকম কথা ছিল!

—কী ছেলেমানুষ তুমি এখনও। আজও অভিমান গেল না? নীলুদা, তোমার মুখের চেহারা কেমন রুক্ষ হয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বেশ জ্বলজ্বলে! তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে খুব, তুমি অনেক বদলে গেছো।

—কে না বদলেছে? ওই অবিনাশটাকে এক সময় গ্রাহ্যই করতুম না, আজ কি রকম অহংকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা ঝাঁকিয়ে।

—আমার সামনে অবিনাশের নিন্দে করা তোমার উচিত নয়। তোমাকে মানায় না। অবিনাশের সঙ্গে সামনের মাসে আমার বিয়ে হবার কথা।

—তুমিও অনেক বদলে গেছো, গৌরী।

—অনেক, অনেক! এখন আমি জানি সারাজীবনে আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারবো না, দু বেলা ঠিক সময়ে খেতে হবে, বেশি চা খাওয়া চলবে না আমার .....আমার একবার রিলাপ্‌স করেছিল, জ্যোৎস্নারাত্রে শখ করে হাঁটতে পারবো না।

—হঠাৎ পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো না।

গৌরী একটু থেমে কি যেন মনে করার চেষ্টা করলো। হয়তো কিছুই মনে পড়ল না। সব কিছু বুঝি আমারই একা মনে আছে! গৌরীর সুন্দর মুখটা ম্লান হয়ে এলো, কি রকম অসহায় কুয়াশা মাখা মুখ, আমার হাতটা চেপে ধরে থেকেই আস্তে আস্তে বললো এসবই এখন আমাকে মানতে হয়। এই সবই আমার বেঁচে থাকার যুক্তি। একটা না মানলেই একলা ঘরের বিছানা। তখন মাথার কাছে বসে যদি কেউ ভালোবাসার কথা বলে, একটুও ভালো লাগে না।....এই দেখো না, এতক্ষণ যে চেয়ারে বসে আছি, পিঠ টনটন করছে।

—গৌরী, আমার কথা কি তোমার মনে পড়তো?

—মনে পড়বে না কেন? তবে খুব যে একটা হা-হুতাশ বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তা যেন মনে করো না। এমনই। তবে মাঝে মনে হতো, আমি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি। মিথ্যে কষ্ট দিয়েছি।

—না, না, তা নয়। আমিও কখনও ভাবিনি। তোমার কথাও প্রথম কিছুদিন খুব মনে পড়তো। তারপর, দেখা না হতে হতে ভুলে গেছি। এখন কোনো দুঃখ নেই, রাগ নেই।

—তুমি আমার ওপর কোনো প্রতিশোধ নেবে না?

—না, না, কেন? কি জন্য? তা ছাড়া, তুমি তো আগে থেকেই হেরে বসে আছো দেখছি।

—হয়তো, তুমি ভাবছো, অবিনাশের ওপর আঘাত করলেই আমাকে আঘাত করা হবে। অবিনাশই আমার এখন একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তা বলে আমি এখনও এত দুর্বল হয়ে পড়িনি যে তোমার কাছে অবিনাশের জন্য মিনতি করবো। তোমাকে বারণ করবো। ওসব তোমাদের পুরুষদের বোঝাপড়া আর পাগলামি।

—অবিনাশের সঙ্গে সাতটার সময় আমার দেখা হব। তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে?

—কোথায়?

—পার্ক স্ট্রিটের মুখে।

নাঃ! আমার ক্লান্তি লাগছে, বাড়ি যাই। অবিনাশের ওপর যদি তুমি প্রতিশোধ নিতেও পারো, তারপর কিন্তু আবার আমাকে ডেকো না। আমি জুয়া খেলার বাজি নই। অবিনাশ তোমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে চায় এ কথা বলে তুমি এরকমই কিছু বোঝাতে চেয়েছিলে, কিন্তু, আমি তো তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি না।

—তা তো জানিই, গৌরী। আবার কেন বললে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। গৌরী ওর ডান হাতটার মুঠো খুলে বললো, দেখো, কি রকম হাত ঘেমেছে আমার। আজকাল এরকম হয়। আমি গৌরীর হাতটা তুলে নিলাম। নরম, বড় বেশি নরম, আগের মতন অমন তাপ নেই। আমার আঙুলের নখ সিগারেটের ধোঁয়ায় হলুদ, গৌরীর হাত ও আমার হাত, দুটোই যেন অন্য কোনো নারী-পুরুষের হাত। অথবা নিয়ন আলোতে অন্যরকম দেখায়।

বাস স্টপ পর্যন্ত হেঁটে গেলাম দুজনে। একটা বিশ্রী চেহারার ছোকরা গৌরীর গায়ে ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। গৌরী তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না। আমি অজান্তে বুকের কাছে ভোজালিতে একবার হাত দিয়েছি। তারপর একটুকু এগিয়ে গিয়ে আমি সেই শৌখিন ছেলেটার পা মাড়িয়ে দিলাম আমার শক্ত জুতো দিয়ে। ছেলেটা রুখে দাঁড়ালো না, চট করে আমার দিকে ফিরে 'একস্‌কিউজ মি' বলে হন-হন করে চলে গেল।

এই সময়টায় বাসে বিষম ভিড়। গৌরী উঠবে কী করে? হয়তো আমারই উচিত ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা। থাক তার দরকার নেই। একটা ফাঁকা লেডিস বাস এসে হাজির। বাস ছাড়ার পর ক্লান্ত মুখে ভারি মধুর করে হাসলো গৌরী আমার দিকে চেয়ে। আমি ফিরে এলাম। প্রায় সাতটা বাজে। এখান থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত হেঁটেই যাবো ঠিক করলুম। রাস্তায় এত ভিড় অথচ আমি হেঁটে যাবার সময় আমার প্রত্যেকটি পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার জুতোয় টকটক শব্দ হচ্ছে। খুব বেশি তাড়া নেই, বহুদিন এমন খুশি বোধ করিনি, বেশ হালকা শরীরে চলে এলাম পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত। অবিনাশ তখনও আসে নি।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। অন্তত এক ঘণ্টার কম নয়। অবিনাশ শেষ পর্যন্ত আসবে না, তা বিশ্বাসই হয় না। মহাত্মাজীর মূর্তির ওপর আলো পড়েছে, তার কাছেই ট্রাফিকের লাল আলোয় যখন অসংখ্য মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে যায় তখন মনে হয়, গান্ধিজিই যেন ডান হাত তুলে গাড়িগুলোকে দাঁড়াতে বলেছেন। মোটরগুলি, ভারী ভারী দোতলা বাস সেই হুকুম অমান্য করতে পারছে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে, অপেক্ষা করছে, কখন তিনি আঙুলের ইশারা করে লালকে বলবেন সবুজ হতে, সকলকে বলবেন, যাও। বারবার এই জিনিস দেখতে আমার বেশ মজা লাগছিল। মহাত্মাজীর হাতের সামনে এসে গাড়িগুলো থামছে, ভেতরে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা নারী পুরুষরা ঝট করে আলাদা

হয়ে সরে বসছে, কেউ একটাও কথা বলছে না, আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছি, কখন তাঁর আঙুল নড়ে ওঠে। ওই নড়ে উঠলো, তিনি বললেন, যাও!

এই রকম দেখতে দেখতেই অনেক সময় কেটে গিয়েছিল। এমন সময় অবিনাশ এলো, হালকা স্যুট পরেছে, টাই-এর ফাঁস আলগা, মাথার চুলগুলো খাড়াখড়া। এসে বললো, কী রে, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? ভেবেছিলুম চলে যাবি! তবে চাকরি এমন জিনিস.....হঃ নিবি তা হলে?

অবিনাশ অনেকটা মদ খেয়ে এসেছে, সোজা হয়ে এখনও দাঁড়াতে পারলেও কথা বলছে গলা উঁচু করে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল খিমচোচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি চোয়াল শক্ত করে বললুম, চল, রাস্তার ওপাশে গিয়ে মাঠে বসি।

—মাঠে কেন, কোনো দোকানে চল না।

—না, এতক্ষণ চায়ের দোকানেই বসেছিলাম। গৌরীর সঙ্গে দেখা হলো।

—গৌরী? কেন, আচ্ছা যাকগে! গৌরীর সঙ্গে তোর দেখা হলো, বললি? কেন?

—কেন মানে? দেখা হলো—চল গিয়ে বসি মাঠে কোথাও।

—তারপর মাঠে বসে কী করবো?

—অবিনাশ, তুই-ই আমাকে এখানে আসতে বলেছিস আজ।

—মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার কথা বলিনি।

—তুই এ-রকম বিশ্রীভাবে কথা শুরু করলে কোনো কথাই বলা যায় না।

—বিশ্রী সুচ্ছিরির কী আছে বাবা। চল যাই মাঠেই—রাস্তা পার হবার জন্য আমি অবিনাশের একটা হাত ধরলুম। অবিনাশ হঠাৎ একটা হুঙ্কার দিয়ে বললো, হাত ছাড়। আমি হাঁটতে পারবো না ভেবেছিস? দু'চার পেগে কিস্যু হয় না অবিনাশ মিত্তিরের। ভেবেছিলুম, তোকেও এসে ডেকে নিয়ে যাবো, কিন্তু এমন জমে গেলুম। আজকাল এত খাওয়াবার লোক না চারিদিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে, অনেক পাণ্টার সব ব্ল্যাকমানি, বুয়েছিস্ তো। তুই তা হলে নিবি তো চাকরিটা।

মহাত্মাজীর মূর্তিটার পিছন দিক দিয়ে এসে, পুকুরের পাড় দিয়ে আমরা ওপাশের অন্ধকার মাঠে এলুম। অবিনাশকে বললুম, আয় বসি এখানে। তারপর কথা হবে। অবিনাশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, না, সময় নেই। আমি আবার যাবো। কী রকম অ্যাপ—অ্যাপ—অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক রেখেছি, বল। তুই চাকরিটা নিয়ে নে। তারপর আমি তোকে আলাদা কণ্ট্রাক্টারি পাইয়ে দেবো। বহু টাকা, মাইরি, একবার ঢুকে দ্যাখ....চল, এক্ষুনি দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

নিজের চোখে নেশা না থাকলে মাতালদের সঙ্গে কথা বলতে আমার একেবারে ভালো লাগে না। এমন বাজে বকে যে কোনো উত্তরই দেওয়া যায় না। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, একটু চুপ করে বসবি!

অবিনাশ চোখ পাকিয়ে বললো, অ্যা-ই! ধমকাচ্ছিস কি? ভেবেছিস বন্ধু বলে রেয়াৎ করবো। একখানা নাকে ঝাড়বো এমন, বিন্দাবন দেখিয়ে, দেবো। হাতে জোর আছে এখনও, শুধু সময় নষ্ট।

—তুই আমাকে চাকরি দেবার জন্য ব্যস্ত কেন?

—ব্যস্ত? কত লোক ফ্যা-ফ্যা করছে একবার ডাকলেই....তোকে ভালোবাসি বলে......তুই কষ্টে আছিস....নে না, তোকে আমি দাঁড় করিয়ে দেবো।

—অবিনাশ, তুই এইরকমভাবে কথা বলা বন্ধ করবি কি না?

—আবার চোখ রাঙানো! এই জন্যই তোকে আমি দেখতে পারি না। দুচক্ষে দেখতে পারি না। একটু কৃতজ্ঞতা নেই! গৌরীর সঙ্গে তোর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বুঝি? হঠাৎ? একবারে রাস্তার মাঝখানে—থাকগে, অন্য কথা। এ রকম একটা চান্স দিচ্ছি....ওই যে কি বলে লছমনপ্রসাদ শুয়ারের বাচ্চাকে কত করে বুঝিয়ে তবে—আর, তুই শুয়ারের বাচ্চা।

—অবিনাশ, আমার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলার সাহস তোর হলো কী করে রে?

—সাহস? তুই কে-রে? একটা যাকে বলে, ওই যে কি যেন, আমাকে তুই সাহস দেখাতে এসেছিস?

অবিনাশের মুখটা ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। ক্রমেই ওর নেশা বেড়ে যাচ্ছে! যদি খুব বেশি খেয়ে থাকে। তবে এখন ঘণ্টাখানেক নেশা বেড়েই চলবে। আমি হাত দিয়ে ওর মুখটা উঁচু করে তুলে বললুম, কি ব্যাপার? তোর কি চাই?

—আমার আবার কী চাই। তোকেই তো পাইয়ে দিচ্ছি!

—গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনেই।

—চোপ!

আচমকা অবিনাশ আমার নাকে একটা ঘুষি মেরেছে। বেশ জোরেই, আমি হাত দিয়ে দেখলুম নাকের কাছটা ভিজে ভিজে, বোধহয় রক্ত বেরিয়েছে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলাম। অন্ধকারে রক্ত দেখা গেল না অবশ্য। মারের

ঝোঁকে অবিনাশ নিজেও পড়ে গেছে মাটিতে।....আমি এক ঝলক সেদিকে তাকিয়ে দেখলুম, অবিনাশ লম্বা হয়ে শুয়ে অথচ উপুড় হয়ে, ঘাড়ের কাছে একটা ভোজালি বিঁধে আছে আমূল, ভোজালির বাঁটটা শুধু বেরিয়ে আছে, জ্যোৎস্না লেগে চকচক করছে সেটা। আমি হাঁটু গেড়ে বসলুম ওর পাশে।

আমি ধাক্কা দিয়ে ডাকলুম অবিনাশ, অবিনাশ! অবিনাশ চোখ খুলে বললো, সুনীল? আমি তোকে মারলুম? অ্যাঁ? আমি তোর জন্য, আমি তোকে, তুই জানিস না, তোর জন্য আমি কতখানি......তোকে মারলুম?

—অবিনাশ, তুই আমাকে কলকাতার বাইরে পাঠাতে চাস কেন?

কলকাতার বাইরে? কলকাতার বাইরে ভেতরে মাঝখানে যেখানে ইচ্ছে থাক না, আমার কি....আমি শুধু টাকার জন্য...এত টাকা চারদিকে—

—তুই কি গৌরীর কথা ভেবে আমাকে—

—গৌরী?

অবিনাশ হঠাৎ বিপন্ন মানুষের মতো ধড়মড় করে উঠে বসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো, তারপর ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলো, গৌরী? ঠিক বলেছিস, এতক্ষণ এ কথাটাই আমার মনে পড়ে নি। ঐ জন্যই তোকে খুঁজছিলাম। ঐ জন্যই তোর কাছে....আসল কথাটাই বলা হয় নি। গৌরীর সঙ্গে তুই আজ কি বলে দেখা করলি? মাঝে মাঝেই এখনও দেখা হয়? না-রে?

—তিন বছর পর আজই প্রথম দেখা হলো।

—যাঃ। বাজে কথা বলিস কেন? তুই তো গৌরীকে ভালোবেসে পাগল ছিলি না।

—না। কোনোদিন না। এক সময় ভালোবাসার চেষ্টা করেছিলুম। এখন আর চেষ্টা করারও ইচ্ছে নেই। আমার দিক থেকে তোর কোনো ভয় নেই।

—ভয়? আমার বড্ড ভয় রে—

অবিনাশ রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে সুস্থ হবার চেষ্টা করলো। মাথার চুলগুলো খিমচে ধরে নিজেই মাথাটা তুলে মুখ আকাশের সমান্তরাল করে ফাঁকা গলায় অবিনাশ বললো, আমার বড্ড ভয় করে রে। কোনোদিন গৌরীর কাছে ধরা পড়ে যাবো, আমি ওকে একটুও ভালোবাসি না। একটুও না। তুই যদি ওকে ভালোবাসতিস, কি চমৎকারই না হতো। আমি বাঁচতুম মাইরি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না, একদম চাই না।

—সামনের মাসে নাকি তুই ওকে বিয়ে করছিস?

—কে জানে কাকে বিয়ে করবো। যদি শান্তার সঙ্গে।

—শান্তা!

—তুই জানিস না, উফ্ কল্পনা করতে পারবি না—একদিন শান্তাকে চুমু খেয়েছিলাম, উফ, বুক জ্বলে গেছে, জ্বলে গেছে—ওসব গৌরীকে-ফৌরিকে আমি চাই বলার কোনো মানে হয় না। শখ করে না—শান্তা—

অবিনাশ গুন গুন করে অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলো। আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসে রইলুম। শান্তা একদিন জলে ডুবে গিয়েছিল, বারবার শান্তার সেই মুখটাই আমার মনে পড়ছে, জলে-ডোবা অসহায় শিশুর মুখ। কি জানি শান্তা এখন কত বড় হয়েছে। হঠাৎ মনে পড়লো, বাস স্টপ পর্যন্ত গৌরীর সঙ্গে হেঁটে যাওয়া, সব তেজী মুখের রেখা মিলিয়ে গিয়ে গৌরীর এখন শান্ত ভঙ্গি, বেশিক্ষণ বসে থাকলে ওর পিঠের শিরদাঁড়ায় ব্যথা করে।

অবিনাশ বললো, গৌরীকে এড়িয়ে কি করে শান্তাকে পাবো বলতো! শান্তাকে একদিন আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলুম, ঠিক আমার বুকের মাপে মাপে বুঝলি, আমার বুকের মধ্যে ওর পুরো শরীরটা এমন খাপ খেয়ে গেল— কিন্তু গৌরীকে নিয়েই হয়েছে ঝঞ্ঝাট। কি ঝামেলার মধ্যে আছি, তুই যদি জানতিস.....গৌরীকে বিয়ে না করলে শান্তাও বোধ হয় আমার দিকে ফিরে তাকাবে না—পারে কখনো, নিজের দিদিকে কেউ অপমান করলে...গৌরীটা মরে না কেন? কিংবা আর কারুর সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম.....

—এ সব কথা আমার সঙ্গে কেন? আমি তোকে সাহায্য করবো ভেবেছিস?

মাইরি, তুই আমায় সাহায্য কর। আমি তোর কেনা হয়ে থাকবো। আমি তোর জুতো মুখে করে নিয়ে যাবো। অনেকদিন ভেবে তোর কথা মনে পড়লো। আহা, তুই গৌরীকে অত ভালোবাসতিস? তোর মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। তোর মতো এমন ভালো ছেলে...

অবিনাশের পাশে বসে থাকতে আমার বিষম বিরক্ত লাগছিল। ওর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না, মাঝে মাঝে ও যে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে, আমার অস্বস্তি লাগছে। ওর মুখ দিয়ে বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে, এখন কথা জড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই থুতু ফেলছে একবার করে, ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে নাক ঝেড়ে আবার সেই হাতে আমাকে ধরতে আসছে বলে আমি একটু সরে সরে বসছি। হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠলো। আমি অবিনাশকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললুম, যা বাড়ি যা? আমার কাছে আর কোনোদিন আসিস না—

—ওফ, শান্তার জন্য বুকটা জ্বলে গেল, এত—টাকা রোজগার করছি, অথচ ইচ্ছেমতো কত বড়ো বড়ো পার্টিতে যাই, সেখানে শান্তা সঙ্গে থাকলে, ওফ, মক্কেলরা একেবারে সেঁটে থাকবে। মাথা ঘুরে যাবে মাইরি, তুই জানিস না, শান্তা....তা নয় গৌরির জন্য আমার কেরিয়ারটা ডুম করা....একটা পোকায় খাওয়া মেয়ের ভালোবাসা কে চায়?

আমি উঠে একা হাঁটতে আরম্ভ করতেই অবিনাশ চেঁচিয়ে বললো এই কোথায় যাচ্ছিস? আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দে...চলে যাসনি! একটু ধর উঠতে পারছি না।

অন্ধকারের মধ্যে আমি ফিরে তাকালুম। মাঠের মধ্যে এক স্তূপ আবর্জনার মতো অবিনাশ এলিয়ে পড়ে আছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলুম। অবিনাশ অনবরত চেঁচাচ্ছে। শব্দ শুনে একটা চিনেবাদামওলা এদিকে দেখতে এলো। আমি ফিরে গিয়ে হাত ধরে অবিনাশকে টেনে তুললাম। অবিনাশ বললো, পড়ে যাবার সময় হাতে বড্ড লেগেছে রে! দেখতো ভেঙেছে না কি? একটু ঝাঁকানি দিয়ে টিপে-ফিপে দেনা। অবিনাশের গা ছুঁতে আমার ইচ্ছে করলো না। আমি বললুম, কিছু হয় নি, যাঃ! অবিনাশ নাকি সুরে বললে, নারে, হাতেরমুঠোয় খুব লেগেছে। উফ! ঠাণ্ডা জল দিয়ে একটু রগড়ে দেনা! তোর লাগে নি.—আমি কোনো উত্তর দিলাম না।—বিজ্ঞাপনের লাল আলোগুলোর দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেলাম রাস্তার দিকে। সহজেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ও বললো, তুই-ও আমার সঙ্গে চল না—

আমি নীরস গলায় বললুম, না।

—চল না, দুজনে মিলে গৌরীর কাছে যাই।

—না। তুই আর আমার কাছে কোনো দিন আসিস না।

—আঃ! যত তোর বাজে কথা! বেশ করবো আসবো। এখন চল না। দুজনে যাই—

—না। আমি প্রায় জোর করেই অবিনাশকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। সেটা চলে যেতেই কান দুটো বেশ ঠাণ্ডা লাগলো। এতক্ষণ ধরে অবিনাশের একঘেয়ে ঘ্যান ঘ্যানানিতে কানের ফুটো দুটো যেন ভরে যাচ্ছিল। এখন ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে টের পাচ্ছি, পুকুরের পাড়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। এখানে কিছু কিছু লোক আছে। এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি, আজকের রাতটা বেশ চমৎকার, খুব শীত নেই—বরং মাঠভর্তি ঠাণ্ডা আলো ছায়া। এখানে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগার কথা নয়। কোথা থেকে যে অবিনাশের মতো লোকেরা এসে হাজির হয়, একলা থাকতে দেয় না। এই রকম জলের ধারে তো একা দাঁড়ানোই ঠিক, আর কিছু তখন মনে পড়ে না, নিজেকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়।

বুকের কাছটা ভারী ভারী লাগছে। ও, ভোজালিটার জন্য! পকেটে নোটবই বা মানিব্যাগ রাখার অভ্যেস নেই আমার, আর সারাদিন একটা ভারী জিনিস বয়ে বেড়াচ্ছি। ইচ্ছে হলো, ভোজালিটা গোপনে বার করে জলের মধ্যে ফেলে দিই। ঝুপ করে একটা শব্দ হবে শুধু। ডুবে যাবে না ভাসবে? খাপ সুদ্ধু ফেললে, ডুবে যাবে কি না ঠিক বলা যায় না। ডুবুক আর ভাসুক, এটাকে ফেলার কোন মানে হয় না, শখ করে কিনেছিলাম! বরং এটাকে দেয়ালেই ঝুলিয়ে রাখবো আবার। অবিনাশকে তো আমার ছুঁতেই ইচ্ছে করলো না, দেখা যাক অন্য কারুকে বেছে নিয়ে আবার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা শুরু করা যায় কি না!

রানি ও অবিনাশ

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা, পা ফাঁক করে দাঁড়ালে অনেকটা বড় ছায়া পড়ে। কিন্তু এখন ছায়াটা একটু বেশি লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, এখন সকলেরই ছায়া ছোটো-ছোটো, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কি করে? রাত্তিরের দিকে পিছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়, অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত, কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোনো আলোর খোঁজ করলো—কিছুই নেই। তা হলে কি করে এতবড় ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে তার মাথা। যাই হোক, ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হল না, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-ফাবিষ্কার যত বেশি হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবলে।

ভারি ভারি বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিক্সা-এমনি ঠেলাগাড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়ে—যাই হোক, ব্যথা তো আর লাগছে না। তবু, অবিনাশ কয়েকবার সরে সরে দাঁড়ালো।

প্রজাপতিরঙা ছোটো ছোটো মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে—না, সর্দারণীরা এখনো বেরোয়নি। মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। কচি কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন টেনের মেয়েদেরও ছুটি হয়ে গেল। এমনকি দু একটা মেয়ের চেহারা দেখে এখন আর ছাত্রী কি মাস্টারণী বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো ঠোঁট দুজন শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে, রানি আজ স্কুলে আসে নি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ। অথবা, রানি হয়তো এখন আর চাকরি-টাকরি করে না। ওর স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবার কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারি করলে মানায়! কিন্তু অবিনাশ শেষপর্যন্ত দেখে যাবে। আর কমিনিট—এর পরই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং আর বেশিক্ষণ নিশ্চিন্ত ভিতরে বসে থাকবে না রানি, যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙিন প্যারাসোল, একটি সুডৌল হাত—মুখ না দেখতে পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ওই হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিডভিকটোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের চটি! ইস্কুলে কাজ করলে তো এসব শখ বেশিদিন থাকে না। দিদিমণি দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর একটা সিগারেট ধরালো। আগে চোখাচোখি হোক না। আধ ঘন্টার ওপর অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ্য করছে? পাড়ার ছোঁড়ারা না আবার আওয়াজ দেয়। যাকগে। বাসে উঠে পড়বে নাতো টপ করে!

রানি কিন্তু এদিকে তাকালো না। ছাতা না বন্ধ করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো সুতরাং অবিনাশই এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কোনো কথা না বলে ওর সামনে দাঁড়ালো। বললো, চিনতে পারো?

—একি, তুমি? রানি যেন খুব বেশি অবাক হয় নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরলো। এতদিনে মনে পড়লো অভাগিনীকে? একটু দয়ামায়া নেই শরীরে তোমার। মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে একটা খবরও নিলে না।

—সত্যি, কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রানি।

—পাঁচ বছর আট মাস।

অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রানি কি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুনছে নাকি? না, টপ করে মুখে যা এল বলে দিল। পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল—সেই আলিপুরের ট্রামে না শশাঙ্কর বিয়ের সময়, না,—যাকগে যাক। রানি ওর বাহু ছুঁয়ে আছে, অবিনাশেরও ইচ্ছে করলো রানির কাঁধে হাত রাখে—কিন্তু এইভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রী-ফাত্রি বোধ হয় দেখে অবাক হবে। থাক। তুমি কেমন আছো রানি।

—ভালো নেই। তোমার জন্য সবসময় মন কেমন করে। বলেই রানি হেসে ফেললো। তারপর হাসতে হাসতেই দুষ্টুমির হাসি, গোপন করতে না পেরে, বললো, বিশ্বাস হল না তো? সত্যিই কিন্তু হেসে ফেললো, কি হবে, তোমার জন্য খুব মন কেমন করে!

—থাক আর ইয়ার্কি করতে হবে না। শরীরটা নষ্ট করলে কেন? এরকম মোটা হতে হয়? কি সুন্দর ফিগার ছিল তোমার। এখন অত বড় বড়....

—এই, অসভ্যতা করো না, লোকে শুনতে পাবে। কি হবে আর এই পোড়া শরীরের দিকে নজর দিয়ে। আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।

—কেন, স্কুলের সেক্রেটারি? তিনি বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকেন না? কিংবা, পাড়ার ছেলেরা, স্বামীর বন্ধু, অথবা পাশের ফ্ল্যাটে কোনো সংগীতরসিক, তোমার স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।

—না, —রানি ছদ্মম্লান গলায় বললো, আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড়া আমার রূপের প্রশংসা আর কেউ করে নি।

এটা একটা পুরোনো ঠাট্টা। রানির চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারি সুন্দর, খুব কোঁকড়ানো চুল আর ফর্সা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রানি এলিজাবেথের (প্রথম) মতোই দেখাতো। ওর নাম আসলে প্রতিমা, কিন্তু সবাই 'রানি রানি' বলেই ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনোক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেতো না ছেলেবেলায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর চেহারাটা চোয়াড়ে, কাঠখোট্টা, রং বেশ কালো। তাই রানি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, 'আহা, সব রাজকুমারই কি সুন্দর হবে নাকি? আফ্রিকার রাজকুমাররা, যত বড় রাজার ছেলেই হোক না—কালো কুচ্ছিততো হবেই! তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার।'

রানি জিজ্ঞেস করলো, এখন কি চাকরি-টাকরি করছো?

—কিচ্ছু না। বিদেশে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার!

—ফিরলে কেন?

—আমি বিদেশে গিয়েছিলুম, তুমি জানতে?

—জানতুম না? সব খবর রাখি। দেখা না হলে কি হয়। ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি?

—তোমার জন্য মন কেমন করছিল।

দুজনেই আবার হেসে উঠলো অনেকক্ষণ। রানি বললো, জানো, আমার এখন সাড়ে তিনশো—চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম। কি, আমাকে বিয়ে না করার জন্য এখন তোমার অনুতাপ হয় না?

—মোটেই না। খুব বেঁচে গেছি। প্রথম প্রথম, তুমি যখন ওই হুঁৎকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দুতিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হত, অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী নারী। বুক ফেটে যেত। মনে হত, সব মেয়েই এই রকম। তারপর বুঝতে পারলুম, খুব বেঁচে গেছি! ওফ! বন্ধু-বান্ধবদের তো দেখেছি—বিয়ে করে এক একজন লেধরুস হয়ে যাচ্ছে, কি রকম বোকা বোকা তেলতেলে মুখ হচ্ছে এক একজনের। আমি কত খোলা হাত পা আছি—যখন খুশি বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় ময়লা গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, 'পকেটে পয়সা থাকলো বা না থাকলো, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি!

—কি নিষ্ঠুর, বাবা। অন্তত মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার।

—মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে। বুড়ো হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আটাশ। নাকি আরও বেশি, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে।

—এখন সে-সন্দেহ হচ্ছে কেন?

—বাঃ, পাঁচ বছরে যদি কারুকে দশ বছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!

—যাঃ মিথ্যে! মোটেই দশ বছর নয়! দুবছর ভাঁড়িয়েছিলুম, এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার—এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে। আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম। তাও কি ভয়—

—সেদিন আর নেই! বিদেশে অন্তত শখানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।

—ওসব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না। আমার চেয়ে আর কেউ বেশি চেনে না তোমাকে।

একটু থেমে রইলো দুজনেই। অবিনাশ রানির সারা শরীরে চোখ ঘোরায়। রানি পাশ-চোখে তা লক্ষ্য করে হাসে।

—সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম। ইস্কুলের যখন মাস্টারণী সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক এক সময় কি রকম

হাসি পায়। জীবন কাটিয়ে দেওয়া তাহলে এত সহজ! কালকে জানো—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম। প্রেমপত্র। একজন লিখেছে, বাকিরা সেটা কপি করে নিচ্ছে। খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে মনে খুক খুক হাসছিলুম। বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছে করছিল। এক জায়গায় কি লিখেছে জানো, 'তোমার জন্য বুকের মধ্যে ব্যথা করে, যেন অসম্ভব জ্বর হয় আমার।'—কি রকম অসভ্য! আমাদের সময় আমরা লিখতুম 'হৃদয়', এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক'। একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাকে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।

—কেন, আমার ঠিকানা জানতে না?

—ইস! শখ কম নয়! জানো, চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশন পর্যন্ত দেয় নি। তার বদলে কোন আধুনিক কবির। কি জানি, তোমারই হয়তো।

—কেন, আমার কবিতা চেনো না? পড়ো না বুঝি আজকাল?

—যা তা রাবিশ লিখছো তো এখন! কে পড়ে ওসব!

—তোমার ইস্কুলের দুএকটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না!

—ফাজলামি করতে হবে না। বাড়ি যাই।

—রানি, তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা ছিল।

—আর দরকারে কাজ নেই। ঢের বেলা হল, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলে আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?

—ও, এবার বুঝি রাগ হল।

—না রে, পাগলা, সত্যি বাড়ি যেতে হবে। এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ধরতে হবে না।

—দ্যাখ, খুকি, চালাকি করিস না। এতদিন পর দেখা হল, অমনি বাড়ি আর বাড়ি! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।

—অত খাতির নয়। আমার কত্তা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। দেবে গলা ধাক্কা।

—তবে চল কোনো চায়ের দোকানে বসি। সত্যি একটা খুব দরকারি কথা আছে তোর সঙ্গে।

—আবার তুই-তুকারি শুরু করছিস!

—তুই-ই তো প্রথম আরম্ভ করলি। তোর ছেলের কি নাম রেখেছিস?

—তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা কুকুর পুষবো, সব সময় বুকে জড়িয়ে থাকবো তাকে।

—রানি তোকে খুব জরুরি একটা কথা বলতে এসেছিলুম।

—কোনো দরকার নেই।

—সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে।

—না, অবি, কেন এসেছিস এতদিন পর? কেন ভেঙে-চুরে দিতে এসেছিস? বেশ তো আমি সংসার পেতে, চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বৌ-বৌ খেলছি। তুই চাস, সব টান মেরে ফেলেই দিই আবার? কিন্তু তুই তো পাগল, তুই তো আমার পাশে থাকবি না জানি। কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে। তুই যা।

—না রে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য। শুধু একদিন। চল, কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি।

—উপায় নেই যে। সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। এত দেরি করে তো কোনোদিন ফিরি না। ওই রাসটায় উঠি।

—একটু দাঁড়া। আচ্ছা মনে কর খুব ট্র্যাফিক-জ্যাম। বাসে ওঠার কোনোক্রমে উপায় নেই। তা হলে কি করতিস, দেরি তো হতোই।

—তা হলে হেঁটে যেতাম।

—আচ্ছা চল, হেঁটেই যাই। এইটুকু সময়ে তোকে একটা কথা বলি। এখনো শীত যায় নি, রোদ্দুরের তাত নেই।

অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে রানি ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত, সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে, স্বাভাবিক এবং ছোটো হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া। অবিনাশ ঘুরে এসে রানির ছায়ার ওপরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল।

রাস্তার লোকজন অনেক কমে গেছে। কোথায় পরের বাড়ি জলের দরের মতো নিলাম হচ্ছে, অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সন্দেহ কি। দুজনে দুজনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগলো।

রানি ওর রঙিন ছাতাটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে। অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে বললো, দেখি কি আছে? ঠোঁট উল্টে রানি বললো, কিছুই নেই, কি আর থাকবে—বাড়ি থেকে ইস্কুল আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই। কটা খুচরো পয়সা আছে।

—ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করবো।

—এক সময় তো অনেক চুরি করেছো বাপু।

—তা সত্যি। অনেক টাকা নিয়েছি তোর কাছে থেকে, রানি।

—কেন আজ দেরি করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পৌঁছে যেতুম।

—সত্যিই তোর ইচ্ছে করছে না আমার সঙ্গে থাকতে? একসময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতিস।

—ছেলেবেলায় ওরকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম! এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে।

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকলো, রানি!

রানি তখুনি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বললো, এবার বুঝি বোকা-বোকা প্রেমের কথা শুরু করবি? খবর্দার। এখন আর কচি খুকিটি নেই যে ভোলাতে পারবে!

—কবেই বা তোকে ভোলাতে পেরেছি! ছেলেবেলা থেকেই তো তুই পাকা একটি। প্রেমের কথা তো তুই-ই আমায় শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা পাতলা ঘাম জমেছে। খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই। এতক্ষণ কথা বলছি—অথচ একটাও চুমু খাই নি তোকে—এরকম আগে কখনও হয়েছে?

—তবে আর কি, রাস্তার মধ্যেই শুরু করো। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক।

—ওই জন্যই তো বলছিলুম কোথাও গিয়ে বসি।

—ইস, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কি! এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসবো টেবিলের দুপাশে।

—দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।

—শাশুড়ি থাকে।

—থাকুক। শাশুড়ি যেদিন গঙ্গায় স্নান করতে যাবে, আমি তক্কে তক্কে থাকবো।

—আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলবো না। কেন খুলবো? তুই আমার কে?

—আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠবো।

—কেন? তুই আমার কে?

—আমি তোর সর্বস্ব! তুই-ই তো বলতিস।

—ইস, কোথাকার সর্বস্ব রে। দেখি মুখখানা।

তুই আমাকে একেবারে গ্রাহ্যই করিস না রানি। আমি বিলেত ঘুরে এলুম হাজার হোক, আমি এখন একটা বিলেতফেরত।

—ওরকম বিলেতফেরত গণ্ডায় গণ্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইমপ্রেস করতে এসেছিস! কি অধঃপতন তোর।

—রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাবো।

—চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তা ছাড়া এমন চেঁচাবো যে রাস্তার হাজারটা লোক এসে গাঁট্টামেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।

—ওসব লোকফোক আমাকে দেখাস নি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুণ্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাবো।

—নিয়ে গিয়ে কি করবি?

—তোর পায়ের তলায় আমার মুখ ঘষবো।

রানি হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, এখুনি ঘষ না, এই যে দাঁড়িয়েছি। লোক দেখুক, ক্ষতি নেই।

—তারপর তোর মুখও ঘষবি, আমার পায়?

—তার দরকার নেই। তোর ওই কুচ্ছিত পা-জোড়া সব সময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।

—ও, তা হলে রানি সান্যালও রোমান্টিক হতে জানে।

—সান্যাল নয়, রায়চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী, মনে থাকে না বুঝি?

—বাঃ, পরস্ত্রী। আয় না রানি, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকীয়া প্রেম খুব ফাসক্লাশ জিনিস।

—অবৈধ প্রেমই যদি করবো, তবে পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে কেন? আমি বুঝি নতুন একজন যোগাড় করতে পারি না?

—করেছিস নাকি এর মধ্যেই।

অবিনাশ রানির ছাতার একটা খোঁচা খেলো। ছাতার বাঁটের নিচে কাদা ছিল, অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়লো। অবিনাশ যে সে দাগটা তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আর একটা সিগারেট ধরালো—তাতেই খুশি ছড়িয়ে পড়লো রানির মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কিসে খুশি হয় বোঝা যায় না। খুশি হয়ে রানি বললো, আজকাল এত বেশি সিগারেট খাস কেন?

—তুই খাবি নাকি? আগে তো দুএকটা খেয়েছিস।

—হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনের বেলায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে যাই। তা হলে আর আমার বাকি থাকে কি?

অবিনাশ একটু চুপ করে রইলো। তাকিয়ে দেখলো, ওদের ছায়া-টায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন বিশ্রি রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে ছায়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনো মানে নেই। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে অবিনাশ বললো, সত্যি রানি, আমরা অনেক দূরে সরে গেছি—অথচ মাত্র ছসাত বছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কি রকম অদ্ভুত শোনালো, যেন একটা বিদেশি শব্দ, যেন আমি একটা লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রত্যেকদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতি—

—থাক, পুরোনো কথা। আমি ভালো আছি অবিনাশ।

—আমিও খুব ভালো আছি। বিশ্বাস কর আমি কোনো দুঃখের কথা বলতে আসি নি।

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রিজের ওপর দিয়েও হাঁটা পথ আছে—নিচে দিয়েও আছে একটা সরু কাঠের রাস্তা। ওরা নিচ দিয়েই গেল। রেলিং ধরে দাঁড়ালো দুজনে। নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেললো জলে, ব্রিজের নিচ দিয়ে ভেসে গেল। রানি একেবারে জল ভালবাসে না। অবিনাশ রানিকেই পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে জানে—জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রানি এক্ষুনি ওই জলে থুতু ফেললো।

রানি বললো, এইবার শুনি কি দরকারটা? কি এমন দরকার আমার কাছে? ইস, কত বেলা হয়ে গেল যে! অবিনাশ জানতো রানি এইবার ও কথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে। ঠিক কি রকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রানি ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বললো, কী?

—তোকে একটা কথা বলবো রানি। তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না। দূরে সরে গেলেও আমি তো তোর সেই অবিনাশই আছি।

—অত ভণিতার দরকার কি? কি চাই বল না।

—রানি তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও।

—হুঁ। ওর খুব একা একা লাগতো—তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে। যাক বাজে কথা—দরকারি কথাটা কি? কি চাইতে এসেছিস এতদিন পর?

—মুক্তি। এক কথায় বলতে গেলে—

—সে আবার কি? তুই-ও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস আমিও তোকে দিয়েছি। বন্ধনটা আর কোথায়?

—সে রকম নয়। তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিস নি। আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে কিন্তু—

রানি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারলো না। সেই জন্যই বোধহয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোনো সংকেত নেই। অবিনাশ আবার বললো, বেশ থেমে থেমে ঠাণ্ডা গলায়—তোর কথা ভুলে যাবার পর—আমি বেশ কয়েকটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর, ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েকজনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পাই নি ঠিক। কেন পাই নি জানিস, সব সময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে! তোর শরীর তো আমি জানি না।

—এবার বাড়ি যাই।

—না, না, শোন, আমার পক্ষে খুব জরুরি কথা। আমার জীবনমরণ সমস্যা। আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে—তোর কথা, হাসি, পাগলামি, শরীরের গন্ধ—অর্থাৎ যা কিছু ফেমিনিন—তার স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি। তোকে মনে হত একটা রহস্যের সিন্দুক। তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে বুকে মুখ চেপে ধরেছি—কি অসম্ভব উথাল-পাথাল করতো তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সকলেরই যা হয় আর

কি। কিন্তু কোনোদিন তোর সঙ্গে শুই নি, সাহস পাই নি—ভাবতুম, অতখানি আমার সইবে না। ওই অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। এইসব আর কি। এখন দেখ, কত বদলে গেছি। চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে, প্রেম-ফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব, মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। অর্থাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাই না ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি—খুব গোপনে, ওদের একদম বুঝতে না দিয়ে—আমার যেটুকু বিষম দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে বুঝি সাধারণ কাণ্ড-কারখানাই হচ্ছে—আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না জেনে—তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মানে বোঝে না শরীরের। আমি চাই ওরা না জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে—। ওদের কোনোদিন বলবো না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনো—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেও কখনও পাই নি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে—তোর কত-কিই তো আমি জানি—প্রায় গোটা জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে, আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি এ কথা বললুম বলে। তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছিস—আমি কি আর কিছু মনে করছি। তুই নিশ্চয়ই আশা করিস নি—আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবো।

—বয়ে গেছে আমার মনে করতে। যাক, এ সব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কি। আমি কি করবো?

—তুই বুঝতে পারছিস না রানি? তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।

—কি রকম সাহায্য? আমার কাছে কি চাইছিস?

—একটি দিন।

—তার মনে?

—আমি তোর সঙ্গে একবার।

—তাতে কি লাভ হবে?

—আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে—আসলে তুই-ও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোনো আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাবো। তার বেশি আর কিছু পাবার নেই।

রানি হঠাৎ চোখ দুটো খুব নিচু করলো। যেন ওর চোখ দুটো একেবারে ঢুকে গেল মুখমণ্ডলের মধ্যে। কপালের নিচে আর কিছু নেই, সাদা। সেইরকম ভাবেই বললো, অসভ্য, ইতর কোথাকার।

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেল। একটু দ্বিধা করে আলতোভাবে রানির কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'একি রানি, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলি নি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দুজনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।

রানি ফুঁসে উঠে বললো, না, আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ।

—এটা তো ছেলেমানুষি! আমাদের এত বয়েস হলে, এখন তো আমরা জানি। তোকে না পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাবো না—একি সম্ভব নাকি!

—হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা—তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয় পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তাকে মুক্তি দেবো না।

—ওসব কিছু না, রানি। জীবন অন্য রকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার—

—তারপর আমার কি হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি সাধারণ থাকবো না? অবি, তোকেও তো আমি সম্পূর্ণ পাই নি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুইও সাধারণ, আমার স্বামীরই মতো—তা হলে আর আমার জীবনে কি রইলো? তোকে দেখলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। যদি দেখি,—তুইও তাহলে, আমার এই চাকরি-করা, স্বামীর সংসার, ছেলে মানুষ-করা—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কি থাকবে তা হলে? আমার একটিও না-দেখা স্বপ্ন থাকবে না? একজনের কাছে অন্তত রানি হয়ে থাকবো না? আমার জীবনে থাকবে না একজন অদেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার! না, অবি, আমি সব কিছু জানতে চাই না। তুই দূর হয়ে যা।

—কিন্তু জানাই তো ভালো। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, জীবনে আমার কি কি প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিত।

তুই আর আমার সামনে আসিস না। কোনোদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোনো ভয়ই আর থাকে না। তা হলেই তোকে আমি চিরকাল ভালবাসতে পারবো।

—তুই ভুল করছিস। ওকে ভালবাসা বলে না। কি দরকার ভালবাসার। ভালবাসা ছাড়াও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বড় কথা হল জানা। যদি তোকে—

—আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। তোর জন্য আমার মায়া হয়।

পাশ দিয়ে যে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন শান্তভাবে কথা বলছে রানি! কিন্তু ওর মুখের একটা সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো। অবিনাশ সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রানি কেন এমন রাগ করলো। রানির ওপর ওর জোর ছিল কত। কত হুকুম করছে একসময়। ওর কথায় রানি একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—

অবিনাশ বললো, আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রানি। অনেক ভেবেচিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরে গেছি, কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয় নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে দূরেই থাকবো। কিন্তু তার আগে—

হঠাৎ অবিনাশ দেখলো রানি চলতে শুরু করেছে। পিছনে ফিরলো না, যেন ও একাই চলে যাবে। কি ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকলো না। মনে মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জানালো রানিকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ও আর একটা সিগারেট ধরালো। একা একা কিছু না ভেবে সিগারেট শেষ করলো। সত্যি সেইটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রানির কথা তো নয়ই, সম্পূর্ণ সাদা মন, ও নিচের ময়লা জলের স্রোত দেখলো। পকেটে হাত দিয়ে একবার খুচরো পয়সাগুলো গুনে দেখলো অনাবশ্যক। তারপর একটা ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে রানির জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো, আমি কি রানিকে অপমান করলুম? আমি তো মোটেই চাই নি। আসলে, যত বয়েস বাড়ছে, রানি ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বছর পাঁচেকবাদে রানিকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কিনা—অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে।

পোস্ট মর্টেম

আপনার নামটা জানতে পারি? সুমিতা মজুমদার। আপনি সেদিন পাঁচটা পঁচিশে...হ্যাঁ, আমি ঠিক পাঁচটা দশে অফিস থেকে বেরোই, পাঁচটায় ছুটি হলেও ইচ্ছে করেই একটু দেরি করি...অফিস থেকে বেরিয়ে, ওইটুকু আসতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগে না...আচ্ছা, আপনি কতদূরে থাকেন? আমি থাকি জগুবাজার স্টপে...

আপনি? আপনি সেদিন ছিলেন?...হ্যাঁ।...আপনার মনে আছে?...হ্যাঁ। মনে থাকবে না কেন? তবে, আমি নিজের চোখে দেখিনি, আমি বসেছিলাম সামনের দিকে...। আপনার নাম? রত্না দাশগুপ্তা...

আপনি? আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক গেটের পাশেই...। দাঁড়ান আপনার নামটা লিখে নি। শর্বরী মুখোপাধ্যায়?...আপনি বানানটা ভুল লিখলেন, তালব্য স হবে...। শর্বরী? আই অ্যাম সরি...হ্যাঁ, আপনি গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন? আচ্ছা, আপনি কোন অফিসে চাকরি করেন? সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক...সেই যেটাতে আগুন লেগেছিল? না আমি অন্য একটা ব্যাঙ্কে...। ও, আচ্ছা সেখান থেকে আসতে আপনার কতক্ষণ লাগে?...পাঁচ ছমিনিট...অফিস থেকে বেরুতে এক একদিন দেরি হয়ে যায়—সেদিন ধরতে পারি না...। আপনি কোথায় থাকেন? আমি থাকি টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছে, এই যে রেশমি, ও আর আমি একসঙ্গে থাকি...

আপনার নাম রেশমি? রেশমি সেনগুপ্ত...। বাঃ, আমি সেনগুপ্ত হতে যাবো কেন...। না, মানে, আমি ওই নামে একজনকে চিনতাম কিনা, তাই ভুল হয়ে গেল।...অনেকটা আপনার মতনই চেহারা...আপনি তা হলে...। রেশমি চৌধুরী।...বিয়ের আগে?...বিয়ের আগেও চৌধুরী ছিলাম। এতে অবাক হবার কী আছে? না, আমি অবাক হচ্ছি না...।

তা হলে রেশমি দেবী, আপনিও কি আপনার বান্ধবী শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন? গেটের কাছেই?

না, আমি গেটের পাশে ছিলাম না!

আপনারা দুই বান্ধবী তা হলে এক সঙ্গে ওঠেন নি ট্রামে? অথবা একজন বসার জায়গা পেয়েছিলেন, আর একজন পান নি?

আমি টার্মিনাস থেকে উঠি, শর্বরী ওঠে দু স্টপ পরে...আমরা থাকি এক জায়গায়।

আপনাদের বাড়িও কি পাশাপাশি?

পাশাপাশি থাকি, কিন্তু পাশাপাশি বাড়ি নয়।

তার মানে? ঠিক বুঝলাম না।

আমি থাকি আমাদের বাড়িতে। পাশের বাড়িটা একটা হোস্টেল, সেখানে থাকে শর্বরী।

হোস্টেল? আপনি কি ছাত্রীও?

না। ওটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল...এরকম হোস্টেলের কথা আপনি আগে শোনেন নি?

ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছি।

কলকাতায় আমার জানাই এরকম পাঁচটা হোস্টেল আছে।

আপনি কি তা হলে বাইরে থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসেছেন? কিছু মনে করবেন না...আপনি তো বিবাহিতা, আপনার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই বলছি...অবশ্য একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন হয়ে যাচ্ছে।

বিবাহিতা...অথচ কেন হোস্টেলে থাকি, এই কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? আগে আমরা আনোয়ার শা রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম...আমরা মানে আমি আর আমার স্বামী...ওঁকে অফিস থেকে খুব ট্যুরে পাঠায়...মাসের মধ্যে অন্তত কুড়ি দিন...বেশির ভাগ দিনই আমি, আমাকে একা থাকতে হতো একা একা একটা ফ্ল্যাট সামলে থাকা...অনেক ঝঞ্ঝাট (হাসি)।

...আমি বলছি...শর্বরীকে একলাই থাকতে হতো বেশির ভাগ দিন...পাড়ার দুটো ছেলে খুব উপদ্রব শুরু করেছিল, যখন-তখন নানান ছুতোয় আসতো...আপনারা পুরুষেরা ভাবেন, কোনো মেয়ের একা থাকার অধিকার নেই...একা থাকলেই তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে।

আপনি সব পুরুষকেই এক দলে ফেলে দিলেন?

নিশ্চয়ই, আপনারা সবাই এক!

নতুন...ধরুন, আপনার স্বামী এবং পাড়ার ছেলেরা এরা সবাই পুরুষ মানুষ হলেও নিশ্চয়ই একরকম নয়? পাড়ার

ছেলেরা একটা আলাদা জাত, আর স্বামীরা একটা...কিংবা ধরুন চেনা কিংবা অচেনা লোক, এরাও আলাদা একজন চেনা লোক যদি কোনো মেয়ের কাঁধে হাত রাখে, আর একজন অচেনা লোকও...ব্যাপারটা কত আলাদা। কিংবা যুবক এবং বৃদ্ধ, এরাও আলাদা জাত নিশ্চয়ই, পুরুষ হলেও...

আপনি আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে এত কথা বলছেন কেন?

আপনাদের যদি আপত্তি থাকে, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি...

আপত্তির কী আছে! এই সুমিতা চুপ কর না, দেখাই যাক না, উনি কী বলতে চান!

আপনাদের কাছে শুধু দুএকটা খবর জানতে চাই, আচ্ছা শর্বরী দেবী, আপনাদের আগের পাড়ায় একটা গন্ডগোল হয়েছিল...

তাই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলাম। এখন আমি হোস্টেলে খুব শান্তিতে থাকি।

কিন্তু আপনার স্বামী যখন কলকাতায় ফেরেন মাঝে মাঝে, অন্তত দশদিন তো শুনি কলকাতায়...

আমাদের রানাঘাটে নিজস্ব বাড়ি...ওঁর যখন ট্যুর থাকে না, তখন রানাঘাট থেকে অফিস করেন...আমি শনিবার বিকেলে চলে যাই, সোমবার সকালে ওখান থেকেই অফিসে।

বাঃ, খুব আধুনিক ব্যবস্থা...আপনাদের আগের পাড়ায় যে গন্ডগোল হয়েছিল, আপনার স্বামী কি সেটা জেনে ফেলেছিলেন? উনি কি আপনার ওপর...না, না, থাক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না, আপনি রেগে যাচ্ছেন, ...তা হলে ধরে নিতে পারি আপনারা এখন খুব শান্তিতে আছেন আপনাদের জীবনে আর কোনো গন্ডগোল নেই...বাঃ গন্ডগোল থাকবে না কেন? বিয়ের পর মাঝে মাঝে একটু-আধটু গন্ডগোল হয়ই...(হাসি)...যাই হোক, আমরা দূরে সরে যাচ্ছি, আপনি সেদিন গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন...আপনার সব ব্যাপারটা মনে আছে, আপনি কি লোকটার সঙ্গে কোনো কথা বলেছিলেন।

না। বোধহয় অঞ্জলিদি কথা বলছিলেন দুএকটা । এই অঞ্জলিদি আপনি, আপনি অঞ্জলি কী? রায়। আপনি কথা বলেছিলেন লোকটির সঙ্গে?

না, আমি কোনো কথা বলিনি।

আপনিও কি গেটের কাছেই...

অঞ্জলিদি, তুমি বলছিলে না যে তুমি লোকটির সঙ্গে...

নাঃ আমি কোনো কথা বলিনি।

আপনিও গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন?

আমার মনে নেই।

মাত্র দুমাস আগের কথা। আপনার মনে নেই?

বলছি তো, আমার কিছু মনে নেই।

আচ্ছা, আপনার মনে আছে? এই যে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আমি সে দিন ওই ট্রামে ছিলামই না।

আপনি কোনো দিন ট্রামে, কোনোদিন বাসে ফেরেন? যখন যেটা সুবিধে মত পাওয়া যায়?

না। সাধারণত আমি এই ট্রামেই যাই। তবে আপনি যে-সময়টার কথা বলছেন, তখন আমি ছুটিতে ছিলাম।

সেদিনটা ছিল একটা মঙ্গলবার। আচ্ছা, রেশমি দেবী, আপনি কি মনে করতে পারেন, সেদিন কত তারিখ ছিল?

কে জানে? অত মনে নেই।

শর্বরীদেবী, আপনার মনে আছে?

মনে রাখা খুবই সহজ। সেদিন ছিল ১লা তারিখ। আমরা অনেকেই সেদিন মাইনে পেয়েছিলাম।

শর্বরী ঠিকই বলেছে। আমারও মনে আছে সেদিনটা ছিল ১লা, বিকেল থেকেই মেঘ করে অন্ধকার হয়েছিল।

তখন বোধহয় বৃষ্টি পড়তেই শুরু করেছিল।

না, বৃষ্টি পড়ে নি, তবে মেঘ করেছিল খুব।

তুই কী বলছিস, সুমিতা! সেদিন তো বিকেল থেকেই দারুণ বৃষ্টি...আমি ভিজে ভিজে ট্রামে উঠলাম।

আচ্ছা, আপনারা কি সবাই সবার নাম জানেন?

অনেকেই অনেকেরটা জানি। রোজ এক সঙ্গে ফিরি তো আলাপ পরিচয় তো হবেই...নতুন কেউ উঠলেই আমরা ঠিক বুঝতে পারি।

লোকাল ট্রেনের একই কামরায় যারা রোজ যাতায়াত করে, তাদেরও এরকম চেনাশুনা হয়ে যায়। তারা অনেকে ক্লাবও করে...যেমন তাসের ক্লাব কিংবা গানের ক্লাব...অনেকেই ট্রেনের কামরায় নাটকের রিহার্শালও দেয়...আপনাদের সে রকম কিছু আছে?

না, আমাদের কোনো ক্লাব-ট্রাব নেই।
এমনি নিজেদের মধ্যে গল্প হয়?
হ্যাঁ, গল্প হয়।
সেদিনের সেই ঘটনাটা নিয়ে পরে আপনাদের মধ্যে আর কখনো কথা হয়েছে?
আপনি কি রিপোর্টার? আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? না, আমি রিপোর্টার নই। রিপোর্টাররা শুধু টাটকা খবর যোগাড় করে। এটা তো দুমাস আগেকার ঘটনা।
তা হলে আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?
এমনিই। আপনাদের যদি উত্তর দিতে আপত্তি থাকে...
পাঁচটা পঁচিশ তো হয়ে গেছে। এখনো এল না কেন?
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মিটিং আছে আজ। রাস্তা বোধহয় জ্যাম। আজ আসতে দেরি হবে।
দেরি হলেও আসবে ঠিকই।
লোকটা অন্ধ ছিল!
আপনি?
আমার নাম শিউলি দাশগুপ্তা। আমি সব দেখেছিলাম। আমি বলছি সব ঘটনাটা। আপনি লিখে নিন।
আপনি বলছেন লোকটি...
হ্যাঁ, লোকটি অন্ধ ছিল। আমি দেখে চমকে উঠেছিলাম। কপালের নিচে চোখের জায়গা দুটো একদম ফাঁকা, কিছু নেই।
না, না, না, মোটেই নয় মোটেই অন্ধ নয়...আমি দেখেছি, চশমা পরা...না, চশমাও ছিল না, দিব্যি প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছিল চারদিকে...আমরা হাসছিলাম দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল...শিউলি তুমি কী করে বললে লোকটি অন্ধ...মোটেই অন্ধ নয়, অন্ধ হলে আমরা...
তা হলে দেখছেন শিউলি দেবী, অনেকেই আপনার কথার প্রতিবাদ করছেন। এঁরা সবাই বলছেন লোকটি অন্ধ ছিল না।
কিন্তু আমার যে স্পষ্ট মনে আছে, লোকটি অন্ধ।
না, না, না, মোটেই নয়, শিউলিদি আপনি ভুল করছেন...আমি পাশ থেকে দেখেছি।
তা হলে বোধহয় লোকটা দুটো চোখই বুজে ছিল।
আচ্ছা, পুরুষরা বাসে ট্রামে যাবার সময় অনেকে ঘুমোয়। মেয়েরা বোধহয় ঘুমোয় না? না?
(হাসি)
ওই লোকটার ঘুমোবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ও বসেনি। দাঁড়িয়ে ছিল...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ ঘুমোয় না।
অনেকে ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটে।
(হাসি)
আপনাদের কারুর কি মনে আছে, লোকটা একটাও কথা বলেছিল কিনা?
হ্যাঁ, বলেছিল। অঞ্জলিদি কথা বলেছিলেন লোকটির সঙ্গে।
না, আমি কোনো কথা বলিনি।
তা হলে অন্য কেউ বলেছিল। লোকটা কিছু একটা উত্তরও দিয়েছিল।
তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে লোকটি ঘুমোচ্ছিলেন না।
লোকটাকে কী বলা হয়েছিল তাও আমার মনে আছে। একজন কেউ বলেছিল, আপনার চোখ নেই?
যার চোখ থাকে না, তাকে অন্ধ বলা যেতে পারে নিশ্চয়ই। সেই জন্যই কি শিউলি দেবী বললেন, লোকটি অন্ধ ছিল?
শিউলিদি যাই বলুক, লোকটি দিব্যি প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছিল।
আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, লোকটা পাগল!
যাঃ পাগল নয়। ভদ্রলোকের মত চেহারা।
ভদ্রলোকেরা পাগল হয় না?
মানে, বলছি, পোশাক-টোশাক বেশ মোটামুটি...পাগল বলে মনে হয় না দেখে...পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি পরা
ধুতি আর ফুল শার্ট। ছাই রঙের শার্ট। পায়ে কেডস।

বাঃ। আপনার তো অনেক কিছু মনে আছে। আপনার নাম?

চন্দ্রা বসু। আমি লোকটিকে তিনবার স্বপ্ন দেখেছি।

কেন?

কী জানি।

লোকটির বয়েস কত ছিল?

পঞ্চাশ-বাহান্ন।

সত্তর।

পঁয়ষট্টির বেশি নয়।

ষাটের নিচেই হবে।

যাঃ। সত্তরের কম নয়।

আচ্ছা, চন্দ্রা বসুর মতামতটাই শোনা যাক। উনি যখন লোকটিকে তিনবার স্বপ্ন দেখেছেন, তখন ওঁর কথাটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে।

স্বপ্নে লোকে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা দেখে।

আমি কিন্তু লোকটিকে দেখেছি স্বপ্নে। আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

আপনি কি তিনবার একই রকম স্বপ্ন দেখেছেন?

হ্যাঁ।

এর আগে আর কোনো অচেনা লোককে আপনি তিনবার স্বপ্নে দেখেছেন?

না।

চন্দ্রা, তুই অত স্বপ্ন দেখিস কী করে? আমি তো একটাও স্বপ্ন দেখি না।

আমি স্বপ্ন দেখি বটে, পরের দিন কিন্তু কিচ্ছু মনে থাকে না।

আমার সব মনে থাকে। আমি বেশি স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রা দেবী, স্বপ্নে লোকটির বয়েস কত ছিল?

আমার ধারণা, সত্তরের কাছাকাছিই হবে।

আপনার ধারণাই ঠিক। ডাক্তারেরও তাই মত।

লোকটিকে আপনি চেনেন?

সে কথা পরে বলছি। তার আগে, আর দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনাদের ইয়েং তো পুরুষ কন্ডাক্টর। আপনারা কখনো মেয়ে কন্ডাক্টরের জন্য দাবি জানিয়েছেন?

হ্যাঁ।

না।

কিছু আসে যায় না।

সে বেচারারই কষ্ট হয়। মুখখানা গোবেচারার মতন করে থাকে।

আপনারা অন্য ট্রামে বাসে না উঠে এটাতেই রোজ বাড়ি ফেরেন কেন? পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি যাওয়া আপনাদের পছন্দ নয়?

তা নয়, এটাতে জায়গা পাওয়া যায়।

সবাই তো বসবার জায়গা পান না। এখান থেকেই অনেককে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, আরও ভিড় বাড়ে নিশ্চয়ই? গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়।

তা হয়। কিন্তু অসভ্যতা তো হয় না। বসে উঠলে তো আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

আপনারা বলছেন, ভিড়ের ট্রামে বাসে উঠলে অনেকে অসভ্যতা করে। পুরুষরাই শুধু অসভ্যতা করে, মেয়েরা করে না?

কক্ষনো না।

তাহলে প্রশ্নটা এইভাবে করা যায়, পুরুষরা অসভ্যতা করে, গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, তাতে মেয়েরা কখনো কখনো বিরক্ত হয়, আবার কখনো কখনো কি তাদের একটুও ভালো লাগে না।

ভালো লাগবে? ছিঃ!

কুমারী মেয়েদের কথা জানি না আমাদের অসহ্য লাগে!

শুধু গা ঘেঁসে দাঁড়ায়? আরও কত রকম জঘন্য কাজ করে...

সে কথা ঠিক। কেউ কেউ ভিড়ের সুযোগ নিয়ে খুব জঘন্য কাজ করে, কেউ পকেট মারে, কেউ হার ছিনিয়ে নেয়, আবার কেউ কেউ তো মেয়েদের দেখে সসম্ভ্রমে সীট ছেড়ে উঠেও দাঁড়ায়? দাঁড়ায় না?

তা দেবে না কেন? সকলেই তো এক হয় না, কিছু ভদ্রলোক থাকে!

আজকাল বেশির ভাগ ভদ্রলোকই মিনি বাসে যায়!

কোনো যুবতি মহিলা কোনো বৃদ্ধকে দেখে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়?

নিশ্চয়ই!

একজন বৃদ্ধের জন্য সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে একজন মহিলাকে আবার অসভ্য পুরুষদের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হবে।

তাহলেও খুব বুড়ো মানুষ দেখলে অনেক মেয়েই সীট ছেড়ে দেয়।

আপনি কখনো দিয়েছেন?

হ্যাঁ, মানে; দেবো না কেন?

দিয়েছেন কখনো?

আপনি এসব কথা জিজ্ঞেস করবার কে?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি। ইচ্ছে না হলে উত্তর দেবেন না!

সে রকম কোনো অকেশান হয় নি। হলে নিশ্চয়ই সীট ছেড়ে দিতাম।

আপনাদের এই ট্রামে চ্যাংড়া ছেলেরা ওঠে না মাঝে মাঝে?

কেউ ভুল করে ওঠে, কেউ কেউ আবার চ্যাংড়ামি করবার জন্য।

এরকম কত বার উঠেছে?

প্রায়ই ওঠে।

আপনারা তখন কী করেন?

কী আবার করবো?

আপনারা তাদের নেমে যেতে বলেন না?

আমরা কেন বলবো? কন্ডাক্টার বলবে। সেটা তার কাজ।

কন্ডাক্টার বললে তারা নেমে যায়?

তা নেমে যায় অবশ্য।

যতক্ষণ না কন্ডাক্টার নেমে যায়, ততক্ষণ আপনারা কী করেন? সবাই মিলে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন?

কী সব আজেবাজে কথা বলছেন?

ধরুন যদি একদিন উত্তমকুমার বা সৌমিত্র চ্যাটার্জি ভুল করে আপনাদের এই ট্রামে উঠে বসে?

আপনারা ওদের নেমে যেতে বলবেন?

ধ্যুৎ!

হাসি।

হাসি।

হাসি।

সেদিন ছিল, মঙ্গলবার। মাসের ১লা তারিখ। আকাশে থমথমে মেঘ, টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই ছাই রঙের শার্টপরা লোকটি কি ভুল করে উঠেছিল, না চ্যাংড়ামি করবার জন্য।

তা আমরা কী বলবো?

গ্লিডসে স্ট্রিটের স্টপের ট্রামটা আবার চলতে শুরু করার পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল লোকটি।

হ্যাঁ।

গেটের কাছেও আপনারা কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেমন আপনি, শর্বরী দেবী। আপনার পাশে আরও কেউ ছিল না?

ছিল আরও দু তিনজন।

কে কে ছিলেন, মনে নেই।

আমিও ছিলাম।

আপনি তো ইয়ে, চন্দ্রা দেবী। আচ্ছা, লোকটি কি আপনাদের ঠেলে ভেতরে উঠতে চেষ্টা করেছিল?

না। আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম বলে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল বোধহয়।

তারপর কেউ তাকে ঠেলে দেয়।

মিথ্যে কথা। একদম মিথ্যে কথা?

কে আপনাকে বলেছে যে লোকটাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল? এক-জন সত্তর বছরের বুড়ো লোককে কেউ কখনো ঠেলে ফেলে দিতে পারে?

আমি বলছি এই শর্বরী, একটু চুপ করো, আমি স্পষ্ট সব দেখেছি, আমার মনে আছে। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কী যেন বিড়বিড় করে বললো, সবাই আবার হেসে উঠলো। লোকটা তখন...

শিউলি দেবী, আপনি বলেছিলেন লোকটি অন্ধ!

অন্ধ না হতে পারে, কিন্তু ভাব-ভঙ্গিটা অন্তত সেই রকম...

তবু লোকটিকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

মোটেই না।

মিথ্যে কথা। অদ্ভুত কথা।

আপনারা অনেকের পদবি বললেন সেনগুপ্তা, দত্তগুপ্তা...মেয়েদের মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি হলে আপনাদের আপত্তি নেই। কিন্তু পুরুষের ভিড় থাকলে আপনাদের খারাপ লাগে।

আপনি কী বলতে চাইছেন?

কিছুই না। শুধু তথ্য।

সারাদিন অফিসে খাটাখাটনি করার পর ভিড়ের বাসে পুরুষদের অসভ্যতা সত্যিই আমাদের সহ্য হয় না।

সেদিন ছিল ১লা তারিখ, অর্থাৎ মাইনের দিন। আপনাদের সকলেরই হ্যান্ডব্যাগ ভর্তি টাকা ছিল।

হ্যান্ডব্যাগ ভর্তি টাকা? আমাদের বুঝি কাঁড়ি কাঁড়ি মাইনে দেয়।

মাইনের দিন আরও বড় হ্যান্ডব্যাগ আনতে হয়, অঞ্জলিদি!

(হাসি)

যাই হোক, অনেকের কাছেই মাইনের টাকা ছিল। আপনারা হঠাৎ সেই লোকটিকে লাফিয়ে উঠতে দেখে কি ভেবেছিলেন, ও একটা ডাকাত?

(নিস্তব্ধতা)

তা হতেও পারতো।

কিন্তু সত্যি সত্যি আপনারা তাকে ডাকাত ভাবেন নি। কারণ আপনারা হাসছিলেন।

লোকটা একা, আর বেশ বুড়ো...আমরা কেউ ডাকাত ভাবি নি।

শর্বরী দেবী, আপনিও তখন হাসছিলেন?

আমরা সবাই হাসছিলাম!

শিউলি দেবী, আপনি বলছিলেন, লোকটা তখন হ্যাঁ...লোকটা বিড়বিড় করে কী যেন বললো, তারপর উল্টোদিকে ফিরেই লোকটি বিড়বিড় করে কী বলছিল, আপনারা শুনতে পাননি?

না।

সেইজন্যই লোকটিকে।

কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

মোটেই না।

বাজে কথা বলবেন না।

লোকটার গায়ে কোনো কিছু ধাক্কা লেগেছিল?

অসম্ভব!

কিছুর? হয়তো কিছুর না। বাতাসের।

আমরা সবাই দেখেছি লোকটা লাফিয়ে পড়েছিল। সেই জন্যই ভেবেছিলাম লোকটার বোধহয় মাথা খারাপ। এমনকি আমি লোকটার হাত চেপে ধরেছিলাম।

আপনি হাত চেপে ধরেছিলেন? তখন সত্যি ওকে ছুঁয়েছিলেন?

হ্যাঁ। ওকে উল্টোদিকে ফিরতে দেখেই...কিন্তু ধরে রাখতে পারলাম না।

শর্বরী দেবী যখন আপনি লোকটির হাত চেপে ধরেছিলেন, তখনও কি আপনি হাসছিলেন?

না, তখন হাসবো কেন?

শর্বরী দেবী, আপনার ঠিক মনে আছে?

(একচারী)

নিশ্চয়ই মনে আছে! লোকটা...মানে ভদ্রলোক তবু লাফিয়ে পড়লেন, ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।
আপনি লোকটিকে রাস্তায় পড়তে দেখলেন?
রাস্তা অন্ধকার ছিল। সেদিন আকাশ অন্ধকার ছিল। ট্রামটা যাচ্ছিল ময়দানের পাশ দিয়ে, ও জায়গাগুলো অন্ধকার।
হ্যাঁ, অন্ধকার।
আপনি কেন বললেন লোকটিকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল?
আপনারা হাসছিলেন!
হ্যাঁ হাসছিলাম। কিন্তু ওটা অ্যাকসিডেন্ট। লোকটি ইচ্ছে করে চলন্ত ট্রাম থেকে...তখন দারুণ স্পীড।
লোকটি ট্রামে লাফিয়ে ওঠবার পর থেকেই আপনারা সবাই হাসছিলেন।
হ্যাঁ হাসছিলাম, তাতে কী হয়েছে? কেউ একটা হাসির কথা বলেছিল...এরকম প্রায়ই হয়...হাসিটা কি দোষের? কে বলেছিল হাসির কথাটা? কী রসিকতা ছিল মনে আছে কারুর?
(নিস্তব্ধতা)
শিউলি দেবী, আপনি বলেছিলেন, আপনার সব মনে আছে...
তা বল কে কী হাসির কথা বলেছিল, তাও কি মনে থাকবে নাকি?
শুধু একজন কেউ বলেছিলেন, আপনার চোখ নেই?
হ্যাঁ বলেছিল। ওটা কথার কথা।
বাকি সবাই হাসছিলেন। বাইরে তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে মেঘ...ট্রামটা কি সঙ্গে সঙ্গে থেমেছিল?
না, আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম...তবু ট্রামটা থামতে থামতে অনেকটা দূর চলে গেল...
কন্ডাক্টার তখন কোথায় ছিল?
সে ছিল একেবারে মাথার দিকে।
সে কোনো কথা বলে নি?
সে তো একটা ল্যাবা গঙ্গারাম...বেশির ভাগ দিনই ওই ল্যাবাটা থাকে।
আপনারা কেউ বেল বাজান নি?
না, মনে পড়ে নি, ড্রাইভার আমাদের সকলের চ্যাঁচামেচি শুনে...ট্রামটা থামাবার পর আপনারা কেউ নেমে দেখতে গিয়েছিলেন।
কন্ডাক্টার গিয়েছিল...
আপনারা একজনও যান নি?
ওই বীভৎস দৃশ্য কেউ ইচ্ছে করে দেখতে যায়? দেখে কী হতো?
দৃশ্যটা ঠিক বীভৎস ছিল না, যাই হোক।
ট্রামটা প্রায় আধ ঘন্টা থেমে রইলো, দারুণ ভিড়
তারপর আবার ট্রামটা চললো, আপনারা যে-যার স্টপে নামলেন ঠিক-ঠাক, সেদিন দেরি করে ফেরার জন্য নিশ্চয়ই বাড়িতে চিন্তা করছিল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল খুব জোরে, সেই বৃষ্টিতেই ভিড় ফাঁকা হয়ে যায়, লোকটি চিৎ হয়ে পড়েছিল মাটিতে, রক্ত-টক্ত বেরোয় নি একদম।
অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, আমরা দেখেছি, তারপর ট্রাম ছাড়ে। আমরা অবশ্য ভাবিনি যে লোকটা সত্যি সত্যি...
আপনারা ভাবেন নি যে লোকটা সত্যি সত্যি মরে যাবে। ভেবেছিলেন, বড় জোর হাত-পাত ভাঙবে, মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত বেরুবে, অথবা দু'চারবার মাটিতে গড়িয়েই ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়বে।
আমরা সে সবও ভাবি নি। কিছুই ভাবি নি।
আপনারা হাসছিলেন!
বারবার ওই কথাটা বলছেন কেন? হাসির কথা শুনলে হাসবো না?
একজন কেউ বলেছিল, আপনার চোখ নেই?
হ্যাঁ বলেছিলাম, সেটা এমন কিছু দোষের নয়!
তারপর থেকে আপনাদের সকলেরই জীবন আগের মতনই আছে, কারুর কিছু বদলায় নি।
আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? লোকটি আপনার কেউ হয়?
যদি বলি, ও লোকটি ছিলেন আমার বাবা?
(নিস্তব্ধতা)
(নিস্তব্ধতা)

(নিস্তব্ধতা)

না, লোকটি আমার বাবা ছিলেন না, আমার কেউ না। আপনাদের মনের ওপর কোনো অপরাধবোধ চাপিয়ে দিতে চাই না। লোকটি সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি, আপনাদের বলছি। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই ওর ঘাড় ভেঙে যায় ও শেষ নিশ্বাস পড়ে। কেননা ও একটাও শব্দ করে নি, কারুকে ডাকে নি ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ার মতন মুখ। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার ঘোষণা করেন মৃত অবস্থায় আনীত। লোকটির কোনো পরিচয় জানা যায় না। ওর পকেটে ছিল পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা। আর কয়েকটা আজেবাজে কাগজ। একটা রুমাল একটা পকেট-গীতা। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সরু সোনার আংটি। এর কোনো কিছু থেকেই ওর বাড়ির ঠিকানা বা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তখন ডেড বডি পাঠিয়ে দেওয়া হয় মোমিনপুরের মর্গে। পরদিন কাগজে দুর্ঘটনার খবর বেরুবার পরও কেউ আসেনি খবর নিতে। এগারো দিন বাদে পুলিশ দপ্তর থেকে ওর ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, কেননা তার কারণ, পোষাক ও মুখের ভঙ্গি দেখে মনে করা হয়েছিল সে ছিল কোনো ভদ্র ও শিক্ষিত মানুষ। ওই সোনার আংটি ও পকেট গীতা । তবু কেউ আসে নি তার খোঁজে। কেউ এসে ওই সোনার আংটি ও পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা দাবি করে নি। এক মাস অপেক্ষা করার পর ডেড বডিটা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

হয়তো সে ছিল একজন অতিরিক্ত মানুষ। যে-ধরনের মানুষের বেঁচে থাকাটাও এলেবেলে, মরে গেলেও ক্ষতি নেই। হয়তো এই পৃথিবীতে ওর আর কেউ ছিল না, যে ওর জন্য কাঁদবে বা শোক করবে। এমনকি, যে ওর অভাবটা অন্তত অনুভব করবে। ও হয়তো ছিল সম্পূর্ণ একলা। পকেটে পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা নিয়ে ও কোথায় যাচ্ছিল কে জানে! কিংবা পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই হয়তো একমাত্র কাজ ছিল। যে-কোনোদিন পথে ঘাটে হঠাৎ মরে যাওয়াই বোধহয় ছিল ওর নিয়তি। যদি এমনি এমনি ফুটপাথে শুয়ে মরে যেত তাতে খুব একটা কিছু চাঞ্চল্য ঘটতো না। পরবর্তী ব্যাপারগুলো একই রকম হতো, তাই না? একজন কেউও যে ওর খোঁজ করলো না, সেটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার নয়? এই শহরে এত নিঃসঙ্গ মানুষও থাকে? যদি লোকটি সত্যিই ততখানি নিঃসঙ্গ হয়, তা হলে একসঙ্গে এতগুলি মেয়ের হাসি...অন্য দিনের মতন সেদিনও লোকটি পথে পথে ঘুরছিল বোধহয়—বৃষ্টি শুরু হতেই সে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল ভুল ট্রামে...তারপর সে শুনলো হাসির শব্দ, শুধু তাকে দেখেই একসঙ্গে এতগুলি মেয়ে...কে জানে লোকটি কখনো বিয়ে করেছিল কিনা, এমনকি কখনো কোনো নারীর সংস্পর্শে এসেছিল কিনা, তাহলে তার হয়তো একটা সাংসারিক বন্ধন থাকতো, অন্তত কেউ না কেউ...। না, তার মৃত্যুর জন্য কেউ কাঁদে নি, কেউ তার অভাব বোধ করে নি, সে ছিল একটি অপ্রয়োজনীয় মানুষ...তবু যে শর্বরী দেবী, আপনি তাকে বাঁচাবার জন্য শেষ মুহূর্তে তার হাত চেপে ধরেছিলেন, চন্দ্রা দেবী, আপনি যে তাকে তিনবার স্বপ্নে দেখেছেন, এটাই তার যথেষ্ট ভাগ্য!

হয়তো এই মৃত্যুটাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। আমার ধারণা, মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। অনেকগুলি হাস্যময় মুখের স্বপ্ন।

হয়তো সারা জীবনে সে এটুকুও পায় নি।

রাজহংসী

কী একটা দরকারি কাজে যাচ্ছিলাম আগরতলায়। প্লেন দু ঘন্টা লেট। অত্যন্ত বিরক্তিকর সেই দু ঘন্টা দমদম বিমান বন্দরে অপেক্ষা করে কাটলো। কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে আসবার পথে বেলেঘাটায় দারুণ ট্রাফিক জ্যাম ছিল, তখন ভেবেছিলাম প্লেন বুঝি আমাকে বাদ দিয়েই উড়ে চলে যাবে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌঁছোবার পর এই অকারণ অপেক্ষা।

আকাশে মেঘ জমেছে। এই মেঘ কতখানি জমাট আর এর মধ্যে ঝড়বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা আছে কিনা আমি জানি না। যদি প্লেন আজ না যায়? আসাম ত্রিপুরা ফ্লাইট প্রায়ই ক্যানসেল হয়! আগরতলা বিমান বন্দরে আমার জন্য লোকজন অপেক্ষা করে থাকবে! দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে। একটা চেনাশুনো লোকও চোখে পড়ছে না। তা হলে অন্তত কথা বলে সময় কাটানো যেত। এয়ার হোস্টেস আর বিমানকর্মীরা ঘোরাঘুরি করছে ব্যস্তভাবে। ওদের সব সময়েই ব্যস্ত মনে হয়। ওদের দেখলেই অন্য যাত্রীদের চোখ উৎসুক হবে, হয়তো কোনো খবর শোনা যাবে। কিন্তু কেউ কিছুই বলছে না। আমি একটা বই খুলে বসেছিলাম, কিন্তু মন বসছে না কিছুতেই।

তারপর এক সময় আমাদের বিমানের নাম-ঘোষণা হল। গনগনে রোদের মধ্যে অনেকখানি সিমেন্টের মাঠ পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে লাইন দিলাম। আমার এক হাতে একখানা মোটা বই, অন্য হাতে একটা ব্যাগ। অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম।

সিঁড়ির একেবারে ওপরে একজন এয়ার হোস্টেস দাঁড়িয়ে থাকে, যার কাজ মিষ্টি হেসে প্রত্যেক যাত্রীকে নমস্কার করা। প্রত্যেক দিন প্রতিটি প্লেন ছাড়ার সময় এই কাজটা করতে হয় বলে তাদের হাসিটা নিতান্তই যান্ত্রিক। একটুখানি হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে যায়।

সাধারণত সুশ্রি মেয়েদেরই এয়ার হোস্টেস করা হয়। তারাও আবার বেশি সাজগোজ করে আরও খানিকটা কৃত্রিম-সুন্দরী হয়ে থাকে। ওদের সবাইকেই প্রায় একই ধরনের দেখায় বলে আমি দু এক পলকের বেশি দেখি না।

সিঁড়ির ওপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল সে আমাকে 'নমস্কার' বলতেই আমি মাথা ঝুঁকিয়ে 'নমস্কার' বলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলাম। এই সময় আবার যেন শুনলাম সে বলছে, 'নমস্কার সুনীলদা!'

ভুল শুনলাম! ফিরে তাকালাম আবার।

মেয়েটি হাসছে। এয়ার হোস্টেসের যান্ত্রিক হাসি নয়, একটি যুবতি মেয়ের চেনা হাসি।

আমি বললাম, 'খুকু!'

ততক্ষণে পেছনের লোক এসে গেছে। প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটার বেশি দুটি কথা বলার রেওয়াজ নেই। বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে আমাকে ভেতরে চলে যেতেই হল।

নিজের জায়গাটা খুঁজে পেতে বেশি দেরি হল না। যাক, জানলার ধারেই জায়গা পাওয়া গেছে। ব্যাগটা ওপরের তাকে তুলে দিয়ে আরাম করে বসলাম। সীটবেল্টটা বেঁধে নিতে হল। এখন সিগারেট ধরাবার নিয়ম নেই।

আমার বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। সত্যিই কি খুকুকে দেখেছি? ভুল করি নি তো? কিন্তু ঠিক সেই রকমই তো সরলতা আর দুষ্টুমি মেশানো হাসি।

আমার পাশের সীটে এসে বসলো একজন বিশাল চেহারার অবাঙালি ভদ্রলোক। কোনো ভারী জিনিসের ব্যবসায়ী মনে হয়।

আজ প্লেনটাতে যাত্রী বেশি নেই। কয়েকটি সীট পুরো খালি পড়ে আছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, প্লেনটা দৌড় দেবার আগে দম নিচ্ছে।

দুজন এয়ার হোস্টেস ঘোরাঘুরি করছে। আমি চোখ দিয়ে ওদের একজনকে অনুসরণ করতে লাগলাম। না, মেয়েটি যে খুকুই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কোনো চেনা মেয়ের পক্ষে এয়ার হোস্টেস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়! বস্তুত আমি আরও দুজন এয়ার হোস্টেসকে চিনি। কিন্তু খুকুকেই যে এখানে এ অবস্থায় দেখবো, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা যেন অতি নাটকীয়, বড় বেশি গল্পের মত—ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

এখন বুঝতে পারলাম, লাউঞ্জে অপেক্ষা করার সময়, আমি খুকুকে দু একবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তখন কিছুই মনে হয় নি। এয়ার হোস্টেসদের সাজগোজ আর চাকচিক্যই বেশি চোখে পড়ে। তখন যদি চিনতে পারতাম, তা হলে খুকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারতাম। বুকের মধ্যে দারুণ কৌতূহল ছটফট করছে। যেন একটা রোমাঞ্চকর

কাহিনী অর্ধেকটা পড়ার পর বইখানা হারিয়ে গিয়েছিল, আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে হাতে। কিন্তু খুকু কি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে? বিমানের মধ্যে কি কোনো যাত্রীর সঙ্গে ওদের গল্প করার নিয়ম আছে?

প্লেন আকাশে উড়তেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ যে বাড়ি-ঘর মানুষ-জন একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে, এই দৃশ্যটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। এই জন্যই জানলার পাশে জায়গা না পেলে রাগ ধরে।

সীট বেল্ট খোলার অনুমতি পেয়ে সিগারেট ধরালাম। খুকু আরও দু এক-বার চলে গেল আমার কাছ দিয়ে, আমার দিকে আর তাকাচ্ছেই না। এখন কাজের সময়—এখন তো আর ওদের গল্প করার কথা নয়।

এয়ার হোস্টেস দুজনই লজেন্সের ট্রে নিয়ে বিলি করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার খুকু আমাকে দিতে এল না, এল অন্য মেয়েটি, খুকু কি এখন ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? তা হলে হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাকলো কেন! ও যদি আমার নাম না বলতো, তা হলে হয়তো আমি ওকে চিনতামই না। বড় জোর আমি মনে করতাম, খুকুর সঙ্গে মেয়েটির চেহারার মিল আছে।

এবার ওরা চা-কফি দিচ্ছে। খুকু জানে, আমি চা খেতে কত ভালোবাসি! ছাত্র বয়সে সারা দিনে অন্তত দশ-বারো কাপ চা খেতাম। এখনো সে নেশা যায় নি। খুকুর কি মনে আছে সে কথা? অনেক সময় খুকুই আমার জন্য চা বানিয়ে আনতো তিনতলা থেকে। আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির যে কোনো ফ্ল্যাটে চা হলেই সে জানে আমার জন্যও এক কাপ বেশি জল নেওয়া হতো। একদিন দুপুর দুটোর সময় এক কাপ চা এনে খুকু বলেছিল, 'ভাগ্যিস একতলার ফ্ল্যাটে গেস্ট এসেছে, তাই তুমি এখন চা পেলে সুনীলদা!' খুকুর কি মনে আছে? এবারেও অন্য মেয়েটিই আমাকে জিজ্ঞেস করতে এল, আমি চা না কফি খাবো। আমার পাশের লোকটি চা চাইলেন বলেই আমি ইচ্ছে করেই বললাম, কফি।

পাশের লোকটি চা পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমার কফি আর আসেই না। আমার আসনটা প্লেনের প্রায় লেজের দিকে। সেই জন্যই বোধহয় আসতে দেরি হচ্ছে।

পাশের লোকটি এবার উঠে গেলেন। বোধহয় বাথরুম। একটু বাদে পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই লোকটির সঙ্গে খুকু কথা বলছে। খুকু কি এই লোকটিকে চেনে নাকি! কী ব্যাপার রে বাবা!

আমি আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। এখন আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু মেঘের খেলা। মেঘ বলেও ঠিক চেনা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাদা বরফের দেশ। তার ওপর এসে পড়েছে শেষ সূর্যের আলো।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বললো, 'এই নিন, আপনার কফি নিন।'

দেখলাম দুটো কাগজের গেলাসে কফি নিয়ে খুকু দাঁড়িয়ে আছে। কফির গন্ধের চেয়েও বেশি পাচ্ছি তার গায়ের মিষ্টি সেন্টের গন্ধ।

মুচকি হেসে খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বুঝি আজকাল কফি খেতে ভালোবাসেন? চায়ের নেশা চলে গেছে?'

তা হলে মনে আছে খুকুর। একটু আনন্দ হল। খুবই সামান্য ব্যাপার—তবু কেউ আমার পুরনো দিনের কোনো কথা মনে রেখেছে, এটা জানলেই এ রকম আনন্দ হয়। কারণ আমি তো অন্য কারুরই পুরনো দিনের কথা ভুলি না। আমার দুঃখই এই, আমি কিছুই ভুলি না। এমন অনেক কিছুই থাকে যা ভুলে যাওয়াই ভালো। খুকুর পুরনো দিনের কথা যদি ভুলতে পারতাম, তা হলে ওর সঙ্গে কথা অনেক সহজ হতো।

আমার হাতে একটি গেলাস দিয়ে খুকু বললো, 'সুনীলদা, আপনার পাশে বসবো?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বসে পড়লো ঝপাত করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে যে ভদ্রলোক ছিলেন—'

দুষ্টু হেসে খুকু উত্তর দিল, 'তাকে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি জানলার ধারে।'

আমি কফিতে চুমুক দিলাম। পরের কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে যান নি!'

—'একটু নয়, খুব!'

—'আগরতলা কেন যাচ্ছেন?'

—'একটা কাজে।'

—'কদিন থাকবেন?'

—'চার পাঁচদিন।'

—'আমিও থাকবো, এক সপ্তাহ।'

—'তোমাদের পরের ফ্লাইটেই ফিরে আসতে হয় না?'

—'আমি ছুটি নিয়েছি।'

—'খুকু, তুমি কতদিন এই চাকরিতে ঢুকেছো?'

খুকু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, 'চুপ, আমাকে খুকু খুকু বলবেন না। আমার নাম বাসবী চৌধুরী।'

—'এরকম সিনেমা অ্যাকট্রেসের মতন নাম আবার তোমার কবে থেকে হলো!

—'সত্যিই আমার ভালো নাম বাসবী। অনেকে অবশ্য আমাকে জয়শ্রী বলেও ডাকতো।'

আমি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলাম। ওর জয়শ্রী নামটা আমি আগে শুনেছি। অবনীও ওকে ডাকতো ওই নামেই। আমরা অবশ্য খুকুই বলতাম।

যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ও ফ্রক পরতো, ক্লাস নাইনের ছাত্রী। থাকতো আমাদেরই পাড়ায়। বয়সের তুলনায় চেহারাটা বেশ বড়, তখন থেকেই পাড়ার ছেলেদের নজরে পড়ে গেছে।

অত্যন্ত একটা টাইট ফ্রক, কাঁধের কাছটা ছেঁড়া—সেই ছেঁড়া জায়গাটা ডান হাতে চেপে ধরে খুকু আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে—এই দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসে।

খুকুরা থাকতো অন্য বাড়িতে। ওদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। আমাদের বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে অনেক লোকজন। এরই একটা ফ্ল্যাটে এক সময় খুকুর এক দূর সম্পর্কের কাকা থাকতেন। সেই সূত্রে খুকু আসতো। তারপর খুকুর কাকারা উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ততদিনে প্রতিটি ফ্ল্যাটের লোকজনের সঙ্গে খুকুর চেনা হয়ে গেছে—এবং সকলের সঙ্গে সে দাদা-কাকা, মাসি-পিসির সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। সব ঘরের দরজাই তার জন্য অবারিত।

পাশ ফিরে খুকুর দিকে ভালো করে তাকালাম। সেই খুকু এখন বাসবী চৌধুরী। ফিটফাট সেজেগুজে আছে। ঝরঝর করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। মাত্র ছ সাত বছরের ব্যবধান। এর মধ্যেই কত রকম কাণ্ড ঘটে গেছে এই মেয়েটিকে নিয়ে।

খুকু বললো, 'এক বছর দু' মাস হলো এই চাকরিতে ঢুকেছি—এবার ছেড়ে দেবো বোধহয়।'

—'সে কি? কেন?'

—'আর ভাল লাগছে না। এর মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে গেছে।'

—'এরপর কি করবে?'

—'কি জানি!'

বলেই খুকু আবার সরলভাবে বসলো। এটাই খুকুর খাঁটি স্বভাব। পরের দিন যে ও কি করবে, তা ও নিজেই জানে না।

খুকু ছিল যাকে বলে পাড়া-বেড়ানি মেয়ে। সব সময় এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াতো। আমাদের বাড়ির কেউ খুকুকে বিশেষ পছন্দ করতো না। খুকু কখনো আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে গুরুজনরা ওকে ডেকে সরিয়ে নিতেন।

খুকু অনেক সময় দুমদাম কথা বলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিত অনেককে। আমাদের রান্নাঘরে দেশলাই ফুরিয়ে গেছে, উনুন ধরানো যাচ্ছে না, খুকু অমনি ফস করে বলে ফেলতো, 'মাসিমা, সুনীলদার কাছেই তো দেশলাই আছে।' তখন আমি লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট খাই, বাড়ির লোক কেউ জানে না, সেই সময়ে পকেটে দেশলাই থাকার কথা কেউ বলে দেয়? আমি খুকুকে পরে এজন্য বকুনি দিতে যেতেই ও বলেছিল, 'বাঃ মাসিমা তো আগেই একদিন দেখে ফেলেছেন যে আপনি সিগারেট খান। তা হলে আর দোষ কি!'

পাড়ার মধ্যে কার সঙ্গে কার ভাব, কার সঙ্গে ঝগড়া, কে কার সঙ্গে গোপনে সিনেমায় যায়—এসবও খুকু জানতো। তাই সবাই ভয়ে ভয়ে থাকতো, খুকু কখন কার সামনে কি বলে ফেলে! খুকু কিন্তু কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কারুর গোপন কথা কখনো ফাঁস করে দেয় নি। অন্যদের তুলনায় ওর সরলতা ছিল বেশি। ভালো মন্দের ব্যবধানটাও ঠিক বুঝতো না। গুরুজনেরা যাঁরা এক সময় খুকুকে ভালোবাসতেন, বড় হয়ে ওঠার পর তাঁরাও খুকুকে অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

খুকুর উদ্ধত স্বাস্থ্য, সেটা ওর দোষ। তা ছাড়া ও পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারতে শুরু করেছে। তা ছাড়া ও নাকি চোর। প্রায়ই একখানা দুখানা বই না বলে নিয়ে চলে যায়। আমার দুএকটা বই কখনো কখনো অদৃশ্য হয়ে গেলেও আমি ওকে কখনো সন্দেহ করি নি।

খুকুর স্বভাবটা ছটফটে হলেও বুদ্ধিটা খুব তীক্ষ্ণ। স্কুলে পড়াশুনোয় ভালো ছিল। ওদের পরিবারটা সম্মানিত হলেও হঠাৎ ভাঙন ধরেছিল। ওর বাবা মারা যান সামান্য অসুখে, এক দাদা আমেরিকায়—বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না—দিদি চাকরি করে আর খুব প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। শিগগিরই বিয়ে হবে—একটি ছোট ভাই অনেকটা জড়ভরত ধরনের।

ক্লাস টেনে উঠে খুকুও রীতিমতন প্রেম করে বেড়াতে লাগলো। তার নিন্দেয় কান পাতা যায় না। অথচ, মাঝে মধ্যে যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখনও সেই রকম সরল মুখ বই পড়ার দারুণ আগ্রহ। কথা বলতে ভালো লাগে মেয়েটির সঙ্গে।

অন্যরা যাকে প্রেম কিংবা অসভ্যতা ভাবে, সেটা খুকুর ক্ষেত্রে ছিল সহজ মেলামেশা। গলির মোড়ে মোড়ে সদ্য-যুবারা আড্ডা মারে। মেয়েরা যখন সেখান দিয়ে যায়, মুখ নিচু করে থাকে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে না, —যেন কোনোক্রমে সেই জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলেই হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার নিয়ম নেই। একমাত্র খুকুই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তো। ছেলেদের নাম ধরে ডেকে কথা বলতো। অনেক ছেলেই তার বাল্যকালের খেলার সাথী, তারা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুকু তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে নি। তাদের সঙ্গে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। ক্লাব ঘরে আগে ক্যারাম খেলেছে। কি জানি, সিনেমাতেও গেছে কিনা ওদের সঙ্গে। মেয়ে হয়েও সে ছেলেদের সঙ্গে সমান সমানভাবে মিশতে চেয়েছিল। গুরুজনদের চোখে সেটাই অন্যায়।

আমাদের বাড়িতেই ছাদের একখানা ঘর নিয়ে থাকতো দুই ভাই, অবনী আর সুবীর। মফঃস্বলের গরিব ঘরের ছেলে, কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করছে। খুব কষ্ট করে থাকতো ওরা। দুই ছেলেই চমৎকার, খানিকটা আদর্শবাদী ধরনের। অবনী সদ্য বি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে, তখনও রেজাল্ট বেরোয় নি, এরই মধ্যে নিজে কি একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে। ছোটভাই সুবীর তখনো কলেজে পড়ছে। ওরা দু ভাই নিজেরাই রান্না করে খায়।

খুকু কখনো কখনো ওদের ঘরেও যেত গল্প করতে। ওদের চা বানিয়ে দিত কিংবা রান্নায় সাহায্য করতো। শুধু ব্যাচিলরের ঘরে কোনো মেয়ের যাওয়া আসায় পাড়ার লোকদের আরও চোখ টাটায়। সুনীতি রক্ষার নামে আসলে সেটা হিংসে।

একদিন শুনলাম, পাড়ার কয়েকটা ছেলের সঙ্গে অবনী খুব ঝগড়া করেছে। অবনী ঠান্ডা স্বভাবের ছেলে, পাড়ার মস্তানদের ঘাঁটাঘাঁটি করা তাকে মানায় না। কিন্তু ব্যাপারটায় নাকি খুকু জড়িত।

দেশের অবস্থা সেই সময় বদলে গিয়েছিল অনেকটা। আগে যাদের বলা হতো পাড়ার ছেলে, তাদেরই নাম হল পাড়ার মাস্তান। তারা কেউ হাতে লোহার বালা পরে, কেউ দাড়ি রাখে। গলার আওয়াজও হঠাৎ কর্কশ হয়ে গেছে। কিংবা ইচ্ছে করেই কর্কশভাবে কথা বলে। তাদের রীতিমতন সমীহ করে চলতে হয়, তারা কাউকে অপমান করছে দেখলেও প্রতিবাদ করা যায় না। ভদ্রলোকেরা সবাই তখন এই নীতি নিয়েছে যে মস্তানদের ঘাঁটাতে নেই।

খুকু কিন্তু তখনো মেলামেশা ছাড়ে নি ওদের সঙ্গে। সেই রকমই হেসে হেসে গল্প করে। আবার কখনো ওদের ধমকাতেও দেখেছি। মাস্তানদের সঙ্গে খুকুর এই ভাব রাখাটা অবনী সহ্য করতে পারে নি। খুকুদের বাড়িতে শক্ত কোনো অভিভাবক নেই। তার মা নিরীহ মানুষ—সেখানে অবনীই হয়ে উঠলো অভিভাবকের মতন। মাস্তানরা এই নিয়ে আওয়াজ দেওয়া শুরু করলো অবনীকে।

তার কয়েকদিন বাদে শুনলাম, অবনী আর সুবীর খুকুদের বাড়িতেই খাবার ব্যবস্থা করেছে। বদলে টাকা দেয়। এর ফলে ওদের আর হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না, খুকুদেরও খানিকটা সাহায্য হবে। সেই সঙ্গে অবনী খুকুকে পড়াতে শুরু করেছে—সামনেই স্কুল ফাইনাল, সে যাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারে—

কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, খুকু আমার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো, 'আগরতলায় আপনি কোথায় থাকবেন?

—'সার্কিট হাউসে।'

—'আমি দেখা করবো আপনার সঙ্গে।'

—'নিশ্চয়ই এসো—'

—'আপনি আমাকে দেখে রাগ করেন নি?'

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো এই কথাটা। আমিও হাসিমুখে বললাম, 'না।'

—'আমি এখন যাচ্ছি। যদি পারি তো আবার আসবো—'

খুকুর চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। কেন বললাম 'না'। ওর ওপরে দারুণ রাগ করাই তো উচিত।

খুব মনে পড়ছে অবনী আর সুবীরের কথা। একটা সামান্য মেয়ের জন্য ওদের জীবন কী ছন্নছাড়া হয়ে গেল। অথচ খুকুর মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্নও নেই।

অবনী দারুণ যত্ন করে পড়াচ্ছিল খুকুকে। তার মনোভাবটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুকু যাতে উচ্ছন্নে না যায়, সেদিকে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। খুকুকে সে লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরি করে নিচ্ছিল, তারপর সময় মতন বিয়ের প্রস্তাব করবে।

সুবীর ছিল খুবই লাজুক। তার মনের কথা কেউ জানতে পারে নি।

খুকু আমার কাছে আসতো গল্পের বই নিতে। যতক্ষণ থাকতো, গলগল করে অনেক কথা বলে যেত। তখন তার বেশির ভাগ গল্পই অবনী আর সুবীর সম্পর্কে। দুজনকে নিয়েই সে মজা করতো সব সময়—ওদের চায়ে নুন মিশিয়ে দিত, সুবীরের অঙ্কের খাতার মলাট বদলে জব্দ করেছিল। এই সব বলতে বলতে খুকু ঝরঝর করে হাসতো। শুধু সেই নির্মল হাসিটুকুর জন্যই ওর ওপর রাগ করা যেত না।

পরীক্ষার মাত্র এক মাস আগে খুকু সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা করলো। এখনো সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তার মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার বিমানদার বিয়ে হয়েছে খুব ধুমধামের সঙ্গে। বিমানদার স্ত্রী আরতি দেখতেও যেমন সুন্দরী, স্বভাবটিও সেই রকম নম্র।

বিয়ে উপলক্ষে খুকু কয়েকদিন সারাক্ষণই প্রায় রয়ে গেল বিমানদার বাড়িতে। সবরকম কাজে সাহায্য করতেও সে ওস্তাদ। আরতি বৌদির সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল খুব। বিমানদার আর কোনো ভাই-বোন ছিল না, খুকুই যেন হয়ে গেল আরতি বৌদির ননদ।

বিমানদা অফিস যাবার পর নতুন বৌ বাড়িতে একা থাকে, তাই খুকুই হয়ে গেল তার প্রত্যেক দিনের সঙ্গী। সকালবেলা অবনীর কাছে পড়াশুনো সেরে নিয়েই খুকু চলে আসতো আরতি বৌদির কাছে। আরতি বৌদি প্রায়ই তাকে খাওয়ান। এমন কি আরতি বৌদি তাঁর বাড়িতেও খুকুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। উনি ওকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা আরতি বৌদি শখ করে খুকুকে তার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই! দাঁড়াও একটু স্নো আর পাউডার মাখিয়ে দিই।'

সেজেগুজে ফুটফুটে হয়ে উঠলো খুকু। আরতি বৌদির তাতেও তৃপ্তি হল না। নিজের গয়নাগুলোও সব পরিয়ে দিলেন খুকুকে। তারপর তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'দেখাচ্ছে ঠিক যেন রাজকন্যা—ইস, তোমার দাদা বাড়িতে থাকলে এই সময় তোমার যদি একটা ছবি তুলে রাখা যেত!'

আয়নার সামনে খুকু অনেকক্ষণ নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। এত ভালো শাড়ি তো বেচারি কখনো পায় নি। এরকম গয়নাও পরে নি। ওর চেহারাটা সুন্দর, ফুটফুটে মুখ—সাজগোজ করলে ওকে তো ভালো দেখাবেই।

খুকু বললো, 'বৌদি, আমার মাকে একটু দেখিয়ে আসবো?'

আরতি বৌদি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন, 'যাও না, দেখিয়ে এসো না—।'

এক পাড়ার মধ্যেই বাড়ি। দুপুরবেলা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, আর ফিরলো না।

আরতি বৌদি বিকেলবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কারুকে কিছু বললেন না। তারপর বিমানদা বাড়ি ফিরলে শুধু বললেন খুকুদের বাড়িতে একবার খোঁজ নিতে।

খুকুর মা আকাশ থেকে পড়লেন। খুকু দুপুরের পর একবারও বাড়িতে আসে নি। পাড়ার মধ্যেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি হল। খবর নেওয়া হল বিভিন্ন হাসপাতালে এবং থানায়। কোথাও নেই, খুকু যেন সম্পূর্ণ উবে গেছে।

ব্যাপারটা প্রথম বিশ্বাসই করা যায় নি। দিন দুপুরে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কি করে উধাও হয়ে যাবে? তার গায়ে অত গয়না ছিল বলে প্রথমেই মনে আসে যে কেউ হয়তো তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? বিমানদার বাড়ি থেকে খুকুদের বাড়ি মাত্র কুড়ি পঁচিশখানা বাড়ির পরেই। পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা। সেখান থেকে কে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

তখন স্বভাবতই মনে আসে, খুকু সোজা তার মায়ের কাছে না এসে অন্য কোথাও গিয়েছিল। চেয়েছিল আর কাউকে তার শাড়ি গয়না পরা চেহারা দেখাতে। কাকে? অবনীকে? কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িতেও সে আসে নি। দুপুরবেলা অবনী বা সুবীর কেউ বাড়িতে থাকে না। তাহলে কি খুকু নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে? আরতি বৌদির গয়না নিয়ে। তখন ওর বয়স কতই বা, বড় জোর আঠারো উনিশ। সেই বয়সের একটি মেয়ের এ রকম ডাকাতে বুদ্ধি হবে, বিশ্বাস করা যায় না, কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

সেই সময় দেখেছিলাম আরতি বৌদির মহত্ত্ব। উনি দিনের পর দিন সান্ত্বনা দিতে যেতেন খুকুর মাকে। তিনি বলতেন, 'শাড়ি-গয়না গেছে যাক, সে এমন কিছু না—শুধু খুকু ফিরে এলেই হয়।'

খুকুর মায়ের চোখ থেকে অনবরত জলের ধারা গড়াতো। এই দুঃসময়ে বিধবাকে সাহায্য করারও কেউ ছিল না।

দারুণ আঘাত পেয়েছিল অবনী। যেন তার সমস্ত স্বপ্ন তছনছ করে দিয়ে গেছে ওই একটি মেয়ে। অবনীর মুখের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল, সব সময়ে ফ্যাকাসে একটা ভাব। যেন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছোট ভাই সুবীর এমনিতে চুপচাপ, সে এ ব্যাপারেও কোনো কথা বলে নি, আরও যেন চুপচাপ হয়ে গেল এবং অল্পদিন পরেই অসুখে পড়লো।

খুকুকে ফিরে পাওয়ার আশা যখন সবাই মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময়, প্রায় মাস দেড়েক পরে, খুকুর চিঠি এল কাশী থেকে। খুকু তার মাকে লিখেছে যে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাকে বিয়ে করতে চায়। গোবিন্দ জাতে তিলি—সেইজন্য এই বিয়েতে তার মায়ের আপত্তি আছে কিনা!

এত কান্ডের পর শুধু জাত বিষয়ে মায়ের আপত্তি আছে কিনা এইটাই যেন বড় ব্যাপার! খুকু আরও লিখেছে যে গোবিন্দ খুব ভালো ছেলে এবং সে বলেছে পরে চাকরি করে আরতি বৌদির গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেবে।

চিঠি পেয়ে খুকুর মা-ই শুধু কাঁদলেন, আর সবাই রাগে ফুঁসে উঠলো। সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন শাস্তি দিতেই হবে। বয়সের দিক থেকে খুকু তখন নাবালিকা, সুতরাং পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা যাবে।

পাড়ায় ছেলেদের কাছ থেকে সন্ধান পাওয়া গেল, গোবিন্দ অন্য পাড়ার একজন মাস্তান। খুকুর সঙ্গে সঙ্গে সেও উধাও হয়ে গেছে ঠিকই, তবে যোগাযোগটা এতদিন বোঝা যায় নি।

একমাত্র আরতি বৌদিই পুলিশে খবর দেবার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল পুলিশ দিয়ে জোর করে ধরে আনতে গেলে খুকুর জীবনটাই বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত গয়না-চুরির অপবাদ তিনি কিছুতেই খুকুর নামে দিতে চান না। তিনি সবাইকে বললেন, ওই সব গয়না তিনি ইচ্ছে করে খুকুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। খুকু যদি গোবিন্দকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে, তবে তাই হোক। তিনি আশীর্বাদ করবেন।

তবু পুলিশে খবর গেল। এবং পুলিশ কিছু করার আগেই অবনী ঠিক করলো সে তক্ষুনি কাশী চলে যাবে। এখন আবার মুখ চোখের চেহারা বদলে গেছে তার, এখন মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, খুকুকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

ট্রেন ধরার জন্য একটা সুটকেস হাতে নিয়ে সন্ধেবেলা অবনী বেরুতে যাচ্ছে, সেই সময় আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। অসুস্থ অবস্থাতেই সুবীর দাদার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে আর সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে! পাগলের মতো সে চেঁচিয়ে বলছে 'না দাদা, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না! ও আমাদের কেউ নয়। ওর জন্য তুমি যাবে না!'

অবনী ধমকে বললো, 'তুই চুপ কর। আমি কি করবো না করবো, তা তুই আমাকে শেখাবি?'

সুবীর বললো, 'তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা নষ্ট মেয়ের জন্য ছুটে যাচ্ছো?'

অবনী এক চড় মারলো তার ভাইকে।

চড় খেয়ে সুবীর একটুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অবনীর হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'না, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না—'

অবনী এক একবার ছোট ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে আবার সুবীর দৌড়ে গিয়ে তার পথ আটকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল—একটা ট্যাক্সি দেখে তাতে এক সময় উঠে পড়লো অবনী।

সেইদিনই ভোর রাত্রে আত্মহত্যা করলো সুবীর।

ছাদের ঘরে একলা একলা শুয়ে থেকে কোন যাতনা তার মনে ছিল কেউ জানে না। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করার গ্লানি হয়তো সে সহ্য করতে পারে নি। কিংবা হয়তো গোপনে গোপনে সে খুকুকে তার দাদার চেয়েও বেশি ভালোবাসতো। খুকু ওরকমভাবে চলে যাওয়া সে-ই আঘাত পেয়েছিল বেশি। ভোর রাত্রে সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে।

খুকুর জন্য অনেকগুলি মানুষের জীবন বদলে গেছে। সেই খুকু এখন সেজেগুজে কি রকম ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিমানের মধ্যে। সম্পূর্ণ অনাবিল মুখ।

অবনী কাশী থেকে ফিরে এসেছিল তিনদিন পরেই। খুকু তার সঙ্গে আসে নি। একদিন একটুক্ষণের জন্য তার সঙ্গে খুকুর দেখা হয়েছিল—তারপরই তারা অন্য কোথাও চলে যায়। অবনী যখন ফিরে এল, তখন সে একটি সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ। তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তক্ষুণি তাকে জানাতে কেউ সাহস পায় নি।

এর অল্পদিন পরেই খুকুর মায়েরা চলে যায় আমাদের পাড়া থেকে। অবনীও ফিরে যায় তার দেশের বাড়িতে। এত কান্ড করার পরও আরতি বৌদি এবং পাড়ার অন্য দুএকটি মহিলা কখনো বলে ফেলেছেন, যাই বলো মেয়েটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভালো ছিল। এত সরল মন, অথচ কেন যে এরকম একটা ব্যাপার করলো!

লোকের মুখে টুকরো টুকরো ভাবে আমি শুনেছিলাম খুকু ঠিক নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে যায় নি। আরতি বৌদির বাড়ি থেকে বেরুবার পর কোনো একটি ছেলে তাকে সিনেমা দেখাবার প্রস্তাব দেয়। খুকু লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখতো। তার বাড়িতে তো এমন কেউ ছিল না যে তাকে সিনেমা দেখাবে! তার দিদি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সব সময়।

আসলে অত দামি দামি শাড়ি-গয়না পরে মাথা ঘুরে গিয়েছিল খুকুর। মেয়েদের এরকম হয়। সে চেয়েছিল যতক্ষণ বেশি সম্ভব ওগুলো পরে থাকতে। সে জানতো, মাকে দেখাতে গেলেই তো মা বলবেন, যা, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়। তাই সে চেয়েছিল ওইগুলো পরে কিছুক্ষণ বেড়াবে, রাস্তায় ঘুরবে।

সিনেমাতে যাওয়াও তো সেই জন্যই—লোকে তাকে দেখবে।

সিনেমা দেখার পর হোটেলে খাওয়াবার নাম করে কয়েকটি ছেলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। মোট

চারটি ছেলে! তারপর গয়না বিক্রি করে নানান জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাশীতে। প্রথম যে ছেলেটি সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে হঠিয়ে দিয়ে খুকুর অধিকার নিয়ে নেয় গোবিন্দ। সেই গোবিন্দর সঙ্গেও খুকুর বিয়ে হয় নি শেষপর্যন্ত—এলাহাবাদের রাস্তায় হঠাৎ সে মারামারি বাধিয়ে দুতিনটে লোকের মাথা ফাটায় এবং নিজেও আহত হয়। পুলিশ তাকে ধরে চালান করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। খুকু তখন একা ছিল। বছর খানেক পরে খুকুকে নাকি কলকাতায় দেখা গেছে আবার। আমি আর দেখি নি।

সেখান থেকে খুকু কোথায় গেল তা আমি আর জানি না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, খুকু ক্রমশই অন্ধকার জগতে চলে যাবে। ওদিকে যারা একবার যায়, তাদের তো ফেরার রাস্তা থাকে না। কিন্তু খুকু আবার একটা পদ্মফুলের মতন ফুটে উঠেছে। চাকরি পেয়েছে যখন, নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে কিছুটা অন্তত। মুখে কোনো রকম পুরনো গ্লানির চিহ্ন নেই। ও কি ফিরে গেছে ওর মায়ের কাছে? আরতি বৌদির সঙ্গে আর কখনো দেখা করেছে? কিছুই জানি না। কৌতূহল হচ্ছে খুব, কিন্তু এখন তো ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। বিমানদা আর আরতি বৌদি এখন বোম্বেতে থাকেন। অবনী কোথায় আছে, খবর রাখি না।

আগরতলা এসে গেছে, সীটবেল্ট বেঁধে নেবার সংকেত জ্বলে উঠেছে। খুকু এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি ওর সিঁথির দিকে তাকালাম। সিঁদুরের চিহ্ন থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিবাহিতা মেয়েরা বোধহয় এয়ার হোস্টেস হতে পারে না।

আমি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'অবনীকে মনে আছে?'

খুকু হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, বাঃ মনে থাকবে না কেন? জানেন না অবনীদা তো বিয়ে করেছেন ওরই এক প্রফেসারের মেয়েকে। ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা করছেন এখন, বেশ ভালো অবস্থা।'

—'তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, দু একবার দেখা হয়েছে। ওর বিয়েতে তো নেমন্তন্নও খেতে গিয়েছিলাম!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাঝখানের ঘটনাগুলো কি তাহলে স্বপ্ন? গয়না চুরি, ইলোপমেন্ট, আত্মহত্যা—এতগুলো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ খুকুর মনে তার কোনো দাগই নেই? সে এমনভাবে কথা বলছে যেন তার সুদিনেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। সবকিছুই এমন স্বাভাবিক। শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ওর ওপর আমার রাগ আছে কিনা। অবনীকে সেই সময় দেখে মনে হয়েছিল, সে আর জীবনে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। জীবন এরকমভাবে বদলে যায়? বেচারা সুবীর। সে-ই শুধু হেরে গেল।

যাবার আগে খুকু বলে গেল, 'আপনার সঙ্গে সার্কিট হাউসে দেখা করবো কিন্তু!'

আগরতলায় আমি তিন চারদিন ছিলাম। এর মধ্যে খুকু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। নিশ্চয়ই সময় পায় নি। সে যে খুবই ব্যস্ত, আমি তা বুঝে ছিলাম। দূর থেকে তাকে একদিন দেখেছিলাম সন্ধেবেলা রাজবাড়ির সামনের রাস্তায়, তার সঙ্গে আর তিনজন যুবক। খুকু হাসি মুখে হাত-পা নেড়ে তাদের কি যেন বলছে, তারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। খুব সাজগোজ করে থাকলেও তার মুখখানা সরল ছেলেমানুষিতে ভরা। আর যুবক তিনটির মুখ দেখলে মনে হয়, তারা তিনজনই খুকুকে যেন দেবীর মতন পুজো করতে প্রস্তুত।

তিনজন কেন একসঙ্গে? কোনো একজন পুরুষকে স্থিরভাবে ভালোবাসার ক্ষমতাই বোধহয় নেই খুকুর। কিংবা ও এখনো ভালোবাসতেই শেখে নি। ওর মনটা ঝরনার জলের মতন, কোনো আবিল নেই। কিংবা রাজহংসীর মতন যে-কোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে গেলেও ওর পালকে দাগ পড়ে না। আমি দেওঘরে একটা বাগানবাড়ির পুকুরে এই রকম একটি রাজহংসী দেখেছিলাম। পুকুরে অনেকগুলো সাধারণ হাঁসের মধ্যে একটি মাত্র রাজহংসী ছিল। রাজহংসীরা সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হয়। অন্য হাঁসগুলো তার চারপাশে ঘিরে থাকে, ঠিক যেন স্তুতি করে। আর রাজহংসীটি মাঝে মাঝে তার অহংকারী গ্রীবা তুলে ঠোকর মারে এক একজনকে। তখন রাগ হয় দেখে। কিন্তু আবার কোনো সময়ে, যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে রাজহংসীটি অনেক দূরে চলে যায়—টলটলে জলের মধ্যে তার নিখুঁত শরীর, একটি পালকও ভিজে নয়, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটি ছবি। কিংবা শিল্প। রাজহংসীটিও যেন দামি শাড়ি এবং গয়না পরে সেজে অহংকারী হয়েছে। সেই রাজহংসীটি ছিল খুকুর মতন, কিংবা খুকুই সেই রাজহংসীর মতন।

যুবক তিনটির সঙ্গে যখন খুকু কথা বলছিল, তখন তার শরীরে খুশীর হিল্লোল। যেন ও তাদের দয়া বিলোচ্ছে। অথচ সরল নিষ্পাপ মুখ। একসঙ্গে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে ও নিজে আনন্দ পায়—আর সেই ছেলেরাও প্রত্যেকে অসুখী হয়। এই ছেলে তিনটিও মারবে।

হঠাৎ খুকুকে দেখে আমার শেখভের 'ডার্লিং' গল্পের নায়িকার কথাও মনে পড়লো। সেই মেয়েটিও পুরুষের পর পুরুষ বদলে গেছে, অথচ তার সরলতা কখনো নষ্ট হয় নি।

দূর থেকে খুকুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির ওপর কি আমার রাগ করা উচিত? অথবা ঘৃণা? এর কোনোটাই আমার মনে এল না। আমি আপন মনে একটু হাসলাম।

আমাদের মনোরমা

আমাদের এই খেপুতে জগুদার চায়ের দোকান ছিল খুব বিখ্যাত। এই খেপুতে আরও দুটো চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেগুলো হল রেস্টুরেন্ট। সে দুটোই বাজারের মধ্যে, একটা জুতোর দোকানের পাশে আর একটা বনশ্রী সিনেমা হলের গায়ে। সেখানে চায়ের সঙ্গে চপ-কাটলেটও পাওয়া যায়। সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই পেঁয়াজ আর বাসি মাছের আঁশের গন্ধে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে। টেবিলে ভনভন করে নীল রঙের ডুমো ডুমো মাছি, সেগুলো উঠে আসা কাঁচা নর্দমা থেকে। পয়সা খরচ করে মানুষ অমন নরকেও খেতে চায়!

আমাদের জগুদার চায়ের দোকান ছিল একদম আলাদা। এ দোকানের কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই। বাজার থেকে অনেকটা দূরে, একটা ছোট টিনের ঘর, সেখানে চারটে নড়বড়ে কাঠের টেবিলের সঙ্গে আটখানা চেয়ার। তার আগে দুখানা বেঞ্চি, দরজার কাছে আড়াআড়ি করে পাতা—বেশি ভিড় হলে খদ্দেররা সেখানে বসে। অবশ্য তেমন বেশি ভিড় হয় কালেভদ্রে।

জগুদার দোকানে শুধু চা আর নোনতা বিস্কুট ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না বেশির ভাগ সময়। আর কেউ যদি সন্ধে ছটা থেকে আটটার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে জগুদার দোকানে, তাহলে সে পেতে পারে তিরিশ পয়সার এক প্লেট মাংসের ঘুগনি। আহা, তার যা সোয়াদ, বহুক্ষণ জিভে লেগে থাকে। আমরা বাজি রেখে বলতে পারি অমন ঘুগনি বদ্ধোমান বা কলকেতার কোনো দোকানেও কেউ পাবে না। তা আমাদের যখন ইভিনিং ডিউটি থাকে, তখন আর ওই ঘুগনি আমাদের ভাগ্যে জোটে না। ডিউটি শেষ করে বেরুতে বেরুতে রাত দশটা বাজে, ততক্ষণে ওই গুগনি ফিনিশ। কত করে আমরা বলেছি, জগুদা, তোমার ওই ঘুগনি একটু বেশি করে বানালেই পারো।

জগুদা ঘাড় নেড়ে বলেছে, না ভাই, তা হয় না। ওসব মাল একসঙ্গে বেশি রান্না করলে ঠিক সোয়াদটা আসে না। সে ম্যাড়মেড়ে বারোয়ারি তারের জিনিস হয়। তা ছাড়া খদ্দেরের মর্জির ওপর কী বিশ্বাস আছে? আজ তোমরা রাত দশটায় ঘুগনি খেতে এলে, কাল যদি না আসো? দোকানের মাল তাড়াতাড়ি ফিনিশ হয়ে যাওয়াই বিজনেসের লক্ষ্মী।

জগুদার মাংসের ঘুগনির নাম ছিল প্যাঁটার ঘুগনি। শুধু খেপুত কেন, আশ-পাশের সাত-আটখানা গাঁয়ের কোন মানুষটা অন্তত একবার জগুদার দোকানের বিখ্যাত প্যাঁটার ঘুগনি খায় নি?

ইভিনিং ডিউটির পর আমরা অনেক সময় জগুদার দোকানে শুধু চা খেতেও আসতাম। বারো নয়া পয়সায় এক কাপ গুড়ের চা। জগুদা সবাইকে বলে দিতো, এই মাগগিগণ্ডার বাজারে সে চিনি দিতে পারবে না। তবে সেই গুড়ের সঙ্গে আদা-টাদা মিশিয়ে এমন চা বানাতো যে একদিন খেলে রোজ না খেয়ে উপায় নেই।

আমরা জিজ্ঞেস করতাম, কী জগুদা, তুমি কি চায়ে আফিং মেশাও নাকি? নইলে এত টানে কেন?

জগুদা হেসে বলতো, হ্যাঁ ভাই, আফিং বুঝি মাগ্‌না পাওয়া যায়? বারো নয়ার চায়ে আমি কি আপিং মিশিয়ে ফৌত হবো?

জগুদার দোকানে ধারের কারবার নেই। কোনো খদ্দের এক কাপ চা নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকলেই জগুদা হাঁক দিতেন, এই মনো, টেবিল মুছে দে।

ওইটাই খদ্দেরকে উঠে যাওয়ার ইঙ্গিত।

পথ চলতে মানুষ অবশ্য জগুদার দোকানে বিশেষ আসে না। শনি মঙ্গলবারের হাটের দিনে তবু কিছু ভিড় হয়। আর বাদবাকি দিন আমাদের এই দেশলাই কারখানার ওয়ার্কাররাই আসে। কারখানার দরজা থেকে বিশ পা গেলেই জগুদার দোকান। তাও রাস্তা ছেড়ে খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে। দোকানের পেছনে দশ কাঠা জমি জগুদারই, সেখানে সে মটর ডাল আলুর চাষ করে। ওই দোকানেরই লাগোয়া একখানা ঘরে জগুদার শোয়ার জায়গা।

এই দোকান আমরা দেখে আসছি আজ বিশ বছর ধরে। দোকানের অবস্থা একই রকম আছে, ক্ষতিও হয় নি, বৃদ্ধিও হয় নি।

বিয়ে-থা করে নি জগুদা। নিজের বলতে কেউ নেই। তবে বছর সাতেক আগে তার এক বিধবা মাসি এসে হাজির। সঙ্গে আবার বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে। অবস্থার বিপাকে মাসির ভিটেমাটি উচ্ছন্নে গেছে, দুমুঠো অন্ন জোটে না। ভাই জগুদার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল।

জগুদা তাদের ফেলে দেয় নি একেবারে। দোকানের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মাসির মেয়েটি হয়ে গেল দোকানের

বয়। এর আগে জগুদা নিজেই খদ্দেরের টেবিলে চা এনে দিতো, তখন থেকে সেই মেয়েটা এনে দেয়। আর মাসি বাসন-পত্তর মাজে, ঘর মোছে, খেতের কাজ দেখে। অনেকদিন বাদে জগুদার ভাগ্যে খানিকটা আরাম জুটলো। মাঝে মাঝে জগুদা নিজেও এক কাপ চা নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে গল্প করতে বসতো।

আড়াই বছর বাদে সেই মাসি মারা গেল ওলাওঠায়। আমরাই কাঁধ দিয়ে মাসিকে পুড়িয়ে এসেছিলাম নদীর ধারে।

মাসির মেয়ের নাম মনোরমা। এর মধ্যেই সে দোকানের কাজ বেশ শিখে নিয়েছে। ঠিক জগুদার মতনই চা বানায়। তার হাতের প্যাঁটার ঘুগনি বুঝি জগুদার থেকেও বেশি স্বাদের। আর পয়সা-কড়ির হিসাবেও বেশ পাকা। জগুদা তার ওপরে দোকানের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি।

মনোরমার বয়েস আর কতই বা, বড় জোর পনেরো-ষোল, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন পঁচিশ-ছাব্বিশ। বেশ লম্বা, বড়-সড় চেহারা। একটু মোটার দিকে ধাত। রংটা তো বেশ কালোই, তার ওপর আবার ছেলেবেলায় পান বসন্ত হয়েছিল বলে মুখে একটা পোড়া পোড়া ভাব। মনোরমার গলা:. আওয়াজটা অনেকটা ছেলেদের মতন। লোকের মুখে মুখে চটাস চটাস করে কথা বলে সে।

জগুদা আর মনোরমা তখন থেকে সেই দোকানঘরেই একসঙ্গে থাকতো বলে কেউ কেউ অকথা-কুকথা বলতে শুরু করেছিল। লোকের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। স'ব সময় জিভ সুড়সুড় করে, একটা কিছু পেলেই হল। মনোরমার মতন সোমত্ত মেয়ে রাত্তির বেলায় জগুদার মতন একটা পুরুষমানুষের কাছাকাছি শোয়—নিশ্চয়ই এর মধ্যে মন্দ কিছু থাকবে। হোক না মাসির মেয়ে—কী রকম মাসি তাই বা কে জানে!

এসব কথা জগুদার কানে আসার পর সে দুঃখ পেয়েছিল। আমরা যারা পুরনো খদ্দের, আমাদের কাছে আফসোশ করে বলেছিল, আচ্ছা তোমরাই বলো দিকিনি, এমন পাপ কথাও লোকের মনে আসে? মেয়েমানুষে আমার অরুচি, নইলে এতগুলো বছর গেল একটা কি বিয়ে-থা করতে পারতুম না? ছি ছি ছি, ঘেন্না—নিজের মাসতুতো ভাগ্নি, তাকে নিয়ে এমন কথা! মেয়েটা এখানে শোবে না তো কোথায় শোবে? ও মেয়েকে যদি কেউ বিয়ে করতে চায়, আমি এক্ষুনি বিয়ে দিতে রাজি আছি। ধার দেনা করেও বিয়ে দেবো। তোমরা দ্যাখো না; কোনো পাত্তর আছে?

না, মনোরমার বিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। তার পোড়া পোড়া মুখে বসন্তের দাগ—তাকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড়া, মনোরমার অমন দশাসই চেহারা, তার সঙ্গে মানাবে এমন জোয়ান মদ্দই বা কোথায়?

আমি, রতন, পরাণ আর জিতেন—আমরা ডিউটি সেরে রোজই একবার জগুদার চায়ের দোকানে যাই। আমরা জানি, জগুদা মানুষটা মন্দ না। মেয়েমানুষের দিকে তার টান নেই সত্যিই, নইলে এতগুলো বছরের মধ্যে একদিনও তো অন্তত একটা খিস্তি-খেউড় শুনতে পেতুম না ওর মুখে।

তা, জগুদা আর মনোরমাকে নিয়ে বদনামটা রটবার পর কিন্তু জগুদার দোকানে ভিড় বেশ বেড়ে গেল। এক একসময় এসে আমরাই জায়গা পাই না। মনোরমার মুখখানা নাই বা সুন্দর হল তার জামা উপছোন বুক আর ভারী পাছার দিকে নতুন খদ্দেররা হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকে। তারা দুকাপ-তিন কাপ করে চা খায়। বাজারের দুটো রেস্টুরেন্টের কোনোটাতেই তো কোনো মেয়ে এসে চা দেয় না।

এত খদ্দের বেড়ে যাওয়ায় জগুদা কিন্তু খুশি হয় নি। ওর নিরিবিলি দোকানের বাঁধা খদ্দেরই পছন্দ। অচেনা খদ্দেররা কখনো একটু বেশি চেঁচিয়ে কথা বললে জগুদা হাঁক দেয়, আস্তে আস্তে, এটা হাটবাজার নয়।

যাই হোক, তবু তো বেশ চলছিল! এর মধ্যে জগুদা একটা মহা নির্বুদ্ধিতার কাজ করল। এই বছর প্রথম বর্ষার শুরুতে জগুদা একদিন হুট করে মরে গেল। মেয়ের কি দশা হবে, সেটা একবার ভাবলো না পর্যন্ত।

সেদিন আমাদের নাইট ডিউটি ছিল। নাইট ডিউটি শেষ হয় ভোর সাড়ে পাঁচটায়—ডিউটি সেরে আমরা কজন, না, সেদিন পরাণ ছিল না, তার বদলে আমাদের সঙ্গে পঞ্চু গুটি গুটি এলাম জগুদার দোকানে। এমন অনেকবার হয়েছে, আজ ভোরে জগুদার দোকানের ঝাঁপ ওঠে নি, আমরাই ডেকে তুলে উনুনে আঁচ দিয়েছি। অসময়ে এলেও জগুদা অসন্তুষ্ট হতো না।

সেদিন এসে দেখি মনোরমা মড়াকান্না কাঁদতে বসেছে। ও দাদা, দাদাগো—বলে সুর টেনে চলেছে মনোরমা। তাকে এর আগে আমরা তো কখনো কাঁদতে শুনিনি, তার মায়ের মৃত্যুর সময়েও সে চেঁচিয়ে কাঁদে নি—সেইজন্যই তার ভাঙা ভাঙা গলা শুনে আমরা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

ওপাশের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখি মেঝের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে আছে জগুদা। চোখ দুটো খোলা, ওরে বাবারে, সে রকম চোখ দেখলেই ভয় করে! পঞ্চু নিচু হয়ে জগুদার গায়ে হাত ছুঁয়ে বললো, এতো একেবারে ঠান্ডা কাঠ। অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে।

পাশাপাশি দুটো বালিশ। জগুদা আর মনোরমা পাশাপাশি শুতো তাহলে। সেমিজের ওপরে একটা আলুথালু শাড়ি জড়িয়ে মনোরমা হাপুস করে কাঁদছে। আমি অন্যদের অলক্ষ্যে মনোরমার বালিশটা পা দিয়ে ঠেলে ঘরের কোণের দিকে সরিয়ে দিলাম। এরপর পাঁচটা লোক আসবে, তারা এ নিয়ে আবার পাঁচ রকম কথা বলবে, কী দরকার।

শরীরে কোনো রোগ ব্যাধি ছিল না জগুদার। তবু এমন করে মরে গেল কেন? সবাই বললো, সন্ন্যাস রোগ। ও রোগে মানুষ এমনিই রাত্তিরবেলা নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ চলে যায়। আমাদের পঞ্চু বললো, জগুদার নিশ্চয়ই হার্ট উইক হয়ে গেছল। হোমিওপ্যাথিতে এর ভালো চিকিচ্ছে আছে। আহা, আগে জানলে—

যাই হোক, আমরা সবাই মিলে তো জগুদাকে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এলুম। কিন্তু এবার মেয়েটার কী গতি হবে? সেই কথা বলেই মনোরমা কাঁদছিল। ও মা গো, আমি এখন কোথায় যাবো গো! আমি কার কাছে যাবো!

দুতিন দিন তো এই ভাবে কাটলো। আমরা রোজই আসি। চা বন্ধ, কিন্তু এই দোকানটাতে আসাটাই যে আমাদের নেশা। গত কুড়ি বছর ধরে আসছি, হঠাৎ কি না এসে পারা যায়?

শেষে আমরাই মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম, তুই আবার দোকান খোল দিদি। তোকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, এই দোকানই তোর ভরসা। তা ছাড়া এই দোকানটাই ছিল জগুদার প্রাণ, এটাকে বাঁচিয়ে না রাখলে যে জগুদার আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

ছদিনের মাথায় মনোরমা চোখের জল মুছে আবার দোকানের ঝাঁপ তুললো। আবার খদ্দের আসতে লাগলো। জগতে কেউ কারুর জন্যে বসে থাকে না। অমন যে জবরদস্ত হাসি-খুশি মানুষটা ছিল জগুদা, সে চলে যাওয়ায় কিছুই ঘাটতি পড়লো না, কিছুই থেমে থাকলো না।

তবে ধন্য সাহস বটে মনোরমার। ওই মাঠের মধ্যে দোকানঘরে সে একলা থাকে। যে ঘরে জগুদা মরেছে, সেই ঘরেই সে এখন একলা শোয়, একটুও ডরভয় নেই তার। আমরা বলেছিলুম কোনো একটা বুড়ি মেয়েমানুষকে ওর কাছে রাখতে। কাজকম্মেও সাহায্য হবে, রাত্তিরেও কাছে থাকবে। মনোরমা বলেছে, তার কোনো দরকার নেই। একটা লোক রাখা মানেই তো বাড়তি খরচ।

এক বচ্ছর কেটে গেছে, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও একটা চোর পর্যন্ত ঢোকে নি ওই দোকানঘরে। আমাদের এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়গুলোও সব রোগা প্যাংলা, তাদের এমন সাহস নেই যে মনোরমার মতন অমন খান্ডারনী মেয়েমানুষের ঘরে ঢোকে। মনোরমার এখন ভারভাত্তিক চেহারা, দেখে কেউ ওর বয়স বুঝবে না। আমরা জানি, ওর বয়েস বাইশ। কিন্তু লোকে ভাববে বত্রিশ।

অ্যাদ্দিন কোনো সাইনবোর্ড ছিল না, এখন মনোরমা দোকানের সামনে এক সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। 'জগুদার চায়ের দোকান'। জগুদা এখন নেই, তবু দোকানের সঙ্গে তার নামটা টিকে গেল।

দোকান বেশ ভালই চালাচ্ছে মনোরমা। আমরা কজন হলুমগে তার গার্জেন। আমরা সবচেয়ে পুরোনো খদ্দের, আর বলতে গেলে জগুদার বন্ধুই ছিলাম, তাই আমাদের সে অধিকার আছে। মনোরমাও আমাদের তেমনভাবেই মান্য করে। আমাদের পরামর্শ-টরামর্শ মন দিয়ে শোনে। রোজ একবার করে আমরা খবর নিতে আসি। আমি, তরুণ, পরাণ আর জিতেন, মাঝে মাঝে পঞ্চুও এসে আমাদের সঙ্গে জোটে।

আমাদের দেশলাই কারখানায় তিনরকমের ডিউটি। ডে, ইভিনিং আর নাইট। আমাদের কোন সপ্তায় কখন ডিউটি থাকবে, তা পর্যন্ত মনোরমার মুখস্থ। সেই অনুযায়ী সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। কখনো যদি আমাদের চারজনের এক শিফটে ডিউটি না পড়ে, তাহলে হয় গন্ডগোল। তখন আর একসঙ্গে আসা হয় না। তবু একবার করে ঘুরে যাই সবাই।

একহাতে দোকান চালাবার ক্ষমতা রাখে বটে মনোরমা। সে-ই চা বানাচ্ছে, সে-ই ঘুগনি রাঁধছে, সে-ই টেবিল পরিষ্কার করছে। আজকাল আবার সে মামলেটও বানায়। নোনতা বিস্কুট ছাড়া, সে একটা কাচের বোয়ামে কেকও এনে রেখেছে। এক এক সময় আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি তার কেরামতি। কোনো একটা খদ্দের একটা অচল আধুলি দিয়েছিল। এক পেলেট ঘুগনি আর এক কাপ চা খেয়ে সে খুচরো আট পয়সা ফেরত চাইলো না। বাবুগিরির কায়দায় সে মনোরমার সামনে আধুলিটা রেখে বললো, খুচরোটা তুমিই নিও।

সে খদ্দের দোকানের দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই মনোরমা ছুটে গিয়ে তার কাছা ধরেছে। কড়কড়ে গলায় মনোরমা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ওরে আমার ভালোমানুষের ছেলে! আমি কি তোমাকে নকল খাবার দিয়েছি যে তুমি আমাকে নকল পয়সা চালাচ্ছ?

খদ্দের যেন কিছুই জানে না; আমসিপানা মুখটি ভরে বললো, নকল পয়সা! কে বলেছে? এই তো আমি সিগ্রেটের দোকান থেকে একটু আগে ভাঙিয়ে আনলাম!

মনোরমা আধুলিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, সে তুমি সিগ্রেটের দোকানদারের সঙ্গে বোঝ গে। আমার খাঁটি জিনিসের খাঁটি পয়সা দিয়ে যাও!

পয়সাটা মাটিতে পড়ে ঠং করে শব্দ পর্যন্ত হলো না।

খদ্দের পকেট উল্টে বললো, আর তো পয়সা নেই!

—খাবার বেলা সে কথা মনে ছিল না?

আমরা চারজন কোণের টেবিলে বসে মিটিমিটি হাসছি। আমরা তো জানিই, ও খদ্দের ব্যাটা বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে তক্ষুনি গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবো। আমরা মনোরমার গার্জেনরা এখানে বসে আছি। ও ভেবেছে মনোরমা অবলা মেয়েছেলে!

আমাদের সে রকম কিছু করবার দরকার হল না। মনোরমা নিজেই দোকানের বাকি খদ্দেরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, আপনারাই পাঁচজনে বলুন, আমি খেটেখুটে দোকান চালাচ্ছি, কোনো দিন কারুকে খারাপ জিনিস দিইনি—কাল দুটো পচা ডিম বেরুল, তাও আমি প্রাণে ধরে ফেলে দিলুম—আর আমাকে এরকমভাবে লোকে ঠকাবে? এই কি ধর্ম?

যে-সব নতুন খদ্দেররা মনোরমার গতর দেখতে আসে, তারা সঙ্গে সঙ্গে বললে, খুব অন্যায়! নিশ্চয়ই ওর ট্যাঁকে আরও পয়সা আছে।

মনোরমা তখনো লোকটার কাছা টেনে ধরে আছে। লোকটার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। মনে হয় কোনো সাধারণ হাটুরে লোক। তা বলে ওকে ছেড়ে দেবার কোনো কথাই ওঠে না।

পরাণ হাঁক দিয়ে বললে, ওর জামা খুলে নে, মনো!

লোকটা হাতজোড় করে বললে, আমাকে আজ ছেড়ে দিন। আমাকে একটা শ্রাদ্ধ-বাড়িতে যেতে হবে। আমি কাল ঠিক এসে পয়সা দিয়ে যাবো।

শ্রাদ্ধবাড়ি কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রতন বললে, ব্যাটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যাবি তো জুতো পরে যাবার দরকার কি? জুতো জোড়া খুলে রেখে যা!

লোকটার পায়ে প্রায় নতুন একজোড়া রবারের পাম্পশু। জামার বদলে শেষ পর্যন্ত জুতো জোড়া খুলে রেখে লোকটা নিস্তার পেলো। সে লোকটা আর জুতো নিতে আসে নি। জুতোজোড়া পড়েই ছিল দোকানে, শেষ পর্যন্ত আমাদের কারখানার দারোয়ান দেড় টাকা দিয়ে সে দুটো কিনে নিলো।

আর একবার একটা লোক নাকি দুপুর দুপুর এসে ইচ্ছে করে মনোরমার গায়ে হাত দিয়েছিল। পয়সা দেবার সময় ইচ্ছে করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একেবারে মনোরমার বুকের ওপর। ঘটনাটি আমি নিজের চোখে দেখি নি, রতনের মুখে শুনেছি। আমাদের মধ্যে শুধু রতন ছিল দোকানে।

রতন লাফিয়ে উঠে গিয়ে লোকটার ঘাড় চেপে ধরেছিল। তাকে ঠেলতে ঠেলতে দোকানের বাইরে করে দিচ্ছিলো, সেই সময়ে মনোরমা এসে বলেছিল, দাঁড়াও রতনদা, এ লোকটার বেশি রস উথলে উঠেছে, একটু শিক্ষা দিয়ে দিই! এই বলে মনোরমা লোকটার নাকে এমন ঘুষি মারলো যে রক্ত বেরিয়ে গেল। মনোরমার ওই গোদা হাতের মার সহ্য করার ক্ষমতা আছে কার?

মনোরমা লোকটাকে সেই অবস্থায় দোকানের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ফের যদি এদিকে আসিস তোর একটা হাড়ও আস্ত রাখবো না। গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে দেবো মুখে, বুঝলি!

এরপর থেকে রসিক ছোকরারা শুধু চাউনি দিয়ে মনোরমার গা চেটেই যা সুখ পায়, ধারে কাছে ঘেঁষতে আর সাহস করবে না কেউ।

জগুদার সঙ্গে মনোরমার একটা ব্যাপারে মিল আছে। বেশি খদ্দের টেনে এনে বেশি লাভ করার দিকে তারও লোভ নেই। বাছাই করা খদ্দের নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট দোকান চালাতেই সে চায়। সে খাঁটি জিনিস দেবে। তার বদলে ভেজাল খদ্দের তার দরকার নেই।

যে যে হপ্তায় ইভনিং ডিউটি থাকে, সেই সব সময়েই জগুদার দোকানে আমরা বেশিক্ষণ কাটাই। ডিউটি শেষ হয় রাত ন'টায়—কোনো কোনোদিন সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে আসি। আধ ঘন্টা ডিউটির পর আমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে তবু তখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় কোথাও নিরিবিলিতে বসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি।

তা রাত নটার পর জগুদার দোকান একেবারে নিরিবিলিই হয়ে যায়। লাস্ট বাস চলে যায় নটা দশে, তারপর এ রাস্তায় তো আর মানুষজন থাকেই না বলতে গেলে। মনোরমা আমাদের ডিউটির সময় জানে; আমরা দোকানে ঢুকে বসবার সঙ্গে সঙ্গে সে চা এনে দেয়। অ্যাসট্রের ছাই ফেলে পরিষ্কার করে আনে। তার পর সে ক্যাশের সামনে বসে সারাদিনের হিসেব করতে বসে। সেই সময় সে আপন মনে গান গায় ঃ

মনোরমার গান ভারি অদ্ভুত। তার গলা ভালো না। কথা বলার সময় তার গলাটা পুরুষমানুষের মতন হেঁড়ে হেঁড়ে মনে হয়। কিন্তু গান গাইবার সময় সে একটা অদ্ভুত সরু গলা বার করে, অনেকটা কুকুরের কুঁইকুঁই-এর মতন। যে কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে সেই কুকুরই তো আবার কুঁইকুঁই করে এক সময়। মনোরমাও সেই রকম। আর রোজ সে একই গান গায়;

যে জ্বরে জ্বরেছে মা, তোর কানাই
মা, তোমায় কেমনে জানাই
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

শুধু ওইটুকুই আর বেশি না। ওই কটা লাইনই বারবার ঘুরে-ফিরে গায়। এই অদ্ভুত গান। এই অদ্ভুত গান কোথা থেকে সে শিখল তাও জানি না।

রতন জিজ্ঞেস করে, আজ কত বিক্কিরি হল মনোদির?

মনোরমা উত্তর দেয়, সাতাশ তিরিশ নয়া। তা ভালোই হয়েছে।

যেদিন বিক্কিরি অনেক কম হয়, সেদিন সে কোনো আফশোস করে না। রোজই পয়সা গোনার সময় সে এ রকম সন্তুষ্টভাবে গান গায়।

এক-একদিন সে আমাদের জন্য ঘুগনি বাঁচিয়ে রাখে। বিশেষ করে শনিবার। মনোরমা জানে। রবিবার আমাদের অফ ডে, তাই শনিবার রাত্রে স্ফূর্তি করি। চায়ের কাপ নিয়ে আমরা চুপচাপ বসে থাকি এক কোণের টেবিলে। কোনো কথাও বলি না। শেষ খদ্দেরটি চলে যাবার পর আমরা আড়মোড়া ভাঙি। তখন রতন বলে, মনো দিদি, চারটে গেলাস দিবি?

মনোরমা আমাদের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে জাঁদরেল ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। তার পর চোখ পাকিয়ে বলে, এখন বুঝি ওই সব ছাই-ভস্ম খাওয়া হবে আবার?

আমাদের একজনের পকেট থেকে একটা বাংলার পাঁইট বেরোয়। আমরা বলি, এই তো এইটুকুনি, এ তো এক চুমুকেই শেষ হয়ে যাবে!

মনোরমা বলে, ঠিক? আর বেশি খাবে না?

—না, দিদি আর পাবো কোথায়?

আমরা মনোরমার গার্জেন। কিন্তু এই সময় সে-ই আমাদের ওপর গার্জেনি করে। আমাদের প্রত্যেকের পকেটেই যে একটা করে পাঁইট আছে, সে কথা জানতে দিই না ওকে।

মনোরমা চারটে গেলাস নিয়ে আসে। নাক সিঁটকে বলে, ইঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ। তোমরা এসব খেয়ে যে কী আনন্দ পাও!

—তুই একটু খাবি নাকি? তাহলে তুইও আনন্দ পাবি!

—রক্ষে করো। আমার আর আনন্দ পেয়ে দরকার নেই। আমি বেশ আনন্দে আছি!

প্রত্যেক শনিবার ঠিক এই একই কথা হয়। প্রত্যেকবারেই আমরা এতে আনন্দ পাই।

মনোরমা আমাদের জন্যে চার প্লেট ঘুগনি নিয়ে আসে। তখনো গরম। আমাদের জন্য যত্ন করে ঘুগনিটা আবার গরম করেছে, এই জেনে বেশ সুখ হয়।

মনোরমা কিচেনে গেলেই আমরা পকেট থেকে বোতল বার করে আবার গেলাসে ঢেলে নিই। ক্রমে ক্রমে নেশা ধরে, আমাদের চোখ চকচকে হয়ে আসে, কপালে বিন বিন করে ঘাম। পরাণ একটু গান ধরতে গেলেই জিতেন তাকে ধমকে ওঠে, চোপ! তুই গান গাইবি না। এখন আমরা মনোরমার গান শুনবো।

রতন বলে, মনো, আমাদের কাছে একটু আয় না দিদি!

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমরা আর কত দেরি করবে?

—এই তো হয়ে এলো, আর একটু বাদেই চলে যাবো। আয় না, আমাদের কাছে এসে একটু বোস, দুটো কথা বলি!

মনোরমা একটা চেয়ার টেনে এনে বসে। একটু দূরে, যাতে বাংলার গন্ধটা তার নাকে না যায়।

জিতেন বলে, ধর তো মা তোর ওই গানটা!

মনোরমা অমনি তার সেই গান ধরে, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

বারবার শুনতে শুনতে আমাদের ঘোর লেগে যায়। মনে হয়, আহা, কী অপূর্ব গান! এমনি কখনো শুনি নি! পরাণ টেবিল চাপড়ে তাল দেয়। রতন আহা আহা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

—মনো, তুই নাচ জানিস না দিদি?

মনো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দেখবে? আমার নাচ দেখবে?

অমনি সে দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে চোখ বুজে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। ঠিক আনি মানি জানি না খেলার মতন। এই রকম বোঁ বোঁ করে ঘোরাকে যে কেন ও নাচ বলে, তা আমরা বুঝি না। তবু প্রত্যেক শনিবার আমরা মনোরমাকে নাচতে বললেই সে এ রকম ঘোরে।

তখন মনোরমাকে বড় সুন্দর লাগে আমাদের। হোক না সে কালো, বসন্তের দাগওয়ালা পোড়া পোড়া মুখ, হাত-পাগুলো মুগুরের মতো, আর বিরাট বিরাট দুই বুক আর পাছা—তবু সুন্দর দেখায় তাকে।

মনোরমার নাচের সময় আমরা চারজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ি। ওর নাচটা আমাদের খেলা। আমরা বয়স্ক চারজন লোক সেই সময় খেলায় মেতে উঠি। আমরা দূর থেকে বলি, মনো, আমাদের ধর দেখি!

মনোরমা ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের একজনের গায়ের উপর পড়ে। সে তখন টু শব্দটি করে না। তখন মনোকে বলতে হবে, সে কাকে ছুঁয়েছে।

মনোরমা চোখ না খুলেই তার গায়ে হাত বুলোয়। থুতনি ধরে নাড়ে, দুষ্টুমি করে কান দুটো টানে, তারপর চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ও এ তো বঙ্কুদা!

মনোরমা যখন আমাকে ধরে এ রকম গায়ে মুখে হাত বুলোয়। আমার শরীরটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয়, মনোরমা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে চিনতে না পারুক!

অন্যরা তখন হিংসে হিংসে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। এক রাত্তিরে এই খেলা দুবার খেলে না মনোরমা। সুতরাং একজনেরই ভাগ্যে শুধু মনোরমা আসে এক এক শনিবারে।

আমাদের বাড়িতে বউ ছেলেপুলে আছে। বুড়ি মা আছে, অভাব আছে, ফুটো টিনের চাল আছে। পোকা লাগা বেগুন আছে। আর অনেক কিছুই নেই। বাড়িতে গেলেই তো শুনতে পাই হ্যানো নেই, ত্যানো নেই। কিন্তু শনিবার রাত্তিরে এ সময়টা আমরা সেসব কিছু ভুলে যাই। তখন শুধু আমরা চারজন আছি, আর মনোরমা।

ছেলে ছোকরারা হাতে পয়সা পেলেই বাজারের সিনেমা হলে ছোটো। সেখানে ধর্মেন্দর আর হেমা মালিনীর জাপটা-জাপটি দেখে তারা কী সুখ পায় কে জানে। আমাদের সিনেমা হলটাও হয়েছে এমন, হপ্তায় দুবার করে বই পাল্টায়। আমরা ওসব দেখতে যাই না কখনো। আমাদের মনোরমা আছে।

রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। মনোরমা বলে, ওগো, তোমরা বাড়ি যাবে না? এর পর বাড়ি গেলে যে বউ তোমাদের প্যাঁদাবে।

আমরা হাহা করে হেসে উঠি। মনো এমন মজার কথা বলে। আমরা জানি, মনোরমা এর পরই একটা গল্প বলবে। প্রত্যেক শনিবারই বলে। বর্ধমানে ওরা কিছুদিন এক কাকার বাড়িতে ছিল। সে বাড়ির ওপরতলায় থাকতো এক ভদ্রলোক আর তার বাঁজা বউ। ভদ্রলোকটি রোজ রাত্তিরে মাল টেনে আসতো আর বাড়ির দরজায় ঢুকেই বলতো, আর করবো না, আর কোনোদিন করবো না! কিন্তু তার বউ তখুনি ছুটে এসে তাকে দুমদাম করে মারতো। সে কি মার। অনেক দূর থেকে সেই শব্দ শোনা যায়। লোকে শুনে ভাবে, ছাদ পেটাই হচ্ছে?

গল্প শুনে আমরা হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ি। প্রত্যেক শনিবার। জিতেন পেট চেপে ধরে বলে, থাম, মনো থাম, আর বলিস না। ওসব ভদ্রলোকের কথা আর বলিস না। টাকা রোজগার করে যে বউকে খাওয়াবে আবার সেই বউয়ের হাতে মারও খাবে এসব ভদ্রলোকেরাই পারে। পরাণ বলে, মনো, আমাদের মতো কেউ যদি তোকে বিয়ে করতো, তুই তাকে মারতিস!

মনোরমা বলে, মারতাম না আবার! মেরে একেবারে পাট করে দিতাম।

রতন বলে, ভাগ্যিস আমি তোকে বিয়ে করি নি! তোর হাতের মার খেলে আমি মরেই যেতাম ।

রতন এক-এক দিন নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি বার করে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ উ-হু-হু করে ওঠে। তারপর বলে, ইস পায়ে খিল ধরে গেল। মনো, একটু টেনে তোল তো আমাকে!

মনোরমা এসে তাকে টেনে তুলতেই সে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরে। ঠিক যেন বাতের রুগী। কিন্তু ওসব চালাকি কি আর আমরা বুঝি না!

পরাণ আজ বলে, আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। কি রে বঙ্কা, তোর ধরে নি?

জিতেন?

আমরা বলে উঠি, হ্যাঁ আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। আমরা তো একসঙ্গে বসে আছি।

জিতেন বলে, রতনকে মনো টেনে তুলেছে। আমাদেরও টেনে তুলবে!

মনো হেসে ফেলে বলে, তোমরা সব বুড়ো খোকা! তোমাদের নিয়ে আর পারি না! এবার যাও, নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো বলছি!

ব্যস, ওই পর্যন্ত। ওর বেশি আর এগোই না। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। আমাদের তো ঘরসংসার আছে। একটা করে বাড়ি আছে। সে বাড়িতে কত কিছুই নেই। আমরা বেরিয়ে আসার পর মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। আমরা চারজন পাশাপাশি হাঁটি।

এক সময় রতন বলে, আমাদের মনো বড় ভালো মেয়ে!

আমরা বাকি তিনজন তখন ওই এক কথাই ভাবছিলাম।

রতন বলে, এমন ভালো মেয়ে, অথচ আর একটা বিয়ে হল না! মেয়েটা সারাজীবন এ রকম কষ্ট পাবে?

আমরা আমাদের মনের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি! মনোরমার সঙ্গে বিয়ে দেবার মতো কোনো পাত্রের কথা আমাদের মনে পড়ে না।

রতন কাঁদতে আরম্ভ করে। একটু নেশা হলেই কান্নাকাটি করা রতনের স্বভাব।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক সময় সে বলে, আমি যদি আগে বিয়ে না করে ফেলতাম, তাহলে আমিই মনোকে বিয়ে করতাম। এ কথা নিশ্চয় করে বলছি। আহা মনোরমার হাতে মার খেয়েও আমার সুখ হতো—।

বলতে বলতে রতন হঠাৎ থেমে যায়। আমাদের চোখের দিকে তাকায়। আমরা ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছি। রতনটা স্বার্থপরের মতো কথা বলছে। আমরাও তো ভুল করে ফেলেছি আগে। আমাদেরও বাড়িতে প্যানপেনে, রোগা পটকা, অসুখে-ভোগা, হাড়-জ্বালানি বউ আছে। তার বদলে মনোরমাকে বিয়ে করলে অনেক বেশি সুখ হতো। কিন্তু, একজন কেউ বিয়ে করলেই তো মনোরমা শুধু তার হয়ে যেতো। বঞ্চিত করা হতো আর তিনজনকে। তখন কি আর অন্য কেউ পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে বলে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরতে পারতো?

না! আমরা আগে বিয়ে করেছি, ভালোই হয়েছে। আমরা কেউ আর মনোরমাকে বিয়ে করতে পারবো না। সেই জন্যেই, মনোরমা আমাদের চারজনের হয়ে থাকবে। তাই তো আমাদের আড্ডায় পঞ্চুকেও সঙ্গে আনি না।

আমাদের দেশলাই কারখানায় দুম করে পাঁচজন লোক ছাঁটাই হয়ে গেল। তার মধ্যে আমরা কেউ পড়ি নি বটে কিন্তু শুনছি আরও ছাঁটাই হবে। কখন কার ওপর কোপ পড়বে তার ঠিক নেই। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। বাজার খুব মন্দা। ম্যাড্রাস থেকে সস্তা দামের দেশলাই এসে বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

ডিউটি শেষ করে বেরুবার সময় মুখটা তেতো তেতো লাগে। প্রত্যেকদিন ভয় হয়, কাল এসে কী নুটিস ঝুলতে দেখবো কে জানে। আবার কেউ কেউ বলছে লক আউট হবে!

ব্যাজার মুখ করে জগুদার চায়ের দোকানে আসি। মনোরমা দোকানটাকে বেশ দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্রায়ই সে বলে, দোকানের জন্য এবার সে ফার্নিচার করবে। চেয়ার টেবিলগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে, কয়েকখানা না বদলালেই নয়।

আমরা মনোরমাকে ঠাণ্ডা মাথায় উপদেশ দিই। এক্ষুনি হুট করে কিছু করে ফেলিস না দিদি। দিন কাল ভালো নয়। হাতে পয়সা থাকা ভালো।

মনোরমা বলে, তোমরা আজকাল এত গোমড়া মুখে থাকো কেন গো? আর বুঝি এ দোকানের চায়ে স্বাদ নেই?

আমরা হাহা করে উঠি। সে কি কথা! মনোরমার চায়ের হাত দিন দিন মিষ্টি হচ্ছে। গুড় দিতে ভুলে গেলেই মিষ্টি।

আমরা মনোরমার দোকানে কখনো ধার রাখি না। এ নিয়ম সেই জগুদার আমল থেকে চলে আসছে। ধার রাখলেই ধার জমে যায়—পরে আর শোধ করা হয় না। ধার রাখলেই দোকানের মালিকের সঙ্গে ভাব নষ্ট হয়। আমরা চারজন এখন মনোরমার গার্জেন, কিন্তু কেউ বলুক দেখি কোনো একদিনও ওর দোকানে মিনিমাগনায় খেয়েছি! হাতে পয়সা না থাকলে সেদিনটা আর দোকানেই আসি না।

তবে, আমরা সকলেই জানি। আমাদের একজন না গেলেও অন্য তিনজন যাবে, মনোরমার দেখাশোনা করে আসবে।

তবে, শনিবারের আড্ডায় কেউ বাদ পড়ে না। কারখানার ফোরম্যানকে ঘুষ দিয়ে হাত করা আছে, কোনো রবিবার আমাদের নাইট ডিউটি দেবে না!

শনিবার দিন পকেট থেকে আমরা মালের বোতল বার করলে প্রত্যেকবার মনোরমা বকাঝকা করে। কিন্তু আমরা জানি, শনিবারের এই মজাটুকু মনোরমাও পছন্দ করে খুব, সারা হপ্তা মনোরমাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে, ওর তো জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। আমাদের সঙ্গে ওইটুকু খেলাধুলোই ওর ফূর্তি।

তা এক শনিবার আমরা অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছি, শেষ লোকটা আর কিছুতেই ওঠে না। লোকটা এক টেবিলে একা বসে আছে, একটা হাত থুতনিতে, কী যেন ভেবেই চলেছে। রোগা লম্বাটে চেহারা লোকটার, জামাকাপড় ফর্সা। একে আগে কখনো দেখি নি। প্রথমে ভেবেছিলাম, লোকটা বুঝি মনোরমার দিকে হ্যাংলা দৃষ্টি দিচ্ছে, তারপর বুঝলাম, তা না, লোকটার চোখ শুধু দেয়ালের দিকে—সে অন্য কিছুই দেখছে না।

আমাদের এ দোকান থেকে বিনা দোষে কোনো খদ্দেরকে কখনো তাড়িয়ে দিই না। কেউ যদি একটু বেশিক্ষণ বসতে চায় বসুক না! কিন্তু লোকটা এক কাপ মাত্র চা নিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

রতন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কটা বাজলো!

পরাণ বলল, নটা বেজে গেছে।

জিতেন বলল, লাস্ট বাস এক্ষুনি চলে যাবে বোধহয়!

আমরা ভাবলাম, যদি এসব কথা শুনে লোকটা উঠে পড়ে। ভিনদেশি লোক, লাস্ট বাস চলে গেলে ফিরবে কী করে?

লোকটা এসব কথা শুনেও উঠলো না। বরং টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো। আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এ আবার কী ব্যাপার!

আমরা মনোরমাকে চোখের ইশারা করলাম। মনোরমা লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই ক্যারকেরে গলায় বললে, আপনি চা খাবেন না? এ তো অনেকক্ষণ ঠান্ডা হয়ে গেছে!

লোকটা কোনো কথা না বলে শুধু মুখ তুলে মনোরমার দিকে তাকালো।

মনোরমা আবার বললে, আমি এবার দোকান বন্ধ করবো।

লোকটা আস্তে আস্তে বলল, আমি এই টেবিলের ওপর শুয়ে থাকবো—শুধু আজকের রাতটা—

এ আবার কেমনধারা কথা! সুবিধে মনে হচ্ছে না তো! গলার আওয়াজ শুনে মনে হল লোকটা নেশাখোর। ওসব ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই এখানে চলবে না। ও তো জানে না, আমরা মনোরমার গার্জেন এখানে উপস্থিত আছি।

রতন উঠে গিয়ে বললে, এই যে মশাই, উঠুন! এটা ঘুমোবার জায়গা নয়!

লোকটা বললে, শুধু রাতটা...এখানে থাকবো...তার জন্যে পয়সা দেবো...

রতন এবার লোকটার প্রায় ঘাড়ের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বলল, ঘুমোতে হয় তো হোটেলে যান না, এখানে কেন?

—হোটেল আছে এখানে?

—বাজারের কাছে আছে অন্নপূর্ণা হোটেল, সোজা সেখানে চলে যান।

—তাই যাবো, আমাকে একটু ধরে তুলুন তো, উঠতে পারছি না।

রতন লোকটার গায়ে হাত দিয়েই চমকে বলে উঠলো, ওরে বাবা, এ কি!

তারপর আমাকে ডেকে বলল, বঙ্কু, একবার এদিকে আয় তো।

আমি উঠে যেতেই রতন বলল, লোকটার কী হয়েছে, দ্যাখ তো?

লোকটা আবার ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়ছে। আমি তার একটা হাত ছুঁয়ে রতনের মতনই চমকে উঠলাম। লোকটার গা অসম্ভব গরম।

আমি বললাম, এ লোকটার তো খুব জ্বর হয়েছে দেখছি!

লোকটি আবার মুখ তুললো, চোখ দুটো অসম্ভব লাল। সে বলল, আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি ঠিক যেতে পারবো।

লোকটির কথাবার্তা আমাদের মতন নয়। বোঝাই যায়, শহুরে ভদ্দরলোক। টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ, ফর্সা রং—সিনেমায় এমন চেহারা দেখা যায়। এমন লোক হঠাৎ আমাদের এখানে এসেছে কেন?

আমি আর রতন লোকটিকে দুদিক থেকে ধরে তুললাম। লোকটি মাতালের মতন টলতে লাগলো। রতন জিজ্ঞেস করলো, আপনার কী হয়েছে?

লোকটি বললে, মাথায় অসহ্য ব্যথা!

জিতেন চেঁচিয়ে বলল, বোধহয় ম্যালেরিয়া ধরেছে!

আমি বললাম, আপনি এই অবস্থায় যাবেন কি করে? মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে। আপনার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে।

—এখানে কোথা থেকে এসেছেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, আমাকে দয়া করে একটু রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিন!

মনোরমা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, জ্বর হয়েছে, না নেশাভাঙ করেছে?

আমি বললাম, নেশা করলে গা এত গরম হয় না।

—রাস্তা দিয়ে কি হাঁটতে পারবে?

—বোধহয় পারবে না!

—তাহলে ওই টেবিলের ওপরেই শুইয়ে রাখ!

এই কথাটা আমিও ভাবছিলাম। একটা অসুখে পড়া অসহায় লোককে রাস্তায় ফেলে রেখে আসার কোনো মানে হয় না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক, পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলে। সে এখানে মরতে এলো কেন?

লোকটাকে আমরা টেবিলের ওপরেই শুইয়ে দিলাম। একটা ডাক্তার এনে দেখালে ভালো হতো। কিন্তু অত রাত্তিরে ডাক্তারই বা কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বললাম, আপনি কিছু ওষুধ-টষুধ খাবেন না!

লোকটা বলল, না, দরকার নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনোরমা বলল, একটু জল দিয়ে মাথাটা ধুইয়ে দেবো?

—তা দাও না।

মনোরমা ঘর মোছার বালতিতে করে নিয়ে এলো এক বালতি জল আর মগ। মগে করে মাথায় জল ঢালতে গিয়ে বলল, ও মা, এর মধ্যে দেখছি অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডান পায়ের গোড়ালিটা দ্যাখো রতনদা, কতখানি ফুলে আছে; নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে পায়ে। সাপে-টাপে কামড়ায় নি তো?

রতন বলল, দূর! সাপে কামড়ালে কী এতক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে? এমনি জ্বর-জারি হয় না মানুষের! সত্যি কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? দেখি—রতন দুচার-বার নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলো, তবু লোকটার আর সাড়া নেই। সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। মনোরমা তবু জল দিয়ে তার মাথাটা ধুইয়ে দিলো।

এত হাঙ্গামার মধ্যে আর আমরা পকেট থেকে বাংলার বোতল বার করতেই পারি নি। রাত বাড়ছে, বাড়িতেও তা যেতে হবে।

পরাণ অধৈর্য হয়ে বলল, ও মনো, চারটে গেলাস দে ভাই, আর দেরি করতে পারছিনি।

সেদিন খাওয়া হল বটে, কিন্তু জমলো না। মনোরমা গান গাইলো না। আমরা তাকে নাচতে বলতেও পারলাম না। ঘরের মধ্যে আর একটা অচেনা লোক হাত পা চিতিয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে কী আমরা আনি মানি জানি না খেলতে পারি! প্রতি শনিবার রাত্রে মনোরমার সঙ্গে আমাদের এই যে খেলাটা—সেটা তো সারা পৃথিবীর অজান্তে। তখন আর বাইরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না—আজ শুধু আমরা চারজন আর মনোরমা। এর মধ্যে আবার এই উটকো উৎপাত এলো কেন? এর বদলে একটা ডাকাত এলেও আমরা প্রাণপণে লড়াই করে তাকে মনোরমার কাছে ঘেঁষতে দিতাম না। কিন্তু এ যে একজন অসুস্থ লোক, একে রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায় কী করে? মনোরমা এর মাথা ধুইয়ে দিলেও আমরা আপত্তি করতে পারি না।

অনেকটা ঝিম মেরে বসে থেকেই আমরা সময় কাটিয়ে দিলাম। এবার যেতে হবে। উঠে এসে আমরা প্রত্যেকে আবার লোকটার কপাল ছুঁয়ে দেখলাম। আমরা সঠিক জেনে নিতে চাই লোকটা সত্যিই অসুস্থ কিনা। যদি অসুখের ভান করে ঘাপটি মেরে থাকে, তাহলে এই দণ্ডেই আমরা ওকে লাথি মেরে বার করে দেবো।

না। গা এখনো গরম আগুন। এখনও জ্ঞান নেই। নিজের গা কেউ ইচ্ছে করে গরম করতে পারে না!

আমরা বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি দেখে মনোরমা জিজ্ঞেস করলো, এ এমনিই শুয়ে থাকবে? রাত্তিরে খাবে টাবে না কিছু?

রতন বলল, খাওয়ার আর ক্ষমতা নেই।

—ও রতনদা, যদি লোকটা মরে-টরে যায়?

—আরে না। মরা অত সহজ নাকি? জ্বর হলে কেউ মরে না। লোকটা থাক এ রকম শুয়ে। সকাল হলে বিদায় করে দিবি।

আমরা বেরিয়ে এলাম। মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে খিল লাগালো। আমাদের চারজনেরই মনের মধ্যে অস্বস্তি। আমরা মনোরমার গার্জেন; আর রাত্তিরবেলা তার কাছে আমরা অচেনা লোককে রেখে এলাম। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী?

একটু বাদে জিতেন বলল, লোকটা কে? চোর ছ্যাঁচোড় না তো?

পরাণ বললো, দেখে তো তা মনে হয় না।

—আরে রাখ রাখ! চেহারা দেখে কী আর মানুষ চেনা যায়? বড় বড় শহরের চোরদের চেহারা ওরকম ভদ্দরলোকের মতনই হয়।

—তা শহরের চোর জগুদার চায়ের দোকানে কী চুরি করতে আসবে?

—রাজবন্দি নয় তো? জেল-টেল থেকে পালাতে পারে!

—লোকটা নাম বলে নি, ধাম বলে নি! কোথা থেকে এলো!

—পুলিস-টুলিসের হাঙ্গামা হবে না তো!

রতন থমকে দাঁড়ালো। চিন্তিত ভাব করে বলল, আমাদের কারো আজ রাতে মনোরমার কাছে থাকা উচিত ছিল। যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়—

আমরা বাকি তিনজন তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে ওকে বিঁধলাম। রতনটা স্বার্থপরের মতন কথা বলছে। আমাদের প্রত্যেকেরও

কি সেই ইচ্ছে হচ্ছে না? মনোর বিপদের সময় তার পাশে বুক পেতে দাঁড়াতে কী আমরা চাই না? কিন্তু এ কথাও জানি, আমাদের মধ্যে একলা কেউ মনোর সঙ্গে সারারাত থাকলে সে একলা একলা আনি মানি জানি না খেলা খেলবে। তাতে আমাদের বাকি তিনজনের বুক জ্বলে যাবে না।

রতন আমাদের তীক্ষ্ণ চোখ দেখে থতমত খেয়ে গেল। আবার চলা শুরু করে সে বলল, বাড়ি না ফিরলে বউ কি আমাকে ছাড়বে? নিজেই ছুটে আসবে হয়তো। জানে শনিবার এই সময়টা কোথায় থাকি।

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমাদেরও ঘরে বউ ছেলে-পুলে আছে। অশান্তি এত বেশি আছে যে আর বেশি অশান্তি ডেকে এনে কোনো কাজ নেই। মনোরমার কাছে যদি রাত্রে থেকে যাই, তাহলেই বাড়িতে অশান্তি। মনোর কাছে কেউ একা এলো কিনা, সেটা দেখবার জন্যে আমরা বাকি তিনজন তক্কেতক্কে থাকি। মনোরমা আমাদের চারজনের একা কারুর না।

রোববারটা আমাদের চারজনেরই ছুটি। সকালবেলা বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে আমি চলে এলাম জগুদার দোকানে। আর তিনজনও এসে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। যেন আগে থেকে ঠিক করাই ছিল।

চায়ের জন্যে তখন আর কোনো খদ্দের আসে নি। শুধু আমরাই চারজন। সেই লোকটা টেবিলের ওপর নেই।

—ও মনো, মনোদিদি!

—কোনো সাড়াশব্দ নেই। পিছনে রান্নাঘর। অন্যদিন তো উনুনে আঁচ পড়ে যায় এই সময়। সেখানে উঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরের মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মনোরমা। আবার আমাদের ডাক শুনে সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলো। চোখ মুছে বললে, তোমরা এসে গেছ!

—তুই এখানে ঘুমোচ্ছিস কেন?

—ঘুমুচ্ছিলাম কোথায়, শুয়ে ছিলাম। সারারাত একটু ঘুমুতে পারি নি। আমার এত ভয় করছিল।

আমরা অবাক। মনোরমার ভয়? তাকে আমরা কোনোদিন এ রকম কথা বলতে শুনি নি। বলি, কেন মনোদিদি, ভয় করছিল কেন? কী হয়েছে?

মনোরমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বলল, সারারাত লোকটার বুকের মধ্যে ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছিলো, আর মাঝে মাঝে মা মা বলে ডেকে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, ও বুঝি যে-কোনো সময় মরে যাবে। এই রকম একটা লোককে তোমরা এখানে রেখে গেলে কী আক্কেলে। আমার কথাটা ভাবলে না?

ভেবেছিলাম মনো, আমরা তো সারারাতই তোর কথা ভেবেছি। পাশে শোয়া রোগা বউ, ছেলেমেয়েগুলোর চ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না, এর মধ্যেও তো আমরা তোর কথাই ভাবি। তুই ছাড়া আমাদের কী আর আছে! কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও আমরা একলা কেউ তো এখানে থাকতে পারি না। তা লোকটা গেল কোথায়? চলে গেল?

—কোথায় যাবে? দেখো গে শুয়ে আছে আমার ঘরে।

—তোর ঘরে? নিজে নিজে উঠে গেল? তাহলে তো মানুষটা অতি বদ!

—নিজে নিজে যাবে কেন। সে শক্তি কি আছে? রাত্তিরবেলা অমন ঘড়ড় ঘড়ড় করছিল, আমার ভয় হল যদি টেবিল থেকে উল্টে পড়ে যায়? তাহলে তো সেই অবস্থাতেই মরবে—তখন আমারই তো হাতে দড়ি পড়বে।

আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে উঁকি দিলাম মনোরমার ঘরে। যে-বিছানায় জগুদাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেইখানে, ঠিক সেই রকম হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। আমাদের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো একবার। সত্যি মরে গেছে নাকি?

পরেই বুঝলাম, না। নিশ্বাসে বুক উঁচু নিচু হচ্ছে। লোকটার কপালে জলপটি।

মনোরমা যত্ন করে তার গায়ে একটা চাদর টেনে দিয়েছে।

মনোরমা নিজেই একে পাঁজাকোলা করে তুলে এনেছে টেবিল থেকে। মনোরমার সে শক্তি আছে। লোকটিকে কিন্তু এখানে মানায় না। ঠিক যেন মনে হয় গরিবের ঘরে এসে ঘুমিয়ে আছে কোনো রাজপুত্তুর।

কিন্তু এ কতক্ষণ এখানে আরাম করে ঘুমোবে। একটু পরেই লোকজন আসবে।

ব্যাপারটা জানাজানি হলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে। যা হোক একটা কিছু বলে দিতে তো মানুষের জিভে আটকায় না—

আমরা চারজন দরজার কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। কে আগে লোক-টিকে ডাকবে ঠিক করতে পারছি না। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এমন সময় লোকটি নিজেই চোখ মেললো।

আমাদের চারজনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, আমি কোথায়?

রতন বললে, আপনার অসুখ করেছে।

—আপনারা কারা।

পরাণ বললে, কাল আমরাই তো আপনাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে গেলাম, মনে নেই?

—ও। কিন্তু এটা তো বিছানা।

—হ্যাঁ, বিছানা। এটা চায়ের দোকানের মালিকানির বিছানা।

রতন লোকটির কপালে হাত রেখে বললে, এখনো তো বেশ জ্বর আছে দেখছি। তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়। আপনি হাসপাতালে যেতে পারবেন?

লোকটি বললে, কোনো দরকার নেই। আমি খানিকটা বাদে ঠিক হলে আপনা আপনি চলে যাবো। আমি যে এখানে আছি, সে কথা কারুকে বলার দরকার নেই।

—কেন? আপনি কে।

লোকটি হাতজোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন। আমি কোনো খারাপ লোক নই। আমার পরিচয় এখন জানাবার অসুবিধে আছে।

কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের সঙ্গে হাতজোড় করে কথা বললে আমাদের গা চিড়চিড় করে। এ রকম ন্যাকাপনা আমার একদম সহ্য হয় না। দরকারের সময় হাতজোড় আবার অন্য সময় চোখ রাঙানো, এসব আমরা ঢের দেখেছি। কিন্তু লোকটির মুখের ওপর কোনো কথা বলতে পারলাম না। লোকটি এমনভাবে কথা বলছে, যাতে মনে হয়, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে; বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে।

বাড়িতে বাজার করে নিয়ে যাবার কথা। আর তো বেশি দেরিও করা যায় না। হপ্তায় এই একটা দিনই তো নিজের হাতে বাজার করা।

বেরিয়ে এসে দেখি, মনোরমা রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে ফেলেছে। দুধ জ্বাল দিচ্ছে। আমাদের দেখে বলল, তোমরা একটু বসো গো। চায়ের জল এবার চাপাবো। কেমন দেখলে?

—এখনো তো বেশ জ্বর।

—কাল কিছু খায় নি। এখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দিই, কি বল?

—দে, তাই দে!

চা-টা খেয়েই আমরা দৌড় লাগালুম। সেদিন সারাদিনে আর চায়ের দোকানে যাওয়া হল না। কারখানা বন্ধ থাকলে আর এত দূরে বারবার আসা হয় না। রবিবারে এই জন্যই এ দোকানে খদ্দের খুব কম থাকে।

এরপর দিন তিনেকের মধ্যেও লোকটি গেল না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বুকে অসহ্য ব্যথা। রতনের ধারণা ওর নিমোনিয়া হয়েছে। জিতেনের ধারণা, ক্ষয়কাশ। এসব ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে মনোরমার কী থাকা উচিত। কিন্তু মনোরমা দিনরাত সেবা করছে লোকটাকে। এমন কি দোকান চালাবার দিকেও তার মন নেই, খদ্দেররা চায়ের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে যায়। এমন কি আমরা যে মনোরমার গার্জেন, আমাদের দিকেও তার নজর নেই আর। আমরা কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তা বলে কী লোকটাকে মরে যেতে দেবো। একটা ভদ্দরলোকের ছেলে, সে কি আমার হাতে জল খেয়ে মরতে এসেছে? তোমাদের মায়া হয় না!

রতন এক কবিরাজের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ এনে দিয়েছে। কথাটা সে আমাদের কাছ থেকে গোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের নজর এড়াবার উপায় নেই। ধরা পড়ে গিয়ে সে বলল, বুঝলি না, ওকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলে বিদায় করতে পারলে তো আমাদেরই সুবিধে। নইলে, মনো যেমন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে, তাতে দোকানটাই না উঠে যায়!

জিতেন বলল, আজ বটতলায় শুনলাম, দুটো লোক বলাবলি করছিল যে জগুদার চায়ের দোকানে কে একটা লোক নাকি লুকিয়ে আছে। এখন এ কথাটা চাউর হয়ে গেলেই তো বিপদ!

আমরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম। সত্যি তো বিপদের কথা। লোকটা নিজের পরিচয় জানাতে চায় না। আমরা মনোরমার বিপদে-আপদে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু মনোরমাকে এই বিপদ থেকে কী করে বাঁচাবো?

পাঁচদিনের মাথায় লোকটা অনেকটা সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। এর মধ্যে গত দুদিন মনোরমা চায়ের দোকান বন্ধই রেখেছিল। সবাই জানে, মনোরমার অসুখ। শুধু আমরা আসল ঘটনাটা জানি। আমরা চুপিচুপি সন্ধের দিকে একবার এসে খবর নিয়ে যাই। সে সময় মনোরমা আমাদের চা খাওয়াতেও ভুলে যায়।

লোকটা বিছানায় উঠে বসেছে, আমরা দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম। মনোরমা ঘরের কোণে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটার মুখের দিকে।

লোকটা আমাদের দেখে বলল, আসুন, এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম মনে হচ্ছে।

আমরা চারজনে ঘরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আমাদের বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ। লোকটা তাহলে এবার বিদায় হবে। আবার শনিবার এসে গেছে, আবার আমরা মনোরমাকে নিজেদের করে পাবো।

লোকটা মনোরমার দিকে তাকিয়ে বলল, এঁর সেবাতেই বেঁচে গেলাম। এঁর শরীরে খুব দয়া-মায়া আছে। নইলে, আমি অচেনা-অজানা লোক।

মনোরমার শরীরে যে দয়া-মায়া আছে, এ কথা আমরা প্রথম অন্য কারুর মুখে শুনলাম। সবাই জানে, দুর্দান্ত রাগী আর জাঁদরেল। অবশ্য মনোরমা কী রকম সে কথা আর আমাদের বলতে হবে না। দয়া না থাকলে সে আমাদের কারুর পায়ে ঝিঁঝি ধরলে হাত ধরে টেনে তোলে?

লোকটি বলল, এর ঋণ কী করে শোধ করে যাবো, জানি না। আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই—

মনোরমা ঝংকার দিয়ে বলল, থাক আপনাকে আর ঋণ শোধের কথা চিন্তা করতে হবে না; এখনো হাঁটতে গেলে পা টলটল করে—

লোকটি বলল, তবে, আমি উপকার ভুলি না। একদিন ঠিক আবার ফিরে আসবো। যদি বেঁচে থাকি—

—সে তো পরের কথা। এখন আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে? আগে খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করুন।

লোকটা বলল, তা মন্দ না। বেশ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করে তারপর আমি এই রেস্টুরেন্টে বয়ের কাজও করতে পারি। লোককে চা দেবো, কাপ ডিশ ধুয়ে দেবো—

পরদিন আমরা গিয়ে দেখি, দোকান খোলা, কিন্তু একজনও খদ্দের নেই। ক্যাশ কাউন্টারে মনোরমা একা বিমুখ হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেও একটা কথা বললে না।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেল? সেই লোকটা কোথায় গেল?

মনোরমা ডান হাতখানা হাওয়ায় ফেরালো শুধু?

—কী হয়েছে, মনো দিদি? হলটা কী?

মনোরমা চেঁচিয়ে ধমকিয়ে বলল, চলে গেছে। সে চলে গেছে।

আমাদের আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে করছিল। চলে গেছে তো আপদ গেছে!

—আবার চায়ের দোকানের বয় হবার কথা বলছিল! রাজপুত্তুরের মতো চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানে বয়গিরি, যতসব ন্যাকাপনা কথা?

—কখন গেল? কী করে গেল?

—সে কি আমাকে বলেছে? একবার ঘুণাক্ষরে জানতেও দিলে না। আমি তাকে একলা রেখে একটু খালপাড়ে চান করতে গেছি—ফিরে এসে দেখি সে নেই। যে মানুষটা ভালো করে হাঁটতে পারে না, সে এমনি এমনি চলে গেল!

—নিশ্চয়ই ওর মতলব ভালো ছিল না। কিছু নিয়ে টিয়ে যায় নি তো?

—ও মনোদিদি, সে কিছু চুরি করে নি তো?

মনোরমা বলে, অহ তোমরা চুপ করবে, আমার ভালো লাগছে না। কী এমন হাতি ঘোড়া আছে আমার, যে সে নেবে!

ধমক খেয়ে আমরা চুপ করে গেলাম।

তারপর শনিবার এলো, কিন্তু মনোরমা আর গাইলো না। নাচলো না। আমাদের আনি মানি জানি না খেলা হল না। মনোরাম আর সেই মনোরমা নেই, সে আর আমাদের গ্রাহ্য করে না। ঠায় চুপচাপ বসে থাকে। এমনি করেই দিনের পর দিন যায়। আমরা বুঝতে পারি, সেই লোকটা অন্য কিছু চুরি না করলেও, সম্পূর্ণ চুরি করে নিয়ে গেছে মনোরমার মন। সেই মনটার চেহারা যে কী রকম তা আর কখনো বুঝি নি।

রতন একবার সাহস করে বলেছিল, ও মোন, সে লোকটা চলে গেল বলে তুই কত দিন আর এমনি করে থাকবি? দোকানটা যে যায়।

মনোরমার চোখের কোণে জল আসে। সে আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু সে যে আবার ফিরে আসবে বলেছে!

ওসব শহুরে লোকের ন্যাকাপনা কথা। এর কি কোনো দাম আছে? একথা আমরা মনোরমাকে বোঝাই কি করে?

যদি সম্ভব হতো, আমরা লোকটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসতাম এখানে। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজতে যাবো? আমাদের কারখানায় যে-কোনোদিন লক আউট হতে পারে, এখন একটি দিনও কাজ কামাই করতে ভরসা হয় না।

তবু রাগে আমাদের গা জ্বলে যায়। আমাদের আর কিছু নেই। সংসারেও শুধু নেই, নেই, নেই। আমাদের ধর্মেন্দর হেমা মালিনী নেই, বাকি পৃথিবীর কিছুই জানার দরকার নেই। শুধু আমাদের মনোরমা ছিল কিন্তু সেই লোকটা, রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, শহুরে মানুষ—ওদের তো কত কিছু আছে, কত রকম আমাদের আর রঙ্গ রস। তবু সে কেন আমাদের মনোরমার মনটা কেড়ে নিয়ে গেল?

ঘুমন্ত

দরজায় ছিটকিনি লাগাবার পর ঘুরে দাঁড়ালেন সুমিত্রা। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায় হেলান দিয়েই। তাঁর চোখের সামনে মেলে রেখেছেন সকালবেলার পুরনো কাগজটা। কিন্তু তাঁর মুখ তখনো উত্তেজনায় রক্তাভ। একটু বাদে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। সুমিত্রা তখনো সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী?

সুমিত্রা বললেন, তোমার লজ্জা করে না?

অনুপম লজ্জার বদলে আরও রাগ দেখিয়ে বললেন, তুমিই তো বেশি বেশি আস্কারা দাও! দিন দিন একেবারে কথার অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে!

—তা বলে অতবড় ছেলেকে তুমি ওই রকম ভাবে মারবে?

অনুপম উত্তর না দিয়ে আবার কাগজ পড়ায় মন দিলেন। আসলে তিনি এখন খানিকটা অনুতপ্ত বোধ করছেন। কিন্তু সেটা স্বীকার করবেন না। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ রাগ এসে যায়। ব্লাড প্রেসারটা বাড়ার পর এই রকম হয়েছে।

সুমিত্রা এগিয়ে এসে ফস করে খবরের কাগজটা ফেলে দিলেন মাটিতে।

অনুপম একটা হতাশ ভঙ্গি করে বললেন, তাহলে আলো নিভিয়ে দাও, শুয়ে পড়ি।

সুমিত্রা বললেন, ছেলেটা বোধ হয় আজ সারারাত ঘুমোবে না।

অনুপম বললেন, ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে এক সময়। মাঝে মাঝে একটু শাসন করা ভাল।

—তাবলে তুমি ওইরকম ভাবে মারবে? যদি একটা চোখ নষ্ট হয়ে যেত? কিংবা কোন হাড় ভেঙে যেত?

—আর এই বয়েসের ছেলে...এর মধ্যেই রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরবে? ভেবেছো কী?

—তুমি কখনো ওই বয়েসে দেরি করে বাড়ি ফেরো নি?

ছেলের বয়েস উনিশ। কলেজে পড়ে। সাধারণত সে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। কোনোদিন যদি সাড়ে আটটা নটা হয় তাহলে সে আগে থেকে বলে যায়। আজ কিছুই বলে যায় নি। দশটার মধ্যে এ বাড়ির খাওয়া দাওয়া চুকে যায়। সাড়ে দশটার পরও শান্তনু ফিরল না। তার কয়েকজন বন্ধুর বাড়িতে টেলিফোন করা হল। তারা সবাই বাড়িতে আছে, শান্তনুর খবর তারা জানে না। অনুপম আর সুমিত্রা উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। এগারোটা বেজে যাবার পর অনুপম জামা গায়ে দিয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তখন ফিরল শান্তনু।

তাও যদি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাবা মায়ের কাছে সবিস্তারে দেরির কারণ বর্ণনা করত, তাহলে এতটা রাগ হত না। এমন কি কোনো মিথ্যে গল্পও তো বলতে পারত। 'জানো মা, আজ একটা সাঙ্ঘাতিক কান্ড হল এমন একটা অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছিল...'এ রকম কিছু বললেই সে কাজের জন্য ক্ষমা পেত। কিন্তু সেসব কিছু করল না। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটিও কথা না বলে সে চলে গেল বাথরুমে। সেখান থেকেও বেরুলো অসহ্য দেরি করে। খাওয়ার টেবিলে তখন সুমিত্রা আর অনুপম অধৈর্য-ভাবে অপেক্ষা করছেন। জামা প্যান্ট ছেড়ে শান্তনু এসে খাওয়ার টেবিলে বসল নিঃশব্দে।

তখন অনুপম জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর এত দেরি হল কেন?

এবারেও সবিস্তারে কোন কৈফিয়ত দিল না শান্তনু। মুখ নিচু করে বলল, এই একটু দেরি হয়ে গেল।

—একটু মানে? এগারোটা বেজে গেছে।

শান্তনু চুপ।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—এই এক জায়গায় গিয়েছিলাম।

—এক জায়গায় মানে কোথায়?

শান্তনু চুপ।

অমনি অনুপমের মেজাজে আগুন ধরে গেল। কথাগুলো যেন গ্রাহ্যই করছে না শান্তনু, উত্তর দিচ্ছে দায়সারা ভাবে। সে কি বলতে পারত না, 'বাবা, আজকের মতন ক্ষমা কর, হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার চলে গিয়েছিলাম...কিংবা ময়দানে বসে গল্প করছিলাম। খেয়াল করিনি যে এত রাত হয়ে গেছে...। কেন সে গোঁজ হয়ে রইল?

ভাত মাখতে শুরু করেছিলেন অনুপম। সেই এঁটো হাতেই খুব জোরে দুটো চড় কষালেন ছেলের গালে। এর পরও যদি শান্তনু শব্দ করে কেঁদে উঠত কিংবা বলত, 'বাবা, আর মেরো না, আর কোনোদিন দেরি করব না',

তাহলেও হয়তো অনুপমের রাগ পড়ে যেত। কিন্তু তা করল না ছেলে, গোঁয়ারের মতন মুখ নিচু করে রইল নিঃশব্দে। অনুপমের আর জ্ঞান রইল না। দুম দাম করে এলোপাতাড়ি মারতে মারতে বলতে লাগলেন, 'অসভ্য ছেলে...এত রাত পর্যন্ত...এর মধ্যেই...আরও পরে কী না যেন হবে...মেরেই ফেলব...বল, বল, কোথায় গিয়েছিলি...দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল...'

সুমিত্রা বাধা দিতে যান নি, স্থির হয়ে বসেছিলেন। স্বামীর মেজাজ তিনি জানেন। শান্তনু নিঃশব্দে মার খাচ্ছিল, এক সময় শুধু সে বলে উঠল, 'আঃ'! তার ঠিক ডান চোখের ওপর অনুপমের একটা থাপ্পড় পড়েছে। থালা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে উঠে চলে গেল বাথরুমে। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অনুপম তখন হাঁপাচ্ছিলেন। একটু দম নিয়ে আবার বললেন, এঃ, আবার রাগ দেখিয়ে চলে যাওয়া হল...দেখাচ্ছি আজকে কত রাগ...

এবার সুমিত্রা স্বামীকে বাধা দিয়ে বললেন, তোমাকে উঠতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

ছেলে বিছানায় শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। সুমিত্রা পাশে গিয়ে বসে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীর স্বরে বললেন, দেখি, চোখটা দেখি।

শান্তনু নিঃশব্দ।

—খোকন। চোখটা একটু দেখতে দে। বেশি লেগেছে?

—না।

—ব্যথা করছে? একটু ওষুধ লাগাবি?

—দরকার নেই।

—দেখি না একটু চোখটা।

—না।

সুমিত্রা এবার জোর করে ছেলের মুখটা ঘুরিয়ে আনলেন নিজের দিকে। চোখটা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি নিশ্চয়ই, তাহলে চোখটা বুজে যেত।

—তোমার বাবার মেজাজ আজকাল হঠাৎ...

—তুমি যাও।

—তুই খাবি না?

—না।

—একটু কিছু খেয়ে নে।

—না।

—কেন, খেয়ে এসেছিস?

—হ্যাঁ।

—তাহলে খেতে বসেছিলি যে? নিশ্চয়ই খিদে আছে। সামান্য কিছু খেয়ে নে।

—বলছি তো খাব না।

—কোথায় গিয়েছিলি রে?

—বলব না।

—কেন?

—এখন তুমি যাও।

—কোথায় গিয়েছিলি বলবি না কেন? আমাকেও বলবি না?

—কেন, সব কথাই তোমাদের বলতে হবে?

সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রায়। এই তাঁর ছেলে শান্তনু, তার স্তন্য পান করে বড় হয়েছে, কতদিন পর্যন্ত...দশ-এগারো বছর বয়েস পর্যন্ত সুমিত্রা ওকে স্নান করিয়ে দিয়েছেন, এই সেদিন পর্যন্ত মাকে ঘিরেই ছিল ওর সম্পূর্ণ জগৎ...স্কুল থেকে ফিরেই গলগল করে বলত কোন কোন ছেলে ওকে কী বলেছে, মাস্টার মশাইরা কে কী রকম...এমন কি যে-কোন বই পড়েও সেই গল্প মাকে শোনান চাই...সেই ছেলে আজ বলছে, সব কথাই তোমাদের বলতে হবে? যেন বাবা-মা আর শান্তনু দুটো আলাদা দল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এসেছিলেন সুমিত্রা। অনুপম তখনো খাবারের থালার সামনে চুপ করে বসেছিলেন। সুমিত্রাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও এল না?

—না, ও খাবে না। তুমি খেয়ে নাও।

—কেন, খাবে না কেন? বেশি বেশি তেজ! দাঁড়াও, আমি দেখছি।

—তোমাকে আর কিছু দেখতে হবে না। তুমি নিজে খাও। এখন স্ত্রীর গলার গাম্ভীর্য টের পেয়ে অনুপম একটু দমে গিয়েছিলেন। আর কথাবার্তা না বলে খেয়ে নিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরও কিছু টুকিটাকি কাজ বাকি থাকে সুমিত্রার। দুই ছোট মেয়ে আলাদা ঘরে শোয়। তারা ঘুমিয়ে পড়ে রাত দশটার মধ্যে। এই গোলমালেও তারা জেগে ওঠে নি। তাদের ঘরে একবার উঁকি মেরে সুমিত্রা আবার এলেন ছেলের ঘরে। ঠিক সেই রকমই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে শান্তনু। শরীর কাঁপছে না, অর্থাৎ কাঁদছে না সে। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। আর ঘাঁটালেন না তাকে, সুমিত্রা চলে এলেন আলোটা নিভিয়ে দিয়ে।

অনুপম বললেন আলোটা নিভিয়ে দাও।

সুমিত্রা বললেন, আগে আমার কথাটার উত্তর দাও। তুমি কখনো ওই বয়েসে দেরি করে বাড়ি ফেরো নি একদিনও? সে সব কথা মনে পড়ল না একবারও? ছেলেটাকে যে অমন করে মারলে।

—না, আমরা কখনো সাহসই পেতাম না এত রাত করে বাড়ি ফেরার। বাবাকে ভয় করতাম যমের মতন।

—কোনোদিন দেরি করো নি?

—বলছি তো, না। বড্ড বেশি আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে তোমার ছেলে মাঝে মাঝে একটু শাসন করা দরকার।

—তাবলে অত বড় ছেলেকে ওরকম ভাবে মারবে?

—মারতাম না...কিন্তু এমন বখাটে হয়েছে—

—খোকন মোটেই বখাটে নয়। পড়াশুনোয় ভাল, সাজপোশাকের দিকে ঝোঁক নেই।

—কোথায় ছিল এত রাত পর্যন্ত তাও বাবা-মাকে বলবে না?

—কেন বলবে?

—তার মানে? তুমি কী বলছ মিতু?

—নিজে থেকে যদি বলত তো ভালই। জোর করে বলানো...কেন, আমরাই বা কেন জোর করব? ছেলের উনিশ বছর বয়েস হল। তার একটা আস্তে আস্তে নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়ে যাবেই—সেখানে মা-বাবার স্থান নেই। সেটাই স্বাভাবিক।

—মোটেই স্বাভাবিক নয়। ছেলে যদি কু-সঙ্গে পড়ে...তা ছাড়া আমাদের কাছে গোপন করার কী আছে, আমরা কী বাধা দিই...সরলভাবে যদি সব কিছু আলোচনা করে আমাদের সঙ্গে।

—তবু ওরা লুকোবেই...আমি...

সুমিত্রা হঠাৎ থেমে গেলেন। তার মুখে খানিকটা অপ্রস্তুত লজ্জার লালচে আভা। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, রাত বারোটা বেজে গেছে, আলো নিভিয়ে দিচ্ছি।

সুমিত্রা যখন দেয়ালের কাছে সুইচে হাত দিয়েছেন সেই সময় অনুপম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে?

সুমিত্রা টুপ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, তুমি ভাল ছেলে ছিলে, রোজ সন্ধের সময় বাড়ি ফিরতে...কিন্তু আমি একদিন—তখন আমারও উনিশ বছরেই মতন বয়েস, আমি রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরেছিলাম।

—একা?

—হ্যাঁ, একা। দুপুরে কলেজে বেরিয়েছিলাম।

—বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলে বুঝি?

—না। একজনের সঙ্গে কলেজ পালিয়ে ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখতে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সন্ধের সময় ফিরে আসব, ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা মোটে...

—কার সঙ্গে গিয়েছিলে?

—সে গিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে।

—নিশ্চয় কোন মেয়ে নয়?

—না।

—তারপর?

—হঠাৎ কী একটা গোলমালে বাস বন্ধ হয়ে গেল, একদল লোক ট্রেন লাইন অবরোধ করল, সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, ফেরার কোন উপায়ই রইল না।

—কী করলে তখন?

—আমরা ট্রেনে উঠে বসেছিলাম, মাঝ পথে ট্রেন থেমে রইল। নেমে অনেক দৌড়োদৌড়ি করলাম, ট্যাক্সি ধরার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু সব রাস্তাই বন্ধ, শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে টিয়ার গ্যাস আর লাঠি চালিয়েছিল রাত দশটার পর।

—সারারাত বাড়িতে নাও ফিরতে পারতে—

—তাও হতে পারত। কিন্তু আমি ফিরলাম রাত সাড়ে বারোটায়।

—বাড়িতে কী অবস্থা?

—মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

—তোমার বাবা সাঙ্ঘাতিক রাশভারি লোক উনি...

—আমাকে মারেন নি, বকেছিলেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। মা বলেছিলেন, মিতু, তুই শুধু সত্যি কথাটা বল কোথায় ছিলি...কিন্তু আমি সত্যি কথা বলিনি, অন্য একটা কী যেন বলেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি, সেই তখন থেকেই আমার একটা আলাদা জগৎ হয়ে গিয়েছিল, মাকে ভীষণ ভালোবাসতাম আমি, বাবাকেও কিন্তু এমন কিছু কথা থাকে যা মা-বাবাকেও বলা যায় না।

—দোষ করলে বা অন্যায় করলে তারপর সেটা মা-বাবার কাছে লুকোন মোটেই ভালো নয়। বরং সব স্বীকার করলে মা-বাবারা মোটেই বেশি রাগ করেন না।

—দোষ বা অন্যায়ের প্রশ্ন নয়। অনেক ব্যাপার আছে, যা মা-বাবাকে ঠিক বোঝানই যায় না। কারুর সঙ্গে ব্যান্ডেল চার্চ বেড়াতে যাওয়া কি দোষের? যদি সন্ধের মধ্যে ফিরে আসতাম, কেউ কিছু জানতেই পারতেন না।

কিন্তু কলেজ পালিয়ে কারুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া।

—ঠিক কলেজ পালিয়ে না, সেদিন আমাদের দুটো ক্লাসের প্রফেসর আসেন নি, মোটে একটা ক্লাসের জন্য তিনটে পর্যন্ত বসে থাকতে হত, সেটাই শুধু থাকিনি—শোন, আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, সেদিন আমি কোন অন্যায় করিনি, কিন্তু মা-বাবাকে সেটা ঠিক বোঝান যেত না... সেই ঘটনার জন্য তো আমি খারাপ হয়ে যাইনি বরং খুব আনন্দ পেয়েছিলাম সে কথা আজও স্বীকার করতে বাধ্য।

—বাঃ!

—তুমি রাগ করছ?

—এ কথা তোমার ছেলের সামনে বলতে পারবে?

—নিশ্চয়ই! আমার বয়েস তখন উনিশ, আমি তখন কুমারী মেয়ে, রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরেছিলাম—সবাই এটাকে দোষের বলবে, কিন্তু আমি জানি, আমি কোন দোষ করিনি, আর আমার ছেলে...হ্যাঁ ও যদি জানতে চায়, আমি নিশ্চয়ই আমার সেদিনের ঘটনা ওকে বলতে পারব— আজ আমি মা, কিন্তু আমারও একদিন কম বয়েস ছিল, আমার মধ্যেও দুরন্তপনা ছিল, আমিও মা-বাবাকে সব কথা বলিনি।

—ছেলে যদি জানতে চায় কার সঙ্গে গিয়েছিলে? তাও বলতে পারবে?

—অ্যাঁ? ইয়ে, হ্যাঁ, তাও বলতে পারি।

—ও, ছেলেকে যেটা বলতে পারবে, সেটা স্বামীকে বলতে পারবে না?

—তুমি জানতে চাও? আমি গিয়েছিলাম দ্বিজুদার সঙ্গে।

—দ্বিজুদা?

—হ্যাঁ, দ্বিজুদা! ওঁরও নিশ্চয়ই এখন মনে আছে। ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

—দ্বিজুদা? ওঃ হো-হো-হো-হো-হো—

অনুপম রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রচন্ড জোরে চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন। সে হাসি আর থামতেই চায় না।

সুমিত্রার বয়েস এখন তেতাল্লিশ। তিনটি সন্তানের জননী হলেও তাকে এখনো বেশি যুবতিই দেখায়। এখন একটু সেজে গুজে রাস্তায় বেরুলে তার দিকে রাস্তায় মানুষ ফিরে ফিরে দেখে। তার ছেলে শান্তনুর বেশ বড়সড় চেহারা হয়ে গেছে, একদিন কে একজন সুমিত্রাকে ভেবেছিল শান্তনুর দিদি।

আর দ্বিজুদা? উনি সুমিত্রার দাদার বন্ধু। বহুদিন ধরে দিল্লিতে আছেন, কলকাতায় আসেন প্রায়ই। অনুপমের সঙ্গে বেশ ভাল পরিচয় আছে। প্রকান্ড মোটা, সেকালের অভিনেতা চার্লস লটনের মতন চেহারা। সম্প্রতি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে মিনমিন করে কথা বলেন। পকেটভর্তি ওষুধ থাকে। কথা বলতে বলতে ওষুধ খান টপাটপ করে। সেই দ্বিজুদার সঙ্গে সুমিত্রার বেড়াতে যাওয়া কিংবা প্রেম করার কথা কল্পনাই করা যায় না।

—মিতু, তুমি আর লোক পেলে না, দ্বিজুদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলে?

—কেন? তখন দ্বিজুদা অত মোটা ছিলেন না। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, খুব ভাল গান করতেন, আর দারুণ হাসাতে পারতেন। মেয়েরা খুব পছন্দ করত ওঁকে।

—এই দ্বিজুদা?

হ্যাঁ! কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা। সময় মানুষকে কত বদলে দেয়!

—ভাগ্যিস তুমি দ্বিজুদাকে বিয়ে কর নি!

—বিয়ে করব কেন? সে প্রশ্নই ওঠেনি। তুমি কী ভাবছ, দ্বিজুদার সঙ্গে আমার সেরকম কিছু সম্পর্ক ছিল? মোটেই না। এখন যেমন তুই তুই করেন, তখনও সেই রকমই করতেন। এই সেদিন হঠাৎ কলেজের সামনে দেখা, উনি বললেন, চল সুমিত্রা, বেশ চমৎকার দিনটা আজ, কোথাও বেড়িয়ে আসি। যাবি? দ্বিজুদা প্রায়ই এখানে সেখানে বেড়াতে যেতেন, খুব ঘুরতে ভালবাসতেন। আমাকে তো আর কেউ বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়নি তখন। তাই রাজি হয়ে গেলাম। সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যে ফিরে আসার কথা ছিল, দেরি যে হয়ে গেল, তাতে তো ওঁর কোন দোষ নেই। উনি বরং অনেক চেষ্টা করেছিলেন, দ্বিজুদা খুব ভদ্রলোক ছিলেন, কক্ষনো কোন অসভ্যতা করেন নি—বাড়িতে গিয়ে যদি বলতাম, দ্বিজুদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, মা-বাবা ঠিক বুঝতেন ব্যাপারটা? ওঁরা দ্বিজুদার ওপর রেগে গিয়ে যা-তা বলতেন না? সেইজন্যই বলিনি।

—হুঁ।

—তুমি ছেলেটাকে ওরকমভাবে মারলে?

—বেশ করেছি। ছেলের অবাধ্যপনা আমি সহ্য করব না।

—কালকে ডাক্তারের কাছে গিয়ে ব্লাড প্রেসারটা একবার দেখিয়ে এস।

—আমার প্রেসার ঠিক আছে। দ্বিজুদা? হে-হে-হে-হে, এখনো হাসি পাচ্ছে, ওই বিরাট ফুটবলের সঙ্গে তুমি...হে-হে-হে...

—তখন অন্যরকম ছিলেন।

—খুব রোগা?

—না রোগা না, একটু মোটার ধাতে। তোমারও তো দু তিনজন প্রেমিকা ছিল।

—কে বলল?

—তুমিই বলেছিলে একদিন।

—ও। তোমারটা আগে বলনি কেন এতদিন?

—এটা তো প্রেম নয়। ছেলেটা আজ দেরি করে ফিরেছে বলেই মনে পড়ল।

—হুঁ।

অনুপমের গলা আগেই ভারী হয়ে এসেছিল। অবিলম্বেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। সুমিত্রা কিছুক্ষণ ছটফট করলেন বিছানায়। একটা কথা মনে পড়ছে খুব। স্বামীকে সেদিনকার ব্যাণ্ডেলে বেড়াবার ঘটনা সবই বলেছেন, শুধু একটুখানি বাদ দিয়ে। দ্বিজুদা সেদিন সুমিত্রাকে দুবার চুমু খেয়েছিলেন। গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে দ্বিজুদা বলেছিলেন, তোকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে রে, মিতু। তোকে একটু আদর করব? সুমিত্রা না, না করেছিলেন, তবু দ্বিজুদা খুব আলতো করে দুবার চুমু দিয়েছিলেন ঠোঁটে। ব্যস, আর কিছু না। সেই প্রথম সুমিত্রার চুম্বনের অভিজ্ঞতা। সে কবেকার কথা, তবু এখনো ভাবলে শিহরণ হচ্ছে তাঁর। সেটা কী কোন অন্যায় ছিল? কী এমন ক্ষতি হয়েছে? সেই অভিজ্ঞতাটা আজও মনের মধ্যে সুন্দর হয়ে আছে। সত্যি, দ্বিজুদা অনেক বদলে গেছেন।

অনুপমের সাধারণত ঘুম ভাঙে না। তবু সেদিন রাত তিনটে আন্দাজ ঘুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে দারুণ একটা অস্বস্তি যেন। একটু জল খেতে ইচ্ছে করছে। সুমিত্রাকে জাগালেন না, নিজেই উঠে পড়লেন। কিন্তু জল না খেয়ে অন্যমনস্কভাবে চলে এলেন ছেলের ঘরে। শান্তনুর ঘরে সারারাত একটা কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলে। একদম অন্ধকারে ও ঘুমোতে ভয় পায়। ছেলেবেলায় ভয় পেত, এখনো সেই ভয় কাটেনি।

পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে শান্তনু। কোন চোখটায় লেগেছিল? খুব জোরে লেগেছে? না, বেশি চোট লাগলে নিশ্চয়ই চোখটা ফুলে উঠত, ঘুমোতে পারত না। চোখের ব্যথা সাঙ্ঘাতিক ব্যথা।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। কী ভীষণ দুরন্ত ছিল ছেলেবেলায়, আর যখন তখন পয়সার জন্য আবদার করত। অফিসের কাজে অনুপমকে কোথাও বাইরে যেতে হলেই শান্তনু ফরমাস করত কিছু আনবার জন্য। সেই শান্তনু এখন কিছুই চায় না। গম্ভীর হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে। এই ঘুমন্ত ছেলেটার মনের মধ্যে কী আছে, অনুপম জানেন না। শান্তনু যেন অচেনা হয়ে গেছে।

অল্প অল্প শীত পড়েছে। অনুপম ছেলের গায়ের ওপর একটা চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর একটু সরে এসে ওর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আবার। একটু যেন চমকে উঠলেন।

একটা দৃশ্য ভেসে উঠল তার চোখে। ঠিক এই শান্তনুর বয়েসেই একদিন রাগ করে না খেয়ে শুয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর নিজের বাবা ছিলেন সাঙ্ঘাতিক রাগী। কী একটা কারণে যেন, আজ আর সেটা মনে নেই, বাবা খুব মেরেছিলেন। লাঠি দিয়ে। অনুপম তখন ঠিক করেছিলেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবেন...বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বোধহয়, ছোট কাকা জোর করে ফিরিয়ে আনলেন...বাবা সেদিন মেরেছিলেন বিনা দোষে...অন্যের মুখে কিছু একটা কথা শুনে...

আজ ছেলেকে মেরে কি নিজের বাবার ওপরেই সেদিনের প্রতিশোধ নিলেন অনুপম?

নীল পরী

বেশিদিন আগের কথা নয়। সেই সময়টা আমার খুব মন খারাপ চলছিল। মাঝে মাঝে এমন হয়, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ দারুণভাবে মন কেমন করে ওঠে দেশের জন্য, ইচ্ছে হয় এক্ষুণি ফিরে যাই, আর একদিনও থাকবো না।

সেই রকমই একদিন সন্ধেবেলা টেলিফোনে একটি অচেনা মেয়ের গলা পেলাম। রং নাম্বার নয়, সে আমাকেই ডাকছে। কোনো মেয়ের টেলিফোন এলে—তক্ষুণি খটাং করে রিসিভার রেখে দেওয়া যায় না। প্র্যাকটিক্যাল জোকের শিকার হবার সম্ভাবনা থাকলেও! বিশেষত সেই মেয়েটির গলার আওয়াজ ভারি মিষ্টি। আমি অবশ্য খুব সাবধানে কথা বলছিলুম, বেফাঁস কিছু বলে ফেলিনি! মেয়েটি নাম বলতে চায় না, কিন্তু প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তার টেলিফোনে আমি বিরক্ত হয়েছি কিনা। তা হলে সে ছেড়ে দেবে। আমি তাকে বলতে বাধ্য হলুম, না, মোটেই বিরক্ত হইনি, সে টেলিফোন করা খুশিই হয়েছি।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সত্যি খুশি হয়েছো? কেন খুশি হয়েছো? আমি তাকে বললুম, খুশি হয়েছি, তার কারণ এই নির্জন সন্ধেবেলা একটা মেয়ের সুন্দর গলার আওয়াজ শুনলেও ভালো লাগবে না, আমি কি এতই বেরসিক?

তখন সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন একা আছো? তোমার মন কেমন করছে না?

টেলিফোনের রিসিভারটা ধরে থেকেই আমি নিজের ঘরের দিকে একবার তাকালুম। শূন্য ঘরটা তখন বড় বেশি বিশাল! সব জানলায় ভারি ভারি পর্দা টানা, চারদিকের দেয়ালে অচেনা ধরনের লতাপাতা আঁকা। বিছানাটা গুটিয়ে এখন লম্বা শোফা হয়েছে। টেবিলের ওপর ছড়ানো বইকারুকার্য করা বাতি দান, পাশের ঘরে রেফ্রিজারেটরটা থেকে কিছুক্ষণ অন্তর ঘোঁ-ঘোঁ শব্দ, চৌদ্দ হাজার মাইল দূরে কলকাতা। কম্পাস দেখে আমি ঠিক করে নিয়েছি— কলকাতা কোনদিকে হতে পারে। সেইদিকের জানলার কাছে আমি এই সব নির্জন সন্ধেবেলা বসে থাকি, ক্ষীণ আশা জাগে, ওই দিকের জানলার হাওয়ায় এই চৌদ্দ হাজার মাইল দূরেও, হয়তো কলকাতার গন্ধ ভেসে আসবে।

সেই জানলার কাছে টেলিফোন। টেলিফোনে অচেনা মেয়ের ডাক, তুমি এখন একা আছো? তোমার মন কেমন করছে না? অচেনা ডাককে বিশ্বাস করতে নেই, হয়তো ছলনা, হয়তো নিশির ডাক। সুতরাং তখনও আমি মেয়েটার সঙ্গে সাবধানেই কথা বলছিলুম।

আমি বললুম, ঠিক একা নই, সঙ্গে রয়েছে অনেক বই, রেকর্ড প্লেয়ারে গানের সুর বাজছে, এরাই আমার সঙ্গী।

টেলিফোনের ওপারে চূর্ণ হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। দুষ্টু-দুষ্টু কচি গলার হাসি। বললো, তুমি কি পাগলা নাকি? কী সুন্দর মিহিন বরফ পড়ছে, এখন তোমার সঙ্গে কোনো মেয়েবন্ধু নেই? কি করে সময় কাটাচ্ছো?

এখানকার কোনো কোনো মেয়ে অনায়াসে খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করে। নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা বলতে একটুও আটকায় না। মেয়েটি অবশ্য সে-রকম কিছু বলে নি, কিন্তু এমন ভাবে আগের কথাটা বললো, যেন সন্ধেবেলা কোনো ছেলের সঙ্গে মেয়ে বন্ধু না থাকাটাই পাপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, মেয়ে-বন্ধু আর কোথায় পাবো, বলো! আমায় আর কে পাত্তা দিচ্ছে!

—আমি আছি। তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

—তুমি কে?

—নাম বলবো না। নাম জেনে কি হবে? আচ্ছা, মনে করো আমার নাম এঞ্জেল।

—এঞ্জেল? পরী? আচ্ছা, ছোট্ট পরী, তুমি হঠাৎ আমার মতো পাপীর প্রতি দয়া দেখাতে চাইছো কেন?

—তুমি কিসের পাপী?

—পাপী না হলে আর একা একা আছি কেন? একা থাকাই তো পাপ? পাপের শাস্তির জন্যই তো আমায় আমেরিকায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।

—আহা, সেইজন্যই তো তোমার কথা ভেবে আমার মায়া হলো! তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে?

—আগে বলো, তুমি আমার টেলিফোন নম্বর জানলে কি করে?

—না, বলবো না। জানো না, পরীরা সব জানতে পারে?

—তা হলে আমি দেখা করবো না। তুমি পরী হতে পারো, কিন্তু তোমাকে নিশ্চয়ই খুব বিচ্ছিরি দেখতে।

—ও মা, কি নিষ্ঠুর তুমি! কি করে তুমি জানলে আমাকে বিচ্ছিরি দেখতে?

—নইলে তুমি যদি সুন্দরী পরী হতে—তবে তুমিও এই বরফ পড়া সন্ধেবেলা একা থাকতে না! ডাকাবুকো ফর্সা ছেলেগুলো কেউ না কেউ তোমাকে আজ সন্ধেবেলা লুফে নিত।

—তুমি কিছু জানো না! আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই কারুর সঙ্গে যাইনি। আমার ইচ্ছে একজন ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আজ গল্প করবো।

—ও, আমি যে ভারতীয় তাও জানো বুঝতে পেরেছি, আমি যে শিকাগো পর্যন্ত মোটর রাইডের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সেইখান থেকেই তুমি আমার নাম আমার টেলিফোন নম্বর পেয়েছো!

—ওসব কথা থাক! তুমি আমার সঙ্গে আজ দেখা করবে কিনা বলো?

—উম-ম। ভেবে দেখি...আচ্ছা, ঠিক আছে, কোথায় দেখা হবে?

—তুমি বলো।

—না, তোমার যেখানে সুবিধে সেটাই বলো।

—জেফারসন এভিনিউতে সিয়ার্স রো-বাক-এর দোকান আছে, তার সামনে একটা ডাকবাক্স, সেখানে তুমি এসো—

—না, আমি ওখানে যাবো না। বড্ড ভিড়! তুমি এক কাজ করো বরং থার্ড স্ট্রিট আর হাই-ওয়ের মোড়ে একটা গ্যাস স্টেশন (পেট্রোল পাম্প)—তার ঠিক উল্টোদিকে একটা চেরি গাছ, তুমি তার নিচে এসে দাঁড়াও। চেরিগাছের তলাতেই এঞ্জেলকে ভালো মানাবে।

—ঠিক আছে। কি করে আমরা দুজনকে চিনবো? শোনো, আমি হচ্ছি ব্লন্ড, নীল রঙের রেন কোট পরে থাকবো, চেরিগাছটার গায় বাঁ হাত হেলান দিয়ে দাঁড়াবো। আর তুমি?

—আমার থাকবে নেভি-ব্লু রঙের স্যুট, হাতে একটা লাল মলাটের বই, আমি প্রথম বলবো, হাই—

—ঠিক আছে, এখন থেকে দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু, সন্ধে ক্রমশ ঘোর হয়ে আসছে, জানো তো, বেশি রাত পর্যন্ত এঞ্জেলরা পৃথিবীতে থাকে না।

—ঠিক আছে। আমি আসছি।

আমি তখন হাতের বইটা মুড়ে রাখলুম। ভেবেছিলুম আজ খিচুড়ি রাঁধবো, স্যামন মাছ আছে, চাকা চাকা করে কেটে ভাজলে অনেকটা ইলিশ স্বাদ। কিন্তু রাঁধতে ভালো লাগে না একদম, খেতেও পছন্দ হয় না। বর্ষাকালের রাত্রে দেশে থাকলে হয়তো খিচুড়ি আর ইলিশমাছ হতো—এখানেও প্রথম শীতের বরফ পড়া তো বর্ষাকালের মতনই। সন্ধেবেলা কোনো কিছু কাজ ছিল না, ঘন ঘন পার্টিতে যেতে ক্লান্ত লাগে—সেই একঘেয়ে কথা আর ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা হাসি—তাও ভালো লাগে না, আবার একা থাকতেও ভালো লাগে না। হঠাৎ এই মেয়েটার টেলিফোন। কি রকম মেয়ে কে জানে! বেনামি টেলিফোন করা এখানকার মেয়েদের মধ্যে একটা মজার খেলা। অনেক নতুন ছেলেকে লোভ দেখিয়ে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। তবুও আমি ভাবলুম, দেখাই যাক না। বেশি যাতে ঠকতে না হয় ওইজন্যই তো বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলুম।

নেভি ব্লু রঙা স্যুটের কথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি কালো প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে তার ওপর মোটা ওভারকোটটা চাপিয়ে নিলুম। হাতে বই-টই কিছু না। চেরিগাছটার ধারে কাছেও গেলুম না। গ্যাস স্টেশনের পাশেই একটা ছোট্ট বার। সেটায় ঢুকে এক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বসলুম দরজার কাছেই। চোখ রইলো রাস্তার ওপারে চেরিগাছটার দিকে।

নিঃশব্দে হালকা পেঁজা তুলোর মতন তুষার ঝরে পড়ছে। এই তুষারপাতের সময় চারদিক বড় নিঃশব্দ। বিরাট বিরাট মোটর গাড়িগুলো দুর্দান্ত বেগে ছুটে যায়, তবু শব্দ পাওয়া যায় না। যেদিকে তাকাই শুধু সাদা। এই সাদা রং আর শব্দহীনতা—এই সময় মানুষের বুকের ভেতরটা আরও বেশি ফাঁকা হয়ে যায়। নইলে আমিই বা কেন বোকার মতন উড়ো টেলিফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবো!

রাস্তার ওপর কয়েক ইঞ্চি পুরু বরফের চাদর জমেছে। সবাই হাঁটছে পা টিপে টিপে। মেয়েদের পোশাক লাল-নীল-গোলাপি, পুরুষরা সবাই প্রায় কালো কোট, —সাদা পটভূমিকায় এই সমস্ত চলন্ত রং মাঝে মাঝে ভেসে যাচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে, আকস্মিক হাসি, ছাত্রদের দল, কিশোরী মেয়ের স্রোত—সবাই চলে যাচ্ছে, কেউ থামছে না।

চেরিগাছটার সব প্যাতা ঝরে গেছে, সেটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না, তলায় দাঁড়ানো দূরের কথা। মেয়েটা ঠকিয়েছে আমাকে।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে আমি সেই বার থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেরিগাছটার দিকে লক্ষ্য রাখলুম আড়চোখে। আর দশ মিনিটের মধ্যেও কোনো নীল বর্ষাতি জড়ানো পরী সেই গাছের নিচে দাঁড়ালো না। খুব বোকা বানিয়েছে!

ক্রমশ এমন মেজাজ খারাপ হতে লাগলো যে আমি সমস্ত শ্বেতাঙ্গিনীদের ওপর অসম্ভব রেগে গেলুম। যত রাজ্যের নির্লজ্জা বেহায়া সব মেয়ে। যার তার সঙ্গে খালি হৈ-হৈ করে বেড়ায়, মনের মধ্যে একটুও গভীরতা নেই, শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না! রাক্ষুসী এক একটা! আমাদের ভারতীয় মেয়েরা কত ভালো। কি শান্ত আর নম্র। এ রকম ক্যাটকেটে ফর্সা রং আর গুন্ডার [illegible] না হলে কি হয়, তারাই তো আসল সুন্দরী। এর চেয়ে অরুণাকে ফোন করলেই হতো! অর্থাৎ তখন আমার মনের অবস্থা অনেকটা তুষারের মতন!

রাগে গজরাতে গজরাতে বাড়ি ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন। তুললুম, মেয়েলি গলায়, হ্যালো! প্রচন্ড ধমক লাগাতে যাচ্ছিলুম, ওপাশ থেকে বাংলায় কথা ভেসে এলো, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে? আমি মমতা বৌদি...

অর্থাৎ বটানির রিসার্চ স্কলার অরুণ মুখার্জির স্ত্রী। আমাকে খুব খাতির করেন, কেননা আমার কাছে প্রায়ই বাংলা পত্র-পত্রিকা আসে—সেগুলো আমি ওঁকে পড়তে দিই। আর একটু হলে ওঁকেই ধমকে দিতে যাচ্ছিলুম!

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে বললুম, আটটা বাজে, এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে যাবে, আমি কি সাহেব হয়ে গেছি নাকি? রান্নাই হয় নি।

—তাহলে আর রান্না করতে হবে না। আমাদের বাড়ি চলে আসুন, দেশ থেকে আজ মুগের ডালের পাঁপর আর আচার এসেছে। আজ খিচুড়ি রেঁধেছি, আর স্যামন মাছভাজা—

—বউদি, আপনি কি মন্ত্র জানেন, আজ আমারও বিষম খিচুড়ি-মাছভাজা খেতে ইচ্ছে করছিল! কি করে আপনি টের পেলেন আমার মনের কথা?

—আমাদের সকলেরই মন যে এক সুতোয় বাঁধা!

—আপনার মমতাময়ী নাম এই জন্যই সার্থক!

—আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, আপনার দাদা যাচ্ছেন গাড়ি নিয়ে, আপনাকে তুলে আনবেন।

তৈরি হওয়া আর কি, আমি তো বাইরে যাবার পোশাক পরেই ছিলুম। মমতা বৌদির জন্য দুএকখানা মাসিক পত্রিকা খুঁজতে লাগলুম। খেতে-খেতেই আমার বই পড়া অভ্যেস, অধিকাংশ নতুন বই রান্নাঘরের টেবিলেই থাকে।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখলুম, আমি গ্যাস স্টোভের চাবি ঘোরাতে ভুলে গিয়েছিলুম। দুপুর থেকেই সেগুলো জ্বলছে। গরম জলের কলটাও খোলা রয়েছে, সেটা থেকে অবিরাম জল পড়ছে। এ মাসে জল আর গ্যাসের কত বিল উঠবে কে জানে!

খুবই অন্যমনস্ক ছিলুম সেদিন সারাদিন, বুঝতে পারিনি—আসলে আমার মন খারাপ ছিল। দেশ থেকে তিন সপ্তাহ কোনো চিঠি আসে নি। ভাগ্যিস মমতা বৌদি ডাকলেন—তবু খানিকটা আড্ডা মারা যাবে—নইলে বাকি সন্ধেটা অসহ্য লাগতো। তার ওপর আবার ডাকিনী-যোগিনীদের ওই টেলিফোনে ইয়ার্কি। মমতা বৌদির ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো।

কয়েক মিনিট পরেই আবার টেলিফোনের ঝনঝন। এবার নির্ভুল সেই মেয়েটির কণ্ঠ। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি রাগ করছো?

আমার চোয়াল কঠিন হয়ে এলো, রুক্ষ গলায় বললুম, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করছো? মজা করতে হয় তুমি তোমাদের আমেরিকান ছেলেদের নিয়ে করো না! আমাকে কেন? আমাকে এতো বোকা পাওনি যে তোমাদের বদমাইশিতে ভুলবো! আমি মোটেই ও জায়গায় যাইনি।

—হ্যাঁ গিয়েছিলে।

—না যাইনি!

—হ্যাঁ গিয়েছিলে, আমি জানি।

—তার মানে?

—তোমাকে আমি দেখেছি।
—অসম্ভব। কি করে...
—রাগ করো না। জানো, এঞ্জেলদের উপর রাগ করতে নেই। শোন তোমাকে বলছি ব্যাপারটা, তোমাকে যখন ফোন করি, আমার দুজন মেয়েবন্ধু তখন পাশে ছিল, ওরাও মজা দেখার জন্য আমার সঙ্গে যেতে চাইলো। তাই আমি চেরিগাছের নিচে দাঁড়াই নি, দূরে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি আমাদের দেখতে পাওনি কিন্তু আমরা তোমাকে দেখেছি।
—আমাকে কি করে দেখলে? আমি চেরিগাছের কাছাকাছি যাই-ই নি!
—তুমি কি সরল! তুমি আমাদের চিনতে পারতে না, কেননা আমাদের মতন মেয়ে আরও অনেকে যাতায়াত করছিল, কিন্তু তুমি তো ওখানে একমাত্র ভারতীয়। ও রাস্তায় তো তখন আর কোনো ভারতীয় ছিল না, তুমিই শুধু... তুমি সিগারেট টানতে টানতে গাছটার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলে।
—আচ্ছা বেশ তো, আমাকে ঠকিয়ে খুশি হয়েছো তো? এবার আর কি চাই?
—না, তোমাকে ঠকাবার আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। আমার বন্ধুদের জন্যই—শোনো, আমি তোমার বাড়ি দেখে নেয়েছি তোমাকে ফলো করে, তোমার বাড়ির খুব কাছ থেকে কথা বলছি, আমি তোমার ঘরে একবার আসবো?
—আমার ঘরে? না, অসম্ভব!
—কেন। প্লিজ, একবার!
—বাজে বোকো না। তোমার কি মতলব বলো তো? আমাদের এ বাড়ির অ্যাপার্টমেন্টে মেয়েরা আসে না।
—কেন, মেয়েরা এলে কি দোষ? আমি এক্ষুনি আসছি।
—না, আমি বাড়ি থাকবো না। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।
—তুমি মিথ্যে কথা বলছো।
—না, মিথ্যে না, আমাকে নিতে এক্ষুনি গাড়ি আসবে।
—আমি তার আগেই...আমি আসছি।

মেয়েটি ঝন করে কানেকশান কেটে দিল। আমি উৎকণ্ঠিত ও বিব্রত হয়ে রইলুম। সত্যি সত্যি যদি মেয়েটা এসে পড়ে, আর তারপর মুখার্জিদা এসে আমার ঘরে মেম দ্যাখে, তা হলে কালকেই এই ছোট্ট শহরের ভারতীয়দের মধ্যে রটতে দেরি হবে না। যত ঝামেলা! প্রথম থেকেই সাবধান হলে ভালো হতো।

আমাকে প্রচুর স্বস্তি দিয়ে দুমিনিট বাদেই বাড়ির বাইরে মুখার্জিদার গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো। একটুও দেরি না করে, কোনোক্রমে পত্রিকাগুলো হাতে তুলে আমি ঝপাস করে দরজা টেনে দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম।
মুখার্জিদা গাড়ির দরজা খুলেই রেখেছিলেন, ঢুকে পড়তেই স্টার্ট দিলেন। খানিকটা এগিয়ে এসে বললেন, কি রে গাঙ্গুলি, আজকাল মেম-টেমদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস নাকি?
আমি সচকিত হয়ে বললাম, কেন বলুন তো?
—দেখলুম, তোদের বাড়ির দরজা দিয়ে একটা মেয়ে ঢুকছে। আমার গাড়ির হর্ন শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে গেল।
আমি তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার পিছন দিয়ে চেয়ে বললুম, কই কই, কোন মেয়েটা?
মেয়েটাকে একবার চোখে দেখার কৌতূহল আমার খুবই ছিল। কিন্তু গাড়ি তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। পিছনের রাস্তায় অন্তত সাত আটটা মেয়ে, কাকে আলাদা করে চিনবো। মুখার্জিদা আমার মুখ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুঁ, লক্ষণ তো ভালো না। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রোগ ধরেছে।
আমি বললুম, কি যে বলেন! আমাদের বাড়িতে একটা স্প্যানিশ ছেলে থাকে, বোধহয় তার কাছে এসেছিল। সেই ছেলেটির একটু ছোঁক-ছোঁক বাতিক আছে।
—আমাকে ভোলাতে পারবি না। সাড়ে চার বছর হয়ে গেল এদেশে। তা একটু-আধটু ঘোরাঘুরি করা খারাপ না। কোনো দেশে এসে সে দেশের মেয়েদের সঙ্গে না মিশলে সে দেশটাকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। তোর বৌদি আসবার আগে আমিও একটু ওসব করে নিয়েছি। কিন্তু দেখিস বাপু, টিন-এজারদের পাল্লায় পড়িস না। ওই কচি মেয়েগুলো একেবারে সাঙ্ঘাতিক। ওদের দয়া নেই, মায়া নেই, ভালোবাসা নেই, ওরা জানে শুধু হৈ-হুল্লা আর ফুর্তি—সে সবও আবার ওদের সঙ্গে বিপজ্জনক।
—আমার সম্বন্ধে ভাববেন না। আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

সে রাত্রে খুব ঝড় উঠেছিল। বরফ পড়ার সময়েও শীত খুব একটা মারাত্মক হয় না, কিন্তু শনশনে হাওয়া উঠলে

একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। অর্থাৎ সে রাতটাও ছিল আজকের রাতের মতন। এই সময় শীত কাটাবার জন্য যে-বস্তুটার দরকার মুখার্জিদা কিংবা মমতা বৌদি সে-সব স্পর্শ করেন না। বিদেশে এসে পানীয় বলতে ওঁদের কাছে শুধু গ্যালন গ্যালন দুধ আর টিনে ভর্তি ফলের রস, বড় জোর গ্যাঁজানো আপেলের রসের সাইডার। শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার ওঁদের একমাত্র উপায়, শিগগির শিগগির কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়া। সুতরাং আড্ডা জমলো না।

আমিও উসখুস করছিলাম, মুখার্জিদা আমায় গাড়িতে করে দশটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে দিলেন। রাস্তায় তখন প্রায় লোকজন নেই, সোঁ-সোঁ হাওয়ার শব্দ, দেখলুম সেই পাতাহীন চেরিগাছটা ঝড়ের তোড়ে বেঁকে বেঁকে পড়ছে।

ঘরে ফিরে আমি রেকর্ডপ্লেয়ারে হালকা গানের রেকর্ড চড়িয়ে হুইস্কির বোতল খুলে বসলুম। এই দশটার সময়েই বিছানায় শুয়ে পড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ শুক্রবার, আজ নানাজায়গায় হরেক পার্টি জমেছে, আমারও দুএকটা নেমন্তন্ন ছিল, আমি এবার একটু পড়াশুনো করবো ভেবে বন্ধু-বান্ধবীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলুম। বুঝতে পারলুম, ভুল করেছি। পড়াশুনো করে কে কবে রাজা হয়েছে! প্রত্যেক শুক্রবারই আমার আড্ডা আর হৈ-হল্লা করা স্বভাব, অথচ কিনা আমায় একা একা বসে হুইস্কি খেতে হচ্ছে।

সে রাত্রে আমার জন্য অনেক আকস্মিকতা অপেক্ষা করেছিল। একটু বাদেই আমার দরজায় বেল বাজলো। আমি চমকে গেলুম। এত রাত্রে কেউ তো কারুকে ডাকতে আসে না। দরকার থাকলে বরং টেলিফোন করে। আমি প্রশ্ন করলুম, হু ইজ ইট? কি যেন একটা অস্পষ্ট উত্তর শোনা গেল, বুঝতে পারলুম না। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই হলো। একটি হালকা আর তুলতুলে মোমের পুতুলের মতন প্রায়-কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে, শীতে-ঠান্ডায় তার ঠোঁট কাঁপছে, তবু অল্প হাসির চেষ্টা করে বললো, আমি এঞ্জেল।

আমি দারুণ চমকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমিই সেই মেয়েটি? তুমি এখন এত রাত্রে কি চাও?

—একটু পরে বলছি। আমি ঠান্ডায় জমে গেছি প্রায়।

মেয়েটি আমার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকলো। বেশ সপ্রতিভভাবে গা থেকে নীল রঙের রেন কোটটা খুলে রাখলো। বছর পনেরো-ষোল বয়েস, গোলাপি-রঙা চুল, বরফের মতন মসৃণ গায়ের চামড়া, সরল বিস্ফারিত দুটি চোখ, কাঁধের পাশে দুটি ডানা লাগানো থাকলে আমি ওকে এঞ্জেল হিসাবে অবিশ্বাস করতুম না।

আমি কথা বলতে ভুলে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলুম, মেয়েটিই আবার বললো, আমি এঞ্জেল, আমাকে দেখে তুমি রাগ করেছো? তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে, এ একটা স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে সত্যিকারের একটি পরীই যেন আমার ঘরে এসেছে। একে কোনো প্রশ্ন করে লাভ কি? স্বপ্ন ভেঙে গেলেই তো সব মিলিয়ে যাবে। তার আগে, বরং ওকে প্রশ্ন না করে বুকে জড়িয়ে ধরি, শরীর ভরে নিই ওর দিব্য শরীরের গন্ধ, তারপর ওর কোলে মাথা দিয়ে, হাতে সুরাপাত্র নিয়ে আমি শুয়ে থাকি।

তারপরেই বুঝতে পারলুম স্বপ্ন নয়। একটা বাচ্চা মেয়ে সত্যিই মাঝরাত্রে আমার ফ্ল্যাটে এসে ঢুকেছে। আমি তাকে পরী ভেবেছিলাম।

কিন্তু এক মুহূর্তই, পর মুহূর্তেই মনে পড়লো টিন-এজারদের সম্পর্কে আমেরিকার কড়া আইন, আমার মরালিস্ট বাড়িওয়ালার মুখ, পাশের ফ্ল্যাটে আপ্পারাও নামে ভারতীয় ঐতিহ্যের বাতিকগ্রস্থ এক ছোকরা। তার চেয়েও বেশি চোখে পড়লো, ঠান্ডায় মেয়েটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মাথার চুল ভিজে, আঙুলের চামড়া কুঁচকে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, যাও শিগগির মাথা মুছে নাও আগে, জুতো খুলে হিটারে পা সেঁকে নাও। এই বরফের ঝড়ে কেউ রাস্তায় বেরোয়!

বাধ্য মেয়ের মতন সে সব করলো। আমার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সে বললো, তুমি হুইস্কি খাচ্ছো? আমাকে একটু দেবে?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আগে বলো তো, তোমার নাম কি? তোমার বয়স কত?

—আমার নাম এঞ্জেলা রো। আমায় সবাই এঞ্জেল বলে ডাকে। আমার বয়স আঠারো বছর তিনমাস।

—আঠারো বছর তিনমাস? মিথ্যে কথা। আসল বয়স বলো?

—সত্যি বলছি।

—আবার মিথ্যে কথা। ঠিক বলো?

—আমার বয়স সাড়ে ষোলো।

—তাই বলো। তাহলে তোমাকে আমি হুইস্কি দেবো কি করে? জানতে পারলে আমায় পুলিসে ধরবে। আমার ঘরে তোমার থাকাও তো বিপজ্জনক। তুমি এসেছো কেন?

—পরে বলছি। আমায় একটুখানি দাও না। আমার শীত করছে খুব। কেউ জানতে পারবে না। আমার হুইস্কি খাওয়া অভ্যাস আছে। বাড়িতে লুকিয়ে খেয়েছি একটু আধটু। দাও, কিছু হবে না।

—একটুখানিই দিচ্ছি। আর চাইবে না। এবার বলো, কেন এসেছো?

—আমি তোমার কাছেই থাকবো।

আমি আঁতকে উঠলুম। মেয়েটার সরল মুখ, কোনো বিকার নেই, তাজা, ফুলের মতন স্বাস্থ্য। যতই বয়েস হোক, তবু ওর পাতলা জামা ভেদ করে যে স্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে—তার সঙ্গে সদ্য ফোটা গোলাপের উপমাই মনে পড়ে। মেয়েটাকে পাগল বলেও তো মনে হয় না। দুনিয়ায় এত লোক, এই ছোট্ট শহরেও কম যুবক নেই, তবু আমার ঘরেই কেন এত রাত্রে এই আগুনের টুকরোর মতন কিশোরী? আমি তখনো হাসার চেষ্টা করেই বললুম, কেন, হঠাৎ আমার এখানে থাকবে কেন ঠিক করলে? বাড়ি যাবে না?

—বাড়ি যেতে আমার আর ভালো লাগে না। আমি আর বাড়ি ফিরবো না ঠিক করেছি।

—তাই নাকি? বাঃ খুব ভাল কথা। কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে কোনো আমেরিকান মেয়ে কোনো অচেনা ভারতীয় ছেলের ঘরে চলে আসে, তা তো শুনিনি!

—আমি তো বাড়ি থেকে পালাই নি। আমি এমনি চলে এসেছি।

—তোমার বাবা-মা কোথায়?

—বাবা ডেট্রয়েটে গেছেন অফিসের কাজে, মা পার্টিতে গেছেন, সন্ধে থেকে আমি একা—আমার একা একা ভালো লাগে না।

—একা কেন? তোমার কোনো ছেলে-বন্ধু নেই? সব মেয়েরই তো থাকে!

হঠাৎ মেয়েটি বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলো, না, আমার কোনো বন্ধু নেই! আমি চাই না। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই না। সমস্ত আমেরিকান ছেলেরা পাজি আর খারাপ। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও?

—হ্যাঁ চাই। কিন্তু আগে বলো, আমাকে তোমার পছন্দ হলো কি করে?

—তুমি ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো। তারা মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি আমাকে কোন ইন্ডিয়ান ভেবেছো? এখানকার আদিবাসী, যাদের তোমরা ইন্ডিয়ান বলো, আমরা বলি রেড ইন্ডিয়ান, তুমি আমাদের সেই তাদেরই একজন ভাবো নি তো?

—না ছুনিল, আমি জানি।

—ছুনিল না, সুনীল।

—সুনীল? কি সুন্দর! আমি জানি, তোমরা গান্ধির দেশের লোক, তোমরা সিনসিয়ার, তোমরা ভালোবাসার মূল্য জানো।

না হেসে আমার উপায় ছিল না। ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু ভাবভঙ্গি একেবারে পাকা গিন্নির মতন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, ভালোবাসার কথাও জেনে ফেলেছো? আসলে তুমি একটি অত্যন্ত ডেঁপো এবং পাকা মেয়ে। অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছো না? এবার চটপট করে বাড়ি যাও।

আমাকে বিমূঢ় করে দিয়ে মেয়েটি চোখ তুলে তাকালো। সেই চোখ জলে ভরা। সেই অশ্রুময় চোখ দেখে আমার বুক মুচড়ে উঠলো। আহা, এই সরল মেয়েটাকে আমি কেন কাঁদালাম। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, ওকি, তুমি এমন—

—তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

—এঞ্জেল, লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার কি হয়েছে খুলে বলো তো? আমাদের দেশে তোমার বয়েসি কোনো মেয়ে তো ভালোবাসা কথাটা উচ্চারণই করে না, তাই তোমার মুখে শুনে কি রকম যেন লেগেছিল। আচ্ছা, কোনো ছেলে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে বুঝি?

—আমি কোনো ছেলের কথা বলতে চাই না। অন্য কোনো ছেলের বন্ধু হতে চাই না। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

—তা তো হবেই। তার আগে আগের ঘটনাটা শুনি। কি নাম সেই ছেলেটার?

—ডিকি। ভীষণ পাজি, বদমাশ, নিষ্ঠুর, বাজে-মার্কা ছেলে, আমি, আমি তার নামও উচ্চারণ করতে চাই না।

—কি করেছে ডিকি তোমাকে?

—কিছু করে নি। কে গ্রাহ্য করে তাকে? বাজে-মার্কা ছেলে। সব আমেরিকান ছেলেরাই বাজে, আমি ওদের কারুকে গ্রাহ্য করি না।

—অন্য ছেলেদের কথা থাক। ডিকি কি করেছে তোমায়?

—ডিকি কি করেছে জানো? ডিকি আজ লুইসার সঙ্গে নাচতে গেছে। গত সপ্তাহেও সে লুইসার সঙ্গে,...অথচ আমি, আমি, পাঁচ বছর ধরে তাকে ভালোবাসি।

বুঝলুম, টেলিভিশান আর আজে-বাজে সিনেমা দেখে এঞ্জেলার মাথাটা একেবারে গেছে। এরই মধ্যে ভালোবাসা-টালোবাসার কথা উচ্চারণ করছে একেবারে জীবনে বহু পোড়তি-খাওয়া যুবতির মতন। পাঁচ বছর ধরে ডিকিকে ভালোবাসে! পাঁচ বছর আগে ওর বয়েস ছিল কত? পাকামি আর কাকে বলে! অথত ওরকম ঝর্ণার জলের মতন টলটলে কিশোরী মেয়ে, পবিত্রতা ওর সর্বশরীরে।

আমি হাল্কাভাবে বললুম, এঞ্জেল, ডিকি অন্য মেয়ের সঙ্গে গেছে তো অত দুঃখ কিসের? আরও তো কত ছেলে আছে ওর মতন, হ্যারি কিংবা টম কিংবা বিল—

—অন্য ছেলে? এঞ্জেলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। আমি ডিকিকে ছাড়া আর কারুকে কখনো ভালোবাসিনি, আর কারুর সঙ্গে কখনো নাচিনি, ডিকি ছাড়া আর কেউ আমাকে, আমাকে চুমু খায় নি, না, না, না।

আমার ঠিক বিশ্বাস হলো না। আমেরিকান টিন-এজার মেয়ে, এগারো-বারো বছরে চুম্বনের স্বাদ পায়, চোদ্দ-পনেরো বছরে অনেকের যৌন অভিজ্ঞতাও পর্যন্ত হয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে এক একটা ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা চলে, অন্ধকারে যায়-তার সঙ্গে আলিঙ্গন তো প্রায় জল-ভাত অথচ এ মেয়েটা বলে কি? আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম, যাঃ—

এঞ্জেলার চোখে আবার জল। হরিণীর মতন সে চঞ্চলা গতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার পাশে সোফায় বসলো। ব্যগ্র চোখ মেলে বললো, তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না? জানো, আমাদের ডর্মে স্পোর্টস হয়েছিল, তাতে হাই জাম্পে আমি সেকেন্ড হয়েছি, লুইসা ফার্স্ট হয়েছে, সেইজন্যই লুইসাকে ডিকি, ওঃ, কি নিষ্ঠুর, আমি কি পরের বছর ফার্স্ট হতে পারতুম না? আ—

আমার হাত চেপে ধরে এঞ্জেলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি তার মাথায় আলতোভাবে হাত রেখে বললুম, এঞ্জেল, অনেক রাত হয়েছে। এবার বাড়ি যাও, অত মন খারাপ করে না।

—না, আমি বাড়ি যাবো না। আমি এ দেশেই থাকবো না। আমি এ দেশ থেকে বহু দূরে চলে যাবো? তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

—দূর পাগল। অত সামান্য কারণে কেউ বাড়ি ছেড়ে যায়? আজ বাড়ি যাও। ডিকি একদিন অন্য মেয়ের সঙ্গে নাচতে গেছে তো কি হয়েছে? এখনো সে তোমাকেই হয়তো ভালোবাসে।

—একদিন! তুমি জানো, ডিকি গির্জায় গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে আমি ছাড়া কারুর সঙ্গে নাচবে না। আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি একদিনও, কিন্তু সে গত শুক্রবার আবার আজও...আজ কোথায় জানো, আমাদের পাশের বাড়িতে পার্টি, আমায় কেউ ডাকে নি।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ বাড়ি যাও।

—না, যাবো না, যাবো না! আমি এখানে থাকবো। আমি তোমার সঙ্গে ইন্ডিয়ায় যাবো। যে-দেশে ডিকি থাকবে, আমি সে দেশেই থাকবো না। আমাদের বাড়ি খালি কেউ নেই, মা নেই, আমি সেখানে শুয়ে শুয়ে পাশের বাড়িতে ডিকি আর লুইসার নাচের আওয়াজ শুনবো? না—

—বাড়িতে গিয়ে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকো। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, এদেশে আর থাকবো না। যেখানে ভালোবাসা নেই, সেখানে আমি থাকবো না। আমি যে অন্য দেশে কি করে যেতে হয় জানি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না? বলো?

এঞ্জেলা তার মৃণালভুজ দুখানি তুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলো, বলো, বলো।

ঘরের মধ্যে এখন আর শীত নেই, এঞ্জেলার শরীর আবার উষ্ণ হয়ে এসেছে, তার সেই টগবগে রক্তময় শরীরের স্পর্শ আমার শরীরে। তার পিঠে আমি একটা হাত রাখতেই আমার বুকের মধ্যে যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

প্রায় মধ্যরাত, বাইরে তুষার হাওয়া, কিছুটা হুইস্কি পান করে আমার মন চঞ্চল, পাশে এই পরীর মতন বালিকা-সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছে, যৌবনের সব চিহ্ন এসে গেছে দেহে। ফুটফুটে খালি পা দুখানি মেঝের ওপর পাতা, সতেজ দুই উরু, মুঠি মাপের কোমর, কোমল বুক দুটি ঘন ঘন নিশ্বাসে দুলছে।

তখনো আমি ভেবেছিলাম সবটাই ছেলেমানুষী। একটা অনভিজ্ঞা সরল মেয়ে বন্ধুর ওপর রাগ করে অতিরিক্ত আবেগে বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছে। এক রাত্রের লম্বা ঘুমে সব ফর্সা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ঘরে থাকার ব্যাপারটা যে অন্যরকম। আমি তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নই। অচেনা তরুণীকে হঠাৎ ভগ্নীভাবে দেখা আমার অভ্যেস নয়।

ওর জন্য আমার মায়াও হচ্ছিল। বাবা বাড়িতে নেই, মা সারারাত অন্য জায়গায় পার্টিতে ব্যস্ত, একলা বাড়িতে ওই মেয়ে, তার ওপর পাশের বাড়িতে ওরই প্রাণের বন্ধু অন্য মেয়ের সঙ্গে নাচছে। মনের মধ্যে ওর তো আঘাত লাগবেই। কিন্তু আমারই বা কি করার আছে। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমার হাত থেকেও তো ওকে বাঁচানো দরকার।

আমি খানিকটা কঠিন হয়ে বললুম, এঞ্জেল, এবার তোমাকে যেতেই হবে। আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।

—কেন?

—এখানে এরকম ভাবে থাকতে নেই।

—কেন থাকতে নেই? এখন থেকে আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি বাসবে না? তুমি আমাকে পছন্দ করছো না?

—তোমাকে আমার খুবই পছন্দ। কিন্তু একজনের ওপর রাগ করে আমাকে ভালোবাসবে, তা তো হয় না। তুমি এত বড় হয়েছো, তুমি নিজে ভেবে দ্যাখো।

—আমি ডিকিকে আর ভালোবাসি না।

—হ্যাঁ। তুমি ডিকিকেই ভালোবাসো।

—না। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি আজ এখানেই শুয়ে থাকবো, তুমি বিছানায় শোও, আমি এই সোফাটায়—এতেই আমার হয়ে যাবে।

—তা হয় না।

—কেন হয় না?

—এঞ্জেল তুমি তো বোকা নও। এক ঘরে কখনো এরকম ভাবে শোওয়া যায়! আমার হয়তো ইচ্ছে করবে তোমাকে আদর করতে, তারপর আরও, না না, তুমি ওঠো।

—না, প্লিজ, আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে পারবো না। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।

—তুমি যদি বাড়ি না যাও, তাহলে আমি পুলিসে খবর দেবো। তুমি এখনো অপ্রাপ্তবয়স্কা, পুলিস এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

অভিমানে এঞ্জেলার মুখটা লাল হয়ে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো! বাবা বলেছিলেন, ভারতীয়রা খুব ভালো লোক। সব বাজে কথা তাহলে? আমি এখন কোথায় যাবো?

ওর সেই আহত অভিমান-মাখা মুখ সহ্য করা যায় না। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললুম, এঞ্জেল, লক্ষ্মী সোনা, রাগ করো না। আমি বলছি, এতেই ভালো হবে। তুমি বরং তোমাদের পাশের বাড়ির সেই পার্টিতে যাও, এখন রাত সাড়ে এগারোটা, এখনো পার্টি ভাঙে নি, তুমি ডিকির কাছে গিয়ে দাঁড়াও, তুমি তাকে এত ভালোবাসো, সে ঠিক বুঝতে পারবে!

—ডিকির কাছে যাবো? কক্ষনো না। হাই জাম্পে ফার্স্ট হয়েছে বলেই সে লুইসার সঙ্গে, আমি সেকেন্ড হয়েছি...

—ওসব কথা ভুলে যাও। আমি বলছি, ডিকি তোমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। সে তোমার দিকে এগিয়ে আসবে নিজেই। তুমি ওর সঙ্গে একটু নেচে তারপর বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার মতন মেয়েকে যে ভালোবাসবে সে ধন্য হবে। ডিকি তো আর বোকা নয়।

আমি রেনকোটটা তুলে এঞ্জেলাকে পরিয়ে দিলাম। জুতো জোড়া এগিয়ে দিলাম। দরজা খুলে বললাম, সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নেমো। তোমার কাছে ট্যাক্সি ভাড়া আছে? না হয় আমি তোমাকে পাঁচ ডলার দিয়ে দিচ্ছি।

—না, আছে। কিন্তু ডিকি যদি আবার আমায় অপমান করে, আমি কোথায় যাবো?

—করবে না। বাড়িতে গিয়ে তারপর লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঘুমিয়ে থেকো।

—তুমি আমাকে ভালোবাসবে না?

—আমার ভালবাসা তোমাকে মানাবে না। ডিকির ভালোবাসাই তোমার দরকার।

ঝড় থেমে গিয়েছিল। বরফপাত বন্ধ। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। এঞ্জেলা আমার বাড়ি থেকে বেরুতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলুম। সে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে আমার দিকে নিষ্পলকভাবে চেয়েছিল। ওর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

পরে আমি ওই ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। সে রাত্রে এঞ্জেলাকে যেতে দিয়ে কি আমি অন্যায় করেছিলাম? আমার এমন কোনো নিজস্ব দেবতা নেই, যার কাছে আমি এই ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলতে পারি। এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি ভুলই করেছিলাম। আমার উচিত ছিল এঞ্জেলাকে আমার ঘরে আশ্রয় দেওয়া। আমার রক্ত

চঞ্চল, অমন রূপসী বালিকাকে পাশে পেয়ে না হয় আমি কিছু করতুম, যদি আরো কিছুদূর গড়াতো—তাতেও হয়তো ক্ষতি ছিল না। জীবনের কাছে এসব জিনিসের আর দাম কতটুকু?

কিন্তু মানুষে তো একেই অন্যায় বলে। একটা অচেনা ষোলো বছরের মেয়েকে সারারাত নিজের ঘরে রাখা—তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া! মুখার্জিদা—মমতা বৌদি তাহলে আর আমার মুখ দেখতেন না, আপ্পারাও আমাকে পুলিসে ধরাতো, সবাই, বলতো আমাকে পাষণ্ড। কিন্তু আমি অত কিছু তখন ভাবিনি, নিজের কাছ থেকেই বাঁচতে চাইছিলুম! এঞ্জেলার মানসিক উদ্বেগকে আমি শেষ পর্যন্ত ছেলেমানুষী ভেবেছিলুম! ওইটুকু মেয়ে, ও আর ভালোবাসার কি বোঝে। একটা প্রচণ্ড অভিমানে শুধু—

কিন্তু পরদিন সকালে সীডার নদীতে এঞ্জেলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। নির্জন মধ্যরাতে লিংকন ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল সে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম সেই মৃতদেহ। তার মুখে তখনো তীব্র অভিমান লেগে।

পুলিস ডিকিকে খুঁজে বার করেছিল। ট্যাক্সিওয়ালার সাক্ষ্যে আমাকেও যেতে হয়েছিল পুলিসের কাছে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই প্রমাণিত হয়েছিল। ডিকির বিশেষ দোষ ছিল না। নাচের পার্টিতে মাঝ রাতে এঞ্জেলা গিয়ে হাজির হয়েছিল। ডিকির বাহু থেকে লুইসাকে ছিনিয়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে সে বলেছিল, না, না, ডিকির সঙ্গে আর কেউ নাচবে না! সবাই হেসে উঠেছিল ওর পাগলামি দেখে। ডিকি অপমানিত বোধ করেছিল। সে রুক্ষস্বরে বলেছিল, শোনো ডার্লিং, আমি তোমাকে এখনো বিয়ে করিনি। আর তুমি এর মধ্যেই দজ্জাল বৌয়ের মত...। ডিকি কি করে জানবে, এঞ্জেলা অত আঘাত পাবে!

কেই বা কি করে জানবে। ছেলেমেয়েরা কম বয়েসে এর তার সঙ্গে প্রেম করবে, সেই তো স্বাভাবিক। একজন আর একজনকে পছন্দ করছে না, তাতে কি। আরেকজন তো আছে। বিয়ের পরেই কত ঘন ঘন বিচ্ছেদ হয়, আর বিয়ের আগে তো...। কেউ ভাবে নি, আমিও ভাবিনি যে সব মানুষই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। ওইটুকু একটা কচি মেয়ে যে তার নিয়ম ভেঙে বসে আছে, কে জানতো?

মাঝে মাঝে ভাবি, এঞ্জেলাকে সে রাত্রে আমি আশ্রয় দিলে ও বোধহয় প্রাণে বাঁচতো। তাতে হয়তো নিয়ম ভাঙা হতো, কিন্তু নিয়মের চেয়েও তো প্রাণ বড়ো।

...আবার একথাও মনে হয়, এঞ্জেলা ছিল সত্যিকারের পরী। ওই রকম পরীরা এই পৃথিবীতে দৈবাৎ মাঝে মাঝে জন্মায় এবং এই নিষ্ঠুর নিয়মের পৃথিবীতে তারা বাঁচতেও পারে না।

তেহেরানের স্বপ্ন

কটা বাজল?

মনীষা ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ঘুমের মধ্যেই সে দেখতে পেল, বড় ঘড়ির কাঁটাটা এসে থামল পাঁচটার ঘরে, তারপর খ-র-র-র শব্দ, তারপর ঢং ঢং ঢং।

ধড়ফড় করে উঠে মনীষা ঘড়ি দেখতে ছুটে এলো পাশের ঘরে। না, পাঁচটা বাজেনি, এখন তিনটে কুড়ি। সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরু কুঁচকে গেল। তিনটে কুড়ি! তাহলে টুম্পু এলো না কেন? সে তো তিনটে পাঁচের মধ্যে রোজ এসে যায়।

মনীষা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তা দিয়ে অনেক রিকশা যাচ্ছে, তার মধ্যে বেশ কটিতেই স্কুল-ফেরত শিশুরা। ব্রিজের পাশ দিয়ে যে রিকশাটা বেঁকল, তার মধ্যে কি টুম্পু? না তো!

মনীষার কপালে এবার উদ্বেগের তিনটি রেখা। অথচ সে ঠিক ভয়ও পেতে চাইছে না ভয় পেতেও ভয় করে। রিকশাওয়ালা অনেকদিনের চেনা। খুব বিশ্বাসী। সে কোন গোলমাল করবে না। টুম্পুর স্কুল ছুটি হয় আড়াইটের সময়, প্রত্যেকদিন টুম্পু মোটামুটি আধঘন্টার মধ্যে ফিরে আসে।

যদি রিকশাওয়ালা আজ না গিয়ে থাকে? যদি তার অসুখ হয়? কিংবা অ্যাকসিডেন্ট?

তিনটে পঁয়ত্রিশ হবার পর মনীষা আর থাকতে পারল না। দ্রুত হাতে মাথায় চিরুনি চালাল। আটপৌরে শাড়িটাই ঠিক করে নিল একটু, তারপর হাত ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দরজাটা বাইরে থেকে টানলেই তালা বন্ধ হয়ে যায়।

রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটছে, তখন মনীষার মুখ চোখ ঠিক কোন পক্ষী-মাতার মতন ব্যাকুল, তার বুক কাঁপছে। সামনে একটা ট্যাক্সি পেয়ে সে ঝট করে উঠে পড়ল। মাত্র মাইল খানেক দূরে স্কুল। তার গেট ফাঁকা। একটি ছাত্রীও নেই। দারোয়ান কিছু বলতে পারল না। না, দারোয়ান তো টুম্পুর কথা মনে করতে পারছে না। রোজ যেমন যায় সেইরকমই গেছে নিশ্চয়ই। রিকশা না এলে নিশ্চয়ই সে দাঁড়িয়ে থাকত কিংবা কান্নাকাটি করত।

সেই ট্যাক্সি নিয়েই মনীষা ফিরে এলো বাড়িতে। ভাড়া না দিয়ে ছুটে উঠে এলো ওপরে। তারপর গভীর ভাবে নিশ্বাস ফেলল। বন্ধ দরজার সামনে বসে আছে টুম্পু, পা ছড়িয়ে, টপ টপ করে পড়ছে চোখের জল।

মনীষা এসে ছোঁ মেরে তাকে কোলে তুলে নিল। টুম্পু দাপাদাপি করে হেঁচকি তুলে কেঁদে কেঁদে বলল, তুমি দুষ্টু তুমি চলে গিয়েছিলে...কেন? আমার খিদে পেয়েছে।

মনীষা চুমু দিয়ে তার কান্না মুছিয়ে দিয়ে বলল, তোমার এত দেরি হল কেন মামণি? আমি তো তোমাকেই খুঁজতে গিয়েছিলাম।

টুম্পু বলল, আমি আজ রিকশায় আসিনি। আমি মণিদীপার মায়ের সঙ্গে গাড়িতে এসেছি।

ব্যাগ খুলে চাবি বের করতে গিয়ে আর এক বিপত্তি। হুড়োহুড়িতে মনীষা চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। এখন আর ঢোকা যাবে না।

এদিকে অধৈর্য ট্যাক্সিচালক নিচে হর্ণ দিচ্ছে বারবার। টুম্পুকে কোলে নিয়ে মনীষা আবার নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ট্যাক্সিতে উঠে বলল, শিগগির চলুন। যোধপুর যাব।

যে-কেউ দেখলে ভাববে, মনীষা বুঝি অন্য কারুর মেয়েকে চুরি করে পালাচ্ছে।

ভুঁলো মন বলে মনীষা একটা চাবি রেখে গিয়েছে তার মায়ের কাছে। গত মাসেও এ রকম একবার চাবি আনতে হয়েছিল। এখন যদি সে যোধপুর পার্কে গিয়ে দেখে মা বাড়ি নেই, সিনেমা দেখতে গেছেন কিংবা বেড়াতে গেছেন নিজের বাপের বাড়ি, তাহলেই সর্বনাশ! এদিকে পাঁচটার মধ্যে আসবে মনীষার ছেলে শান্তনু। সেও যদি এসে দেখে দরজা বন্ধ, তাহলে তুলকালাম কাণ্ড বাধবে!

রাত্রে খাবার টেবিলে রজতের সঙ্গে এটাই হল প্রধান আলোচনার বিষয়। জানো আজ কি হয়েছিল—এই বলে চোখ বড় বড় করে শুরু করল মনীষা রজত শুনে গেল নিঃশব্দে। খাওয়ার সময় তার বই পড়ার অভ্যেস। বই থেকে সে চোখ তুলল না।

মনীষার কথার মাঝপথে হো হো করে হেসে উঠল রজত। তারপর বলল, তোমরা মেয়েরা...সত্যি...সারাদিন

কোন কাজ নেই...তাই সামান্য ব্যাপার থেকেই...তুমি যদি আর মাত্র পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে, তাহলে এ সব কিছুই ঘটত না!

মনীষা রেগে গিয়ে বলল, বাঃ, সাড়ে তিনটে বেজে গেল, তখনো টুম্পু আসছে না!

রজত বলল, এক কাজ করলেই তো পারো। দুপুরবেলা তুমিই তো রোজ টুম্পুকে আনতে যেতে পারো, শুধু শুধু না ঘুমিয়ে।

আমি আর কতক্ষণ ঘুমোই? বড় জোর একঘণ্টা...তাও রোজ হয় না।

আমরা সে সময় অফিসে কাজের চাপে পাগল হয়ে যাই, আর তোমরা দিব্যি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে—

রাঁধার মা ছুটি নিয়ে সেই যে দেশে গেল, এখনো এলো না, আমাকে বেরুতে হলে দরজা বন্ধ করে বেরুতে হয়।

সেটা আর এমন কি শক্ত ব্যাপার! অবশ্য যদি রোজ রোজ চাবি নিতে ভুলে যাও আর ট্যাক্সি করে তোমার মায়ের কাছ থেকে চাবি আনতে যেতে হয়, তাহলে খরচ পোষাবে না।

ও, টাকা খরচটাই তোমার গায়ে লাগছে। ঠিক আছে, কাল থেকে আমি যাব, তাতে টুম্পুর জন্য তোমার রিকশা ভাড়াটাও বাঁচবে।

আমি সে কথা বলিনি। টুম্পুকে নিয়ে তুমি রিকশা করেই আসবে, অনেক মা-ই তো বাচ্চাদের আনতে যায়।

সত্যি তুমি অনেক পরিশ্রম করে টাকা রোজগার কর, আর আমি তোমার টাকা বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিই।

আরে কি মুস্কিল! এসব কথা উঠছে কেন! আমি কখন বললাম যে তুমি বাজে খরচ কর?

নিশ্চয়ই বলেছ। আমি আমার মায়ের বাড়িতে ট্যাক্সি করেও যেতে পারব না? ঠিক আছে, এবার থেকে হেঁটেই যাব।

শোন মনীষা, খাওয়ার সময় মিছিমিছি ঝগড়া করলে খাওয়া হজম হয় না। একটু শান্তিতে বসে খাও।

তুমি খাও, যত ইচ্ছে শান্তিতে বসে খাও!

মনীষা নিজের থালা ঠেলে উঠে চলে গেল। রজত দুবার ডাকল মনীষা, মনীষা! সাড়া না পেয়ে সে নিঃশব্দে আবার নিজের খাবারের থালায় মন দিল। ধীরে সুস্থে সব শেষ করে সে বাথরুমে হাত ধুতে এসে দেখল, মনীষা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

রজত বলল, কি যে ছেলেমানুষী কর। এই—কি হল?

রজত মনীষার কাঁধটা ছুঁতেই সে মুখ ফিরিয়ে শুকনো গলায় বলল, কিছু হয়নি! ছাড়!

বেশ কিছু পরে, রান্নাঘর গুছিয়ে মনীষা যখন শোবার ঘরে এলো, রজত তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনীষার ঘুম ভাঙে সকাল ছটায়। ওই সময় ঠিকে ঝি আসে, দরজা খুলতে হয় মনীষাকেই। আগে রাঁধুনি ছিল তখন অসুবিধে ছিল না। কিন্তু রাঁধুনি দেশে পালিয়েছে, সে ফিরবে কিনা ঠিক নেই, এদিকে নতুন লোকও পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া গিয়েছিল চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলে। কিন্তু বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পুরুষলোক রাখতে রজতের ঘোর আপত্তি। সে বলে; বিদেশে আজকাল কোন বাড়িতেই ঠাকুর-চাকর থাকে না। আর তোমরা শিক্ষিত মেয়ে হয়েও বাড়ির রাঁধুনি কয়েকদিনের ছুটি নিলে রেগে যাও। আমরা যে অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিই?

অফিসের কাজে রজত একবার মাত্র আড়াই মাসের জন্য বিলেত গিয়েছিল। তারপর থেকে সে কথায় কথায় বিদেশের উদাহরণ দেয়।

রজত আরও বলে, একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে সারাদিন বসে বসে রান্না করছে—এই দৃশ্যটাই খারাপ। অমানবিক!

নারীবর্ষের জের টেনে মনীষা এই তর্ক করেছিল রজতের সঙ্গে।

সে যা-ই হোক, এখন সকালের চা করতে হচ্ছে মনীষাকেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খাওয়ার আনন্দ সে আর পায় না।

রজত অফিসে বেরিয়ে যায় সাড়ে নটার সময়। সেই সময় সে টুম্পুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়। সুতরাং সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে এক মিনিট নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না, টুম্পাকে তৈরি করাও এক বিরাট ঝামেলা। কিছুতেই সে স্নান করতে চায় না। তাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

বাবলু স্কুলে যায় সাড়ে দশটায়। সে রোজ হাঙ্গামা বাধায় খাওয়া নিয়ে। চোদ্দ বছর বয়েস ছেলের। এর মধ্যেই খাওয়া নিয়ে নানা রকম বাছ-বিচার। কোন মাছই তার পছন্দ নয়। সে মাংস ভালবাসে। কোন বাড়িতে রোজ রোজ মাংস রান্না হয়।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় বাবলুর এক স্কুলের বন্ধু নিচতলা থেকে চেঁচিয়ে ডাকে, শান্তনু—শান্তনু!

অমনি অর্ধেক খাওয়া হলেও তা ফেলে রেখে উঠে পড়ে বাবলু। হাত ধুয়েই নিচের দিকে দৌড়য়। রোজ রোজ যদি এ রকম আধপেটা খেয়ে যায়, তাহলে কি আর স্বাস্থ্য ভাল হবে?

এর পর ফ্ল্যাট ফাঁকা। ঠিকে ঝি আজকাল আরেকবার এসে তরকারি কুটে বাসন মেজে দিয়ে যায়। মনীষা বাকি রান্না, বিকেলের জলখাবার এমন কি রাত্তিরেও দু-একটা পদ রেঁধে রাখে। এতেই বেজে যায় একটা দেড়টা। স্নান করতে যাবার সময় একটা মুস্কিল। ওই সময় কেউ এলে দরজা খুলে দেওয়া যায় না। অথচ মনীষা স্নান করতে ঢুকলেই কেউ না কেউ আসবে। হয় মুর্গিওয়ালা, নয়তো পোস্টম্যান অথবা পাশের বাড়ির কেউ। ঝনঝন করে কলিং বেল বাজাতেই থাকে। বাথরুমের দরজা বন্ধ থাকলে বেলের আওয়াজ শোনা যায় না। তাই সে বাথরুমের দরজা খুলেই স্নান করে।

সবচেয়ে খারাপ লাগে একলা বসে খেতে। আগে টুম্পু থাকত, এখন সেও ইস্কুলে যায়। কি তীব্র নিঃসঙ্গ দুপুর। শুয়ে শুয়ে বই পড়তে গেলে ঘুম আসে। সেই ঘুম গাঢ় হবার আগেই টুম্পু আর বাবলু ফিরতে শুরু করে।

মনীষা সাইকোলজি নিয়ে এম এস সি পাশ করেছিল, আর কিছু কাজে লাগে না! শুধু স্কুল ফাইনাল পাশ করলেই বা কি ক্ষতি ছিল। কেন খেটে খুটে এতখানি পড়াশুনা করতে গেল? বাড়ির রান্না আর ছেলেমেয়েকে স্নান করিয়ে খাইয়ে স্কুলে পাঠানোর জন্য এম এস সি পাশ করার দরকার হয় না।

প্রায় মনীষা বলে, সে একটা চাকরি করবে।

রজত জবাব দেয়, কর না, কে আপত্তি করেছে?

টুম্পু জন্মাবার আগে মনীষা কিছুদিন একটা স্কুলে পড়িয়েছিল। সেটা ছিল মর্নিং স্কুল। এখন তার পক্ষে মর্নিং স্কুলের কাজ করা সম্ভব নয়। বাড়িতে রান্নার লোক যদি থাকেও। ছেলে মেয়ে দুটোর পড়াশুনাও তো একটু দেখিয়ে দিতে হয়। রজত ও সব কিছু করবে না। দশটা পাঁচটার সুবিধে মত চাকরি কে-ই বা দিচ্ছে মনীষাকে। রজত কিচ্ছু চেষ্টা করে না। তার মনে মনে খুব ইচ্ছে নয়, মনীষা চাকরি জগতে যাক। সে চায় মনীষা বাড়িতে থেকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করুক। রজতের সম্প্রতি চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। চাকরিতে উন্নতি মানেই অফিসের কাজে আরও বেশি আত্মবিক্রয়। বেলা সাড়ে নটায় বেরোয়। ফেরে সেই রাত প্রায় সাড়ে নটায়। তখন সে ক্লান্ত হয়ে থাকে। প্রায়ই মনীষার সঙ্গে হুঁ হাঁ ছাড়া কোন কথাই হয় না। চাকুরিতে এবার উন্নতির পর থেকেই রজত ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে।

সন্ধ্যেবেলায় ছেলে মেয়েদের পড়তে বসায় মনীষা। বাবলুর জন্য একজন মাস্টারমশাই রাখতে হয়েছে, তিনি সপ্তাহে তিনদিন আসেন। বাবলুটার পড়াশুনোতে মাথা থাকলেও দারুণ ফাঁকিবাজ। মাস্টারমশাই যে সব দিন আসে না, সে সব দিন সে নিজের পড়ার বই ছুঁয়েও দেখে না। খালি গল্পের বই, তাই সব সময় নজর রাখতে হয় মনীষাকে।

ছেলে মেয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। তারপর মনীষাকে প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হয়, কখন রজত আসবে। এক একদিন রজতের ফিরতে সাড়ে দশটা এগারোটাও হয়ে যায়, মনীষা ঘুমোতে পারে না। কে দরজা খুলবে? তা ছাড়া সারাদিন খেটে খুটে বাড়ি ফেরার পর রজত তো আর নিজের খাবার নিজে নিয়ে খাবে না?

মনীষা প্রায় ভাবে, এই কি তার জীবন? শুধু ছেলেমেয়েদের মানুষ করা আর স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে থাকা? আগেকার দিনে মেয়েরা এতেই সন্তুষ্ট থাকত। অবশ্য তখন ছিল একান্নবর্তী পরিবার, সারাদিন আরও অনেকের সঙ্গে গল্প, হাসি ঠাট্টা, না হোক ঝগড়াঝাটি কিছু একটা করে সময় কাটত। এখন মনীষা দিনের অধিকাংশ সময়ই নিঃসঙ্গ। মেয়েদের জীবনে কি আলাদা কিছু করবার নেই?

সেদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় দারুণ মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো মনীষা। হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে নিজের ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। সে কি অনেক বদলে গেছে? কপালে কুঁচকানো দাগ দেখা যাচ্ছে? দু-এক প্যাকেট বিস্কুট আর কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে বেরিয়েছিল মনীষা। চেনা স্টেশনারি দোকান, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বসেন সেখানে। আজ সেখানে বসে ছিল একটি কুড়ি একুশ বছরের ছেলে। খুচরো পয়সা ফেরত দেবার সময় সেই ছেলেটি বললে, এই নিন মাসিমা!

মাসিমা?

মনীষা একেবারে চমকে উঠেছিল। দোকানদারেরা তাকে দিদি বলে সব সময়। আজ সে হঠাৎ মাসিমা হয়ে গেল কি করে? সে কি বুড়ি হয়ে গেছে? বিরক্ত মুখে মনীষা বেরিয়ে এসেছিল দোকান থেকে।

কিন্তু এক একদিন পরপর দুর্ঘটনা ঘটে। পাড়ার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি ছেলে। সকলেরই মুখ চেনা। তার মধ্য থেকে দুটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, সামনের সোমবার সকালে কিন্তু আমরা সরস্বতী পুজোর চাঁদা আনতে যাব মাসিমা!

মনীষার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। গত বছরেও এই ছেলেরা তাকে বৌদি বলে ছিল। এক বছরের মধ্যে এদের চোখে সে মাসিমা হয়ে গেল? নাকি গত বছর অন্য ছেলেরা এসেছিল?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনীষার মনে হল, সে সত্যিই বুড়ি হয়ে গেছে। তার বয়েস ঠিক এখন পঁয়তিরিশ। এক সময় সুন্দরী হিসেবে তার নাম ছিল। স্কুলে তার সঙ্গেই পড়ত বন্দনা সেন, সে এখনও সিনেমায় নাম-করা নায়িকা, এখনও সে কলেজের মেয়ে সাজে, মানিয়েও যায়। অথচ বেশি সুন্দরী। সেই বন্দনা এখনো যুবতি রয়ে গেল, আর মনীষা হয়ে গেল মাসিমা?

মন খারাপের জের রয়ে গেল বেশ কয়েকদিন। একদিন সকালে রজত দেখল রান্নাবান্না ছেড়ে মনীষা আয়নার সামনে বসে কাঁদছে।

রজত বলল, এ কি ব্যাপার! তুমি নাটক করছ নাকি?

রজত সব সময় আজকাল একটু খোঁচা দিয়ে কথা বলে। এক সময় তাকে কত ভালবাসত রজত। রাস্তা দিয়ে চলার সময় কেউ মনীষার গায়ে একটু ধাক্কা দিলে রেগে আগুন হয়ে মারতে যেত তাকে। মনীষার একটু অভিমান হলে রজত সেদিন অফিসেই যেত না।

মনীষা বলল, তুমি চাও আমি পাগল হয়ে যাই কিংবা মরে যাই?

রজত বলল, আমি এ রকম অদ্ভুত জিনিস চাইতে যাব কেন? তুমি পাগল হলে বা মরে গেলে—দুটোতেই আমার দারুণ ঝামেলা।

তুমি শুধু নিজের ঝামেলার কথাই ভাবো, আর কিছুই ভাবো না!

লক্ষ্মীটি, সকালবেলাতেই এত রাগ কেন? কী হয়েছে খুলে বল তো?

আমার দিকে একটু চেয়ে দেখার সময় নেই তোমার। তুমি দেখতে পাও না যে আমি বুড়ি হয়ে গেছি?

বুড়ি? কে বললে? এখনো রাস্তায় বেরুলে সবাই তোমার দিকে তাকায়।

মোটেই না। সেদিন একজন দোকানদার আমাকে মাসিমা বলেছে!

রজত হো হো রেগে হেসে উঠল।

মনীষা আরও রেগে গিয়ে বলল, তুমি হাসছ?

হাসব না! কোন দোকানদার তোমাকে মাসি বলেছে, সেই জন্য সকালবেলা আমি বকুনি খাব? সেই জন্য সকালবেলা তুমি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে?

আমি সত্যিই তো বুড়ি হয়ে গেছি। আমার কপালে একটা দাগ পড়েছে।

কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। শোন, পঁয়তিরিশ বছর বয়সে কি আর ষোল বছরের মতন চেহারা থাকে? সব বয়েসেরই একটা আলাদা সৌন্দর্য থাকে। আমিও কি আর আগের মত যুবক আছি?

কিন্তু বন্দনা সেন, সে আমারই বয়েসি।

তুমিও সিনেমায় নামো। মেক-আপ টেক-আপ নিয়ে তোমার বয়েসও অনেক কম দেখাবে।

খানিকটা বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রজত বলল, মনি, আর একটা কাজ করতে পারো। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কারুর সঙ্গে প্রেম করা শুরু করে দাও। নতুন প্রেমে পড়লে বয়েস অনেক কমে যায়।

মনীষা বলল, তুমি কারুর সঙ্গে প্রেম করছ বুঝি?

আমার সময় কোথায়? সারাদিনই তো খেটেখুটে মরছি। সময় থাকলে নিশ্চয়ই প্রেম করতাম। দেখলে না মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে আমার? নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে টাক পড়ত না, ব্লাড কোলেস্টেরল হত না। প্রেমে পড়লে শুনেছি হার্ট অ্যাটাকও হয় না! তোমার তো সারাদিনে অঢেল সময়—কারুর সঙ্গে জমিয়ে ফেলো। আমি দুপুরে বাড়ি থাকি না। তোমার অনেক সুবিধে। কথা দিচ্ছি, কোনোদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ি ফিরে তোমায় চমকে দেব না।

চুপ করো, বাজে কথা বল না।

আমি সীরিয়াসলি বলছি!

আহা, এমনি এমনি বুঝি কারুর সঙ্গে প্রেম করা যায়? আমি কোথাও যাই? কারুর সঙ্গে মিশি? রাস্তায় গিয়ে লোককে ডেকে ডেকে বলব ওগো তোমরা কেউ আমার সঙ্গে প্রেম করবে? প্রেম করবে?

রজত আবার হাসতে হাসতে বলল, তা হলে মন্দ হয় না ব্যাপারটা!

অফিসে বেরুবার সময়ও রজত দেখল মনীষার মুখ থমথমে। ছেলেদের লুকিয়ে সে মনীষাকে একবার জড়িয়ে ধরে বলল, মনি, আমার ওপর এত রেগে আছ কেন? এই যে আমি এত খাটছি, এ কি আমার নিজের জন্য? তোমার জন্য নয়? তুমি যা চাও, তাই দিয়েছি। তোমার কোন অভাব রাখিনি। যাদবপুরে জমি কিনে রেখেছি, সামনের

বছরে বাড়ি শুরু করব, তুমি যেমন চাও, ঠিক সেই রকম। তোমার সময় কাটে না, আগামী মাসে একটা টিভি কিনছি।

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মনীষা বলল, আমি ও সব কিছু চাই না। কিচ্ছু চাই না। আমাকে একটা নতুন জীবন দাও—

সেদিনই দুপুরে খেতে বসে, কাগজ পড়তে পড়তে চোখে পড়ল একটা খবর বন্দনা সেন বিলেতে যাচ্ছে। আবার রাগ হয়ে গেল মনীষার। বন্দনা এই নিয়ে কতবার বিদেশে গেল? অথচ সে যেতে পারবে না। তার রূপ বা গুণ কোনোটাই কি কম ছিল?

শনিবার মনীষার দিদি জামাইবাবুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। কিন্তু রজত যেতে পারবে না। তার অফিসের কোন সাহেব আসছে, সেই জন্য তাকে যেতে হবে এয়ারপোর্টে। ফিরতে ফিরতে সেই রাত এগারোটা।

ছেলে মেয়েকে নিয়ে মনীষা একাই গেল। অনেক লোকজন এসেছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে কি সুন্দরী! চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়েস, মুখ দিয়ে যেন একটা দীপ্তি বেরুচ্ছে। মনীষার দিদি হঠাৎ বলল, বিয়ের ঠিক আগে মনীষাকেও, দেখতে এই রকম ছিল।

মনীষা বলল, যাঃ মোটেই না। ও অনেক বেশি সুন্দরী।

গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মনীষা। ওই বয়েসটা তো সে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না!

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল। ওর নাম দেবযানী। বয়েস অত কম নয়। মেয়েটি নিজেই বলল, ওর বয়স আটাশ। বিয়ে হয়েছে দুবছর আগে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই থাকে তেহেরানে।

মনীষার জামাইবাবু বললেন, ওর কাছে তেহেরানের অনেক গল্প শুনছিলাম। দারুণ ব্যাপার, বুঝলে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে, মাইনে পায় ডলারে। ফ্রি এয়ার কণ্ডিশানড বাংলো, ফ্রি গাড়ি—খরচই নেই. ওরা তো টাকা জমিয়ে একবার বিলেত ফ্রান্স ঘুরে এলো।

মনীষা জিজ্ঞেস করল, আপনারা দুজনেই ওখানে একসঙ্গে চাকরি পেয়েছেন?

দেবযানী বললেন, না, প্রথমে ও একলাই চাকরি নিয়ে গিয়েছিল। আমি একলা একলা সারাদিন থাকতাম। তাই ভাবলাম, বসে থেকে কি করব। একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে নিলাম।

ওখানে বুঝি সহজেই চাকরি পাওয়া যায়?

হ্যাঁ। এখন তো আমাদের দেশ থেকে অনেকেই যাচ্ছে। ওরা ইণ্ডিয়ানদের বেশ পছন্দ করে।

জামাইবাবু বললেন, বুঝলে না, পেট্রলের টাকা, অঢেল টাকা। কি করে খরচ করবে ভেবে পায় না। বহু লোক নিয়ে যাবে এদেশ থেকে।

মনীষা জিজ্ঞেস করল, আমি চাকরি করতে পারি? আমার একটা এম এস সি ডিগ্রি আছে।

দেবযানী বেশি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। অন্ততঃ স্কুলে তো পাবেনই।

কত মাইনে?

আমাদের টাকার হিসেবে প্রায় চব্বিশশো টাকা। তাছাড়া বাড়ি ফ্রি। বছরে একবার যাতায়াতের ভাড়া।

জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন। তুমি তেহেরানে যাবে ভাবছ নাকি?

মনীষা মুচকি হেসে বলল, ভাবছি। গেলে মন্দ হয় না।

তোমার তিনটি ছেলেমেয়েকে কার কাছে রেখে যাবে?

তিনটি?

বাঃ, রজতও তোমার ছেলেরই মতন। তোমাকে ছাড়া নিজে কিছু করতে পারে না। গেঞ্জি আণ্ডারওয়্যার কোথায় থাকে, তার খবর রাখে না পর্যন্ত।

আহা-হা! তখন রাখবে। আমি এতদিন ছেলেমেয়ে দেখাশুনা করেছি, এবার কিছুদিন ও করুক।

দেবযানী বলল, ওখানে গেলে কিন্তু তিন বছরের কন্ট্রাক্টে যেতে হবে। তার আগে কাজ ছেড়ে দিলে টাকা ফেরত দিতে হয়।

জামাইবাবু হাসি ঠাট্টা করে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে মনীষা রজতকে বললে, আমি যদি তেহেরান যাই, তোমার আপত্তি আছে?

রজত আকাশ থেকে পড়ল, তেহেরান? সেখানে তুমি হঠাৎ যাবে কেন? যাবেই বা কি করে?

মনীষা হাসতে হাসতে বলল, চাকরি নিয়ে যাব। ইচ্ছে করলেই সেখানে চাকরি পেতে পারি।

তাই নাকি? ইচ্ছে করলেই পেতে পারো?

হ্যাঁ। মাইনে কত জানো? চব্বিশশো টাকা। ডলারে পেমেন্ট। ওই টাকা জমিয়ে বিলেত ফ্রান্স ঘুরে আসতে পারি। কি—যেতে দেবে?

দু-এক মুহূর্ত মাত্র চুপ করে থেকে রজত বললে, তোমার যদি ইচ্ছে হয় যাবে। তোমার কোন ইচ্ছেতে আমি বাধা দিয়েছি?

মন থেকে বলছ?

নিশ্চয়ই!

ছেলে মেয়েদের কি হবে?

আমি দেখব ওদের।

হুঁ তুমি দেখবে ছেলেমেয়েদের। তোমার সময় কোথায়?

একজন বয়স্কা মহিলা রেখে দেবো, যে ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা দেখাশুনো করবে! একটু ভোর ভোর উঠে আমি ওদের পড়াব। চেষ্টা করব, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে।

এখন ফেরো না কেন তাড়াতাড়ি?

এখন ফিরি না, কারণ ওদের দেখাশুনা করবার জন্য তুমিই তো আছ।

ছেলেমেয়েদের দেখাশুনোটাই বড় কথা? শুধু আমার জন্য বুঝি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারো না?

সোনা, অফিসে যখন খুব কাজ থাকে, তখন কি আমি বলতে পারি যে আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে, আমাকে চলে যেতে হবে? বিয়ের তেরো চোদ্দ বছর পর এ কথাটা বলা যায় না, ন্যাকামির মত শোনায়। কিন্তু মা বাড়িতে নেই, ছেলেমেয়েরা একলা রয়েছে, এ জন্য কাজ ফেলেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়।

দু দিন হয়তো একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, তারপর আড্ডায় মেতে আবার ভুলে যাবে।

না, ভুলে যাব না। তা ছাড়া, আমাদের চাকরিতে কিন্তু লোকের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও একটা কাজ।

আমি যদি যাই, ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাব?

অসম্ভব! ওদের পড়াশুনো নেই? ছেলেটা ক্লাস এইটে উঠেছে, এখন একদিনও ওর পড়াশুনো নষ্ট করা উচিত নয়।

টুম্পু? টুম্পু যদি যায়? ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

টুম্পুকে নিয়ে যেতে পারো। ও ছোট আছে।

তখনকার মতন কথাবার্তা সেইখানেই থেমে রইল। মনীষা অন্যদিনের মতন মেয়েকে স্নান করিয়ে রজতকে খাবার সাজিয়ে দিল। অন্যদিনের চেয়ে সেদিন একটু গম্ভীর মনে হল রজতকে। কথাবার্তা তার ঠিকঠাকই আছে, কিন্তু মুখে যেন একটা পাতলা ছায়া।

দুপুরবেলা কিছুতেই ঘুম এলো না মনীষার। গুমোট গরম পড়েছে দুদিন ধরে। পাখার হাওয়াতে ঘাম শুকোয় না।...ইরান দেশটাও খুব গরম নিশ্চয়ই । হোক না গরম। এয়ারকণ্ডিশানড বাড়ি...দেবযানী বলেছিল, ওখানকার স্কুল হয় সকাল আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত, এ-সময় ছুটি...ওদেশের খাবার দাবার কেমন হয় সে জানে...মনীষা নিজেরটা নিজেই রান্না করে নেবে, দারুণ চাল পাওয়া যায়। দেবযানী বলেছিল দুধ, মাখন সব খুব সস্তা...টুম্পুর স্বাস্থ্যটা যদি ফেরে...তারপর এক ছুটিতে প্যারিসে ঘুরে আসা...ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল একবার প্যারিস যাওয়ার...

বিকেলবেলা বাবলু স্কুল থেকে ফেরার পর, তাকে জলখাবার দিয়ে মনীষা জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে বাবলু, আমি যদি তিন বছরের জন্যে বাইরে কোথাও যাই, তুই বাবার কাছে থাকতে পারবি?

একটু বাদে বাবলুর ফুটবল খেলার বন্ধুরা ডাকতে আসবে। তার আগে সে এইটুকু সময়ের জন্যই একটা গল্পের বই খুলে বসেছে। মায়ের কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়েই সে বললে, হ্যাঁ পারব। তুমি কোথায় যাবে মা?

তেহেরান।

ও!

ও বললি যে? তুই জানিস তেহেরান কোথায়?

জানি। ইরানের রাজধানী।

আমি অতদূরে চলে গেলে তোর মন কেমন করবে না?

বাঃ, মন কেমন করবে কেন? তুমি তো বললে তিন বছর পরে ফিরে আসবে। মনীষার মনটা একট দমে গেল। বাবলু তার কথায় কোন গুরুত্বই দিল না। একবার জানতে চাইলে না, মা কেন চলে যাবে! তার গল্পের বই আর বন্ধু বান্ধবরাই এখন সব। অথচ মাত্র দুবছর আগেও রাত্তিরে একটা না একটা গল্প না বললে বাবলু ঘুমোত না। ছেলেটা দূরে সরে যাচ্ছে, তিন বছর পর বাবলু আর তাকে চিনতে পারবে কিনা কে জানে।

মনীষা গাঢ় গলায় ডাকল, বাবলু!

এই ডাক শুনে বাবলু চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল।

মনীষা বুকের ভেতরকার বাষ্প চেপে রেখে বলল, বাবলু, তিন বছর পরেও যদি আমি ফিরে না আসি, যদি আমি মরে যাই, তোদের কোন কষ্ট হবে না, না রে?

বাবলু বই ছেড়ে উঠে এসে মনীষার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, মা, তোমার কি হয়েছে? তোমার মন খারাপ হয়েছে?

যদি আমি মরে যাই?

ধ্যাৎ!

সেদিন রজত বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে এগারোটার পর। অনেকখানি হুইস্কি খেয়েছে, চোখ লাল। ঠিক মত দাঁড়াতে পারছে না।

মনীষা বলল, এই তোমার তাড়াতাড়ি ফেরার নমুনা? আজই কথা হল আর আজই তুমি দেরি করে ফিরলে?

রজত কড়া গলায় বললে, তাতে কি হয়েছে। তুমি তো আজই বাগদাদ না দার-এস-সালাম কোথায় যেন চলে যাওনি? আজ আমার দরকার ছিল তাই দেরি হয়েছে!

দরকার! রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কারুর অফিসের দরকার থাকে? মুখে মদের গন্ধ। তোমাদের অফিসে কি আজকাল মদ্যপানও চলছে না কি!

রজত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, অফিসে বসে মদ খাব কেন? হোটেল হিন্দুস্থানে গিয়ে খেয়েছি, ক্যাবারে নাচ দেখেছি, কত বিল হয়েছিল জানো? চারশো দশ টাকা। তার ওপর চল্লিশ টাকা টিপস দিয়েছি, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

তোমার মত মানুষের ওপর আমি ছেলের ভার দিয়ে যাব?

ছেলের জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না! সে আমি দেখব।

আজকাল বাড়ির কথা তুমি একটুও চিন্তা কর না। অফিসের কাজের নাম করে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বাইরে থাক, তারপর বাড়িতে এসে নির্লজ্জের মতন মাতলামি করছ।

বেশ করছি! হ্যাঁ, আমি নির্লজ্জই তো।

আমি, আমি...

এখন নাকি কান্না কেঁদো না। প্লীজ...

মনীষা বাথরুমে চলে গেল কাঁদতে। খানিক বাদে বেরিয়ে এসে দেখল রজত অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গায়ের জামাটাও খোলেনি। উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে আছে বালিশে।

মনীষা এসে বারান্দায় দাঁড়াল। রজতের জন্য সে এতক্ষণ না খেয়ে বসে ছিল। এখন আর তার খেতে ইচ্ছে করছে না। রজতকে এখন আর ডেকে লাভ নেই, বাইরের রাতটা ভারি সুন্দর। পাতলা ফিনফিনে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে আকাশে। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস। মাত্র কয়েক বছর আগেও সে আর রজত রাত্রে খাওয়ার পর এই বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে অনেকক্ষণ গল্প করত। এখন গল্প তো দূরের কথা, সারাদিনে রজতের সঙ্গে দুটো চারটের বেশি কথাই হয় না। রজত কত বদলে গেছে।

...তেহেরানের বাড়িটার রং কি হবে? সাদা? সাদা রঙই মনীষার পছন্দ। সাদা ছিমছাম, একতলা বাড়ি। সামনে একটা ছোট বাগান থাকবে। নিজের হাতে যত্ন করবে মনীষা। ওই বাগান নিয়েই তার সময় কেটে যাবে। ওদেশে কি কি ফুলগাছ পাওয়া যাবে? গোলাপ ফুল নিশ্চয়ই আছে। গোলাপ তো ওই সব দেশ থেকেই এসেছে। বসরাই গোলাপ বিখ্যাত।

ওই সব মরুভূমির দেশের আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়। জ্যোৎস্না অনেক গাঢ় হয়। এই রকম সময়, গোলাপ বাগানের মধ্যে জ্যোৎস্নার নিচে বসে থাকবে মনীষা একা। আঃ, শান্তি, শান্তি!

পরদিন মনীষার ঘুম ভাঙল একটু দেরীতে। রজত আগেই উঠে পড়ে বসবার ঘরে কাগজ খুলে বসেছে। সামনে খালি চায়ের কাপ। নিজেই চা বানিয়ে নিয়েছে বোধহয়। মুখখানা গম্ভীর।

মনীষা আপন মনে নিজের কাজ করতে লাগল। বসবার ঘরে এলো না একবারও। আজ ছুটির দিন, তাই ছেলেমেয়েদের জাগাল না।

রজত একবার ডাকল, মনি, শোন!

মনীষা কোন সাড়া দিল না।

রজত আরও দু-তিন বার ডেকে সাড়া না পেয়ে চলে এলো রান্নাঘরে।

মনীষা পিছনে না ফিরেই তার উপস্থিতি টের পেয়ে শুকনো গলায় বলল, টোস্ট আর ডিম সেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে।

রজত বলল, ঠিক আছে, আমার কোন তাড়া নেই। শোন, আমি ভাবছিলাম আজ দুপুরে রান্নাবান্না করার দরকার নেই। সবাই মিলে চল বাইরে গিয়ে কোথাও খেয়ে আসি।

মনীষা বলল, দরকার নেই। আমি বাড়িতেই রেঁধে নিতে পারব।

সে তো রোজই রাঁধছ। চল, আজ কোন চিনে দোকানে খাই।

ঘুষ দিতে চাইছ?

ঘুষ?

আগের দিন বাড়ি ফিরে মাতলামি করে পরদিন চিনে খাবারের ঘুষ? তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আজ আবার হোটেল হিন্দুস্থানে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেও ওসব।

রজত একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল, কাল রাতে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, সে জন্যে আমি দুঃখিত। কাল আমার মেজাজটা ভাল ছিল না।

এ সব কথা বলার জন্য যতটা গলার আওয়াজ নরম করা উচিত, যতটা বিনীত হওয়া উচিত রজতের কথায় তা নেই। সে যেন কথাগুলো বলছে দায়সারা ভাবে।

মনীষার আরও রাগ হয়ে গেল।

রজত ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে রান্নাঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, সাড়ে চারশো টাকা খরচ করে হোটেল হিন্দুস্থানে গিয়ে মদ খাবার মতন দুর্মতি যে আমার হয়নি, সেটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। টাকাটা দেবে কোম্পানি। একজন অপরিচিত পাঞ্জাবির সঙ্গে বীভৎস ক্যাবারে নাচ দেখবার মতন রুচি যে আমার নেই, আশা করি এটাও তুমি জানো। তবু আমাকে যেতে হয়েছিল। লোকটি একজন আর্মি অফিসার। আমাদের একটা জিনিসের কোয়ালিটি ও অ্যাপ্রুভ না করলে বারো লাখ টাকার একটা অর্ডার ক্যানসেলড হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য কোম্পানি থেকে ওই লোকটিকে ঢালাও তোষামোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই লোকটিই ক্যাবারে দেখতে চেয়েছিল, আমাকে ওর পাশে বসে সর্বক্ষণ দেঁতো হাসি হাসতে হয়েছে।

মনীষা মুখ ঘুরিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, ও রকম চাকরি করা কেন? ছেড়ে দিতে পারো না? চাকরি করতে গেলে এ রকম নোংরা কাজ করতে হবে?

এ দেশের সব কোম্পানি এক্সিকিউটিভদেরই নানা রকম নোংরা কাজ করতে হয়। সকলে এই কাজগুলোকে নোংরা মনে করে না অবশ্য।

ছেড়ে দাও ওই চাকরি!

মেয়েদের পক্ষে এই সব কথা বলা সোজা। তারা একবারও চিন্তা করে না, টাকাটা রোজগার হয় কি ভাবে। অথচ টাকা না থাকলেই তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়! যে মাসে একটু টাকা পয়সার অসুবিধে থাকে, সেই মাসটা একটু টেনেটুনে চালাতে বললে, অন্তত সাতবার শোনাবে, কত দরকারি জিনিস সে মাসে কেনা হল না। তোমার দিদি কিংবা কোন মাসী কত বেশি টাকা খরচ করে। বল না?

তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, দরকার হলে আমরা গাছতলায় গিয়ে থাকব।

সেখানে তোমার মোজাইক করা পরিষ্কার বাথরুমের দরকার হবে। তাছাড়া আমরা গাছতলায় থাকবই বা কেন? আমরা নিজেদের বাড়িতে আর পাঁচজনের মতন ঠাট বজায় রেখেই থাকব। সেজন্যে কিছু মূল্য দিতেই হয়।

আমি কিন্তু তেহেরানে চলে যাবই।

আমি তা আপত্তি করিনি। আমি তোমার কোন কাজে কখনো বাধা দিয়েছি। এখানে তোমার জীবন যদি একঘেয়ে লাগে, তুমি কিছুদিনের জন্য নিশ্চয়ই ঘুরে আসতে পারো।

অন্তত তিন বছর।

বেশ তো।

রজত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে এলো। মনীষার কাঁধে হাত রেখে শান্ত ভাবে বলল, একটা জিনিস কখনো ভুল করো না। আমি তোমায় ভালবাসি।

দেবযানী মেয়েটি ফিরে গেছে ইরানে। সেখান থেকে সে মনে করে ফর্ম পাঠিয়ে দিয়েছে মনীষাকে। দুপুরবেলা রেজিস্টার্ড পোস্টে খামটা আসবার পর মনীষা বহুক্ষণ ধরে ফর্মগুলো পড়ে দেখল। বাবা রে বাবাঃ, কত রকম নিয়ম কানুন। বাবা, মা ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, দিদিমাদের কারুর কোন অসুখ আছে কি না তা পর্যন্ত জানাতে হবে। কিন্তু মাইনে বেশ ভাল। বছরে এগারো মাস কাজ। এক মাস পুরো ছুটি। সেই সময় দেশে ঘুরে যাবার ভাড়া দেবে ইরান সরকার।

...এক বছর পর ফিরে এসেছে মনীষা। টুম্পুটার দারুণ স্বাস্থ্য হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা তাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেই বলল, বৌদি, কোথায় ছিলেন এতদিন? নিচতলার ভাড়াটে বলল, মনীষাদি, কী সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি!

ঠিক যেন দশ বছর বয়েস কমে গেছে! মনীষার সঙ্গে প্রচুর জিনিসপত্তর। সকলের জন্য উপহার এনেছে নানা রকম। রজত হাসতে হাসতে বলল, তোমাকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। ঠিক যেন মনে হচ্ছে অন্য কাদের বউ! মনীষা লাজুক ভাবে হেসে বলল, আহা-হা, এক বছরে কেউ এতখানি বদলায় নাকি? তারপর সে আবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, জানো আসবার আগে গ্রীস ঘুরে এলাম। এথেন্সে ছিলাম, আরও দু-একটা জায়গায় যেতাম, কিন্তু টুম্পুটা বাড়ি ফেরার জন্য কান্নাকাটি করল, অনেকদিন তোমাকে দেখেনি তো!...

দরজায় শব্দ হল। টুম্পু এসে গেছে স্কুল থেকে। মনীষার মেজাজটা আজ খুব ভাল। টুম্পুর হাত থেকে বই খাতা নিয়ে সে বলল, টুম্পু শোন, তোমাকে আর এই স্কুলে পড়তে হবে না।

টুম্পু বলল, আমাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে? বড় হয়ে গেছি!

না। আমরা দূরে এক জায়গায় বেড়াতে চলে যাব। তুমি সেখানকার ইস্কুলে পড়বে।

কোথায় মা?

সে অনেক দূর। এরোপ্লেনে করে যেতে হবে। দাদা আর বাবা কিন্তু যাবে না। শুধু তুমি আর আমি।

দাদাকে নিয়ে যেও না। দাদা দুষ্টু। বাবা যাবে।

না, বাবা যাবে না।

টুম্পু একগাল হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ, আমি জানি বাবা যাবে। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। বাবা না গেলে কে আমাদের নিয়ে যাবে?

কেন? আমি বুঝি নিয়ে যেতে পারি না?

পুরীতে যাবার সময় তুমি যে রেলের টিকিট হারিয়ে ফেললে?

ও মা! সে কথা তোর এখনো মনে আছে? তুই তো তখন অনেক ছোট।

হ্যাঁ, মনে আছে। বাবা বকল তোমাকে সেই জন্য।

একবার টিকিট হারিয়ে ফেলেছি তো কি হয়েছে। এবার কিছু হারাবে না।

পরদিন সকালে রজতকে ফর্মগুলো দেখাল মনীষা। রজত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বলল, এখানে ছেলেমেয়েদের কথা কিছু লেখা নেই। যার চাকরি হবে, সে যাওয়ার ভাড়া পাবে। ছেলেমেয়েদের ভাড়া দেবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না!

মনীষা একটু দম দিয়ে বলল, এই রে, তাহলে টুম্পু যাবে কি করে?

রজত বলল, সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। সব ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়, তাহলে টুম্পুর ভাড়া আমি যোগাড় করে দিতে পারব।

কত টাকা।

সে দেখা যাবে। কিন্তু তোমার পাসপোর্টও তো করিয়ে রাখা দরকার। হঠাৎ যদি সব ঠিক হয়ে যায় তাহলে পাসপোর্টের জন্য আটকে যেতে পারে। আমি পাসপোর্টের ফর্ম আনিয়ে দেব কালই।

খানিক বাদে মনীষা বলল, তুমি কাল রাত্রে ভয়ঙ্কর কাশছিলে?

রজত বলল, কই না তো!

হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে কাশতে কাশতে একবার উঠে বসলে পর্যন্ত।

ও কিছু না।

তুমি একবার ডাক্তার দেখালে পারো।

সামান্য কাশির জন্য কেউ ডাক্তার দেখায়? তাছাড়া এখন আমার সময়ও নেই। সিগারেটটা একটু কমিয়ে দিলেই হবে।

পাসপোর্টের ফর্মের কথা রজত নিজেই বললেও সেটা আবার সে ভুলে গেল। দু'দিনের মধ্যেও সে আর উচ্চবাচ্য করল না দেখে মনীষার একটু সন্দেহ হল, তা হলে কি রজত তার যাওয়াটা ঠিক চায় না? কিন্তু এদিকে মনীষার মনের ভাব এমন যেন তার তেহেরান যাওয়া একেবারে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সে এখন সাদা রঙের একতলা বাড়িটা যখন তখন দেখতে পায় চোখের সামনে। সে এমন কি সেই বাড়িটা তার মনের মতন করে সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। মনে মনে।

তৃতীয় দিনে সে জিজ্ঞেস করল, তুমি সেই পাসপোর্টের ব্যাপারটা...তোমার যদি অসুবিধে থাকে, তাহলে আমিই না হয়—

রজত খুবই লজ্জিত হয়ে বলল, এই রে ছি ছি! আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমি আজই...অফিসের একটা কাজ নিয়ে এমন দুশ্চিন্তায় রয়েছি কদিন ধরে...অন্য কোন দিকে মনই দিতে পারছি না।

অফিস থেকে কেন এত দুশ্চিন্তা কর! শরীর খারাপ হয়ে যাবে শেষে! মালিকরা টাকা দেয় বলে কি তোমাকে কিনে নিয়েছে নাকি?

চাকরি মানে তো অনেকটা তাই! তাছাড়া, একটা ব্যাপার কি জানো, কোন একটা কাজ হাতে নিয়ে সেটা ঠিকমতন শেষ করতে না পারলে শান্তি পাওয়া যায় না। এটা পুরুষ মানুষের একটা চ্যালেঞ্জ। যাক গে, তোমার পাসপোর্টের ফর্ম আমি আজই আনিয়ে দেব।

আমি ফর্মটা ফিলাপ করেছি।

তাহলে ওটা পাঠিয়ে দাও, দেরি করছ কেন?

একটা জায়গায় বুঝতে পারছি না। তুমি একটু দেখে দেবে?

রজত ফর্মটা নিয়ে যেটুকু বাকি ছিল, সব ভর্তি করে দিল। পাড়ার স্টুডিও থেকে এর মধ্যেই মনীষা পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলিয়ে এনেছে ছখানা। সেই কখানা ছবি দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে। ছবিটা দেখে রজত বলল, তোমাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতন দেখাচ্ছে!

মনীষা বলল, যাঃ, বুড়ি হয়ে গেছি। দেখি, যদি ওখানে গিয়ে শরীরটা সারে।

খামের ওপর ঠিকানা লিখে রেখেছে মনীষা আগেই। এবার তার মধ্যে সব কাগজপত্র ভরে আঠা দিয়ে আটকে দিল। রজত বলল, দাও, আমি অফিস থেকে বেয়ারা পাঠিয়ে ওটা পোস্ট করে দেব এখন!

মনীষা বলল, রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে হবে।

রজত বলল, তা তো নিশ্চয়ই। সে আমি ঠিক করে দেব এখন।

তুমি পাঠিয়ে দেবে? থাক।

কেন?

তুমি কেন কষ্ট করবে। আমি আজ একবার বেরুব, পোস্ট অফিস তো কাছেই, আমিই পোস্ট করে দেব এখন।

আমার আবার কষ্ট কি। বেয়ারা পাঠিয়ে দেব।

থাক। আমিই দেব এখন।

রজত কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল মনীষার দিকে। গুপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অফিস যাবার পথে ম্লান হয়ে রইল তার মুখ। মনীষা তাকে বিশ্বাস করে না। মনীষা বোধহয় ভেবেছে, রজত ঠিক মতন ওই খামটা না-ও পাঠাতে পারে।

মনীষা কিন্তু এ সব বুঝল না। সে নিজের আনন্দে মশগুল হয়ে আছে। এই খামটা যেন তার নতুন জীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি। এটা সে নিজের হাতে পাঠাবে, এই কথা ভেবেই উত্তেজিত হয়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এলো রজত। হাত মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় ছেড়েই সে ছেলেকে ডেকে বলল, বাবলু, তোর ইংরিজি গ্রামার বইটা নিয়ে আয়।

বাবলু রীতিমত অবাক। বাবা কোনোদিন তাকে পড়ায় না। কিন্তু সেদিন রজত দারুণ তোড়জোড় করে পড়াতে বসল বাবলুকে। পড়াবার অভ্যাস নেই বলেই সে রেগে উঠতে লাগল প্রায়ই। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে বাবলুর, রজত তবু নিষ্কৃতি দেবে না।

মনীষা বলল, আজ আর থাক। এবার ওঠ।

রজত বলল, ও গ্রামারে খুবই কাঁচা রয়েছে দেখছি! কিছুই জানে না।

মনীষা হেসে বলল, তুমি কি একদিনেই ওকে পণ্ডিত করে তুলবে নাকি?

এবার থেকে প্রায়ই ওকে নিয়ে বসব ঠিক করেছি।

তা হলে ভালই হবে। ওর মাথা আছে, কিন্তু বড্ড ফাঁকি দেয়।

টুম্পু অভিমান করে রইল বাবার ওপর! বাবা কেন দাদাকে পড়াচ্ছে, তাকে পড়াচ্ছে না? বাবা কি দাদাকে বেশি ভালবাসে তার চেয়ে?

কয়েক মাস কেটে গেছে, মনীষা পাসপোর্ট নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে। কিন্তু ইরান থেকে আর উত্তর আসে না। মনীষা আলাদা চিঠি লিখল সেই দেবযানী নামের মেয়েটিকে। দিন পনেরো বাদে উত্তর এলো। দেবযানী এখন আর তেহেরানে নেই, তার স্বামী আরও ভাল চাকরি পেয়ে চলে এসেছে বাগদাদে। ওরা ঠিক খবর দিতে পারবে না। কিন্তু মনীষার তো হয়ে যাবার কথা। ওর চেনা একজন বড় অফিসারকে বলে এসেছিল মনীষার কথা।

...একদিন মনীষা সকালবেলা ক্ষুণ্নভাবে বলে ফেলল, তিনমাস হয়ে গেল। কোন উত্তর এলো না? দূর ছাই, ওরা বোধহয় আর ডাকবে না!

রজত অতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল, খামটা তো তুমি নিজেই পাঠিয়েছিলে রেজেস্ট্রি করে। পৌঁছেচে নিশ্চয়ই।

মনীষা ব্যঙ্গটা ধরতে পারল না। সে বলল, পৌঁছবে না কেন? ওরাই উত্তর নিচ্ছে না!

মনীষার মন খারাপ করা মুখের দিকে চেয়ে রজত একটু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আসবে, এখনো বেশি দেরি হয়নি, মোটে তো তিন চার মাস হল।

তারপর সে একটু মিনমিন করে বলে, শুনেছিলাম, আজকাল বাইরের সব চাকরিই মিনিস্ট্রি অভ এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্সের থ্রু দিয়ে আসতে হয় সেটাও কিছু অসুবিধে হবে না। ওরা কিছু লিখলে দিল্লী থেকে অনুমতি আনিয়ে নেওয়া যাবে। নিছক একটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার।

কিন্তু পরের মাসেও কোন চিঠি এলো না। এদিকে সেই গোলাপ বাগান ঘেরা একতলা বাড়িটা তেহেরান শহরে এখনো খালি পড়ে আছে। মনীষা তার জানালার পর্দার রঙ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়।

রজতের অফিসের ব্যাগটার মনীষা কখনো হাত দেয় না। অনেক দরকারি কাগজপত্র থাকে, মনীষার ভুলো মন, যদি কোন কাগজ হারিয়ে যায়, সেই জন্য। একদিন ব্যাগটা খাবার টেবল থেকে ঘরে নিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ খুলে গেল। পড়ে গেল কয়েকটা কাগজ। সেগুলো তুলতে গিয়ে ঠিক আসল কাগজটাই সে দেখে ফেলল। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান। রজতের ব্লাডপ্রেসার অনেক বেড়েছে। তার ব্লাড কোলেস্টেরল হয়েছে, হার্টের ই-সি-জি করাতে বলা হয়েছে। এছাড়া দেওয়া হয়েছে একগাদা ওষুধ।

মনীষা গালে হাত দিয়ে বসে রইল। রজত এ সব কথা কিছুই বলেনি। এর একটাও ওষুধ নেই বাড়িতে। রজত এমনিতেই চাপা স্বভাবের, নিজের অসুখ বিসুখের কথা সে কখনো বলে না। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার সে গোপন করে যাবে। রজত তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

এরপর একদিন রাত এগারোটা বেজে গেল, তবুও রজত ফিরল না। অফিসে বেরুবার সময় সে সামান্য একটু আভাস দিয়ে গিয়েছিল যে তার ফিরতে দেরি হতে পারে। কত দেরি? রজতের শরীর ভাল নেই, প্রায়ই রাত্রে সে খুব কাশে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেই হাঁপিয়ে যায়। তবু অফিসের জন্য এত খাটনি, এত রাত করা, হঠাৎ যদি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে? যাতে তার তেহেরান যাওয়ার ব্যাঘাত না হয়, তাই রজত তার অসুখের কথাটা গোপন করে গিয়েছিল।

বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে রইল মনীষা। রাস্তায় যে কোনো লোকের পায়ের শব্দ বা যে কোনো গাড়ির আওয়াজ শুনলেই মনে হয়, ওই বুঝি রজত এলো! কিন্তু সে আসে না।

মনীষা অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে ফুটে ওঠে একটা সাদা বাড়ি। ভেতরটা ঠান্ডা। বাইরের আকাশে প্রগাঢ় জ্যোৎস্না। গোলাপ বাগান ধুয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। সেই বাগানে একটি চেয়ার। ফাঁকা। ওই বাড়িটার নাম মুক্তি। অনেক অনেক দূরে ওই বাড়ি মনীষা ওখানে কোনোদিনও যাবে না।

স্বপ্নের একটি দিন

মনোলীনার মাথায় যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন আসে। কখন যে সে কোন কথাটা বলবে, তার কোনো ঠিক নেই। প্রসঙ্গ বদলে ফেলতে তার এক মুহূর্তও লাগে না। সেই জন্যই মেয়েটিকে বড় বেশি রহস্যময়ী মনে হয়।

শুভ্র ভর দুপুরবেলা ওর সঙ্গে এসেছে গঙ্গার ধারে। বেশি ভিড় নেই এখন এখানে। চার পাঁচ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে-সেখানে। আর কিছু অলস চেহারার মাঝবয়েসি লোক, পৃথিবীর সমস্ত পার্কে বা বেড়াবার জায়গায় এই ধরনেরকিছু লোককে বসে থাকতে দেখা যায়। তবুও অনেক বেঞ্চ খালি। কিন্তু একটাও পছন্দ নয় মনোলীনার। বেশ সুন্দর, গাছের ছায়ার নিচের ফাঁকা বেঞ্চ দেখেও সে বলছে, উঁহু, এখানে নয়!

শুভ্র হেসে বলল—তোমার যদি বসতে ইচ্ছে না করে, আমরা হেঁটেও বেড়াতে পারি। আমার রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতে ভাল লাগে।

মনোলীনা জিজ্ঞেস করল—হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যে তুমি হেঁটেছ কখনও?

শুভ্র বলল—হ্যাঁ। কেন হাঁটবো না!

—শেষবার কবে? এমনি কলকাতা শহরের কাদা নয়। হাঁটু পর্যন্ত কাদা!

শুভ্র একটু মুশকিলে পড়ল। ঠিক বলা শক্ত, শেষবার কবে সে কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটেছে। বারবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। যেন শুভ্র একটা বাচ্চা ছেলে, ইচ্ছে করে কাদার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে, কোন এক অচেনা নদীর ধারে।

শুভ্র সময় নিচ্ছে দেখে, মনোলীনা বলল—থাক, বলবার দরকার নেই।

—মনে পড়েছে! একবার সুন্দরবন গিয়েছিলাম...নৌকো থেকে নেমে দারুণ কাদা...ঝিনুকের টুকরোয় আমার পা কেটে গিয়েছিল।

—কতদিন আগে?

—আট ন বছর হবে। দাঁড়াও, হিসেব করে দেখছি, না, ঠিক এগারো বছর আগে।

—তখন আমি ফ্রক পরতাম।

মনোলীনার বয়স কুড়ি একুশের বেশি নয়। শুভ্রর বয়েস প্রায় চল্লিশ ছুঁয়েছে, বেশ কিছু পাকা চুল দেখা যায়। ওদের দেখলে কেউ ঠিক প্রেমিক-প্রেমিকা ভাববে না। ওরা তা নয়ও বোধ হয়।

শুভ্র জিজ্ঞেস করল—কফি খাবে? দোকানটা খোলা আছে দেখেছি।

মনোলীনা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল—আমি কোথায় জন্মেছি, জান?

তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, আমি কোথায় জন্মেছি, তা হলে আমি বলব রাস্তায়।

—তার মানে?

—আন্দাজ কর।

—ট্রেনের মধ্যে? প্লেনে? গাড়িতে যেতে যেতে?

—না, হল না।

—তা হলে? এ তো খুব শক্ত ধাঁধা দেখছি?

আমি তোমাকে আমার জন্মস্থান দেখিয়েও দিতে পারি। সেটা সত্যিই একটা রাস্তা।

—ব্যাপারটা কী, খুলে বল।

—আমরা তখন দুবরাজপুরে থাকতাম। মানে, আমার মা আর বাবা থাকতেন। আমি তো তখন পৃথিবীতে ছিলামই না। তারপর আমি জন্মালাম। একটা ছোট্ট সুন্দর সাদা একতলা বাড়ি। এখন সে বাড়িটা নেই। সেই বাড়িটা ভেঙে এখন সেখান দিয়ে একটা রাস্তা হয়েছে। বাস যায়, ট্রাক যায়।

মনোলীনা খুব হাসতে লাগল। তারপর হাতের বইগুলো ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে—এখানে বসবে?

শুভ্র বলল—না। রোদ্দুরের মধ্যে আমি হাঁটতে পারি, কিন্তু বসে থাকতে ভাল লাগবে না।

মনোলীনা বলল—তা হলে ওই গাছের নিচে। মোট কথা মাঠে বসব, বেঞ্চিতে না।

গাছটার তলায় গিয়ে মনোলীনা বসলো না, সোজা শুয়ে পড়ল। জায়গাটা খুব পরিষ্কার নয়, কিছু আখের ছিবড়ে পড়ে আছে। দু একটা আইসক্রিমের গেলাস। মনোলীনা সে সব গ্রাহ্য করল না।

শুভ্রর একটু অস্বস্তি লাগছে। একটা মেয়ে মাঠের মধ্যে এ রকম ভাবে শুয়ে থাকলে পথচারীরা ফিরে ফিরে তাকাবেই। তবু শুভ্র ঠিক করল, সে মনোলীনার কোন ইচ্ছেতেই বাধা দেবে না।

—আমি যখন জন্মাই, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

শুভ্র একটু হিসেব করে নিয়ে বললে—খুব সম্ভব বিলেতে। আমি উনিশ বছর বয়েসে বিলেতে গিয়েছিলাম পড়তে।

—অনেকদিন ছিলে?

—প্রায় দশবছর।

আর তুমি যখন জন্মাও, তখন আমি কোথায় ছিলাম?

শুভ্র এবার হাসলে। এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন কোনো মেয়ের কাছে থেকে কখনো শোনে নি শুভ্র। সে যখন জন্মায়, তখন মনোলীনা কোথায় ছিল?

শুভ্র বলল—ওই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে না। 'ইচ্ছা' হয়ে ছিল মনের মাঝারে—' তোমার নামটাও এদিক থেকে খুব সার্থক।

—তুমি কবিতা পড় বুঝি?

—কেন, ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝি কবিতা পড়তে নেই? এখন অবশ্য সময় পাই না, কিন্তু এক কালে পড়তাম।

—বিলেতে যাবার আগে তুমি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়নি?

—না। বিলেত যাবার পরই।

—তুমি ইংরেজিতে প্রথম প্রেম করেছো?

—তাও না। বিলেতে গিয়ে আমি একটি বাঙালি মেয়েরই প্রেমে পড়েছিলাম।

—সেই মেয়েটিই হাসিদি?

—উঁহু। হাসিকে আমি প্রেম করেছি দেশে ফিরে এসে।

—তা হলে সেই মেয়েটি, যাকে তুমি প্রথম ভালবেসেছিলে। তাকে তুমি বিয়ে করলে না, নাকি সেই তোমাকে বিয়ে করল না?

—সেই আমাকে বিয়ে করল না। তার বদলে সে টুপ করে মরে গেল।

—তাকে তোমার মনে আছে? তার মুখটা মনে আছে?

—হ্যাঁ, সব মনে আছে।

—কত বয়েস ছিল তার, যখন সে মরে যায়?

—প্রায় তোমারই বয়েসি ছিল।

—সেই জন্যই আমার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয়, আমি যদি এখন মরে যাই, তা হলে আমাকে অনেকে অনেক দিন মনে রাখবে। নইলে, আমি সকলের কাছেই একদিন না একদিন পুরনো হয়ে যাব।

—মনোলীনা। তুমি সত্যিই একটা অদ্ভুত মেয়ে!

মনোলীনা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাটি থেকে পটাং পটাং করে কয়েকটা ঘাস ছিঁড়ল। তারপর সেইগুলো শুভ্রর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—তোমাকে যে আজ ডেকে আনলাম, সে জন্য তুমি রাগ করেছ?

শুভ্র বলল—না, রাগ করব কেন? তবে একটু অবাক হয়েছি ঠিকই।

—অবাক হওয়াটা তো খুব ভাল। আমার মানুষকে অবাক করে দিতে খুব ভাল লাগে।

—আমরা তো আজকাল চট করে অবাক হই না।

—জীবনে আমরা যতবার অবাক হই, তার চেয়ে অনেক বেশিবার রেগে যাই, তাই না? অথচ আমরা কেউ রাগতে চাই না। অবাক হতেই চাই।

মেয়েটি এত সুন্দরভাবে কথাটা বলল। শুভ্র একটা তীব্র খুশি বোধ করল শরীরে। তার ইচ্ছে করল, মেয়েটিকে আদর করতে। কিন্তু এই দুপুরবেলা খোলা মাঠের মধ্যে...তাছাড়া মনোলীনার সঙ্গে তার পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের।

তবু সে হাত বাড়িয়ে মাটির ওপর ছড়িয়ে থাকা মনোলীনার একটা হাত চেপে ধরল। মনোলীনা হাত সরিয়ে নিল না, তার কোমল হাতের স্নিগ্ধ উত্তাপ উপহার দিল শুভ্রকে। তারপর বলল—তুমিও শুয়ে পড় না এখানে:

শুভ্র ভুরু উঁচু করে বলল, শুয়ে পড়ব!

—হ্যাঁ, কেন, তোমার ইচ্ছে করছে না? টাই আর কোট পরে তোমায় মজার দেখাচ্ছে। কোটটা খুলে ফেলে মাথার বালিশ করে নাও!

—হঠাৎ মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ব?

এমনিতেই শুভ্রর চেনাশুনো কেউ তাকে এই দুপুরবেলা মাঠের মধ্যে বসে থাকতে দেখলে আঁতকে উঠবে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারবে না। শুভ্রজ্যোতি সেনগুপ্ত একজন বিরাট ব্যস্ত মানুষ। বিলেত থেকে ফেরার পরে শুভ্র কিছুদিন সরকারি দপ্তরে কাজ করেছিল, তারপর নিজের ফার্ম খোলে। সারা ভারত জুড়ে তাদের কাজ কারবার, এমন কি মালয়েশিয়াতেও কাজ করছে কিছু। কাজের ব্যাপারে শুভ্র দারুণ সিরিয়াস। তাছাড়া, সে হাল্কা স্বভাবের মানুষ নয়। সে নেশা করে না, বা মেয়েদের পেছনে ছোটাছুটি করে না। গোপনে যদি নারীদের উপভোগ করতে চাইতো সে, তা হলেও তার কোনো অসুবিধে ছিল না। প্রায়ই তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়, টাকা দিয়ে সে মেয়েদের কিনতে পারে। কিন্তু শুভ্রর সে রকম কোনো ইচ্ছে হয় না। বিবাহিত জীবনে সে পরিতৃপ্ত।

মনোলীনার সঙ্গে তার আলাপ মাত্র কয়েকদিন আগে। তার ছোট শ্যালিকার বান্ধবী এই মেয়েটি। একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে প্রথম পরিচয় হয়। সেদিন উৎসব ভাঙতে বেশ রাত হয়েছিল। তার ছোট শ্যালিকা বলেছিল, শুভ্রদা, তুমি একটু আমার বান্ধবীকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবে? অনেক রাত হয়ে গেছে, ওকে একা একা যেতে হবে...।

হাসির জ্বর হয়েছিল বলে সেদিন সে নেমন্তন্ন বাড়িতে আসে নি। গাড়িতে আরও কয়েকজন লোক উঠেছিল, সবাইকে নামাতে নামাতে গিয়েছিল শুভ্র। মনোলীনার বাড়ি সবচেয়ে শেষে। মনোলীনার বাড়ির সামনে এসেও গাড়ির মধ্যে অন্তত আধঘণ্টা কথা বলেছিল দুজনে। প্রথম আলাপেই মনোলীনা তাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিল। আজকালকার মেয়েরা বোধহয় এ রকমই বলে।

সেদিন মনোলীনা বলেছিল—তুমি সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দিলে, কিন্তু কারুর সঙ্গে একটাও কথা বললে না কেন?

শুভ্র অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—কথা বলিনি? কই, বললাম তো!

—সে তো শুধু ভদ্রতার কথা। সবাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাল, তুমি তার উত্তরে ভদ্রতা দেখালে। তুমি অন্য কথা ভাবছিলে? তুমি বুঝি সব সময় কাজের কথা ভাবো?

প্রথম দিনের আলাপেই কেউ এ রকম ভাবে কথা বলে না। তাছাড়া, একটা কলেজে-পড়া বাচ্চা মেয়ে...তার তুলনায় শুভ্র রীতিমত একজন দায়িত্বপূর্ণ ভারিক্কি লোক।

সেদিন গাড়ি থেকে নামবার সময় মনোলীনা বলেছিল—পাইপ খাও, এক এক সময় তোমার চোখ বুজে যায়—আমি লক্ষ্য করেছিলাম। যারা লোকজনের মাঝখানে চোখ বুজে পাইপ টানে, তাদের সেই সময়টায় খুব বোকা বোকা দেখায়।

শুভ্র এ কথা শুনে রাগ করবে না বিরক্ত হবে, ঠিক করতে পারছিল না। মনোলীনা তক্ষুনি আবার বলেছিল—এবার থেকে চেষ্টা করে চোখ খুলে রেখো...তুমি তো আর সত্যি সত্যি বোকা নও!

শুভ্র এরপর তার ছোট শ্যালিকা জয়িতাকে বলেছিল—তোমার বান্ধবীটি ভারি অদ্ভুত তো। কী রকম যেন কথা বলে...

জয়িতা বলেছিল—ঐ মনোলীনা তো, কলেজে ওকে অনেকে পাগলী বলে—কিন্তু দারুণ ভাল মেয়ে। মনটা একেবারে সোনার মতন।

দু তিনদিন বাদেই মনোলীনা একদিন ওদের বাড়িতে এসে হাজির। কয়েক মিনিটেই হাসির সঙ্গে তাঁর দারুণ ভাব হয়ে গেল। কোন রকম আড়ষ্টতা না দেখিয়ে সে ঘুরে ঘুরে দেখল সব কটা ঘর। শুভ্রর ঘরের দেয়ালে একটা ছবি বাঁকা হয়ে ঝুলেছিল, সেটাকে সোজা করে দিল।

চা খেল তিন কাপ। তখন টেলিভিশানে সিনেমা শুরু হবার কথা, তাকে বলা হল সিনেমা দেখে যেতে। কিন্তু সে তক্ষুনি হাতের বইগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

সে কেন এসেছিল, কেন হঠাৎ চলে গেল, কিছুই বোঝা যায় নি। সে যাবার পর দেখা গেল, একখানা বই সে ফেলে গেছে।

আজ সে হঠাৎ শুভ্রর অফিসে এসে হাজির। শুভ্র তখন বোর্ড মিটিং-এ ব্যস্ত ছিল। অন্য যে কেউ হলে সে দেখাই করত না। কিন্তু হাজার হোক একটি যুবতি মেয়ে এবং ছোট শ্যালিকার বান্ধবী, সুতরাং পুরোপুরি অবজ্ঞা করা যায় না। হাতের কাজ খানিকটা সরিয়ে রেখে সে মনোলীনাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার?

যেন কতকালের চেনা। এই রকম ভাবে মনোলীনা বলেছিল, তোমার অফিসটা দেখতে এলাম। একজন মানুষকে শুধু নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখলে চেনা যায় না। নিজের বাড়িতে, অফিসে সেই নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা মানুষ!

শুভ্র বলেছিল, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ তো খানিকটা আলাদা হয়ে যায়ই। এতে আর আশ্চর্য কী আছে?

—তুমি আমার সঙ্গে একটু বেরুবে? গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাব।

শুভ্র আকাশ থেকে পড়েছিল। অফিসে হাজার ব্যস্ততার মধ্যে নিশ্বাস ফেলার পর্যন্ত সময় থাকে না। অন্যের অফিস

নয় যে শুভ্র মাঝে মাঝে ফাঁকি মারবার চেষ্টা করবে। এটা তার নিজের অফিস। তাছাড়া দুপুরবেলা গঙ্গার ধারে বেড়ানো...সে তো কলেজের ছেলেদের ব্যাপার।

শুভ্র বলেছিল, তোমার গঙ্গার ধারে বেড়াতে ইচ্ছে করছে...আমার সঙ্গে ... .কেন, তোমার নিজের বন্ধু-টন্ধু নেই?

মনোলীনা বলেছিল, কেন থাকবে না, অন্য অনেকের সঙ্গেই তো বেড়াতে যাই...আজ তোমার সঙ্গেই যেতে ইচ্ছে করছে। তুমি যাবে না?

শুভ্র বলতে যাচ্ছিল, না, এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার। অফিসের জরুরি কাজকর্ম ফেলে সে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাবে? মনোলীনা সরল ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে তাকিয়েছিল তার দিকে। যেন এই মেয়েটিকে কিছুতেই আঘাত দেওয়া যায় না।

তখন হঠাৎ শুভ্র ভেবেছিল, একদিন নিয়মের ব্যতিক্রম করলেই বা ক্ষতি কী? দেখাই যাক না, এই মেয়েটি তার কাছে কী চায়। অফিসের সমস্ত লোককে বিস্মিত করে শুভ্রজ্যোতি সেনগুপ্ত দুপুর তিনটের সময় বেরিয়ে পড়েছিল একটি সুন্দরী যুবতি মেয়ের সঙ্গে।

শুভ্র বলল, আমি টাই পরে আছি বলে তোমার খারাপ লাগছে। আচ্ছা, খুলে ফেলছি।

মনোলীনা বলল, তুমি এই মাঠের ওপর শুয়ে পড়তে লজ্জা পাচ্ছো? কিন্তু, শুয়ে থাকলে কতখানি আকাশ দেখা যায়...শুয়ে আকাশ দেখা মানুষের ভাগ্যে খুব কম হয়...

শুভ্র খুলে ফেলল কোটটা। সেটা সাবধানে ভাঁজ করে রেখে সেও শুয়ে পড়ল, ইচ্ছে যখন, ছেলেমানুষির চূড়ান্ত হোক। এই অবস্থায় শুয়ে থাকা আইনবিরুদ্ধ কিনা কে জানে। যদি তাদের পুলিশে ধরে।

মনোলীনা পাশ ফিরল শুভ্রর দিকে। শুভ্র বুকের ওপর সে নিজের এক হাত রেখে বলল, তুমি জান না, তোমার মুখখানা এখন একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। তুমি নিজেই দেখলে বোধ হয় চিনতে পারবে না।

শুভ্র বলল, আমি এখন সত্যিই একটা অন্য মানুষ।

—তুমি ফুল ফোটা দেখেছ?

—ফুল ফোটা মানে? কী ফুল?

—যে কোনো ফুল। গাছে প্রথমে একটা কুঁড়ি এল, তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে সেটা ফুটল, একদিন পুরোপুরি ফুল হল, তারপর আবার ঝরে গেল...

—না দেখিনি...ফুল অনেক দেখেছি, ফুলের মালা...ফ্লাওয়ার ভাসে সাজান ফুল।

—ফুলের চেয়েও ফুল ফোটা দেখতে বেশি ভাল লাগে।

—কী করে দেখবে বল...আমরা শহরে মানুষ।

—অনেক বাড়ির ছাদে ফুলের টব থাকে।

—হাসি কয়েকটা টব রেখেছিল ছাদে, তারপর ঠিক মতন যত্ন নিতে পারেনি।

—তুমি যত্ন করোনি?

—আমি? আমার সময় কোথায়?

একটি অল্পবয়েসি বাচ্চা এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। পয়সা চাইছে। গাছতলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বাতাসের মধ্যে শুয়ে থেকে শুভ্র যেন সত্যিই এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। এ সময় ভিখিরির উৎপাত তার ভাল লাগল না। ভিখিরিদের বিদায় করার সবচেয়ে ভাল উপায় দুটো চারটে পয়সা দিয়ে বিদায় করা। কিন্তু একজনকে দিলেই আরও আসবে। তাছাড়া, শুভ্রর কাছে একেবারেই খুচরো পয়সা নেই।

—এই যাও।

কিন্তু ছেলেটি যাবে না। বিরক্তি সৃষ্টি করাই তার অস্ত্র। শুভ্র বেশ জোরে বকুনি দিল ছেলেটিকে।

মনোলীনা তার ছোট্ট ব্যাগ খুলে একটা দশ পয়সা বার করে শুভ্রর হাতে দিয়ে বলল—এই নাও।

মনোলীনা তো নিজেই ভিক্ষে দিতে পারতো ছেলেটিকে। তার বদলে পয়সাটা সে শুভ্রর হাতে দিল কেন? শুভ্র একটু ক্ষুণ্ণ হল। খুচরো পয়সা থাকলেও সে তো পুরো একটা টাকাই দিয়ে দিতে পারত ছেলেটিকে। তার কাছে এক টাকার দাম কিছুই নয়।

মনোলীনা কি ওই দশ পয়সা শুভ্রকেই ভিক্ষে দিল? পয়সাটা সে ছুঁড়ে দিল ছেলেটির দিকে। বলল—এরপর আরও ছেলেরা আসবে।

মনোলীনা বলল আমার কাছে আরও খুচরো পয়সা আছে।

টাটকা হাওয়ায় শুভ্র জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। এমন কি তার পাইপ ধরাবারও ইচ্ছে হল না। এতক্ষণে সে একবারও পাইপ খায়নি।

মনোলীনা, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার সমান বয়েসি হয়ে গেছি।

—তুমি বুঝি নিজেকে খুব বড় ভাব?

—বয়েসের দিক থেকে তো বটেই, সেটা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই! তাছাড়া আমি ভীষণ একটা কাজের জগতে, ব্যস্ত জগতে ঢুকে গিয়েছিলাম...কোনোদিন দুপুরবেলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি...তুমি ভাগ্যিস আমাকে ডেকে আনলে...তা তোমার কাছে আমি কতটা কৃতজ্ঞ।

—আমরা অনেকে এ রকম প্রায়ই আসি...শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখি।

—আমাকে তোমাদের দলে নেবে?

উত্তর না দিয়ে মনোলীনা হাসল শুধু। শুভ্রর ইচ্ছে করল, ওই নির্মল হাসিটুকু সে মনোলীনার ওষ্ঠ থেকে চেটে নেয়। এ রকম ইচ্ছে তার আগে কখনো হয়নি। আজ সে বাচ্চা বয়েসের মতন উত্তেজনা বোধ করছে।

মনোলীনা বলল—তুমি এমন কোন জায়গা জান, যেখানে কোন অশান্তি নেই, দুঃখ নেই, হিংসে নেই, লোভ নেই।

শুভ্র বলল—সে রকম জায়গা পৃথিবীতে আবার আছে নাকি? আমার তো মনে হয়।

—আছে।

—আছে? কোথায়? তুমি সে রকম জায়গা খুঁজে পেয়েছ?

—না, এখনো খুঁজে পাইনি। কিন্তু কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়ই....যতদিন সে জায়গাটা খুঁজে না পাই, ততদিন মনে মনে সে রকম জায়গা বানিয়ে নিতে পারি....এ রকম আকাশের নিচে শুয়ে, চোখ বুজে....তুমি চোখ বুজে দেখো...

শুভ্র সত্যিই চোখ বুজল। অমনি তার মনে পড়ে গেল অফিসে ফেলে রেখে আসা কাজের কথা। সে বিরক্ত হয়ে উঠল নিজর ওপর। সব কিছু ভুলে যেতে চাইল। একটু পরেই মনে হল, সে বুঝি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমের মধ্যে একটা লোভহীন হিংসাহীন শান্তিময় জায়গা আছে বটে।

শুভ্র উঠে বসল। মনোলীনা তখনও চোখ বুজে আছে। এই মেয়েটি তার কাছে কী চায়?

মনোলীনা, সত্যি করে বল তো, তুমি আমাকে এখনে ডেকে আনলে কেন?

—এমনিই!

—এমনিই? কিন্তু...যদি আমার নেশা ধরে যায়? যদি আমি বারবার তোমার সঙ্গে এখানে আসতে চাই?

—তা তুমি চাইবে না।

—যদি চাই?

আমাকে ডেকো, আমি আসবো।

কিন্তু কেন আসব? আমি তোমার কে? তোমার নিশ্চয়ই অনেক সমবয়েসি বন্ধু-বান্ধব আছে...ইস, পাঁচটা বাজল, আমাকে অফিসে যে একবার ফিরতেই হবে!

—চল, ফিরে যাই।

—যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে, একবার অন্তত, কিছু বলে আসিনি...আমি না ফেরা পর্যন্ত অনেকে বসে থাকবে।

—চল।

—তুমি কোন দিকে যাবে?

—আমি অন্যদিকে...একটু এগুলেই বাস পেয়ে যাবো।

—আমি ট্যাক্সি নিচ্ছি, তোমায় কোথাও নামিয়ে দেবো?

—না।

—তুমি আর কখনো নিজে থেকে এসে আমায় ডাকবে?

—কী জানি!

—আজ তবে কেন এলে? কেন হঠাৎ ডাকলে?

—এমনিই ইচ্ছে হল।

—মনোলীনা, তুমি তো সুন্দর...তুমি আজ আমাকে কী চমৎকার দুটি ঘন্টা উপহার দিলে...যদি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই...কিংবা যদি আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই।

মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, এই তো স্বাভাবিক।

—সেরকম ভালবাসা নয়...আমি যেন তোমাকে বহুকাল ধরে চিনি, তুমি আর আমি খুব কাছের মানুষ।

—চোখ বুজে পাশাপাশি শুয়ে থাকলে এই রকম মনে হয়। তারপর চোখ খুলে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর সেটা ভেঙে যায়।

মনোলীনা চট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর শুভ্রর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে?—ওঠো, তোমার দেরি হয়ে যাবে।

শুভ্রর পিঠে ধুলো লেগেছিল, মনোলীনা সযত্নে ঝেড়ে দিল পিঠটা। শুভ্র যেন শিশু একটা। তারপর শেষ বিকেলের রঙিন আলোর মতন ঝলমলিয়ে হেসে মনোলীনা বলল, যারা খুব কাজের মানুষ, কিছুক্ষণের জন্য তাদের কাজ ভুলিয়ে দিতে আমার খুব ভাল লাগে।

—আবার দেখা হবে?

—হ্যাঁ, যখন তোমার ইচ্ছে হবে।

আর দেরি করা যায় না। শুভ্রকে এগিয়ে আসতেই হল রাস্তার দিকে। সহজেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। কিন্তু মনোলীনা কিছুতেই রাজি হল না সেই ট্যাক্সিতে চাপতে। সে হাঁটবে। শুভ্রর ট্যাক্সি ঘুরে গেল উল্টো দিকে। পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। মনোলীনা মাথা নিচু করে হাঁটছে আস্তে আস্তে। যেন সে দিগন্তের মধ্যে মিলিয়ে যাবে।

পাইপ জালাবার জন্য কোটের পকেটে হাত দিয়ে অন্য কী যেন টের পেল শুভ্র। এক মুঠো ঘাস। মনোলীনা এক সময়ে তার পকেটে ভরে দিয়েছিল। সেগুলো ফেলে দিতে গিয়েও ফেলল না শুভ্র। অফিসে ফিরে এসে রেখে দিল নিজের ড্রয়ারে।

তারপর আবার আগেকার মতন দিন কাটতে লাগল, সেই একঘেয়ে ব্যস্ততায়। এক সপ্তাহের মাথাতেই তাকে অফিসের কাজে যেতে হল দিল্লি। ফিরে এল দুদিন বাদেই। মনোলীনা আর আসে নি। মনোলীনার কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় শুভ্রর। এক এক সময় বুকটা মুচড়ে ওঠে।

মনোলীনাকে যখন সে জিজ্ঞেস করেছিল, আবার দেখা হবে? তার উত্তরে সে বলেছিল, যখন তোমার ইচ্ছে হবে, শুভ্রর কি ইচ্ছে হয় না? কিন্তু ইচ্ছেটাই সব নয়।

মনোলীনা তার কাছে কিছু চায় নি। শুভ্র খুব ভালমতন ভেবে দেখেছে, মেয়েটির অন্য কোন মতলব ছিল না। সে শুভ্রকে প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমে পড়তে চায় নি। শুভ্রর টাকা পয়সা, প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু সে সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখায় নি মনোলীনা। একটা পয়সা খরচ হয় নি তার জন্য। বরং মনোলীনাই দশটা পয়সা দিয়েছিল শুভ্রর হাতে। যেন সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক, সেইভাবে বলেছিল, আর অনেক খুচরো পয়সা আছে।

মনোলীনা আর কিছু চায় নি। শুধু তার ইচ্ছেটুকু চেয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছেটাই সব নয়। ইচ্ছে থাকলেও শুভ্র আর গঙ্গার ধারে মাঠের ওপর দুপুরবেলা শুয়ে থাকার সময় করতে পারে না। মনোলীনাকে খুঁজে বার করার চেষ্টাও সে করে নি। তার ছোট শ্যালিকা জয়তীর কাছে মনোলীনার খোঁজ নিতে লজ্জা পেয়েছে। এমন কি মনোলীনার বাড়িও সে চেনে। একদিন মাঝ রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু শুভ্র কি হঠাৎ মনোলীনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলতে পারে, তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে চল। তা হয় না। সে শুভ্রজ্যোতি সেনগুপ্ত, দারুণ ব্যস্ত মানুষ, এসব ছেলেমানুষি তাকে মানায় না।

মাঝে মাঝে টেবিলের ড্রয়ার খুলে সে সেই ঘাসগুলো দেখে। শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তবু থাক। শুভ্রর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সেই গাছের তলায় ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা দুপুরবেলা, তার বুকের ওপর মনোলীনার একটা হাত, সেই দৃশ্যটা যেন স্বপ্ন মনে হয়। কিন্তু স্বপ্ন তো নয়, ঘাসগুলো রয়েছে।

মনোলীনা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি যখন জন্মেছিলে, তখন আমি কোথায় ছিলাম? শুভ্র বলেছিল, 'ইচ্ছে হয়ে ছিল মনের মাঝারে'।

এখন, শুভ্র বুকের মধ্যে মনোলীনা একটা ইচ্ছে হয়েই রইল।

সহ-অবস্থান

মাঝে মাঝে আমি বিশেষ প্রয়োজনে অজ্ঞাতবাসে যাই দু-চার দিনের জন্য। সেই রকমই একবার গিয়েছিলাম, জায়গার নামটি বলবো না, ধরা যাক সেটা পশ্চিম বাংলা আর আসামের সীমান্তে এক ডাকবাংলো।

ডাকবাংলোটি বেশ উঁচু জাতের। পরিবেশ প্রকৃতি অতি মনোরম তো বটেই, তাছাড়াও দোতলার ঘর দুটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত। এমন চমৎকার ও আরামদায়ক ডাকবাংলোটিতে কিন্তু অতিথি খুবই কম আসে। এখান থেকে চার মাইল দূরের এক জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন চার বছর আগে, তাঁরই থাকবার জন্য তৈরি হয়েছিল এই ডাকবাংলো। এখন বেশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছাড়া উটকো ভ্রমণকারীদের এখানে প্রবেশ অধিকার নেই। সেই রকম একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ধরেই আমি রিজার্ভেশান করিয়েছিলুম।

ঠা-ঠা রোদের মধ্যে দুপুর দুটো আন্দাজ আমি পৌঁছোলুম সেখানে। মূল রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে, চার দিকে বিশাল বাগানের মধ্যে সুদৃশ্য বাড়িটা দেখে প্রথমেই খুশি খুশি লাগে। একটি ট্যাক্সি আমার নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। একলা আমি পোর্টিকোর নিচে এসে হাঁক দিলুম চৌকিদার! চৌকিদার!

বেশ কয়েকবার ডাকেও সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর দেখা গেল দরজায় কলিং বেল আছে। এ রকম নিরালা জায়গায় বিদ্যুৎ থাকবে আমি ভাবিনি, অবশ্য বাংলোটি যে একটি জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রর সঙ্গে জড়িত, সেটা আমার মনে ছিল না।

বেল বাজাবারও বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললো। একজন বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, অন্তত ছ ফুট হবে বলে মনে হয়। কপালে হাত ছুঁয়ে অভিবাদন করে বললো, আসুন স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম স্যার, মাপ করবেন স্যার।

কিন্তু সে আমার সুটকেসটা হাতে তুলে নিল না। সেটা আমাকেই বয়ে আনতে হলো ভেতরে। লোকটির ভাব-ভঙ্গি ঠিক চৌকিদারের মতন নয়। আমি বহু জায়গায় বহু ডাকবাংলোতে থেকেছি কিন্তু এটা প্রধানমন্ত্রীর জন্য তৈরি হয়েছিল বলেই এর বন্দোবস্ত অন্য রকম। এখানে টেলিফোন পর্যন্ত আছে—যদিও পরে জেনেছিলাম সেটি অচল। লোকটি আমার কাছ থেকে প্রথমে রিজার্ভেশান স্লিপ দেখতে চাইলো, তার পর সেটি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নাম লেখার জন্য খাতা এগিয়ে দিল। দেখলুম, আমার আগের ব্যক্তিটি এখানে এসেছিলেন দু-মাস দশ দিন আগে।

লোকটি আমায় দোতলায় নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। অপছন্দ হবার কিছুই নেই। অবশ্য অনেক সময় খুব বেশি ভালো ব্যবস্থা দেখলে অস্বস্তি হয়। বিশাল ঘর, তারই উপযুক্ত বাথরুম, দেয়াল, পর্দা ও বিছানায় বালিশের ওয়াড়ের রং পিংক। এ রকম ঘরের চার্জ যৎসামান্য। এক প্যাকেট সিগারেটের দামের সমান। তাও খুব দামি সিগারেট নয়, আমি যে ব্র্যাণ্ড খাই সেটাই।

এয়ার কণ্ডিশনার চালু করে দিয়ে, কী করে সেটা বাড়াতে-কমাতে হয় তা শিখিয়ে দিয়ে লোকটি বললো, তা হলে আপনি স্নান-টান সেরে নিয়ে বিশ্রাম করেন, স্যার।

দু মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে আমি নিচে নেমে এলুম। বিশ্রাম নেবো কি, খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।

অন্তত কুড়িজন লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে, এমন বড় খাবার টেবিল। ডাইনিং হলের সব পর্দা আবার হালকা নীল। অত বড় টেবিলের ওপর শুধু দুটি খরগোশ পুতুল। ওই দুটি নুন ও মরিচ দানি।

একটি জানালায় শুধু পর্দা নেই, লম্বা লোকটি সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে চেয়ে।

আমি চেয়ার টেনে বসবার পর সে মুখ ফিরিয়ে বললো, আজই এই পর্দাটা চুরি গেছে শালা চোরদের জ্বালায় আর পারা যায় না—

আমি বললুম, এই রকম ফাঁকা জায়গাতে চোর আসে?

সে বললো, চোর কোথায় নেই, সার। সন্ধ্যার পর একা বার হবেন না, সার এ-দিকে ডাকাইতেরও উপদ্রব আছে।

লোকটির কথা বলার ভঙ্গি একটু অদ্ভুত। প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, আবার দু একটা শব্দ একটু বে-মানান যেমন ডাকাইত। অথচ লোকটি বাঙ্গাল নয়, তাও বোঝা যায়। চেহারাটি এককালে নিশ্চয়ই পালোয়ানের মতই ছিল ওর এখন রয়েছে শুধু কাঠামোটা, বয়েস অন্তত বছর ষাটেক তো হবেই।

আমি বললুম, খাবার-টাবার আছে তো? চিঠি লিখেছিলাম খাবার তৈরি রাখবার জন্য।

লোকটি বললো, আমি এখানকার ইনচার্জ। আমি খাবার দিই না সার খাবার দেবে নেতাই, সে বেয়ারা।

—কোথায় সে নিতাই?

—কে জানে! তার পাত্তার পাওয়ার সাধ্য আমার নাই!

এই কথা বলে লোকটি ভেতরের দিকে চলে গেল। আর এলো না। আমি চুপ করে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। খিদের সময় মানুষের রাগ বাড়ে। বুঝলুম আমাকে এখানে খাতির করা হচ্ছে না। এখানে আসে সাধারণত বড় অফিসাররা, তাদের সঙ্গে গাড়ি থাকে, অন্য লোকজন থাকে। আমার সঙ্গে গাড়ি নেই, আমি এসেছি একা এবং আমার চেহারা দেখলেও বোঝা যায় আমি বড় অফিসার নই।

লোকটির নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি। জোরে ডাকলুম, এই যে, ও ইন-চার্জ মশাই কোথায় গেলেন?

দু-তিনবার ডাকবার পর লোকটি ধীরে সুস্থে এসে বললো, আমায় ডাকছেন, সার?

—আপনার নাম কি?

ঈশা খাঁ সার। পুরা নাম মহম্মদ ইউসুফ ঈশা খান। সার, আপনি শুধু ঈশা খান বলেই ডাকবেন।

ঐতিহাসিক নামের মানুষটিকে আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে আমি একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলুম, ওই যে নিতাই না কে, সে না এলে আমি খাবার পাবো না?

ঈশা খাঁ বললো, আমি খাবার দেই না সার। সে রকম রুল নাই স্যার।

আমি পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিয়ে বললুম, নিন!

সে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, কিসের জন্য স্যার?

—কিছু না, এমনিই রাখুন আপনি।

আমার মতন যারা বহু ডাকবাংলোর চৌকিদার চরিয়েছে, তারা সবাই জানে যে, বিদায় নেবার সময় বকশিশ দেবার চেয়ে প্রথমেই গিয়ে কিছু বকশিস দিলে বেশি কাজ পাওয়া যায়।

টাকাটা নিয়ে ঈশা খাঁ হাসলো, নেতাই এলে একটু ভালো করে ধমকে দেবেন স্যার!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই এসে পড়লো। খুব ব্যস্ত-বাগীশের মত ভঙ্গি। হাত তুলে নমস্কার করে বললো, কতক্ষণ এসেছেন, স্যার। আমি মোড়ের মাথায় ছিলাম, কোনো জিপ গাড়ি দেখিনি...

তারপর সে ঈশা খাঁকে বললো, আমায় একটা খবর দিতে পারো নি? সাহেব না খেয়ে বসে আছেন?

ঈশা খাঁ ঝাকড়ে উঠে বললো, তোকে আমি ডাকতে যাবো কেন রে হারামজাদা! তুই কোন লাটসাহেব! নবাবপুত্তুরকে আমি ডাকতে যাবো।

—একটুখানি এগিয়ে গিয়ে হাঁক দিলেই তো হতো?

—আমি হাঁক দেবো...দুইদিন ধরে আমার গলায় বেদনা।

এখন এত চ্যাঁচাচ্ছো কী করে?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এরা যে ঝগড়া করতে শুরু করে দিল! এই দুটি লোকের ব্যবহার একেবারে দু রকম। ঈশা খাঁ ধীর-স্থির। আর নিতাই চঞ্চল ধরনের। নিতাই-এর বয়েসও ঈশা খাঁর অর্ধেক, সে পরে আছে ধুতির ওপর নীল রঙের হাফ শার্ট, সরুভাবে গোঁফ কামানো। তার মুখখানি অতি চালাক ধরনের। ঈশা খাঁর মুখে দাড়িগোঁফ নেই, মাথার চুলও কমে এসেছে, ঢোলা পায়জামার ওপরে খুব আঁটোসাঁটো একটা ময়লা পাঞ্জাবি পরা।

নিতাই আমার খাবার এনে দিল। ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা ও হাঁসের ডিমের ঝোল। ঠান্ডা খাবার আমি খেতে পারি না। বিশেষত বেগুন ভাজার মতন জিনিস গরম গরম যেমন সুখাদ্য ঠান্ডা হলে তেমনি অখাদ্য। এখুনি আর কিছু না বলে কোনো রকমে খাওয়া খেয়ে উঠে পড়লুম।

—বিকেলে পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার সময় চা পাওয়া যাবে তো?

নিতাই বললো, চা তো নেই, সার। চা-দুধ-চিনি কিনে আনতে হবে। আপনার রাত্তিরের খাবারের জন্য বাজারও করতে হবে। কাছে পিঠে তো কোনো দোকান নেই, আপনি যে-কদিন থাকবেন, হিসেব করে একেবারে চাল-ডাল।

আমি একটি একশো টাকার নোট নিতাইকে দিয়ে বললুম, আমি অন্তত চার পাঁচদিন থাকবো, বেশিও থাকতে পারি, আপাতত চারদিনের মতন বাজার করে নিয়ে এসো।

ঈশা খাঁ নিঃশব্দে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একবার গলা খ্যাঁকারি দিল, যেন কিছু বলতে চাইছে।

নিতাই বললো, আপনি মুর্গি খান তো, সার? মাছ এদিকে ভালো পাওয়া যায় না।

সংক্ষেপে কথা সেরে আমি উঠে এলুম ওপরে। বাইরে গরম বাতাসের হল্কা। সেই সময় ঠান্ডা ঘরে আরামে একটা ঘুম দিতে হবে।

বিকেলে চা পাওয়া গেল না। নিতাই বাজার করে ফেরে নি। নিচে নামবার পর ঈশা খাঁ অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, ও সার রাত্রে সাতটা-আটটার আগে ফেরে কিনা সন্দেহ? মাত্র চাইর মাইল রাস্তা, এত সময় কখনো লাগতে পারে, আপনি বলেন সার?

আমি বললুম, আমি ঘণ্টাখানেকের জন্য একটু ঘুরে আসছি। চারিদিকটা দেখে আসি।

—সব বন্ধ-টন্ধ করে রেখেছেন তো সার?

—এর মধ্যেই চোর আসবে নাকি? ঘরে তালা দিতে হবে?

—তার কোনো প্রয়োজন নাই সার। তবে আপনার সোনো-পাউডার বাক্সে বন্ধ করে রাখবেন। ওই নেতাইটা বগলে পাউডার মাখে।

—কী?

—হাঁ, সার, সত্যি কথা। একবার এক বড় অফিসার এসেছিলেন কলকাতা থেকে। তেনার ইস্ত্রি, দুটি সন্তানও সঙ্গে ছিল, ওই নিতাই চুরি করে সেই সাহেবের পাউডার মেখেছিল। ধরাও পড়ে যায়, সাহেব ওর চাকরি খাবার হুমকি দিয়েছিলেন, আমিই বলে কয়ে সাহেবের রাগ শান্ত করি, তা-ও ও হারামজাদার লজ্জা নাই।

হাসি চেপে আমি বললুম, আমার সঙ্গে স্নো-পাউডার কিছুই নেই, সুতরাং সেদিকে চিন্তার কিছু নেই।

—আপনার সাবান আছে তো, সার? ও সাহেবদের সাবানও চুরি করে পায়ে ঘষে।

—সাবানও বাক্সে বন্ধ করে রাখতে হবে নাকি? আমার সাবান ব্যবহার করলে আমি ঠিক ধরে ফেলবো।

এ দেশের কোনো স্থানই আর সম্পূর্ণ নির্জন নেই। বড় রাস্তার দুপাশে বেশ ঘন জঙ্গল, কিন্তু মাইলখানেক হাঁটতেই দেখলুম সেখানে একটি ছোট গ্রামের মতন রয়েছে। বেশির ভাগই বাঙালির ঘর, কিছু নেপালির। দু দলই উদ্বাস্তু। এদিককার নেপালিরা আসে ভুটান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে।

একটি ছোট চায়ের দোকান এবং একটি মন্দিরও আছে। চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জেনে ফেললুম। যে ওই শিব মন্দিরটিতে বছর তিরিশেক বয়েসের একটি যুবতি পূজারিণী আছে, সেই যুবতিটি কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না, সে নিজের কোনো পরিচয় দেয় না, প্রতি সন্ধেবেলাতেই তার ভর হয়। লোকে তাকে ডাকে 'আকাশি মা' বলে। এছাড়া প্রতি পূর্ণিমার রাতে একটি জ্যান্ত ময়াল সাপ এসে শিবলিঙ্গর গায়ে জড়িয়ে থাবে এবং ওই আকাশি মা নিজে সেই সাপটাকে দুধ কলা খাওয়ায়।

বেশ একখানা গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি প্রথমে একটু চনমনে হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু আমার মাথায় এখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভূত চেপে আছে, আপাতত আমার গল্পের দরকার নেই।

চায়ের দোকান ছেড়ে মন্দিরটা দেখে এলুম একবার। গল্পের পক্ষে মন্দিরটা বেশ আনইমপ্রেসিভ, নেহাতই নতুন এবং বাইরে আবার সাদা চুনকাম। যুবতিটিকেও দেখলুম, চোখের দৃষ্টি পাগলাটে ধরনের, এইসব চোখ অনেক পুরুষকে একসঙ্গে পাগল করে।

ডাকাতের ভয় আছে জেনে সন্ধে ভালো করে নামাবার আগেই আমি ফিরে এলুম ডাকবাংলোয়। নিতাই তখনো বাজার করে ফেরে নি। ওপরে উঠে এলুম নিজের কাজ করতে।

একমন দিয়ে অনেকক্ষণ লেখালেখি করছিলুম, হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখলুম, দরজার কাছে ঈশা খাঁ দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে একদৃষ্টে।

আমি বললুম, কী?

—এই, সার, দেখতে এলাম। আপনি ওপরে আছেন, কোনো কথাবার্তা কইছেন না, সার সব চুপচাপ, সেই জন্য—

আমি ওপরে একলা ঘরে বসে আপনমনে কথা বলব এটা সে আশা করে কি করে কে জানে।

আমি বললুম, হুঁ।

নেতাই একটু আগে ফিরেছে, সার।

—হুঁ।

—আপনার পাশে বোতলে ওটা কী, সার? জল?

কলমটা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মুখ ঘোরালুম। তারপর বললুম, খান সাহেব, আমি এখানে লেখাপড়ার কাজ করতে এসেছি, সুতরাং যখন আমি কাজ করবো, তখন এখানে আসবেন না। বোতলে ওই সাদা মতন জিনিসটা জল নয়, জিন, ওটা একরকমের মদ, মাঝে মাঝে আমি খাই।

তাতেও না দমিত হয়ে সে বললো, জিন কারে বলে আমি জানি, সার। ওয়ারের টাইমে আমি আবিসিনিয়ায় ছিলাম তো, সেখানে সবাই রাম আর বেরাণ্ডি খায়।

শুনুন, আমার যখন গল্প শোনার ইচ্ছে হবে, আপনাকে ডাকবো। এখন আপনি নিচে যান।

—আপনাকে একটা কথা জানানো খুব প্রয়োজন সার।

—বললাম না যে এখন নয়।

এবার সে ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেল। একটু পরেই শুনতে পেলুম, নিচে তুমুল ঝগড়ার আওয়াজ। নিতাই-এর সঙ্গে ঈশা খাঁ'র কী নিয়ে যেন লেগে গেছে। আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলুম।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময় মনে হল, চতুর্দিক একেবারে শুনশান! ঘড়িতে দেখি পৌনে এগারোটা। কী ব্যাপার, এরা কি খেতে-টেতে ডাকবে না?

নেমে এলাম নিচে। কারুর পাত্তা নেই। ডাইনিং রুমের আলো জ্বলছে, তার ওপর আমার খাবার ঢাকা। আবার সেই ঠান্ডা খাবার! কারুকে না ডেকে খেয়ে উঠে এলুম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙালো নিতাই। চা নিয়ে এসেছে। তাকে দরজা খুলে দিয়ে বাথরুমে ঢুকলুম। তারই মধ্যে নিতাই টেবিলে চায়ের কাপ রেখে উধাও! অথচ সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার অন্তত দুকাপ চা লাগে।

বারান্দায় বেরিয়ে বেশ ব্যক্তিত্বসহকারে হাঁক দিলুম, নিতাই! নিতাই!

নিতাই তক্ষুনি চলে এলো। মাথার ভিজে চুল ফিটফাটভাবে আঁচড়ানো। এরই মধ্যে স্নান করে নিয়েছে।

আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কাল রাতে তোমরা দু'জনে অত ঝগড়া করছিলে কেন?

—আর বলবেন না, সার, বুড়োটা সর্বক্ষণ বকবক বকবক করে কানের পোকা বার করে দেয়। এদিকে ওর গলায় কী এক রোগ সেঁধিয়েছে, রোজই বলে গলায় ব্যথা, গলায় ব্যথা! কিন্তু কেমন চ্যাঁচায়, আপনিই তো শুনেছেন, সার। ওর জন্য আমি শিবমন্দিরের আকাশি মায়ের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিলুম, তা খাবে না। নাক ছাঁটা আছে বুড়োর। বলে কিনা দিনে তিনবার ওকে নুন গরম জল করে দিতে। আমি কি ওর চাকর? ওর রান্না ওর নিজের করার কথা।

সকালে আর দূরে কোথাও না গিয়ে বাংলোর বাগানটাতেই বেড়ালুম। এই বাংলোর সঙ্গে একটি সুইমিং পুলও করা হয়েছিল, এখন সেটা একটা মজা ডোবা।

বাগানের একদিকে কিছু বিবর্ণ গোলাপ গাছের কাছে বসে ঈশা খাঁ খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে বললো, এ কাজ আমার করার কথা নয়, সার, নেতাইয়ের। সে হারামজাদা তো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। আমার শখ আছে বলে মাঝে মাঝে আমি একটু মাটি খুঁড়ে দিই। শরীরে আর কুলোয় না। দুবৎসর আগেও এখানে কী সুন্দর বাগান ছিল।

—নিতাই বেরিয়ে গেল দেখলুম। এত সকালে ও যায় কোথায়?

শুনলুম চার মাইল দূরের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিছু কর্মচারীর এক মেসে নিতাই দুবেলা রান্না করে দিয়ে আসে। সেটা তার উপরি রোজগার। খাওয়াটা সেখানেই পায়। সারা বছর এ বাংলোয় প্রায় লোকই আসে না, কাজ কিছুই নেই, সুতরাং সে যদি বাড়তি কোনো উপার্জনের সুযোগ নেয়, তাতে আপত্তি করার কিছুই নেই।

—সার, কাল যে ওকে একশো টাকার নোট দিয়েছিলেন, তার হিসাব নিয়েছেন?

—না। নিইনি এখনো।

—একশো টাকা দিয়ে বড় ভুল করেছেন, সার। অত লোভ ও সামলাতে পারবে না। দেখেন, কিছু ফেরত পান কিনা সন্দেহ!

এ বিষয়ে অবশ্য আমার চিন্তার কোনো কারণই নেই। অনেক ভেবে-চিন্তেই একশো টাকার নোটটা আমি দিয়েছি নিতাইকে। এটা একটা কৌশল মাত্র। প্রথমে দুএকদিন এমন ভাব দেখাতে হবে, যেন আমি টাকাটার কথা ভুলেই গেছি, তারপর যথাসময়ে চেপে ধরলেই হবে।

ঈশা খাঁ আবার বললো যা রোজগার করে, তা নেতাই, সবই উড়িয়ে দেয়, সার। টাকাগুলো নিয়ে কী করে কে জানে? বিয়ে-শাদি করে নি। বাড়িতেও টাকা পাঠায় না। কুচবিহারে ওর বুড়ো বাবা-মা থাকে, সার আমি কত বলি, মাস মাস তাদের কিছু দে, তা কোনো কথা শোনে না। ওই শিবতলা গেরামে সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করে, আমার সন্দ হয়, খারাপ মেয়েছেলে টেয়েছেলে আছে, বুঝালেন, সার—

এ আলোচনায় আর উস্কানি না দিয়ে আমি চলে গেলাম সেখান থেকে।

টেবিলে আমার জন্য ডিম সেদ্ধ, মাখন লাগানো রুটি এবং এক পট চা রেখে গেছে নিতাই। সেগুলো সদ্ব্যবহার করছি, এমন সময় ঈশা খাঁ এসে কাছে দাঁড়ালো।

আমি বললুম, বসুন, এবার আপনার গল্প শোনা যাক।

বৃদ্ধ সত্যিই কথা বলতে ভালোবাসে। আরম্ভ করলো একেবারে শৈশব থেকে, এর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ আর্মির সোলজার হয়ে লড়াই করার ঘটনাটা কিছুটা আকর্ষণীয়। অবশ্য খালাসিটোলায় এরকম যুদ্ধ ফেরত অশিক্ষিত সৈনিকদের বেশ কয়েকজনকে আমি আগেই দেখেছি। তাদের মধ্যে একজন এক হোটেলের ঝাড়ুদার।

তবে বৃদ্ধের এখনকার অবস্থা বড় করুণ। বাড়ি ছিল বর্ধমানের কোনো গ্রামে। জ্ঞাতি গোষ্ঠী সেই বাড়ি দখল করে নিয়েছে। এখন সেখানে গেলেও থাকতে দেয় না। ওর তিনকূলে কেউ নেই। এই চাকরি থেকে রিটায়ার করলে কোথায় যাবে তা সে জানে না।

গল্পের শেষে হাত কচলিয়ে বললো, সার, আপনি বড় অফিসার, আপনি রাত্র জেগে জেগে অত রিপোর্ট লেখেন, আপনি যদি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে আমার এক্সটেনশান পাবার কথা বলে দেন।

আমি যে সরকারি অফিসার নই, একথা বৃদ্ধকে বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বললুম, আচ্ছা বলে দেবো।

দুপুরবেলা খাওয়া শেষ করার পর ঈশা খাঁ আমায় আবার ধরলো। খুব গোপন কথা জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে চুপি চুপি বললো, সার, আপনি যে মুর্গির মাংস খেলেন তাতে দুটো ঠ্যাং ছিল? আপনারই পয়সায় কেনা জিনিস...

আমি বললুম, বোধ হয় এক ঠ্যাংওয়ালা মুর্গি কিনেছিল।

—না, সার প্রশ্রয় দেবেন না, ও হারামজাদা চুরি করে খায়। কত বড় বড় অফিসার আসে ও ঠিক চুরি করে। একবার মিনিস্টার এসেছিলেন, তিনি মুর্গি খান না, জলপাইগুড়ি থেকে অ্যাত বড় রুই মাছ আনানো হল, সেবারও নিতাই পেটির মাছ চুরি করে খেয়েছে। আবার ব্যাটা এত দুষ্টু, দলে টানার জন্য আমাকে ভাগ দিতে চায়। আদর করে বলে, খাও, খাও। আমি সার গরিব হতে পারি, কিন্তু হারামের জিনিস খাই না। আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেবো, তবু চুরি করবো না। আমার শরীরে সার, পাঠানের রক্ত আছে। দুবেলা ভাত খেলে কী হয়, জাতে আমি প্যাঠান।

আমি বললুম, বাঃ!

হয়তো এখানে বাঃ বলা ঠিক মানানসই হল না, তবু এ কথাটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

বিকেলে আর একবার ঈশা খাঁ আমায় জিজ্ঞেস করলো, সার, নেতাই-এর কাছ থেকে টাকার হিসেব নিয়েছেন?

আমি দুদিকে ঘাড় নাড়লুম।

—ওকে বিশ্বাস করবেন না, সার, ওর টাকার লোভ সাংঘাতিক। হাতে একেবারে পয়সা থাকে না। কী করে সে আপনি বুঝে নেন সার। সেবারে কুচবিহার থেকে টেলিগ্রাম এল, ওর বাপের ব্যামো হয়েছে, টাকা পাঠাতে হবে, তা নেতাই হারামজাদা বলে কী, হাতে একটাও আধলা নেই। আমি বললুম, নিমকহারাম, বুড়ো বাপকে দেখবি না? যা দেখে আয়গে যা। তা শুনে কাঁদতে লাগলো। তখন আমি দিলাম পঞ্চাশ টাকা।

এবার বেশ মানানসই ভাবে আমি বললুম, বাঃ!

বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে শিবতলায় চা খেতে গিয়ে আকাশি মা'র ভর হওয়া দেখলাম। যুবতি শরীরটা মন্দিরের চাতালে ছটফট করছে, সেজন্য অনেক দর্শক। সব জায়গাতেই কিছু না কিছু স্থানীয় আকর্ষণ থাকে। এই আকাশি মায়ের ব্যাপারটা খানিকটা প্রচার হলে এখানে আরও অনেক ভক্ত জুটে যাবে। কালক্রমে সে জায়গাটা বেশ বড় একটা তীর্থস্থান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

মন্দিরের সিঁড়িতে নিতাই দুতিনজন লোকের সঙ্গে বসে জমিয়ে গল্প করছিল, হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। আমাকে দেখে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গেল। তারপর দেখি হনহন করে চলে যাচ্ছে। ওর অমন চলে যাবার কারণ কী? আমি কি ওর গুরুজন না মালিক? বোধহয় একশো টাকার অপরাধবোধটা ওর মনের মধ্যে ক্রিয়া শুরু করেছে।

রাত্রে লেখাপড়া সেরে নিচে নেমে দেখলুম, নিতাই কিংবা ঈশা খাঁর কোনো পাত্তা নেই। টেবিলে আমার খাবার রাখা আছে অবশ্য। তক্ষুনি খাবার ইচ্ছে নেই, একটু বেড়াতে গেলাম বাগানে। ভাগ্যিস টর্চটা হাতে ছিল, তাই দেখতে পেলুম সাপটাকে। গেটের একেবারে কাছে। বিষাক্ত কিনা জানি না, তবু সাপ মাত্রই আমার কাছে ভয়াবহ। আর কোনো দিন রাত্রে এ বাগানে ফিরে কবিত্ব করা হবে না।

ফিরে এসে খেতে বসে বসে ভাবছি, এ বাংলোর সব কিছু চুরি হয়ে যাওয়াও তো আশ্চর্য কিছু নয়। দরজা-টরজা সব খোলা, আলো জ্বলছে কিন্তু নিতাই বা ঈশা খাঁ কেউ নেই। কোনো বাপ মা নেই এ জায়গাটার।

হঠাৎ মনে হলো, ওপরে আমার ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ। চোর? এঁটো হাতেই তরতর করে উঠে এলাম ওপরে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখি আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঈশা খাঁ, হাতে জিনের বোতলটা। লজ্জায় এবং ভয়ে তার মুখখানা কুঁকড়ে গেছে।

তোৎলাতে তোৎলাতে বললো, সার, মাপ করে দিন, সার, আমার গলায় খুব ব্যথা, ভাবলাম এটা খেয়ে যদি একটু কমে, বড় কষ্ট পাই সার, সেই জন্য এক চুমুক না না, সার আমি *ঠোঁট* ছোঁয়াই নি, সার, কসম খেয়ে বলছি আলগোছে শুধু।

এখানে বাঃ বলা একেবারেই চলে না, আমি বললুম হুঁ।

বোতলটা নামিয়ে রেখে ঠিক পুতুল নাচের মতন এক পা এক পা করে বেরিয়ে গেল ঈশা খাঁ। আমি আর বাকি খাবারটুকু শেষ করার জন্য নিচে গেলুম না, হাত ধুয়ে নিলুম ওপরেই।

ঈশা খাঁ একটু বাদেই ফিরে এলো। দারুণ কাতরভাবে বললো, আপনি রাগ করেছেন, সার? আপনি বড় অফিসার, এত রিপোর্ট লেখেন, আমার নামে এক কলম লিখে দিলেই আমার সর্বনাশ হবে সার। বুড়ো বয়েসে লোভ বড়

শক্ত। সেই লোভের বশে কী কুকর্ম করে ফেলেছি, সার, আপনার জিনিস, ভাবলুম গলার ব্যথাটা যদি একটু কমে তাই এক ঢোক, ও জিনিস বড় উত্তম, সার, ঢালামাত্র গলায় এমন আরাম হলো—

—আপনার গেলাসটা নিয়ে আসুন!

—কী বললেন, সার?

—আপনার গেলাসটা নিয়ে আসুন!

সেই ধীর স্থির বৃদ্ধ যে কী তড়িৎবেগে ছুটে গেল তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রায় যেন মুহূর্তের মধ্যে নিচ থেকে গেলাস নিয়ে ফিরে এলো।

তার গেলাসে খানিকটা জিন ঢেলে দিয়ে বললুম, যান, নিচে গিয়ে খান। গলার অসুখ তো চিকিৎসা করান না কেন?

—অনেক চিকিৎসা করিয়েছি সার, কাজ হয় না। ওই শিবতলার আকাশি মা ভালো ওষুধ দেন, আমি বর্ধমানে দেখেছি সার, আমাদের পীর ফকিরের দেওয়া ওষুধ অনেক হিন্দুরা খায়, তাই আমি নেতাইকে বলি, আকাশি মায়ের নিকট থেকে আমার জন্য ওষুধ আন, তা ও হারামজাদা কানই দেয় না।

—সে কি, নিতাই যে বললো, আপনার জন্য ওষুধ এনেছিল, আপনি খান নি?

—তাকে কি আনা বলে? কোনো রকম ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। ওসব ওষুধ আনতে হয় শুদ্ধ বস্ত্র পরে—তা না, নেতাইটা রাত্তিরবেলায় যে পাজামা পরে শোয়, সেই পাজামা পরে মন্দিরে যায়, কী কবো আপনাকে, সার, দেখলে আমার ঘেন্না লাগে!

এ যে বামুন পণ্ডিতের মতন কথা বলে? শুদ্ধ বস্ত্র! মুখের ওপর হেসেও উঠতে পারি না। সুতরাং আবার বললুম, বাঃ!

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো ঈশা খাঁ আর নিতাইয়ের তুমুল ঝগড়ায়। রাত্রে আমি এয়ারকণ্ডিশনার চালাই না, তাই জানলা-টানলা খোলা থাকে। উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের ঝগড়া শুনতে লাগলুম।

নিতাই কাল রাত্রে এখানে ছিল না বলে ঈশা খাঁ অভিযোগ জানাচ্ছে। আর নিতাই বলছে, সে কোথায় থাকে না থাকে তা নিয়ে কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সে তার ডিউটি করে দিয়ে গেলেই হল।

শেষ পর্যন্ত ঝগড়াটা এমন জায়গায় গড়ালো যে ঈশা খাঁ বললো, তুই মর, মর মরিস না কেন? তুই মরলে আমার হাড় জুড়োয়!

নিতাই বললো, ইঃ! আমি আগে মরবো কেন, তুমিই একদিন চোখ উল্টে পড়ে থাকবে। বয়সের গাছ পাথর নেই!

ঈশা খাঁ বললো, মোটেও সে কথা মনে স্থান দিস না হারামজাদা! ভেবেছিস তোর আগে মরবো। শরীরে যথেষ্ট তাগত আছে। তুই মরলে শ্মশানে তোর চিতের ধোঁ শুঁকে তবে আমার শান্তি হবে।

নিতাই বললো, তোমার কবরে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর আমি নাচবো। তুমি দেখে নিও—

আমি ভাবলুম এই রকম নিরিবিলি জায়গায় দুজন হিন্দু-মুসলমানকে চাকরি দেওয়া কি সরকারের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হয়েছে? কোন দিন না এরা মারামারি করে মরে!

ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করবার জন্য আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, আজ সকালে কি চা-টা পাওয়া যাবে না কি?

সঙ্গে সঙ্গে বিবাদ বন্ধ। একটু পরে ঈশা খাঁ বললো, যা হতভাগা সাহেবকে চা দিয়ে আয়। সাহেব রাগ করলে তুই-ই বিপদে পড়বি। আমার আর কি, কটা দিনই বা আছি।

নিতাই বললো, তুমি চুপ করো। ওপরে চা দিতে এসে কৈফিয়তের সুরে নিতাই বললো, বুঝলেন সার, ওই বুড়োটা সারা রাত এমন খকর খকর করে কাশে যে আমি রাত্রে, ঘুমোতে, পারি না এখানে—

সেদিন ব্রেক ফাস্ট টেবিলে ঈশা খাঁ একবার এসে দেখা দিয়ে গেল। এই গরমেও তার গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। তার নাকি জ্বর হয়েছে। সুতরাং সেদিন সে আমার কোনো তদারকি করতে পারবে না। যা দরকার হয় নিতাইকে যেন বলি। নিতাই পাম্প খুলে দিলে ওপরের বাথরুমে জল যাবে। ওকে আস্কারা দেবেন না সার, সুযোগ পেলেই বাইরে দৌড় মারে। ওকে একটা কড়া শাসনে রাখা দরকার, আপনাকে আর কি কবো, সার আপনি সব বোঝেন।

দুপুরবেলা লিখতে লিখতে হঠাৎ বাধা পড়লো। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। এই রোদ্দুরের মধ্যে এখন সিগারেট কিনতে যেতে হবে সেই শিবতলায়। নিতাইকে তো পাওয়া যাবে না। নেমে এলাম নিচে।

ডাইনিং হলের পেছন দিকে স্টাফ কোয়ার্টারে তখন আবার ঝগড়া চলছে। এবারের ঝগড়ার বিষয়বস্তু বেশ চিত্তাকর্ষক। ঈশা খাঁ নিজে রান্না করে খায়। আর তার জ্বর বলে সে রান্না করে নি। খায়ও নি। এবং সে কেন খায় নি, সেই জন্য তাকে বকুনি দিচ্ছে নিতাই, ঈশা খাঁ বলছে, বেশ করেছি খাইনি। আমি যদি না খেয়ে মরি, তোর তাতে কী? তুই যা না। শিবতলায় কত মধু পেয়েছিস, সেখানে যা। পয়সাকড়ি সব উড়ো। নিতাই বললো সে পয়সা

খরচ করে, নিজের পয়সা, কারুর বাপের পয়সা সে ওড়ায় না। সাহেবের ব্রেক ফাস্টের জন্য যে পাঁউরুটি রাখা আছে, সেটাও তো খেতে পারতো বুড়োটা। পরে সাহেবের জন্য আবার এনে দেওয়া যেত! ঈশা খাঁ বললো, সে কখনো অপরের জিনিস চুরি করে খায় না। সে মানী বংশের লোক? সে নিতাইয়ের মতন চোর নয়। নিতাই বলে, চোপ, মুখ সামলে কথা বলবে! এখন ওঠো, উঠে এই পাঁউরুটিটা খেয়ে আমায় উদ্ধার করো! সাহেবের টিনের দুধ থেকে এক কাপ দুধ গুলে দিচ্ছি—

সিগারেট আনাবার জন্য আমাকে আরও আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হল।

সেদিন রাত আটটায় হঠাৎ আমার মন উচাটন হল। এ জায়গাটা প্রধানমন্ত্রীর মতন ব্যস্ত মানুষের এক রাত্রি বাসের পক্ষে যথেষ্ট ভালো হতে পারে কিন্তু আমার মতন কারুর একা দিনের পর দিন থাকা অসম্ভব। এক এক সময় একাকিত্ব বিষম ভারী হয়ে মাথায় ওপর চেপে বসে। যেমন, এই রাত্রি আটটার সময় হঠাৎ আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না। তখুনি মনস্থির করে ফেললুম।

পরদিন সকালে নিতাই চা দিতে এলেই আমি বললুম, আমার জন্য আজ দুপুরে রান্না করতে হবে না। আজ সকালেই আমি চলে যাবো। আমার টাকাগুলো দাও।

আমার প্রস্তাবের আকস্মিকতায় নিতাই প্রথমে খুব বিস্মিত হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললো, আর দু একদিন থাকবেন না, সার? আপনার চাল-ডাল এখনো রয়ে গেছে।

—তা থাক। ও তোমরা দুজনে ভাগ করে নিও। আমার টাকা কি ফেরত আছে, দাও। হিসেব বুঝিয়ে দাও।

একটু ঘুরে এসে নিতাই আমাকে নানা ধরনের নোটে ঊনত্রিশ টাকা ফেরত দিল। তারপর শুকনো মুখে বললো, একটা মুর্গি চোদ্দ টাকা। আপনার দেড় কিলো চাল দুটাকা নব্বুই করে কিলো হলে—

আমি হাত তুলে বললুম থাক, ঠিক আছে।

ততক্ষণে আমার হিসেব করা হয়ে গেল। চার দিনের খাওয়ার খরচ একাত্তর টাকা এর মধ্যে সকালের ডিম সেদ্ধ। পাঁউরুটি, চা, কণ্ডেসড মিল্ক দু প্যাকেট সিগারেট....খুব বেশি খরচ নয়। বড় জোর নিতাই দশ টাকা মেরেছে। একসঙ্গে বেশি টাকা চুরি করার কল্পনাশক্তিই ওর নেই।

নিতাইকে দু টাকা বকশিশ দিতেই সে আগ্রহের সঙ্গে নিল। তাকে যে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়িয়ে মিথ্যে হিসেব দিতে হয় নি, তাতেই সে অতি সন্তুষ্ট।

সকালবেলা নটার সময় এখান দিয়ে বাস যায় সেটা ধরতে হবে। ঈশা খাঁকে ডেকে রুম চার্জ মিটিয়ে দিলুম। আজও তার গায়ে কম্বল জড়ানো, জ্বর তার ছেড়ে গেছে কিন্তু গলায় খুব ব্যথা।

ঈশা খাঁকেও বকশিশ দিলুম দু টাকা। কারণ প্রথম দিন এসেই তাকে দশ টাকা দেওয়া আছে। তাতেই সে খুশি হয়ে অনেকখানি নিচু হয়ে সেলাম জানালো। জিন চুরি করে ধরা পড়ার পর সে আমার কাছ থেকে কোনো বকশিশই আশা করে নি। বিড়বিড় করে বললো, আপনি খুব ভালো লোক, সার কত বড় অফিসার, ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়।

নিতাই-এর দেখা নেই, সে এরই মধ্যে হাওয়া হয়ে গেছে।

ঈশা খাঁ বললেন, দেখলেন সার, নিতাই হারামজাদার কাণ্ডটা। আপনার বাক্সটা বাসে তুলে দিয়ে আসবে, সে তরও সইল না, এমন নিমকহারাম—আমারও শরীল অসুস্থ।

আমি বললুম ঠিক আছে, এটা আমিই নিয়ে যেতে পারবো।

আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে ঈশা খাঁ প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আপনি দু একদিন থাকলেন না, সার, আবার কতদিন পর কোন সাহেব আসবে তার ঠিক নাই, এর মধ্যে নিতাইটার আর পাত্তাই পাওয়া যাবে না, আর এদিক মুখো দিনে একবার হয় কি না সন্দেহ, ওফ। আমার কোনো কথা শোনেই না—

সত্যি, এটা একটা সমস্যাই বটে। এই নির্জন বাংলোয় গলায় ক্যান্সার নিয়ে দিনের পর দিন এই বৃদ্ধের একা থাকা খুব কষ্টকর। অন্তত ঝগড়া করার জন্যও তো একজন লোক চাই।

তিনজন মানুষ

দড়াম করে দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লো তপন। বাইরে টুলে বসা বেয়ারাকে বাধা দেবার কোনো সুযোগই দিল না। জেনারেল ম্যানেজার উৎকট মুখভঙ্গি করে তাকালেন। তপন কিছুই গ্রাহ্য করলো না, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর পা তুলে দিয়ে বললো, কী বলছেন বলুন?

জেনারেল ম্যানেজার মুখ গোমড়া করে বললেন, কিছুই তো বলার নেই আমার। যা বলার তা তো চিঠিতেই জানিয়েছি।

তপন পকেট থেকে টাইপ করা চিঠিখানা বার করে হাত দিয়ে মুড়ে ছুঁড়ে মারলো জেনারেল ম্যানেজারের নাকের ওপর। নাকে ঠিক লাগলো না, কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেল সাঁ করে।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বললেন, একি! এটা কী করছেন?

—কী করছি, বুঝতে পারছেন না? যা ইচ্ছে চিঠি লিখে পাঠালেই হলো?

—তপনবাবু, লিসন, সব অফিসেরই একটা ডিসিপ্লিন আছে। খবর না দিয়ে এভাবে আসবেন না।

শালা, এটা তোমার বাবার অফিস? তুমিও চাকর, আমিও চাকর, অত ফাঁট কীসের?

জেনারেল ম্যানেজার বেল বাজালেন, চ্যাঁ, চ্যাঁ—

তপন ঘুরে টেবিলের ওপাশে গিয়ে বললো, কী ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে? বেয়ারা ডাকবেন? আই ডোণ্ট কেয়ার। আমি লাথি মারি এই চাকরির মুখে।

—দয়া করে বাইরে যান। আমি ব্যস্ত আছি।

—যাবো, আর কোনোদিন তোমার চাঁদ মুখ দেখতে আসবো না চাঁদু। আজ গঙ্গায় চান করে বাড়ি ফিরবো। এই জঘন্য চাকরিতে এতদিন ছিলাম, ঠিক যেন নোংরা পাঁকে ডুবে ছিলাম। ব্লাক মারকেটের কারবার।

ম্যানেজার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না, ফেটে পড়লেন, আপনি বেরিয়ে যাবেন কি না? গেট আউট! তপন টেবিল থেকে ভারি পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে রুদ্রমূর্তিতে চোখ পাকিয়ে বললো, চুপ! অত গরম দেখাচ্ছো কী? মেরে খোপরি উড়িয়ে দেবো, শালা! না, এভাবে নয়। এভাবে সে পারবে না।

রামচাঁদ জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন বাবু? তপন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে।

রামচাঁদ আরও কী যেন বলতে গেল, তপন তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না। তপন ভেতরে ঢুকে গেল।

জেনারেল ম্যানেজার একবার চোখ তুলে তপনকে দেখেই আবার কাজে মন দিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, ইয়েস?

—স্যার আপনার চিঠি পেয়েছি।

—কী বলবেন, বলুন? কিন্তু উত্তরটা আপনাকে লিখেই জানাতে হবে। আপনার নামে সিরিয়াস চার্জ। তপন এর আগে কোনোদিন জেনারেল ম্যানেজারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কথা বলার সাহস পায়নি। কিন্তু আজ তার কোনো ভয় নেই।

তপন নির্লিপ্ত গলায় বললো, স্যার আমার উত্তরটা খুব ছোট। আমি শোকজের কোনো কারণ দেখাবো না। আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাই।

জেনারেল ম্যানেজার সহজে কিছুতেই অবাক হন না। তবু এবার একটু অবাক না হয়ে পারলেন না। এ যেন কোনো নেংটি ইঁদুর হঠাৎ বেড়ালকে কামড়াতে এসেছে।

—চাকরি ছেড়ে দিতে চান? ওয়েল! আর কোথাও চাকরি পেয়েছেন?

—না।

—তবে?

—এমনিই ছেড়ে দেবো।

—বাঃ বেশ ভালো কথা! আপনার সাহস আছে বলতে হবে।

—সাহসের প্রশ্ন নয়। বিবেকের প্রশ্ন। পেটের দায়ে চাকরি করতে হয়, কিন্তু প্রত্যেকে মাসে মাইনে নেবার পর নিজের ওপর ঘৃণা আসে আমার।

—ইয়ে, তপনবাবু, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি।

—যতই ব্যস্ত থাকুন, আপনাকে শুনতে হবে। মাসের পর মাস ভেবে আমি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সিদ্ধান্তটা

নিয়ে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। পৃথিবীতে আর কারুকে আমি ভয় পাই না। এর আগে মাসের পর মাস আমার মন খারাপ থাকতো, কিছুতেই অফিসে আসতে ইচ্ছে করতো না। আমাদের অফিসটা কী! শুধু চুরি-জোচ্চুরির কারবার। দুরকম খাতা দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা ফাঁকি দিচ্ছেন সরকারকে। দেশের ক্ষতি করছেন আপনারা।

তপনবাবু এসব লেকচার কি এখানে না দিলেই নয়?

—চুপ করুন! আমাকে যেতে দিন। বেবি ফুডের দাম বাড়াবার জন্যে আপনারা ইচ্ছে করে বাজার থেকে দুসপ্তাহের জন্য বেবি ফুড উধাও করে দিলেন।

—ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয়। অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার—

—আমি সব জানি। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনিও তো এখানে চাকরি করেন। কত আর মাইনে পান? বড় জোর দুহাজার কী আড়াই হাজার—তবু আপনি এই চোরা কারবারি মালিকের স্বার্থে দেশের এই ক্ষতি করছেন? হাজার হাজার শিশু যখন না খেয়ে থাকে...

জেনারেল ম্যানেজার এবার বেল বাজালেন। চ্যাঁ চ্যাঁ। তপনের সারা শরীরটা সজাগ হয়ে উঠলো। কোনো অপমান করলে সে আজ সহ্য করবে না। রামচাঁদ ঘরে এসে দাঁড়ালো। জেনারেল ম্যানেজার একবার তপনের মুখের দিকে একবার রামচাঁদের মুখে দিকে চোখ ফেললেন। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, এক গেলাস জল নিয়ে এসো—।

রামচাঁদ চলে যাবার পর জেনারেল ম্যানেজার বললেন, আপনার ডিসচার্জ অর্ডার কালই পেয়ে যাবেন। যা পাওনা-টাওনা আছে, সামনের সপ্তাহে এসে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে বুঝে নেবেন! এবার আপনি আসুন।

—না, আমার আরও কথা আছে।

—কিন্তু আমার শোনোর সময় নেই! আপনাকে বেয়ারা ডেকে বার করে দেওয়া হোক, সেটা চান? ডোনট ফোর্স মি টু ডু দ্যাট! এমনিই আপনি অনেক নুইসেন্স ক্রিয়েট করেছেন—.

—ভদ্রভাবে কথা বলুন! আমি আপনার চাকর নই!

দৃশ্য আরেকরকম।

তপন অনেকক্ষণ ধরেই জেনারেল ম্যানেজারের ঘরের সামনে ঘুরঘুর করছিল।

রামচাঁদ মুখে খৈনি ঠেসে দিয়ে ঝিমুচ্ছে। তপন দুএকবার ওর কাছাকাছি এসেও ফিরে গেল। তারপর একবার কাছে এসে মিহি গলায় ডাকলো, রামচাঁদ—চোখ না খুলেই রামচাঁদ বললো, এখন দেখা হবে না। তপন আবার বললো, আরে শোনো না! তোমাকে একটা ভালো খবর দিতে এলাম। তোমার লিভারিজ অ্যালাওয়েন্স স্যাংকশান হয়ে গেছে!

—রামচাঁদ চোখ খুলে বললো, হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। তোমার খাঁকি কোট, পেতলের চাক্তি বসানো বেল্ট আর জুতো কেনার জন্য তুমি চুয়ান্ন টাকা বেশি পাবে বছরে। কিছুক্ষণ রামচাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করার পর তপন চোখের ইঙ্গিত করে বললে, সাহেব আছেন?

—এখন ব্যস্ত, এখন দেখা করার মানা আছে।

—আমি মোটে দুমিনিট কথা বলবো—

ভেতরে ঢুকে দুমিনিট তপনকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেই হলো। বড় সাহেব গভীর মনোযোগ দিয়ে কী একটা ফাইল পড়ছেন। তপনের উপস্থিতি যে তিনি টের পেয়েছেন, তাও মনে হয় না।

তপন এক পা আর এক পায়ে বদলে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে। তারপর খুব নিচু গলায় বললো, স্যার, স্যার—

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। আমি এই কাজটা সেরে নিই।

জেনারেল ম্যানেজার তাকে বসতে বলেছেন, এটাকেই তপন একটা সৌভাগ্যের সূচনা বলে মনে করলো। সন্তর্পণে বসলো। দৃষ্টি টেবিলের কাচে স্থির নিবদ্ধ। এদিক-ওদিক তাকালে চঞ্চলতা প্রকাশ পায়।

কিন্তু চুরুটটা আবার জ্বেলে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বড় সাহেব বললেন, হ্যাঁ বলুন কী ব্যাপার?

তপন আরও কিছুক্ষণ টেবিলের কাচের দিকেই চেয়ে থেকে, তারপর মুখ তুললো, মুখখানা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললো, স্যার, এবারকার মতন যদি আপনি দয়া না করেন—

—কী ব্যাপার? কীসের দয়া?

—স্যার, সেই চিঠি, পরশুদিন পেয়েছি।

—ওঃ হো, আপনার কাছে তো শো-কজের চিঠি গেছে, তাই না? উত্তর দেননি কেন? আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেওয়ার কথা ছিল।

—সেই ব্যাপারেই আপনার পরামর্শ চাইতে এলাম। কী লিখবো।

—পরামর্শ দেবার তো কিছু নেই। এবার আপনার চাকরিটা আর কিছুতেই রাখা যাবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—কিন্তু অনবরত কাজে ভুল করবেন, দরকারি জিনিস হারিয়ে ফেলবেন, তাছাড়া বিনা নোটিশে হঠাৎ হঠাৎ ডুব মারবেন দুএক সপ্তাহ—কোম্পানি আর কত সহ্য করবে বলুন?

—স্যার, আমার অসুখ করেছিল, তাই আসতে পারিনি।

—প্রত্যেক মাসে যদি আট-দশদিন করে আপনার অসুখ হয়—তাহলে চাকরি ছেড়ে ভালো করে চিকিৎসা করান আগে!

—চাকরি ছাড়লে খাব কী? বাড়িতে অনেকগুলো লোক, আমার বাবা রিটায়ার করেছেন।

—কিন্তু না খাটলে কি খাওয়া যায়? কাজ করবেন না, তাও আপনার চাকরি থাকবে? কত বেকার ছেলে হন্নে হয়ে আছে—তাদের কারুকে চান্স দিলে—না, তপনবাবু আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, আপনাকে এখানে আর রাখা যাবে না। অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন।

—আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন স্যার। এখন চাকরি গেলে সবাই মিলে না খেয়ে মরবো। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে করেছি।

—ইয়ংম্যান বিয়ে করেছেন, সেই জন্যই তো আপনার আরো মন দিয়ে কাজ করা উচিত। তা নয় আপনি এক বছর ধরে স্ত্রীকে নিয়ে হনিমুন করবেন, আর কোম্পানি আপনাকে টাকা দেবে? তা তো হয় না!

—স্যার, আমার বউয়ের অসুখ।

—ইউ আর এ হোপলেস লায়ার। গত মাসেই তো আপনি ও আপনার স্ত্রীকে মেট্রোর সামনে দেখলাম, আপনি আলাপ করিয়ে দিলেন, দিব্যি স্বাস্থ্য, আর এখন বলছেন তার অসুখ।

—ওর অসুখ বাইরে থেকে বোঝা যায় না স্যার।

—বুঝেছি। আপনাদের ইউনিয়নের লিডারও স্বীকার করেছে, আপনি একজন ওয়ার্থলেস ওয়ার্কার।

—সে ওরা বলবেই, কারণ আমি ইউনিয়নের কোনো মিটিং-এ যাই না।

—যাক, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আই অ্যাম সরি, তপনবাবু, আই ক্যানট হেল্প ইউ। আমি ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আপনার ডিসচার্জ লেটার অলরেডি টাইপ হয়ে গেছে।

তপন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। মুখখানা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। আচমকা টেবিলের এপাশে এসে বড় সাহেবের হাত চেপে ধরে বললো, স্যার, আমাকে বাঁচান। আমাকে আর একটা চান্স দিন!

—আরে, আরে কী মুশকিল! এরকম করবেন না! আমিও তো কোম্পানির মাইনে নিচ্ছি। আমাকে কোম্পানির ইন্টারেস্ট দেখতে হবে।

—স্যার, সব্বাই জানে, আপনি খুব ভালো লোক, আপনি আমাকে এরকমভাবে মেরে ফেলবেন না। এই বাজারে আর কোথাও চাকরি পাবো না, না খেয়ে মরবো। আর একটি বার অন্তত চান্স দিন।

—চান্স দিলেও কি আপনি শোধরাবেন?

—একবার অন্তত দিয়ে দেখুন। আর কক্ষনো যদি আমার কাজে কোনো ভুল করি।

—ঠিক!

—স্যার, আমি হাত জোড় করে আপনার সামনে বলে যাচ্ছি, আর কোনোদিন—

কারুর চাকরি খেতে আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু কোম্পানি তো দয়া-ধর্ম দেখিয়ে টিকে থাকতে পারে না। ঠিক আছে, দিন চিঠিটা দিন।

তপন তার পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিল। জেনারেল ম্যানেজার তার ওপর লাল পেন্সিলে খসখস করে কী লিখে দিলেন। সেটা দেখে তপনের চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

গদগদভাবে বললো, স্যার, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে! যান, মন দিয়ে কাজ করুন গিয়ে—

যখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তখনও সারা শরীরটা ওর থরথর করে কাঁপছে। এ যেন মৃত্যুর গহ্বর থেকে বেঁচে ফিরে আসা।

বেশি উত্তেজনায় অনেকেরই বাথরুম পেয়ে যায়। তপনকেও এক্ষুনি বাথরুমে যেতে হবে। হনহন করে সে চললো বাইরের বাথরুমের দিকে। যাবার সময় সারা পথ সে থু থু করে থুতু ছেটাচ্ছে। তার মুখে যেন অনন্ত থুতু জমেছে, অনবরত ফেলেও ফুরোচ্ছে না।

বাথরুমে একটা বড় সাইজের আয়না। আয়নাটা মাঝখান দিয়ে ফেটে গেছে অনেকদিন। বদলানো হয়নি। সেই আয়নায় তপন তার ফাটা মুখচ্ছবির দিকে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর থু করে অনেকটা থুতু ছিটিয়ে দিল।

অপরেশ রমলা ও আমি

আমি প্রথমটা দেখতে পাইনি। বাসে উঠতে যাচ্ছি, একজন মহিলা নামছেন দেখে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছি। এক পায়ের চটি, ভদ্রমহিলার পায়ের দিকে তাকিয়েই আমার বুকটা একটু শিরশির করে উঠল, মনে হল, এই পা দুটি আমার হাতের মতন, বহুদিন আমি এই দুটি পা আমার হাতের মুঠোয় ধরেছি। চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলাকে পুরোপুরি দেখে বললুম, তুমি?

রমলা তখন বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমার সে বাসে ওঠা হল না। জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছ?

রমলা হেসে সামান্য ডানদিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো, আপনি কেমন আছেন?

'আপনি' শুনেই বুঝলুম, রমলার পিছন পিছন যে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোকটি নেমেছে, সেই রমলার স্বামী। রমলা কোনোদিনই আমাকে অন্য লোকের সামনে তুমি বলত না। অন্য লোকের সামনে আমি ছিলাম ওর দাদার একজন বন্ধুই।

রমলার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললুম, ভালো আছেন?

অপরেশ রায় মুখে কিছু না বলে ঘাড় হেলালেন। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। অপরেশ রায়কেও আমি আগে চিনতাম কিন্তু বছর সাতেক দেখি নি, মুখ মনে ছিল না, অথচ রমলার পা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম ঠিকই। এই সাত বছরে রমলার পা নিশ্চয়ই খানিকটা বদলেছে, আমরাও চোখ বদলেছে নিশ্চিত, তবু মুখের দিকে না তাকিয়ে চিনতে পেরেছিলুম।

হঠাৎ চৌরঙ্গিতে এই শেষ বিকেলবেলায় ওদের সঙ্গে দেখা হতে আমার ভালোই লাগল। শেষ যখন দেখেছিলুম, তখন ওর চোখের দুধার বেশ শুকনো ছিল, এখন পুরো মুখটাই মসৃণ হয়েছে। কি জানি এই ছয়-সাত বছর রমলা কলকাতাতেই ছিল কিনা, আমি ছিলাম না মাঝে দুএক বছর—তবু, এর মধ্যে কোথাও একদিনের জন্যেও দেখা হয় নি। গত তিন চার বছর একবারও ওর কথা মনেও পড়ে নি বোধহয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল, রমলা আমার থেকে খুব দূরে সরে যায় নি। চোখের কোণে চিকচিকে হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বেশ সরল হাস্যে বললুম—বাঃ, বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার!

অপরেশবাবু, আপনারা কোথায় আছেন এখন?

অপরেশ কোনো কথা না বলে তেমনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রমলাই উত্তর দিল, আমরা এখন গড়িয়াহাটায় থাকি। ওঁর অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে।

আপনি এখন কি করছেন?

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই অপরেশ বললেন, এক সেকেণ্ড। তারপর স্ত্রীকে ডেকে নিচু গলায় কি যেন বলতে লাগলেন।

আমি ওদের দিকে—সস্নেহে বললে খুব ভারিক্কি শোনাবে কিন্তু, বেশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। অপরেশের পাশে রমলাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। রমলা আগে ছিল রোগা-পটকা। সবল চেহারার পাশে ওকেও খানিকটা স্বাস্থ্যবতী হতে হয়েছে। আমি যে রমলাকে একসময় সত্যি ভালবাসতুম তা এই মুহূর্তে আবার বুঝতে পারলুম, কারণ ওদের একসঙ্গে দেখে আমার একটুও ঈর্ষা হচ্ছে না। গ্রীষ্মকালে এক গ্লাস ঠান্ডা জল পাওয়ার মতো, ওদের দেখার পর থেকেও আমার বুকের মধ্যে যেন আস্তে আস্তে খুশি গড়িয়ে আসছে। অপরেশকে বিয়ে করে খুবই বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিল রমলা—তার বদলে আমাকে বিয়ে করলে বেচারার দুর্ভোগ্যের সীমা থাকত না। স্বাস্থ্য কি এমন নিটোল হতে পারত? না, তার বদলে এতদিনে মুখে পড়ত ক্লান্তির ছাপ—আমিই আমার নিজের জীবন নিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি, সেই জীবনকে আশ্রয় করে কতদিন শান্তিতে থাকতে পারত রমলা? তাছাড়া গড়িয়াহাটের অফিস থেকে পাওয়া কোয়ার্টার—তা যোগাড় করা কোনোদিন আমার পক্ষে সম্ভব হত না। সত্যি রমলা, তুমি যে সুখে আছ, এ দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে।

অপরেশ বললেন, আপনারা একটু দাঁড়িয়ে কথা বলুন। আমি এক মিনিট আসছি। আমি রমলাকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় গেল তোমার স্বামী?

—চুরুটের বাক্স কিনতে।

—খুব চুরুট খান বুঝি?

—হুঁ! আর কোনো বিশেষ নেশা নেই—কিন্তু চুরুট না হলে চলে না। সব সময় হাতে চুরুট থাকা চাই। এক এক দিন চায়ের মধ্যে চুরুটের ছাই পড়ে যায়! মশারির মধ্যে ঢুকেও—

আমি হাসতে লাগলুম। রমলা বলল, ওর বাবাও এমন চুরুট খান—

আমার মনে হল, অপরেশ বোধহয় আমদের দুজনকে নিরালায় দুএকটা কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যই ছুতো ধরে চলে গেল। কিন্তু আমরা—অপরেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপরেশ আর তার বাবার চুরুট খাওয়ার নেশা নিয়েই কথা বলতে লাগলুম।

তা ছাড়া আর কিই বা বলতে পারতুম! বলা যায় কি, রমলা আমাকে তোমার মনে পড়ে? নাঃ! আমারই ওকে মনে পড়ে না—ওরই বা পড়বে কেন? কিংবা, একথাও কি বলা যায়, তোমার মনে আছে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা? তোমাদের ছাদের চিলেকোঠায়, সরস্বতী পুজোর রাত্রে তুমি বলেছিলে, তোমার বুকের বাঁ দিকটা আমার। আমি যখন খুশি দাবি করতে পারি—বুকের ওপরটা বা ভিতর—যা ইচ্ছে। না, এরকম দাবি জানাবার ইচ্ছেও আর আমার মনে পড়ে নি!

—কোনোদিন যদি চুরুট একেবারে ফুরিয়ে যায় তখন কি করে জান? সাদা কাগজ মোটা করে পাকিয়ে—হাতে ধরে থাকে। মাঝে মাঝে কাগজটা মুখে টানার ভান করে, অন্যমনস্কভাবে অবিকল চুরুটের ছাই ঝাড়ার মতো আঙুল দিয়ে টোকা দেয়। নেশাটা মুখের না হাতের...আমার...

রমলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাসছিলুম। অপরেশ ফিরে এলেন এর মধ্যে। এবার অপরেশের মুখের হাসিটা আর দেখা যায় না। আমি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, কোনো বিশেষ কাজে যাচ্ছিলেন নাকি? নইলে, আসুন না, একটু বসে চা খাওয়া যাক। অপরেশ বললেন, না, আমার একটু তাড়া আছে।

—কত আর সময় লাগবে! একটু চা খেয়ে যাওয়া—

অপরেশ ভ্রূকুটি করে বলল, বাঃ, আমি থাকব কি রে? অলি মাসির বাড়ি আমি যাব বলে কথা দিয়েছি। তুমি একা গেলে কি ভাববেন ওঁরা।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আজ চলি! একদিন আসুন না বাড়িতে!

আমি আর জোর করলুম না। রমলার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে পরে ঘাড় ঘুরিয়ে অপরেশকে নমস্কার জানালুম। অপরেশ ততক্ষণে এগুতে শুরু করেছে।

রমলা ওর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলল, অথচ ঠিকানা দিয়ে গেল না। তার মানে ওটা কথার কথা। অথবা ধরেই নিয়েছে আমি যাব না, বা দরকার নেই আমার।

কিন্তু সেই পড়ন্ত বিকেলে ওদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় আমার বেশ ভালো লাগছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করি, প্রচুর হাসাহাসি হোক, অপরেশের সামনে রমলাকে দুএকটা পুরোনো কথা তুলে লজ্জা দিই—যাতে অপরেশও প্রচুর মজা পেয়ে হাসতে পারে।

ছ-সাত বছর ওদের কথা একেবারেই ভাবি নি কিন্তু সেই দেখা হওয়ার পর, এক দিন আমি এক বন্ধুকে টেলিফোন করার জন্য গাইডের পাতা ওলটাতে অন্যমনস্কভাবে অপরেশ রায়ের নাম খুঁজতে লাগলুম। অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে যখন, তখন বাড়িতে ফোন থাকা খুবই স্বাভাবিক। গাইডে তিনজন অপরেশ রায়—গড়িয়াহাটের ঠিকানা যার—আমি তার নম্বর ঘোরাতে লাগলুম। এখন দুপুরবেলা—অপরেশের বাড়িতে থাকার কথা নয় যদিও।

রমলা আমাকে কখনও টেলিফোন করে নি, কিন্তু গলা শুনেই আমি চিনতে পারলুম। আমি বললুম, রমলা, আমি।

ওপাশে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর শান্তসুরে জিজ্ঞেস করল, এতদিন পর তুমি হঠাৎ ফোন করলে যে?

—আমায় চিনতে পারছ তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন পর!

—এতদিন পর হঠাৎ সেদিন দেখা হল কিনা। তুমি কেমন আছ?

—আমি ভালো আছি। কিন্তু তুমি আর কোনোদিন ফোন কর না।

—সে কি! রমলা, আমার তো কোনো খারাপ মতলব নেই। এমনিই ত শুধু——না। লক্ষ্মীটি, ও তোমার জন্য এখনও কষ্ট পায়।

—কে? অপরেশ? আমার জন্য? কেন?

—কেন তুমি জান না?

—আমি কি করে জানব? আমি ওর মনের কথা কি করে বুঝব?

—ও ভাবে, তোমার সঙ্গে এখনও আমার লুকিয়ে দেখা হয়।

—যাঃ। সাত বছরে ...

—অথবা....

—অথবা কি?

—ও ভাবে, আমি তোমার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কখনও কাঁদি।

—সত্যি কাঁদ নাকি?

আমি টেলিফোনে অনেকখানি হাসি পাঠিয়ে দিলুম রমলার কাছে। বললুম, যতসব পাগলের কাণ্ড। অপরেশকে দেখে মনে হল বেশ বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ লোক। সে সাত বছরেও নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারল না? সাত বছর আগে যা চুকে গেছে—

—হ্যাঁ, চুকেই তো গেছে। কিন্তু, তুমি আর কোনোদিন ফোন কর না লক্ষ্মীটি। আমরা তো দুজনে আর কেউ কারোর নই—তবে কেন আর—

—আচ্ছা, ফোন করব না আর কখনো। কিন্তু রমলা, আমার ইচ্ছে ছিল, অপরেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হোক—তা হলে হয়ত ওর ভুল ভেঙে যাবে। ও তো আগে সবই জানত। জানত—তুমি ইচ্ছে করেই ওকে বিয়ে করেছ—কেউ তোমাকে জোর করে নি। আমার সাধ্য ছিল না, তোমাকে আঁকড়ে রাখি।

—প্লীজ, নীলুদা, ওসব কথা থাক। তুমি আমাকে ভুলে যাও। আর কোনোদিন—লাইন ছেড়ে দিল। আমি দুঃখিত হাতে কিছুক্ষণ রিসিভারটা ধরে রইলুম তবু। কড়-র-র শব্দ হতে লাগল। আমি রিসিভারটা একবার রেখেই আবার তুলে নিয়ে সেই একই নম্বর আবার ডায়াল করলুম। ওপাশ থেকে তুলতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, রমলা, আবার আমি—

—নীলুদা। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাও?

—না, রমলা। আমায় বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে সুখী করতে চাই। আমি আর কোনোদিন তোমাকে ফোন করব না। পথে দেখা হলেও এড়িয়ে যাব। সত্যি রমলা, তোমাদের জীবনে একটুও ব্যাঘাত করার ইচ্ছা নেই আমার। ভেবেছিলুম বন্ধুর মতো একটু দেখাশোনা করে গল্প-গুজব করব। তাও দরকার নেই। কিন্তু অপরেশের কথা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, সে বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে—কিন্তু এ কিরকম মন তার। সাত বছর আগেকার ব্যাপার সে মনে পুষে রেখেছে? সেদিন ত দেখে কিছু বুঝতে পারিনি।

—ওই যে সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, ইচ্ছে করে একটুক্ষণ আড়ালে চলে গেল। এধরেই নিয়েছিল, তোমার সঙ্গে আমি গোপন দুঃখের কথা বলব।

—গোপন দুঃখ? তা নিয়ে আবার মুখের কথা বলা যায় নাকি? কি সর্বনাশ। অপরেশ কি তোমাকে কষ্ট দেয়?

—মোটেই না। নিজেই মন খারাপ করে। প্রায়ই বলে, আমি ওকে ভালবাসি না। কারণ আমি নাকি তোমাকে ভুলতে পারি নি।

—ইস, ছি ছি। আচ্ছা, আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমি আর কোনোদিন তোমাদের মধ্যে আসব না। অপরেশ কোন অফিসে চাকরি করে?

—কেন? তুমি জানতে চাইছ কেন?

—কোনো ভয় নেই তোমার, রমলা। আমি তোমাকে আমার পুরোনো গলায় বলছি, কোনো ভয় নেই, আমাকে প্রায়ই নানা কাজে অনেক অফিসে যেতে হয়, অপরেশের অফিসের নামটা জেনে রাখি—সেখানে কোনোদিন যাব না। যাতে কোনোদিন ওর সঙ্গে হঠাৎও আর দেখা না হয়।

—আলফা এক্সপোর্ট। স্টিফেন হাউস অফিসে।

—আচ্ছা রমলা, আমি ছেড়ে দিচ্ছি এবার। রমলা আমরা অনেক দূরে সরে গেছি।

—এতদূর থেকে কেউ কারুর দিকে হাত বাড়াতে পারি না? আমার দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। যাই—আর কোনোদিন হয়ত দেখা হবে না।

—নীলুদা, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ তো?

—ক্ষমার কথা উঠছে কিসে? রমলা, ছেলেবেলাতে আমি যা করেছি—তার জন্য আমি কোনোরূপ অনুতাপও করি না, আবার অতৃপ্তির হাহাকারও নেই। ছেলেবেলায় যা করেছি, তা ছেলেবেলাতেই মানায়, এখন যেমন মানায়—সেই রকম ভাবেই বেঁচে আছি। কোথাও কোনো দুঃখ নেই। তুমি ভালো থেকো রমলা। আচ্ছা!

এর পরদিন আমি যা করলুম, তার ঠিক যুক্তি হয়ত দেখাতে পারব না। আমি লোকটা তেমন খারাপ নই—স্বাভাবিক মানুষ যেমন হয়—সেই রকম। তবে নিজের কয়েকটি ইচ্ছার আমি নিজেই যুক্তি খুঁজে পাই না। যেমন, একদিন আমি পার্কে আলুকাবলি খেয়ে বেরিয়েছি, খুব ঝালে ঠোঁট উস উস করছি—দু হাতে লঙ্কার গুঁড়ো, নুন আর ঝোল লেগে আছে—হাত মোছা হয়নি। কোথায় হাত মুছব ভাবছিলুম—পকেট থেকে রুমাল বের করে মোছা যায় কিন্তু সেই রুমাল দিয়ে ভুল করে যদি কখনও মুখ মুছতে যাই—তবে চোখের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি রকম

ভাবছিলুম, সেই সময় একটি সুবেশ যুবকের দিকে আমার চোখ পড়ে। চমৎকার চেহারা, খুব দামি পোশাক পরা—পরিচ্ছন্ন চেহারার যুবকটি পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল, সেই যুবকটির গায়ের জামায় হাত দুটি মুছে দিই। ভাবতেই আমার হাসি পেল, এখন সোজা গিয়ে যদি ওর ফর্সা জামায় আমার হাত দুটি ঘষে দিই—কি অবস্থা হবে? যুবকটি হয়ত কোনো নারীর জন্য অপেক্ষা করছে—তাহলে...আমার ইচ্ছাটা এমন প্রবল হল যে আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু সামনা-সামনি হাতে ঘষে দেব তত সাহস আমার নেই। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা হতে লাগল। ছেলেটির চোখে কালো গগলস—সেই দেখেই কিনা হঠাৎ আমার মনে হল, ছেলেটি আমার শত্রু, এর ওপর প্রতিশোধ নিতেই হবে—অথচ ওকে আমি কোনোদিন দেখি নি।

যুবকটি হাঁটতে শুরু করতেই আমি ওকে অনুসরণ করলুম। দশ মিনিট হাঁটল সে—আমিও ওর পিছনে পিছনে যাচ্ছি। তখন আর আমার ফেরার উপায় নেই, তাহলে আমি ওর কাছে হেরে যাব। আমার হাতে পাঞ্জা দুটি খোলা—তখনও লঙ্কা তেঁতুলের টক লেগে আছে। হাজারার মোড় থেকে ছেলেটি একটি বাসে উঠল। সেই আমার সুযোগ—আমিও বাসে উঠে পড়লুম—খুব ভিড় ছিল, ভিড় ঠেলে আমি ওর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছি এবং এক সুযোগে ওর পিঠে এঁকে দিয়েছি আমার দু হাতের ছাপ। তারপরেই জয়ের গর্বে মন ভরে যেতে—আমি নেমে পড়েছি বাস থেকে।

বোধহয় সেইরকমই কোনো যুক্তিতে, আমার বার বার মনে হতে লাগল, অপরেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করা দরকার। সে আমায় শত্রু ভাবছে, অথচ আমি তো সত্যই তার বন্ধু। রমলাকে সে বিয়ে করে সুখী করেছে—সে আমায় বন্ধু হবে না? আমি রমলাকে এক সময় পাগলের মতো ভালবাসতুম—এখনও বাসি নিশ্চয়ই। যদি দেখতুম রমলার স্বামী একজন কুচ্ছিত গরিব লোক কিংবা মাতাল লম্পট জুয়াড়ি—তার ওপর আমি নিশ্চিত রেগে যেতুম, সে হত আমার শত্রু। কিন্তু অপরেশ অমন দৃপ্ত স্বাস্থ্যবান—সে রমলাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে—সে আমার শত্রু হবে কেন?

এতসব ভাববার আগেই কিন্তু আমি আলফা এক্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে ঢুকে পড়েছি। আলাদা ঘরের সামনে অপরেশের নাম লেখা—বেশ বড় অফিসারই মনে হল। বাইরের কোনো বেয়ারার হাত দিয়ে স্লিপ পাঠালে যদি অভিমানী অপরেশ আমার সঙ্গে দেখা করতে না চায়, এই ভেবে আমি দরজা খুলে সোজা ঘরে ঢুকে পড়লুম।

আমাকে দেখে অপরেশ নিশ্চিত খুবই অবাক হয়েছেন—কিন্তু অফিসাররা মুখের বিস্ময় লুকোতে জানে। ফাইলে মুখ গোঁজা ছিল, মুখ তুলে নির্বিকারভাবে বললেন, কি ব্যাপার?

আমি বললুম, পাশের অফিসে আমার এক বন্ধু কাজ করে, তার ওখানেই আপনার নাম শুনে ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। খুব বেশি ব্যস্ত ছিলেন নাকি!

—না, খুব নয়।

অপরেশ তখনও আমাকে বসতে বলেন নি। সে অভিমান করে আছে। কিন্তু আমার এসব ছোটখাটো ব্যাপার কিছু মনে করলে চলে না। আমি নিজেই চেয়ার টেনে বসলুম। বললুম, সেদিন পথে দেখা হল কিন্তু আপনার সঙ্গে ভালো করে কথাই হল না।

—হুঁ।

—এ অফিসে কতদিন আছেন?

—একটা কথা আগে জিজ্ঞেস করে রাখি। আপনি নিশ্চয়ই আপনার ভাইপো বা বন্ধুর ভাইয়ের জন্য চাকরির উমেদারি করতে আসেন নি? এখন লোক নেওয়া হচ্ছে যদিও কিন্তু আমাদের অফিসে ওসব চলে না।

এ যে স্পষ্ট অপমান। এ কথায় আমার খুব রেগে ওঠাই উচিত ছিল বোধহয়। তবু হেসে বললুম, না আমার কারুর চাকরির জন্য আসি নি। আমার নিজের জন্যও নয়। আমি আন্তরিকভাবেই দুএকটা কথা বলতে এসেছিলাম।

—আমার কাছে? হঠাৎ!

—আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করছেন না। তার কারণ হয়ত—

—কোনোই কারণ নেই। আপনার সঙ্গে আমার কোনোদিনই ভালো করে পরিচয় ছিল না—হঠাৎ অর্ধপরিচিত লোকদের সঙ্গে আন্তরিক আলোচনা করা আমার স্বভাব নয়। আমার স্ত্রীর মাকে আমি মা বলে ডাকি, তা বলে আমার স্ত্রীর সব বন্ধুদেরও আমি বন্ধু ভাবব, তার কি মানে আছে?

—'স্ত্রীর বন্ধু' বলতে আপনি ঠিক কি ভাবছেন?

ঢং ঢং করে বেল টিপে অপরেশ বেয়ারাকে ডাকলেন। তারপর রুক্ষ গলায় বললেন, নন ফেরাস মেটালের ফাইলটা এখনও পেলাম না কেন?

অপরেশের সঙ্গে ওর অফিসে এসে দেখা না করলেই ভালো হত—অফিসের বাইরে ছুটির পর দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত ছিল আমার। এই সব অফিসারদের ব্যবহার এমন হাস্যকর হয়—যতক্ষণ নিজের কামরায় বসে থাকে! বাইরে

বেরুলেই এরা সাধারণ মানুষ কিন্তু নিজের এই পার্টিশন করা ঘরের মধ্যে টেবিলের উলটোদিকে নিজের ঘুরোনো চেয়ারে বসলেই আর কিছুতে মুখের ভাব সরল করতে পারে না। কার্টুনের মতো মুখভঙ্গি করে থাকে। অপরেশ আমার দিকে ফিরে আবার বললেন, বলুন!

আমি চেয়ারটাকে টেবিলের আরও কাছে টেনে আনলুম। আমার মুখে হাসি। বললুম, আপনার সময় জরুরি। সুতরাং অল্প সময়ে স্পষ্ট করে কথা বলে যাই। সেদিন আপনাদের দেখে একটা কথা মনে হল। আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না। না করুন, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু মনে কোনো জ্বালা রাখবেন না। রমলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল—একথা জেনেও আপনি ওকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু তারপর আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলেবেলায় এরকম বন্ধুত্ব অনেকেরই থাকে—আপনারও হয়ত কোনো মেয়ের কোনো সঙ্গে ছিল। বিয়ের পর আর ওসব কে মনে রাখে? রমলাকে আমার মনেও পড়ে না।

—আপনি এসব কথা আমাকে বলতে এসেছেন কেন দয়া করে সেটা জানাবেন কি? রমলাকে আপনি মনে রেখেছেন কি রাখেন নি এটা শুনে সে দুঃখিত বা খুশি হতে পারে—কিন্তু আমার কি করার আছে? আমার স্ত্রীর সব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাব—এরকম হীন আমি নই। আপনার সঙ্গে যদি তার গোপনে সেন্টিমেণ্টাল অ্যাফেয়ার থেকেই থাকে—তাতেই বা—

আমি হঠাৎ টেবিলে দুম করে একটা ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে বললুম, যদি বলছেন কেন? বলছি না, নেই। কিছু নেই! আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না?

অপরেশের মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠল। অহংকারী গলায় বললেন, এটা একটা অফিস, দয়া করে মনে রাখবেন। নাটক করার জায়গা নয়—

—এখনও মনে হচ্ছে বুঝি নাটক করছি?

—আপনি আমার কাছে মহত্ত্ব দেখাতে এসেছেন, আপনি প্রেমিক আর আমি স্বামী। অর্থাৎ আপনি হলেন নায়ক, আমি ভিলেন। আপনার আত্মত্যাগ কি অসামান্য—রমলাকে আপনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন আবার এসেছেন উদারতা দেখাতে—আপনি ব্যর্থ প্রেমিক—আপনি এসেছেন নায়িকাকে সুখী করতে! আমার কিছু যায় আসে না, আপনি রমলার সঙ্গে ব্যভিচার করুন কি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করুন, আমার কিছু যায় আসে না। দয়া করে শুধু আপনার ওই ফিলথি ফেস আমাকে আর দেখাবেন না।

—অপরেশবাবু, শুনুন—

—আপনি যদি এখন চলে না যান, আমাকে ইংরাজিতে গেট আউট বলতে হবে। সেটা খুবই কর্কশ শোনাবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে অপরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। সেই হাসি দিয়ে আমি ওকে বললুম, তুমি একটা বিষম বোকা লোক।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমি সোজা চলে এলাম গড়িয়াহাটায়। ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি হল না। তেতলায় তিনটে ঘরের ফ্ল্যাট। রমলা দরজা খুলতেই আমি জোর করে ঢুকে পড়লুম।

বিবর্ণ মুখে রমলা বলল, নীলুদা, একি সর্বনাশ করতে এসেছ আমার?

আমি দুহাতে জড়িয়ে ওকে বললুম, মিলু, আমাকে দয়া কর, দয়া কর। সাত বছর তোমাকে দেখি নি, আমি তো বেশ ছিলুম। কিন্তু সেদিন তোমাকে একবার দেখে আমার বুকের মধ্যে আবার সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি আর থাকতে পারছি না। এখন বুঝতে পারছি, মিলু, এই সাত বছর আমি তোমার কথাই ভেবেছি। তোমাকে ছাড়া আমি কি করে বাঁচব মিলু?

—না, না, নীলুদা। ও যে কোনো সময়ে এসে পড়বে, এখন যাও, তোমার পায়ে পড়ি—

—না, আসবে না। অফিস ছুটি হতে অনেক দেরি। তার আগে আমি তোমার সামনে বসে একটু কথা বলতে চাই।

—সাড়ে চারটের আমার ছেলেকে আনতে যেতে হবে স্কুল থেকে। নীলুদা, তুমি যাও।

—সাড়ে চারটেরও একঘণ্টা দেরি। মিলু, আমাদের আগেকার সবই কি মিথ্যে হয়ে গেল?

—নীলুদা, তুমি কেন বিয়ে কর নি? কেন আমাকে ভুলে যাও নি। এ আমি সহ্য করতে পারব না।

—আমি আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারি না। আমি আজ তোমার কাছে আমার দাবি জানাতে এসেছি। তোমার বুকের বাঁ দিক আমার ছিল। আমি আমার জমি আবার উদ্ধার করে নিতে চাই।

রমলার মসৃণ, সৌরভময় শরীর আমার বাহুর মধ্যে। আমি বুঝতে পারলুম ওর শরীর কাঁপছে। হয়ত আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়—কিন্তু ওর একটা হাত আমার পিঠে। আমি ওর মুখ উঁচু করে কপালে ও ঠোঁটে চুমু খেলুম। মনে হল, ওর একটা ঠোঁট ঠান্ডা, একটা ঠোঁট উষ্ণ। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলুম।

রমলা ঠোঁটে হাত চেপে আর্তকণ্ঠে বলল, না, না, আমি পারব না, আমার ঘর সংসার সব ভেসে যাবে। আমি পারব না। তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। কিন্তু আমার ছেলে আছে—

রমলার পায়ের কাছে বসে বললুম, মিলু, একবার তোমার পা দুটো আমার বুকের ওপর রাখি। বিশ্বাস কর, আমি সাত বছরে একটুকুও বদলাই নি। আমি দুর্বৃত্ত ডাকাত হয়ে যাই নি, কিছুই কেড়ে নেব না জোর করে।...আমি নিজেকে বুঝতে পারি না...কাল পর্যন্ত জানতুম, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, তোমার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই—কিন্তু আজ অপরেশের সঙ্গে দেখা করার পর—

—তুমি ওর সঙ্গে দেখা করেছিলে? কেন? তবে যে আমাকে কথা দিয়েছিলে—

—জানি না। কেন যে দেখা করতে গেলাম জানি না। কিন্তু অপরেশ আমাকে অপমান করল—

রমলা আমার বুকের ওপর এসে হুহু করে কাঁদতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, আমিও তোমাকে ভুলতে চেয়েছিলাম, ভুলতে পারি নি অনেক চেষ্টা করেছি—ও আমার মুখ দেখে ঠিকই বুঝতে পারত—কিন্তু তুমি আবার কেন এলে? কেন?

—জানি না। এক ঘণ্টা আগেও ভাবি নি, তোমার কাছে কখনও আবার আসব।

কিন্তু দেখলুম অপরেশ নির্বোধ।

—সাত বছর আগে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

—সে কথা সাত বছর আগে জানতুম। এখন ভুলে গেছি, এই সাত বছরে তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। কিন্তু তোমার শরীর এখনও আমার কাছে ঠিক সেই রকম চেনা।

—তোমার চেহারা এমন রুক্ষ হয়ে গেছে কেন?

—যদি বলি তোমার জন্য, তাহলে কি খুশি হবে? কিন্তু তা বোধহয় সত্যি নয়। মিলু, এখন যদি অপরেশ এসে পড়ে?

—তাহলে আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হবে—

—না, না, তুমি মরবে কেন। কিন্তু আমাকেও যেন জানলা দিয়ে লাফাতে বলো না। তিনতলা থেকে আমি লাফাতে পারব না। বাথরুমেও লুকোতে পারব না।

—বাথরুমের মধ্যে আমি ধরা পড়তে চাই না। খাটের তলায়ও ঢুকে থাকা অসম্ভব।

—ওখানে নিশ্চয়ই আরশোলা আছে।

—নীলুদা, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, সত্যি করে বল?

আমি রমলার চুলের মধ্যে হাত বুলতে বুলতে বললুম, অপরেশ আমাকে আসতে বলল।

—কি!

—আমি অপরেশের কাছে গিয়েছিলাম। দেখলুম, ও একটা বোকা অহংকারী। ও আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল না যে আমি সত্যি কথা বলেছি! ও আমাকে অপমান করে সুখী হতে চায়। যেমন, ও তোমাকে চিরকাল সন্দেহ করেই সুখে থাকবে। ও তোমার ওপর অত্যাচার করবে না কোনোদিন। তোমাকে সন্তান দেবে, সম্পদ দেবে—তোমাকে ভালবাসবে—কিন্তু সন্দেহ করে যাবে বহুদিন, সারাজীবন। আমার কাছ থেকে তোমাকে জয় করে নিয়েছে—এই যেমন ওর গর্ব, তেমনি স্বামী হিসাবে তোমাকে সন্দেহ না করলে ওকে মানায় না—একথাও ও জানে। অর্থাৎ তোমার গোপন প্রেমের দুঃখ সত্ত্বেও—সবল সুস্থ স্বামী হিসেবে ও তোমাকে অধিকার করে আছে—এই হবে ওর সারা জীবনের অহংকার।

...নীলুদা, তুমি কি বলছ!

—ঠিক বলছি। ওর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার মনে হল, তাহলে আমিই বা কেন ক্ষতি স্বীকার করব। আমি চাই তোমাকে দেখতে, আমি চাই তোমাকে ছুঁতে, তোমার বুকের গন্ধ শুঁকতে। সন্দেহ যখন ও করবেই—তখন আমি কেন ফিরে আসব না? শুধু গোপনতা রক্ষা করাই যথেষ্ট। অপরেশ এমন দুর্বল নয় সে দুপুরে হঠাৎ অফিস থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে।

রমলা আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, কিন্তু আমি পারব না। এরকম আমি কিছুতেই পারব না। তুমি ওর দিকটাই ভেবে দেখছ, আমার কথা ভাবছ না? আমি কেউ নই, আমি একটা খেলনা? এতদিন আমি মনে মনে জানতাম, আমি বিয়ের পর থেকে ওর সঙ্গে কোনো ছলনা করিনি। মনে মনে তোমাকে ভুলতেই চেয়েছি. কিন্তু এখন ওর সঙ্গে অভিনয় করতে হবে নিয়মিত—সে গ্লানি আমি সইব কি করে?

—তবে কি তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে?

—কোথায়? সেদিন কাপুরুষের মতো দূরে সরে গিয়েছিলে, আজ আর কোথায় যাব! আজ তোমার সঙ্গে যেতে আমাকে যত মূল্য দিতে হবে—ভালবাসার জন্য ততটা কি মূল্য দেওয়া যায়? না, যায় না!

—ঠিক। শুধু ভালবাসার জন্য কে আর আজকাল দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে চায়। অপরেশ জানে না, প্রেমিকরা আজকাল আর নায়ক নয়, স্বামীরাই নায়ক। নাটক নভেলে সেই পুরাতন ব্যাপার দেখা গেলেও জীবন এখন বদলে গেছে, প্রেমের জন্য কে আর আত্মত্যাগ করতে চায়। সব প্রেমিকই এখন ব্যর্থ প্রেমিক।

আমি আর একটা চুমু খেয়ে মিলুর চোখের জল মুছে নেব ভেবেছিলুম—এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। মিলু ঝট করে ঘুরে সরে দাঁড়িয়ে বলল, এবার? এবার আমার কি হবে?

—আমি জিজ্ঞেস করলুম, অপরেশ নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—যাঃ, তা হতেই পারে না। প্রতিবেশী হতে পারে, কোনো সেলসম্যান বা তোমার ঝি নেই?

হিংস্র চোখে রমলা বলল, আমি ওই আওয়াজ চিনি। শেষে তুমি আমার সর্বনাশ করে গেলে।

সর্বনাশ কি মিলু। আমি তো তোমার পাশেই আছি।

রমলার চেহারা কি রকম হিংস্র হয়ে উঠেছে। বিস্রস্ত চুল, অল্প অল্প কান্নায় ফুঁসছে। দরজায় আবার ধাক্কা পড়তেই আমি দরজাটা খুলতে এগিয়ে গেলুম।

রমলা বললো, চুপ।

আমি বললুম, তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেওয়াই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক।

রমলা অল্প অল্প কান্নার আওয়াজ করতে করতে বলল, তুমি আমার কেউ নও। শুধু শুধু তুমি আমার সঙ্গে খেলা করতে এসে সর্বনাশ করে গেলে। আমি তোমাকে কোনোদিনও ভালবাসি নি।

—কিন্তু আমি এ ঘরে প্রথম ঢোকার পরই তুমি আমার আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছিলে।

—চুপ। বলেই পাগলাটে ধরনের রাগে রমলা কি একটা পেপারওয়েট না অন্য কোনো ভারী জিনিস ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। ওর ব্যবহার এমনই অস্বাভাবিক যে আমি মুখটা সরিয়ে নিই নি। সোজা এসে সেটা আমার কপাল ও নাকে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলেও মনে হল ভাগ্যিস চোখে লাগে নি। আমার সাধারণ শরীর, তাই নাক দিয়ে বেশ রক্ত বেরিয়ে এল। আমি রুমাল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে দরজায় দিকে এগিয়ে গেলুম। রমলা আরও কি একটা যেন ছুঁড়ে মেরেছে আমাকে। কিন্তু ততক্ষণে আমি দরজা খুলে দিয়েছি।

একটা ফুটফুটে ছ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে, অপরেশ নয়। রমলার ছেলে—একাই বা কারুর সঙ্গে ফিরে এসেছে। ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে তো ছেলেটাকে। মায়ের মুখ পেয়েছে।

ছেলেটা ঘরে ঢুকতেই, ঘরের কোণ থেকে এগিয়ে এল রমলা। রমলার কপালের টিপটা ধেবড়ে গেছে, চোখের পাশে শুকনো কান্না। কিন্তু এতটুকু ছেলের চোখে কি এসব ধরা পড়বে?

রমলার মুখের চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, তুই কার সঙ্গে এলি?

—বিলটুদের গাড়িতে। তুমি এলে না।

—নীলুদা, তুমি একটু বেঞ্জিন লাগাবে?

আমি হেসে বললুম, না, এমন কিছু লাগে নি। আমি যাই। আমি ছেলেটার চুলে হাত দিয়ে একটু আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম—রমলা পিছন থেকে তাকিয়ে আছে কি না দেখারও ইচ্ছে হল না একবার।

অপয়া

কতকগুলো ব্যাপার আছে, যেগুলোর কথা আমরা খবরের কাগজে পড়ি কিংবা লোকের মুখে শুনি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হয় না। যেমন জীবনে আমি বেশ কয়েকবার প্লেনে চেপেছি, ট্রেনে চেপেছি অন্তত কয়েক শো' বার, কিন্তু কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। তেমনি কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা কিংবা ডাকাতিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সাধারণ মানুষের জীবন শুধু অতি সাধারণ ঘটনাতেই সাজানো থাকে। আবার এক একজন মানুষ থাকে, যাদের জীবনে এরকম অনেকগুলো ঘটনাই পর পর ঘটে যায়। যাদের কাছে মৃত্যু অনেকবার কাছাকাছি এসে ফিরে যায়। তাদের জীবন নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক আলাদা।

সেই রকম একজনকে আমি দেখেছিলাম। বাণীদি। বাণীদিকে চিনতাম অনেকদিন ধরেই, কিন্তু যেদিন থেকে তাঁর জীবন কাহিনী জানতে পারলাম, সেদিন থেকে ওঁকে অন্য চোখে দেখতে লাগলাম। বাণীদি খুব একটা সুন্দরী না হলেও বেশ আকর্ষণীয় চেহারা। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় লম্বা, চোখে মুখে ব্যক্তিত্ব আছে এবং রীতিমত বিদুষী। দর্শনশাস্ত্রের ওপর বাণীদির লেখা দুখানি বই আছে। আমি ইচ্ছে করেই ওঁর পুরো নাম জানাচ্ছি না। কী যেন এক অদৃশ্য অভিশাপের জন্য বাণীদি কখনো জীবনে সুখ পেলেন না।

গোড়া থেকে বলি। একবার আমরা দলবল মিলে ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। তখন বাণীদির বয়স বছর তিরিশেক, আমাদের আরও কম। সবাই মিলে শিয়ালদা স্টেশনে এসেছি সকালবেলা। স্টেশনে রীতিমত গোলমাল, কোন ট্রেন আগে যাবে, কোন ট্রেন পরে যাবে তার ঠিক নেই। আমরা রীতিমতন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

কি কারণে যেন বাণীদি এই পিকনিকের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। কিছুতেই আসতে রাজি হয় নি। অনেকটা ওঁকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল। ট্রেনের গোলমাল দেখে বাণীদি বললেন, আমি তাহলে ফিরে যাই।

কিন্তু এতদূর এসে কি কেউ ফিরে যায়? আমরা বাণীদিকে জোর করে আটকে রাখলাম।

পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মে দুটি ট্রেন দাঁড়িয়ে। কোনটা আগে ছাড়বে কেউ বলতে পারে না। মোটামুটি আন্দাজ করে একটা ট্রেনে উঠে বসলাম। একটু পরেই সুবিমল খবর নিয়ে এল, আমরা ভুল ট্রেনে উঠেছি। অন্যটাই আগে ছাড়বে।

তক্ষুণি আমরা হুড়োহুড়ি করে, লটবহর নামিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে বসলাম অন্য ট্রেনটিতে। বাণীদি যাতে চলে না যান, সেই জন্য আমি ওঁর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা এই ট্রেনে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ট্রেনটা হুইশল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। তখন আর আমাদের নামবার উপায় নেই। সকলে মিলে খুব একচোট গালাগাল দিলাম সুবিমলকে। সুবিমল মিনমিন করতে লাগলো।

যাই হোক আধ ঘন্টা বাদে আমাদের ট্রেনটাও ছাড়লো। আমরা সবাই মিলে গান ধরলাম। আমাদের মধ্যে সুবিমল, মালতী আর অঞ্জনার গানের গলা বেশ ভালো। বাণীদিও এক একবার আমাদের সঙ্গে গলা মেলালেন। এখন বাণীদিকে বেশ হাসিখুশিই মনে হচ্ছে।

আমরা মাঝামাঝি পথ পৌঁছবার পর হঠাৎ মাঠের মাঝখানে থেমে গেল ট্রেনটা। ঘন ঘন হুইশল বাজাতে লাগলো। কি রকম যেন আর্ত চিৎকারের মতন। অনেক কৌতূহলী যাত্রী নেমে পড়লো ট্রেন থেকে। সুবিমলই খবর নিয়ে এলো যে তিন মাইল দূরে একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমাদের এই ট্রেন আর চলবে কিনা সন্দেহ আছে।

তখন আমাদের অল্প বয়েস। কোনো ঘটনাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। ট্রেন চলবে না শুনেও খুব একটা ঘাবড়ে গেলুম না। আমি অন্যদের কাছে প্রস্তাব দিলাম, 'চল না আমরা হেঁটে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টটা দেখে আসি।'

সকলে রাজি হল। শুধু দেখলাম বাণীদি জানলার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মুখখানা দারুণ বিষণ্ন। মনে হলো অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে মনে খুব আঘাত পেয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বাণীদি আপনি যাবেন না?'

বাণীদি একটু ম্লান অপলকভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই জন্যেই আমি আসতে চাই নি। তোমরা কেন আমাকে নিয়ে এলে? আমার জন্যই তোমাদের সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'আপনার জন্য? আপনি আবার কি করলেন?'

বাণীদি—'তোমাদের পিকনিকে যাওয়া হলে না আর।'

—'তাতে কি হয়েছে? জিনিসপত্র তো সঙ্গেই আছে, আমরা না হয় এই মাঠের মধ্যেই পিকনিক করবো।'

বাণীদি তবু একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ সুবিমলের জন্যই তোমরা বেঁচে গেলে। শেষ মুহূর্তে সুবিমলের কথায় আমরা ট্রেন বদলালাম। নইলে আগের যে ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে, আমরা তো সেটাতেই থাকতাম।'

এ কথাটা অবশ্য প্রথমেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল। সত্যিই, একটুর জন্য আমরা আগের ট্রেনটায় যাই নি।

সুবিমল বললো, 'আমি তখনই বুঝেছিলাম। আমি বিপদের গন্ধ পাই।'

আমরা সবাই মিলে সুবিমলকে 'যা যা বেশি চালাকি করিস নি।' 'চুপ কর তো, অ্যান অ্যাকিসিডেন্ট ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট—এইসব বলে চুপ করিয়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু বাণীদি আমাদের বাধা দিয়ে বললেন—,

—'সুবিমল কিন্তু ঠিকই বলেছে। ও না থাকলে তোমাদের আজ বিপদ হতো। আমি যেখানেই যাই সেখানেই একটা কিছু বিপদ হয়। আমি অপয়া।'

আমরা বললাম, 'সে কি বাণীদি! অপয়া আবার কি! আপনার কুসংস্কার আছে জানতাম না তো!'

বাণীদি ম্লান গলায় বললেন 'আমি এই কথাটা কত দুঃখে বলেছি তা তো জানো না। কেউ কখনো নিজের মুখে নিজেকে অপয়া বলে? জন্ম থেকেই বিপদ আমার পাশে পাশে।'

সেই দিন আমরা বাণীদির জীবনের ঘটনা শুনলাম। ডায়মণ্ডহারবার লাইনে ট্রেন সেদিন ছ ঘণ্টা বন্ধ ছিল। আমরা সেই মাঠের মধ্যেই পিকনিক করেছি. শীতকাল ছিল, তাই বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় নি। ট্রেনের কামরা ছিল আমাদের বিশ্রামের জায়গা।

বাণীদির জীবন কাহিনী বানানো গল্পের মত অস্বাভাবিক। অথচ বাণীদি আমাদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত বসেছিলেন, এবং ওঁর জীবনের কয়েকটা ঘটনা যে সত্যি তা আমাদের মধ্যে আরও কয়েজন স্বীকার করলো, তারা আগেই শুনেছে।

বাণীদির শৈশব শুরু হয়েছে অদ্ভুতভাবে।

বাণীদি বললেন, 'তোমাদের মনে আছে, বিহারে একবার সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়েছিল? সেই বছরে আমার জন্ম। সেই সময় আমার বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করতেন। আমার তখন মাত্র দেড় মাস বয়েস সেই সময় এক শেষ রাত্রে শুরু হল ভূমিকম্প। তার একটু আগেই আমি খুব কান্নাকাটি করেছিলাম বলে আমার মা জেগে উঠে আমায় কোলে নিয়ে বসেছিলেন। একটু বাদেই ঘরবাড়ি সব কেঁপে উঠলো। অনেকেই ছুটে চলে গিয়েছিল বাড়ির বাইরে। কয়েকজন আমার মাকে চেঁচিয়ে বলেছিল, শিগগির বাইরে চলে এসো। মা বলেছিলেম খুকিকে একটু শান্ত করেই আসছি। এখন বাইরে নিয়ে গেলে আরও চ্যাঁচাবে।

কিন্তু মা আর সময় পেলেন না। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বাড়িটা ভেঙে পড়লো। সেবার হাজার হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। আমাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেখা গিয়েছিল, বসে থাকা অবস্থাতেই মা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর কোলের মধ্যে আমি তখনও বেঁচে। শেষ মুহূর্তে মা মাথাটা ঝুঁকিয়ে আমার শরীরটা আড়াল করে রেখেছিলেন। আমাকে সারা জীবন কষ্ট দেবার জন্য মা আমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেলেন।'

বাণীদি কথাগুলো এমন নিরাসক্তভাবে বললেন যে চট করে কোনো মন্তব্য করা যায় না। কিন্তু এই একটা ঘটনার জন্যই অপয়া বলা যায় না কারুকে।

বাণীদি বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝলেন তাই বললেন, শুধু এই একটা ঘটনাই নয়। আমি যতবার ট্রেনে চেপেছি. একটা না একটা দুর্ঘটনা হয়েছেই। এর মধ্যে বড় রকমের অ্যাকসিডেন্ট অন্তত চারবার। প্রত্যেকবারই আমার চোখের সামনে কেউ না কেউ মারা গেছে কিন্তু আমার গায়ে আঁচড়টা পর্যন্ত লাগে নি। ইডেন গার্ডেনে একবার খুব বড় একটা মেলা হয়েছিল না? আমি তখন বেশ ছোট, স্কুলে পড়ি। স্কুলের কয়েকজন বন্ধু মিলে সেই মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চেপেছিলাম। খুব জোরে যখন ঘুরছে, সেই সময় নাগরদোলার একটা পাল্লা ভেঙে গেল। আমরা চারটি মেয়ে তখন সবচেয়ে উঁচুতে, হঠাৎ মনে হলো যেন আমরা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছি। প্রাণ-ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। সবাই, অন্যরাও গেল গেল বলেছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ধপ করে পড়লাম একটা নরম জায়গায়—পাশের একটা তাঁবুর ওপর, আমার কিছুই হল না। কিন্তু আর দুটি মেয়ের মাথায় খুব চোট লেগেছিল, আর একটি মেয়ের পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে রইল সারা জীবনের মতন। সেই থেকে আমি আর কক্ষনো নাগরদোলায় চাপি না।'

বাণীদি সেদিন এই রকম অনেকগুলো অবিশ্বাস্য অথচ সত্যি ঘটনা বলেছিলেন।

তার মধ্যে আর একটির উল্লেখ করছি এখানে। সেটি সত্যই চমকপ্রদ। বাণীদি বললেন—'তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। একদিন দুপুরবেলা আমি দোতলা বাসে চেপে যাচ্ছি কলেজ স্ট্রীটে। হাজরা মোড়ের কাছে বাসটা থেমেছে, দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমার মাসতুতো ভাই মন্টু। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, "কি রে মণ্টু কোথায় যাবি?" মণ্টু চেঁচিয়ে বলল, "কোথাও না। এমনি আড্ডা মারছি, তুমি নাম না এখানে!" আমি বললাম,

"তোরা উঠে আয় না বাসে, কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউসে বসব!" মণ্টু আর ওর এক বন্ধু অমল, লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই চলন্ত বাসে। আমার কাছে এসে মণ্টু বলল, "তুমি কিন্তু আমাদের বাসভাড়া দেবে, আর কফি হাউসে খাওয়ার খরচও তোমার" আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেব দেব, তাদের ডেকেই দেখছি ভুল করেছি---"

বাণীদি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'সত্যি, সেদিন কি ভুলই করেছিলাম ওদের ডেকে। আজও সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না, বিশেষ করে মণ্টুর বন্ধু অমলের কথা ভাবলে।'

আমরা বাণীদিকে বললাম' 'তারপর কি হল?'

বাণীদি বললেন, 'আমি বসেছিলাম লেডিস সীটে। পাশে একটা জায়গা খালি ছিল। সেখানে মণ্টু বসবে না অমল বসবে এ নিয়ে খুব ঝুলোঝুলি হল। অমল খুব লাজুক ধরনের ছেলে, সে কিছুতেই বসতে রাজি হল না, মণ্টু বসলো আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল অমল। বাস খানিকটা আসতেই কি রকম যেন গোলমাল টের পেলাম। বাসটা চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ধর্মতলায় ঢুকতেই দেখলাম রাস্তা একেবারে লোকে লোকারণ্য, অনেকের হাতে বড় বড় লাঠি আর ছোরা, আমরা টের পাই নি কলকাতায় কখন দাঙ্গা বেধে গেছে। কিন্তু তখন আর বাস ঘোরাবার উপায় নেই। সোজা চালিয়ে কোন থানায় আশ্রয় নিতে হবে। ওয়েলিংটনের কাছে একদল লোক বাস আটকে দিল। দুমদাম করে বোমা আর দুটো গুলির আওয়াজ শুনলাম। চোখের নিমেষে দেখলাম আমাদের পাশে দাঁড়ানো অমল গুলি বিদ্ধ হয়ে ধুপ করে পড়ে গেল। একটা আওয়াজও করতে পারল না। ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। তার পরেই বাসসুদ্ধ লোকের আর্ত চিৎকার।

এদিকে গুণ্ডারা বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সকলকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে, কাউকে নামতেও দেবে না। আমরা তাকিয়ে দেখলাম, বাসের ড্রাইভার হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত তারও গুলি লেগেছে। আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই। তখন মণ্টু এক অসমসাহসিক কাণ্ড করলো। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে ছুটে গেল বাসের সামনের দিকে। ড্রাইভারের সীটের পেছনে যে তারের জাল থাকে সেটার ওপর দমাদম লাথি মেরে ছিঁড়ে ফেললো, সেটাকে, তারপর লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে আহত ড্রাইভারকে সরিয়ে নিজেই চালিয়ে দিল বাসটা, মণ্টু খুব ভালো গাড়ি চালায়, কিন্তু কোনোদিন বাস চালায় নি। তবু ঝড়ের বেগে সেই বাস চালিয়ে গুণ্ডাদের দুএকজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে সোজা সেই বাস এনে ওঠালো মেডিকেল কলেজে। সেখানে পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে গেল মণ্টু। তার কাঁধে একটা ছুরি বিঁধেছিল—

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের লোকজন এসে নামালো আহতদের, আমি ঘোর লাগা চোখে অমলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিলাম। আমার নড়াচড়া করারও ক্ষমতা ছিল না যেন, আমার দিকে তাকিয়ে কয়েকজন একটু যেন থমকে গেল। তারপর বললো, 'আপনি চুপ করে বসে থাকুন, একটুও নড়বেন না। আমরা স্ট্রেচার আনছি।'

আমি অতিকষ্টে বললাম, 'আমার, আমার কি হয়েছে?'

'আপনার বুকে বোধহয় গুলি লেগেছে একদম নড়াচড়া করবেন না।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার বুকের কাছে শাড়িতে লেগে আছে টাটকা রক্ত। বিন্দু বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। সত্যি কথা বলতে কি সেই রক্ত দেখে আমার বেশ আনন্দই হয়েছিল। হয়তো আমার গুলি লেগেছে কখন, আমি টেরই পাই নি। কিন্তু আমি যে অন্যদের সঙ্গে দুর্ভাগ্য ভাগ করে নিতে পেরেছি এটাই আমার আনন্দ।

কিন্তু পরে দেখা গেল, আমার কিছুই হয় নি। অমলের রক্ত ছিটকে এসে লেগেছিল আমার গায়ে। অন্যান্য বারের মতন সেবারে আমার গায়ে আঁচড়ও লাগে নি। সেই দুঃখে সেবারে আমি এত কেঁদেছিলাম যে সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারি নি। আমি অন্যদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনি, তবু আমার কিছু হয় না কেন?'

বাণীদির গলা ধরে এসেছিল, বোধহয় কেঁদেই ফেলতেন। অতিকষ্টে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'সত্যিই দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে ঘোরে। টাইফয়েড মেরীর কথা শুনেছো তো। সেই যে মেরী নামে একটি মেয়ে যে বাড়িতেই যেত সেই বাড়তেই কেউ না কেউ টাইফয়েডে মারা যেত, অথচ তার নিজের কিছুই হতো না—আমার অবস্থাও সেই রকম। আগেকার দিন হলে আমাকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হোত!'

আমরা বাণীদিকে সান্ত্বনা ঠিক দিতে পারিনি নি, কিন্তু এর পর অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। এর কোনো ঘটনার জন্যই তো কেউ বাণীদিকে দোষ দিতে পারবে না। আমরা আধুনিক কালের মানুষ হয়ে অলৌকিক কিছু মানতে পারিনা। এই সব ঘটনাকেই কাকতালীয় বলতে হয়।

যাই হোক, সেবারের পিকনিকের পর থেকেই আমি বাণীদির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, আর যাই হোক বাণীদি মোটেই সাধারণ মেয়ে নন। প্রায়ই যেতাম ওঁদের বাড়িতে, ওঁদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল, ল্যান্সডাউনে বিরাট বাড়ি। বাণীদি কিছুদিন একটা কলেজে পড়াচ্ছিলেন, তারপর কি কারণে যেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেই নিজের পড়াশোনাতে মেতে আছেন। ওঁর এক দাদা থাকেন আমেরিকায়, আর একজন দিল্লীতে।

বাড়িতে লোকজন প্রায় নেই-ই বললে হয়। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাণীদি, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

বাণীদি বলেছিলেন, 'কেন, পৃথিবীর সব মেয়েকেই কি বিয়ে করতে হবে নাকি? কত পুরুষ তো সারাজীবন ব্যাচিলার থাকে।'

—'তা থাকতে পরে, আপনার কখনো একলা লাগে না?'

—'না। আমি একা থাকতেই ভালবাসি।'

বাণীদির মত মেয়েকে বিয়ে করতে অনেক পুরুষই আগ্রহী হবে। তাঁর রূপ ও বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াও এক একসময় বাণীদি বেশ গান বাজনা ও গল্পে জমিয়ে রাখতে পারেন। বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে গেলে বোধহয় বাণীদির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস মুছে যেতে পারতো।

দু'তিনবার বাণীদিকে ওই বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করার পর বাণীদি হঠাৎ একবার বলে ফেলেছিলেন, 'আমি বিয়ে করতে চেয়ে দুটি ছেলেকে মেরে ফেলেছি। তারপরও আমাকে বিয়ে করতে বলো তোমরা?'

কথাটা চমকে ওঠার মতো, কিন্তু বাণীদি সহজে সে ঘটনা দুটো বলতে চান নি। অনেক চেষ্টা করে জানতে হয়েছে। এক বৃষ্টি ভেজা মন খারাপ করা বিকেলে বাণীদি আমাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি আজ রঞ্জন আর অনুপমের কথা বলছি, তুমি আর আমাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করো না।'

একটু থেমে বাণীদি বলেছিলেন, 'রঞ্জনকে আমি চিনতাম কলেজ জীবন থেকেই। রঞ্জন আমার বাবার বন্ধুর ছেলে। আমাদের মেলামেশা অনেক সহজ ছিল। আমি রঞ্জনকে মনে মনে ভালবাসতাম, কিন্তু রঞ্জনের ছিল খুব খেলাধুলায় ঝোঁক। ক্রিকেট আর ব্যাডমিণ্টন খেলায় ওর খুব সুনাম ছিল। খেলার নেশাতেই ও মেতে থাকতো, হঠাৎ একদিন তার চোখ পড়লো আমার দিকে। তারপরই বিয়ের প্রস্তাব জানালো।

ওর আর আমার বিয়ে হওয়াটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারুর বাড়ি থেকেই কোনো আপত্তি হতো না, বরং সবাই খুশি হোত, আমি শুধু একটা ব্যাপারে মনে মনে একটু অস্বস্তিতে ছিলাম। রঞ্জনের নিজস্ব একটা গাড়ি ছিল। আর ও গাড়ি চালাতো দুর্দান্ত স্পীডে, সেটাতেই আমার ভয়। আমি তো নিজেকে জানি। রঞ্জনের গাড়িতে আমি থাকলে নিশ্চয়ই একদিন একটা অ্যাকসিডেণ্ট হবে, অথচ এ কথাটা রঞ্জনকে জানানোও যায় না।

প্রায়ই ও গাড়ি নিয়ে আসতো আমাদের বাড়িতে। হর্ন বাজিয়ে ডাকতো আমাকে, আমি নিচে নেমে এলেই বলতো, "চলো আজ কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসি। ব্যারাকপুর কিংবা ব্যাণ্ডেল।"

আমি বলতাম, "কেন, অত দূরে কেন? চলো না, ময়দানে যাই।" রঞ্জন তা পছন্দ করতো না। লং ড্রাইভ ছাড়া ওর ভালো লাগে না। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম, দুএকদিন অ্যাকসিডেণ্টের উপক্রমও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একদিন ওকে বলেই ফেললাম, আমার গাড়ি করে বেড়াতে ভালো লাগে না। রঞ্জন প্রথমটা তো বুঝতেই পারে না আমার কথা, কি করেই বা বুঝবে? কোনো মেয়ে কি একথা বলে? তবু আমি ওকে বললাম, আমার চেনাশুনো সব মেয়েরা পায়ে হেঁটে কি রকম বেড়ায়, কিংবা ট্রামে বাসে ঘোরে। বড় জোর কখনো ট্যাক্সিতে চাপে। কিন্তু এরকম বড়লোকের মতন সব সময় গাড়ি নিয়ে ঘুরতে আমার লজ্জা করে। রঞ্জন কয়েকবার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এরপর থেকে ও গাড়ি নিয়ে এলে আর ওর সঙ্গে বেরুতাম না। রঞ্জন খুব দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু আমার জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেললো। একদিন এক কথায় বিক্রি করে দিল গাড়িটা প্রায় জলের দামে। গাড়িটা ছিল ওর খুবই প্রিয়, গাড়ি ছাড়া ওকে এক মিনিট দেখা যেত না পথে ঘাটে—সেই গাড়ি বিক্রি করে দিতে যে ওর মনে কতটা লেগেছিল তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। গাড়িটা বিক্রি করে সোজা রঞ্জন আমাদের বাড়িতে এসে বললো, "এবার তুমি খুশি তো?" তার দুদিন পরেই রঞ্জন মারা গেল।

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললাম—'অ্যাঁ, কি হলো?'

বাণীদি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'রঞ্জন মারা গেল। কি করে জানো? গাড়ি চাপা পড়ে। খেলার মাঠ থেকে ফিরছিল, দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে।—রঞ্জন নিজে কখনো কারুকে চাপা দেয় নি, অথচ ওকেই মরতে হলো গাড়ির তলায়। আর কেউ জানে না, কিন্তু আমি তো জানি, রঞ্জন যদি নিজের গাড়িটা বিক্রি করে না দিত তা হলে কিছুতেই এভাবে—'

আমি বাণীদিকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না বাণীদি, এটা আপনি শুধু নিজের ওপর দোষ টানছেন। অনেকেই তো গাড়ি বিক্রি করে দেয় অনেক কারণে, তা বলে তারা যদি চাপা পড়ে মরে? এটা মানে, এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার।'

বাণীদি বললেন, 'আমার সব ঘটনা সম্পর্কেই সবাই একথা বলে। কিন্তু আমার জীবনে এতগুলো আকস্মিক ঘটনা কেন ঘটে বলতে পারে?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'যাই হোক, দ্বিতীয় ঘটনাটা কি?'

বাণীদি বললেন, 'সেটা বলার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছো সত্যি করে বলতো?' আমি একটু থমমত খেয়ে বললাম—'কি আবার ভাববো?'

—'আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছো না?'

—'ভয় পাবো কেন? আপনাকে ভালো লাগে বলেই তো আপনার কাছে যখন তখন চলে আসি। দ্বিতীয় ঘটনাটা বলুন।'

বাণীদি বললেন, 'দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় বছর পাঁচেক পরে। রঞ্জন মারা যাবার পর আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে তেমন করে মিশতুম না। আর কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় নি। আমি মন ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে প্রেম, ভালবাসা এসব আমার জন্য নয়। কিন্তু এ সব কিছু ওলট-পালট করে দিল অনুপম, অনুপম অনেক দিন বিদেশে ছিল, আগে ওর সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। বিদেশ থেকে ফিরে কেন জানি না ও আমাকে খুঁজে বার করলো, নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতে লাগলো। তারপর একদিন বিয়ের প্রস্তাব জানাল। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু অনুপম একেবারে নাছোড়বান্দা। আমি কেন ওকে বিয়ে করতে রাজি নই সেই কথা ওকে জানাতে হবে, না হলে ও কিছুতেই ছাড়বে না। অর্থাৎ ওর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ওকে একদিন সব কথা খুলে বললাম। আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে অন্য কারুর জীবনের সঙ্গে আমি আমার জীবনটা জড়াতে চাই না। আমি অপয়া।'

অনুপম তো সেই কথা শুনে আরো ক্ষেপে উঠলো। ও বললো, "এই সব ননসেন্স তুমি বিশ্বাস করো। এ রকম অ্যাকসিডেন্ট তো মানুষের জীবনে হয়ই। আমারও তো কতরকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

আমি বললাম "অনুপম, তোমার ব্যাপার আর আমার ব্যাপার একদম আলাদা, আমার কাছাকাছি যারাই আসে তাদেরই একটা না একটা বিপদ হয়।"

অনুপম বললো, "আমি কোনো বিপদকে গ্রাহ্য করি না। মনের জোর থাকলে মানুষ সব কিছু কাটিয়ে উঠতে পারে। আমি দেখিয়ে দিতে চাই তোমার ধারণাগুলো কত মিথ্যে।"

তারপর থেকে অনুপম আমাকে নিয়ে কতকগুলো এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলো। আমাকে নিয়ে প্রত্যেক দিনই ট্যাক্সিতে কিংবা গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে লাগলো। জোর করে দেখবার জন্য যে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয় কি না। সত্যিই কিছুই হল না কোনোদিন। একদিন গঙ্গায় নৌকা ভাড়া করে ঘুরে এল আমাকে নিয়ে। ঝড় উঠলো না, নৌকো ডুবলো না। কলকাতায় তখন খুব কলেরা হচ্ছে। ইচ্ছে করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একগাদা আলুকাবলি আর কাটা ফল খেল একদিন। ওর কোনো অসুখ হলো না, ও আমাকে গর্ব করে বলতে লাগলো, "দেখছো তো আমি আমার, আমার কিছু হয় না।"

সেই কমাস আমার সত্যি খুব আনন্দে কেটেছিল। আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম সত্যিই হয়তো দুর্ঘটনার অভিশাপ কেটে গেছে আমার ওপর থেকে। অনুপম আমার জীবনটা বদলে দিচ্ছে। তারপর অনুপম একদিন এসে বললো, "তোমার ওপর আর একটা এক্সপেরিমেন্ট বাকি আছে। তোমার তো ট্রেন সম্পর্কে ভয় আছে। তুমি আমার সঙ্গে ট্রেনে চেপে দার্জিলিং যাবে।" আমি অবাক হয়ে বললাম—"দার্জিলিং যাবো? বাঃ, তা কি করে হয়?"

অনুপম বলল, "কেন? অসুবিধে কি আছে? বাড়িতে একটা কিছু বলে ম্যানেজ করতে পারবে না?"

"এ কি তোমার বিদেশ পেয়েছ নাকি? অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব কেন? দার্জিলিং-এ তোমার এক মামা থাকেন না? তুমি তাঁর বাড়িতে থাকবে আমি হোটেলে উঠব। একসঙ্গে ট্রেন জার্নি, বেড়ানো তো হবে।"

শেষপর্যন্ত অনুপমের প্রস্তাবে আমাকে রাজি হতে হল। আমাদের বাড়িতে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। ট্রেনে দার্জিলিং গেলাম, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলো না। এমন কি একদিন জীপ নিয়ে ঘুরে এলাম কালিম্পং—ওদিকটার রাস্তা তখন বেশ খারাপ ছিল কিন্তু জীপের ড্রাইভার বলল এমন নিশ্চিন্তে সে বহুদিন চালায় নি। অনুপম গর্বের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল "দেখলে? আমি বলেছিলাম না মনের জোরটাই আসল!"

কিন্তু বিপদটা এল অন্যদিক থেকে। আমি নিজের জন্য কখনো চিন্তা করি না। অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে কিন্তু আমার তো কখনো কিছু হয় নি। বিপদ হয়েছে অন্যদের। তাই আমি সব সময় অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করি। গাড়িতে যাবার সময় অনুপম জানালা দিয়ে সামান্য একটু ঝুঁকলেও ওর হাত চেপে ধরতাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কোনো গাড়ি এলে আমি সামনে এসে দাঁড়াতাম ওকে আড়াল করে।

একদিন ঘুম মনাস্টারির দিকে বেড়াতে গেছি বিকেলের দিকে। দুজনে পাশাপাশি আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, চমৎকার শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, এই জীবনটা কি সুন্দর। অনুপম আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সব ভয় গেছে তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ভাল লাগছে?"

"খুব। এত ভাল লাগবে, কখনো ভাবি নি।"

অনুপম একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়াল। আমি একটা গান গুনগুন করতে করতে এগিয়ে গেলাম অন্যমনস্কভাবে। বেশ কুয়াশা ছিল, রাস্তাটা লক্ষ্য করি নি। একটা আলগা প্যাথরে পা পড়তেই আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম পাশের দিকে। পাশেই বিরাট খাদ। আমি শুধু মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলাম। তাই শুনেই অনুপম ভাবল আমার খুব বিপদ হয়েছে। লাফ দিয়ে চলে এল আমার দিকে। আমি তখন রাস্তায় পাশে পড়ে গিয়েও একটা পাথর ধরে ফেলেছি। কিন্তু অনুপম এমন হুড়মুড় করে সেখানে এসে পড়ল যে তাল সামলাতে পারল্ল না। ও গড়িয়ে পড়ল নিচের দিকে। আমি ভেবেছিলাম অনুপম নিশ্চয়ই কিছু একটা ধরে ফেলবে। কিন্তু তা হলো না, অনুপম চেঁচিয়ে উঠল, "বাণী, আমার হাতটা একটু ধরো। হাতটা একটু ধরো—"

আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে এসে আর সেখানে কিছুই দেখতে পেলাম না, অনুপম আর নেই।

বাণীদি গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'এখনো আমার কানে সেই ডাক ভেসে আসে, বাণী, আমার হাতটা একটু ধরো, আমার হাতটা একটু ধরো। কিন্তু আমি ধরতে পারি নি।'

বাণীদির সমস্ত শরীটা কাঁপছিল। মুখটা নিচু করা। আমি গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'বাণীদি, আমি শুধু একটা কথা বলছি আপনাকে। এসব যাই ঘটে থাক, তবু আপনাকে এখনো অনেকে ভালবাসে।'

বাণীদি আমার কথা শুনে কি বুঝলেন কে জানে। তীব্রভাবে তাকালেন আমার চোখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুনীল, তুমি আমার কাছে আর কখনো এসো না। কোনোদিন এসো না। আমি অপয়া। আমি সাংঘাতিক অপয়া। আমি তোমার ভাল চাই বলেই বলেছি। তুমি আর কোনোদিন এসো না আমার কাছে। আমি তোমার মুখও আর দেখতে চাই না কোনোদিন।'

বলতে বলতে বাণীদি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। এই সময় বাণীদিকে আরও বেশি সুন্দর দেখতে লাগছে।

আর কোনো সান্ত্বনার কথা আমার মনে এলো না। আমার হাতের ওপর ঝরে পড়েছে বাণীদির চোখের জলের কয়েকটি ফোঁটা। কিছু না ভেবেই আমি সেই অশ্রুবিন্দু আমার জিভে ঠেকালাম। মনে হল, বাণীদির চোখের জল নোনতা নয়, মিষ্টি। কেন এরকম মনে হল কে জানে।

আমার একটি পাপের কাহিনী

মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল একটা পার্টিতে। তখন আমি থাকতাম অ্যারিজোনায়। মন-টন খুব খারাপ—অনেকদিন বাড়ি থেকে চিঠি পাই না। বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ নেই। আমার মনমরা অবস্থা দেখে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক রিচার্ডসন আমাকে জোর করে একটা পার্টিতে ধরে নিয়ে গেলেন। সেখানেও ভাল লাগছিল না। চুপচাপ একা বসেছিলাম।

পার্টি চললো রাত দুটো পর্যন্ত, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ি ফেরার পালা। প্রায় পঞ্চাশ-জন নারী-পুরুষ উপস্থিত, প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই একবার না একবার কথা বলা হয়ে গেছে। অনবরত ভদ্রতার হাসি হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা হবার অবস্থা। মেয়েরা-ছেলেরা টুইস্ট নেচে-নেচে এখন ক্লান্ত, গেলাসের পর গেলাস শুধু বরফ মেশানো হুইস্কি খেয়ে আমার মাথাটা ভারী ভারী লাগছে—এবার বাড়ি ফেরার পালা।

—আমার গাড়ি নেই, সেখান থেকে আট মাইল দূরে আমার অ্যাপার্টমেন্ট—অত রাত্রে ফেরার অন্য কোনো উপায় নেই। অপেক্ষা করে আছি—অধ্যাপক রিচার্ডসন কখন উঠবেন—তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ফিরবো। রিচার্ডসনের বয়েস ষাটের কম নয়, কিন্তু ছেলে-ছোকরার মতন তিনিও স্যুট-টাই পরা ছেড়েছেন—প্যান্টের ওপর শুধু উলের গেঞ্জি—ছেলে-ছোকরাদের চেয়েও বেশি উৎসাহে হাসছেন, হাসাচ্ছেন—মাঝখানে একবার দুচক্কর নেচেও নিলেন। উৎসাহ তাঁর কিছুতেই ফুরোয় না।

হাতের গ্লাস খালি, আর এক গ্লাস খাব কিনা মনস্থির করতে পারছি না, বেশি নেশায় যদি লটকে পড়ি—তা হলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে বদনাম হয়ে যাবে—এই সময় রিচার্ডসন এসে বললেন, ফিল লাইক গোয়িং হোম?

তক্ষুনি মনস্থির করে আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ইয়েস। চলো, এবার বাড়ি যাওয়া যাক। ঘুমের কথা বললুম না, বললুম, কাল সকালে উঠেই একটা পেপার তৈরি করতে হবে। যেন কত লক্ষ্মী ছেলে আমি, পড়াশুনোয় কি মন আমার। অধ্যাপক হেসে আমার কাঁধ চাপড়ালেন।

রিচার্ডসনের বিরাট থান্ডারবার্ড গাড়ি সদ্য স্টার্ট নিয়েছে, হঠাৎ তিনি বললেন, ওঃ হো—মণিকাকেও তো পৌঁছে দেবো বলেছিলাম। তুমি যাও তো সরকার, মণিকাকে ডেকে আনো।

মণিকা? পার্টিতে তো একটাও বাঙালি মেয়ে দেখিনি। অবাক হয়ে বললুম, কে মণিকা? চিনি না তো?

অধ্যাপক বললেন, এখনো মণিকাকে চেনো নি? তুমি একটা বুদ্ধুরাম। এই পার্টিতে সেই তো সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে। দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি।

অধ্যাপক যাকে ধরে আনলেন, সে মোটেই বাঙালি মেয়ে নয়, ছিপছিপে তরুণী মেম এবং মিষ্টিই বা কোথায়—হিংস্র বনবিড়ালীর মতন রিচার্ডসনের বাহু-বন্ধনে ছটফট করছে—কিছুতেই সে আসবে না। তখন রিচার্ডসন বললেন, না, এবার বাড়ি চলো, বড্ড নেশা হয়ে গেছে তোমার।

বুঝতে পারলুম, মেয়েটি ইটালিয়ান। কয়েকদিন আগেই একটা ইটালিয়ান সিনেমা দেখেছিলাম, আন্তোনিয়োনি'র "রাত্রি"—সেই বইতে উপনায়িকা ছিল মোনিকা ভিট্টি নামে একটি মেয়ে। অনেক ইটালিয়ান মেয়ের নামই বাঙালি-বাঙালি শোনায়।

রিচার্ডসন জোর করে মেয়েটিকে গাড়ির মধ্যে বসালেন। বললেন—সরকার, এই হচ্ছে মোনিকা, আর মোনিকা, মিট সুনীল।

মেয়েটি দায়সারা ভাবে আমার দিকে ভালো করে না চেয়েই বললো, 'হ্যালো—' তারপর সেই ছেড়ে আসা পার্টির দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে। আমি নামবার আগেই মোনিকা সেখানে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়লো। অধ্যাপক হাত নাড়িয়ে বাই বাই বলে হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

নির্জন রাস্তায় আমরা দুজন দাঁড়িয়ে! মেয়েটি কাছাকাছি কোথাও থাকে বোধহয়। ভদ্রতা করে আমি বিদায় নেবার জন্য বললুম, গুড নাইট! মেয়েটিও বললো, গুন্নাইট। আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম। মেয়েটিও সেদিকে এলো। তারপর একই বাড়ির প্রবেশ পথে এসে দুজনে আবার মুখোমুখি দাঁড়ালুম। আমার ধারণা হলো, মেয়েটা অতিরিক্ত মাতাল হয়ে সব কিছু ভুলে গেছে নিশ্চয়ই। আজ ঝামেলা বাধাবে দেখছি! মোনিকা ভুরু কুঁচকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার সঙ্গে আসছো কেন? লীভ মি অ্যালোন!

আমার রাগ হলো। আমি বললুম, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, আমি এই বাড়িতেই থাকি—তুমিই আমার পেছন পেছন আসছো!

মোনিকা এবার হাসলো। বললো, ইজ ইট সো? তারপর হাত ব্যাগ থেকে একটা চাবি বার করে বললো, এই দ্যাখো, আমার ঘরের চাবি, নাম্বার এইটি থ্রি। তোমার কত?

আমার ঘরের নম্বর তিয়াত্তর। ন তলা বাড়িতে অন্তত নব্বই জন ভাড়াটে—সকলকে চেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি এসেছি মাত্র একমাস। আমি বললুম। আমার নম্বর তিয়াত্তর—তার মানে তোমার ঠিক নিচের ঘরটাই আমার। আমি যে প্রায়ই ওপরে ধুপধাপ আওয়াজ শুনি, এখন বুঝলুম, সেটা তোমারই মধুর পায়ের ধ্বনি!

মোনিকা এবার খিলখিল করে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমি নাচ প্র্যাকটিস করি।

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি কোন্ দেশের লোক? ইজিপ্ট?

আমি মুচকি হেসে বললুম, না।

—তবে? জাপান?

ওঃ, পৃথিবী এবং তার মানুষজন সম্পর্কে কি জ্ঞান ওর! মজা দেখার জন্য আমি সেবারও বললুম, না।

—বুঝতে পেরেছি, তুমি টার্কিশ।

—উহুঁ।

—তবে, তবে আফরিকান?

—না! এবারও হল না।

—এই, বলছো না কেন? তুমি কে?

—আমি একজন ইন্ডিয়ান।

ইন্ডিয়ান শুনে ও একটু সচকিত হয়ে তাকালো। একটু সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওর মুখে খেলা করে গেল। বুঝতে পারছি, ও আমাকে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ভাবছে। ফের জিজ্ঞেস করলো, রিয়েলি? ইউ আর অ্যান ইন্ডিয়ান?

—হ্যাঁ, খাঁটি ইন্ডিয়ান।

এবার মোনিকার চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, বুঝতে পেরেছি, ইউ আর অ্যান ইন্ডিয়ান ফ্রম ইন্ডিয়া—

আমি প্রাচীন নাইটদের কুর্নিশের ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে বললুম, সি, সিনোরিটা।

—হাউ ওয়ান্ডারফুল ইট ইজ টু মীট আ রিয়াল ইন্ডিয়ান—

—গ্রাৎসি সিনোরিটা।

মোনিকা বললো, এসো, এখানে একটু বসি।

আমরা দুজনে পর্চে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লুম। মধ্যরাত ঝিমঝিম করছে। চওড়া রাস্তায় ধপধপে জ্যোৎস্না। ওপারে একটা উইলো গাছের মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে একটু করুণ শব্দ হয়—এগুলোকে এইজন্য উইপিং উইলো বলে। আগস্ট মাস—এখন শীতের চিহ্ন নেই।

মোনিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে আমার দেশের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ইটালির অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে মোনিকা, আমেরিকায় পড়তে এসেছে—পড়াশুনোর চেয়ে হৈ-হল্লোড়েই বেশি উৎসাহ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও কিছুই জানে না—যাকে বলে কিচ্ছু না—এমন কি গান্ধিজির নামটাও ওর পেটে আসছে মুখে আসছে না। কোথাও শুনেছে, মনে করতে পারছে না ঠিক। আমার ভারি মজা লাগতে লাগলো। অথচ ইটালি সম্পর্কে আমরা অনেক খবর রাখি।

গল্প করতে করতে রাত তিনটে বাজলো, তখন উঠলুম। লিফটে কোনো চালক নেই, অটোমেটিক। বোতাম টিপে দুজনে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সাততলা, ওর আটতলা—আমাকেই আগে নামতে হবে—সাততলায় আসতে আমি বললুম, গুড নাইট মোনিকা!

অভ্যেস মতন মোনিকা গালটা এগিয়ে দিল। ওখানে বিদায়-চুম্বন দেবার কথা। ইচ্ছে ছিল ভদ্রতাসূচক একটা ঠোনা মারা চুমুই দেবো গালে—কিন্তু হঠাৎ মাথার গোলমাল হয়ে গেল—যাকে বলে 'প্রগাঢ় চুম্বন'—হঠাৎ তাই একখনো দিয়ে ফেললুম, তারপর বললুম, কাল দেখা হবে তো?

পরের দিন রবিবার। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে—বৃষ্টি পড়লেই মনটা একটু উদাস উদাস হয়ে যায়। নিজে রান্না করে খেতে হবে—এই সব বৃষ্টির দিনে আর রাঁধতে ইচ্ছে করে না একটুও। সকালে গুটি চারেক ডগ্ সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, চায়ের সঙ্গে খাবার মত—তাতেই পেট অনেকটা ভরে আছে—আজ আর দুপুরে রান্নার ঝামেলায় যাবো না—না হয়....এক টিন চিকেন-অনিয়ন সুপ গরম করে নেবো!

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পূর্বদিকের বড় জানলাটার পাশে হাতে বই নিয়ে বসলুম। রাস্তার ওপারে একটা গ্যাস স্টেশন, দূরে দেখা যায় ক্যাপিটলের চূড়া।

দুপুর একটা নাগাদ দরজায় ধাক্কা। খুলতেই মোনিকা এসে ঢুকলো। তখনো ড্রেসিং গাউন পরা, চুল এলোমেলো, হাতে একটা চিঠি লেখার প্যাড আর কলম, খুব ব্যস্ত ভাব। সারা সকাল বোধহয় বিছানাতেই শুয়ে ছিল। এই কাণ্ড কোনো ইটালিয়ান মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। ড্রেসিং গাউন পরে, কোনো সাজ পোশাক না করে—এক দিনের চেনা কোনো বন্ধুর ঘরে আর কোনো জাতের মেয়ে আসবে না।

ব্যস্তভাবে মোনিকা বললে, এই, তোমার পুরো নামের বানানটা কি? ছানিল? সুন্‌নীল? তারপর কি যেন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, —কেন, আমার নাম দিয়ে কি হবে?

—এই দ্যাখো না, মায়ের কাছে চিঠি লিখছি।

গড়গড় করে মোনিকা ইটালিয়ান ভাষায় কি যেন পড়ে গেল! এক বর্ণও বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলুম, এর মানে কি? ইংরেজিতে বলো।

একটু হকচকিয়ে তাকিয়ে মোনিকা ইংরেজি অনুবাদে বললো, মা, কাল রাত্রে আমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, তুমি ভাবতে পারো? তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। একজন ভারতীয়, সত্যিকারের ভারতবর্ষের লোক—সেই সুদূর বে-অফ বেঙ্গলের পাড়ে থাকে—তার সঙ্গে পরিচয় হলো। শুধু তাই নয়, আমরা এক বাড়িতেই থাকি। ছেলেটি প্যান্ট শার্ট পরে, গায়ের রং জলপাই ফলের মতন, ইংরেজিতে কথা বলতে পারে, কথায় কথায় হাসে—

আমি হো-হো করে হাসতে লাগলুম। মোনিকা বললো, এই হাসছো কেন? আমার ইংরেজি ট্রানস্লেশান খারাপ হচ্ছে?

উত্তর দেবো কি? আমি তখনও হাসছি। তারপর বললুম, আমিও আমার মাকে চিঠি লিখবো মা, মঙ্গলগ্রহের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, যে দুপুর একটাতেও ড্রেসিং গাউন পরে থাকে, বিশ্বসুদ্ধ সবাই ইটালিয়ান ভাষা জানে না শুনে অবাক হয়—

—এই-ই, ভালো হবে না বলছি!

আমার কাছে এসে মোনিকা আমার মুখ চাপা দেয় হাত দিয়ে। আমি ওর হাত সরাবার জন্য ওকে কাতুকুতু দেবার চেষ্টা করি।

একটু বাদে মোনিকা বললো, তুমি সত্যিই ইটালিয়ান ভাষা জানো না, তা হলে তো মুশকিল—আমি বেশিক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না।

আমি বললুম, ইংরেজি সম্পর্কে আমারও সেই দশা! বেশ তো মাঝে মাঝে তুমি ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলবে, আমি বাংলায় বলবো। ঠিক বুঝে যাবো।

—গুড্। বাংলা? এ-ই, তুমি আমায় বাংলা শেখাবে?

—নিশ্চয়ই।

—এখন একটা সেন্‌টেন্স শেখাও।

আমি তক্ষুনি ওকে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটি শিখিয়ে দিলুম। বাক্যটির মানে জেনে নিয়ে তক্ষুনি আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাসতে হাসতে বললো—সুন্‌নীল, আমি টোমাকে বালোবাসি! —এবার তুমি ইটালিয়ান কোন্ কথাটা আগে শিখতে চাও, বলো?

আমি বললুম, আমি দু চারটে শব্দ জানি। তা ছাড়া জানি, দু লাইন কবিতা। শুনবে?

মোনিকাকে চমকিত করে আমি আবৃত্তি করলুম "Incipit vita nova. Ecce deus fortior me,/qui veniens dominibatur mihi." দান্তের সেই অমর কবিতা। তাঁর জীবনের পরম-রমণী সম্পর্কে কবি যা বলেছিলেন, "আজ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। আমার চেয়েও শক্তিমান এই দেবতা আমাকে আচ্ছন্ন করলেন।" (মোনিকা তো জানে না, বাঙালি ছেলেরা কত চালু হয়। কাল রাত্রে ওর সঙ্গে পরিচয় হবার পর আজ সকালেই আমি খুঁজে ওই লাইন দুটো বার করে বাথরুমে বারবার পড়ে মুখস্থ করে রেখেছি! কিন্তু, পরে বুঝেছিলাম, আমার ভুল হয়েছিল। মোনিকাকে মুগ্ধ করার জন্য কোনোরকম চেষ্টা করার দরকার হয় না।)

মোনিকা ডাগর চোখ মেলে সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তুমি দান্তের কবিতা পড়েছো? তুমি বুঝি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসো?

আমি আস্তে আস্তে বললুম, যে কবিতা পড়তে ভালোবাসে না, আমি তাকে সম্পূর্ণ মানুষ বলেই মনে করি না।

—আজ থেকে তা হলে আমরা দুজনে একসঙ্গে কবিতা পড়বো?

সত্যই মোনিকাকে মুগ্ধ করার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না। সরল নিষ্পাপ ওর আত্মা। যা কিছু নতুন কথা শোনে, তাতেই অবাক বিস্ময় মানে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও কিছুই জানতো না—তাই জানার নেশা ওকে পেয়ে বসে।

রোমে কিছু ভারতীয় আছে বটে, কিন্তু মিলান শহর থেকে ২০ মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহরের মেয়ে মোনিকা, সেখানে কখনো কোনো ভারতীয় ও চোখে দেখে নি।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধেবেলা মোনিকা আমার ঘরে আসতে লাগলো, দুজনে একসঙ্গে বসে গল্প করি, হাসি—খুনসুটি হয়—ক্রমশ আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লুম। মাঝে মাঝে মোনিকা আমার ঘরে এসে রান্না করে দেয়—দুজনে একসঙ্গে খাই। প্রথম প্রথম ভারতীয় রান্না সম্পর্কেও ওর ভয় ছিল। আমি যখন ওকে বললুম, আমরা বাঙালিরা ম্যাকারুনি আর পিৎসা খাই না বটে, কিন্তু ভাত খাই, মুসুর ডাল অর্থাৎ লেনটিল সুপ, নানা রকম মাছ—তোমাদের প্রিয় ইল অর্থাৎ বান মাছও খাই, ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং মাংসের কোনোরকম রান্নাতেই আপত্তি নেই—অর্থাৎ ইটালিয়ানদের সঙ্গে আমাদের খাওয়ার খুব একটা তফাত নেই—তখন ও আশ্বস্ত হলো।

কোমরে অ্যাপ্রন জড়িয়ে মোনিকা যখন রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনের সামনে দাঁড়াতো, তখন ভারি সুন্দর দেখাতো ওকে। এমনিতে খুব রূপসী নয় মোনিকা—একটু বেশি লম্বাটে, উচ্চতায় প্রায় আমার কাছাকাছি—কিন্তু ভারি ছটফটে। সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যে যে সৌন্দর্য—মোনিকা সেই সুন্দরী। কোনোরকম আড়ষ্টতা নেই, কোনো পাপ নেই, অকপট সরল ওর ব্যবহার। ওর সাহচর্যে আমিও সৎ হয়ে উঠতে লাগলুম।

মাঝে মাঝে ওকে এক একটা কথা বলে ফেলে বিপদে পড়ি। একদিন ঠাট্টা করে ওকে বললুম, জানিস, আমাদের নিমতলার শ্মশানঘাটে একটা পাগলি দেখেছিলুম, তোকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে। এর পরই বিপদ—বোঝাও ওকে। প্রথমে বোঝাতে হবে নিমতলা কোথায়, তারপর বোঝাতে হবে শ্মশান কি জিনিস—সেখানে মানুষ পোড়ায় কেন? আমাদের দেশে সব পাগলিরাই রাস্তা-ঘাটে খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় কিনা—তারা বৃষ্টির সময় কোথায় শোয়, কি খায়? বেশিক্ষণ ইংরেজি বলতে গেলেই আমার দম আটকে আসে—এসব বোঝাতে তো প্রাণান্ত।

একদিন কথায় কথায় ওকে শরৎচন্দ্রের একটা গল্প শোনাতে গিয়ে বলেছিলুম, জানিস, আমাদের দেশের মেয়েরা এমন—স্বামী অফিস থেকে ফিরলে বউরা অমনি তার জুতোর ফিতে খুলে দেয়, পাখার হাওয়া করে। মোনিকা শুনে বললো, হাউ নাইস এন্ড সুইট।

পরদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছি, মোনিকা আগে থেকেই আমার ঘরে বসেছিল, আমি ঢুকতেই হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে বুটজুতোর ফিতে খুলতে গেল। মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বললো, এইরকমভাবে বসে তোমার দেশের মেয়েরা?

নানা কারণে সেই সময়টায় আমেরিকা আমার ভালো লাগছিল না। সব সময় পালাই পালাই মন। এখানে কোনো অভাব নেই, অফুরন্ত মদ, প্রচুর মেয়ের সাহচর্য, অর্থের চিন্তা নেই, কাজকর্মও বিশেষ নেই—তবু ভালো লাগছিল না, তবু কলকাতার ভিড়ের ট্রাম-বাস, রাস্তার কাদা আর চায়ের দোকানের বন্ধু-বান্ধবের জন্য আমার মন কেমন করে। একমাত্র মোনিকার জন্যই কিছুটা ভালো লাগছিল। মোনিকার সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে কিরকমভাবে যেন সময় কেটে যেত অজান্তে।

একদিন একটা পার্টিতে আমি আর মোনিকা দুজনেই গেছি। খুব হৈ-চৈ আর হল্লোড়ের পার্টি। মোনিকা নাচতে ভালোবাসে—এর ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচছে। আমি অনবরত হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। এই সময় ডগ্ বলে আমার চেনা একটি ছেলে এসে বললো, এ-ই সুনীল। তুমি কি খাচ্ছো স্কচ না বার্বন? এসো, একটু জামাইকা রাম খেয়ে দ্যাখো। খুব ভালো জিনিস।

একসঙ্গে দুরকম মদ আমার সহ্য হয় না। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে গেলুম। ডগ্ খুব মস্তানি দেখাচ্ছিল—এক একটা রামের গেলাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করছে, আমিও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলুম। একটু বাদেই মাথায় নেশা লেগে গেল। আমি টলতে টলতে মোনিকার সামনে গিয়ে বললুম, এসো মোনিকা, তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। তুমি আর কারুর সঙ্গে নাচবে না।

মোনিকা খিলখিল করে হেসে বললো, ধ্যাৎ। তোমার নেশা হয়ে গেছে। তুমি চুপটি করে বসো।

—না, নেশা হয় নি। আমি নাচবো।

—আবার দুষ্টুমি? যাও, ওখানে গিয়ে বসো।

—মোনিকা, তুমি আমায় রিফিউজ করছো?

—কি পাগলামি করছো। বলছি, তুমি ওখানে গিয়ে বসো। যাও—

মাতালের অপমানবোধ বড়ই সাংঘাতিক। আমার এমন অভিমান হল যেন মনে হতে লাগলো, সমস্ত পৃথিবীই আমাকে অবজ্ঞা করছে। আমার আর বেঁচে থাকার কোনা মূল্যই নেই। আমি মাথা নিচু করে গুম হয়ে একটা সোফায় বসে রইলুম। আমার হাত থেকে বারবার সিগারেট খসে পড়তে লাগলো।

বাড়ি ফিরতে হলো একসঙ্গেই। ফেরার পথে আমি মোনিকার সঙ্গে একটাও কথা বললুম না। লিফট এসে থামলো আমার ঘরের তলায়। আমি বিদায় না জানিয়েই বেরুতে যাচ্ছি—মোনিকা বললো, দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছি। আমার তখন মাথা ঘুরছে, আমার তখন হাত নেই, পা নেই, গোটা শরীরটাই নেই, শুধু একটা প্রবল ভারী মাথা—তবু আমি রুক্ষভাবে বললুম, না কোনো দরকার নেই। থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস এ লট!

মোনিকা জোর করে আমার বাহুর নিচে ওর হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এলো। আমি ওকে সুদ্ধু দুলছি, তবু আমার মাথা প্রবল অভিমান ভরে বলছে, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও, মেয়েদের কেউ কখনো বিশ্বাস করে?

কোনোরকমে অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা খুলে ঘরে পা দিয়েছি, কিসে একটা হোঁচট লাগতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠলো! আমি সেখানেই পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হলো শেষ রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আমি কোথায়? আমি নিজের বিছানাতেই। আমার পা থেকে জুতো খুলে নেওয়া হয়েছে, গায়ে কোট নেই, গলায় টাই নেই—গায়ে কম্বল চাপা দেওয়া—পাশে মোনিকা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। শিশুর মতন প্রশান্ত ঘুম তার মুখে। দরজার কাছে যেখানে আমি পড়ে গিয়েছিলাম—সেখানে অল্প-অল্প বমির দাগ—নিজের মুখে হাত দিলাম, কিছু নেই। মোনিকা আমার জামা-জুতো খুলে দিয়েছে, বমি মুছেছে—তারপর আমার এই হেভি লাশ টেনে এনে বিছানায় শুইয়েছে। অনুশোচনায় ও গ্লানিতে মন ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর মমতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। মনে হলো, আঃ, এই যে এই পৃথিবীতে আমি শুধু বেঁচে আছি—এটাই কি বিরাট ঘটনা। আমাকে এক বুক কাদার মধ্যে যদি শেকল দিয়ে বেঁধে ক্রীতদাস করেও রাখা হয় তবুও আমি বেঁচে থাকতে চাইবো।

খুব নরমভাবে আমি মোনিকার কপালে হাত বুলোলুম একবার। মোনিকা একটু কেঁপে উঠে ঘুমের ঘোরেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি নুয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেলাম। মোনিকা চোখ মেলে তাকালো, বললো, উঃ বড্ড শীত করছে। আরও দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করতেই এক নিমেষে চলে এলো উষ্ণতা। পাখির বাসার মতন গরম ওর বুক—সেখানে মুখ গুঁজে কাতরভাবে আমি বললুম, মোনিকা, তুমি আমার ওপর রাগ করো নি? আমার কানের কাছে মুখ এনে মোনিকা বাংলায় বললো—সুনীল, আমি টোমাকে বালোবাসি।

আমি জ্ঞান হারালুম। আমাদের দুজনের পোশাক ছিটকে পড়লো খাটের বাইরে। চুমু খেতে খেতে আমার জিভ ওর আলজিভ স্পর্শ করতে ছুটে গেল। আমার পিঠে এমন খিমচে ধরলো মোনিকা যে স্পষ্ট টের পেলুম সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। এক ধরনের অসহ্য সুখের যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলুম আমরা দুজনেই।

ঘুম ভাঙলো বেলা নটায়। চোখ মেলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে, দরজার তলা থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে আমি মুখ আড়াল করলুম। মোনিকা তার আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। কিচেনে টুং-টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটু বাদে মোনিকা আমাকে চা খেতে ডাকলো।

চায়ের টেবিলে দুজনে নিঃশব্দ। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আমি গাঢ় স্বরে ডাকলুম, মোনিকা—। ও বললো, চুপ, এখন কোনো কথা বলো না।

—আমাকে একটা কথা বলতে দাও।

—না, কিছু বলো না।

—আমাকে বলতেই হবে। শোনো, যা হয়েছে তার জন্য আমি কোনো অনুতাপ করতে চাই না। কিন্তু আমাকে স্বার্থপর, সুবিধাবাদীও তুমি ভেবো না। তুমি যা বলবে, আমি তার সব কিছুই করতে রাজি। এমনকি বিয়েও...

—চুপ, ও কথা বলো না। না!

—কেন?

—বিয়ে কি ওই ভাবে হয়—কোনো অবস্থার চাপে কিংবা কোনো ঘটনার ফলে? বিয়ে হয় আরও পবিত্র কারণে।

—মণি, তুমি তো জানো—

—তাও হয় না, তুমি আঘাত পেয়ো না—এ নিয়ে আমরা আর কথা বলবো না। এসো, এটা আমরা ভুলে যাই। আমার মায়ের অনেক দিন থেকেই অসুখ—অন্য কোনো ধর্মের লোককে যদি আমি বিয়ে করি—তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে আমি আঘাত দিতে পারবো না। মাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তুমি এ নিয়ে কিছু ভেবো না—দোষ তো আমারই।

রবিবার দিন ভোরবেলা মোনিকা গির্জায় চলে গেল। ইটালিয়ানরা গোঁড়া ক্যাথলিক—মোনিকাদের পরিবারে ধর্মবিশ্বাস খুবই প্রবল। গির্জার প্রধান পাদ্রীর কাছে মোনিকা তার পাপের কনফেশান দিয়ে এলো এবং এক মাস মদ, সিগারেট ছোঁবে না ও মাছ ছাড়া আর কোনো আমিষ খাবে না ঠিক করলো। কিন্তু সেদিনই রাত্তিরবেলা পাশাপাশি বসে পোল ভেরলেইন এর কবিতা পড়তে পড়তে আমি অন্যমনস্কভাবেই যেই মোনিকার কাঁধে হাত রেখেছি, মোনিকা

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। ঠোঁট দুটো কাঁপছে, অস্ফুটভাবে বললো, আমি পারছি না, আমি পারছি না। তুমি আমায় ভালোবাসবে না?

মোনিকা আমার বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও তীব্রতর কোনো শক্তিতে ওর শরীর ফুঁসছে। আমি ঈশ্বর মানি না, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো ঐশী সীমারেখা জানি না—আমার মনে হয়েছিল, জীবনের সেই মুহূর্তের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবার কোনো যুক্তি নেই। আমি মোনিকাকে আলিঙ্গন করে ওর কোমরের কাছে হাত নিতেই তীব্র আবেগে মোনিকা আমার বুকে কামড় বসিয়ে দিল।

তারপরের দিনগুলো কাটতে লাগলো হু-হু করে। দুজনে দুজনের মধ্যে ডুবে রইলাম। সেই সময়টায় আমার লেখাপড়া-টড়াও ডকে উঠে গিয়েছিল। স্থানীয় ভারতীয় ছেলেরাও আমাকে বয়কট করেছিল দুশ্চরিত্র বলে। কিন্তু মোনিকার মধ্যে আমি এমন একটা জিনিস পেয়েছিলুম—। আমি কদাচিৎ বাইরে বেরোই, অন্য লোকের সঙ্গে দেখাই করি না—মোনিকা বাইরের দরকারি কাজগুলো দ্রুত সেরেই আমার ঘরে চলে আসে। আগে ওর আরও অনেক বন্ধু ছিল—এখন আর কারুর সঙ্গে দেখা করে না। আমরা দুজনেই যেন শৈশবে ফিরে গিয়েছিলুম—যেখানে কোনো অভাববোধ নেই, প্রয়োজনের গুরুভার নেই।

মাসখানেক বাদে এই আচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠতেই হলো। পনেরোদিন পরে মোনিকার পরীক্ষা। আগের সেমেস্টারে ও পরীক্ষা দেয় নি, এবারও পরীক্ষা না দিলে ওর ভিসার সময় বাড়াতে অসুবিধা হবে। আমার তখন পরীক্ষা-ফরীক্ষার বালাই নেই—তবু আমি মোনিকাকে পড়াশুনো করার জন্য.....জোর করলুম। মোনিকা আমার ঘরে বসেই বইপত্র ছড়িয়ে পড়াশুনো করে—আমি ওকে ছুঁই না, দূর থেকে ওকে দেখি।

আমি এ পর্যন্ত কোনো পাপ করিনি। একটা মেয়ের সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল—বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকতুম—এটাকে আমি পাপ মনে করিনি।

আমার পাপের কাহিনী এরপর থেকে শুরু। একদিন আমি স্নান করছি, বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে মোনিকা বললে, সুনীল, শিগগির খোলো, একটা জরুরি কথা আছে, শিগগির।

ওর গলার আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি তোয়ালে জড়িয়েই বেরিয়ে এলুম। মোনিকার মুখ ফ্যাকাসে—হাতে একটা ওভারসীজ টেলিগ্রাম। পড়লাম। ওর বাবা পাঠিয়েছে, ওর মায়ের খুব অসুখ।

মোনিকা কাঁপতে কাঁপতে বললো, বুঝতে পারছি না, মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা। মাকে আমি আর দেখতে পাবো না—তা কি হয়? তুমি বলো, তা কি হয়? অসম্ভব। আমি আজই যাবো।

মোনিকার মায়ের বারণ ছিল, মোনিকা যেন কখনো প্লেনে না চাপে। প্লেন সম্পর্কে তাঁর দারুণ ভয়। ইউরোপ-আমেরিকায় এখনো এরকম মা আছে। কিন্তু এখন জাহাজে যাবার সময় নেই। মাকে দেখার জন্য মোনিকা দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠল—সেদিনই প্লেনে চাপতে চায়। স্টুডেন্ট কনসেশন পেলেও প্লেনে ভাড়া প্রায় তিনশো ডলার লাগবে। মোনিকার কাছে তখন সব মিলিয়ে দেড়শো ডলার ছিল, আমার নিজের কাছে ছিল বিরাশি ডলার—তার থেকে পঁচাত্তর ডলার ওকে দিয়ে দিলাম, বাকি টাকাটা ওর দুই বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করে সেদিন বিকেলেই প্লেনের টিকিট কাটলো। টিকিট পেতে অসুবিধে হলো না।

আমি এয়ারপোর্টে মোনিকাকে তুলে দিতে গেছি। তখনও সময় আছে। মালপত্র জমা দিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরছি আমরা। সঙ্গে টাকাকড়ির অবস্থা সঙ্কটজনক। ইচ্ছে থাকলেও এয়ারপোর্টের বার-এ গিয়ে বসার উপায় নেই। মেশিন থেকে দুটো কোকোকলার বোতল নিয়েই তৃষ্ণা মিটিয়েছি। মোনিকা আমাকে বললো, গিয়ে যদি দেখি মা একটু ভালো হয়ে গেছেন—তাহলে আমি সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। এবার আমি পরীক্ষা দেবোই।

আমি বললুম, আমার মনে হচ্ছে, তোমার মা ভালো হয়ে উঠেছেন এর মধ্যে।

—আচ্ছা দেখি, ইন্ডিয়ান যোগির কথা মেলে কিনা।

—ঠিক মিলবে। মিললে তুমি ফিরবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—নাকি বাড়িতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে?

—ইস। ওরকম কথা বললে সবার সামনেই তোমার গালটা কামড়ে দেবো বলছি।

দাও না, আপত্তি নেই। কে জানে এই শেষবার কিনা—

—আবার ওই কথা?

একটু বাদেই মাইকে যাত্রীদের নামে ডাক শোনা গেল। যাত্রী-যাত্রিণীরা একে একে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। পাশের এক কাউন্টারে ইনসিওরেন্স করা হচ্ছে। প্লেনের সাধারণ ইনসিওরেন্স ছাড়াও এখানে যাত্রীরা অতিরিক্ত ইনসিওরেন্স করাতে পারে। খুব সস্তা। এক ডলারে পনেরো হাজার ডলার। মোনিকা বললো, একটা ইনসিওরেন্স নেবো নাকি? কখনো করাই নি আমি। করাবো?

আমি বললুম, কি হবে? শুধু শুধু টাকা নষ্ট!

—মোটে তো এক ডলার।

—এক ডলারই এখন আমাদের কাছে যথেষ্ট দামি।

—তা হোক। তবু একটা করাই।

ও সেই কাউন্টারে গিয়ে একটা ফর্ম চাইলো। ফর্মের এক জায়গায় নমিনীর নাম লিখতে হয়। দুর্ঘটনা হলে টাকাটা সে পাবে। মোনিকা ঝকঝকে হাসি মুখে বললো, এখানে তোমার নামটা বসাই। টাকা জমা দিয়ে ফর্মের একটা কপি ও আমার হাতে দিয়ে বললো, এই নাও, সাবধানে রেখো। আমি মরলে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। আমি তখনও বিরক্তভাবে ওকে বলেছি, তুমি শুধু শুধু একটা ডলার বাজে খরচ করলে। যত পাগলামি।

এবারে যাত্রীদের প্লেনে উঠতে হবে। মোনিকা দাঁড়িয়েছে লাইনে সবার শেষে। আমি ওর পাশে পাশে গল্প করতে করতে এগোচ্ছি। গেটের ওপাশে আর আমাকে যেতে দেবে না। গেট পেরিয়ে চলে গেল মোনিকা, আমি ওকে রুমাল উড়িয়ে বিদায় দিলুম। হঠাৎ ও আবার এক ছুটে ফিরে এলো। ওই একগাদা লোকের মধ্যেই আমাকে বিষম অপ্রস্তুত করে আমার ঠোঁটে একটা দ্রুত চুমু দিয়ে বললো—তুমি কিছু ভেবো না, আমি আবার সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকো এইকটা দিন।

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ইস, আজকের দিনে বৃষ্টি না পড়লেই ভালো হতো। বৃষ্টির সময় একটা পাতলা কুয়াশায় সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্লেনে জানলার ধারে সীট পেয়েছে মোনিকা, বৃষ্টি না পড়লে আরও কিছুক্ষণ আমি ওর শরীরের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেতুম। কাচের ভেতর দিয়ে ও আমাকে দেখতে পেতো স্পষ্ট। দারুণ তৃষ্ণার্ত মানুষের মতন মোনিকাকে আরও একটু দেখার জন্য ছটফট করছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, সব বাধা ভেঙে ছুটে গিয়ে প্লেনের মধ্যে উঠে আরেকবার দেখে আসি। মায়ের অসুখ না সারলে আবার কবে ফিরবে মোনিকা তার ঠিক কি। ততদিন আমি থাকবো কিনা কি জানি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, মোনিকা যদি ফিরতে না পারে—যেমন করেই হোক, দুএক মাসের মধ্যে আমি ইটালিতে চলে যাবো।

প্লেন ছাড়ার আগেই বৃষ্টি প্রবল হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো ঝড়। এখানে ঝড় সহজে আসে না, কিন্তু যখন আসে—তখন বড় দুর্দান্ত। তবু সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই প্লেন উড়লো।

রানওয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে হঠাৎ ভেসে উঠলো হাওয়ায়, চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো একটুক্ষণ। আমি সেই দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করতে লাগলো।

ইস, আজকেই এমন ঝড়-বৃষ্টির। মোনিকার মায়ের অসুখ নিয়ে এমনিতেই তার মন খারাপ, তার ওপর ঝড়-বৃষ্টির জন্য আরও মন খারাপ লাগবে। যদি কোনো দুর্ঘটনা হয়? না, না, কোনো দুর্ঘটনা হবে না—এসব বোয়িং বিমান কয়েক মিনিটের মধ্যেই পঁচিশ-তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যাবে—সেখানে ঝড়-বৃষ্টির কোন চিহ্ন নেই।

দুর্ঘটনা? হঠাৎ অন্য ধরনের একটা অনুভূতি আমার শরীরে শিহরণ খেলিয়ে গেল। মোনিকার বিমান সদ্য দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেছে, আমি তখনও আকাশের দিকে চেয়ে আছি, আমার হাতে সেই ইনসিওরেন্সের কাগজ—হঠাৎ আমার মনে হলো, দুর্ঘটনায় যদি বিমানটা ভেঙে পড়ে—তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পনেরো হাজার ডলার অর্থাৎ একলক্ষ বারো হাজার টাকার মালিক হয়ে যাবো। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা।

আমার মুখখানা ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা বোধ করলুম। ছি, ছি, এ আমি কি ভাবছি। মোনিকা, তাকে আমি এত ভালোবাসি—আমি তার মৃত্যু চিন্তা করছি? এমন সরল সুন্দর মোনিকা—কত শ্বেতাঙ্গ প্রেমিককে উপেক্ষা করে আমার মতন একটা সাধারণ ভারতীয়কে সে অমন সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছে—আমার সুখের জন্য, তৃপ্তির জন্য ও করে নি অমন কাজ নেই—আর আমি তার মৃত্যু চাইছি!

কিন্তু বুকের ভেতর থেকে আমার দ্বিতীয় আত্মা বলতে লাগলো, না, না, তুমি তার মৃত্যু চাইছো না। বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে তোমার তো কোনো হাত নেই। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছার ওপর কিছু নির্ভর করে না—কিন্তু ধরো যদি ঝড়-বৃষ্টিতে বিমানটা ভেঙেই পড়ে—তুমি তো তা আর আটকাতে পারছো না—তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পেয়ে যাবে এক লক্ষ বারো হাজার টাকা—এক লক্ষ বারো হাজার টাকা কতখানি তা বুঝতে পারছো।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বাড়ি ফিরে এলুম। সারা ঘরে মোনিকার স্মৃতি। মোনিকার চটিজুতো জোড়া আমার ঘরেই ফেলে গেছে। প্রায় রাত্তিরে চুপি চুপি আমার ঘরে নেমে এসে ও আমার বিছানায় শুতো। ওর স্লিপিং স্যুটও রাখা আছে আমার এখানে। বালিশে এখনও লেগে আছে ওর কোমল মুখের স্পর্শ। ছড়ানো রয়েছে ওর বইখাতা, চিরুনি, নাইলনের মোজা। মোনিকাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমার বুক মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। আগেও দু চারজন মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে এদেশে—কিন্তু মোনিকার মতন এমন কারুর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ বোধ করিনি।

দেয়ালে লাগানো বিশাল আয়না—এই আয়নার সামনে একদিন মোনিকাকে দাঁড় করিয়েছিলুম, একে একে খুলে ফেলেছিলুম ওর সব পোশাক। মোনিকা আপত্তি করে নি। মুখ টিপে-টিপে হাসছিল—ওর লিলিফুলের মতন নরম গাল দুটিতে আমি আলতোভাবে চুমু খেয়েছিলুম, ওর ঠোঁটে জিভ ঠেকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়েছিলুম। পুকুরঘাটে বাংলাদেশের মেয়েরা জল আনতে গিয়ে কলসির গলা জড়িয়ে ধরে যে রকম আনন্দ পায়—সেই রকম শান্তিময় আনন্দ পেয়েছিলুম ওর সরু কোমর জড়িয়ে। ফর্সা ঊরু দুটিতে স্বর্গের সুষমা, —দুই বুকের সন্ধিস্থলে মুখ গুঁজে বলেছিলাম, মোনিকা, তুমি দেবীর মতন, তুমি সত্যিই দেবী, আমি তোমায় ভালোবাসি—তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। মনে হয়, মোনিকা যেন এখনও সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—সেইরকমভাবেই আমার দিকে চেয়ে হাসছে।

চেয়ারে কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলুম মনে নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো আমি সেই ইনসিওরেন্সের কাগজখানাই বারবার পড়ছি। পড়ে দেখছি, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই—টাকাটা আমি পাবো কিনা—আইনগত কোনো অসুবিধা হবে কিনা। কোনই অসুবিধে নেই, সে নিজে হাতে প্রাপক হিসেবে আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিচে সই করে গেছে। মৃত্যু প্রমাণিত হলেই কোম্পানি বাড়ি বয়ে এসে আমাকে টাকা দিয়ে যেতে বাধ্য। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা। উঃ কি নীচ, শয়তান, পাষণ্ড আমি। সামান্য টাকার জন্য আমি মোনিকার মৃত্যু চাইছি। স্বর্গ-দুর্লভ ভালোবাসার স্বাদ দিয়েছে মোনিকা আর আমি...

চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে আয়নার কাছে চলে এলাম। আয়নার গায়ে মুখ লাগিয়ে ব্যাকুলভাবে বললাম, না, না, না—মণি, আমার সোনা, আমার দেবী, আমি তোমাকে ভালোবাসি—শুধু তোমাকেই—পৃথিবীর বিনিময়েও আমি তোমার মৃত্যু চাই না। না—। আমি শুধু তোমাকেই চাই। প্রচণ্ড রাগে ইনসিওরেন্সের কাগজটা আমি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যদি একটা কিছু ঘটেই যায়—তাহলে টাকাটা শুধু শুধু নষ্ট করার কোনো মানে হয় না! এক লক্ষ বারো হাজার টাকা আমি না নিলে ওটা আর কেউ পাবে না। তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেলাম—লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে সাততলা সিঁড়ি হুড়মুড় করে নেমে চলে এলাম রাস্তায়। কাগজটা তখনও পড়ে আছে—একটু জল লেগেছে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

নিজেকে সত্যিকারের পাপী মনে হয়েছিল আমার। আমি ভারতীয়, আমি ভিখিরির জাতের লোক—হঠাৎ টাকা পাবার লোভ কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারি না। আমাদের চোখে এখন টাকার তুলনায় প্রেম, মমতা, কৃতজ্ঞতা এসবই তুচ্ছ। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পেলে আমি এই পোড়ার দেশে আর একদিনও থাকবো না। প্রবাসের রুক্ষ জীবন কে চায়? এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পেলে তক্ষুনি আমি দেশের টিকিট কাটবো—প্লেনের না, জাহাজের—ফিরে গিয়ে কলকাতাতেও থাকবো না, চলে যাবো ফ্রেজারগঞ্জে। সেখানে একটা ছোট বাড়ি বানাবো। আমার অনেক দিনের শখ। আর কারুর দাসত্ব করতে হবে না, কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হবে না। সেখানে জমি কিনে আমি নোনা মাটিতে ফসল ফলাবো, সমুদ্রে মাছ ধরবো। জল-কাদার মধ্যে পরিশ্রম করবো আমি, জেলে ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যাবো ঝড়-বাদল তুচ্ছ করে। এই সব পরিকল্পনা করতে করতে ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম আমি। হঠাৎ যেন মনে হলো, আমি মোনিকার মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে খলখল করে হাসছি।

সেদিন সন্ধেবেলা আমার বন্ধু ডম্ আমাকে ডাকতে এলো। বললো—এই সুনীল, চলো, আজ আমাদের একটা সোয়েল পার্টি আছে—মোনিকা কোথায়? নেই? তাই তোমাকে এমন মনমরা দেখছি। চলো, চলো, তুমি একাই চলো—

জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমাকে। গোপন নিষিদ্ধ পার্টি। এ পার্টিতে সামাজিক ভদ্রতা নেই, মদ নেই, খাবারও নেই। শুধু মেরুআনা (গাঁজা) আর এল. এস. ডি.-র পার্টি। পুলিশ জানতে পারলে যে-কোনো মুহূর্তে এসে ধরে নিয়ে যাবে। সাতটা ছেলে আর নটা মেয়ে। মেয়েগুলোরই উন্মত্ততা বেশি। ডম্ প্রস্তাব করলো, আজ সুনীল আমাদের ইয়োগা শেখাবে। আমি যতই বলি যে আমি যোগ, তন্তর-মন্তর কিছু জানিও না, বিশ্বাসও করি না—কিছুতেই ওরা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত আমি ওদের পদ্মাসনে ওঁ তৎ সৎ জপ করা শেখাবার চেষ্টা করলুম। মাটিতে বসা অভ্যেস নেই—পা মুড়ে তো বসতে জানেই না, বসতে গেলে উল্টে পড়ে যায়। ঘরময় ছেলেমেয়ের গড়াগড়ি। সে একখানা দৃশ্য বটে!

মনের মধ্যে আমার দারুণ অস্বস্তি সবসময়, তাই আমি ওদের হৈ-চৈতে ঠিক যোগ দিতে পারছিলুম না সেদিন। মন অতি অস্থির থাকলে এল. এস. ডি. খাওয়া উচিত নয়—বলে আমি এড়িয়ে গেলাম। পাইপে খানিকটা মেরুয়ানা ভরে টানতে লাগলাম। তবু মনের অস্বস্তি কাটে না। পকেটে মাত্র সাত ডলার আছে—সপ্তাহ না ফুরালে আর টাকা পাবার আশা নেই। এই সপ্তাহটা এ দিয়েই কোনক্রমে টেনে-টুনে চালাতে হবে। তখন কলকাতায় আমাদের বাড়ির সংসার খরচও আমাকে এখান থেকে চালাতে হয়। আমার নিজেরও রোজগার তখন বেশি নয়। সেদিন বিকেলেই

বাবার চিঠি পেয়েছি—আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের গুরুতর অসুখ—স্পেশালিস্ট্ দেখাতে হবে, বাড়ি ভাড়া তিনমাস বাকি—অর্থাৎ আরও টাকা পাঠাতে হবে।

নেশার ঝোঁকে অনেকেরই অবস্থা বেসামাল। ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ডম্ শুধু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে রেখেছে। দরজা জানলা সব বন্ধ, ধোঁয়ায় গুমট আবহাওয়া, তার মধ্যে অতগুলি সুগঠিত স্বাস্থ্যবান প্রায় নগ্ন নারী-পুরুষ—এক অকল্পনীয় বিস্ময়কর দৃশ্য। দু'চারজন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝোতে, অনেকেই কিন্তু মুখোমুখি বসে নিস্পৃহের মতন গল্প করে যাচ্ছে। আমি ছিলাম, জানলার কাছে। এই সময় ক্যারোলিন বলে একটা মেয়ে আমার কাছে এসে বললো—এ-ই, তুমি একা একা অমন গ্লাম ফেসেড্ হয়ে বসে আছো কেন?

আমি উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। ক্যারোলিনের বিশাল চেহারা, শক্ত উন্নত স্তন, কলাগাছের মতন দুই ঊরু, শিল্পীদের মডেল হয় ক্যারোলিন। কথা নেই বার্তা নেই ক্যারোলিন আমার কোলের ওপর বসে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বললো, হ্যালো সু-ই-টি!

কি যেন হলো আমার, রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে আমি ক্যারোলিনকে নামিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম মোনিকা ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়েকে আমি চাই না। অন্য কোনো মেয়েকে ছোঁয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোনিকার জন্য আমার শিরায় শিরায় ব্যাকুলতা জেগে উঠলো, আর ক্যারোলিনের প্রতি এল ঘৃণা। ক্যারোলিন অবাক হয়ে বললো, হেই। ইউ আর ক্রস? কি হয়েছে তোমার?

আমি বললুম, মাপ করো, আমার ভালো লাগছে না। আই অম আ ড্রপ আউট টু নাইট।

তক্ষুনি আমি আমার কোট পরে নিলাম এবং সকলের অনুরোধ, মিনতি উপেক্ষা করে বাইরে চলে এলাম। বাইরের মুক্ত হওয়ায় সুস্থভাবে নিশ্বাস নিয়ে মনে হলো মোনিকাকে যেন আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

পরদিন সকালে রেডিওতে খবর বলা শেষ করার আগে সংক্ষিপ্তভাবে জানালো—সুইজারল্যাণ্ড আর ইটালির সীমান্তে একখানা বিমান ধ্বংস হয়েছে। যাত্রীদের কাউকে উদ্ধার করা যায় নি। বুকের মধ্যে ধক করে উঠে যেন দম আটকে গেল আমার। রান্নাঘর থেকে রেডিওর কাছে ছুটে এলাম। খবর সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। কাঁটা ঘুরিয়ে আমি অন্য স্টেশন ধরার চেষ্টা করলুম। কোথাও আর তখন খবর নেই। হারামজাদারা—ওই রকম সাঙ্ঘাতিক খবর অত সংক্ষেপে বলার কোনো মানে হয়? কোন্ কোম্পানির প্লেন, কোত্থেকে আসছিল, যাত্রীদের নামের তালিকা—আঃ, অসহ্য, অসহ্য সেই বিকেলবেলা খবরের কাগজ বেরুবে—তাতে যদি থাকে—অ্যালিটালিয়া বিমান কোম্পানির অফিসে ফোন করবো? মোনিকার পুরো নাম—মোনিকা আর্লিংগেটি—ইনসিওরেন্সের কাগজটা ড্রয়ারে রেখেছিলাম—ঠিক আছে তো? অন্য বিমানও হতে পারে অবশ্য—কিন্তু কাগজটা সাবধানে, একলক্ষ বারো হাজার টাকা—প্রায় উন্মাদের মতন ছটফট করছিলুম আমি—এক সময় সম্বিত ফিরে এলো। নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণায় বিমর্ষ হয়ে পড়লুম। মোনিকা বেঁচে আছে কিনা সে কথা আমি জানতে চাইছি না, আমি জানতে চাই মোনিকা মরে গেছে কিনা। মোনিকা যদি সত্যিই মরে—তবে আমিই তার হত্যাকারী। আমি তো ওর নিরাপদে পৌঁছুবার কথা একবারও ভাবিনি, ওর মৃত্যুর কথাই ভেবেছি শুধু।

ঠিক করলুম, আর রেডিও খুলবো না, আর খবরের কাগজ পড়বো না। আমি কিছু জানতে চাই না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার পরের কয়েকটা দিন যে নিরন্তর মানসিক যন্ত্রণায় কাটিয়েছি—তা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে মোনিকার মুখ মনে পড়ায় আমার বুকের মধ্যে হু হু করে উঠেছে, আবার প্রতি মুহূর্তে আমি দরজার কাছে একটা ভারী জুতো পরা পায়ের আওয়াজের প্রতীক্ষা করেছি, পিওনের পায়ের আওয়াজ টেলিগ্রাম নিয়ে আসবে—যে টেলিগ্রামে থাকবে আমার এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পাওয়ার খবর।

ছয়দিনের মধ্যে মোনিকার কোনো চিঠি এলো না, ঠিক সাতদিনের মাথায় আমার দরজায় কে যেন বেল টিপলো। টেলিগ্রাম পিওন ভেবে আমি দৌড়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলাম মোনিকা দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি, না স্বপ্ন? একটা নীল রঙের রেন কোট পরা, তার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে, হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ, রক্তিম ঠোঁট ফাঁক করে ঝকঝকে দাঁতে আলো করে হাসলো মোনিকা।

আমি কঠোর পুরুষ, জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি, অনেক নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার পেয়েছি ও দিয়েছি. কখনও আমার চোখে জল আসে নি। কিন্তু সেদিন আমার চোখ জ্বালা করে উঠলো, শেষ পর্যন্ত কাঁদিনি কিন্তু ওই চোখের জল আসার ইঙ্গিতেই আমি বুঝতে পারলুম, আমার পাপের অবসান হয়েছে। আমি আর লোভী নই, আমি আর কিছু চাই না, শুধু মোনিকাকেই চাই। আমি দুহাত বাড়িয়ে ডাকলুম, মণি, —সত্যি—তুমি—

হাতের ব্যাগ দুটো ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মোনিকা ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললো, আমি কথা রেখেছি। দ্যাখো আমি ঠিক সাতদিনের মধ্যেই ফিরে এসেছি।

আমি কোনো কথা বলতে পারছিলুম না, ওকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইলুম। ও আবার খুশি খুশি গলায় বললো,

তোমার কথাই সত্যি হয়েছে। গিয়ে দেখলুম, মা ভালো হয়ে গেছেন। আমি না গেলেও পারতুম—যাক গে গিয়েছি ভালোই হয়েছে, নিজের চোখে দেখে এলাম—এখন নিশ্চিন্তে পড়াশুনো করতে পারবো! এ-কদিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি—তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা একটুও ভাবোনি! ভাবোনি তো? এ—ই?

আমি তবু চুপ করে রইলুম।

—এ-ই, তুমি কথা বলছো না কেন?

—মোনিকা, আমি খুব খারাপ লোক! এই কদিন শুধু ভাবছিলুম, যদি তোমার কোনো দুর্ঘটনা হয়—

—তুমিও তাই ভাবছিলে!

মোনিকা আমাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের মতন হাসিমুখে বললো—জানো, আমার মাও শুধু ওই কথা ভাবছিলেন! মা যখন শুনলেন, আমাকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, তখন থেকেই মা'র কি চিন্তা। আমি প্লেনে আসবো মা ভাবতেই পারেন না? ফেরার সময়েও যখন প্লেনে এলুম মা'র কি কান্নাকাটি, কিছুতেই আসতে দেবেন না। প্রায়ই প্লেন অ্যাকসিডেন্ট হয়, আমি যদি মরে যাই—শুধু এই কথা। তুমিও দেখছি, আমার মা'র মতনই।

—না, সে রকম নয়। আমি খারাপ লোক, আমি তোমার মৃত্যুর কথা অনবরত ভাবছিলুম, আর—

—জানি, তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো।

—না, আমি তোমাকে ভালোবাসার যোগ্য নই।

—পাগল। তুমি কিছু বোঝ না! শোনো, যে যাকে যত বেশি ভালোবাসে—সে তত বেশি তার বিপদের কথা চিন্তা করে। দ্যাখো না—ছেলেমেয়েরা যখন বাইরে খেলাধুলা করতে যায়—মা তখন বলেন, দেখিস, গাড়ি চাপা পড়িস না, মারামারি করিস না, চোর ডাকাত যেন ধরে না নেয়—

শুধুই বিপদের কথা, ভালো কথা কি বলে? ভালোবাসার নিয়মই এই। মা'র মতন তুমিও আমার মৃত্যুর কথাই শুধু ভেবেছো। মা ছাড়া আমাকে আর কেউ এত ভালোবাসেনি—তোমার মতন।

আমি আচ্ছন্ন, অভিভূত মানুষের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম। মোনিকা অভিমানী গলায় বললো, —তুমি আমাকে একটুও আদর করোনি তখন থেকে, এসো—

মোনিকা নিজেই এসে আবার আমার বুকে মাথা রাখলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজলাম ওর পিঠে। আমার দুই হাত ওর পিঠের ওপর রাখা। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, এই হাত মোনিকাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

সুলতান

গোলাপ ফুল যা ফুটেছে, দেখবার মতন। পাথর মেশানো রুক্ষ মাটি অথচ এত রস যে কোথা থেকে পায়। নবনীতা সাবধানে পা ফেলে ফেলে গোলাপ বাগানে ঘুরছে। এই বাগানে কোনো গোলাপই গোলাপি রংয়ের নয়, সাদা আর হলদে। স্নিগ্ধ মাদক গন্ধ। নবনীতা ফুল ছেঁড়ে না, মুখ নুইয়ে এনে গাছ থেকেই গন্ধ শোঁকে।

কুয়োর পাশের ফাঁকা জায়গাটায় বেতের বড় চেয়ারে, মুখের সামনে বই ধরে সূর্য আড়াল করে বসে ছিল দীপঙ্কর। খালি গা, শুধু একটা আন্ডারওয়ার পরনে। তেল মেখে গায়েই সেটা শুষিয়ে নিচ্ছে। মাথার ওপরে হা-হা করছে খোলা আকাশ, ভেজালহীন ঝকঝকে রোদ্দুর, তবু এই রোদ্দুরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও আরাম লাগে।

বই সরিয়ে দীপঙ্কর বলল, এই নবনী, তুমি খালি পায়ে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ! কাঁটা ফুটবে!

ফুটুক!

দীপঙ্কর হাসি মুখে তাকিয়ে রইল নবনীতার দিকে। বাইরে দুটো টাঙ্গা প্রতিযোগিতা করে ছুটে গেল। গেটের সামনে খেলা করছে ওদের ছেলেমেয়ে। রঞ্জন আর সুমিত্রা এখনও বাজার থেকে ফেরেনি। নবনীতা ওর গায়ের শালটা খুলে রেখেছে করবী ফুলের গাছটায়। ওর খোলা চুল উড়ছে হাওয়ায়।

পায়ে কাঁটা ফোটানোর খুব শখ বুঝি তোমার?

নবনীতা এদিকে না ফিরেই বলল, ফুটলে তুমি তুলে দেবে। আমি এখানে রোজ খালি পায়ে হাঁটব। উঃ, কতদিন খালি পায়ে হাঁটিনি।

নবনী, লক্ষ্মীটি, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা একটু এনে দেবে?

তুমি নিজে যাও না। সকাল থেকে তো বসে বসে কুড়েমি করছ!

যা আলস্য লাগছে না, উঠতে একেবারেই ইচ্ছে করছে না! তাছাড়া কুড়েমি করতেই তো এখানে এসেছি।

আর আমি বুঝি এসেছি খাটাখাটনি করতে?

—একটু এক্সারসাইজ করা ভাল। গুড ফর ইউ—

নবনীতার বাচ্চা হবে, চারমাস চলছে। নবনীতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আলতো পায়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। একটু বাদেই ফিরে এসে সিগারেট আর দেশলাই দীপঙ্করের হাতে দিয়ে বলল, তুমি এবার চান করে নাও। আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

দীপঙ্কর হাত দুটো বুকের কাছে এনে বলল, গায়ে জল ঢালতে হবে ভাবলেই শীত করে। যা ঠান্ডা জল।

মোটেই না। কুয়োর জলে বেশি শীত করে না। একবার জল ঢাললেই—

সেই প্রথমবার ঢালাই তো মুশকিল।

গেটের কাছে ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচামেচি করে উঠল। গেট খুলে সাইকেল রিকশায় চেপে ঢুকল রঞ্জন আর সুমিত্রা। পায়ের কাছে দু ঝুড়ি ভর্তি টাটকা আনাজ আর মাছ। সাইকেল রিকশার পিছনে মোটর বাইক ঠেলতে ঠেলতে আসছে আর একজন মাঝবয়সি লোক।

অপরিচিত লোক দেখে দীপঙ্কর ব্যস্ত হয়ে বলল, এই নবনী, আমার বড় তোয়ালেটা দাও, ওই যে, তোমার পাশেই।

তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি জড়িয়ে নিয়ে দীপঙ্কর ভারিক্কি মানুষের মতন বইটা আবার তুলে নিল হাতে।

রিকশার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল এ বাড়ির চাকর এবং মালি কম্বাইন্ড ভুনেশ্বর। রঞ্জন তাকে বলল, এই ভুনেশ্বর, সব চীজ-উজ ভিতর লে যাও। আউর চা বানানে বোলো, জলদি।

মোটর সাইকেল সমেত লোকটিকে বলল, বসুন ভবরঞ্জনবাবু।

লোকটি মোটর সাইকেলটা রেখে বলল, এই বাগানটার তেমন যত্ন হয় না আজকাল। আগে যা দেখেছি—আমি প্রায় তিন চার বছর বাদে এলাম।

রঞ্জন বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, আমার কলিগ এবং ভায়রাভাই। আর দীপঙ্কর, ইনি ভবরঞ্জন চ্যাটার্জি—

চ্যাটার্জি না, চৌধুরী।

ও হ্যাঁ, চৌধুরী, আই অ্যাম সরি—। ইনি এখানকার লোকাল লোক, একজন জার্নালিস্ট এবং ডাক্তার।

ভবরঞ্জনের দুটো দাঁত নেই। হেসে বলল, আমি পুরো জার্নালিস্টও নই, পুরো ডাক্তারও নই। তবে, দুটোই প্র্যাকটিস করি।

অচেনা লোক সম্পর্কে কৌতূহল আছে দীপঙ্করের, কিন্তু মুখে সে ভাব দেখাল না। হাত দুটো তুলে আলগাভাবে বলল, নমস্কার।

গায়ে তেল মেখে তোয়ালে জড়ানো অবস্থায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে পড়ে গেলে দীপঙ্কর লজ্জা পেত, কিন্তু ভবরঞ্জনকে উঁচু দরের মানুষ মনে হল না।

রঞ্জন বলল, মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বাজারে আলাপ হল। ইনি এই এলাকাটা বেশ ভাল রকম চেনেন। এঁর কাছ থেকে বেড়াবার জায়গাগুলো জেনে নেওয়া যাবে। আশেপাশে তো অনেক কিছু দেখার আছে, তাই না?

ভবরঞ্জন উত্তর দিল, হ্যাঁ, দেখার অনেক কিছু আছে। কোথায় নেই বলুন? সারা পৃথিবীটাই তো দেখার জায়গা। তবে আপনারা কি ধরনের জায়গা দেখতে চান—ন্যাশনাল পার্কে যাবেন নিশ্চয়ই?

রঞ্জন বলল, ওখানে আগে একবার গেছি। রাঁচি থেকে এসেছিলাম।

দীপঙ্কর বলল, দূর দূর, ন্যাশনাল পার্কে দেখার কি আছে? সারারাত জেগে গাড়িতে করে ঘুরলাম সেবার—একটাও বড় জন্তুজানোয়ারের টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু গুচ্ছের হরিণ—

ভবরঞ্জন মাঠের ঘাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। লোকটির বয়েস বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি না, মাথার চুল বেশ পেকেছে, কিন্তু চেহারাখানা বেশ শক্ত, চওড়া দুই কাঁধ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, তার ওপর শার্ট। দেখলে সাংবাদিকও মনে হয় না, ডাক্তারও মনে হয় না।

ভুনেশ্বর ট্রেতে করে চা এনেছে, সঙ্গে এসেছে সুমিত্রা। বাজার থেকে ফিরেই সে শাড়ি বদলে ফেলেছে। সুমিত্রার বিয়ে হয়েছে মাত্র পাঁচ মাস আগে, চোখে মুখে রহস্যময় চঞ্চলতা। সুমিত্রা চায়ের কাপ এগিয়ে দিল ভবরঞ্জনের দিকে।

ভবরঞ্জন ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, না মা জননী, আমি চা খাই না।

এমন কিছু বয়েস নয় লোকটির, ওর মুখে মা জননী শব্দটা একটু বেমানান। হাসি পেয়ে যাবারই কথা। সুমিত্রা চকিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, চা খান না? কফি খাবেন?

না। আমার জন্য ওসব কিছু দরকার নেই।

রঞ্জন একটু আন্তরিক হবার চেষ্টা করে বলল, আরে মশাই, খান না একটু। এই শীতে চা-কফিই তো আরামের।

তা ঠিক। শীতে চা-কফি বেশ জমে। কিন্তু আমি খাই না, আমার ওসব সহ্য হয় না।

আপনার কি গ্যাসট্রিক?

না, সে-সব কিছু নয়। এমনিই ভাল লাগে না।

তাহলে আপনাকে একটু শরবত বানিয়ে দেব?

শুধু এক গ্লাস জল। আমি জলটা একটু বেশি খাই। দিনে আট দশ গেলাস জল না খেলে আমার চলে না।

এই শীতের মধ্যে অত জল খাওয়া যায়?

জল চিকিৎসা বলে একটা কথা আছে জানেন তো? সারাদিন জল খেয়ে গেলে আমার শরীর বেশ সুস্থ থাকে।

অন্যরা চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করল, মিঃ চৌধুরী, আপনি এখানে কতদিন আছেন?

তা ধরুন, বছর কুড়িক হবে। আমার জন্ম ভাগলপুরে। আমাকে বাঙালি না বলে বিহারীই বলতে পারেন। কলকাতায় গেছি মাত্র পাঁচ-ছবার।

ভাগলপুর ছেড়ে এখানে এলেন কেন? হাজারিবাগ টাউনটা তো সে রকম বড় নয়। তাছাড়া কুড়ি বছর আগে লোক নিশ্চয়ই আরও কম ছিল—ডাক্তারি করার পক্ষে।

আমি পুরো ডাক্তার নই—হাফ ডাক্তার। এখানে ডাক্তারি করতে আসিনি, আমার কাকার সঙ্গে এসেছিলাম ব্যবসা করতে। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা। দুদিনেই সেটা লাটে উঠল। কাকা চলে গেলেন, আমি রয়ে গেলাম। কিছুদিন কয়লার ব্যবসাও করতে শুরু করেছিলাম, সেটাও লোকসানে উঠল। ব্যবসা করা ধাতে সইল না।

তবু এখানেই রয়ে গেলেন কেন?

এক একটা জায়গা এক একজনের ভাল লেগে যায় না? সেইরকম আর কি। ডাক্তারি কলেজে পড়িনি কোনদিন, পাসও করিনি। এমনিই হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথির বই কিছু পড়ে-টড়ে এখানকার আদিবাসীদের ওষুধ দিই। আন্দাজে লেগে যায় অনেক সময়। এরা তো সারাজীবনে ওষুধ খায় না—অনেক সময় এক-আধটা পেটেন্ট ট্যাবলেটে বেশ

কাজ হয়। এ ছাড়া, কলকাতার একটা কাগজের নিউজ এডিটার এখানে এসেছিলেন একবার, আলাপ হল, তিনি বললেন, তাঁর কাগজের লোকাল করসপন্ডেন্ট হতে। বাঁধা ধরা কিছু নেই, বড় রকমের কিছু খবর হলে পাঠাই।

আচ্ছা, বাজারে দুজন লোক আপনার সঙ্গে খুব চ্যাঁচামেচি করে কথা বলছিল। ওরা কে?

ওরা আমার বন্ধু।

রঞ্জন আর সুমিত্রা চোখাচোখি করে চুপ করে গেল। দেখে তখন বন্ধু মনে হয়নি। চ্যাঁচামেচি করে প্রায় ঝগড়ার মতন কথাবার্তা।

ভবরঞ্জন বললে, ওরা ঝাড়খণ্ড পার্টির লোক। একজন লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। আমার সঙ্গে তর্ক হয়, ঝগড়া হয়, তবু আমাকে ভালবাসে—প্রায়ই আসে আমার কাছে। আমি ওদের সাপোর্ট করি।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে, ঝাড়খণ্ড পার্টিটা কিসের যেন? আজকাল এত পার্টি, কোনটা যে কি মনে থাকে না।

দীপঙ্কর বলল, ওটা হচ্ছে এখানকার আদিবাসীদের পার্টি। ওরা আদিবাসী এলাকাগুলো নিয়ে আলাদা ঝাড়খণ্ড স্টেট দাবি করেছে। বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের খানিকটা অংশ তাতে পড়বে। উড়িষ্যারও বোধ হয় কিছুটা।

সুমিত্রা বলল, আবার একটা আলাদা স্টেট? এরপর জেলায় জেলায় পাড়ায় পাড়ায় স্টেট গড়ার দাবি উঠবে।

রঞ্জন বলল, আপনি বাঙালি হয়ে ওদের সাপোর্ট করেন?

ভবরঞ্জনের মুখে সব সময়ই মৃদু মৃদু হাসি। সাধারণত সে অন্য কারুর মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। মাটির দিকে তাকিয়ে, গাছপালার দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখে কথা বলে। ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ করি। ওদের দাবি ন্যায্য।

কিন্তু ওরা কি বাঙালিদের পছন্দ করে?

অপছন্দ করার মতন কাজ না করলে কেন পছন্দ করবে না? তাছাড়া, আমার আর বাঙালিত্ব কি আছে বলুন! জন্ম থেকেই এই সব এলাকায় আছি। পশ্চিম বাংলায় গেলেই বরং একটু বিদেশি বিদেশি মনে হয়। কলকাতার রাস্তায় একলা একলা যখন হাঁটি, কি রকম যেন বোকা বোকা হয়ে যাই। কেউ চেনে না, রাস্তায় কেউ ডেকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে না—মনে হয় যেন একটা নিষ্প্রাণ শহর। আমাদের মতন গাঁইয়া লোকের জায়গা নেই সেখানে। এখানে বেশ আছি।

নবনীতা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে? দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখনো চান করনি? সেই কখন থেকে তেল মেখে বসে আছ—

ভবরঞ্জন শশব্যস্ত হয়ে বলল, আমি উঠি। আপনারা চান-টান করবেন এখন, কথা বলতে বলতে খেয়াল থাকে না—

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না না, এমন কিছু বেলা হয়নি। ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ ভাল লাগল। এদিক দিয়ে গেলে আবার আসবেন।

ভবরঞ্জন মোটর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে সারা বাড়ি ও বাগানের দিকে একবার চোখ বোলাল। তারপর বলল, এটা তো জাস্টিস মল্লিকের বাড়ি। এ বাড়িটা আমি তৈরি হতে দেখেছি। আগে বাগানটা আরও ভাল ছিল।

রঞ্জন বলল, উনি আমাদের মামাশ্বশুর। অনেকদিন তো নিজে আসেননি, দেখাশুনো ঠিক মতন না হলে....

ভবরঞ্জন গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই দীপঙ্কর রঞ্জনকে বলল, এই চীজটিকে আবার কোথা থেকে জোটালে?

কেন, একজন লোকাল বাঙালির সঙ্গে আলাপ রাখা তো ভালই, যদি কোনো দরকার-টরকার হয় হঠাৎ।

যখন তখন এসে জ্বালাতন করবে। আমি চিনি এই টাইপের লোকদের। জীবনে কিছু হয়নি—

নবনীতা আবার তাড়া দিল, তুমি যাও তো চান করতে।

ভুনেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে কুয়োর পাড়ে, জল তুলে দেবে। দীপঙ্কর কাছে এসে কুয়োর মধ্যে উঁকি মারল। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলল, এই সুমিত্রা, এদিকে এস, শিগগির এস, একটা জিনিস দেখে যাও—

সুমিত্রা কাছে এগিয়ে এসে ব্যস্তভাবে কুয়োর পাশে দাঁড়াতেই দীপঙ্কর বালতি থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল তার গায়ে। শীতে সে একেবারে কেঁপে উঠল। এমনিতেই সে চান করতে চায় না। কৃত্রিম রাগে চেঁচিয়ে উঠল, এই এই ভালো হবে না বলছি—

রঞ্জন তুমুলভাবে হাসছে। দীপঙ্কর আবার জল ছিটাল, দৌড়চ্ছে সুমিত্রা, দুই শ্যালিকা ও দুই ভায়রাভাই মিলে এখন একটু ইয়ার্কি ঠাট্টার সময়।

বিকেলবেলা বেড়াতে বেশ ভালো লাগে, কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতেই শীত একেবারে জেঁকে আসে। টেরিলিনের শার্ট, সোয়েটার কোটেও শীত মানে না, মাফলার দিয়ে কান ও গলা ঢাকা, তবু নাকের ডগা ও হাতের আঙুলগুলো

যেন জমে আসে। ফেরার সময় বাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা সবাই দৌড়তে শুরু করে দেয়। দৌড়লে বেশ ভাল লাগে। রোজই এই সময় ওদের দৌড়ের কমপিটিশান হয়।

সন্ধ্যের পর বাইরে বসার কোনো উপায় নেই, যদিও গোলাপ বাগানে কি সুন্দর জ্যোৎস্না।

সব ক'টা জানালা বন্ধ করে বসবার ঘরটায় চেয়ারগুলো কাছাকাছি টেনে এনে ওরা অন্তরঙ্গ হয়ে বসল। দীপঙ্কর আর রঞ্জন সিগারেট ধরাতেই সুমিত্রা আদুরে গলায় বলল, আমি একটা খাব!

রঞ্জন সিগারেট এগিয়ে দিতেই নবনীতা বলল, আমি না! আমার আজকাল কি রকম যেন বেশি গন্ধ লাগে।

দীপঙ্কর বলল, নবনী, তুমি একটু ব্র্যান্ডি খাও। দেখবে শীত কোথায় পালাবে!

রঞ্জন চোখের ইশারা করে বলল, হয়ে যাক একটু একটু।

গেলাস এনে ব্র্যাণ্ডি বোতল থেকে সদ্য ঢালা হয়েছে, এমন সময় বাইরের গেটের সামনে মোটর সাইকেলের শব্দ।

দীপঙ্কর বলল, এই সেরেছে! সেই ভবসিন্ধু না গঙ্গারঞ্জন কি যেন, সে এসেছে। বলেছিলুম না জ্বালাবে!

সুমিত্রা বলল, ভুনেশ্বরকে বলে দাও না, কেউ বাড়ি নেই।

রঞ্জন বলল, কেন, আসুক না। ওর কাছ থেকে লোকাল ব্যাপার অনেক কিছু জানা যাবে।

নবনীতা বলল, আমাদের ভুনেশ্বর ওই ভদ্রলোককে ভালভাবে চেনে। বেশ ভক্তি করে। দুপুরবেলা অনেক গল্প করছিল আমার কাছে। ভদ্রলোকের নাকি একসময় অবস্থা খুব ভাল ছিল, দুখানা মোটরগাড়ি ছিল। এখন সব গেছে।

সুমিত্রা সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। ব্র্যান্ডির গেলাস লুকোতে যাচ্ছিল। রঞ্জন ধমক দিয়ে বলল, লুকোবার কি আছে?

দীপঙ্কর শ্যালিকার কাঁধে হাত তুলে দিয়ে বলল, শীতকালে ব্র্যান্ডি খাওয়া অন্যায় কিছু নয়।

ভবরঞ্জন ঢুকেই বলল, ডিসটার্ব করলাম? যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে—

না, না, বসুন, বসুন—

ইয়ে, মিঃ চ্যাটার্জি—

চ্যাটার্জি নয়, চৌধুরী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। বলছিলাম কি, আমরা ব্র্যান্ডি খাচ্ছি, আপনার একটু চলবে?

ভবরঞ্জন মাটির দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। বলল, শীতকালে ব্র্যান্ডি বেশ উপকারী। শরীর গরম করে—কিন্তু আমি খাই না।

খান না। একটু চেখে দেখুন। ভয়ের কিছু নেই।

সাহেবদের আমলে দু-একবার চেখে দেখেছি। না, আমার চলবে না। আমাকে বরং এক গ্লাস জল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই—একটু পরে হলেও চলবে—

এই শীতের মধ্যে জল খাবেন? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই!

আমার এই একটাই দোষ।

নিন, সিগারেট নিন।

সিগারেটও আমার চলে না। আমি একটা জিনিস খাই, কিন্তু মা জননীরা রয়েছেন, এখন খাওয়া যাবে না।

চারজনে একটু শঙ্কিতভাবে তাকাল। গাঁজা-টাঁজা নাকি? অবশ্য গাঁজার নামে আজকাল বিশেষ ভয় নেই, সাহেবরাও খায়।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, কি খান আপনি? বলেই ফেলুন না—

বিড়ি। মা জননীদের গন্ধটা হয়তো খারাপ লাগবে।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলল, না, না, আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

কোটের পকেট থেকে বিড়ি বার করার আগে ভবরঞ্জন একটা খবরের কাগজ বার করল। বলল, আপনারা বোধহয় আজকের কাগজ দেখেননি। তাই নিয়ে এলাম—এখানে বিকেলের দিকে আসে কাগজ।

দীপঙ্কর বিতৃষ্ণা দেখিয়ে বলল, আমি মশাই বাইরে এসে কাগজ-টাগজ পড়ি না। কি হবে পড়ে, সেই তো একঘেয়ে খুনোখুনির খবর—কিংবা স্ট্রাইক—বেড়াতে এসেও যদি মাথার মধ্যে ওই সব ঢোকাতে হয়—

পুরুষরা উৎসাহ না দেখালেও সুমিত্রা আর নবনীতা কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। যেহেতু ওটা শুক্রবারের, পিছনের পাতায় সিনেমা—তাই ওরা প্রথম পাতা না দেখে একেবারে উল্টে নিলে।

রঞ্জন বলল, বিশেষ কিছু খবর-টবর আছে?

মাটির দিকে মুখ রেখে সেইরকম মৃদু মৃদু হাসতে হাসতেই ভবরঞ্জন বলল, বিশেষ খবর আর কি! ইন্দিরা গান্ধি পদত্যাগ করে আবার নির্বাচন চেয়েছেন (১৯৭০)—বিহারে আবার মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে—

সে কি, ইন্দিরা গান্ধি রিজাইন্ড? দেখি, দেখি—

এরপর আর কাগজ না পড়ে পারা যায় না। কিছুক্ষণ আলোচনা চলল ভারতের রাজনীতি নিয়ে। মেয়ে দুজন চুপ করে বসে রইল। সুমিত্রা মনের ভুলে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল ভবরঞ্জনের সামনেই। দীপঙ্কর শ্যালিকার কাঁধ থেকে হাত তুলে বেউয়ের পিঠে রাখল।

কাগজ পড়তে পড়তে একটা খবরের দিকে চোখ পড়ল দীপঙ্করের। বিস্মিতভাবে বলল, এই যে দেখেছ, প্রবল ঠান্ডায় হাজারীবাগে সাতজনের মৃত্যু! পরশুদিনের খবর। কি মশাই, সত্যি? আমরা কিছু টের পেলাম না।

হ্যাঁ, সত্যি।

আমরা সাতদিন ধরে আছি, শুনিনি তো কিছু!

হাজারীবাগ মানে তো শুধু এই শহরটা নয়। গোটা একটা জেলা।

আমার তবু বিশ্বাস হয় না। এমন কিছু ঠান্ডা নয়। শীত আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বেশ আরামের!

সুমিত্রা বলল, এর আগেও তো এরকম খবর বেরিয়েছিল। আমরা আসবার আগে সবাই কি রকম ভয় দেখিয়েছিল। অথচ এমন কিছু তো কষ্ট হচ্ছে না আমাদের।

রঞ্জন বলল, সব বোগাস! ঘরের মধ্যে থাকলে কিছু এমন বোঝা যায় না। হাওয়াটা যদি গায়ে না লাগে।

ভবরঞ্জন হাসি মুখে বলল, বনে জঙ্গলে কত গরিব লোক থাকে, তাদের আর মরে যাওয়া ছাড়া কাজ কি! তারা শীতকালেও মরে, গরমকালেও মরে। তবে শীতকালে একটু বেশি মরে—

রঞ্জন বলল, আসল ব্যাপারটা কি জানেন, বহুদিন ধরে যারা অসুখে ভুগছে, সেই রকম পুরোনো রুগীরা শীতকালে টেঁসে যায়। অমনি আপনারা কাগজে লেখেন, শীতের প্রকোপে মৃত্যু! শীতকালে যে জেনারেল হেল্থ ভাল থাকে সে কথা অস্বীকার করতে পারবেন?

সুমিত্রা বলল, এখানকার লোকদের তো শীত কম লাগারই কথা। সহ্য হয়ে যায় না? এই তো ভুনেশ্বরকে দেখি সব সময় একটা পাতলা শার্ট গায়ে দিয়ে আছে, মাঝে মাঝে একটা চাদর জড়ায়। ওর তো কিছু হয় না? রাত্তিরে মোটে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে শোয়—

নবনীতা মৃদু গলায় বলল, ভুনেশ্বর সারারাত ঘরে আগুন জ্বেলে রাখে।

সে তো এখানকার সবাই পারে। কাঠ-ফাঠ তো কুড়িয়ে আনলেই হয়, কত জঙ্গল—

ভবরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, ভুনেশ্বর কোন ঘরে শোয়?

পাশের ঘরটাতেই তো।

এটা পাকা বাড়ি। জানলা বন্ধ করলে হাওয়া ঢোকে না—

দীপঙ্কর ব্র্যান্ডির গেলাসে লম্বা চুমুক মেরে বলল, এইটা আমার কাছেও একটা সমস্যা। প্রত্যেক বছরই দেখি, কাগজে বেরোয়, প্রবল শীতে হাজারীবাগে অনেক লোক মারা যায়। আপনিই তা হলে সে-সব খবর পাঠান? বিহারের অন্য কোথাও এত লোক মরে না, হাজারীবাগেই শুধু এত লোক মরে কেন? এখানে বেশি শীত পড়ে?

ভবরঞ্জন বলল, তাই পড়ে বোধহয়।

ধ্যাৎ মশাই! এ জায়গাটা কি হিমালয়ের ওপর? এখানকার স্পেশালিটি কি?

এখানকার লোক বেশি গরিব!

সুমিত্রা বলল, যাকগে ওসব। কাল কোথায় বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে বল।

ভবরঞ্জন বলল, আমি উঠি তা হলে?

বসুন, বসুন। আচ্ছা, এখানে কাছাকাছি কি যেন একটা ড্যাম আছে না?

খুব নাম শুনেছি।

হ্যাঁ, কোনার ড্যাম। মাইল তিরিশেক হবে—

কি রকম? সুন্দর জায়গা?

ভবরঞ্জন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মাটির দিকে চোখ রেখে আপন মনে বলল, হ্যাঁ, ভারি সুন্দর—স্বীকার করতেই হবে, ভারি সুন্দর—

সেখানেই যাওয়া যাক তাহলে। বাংলো-টাংলো আছে? ওখানে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

ফরেস্ট বাংলো আছে একটা। দেখি চেষ্টা করে—

কোনার ড্যামের ওপর দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয় না ভারতবর্ষের কোনো জায়গা। মনে হয়, বিদেশেই শুধু এমন সুন্দর দৃশ্য থাকা সম্ভব—যেখানে প্রকৃতি এবং মানুষ—কারুর কৃতিত্বই কম নয়।

বাঁধটা প্রায় মাইল খানেক চওড়া। সুমিত্রা প্রায় ছেলেমানুষের মতন ছুটোছুটি করছে তার ওপর। গর্ভে সন্তান আছে বলে নবনীতার গতি মন্থর। একদিকে পাহাড়ের বহু নিচে শীর্ণ দামোদর, অন্যদিকে থৈ থৈ করছে জল। পাহাড় বেষ্টিত এই জলের শোভার কাছে মনটা হালকা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন ফিনফিনে হাওয়া ধারালো ছুরির মতন—তবু এই শীতের মধ্যে আনন্দ করতে ভাল লাগে।

বাঁধ শুরু হবার আগে ও শেষে খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে ফুলের বাগান। সব ব্যাপারটাই এমন নিঁখুত পরিচ্ছন্ন যে বিশ্বাস হতে চায় না, আমাদেরই দেশের মানুষ এসব বানিয়েছে। এত বড় একটা ব্যাপারের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ফরেন এক্সপার্টদের—দীপঙ্কর আর রঞ্জন এই নিয়ে আলোচনা করছে।

ভবরঞ্জনকে সঙ্গে এনে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। ফরেস্ট বাংলোটা পাওয়া গেল না, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা সেখানে আগে থেকেই এসে আছে। ভবরঞ্জন অবশ্য কাঁচুমাচু হয়ে বারবার বলতে লাগল যে দু-চারদিন আগে থেকে জানলে সে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে পারত, মাত্র একদিনের নোটিশে—

ভবরঞ্জন ওদের সঙ্গে আসতেও চায়নি, সে নিজেরই কোন কাজে এদিকে আসছিল মোটর সাইকেলে। কিন্তু ওরা যখন গাড়ি নিয়ে এখানে আসছেই, তখন ভবরঞ্জনকে আর মোটর সাইকেল আনতে দেয়নি, নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়েছে।

ডাক বাংলো পাওয়া যায়নি বলে যেটুকু উষ্মা জেগেছিল প্রথমে, আস্তে আস্তে তাও মিলিয়ে গেল। জায়গাটা এত সুন্দর যে বেশিক্ষণ মেজাজ খারাপ করে থাকা যায় না। তাছাড়া ওরা জেনে গেল, পাহাড়ের নিচে দামোদরের ধারার কাছে—পাশেই জঙ্গল, চমৎকার পিকনিক করার জায়গা। ওদের সঙ্গে খাবার-দাবার ছিলই, স্থানীয় দু-একটা ছোকরাকে লাগিয়ে দিয়ে বেশ সহজেই রান্না-টান্নার ব্যবস্থা হয়ে গেল। মুর্গিও জোগাড় হয়ে গেল সস্তায়।

ভবরঞ্জন মাংস খায় না, ডিম খায় না। একথালা ভাত শুধু ডাল আর পেঁয়াজকুচি দিয়ে খেয়ে উঠল। লোকটার এতখানি স্বাস্থ্য শুধু ওই খেয়ে কি রকমভাবে টেকে কে জানে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে ভবরঞ্জন বলল, মা জননীদের রান্না সত্যি অপূর্ব।

তাই শুনে সুমিত্রা আর নবনীতা হেসে লুটোপটি দেয়। শুধু ভাত আর ডাল—এতে আবার রান্নার কি আছে? লোকটি সত্যিই অদ্ভুত।

খেয়ে উঠে শাল গাছের নিচে বড় পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে রঞ্জন দীপঙ্কর সিগারেট ধরিয়েছে। ভবরঞ্জন বলল, আপনারা বসুন, আমি একটু ঘুরে আসি।

এখানে আবার ঘুরতে যাবেন?

একটু গ্রামের দিকে যাব। আমি তো ডাক্তারি করি এদিকে, রুগী-টুগীদের দেখে আসি। আপনারা তো বিকেলের আগে ফিরবেন না?

অপূর্ব জায়গা, ফিরতেই ইচ্ছে করছে না। আপনি মশাই জোগাড় করতে পারলেন না বাংলোটা—

রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে গল্প করছে সুমিত্রা আর নবনীতা। দীপঙ্কর ডাকল, এই তোমরা অতদূরে বসে রইলে কেন, এখানে এস না?

ওরা বলল, তোমরা এস। এখানে কি সুন্দর রোদ্দুর!

এরাও যাবে না, ওরাও আসবে না। একটা লক গেট খুলে দেওয়া হয়েছে, অবিশ্রান্ত জলের আওয়াজ। আস্তে আস্তে রোদ্দুর আড়াল করে চলে এল মেঘ। চতুর্দিকে একটা পাতলা ছায়া। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়গুলো।

রঞ্জন উঠে বলল, চল, নদীটার পাড় দিয়ে খানিকটা হেঁটে আসি।

নবনীতা বলল, তোমরা দুজনে যাও ভাই। আমি একটু বসি।

বেশি আর পেড়াপেড়ি করল না, সুমিত্রা আর রঞ্জন চলে গেল। ওরা একটু দূরে যেতে না যেতেই রঞ্জন জড়িয়ে ধরল সুমিত্রার কোমর।

নবনীতা উঠে এসে দীপঙ্করের পাশে বসে পড়ে হেলান দিল তার বুকে। এদিকটায় এখন কোনো মানুষজন নেই।

বিকেলে ওরা চারজন সব জিনিসপত্র গুছিয়ে-টুছিয়ে নিয়েছে। গাড়ি রাখা আছে বাঁধের ওপর। অনেকটা উঠতে হবে।

দীপঙ্কর বলল, কই, ভদ্রলোক তো এলেন না। আমাদের এবার স্টার্ট করতে হবে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে—শীতকালের বৃষ্টি একেবারে সাংঘাতিক।

রঞ্জন ঘড়ি দেখে বলল, হ্যাঁ পাঁচটা বাজে। ভবরঞ্জনবাবু তো এলেন না।

ওপরে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল ওরা সবাই। নামা যত সহজ, ওঠা সে রকম নয়। এখন ওপর থেকে তাকিয়ে দেখছে, নিচের জায়গাটা কত বেশি নিচে।

গাড়িতে জিনিসপত্তর ভরা হল, হর্ন দিল দু-একবার। ভবরঞ্জনের পাত্তা নেই। দীপঙ্কর বড্ড ছটফটে। সে বলল, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? চল, এবার যাওয়া যাক!

ভদ্দরলোককে ফেলে যাব? উনি ওঁর মোটর সাইকেল আনেননি।

ওঁর বোধ হয় এসব জায়গায় থাকার অভ্যেস আছে। এত দেরি করার তো কথা ছিল না।

বাঁধের ওপাশ থেকে কালো বিন্দুর মত একজন মানুষকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে ভবরঞ্জন বলল, আপনারা তো ওদিক দিয়েই যাবেন, তাই আমি ওপাশটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দীপঙ্কর প্রায় ধমক দিয়ে বলল, জানব কি করে আপনি ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন? বলে যাবেন তো। আপনাকে ফেলে তো আর যেতে পারি না—

গাড়িতে উঠে সবে মাত্র স্টার্ট দিয়েছে, ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। সে কি প্রবল তুমুল বৃষ্টি। চতুর্দিক মিশে একাকার। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রঞ্জন। বাঁধটা পেরিয়ে এসে বড় রাস্তা ধরেও আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। দু-পাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মাইল তিনেক যাবার পর একটা গর্ত-টর্ততে পড়ে ঘটাং করে আওয়াজ করে গাড়ি থেমে গেল। বিবর্ণ মুখে দীপঙ্কর বলল, কি হল?

বৃষ্টি পড়ছে সমান ভাবে, ছাতা-টাতা কেউ আনেনি। বৃষ্টির মধ্যেই নামল রঞ্জন। কি খানিকটা দেখে-টেখে এসে মুখ অন্ধকার করে বলল, কেলেঙ্কারি হয়েছে। অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে!

বাকিরা সমস্বরে বলল, কি? গাড়ি আর চলবে না?

রঞ্জন তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে বলল, ঠান্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছি দীপঙ্করদা, ব্র্যান্ডিটা এনেছ তো?

না তো!

তা হলে নির্ঘাত আমার নিউমোনিয়া হবে। এই ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে।

গাড়ি আর চলবে না?

কোনো চান্স নেই।

তাহলে সারা রাত থাকতে হবে?

একমাত্র উপায় সেই ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে যাওয়া। কোনো মতে কাকুতি মিনতি করে জায়গা করে নেওয়া। কিন্তু বাংলো অন্তত মাইল পাঁচেক দূরে—অতখানি রাস্তা বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষত নবনীতাকে নিয়ে তো আরও মুশকিল।

সবাই এমন ভাবে কথা বলছে, যেন দুর্ঘটনার জন্য ভবরঞ্জনই দায়ি। সে একেবারে মরমে মরে আছে।

দীপঙ্কর বলল, সারারাত এই গাড়িতে থাকতে হলে ঠান্ডায় একেবারে জমে যাব। তা ছাড়া চোর ডাকাতের ভয় আছে। কি মশাই, এখানে ডাকাতি-টাকাতি হয় না?

ভবরঞ্জন বলল, মাইল সাতেক দূরে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। সেখানে খবর পাঠালে হয়তো মেকানিক পাওয়া যেতে পারে। কিংবা যদি আর একটা গাড়ি পাওয়া যায়—

কে যাবে অতদূরে খবর দিতে?

ভবরঞ্জন একটু চিন্তা করে বলল, দাঁড়ান, বৃষ্টিটা ধরে যাক, তারপর দেখা যাক কি করা যায়। শীতকালের বৃষ্টি, বেশিক্ষণ হবে না।

বৃষ্টি থামল একটু বাদেই, কিন্তু ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভবরঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর তাকাল রাস্তার বাঁদিকে। দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু।

ভবরঞ্জন বলল, আজ শীতটা বড্ড বেশি। এভাবে গাড়িতে বসে থাকলে আপনারা কষ্ট পাবেন। কাছেই একটা গ্রাম আছে, আমার চেনা। সেখানে গিয়ে যদি একটু বসেন, আগুনে হাত পা সেঁকে—

আগুনের কথা শুনলেই এখন লোভ হয়। সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে বলল, সেই ভাল। চল, আমরা আগুনের ধারে বসি ততক্ষণ—তোমরা পেট্রোল পাম্পে গিয়ে চেষ্টা করে দেখ—

ভবরঞ্জন বলল, পেট্রোল পাম্পে আপনাদের কারুকে যেতে হবে না—আমি ওখান থেকেই কারুকে পাঠাব।

গাড়ি লক করে ওরা হাঁটতে আরম্ভ করেছে যেই, আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। গায়ে যেন পিন ফুটছে। ওদের গায়ে

প্রচুর গরম জামা কাপড়, তবু অবস্থা কাহিল। রঞ্জন বলল, বাপস, বাপের জন্মে এত শীত পাইনি কক্ষনো। দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীরেও না।

দীপঙ্কর বলল, আজ নির্ঘাত মারা যাব। ও মশাই, আপনার হাজারীবাগে শীতের প্রকোপে মৃত্যুর সংখ্যা দু-চারটে বাড়বে আজই।

ভবরঞ্জন বিনীতভাবে বলল, না না, আপনারা মরবেন কেন? ভদ্দরলোকেরা শীতে মরে না। আমরা যে গ্রামে যাচ্ছি, ওই গ্রামেরই দুটো লোক গত সপ্তাহে মারা গেছে।

এই সেরেছে, আবার সেখানে আমরা যদি—

না না, ভয় নেই কিছু। কান্নাকাটি দেখতে হবে না। কেউ মরলে এরা বিশেষ কান্নাকাটি করে না।

গ্রাম মানে আট দশখানা ছড়ানো ছিটোনো ঘর, কিছু মানুষ আর কিছু মুর্গি, শুয়োর, মোষ। তিন চারটে ঘরে খাপরার চাল, অন্যগুলোতে স্রেফ লতাপাতা চাপানো—টপ টপ করে জল পড়ছে ভেতরে। হাওয়ার যথেচ্ছাচার।

সবচেয়ে ভাল যে ঘরটি, তার সামনে একটুখানি বারান্দা। সেখানে ওদের খাতির করে চারপাই পেতে বসানো হল। গ্রামের লোকেরা ভবরঞ্জনকে চেনে। কয়েকখানা কাঠ এনে জ্বালিয়ে দেওয়া হল সেই বারান্দাতেই।

একটি সবল ছেলেকে চিঠি লিখে পাঠানো হল পেট্রোল পাম্পে। সে পাঁচ টাকা নেবে এবং বেশ খুশি মনেই গেল। বাকি লোকেরা যার যার ঘরের সামনে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতন বসে বা দাঁড়িয়ে। শীতের তাড়নায় শুয়োর মুর্গিগুলোও মানুষের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে।

ওরা চারজন আগুনে হাত পা সেঁকে নিচ্ছে ভাল করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। কারুর মুখে কথা নেই। ব্র্যান্ডির বোতলটা না আনার জন্য দুঃখ হচ্ছে দীপঙ্করের। রঞ্জন সিগারেট টেনে যাচ্ছে একমনে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে ভবরঞ্জন বলল, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে খুব। কিন্তু জানেন তো, শীতের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে থাকলে বেশি শীত করে। গান শুনবেন? বসুন, আপনাদের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাই।

কার উদ্দেশ্যে যেন হাঁক পেড়ে ভবরঞ্জন বলল, এ ভাগিয়া, সুলতান কাঁহা রে? সুলতানকে ইধার লাও তো। বাবুলোক দেখবে।

সেই লোকটি হাত ধরে টানতে টানতে যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে ওরা চারজনেই চমকে উঠল দারুণভাবে। শুধু চমক নয়, খানিকটা ভয়েও মুখ দিয়ে এক রকম শব্দ বেরিয়ে এল। নবনীতা কাতরভাবে বললল, এ কি।

একজন শক্ত সমর্থ চেহারার পুরুষ মানুষ, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স কিন্তু সম্পূর্ণ খালি গা। কোমরের কাছে কোনো রকমে ছেঁড়া কাপড় এক টুকরো জড়ানো, কিন্তু বাকি শরীরে কোনো আবরণ নেই। কিন্তু লোকটির মুখে বেশ একটা পরিতৃপ্তির হাসি—শীতের কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই।

সুমিত্রা চাপা গলায় বলল, এই শীতে খালি গা! মরে যাবে যে।

ভবরঞ্জন আশ্বস্ত গলায় বলল, না না, সুলতানের শীত লাগে না। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখাবার জন্যই তো ওকে ডাকলাম। আর সবাই শীতে মরে যেতে পারে, ওর কিচ্ছু হবে না। দেখছেন না, ওর গায়ে জল—তার মানে বৃষ্টিতে চান করেছে।

দীপঙ্কর অস্ফুট গলায় বলল, আশ্চর্য। এ কখনো সম্ভব?

ভবরঞ্জন গলা চড়িয়ে বলল, এ সুলতান, একঠো গানা শোনাও। বাবুলোক তুমহারা গানা শুননে মাঙ্তা।

'সুলতান কোনো কথা না বলে দুটো আঙুল ঠোঁটের কাছে এনে হুস হুস করে শব্দ করল।

ভবরঞ্জন হেসে দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে একটা সিগারেট দিন। ও আবার বড্ড শৌখিন, বিড়ি খায় না।

হাত বাড়িয়ে সুলতান সিগারেট নিল, মনোযোগ দিয়ে ধরাল। তারপর দু আঙুলে সিগারেটটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। যেন ঠিক কি ভাবে ধরলে তাকে বেশি মানাবে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না।

ভবরঞ্জন বলল, ওর আসল নাম কিন্তু সুলতান নয়। ওর আসল নাম তারু। তারু মাঝি। কিন্তু লোকে ওকে বলে সাত রোজ কা সুলতান। সেই থেকে শুধু সুলতান নাম হয়ে গেছে।

এই সুলতান, গানা গাও।

লোকটা হঠাৎ উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গান ধরে দিল। যেমন বেসুরো গলা তেমনি তার গানের একটা অক্ষরও বোঝা যায় না। কিন্তু সে খুব মনের আনন্দে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে গাইছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘলা আকাশ—তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা—গায়ে অল্প অল্প জল লেগে আছে, সতেজ মাসলগুলো স্পষ্ট, মাথার চুল জট পাকানো, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখলে পাগল মনে হয় না।

নবনীতার মুখখানা খুবই বিষণ্ণ, গর্ভের সন্তানের জন্য তার ভয়। এত শীতে মনে হচ্ছে যেন শরীরের ভেতরের রক্তও জমে যাবে। নবনীতা সুলতানের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, ওকে বলুন না, এখানে উঠে আসতে। এই আগুনের পাশে বসে গান করুক।

ভবরঞ্জন উত্তর দিল, আপনারা মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। সুলতানের একটুও শীত করে না। এইটাই তো দেখার জিনিস। আপনারা যদি বলেন, ও এক্ষুনি নদীতে স্নান করে আসতে পারে—একটুও শীতে কাঁপবে না। পরীক্ষা করে দেখতে চান?

দীপঙ্কর বলল, ইমপসিবল। মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক, পরীক্ষা করে দেখার দরকার নেই।

রঞ্জন একটা সিগারেট শেষ হতে না হতেই আর একটা ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওকে সবাই সুলতান বলে কেন?

শুনুন তা হলে গল্পটা বলি। গল্প নয় অবশ্য—তবে আজকাল খবরের কাগজের সব রিপোর্টকেই তো বলে স্টোরি—সেই হিসেবে গল্প বললাম। যে বাঁধটা দেখে এলেন—ওই রকমই একটা বাঁধের কাছে ছিল সুলতানের জমি। তখন ওর নাম ছিল তারু। জংলি মানুষ, কোনোরকমে চাষবাস করে পেটে চালাত—তাও সারা বছর দুবেলা খাওয়া জুটত না। এখানে কারুরই জোটে না। ডি ভি সি থেকে ওর জমিটা নিয়ে নিল—তাকে অবশ্য ওর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, জমি হারিয়ে না হয় কুলি মজুরের কাজ-টাজ করত—

রঞ্জন বলল, কেন, ওদের কমপেনসেশান দেয়নি?

ভবরঞ্জন হেসে জানাল, হ্যাঁ, কমপেনসেশান তো দেয়ই—গভর্নমেন্ট কি কারুকে ঠকাতে পারে? কিন্তু সেটাই হল ওর বিপদের কারণ। তারুর জমির দাম হল আঠারো শো টাকা। হাতে পেল তেরো শো টাকা—কারণ গভর্নমেন্টের টাকা তো সহজে পাওয়া যায় না—দালাল লেগে গেল তারুর পেছনে—তারা টাকা আদায় করে দিয়ে নিজেরা কিছু কমিশন নিল, কিছু কিছু করে দিতে হল অফিসের বাবুদের—শুনেছি ম্যানেজাররা পর্যন্ত তার ভাগ পান। সে যাই হোক, আপনারা ধারণাই করতে পারবেন না, এই সব জঙ্গলের মানুষের হাতে হঠাৎ এতগুলো টাকা এলে কি অদ্ভুত ব্যাপার হয়।

সুলতান গান থামিয়ে আবার একটা সিগারেট চাইছে। দীপঙ্কর তার প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল। প্যাকেট থেকে একটি মাত্র সিগারেট নিয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে আবার গান ধরল সুলতান। ভবরঞ্জন সেদিকে তাকিয়ে বলল, সুলতান কিন্তু এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুখী মানুষ। ওর কোনো অভাব অভিযোগ নেই। দেখুন না, মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, টাকাগুলো নিয়ে কি করল?

ভবরঞ্জন হাসতে হাসতে বলল, টাকাগুলো পেয়ে সুলতান খুব রেগে গেল। হ্যাঁ, রেগে গেল। সুলতানকে দেওয়া হয়েছিল তেরখানা একশো টাকার নোট। ওর ধারণা ওকে কম টাকা দেওয়া হয়েছে। সুলতান একশো টাকার নোট চোখে দেখেনি। ও টাকা গুনতে জানে না। টাকার দামই জানে না। এই সব জঙ্গলে এখনো বারটার সিসটেম চলে। এক মণ ধান হাটে নিয়ে গিয়ে পাইকারদের দিয়ে হয়তো একটা ছাগল নিয়ে এল—এই রকম। এখানে নুনের খুব অভাব—গুজরাটি ব্যবসায়ীরা জঙ্গলে গিয়ে অনেক সময় এক সের নুনের বদলে পাঁচ সের তিল নেয়। এরা দু-পাঁচ টাকা বড় জোর দেখেছে। একশো টাকার নোটের কি মর্ম বুঝবে! সুলতানের রাগারাগি দেখে পাইকাররা হেসেই খুন। তারা বলল, আরে বুদ্ধু, ওই নোট নিয়ে দোকানে গিয়ে হুকুম কর না, যা হুকুম করবি, তাই পাবি! মিঠাইয়ের দোকানে যাবি? সরাবের দোকানে যাবি?

বলাই বাহুল্য, দালালরা ওই সব দোকান থেকে কমিশন পায়। খাবার-টাবারের ভাগও পায়। দালালরা সুলতানকে নিয়ে গেল শহরে। সুলতানের তখন অদ্ভুত ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা। গেঁজে থেকে একটা নোট বার করে, আর কত জিনিসপত্তর পাওয়া যায়, কত নোট ফেরত দেয়! ও বেশ একটা মজার খেলা পেয়ে গেল। সুলতানকে তখন দ্যাখে কে! নতুন জামা কাপড় ওর গায়ে, যে কোনো দোকান দেখলেই টাকা ভাঙাতে যায়। দালালরা ওকে নিয়ে গেল বিলিতি সরাবের দোকানে, বাজারের পেছনে যে বেশ্যারা থাকে—তাদের কাছে। একটা জংলি ভূত, অথচ তাকে সবাই খাতির করছে, এটা কম কথা?

আমরা একদিন রেলওয়ে ক্লাবে বসে তাস খেলছিলাম, একজন এসে বলল, রাস্তার মাঝখানে একটা লোক শুয়ে আছে, মরেই গেছে বোধহয়। আমরা সাংবাদিক মানুষ, এসব খবর শুনলে যেতেই হয়। সেই প্রথম আমি সুলতানকে দেখি। ডিসেম্বর মাস—রাস্তায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে সুলতান, মুখে মিটিমিটি হাসি। তাড়াতাড়ি একটা কম্বল চাপা দিয়ে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে এলাম ডাক্তারখানায়। তখন ওর টং নেশা, কিন্তু জ্ঞান আছে। ওই শীতে কত

মানুষ মরছে, কিন্তু ওর কি অদম্য জীবনী-শক্তি, কতক্ষণ ওই রকমভাবে রাস্তায় শুয়ে ছিল কে জানে। আস্তে আস্তে ওর ঘটনাটা শুনলাম। টাকা পয়সা সব গেছে—যাবেই জানা কথা, যে দালালটা শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে ছিল, সে যাবার সময় ওর গায়ের নতুন জামা কাপড়ও খুলে নিয়ে গেছে। আমরা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর এখনও জ্ঞান আছে। তোর জামা কাপড় খুলে নিয়ে গেল, তুই কিছু বললি না? ও কি উত্তর দিয়েছিল জানেন? কল্পনাই করা যায় না। ও ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বলেছিল, আহ্‌, বেচারার বোধহয় খুব জাড়া লাগছিল, তাই আমারটাও গায়ে দিয়ে গেছে। ওই একটা কথার জন্যই নিজের শীত জয় করেছে সুলতান। ওর আর শীত করে না। ডাক্তারদের কাছে ও একটা বিস্ময়।

রঞ্জন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, লোকটা তারপর থেকেই পাগল?

ওকে ঠিক পাগল বলা যায় না। বরং বলা যায় ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা। সব সময় নিজের মনে আছে। কারুর কোনো ক্ষতি করে না। যে যা দেয়, তাই খায়। কাজ করতে বললে কাজ করে। গান গাইতে বললে গান গায়। কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। বেশ আনন্দেই আছে।

দীপঙ্কর অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? যে-ছেলেটাকে পেট্রোল পাম্পে পাঠালেন, তার কতক্ষণ লাগবে আসতে?

অন্তত ঘণ্টা দুয়েক তো লাগবেই। যদি দৌড়েও যায়—

অতক্ষণ এখানে থাকতে হবে?

যদি চান, গাড়ির মধ্যে গিয়েও বসতে পারেন। বৃষ্টি তো থেমেই গেছে।

তাই যাওয়া যাক। রঞ্জন, কি করবে? আমার এখানে অসহ্য লাগছে। রঞ্জন বলল, এখানে তবু আগুন ছিল। নবনীতাদি, তোমার শীতটা একটু কম লাগছে না এখানে?

নবনীতা সে কথায় কোনো উত্তর দিল না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুলতানের দিকে, কিন্তু ভাবছে নিজের গর্ভের সন্তানের কথা। যে সন্তান এখনো জন্মায়নি, যার মুখ এখনো দেখা হয়নি—তার জন্যই ব্যাপক মায়ায় শরীর অবশ হয়ে যায়। তখন সারা পৃথিবীর জন্যই মঙ্গল চাইতে ইচ্ছে করে। নবনীতা বলল, ওই লোকটা যে এতক্ষণ ধরে গান গাইছে, একটাও তো কথার মানে বুঝতে পারছি না। কি ভাষা? হিন্দি নয়?

ভবরঞ্জন বলল, আপনি বুঝি মানে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন? ওর ওই সব গানের মানে আমরাও বুঝি না। কেউ বোঝে না। ও নিজেই শুধু নিজের গানের মানে বোঝে।

নবনীতা থরথর করে কেঁপে উঠলো। অসম্ভব শীত করতে লাগল তার। পাণ্ডুর মুখে বল্‌ল, আমার ভয় করছে। আমার খুব ভয় করছে।।

দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি

লাল মিঞা

কত বড় জবরদস্ত মানুষ যে লাল মিঞা, তার প্রমাণ একবার তিনি হাসেমকে এমন একখানা কান চাপাটি ঝাঁপড় মেরেছিলেন যে সেই থেকে হাসেম আর বাঁ কানে শুনতেই পায় না। তখন থেকে তার নাম এক কেনো হাসেম। তার সেই নামের মধ্যে লাল মিঞার কীর্তি স্থায়ী হয়ে রইলো। এ কেনো হাসেম এখন লাইনের চায়ের দোকানে কাজ করে। ছোঁড়াটা এমন মজার যে যদি সে বাঁ দিক ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন যতই তাকে ডাকো, সে শুনতে পাবে না। তখন তাকে ধরে ঘুরিয়ে দিতে হয় ডান দিকে।

লাল মিঞার আর একখানা কীর্তির কথা লোকের মুখে মুখে ঘোরে। এই গ্রামে প্রথম নাইলন সুতোর ছিপ এনেছিলেন লাল মিঞা। সেই ছিপ পেতে বসেছিলেন বারো শরিকের পুকুরে। এই পুকুরে যার খুশি ছিপ ফেলে মাছ ধরুক, কিন্তু কেউ চুপচাপে জাল ফেললেই কাজিয়া লেগে যাবে। বারো শরিকের কারুর বাড়ি বিয়ে-শাদি হলে তখনই দেওয়া হবে জাল ফেলার অধিকার।

বিরাট পুকুর, মাছ আর পদ্ম পাতায় ভরা। দুপুরবেলা লাল মিঞার ছিপের নীল রঙের সুতোয় টান পড়লো। অমনি বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো হুইল। মাছটা সারা দিঘি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। টান দিতে গিয়ে লাল মিঞা ভাবলেন, ওরে বাপস এটা মাছ না জল দানব? লাল মিঞা নিজে সা-জোয়ান। গাজির নাম নিয়ে জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই টাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন জলে। লাল মিঞা জীবনে কখনো হারেন নি। জলের মধ্যে লেগে গেল লড়াই। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। লাল মিঞার সারা গায়ে জড়িয়ে গেছে নাইলনের সুতো, সে আর কিছুতেই ছেঁড়ে না, তিনিও উঠে আসতে পারেন না, অন্যদিক থেকে জল দানব তাঁকে টানছে।

শেষ পর্যন্ত লাল মিঞারই জয় হল। তিনি দু'হাতে বুকের মধ্যে তাঁর শত্তুরকে সাপটে ধরে এক সময় উঠে এলেন। এই এত্ত বড় কালো হাঁড়ির মতন মাথা, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, একটা বিরাট কাতলা মাছ। পরে ওজন নিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক আট কেজি। অত বড় একটা মাছের সঙ্গে জলের মধ্যে কুস্তি করে কেউ ধরে আনতে পেরেছে, এমন কথা ভূ-ভারতে কখনো শোনা যায় নি। আশে পাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে এখনো কেউ বড় মাছ ধরলেই লোকে বলে, আরে যা যা, রেকর্ট করেছিল বটে লাল মিঞা, এখনো তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার হেম্মত কেউ দেখাতে পারে নি।

তবে, এসব লাল মিঞার যৌবনের কথা। এখন তাঁর আসল জোর মামলায়। জমি-জিরেত নিয়ে লাল-মিঞার একবার যে মামলায় জড়াবে, তার গুষ্টির তুষ্টি নাশ হয়ে যাবে।

রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরছেন লাল মিঞা। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর সাদা মখমলের পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের পাম্প শু, হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় হড়হড়ে কাদা। তার মধ্য দিয়ে গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাঁটছেন তিনি। অন্য যে-কেউ আছাড় খেয়ে পড়তে পারে, কিন্তু লাল মিঞা? সে তো একটা বাঘ।

গ্রামে এখন নিশুতি রাত। এর মধ্যে লাল মিঞার টর্চের আলো এদিক ওদিক ঝিলিক দিচ্ছে। পেয়ারাতলীর পাশে একটি একটেরে ঘর, সেখান থেকে হঠাৎ শোনা গেল একটি কচি শিশু গলার কান্না।

ঘৃণায় লাল মিঞা মুখ বেঁকালেন।

রহমান সাহেবের বাড়িতে অতিথি এসেছেন চারজন। রহমান সাহেব কলকাতায় সেটেলমেন্ট অফিসে চাকরি করেন। সপ্তাহে একবার বাড়ি ফেরেন প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মেহমান থাকে। আসার পথে আড়বেলের হাট থেকে গোস্ত কিংবা বড় মাছ কিনে আনেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে গান বাজনা হয়। রহমান সাহেবের বাবা মাত্র ছমাস আগে এন্তেকাল করেছেন। তিনি ছিলেন ভারি কড়া লোক। তিনি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তেন এবং দান ধ্যান করতেন নিয়মিত। তাঁর আমলে পঁয়ত্তিরিশ বছর বয়স্ক রহমান সাহেবও বাড়িতে থাকতেন মুখ বুজে। এখন তিনি যেভাবে চলছেন, তাতে লোকে বলে, বাপের বিষয় সম্পত্তি তিনি দু'দিনেই উড়িয়ে দেবেন।

রহমান সাহেবের স্ত্রী নাজমা পোয়াতি। আম্মার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এত লোকের রান্না বান্না করবে কে? বাড়িতে যে ছোট মেয়েটি বাসন মাজতে আসে, তাকে নাজমা বললো, যা তো, হাসিনাকে ডেকে নিয়ে আয়।

পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ডাক পেয়েই হাসিনা ছুটতে ছুটতে চলে এল।

হাসিনা আল্লার এক অপূর্ব সৃষ্টি। সকলেই জানে, তার বয়েস ত্রিশ একত্রিশের কম নয়। কিন্তু দেখায় ঠিক ষোলো-সতেরো। খুব বেশি মনে হয় তো কুড়ি। রংটি কালো, কিন্তু সেই কালোর ওপরেই যেন চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে। শরীরের গড়ন পেটনও খুব মজবুত। সে কখনো হাঁটে না, সব সময় দৌড়ে দৌড়ে চলে। আর এ মেয়ের কত গুণ। হাতখানা যেন মধু। যা রাঁধবে তাতেই এমন সোয়াদ আসবে যে সবাই চেয়ে চেয়ে খাবে। হাসিনাকে পানি এনে দিতে বলো, পুকুর থেকে দশ ঘড়া পানি তুলে দেবে, তারপরও মুখখানা তার হাসি হাসি থাকে। সারা বাড়ি মুছে ঝকঝকে তকতকে করে দেবে সে, একবার বলতেও হবে না।

হাসিনা বড়-মানুষের দুঃখী মেয়ে। পাড়ায় কারুর বাড়িতে বড় কাজকর্ম থাকলে হাসিনার ডাক পড়ে। সে দু হাতে সতেরো হাতের কাজ করে দেয়। দোতলায় পুকুরের ধারের ঘরটিতে রহমান সাহেব তাঁর মেহমানদের নিয়ে বসেছেন, কখনো হেঁকে পানি চাইছেন, কখনো কাবাব, কখনো একটা দেশলাই, হাসিনা ছুটে ছুটে গিয়ে দিয়ে আসছে সব কিছু। একতলার রান্নাঘরে বসে থাকলেও সে দোতলার হাঁক একবারেই ঠিক শুনতে পায়। কখনো সে দোতলায়, কখনো সে পুকুর ঘাটে, কখনো রান্না ঘরে, কখনো বা সে রহমান সাহেবের মাকে পান ছেঁচে দিচ্ছে। মুখের হাসিটি লেগে আছে ঠিক।

দরজার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে সে বললো, এই নিন, রহমানভাই, আপনি দেশলাই চেয়েছিলেন।

রহমান সাহেব বললেন, ভেতরে আয় না, এত লজ্জা কী?

উঠে গিয়ে তিনি হাত ধরে হাসিনাকে টেনে নিয়ে এলেন ভেতরে। তাঁর চারজন দোস্তের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এ আমার এক দূর সম্পর্কের বোন হয়। আসলে এ আমার এক শত্রুর মেয়ে। ওর বাবার সঙ্গে আমার মামলা চলছে। ওর বাবা অতি ঘোড়েল লোক, কিন্তু এ মেয়েটা খুব ভালো। আচ্ছা, বলুন তো, এর বয়েস কত?

হাসিনাকে নিয়ে এই খেলাটা সবাই খেলে। বয়েস হলে মানুষের মুখে তার একটা ছাপ পড়বেই। শুধু হাসিনা ব্যতিক্রম।

অতিথিদের মধ্যে কেউ বললো আঠারো, কেউ বললো কুড়ি। এদের মধ্যে যার নিজেরই বয়েস অনেক কম, সেই মীজানুর বললো, কত আর হবে, পনেরো, ষোলো।

রহমান সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কালো রঙের মেয়ে, তার ওপর পরে আছে একটি কালো শাড়ি। হাসিনা যেন রাত্তিরের সঙ্গে মিশে আছে।

রহমান সাহেব মীজানুরকে বললেন, এর বড় ছেলেটারই বয়েস বোধহয় চোদ্দ-পনেরো। নারে হাসিনা? এর ছেলেমেয়ে কটি জানেন? তিনটে না চারটে রে?

হাসিনা আঙুলে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, তিন।

সবাই খুব বিস্ময় প্রকাশ করলো।

রহমান সাহেব বললেন, মীজানুর, তুমি তো বিয়ে—শাদি করোনি এখনও? একে বিয়ে করবে? কি রে হাসিনা, তোর পছন্দ হয় আমার এই বন্ধুকে? মুখ তুলে দ্যাখ ভালো করে। একে নিকে করবি?

হাসিনা ঘাড় কাত করে বললো, হুঁ।

রহমান সাহেব বললেন, দেখছেন তো, স্বভাবটা ওর একদম বাচ্চার মতন? এরকম বিয়ে-পাগলি মেয়ে আর আমি দেখিনি। একেও অনেকেই বিয়ে করতে চায়। তবে একটা বড় কঠিন শর্ত আছে! সেটা শুনলেই পিছিয়ে যায় সবাই!

লাইনে সন্ধ্যা

কলকাতা শহর থেকে মাত্র সত্তর মাইল দূর হলেও এদিকে ট্রেন চলে না, এদিকে বিদ্যুৎ পৌঁছোয় নি। তবে, দেড় মাইল হাঁটা পথের পর বড় রাস্তা, সেখান দিয়ে অনেক বাস চলে। এখানে বাস রাস্তাকেই বলে লাইন। যেখানে বাস থামে, তার নাম স্টেশন।

বিকেলের পর গাঁয়ের অনেকেই একবার লাইনের দিকে ঘুরে আসতে যায়। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। এখানে এসে কিছুক্ষণ বসলে পাঁচরকম কথা শোনা যায়। কেউ কেউ শখ করে এখানে চা খেতে আসে। বসিরহাট কিংবা এদিকের আড়বেলের বাজারে মাছের দাম, পাটের দাম, আলুর দাম কত, তাও জানাজানি হয়ে যায় এখানে।

সবচেয়ে ঝলমলে দোকানটি বীরেন সাহার। সুচ সুতো থেকে শুরু করে ফুটবল পর্যন্ত পাওয়া যায়। সামনে সাজানো সারি সারি কাচের বৈয়ামে নানারকম লজেন্স ও বিস্কুট। এক একবার বাস এসে থামে আর বীরেন সাহা চোখ তুলে দেখে। শহরে কে কে গিয়েছিল, কে কোনরকম জিনিসপত্র নিয়ে এলো সঙ্গে করে।

দোকানের সামনে সাত থেকে তেরো বছর বয়সের তিনটি ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে।

দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, মেয়েটিই ছোট। তিনজনই পরে আছে ছোট ইজের, খালি গা ওরা। চোখ দিয়ে লজেন্স বিস্কুটগুলো চাটছে।

বীরেন সাহা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে ওঠে, এই, যা যা! কেন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছিস?

ওরা নড়ে না। মেয়েটার নাক দিয়ে সিকনি গড়াচ্ছে, মেজ ছেলেটা ঘ্যাসর ঘ্যাসর চুলকোচ্ছে ঊরু, সেখানে পাঁচড়া হয়েছে। বড় ছেলেটা ছটফটে ভাবে এদিক ওদিক তাকায় সর্বক্ষণ। তার রোগা ক্যাংলা চেহারা, কিন্তু মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যায় বেশ বুদ্ধি আছে। তার নাম জাভেদ।

বীরেন সাহা আবার তাড়া দিয়ে উঠলো, এই, যা যা সর দোকানের সামনে থেকে।

ওরা তবু নড়লো না। ওরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। রাস্তাটা কারুর কেনা নয়!

দোকানে খদ্দের আসছে, যাচ্ছে। একটু ফাঁকা হলেই বীরেন সাহার চোখ পড়ে ওই দিকে। সর্বক্ষণ হ্যাংলার মতন চেয়ে থাকা ওই তিনটে বাচ্চাকে দেখতে কারুর ভালো লাগে? একটা নুলো ভিখিরি এসে ভিক্ষে চেয়ে পাঁচ নয়া নিয়ে গেল। ওরা ভিক্ষেও নেবে না।

শেষ পর্যন্ত বীরেন সাহা কাচের বৈয়াম খুলে তিনটে সস্তা লজেন্স বার করে বললো, এই নে, এদিকে আয়, নে তারপর যা।

ছেলেমেয়ে তিনটে তবু এগোলো না। পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো একবার, কিন্তু নড়লো না কেউ।

—এ যে দেখছি মহাজ্বালা!

একটু পরেই মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেল বীরেন সাহা। বসিরহাটের দিক থেকে একটা বাস এসে থামলো, তার থেকে নামতে দেখা গেল লাল মিঞাকে।

বীরেন সাহা বললো, ওই লাল মিঞা আসছে!

জাভেদ পেছন ফিরে তাকিয়ে সত্যিই রাস্তার ওপারে লাল মিঞাকে দেখতে পেয়ে কেঁপে উঠলো। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতন অমনি গ্রামের দিকে ছুটলো পাঁইপাঁই করে। তার ভাই বোনও তার পেছনে পেছনে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

যারা শুধু চাষবাস নিয়ে আছে, তাদের ভাগ্যের বিশেষ উত্থান পতন নেই। কোনো কোনো বছর খুব খারাপ যায়, কোনো কোনো বছর খারাপ দিনগুলোও সয়ে যায়। হঠাৎ কোনো বছর যদি পাটের দাম একটু চড়ে, বাজারে আগে ভাগে পাট পৌঁছোনো যায়, তা হলে হাতে কিছু উটকো টাকা আসে। সেই টাকায় ঘরের ছাউনি বদলানোটা হয় সেবার।

গণি খান চৌধুরী তাঁর ভাই রহিমের মতনই আলাদা আলাদা জমি চাষ করে আসছিলেন। এক বছর তিনি খেয়ালের বশে পাট বেচা টাকায় জলকর ডেকে নিলেন। সেবার থেকেই তাঁর ভাগ্য ফিরলো। আজকাল মাছের ভেড়িতেই সোনা ফলে।

এখন গণি চৌধুরীর দোতলা কোঠা বাড়ি। সে বাড়িতে রেডিও আর বন্দুক আছে। তাঁর হাতে সোনার ব্যান্ডের হাতঘড়ি। দেশলাই এর বদলে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরান। তাঁর পাঁচ ছেলে, সবাই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। দুই ছেলে দেখে চাষবাস, আর দুই ছেলে পড়ে থাকে ভেড়িতে। ছোট ছেলেটি ইস্কুলে যায়। গণি চৌধুরীর ইচ্ছে আছে সামনের বছর ফেরী ঘাটের নিলামের সময় ডাক দেবেন।

বয়েস হলেও গণি চৌধুরীর শরীরটা মজবুত আছে। দুই বিবিই গত হয়েছেন অকালে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তিনি আর নতুন করে শাদির কথা ভাবেন না। ছেলেরা তাঁর যত্নআত্তির কোনো ত্রুটি রাখেনি, তাঁর কাজের বোঝাও হালকা করে দিয়েছে। তিনি এখন পরোপকার করে বেড়ান। মসজিদ সংস্কার, গ্রামে প্রাইমারি স্কুল গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন, মাদ্রাসার শিক্ষকদের বকেয়া বেতন এসব ব্যাপারে গণি চৌধুরি সব সময় খুশি। তেঁতুলগাছের পীর সাহেবের সামনে তিনি নিজ ব্যয়ে বসিয়ে দিয়েছেন টিউকল, কাজি কবির ইন্তেকালের পর যে ফাংশান হল তাতে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কেউ বলতে পারবে না নতুন টাকার গরমে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। তিনি দয়ালু মানুষ। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যান, সকলে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

সন্ধের দিকে গণি চৌধুরীর একটু জ্বর এসেছে। প্রায়ই এরকম ঘুষঘুষে জ্বর আসে। ডাক্তারকে দেখাতে যাবেন যাবেন করেও হচ্ছে না। চাষির রক্ত আছে শরীরে, যখন তখন ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা এখনো রপ্ত করতে পারেন নি। তাঁর দোস্ত গীয়াসুদ্দিন আহমদের জানাজায় যাবার কথা ছিল, তিনি আর গেলেন না। দোতলায় নিজের ঘরে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেন না। ছটফট করছেন। কেমন যেন শয্যাকন্টকীর ভাব। একবার উঠছেন,

একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন বিছানায়। বাড়িটা নিঝুম, ছেলেরা কেউ নেই বাড়িতে। দুই ছেলের বউ নিশ্চয়ই গেছে পাড়া বেড়াতে।

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এখান থেকে দেখা যায়, তাঁর নিজের বাড়ির চৌহদ্দি, তারপর ফলবাগান, নিজস্ব পুকুর, অনেক দূর বিস্তৃত ধান জমি। সবই তাঁর নিজের জীবনে গড়া। পুকুরের ওপারে তাঁর ভাই রহিমের কাঁচা বাড়িটি যেমন আগে ছিল তেমনিই আছে।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এত করেও কী লাভ হল? সন্ধেবেলা এই যে তাঁর শরীর ছনছন করছে, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই। কেউ তাঁর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে আসবে না। শরীরে এত তাকত অথচ শরীর থাকে অনাহারে।

তিনি হতাশভাবে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। যদি এই সময় কেউ এসে পাশে বসতো, দুটো সোহাগের কথা কইতো! দুই প্রাক্তন বিবির মধ্যে একজনের কথাও গণি চৌধুরীর মনে পড়লো না, তিনি ভাবতে লাগলেন আর একজনের কথা, বড় কোমল তার মুখখানা, তার হাতের আঙুলে যেন জাদু।

হাসিনার পূর্ব ইতিহাস

ষোলো বছর বয়েসে হাসিনার চেহারা যখন ঠিক ষোলো বছরের মেয়ের মতই ছিল, সেই সময় সে এক সন্ধেবেলা লাইনের ধার থেকে মেল বাসে উঠে পালায়। হাসিনা পাকতে শুরু করেছিল তের বছর বয়েস থেকে। তার বাড়-বাড়ন্ত শরীরের জন্য পাড়ার চাচা আর দুলহাভাইরা একটু গোপন ফুরসত পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। এইভাবে হাসিনার শরীর গরম হয়ে গেল। ষোলো বছর বয়েসে একটি লম্বা চওড়া ছেলে তাকে হাতছানি দিতেই সে সরে পড়লো তার সঙ্গে।

দোর্দণ্ড প্রতাপ লাল মিঞা মেয়ের খোঁজে চতুর্দিকে লোক লাগলেন। বেশি দূর নয়, হাসিনাকে পাওয়া গেল ইটিন্ডাঘাটে। ছেলেটি সেখানে ফলের ব্যবসা করে, তার নাম জামালুদ্দীন।

লাল মিঞা ছেলেটিকে টুঁটি ধরে নিয়ে এলেন। মেয়েকে দিলেন বিষম মার। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বদ-নসিবের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই জামালুদ্দীনের সঙ্গেই শাদি দিলেন মেয়ের।

কিন্তু জামাল ছেলেটি বড় তেরিয়া। লাল মিঞার ইচ্ছে ছিল ওকে তিনি ঘরজামাই করবেন। তাঁর নিজের পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলের মধ্যে ছেলেটাই সবচেয়ে কমজোরি। প্রায়ই সে কাশির অসুখে ভোগে। কিন্তু জামাল রাজি হল না, সে তার স্বাধীন ফলের ব্যবসায় ফিরে যেতে চায়। শেষকালে এমন হল, শ্বশুরে জামাইতে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

বিয়ের পাঁচ বছর পর জামালুদ্দীন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ফলের দোকানের আড়ালে সে শুরু করেছিল বন্দুক পিস্তলের চোরা চালানি কারবার। কাছেই বর্ডার, এখানে ওই সব কারবারের অনেক সুবিধে আছে। বিপদও আছে এই কাজে, কিন্তু এক একজন মানুষ বিপজ্জনক জীবন কাটাতেই চায়। জামালের চওড়া বুক, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, সে এই পৃথিবীতে হেরে যাবার জন্য আসে নি, সে চায় যতটা সম্ভব ভোগ করে নিতে।

জয়বাংলা হবার সময় তার কাজ কারবারে খানিকটা অসুবিধে হল। বন্দুক-পিস্তলের তখন জলের দাম। একটা মাসকট একশো টাকায় সেধে সেধে বিকোয়, তিনশো টাকায় এল এম জি। কয়েক বছর পর অবস্থা একটু বদলাবার পর সে বেচাকেনা করতে লাগলো পাইপগান। খুব সস্তার মাল হলেও এতে ঝুঁকি কম, এর বাজার সব সময় তেজি থাকে।

কিছুদিনের জন্য সে মাছের ব্যবসাতেও নেমেছিল। কিন্তু এই নিয়ে তার শ্বশুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। গণি খান চৌধুরী লাল মিঞার বিশেষ দোস্ত। লাল মিঞাও কিছুদিন আগে জলকর নিয়েছেন। এখানকার ভেড়িয়াওয়ালারা নিজেদের স্বার্থেই বাংলাদেশ থেকে মাছের স্মাগলিং আটকাতে চায়। নইলে তাদের মাছের দর নেমে যায় যখন তখন। এদের হাতে আছে থানা পুলিশ। জামালুদ্দীন এখানে হেরে গেল।

মাঝে মাঝে ছোটখাটো মারামারিতে জড়িয়ে পড়তো জামালুদ্দিন। তার অসীম সাহস। এইরকম কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামায় সে হঠাৎ প্রাণ হারাতে পারতো, কিন্তু সে মারা গেল মাত্র সাত দিনের জ্বরে। মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে দেখা দিল কী এক নতুন রোগ, আর সেই রোগেই সুস্থ সবল মানুষটি মরে গেল দাপিয়ে দাপিয়ে। এক শীতের রাত্রে। ঘরে তখন তার তিনটে বাচ্চা আর যুবতী স্ত্রী।

জামালুদ্দীনের জমা টাকা পয়সা বা বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। ফলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথে বসতে হল হাসিনাকে। তার সোমত্থ যৌবনের জন্যই বাড়িতে শুরু হল চিল-শকুনের উপদ্রব।

লাল মিঞা বাধ্য হয়েই মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। মেয়েটার কথা মন থেকে তিনি বাদই দিয়েছিলেন,

কিন্তু ওই মেয়ে যদি হাসনাবাদের বাজারে গিয়ে নাম লেখায়, তাহলে সবাই তো বলবে, দ্যাখো, দ্যাখো লাল মিঞার মেয়ে রেন্ডি হয়েছে!

লাল মিঞা মেয়ের ঘরে গিয়ে বললেন, বাক্স বিছানা গুছিয়ে নে। আজই যাবি আমার সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে কিলবিল করছে তিনটি বাচ্চা। লাল মিঞা ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে কোথায় নিয়ে যাবি, ওদের এখানে রেখে যা!

হাসিনা বাপের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আব্বা, ওদের আমি কোথায় ফেলে যাবো, ওদের আমি নিজের পেটে ধরিচি। ওদের আর কে আছে?

লাল মিঞা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, গিয়াসের নিজের লোক কেউ নেই? তারাই ওদের দেখবে। ওরা আমার কেউ নয়।

হাসিনা বললো, সে মানুষটার তো আপনার জন আর কেউ ছিল না। আছে শুধু এক বুড়ি দাদি, সে চোখে দেখে না ভালো, তার নিজেরই খাবার জোটে না, সে কোথা থেকে ওদের খেতে দেবে?

লাল মিঞা বললেন, তাহলে ওদের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যা। অমন কত বাচ্চা রাস্তায় থাকে।

ঘরের এক কোণে বসে জুলজুল করে চেয়ে দেখছে তিনটে বাচ্চা। তিনজনেরই এসব কথা বুঝতে পারার বয়েস হয়ে গেছে।

লাল মিঞা রাগ করে মেয়েকে না নিয়েই ফিরে এলেন। যাক ওরা জাহান্নমে যাক।

খিদের জ্বালা সইতে না পেরে একদিন হাসিনা নিজেই ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে এসে উপস্থিত হল বাপের বাড়িতে। তার নিজের মা বেঁচে নেই, কেঁদে পড়লো ছোট আম্মার পায়ের ওপর।

লাল মিঞা প্রথমে এক চোট খুব হম্বিতম্বি করলেন। ও মেয়ের মুখ দর্শনও করতে চাইলেন না। কিন্তু তার ছোটবিবি নাজমা যখন বললেন আহা এয়েছে যখন ফেলেতো দিতে পারবে না! বরং খালপাড়ে যে পাট রাখার ঘরটা বানিয়েছিলে, সেটা তো এখন খালি, সেখানে গিয়ে থাকুক—অমনি লাল মিঞা চটে উঠে এক ধমক দিলেন ছোট বিবিকে। কী তাঁর মেয়ে অতদূরে খাল পাড়ে একা থাকবে? শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে না?

পেয়ারা বাগানের এক কোণে একটা ঘর তুলে দিলেন লাল মিঞা। সে ঘরের অর্ধেকটা গিয়ে পড়লো রহমান সাহেবদের জমিতে। রহমান আপত্তি জানাতেই মামলা ঠুকে দিলেন লাল মিঞা আর সেই মামলার ঝোঁকে বেশ কিছুদিন মশগুল হয়ে রইলেন তিনি।

হাসিনা বাপের বাড়িতে জায়গা পেল একটি শর্তে। সে তার নিজের ভরণ পোষণ পাবে বাপের কাছ থেকে। কিন্তু ছেলেপুলেদের কিছু দেবেন না লাল মিঞা। ওরা তাঁর কেউ নয়, ওরা তাঁর দুশমনের বাচ্চা।

হাসিনা মাঝে মাঝে এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করতে যায়। তখন ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। তিনজন সব সময় থাকে একসঙ্গে। কী হ্যাংলা, কী হ্যাংলা! যেখানে যা কিছু কুড়িয়ে পায়, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয় চেটেপুটে। হাসিনা যে-সব বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেখানে ওদের যাওয়া নিষেধ। কাজের বাড়িতে তিনটে বাচ্চা ঘুরঘুর করবে, এটা কেউ পছন্দ করে না। তা ছাড়া চোর ছ্যাঁচোড়ের মতন স্বভাব, কখন কোন জিনিসটা টুক করে সরিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

লাইনের ধারে ছেলেমেয়ে তিনটেকে একদিন ভিক্ষে চাইতে দেখে লাল মিঞা প্রবল হুংকার ছাড়লেন। এই বিচ্ছুগুলো তাঁর সুনাম ধ্বংস করতে এসেছে! ওদের বাপ যে-ই হোক, লোকে তো বলবে লাল মিঞার নাতি-নাতনিরা পথে পথে ভিগ মেঙ্গে বেড়াচ্ছে।

লাল মিঞা তাঁর বিখ্যাত কান-চাপাটি চড় মারার সুযোগ পেলেন না। তাঁর হুংকার শুনে বাচ্চা তিনটে ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক দৌড়ে পালালো। লাল মিঞা বাড়িতে এসে হাসিনার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন।

সেই থেকে বাচ্চাগুলোর ভিক্ষে করা বন্ধ। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে লোকের বাড়ির আঁস্তাকুড় খুঁটে খায়। বড় ছেলেটা বেশ চতুর হয়ে উঠেছে। এক একদিন সে বাসের পেছনে চেপে চলে যায় আড়বেলে। সেখান থেকে বেড়াচাঁপার দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে টুকটাক ভিক্ষে করে আসে। এখানে লাল মিঞা দেখতে পাবে না।

তাও গাঁয়ের দুচারজন লোকের নজরে পড়ে যায়। একদিন হাসিনা বাগানে শুকনো নারকোলের বালদো কুড়োচ্ছে, সেই সময় গিয়াস তাকে বললো, ও হাসিনা তোর ছেলে জাভেদকে যে দেখলাম বেড়াচাঁপার রাস্তায় ভিক্ষে করছে? লাল মিঞার কানে গেলে যে একেবারে জবাই করে ফেলবে!

বাণবিদ্ধ পাখির মতন হাসিনা ছুটে গিয়ে পড়লো গিয়াসের পায়ের ওপর। ব্যাকুলভাবে বললো, গিয়াস ভাই, বলো না, তুমি আব্বাকে বলো না, আমি ওকে নিষেধ করে দেবো। আর যাবে না!

একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন বিছানায়। বাড়িটা নিঝুম, ছেলেরা কেউ নেই বাড়িতে। দুই ছেলের বউ নিশ্চয়ই গেছে পাড়া বেড়াতে।

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এখান থেকে দেখা যায়, তাঁর নিজের বাড়ির চৌহদ্দি, তারপর ফলবাগান, নিজস্ব পুকুর, অনেক দূর বিস্তৃত ধান জমি। সবই তাঁর নিজের জীবনে গড়া। পুকুরের ওপারে তাঁর ভাই রহিমের কাঁচা বাড়িটি যেমন আগে ছিল তেমনিই আছে।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এত করেও কী লাভ হল? সন্ধেবেলা এই যে তাঁর শরীর ছনছন করছে, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই। কেউ তাঁর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে আসবে না। শরীরে এত তাকত অথচ শরীর থাকে অনাহারে।

তিনি হতাশভাবে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। যদি এই সময় কেউ এসে পাশে বসতো, দুটো সোহাগের কথা কইতো। দুই প্রাক্তন বিবির মধ্যে একজনের কথাও গণি চৌধুরীর মনে পড়লো না, তিনি ভাবতে লাগলেন আর একজনের কথা, বড় কোমল তার মুখখানা, তার হাতের আঙুলে যেন জাদু।

হাসিনার পূর্ব ইতিহাস

ষোলো বছর বয়েসে হাসিনার চেহারা যখন ঠিক ষোলো বছরের মেয়ের মতই ছিল, সেই সময় সে এক সন্ধেবেলা লাইনের ধার থেকে মেল বাসে উঠে পালায়। হাসিনা পাকতে শুরু করেছিল তের বছর বয়েস থেকে। তার বাড়-বাড়ন্ত শরীরের জন্য পাড়ার চাচা আর দুলাভাইরা একটু গোপন ফুরসত পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। এইভাবে হাসিনার শরীর গরম হয়ে গেল। ষোলো বছর বয়েসে একটি লম্বা চওড়া ছেলে তাকে হাতছানি দিতেই সে সরে পড়লো তার সঙ্গে।

দোর্দণ্ড প্রতাপ লাল মিঞা মেয়ের খোঁজে চতুর্দিকে লোক লাগালেন। বেশি দূর নয়, হাসিনাকে পাওয়া গেল ইটিণ্ডাঘাটে। ছেলেটি সেখানে ফলের ব্যবসা করে, তার নাম জামালুদ্দীন।

লাল মিঞা ছেলেটিকে টুঁটি ধরে নিয়ে এলেন। মেয়েকে দিলেন বিষম মার। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বদ-নসিবের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই জামালুদ্দীনের সঙ্গেই শাদি দিলেন মেয়ের।

কিন্তু জামাল ছেলেটি বড় তেরিয়া। লাল মিঞার ইচ্ছে ছিল ওকে তিনি ঘরজামাই করবেন। তাঁর নিজের পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলের মধ্যে ছেলেটাই সবচেয়ে কমজোরি। প্রায়ই সে কাশির অসুখে ভোগে। কিন্তু জামাল রাজি হল না, সে তার স্বাধীন ফলের ব্যবসায় ফিরে যেতে চায়। শেষকালে এমন হল, শ্বশুরে জামাইতে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

বিয়ের পাঁচ বছর পর জামালুদ্দীন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ফলের দোকানের আড়ালে সে শুরু করেছিল বন্দুক পিস্তলের চোরা চালানি কারবার। কাছেই বর্ডার, এখানে ওই সব কারবারের অনেক সুবিধে আছে। বিপদও আছে এই কাজে, কিন্তু এক একজন মানুষ বিপজ্জনক জীবন কাটাতেই চায়। জামালের চওড়া বুক, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, সে এই পৃথিবীতে হেরে যাবার জন্য আসে নি, সে চায় যতটা সম্ভব ভোগ করে নিতে।

জয়বাংলা হবার সময় তার কাজ কারবারে খানিকটা অসুবিধে হল। বন্দুক-পিস্তলের তখন জলের দাম। একটা মাস্কেট একশো টাকায় সেধে সেধে বিকোয়, তিনশো টাকায় এল এম জি। কয়েক বছর পর অবস্থা একটু বদলাবার পর সে বেচাকেনা করতে লাগলো পাইপগান। খুব সস্তার মাল হলেও এতে ঝুঁকি কম, এর বাজার সব সময় তেজি থাকে।

কিছুদিনের জন্য সে মাছের ব্যবসাতেও নেমেছিল। কিন্তু এই নিয়ে তার শ্বশুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। গণি খান চৌধুরী লাল মিঞার বিশেষ দোস্ত। লাল মিঞাও কিছুদিন আগে জলকর নিয়েছেন। এখানকার ভেড়িয়াওয়ালারা নিজেদের স্বার্থেই বাংলাদেশ থেকে মাছের স্মাগলিং আটকাতে চায়। নইলে তাদের মাছের দর নেমে যায় যখন তখন। এদের হাতে আছে থানা পুলিশ। জামালুদ্দীন এখানে হেরে গেল।

মাঝে মাঝে ছোটখাটো মারামারিতে জড়িয়ে পড়তো জামালুদ্দিন। তার অসীম সাহস। এইরকম কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামায় সে হঠাৎ প্রাণ হারাতে পারতো, কিন্তু সে মারা গেল মাত্র সাত দিনের জ্বরে। মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে দেখা দিল কী এক নতুন রোগ, আর সেই রোগেই সুস্থ সবল মানুষটি মরে গেল দাপিয়ে দাপিয়ে। এক শীতের রাত্রে। ঘরে তখন তার তিনটে বাচ্চা আর যুবতী স্ত্রী।

জামালুদ্দীনের জমা টাকা পয়সা বা বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। ফলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথে বসতে হল হাসিনাকে। তার সোমখ যৌবনের জন্যই বাড়িতে শুরু হল চিল-শকুনের উপদ্রব।

লাল মিঞা বাধ্য হয়েই মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। মেয়েটার কথা মন থেকে তিনি বাদই দিয়েছিলেন,

কিন্তু ওই মেয়ে যদি হাসনাবাদের বাজারে গিয়ে নাম লেখায়, তাহলে সবাই তো বলবে, দ্যাখো, দ্যাখো লাল মিঞার মেয়ে রেন্ডি হয়েছে!

লাল মিঞা মেয়ের ঘরে গিয়ে বললেন, বাক্স বিছানা গুছিয়ে নে। আজই যাবি আমার সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে কিলবিল করছে তিনটি বাচ্চা। লাল মিঞা ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে কোথায় নিয়ে যাবি, ওদের এখানে রেখে যা!

হাসিনা বাপের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আব্বা, ওদের আমি কোথায় ফেলে যাবো, ওদের আমি নিজের পেটে ধরিচি। ওদের আর কে আছে?

লাল মিঞা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, গিয়াসের নিজের লোক কেউ নেই? তারাই ওদের দেখবে। ওরা আমার কেউ নয়।

হাসিনা বললো, সে মানুষটার তো আপনার জন আর কেউ ছিল না। আছে শুধু এক বুড়ি দাদি, সে চোখে দেখে না ভালো, তার নিজেরই খাবার জোটে না, সে কোথা থেকে ওদের খেতে দেবে?

লাল মিঞা বললেন, তাহলে ওদের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যা। অমন কত বাচ্চা রাস্তায় থাকে।

ঘরের এক কোণে বসে জুলজুল করে চেয়ে দেখছে তিনটে বাচ্চা। তিনজনেরই এসব কথা বুঝতে পারার বয়েস হয়ে গেছে।

লাল মিঞা রাগ করে মেয়েকে না নিয়েই ফিরে এলেন। যাক ওরা জাহান্নমে যাক।

খিদের জ্বালা সইতে না পেরে একদিন হাসিনা নিজেই ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে এসে উপস্থিত হল বাপের বাড়িতে। তার নিজের মা বেঁচে নেই, কেঁদে পড়লো ছোট আম্মার পায়ের ওপর।

লাল মিঞা প্রথমে এক চোট খুব হম্বিতম্বি করলেন। ও মেয়ের মুখ দর্শনও করতে চাইলেন না। কিন্তু তার ছোটবিবি নাজমা যখন বললেন আহা এয়েছে যখন ফেলেতো দিতে পারবে না! বরং খালপাড়ে যে পাট রাখার ঘরটা বানিয়েছিলে, সেটা তো এখন খালি, সেখানে গিয়ে থাকুক—অমনি লাল মিঞা চটে উঠে এক ধমক দিলেন ছোট বিবিকে। কী তাঁর মেয়ে অতদূরে খাল পাড়ে একা থাকবে? শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে না?

পেয়ারা বাগানের এক কোণে একটা ঘর তুলে দিলেন লাল মিঞা। সে ঘরের অর্ধেকটা গিয়ে পড়লো রহমান সাহেবদের জমিতে। রহমান আপত্তি জানাতেই মামলা ঠুকে দিলেন লাল মিঞা আর সেই মামলার ঝোঁকে বেশ কিছুদিন মশগুল হয়ে রইলেন তিনি।

হাসিনা বাপের বাড়িতে জায়গা পেল একটি শর্তে। সে তার নিজের ভরণ পোষণ পাবে বাপের কাছ থেকে। কিন্তু ছেলেপুলেদের কিছু দেবেন না লাল মিঞা। ওরা তাঁর কেউ নয়, ওরা তাঁর দুশমনের বাচ্চা।

হাসিনা মাঝে মাঝে এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করতে যায়। তখন ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। তিনজন সব সময় থাকে একসঙ্গে। কী হ্যাংলা, কী হ্যাংলা! যেখানে যা কিছু কুড়িয়ে পায়, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয় চেটেপুটে। হাসিনা যে-সব বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেখানে ওদের যাওয়া নিষেধ। কাজের বাড়িতে তিনটে বাচ্চা ঘুরঘুর করবে, এটা কেউ পছন্দ করে না। তা ছাড়া চোর ছ্যাঁচোড়ের মতন স্বভাব, কখন কোন জিনিসটা টুক করে সরিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

লাইনের ধারে ছেলেমেয়ে তিনটেকে একদিন ভিক্ষে চাইতে দেখে লাল মিঞা প্রবল হুংকার ছাড়লেন। এই বিচ্ছুগুলো তাঁর সুনাম ধ্বংস করতে এসেছে! ওদের বাপ যে-ই হোক, লোকে তো বলবে লাল মিঞার নাতি-নাতনিরা পথে পথে ভিগ মেঙ্গে বেড়াচ্ছে।

লাল মিঞা তাঁর বিখ্যাত কান-চাপাটি চড় মারার সুযোগ পেলেন না। তাঁর হুংকার শুনে বাচ্চা তিনটে ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক দৌড়ে পালালো। লাল মিঞা বাড়িতে এসে হাসিনার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন।

সেই থেকে বাচ্চাগুলোর ভিক্ষে করা বন্ধ। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে লোকের বাড়ির আঁস্তাকুড় খুঁটে খায়। বড় ছেলেটা বেশ চতুর হয়ে উঠেছে। এক একদিন সে বাসের পেছনে চেপে চলে যায় আড়বেলে। সেখান থেকে বেড়াচাঁপার দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে টুকটাক ভিক্ষে করে আসে। এখানে লাল মিঞা দেখতে পাবে না।

তাও গাঁয়ের দুচারজন লোকের নজরে পড়ে যায়। একদিন হাসিনা বাগানে শুকনো নারকোলের বালদো কুড়োচ্ছে, সেই সময় গিয়াস তাকে বললো, ও হাসিনা তোর ছেলে জাভেদকে যে দেখলাম বেড়াচাঁপার রাস্তায় ভিক্ষে করছে? লাল মিঞার কানে গেলে যে একেবারে জবাই করে ফেলবে!

বাণবিদ্ধ পাখির মতন হাসিনা ছুটে গিয়ে পড়লো গিয়াসের পায়ের ওপর। ব্যাকুলভাবে বললো, গিয়াস ভাই, বলো না, তুমি আব্বাকে বলো না, আমি ওকে নিষেধ করে দেবো। আর যাবে না!

গিয়াস সস্নেহে তাকে টেনে তুলে বললেন, আরে না না, আমি বলবো না। তুই কি আমার পর? তবে গাঁয়ে কতরকম লোক আছে, কে কখন কথাটা লাল মিঞার কানে তুলে দেবে—তাই তোকে সাবধান করে দিলাম।

সেই সুবাদে গিয়াস হাসিনার বুকে হাত বুলিয়ে নিল ভালো করে। এবং পরদিন কথায় কথায় সেই কথাটা জানিয়ে দিল লাল মিঞাকে। সেবার জাভেদ পার পায় নি, বেধড়ক মার খেয়ে বিছানায় পড়েছিল দুদিন।

লাল মিঞা একদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, তুই আবার নিকে কর, আমার হাতে ভালো পাত্তর আছে।

হাসিনা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ সে রাজি।

লাল মিঞা বললেন, বাজিতপুরের রজব আলির ছেলে শামসের, খুব বুঝদার মানুষ, লরির ব্যবসা করে, অবস্থা ভালো, তার সঙ্গে কথা বলি?

হাসিনা আবার ঘাড় নাড়লো।

—এই অ্যান্ডা-বাচ্চাগুলোর ব্যবস্থা আমি করবো। ওদের আমি পাঠিয়ে দেবো।

—ওরা কোথায় যাবে? ও আব্বা, ওরা তো আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে নে!

—ওরা তোর সঙ্গে যাবে নাকি? তুই পাগল হয়েছিস?

—কেন, বাজিতপুরের সেই মানুষ ওদের নেবেন না?

—কেউ নেয়? তিনটে গেঁড়ি গেঁড়ি বাচ্চা সমেত কেউ বউ ঘরে আনে?

—তা হলে ওদের কোথায় ফেলে যাবো? ওরা যে আমার পেটের সন্তান!

লাল মিঞা এমনভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি এরকম একটি অদ্ভুত নির্বোধ প্রাণী কখনো দেখেন নি। বাড়িতে বেড়ালের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা বেশি হলে লোকে দূরে পার করে দিয়ে আসে না? এই বাচ্চাগুলোকে একদিন শিয়ালদা স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে এলে আর কোনোদিন ওরা এ জায়গা খুঁজে পাবে না। সেখানে ওরা ভিক্ষে করুক আর যাই করুক কেউ তো জানতে যাচ্ছে না।

এই মেয়েকে নিকে করার জন্য অনেকেই রাজি। মেয়ের যৌবন আছে, গুণ আছে। এখনো ও ইচ্ছে করলেই সাধ আহ্লাদ মিটোতে পারে। শুধু ওই গেন্ডিগুলোর জন্যে।

হাসিনা আবার কেঁদে ভাসালো। না, ওদের ছেড়ে সে কোথাও নিকে বসতে পারবে না। তারই পেটের নাড়ি কেটে যে ওদের এ পৃথিবীতে আনা হয়েছে।

উপকারী সামসুল

পাশাপাশি দুখানি গাঁয়ের জন্য একটা প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুল পেরিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র বারোটি ছেলে বড় স্কুলে পড়তে গেছে। তার মধ্যে বদরুদ্দীন শেখের ছেলে সামসুল হক বি-এ পাস দিয়েছে। ভারি ধীর-স্থির বুদ্ধিমান।

লাইনের ধারে চায়ের দোকানে বসেছিল সামসুল। এমন সময় ধর, ধর, গেল, গেল রব উঠলো একটা। সবাই ছুটে বাইরে এলো। বিকট শব্দে একটা এক্সপ্রেস বাস ব্রেক কষেছে। তার সামনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে। এই বাসটা যদি ওকে চাপা দিয়ে যেত, তবু ড্রাইভারের কোনো দোষ দেওয়া যেত না। শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষায় ড্রাইভারের সমস্ত অনুভূতি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। সে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে প্রথমে ওইটুকু মেয়েকেই এক চড় কষালো। পরক্ষণেই সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো খুব।

সামসুল জিজ্ঞেস করলো, কার মেয়ে?

পাশে দাঁড়ানো একজন জবাব দিল, লাল মিঞার নাতনি।

সামসুল বললো, এই সন্ধেবেলা ওইটুকু মেয়ে বড় রাস্তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে?

একজন বললে, ওরা তো এইখেনেই থাকে। ওই দ্যাখো না, ওর দুই ভাইও রয়েছে কাছে।

আর একজন বললো কড়া জান বটে। অন্য কোনো বাচ্চা হলে ঠিকই চাপা পড়তো। কিন্তু হাসিনার ছেলেমেয়েদের কিছুই হয় না। মনে আছে, গত বছর জাভেদকে সাপে কামড়ালো কিন্তু ও ছোঁড়া ঠিক বেঁচে গেল! অ্যাঁ, তোমার আমার ঘরের ছেলেপুলে হলে বাঁচতো? অ্যাঁ?

অন্য দুজন অকারণে হেসে উঠলো।

সামসুলের মুখে ছড়িয়ে পড়লো একটা পাতলা দুঃখের ছায়া। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সেই মানুষের জীবনের দামও এত তুচ্ছ হয়! একটা বাচ্চা মেয়ে এইমাত্র মরতে মরতে বেঁচে গেল, আর সেই উপলক্ষে এই লোকেরা হাসছে।

সামসুল একা এগিয়ে গিয়ে বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে সরিয়ে আনলো ভিড় থেকে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে

দিয়ে বললো, এরকম আর কক্ষনো করো না। বড় রাস্তা দিয়ে এরকম দৌড়োদৌড়ি করতে নেই। তোমার নাম কী খুকি?

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে কী যে বললো কিছুই বোঝা গেল না।

এবার ঘাড় নিচু করে আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী?

এবার মেয়েটি মিনমিন করে বললো, নাহারুন্নেছা।

—চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ওর আর দু'ভাই কাছেই ঘুরঘুর করছিল। তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, আসেন না, আমাদের বাড়ি, রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

সন্ধের পর যে-কোনো সম্পন্ন লোকের হাতেই টর্চ থাকে। সামসুলের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে জাভেদ আগে আগে দৌড়লো।

হাসিনার ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে কেরোসিনের কুপি। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি। সেই আলোতেই বসে হাসিনা ব্লাউজ সেলাই করছিল, ব্লাউজটা তার গা থেকে এইমাত্র খুলেছে। পুরুষ মানুষ দেখে তাড়াতাড়ি শাড়িটা ভালো করে বুকে জড়ালো।

গ্রাম সম্পর্কে পরস্পর মুখ চেনা। সামসুল বললো, তোমার নাম হাসিনা না? তুমি ছেলেমেয়েদের এইভাবে রাস্তায় ছেড়ে দাও কেন?

জাভেদ সোৎসাহে শোনালো দুর্ঘটনা-নাটকটির বিবরণ। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে তবু এটা একটা ঘটনা। হাসিনা মেয়েকে কোলে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সামসুলকে বললো, আপনাকে কোথায় বা বসতে দেবো... আমার কপাল পোড়া...আমার ছেলেমেয়েগুলোকে কেউ ভালোবাসে না..

সামসুল মাটির দাওয়ার বসে শুনলো হাসিনার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী। পেয়ারা বাগানের মাথায় তারকা খচিত আকাশ। পুকুরের জলে খুব জোরে টিপ করে শব্দ হলো। বোধহয় তাল পড়লো একটা।

সামসুল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কবে যে এই সমাজের উন্নতি হবে। এত অবিচার, এত অন্যায় এত কুসংস্কার। তবু কিছু তো চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেককেই।

সে ছোটখাটো একটি বক্তৃতা শোনালো হাসিনাকে। এইভাবে চললে তো তার দুঃখ কোনোদিন ঘুচবে না। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়াও শিখছে না। ওরা বড় হলে কী কাঙালি হবে? একবার সাপের কামড় বা একবার বাস চাপা থেকে বাঁচলেও কি আর বারবার বাঁচবে? বরং ওরা যদি মানুষ হয়, তবে ওরাই একদিন হাসিনার দুঃখ ঘুচবে।

হাসিনা জাভেদকে দেখিয়ে বললো, ওটা দুকেলাস পর্যন্ত পড়েছিল। এখন আর কোথায় বা পড়বে, কেই বা পড়াবে।

সামসুল বললো 'ওটা' বলতে নেই। নিজের ছেলে....বা যে-কোনো মানুষ সম্পর্কেই ওরকম ভাবে কথা বলতে হয় না। আর তুমিই বা এত কম আলোয় সেলাই নিয়ে বসেছিলে কেন? চোখটা যে যাবে। দিনের বেলা সেলাই করতে পারো না?

এরপর মাঝে মাঝেই সামসুল আসতে লাগলো হাসিনার কাছে। সারাদিন সে ব্যস্ত থাকে, সদ্য কাজ পেয়েছে পোস্ট অফিসে, তাই আসে সন্ধের পর। জাভেদের জন্য সে এনেছে বই-খাতা, ছোট মেয়েটির জন্য একটা ফ্রক।

দিন পনেরোও কাটলো না, এর মধ্যেই লাইনের ধারের চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠলো। একদিন সামসুল সেখানে ঢুকে পড়ে শুনলো, সেদিনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সে নিজে। একজন টিপ্পনি কেটে বললো, ও সামসুল মিঞা, কেমন জমেছে? হাসিনা বিবির চোখে জাদু আছে তাই না? দেখো, যেন তোমার বিবির কানে কথাটা না যায়?

সামসুলের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার নিজের শাদি হয়েছে মাত্র দেড় বছর আগে। কলেজে পড়া মেয়ে। সে কেন একটা গেঁয়ো বিধবার সঙ্গে অন্যায় কাজ করতে যাবে?

দুতিনজন একসঙ্গে বললো, আহা-হা কী কথাই বললে? নিজের ঘরে বউ থাকলেও বুঝি লোকে অন্য মাগি খোঁজে না? তা হলে তো দুনিয়াটাই বদলে যেত। দেখো, সাবধান, লাল মিঞা যদি টের পায়, তবে জোর করে নিকে দিয়ে দেবে কিন্তু। তখন ওই তিনটে বাচ্চা সমেত ঘরে তুলতে হবে হাসিনাকে।

সামসুল তর্ক করলো ঝগড়া করলো, রাগ করে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। কিন্তু পরদিন থেকে সে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তাকে নিয়ে সাত নম্বর হলো—যারা নানা কারণে হাসিনাকে সাহায্য করতে গিয়ে পিছিয়ে গেছে আবার।

আমবাগানে

হাসিনা একবারে পড়ে গেল গণি চৌধুরীর মুখোমুখি। রোজ ভোরবেলা তিনি নিজের বাগান পরিদর্শনে আসেন।

হাসিনার হাতে এক থোকা কাঁচা আম। তাড়াতাড়ি সেটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলে সে চৌধুরী সাহেবের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলো।

গণি চৌধুরীর কিছুই চোখ এড়ায় না। হাসিনা উঠে দাঁড়াবার পর তিনি তার থুতনি ছুঁয়ে বললেন, আহা, ভালো হোক, মঙ্গল হোক। কটা আম নিলি রে?

হাসিনা ধড়ফড় করে উঠে বললো, ও চাচা আমি গাছ থেকে নিইনি, মাটিতে পড়ে ছেল, বিশ্বাস করেন, ও চাচা—

গণি চৌধুরী সস্নেহে বললেন, আহা তাতে কী হয়েছে, নিয়েছিস নিয়েছিস। বেশ করেছিস।

হাসিনার থুতনিটা তুলে ধরবার সময় তিনি দেখেছেন ওর টলটলে দুটি চোখ। ঠিক যেন গহিন কালো দিঘির জল। তা দেখেই তাঁর মনটা নরম হয়ে গেছে।

তিনি আবার বললেন, দেখি, কটা নিয়েছিস? ভয় পাচ্ছিস কেন?

হাসিনা আঁচ... তলা থেকে হাত বার করবার সময় সেই ফাঁকে গণি চৌধুরী দেখতে পেলেন তার বুক। ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে। আরও নরম হলো তার মন।

তিনি বললেন, মোটে চারটে? এ আর এমন কি।

হাসিনা বললো, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু টক রেঁধে দেবো—ওরা বড্ড জ্বালায়, আমি বলে দিয়েছি, খবর্দার চুরি করবি নে, নিতে হয় আমি নিজে আনবো, চাচার ঠেঙে চেয়ে নেবো।

গণি চৌধুরী বললেন, ঠিকই তো, দরকার হলে আমার কাছে আসবি, তোর লজ্জা কী...আরও নিবি?

শখ করে তিনি গোলাপখাসের কলম লাগিয়ে ছিলেন, এই আম ঠিক কাঁচা অবস্থায় টক রেঁধে খাবার জন্য নয়। তবু তিনি নিজের হাতে সেই ছোট গাছের ডাল থেকে আট দশটা আম ছিঁড়ে নিয়ে বললেন নে, আঁচল পাত।

হাসিনা গা মুচড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। গণি চৌধুরী সুন্দর করে হেসে বললেন, নে, আঁচল পাততে লজ্জা করছিস কেন?

হাসিনা আঁচল খুলতেই গণি চৌধুরী তার বুকের দিকে চেয়ে থেকে আমগুলো ঢেলে দিলেন। তারপর হাসিনা যখন পুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত সেই সময় তিনি ওর পিঠে হাত রেখে কাছে আকর্ষণ করে বললেন, কী, খুশি তো?

হাসিনা উঁ উঁ শব্দ করলো।

গণি চৌধুরীর হাত স্বাধীন হয়ে গিয়ে নড়াচড়া করতে লাগলো যেখানে সেখানে। এর পর আর মাত্র দুমিনিট লাগলো মাটিতে শুয়ে পড়তে। এত ভোরে কাকপক্ষীও জাগেনি। জাগলেও কেউ আমবাগানের দিকে আসবে না। হাসিনার কোঁচড় থেকে আমগুলো গড়িয়ে গেল.....সে অনবরত শব্দ করতে লাগলো উঁ উঁ উ।

ব্যাপারটা শেষ হবার পর গণি চৌধুরীর একই সঙ্গে প্রবল উল্লাস এবং দারুণ ভয়ের অনুভূতি হল। উল্লাস এই কারণে যে এই বয়সেও তাঁর পৌরুষ অক্ষুণ্ণ আছে। মনে মনে একটা চাপা ভয় ছিল হয়তো পারবেন না কিন্তু তিনি পেরেছেন। আর ভয় এই জন্য যে সমাজের একটা গণ্যমান্য লোক হয়ে তিনি এটা কী করে বসলেন? কথাটা যদি কোনক্রমে লাল মিঞার কানে ওঠে? লাল মিঞা তাঁর দোস্ত, হাসিনা তাঁর মেয়ের বয়েসি।

ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে এলো অনুশোচনা। হঠাৎ কেন তাঁর মাথা ঘুরে গেল? বেওয়ারিশ মেয়েমানুষ দেখলেই বুঝি মানুষের মনে এরকম দুষ্টু বুদ্ধি জাগে? প্রায়ই তিনি হাসিনার কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু সে মনের কথা মনের মধ্যেই ছিল। হঠাৎ এই ভোরবেলা...ছি ছি ছি ছি...যদি তাঁর ছেলেরা একবার শুনতে পায়, মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে সবার সামনে।

একবার তিনি ভাবলেন যা হবার হয়েছে। কী আর করা যাবে। যদি জানাজানি হয়ই, তিনি নিকে করবেন হাসিনাকে এরকম একটা বিবি পেলে তিনি এখনো বিশ বছর বাঁচতে পারবেন হেসে খেলে। কিন্তু হাসিনার ওই তিনটি ছেলেমেয়ে রয়েছে...না, না, সম্ভব না, তাঁর নিজের ছেলেরা কিছুতেই রাজি হবে না, বিষয় সম্পত্তি সব তছনছ হয়ে যাবে। ওরে বাবারে, না না...।

শাড়ি টাড়ি সামলে হাসিনা উদাসীন দৃষ্টি মেলে বসে আছে। হাঁটুর ওপরে থুতনি। গণি চৌধুরী তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললেন, ও হাসিনা এ কথা কারুকে বলিস না রে, তোর ছেলে মেয়েদের আমি দেখবো, তোকে অনেক জিনিস দেবো, কারুরে বলবি না। কিরে কেটে বল, ও হাসিনা, দেখিস, যদি কেউ শোনে, আমাকে দোজখে যেতে হবে।

গণি চৌধুরী এমন আকুলি বিকুলি করতে লাগলেন যে হাসিনা বলে উঠলো না, চাচা, কাকে কবো একথা? আমার দোষ নেবেন না, আমি বড় হতভাগিনী...

—তোকে আমি দেখবো, হাসিনা, তুই শুধু আমার মান রাখিস, কেউ যেন টের না পায়।

—না, চাচা, কেউ না।

—আমি যাই।

গণি চৌধুরী দ্রুতপদে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

হাসিনা আরও কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলো। কত রকম কথা মনে পড়ছে তার। মনে পড়লো জামালুদ্দীনের কথা। ছেলেমেয়ে তিনটের কথা। হাসিনার কি গুনাহ হলো? গণি চাচা কত বড় একটা মানী লোক, তিনি যখন ইচ্ছে করলেন, হাসিনার মতন সামান্য একটা মেয়ে কি না বলতে পারে? সেটা একটা আস্পর্ধা হয়ে যায় না! আর এ কথা সে কাকেই বা জানাবে, তার কসবী বলে নাম রটে যাবে না?

এইরকম আর একটা ব্যাপার হয়েছিল মাসখানেক আগে। রহমান সাহেবের বন্ধু মীজানুর, যে শহর থেকে আসে। মীজানুর না যেন মজনু। লায়লা-মজনু যাত্রার ঠিক মজনুর মতন চেহারা। সে একদিন দুপুরবেলা চুপে চুপে বলেছিল, এতদিন আমি শাদি করিনি, হাসিনা, এবার তোমাকে দেখে আমার সেই ইচ্ছে জেগেছে। আমার মাকে বলেছি না। মা ওই বাচ্চাগুলোর জন্য রাজি হচ্ছেন না। কিন্তু আমি পছন্দ করি তোমার বাচ্চাদের, আমি ওদেরও নিয়ে যাবো, লেখাপড়া শিখবে মাকে যদি রাজি করাতে পারি।

রহমান ভাই নিচতলায় তাঁর স্ত্রী পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওপরের ঘরে মীজানুর সাহেব একা। এক গেলাস পানি দিতে এসে হাসিনা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে এই কথাশোনো।

—অত দূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন হাসিনা। কাছে এসো, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।

কী সুন্দর করে কথা বলেন মীজানুর সাহেব। মানুষটা সত্যি ভালো। আজকাল প্রায় ফি-সপ্তাতেই ইনি আসেন রহমান ভাইয়ের সঙ্গে। আজ সকালে হাসিনা নিজে দেখেছে যে বারো শরিকের দিঘি থেকে স্নান করে আসবার পথে মীজানুর সাহেব তার মেয়ে নাহার-এর গাল টিপে আদর করে দিলেন। আহা রে! এ গাঁয়ের কেউ তো হাসিনার ছেলেমেয়েদের ছুঁতেই চায় না, সবাই দূর ছাই করে। মীজানুর সাহেব কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করলেন নাহারকে।

যে-ভাবে সকালবেলা মেয়েকে আদর করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই দুপুরে মাকে আদর করতে শুরু করলেন মীজানুর সাহেব। হাসিনা লজ্জা পেয়ে সরে গিয়েছিল।

মীজানুর বললো, চলে যাচ্ছো কেন হাসিনা? এসো, কাছে এসে বসো! তুমি কী মিষ্টি!

এই কথাটা শুনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে হাসি উঠে এসেছিল হাসিনার বুক থেকে। পুরুষ মানুষের মুখে সে অনেক রকম কথা শুনেছে, সে সুন্দর, সে পটের বিবি, সে লক্ষ্মী সোনা, সে দিনকি মোহিনী রাতকি বাঘিনী কিন্তু মিষ্টি? একথা তো কেউ কখনো বলেনি। শহরের লোক এরকমভাবে কথা বলে। মীজানুর সাহেব কত লেখাপড়া জানেন।

মীজানুরের চুমুতে কী সাঙ্ঘাতিক উত্তাপ! বাহুতে প্রবল জোর। আনন্দে অবশ হয়ে যেতে যেতেও হাসিনা বলে, আমায় ছেড়ে দিন, কেউ এসে পড়বে—আমায় বকবে, আ...র আবার সর্বনাশ হবে।

—কেউ আসবে না।

সেদিনও হাসিনা খুব জোর করে বাধা দিতে পারেনি। মীজানুর সাহেব কত জ্ঞানীগুণী লোক, শহরে বড় চাকরি করেন। শহরে পয়সা ফেললেই কত সিনেমা থিয়েটারের খুপসুরত মেয়েদের বগলদাবা করে নিয়ে ঘোরা যায়, সেই সব ফেলে সেই মানুষটা হাসিনার মতন সামান্য একটি মেয়েকে আদর করতে চাইছেন, সেই সময় বাধা দিতে যাওয়াটা ছোটো মুখে বড়ো কথার মতন হয়ে যায় না? তা ছাড়া মীজানুর সাহেব বারবার বলছিলেন, তুমি ভয় পাচ্ছো কেন হাসিনা, আমি তো তোমাকে বিয়ে করবো, তোমার ছেলেমেয়েদের সুদ্ধ নিয়ে যাবো, মাকে একটু রাজি করাতে পারলেই...

আমবাগানে বসে হাসিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সেটা সুখের না দুঃখের, তা অত বোঝে না হাসিনা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে গোলাপখাস কলমের গাছ থেকে আরও কতকগুলো কচি আম পেড়ে ফেললো। যেন এই আমবাগানটা তার নিজের।

পুকুরে চাঁদের ছায়া

ঘরের খুব কাছে শেয়াল ডাকলে হাসিনার ঘুম ভেঙে যায়। শেয়াল এমন জীব, ওরা চুপেচাপে কোথাও যাওয়া আসা করতে পারে না। মুর্গি চুরি করার লোভে শেয়ালগুলো গেরস্তবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে, তার মধ্যে নিজেরাই ডেকে ওঠে এক সময়। অমনি কুকুরগুলো তাড়া করে যায়। তারপর কুকুরের ঘেউঘেউ আর শেয়ালের হোক্কা হো মিলে এক বিকট শব্দ-খিচুড়ি তৈরি হয়।

হাসিনা ঘুম ভেঙে উঠে জানলা দিয়ে বলে, হুস হুস!

সেই সময় কোনো কোনোদিন রাত্রে হাসিনা দেখতে পায় সামনের পুকুরটার জলে একটা চাঁদ ভাসছে। ছেলেবেলা থেকে যখনই এরকম দেখেছে হাসিনা, অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এই দৃশ্যটা তাকে চুম্বকের মতন টানে। চারপাশে একেবারে নিঝঝুম। পুকুর ধারের নারকোল গাছগুলোর পাতায় একটুও সাড় নেই। জোছনার আলোয় পদ্মপাতাগুলোও সাদা সাদা দেখায়। পুকুরের পানি কিন্তু এখন আরও যেন মিশমিশে কালো। তার মধ্যে আপনমনে খেলা করছে একলা একটা চাঁদ।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কেন যেন হাসিনার বুক মুচড়ে আসে। সে সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদে কিছুক্ষণ।

আবার শুতে আসবার সময় সে ছেলেমেয়েগুলোকে একবার দেখে। মাটিতে কাঁথা পেতে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা তিনজন। জাভেদ, সিরাজ আর নাহার। গভীর ঘুমের মধ্যেও ওরা চটাপট হাত চালিয়ে মশা মারছে মাঝে মাঝে। ভীষণ মশা। আগের মশারিটা ছিঁড়ে গেছে সেই কবে! কে আর নতুন মশারি দেবে?

বাইরের আকাশে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে ওদের মুখে। এখন পৃথিবীর আর কোনো শিশুর মুখের সঙ্গে ওদের মুখের ঘুমের সারল্যের কোন তফাত আছে? এখন কি কেউ দেখে বলবে, ওরা হতভাগ্য?

সারাদিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসিনার বিশেষ দেখাই হয় না। হাসিনা কাঠ-কুটো কুড়োয়, ঘুঁটে-গুল দেয়, পরের বাড়িতে কাজ করতে যায়। ছেলেমেয়েরা কুকুর-ছাগলের মতন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। লাল মিঞার মূল বাড়ির দিকে গেলেই ছোট বিবির কাছ থেকে লাথি ঝাঁটা খেতে হয় ওদের। এই তো গত শনিবার বাণপুরের হাটে সিরাজটা একটা ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেই পাঁচ-ছ মাইল দূরে বাণপুরে হাট, সেখানে ওরা হেঁটে হেঁটে গেছে। হাসিনা এত বারণ করে তবু ওরা কথা শোনে না। সন্ধের পর খিদে পেলে তখন ঠিক বাড়িতে ছুটে আসবে।

সামান্য যা খাবার থাকে, তাই ভাগ করে চেটেপুটে খেয়ে, তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক হাসিনা ঠিক একটি বিড়ালি-মাতার মতন ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলে। সবাই হুটোপুটি করে ঘরের মধ্যে। এমনকি জাভেদটা এখন এত বড় হয়ে গেছে, সেও দস্যিপনা করে মায়ের সঙ্গে। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই।

হাসিনা ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আস্তে আস্তে। তার ইচ্ছে হলো, ছেলেমেয়েগুলোকে ডেকে তুলে আবার খেলা করে এখন। অমন আনন্দ হাসিনা আর কিছুতে পায় না।

হাসিনার শরীরে ভরা নদীর মতন যৌবন, তবু এই ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সে কক্ষনো কোনো নতুন সোয়ামির বাড়িতে সুখ ভোগ করতে যাবে না।

হাসিনা আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো, সম্মোহিতভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে পুকুরের পানিতে একলা একলা চাঁদের খেলা। ও চাঁদ, তুমি কত সুখী। তোমাকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না!

সুখেন্দুবাবু

নিম্ন আদালতে লাল মিঞার হার হল। জমির অধিকার তিনি পেলেন না। পেয়ারা বাগানের সবটা তাঁর নয়। অর্থাৎ হাসিনার ঘরটা ভেঙে দিতে হবে। অবশ্য এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন লাল মিঞা। তিনি লড়বেন, তিনি বড় আদালতে যাবেন। ইতিমধ্যে তিনি দুটি পাল্টা মামলা রুজু করেছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি মেয়ের ওপর চটে গেলেন আবার। মেয়েটা অপয়া, নইলে গত পনেরো বছরের মধ্যে লাল মিঞা কখনো কোনো মামলায় হারেন নি, এই প্রথম তাঁকে হার স্বীকার করতে হল। এ যে কত বড় অপমান তা মেয়েছেলেরা বুঝবে না। এ তো শুধু দু পাঁচশো টাকার ব্যাপার নয়!

লাল মিঞা হাসিনাকে ডেকে সাফ বলে দিলেন, সে যদি কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পছন্দ করা পাত্রকে নিকে করতে রাজি না হয়, তা হলে তিনি আর ওর খোরাকি জোগাতে পারবেন না। কানাখোঁড়া নয়, রোগাভোগা নয়, বয়েসকালের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, এমন মেয়ে কেন নিকে বসবে না? এমন মেয়েকে কোনো বাপ সারাজীবন বসে বসে খাওয়ায়, এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে? তা ছাড়া দিনকাল এখন খারাপ।

দিনকাল সত্যিই খারাপ। পাটের দর এ বছর হু হু করে পড়ে গেছে। ভেড়িতে মাছের আকাল। মাজরা পোকা লেগে ধান একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে। কারুর মুখে এবার হাসি নেই। গ্রামের চাষিদের মধ্যে যে মানুষটি সবচেয়ে হাসিখুশি সেই রহিম চাচার কপালেও এবার তিনটে ভাঁজ পড়েছে। মাঠের যে-কোনো ফসলই রহিম চাচার কাছে সন্তানের মতন, এবারের রুগ্ন জীর্ণ ধানক্ষেত দেখে তিনিও কপালে হাত দিয়ে বসেছেন, হা আল্লা!

যে-সব বাড়িতে একজন দু'জন চাকুরে লোক আছে, শুধু তারাই এবার তেমন ধাক্কা খায়নি। চাকরির বাঁধা মাইনেটা তো আছেই। রহমান সাহেবের বাড়িতে প্রতি শনি-রবিবার বন্ধুবান্ধব এলে হাসিনার ডাক পড়তো কাজের জন্য। তখন হাসিনা চাট্টি বেশি করে রঙিন ভাত আর গোস্ত নিয়ে আসতো ছেলেমেয়েদের জন্য। তা রহমান সাহেবও

কয়েক মাস বাড়ি আসছেন না। তার বউয়ের বাচ্চা হয়েছে, সে আছে এখন জয়নগর-মজিল-পুরে তার বাপের বাড়িতে। রহমান সাহেব সপ্তাহান্তে সেখানেই যান। ফলে মীজানুরও আর আসে না।

এই শনিবার রহমান সাহেব আবার এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন এক হিন্দু বন্ধু। আবার হাসিনার ডাক পড়লো।

বন্ধুটির নাম সুখেন্দু। ইনি এ অঞ্চলের একজন নামকরা কনট্রাক্টার। বড় বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাশুনো। গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে শেয়ারে এ বছর রহমান সাহেব সুন্দরবন ফেরি সার্ভিস ডেকে নিয়েছেন। অনেক টাকার ঝক্কি। চাষের জমি বেচে রহমান সাহেব ব্যবসায় নেমেছেন, এ সময় সুখেন্দুবাবুর মতন লোকদের হাতে রাখা দরকার। হিন্দু বলে সুখেন্দুবাবুর কিছু কিছু অতিরিক্ত সুবিধে আছে। তিনি এস ডি ও-র বৌকে বৌদি কিংবা পুলিশের এস ডি পি ও-র মাকে মাসিমা ডেকে টিপ করে প্রণাম করে ফেলতে পারেন। তাতেই অর্ধেক কাজ ফতে। টাকা-পয়সা ঘুষের চেয়েও এটা অনেক শক্তিশালী কায়দা।

সুখেন্দুবাবুর লম্বা চওড়া চেহারা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। দেখলে মনে হয় বেশ একটি ভালো মানুষ লম্পট। লোকটি ঠিক তাই। মদ আর মেয়েছেলের দিকে অত্যধিক ঝোঁক। এদিকে খুব কুচক্রীও নয়। লোকের ক্ষতি করার জন্য দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে না। বরং মাতাল অবস্থায় অনেককেই বলে বসে, আরে, সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। তোমার কী কী চাই, আমাকে বলো না!

সুখেন্দুবাবু এসেছে বিরিয়ানি আর বড় গোস্তের কাবাব খাবার জন্য। রহমান সাহেবকে সে অনেকবার বলেছে, বুঝলে ভাই রহমান, এসব রান্না মুসলমানদের মতন আর কেউ পারে না। কলকাতায় গেলেই আমি একবার আমিনিয়ায় ঢুকে যাই। আমাদের বাড়িতে অবশ্য এ সব চলে না, আমার ঠাকুমা বেঁচে, ওরে বাবা, মুর্গি পর্যন্ত চুপি চুপি খেতে হয়।

অবশ্য, বিরিয়ানি আর কাবাবই বড় কথা নয়, সেই সঙ্গে হুইস্কিও এসেছে। সুখেন্দু এত বেশি হুইস্কি সন্ধেবেলার মধ্যেই খেয়ে ফেললো যে, কাবাব-বিরিয়ানি খাওয়ার দিকে তার আর রুচি রইলো না। জিভ এলিয়ে এসেছে, চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে ফুরফুরে হাসি।

দুবার হেঁচকি তুলে সুখেন্দুবাবু বললো, আরে, ইয়ে, পানি নেই যে, শুধু শুধু মাল খাবো, একটু পানি আনাও।

রহমান সাহেব বললো, ও জল খাবেন? হাসিনা, এই হাসিনা, এক জগ জল দিয়ে যা তো!

এ গ্রামের বাড়িতে হিন্দু অতিথি বিশেষ আসে না। কখনো দু-একজন কেউ এলে সবাই সচেতন হয়ে যায়, যেন আদর আপ্যায়নে কোন খুঁত না থাকে। বাচ্চারা কৌতূহলী চোখে তাকায়। বয়স্করা এসে রামায়ণ মহাভারত বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের কথা জানিয়ে যায় অতিথিদের।

হাসিনা এক জগ পানি নিয়ে এলো। রহমান সাহেব একটু বেশি বেশি জোর দিয়ে বললেন টিউবওয়েলের জল এনেছিস তো? পুকুরের জল আনিস নি তো!

সুখেন্দুবাবু জড়ানো গলায় বললো, ও ঠিক আছে, দাও না।

রহমান সাহেব হাসিনার হাত ধরে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, সুখেন্দুদা, এই মেয়েটিকে দেখুন, দেখছেন তো? বলুন তো এর বয়েস কত?

সেই পুরোনো খেলা।

সব শুনে সুখেন্দুবাবু হেসে উঠলো হা-হা করে। বললো তাই নাকি? সত্যি, একদম বোঝা যায় না?

দু চোখ থেকে দুটি লকলকে জিভ বার করে সুখেন্দুবাবু হাসিনার যৌবনময় শরীরটা চাটতে লাগলো। নেশার ঝোঁকে একবার ভাবলো, হ্যাঁ, একটা সরেস মাল বটে! একে পাওয়া যায় না? কত টাকা লাগবে?

পরক্ষণেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেশা কাটাবার চেষ্টা করলো। মনে মনে বললো, ওরে বাবা, মোছলমানের ঘরের মেয়েছেলে, এদিকে নজর দিতে গিয়ে কি শেষে গর্দানটা খোয়াবো? কোথায় কী গোলমাল হয়ে যাবে, তারপর যদি দাঙ্গা ফাঙ্গা বেধে যায়? কাজ নেই বাবা! গণি চৌধুরী বলেছে এই শীতে লখনৌ বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই ভালো, সেখানে গিয়ে যত খুশি বাঈজি ফাইজি, তারা একেবারে খানদান মোছলমান, এখানকার কোনো শালা টেরটিও পাবে না!

সুখেন্দুবাবুকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে রহমান সাহেব হাসিনাকে খানিকটা রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, মীজানুরের সঙ্গে তোর বিয়েটা প্রায় ঠিক করে এনেছিলুম, বুঝলি, কিন্তু ও শালা ট্রান্সফার হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের চাকরি তো। ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে একেবারে দার্জিলিং, বুঝলি?

হাসিনা ভাবলো, আহা, মীজানুর নিকে করুক বা না করুক, তবু তো সে মুখে অন্তত বলেছিল যে সে ছেলেমেয়েগুলোকেও নিয়ে যাবে? কাল থেকে নাহারের খুব জ্বর। হে খোদাতাল্লা, ওকে তুমি বাঁচিয়ে দিও!

রহমান সাহেব বললেন, তোর জন্য আর একটা পাত্র খুঁজছি। মুশকিল তো ওই বাচ্চাদের নিয়ে?

সুখেন্দুবাবু চোখ তুলে বললো, কী হয়েছে? এর মধ্যে আবার বাচ্চা এলো কোথা থেকে?

রহমান সাহেব খানিকটা ইতিহাস বিবৃত করলেন।

অমনি সুখেন্দুবাবুর মধ্যে সব করে দেবো ভাবটা জেগে উঠলো। সে একজন মাতালের পক্ষে যতখানি চিন্তিত হওয়া সম্ভব ততখানি চিন্তিত ভঙ্গি করে বললো, হ্যাঁ, এটা একটা প্রবলেম। তিন তিনটে বাচ্চা সমেত কে আর শাদি করবে? তবে এক কাজ করা যায়? যদি তোমরা রাজি থাকো—

—কী?

—দ্যাখো, দুঃখ কষ্টে থাকার চেয়ে, বাচ্চাগুলোকে যদি অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া যায়—পুটিয়ার যে রাজবাড়িটা ছিল না, সেটা তো গতবারে গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, সেখানে একটা অনাথ আশ্রম খুলেছে।

—তাই নাকি?

—তাই নাকি মানে? সেখানকার ফার্নিচার সব আমি সাপ্লাই করেছি, আমি জানি না? আমি বলি কি, সেখানে ওদের ভর্তি করে দাও, খাওয়া দাওয়া পাবে, লেখাপড়া শিখবে।

—সত্যি...টাকা পয়সা লাগবে না?

—কিসের টাকা পয়সা? সে সব তো গভর্নমেন্ট দিচ্ছে।

রহমান সাহেব হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি হাসিনা, এটা কিন্তু খুব ভালো কথা। ভেবে দ্যাখ, ওরা খাওয়াপরা পাবে, লেখাপড়া শিখবে—.

হাসিনা চুপ করে রইলো।

রহমান সাহেব আবার বললেন, সুখেন্দুদা, ওদের নেবে সেখানে?

সুখেন্দুবাবু বললো, কেন নেবে না? আলবাত নেবে?

রহমান সাহেব একটু ইতস্তত করে বললেন, মানে, সুখেন্দুদা, তোমাকে খোলাখুলি বলছি, সেখানে মুসলমানের ছেলেমেয়েদের নেয়?

সুখেন্দুবাবু একটা প্রচন্ড মাতালের হাসি হেসে বললো, আরে অনাথের আবার হিন্দু মুসলমান কী? অনাথ মানে তো যার কেউ নেই। হে-হে-হে-হে-হে!

রহমান সাহেব কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, না, মানে, বলছিলাম, ওরা তো বেশ বড় হয়ে গেছে, বড় ছেলেটা তো বেশ বড়।

সুখেন্দুবাবু দু হাত তুলে অভয় দানের ভঙ্গিতে বললো, সে সব আমি ম্যানেজ করে দেবো। সব আমি করে দেবো, তোমার কী কী চাই, বলো না?

সে আর একবার ঘোলাটে চোখে দেখে নিলো হাসিনার লোভনীয় যৌবন। বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে কাটিয়ে দিলে যদি মেয়েটা কৃতজ্ঞতা জানাতে তার কাছে আসে....যদি। একবার.....! যাক গে যাক, না এলো না এলো, লখনৌ তো আছেই!

শুধু যাওয়া, শুধু আসা

সুখেন্দুবাবু যথারীতি পরের দিনই এসব কথা একদম ভুলে গেল। কিন্তু যদিও এসব কথা হয়েছিল রহমান সাহেবের বাড়ির দোতলার ঘরে, তবু কী করে যেন কথাটা রটে গেল গ্রামের মধ্যে। হাসিনার ছেলেমেয়ে তিনটির ব্যবস্থা করার একটা উপায় আছে। পুটিয়ার প্রাক্তন রাজবাড়িতে যে একটা অনাথ আশ্রম হয়েছে, সেই খবরই তো অনেকে রাখতো না। সুযোগ যখন একটা এসেছে, তখন তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। বিশেষত খরচাপাতি যখন সব সরকারই দেবে।

কোনো এক রহস্যময় কারণে, এই ব্যাপারে গণি খান চৌধুরীর ছেলেদেরই বেশি উৎসাহ দেখা গেল। হাসিনার ছেলে মেয়ে তিনটে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এটা ভালো দেখায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। তারা ঘুরে ঘুরে জনমত সংগ্রহ করলো। সবাই এ ব্যাপারে একমত। এমন কি, লাইনের চায়ের দোকানে সামসুল হক পর্যন্ত স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ, এই ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। লাল মিঞা তো একেবারে খেপে উঠলেন। তিনি আজ পারলে আজই দিয়ে আসেন। এন্ডিগেন্ডিগুলো বিদায় হলে তিনি হাসিনার সুন্দর ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করে দেবেন সবাই মিলে হাসিনাকে এমন বোঝালো যে হাসিনা আর না বলতে পারলো না। বিশেষ করে, পরোপকারী সামসুল হক পর্যন্ত এসে বললো, ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে...। এত সব মাথাওয়ালা লোকেরা কি আর ভুল কথা বলে?

সুখেন্দুবাবুকে ধরাধরি করায় সে কিছু সাহায্য করলো, বাকি ব্যবস্থা করে ফেললো গণি খান চৌধুরীর চৌকোশ ছেলেরা। ফর্ম ফিলাপ করা-টরা শেষ।

একদিন সকালে হাসিনার তিন ছেলেমেয়েকে ভালো করে নাইয়ে, ভালো করে খাইয়ে, নতুন জামা কাপড় পরিয়ে রওনা করে দেওয়া হল। সঙ্গে গেল গণি খান চৌধুরীর দুই ছেলে আর গিয়াস। অনাথ আশ্রমের অফিস ঘরে গিয়ে যখন ওরা কথাবার্তা বলছে, ছেলেমেয়ে তিনটে ভ্যাবাচ্যাকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, সেই সময় হঠাৎ সেখানে আলুথালু চুলে, প্রায় পাগলিনীর বেশে হাজির হলো হাসিনা।

সে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বলতে লাগলো, ওগো বাবু, ওদের ছেড়ে দাও। ওরা অনাথ নয়। আমি ওদের মা। যাদের মা থাকে, তারা কি অনাথ হয়? ওগো বাবু, তোমাদের পায়ে পড়ি, ওরা আমাকে ছেড়ে কখনো থাকে নি, আমি ওদের পেটে ধরেছি।

ছেলেমেয়ে তিনটি ছুটে গিয়ে হাসিনাকে ঘিরে দাঁড়ালো। অনাথ আশ্রমের কাউন্টারের একজন কেরানি বললো, দিস ইজ কলড ইউনিভার্সাল মাদারহুড! একটা যদি ক্যামেরা থাকতো—

যাবার সময় বাসে চেপে গিয়েছিল ছেলেমেয়েরা। ফেরার সময় এলো হেঁটে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে জাভেদ একটা ফড়িং ধরে ফেললো। হাসিনা বললো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে হারামজাদা!

তার আগেই ফড়িংটা উড়ে পালিয়েছে। শুধু একটা ডানা ছিঁড়ে রয়ে গেছে ছেলেটার হাতে।

সিরাজ একটা ডোবায় নেমে তুলে আনলো এক গোছা শাপলা। ওতে ভাল তরকারি হয়।

দেবদূত

আজ শবে বরাত। রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে খরখরে চোখ মেলে চেয়ে আছে হাসিনা।

আজকের দিনটা তার বড় ভালো কেটেছে। অনেক, অনেকদিন পর এমন একটা চমৎকার দিন।

আজ হাসিনার ডাক পড়েছিল গিয়াসদের বাড়িতে। গিয়াসের দাদির মতন এমন সুন্দর একটা মানুষ দেখা যায় না। বয়েসের গাছ পাথর নেই। চার কুড়ি তো হবেই, টুসটুসে একটা পাকা ফলের মতন চেহারা। এখনো দেখলে বোঝা যায়, এককালে কত ফর্সা রং আর কী দারুণ রূপসী ছিলেন উনি। অতিশয় ধর্মপ্রাণা মহিলা। ওঁর বাপের বাড়ি হাজারীবাগ। এ গ্রামে একমাত্র উনিই পরিষ্কার উর্দু বলতে পারেন। শবে বরাতের উৎসব ওই বাড়িতেই সবচেয়ে বেশি জমজমাট।

কাজ কি কম। সকাল থেকে বাড়ির মেয়েরা বসে যায় চাল গুঁড়ো করতে। তারপর সেই চাল গুঁড়ো ছাঁকা হয়। তারও পর সেই চালের আটা মেখে তৈরি হয় রুটি। একখানা দুখানা নয়, শয়ে শয়ে। আজকের পুণ্য দিনটিতে বাড়িতে কোনো প্রার্থী এসে ফিরে যাবে না।

রান্নাঘরে রুটি গড়তে গড়তে ফাঁকে ফাঁকেই হাসিনা উঠে গেছে গিয়াসের দাদির ঘরে। উনি আজ সারাদিন পবিত্র কোরান পাঠ করলেন। তাঁর শোওয়ার ঘরে মেঝের ওপর ছোট জলচৌকি পেতে বসেছিলেন তার সামনে । এই বয়েসেও কী সরল, উন্নত চেহারা। তিনি লেখাপড়া জানা মহিলা, নিজের হাতে মুক্তোর মতন অক্ষরে কোরানের অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন। পবিত্র গ্রন্থ পাঠের সময় তাঁর সুষমামণ্ডিত মুখখানিতে যেন একটা স্বর্গীয় আভা ফুটে ওঠে। হাসিনা সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।

এক একবার সে বলে, ও দাদিমা, একটু জোরে জোরে পড়েন না, আমরাও একটু শুনি।

দাদিমা চোখ খুলে শান্ত স্বরে বলেন, শুনবি, আয় বোস।

তিনি পড়ে পড়ে মানে বুঝিয়ে দেন, হাসিনা বিভোর হয়ে শোনে। এক অপূর্ব অনুভূতিতে তার মন ছেয়ে যায়। মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে আর কোনো পাপ নেই, দুঃখ নেই, অশান্তি নেই, আছে শুধু আনন্দ।

রান্নাঘর থেকে ডাক পড়লেই সে ছুটে চলে যায়। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দাদিমার ঘরে। আগে কখনো সে এত মন দিয়ে কোরান পাঠ শোনে নি। কম বয়েসে মন চঞ্চল ছিল, এখন তো তার বয়েসও তিরিশ পার হয়ে গেল।

গিয়াস মাঝে মাঝে দু-একবার তরল চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। ইঙ্গিত করেছিল একটু গোপনে কাছে আসবার। কিন্তু হাসিনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল সেই ডাক। আজ সে ঠিক করেই রেখেছিল, কোনো পুরুষ মানুষের কাছে ঘেঁষবে না, মিথ্যে কথা বলবে না, আঁচলের তলায় চুরি করে খাবার আনবে না। সে শুদ্ধ, ভক্তিমতী হয়ে দিনটা কাটিয়ে দেবে।

সেইরকমভাবেই দিনটা গেছে। সারা দিন ধরে গরিব দুঃখীদের দান করা হয়েছে খাবার। সন্ধেবেলা কতরকম বাজি ফাটানো হল গিয়াসদের বাড়ির সামনে। পরবের দিনগুলোতে দাদিমা নিজের তোরঙ্গ থেকে টাকা বার করে দেন। উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসিনার ছেলেমেয়েরা জুলজুলে চোখে দেখছিল বাজি পোড়ানো, আজ আর ওরা কুকুরের মতন তাড়া খায় নি, শেষ অবধি ওরাও পেয়েছিল একটা করে তারাবাজি।

সন্ধের পর আজ আর হাসিনাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে খাবার আনতে হয় নি, তাকে দেওয়াই হয়েছে প্রায় চল্লিশখানা রুটি আর এক ভাঁড় মাংস। গিয়াসদের বাড়িতে কেউ বড় গোস্ত খায় না, ও বাড়িতে বরাবর খাসির মাংস আসে। সেই মাংসের মধ্যে চাকা চাকা আলু। মাংসের চেয়েও মাংসের ঝোলে ডোবানো আলু খেতে এত ভালোবাসে জাভেদটা!

হাসিনার দু হাত ভর্তি খাবার, আর তার পেছনে পেছনে লাফাতে লাফাতে আসছিল ছেলেমেয়েরা। তাদের আর তর সইছে না, সুলুপ সালুপ শব্দ করছে জিভ দিয়ে।

তখনও চলেছে কাঙালির দল। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ওরা আসে, লোকের বাড়ি বাড়ি ভিখ মেঙে বেড়ায়। জানে, আজ কোন বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরবে না। সেরকম তিনজনের একটা ছোট দলকে থামিয়ে হাসিনা গুণে গুণে নখানা রুটি দিয়ে দিল। গিয়াসদের বাড়িতে সারাদিন দান চলেছে, হাসিনা নিজের হাতেও রুটি বিলিয়েছে। কিন্তু সে হল পরের বাড়িতে পরের জিনিস দেওয়া। তাতে তো হাসিনার নিজের দানের পুণ্য হয় নি। এখন হাসিনা তার নিজের রুটি দান করলো। আহা, খাক, ওরাও খাক।

বড় আনন্দে গেল আজকের দিনটা। ছেলেমেয়েরা তৃপ্তি করে খেয়েছে, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত হুটোপুটি করে এই তো খানিক আগে ঘুমোলো। কিন্তু হাসিনা ঘুমোবে না, সে জেগে থাকবে।

আজকের রাতে আশমান থেকে আল্লার ফেরেস্তা নেমে এসে কপালে লিখন দিয়ে যাবেন। আজ দুনিয়ার কোনো মানুষকে খারাপ ভাবতে নেই, আজ কোনো পাপ চিন্তা করতে নেই। হাসিনা ঘুমোবে না, যদি স্বপ্নের মধ্যেও কোনো পাপ চিন্তা আসে। আর কতদিন এমন দুঃখে দিন কাটবে? এবার যেন একটু সুদিন আসে।

হাসিনা জেগে আছে। সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ডানায় ভর দিয়ে বাতাস কেটে নেমে আসছেন দেবদূত। তীব্র জ্যোতির্ময় তাঁর রূপ। কখন তাঁর সময় হবে, কখন তিনি হাসিনার ঘরে আসবেন, শুধু সেই প্রতীক্ষা।

আজ আর পুকুরের পানিতে চাঁদের খেলা দেখতে পাওয়া যাবে না। ঝিরঝিরে করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রতি বছর শবে বরাত-এর রাতেই যেন ঠিক বৃষ্টি পড়ে। তখন পৃথিবী আরও বেশি নিঝঝুম হয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর ঘরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের নিশ্বাসের ভরর ভরর শব্দ।

হঠাৎ এক সময় ঘুলিয়ে উঠলো হাসিনার শরীরটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো সাঙ্ঘাতিক ভাবে। কয়েকবার এপাশ ওপাশ ফিরেও হাসিনা সামলাতে পারলো না নিজেকে। হুড়োতাড়া করে উঠে ছুটে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় বসে বমি করলো অনেকটা। বমির সঙ্গে সঙ্গে হাসিনা কাঁদতে লাগলো খুঁ খুঁ করে।

কিছুদিন ধরেই হাসিনা যে সন্দেহ করছিল অথচ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় নি, শেষ পর্যন্ত সত্যি তাই হলো। হাসিনা এ বমির মর্ম বোঝে। এই জন্যই গত কয়েকদিন টিসটাস করছিল শরীরটা। এর কারণ আর কিছুই না, হাসিনা আবার গর্ভবতী হয়েছে, আবার একটা শত্রুর এসেছে তার পেটে।

পরক্ষণেই সে জিভ কেটে বললো, ছিঃ, এ কথা বলতে নেই! পেটের সন্তান কখনো শত্রুর হতে পারে? ও কথা মনে করাও পাপ। যে আসছে, সে আসুক।

বন্দিনী

লোহার গেটটা বন্ধ। তার বাইরে মহিমবাবু যেই সাইকেল রিকশা থেকে নামলেন, অমনি ভেতর থেকে একটা কুকুর হিংস্রভাবে ডাকতে ডাকতে তেড়ে এল। সাধারণ খয়েরি রঙের নেড়িকুত্তা কিন্তু তার গলায় খুব তেজ।

মহিমবাবু প্যান্ট-শার্ট পরা, রোদ্দুরের জন্য মাথায় দিয়েছেন একটা তালপাতার টুপি। তিনি কুকুর-টুকুর বিশেষ পছন্দ করেন না।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকেই চলেছে। মহিমবাবু বললেন, কী আপদ! এখানে আবার একটা কুকুর এল কী করে?

রিকশা থেকে পরে নামলেন তাঁর স্ত্রী সুজাতা দেবী। রিকশার ভাড়া তিনিই চুকিয়ে দিতে দিতে বললেন, ভালই তো। একটা কুকুর থাকলে বাড়ির পাহারা হয়। যাকে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

মহিম বললেন, এ যে আমাকেই ঢুকতে দিচ্ছে না! কামড়ে-টামড়ে দেবে নাকি?

সুজাতা কোনো কুকুরকেই ভয় পান না। তিনি গেট খুলে চুঃ চুঃ শব্দ করতেই কুকুরটা ডাক থামিয়ে দিল।

সুজাতা ডাকলেন, সরদার! সরদার!

বাড়ির পেছন দিক থেকে এল একজন কুচকুচে কালো মাঝবয়সী লোক। সে একজন সাঁওতাল। সে এই বাড়ির কেয়ারটেকার।

সুজাতা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ, সরদার?

সাঁওতালরা সাধারণত খুব হাসিখুশি ধরনের মানুষ হয়। কিন্তু এই মানুষটি গম্ভীর ধরনের। সে সহজে কথা বলে না। সুজাতার প্রশ্ন শুনে সে মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড়টা হেলাল। এই সময় কোথা থেকে আর একটা কুকুর লেজ নাড়তে লাগল সরদারের পাশে এসে।

একেবারে নতুন ঝকঝকে বাড়ি। সামনের বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে। পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। তাতে টলটল করছে জল।

মহিম নিজেই বাড়িটা দেখে অবাক। অনবরত বাঃ বাঃ বলতে লাগলেন।

বছরখানেক আগে কেনা হয়েছিল জমি। তখন জায়গাটা ছিল এবড়োখেবড়ো মাঠের মতন। আর ছিল কয়েকটা তালগাছ। বাড়ি তৈরির জন্য যখন সবেমাত্র খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে, তখন অফিসের একটা কাজে মহিমকে চলে যেতে হল আফ্রিকায়। সেখানেই থেকে যেতে হল আট মাস। এর মধ্যে সুজাতা নিজেই দেখাশুনো করে শান্তিনিকেতনে এই বাড়িটা বানিয়ে ফেলেছেন।

মহিমের কাছে তাই সবকিছুই নতুন। তাঁর মনে হচ্ছে, যেন আলাদিনের দৈত্য মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি বসিয়ে দিয়েছে।

সবই বেশ পছন্দ হয়েছে মহিমের। শুধু অনবরত কুকুরের ডাক শুনলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। দুটো কুকুর যখন তখন ডাকে, ঝগড়া করে খেলা করে। কুকুর দুটো মহিমের পা চাটবার চেষ্টা করতে তিনি খানিকটা ভয় পেয়ে আর খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, এই যাঃ যাঃ।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে মহিম হয়তো আকাশের মেঘ দেখে গুনগুন করে গান গাইছেন, এমন সময় কুকুর দুটো ছুটোপাটি করে তাঁর সামনে এসে তাঁর গায়ের গন্ধ শুঁকতে চায়। কুকুরদের এই উপদ্রবে তাঁর গান বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি সুজাতাকে ডেকে বললেন, এ বাড়িতে কুকুর দরকার নেই, তুমি ওদের তাড়াও।

সুজাতা বললেন, সে কি। ও দুটো তো সরদারের পোষা কুকুর। সাঁওতালরা কুকুর ছাড়া থাকতে পারে না, তুমি জানো না?

মহিম বললেন, একটা কুকুরই তো যথেষ্ট, আবার দুটো কেন?

সুজাতা বললেন, দুটোই যে ওর আগে থেকে পোষা।

মহিম বললেন, ওর যদি একটা পোষা বাঘ থাকত, সেটাও কি আমাদের এই বাড়িতে রাখতে হত?

এ কথা শুনে হেসে ফেললেন সুজাতা।

এই নতুন বাড়ির সবকিছুই পছন্দ মহিমের। শুধু কুকুর দুটো ছাড়া। ওদের আবার বন্ধু আছে। এক এক সময় আরও কুকুর ঢুকে আসে বাড়ির মধ্যে।

শান্তিনিকেতনের এই বাড়িতে তো একটানা বেশিদিন থাকা যায় না। কলকাতায় কাজকর্ম আছে। তবে মহিম আর সুজাতা একটু ছুটি পেলেই চলে আসেন এখানে।

কয়েক মাস বাদে সরদার হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল। কোনো কারণ নেই, ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি, এমনিই সে বলল, নিজের গ্রামে ফিরে যাবে।

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল সরদার। সুজাতাবিপদে পড়ে গেলেন। এরপর বাড়ির দেখাশুনো করবে কে? খালি বাড়ি ফেলে রাখলেই চোর আসবে।

মহিম কিন্তু খুশি। কুকুর দুটো তো বিদায় হয়েছে।

চেনাশুনো লোকদের ধরাধরি করে আর একটি লোক পাওয়া গেল। তার নাম রাখাল। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, খুব চটপটে, বাগানের কাজ জানে, রান্না জানে।

কয়েকদিনের মধ্যেই, বোঝা গেল, রাখাল খুবই উপযুক্ত ছেলে। সুজাতার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। মহিমের আরও পছন্দ, রাখালের কোনো পোষা কুকুর নেই।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মহিম পাখির ডাক শুনছেন। এত পাখি কলকাতায় দেখা যায় না। বুলবুলি, দোয়েল, মুনিয়া। মহিম ঘুমোন দোতলার ঘরে। জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখা যায়। পুকুরের ধারে ধারে ছোট ছোট গাছ। একটা কদম গাছ এর মধ্যেই অনেকটা বড় হয়েছে। সেই গাছটায় পাখিরা এসে বসে। একদিন এসেছিল একটা ইষ্টিকুটুম পাখি। পায়রা আর বকেরা পুকুরের জল খেতে আসে।

পাখির ডাক শুনতে শুনতে মহিম একটা কুঁই কুঁই শব্দ শুনতে পেলেন। এটা আবার কিসের শব্দ? তিনি নেমে এলেন নীচে, বাইরের বারান্দায় এসে দেখলেন, সুজাতা বিস্কুট ভেঙে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন আর সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছে একটা বাচ্চা কুকুর। খুবই বাচ্চা, মোটে তিন-চার মাস বয়েস হবে, কালো-সাদা রং একটা পশমের বলের মতন।

মহিম ভুরু তুলে বললেন, আবার কুকুর?

সুজাতা বললেন, দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর কুকুরটা। কী রকম তুলতুলে। আর কী সুন্দর চোখ দুটো।

মহিম বললেন, এটাকে আবার কোথায় পেলে?

সুজাতা বললেন, এমনিই গেটের তলা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। এইটুকু কুকুর, কিন্তু কী বুদ্ধি দেখবে?

একখানা আস্ত বিস্কুট উঁচু করে ধরে সুজাতা বললেন, এই শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। না হলে পাবি না।

কুকুরটা অমনি চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পাগুলো গুটিয়ে রাখল, আর মাথাটা ঘোরাতে লাগল এদিক-ওদিক।

সুজাতা ওকে টপ করে বুকে তুলে নিয়ে বললেন, কী লক্ষ্মী কুকুর। এটাকে আমি পুষব।

মহিম বিরক্ত হয়ে বললেন, আবার কুকুরের ঝামেলা কেন?

সুজাতা ধমক দিয়ে বললেন, তুমি এইটুকু একটা কুকুরছানাকেও ভয় পাও নাকি?

মহিম বললেন, না, ভয়ের কী আছে? তবে এটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো বাড়ির পোষা কুকুর। গেটের বাইরে রেখে আসাই ভাল।

সুজাতা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। অন্য কেউ চাইতে এলে দিয়ে দেব। বাড়িতে একটা কুকুর রাখা খুব দরকার।

মহিম আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। দুতিন দিনের মধ্যে কেউ চাইতেও এল না কুকুরটাকে।

বাচ্চা কুকুরটা সারাক্ষণ খেলে বেড়ায়, বেশি ডাকাডাকি করে না। শুধু দুপুরবেলা মহিম আর সুজাতা যখন খেতে বসেন, সে তখন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভুক ভুক শব্দ করে। যেন সে বলতে চায়, আমাকে খেতে দিতে ভুলে যেও না যেন।

সেই যে প্রথম দিন সুজাতা ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, লক্ষ্মী কুকুর, সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল লক্ষ্মী।

সুজাতার খুব মায়া পড়ে গেছে লক্ষ্মীর ওপর। মহিমও মাঝে মাঝে এখন ওকে বিস্কুট খেতে দেন। হঠাৎ কোনো সময় লক্ষ্মী তাঁর পায়ের ওপর এসে লুটোপুটি খেলে রাগ করার বদলে হেসে ফেলেন তিনি।

রাখাল কিন্তু প্রথম থেকেই কুকুরটাকে অপছন্দ করেছে। সে বলল, এটা মেয়ে-কুকুর। বাড়িতে মেয়ে-কুকুর রাখা ভাল নয়, তাতে অনেক ঝামেলা হয়।

সুজাতা ধমক দিয়ে বললেন, মেয়ে-কুকুর আর ছেলে-কুকুর কী রে? মেয়ে বলে বুঝি মানুষ নয়?

তাই শুনে মহিম খুব হাসতে লাগলেন।

সুজাতা সেই হাসি অগ্রাহ্য করে বললেন, ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। লক্ষ্মী এ বাড়িতেই থাকবে। আমরা যখন থাকব না, তখনো ওকে ভাল করে খেতে টেতে দেবে।

দুদিন বাদে সুজাতা আর মহিম ফিরে গেলেন কলকাতায়। তারপর আর বেশ কিছুদিন ফেরা হল না শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় অনেক কাজ।

মাস দেড়েক বাদে আবার ওঁরা এলেন শান্তিনিকেতনে। এবার বেশ বড় দল। মহিমের মা এসেছেন সঙ্গে। ওঁদের ছেলে বাপ্পা খড়গপুরে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, সেও এসেছে গরমের ছুটিতে। সুজাতার দিদি-জামাইবাবু এসেছেন বেড়াতে।

ঘরের জিনিসপত্র ঠিক-ঠাক করে সাজাতে সাজাতে হঠাৎ সুজাতার খেয়াল হল, লক্ষ্মীকে তো একবারও দেখা যায়নি!

রাখালকে সেই কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, ও মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যায়। বাড়িটাড়ি কিছু পাহারা দেয় না। বাইরে বাইরেই থাকে।

সুজাতা বললেন, নিশ্চয়ই তুই ওকে খেতে দিস না। তাই ও বাইরে চলে যায়।

সুজাতা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দুবার ডাকলেন লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

তখন দেখা গেল দূরের মাঠ পেরিয়ে তীরের মতন ছুটে আসছে একটা বাচ্চা কুকুর। কাছাকাছি এসে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজাতার পায়ের ওপর। সুজাতা তাকে কোলে নিয়েই বললেন, ইস, দেখেছ কত ময়লা মেখেছে গায়ে!

একটুক্ষণের মধ্যেই ঘাসে কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল লক্ষ্মী।

বাপ্পা কুকুর ভালবাসে। সে একটা বল নিয়ে খেলতে লাগল। যতবার বলটা ছুড়ে দেয়, লক্ষ্মী দৌড়ে গিয়ে বলটা মুখে করে আনে। বাপ্পা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও লক্ষ্মী তার সঙ্গে ঘোরে।

কুকুরটা খুব দুরন্ত কিন্তু অসভ্য নয়। খাবার দিলেই চেটেপুটে খায়, অথচ হ্যাংলামি নেই একটুও। দেখতেও বেশ সুন্দর। সবারই পছন্দ হয়ে গেল ওকে।

শুধু মা বললেন, ওর নাম লক্ষ্মী রেখেছ কেন? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে ইয়ারকি করতে নেই। তার বদলে ওর নাম দাও রক্ষী। বাড়ি পাহারা দেবে, তাই রক্ষী নামটাই মানাবে।

সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে নামটা পছন্দ করে ফেললেন। রক্ষী বলে ডাকলেই ও সাড়া দেয়। ও লক্ষ্মী আর রক্ষীর বিশেষ তফাত বুঝবে না। কয়েকবার তিনি রক্ষী, রক্ষী বলে ডাকলেন, অমনি সে ছুটে এল।

বাপ্পা শুধু বলল, ঠাম্মি, ঠাম্মি, কুকুরটা তো মেয়ে। তা হলে রক্ষীর বদলে ওর নাম রক্ষিণী রাখতে হয়।

বাপ্পার ঠাকুমা বললেন, রক্ষিণী শুনতে বিচ্ছিরি। এ সব রক্ষিণী-যক্ষিণী দরকার নেই। শুধু রক্ষীই ভাল।

লক্ষ্মী সে দিন থেকে রক্ষী হয়ে গেল।

সুজাতার ধারণা অন্য সব কুকুরের চেয়ে রক্ষীর বুদ্ধি বেশি। একদিন সকালে তার কিছুটা প্রমাণও পাওয়া গেল।

আগের রাতে পাঁঠার মাংস খাওয়া হয়েছিল। তার প্রচুর হাড় রক্ষী খেয়েছে। পাঁঠার মাংসের হাড় কুকুরদের বেশি পছন্দ।

সকালবেলা সবাই যখন বারান্দায় চা খেতে বসে, তখন রক্ষী কাছে এসে লাফালাফি করে। প্রত্যেকেই খানিকটা বিস্কুটের টুকরো দেয় ওকে।

সেই সকালে রক্ষীর যেন বিস্কুট খাওয়ার তেমন উৎসাহ নেই। ছুটে ছুটে বিস্কুট কুড়োচ্ছে না। সুজাতা বললেন, কাল রাত্তিরে রক্ষী এত মাংস খেয়েছে যে এখনো ওর খিদে পায়নি।

বাপ্পা তবু আস্ত একটা বিস্কুট ছুড়ে দিল একটু দূরে।

রক্ষী কয়েক পলক সেই বিস্কুটটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সেটা মুখে নিয়ে ছুটে গেল ফুলবাগানে। সেখানকার নরম মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত বানিয়ে ফেলে তার মধ্যে রাখল বিস্কুটটা। আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল।

বাপ্পা বলল, ও কি বিস্কুটটাকে পুঁতল নাকি? ভাবছে, বিস্কুটের গাছ হবে?

মহিম বললেন, না রে! ও বিস্কুটটাকে জমিয়ে রেখে দিল, পরে খাবে।

বাপ্পা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা, জন্তু-জানোয়াররা এরকম খাবার জমাতে জানে? আগে তো কখনো দেখিনি!

সুজাতা বললেন, দেখলে, ওর কত বুদ্ধি?

শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার সময় সকলেরই একটু একটু মন খারাপ লাগে। রক্ষী প্রত্যেকের পায়ে এমন মাথা ঘষে, যেন বলতে চায়, যেও না, যেও না।

তবু তো যেতেই হয়।

এক মাস বাদে আবার ফিরে এসে সুজাতা দেখলেন রক্ষী বাড়িতে নেই। এবার গেটের কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করতেও সে এল না।

রাখালকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, ও কুকুরটা কিছুতেই বাড়ির মধ্যে থাকতে চায় না। গেটের তলা দিয়ে যখন তখন বেরিয়ে যায়। অন্য বাড়ি গিয়ে বসে থাকে।

সুজাতা ধমক দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি ভাল করে ওকে খেতে দাও না। না হলে অন্য বাড়িতে যাবে কেন? ওর খাবার জন্য তোমাকে আলাদা টাকা দিই।

মহিম বুঝলেন, রাখালকে ধমকে লাভ নেই। রাখাল কুকুর ভালবাসে না। রক্ষীকে ও প্রথম থেকেই অপছন্দ করেছে। সেই জন্যই মনে করে নিয়মিত খাবার দেয় না। কুকুরেরা ঠিক বুঝতে পারে, কে ভালবাসে আর কে ভালবাসে না।

পোষা কুকুর নিজে শিকার করে খেতে জানে না। মানুষ যদি খাদ্য না দেয়, তা হলে ওরা অসহায়। শান্তিনিকেতনের এই দিকটায় বেশিরভাগ বাড়ি প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকে। মালিকরা না এলে কুকুররা মুশকিলে পড়ে যায়।

সুজাতা অনেকক্ষণ রাগারাগি করলেন, তারপর নিজে পাড়া খুঁজতে বেরোলেন। রক্ষীকে পাওয়া গেল না। অন্য দুতিনটে কুকুর খাদ্যের লোভে সন্ধের দিকে বাড়ির বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।

পরদিন সকালবেলা দেখা গেল গেটের কাছে শুয়ে আছে রক্ষী।

তার অবস্থা দেখে মহিম আর সুজাতা আঁতকে উঠলেন। তার চোখের দৃষ্টি করুণ। সুজাতাকে দেখে সে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল, কয়েক পা এসেই ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

এই এক মাসের মধ্যেই সে অনেকটা রোগা আর লম্বাটে হয়ে গেছে। আর তার পেটের একদিকে বিরাট ঘা। সেই ঘা একেবারে দগদগ করছে, রস গড়াচ্ছে। দেখলে ঘেন্না করে।

কান্না এসে গেল সুজাতার। তিনি বললেন, এ রকম অবস্থা কী করে হল ওর? কে ওকে মারল?

সুজাতার ঘেন্না নেই। তিনি রক্ষীকে কোলে তুলে এনে শুইয়ে দিলেন বারান্দায়। নিশ্চয়ই রক্ষী অনেকদিন খেতে পায়নি, তিনি কয়েকখানা বিস্কুট এনে রাখলেন তার সামনে। রক্ষী খাবার চেষ্টা করেও পারল না। যেন বিস্কুট চিবোবার শক্তিও তার নেই। তখন সুজাতা নিয়ে এলেন এক বাটি দুধ। এমন একটা কুঁ-উ-উ শব্দ করল রক্ষী, যেন সুজাতা তার মা, আর সে সুজাতার মেয়ে।

কাছাকাছি অন্য একটা বাড়ির কেয়ারটেকার ভৈরব এসে বলল, গোয়ালপাড়ায় একটা বাড়ির লোক রক্ষীর গায়ে গরম ফ্যান ঢেলে দিয়েছে। সেইজন্য রক্ষীর ওরকম ঘা হয়েছে।

তা শুনে সুজাতার চোখে কান্না এল আবার। ওইটুকু একটা কুকুর, অমন সুন্দর চোখ, তার গায়ে কেউ গরম ফ্যান ঢেলে দিতে পারে? মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়?

সুজাতা নিজের হাতে ওর সেবা করতে লাগলেন। গরম জলে তুলো ভিজিয়ে ওর ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর যেই মলম লাগিয়ে দিতে গেলেন, রক্ষী অমনি তা চেটে খেয়ে ফেলল। সুজাতা আবার মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন সেখানে। বারবার রক্ষীকে খাওয়াতে লাগলেন দুধ।

এক একসময় ক্ষতস্থানটার যন্ত্রণায় রক্ষী আর্তনাদ করে, সুজাতার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

সুজাতা বোলপুরে গিয়ে কুকুরের ডাক্তারের খোঁজ করলেন, তা অবশ্য পাওয়া গেল না। একটি ডাক্তারখানার লোক বলল, মানুষের ওষুধেই কুকুরের কাজ হয়।

এবারে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। মহিমকে আবার বিদেশ যেতে হবে, এবার সুজাতাও সঙ্গে যাবেন। ছ মাসের জন্য। কিন্তু সুজাতার মন খুব খারাপ। রক্ষীকে এইভাবে রেখে যাবেন কী করে? রক্ষীকে সঙ্গে করে কলকাতাতে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

মহিম বললেন, তিন-চারদিনে রক্ষী তো অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছে। দেশি কুকুর, ওরা কত মার খায়, এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।

সুজাতা আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করে গেলেন রক্ষীর জন্য। রাখালকে বার বার বললেন, প্রত্যেকদিন যেন দুবেলা দুধ খাওয়ানো হয় ওকে। সপ্তাহে দুদিন অন্তত মাংস।

ছ মাস বাদে ফিরে এসে শোনা গেল রক্ষী মারা গেছে। ঠিক কীভাবে সে মরেছে, তা বলতে পারল না রাখাল। সুজাতারা চলে যাবার দুদিনের মধ্যেই রক্ষী আবার বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। কে যেন বলেছিল খালের ধারে মরে পড়ে আছে একটা কুকুর। সেটা আর দেখতে যায়নি রাখাল।

এবার আর কাঁদলেন না সুজাতা। মরেই গেছে যখন, তখন আর ভেবে লাভ কী? তিনি নিজেও তো রক্ষীকে পুরো সেবা-যত্ন করতে পারেননি। রাখাল রক্ষীর যত্ন করবে না, এ তো জানা কথাই।

আস্তে আস্তে রক্ষীর কথা মন থেকে মুছে গেল।

তারপর কেটে গেল আরো এক বছর।

একদিন দুপুরবেলা সারা আকাশ ঢেকে গেছে কালো মেঘে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তারই মধ্যে মহিমের

বেড়াতে যাবার শখ হল—কলকাতা শহরে তো এতখানি বর্ষার আকাশ দেখা যায় না! মাঝপথে বৃষ্টি এলেও ক্ষতি নেই, একদিন না হয় ভেজা যাবে।

সুজাতার বাড়ির পেছনটায় ফাঁকা মাঠ ছিল। এখন দূরে দূরে দুটো একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। তারও পরে গাছপালা ঘেরা একটা গ্রাম।

সেইদিকেই বেড়াতে গেলেন মহিম আর সুজাতা। হাঁটছেন আস্তে আস্তে। নতুন বাড়িগুলো দেখছেন। হঠাৎ একটা বাড়ির পাশ থেকে একটা বেশ বড়সড় কুকুর জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজাতার ওপর।

সুজাতা ভয় পেয়ে বাবা-গো, মা-গো বলে বসে পড়লেন মাটিতে। কুকুরটা তার গায়ের ওপর লাফাতে লাগল।

মহিমও বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। এটা বোধহয় পাগলা-কুকুর। পাগলা কুকুর কামড়ালে অনেকগুলো ইঞ্জেকশন নিতে হয়। নিজের স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে। একলা পালালে চলবে না। কোনো রকমে বীরত্ব সঞ্চয় করে কুকুরটার সঙ্গে লড়বার জন্য তিনি একটা ইট খুঁজতে লাগলেন।

কুকুরটা সুজাতাকে ঘিরে লাফাচ্ছে বটে, কিন্তু কামড়াচ্ছে না তো! সুজাতা মুখ থেকে হাত সরালেন, তারপর দারুণ অবাক হয়ে বললেন, ওমা, এ তো রক্ষী!

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কুঁ কুঁ করতে লাগল।

এবার দেখা গেল, তার পেটের একদিকে অনেকখানি পোড়া দাগ, এখন আর ঘা নেই। এ কুকুরটা তা হলে সেই রক্ষী, সে মরেনি। এতদিন পরেও সে সুজাতাকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছে।

রক্ষী অবশ্য এখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তাকে কোলে তোলা যায় না। সুজাতা আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, মানুষই মানুষকে বেশিদিন মনে রাখে না, কুকুরটা আমাদের মনে রেখেছে।

ওকে এবার কলকাতায় নিয়ে যাব। আর কোনোদিন চোখের আড়াল করব না।

ঠিক তখুনি চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলে একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ডাকল, দুখিয়া! দুখিয়া!

কুকুরটা তখন সুজাতাকে ছেড়ে ছেলেটার কাছে চলে গেল। আবার সুজাতার কাছে ফিরে এসে তার পায়ে মাথা ঘষল।

মহিম ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা তোমার কুকুর নাকি?

ছেলেটি বলল, হুঁ।

সুজাতা বললেন, এটা আসলে ছিল আমাদের কুকুর। তুমি খুব ভাল ছেলে, ওকে বাঁচিয়েছ—

ছেলেটি আর কোনো কথা বলল না। ও কুকুরটাকে আবার দুবার দুখিয়া বলে ডাকল। তারপর কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বন্ধ করে দিল লোহার গেট।

সুজাতা হাহাকার করে বললেন, ও কি, ও রক্ষীকে ফেরত দেবে না?

মহিম বললেন, রক্ষী তো আর নেই, ওর নাম এখন দুখিয়া। ছেলেটা ওকে বাঁচিয়েছে, আমরা ফেরত চাইব কী করে বলো?

সুজাতা ডাকলেন, রক্ষী, রক্ষী।

লোহার গেটের ওপাশে কুকুরটা এমনভাবে লাফালাফি করছে, যেন কারাগারের কোনো বন্দিনী।

সুজাতার ডাক শুনে সে এমনভাবে ডেকে উঠল, যেন ঠিক কান্নার মতন।

আবার ছেলেটা ভেতর থেকে ডাকল, দুখিয়া, দুখিয়া! তখন কুকুরটা কান্না থামিয়ে ছেলেটার দিকে ছুটে গেল।

মহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের চেয়ে ওই ছেলেটার দাবি বেশি। চলো যাই।

দুজনে ফিরে চললেন। সুজাতা পেছন ফিরে তাকাতে লাগলেন বারবার। কুকুরটা আবার গেটের কাছে পা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর ডাকছে ঠিক কান্নার মতন।

সন্তান

পার্টি জমে উঠেছে দুপুরবেলাতেই। ছোট অ্যাপার্টমেন্টে প্রায় বারো চোদ্দজন মানুষ, রান্নাঘরের ভার নিয়েছে পুরুষরাই। বিদেশে এসে সব পুরুষই বেশ রান্না শিখে যায়। মন্টু দারুণ বিরিয়ানি রান্না করে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে-কোনও বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার হলেই মন্টুর ডাক পড়ে। এমনই রান্নার নেশা মন্টুর যে সে সময় সে তার স্ত্রী নীলাকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দেয় না। আজিজ, নিপুরা মাছ কুটছে, তরকারি কাটছে, প্রত্যেকেরই হাতেই বিয়ারের টিন কিংবা সিগারেট। মেয়েরা সেজেগুজে বসবার ঘরে বসে প্রাণখুলে শাড়ি, গয়না, কে নতুন গাড়ি কিনল, কে ছুটিতে দেশে যাবে, এই আলোচনা চালাচ্ছে, আজ রান্নায় হাত লাগাতে হবে না বলে তারা খুশি।

এই পার্টির মধ্যমণি একটি ছ মাসের শিশু, সে শুয়ে আছে একটা লাল মখমল বিছানো দোলনায়। খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে তাকে, মাথায় একটা পালকের মুকুট, কেউ আদর করতে এলেই সে ফোকলা দাঁতে খটখট করে হাসছে। ভাল নাম এখনো রাখা হয়নি, ওর ডাক নাম বাবু।

মালা আর ফিরোজ কাউকে উপহার আনতে বারণ করেছিল, আজ তাদের ছেলের জন্মদিন নয়, কোনো উপলক্ষই নেই, এমনি ছুটির দিনে হইহই। মালা সদ্য তার বাচ্চাকে নিয়ে ঢাকা থেকে এসেছে, বন্ধুবান্ধবরা এই প্রথম ফিরোজের সন্তানের মুখ দেখছে, উপহার আনবে না? অনেক রকম বেলুন আর খেলনায় ঘরের একটা কোণ ভরে আছে। ফিরোজ একটা বার কাউন্টার খুলে ফেলেছে, কাউকে বিয়ার, কাউকে ভদকা দিচ্ছে গেলাসে গেলাসে। মেয়েরা এ সব খেতে চায় না, ফিরোজ খুব চেষ্টা করছে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফারুখের স্ত্রী পাখিকে ওয়াইন খাওয়াতে। মুখের সামনে গেলাস নিয়ে বলছে, অন্তত একটা চুমুক দাও, আমি তোমাকে আগে ওয়াইন খেতে দেখেছি প্রফেসার লোথারের বাসায়। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ফারুখ দাঁড়িয়ে আছে টেলিফোনের কাছে। সে তুলে বলল, হ্যালো, গুটেন, গুটেন মরগান... কথা বলতে বলতে ফারুখের ভুরু কুঁচকে গেল। ওপাশের কথা শোনা যাচ্ছে না, সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফারুখ মাউথ পিস চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, রোজা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর নীরবতা। বাচ্চার দোলনার কাছ থেকে মালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কী চায় সে?

ফারুখ বলল, ফিরোজের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

স্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষা না করেই ফিরোজ এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরল। প্রথমে একটুক্ষণ জার্মান ভাষায় কথা বলে তারপর শুরু করল বাংলায়।... হ্যাঁ, আসতে পারো, অবশ্যই, এখনই চলে এসো, তোমার স্বামী সঙ্গে আছে, তাকেও নিয়ে এসো, কোনো অসুবিধা নাই, হি ইজ মোস্ট ওয়েলকাম... আমরা এই নতুন বাসার ডিরেকশন বলে দিচ্ছি, হপবানহপে নামবা, সেখান থিকা কাইজার স্ট্রাসের কর্নারে এগারো নম্বর ট্রাম...ও গাড়িতে আসবে? তা হলে...

ফোন রেখে দিয়ে ফিরোজ বলল, রোজা আর তার হাজব্যান্ড আমাদের ছেলেকে দেখতে আসছে। আমাদের অফিসে কাজ করে, লুডউইগ, তার কাছ থেকে শুনেছে। মালা বলল, তুমি তাকে আসতে বললে?

কেন আসবে?

ফিরোজ মালার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, ওটা এ দেশের ভদ্রতা। উতলা হোয়ো না। আমরাও ভদ্রতা করব। দেখো, ওরা বেশিক্ষণ থাকবে না।

মালা তবু ভুরু কুঁচকে রইল। বাচ্চার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, নজর দিতে আসছে। ফিরোজ হো হো করে হেসে উঠল। বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আহবাব আর ডালিম। ডালিম সদ্য এসেছে দেশ থেকে, সে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটাই এখনও ভাল চেনে না। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, এই রোজা কে?

আহবাব বলল, রোজা আগে ফিরোজের স্ত্রী আছিল। আট বছর পর ডিভোর্স হইয়া গেছে। মালার সঙ্গে ফিরোজের বিয়ে হয়েছে মাত্তর দুই বছর আগে। ডালিমও অবাক হয়ে বলল, আগের বউ? সে আসতে চায় কেন? তার এখনকার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসবে? আহবাব বলল, এ দেশে এটা কিছু অস্বাভাবিক না। রোজার সাথে তো ফিরোজের ঝগড়া-মারামারি হয় নাই। মিউচুয়াল ডিভোর্স। তারপরেও সামাজিক সম্পর্ক রাখতে তো অসুবিধা নাই কিছু। আবার আড্ডা শুরু হলেও ঠিক জমল না। এদের মধ্যে অনেকেই রোজাকে চেনে। চার-পাঁচ বছর আগে এই ফিরোজের বাড়িতেই কোনো পার্টি হলে রোজা হইচই করে জমিয়ে রাখত। দারুণ প্রাণবন্ত মেয়ে রোজা। তার সঙ্গে ফিরোজের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় বন্ধুরা অনেকেই দুঃখিত হয়েছিল। জার্মান মেয়েরা এমনিতেই বউ হিসেবে খুব ভাল হয়,

তাদের মধ্যে রোজা আরো বেশি ভাল। তবু ঠিক কী কারণে দুজন নারী-পুরুষের বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

পাখি একবার অন্য কথার মধ্যে বলে উঠল, রোজা আসতে চায় আসুক, সে আবার স্বামীটিকে নিয়ে আসছে কেন? ওর স্বামী তো জার্মান, তার সামনে বাংলায় কথা বলা যাবে না!

আট বছরের বিবাহিত জীবনে রোজা বেশ ভাল বাংলা শিখে নিয়েছিল। উচ্চারণে গণ্ডগোল থাকলেও সাবলীলভাবে কথা বলে যেত বাংলায়। রোজার সেই বাংলা জ্ঞান আর কোনো কাজে লাগবে না।

একটু বাদে বেল বাজতেই সবাই সচকিত হয়ে উঠল। এর মধ্যেই চলে এল। দরজা খোলার পর দেখা গেল অন্য অতিথি, অনিল আর বাদল, ওরা কলকাতা থেকে বুক ফেয়ারে যোগ দিতে এসেছে, এখানে ফারুখের আমন্ত্রিত।

দুজনের হাতে তুলে দেওয়া হল ভদকার গেলাস। বাদল বলল, চমৎকার বিরিয়ানি রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে!

পাশের ঘর থেকে মন্টু চেঁচিয়ে বলল, আর বিশ মিনিটের মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে। তারপর লাঞ্চ সার্ভ করা হবে।

অনিলকে দেখে মালা কিছুক্ষণের জন্য রোজার কথা ভুলে গেল। ঢাকায় থাকতে এই লেখকের অনেক বই সে পড়েছে, এর কবিতা আবৃত্তি করেছে, সেই লেখক জলজ্যান্তভাবে তার ঘরে উপস্থিত। দেখলে মনে হয় সাধারণ একজন মানুষ, লেখক বলে বোঝাই যায় না। রোজা আর তার স্বামী এসে উপস্থিত হল আরো পনেরো মিনিট পরে।

সাধারণ মেয়েদের তুলনায় রোজা বেশ লম্বা তার শরীরের গড়ন, মুখশ্রী ভারী আকর্ষণীয়। একটা হলুদ স্কার্ট পরে আছে। তার তুলনায় তার স্বামীটি একটু বেঁটেই হবে, তবে মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ আছে, ওষ্ঠে হাসি মাখানো। ফিরোজ বেশ লম্বা-চওড়া, তার পাশে রোজাকে ভাল মানাত। মালা ছোট্টোখাট্টো সুন্দরী বাঙালি মেয়ে।

রোজা পরিচয় করিয়ে দিল, তার স্বামীর নাম ক্লাউস। কদিন ধরে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে খুব গরম পড়েছে। এতগুলি অচেনা বিদেশির মধ্যে তার কোনো ভূমিকা নেই সে জানে, তাই মুখখানা হাসি হাসি করে রেখেছে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত যারা আগে থেকে রোজাকে চিনত, তারা এখনকার রোজার মধ্যে উচ্ছলতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না। শান্ত, সংযত ভঙ্গি। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল মালাকে, তারপর একটি ছোট্ট রুপোর বাক্স তুলে দিল তার হাতে। তার মধ্যে রয়েছে খুদে খুদে দুটি রুপোর চামচ।

বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বলল, কী সুন্দর। টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, মায়ের সঙ্গে খুব মিল। দেখ দেখ ক্লাউস! ক্লাউস কাছে এসে নিখুঁত ভদ্রতার সঙ্গে বলল, ভেরি হ্যান্ডসাম!

ফিরোজের সঙ্গে কথা বলছে না রোজা। মালাকেই জিজ্ঞেস করল, ওর কী নাম রাখা হয়েছে?

মালা আড়ষ্টভাবে বলল, এখনও ভাল নাম দেওয়া হয়নি, বাবু বাবু বলে ডাকি।

রোজা বলল, বাবু, বাবুও খুব সুন্দর নাম। আমি কি একবার ওকে কোলে নিতে পারি?

স্পষ্ট আপত্তি আছে মালার, তবু ঘাড় নাড়ল।

দোলনা থেকে বাবুকে কোলে তুলে নিল রোজা, তারপর ঘুরে তাকাল ফিরোজের দিকে।

ফিরোজের সন্তান তার গর্ভেও আসতে পারত, এ বাড়িতে রোজা নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে এ রকম একটা পার্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারত। কিন্তু আট বছরের বিবাহিত জীবনে তার কোনো বাচ্চা হয়নি।

ফিরোজ এবং রোজা যেন কয়েক পলক বেশি সোজাসুজি তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। সেই দৃষ্টির ভাষা অন্য কেউ বুঝবে না।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে রোজাকে দেখছে। এখন রোজাই কেন্দ্রবিন্দু।

বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখতে রাখতে মালাকে রোজা বলল, তুমি খুব ভাগ্যবতী।

রান্নাঘর থেকে অ্যাপ্রন পরা মন্টু এসে বলল, এই রোজা, আমি বিরিয়ানি রান্না করছি, খেয়ে যেতে হবে কিন্তু!

রোজা স্বামীর দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আবিদ হোসেন মন্টু, ফিরোজের চাচাতো ভাই, খুব ভাল রান্না করে।

তারপর মন্টুকে বলল, আমরা লাঞ্চ খেয়ে এসেছি। এখন তো আর কিছু খেতে পারব না!

ফিরোজ এবার ভদ্রতা করে ক্লাউসকে বলল, না, না, আপনাদের খেয়ে যেতেই হবে। প্লিজ বসুন! একটা ড্রিংক দেব?

বিয়ার?

ক্লাউস জানাল সে কোনো রকম মদ্যপান করে না।

বাঙালিরা হঠাৎ কারো বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে গৃহস্বামীর অনুরোধে খেতে বসে যায়। জার্মানরা সেরকম খাবে না। তা ছাড়া এদের সঙ্গে তাদের সে রকম সম্পর্কও নয়।

ক্লাউস আর রোজা কিছুতেই খেতে রাজি নয়। মালা বলল, অন্তত একটা মিষ্টি খেয়ে যান!

রোজা বলল, ঠিক আছে, একটা মিষ্টি আর এক গেলাস পানি!

এবার ওরা বিদায় নেবে, সব মিলিয়ে দশ বারো মিনিট। ফিরোজ ওদের পৌঁছে দিল সিঁড়ি পর্যন্ত। নামবার আগে রোজা বলল, ঘরে বাচ্চাটা রয়েছে, সবাই সিগারেট খাচ্ছে। বন্ধুদের পাশের ঘরে গিয়ে সিগারেট খেতে বলো!

আবার শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন!

বারান্দার ধারে দাঁড়ানো ডালিম আর আহবাবের পাশে এসেছে অনিল আর বাদল।

বাদল বলল, জার্মান ছেলে, অথচ বিয়ার খায় না। এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। অনিল বলল, হয়তো খায়, এখানে খেতে চাইল না।

ডালিম ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটিকে তো বেশ ভালই মনে হল। ডিভোর্স হল কেন?

আহবাব বলল, মেয়েটা বোধহয় বাঁজা। ফিরোজের খুব ছেলেমেয়ের শখ!

বারান্দা দিয়ে দেখা গেল, রাস্তায় নেমে গেছে রোজা আর ক্লাউস। ক্লাউস চাবি দিয়ে গাড়ি খুলছে, এ পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোজা। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছল, তারপর দুটি কাগজ বার করল।

দুখানা মেডিক্যাল রিপোর্ট। রোজা আর ফিরোজ দু জায়গায় পরীক্ষা করিয়েছিল। দু জায়গা থেকে রিপোর্ট দিয়েছে, ফিরোজের সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তবু ফিরোজ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সন্তানের গর্বিত পিতা হয়েছে। অলৌকিক ব্যাপার আজও ঘটে।

কাগজ দুটো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল রোজা।

ক্লাউস জিজ্ঞেস করল, ও কী করছ? কী ছিঁড়ছ?

রোজা বলল, ফিরোজকে ফিরিয়ে দেব ভেবেছিলাম। তারপর মনে হল, ওর আর দরকার নেই।

ক্লাউস মুচকি হেসে বলল, প্রেমপত্র নাকি?

রোজা হাহাকারের সুরে বলল, হ্যাঁ!

আকাশচুম্বী

সন্ধের পর থেকেই একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, ও এমন কিছু না। লোডশেডিং হয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে, তাতেই বা কী আসে যায়। কলকাতার রাস্তার সঙ্গে এখন গ্রামের রাস্তার কোনো তফাত নেই। ওদের দুজনের হাঁটতে একটুও অসুবিধে হয় না।

গড়িয়াহাটের মোড় পেরিয়ে ওরা এগিয়ে গেল গোলপার্কের দিকে। চতুর্দিকে এত মানুষের ভিড়, তার মধ্যে ওরা আলাদা। ওরা নিজেদের নিয়েই মশগুল।

মেয়েটি পরে আছে একটা ফুলছাপ শাড়ি। ওর নাম মুন্নি। ছেলেটি মালকোঁচা মারা ধুতির ওপর পরেছে একটা নীল হাফশার্ট। ওর নাম জাদু।

দুজনেরই তেজি চামড়া, শরীরের কোথাও এক ছিটে চর্বি নেই, কোথাও কোথাও একটু-আধটু ধুলোবালি লেগে আছে অবশ্য।

মুন্নি বলল, আজ রাতে ভাত খাব।

জাদু বলল, রুটি খাবি না? ও দোকানে তো ভাত পাওয়া যায় না।

মুন্নি তবু আদুরে গলায় বলল, অন্য দোকানে খাব। আজ রুটি খেতে ইচ্ছে করছে না।

তারপর ফিক করে হেসে বলল, আজ আমি খাবারের পয়সা দেব।

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওপর লেকের এক কোণে পর পর কয়েকটা দোকানের মাঝখানে একটা হোটেল। ওখানেই রোজ সন্ধেবেলা ওরা খেতে আসে। রুটি, ডাল-তরকা, সবজি, ডিমের ঝোল, কিমা, কারি। গরম গরম সেঁকে দেয় রুটি, পেঁয়াজ লঙ্কা যত ইচ্ছে চাও দেবে।

রাস্তার উলটো দিকেই একটা চীনে রেস্তোরাঁ। সেখানের চেয়ে এই হোটেলের ভিড় অনেক বেশি।

আজ মুন্নি আর জাদু সে দিকে গেল না।

ওরা ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে বাস ডিপোর পেছনটায় আর-একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যে এখানে জ্বলছে একটা হ্যাজাক বাতি। কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। পেঁয়াজ মেশানো মুসুরির ডালের গন্ধে ম ম করছে বাতাস।

মুন্নি আর জাদু ভেতরে ঢুকতে দ্বিধা করছে খানিকটা, একটা বাচ্চা বেয়ারা বলল, আসুন, বসুন, এই তো জায়গা আছে।

ওরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। কোনো কারণ নেই, এমনিই।

ভাত, ডাল আর ঢেঁড়সের তরকারি নিল প্রথমে। সেই খাওয়া শেষ হতে না হতেই বাচ্চা বেয়ারাটা কানের কাছে চেঁচাতে লাগল, আর কী নেবেন। পারশে মাছ, ট্যাংরা মাছ, মটন কারি, ফাউল কারি...

মুন্নি বলল, আজ মাংস খাবো!

জাদুর তাতে কোনো আপত্তি নেই। আজ দুজনের কাছেও অনেক টাকা। এক প্লেট মাংসের সঙ্গে দু-বার ঝোল চেয়ে নিয়ে আরও অনেকটা ভাত। শহুরে সরু চালের ভাত, ঠিক যেন পেট ভরতেই চায় না।

হোটেল থেকে মুন্নি আবার আবদার জানাল, পান খাব।

জাদু পানের দোকানে গিয়ে চার খিলি পান নিয়ে ফেলল। মিঠা পাতা, সুপারি, জরদা, ইলাইচ। পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করল না সে।

তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তার ঘুরল অনেকক্ষণ।

এক সময় বৃষ্টি বেশ ঝেঁপে এল, ওরা দাঁড়ালো একটা গাড়ি বারান্দার তলায়। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

শহরের রাস্তায় ছাতা না থাকলেও চলে। বারান্দার পর বারান্দা, আর দোকানের ঝাঁপের তলা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

বাড়ি। প্রকাণ্ড বাড়ি।

একতলায় অনেকে শুয়ে আছে ঘেঁষাঘেঁষি করে, কুণ্ডলী পাকিয়ে। বৃষ্টির আমেজে ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যে।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেল দোতলায়।

মুন্নি বলল, আরো উপরে চল!

একেবারে ধপধপে নতুন বাড়ি। গতকালই দেয়ালগুলোতে সাদা রঙের পোঁচ পড়েছে, চুন আর এলার গন্ধ। জানলার গ্রিলে রং। হাত দিলে এখনো লেগে যেতে পারে।

দরজা লাগানো হচ্ছে আজ থেকে। এখনো সব ঘর বন্ধ হয়নি।

মুন্নি বলল, আরো ওপরে যাব।

জাদু বললে, আরো উপরে গিয়ে কী হবে? এখানেই থেকে যাবি!

মুন্নি সুর করে বলল, না, না, আরো আরো উপরে যাব!

জাদু মুন্নির কাঁধে হাত দিয়ে বলল, ইস একেবারে ভিজে গেছিস যে রে!

মুন্নি খিলখিল করে হেসে বলল, তুই বুঝি ভিজিসনি!

জাদু নিজের জামাটা খুলে ফেলল। মুন্নির দিকে তাকাল। মুন্নি তো এভাবে শাড়ি খুলে ফেলতে পারে না। সে পরে শাড়ি বদলাবে। এখন তার ওপরে ওঠার নেশা লেগেছে।

ছ তলার ওপরে উঠে এসে জাদু বলল, থকে গেছি। আর উঠতে হবে না। এই ঘরটা কী ভাল দ্যাখ! সব দিকে জানালা।

ঘরটায় ঢুকে পরিদর্শন করে দেখল মুন্নি। অন্ধকার বটে। কিন্তু দেয়ালের নতুন সাদা রং থেকে যেন কিছুটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সঙ্গে একটা মস্ত বারান্দা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ মজা লাগল মুন্নির। একটা নারকেল গাছের মাথা অনেক নীচে। গ্রামে থাকার সময় মুন্নি দেখেছে, নারকেল গাছের মাথা সব সময় বাড়ি ছাড়িয়ে যায়। এখানে নারকেল গাছটা পাল্লায় হেরে গেছে।

চিক করে একটু থুতু ফেলল মুন্নি। কোথায় হারিয়ে গেল সেই থুতু।

তারপর সে বলল, চল, উপরে চল।

জাদু বলল, আবার? এই ঘরটা তোর পছন্দ হল না?

মুন্নি হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগল। কত ঘর, একশো, দুশো, এর মধ্যে যে কোনো ঘরেই ইচ্ছে করলে ওরা থাকতে পাবে। রাজা বাদশাদেরও এত ঘর থাকে না।

সে বলল, চল না। চল না।

সাত তলা, আট তলা, ন তলা...। দশ তলায় এসে মুন্নির পা ব্যথা হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিং ধরে সে দম নিচ্ছে।

জাদু এখানেও থামবে না। ওপরেই যখন উঠেছে, তখন একেবারে উপরে উঠে যাবে না কেন?

সে মুন্নির হাত ধরে টেনে বলল, আয়।

মুন্নি বললো, দাঁড়া, দাঁড়া, একটু শ্বাস নিই!

টপ করে জাদু পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মুন্নিকে।

মুন্নি হাত-পা ছুড়ে বলতে লাগল, আরে আরে, ছাড়, ছাড়, পড়ে যাব। তুইও তো থকে গেছিস।

কে শোনে কার কথা। মুন্নিকে কোলে নিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল জাদু।

ওপরে এসে একটা গোটানো মাদুরের মতন মুন্নিকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সে।

জাদুও খুব হাঁপিয়ে গেছে। বুকটা উঠছে আর নামছে তার।

এগারো তলা। এটাই সবচেয়ে উঁচু। সারা বাড়িতে আলো নেই, কিন্তু এখানে আকাশের আলো আছে। ভিজে শাড়িতে মুন্নির হিলহিলে শরীরটা স্পষ্ট।

জাদু বলল, এখানে থাকব। সকলের মাথার ওপরে। কোন ঘরটায় শুবি বেছে নে।

পর পর অনেকগুলো ঘর। যে-কোনো ঘর ওদের শয়নকক্ষ হতে পারে। মুন্নি আগেই একটা বেছে রেখেছে মনে মনে। দক্ষিণ দিকের কোণের ঘর।

তিন দিক খোলা এই ঘর। এখান থেকে গোটা শহরটাকেই পায়ের তলায় মনে হয়। দূরের দিগন্তকে মনে হয় সমুদ্র।

জাদু দেয়ালে হাত বোলাতে লাগল খুব মায়ার সঙ্গে। মুন্নি মাথায় করে ইট বয়ে এনেছে, সে সিমেন্ট গেঁথেছে। কত মসৃণ হয়েছে দেয়াল। এ ঘর তার সৃষ্টি। তাদের দুজনের।

কাল থেকে সব ঘরে দরজা বসে যাবে। দরজার সঙ্গে তালা। তখন সব ঘর বন্ধ হয়ে যাবে।

কাল থেকে ইলেকট্রিক মিস্তিরি, কলের মিস্তিরিরা কাজ করবে। জাদু মুন্নিদের কাজ শেষ। ওরা চলে যাবে।

আজ রাত পর্যন্ত এই সব ঘরের ওপর ওদের অধিকার আছে। এই শহরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘরখানিতে ওরা শুয়ে থাকবে পাশাপাশি। ওদের নিজের হাতে গড়া ঘর। না ঘুমিয়ে ওরা জেগে জেগে গল্প করবে সারারাত।

দুজনেই দেওয়ালে হাত বুলোচ্ছে। তারিফ করছে মসৃণতার।

জাদু জিজ্ঞেস করল, ভিজে শাড়িটা খুলবি না? এখানে তো আর কেউ নেই। শরমের কী আছে?

মুন্নি ভ্রূভঙ্গি করে বলল, না। খুলব না।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দায়। বাবু-বিবিদের মতন পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরল। গালে ঠেকাল গাল।

মুন্নি হাসতে হাসতে বলল, আমাদের বাড়ি।

জাদু মুন্নিকে আরও জোরে টেনে বলল, আমাদের বাড়ি।

তারপর দুজনেই হাসতে লাগল পাগলাটে গলায়।

একটু পরে রেলিং-এ অনেকখানি ঝুঁকে মুন্নি তার জিভটা বার করল। নীচের দিকে অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে শহর। মুন্নি দেখছে ওপরের দিকে। জাদু জিজ্ঞেস করল, ও কী করছিস?

মুন্নি বলল, দ্যাখ দ্যাখ, আকাশ কত কাছে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, না?

জাদু হাত তুলে বলল, কই, ছোঁয়া যাচ্ছে না।

মুন্নি বলল, দূর বোকা, তুই কিছু বুঝিস না। দ্যাখ না, মেঘ নিচু হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামবে। একটু মেঘ খেয়ে দ্যাখ না। জিভে লাগছে।

জাদুও জিভ বার করে দিল।

তারপর দুজনে মহা উল্লাসে মেঘ খেতে লাগল।

শিকার কাহিনী

মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আগে কখনো কলকাতায় আসেনি। হাওড়া স্টেশনে সকাল পৌনে দশটায় ভিড়ের মধ্যে সে স্পষ্টতই একা। একটা হলদে ডুরে তাঁতের শাড়ি পরা। কপালে লাল টিপ। সিঁথিতে অনেকখানি সিঁদুর। তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। পাতলা দোহারা চেহারা। একটু বেশি লম্বা বলে হিলহিলে ভাব আছে। তার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রথম দেখা শহরের ছবি।

অফিস টাইমে, সবাই ব্যস্ত। হুড়োহুড়িতে মত্ত। এমন সময় সিঁথিতে অতখানি সিঁদুর দেওয়া কোনো রমণীকে মানায় না। সে জনস্রোতে ধাক্কা খাচ্ছে। কেউ কেউ ইচ্ছে করে তাকে খোঁচা মারছে। সে স্রোতের ফুলের মত দুলছে এদিক ওদিক।

তার হাতে একটা ছোট চটের থলি, অন্য হাতে একটি পোস্ট কার্ড।

সে একজন মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে বলছে, ও দিদি, ও দিদি!

সবাই কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে ট্রেনে চাপে। হাওড়ায় নেমেই ছুটে গিয়ে বাসের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। নইলে অফিসে লেট মার্ক পড়ে। এখন কি কারুর একটা বাজে হাতে-লেখা পোস্টকার্ড পড়ার সময় আছে?

তবু কেউ কেউ দাঁড়ায়। সমস্ত শরীরটা অস্থিরতায় দুললেও সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির কথা শুনতে চায়। শুনে, অসহায় ভাব করে।

পোস্টকার্ডটায় এক-পিঠে একটা ঠিকানা লেখা আছে। তারা-মা কেমিক্যাল ওয়ার্কস; ৩/২ গণেশ সাহা লেন। কলিকাতা।

এরকম একটা অজ্ঞাত রাস্তা কে চিনবে? পোস্টাল জোন পর্যন্ত লেখা নেই।

একজন মধ্য বয়স্কা, ফরসা, গালভারি চেহারার মহিলা সমস্ত পোস্টকার্ডটি পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একলা এসেছো? কলকাতায় তোমার আর কেউ চেনা নেই?

মেয়েটি দুদিকে মাথা নাড়লো।

মহিলা বললেন, এ রকম হুট করে কি কেউ আসে? কলকাতা শহর...বড় কঠিন জায়গা।

মহিলাটি বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন, তাঁর চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। তাই তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে যায়।

মহিলাটি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কেউ গনেশ সাহা লেন চেনেন?

একজন বললো, ভবানীপুরে বোধহয়। আর একজন বললে, বাগবাজারে। আর একজন বললো, বড়বাজারে গনেশ দাস লেন আছে একটা। আর একজন বললো, কলকাতাতে নয়, তারা-মা কেমিক্যাল ওয়ার্কস তো দক্ষিণেশ্বরে।

মহিলাটি রাগ রাগ চোখ করে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে পারবেন?

অমনি ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

ফরসা মহিলাটি এই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বউটিকে বললেন, আমার হাতে তো একদম সময় নেই ভাই। না হলে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম। তুমি বরং পুলিশের কাছে গিয়ে খোঁজ করো।

মহিলাটি পোস্টকার্ডটি ফেরত দিয়ে এগিয়ে গেলেন। একটুখানি গিয়ে আবার পেছন ফিরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।

মেয়েটি তবু মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলো। পুলিশ শব্দটি তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। জন্ম থেকেই সে জেনে এসেছে, পুলিশের কাছাকাছি যেতে নেই। প্রজাপতি যেমন চড়াই পাখির কাছে যায় না, চড়াই পাখি যেমন বেড়ালের কাছে যায় না।

কলকাতার পুলিশ কি আর অন্যরকম হবে?

একটা ট্রেন পৌঁছে গেছে। পরবর্তী ট্রেন একটু পরে আসবে। মাঝখানের সময়টায় প্ল্যাটফর্ম একটু ফাঁকা হয়।

তখন পাজামার ওপর নীল শার্ট পরা একটা লোক, টিমসে চেহারা, মুখখানা ছুঁচালো ধরণের, একটা সিগারেট টানতে টানতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিষ্টুপদকে খুঁজতে এসেছো?

মেয়েটি আবার কেঁপে উঠলো। কেউ যেন তার হাতে চাঁদ গুঁজে দিল এইমাত্র। এই লোকটা তার স্বামীকে চেনে?

লোকটি বললো, তুমি বিষ্টুদার বউ?

মেয়েটি এবার জোরে জোরে মাথা নাড়লো।

লোকটি আবার বলল, তারা-মা কেমিক্যালে বিষ্টু তো আমার সঙ্গেই কাজ করে। বিষ্টু বলছিল বটে, ছ মাস বাড়ি ফেরা হয়নি। আমার বউটা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে। বিষ্টু গত হপ্তায় তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে, তুমি পাওনি।

মেয়েটি বলল, কই না তো!

লোকটি বললো, বিষ্টু এখনো বাড়ি ভাড়া করতে পারেনি, তাই তোমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমার সঙ্গেই থাকে। তা বলে তুমি হুট করে চলে এলে? কানের ফুল দুটো কিসের, রুপোর? হাতের লোহাটা সোনা দিয়ে বাঁধানো, না পেতলের? আরে দিদি, এই সব গয়না পরে কোনো মেয়েছেলে একা একা কলকাতা শহরে আসে? এ কেমন জায়গা তা তো জানো না! পদে পদে বিপদ! ভাগ্যিস, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চলো!

মেয়েটি অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব? আপনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাবেন?

লোকটি বলল, হাওড়ায় শালকেতে আমাদের জায়গা। তার পাশেই আমার বাড়িতে বিষ্টু থাকে। তোমাকে দেখে বিষ্টু একেবারে অবাক হয়ে যাবে! তুমি এমনভাবে চলে এসেছ বলে বকুনিও দেবে তোমাকে। যাক গে, সে তোমরা বুঝবে!

লোকটির সঙ্গে এবার নিশ্চিন্তে এগোলো মেয়েটি। তার স্বামী তাকে বকুনি দেয় তো দিক! সেও কম বকবে না। ছ মাস আগে এই একখানা পোস্টকার্ড এসেছিল, তারপর মানুষটার আর কোনো পাত্তা নেই।

যেতে যেতে লোকটি বলল, আমার নাম ঘনশ্যাম। বিষ্টু আমার কাছে সব কথা বলে। তোমার জন্য ওর খুব কষ্ট। তোমার নাম কী যেন!

বিষ্টু বলেছে, ভুলে যাচ্ছি।

—সাবিত্রী। সাবিত্রী মাইতি।

—ও হ্যাঁ, সাবিত্রী। সকালে কিছু খেয়েছ? মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খাওয়া হয়নি কিছু। সঙ্গে পয়সাকড়িও কিছু নেই নিশ্চিত। ছি, ছি, এভাবে কলকাতায় এসে পড়লে। আমার সঙ্গে দেখা না হলে কী বিপদেই যে পড়তে। নাও, একটু চা আর বিস্কুট খেয়ে নাও।

সাবিত্রীর চোখে জল এসে গেল। সারা রাস্তা সে ভয়ে ভয়ে এসেছে। ট্রেনেও দুটো লোক তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। তবু সে এসেছে বেপরোয়া হয়ে। এখন একজন মানুষের মুখে এসব সহৃদয় কথা শুনলে তার কান্না আসবে না?

চা ও একখানা নোনতা বিস্কুট খেয়ে ওরা বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে। ভিড়ের জায়গাগুলো এড়িয়ে, পেছন দিকের ব্রিজের কাছে এসে একটা রিকশ ডাকল ঘনশ্যাম। সাবিত্রীকে আগে তাতে ওঠাল। তারপর সে রিকশয় পা দিতে যাবে, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

একটু দূর থেকে একজন হেঁড়ে গলায় ডাকল, অ্যাই লটকা!

সেই ডাক শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ঘনশ্যামের। মুখ ঘুরিয়ে আহ্বানকারীকে দেখতে পেয়েই সে এক মুহূর্ত দেরি করলো না। পাঁই পাঁই করে ছুট দিল প্রাণপণে। এঁকে বেঁকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল কোথায়।

যে ডেকেছিল, তার পরনে একটা কালো রঙের প্যান্ট, ধূসর গেঞ্জি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে লোহার বালা, মাথার চুল তেল-চকচকে। বেশ মজবুত শরীর।

সে কাছে এসে সাবিত্রীকে আপাদমস্তক দেখল, হুঁ! এই মেয়ে, তুমি ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে?

সাবিত্রীর বুক টিপটিপ করছে। ওই লোকটা তার স্বামীর বন্ধু তাকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলেছিল, তবু হঠাৎ পালাল কেন? এবার তার কী হবে?

সাবিত্রী বলল, উনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন! ঘনশ্যামবাবু কোথায় গেলেন?

মজবুত চেহারার ছোকরাটি বলল ঘনশ্যাম? সাত জন্মে ওর নাম ঘনশ্যাম নয়। ওর নাম লটকা। ও ব্যাটা তো একটা শেয়াল। প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করে! ও তোমাকে কোথাও পৌঁছে দেবে বলেছিল? হা-হা-হা-হা।

হাসি থামিয়ে সে বলল, ব্যাটাকে ধরতে পারলে মাথা গুঁড়িয়ে দিতুম। আমার টাকা মারার তাল! ওগো মেয়ে, ও তোমাকে খাবার মতলবে ছিল!

সাবিত্রী বলল, না, না, উনি আমার স্বামীকে চেনেন। নাম বললেন, এক সঙ্গে কাজ করেন!

—লটকা কাজ করে? ছোঁক ছোঁক করা ছাড়া আর কোনো কাজ ও জানে? তোমার হাতে ওটা কী?

—আমার স্বামীর চিঠি।

—ওই লটকা ব্যাটা কোনো ফাঁকে উঁকি মেরে চিঠিখানা দেখে নিয়েছে। তাই থেকেই বানিয়েছে যে তোমার স্বামীকে চেনে। ছেঃ! ব্যাটাকে ধরা গেল না। দেখি, ঠিকানাটা দেখি—

পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে উলপে পালপে দেখে সে বলল, তারা মা কেমিকেল! গণেশ সাহা লেন। শিবপুর। আমাদের পাড়াতেই। দ্যাখা যাক, সেখানে তোমার মরদকে পাওয়া যায় কি না। সরে বসো!

এক লাফ দিয়ে রিকশয় উঠে বসে রিকশওয়ালাকে বলল, এই ব্যাটা জোরে ছুটবি! টিকিস টিকিস করলে লাথি খাবি!

রিকশটা ছুটতে শুরু করতেই যুবকটি বলল, ভয় নেই। আমি তোমায় ভাল জায়গায় রাখব!

সাবিত্রী বলল, আমি আমার স্বামীর কাছে যাব।

তা তো যাবেই। ওই লোকটার হাতে পড়লে কোনোদিন পৌঁছতে পারতে না; সোজা তোমাকে আসল পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তুলত।

—আমার স্বামীকে আপনি চেনেন?

—চিনি না। কিন্তু খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। ঠিকানা যখন আছে। আজ না হয় কাল পাওয়া যাবে, কাল না হয় পরশু!

—আমি আজকেই যাব।

—যাবে, যাবে! ঠিক হয়ে বসো। কান্নাকাটি কোরো না। কোনো লাভ নেই। তুমি সিগ্রেট খাবে?

—আমি খাই না।

ব্রিজ পার হবার পরেই বৃষ্টি নামল। রিকশর ছাউনি তুলে দিতে হল। ছোকরাটি তখন একটা হাতে সাবিত্রীর কোমর বেষ্টন করল। তারপর বেশ ভাব দিয়ে বলল, গ্রাম থেকে চলে এসেছ, ভাল করেছ। গ্রামে কি মানুষ থাকে? যত সব ক্যাংলা পার্টি। আমিও চলে এসেছি।

—একটু সরে বসুন। গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

—তবে কি তোমার বুকে হাত দেব সোনা।

ঠিক এই সময় এমনভাবে একটা জিপ এসে থামল সামনে যে রিকশটা উলটে যেত আর একটু হলে।

একজন পুলিশ অফিসার ঝট করে জিপ থেকে নেমেই রিভলভার তুলে বললেন, এই ছোটেলাল, নাব, নাব। এদিক ওদিক করলেই কিন্তু খোপরি উড়িয়ে দেব।

জিপ থেকে আরও একজন কনস্টেবলও নেমেছে। তার হাতে বেঁটে লাঠি।

ছোটেলাল একবার কোমরের কাছে লুকানো ছুরিতে হাত বুলাল, কিন্তু বার করল না। এই রজত দারোগা কতটা হিংস্র সে ভাল করেই জানে, সত্যি সত্যি গুলি চালিয়ে দিতে পারে। দু মাস একে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। রোজগারপাতি যে এখন কম, তা এই দারোগা বুঝবে না।

দারোগাটির পেটানো চেহারা, চওড়া বুক, সরু মধ্যদেশ। চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। সে বলল, হারামজাদা, আমার হাত এড়িয়ে পালাবি কদিন? আমি ইচ্ছে করলে ধরতে পারিনি, এমন কালপ্রিট জন্মায়নি আজও। সঙ্গে আবার ভাল চেহারার মেয়ে জুটিয়েছিস! দিন-দুপুরে মেয়ে নিয়ে রিকশয় ঘুরছিস, তোর পাখা গজিয়েছে দেখছি!

কনস্টেবলটিকে সে বলল, ওর হাত দুটো পিছ মোড়া করে বাঁধো। দেখো, সাবধান, এটা একেবারে নেকড়ের মতন শয়তান। ছুরি থাকে, বার করে নাও আগে।

ছোটেলাল বলল, বড়বাবু, এই মেয়েছেলেটি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই ওকে পৌঁছে দিচ্ছিলুম!

দারোগাটি মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রবল জোরে হেসে উঠল।

তারপর বললে, তুই পৌঁছে দিচ্ছিলি? অ্যাঁ? কেন, তোর বুঝি খিদে নেই?

ছোটেলাল বললে, বড়বাবু, আপনি তবে ওকে নিন। আমাকে ছেড়ে দিন এবারটির মতন!

দারোগা গর্জন করে বলে উঠল, চোপ! ওর কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না!

তারপর ছোটেলালের চুলের মুঠি ধরে বললো, ওঠ গাড়িতে! এবার তোর মাথা যদি ভেঙে না দিই তো আমার নাম মাধব সরদার নয়!

ছোটেলালকে জিপের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বেশ নরম গলায় দারোগাটি সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কবে থেকে লাইনে নেমেছ? আগে তো দেখিনি!

সাবিত্রী সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, বাবু, আমি পুরুলিয়া থেকে এসেছি, আমার স্বামীকে খুঁজতে। এই যে আমার স্বামীর চিঠি!

পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে দারোগাটি সব পড়ল। তারপর বলল, ঠিক আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওঠো, জিপে এসো!

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসল দারোগা, তার পাশে বসাল সাবিত্রীকে। সাবিত্রী কখনো এরকম গাড়িতে চড়েনি।

একটু পরে দারোগাটি জিজ্ঞেস করল, তোমার স্বামী তোমাকে একলা গ্রামে ফেলে কলকাতায় চাকরি করতে এল?

সাবিত্রী বলল, এখান থেকে কয়েকজন বাবু গিয়েছিল আমাদের গ্রামে। তারা ওকে বলল, কলকাতায় চাকরি দেবে। ভাল মাইনে, কারখানায় কাজ। বাবুরাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

—হুঁ, বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে এল। কী রকম বাবু কে-জানে। তোমাকে একা রেখে এল?

—ওখানে আমার এক বুড়ি পিসিমা থাকে। ও বলেছিল, এক মাসের মধ্যে আমাকে পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে।

—তারপর আর পাত্তা নেই? এই একটামাত্র চিঠি লিখেছে।

—আমি দুখানা পত্তর পাঠিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি।

—হুঁ, তা হলে কলকাতায় অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়ে মজেছে। তোমাকে ভুলে গেছে।

—না গো, বাবু, না, না, সে তেমন মানুষই নয়।

—কে কখন বদলে যায়, তা কি বলা যায়? এ তো আর গ্রাম নয়, শহর বড় মজার জায়গা। তা তুমি চলে এসে ভাল করেছ। গ্রামে থাকলে তো খেতেই পেতে না। শুধু শুধু এমন শরীরটা নষ্ট করতে।

—বাবু আমার এখন কী হবে?

—ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

—থানার কাছে এসে জিপটি থামতেই দারোগাটি কনস্টেবলকে বলল, তুমি ছোটেলালকে গারদে নিয়ে যাও। একটু দলাই মলাই করো। আমি আসছি। এই মেয়েটাকে কোনো আশ্রম টাশ্রমে পৌঁছে দিতে হবে তো!

ছোটেলাল জিপ থেকে নামবার পর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আশ্রম না ছাই। ওগো মেয়ে, তুমি এবার বাঘের খপ্পরে পড়লে।

জিপের ড্রাইভার এবং কনস্টেবল দুজনেই গোঁফের ফাঁকে হাসল।

জিপ ছাড়তেই সাবিত্রী বলল, আমি আশ্রমে যাব না। আমি স্বামীর কাছে যাব।

দারোগা বলল, যাবে, যাবে যেখানেই যাও, অত তাড়াহুড়ো কিসের? পুলিশের হাতে পড়েছ। এজাহার দিতে হবে না? ড্রাইভার, আগে গেস্ট হাউস চলো।

এই থানার মধ্যে কয়েকটা জুট মিল আছে। তার মধ্যে একটির রয়েছে চমৎকার গেস্ট হাউস। গঙ্গার ধারে নিরিবিলি। সব রকম খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা। দারোগাবাবু সে গেস্ট হাউস যখন তখন ব্যবহার করতে পারে।

বাঘের যেমন স্বভাব, দেরি সহ্য হয় না। খিদে পেয়েছে, সামনে খাদ্য তৈরি, সন্ধের অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। বাঘকে কে না ভয় পায়।

জিপটা এসে থামল বাগানবাড়ির পেছন দিকে। সেখানে একটা ছোট দরজা। দারোগাকে দেখে একজন আরদালি সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিল। সাবিত্রী ভয়ের চোটে নামতে চাইছিল না, তাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হল ভেতরে।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দারোগা তার ঘাড় কামড়ে ধরে গরগর করতে করতে বলল, চেঁচাবি না, হারামজাদি, তা হলে এক্ষুণি শেষ করে দেব। চুপচাপ থাক, দুতিনদিন পর স্বামীর কাছে পৌঁছে যাবি।

দোতলার বড় ঘরটির দরজা ঠেলে খুলতেই অন্য দৃশ্য।

লোকে বলে, এক অরণ্যে বাঘ আর সিংহ একসঙ্গে বাস করে না। কিন্তু শহরে ও নিয়ম খাটে না। এখানে বাঘেরও বাবা আছে, বাঘ আর সিংহ দিব্যি সহাবস্থান করতে পারে।

এই ঘরটার সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে সাতখানা জুট মিলের মালিক দুর্জয় সিং। বিশাল চেহারা। চোখ দুটো ভাটার মতন। মাথায় পরচুলা। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

দারোগাকে দেখেই দুর্জয় সিং হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, এই যে দারোগাবাবু, আপনি আমার দুজন লোককে অ্যারেস্ট করেছেন? আপনাকে প্রতি মাসে মোটা খাওয়াচ্ছি, তাতে হয় না। মন্ত্রীদের দিয়ে টেলিফোন করাতে হবে?

দারোগা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল, আপনার লোককে ধরেছে? কই, আমি জানি না তো!

দুর্জয় সিং আবার ধমক দিয়ে বললে, আপনি জানেন না? তাদের এমনি এমনি ফটকে পুরল? বাঁকুড়ায় ট্রান্সফার হতে চান, না সাসপেন্ড হতে চান।

দারোগা বলল, নিশ্চয়ই ভুল করে ধরেছে। আমি দেখছি। একটু পরেই থানায় গিয়ে দেখছি।

দুর্জয় সিং বলল, একটু পরে কেন, এক্ষুনি যান? ডিউটি ফেলে রাখবেন না। এখানে এখন কী করতে এসেছেন?

দারোগা বলল, এই মেয়েটা স্যার, হারিয়ে গেছে। ছোটেলালের খপ্পরে পড়েছিল। এর সঙ্গে ক্রিমিন্যালদের কোনো কানেকশন আছে কি না, তা একটু জেরা করে দেখতে হবে। সেইজন্যেই নিরিবিলিতে...বেশিক্ষণ লাগবে না, বড় জোর চল্লিশ মিনিট।

দুর্জয় সিং এই প্রথম সাবিত্রীকে দেখল। উঠে এসে একবার সামনে, একবার পেছনে, একবার থুতনি তুলে। তারপর বলল, বাঃ এ যে একেবারে ফ্রেস মাল দেখছি। কোথায় পেলে?

—আজই ট্রেন থেকে নেমেছে।

—বা-বা-বা-বা! আজকাল যতই টাকা খরচ করুন, ফ্রেস কিছুতেই পাওয়া যায় না। সবই কোল্ড স্টোরেজ আর

ডিপ ফ্রিজের মাল। জানেন তো, যতই খুবসুরত হোক, আর এ সব পোশাকের বাহার থাকুক, ফ্রেস জিনিসের স্বাদই আলাদা। এখানে একে আপনি জেরা করবেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি থানায় গিয়ে ডিউটি করুন। আমি জেরা করছি। আজ আমার মনমেজাজ ভাল নেই। দেখি, এই ফ্রেস জিনিসটি খেলে আমার তবিয়ত ঠিক হয় কি না।

দারোগাটি দুর্জয় সিং এর চোখের দিকে তাকাল। নিজের লেজটা আছড়াতে আছড়াতে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে গরগর করতে করতে বলল, না একে আমিই জেরা করব। বলছি তো বেশিক্ষণ লাগবে না।

দুর্জয় সিং হেসে বলল, ঠিক আছে, একদিনের জন্য জামিন তো দিতে পারেন? একদিন জামিন রাখতে কত লাগবে বলুন। তারপর কাল আপনি যত ইচ্ছে জেরা করবেন। কত লাগবে, কত?

পকেট থেকে এক মুঠো একশো টাকার নোট বার করে সে ছুড়ে দিল দারোগার বুকে। নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দারোগা একবার তাকাল সাবিত্রীর দিকে, আর একবার দুর্জয় সিং এর দিকে। তারপর ঠোঁট চাটতে চাটতে পিছিয়ে গেল এক পা এক পা করে।

দুর্জয় সিং বলল, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

সিংহ সমাজে একটা নিয়ম আছে। পুরুষ সিংহরা বসে থাকে এক জায়গায়, সিংহিনীরা শিকার করে। সিংহিনী সব জোগাড় করে দেয়, সিংহ দয়া করে খায়। তারপর সিংহিনীই সিংহের গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়।

এখানেও সেরকম একটা কিছু ঘটল।

একটা এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়ি এসে থামল প্রধান দরজায়। খুব ফরসা, স্থূলাঙ্গিনী, চোখে কালো চশমা পরা এক মহিলা সেই গাড়ি থেকে নেমে ধুপধাপ করে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। একজন আরদালি কিছু বলতে এল তাকে, সে এক ঠেলায় সরিয়ে দিল তাকে। তারপর ওপরে এসে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা।

দুর্জয় সিং তখন সবেমাত্র সাবিত্রীর আঁচলটা খুলে ফেলেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বলল, কে?

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি তা গ্রাহ্য না করে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, এ কে?

দুর্জয় সিং কোনো উত্তর দিল না।

মহিলাটি নাক কুঁচকে বলল, ছিঃ এই তোমার রুচি হয়েছে? অ্যাংলো মেয়ে, বম্বের ফিলম অ্যাকট্রেস, অ্যামেরিকান হিপি, কলেজে পড়া বাঙালি মেয়ে, এ সব কোনো কিছুতেই আমি আপত্তি করি না। খাও না, যত ইচ্ছে খাও। তা বলে এই নোংরা, গরিব, গেঁইয়া চাই তোমার? এর কত, কোন রোগ আছে তার ঠিক কী? ছি ছি ছি ছি, তুমি খানদানি মুসলমান, পাহাড়ি মেয়ে, অফিসারের বউ কী চাও বলো? এটাকে দূর করে দাও।

তারপর পা থেকে চটি খুলে সাবিত্রীকে মারতে মারতে বলতে লাগলো, বেহদ্দা, রেন্ডী কাঁহিকা। দূর হয়ে যা। মর, তুই মর। তোকে শিয়ালকুকুরে খাক। তুই এসেছিস সিংহের গুহায়।

মার খেয়ে সাবিত্রী মাটিতে পড়ে যেতেই স্ত্রী লোকটি হাঁক দিল, আরদালি, এই রেন্ডীটাকে অনেক দূরে মাঠের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসো।

নদীর ধারে, একটা আবর্জনার স্তূপের ধারে বসে সাবিত্রী এখন অঝোরে কাঁদছে। শুধু কেঁদেই চলেছে। সে এখন কোথায় যাবে, তা জানে না। এরপর কী।

কোনো কবি হলে এই জায়গায় হয়তো লিখতেন, এক সময় সাবিত্রীর প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুক্তো হয়ে ঝরতে লাগল, যাদের হৃদয়ে পরিতাপ থাকে, তারাই শুধু দেখতে পায় সেই মুক্তো, তারা হাতজোড় করে সাবিত্রীর সামনে এসে বসল।

কোনো পেশাদার প্রগতিশীল হলে বলতেন, সাবিত্রীর চোখের জলের ফোঁটাগুলো আসলে এক একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। ক্রমশ সেই সব অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, সেই আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে দিল দুর্জয় সিংহের মতন অত্যাচারীদের।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। সাবিত্রী শুধুই অসহায়ভাবে কেঁদে চলেছে।

গল্প লেখকের মুশকিল, এভাবে গল্প শেষ করা যায় না। ধরা যাক, অন্য একজন পুলিশ অফিসার, কিছু কিছু পুলিশ তো সৎ ভদ্র থাকতেই পারে, তাদের একজন সাবিত্রীকে পৌঁছে দিল তার স্বামীর কাছে। তা হলে কিন্তু সেটা গল্প হবে না। কিংবা এক সহৃদয় ভদ্রলোক কিংবা তরুণ আদর্শবাদী সাবিত্রীকে যত্ন করে তুলে দিল পুরুলিয়ার ট্রেনে। বাস্তবে এরকম ঘটে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়লে সবাই বলবে, বাজে গল্প।

সুতরাং সাবিত্রী ওখানেই বসে থাক, কাঁদুক।

শুধু অসমাপ্ত গল্পের অস্বস্তিতে আর সাবিত্রীর কান্নার শব্দে লেখকের একটা দিন মন-খারাপ অবস্থায় কাটবে।

দরজা খোলার পর

একদিকে টুং করে দরজার বেল বাজল। অন্যদিকে ঝনঝন করে টেলিফোন। টেলিফোনটা খাবারের টেবিলের কাছেই, সুশোভন চেয়ারটা একটু সরিয়ে এনে টেলিফোনটা ধরলেন। দেবযানী তাকালেন বাইরের দরজার দিকে। স্বামীকে মাছের ঝোল তুলে দিচ্ছিলেন দেবযানী, এক হাতে ঝোলসুদ্ধ হাতা ; একটু আগে যোগব্যায়াম করেছেন, এখনও স্নান হয়নি, মুখখানা ঘামে তেলতেলে, স্বচ্ছ রাত্রিবাস পরা, বুকে একটা তোয়ালে জড়ানো। এই অবস্থায় বাইরের লোকের সামনে যাওয়া যায় না, তবে দরজা কে খুলবে? দিলীপকে দই কিনে আনবার জন্য পাঠানো হয়েছে বাইরে।

দেবযানী মুখ ফেরালেন স্বামীর দিকে। সুশোভন টেলিফোন কানে দিয়ে ও আচ্ছা বলে যাচ্ছেন, মুখে ঈষৎ হাসি, স্ত্রীর চোখে চোখ পড়ল না।

বাইরে যে এসেছিল, সে অধৈর্য হয়ে আর একবার বেল বাজাল। দেবযানী হাতাটা নামিয়ে রেখে শয়নকক্ষে গিয়ে তোয়ালেটা খুলে দ্রুত একটা শাড়ি জড়িয়ে নিলেন। রাত-পোশাকের হাতা থাকে না, দু কাঁধের কাছে এমন গোল গোল করে কাটা যে স্তনের আভাস চোখে পড়ে, কোনওরকমে ঢাকাঢুকি দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

প্রত্যেকবারই দরজা খোলার আগে পর্যন্ত মনে হয়, এমন কেউ এসেছে যাকে বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। কোনও মানী লোককে অপমান করা হয় কিংবা কোনও প্রিয়জনের প্রতি দেখানো হয় অবজ্ঞা। অধিকাংশ সময়েই অবশ্য এ ধারণা মেলে না। ফ্ল্যাট বাড়িতে যে-কোনও ফেরিওয়ালা বা চাঁদা প্রার্থী সেও বেল বাজাতে পারে। এখন এসেছে কুরিয়ার সার্ভিসের একজন লোক।

ইদানীং ডাক বিভাগের ওপর অনেকেরই আস্থা নেই। কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড়ের নীতি গল্পটা এখন আর মেলে না। খরগোশ অনেক আগে পৌঁছে যায়, কচ্ছপই মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ে, কুরিয়ার সার্ভিসে খরচও এমন কিছু বেশি না, ওদের লোকগুলো খরগোশের মতোই দরজার সামনে অস্থির থাকে।

দেবযানী সই করে নিলেন। এমন কিছু জরুরি চিঠি নয়, খামটা দেখলেই বোঝা যায়। খুব সম্ভবত কোনও কবি যশোপ্রার্থী একটা লেখা পাঠিয়েছে সুশোভনের কাছে। সই করে নেওয়া চিঠি, বলা যাবে না যে পাইনি।

সুশোভনের ফোনে কথা বলা এখনও শেষ হয়নি। একটি মেয়ে, নিজের নাম জানাবে না, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে, মানুষকে বিশ্বাস করা কি ভুল? কোনও মানুষকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে সব কিছু দিতে গেলেও সে কেন হৃদয়হীন অমানুষ হয়ে ওঠে? কীভাবে খাঁটি মানুষ চেনা যায়? আপনি সাহিত্যিক, আপনি নিশ্চয়ই এ সব বলতে পারবেন। আপনার লেখার যোগ্য...

সুশোভন খেতে বসেছেন, এখন দুপুর সাড়ে বারোটা, খেয়ে উঠেই তাঁকে বেরুতে হবে। এই সময় এই ধরনের ছেঁদো কথাবার্তা শুনতে কারুর ভাল লাগে? মেয়েটি হয়তো কোনও পুরুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে, কিন্তু কারুর ব্যক্তিগত সমস্যা কি লেখকদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব? লেখকরা নিজেদের সৃষ্টি করা চরিত্রগুলির সমস্যা মেটাতেই হিমশিম খেয়ে যান, কারুর বাস্তব সমস্যার কাছে তারা অসহায়। তবু অনেকে মনে করে, তার গোপন দুঃখের কথা আর কারুকে বলা না গেলেও একজন লেখককে জানানো যায়। সেই লেখক তখন খেতে বসেছেন, কিংবা লিখছেন কিংবা অন্য জরুরি কাজে ব্যস্ত কি না, সে সব কেউ খেয়াল করে না।

তবু রূঢ়ভাবে আমি এখন ব্যস্ত বলে ফোন রেখে দেওয়া যায় না। দুচারটে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেই হয়। রূঢ় ব্যবহার করা স্বভাবও নয় সুশোভনের। তিনি হ্যাঁ, তাতো বটেই, মানুষ চেনা শক্ত, তবু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই, এ ধরনের মামুলি উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

ফোনটা রাখার পর তিনি আপন মনে বললেন, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

দেবযানী বললেন, তুমি আর একটা মাছ নেবে? সুশোভন বললেন, না থাক। দিলীপ এখনও দই আনল না? কে বেল দিয়েছিল?

টেবিলের ওপর খামটা রাখলেন দেবযানী। চিঠি জমে যাওয়া নিয়ে দেবযানীর অভিযোগ আছে। প্রতিদিনই কয়েকটা চিঠি ও পত্রপত্রিকা আসে। সুশোভন প্রত্যেকটা খুলে পড়েন, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয় না, এক দেড় মাস অন্তর অন্তর চিঠির উত্তর দেবার সময় আসে, এর মধ্যে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে থাকে চিঠি।

খেতে খেতেই অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতে খামটা খুললেন সুশোভন। হ্যাঁ কবিতাই। বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে একজন সুশোভন সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ভরা খানিকটা প্রশস্তির সঙ্গে চারখানা কবিতা পাঠিয়েছে। প্রতিটি কবিতাই প্রথম দুতিন লাইন পড়লেন। একেবারে নিরেস। কবিতার আঙ্গিক, ভাষা ব্যবহার না শিখেই কিছু একটা লিখে ফেলে এরা ছাপাবার জন্য ব্যস্ত। যেন কবিতা লেখা খুব সহজ কাজ।

মুঠো করে সবসুদ্ধ দুমড়ে সুশোভন ছুড়ে দিলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে। সেখানে পড়ল না, ঢুকে গেল ফ্রিজের তলায়।

দেবযানী জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমার কী প্রোগ্রাম?

সুশোভন বললেন, দুপুর দুটোয় সেই ইতালিয়ান মেয়েটি দেখা করতে আসবে অফিসে, আমার একটা উপন্যাস অনুবাদ করতে চায়, আজ কন্ট্রাক্ট সই করবে, মেয়েটির ব্যবহার ট্যবহার ভারী সুন্দর। ঠিক সময়ে পৌঁছাতে হবে, আজ আর দই খাওয়া হবে না।

দেবযানী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, বিকেলে?

সুশোভন অন্যমনস্কভাবে বললেন, অফিসে একটা সম্পাদকীয় লেখা আছে, লিখে ফেলতেই হবে আজ, বিকেলে পাঁচটায় ওরা নিতে আসবে।

দেবযানী বললেন, ওরা মানে কারা? কোথায়?

সুশোভন বললেন, তোমায় আগে বলিনি? আজ ব্যারাকপুরে আমার একটা সংবর্ধনা আছে। একটা লাইব্রেরির শতবর্ষপূর্তি।

দেবযানী বললেন, না, আমাকে আগে বলনি।

সুশোভন বললেন, বলিনি? নিশ্চয়ই বলেছি, দশ-বারো দিন আগে, তোমার খেয়াল নেই। এই সংবর্ধনা, ফংবর্ধনা আমার একদম পছন্দ হয় না, কিন্তু বিমলেন্দুর ভাই খুব করে ধরেছে, একেবারে নাছোড়বান্দা যাকে বলে। তুমি ব্যারাকপুরে যেতে চাও? তা হলে ওদের বলতে পারি গাড়িটা আগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।—

দেবযানী বললেন, না।

সুশোভন কই মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললেন, ফিরতে কিছুটা দেরি হবে, ওদিকের রাস্তা ভাল নয়, তবে রাত দশটার মধ্যে ফেরার খুব চেষ্টা করব।

দেবযানী বললেন, একদিন বাড়ি ফিরে যদি দেখো যে আমি নেই, তা হলে তোমার কেমন লাগবে?

সুশোভন বললেন, তার মানে? আজ কোথাও তোমার যাবার কথা আছে? আমার গাড়ি তো ফেরত পাঠিয়েই দিচ্ছি।

দেবযানী বললেন, কোথাও যাবার কথা নেই। তোমার গাড়িও লাগবে না। আমি এমনি কোথাও চলে যাব! হ্যাঁ চলেই যাব। কেউ আমাকে আর খুঁজে পাবে না। না, ভুল বললাম, কেউ খুঁজতে যাবেও না।

খাওয়া বন্ধ করে সুশোভন মুখ তুলে তাকালেন। দেবযানীর গায়ে আলুথালুভাবে শাড়িটা জড়ানো, চুল আঁচড়ানো নেই, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা, চোখের কোণে টলটল করছে অশ্রু।

সুশোভন বিস্মিতভাবে বললেন, আজ আবার কী হল?

দেবযানী বললেন, কিছু হয়নি। এ বাড়িতে আমার তো কোনও প্রয়োজন নেই। আমি টেকন ফর গ্রান্টেড। থাকা না থাকা সমান। তোমার খাওয়া দাওয়া, ঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া এ সব দিলীপই করতে পারবে। কিংবা তোমার কত মেয়ে ভক্ত আছে, তারা এসে তোমার যত্ন করবে। আমি বুড়ি হয়ে গেছি।

সুশোভন খানিকটা অস্থিরতা গোপন করে বললেন, হঠাৎ এ সব কথা শুরু করলে কেন? আজ সকাল থেকে আমি কি কোনও দোষ করেছি?

দেবযানী বললেন, না, দোষ করবে কেন? তুমি তো কোনও দোষ করো না, সব দোষ আমার। আমি যাই করি সেটাই দোষের হয়ে যায়। তোমার লেখার সময় আমি বিরক্ত করি, তুমি ব্যস্ত মানুষ, তোমার কথা বলার সময় নেই, আমার কথা বলতে যাওয়াটাই অন্যায়। বাইরের সকলের কাছে তুমি পারফেক্ট জেন্টলম্যান।

সুশোভন বললেন, যতই ব্যস্ততা থাক, তোমার সঙ্গে কথা বলি না? তোমার কথা ভাবি না?

দেবযানী বললেন, কাল দুপুরে আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম, তুমি নিজে থেকে আমার সঙ্গে একটাও কথা বল নি।

সুশোভন বললেন, যাঃ সে কী। কাল তো আমরা অনেক কথা বললাম, সুভদ্রা মাসির মেয়ের বিয়েতে যেতে হবে—

দেবযানী বললেন, আমি যা যা জিজ্ঞেস করেছি, তুমি উত্তর দিয়েছ। আমি লক্ষ করছিলাম, তুমি নিজে থেকে একটাও কথা বল কি না। বলনি।

সুশোভন বললেন, হয়তো কাল অন্যমনস্ক ছিলাম, লেখার কথা মাথায় ঘুরছিল। একটা গল্প কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।

দেবযানী বললেন, হ্যাঁ। লেখার চিন্তা, তোমার কত বান্ধবী, তাদের নিয়ে চিন্তা। বউকে নিয়ে চিন্তা করতে যাবে কেন? বউ তো পুরনো হয়ে গেছে। টেলিফোন এলে তোমার সব লেখার চিন্তা চলে যায়, আমি ধরার আগে তুমি খপ করে তুলে নাও। পাছে আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি, তাই সবসময় তুমি আগ বাড়িয়ে নিজে ফোন ধরো। অনেকবার আমি দেখেছি, আমি ফোন তুলে হ্যালো বললে ওপাশ থেকে কোনো উত্তর আসে না। স্পষ্ট বুঝতে পারি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তোমার কোনো বান্ধবী আমার গলা শুনে উত্তর দেয় না।

একটু হালকা করার জন্য সুশোভন বললেন, সে তো আমিও অনেকবার দেখেছি, ফোন তুললে ওপাশে চুপ করে থাকে। তোমার কোনো বন্ধু, তোমার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করতে চায় বোধহয়।

দেবযানী বললেন, সে আগে হয়তো হত, কেউ কেউ আমার সঙ্গে গল্প করতে চাইত। এখন আমি তো বুড়ি, বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছি।

সুশোভন বললেন, আর আমার বুঝি বয়েস কমছে?

দেবযানী বললেন, তোমাদের বেশি বয়েস হলেও কিচ্ছু যায় আসে না। তোমরা যে পুরুষ। পঞ্চান্ন-ষাট বছরের পুরুষ অনায়াসে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের কোনো মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে পারে, প্রেম করতে পারে। তোমাকেও তো দেখছি, ওই বয়সের মেয়েদের দেখলে তুমি গদগদ হয়ে যাও, দিব্যি ন্যাকামি করো। আর আমরা, আমার এখন বাহান্ন, পঁচিশ-তিরিশ বছরের ছেলেদের কাছে মাসি-পিসি সাজতে হয়। সেটাই তো নিয়ম।

সুশোভন বললেন, তুমি মোটেই বুড়ি হওনি। পার্টিতে সেজেগুজে গেলে অনেকেই তোমার দিকে তাকায়, চল্লিশের বেশি মনে হয় না। আমার চোখে তুমি এখনও খুব সুন্দর।

স্বামীর দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে উনুনের আঁচের মতো গলায় দেবযানী বললেন, হ্যাঁ সেইজন্যই তো বাড়িতে যখন আমি বিচ্ছিরিভাবে থাকি, শাড়িটাও পরা নেই, তখন দরজায় বেল বাজলে আমাকেই যেতে হবে। পিওন, মেথর, ফিলমের প্রোডিউসার যে-ই হোক তার সামনে আমাকে ওইভাবে দাঁড়াতে হবে। আর তুমি তখন ফোনে কোনো বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি হেসে গল্প করবে। তুমি দরজা খুলতে যাবে কেন, তোমাকে ইমেজ রাখতে হবে তো!

সুশোভন কয়েক মুহূর্ত মুখ নিচু করে রইলেন। বুঝতে পারলেন আজকের কলহের উৎস। দেবযানী ঠিকমত সাজপোশাক করে নেই, মুখখানায় তেলতেলে ঘাম, এই অবস্থায় এঁটো হাতেও উঠে গিয়ে সুশোভনেরই দরজা খোলা উচিত ছিল। সেই সময়েই টেলিফোন বাজল, কানের কাছে ফোন বাজলে, ছেলে বা মেয়ে যারই হোক, অধিকাংশ ফোনই আসে অন্যের স্বার্থকথা নিয়ে, অনেকগুলিই বিরক্তিকর, তবু ফোনের আওয়াজের মধ্যে এমন একটা অজ্ঞাত জরুরি ভাব থাকে যে না ধরে পারা যায় না। দরজার বেলটা তিনি খেয়াল করেননি, দিলীপ যে বাড়িতে নেই, সেই মুহূর্তে সেটাও ভুলে গিয়েছিলেন। এটা দোষই হয়েছিল, নির্ঘাত তাঁর দোষ।

সুশোভন একবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। আর অপেক্ষা করা যায় না।

দেবযানীর একটা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, আই অ্যাম সরি, সত্যি আমার দোষ হয়ে গেছে। আজ আমারই দরজাটা খোলা উচিত ছিল।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, দূরে সরে গিয়ে দেবযানী তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, শুধু আজ? এই রকম দিনের পর দিন। আমি কী ভেবে বিয়ে করেছিলাম, আর কী পেলাম? সব নষ্ট হয়ে গেল। বাবা মায়ের অমতে... তখন আমি ভেবেছিলাম বিয়ে করতে যাচ্ছি একজন তরুণ কবিকে, দুজনে মিলে দুঃখ-কষ্ট আনন্দ সব ভাগ করে নেব, ভুল, সব ভুল। আজ তুমি বিখ্যাত লোক, ব্যস্ত লোক, সব সময় তোমাকে অন্যেরা ঘিরে থাকে, অনেক মেয়ে তোমাকে পছন্দ করে, আমি দেখেছি, আমি কাছে থাকলে তাদের অস্বস্তি হয়, আমাকে কেউ পছন্দ করে না, আমি না থাকলে তুমিও খুশি হও, তারাও খুশি হয়।

রসিকতা করার চেষ্টা করে সুশোভন বললেন, আমার বিখ্যাত হওয়াটাই তোমার রাগের কারণ? তা হলে বল, টাইম মেশিনে আবার উলটো দিকে ফিরে যাই। আবার শুরু হোক—

দেবযানী ও সব কথা একেবারে না শুনে আপন মনে বললেন, তোমার জন্য আমার সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। গান ভালবাসতাম, ভাল করে শিখলে খুব একটা খারাপ গাইতাম না। দেবব্রত বিশ্বাস বলেছিলেন...। জার্মান ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম, দুবছর টানা ক্লাস করেছি, ফার্স্ট হতাম, বিশাখাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সেই জার্মান ক্লাসও কনটিনিউ করা হল না। বিশাখা স্কলারশিপ পেয়ে—

সুশোভন বললেন, আমার জন্য হল না? আমি তোমাকে বারণ করেছি কখনো?

দেবযানী বললেন, তুমি মুখে বারণ করবে কেন? তুমি যে উদার, তুমি যে মহৎ! ছেলের লেখাপড়া কে দেখত?

তুমি একদিনও তাকে নিয়ে বসেছ? আমি বছরের পর বছর বিল্টুর সঙ্গে সারাক্ষণ, তার পড়াশুনার যাতে ক্ষতি না হয়, বাজে ছেলেদের সঙ্গে যাতে না মেশে, আমি কোথাও যাইনি, সিনেমা দেখিনি, পার্টিতে যাইনি, নিজের গানটান তো একেবারে বন্ধ! আর তুমি তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা আর হই-হল্লা করে বেড়িয়েছ, মাঝরাতের আগে কখনো বাড়িতে ফিরতে না।

সুশোভন এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুধু হই-হল্লা করে বেড়িয়েছি? ঘাড় গুজে যে অক্লান্তভাবে লিখে গেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার কষ্ট হচ্ছিল না? আমি তো বাবার সম্পত্তি পাইনি। গরিবের ছেলে, তখন ছিল বাঁচা মরার প্রশ্ন। না লিখলে খেতে পেতাম না। সংসার চালাবার জন্য কত আজেবাজে লেখা লিখতে হয়েছে, কবিতা ছেড়ে গদ্য, লিখতে লিখতে চোখ ক্ষয়ে গেছে, আঙুল টনটন করেছে, তা কিছু না? এখনো যে কত রকম লিখতে হয়, এই উপন্যাসটা লেখার জন্য কত পড়তে হচ্ছে, এত পড়া, এত লেখা, এর পরিশ্রম নেই, কষ্ট নেই?

দেবযানী বললেন, সবাই জানে লিখতে গেলে কষ্ট হয়। তুমি পরিশ্রম করেছ, কষ্ট করেছ, তার বদলে পেয়েছ অনেক কিছু। এখনো পাও। খ্যাতি, কিছু লোক তোমাকে নিয়ে নাচানাচি করে, এখান থেকে সেখান থেকে নেমন্তন্ন পাও, মেয়েরা তোমার কাছে আসে, প্রেম প্রেম ভাব করে। আমি কী পেয়েছি? কিচ্ছু না! তুমি আসলে স্বার্থপর, ভীষণ স্বার্থপর।

সুশোভন গলা চড়িয়ে বললেন, সব সময় খালি মেয়ে মেয়ে করো। কোথায় মেয়ে, আমার কি মেয়েদের সঙ্গে মেশার সময় আছে? আমায় স্বার্থপর বললে, তুমি কিছু পাওনি? আমার খ্যাতিতে তোমার আনন্দ হয় না? পৃথিবীর কত দেশে তোমাকে নিয়ে গেছি, তুমি বেড়াতে ভালবাস, যতদূর সম্ভব তোমার শখ মিটিয়েছি, কত নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, অল্পবয়েসি অনেক ছেলেমেয়ে তোমারো ভক্ত হয়েছে, আমার থেকেও তোমাকে খাতির করেছে বেশি। কিছুই পাওনি, এ কথা বলতে পারলে?

দেবযানী বললেন, রিফ্লেকটেড গ্লোরি! আসলে তারা তোমাকেই চায়। আমার অসুখ হলে কেউ খবর নেয়? তোমার দু দিন জ্বর হলেই সবাই আহা উহু শুরু করে দেয়। আমার অসুখ হলে তুমিও গ্রাহ্য কর না। তোমার তো সময়ই নেই আমার দিকে তাকাবার। ডাক্তার দেখানো হয় না... আমার দরকার নেই। আমি কিচ্ছু চাই না। আমি চলে যাব। জঙ্গলের ধারে একটা নদী, কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই, একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বেঁধে আমি থাকব, কেউ আসবে না, কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না।

সুশোভন বললেন, ওরকম কোনো জায়গা নেই পৃথিবীতে। একা একা কোনো মেয়ে ও ভাবে থাকতে পারে নাকি?

দেবযানী বললেন, না হয় মরে যাব। আমার আর একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি যা চেয়েছিলাম, তুমি ভালবাসার মর্ম বুঝলে না, আমাকে তুমি মনে কর বাড়ির একটা ফার্নিচার, আমার জন্য তোমার আলাদা কোনো সময় নেই।

সুশোভন একঝলক ঘড়ি দেখলেন। এখনো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লে দুটোর মধ্যে পৌঁছানো যায়।

মিনতি করে বললেন, মিলি, আমরা পরে এ নিয়ে কথা বলব। আমি আর দেরি করতে পারছি না, ইতালিয়ান মেয়েটি অপেক্ষা করে চলে যাবে।

দেবযানী বললেন, যাও না, কে তোমাকে আটকে রেখেছে। একজন সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে, বাড়িতে থাকতে ভাল লাগবে কেন?

সুশোভন এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, আবার মেয়ে মেয়ে করছ? সে আমার বই অনুবাদ করছে, মেয়ে কিংবা পুরুষ, তাতে কী আসে যায়। একটা উপন্যাস অনুবাদ করবে, বেশ কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে।

দেবযানী বললেন, এক্ষুণী ছুটে চলে যাও। আমার সঙ্গে তোমার আর কোনো কথা তো নেই, কোনো কথা নেই।

দেবযানী নিজেই দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সুশোভন বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। দেবযানীর একবার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলে অভিযোগের পর অভিযোগ শুরু হয়ে যায়। দশ বছর-কুড়ি বছর আগের কোনো কোনো ভুলের কথা আবার এসে পড়ে। এরকম সময় চলে যাওয়া কি ঠিক? দেবযানী একবার বাথরুমে ঢুকলে সহজে বেরুবে না।

রান্নাঘরের বেসিনে সুশোভন হাত ধুয়ে নিলেন। একটা উপন্যাস অনুবাদ হলে কী আর এমন হাতি-ঘোড়া হবে, কত টাকাই বা পাওয়া যাবে? এমন কিছু না, কিছু যায় আসে না, সুশোভনের সেরকম কোনো মোহ নেই। তবু সময় রক্ষা করা সুশোভনের অনেক দিনের অভ্যেস। কাউকে আসতে বলে দেখা করতে না যাওয়া চরম অসভ্যতা। বিশেষত একজন বিদেশির সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা যায় না। কাউকে কি বলা যায় যে আমার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল বলে আমি আসতে পারিনি।

দিলীপের কাছে চাবি থাকে, সে দরজা খুলে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ঢুকতেই সব রাগ পড়ল তার ওপর। চোখ গরম করে বললেন, দই আনতে এতক্ষণ সময় লাগে? লোকে এসে দরজায় বেল দেয়, এঁটো হাতে এসে দরজা খুলব? দই খাব না। বউদিকে বলিস, আমি অফিসে চলে যাচ্ছি।

সুশোভন নিজে গাড়ি চালান না অনেকদিন। যখন নিজের গাড়ি ছিল না, গাড়ি কেনার কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তখন ড্রাইভিং শিখেছিলেন। এম এ পাশ করে টানা চার বছর বেকার থাকার সময় একবার ভেবেছিলেন, ট্যাক্সি চালিয়ে সংসারের খরচ জোটাবেন। সে সব অনেকদিন আগেকার কথা।

ড্রাইভারকে বললেন, তাড়াতাড়ি চল।

দেবযানী তাকে বলল, স্বার্থপর। সুশোভন যে এত খাটাখাটি করছেন, এত লেখালেখি, সব নিজের স্বার্থের জন্য? এ কথা ঠিক, লেখার চিন্তাই তাঁর অনেক সময় খেয়ে নেয়। এক একসময় লেখার মধ্যে একটা সঙ্কট আসে, একটা গল্প লেখার মাঝপথে থমকে যেতে হয়, এরপর গল্পটা কোন দিকে যাবে কিছুতেই ঠিক করা যায় না, তখন কী যে অস্বস্তি, কী যে যন্ত্রণা হয়, তা কাউকে বলে বোঝানো যায় না। তখন সত্যিই নিজের স্ত্রীর দিকেও মনোযোগ দেওয়া যায় না, বাড়িতে কী ঘটছে না ঘটছে কিছু খেয়াল থাকে না।

লেখাটা কি শুধু তাঁর শখ? কিংবা শুধু জীবিকা? একটা গল্প না লেখা হলে কী ক্ষতি হবে? বাংলা ভাষায় কত কী লেখা হচ্ছে, তার মধ্যে সুশোভন দাশগুপ্ত একটা গল্প না লিখলে কেউ মাথা ঘামাবে না। সুশোভনকে তবু সেই গল্পটা শেষ করার জন্য মাথা খুঁড়তে হবে কেন? গল্পটির বিনিময়ে যে টাকা পাওয়া যাবে, সেটা এখন তুচ্ছ। তিরিশ বছর আগে সুশোভনের কাছে টাকার প্রয়োজন বা মূল্য যতখানি ছিল, এখন তা নেই। এক পয়সাও দেয় না এমন কিছু কিছু পত্রিকাতেও তিনি লেখা দেন, সেই লেখার সময়েও যে দুশ্চিন্তা, যে আয়ুক্ষয়, সংসারের প্রতি অমনোযোগ, ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষয়ের মতো ছটফটানি, তার ব্যাখ্যা কী? খ্যাতির জন্য লোভ? দু পাঁচটা গল্প কম লিখলে খ্যাতির কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়? খ্যাতিই বা এমন কী, কেউ কেউ খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, কেউ খুব গালাগালি দেয়। কেউ চিঠিতে লেখে, আপনার একলাইনও উত্তর পেলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। সদ্য কবিতার বই বেরুবার পরও কেউ কেউ বলে আপনি আজকাল আর কবিতা একেবারেই লেখেন না ? কেউ বলে, আপনার অমুক উপন্যাসটা এত ভাল লাগল। সেটা সুশোভনের লেখাই নয়। এই তো খ্যাতির ধরন! কী হয় এখন থেকে লেখা একেবারে ছেড়ে দিলে? নিজেকে একবার বাজিয়ে দেখা দরকার।

সুশোভন যখন পত্রিকার অফিসে পৌঁছালেন, ঠিক তখনই ইতালিয়ান মেয়েটি নাম লেখাচ্ছে রিসেপশন কাউন্টারে সুশোভনের মুখখানা থমথমে হয়ে ছিল, জোর করে হাসি ফোটালেন, মেয়েটিকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে।

মেয়েটির নাম সিলভিয়া, বছর পঁয়ত্রিশেক বয়েস, মাথার চুল সোনালি। বব করা নয়, লম্বা চুল পিঠের উপর ছড়ানো। মেয়েটির মুখখানি ভারী নরম, স্নিগ্ধ চোখ দুটি, কথা বলে খুব আস্তে আস্তে। তার উপস্থিতির মধ্যে রয়েছে কোমলতা, যদিও সে একা একা দুমাস ধরে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরেছে। নিজে লেখেটেখে, ইতালির একটি ছোট প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

সিলভিয়া বাংলা জানে না। একজন নাম করা পরিচালক সুশোভনের একটি উপন্যাস অবলম্বনে ফিলম তুলেছেন, সেই ফিলম দু একটা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে, সিলভিয়া দেখেছে সেই ফিলম। সুশোভনের উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায়, সেই অনুবাদ থেকে সিলভিয়া ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করতে চায়।

সুশোভন জিজ্ঞেস করল, তুমি যে এই বইটির অনুবাদ ছাপবে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কি ইতালিয়ান পাঠকদের আগ্রহ আছে?

সিলভিয়া বলল, সত্যি কথা বলতে কী, বাংলা ভাষা সম্পর্কে ইতালিয়ানরা বিশেষ কিছুই জানে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এ কালের পাঠকরা চেনে না। আমি চেষ্টা করছি, কিছু কিছু ভারতীয় সাহিত্য আমাদের ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য। আমাদের প্রকাশনা সংস্থাটি ছোট, নানা রকম পরীক্ষামূলক বই ছাপে, খুব বেশি বিক্রি না হলে, তুমি টাকাপয়সা বিশেষ পাবে না, তবু আমাদের এই প্রচেষ্টায়...

সুশোভন কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করে দিল। রয়ালটি মাত্র পাঁচ শতাংশ। এই বই কবে অনুবাদ হবে, কবে ছাপা হয়ে বেরুবে ঠিক নেই, ছাপা হলেও সুশোভন দু এক হাজারের বেশি টাকা পাবে না। এর আগেও অন্য ভাষায় অনুবাদের দু একটা প্রস্তাব কার্যকর হয়নি শেষ পর্যন্ত। প্রাগ শহর থেকে এক প্রকাশক চিঠি দিয়েছিল, তারা সুশোভনের একটি কবিতা সংগ্রহ ছাপতে আগ্রহী, পঞ্চাশটি কবিতার মূল বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ পাঠালে ভাল হয়। কে আর অত ঝঞ্ঝাট করে, তাই সে চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি।

সিলভিয়াকে লিফটের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল সুশোভন। শেষ মুহূর্তে সিলভিয়া হাত বাড়াতে সুশোভন আলতোভাবে স্পর্শ করল কী নরম হাত। ভারী সুন্দর মেয়েটি।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল সুশোভন।

দেবযানীকে সে বলেছিল, একজন তার বই অনুবাদ করতে চায়, সে মেয়ে না পুরুষ, তাতে কিছু আসে যায় না। কথাটা কি সত্যি? অন্য কেউ বিশ্বাস না করুক, সুশোভন নিজে ভালই জানে, অনুবাদের প্রতি তার কোনো মোহ নেই। কেউ অনুবাদ করতে চায় করুক না করলে বয়ে গেল, এইরকম তার মনোভাব। অনুবাদ ছাপা হলেই তো হাতে স্বর্গ পাওয়া যাবে না, তার পাঠক দরকার। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে সুশোভন, সে জানে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকেরই কোনো আগ্রহ নেই। ভারতীয় সাহিত্য বলতে এখনো অনেকে বোঝে বেদ-উপনিষদ। ছুটকো ছাটকা দু চারটে আধুনিক সাহিত্যের অনুবাদ বেরোয়, বিশেষ কেউ পড়ে না।

তা হলে? সিলভিয়ার বদলে যদি একজন হুমদো চেহারার পুরুষ হত, তা হলেও কি সুশোভন নিজের স্ত্রীর মন খারাপের দিনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করার জন্য ছুটে আসত? অফিসে টেলিফোন করে বলে দিতে পারত না যে আজ সে আসতে পারবে না?

নিজের কাছে অন্তত স্বীকার করা উচিত, সিলভিয়া একটি মেয়ে এবং সুন্দরী বলেই সুশোভন আকৃষ্ট হয়েছে। এটা কি অপরাধ? অন্য কোনো মেয়ের সান্নিধ্য কিছুক্ষণের জন্য ভাল লাগা মানেই কি নিজের স্ত্রীকে কম ভালবাসা? একজন লেখক নিজের স্ত্রীর ছাড়া আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, কাছাকাছি যাবে না, রঙ্গ রসিকতা করবে না, তারপরেও সে লেখক কি লেখক হয়ে বেঁচে থাকতে পারে?

কতখানি কাছাকাছি? সিলভিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল নন্দনে এক চলচ্চিত্র উৎসবে। সে দিনই সুশোভনের উপন্যাসের চিত্ররূপটি দেখানো হচ্ছিল। কেউ একজন আলাপ করিয়ে দেয়। চোখে পড়বার মতো মেয়ে ঠিকই। সিলভিয়া তারপর চলে যায় দক্ষিণ ভারতে। পরশু ফিরে এসে একটা হোটেলে উঠেছে। সেখান থেকে সে টেলিফোন করেছিল, কলকাতার রাস্তাঘাট সে চেনে না, সুশোভন যদি তার হোটেলে আসে, তা হলে অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

একটি সুশ্রী বিদেশিনী তার হোটেল কক্ষে ডেকেছে। লেখক না হয়ে সুশোভন যদি শুধু একজন পুরুষ মানুষ হত, তা হলে তার ছুটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। প্রথম আলাপেই হয়তো ব্যভিচারের প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু নিরালা ঘরে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানোও তো কম আনন্দের নয়। সুশোভন যেতে রাজি হয়নি, কারণ সে লেখক, একজন প্রকাশক যদি তার অনুবাদ ছাপতে চায়, তা হলে প্রকাশককেই লেখকের কাছে আসতে হবে, লেখক যাবে কেন? এটা তার অহঙ্কারের জায়গা। সে বলেছিল, ট্যাক্সিতে আমাদের পত্রিকা অফিসের নাম বললেই ঠিক নিয়ে আসবে।

অফিসে আর পাঁচজন লোকের ঘোরাঘুরির মধ্যেও যে সিলভিয়া খানিকক্ষণ বসে ছিল, তাও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। খুব সম্ভবত ওই মেয়েটির সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না, তবু খানিকটা মৃদু সৌরভ যেন রয়ে গেল। সিলভিয়াকে নিয়ে সুশোভন কোনো দিন কিছু লিখবেন না। কিন্তু ওই সৌরভটুকু তার লেখায় সাহায্য করবে।

যত নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, মেলামেশা হয়, তারা সকলেই লেখায় কিছু না কিছু সাহায্য করে। শুধু মেয়েদের নিয়ে তো সাহিত্য হয় না, অসংখ্য পুরুষ চরিত্র থাকে, পুরুষদেরও পর্যবেক্ষণ করতে হয়। লেখক যদি পুরুষ হয়, তা হলে মেয়েদের সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? লেখিকাদেরও বোধহয় এর উলটোটাই হয়।

অন্য মেয়েদের সান্নিধ্য পেলে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমে যায়?

দেবযানীও কি স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে খুশি হয় না? বয়সের নিয়মে বয়েস বেড়েছে, কিন্তু দেবযানীর রূপ এখনও ঝরে যায়নি। একটু সাজগোজ করলে এখনো সত্যিই তাকে বেশ কমবয়েসি মনে হয়। কোনো কোনো পার্টিতে দেবযানী যখন দূরে দাঁড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে গল্প করে তখন একসময় সুশোভনের মনে হয়, আমার বউটি তো অনেকের চেয়েই সুন্দর! না সাজলেও সে অসুন্দর নয়। মেয়েরা সাজগোজ করে কেন, স্বামীকে মুগ্ধ করার জন্য! দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এটা একেবারেই ঠিক নয়। বাড়িতে যেমন তেমন, বাইরে বেরুবার সময়ই প্রসাধন ও সাজের বাহার। বন্ধুস্থানীয়রা কয়েকজন দিব্যি ফ্ল্যার্ট করে দেবযানীর সঙ্গে, দেবযানীও তো বেশ পছন্দ করে। কিন্তু তার একটা সীমারেখা টানা আছে। সুশোভনের নেই?

অন্তত একজন বন্ধুর সঙ্গে দেবযানীর ব্যবহার সুশোভন ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। চিত্রভানু বিখ্যাত লম্পট, দেবযানীও তো ভালই জানে। চিত্রভানুর অনেক গুণ, যেমন সুপুরুষ, তেমনই পড়াশুনোয় মেধাবী, বড় চাকরি করে, প্রচুর মদ খায়, আর মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা সাঙ্ঘাতিক। নিজের স্ত্রীকে সে গ্রাহ্যই করে না, একের পর এক মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে, প্রকাশ্যে তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য মহিলার সঙ্গে কয়েকদিন

কাটিয়ে আসতেও সে দ্বিধা করে না। কথাবার্তায় যে-কোনো মেয়েকে সে ভুলিয়ে দিতে পারে। সুশোভনের বাড়িতে এলে সে দেবযানীর সঙ্গেও নানারকম ফষ্টিনষ্টি করে, তাতে বেশ মুগ্ধ হয় দেবযানী। সুশোভন খুব ভালভাবেই জানে, চিত্রভানু তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতাবে না। দেবযানীও সীমারেখাটা ঘুচিয়ে গোপনে চিত্রভানুর সঙ্গে দেখা করবে না। কিন্তু চিত্রভানু নিজের স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে শোয়া-বসা করে জেনেও তাকে কেন পছন্দ করে দেবযানী?

এবার সম্পাদকীয় লিখতে হবে। কলমটা হাতে নিয়েই সুশোভনের মনে পড়ল, দেবযানী তাকে স্বার্থপর বলেছে। সে সত্যিই স্বার্থপর? টাকাপয়সা রোজগার করতে হয় নিজের জন্য? স্বামী-স্ত্রীর সংসারে স্বামী না স্ত্রী, কার জন্য বেশি টাকা খরচ হয়? খ্যাতি তার নিজস্ব? এর ভাগ নিতে দেবযানী চায় না?

কেউ কেউ বলে, শিল্পী মাত্রই স্বার্থপর। অনেকেই এ ধরনের গোলমেলে কথা বলে মন বিষিয়ে দেয়। অনেকদিন আগে চিত্রভানু বলেছিল, মিলি, বিখ্যাত লোকের বউ হওয়া যে কত বিপদের তা তুমি এখনো বুঝছ না। ওই সুশোভনটা যত বিখ্যাত হবে, তত তুমি একা হয়ে যাবে!

এই কথাটা দেবযানীর মনে গেঁথে আছে, ঝগড়ার সময় প্রায়ই বলে। এটা কি একটা আপ্তবাক্য? চিত্রভানুকে তার বন্ধুবান্ধবের গণ্ডির বাইরে বিশেষ কেউ চেনে না, সে বিখ্যাত ব্যক্তি নয়, কিন্তু সে তার স্ত্রীকে একা করে দেয়নি? অনেক স্বামী-স্ত্রীকে দেখেছে, যারা নেমন্তন্নে বাড়িতে একসঙ্গে যায়, বাড়িতে অতিথিদের ডাকে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই।

শুধু চকচকে হাসিখুশি মলাট, ভেতরটা সাদা। এই ধরনের ব্যাপারকে খুব ভয় পান সুশোভন। প্রথম বয়েসের প্রেম পরবর্তী জীবনে দয়া, মমতা, স্নেহ, পারস্পরিক নির্ভরতা এইসব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। যতই বয়েস হোক, ইয়ারকি-খুনসুটির ভাবটাও প্রেমেরই একটা প্রকাশ।

কেন একা হয়ে যাবে দেবযানী? সুশোভন সচেতনভাবেই দেবযানীকে নিজের দিকে টেনে রাখে। এই বয়েসে রাস্তায় হাত ধরাধরি করে বেড়ানো যায় না, কিন্তু একটা বই পড়তে পড়তে দেবযানীকে ডেকে শোনায়। নিজের লেখার ব্যাপারে দেবযানী-র মতামতের গুরুত্ব দেয়। আজকাল আর মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে থাকে না, বন্ধুর সংখ্যা কমে গেছে অনেক, কমতে কমতে প্রায় শূন্যতার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। কোথাও গেলে দেবযানীকে সঙ্গে নিতে চায়, কিংবা বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকে। অবশ্য লেখার সময়টায় দেবযানীর দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। লেখার সময়টাই যে তার জীবনের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নিচ্ছে।

বাড়িতে একটা ফোন করলেন সুশোভন। দিলীপ তুলে বলল, বউদি ঘুমোচ্ছেন বোধহয়, দরজা বন্ধ। ডাকব?

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, বউদি খেয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে, ডাকতে হবে না!

একটা সম্পাদকীয় লিখতে বড়জোর এক-দেড়ঘণ্টা লাগে, আজ আর কলম চলছেই না। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন সুশোভন। সমস্ত যুক্তি-তর্কের পরও একটা সত্য জেগে থাকে, দেবযানীর আজকাল প্রায়ই মন খারাপ হয়, নিজেকে সে নিঃসঙ্গ ও অবহেলিত মনে করে, এজন্য সুশোভন নিশ্চয়ই কিছুটা দায়ী। তার কী করা উচিত? ছেলে থাকে বিদেশে, সুশোভনের মা থাকেন অন্য ভাইয়ের কাছে, দেবযানীর মা-বাবা দুজনেই খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে চলে গেছেন। বাড়িতে শুধু এখন স্বামী-স্ত্রী। সুশোভনকে ব্যস্ত থাকতেই হয়, বড় বেশি ব্যস্ততা, কিছুটা অকারণেও বটে, নানা লোকের উপরোধ-অনুরোধ রাখতেও অনেক সময় চলে যায়। তা ছাড়া ছোটবেলা থেকে এমনই অভ্যেস করে ফেলেছেন সুশোভন যে চোখের সামনে অক্ষর ছাড়া থাকতে পারেন না। হয় লিখছেন, অথবা বই পড়ছেন। খাবার টেবিলেও বই পাশে খুলে রাখেন। দেবযানী তাই বলেন, তোমার সঙ্গে কথা বলব কখন, সর্বক্ষণ তোমার লেখা আর বইপড়া।

দেবযানী নিজেও একসময় বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। মন অশান্ত থাকলে কিছু পড়া যায় না।

অন্য মেয়েদের সম্পর্কে দেবযানীর ঈর্ষা মাত্র কয়েক বছর শুরু হয়েছে। আগে এরকম ছিল না। দেবযানী কী ভাবে, এই বয়েসে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সুশোভন সংসার ভাঙবেন? তাঁদের সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন কখনো চিড় খায়নি।

ঝগড়ার সময় দেবযানী প্রায়ই বলেন, তোমাকে বিয়ে করা আমার ভুল হয়েছে। সুশোভনের মুখ দিয়ে কখনো এরকম কথা বেরোয় না, তাঁর মনের গোপনেও কখনো এরকম চিন্তা আসেনি। কখনো মনে হয়নি, অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করলে ভাল হত। যখন মন প্রফুল্ল থাকে, তখন দেবযানী সত্যিই খুব আকর্ষণীয়া, এমন একটা অনাবিল সারল্য আছে, যা খুব দুর্লভ। মিথ্যে ওজর কিংবা কোনো কিছু ভাল ভাবে না জেনে হঠাৎ আলগা মন্তব্য করা সে ঘোর অপছন্দ করে, সুশোভন অনেক সময় ভেবে দেখেছেন, খাঁটি মানুষ হিসেবে, হিউম্যান কোয়ালিটির বিচারে দেবযানীর স্থান তাঁর থেকে বেশ উঁচুতে।

আজকাল মাঝে মাঝেই দেবযানীর মন প্রফুল্ল থাকে না। তখন রাজ্যের হতাশা তাঁকে পেয়ে বসে। ডিপ্রেশন! যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে মেয়েদের নাকি এরকম মানসিক নিম্নচাপ আসে। তখন পুরুষদের উচিত তাদের সর্বক্ষণ দুবাহু দিয়ে ঘিরে রাখা, এরকম ডাক্তারি মতামত সুশোভন একটা প্রবন্ধে পড়েছেন। সব পুরুষ তা পারে? সুশোভনের চেয়েও তো আরো কত ব্যস্ত, কত বিখ্যাত মানুষ আছে, তাদের সংসারে কী হয়?

যৌবন হারানোটা মেয়েরা সহজে মেনে নিতে পারে না। সেই তুলনায় পুরুষরা বোধহয় অনেক সহজে বার্ধক্যের দিকে চলে যায়। আরো একটা তফাত আছে। বয়েসের দিক দিয়ে পুরুষরা বুড়ো হয়, চুল দাড়ি পাকে, কিন্তু যৌনক্ষমতা যায় না তখনো। সুশোভনের এখনো লিবিডো প্রবল। সম্পাদকীয় শেষপর্যন্ত লেখা হল বটে, কিন্তু তেমন ভাল হল না। একটা এরকম লেখা একটু ভাল হল, না একটু খারাপ হল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু যে লেখে তার মনটা কিছুক্ষণ ভার হয়ে থাকে, নিজের কাছেই অপরাধ বোধ হয়।

টেবিলের সামনে একজন কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ় ও একটি সিল্কের শাড়ি পরা, অতিরিক্ত সাজগোজ করা যুবতী এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি হাসি মুখ। প্রৌঢ়টি বলল, স্যার, আপনি রেডি?

বিস্ময়ে ভুরু তুলে সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

মেয়েটি বলল, পাঁচটা বাজে, আমরা গাড়ি এনেছি।

সুশোভন তবু জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ি? কোথায় যাব?

প্রৌঢ়টি বলল, স্যার, আমার নাম অরুণ, চিনতে পারছেন না? ব্যারাকপুরে আমাদের লাইব্রেরিতে আপনার সংবর্ধনা, আপনাকে কার্ড দিয়ে গেছি।

সুশোভনের চোখের সামনে যেন একটা পরদা, পিছনের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে গেছে। এই অরুণ তাঁর এক বন্ধুর ভাই, তিনি ভালই চেনেন, মেয়েটিও অচেনা নয়, তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি এদের একেবারেই চিনতে পারেননি। আজকের ওই লাইব্রেরির অনুষ্ঠানের কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে তিনি বললেন, আমি তো আজ যেতে পারছি না।

নারী-পুরুষ দুজন যেন আঁতকে উঠল। ভয়ার্ত স্বরে পুরুষটি বলল, সে কী? সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আপনি না গেলে... সবাইকে জানানো হয়ে গেছে, লোকে আমাদের মারবে, চলুন, চলুন স্যার।

বন্ধুর ভাই, তবু স্যার স্যার বলছে কেন? সুশোভন যদি এখন জানান যে আমি আজ যাব না, কারণ আমার মন ভাল নেই, সে অজুহাত এরা কিছুতেই মানবে না। মনকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। যদি বলেন, আমার খুব শরীর খারাপ, বুক ব্যথা করছে, তা হলে হয়তো ভয় পেতে পারে। কিন্তু সুশোভনের দোষ এই যে তিনি শরীর খারাপের কথা কক্ষণো প্রকাশ্যে বলেন না। এমনকি মাঝেমাঝে সত্যি বুকে ব্যথা হলেও স্ত্রীকে জানান না। তিনি নিজের শরীর ও অসুখ-বিসুখ নিয়ে আলোচনা করার ঘোর বিরোধী।

সুশোভন সম্পর্কে এরকম জনরব আছে যে তিনি কথা দিলে কথা রাখেন। যে অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না আগেই জানিয়ে দেন। যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে নিশ্চিন্ত। সুশোভন আজ কিছুতেই যাবেন না ঠিক করেছেন, তবু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য অস্বস্তিবোধ করছেন।

তাকে অস্বস্তি থেকে উদ্ধার করল মেয়েটি। সে বলল, স্যার চুনী গোস্বামী আর প্রদীপ ঘোষ বসে আছেন। আপনি যাবেন শুনে ওঁরা রাজি হয়েছেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুশোভন বললেন, চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ঘোষ, বাঃ, তবে আর চিন্তা কী! একজন না গেলে কোনো ক্ষতি নেই, লোকে ওঁদের দেখলেই খুব খুশি হবে। তোমরা ওদের দুজনকে বলো, আমি ক্ষমা চাইছি, আমার আজ বিশেষ অসুবিধে আছে, তাই যেতে পারছি না।

আরো মিনিট দশেক ধস্তাধস্তি করার পর সুশোভনের জেদটা জয়ী হল, ওরা চলে যাবার পর সুশোভন বাড়িতে আবার ফোন করলেন।

শুধু রিং হয়ে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না। একবার কেটে দিয়ে আবার। কোনো সাড়া নেই। দিলীপ বিকেলের দিকে পাড়া বেড়াতে যায়। দেবযানী কি বাথরুমে গা ধুচ্ছে? কিংবা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? 'একদিন ফিরে এসে যদি আমাকে আর দেখতে না পাও?' ঝোঁকের মাথায় হুট করে বেরিয়ে যাওয়া দেবযানীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। যখন রাগ চরমে ওঠে, তখন অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান থাকে না।

টাকাপয়সার হিসেব করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে ও কখনো যাবে না। 'আমি একলা একলা কোথাও চলে যাব একদিন।' কোথায় যাবে? ওর বাপের বাড়ি নেই। সেরকম কোনো ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও নেই। 'জঙ্গলের পাশে, এক নির্জন নদীর ধারে—'

হয়তো ফলস অ্যালার্ম। দেবযানী কাছাকাছি কোনো দোকান-টোকানে গেছে। কেন নিজের মনের মতো সাজানো সংসার ছেড়ে সে চলে যাবে? কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বীভৎস সংঘর্ষ হয়। মারামারি, গালাগালি, আরো বিশ্রী ব্যাপার চলে। তৃতীয় একজন, নারী কিংবা পুরুষ এসে উৎপাত বাধায়, সুশোভন আর দেবযানীর মধ্যে সেরকম কখনো কিছু হয়নি। ছোটখাটো ঝগড়া, রাগারাগি তো মাঝে মাঝে হবেই, দুজন নারী-পুরুষ কি সব সময় হাসি হাসি মুখ করে থাকতে পারে? কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ নেই। দেবযানীকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন আপনার স্বামীকে ছেড়ে এলেন? দেবযানীর একমাত্র উত্তর হতে পারে, আমার স্বামীর আমার জন্য কোনো সময় নেই। সময়! টেনে লম্বাও করা যায় না, সঙ্কুচিতও করা যায় না। শুরুও নেই, শেষও নেই। এই এক অনন্ত প্রবাহের মধ্যে আমরা লুটোপুটি খাচ্ছি। ব্রাউনিং-এর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে : 'আউট অফ অল ইওর লাইফ, গিভ মি বাট আ সিঙ্গল মোমেন্ট।' মাত্র একটি মুহূর্ত!

সুশোভন এখন বাইরের আড্ডা অনেক কমিয়ে এনেছেন। সারাদিনে বাড়ির বাইরে পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশি থাকেন না। ঘুম সাত ঘণ্টা। লেখার জন্য বড়জোর চার ঘণ্টা সকালের দিকে। বাকি রইল আরো সাত ঘণ্টা। এই সময়টা কার জন্য? বই পড়া আছে, বন্ধুবান্ধব, দর্শনপ্রার্থী, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, নবীন কবি-লেখকদের আসা-যাওয়া আছে, এইসব মিলিয়েই তো জীবন।

ব্যারাকপুরে যাবার কথা মনে ছিল না বলেই সুশোভন নিজের গাড়ি ছেড়ে দেননি। দেবযানী বাড়ি নেই, এটা জানার আগেই সুশোভন ঠিক করেছিলেন ব্যারাকপুরে যাবেন না। প্যানিক করার দরকার নেই, বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করে দেখা যাক।

বিকেলের রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক জ্যাম। সুশোভন আপাত শান্তভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। দেবযানী যদি সত্যিই ঝোঁকের মাথায় কোথাও চলে গিয়ে থাকে, তা হলে কোথায় তার খোঁজ করা হবে।

পুলিশের ওপর মহলের কয়েকজনের সঙ্গে সুশোভনের ভাল পরিচয় আছে, কিন্তু প্রথমেই পুলিশের সাহায্য নেবার দরকার নেই। হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে দেবযানীর বিপদে পড়ার সম্ভবনা আছে খুবই। বুদ্ধিমতী, কিন্তু বাস্তববুদ্ধি তেমন নেই ওর। অনেক দিন আগে একবার সুশোভন বাড়ি ফিরতে খুব দেরি করে ফেলেন। তখন নিয়মিত আড্ডা ছিল পার্ক স্ট্রিটের এক পানশালায়। কয়েকজন প্রবাসী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে রাত হয়ে গিয়েছিল অনেক। প্রায় সাড়ে বারোটার সময় গাড়িতে ফিরছিলেন সুশোভন। ড্রাইভার হঠাৎ বলল, উলটোদিকের এক ট্যাক্সিতে বউদিকে দেখলাম মনে হল! সুশোভন সাঙ্ঘাতিক চমকে গিয়েছিলেন। এত রাতে দেবযানী একা ট্যাক্সিতে কোথায় যাচ্ছে। ড্রাইভারের দেখতে ভুল হয়নি তো। গাড়ি ঘুরিয়ে সেই ট্যাক্সিকে তাড়া করা হল, খুব জোরে গিয়ে সুশোভনের গাড়ি সেই ট্যাক্সির সামনে রুখে দাঁড়াল। সত্যিই দেবযানী। ট্যাক্সি চালাচ্ছিল একটি অল্পবয়েসি ছেলে, তার হেলপারটিও সেইরকম। এইরকম ব্যাপার দেখে ড্রাইভারটি বলে উঠেছিল, দেখুন স্যার, আমাদের কোনো দোষ নেই। ভদ্রঘরের মেয়েছেলে, এত রাতে পার্ক স্ট্রিট যেতে চান শুনে আমিই বলেছিলুম, দিদি, সেখানে কেন যাবেন, আজ অনেক রাস্তায় হেভি গণ্ডগোল। তা উনি বললেন, আমি আমার স্বামীকে খুঁজতে যাচ্ছি, আপনারা কথা দিন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না, আমাকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাবেন না! আমরা তাই বাধ্য হয়ে—

সেদিন কলকাতায় কী একটা উপলক্ষে কিছু ভাঙচুর, ট্রাম-বাসে আগুন আর বোমাবাজি হয়েছিল, পার্ক স্ট্রিটে অবশ্য তার কোনো প্রভাব পড়েনি। টিভিতে সেই গণ্ডগোলের খবর দেখে, স্বামীর ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে করতে উতলা হয়ে শেষ পর্যন্ত দেবযানী একা রওনা হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের দিকে। ট্যাক্সি ড্রাইভারটি ভাগ্যিস ভাল ছিল, পাজি-বদমাশও হতে পারত!

ঘটনাটা মনে পড়তেই সুশোভনের বুকটা টনটন করে উঠল। নিজের জীবনের সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে দেবযানী স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন, কিন্তু কতটা টান থাকলে...। এই দেবযানীই রাগের মুহূর্তে বলে, তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি। আরো অনেক রূঢ়-নির্মম কথাও বলে, কিন্তু রাগের সময়কার সেইসব কথা আসলে অর্থহীন। অনেকে যেমন অর্থের কথা না ভেবেই শালা-বাঞ্চোৎ বলে। সুশোভন কক্ষণো এরকম শব্দ উচ্চারণ করেন না, তিনি যে ভাষার কারবারি, কোনোরকম অর্থহীন বা ভুল ভাষা ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক সময় দেবযানীর ওইসব অর্থহীন রাগের ভাষা বিশ্বাস করে ফেলে তিনি কষ্ট পান।

দেবযানী আজ ঠিক রাগ করেনি, তার কণ্ঠস্বর ছিল ভাঙাভাঙা, বেদনার্ত উদাস। ভিতরে ভিতরে সত্যি ওর নিঃসঙ্গতার গভীর কষ্ট হচ্ছিল, সুশোভন খানিকটা চঞ্চল মনের বলে তখন ঠিক বুঝতে পারেননি। যদি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। পাগলামি করে যদি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কোনো ট্রেনে চেপে বসে? জঙ্গলের ধারে নির্জন নদীর তীরে কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাকার স্বপ্ন... পৃথিবীতে ওরকম জায়গা কোথাও নেই, যেখানে একটি রমণী একা ঘর বেঁধে থাকতে পারে...। দেবযানী সেরকম কিছু করতে গেলে বিপদে পড়বেই, এক একা, অসহায়, চতুর্দিকে হিংস্র পশুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেবযানীর সরলতার সুযোগ নিয়ে...

না, না, এ সব ভুল ভাবনা। ওরকম একা থাকার ইচ্ছে মানুষের হয়, তা বলে কি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে যায়? না, তা হয় না, দেবযানী বাথরুমে ছিল বলে ফোন ধরতে পারেনি, কিংবা পাশের কোনো ফ্ল্যাটে গেছে।

গাড়িটা যাচ্ছে রেড রোড ধরে। এ দিকটা ফাঁকা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে একজোড়া যুবক-যুবতী। ওরা পৃথিবীর আর কিছু দেখছে না। বিয়ের আগে দেবযানীর সঙ্গে এখানে দেখা হত। সবচেয়ে ভাল লাগত বৃষ্টির দিনে, আর কেউ থাকত না প্রায়। দুটি পাখির মতো বৃষ্টিতে সেই স্নান... না, এ জীবনে আর ও সব হবে না। এখন দেবযানীকে নিয়ে এখানে কোনোদিন বেড়াতে এলে কেউ না কেউ সুশোভনের কাছে এসে অটোগ্রাফ চাইবে।

ভবানীপুরের রাস্তায় আবার জ্যাম। বাড়ি পৌঁছবার জন্য ছটফট করছেন সুশোভন। কেন কেউ ফোন ধরল না? না, না, দেবযানী, কোথাও যেও না, প্লিজ, আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।—

তবু যেন সুশোভন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেবযানী উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা ট্রেনে উঠছে। ট্রেনটা ছেড়ে গেল নিরুদ্দেশের দিকে। একটা আটপৌরে শাড়ি পরা, চুলটাও ভাল করে বাঁধেনি, হাতে শুধু একটা হ্যান্ড ব্যাগ...দু চোখে থমথমে কান্না...। জোর করে ছবিটা মুছে দিতে চাইছেন সুশোভন।

ঝট করে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ে সুশোভন ড্রাইভারকে বললেন, তুমি গাড়িটা যখন পারো নিয়ে এসো, আমি হেঁটে যাচ্ছি।

হনহন করে হাঁটতে লাগলেন সুশোভন। বাড়ি আর খুব বেশি দূর নয়। হঠাৎ দুটি ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকাল। প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। একজন বলল, স্যার, আপনার ওই ধারাবাহিক লেখাটায়... ওই চরিত্রটা কি কাল্পনিক? অনেকদিন আপনার কবিতা পড়িনি...

সাদা চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে সুশোভন বললেন, পরে কথা হবে, এখন আমি ব্যস্ত আছি—

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন বাড়িতে। লিফট নীচে নামা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারছেন না। আরোতনেক লোক আছে, প্রত্যেক তলায় লিফট থামছে। সুশোভন অবশ্য নামলেন একা। বুক কাঁপছে, বুক কাঁপছে। কলিং বেলে হাত দিলেন সুশোভন।

দু বার তিনবার বাজল। কোনো সাড়া নেই। দেবযানী ঘুমিয়ে আছে? বাথরুমে থাকলে বেল শোনা যায় না। দিলীপটা কোথায় গেল? সুশোভন বেলটা বাজাতেই লাগলেন, বাজাতেই লাগলেন, যেন দেবযানীকে ভিতরে থাকতেই হবে, বাথরুমের দরজা ভেদ করে এই শব্দ যাবে।

পরের বার লিফট আসার পর লিফটম্যান বলল, স্যার বউদি তো বেরিয়ে গেছেন?

লিফটম্যানের গলায় কোনো উৎকণ্ঠা নেই। মাঝে মাঝেই যে রকম বেরোয় দেবযানী, যেন সেইরকমই। তেমনই তো হবে। যদি চিরকালের মতো বেরিয়ে যেতে চায়, তা হলেও কি দেবযানী লিফটম্যানকে জানিয়ে যাবে?

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, দিলীপ কোথায় গেছে?

লিফটম্যান বলল, তাকে দেখিনি।

সুশোভন আবার জিজ্ঞেস করলেন, বউদি কখন বেরিয়েছে?

লিফটম্যান বললেন, অনেকক্ষণ আগে, মনে হয় তখন চারটে বেজে গেছে। সুশোভন বললেন, ঠিক আছে, নীচে খোঁজ করে দেখো তো দিলীপ আছে কি না।

সুশোভনের কাছে চাবি থাকে না। আজ তাঁর এই সময় ফেরার কথাও নয়। ব্যারাকপুরে গেলে রাত দশটার আগে ফেরা যেত না। দেবযানী তাই-ই জানে।

সত্যি চলে গেছে দেবযানী? একজন নারী যদি গৃহত্যাগ করতে চায়, তা হলে ঠিক কখন চলে যায়? স্বামী বেরিয়ে যাবার একটু পরেই? কিংবা দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিয়ে? কিংবা সন্ধের অন্ধকার নামলে? পুরুষরা সংসার ছাড়ে ভোর রাতে, ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে রেখে, নদের নিমাইয়ের মতো।

বিকেল চারটের সময় গনগনে রোদ ছিল, তখন দেবযানী কোথায় গেল? গাড়ি নেই, ট্যাক্সি ডেকেছে! বাসে চেপে গেছে? আর দিলীপটাই বা কোথায় গেল?

তাঁর বন্ধু নজরুল পুলিশের একজন বড় কর্তা, তাঁকে ফোন করবেন? নজরুল হুলস্থূল বাধিয়ে দেবে। নিরুদ্দেশের ট্রেনটা ছুটছে না থেমে, জানলার কাছে বসে আছে দেবযানী, কী করুণ আর নিঃস্ব দেখাচ্ছে তাকে, বুকটা মুচড়ে উঠল সুশোভনের। ভুল হয়েছে, অনেক ভুল হয়েছে। যুক্তি থাক বা না থাক, দেবযানী কষ্ট পেয়েছেন এটা তো ঠিক। সুশোভন কেন তা বোঝেননি। কেন সেই বেদনার মর্যাদা দেননি? আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায় না?

দেবযানী কি কোনো চিঠি লিখে রেখে গেছে? সুশোভন ফিরে এলে কী করে ঢুকবে সে ব্যবস্থাও সে করে যাবে না? ফ্ল্যাটের ভিতরে না গিয়ে, সব ব্যাপারটা না বুঝে এখনই কাউকে খবর দেওয়া ঠিক হবে না।

লিফট আবার ফিরে আসতেই সুশোভন সচকিত হয়ে তাকালেন। নামল একজন অচেনা। অন্য ফ্ল্যাটে যাবে। লিফটম্যান বলল, স্যার দিলীপকে তো দেখছি না, আপনি নীচে গিয়ে বসবেন?

সুশোভন বললেন, না, ঠিক আছে।

দুপাশের অন্য দুটি ফ্ল্যাটের মানুষজনের সঙ্গে খুবই সদ্ভাব আছে, ইচ্ছে করলেই যে কোনো ফ্ল্যাটে বসা যায়। সুশোভন কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারেন। গেলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে। বন্ধ দরজার ওপাশের শূন্যতার গর্ভে কী রহস্য আছে কে জানে!

সুশোভনের কাছে প্রায় চারশো টাকা আছে। এক কাজ করলে হয় না? সুশোভনও যদি এক্ষুনি হাওড়া স্টেশন গিয়ে যে-কোনো ট্রেনে টিকিট না কেটে উঠে পড়েন তো কেমন হয়? দুজনের নিরুদ্দেশ যাত্রা কি কোথাও মিলবে?

দেবযানী বিষ-টিষ খেয়ে ফেলেনি তো? কিংবা শাড়িতে আগুন লাগিয়ে...। যার যত আজেবাজে চিন্তা। কে যেন লিখেছিল, অতি প্রিয়জন সম্পর্কেই যত সব খারাপ খারাপ দুর্ঘটনার কথা মনে আসে। মা ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাবার সময় মনে মনে বলে, যেন গাড়ি চাপা না পড়ে!

লিফটটা কতবার উঠছে, নামছে। ইচ্ছে শক্তি দিয়ে দেবযানীকে ফিরিয়ে আনা যায় না? সুশোভন সেরকম মনের জোর পাচ্ছেন না। মনটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন কাঁদেননি, তবু ভিতরে ভিতরে ঝরছে কান্না। দেবযানীর একটা স্বপ্নের জগৎ আছে, সেখানে সুশোভন অনেক সময় ঢুকতে পারেন না। সাতাশ বছর একসঙ্গে থাকলেও কি স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে পুরোপুরি চিনতে পারে? না, কোনো মানুষের পক্ষেই একবারে স্বচ্ছ হওয়া সম্ভব নয়।

হঠাৎ সুশোভনের মনে হল, আর লিখে-টিখে কী হবে? বেঁচে থাকারই বা আর কী দরকার। ছেলে বিদেশে আছে, ভাল আছে, তার জন্য দুশ্চিন্তা নেই। এই ফ্ল্যাটটা, বইয়ের রয়ালটি থেকে যা টাকা পাওয়া যাবে, তাতে দেবযানীর বাকি জীবনটা কেটে যাবে।

সুশোভন দাশগুপ্তর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। তাঁকে বাদ দিয়েও বাংলা সাহিত্য রমরমিয়ে চলছে। দূর ছাই, আর ভাল লাগে না। 'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও, ভারের বেগেতে চলেছি কোথায় এ যাত্রা তুমি থামাও—।' কয়েকটা ডাক্তারখানা ঘুরে সত্তর-আশিটা ঘুমের বড়ি জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়, তারপর ঘুম, গভীর, লম্বা ঘুম, আর কী আরাম, একেবারে নিশ্চিন্তপুরে যাত্রা—।

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন সুশোভন। এ সব কী হচ্ছে? এও তো ডিপ্রেশন, পুরুষ মানুষের ডিপ্রেশন হতে নেই, পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

এক ঘণ্টা দশ মিনিট বাদে লিফট থেকে নামলেন দেবযানী। সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন এলে?

সুশোভনের বুক কাঁপছে। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে। অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, এই তো একটু আগে।

ব্যাগ থেকে চাবি বার করতে করতে দেবযানী বললেন, তোমার ফিরতে রাত হবে বলেছিলে, তাই দিলীপকে নটা পর্যন্ত ছুটি দিয়েছি, ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

দেবযানী বললেন, দিদির বাড়িতে। টুকুনের খুব জ্বর, দিদির আবার কাজের লোক নেই, তাই টুকুনের পাশে কিছুক্ষণ বসেছিলাম। ভাগ্যিস চলে এলাম, না হলে তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে! পাশের ফ্ল্যাট থেকে দিদির বাড়িতে একটা ফোন করে দেখলে পারতে।

সুশোভন বললেন, ঠিক। সে কথাটা মনে পড়েনি। তুমি দিদির বাড়ি থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন?

দেবযানী বললেন, এমনিই, টুকুন ঘুমিয়ে পড়ল, ভাবলাম বাড়িতেই যাই। রথীদা এ দিকে আসছিলেন, আমাকে নামিয়ে দিলেন। টিভি-তে একটা ভাল ফিল্ম আছে, দেখবে? নাকি তোমার লেখা আছে?

সুশোভন বললেন, হ্যাঁ দেখব, না লেখা-টেখা কিছু নেই।

ফরফর আলোগুলো জ্বালালেন দেবযানী। ভুরু পরিষ্কার, মুখে হালকা ভাব ছড়ানো, দুপুরের মেজাজ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সুশোভন কত আজে বাজে কথা ভেবে মরছিলেন।

দেবযানী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ব্যারাকপুর গেলে না কেন?

ইচ্ছে করেই যাইনি, তোমার জন্য যাইনি, এরকম কথা বললে পাছে অবিশ্বাস্য শোনায়, তাই সুশোভন বললেন, ওদের ওখানে কী যেন একটা গোলমাল হয়েছে, তাই অনুষ্ঠানটা পিছিয়ে গেছে।

দেবযানী ওষ্ঠ উলটে বললেন, ভালই হয়েছে। সংবর্ধনা মানে তো একটা তামার প্লেট কিংবা একটা জ্যালজেলে পাঞ্জাবির কাপড় দেবে, ও সবের জন্য অতদূর যাওয়ার কোনো মানে হয়!

টেবিলের ওপর একটা পত্রিকা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে দেবযানী আবার বললেন, তুমি এই পত্রিকায় কমল দত্ত নামে একজনের লেখা পড়েছ?

ডাকে যত পত্র-পত্রিকা আসে, তার সবকিছুই সুশোভনের পড়া হয় না। সময় পান না, কিন্তু দেবযানী সব পড়েন। সুশোভন বললেন, না, পড়িনি, কী আছে তাতে?

দেবযানী বললেন, দুপুরবেলা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে এমন রাগ হয়ে গেল। লোকটা লিখেছে, তুমি নাকি অতীত কাল নিয়েই শুধু লেখো, তুমি অতীত বিলাসী, বর্তমান কাল নিয়ে কিছু লেখো না, এখনকার জীবন নিয়ে কিছু লিখতে ভয় পাও। কী বাজে কথা! তোমার অমুক অমুক বইটা একালের কথা নয়! তোমার বেশিরভাগ লেখাই তো সমসাময়িক জীবন নিয়ে, তুমি নকশালদের নিয়ে যেটা লিখেছ, এরা কিছু পড়ে না, না পড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো মন্তব্য করে।

সুশোভন বললেন, ওই কমল দত্ত নামের লোকটিকে একটা ধন্যবাদ জানাতে হবে তো!

দেবযানী বললেন, কেন?

সুশোভন বললেন, ওর লেখা পড়ে রেগে গিয়ে তুমি দুপুরবেলা আমার ওপর যে রাগ করেছিলে, সেটা ভুলে গেছ। ভদ্রলোক আমার উপকারই করেছেন।

হেসে ভ্রূভঙ্গি করে দেবযানী বললেন, মোটেই না। সে সবও ভুলিনি। সেসব নিয়ে অনেক কথা আছে। এই তুমি চা খাবে? সিনেমাটা শুরু হতে একটু দেরি আছে, আগে একটু চা খাওয়া যাক।

সুশোভন বললেন, আমার সাঙ্ঘাতিক চা-তেষ্টা পেয়েছে।

সত্যিই তাই, দেবযানীকে সহজ, স্বাভাবিক, এমনকি কিছুটা উচ্ছল দেখে সুশোভনের বুকের পাষাণ-ভার নেমে গেছে, অনুভূতিগুলি সব ফিরে এসেছে। তেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পেয়েছে।

রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাস জ্বালালেন দেবযানী। সুশোভন দেখলেন, ফ্রিজের ওপর একটা প্লাস্টিকের কৌটো ভর্তি পিস্টাশিও বাদাম রয়েছে। যতক্ষণ চা তৈরি হয়, ততক্ষণ খোলা ভেঙে ভেঙে এই বাদাম খেলেন, তারপর ভাবলেন, একা একা খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালেন দেবযানীর গা ঘেঁষে। তার একটা হাত নিয়ে মুঠোর মধ্যে দিলেন পিস্টাশিও।

দেবযানী জিজ্ঞেস করলেন, কী? এটা কী দিলে?

মৃদু হাস্যে সুশোভন বললেন, সময়!

দূর থেকে দেখা

বৃষ্টির পর ঘাসগুলো চকচকে সবুজ হয়ে আছে। পুরনো উপমা হলেও কার্পেটের কথাই মনে আসে। সেই মাঠভরা কার্পেটের ওপর দৌড়চ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, এই সাত আট বছর বয়েস। ছেলেটার পরনে একটা টকটকে লাল রঙের প্যান্ট, কোমরের অনেক নীচে নেমে গেছে, এক হাতে সেটা ধরা। হাত ছাড়লেই প্যান্ট খুলে যাবে। ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে ছোটাছুটি করছে একটা ডানা-ভাঙা শালিক পাখি ধরার জন্য।

দৃশ্যটা আকর্ষণীয়। লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে আমি সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। ছাদের ওপর একটা ছোট্ট ঘর আমি সম্প্রতি পেয়েছি, সেখানে এখন লিখতে বসি। ঘরটা সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়— চারদিক শুধু ছাদ, যেন একটা ছাদের জগৎ, কোনো মানুষজন নেই। সকাল নটা-দশটায় কে আর ছাদে উঠবে। ক্বচিৎ দেখা যায় কাপড় মেলতে এসেছে কোনো ঝি, অথবা দূরে কোনো রান্নাঘরের জানলায় কোনো সুন্দরী রমণীর শরীরের একাংশ।

কিছু কিছু গাছপালাও চোখে পড়ে। আমার বাড়ি শহরের ধার ঘেঁষে, সামনেই ওভারব্রিজ, তলায় রেললাইন। ছাদের ঘরে আসার পরেই আমি টের পেয়েছি, এ দিকে অনেক নারকেলগাছ আছে এখনো। পুব দিকে বেশ খানিকটা দূরে একটা নারকেল গাছের জঙ্গল। এ ছাড়া কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ ও আমগাছ বেশ দেখা যায়। এমনকি এক বাড়ির উঠোনে একটা পেঁপেগাছ পর্যন্ত। আমি অবশ্য প্রকৃতি-ট্রকৃতি তেমন একটা পছন্দ করতাম না কখনো, কিন্তু এখন লক্ষ করছি, বৃষ্টির সময় গাছগুলির চুপচাপ স্নান করার দৃশ্য দেখতে বেশ ভালই লাগে। আমার ঘরে পাখা নেই, কখনো কখনো বেশি গরম লাগলে আমি দূরের নারকেলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওদের পাতা নড়ছে কি না।

জমির দাম আগুন হলেও এখনো কিছু কিছু জমি খালি পড়ে আছে। হয়তো মালিকানার গণ্ডগোল বা অন্য কিছু কারণ থাকে। সেই রকম একটা জমি, বেশ বড়, ফুটবলের মাঠ হতে পারত, চারদিকে পাঁচিল ঘেরা, অনেকদিন থেকেই বিনা রক্ষণাবেক্ষণে আছে দেখছি। পাঁচিলের একদিকে এর মধ্যেই বেশ বড় একটা গোল গর্ত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে দৈত্যের বাগানে শিশুদের মতন রেললাইনের পাশের বস্তির ছেলেমেয়েরা খেলা করতে আসে। আমার লেখার টেবিলের সামনেই জানালা, সেই জানলার সোজাসুজি ওই মাঠ। একটু চোখ তুললেই ওইদিকে তাকাতে হয়।

শালিক পাখিটা বাচ্চাই হবে বোধ হয়। একটু-আধটু উড়েই আবার পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটা এক একবার ধরেও ফেলছে সেটাকে। কিন্তু এক হাতে রাখতে পারছে না। অন্য হাত ব্যবহার করতে গেলে প্যান্ট ছেড়ে দিতে হয়।

দুটো শালিক ব্যাকুলভাবে ছেলেটার মাথার কাছে ওড়াউড়ি করছে। দুটো কেন? শিল্পীরা যে ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, তার প্রমাণ কোকিল। গৃহহীন বলেই বোধ হয় পাখিদের মধ্যে শালিকের সন্তান স্নেহ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু দুটো কেন? জন্তু-জানোয়ারের তো পিতৃস্নেহ বলে কিছু থাকে না শুনেছি।

শালিক দুটো ছেলেটার খুব কাছাকাছি উড়ে উড়ে ওর দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করছে। ছেলেটা অবশ্য তাতে ভুলবে না। দূরে পাঁচ-সাতটা কাক এমন লঘু স্বরে ডাকছে, যেন হাসছে। কাকের বাচ্চা নিয়ে কেউ এরকম খেলা করলে ওরা এতক্ষণ তার জীবন অতিষ্ঠ করে দিত। এখন শালিকের বাচ্চার বিপদে ওরা মজা দেখছে। অবশ্য শালিকরাও চড়ুই পাখির বাসা খুঁচিয়ে বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলে আমি জানি।

ছেলেটা একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাতে চেপে ধরল শালিকের বাচ্চাটাকে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ে গেল ওর প্যান্টটা। আমি একা ঘরে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ছেলেটা জানে না ওকে কেউ দেখছে। তবু পাখিটাকে ছেড়ে প্যান্টটাকে টেনে তুলল আবার। একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল কী যেন। পাখির বাচ্চাটা লাফিয়ে অনেকটা দূরে চলে গেছে, দুই অভিভাবক পিড়িং পুড়িং করে কী যেন উপদেশ দিচ্ছে তাকে। লাল প্যান্ট পরা ছেলেটা কিন্তু হাল ছাড়ল না। আবার দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল সারা মাঠ জুড়ে।

এটা একটা সুন্দর দৃশ্য। কোনো বাচ্চা ছেলে যখন একা একা খেলা করে, তখনই তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। একা খেলার সময় কী অসম্ভব মনোযোগী হয় ওরা। দৃশ্যটা আমার বেশি ভাল লাগছে এই কারণে যে, ওই ছেলেটা

থাকে রেললাইনের পাশের বস্তিতে, যেটা এ পাড়ার ঝি-চাকরের ডিপো। ওখানে আছে নিরানন্দ, মারামারি; ওখানে দুবেলা খাবার নেই, চিনি কিংবা মাছের স্বাদই জানে না। ওই জায়গাকার একটি ছেলে, কারুর কাছ থেকে চেয়ে আনা লাল রঙের প্যান্টুল পরা, আপন মনে খেলছে। এখন এই বালকের খেলার যা আনন্দ, পৃথিবীর কোনো বালক এর চেয়ে বেশি কিছু পায় না।

সুন্দর দৃশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না অবশ্য। দৌড়োদৌড়িতে পরিশ্রান্ত ছেলেটি হঠাৎ মত বদলে ফেলে। দু হাতের ব্যবহার ছাড়া সে পাখিটাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না জেনে এবার সে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নেয়। এবার সে শালিকের বাচ্চাটাকে মারবে।

আমি আঁতকে উঠলাম। একবার ভাবলাম, চেঁচিয়ে বারণ করি। কিন্তু আমার গলার আওয়াজ অতদূর পৌঁছবে না। তা ছাড়া, ও শুনবেই বা কেন আমার কথা।

শালিকের বাচ্চাটাকে ইট ছুড়ে ছুড়ে মেরেই ফেলল ছেলেটা। বড় শালিক দুটো একবার তার মাথার কাছে এসে উড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে একটু দূরে। মায়ের সামনেই হত্যা করা হচ্ছে তার সন্তানকে, কিন্তু প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই তার। এটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয় পৃথিবীতে, কিন্তু আমার চোখের সামনেই ঘটে বলে আমি একটু মুষড়ে পড়ি।

খেলা শেষ হয়ে গেছে, ছেলেটি এক দৌড়ে দেয়ালের গর্ত পেরিয়ে চলে গেল আমার দৃষ্টির আড়ালে। তখন চোখে পড়ল, এক কোণে একটা বেড়াল চুপ করে বসে ছিল, এবার সে গুটিগুটি পায়ে এগোচ্ছে মরা শালিকটার দিকে। তার মা তখনো খুব কাছে বসে। বেড়ালটাকে আমি আগে লক্ষ্যই করিনি। ও ঠিক সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমি জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনটা খুব খারাপ লাগছে। আমার চোখের সামনেই শালিকের বাচ্চাটা মরল। আমি যখন এ ঘরে থাকি না, সেই সময়ে মরলেই তো পারত। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু এরকম করলে তো চলবে না। অনেক জরুরি লেখা বাকি আছে।

মন ভাল করার জন্য আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজেকে ভ্যাংচালাম। তাতেও কিছু হল না বলে নাচতে শুরু করলাম আমি। খানিকক্ষণ মণিপুরী সর্পনৃত্য অভ্যেস করা গেল। একা ঘরে থাকার এই একটা সুবিধে, যাই করি, কেউ পাগল ভাববে না। কিন্তু নাচের পরেও মনটা শান্ত হয় না। ছাদে বেড়িয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকি, যদি কোনো সুন্দরী রমণীর এক চিলতেও দেখতে পাওয়া যায়। বেশিক্ষণ খুঁজতে সাহস হয় না অবশ্য, কারণ আমাদের কাছাকাছি একটি বাড়িতে একটি বদ্ধ উন্মাদ স্ত্রীলোক আছে, ক্বচিৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেই আমার বুক কাঁপে। তখন আমি দূরের দিকে তাকিয়ে যা দেখা যায় না, তাই দেখার চেষ্টা করি।

দিন তিনেক বাদে দুপুরবেলা দেখলাম আমাদের বাড়ির সিঁড়িতে সেই লাল প্যান্টপরা ছেলেটা বসে আছে। একটু চমকে উঠলাম। এ বাড়ির সদর দরজা এবং সিঁড়ি থেকে নিয়মিত বালব চুরি যায়। অনেক চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারি না। অনেক সময় দিনদুপুরেও বালব অদৃশ্য হয়। বাড়িওয়ালাও এক সময় হার স্বীকার করে জানিয়েছেন, এ পাড়ায় মশাই সিঁড়িতে আলো জ্বালিয়ে রাখার উপায় নেই।

আমি ছেলেটার দিকে কড়া চোখে তাকালাম। সে মুখ নিচু করে বসে রইল। যেভাবে টিকটিকির মতন দেয়াল বেয়ে উঠে বালব খুলে নেয়, তাতে এই রকম বাচ্চা ছেলেরই কাজ। কিন্তু চোর আমাকে দেখেও সিঁড়িতে বসে থাকবে না।

—কী চাই?

ছেলেটা মুখ তুলে তাকাল। এখন একে শালিক হত্যাকারী বলে আর চেনা যায় না, নিতান্ত গোবেচারা মুখ, অনেকটা মহাত্মা গান্ধীর বাল্যকালের ছবির মতন।

উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী চাই?

—আমার মায়ের সঙ্গে এসেছি।

ভেতরে এসে দেখলাম, একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমার মা ও বউদির সামনে মাটিতে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু বলছে। দেখলেই বোঝা যায় ঝি-ক্লাসের মেয়েছেলে। আমার মা ও বউদি ওকে চেনেন মনে হল।

বসবার ঘরে খবরের কাগজ খুলে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পরীক্ষা বিষয়ে পড়তে পড়তেও আমি ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। স্ত্রীলোকটি তার নিজের জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছে। দুঃখের কাহিনী শুনতে আমার ভাল লাগে না, দুঃখের কাহিনী সব সময়েই একঘেয়ে হয়। পঙ্গু স্বামী, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, দু সপ্তাহ রেশন তুলতে পারিনি, কী করে বাঁচব বলুন ইত্যাদি। নতুন কিছু না। মোট কথা, স্ত্রীলোকটি আমাদের বাড়িতে কাজ চায়। এক সময় তার বড় মেয়ে এ বাড়িতে কাজ করত, দু-একদিন সেও এসে বদলি কাজ করে দিয়ে গেছে। সেই সূত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ।

আমাদের বাড়িতে একজন ইতিমধ্যেই কাজ করছে। একজনকে কাজ দেবার জন্য তো আর একজনকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে দু সপ্তাহ রেশন তুলতে পারেনি, সে এই যুক্তি বুঝবে না, তাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

ওই সব ঘ্যানঘেনে কথাবার্তার মধ্যে একটি মাত্র বিষয়ই উল্লেখযোগ্য। ওই স্ত্রীলোকটির যে কিশোরী মেয়েটি এক সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করত, সে এখন যুবতী হয়েছে, এবং সে এখন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা বাসা নিয়েছে। তার রোজগার ভাল, সে গালে স্নো পাউডার মাখে, কিন্তু মা, আমি মরে গেলেও তার অন্ন খাব না। সে সেধে দিতে এলেও তার কাছ থেকে একটা আধলাও নেব না।

বুঝতে অসুবিধে হয় না, মেয়েটি এখন বেশ্যা হয়েছে। ওই স্নো-পাউডার মাখার কথাটা শুনলেই ধরা যায়। আশ্চর্য, গরিবদের মধ্যেই এত পাপ-পুণ্য বোধ প্রবল থাকে। এই গোঁয়ার ধারণাগুলোর জন্য না খেয়ে থাকতেও রাজি আছে। ঝি-গিরি করার চেয়ে বেশ্যা হওয়া খারাপ। চুরি ডাকাতি করার থেকেও! দু সপ্তাহ রেশন না তুললে বস্তির লোকেরা কী খেয়ে থাকে, কে জানে!

গত সপ্তাহে আমাদের রেশন থেকে অখাদ্য চাল দিয়েছিল। শুধু কাঁকর এবং পোকা-ধরাই নয়, বিশ্রী গন্ধ। ওই স্ত্রীলোকটিকে চাকরির বদলে সেই চাল দান করে দেওয়া হল। দুটো রুটি ওর ছেলেটার জন্য। বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ছেলেটি সেই রুটি দুটো চিবোতে চিবোতে আর লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে মায়ের পেছনে। ছেলেটার আনন্দ পাবার ক্ষমতা আছে।

ওর যে দিদি আমাদের বাড়িতে আগে কাজ করত, তাকে মাঝে মাঝে পথেঘাটে দেখি। এর পর একদিন বাস স্টপে সেই মেয়েটিকে দেখে একটু বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তাকালাম। সত্যিই গালে স্নো-পাউডার মেখেছে। জ্যালজেলে সস্তা সিল্কের শাড়ি। ব্রা-ফুটে ওঠা ব্লাউজ, পায়ে গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের চটি, হাতে আবার একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। সে যেন আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেয়েছে, মুখটা ঘুরিয়ে রইল অন্যদিকে। স্বাস্থ্যটি বেশ ভাল হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়, দুবেলা ঠিক মতন খেতে পায়। আগে তিন চারটে ঠিকে কাজ করত, এখন নিশ্চয়ই তার থেকে ওর খাটনি কম এবং রোজগার বেশি। আমি মনে মনে ওকে আশীর্বাদ করলাম, বেঁচে থাকো, সুখী হও!

রাত্তিরবেলা ছাদের ঘরটা আবার অন্য রকম লাগে। বেশি চাপ পড়েছে বলে রাত জেগে লিখতে শুরু করেছি ক'দিন ধরে। খুব মন দিয়ে দু-এক ঘণ্টা লেখার পর হঠাৎ মনে হয়, ছাত্র বয়েসে যদি এরকম একটা ঘর পেতাম, নিশ্চয়ই সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম। হাত-পা ছড়াবার জন্য মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াই। জাহাজের মতন বিরাট বিরাট সব আলোকোজ্জ্বল বাড়ি, হঠাৎ দপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। লোডশেডিং। নিমেষে শহরটাকে মনে হয় মৃত পুরী। শুধু রেললাইনের পাশের বস্তিতে আলো দেখা যায়, ওখানে ইলেকট্রিক নেই।

ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, কতদিন আকাশ দেখিনি। মাঝে মাঝে দেখা স্বাস্থ্যকর। আমি খোঁজখবর না নিলেও আকাশটা আগের মতনই ঠিকঠিক ভাল আছে। আর একটু টাকাপয়সা পেলে কোন তারায় গিয়ে একটা বাড়ি বানাব, সে বিষয়ে মনে মনে একটা ছক এঁকে ফেলি। সেই মুহূর্তে নিজেকে বেশ সুখী ও স্বাস্থ্যবান মনে হয়। প্রিয় নামে ডাকলাম, হ্যালো, প্রিন্স অব ডেনমার্ক!

ঘরে এসে মোম জ্বেলে আবার লিখতে বসি। জানলার বাইরের অন্ধকারটাকে মনে হয় যেন নারী। একরাশ কালো চুল মেলে চুপচাপ আমাকে দেখছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ?

দমকা হাওয়ায় নিভে গেল মোমটা। আমি তখন সেই অন্ধকারকে আলিঙ্গন করে বেশ বড় দুটো চুমু খেলাম। বললাম তোমার জিভটা একটু বার করে দাও তো! তুমি আমার মাথায় হাত রাখো, দু আঙুল দিয়ে যতটুকু নুন তোলা যায়, আমায় ততটুকু ভালবাসবে? তোমায় আমি—

একলা ঘরে থাকলে এ রকম যা খুশি করা যায়। কিন্তু লেখায় মন বসছে না। আবার মন দেবার চেষ্টা করতেই কানে ভেসে এল একটি বাচ্চার তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ। যেন কেউ মেরেছে। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না। ভুরু কুঁচকে যায় আপনা থেকেই।

তারপর শুনতে পাই ঘন ঘন ট্রেনের হুইশল। যেন কিসের সংকেত। এটা আমার চেনা। ট্রেন থেমে গেছে, কিছুক্ষণ বাদে বাদে পর পর চারবার লম্বা হুইশেল দিচ্ছে। ওভারব্রিজের তলাটায় ওয়াগান ব্রেকারদের আড্ডা। পরমানন্দে কিছু লুঠপাট চলছে। নিয়মিত ব্যাপার। যে অন্ধকারকে আমি শুধু নারী ভেবেছিলাম, সেই অন্ধকার ওদের কাছে অন্নপূর্ণা।

আমি আবার ছাদের আলসের কাছে গিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখবার চেষ্টা করলাম। কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যেও শোনা যাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলের কান্না। সেই ছেলেটা?

সেই ছেলেটাকে পরদিনই দেখলাম শ্রমিকের ভূমিকায়। ব্রিজের আরম্ভের মুখে যে ট্যাক্সিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে সেই ট্যাক্সি ধোয়া-মোছার কাজ নিয়েছে। কোথা থেকে জোগাড় করেছে একটা হলদে কাপড়। বিশাল চেহারার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা যখন স্টিয়ারিঙের ওপর পা তুলে একটু বিশ্রাম নেয়, সেই সময়টুকু ওই ছেলেটা সামনের কাচ পরিষ্কার করে, মাডগার্ডের কাদা মুছে দেয়। রেট দশ পয়সা। কয়েকদিন আরো কয়েকটা ছেলে ওই কাজে জুটে গেল। রীতিমতন প্রতিযোগিতা।

একদিন আমি নিজেই তাড়াহুড়ো করে একটা ট্যাক্সিতে এসে চাপলুম। ট্যাক্সির ড্রাইভার টাং টাং করে মিটার ঘুরিয়ে যেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, অমনি জানলার কাছে সেই ছেলেটা এসে বলল, আমার পয়সা? সর্দারজি, আমার পয়সা।

সর্দারজি বলল, ভাগ! আধা কাম নেহি হুয়া—

পয়সা না দিয়েই সর্দারজি গাড়ি ছেড়ে চলে এল, ছেলেটা খানিকটা পেছন পেছন ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। সর্দারজি আপন মনেই শব্দ করে হাসছে, যেন একটা মজার ব্যাপার।

আমি একবার ভাবলাম, ওইটুকু ছেলেকে ঠকাবার জন্য সর্দারজিকে এক ধমক দেব। এখনো পিছু ফিরে পয়সা দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এটা ওদের ব্যাপার। একটা বাঘ কি অন্য বাঘের বাচ্চার প্রতি মায়াদয়া দেখায়? মানুষ তার থেকে কতটা আর আলাদা! তা ছাড়া, সর্দারজি বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে ভালবাসে, এটা বোধ হয় সে-রকমই একটা কিছু।

আসলে, আমি এই সব যুক্তি বানাচ্ছিলাম নিজেকে বাঁচাবার জন্য। আমার মনে মনে অনেক কথা এলেও মুখে তা বলতে পারি না। সর্দারজির সঙ্গে ঝামেলা করতে চাইছিলাম না। তবু মনটা একটু খচখচ করতে লাগল। দশটা পয়সা থেকে ওই ছেলেটাকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে আমারো কিছুটা ভূমিকা আছে। কোনো এক সুযোগে আমিও ওকে পয়সাটা দিয়ে দেব।

সেই দিন একটু রাত করে বাড়ি ফিরছি, ঠিক দরজার কাছে একটা হোঁচট খেলাম। অন্ধকারের মধ্যেও একটা জিনিস দেখে বুকটা ভয়ে হিম হয়ে গেল। হাইড্র্যান্টের মুখটা খোলা। একটা গোল গর্ত হাঁ করে আছে। সেই গর্তের পাশে একটা ইটে ভাগ্যিস আমার পা লেগেছিল, নইলে গর্তে পড়ে পা-টা নিশ্চয়ই ভাঙত। ওই নোংরার মধ্যে আমার পা—দৃশ্যটা ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করছে। বাড়ির কোনো বাচ্চা ছেলে পড়ে গেলে মারাও যেতে পারত! যোধপুর পার্কে আগে ঠিক এইভাবেই একটি ফুটফুটে মেয়ে মারা গেছে।

রাগে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যায়। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। হাইড্র্যান্টের ঢাকনা চুরি করা তো প্রায় খুন করার সমান। এর প্রতিকার করার উপায় নেই? আমি এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলাম যে, প্রতিবেশীরাও অনেকে জেগে উঠল। তখন দেখা গেল, পাশাপাশি চার-পাঁচখানা বাড়ির সদর দরজার সামনে থেকে হাইড্র্যান্টের ঢাকনা চুরি গেছে। হাঁ করে আছে মৃত্যুফাঁদ। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, এই বস্তির ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। বস্তিটা হয়েছে চোর আর ছিনতাইবাজদের আড্ডা। সি এম ডি এ যে বলেছিল বস্তি তুলে দেবে—কিছুই করার নাম নেই, যত সব! লোহার ঢাকনাগুলো বিক্রি করলে কটা পয়সাই বা পাওয়া যায়—আর যারা কেনে তারা বোঝে না ওগুলো কোথা থেকে আসে?

সেই রাত্রেই কোনোক্রমে কাঠ-ফাট জোগাড় করে তার ওপর ইট-পাথর চাপা দিয়ে গর্তগুলো ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হয়। আমিই এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি বলে আমার রাগ কমে গিয়ে একটু গর্ব জাগে। সে রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না।

আবার ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় একটি ভিখিরির চিৎকারে। একটি মাঝবয়েসি বুড়ি ঠিক আমাদের জানলার নীচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, মা, কিছু খাইনি, খেতে দাও না! নিটোল ভরাট গলা বুড়িটার, গান শিখলে উন্নতি করতে পারত। সে ওই একই কথা এত বার বলে থাকে যে, অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

বিছানা থেকে উঠে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজে। সারা রাত লোডশেডিং, অসহ্য গরম, ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু একটু স্নিগ্ধ আমেজ আসে, বিছানাটা প্রিয় মনে হয়—সেই সময় এই চিৎকার। রাগের বদলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এত ভোরে কখনো ভিখিরির ডাক শুনিনি। ও কি সারা রাত ধরেই এমন করে চেঁচিয়ে ফিরছে? এ সব কিসের চিহ্ন?

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আমি একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। যে দিকেই চাই, মানুষের চেহারা যেন ক্রমশ রোগা আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। আমাদের বেশ কয়েকজন পুরনো রাঁধুনি, যারা কখনো কখনো বিনা নোটিসে বা মিথ্যে কথা বলে চাকরি ছেড়ে দেশে পালিয়েছে—এখন প্রতিদিনই তাদের একজন দুজন করে ফিরে আসছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে, সঙ্গে ছেলেপুলে বা নাতিপুতি—হাত পেতে বলছে, মা, যে কোনো একটা কাজ দাও, দেশে খাবার নেই মা, কেউ খেতে পায় না মা—। যুদ্ধ নেই, দাঙ্গা নেই, তবু কলকাতার সব ফুটপাথ, রেল স্টেশন গৃহহারা

পরিবারে ভরে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, হাজার হাজার লাখ লাখ কঙ্কালসার মানুষ ধেয়ে আসছে শহরের দিকে।

জানলা দিয়ে তাকালে পৃথিবীটা এখন কত সুন্দর মনে হয়। হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে এমন তকতকে নীল আকাশ, ঝলকে ঝলকে ছুটে আসছে সোনালি রোদ, নারকেলগাছের পাতায় বাতাসের চিকন চিকন খেলা। এক ঝাঁক পায়রা আনন্দের জ্যান্ত ছবির মতন লুটোপুটি খাচ্ছে শূন্যে। এখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বহু দিন বেঁচে থাকতে সাধ হয়। শুধু নিজের একলা বেঁচে থাকা, সেই সঙ্গে কিছু প্রিয়জন—তার বাইরেই একটা বিরাট ক্ষুধা প্রকাণ্ড মুখ বার করে আছে। পৃথিবী এরকম সুন্দরই থাকবে—তবু কি এখান থেকে মানুষের আয়ু শেষ হল?

হঠাৎ খেয়াল হল, ভিখিরি বুড়িটা তখনো নিটোল সুরেলা গলায় কেঁদে যাচ্ছে। কোনো সিনেমার অভিনেত্রীও এমন নিখুঁতভাবে কাঁদতে পারবে না। আমি জানলার পাশে লুকিয়ে থেকে একটা দশ পয়সা ছুড়ে দিল্যাম নীচে। ঠং করে পয়সাটার শব্দ হল কিন্তু সেটা কুড়িয়ে না নিয়ে বুড়িটা বলল, পয়সা চাই না গো, দুটি খেতে দাও, কিছু খাইনি— ও গো, আমি কিছু খাইনি—

আর কোথাও কারুর জেগে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। আমি একলা জেগে উঠে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? আমারই সব দায়িত্ব? কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললাম, যাও যাও আর কিছু হবে না।

এর দু ঘণ্টা বাদে ডিম সেদ্ধ আর টোস্টের সঙ্গে চা খেতে খেতে এক পলকের জন্যে মনে প্রশ্ন জাগল, আমি কোনো অন্যায় করেছি? আমার বাঁ হাতটা আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে যায়। যেন একটা বিরাট আদালতে দাঁড়িয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি, অস্ফুট গলায় বললাম, চোপ! একটাও কথা শুনতে চাই না। আর একটা কথা বললেই গুলি চালাব। আমার বাঁ হাতটা উঁচু হয়ে ওঠে, সে হাতে একটা রাইফেল ধরা, দেয়ালে আমার বাবার ছবিটার দিকে টিপ করে ফায়ার করলাম।

ছাদের ঘরে এসে সে দিন আমি টেবিলটা ফেরালাম। দূরের ওই মাঠ তার পাশের বস্তির দিকে বার বার চোখ চলে গেলে আর লেখা এগুবে না। এ দিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ির পেছনের দিকটা, আর কয়েকটি সুশ্রী অট্টালিকার দোতলা তিনতলার বাসিন্দা—সে সব জায়গায় ইজিচেয়ারে কোনো প্রৌঢ় বা কিশোরী সামনে বই খুলে বসে থাকে। বিভিন্ন রান্নাঘরে মাছ মাংসের গন্ধ-ভরা ধোঁয়া। ছাদের টব-গাছগুলোতে ফুল এসেছে বর্ষায়। এ দিকে অন্য পৃথিবী।

তবু কি মন বসাবার উপায় আছে। একটা গোলমাল শুনে পিঠ ফেরাতেই হয়। বস্তিতে মারামারি লেগেছে। বিশেষ কিছু না, ওদের নিজেদেরই দুই দলের মধ্যে মারামারি হুড়োহুড়ি, ছোট ছোট বাচ্চারাও ইট ছোড়াছুড়ি করছে—কিছুকাল আগেও এই সব মারামারিতে বোমা ফাটত—এখন বোমার আওয়াজ আর শোনা যায় না। গরিবরা বেশি মারামারি করে, ওদের ছেলেপুলে বেশি হয়—ওদের পেট ছাড়া আর কোনো বস্তু নেই। মারামারিটা ছড়িয়ে পড়েছে রেললাইনের ওপর, ভ্যাঁ ভ্যাঁ আওয়াজ করতে করতে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন গতি মন্দ করে। ট্রেনটা অফিসযাত্রীতে ঠাসাঠাসি, ভিড় উপচে পড়ছে দরজার বাইরে—কয়েকটা বস্তির ছেলে সেই সব ট্রেন-যাত্রীদের দিকেই পাথর ছুড়তে শুরু করে হঠাৎ। উঃ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ওই ছেলেগুলোকে এক্ষুনি গিয়ে চাবকানো উচিত।

আমি চোখ বন্ধ করি। আবার চোখ খুলতে হয়। একটা ভয়ঙ্কর চ্যাঁচামেচির মধ্যে ট্রেনটা এবার জোরে বেরিয়ে যায়।

ট্রেন এর প্রতিশোধ নিল পরের দিন। আমি তখন বাজারে যাওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়েছি, দেখলাম রাস্তার সব লোক দৌড়চ্ছে ট্রেন লাইনের দিকে। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া যায় না। সব লোক যে দিকে যাচ্ছে আমিও সে দিকে এগোলাম।

ট্রেন লাইনের পাশেই বিরাট লম্বা বস্তি। অনেকের প্রায় লাইনের ওপরেই সংসার। কুকুর ছাগল ও বাচ্চারা লাইনের ওপরে বসে রোদ পোয়ায়।

আজ ট্রেন হুইশল না দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেছে। চাপা পড়েছে একটি ছাগল আর একটি মানুষ। আমি পৌঁছে দেখলাম লাইনের ওপর চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে, তা ওই ছাগলটার, দু'খণ্ড হয়ে গেছে একেবারে। পাঁঠা বলি অনেক দেখেছি, সুতরাং ছাগলের রক্ত দেখে গা গুলিয়ে ওঠার কথা নয়। কয়েকটা লুঙ্গি পরা ছেলে ছাগলের টুকরো দুটো ধরাধরি করে তুলে দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল।

ছেলেটার গা থেকে কিন্তু একটুও রক্ত বেরোয়নি। ও নাকি ট্রেনের একেবারে সামনে দিয়ে ছুটে পালাতে গিয়েছিল, ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছে লাইন থেকে অনেকটা ধারে। এখানে লাইনটা বাঁক নিয়েছে তো। এখনো বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে এই রকম মনে হয় ওকে দেখলে। ঠিক যেন ব্যথা সামলাবার জন্য পাশ ফিরে পেটে হাত চেপে শুয়ে আছে। সেই লাল রঙের প্যান্ট পরা ছেলেটা।

আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে ছেলেটা মরে গেছে। কালকে যাকে বেশ জ্যান্ত দেখেছি, সে কি এরকম দুম করে মরে যেতে পারে। কাছে গিয়ে মুখটা ভাল করে দেখার পর আর সন্দেহ থাকে না।

মেয়েটির মা ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পেছন পেছন আর একটা মেয়ে। ওর দিদি, যার সঙ্গে ওদের বাড়ির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। মেয়েটা এসেই একেবারে গালাগালির ঝড় তুলে দেয়। কাকে সে গালাগালি দিচ্ছে বোঝা না গেলেও তার শোকের প্রকাশ যে ক্রোধের উগ্রতায় এবং তা যে আন্তরিক তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে মায়ের কাছ থেকে ভাইকে নিজের কোলে তুলে নিতে চাইছে বারবার।

আমি মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্ট করি। একটা ক্ষুধার্ত পেট পৃথিবী থেকে কমে গেলে কী ক্ষতি? দশ বছর আগে নিরোধ জনপ্রিয় হলে এই ছেলেটা জন্মাতই না। দেশসুদ্ধ সবাই কি ভাবছে না গরিবদের জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা? মৃত্যু নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার মানে হয় না। পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই তো মানুষ মরছে।

লাল রঙের প্যান্ট পরা ছেলেটার দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে। ওর মা শুয়ে ওলট-পালট করছে তার পাশে। মেয়েটা সামলাবার চেষ্টা করছে মাকে। আমার চোখ ছেলেটার পা দুটোর দিকে চলে যায় বারে বারে। ও আর উঠে ছুট লাগবে না। ওকে আমি একটা সবুজ মাঠে দৌড়োদৌড়ি করতে দেখেছি।

অবধারিতভাবেই আমার সেই শালিক মারার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। এই সাদৃশ্যের কোনো মর্ম খুঁজে পাই না আমি। শুধু মনে হয় আমার মতন চারপাশে যারা ভিড় করে এই দৃশ্যটা দেখছে তারা যেন সেই কাকগুলির মতন। দর্শকদের চ্যাঁচামেচি কথাবার্তাই বেশি। এর মধ্যে অনেক আছে ভ্রষ্টা যুবতী মেয়েটির আঁচল খোলা বুকের দিকে বেশি দৃষ্টি রেখেছে—তা এই মৃত্যুর পাশেও নিশ্চিত সত্য। একদল লোক আবার লাইনের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে—আজ ওরা এ লাইনে ট্রেন চলতে দেবে না। অথচ আজ একটা বৃষ্টি-ধোয়া চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিন।

অল্প একটু পরেই ভিড় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ওভারব্রিজের নীচে একটা পুলিশের গাড়ি। তার থেকে নামল প্রায় এক ডজন পুলিশ।

এবার সেই বেড়ালটা আসছে।

ফুল ও নারী

—এই, তোরা এই সব ফুল কোথা থেকে পাস রে?
—হাওড়া হাট থেকে। খুব সকালবেলা হাওড়া ব্রিজের নিচে ফুলের হাট বসে।
—সকালবেলা যাস কি করে। এখানেই তো রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত থাকিস!
—কারবার করতে হলে যেতে হবে না?
—সেই সক্কালবেলা ফুল কিনিস, আর এত রাত পর্যন্ত টাটকা থাকে?
—তুইও তো মাইরি সন্ধেবেলা সেজেগুজে আসিস। তাহলে এত রাত পর্যন্ত টাটকা থাকিস কি করে?
—আহা, কি কথার ছিরি। যা জিজ্ঞেস করছি বল না!
—সন্ধের পর কবরখানা থেকেও কিছু ফুল পাই।
—ওমা, তোরা কবরখানা থেকে ফুল আনিস?
—এই দ্যাখ না, এই গোলাপের খোশগুলো আজই পার্ক সার্কাস কবরখানা থেকে এনেছি। ভালো জাতের জিনিস।
—ছি, ছি, তোরা কবরখানার জিনিস লোককে বেচছিস? লোকে এই ফুল নিয়ে শোবার ঘর সাজাবে।
—আহা, তোর দরদ যে উথলে উঠলো দেখছি!

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাফিকের সবুজ আলো আবার লাল হলো। ফুলওয়ালা দীনু দৌড়ে গেল থেমে-থাকা গাড়িগুলোর সামনে। হাতের ফুলের তোড়াদুটো নাচাতে লাগলো এক একটা জানলায়।

বিশেষ কেউ ফুল কিনতে চায় না এই সময়। কচিৎ সিনেমাফেরত দম্পতি কিংবা কুপথযাত্রী মাতাল হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয়, তাও অনেক দরাদরি করতে হয়।

দীনু রজনীগন্ধা, বেল ফুলের মালা বা গোলাপের তোড়ার দর হাঁকে যা খুশি। দরদাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত বারো আনা এক টাকায় নামে। রাত ঘন হয়ে এসেছে, এখন যে-কোনো দাম পেলেই বেচে দেবে।

গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করলে দীনু আবার ফিরে আসে বাস গুমটির নিচে। সেখানে গোলাপি নামের মেয়েটা একটা টুলে বসে পা দোলাচ্ছে।

গোলাপির পরনে একটা সস্তা পাট-সিল্কের শাড়ি, বহুকাল কাচা হয় নি সেটা। সেই রকমই একটা ব্লাউজ। আর একটা রবারের চটি।

গোলাপি জিজ্ঞেস করলো, কি রে একটাও গছাতে পারলি?
দীনু বললো, এক জোড়া গোড়ের মালা গেছে।
—তবে তো কাম ফতে করে এসেছিস।
—আর এই গোলাপের তোড়া দুটো আর তিন ডজন রজনীগন্ধা হলেই—

এই বাস-গুমটিতে বাসযাত্রীরা দাঁড়ায় না। আগে এখানে দুটি ভিখিরি পরিবার মৌরসী পাট্টা গেড়েছিল। তাদের রান্না-বান্না গেরস্থালি সবই চলতো এখানে।

কিছুদিন আগে তাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে রঘুরাম। রঘুরাম পার্ক স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ফুটপাথ নিজের দখলে এনে ফেলেছে। এখানে কে থাকবে, কে শোবে, সবই তার নির্দেশে ঠিক হবে। ভিখিরি পরিবার দুটি রঘুরামকে এক পয়সাও দিত না, তাই সে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এক চা-ওয়ালাকে বসিয়েছে।

চা-ওয়ালার নাম ভিখুরাম। সে অতি নিরীহ মানুষ। কারুর সাতে পাঁচে নেই। চা ও লেড়ো বিস্কুট ছাড়া সে রেখেছে কিছু ছাতু ও কাঁচালঙ্কা। রিকশাওয়ালা ও মুটেরা এসে খেয়ে যায়। বসবার টুল তার একটাই যখন যে এসে বসে।

একটা কেটলিতে চায়ের জল আর পাতা একসঙ্গে ফুটছে অনেকক্ষণ ধরে। এত রাতে আর খদ্দের পাবার সম্ভাবনা কম।

দুটো লোক পার্ক স্ট্রিট ধরে হেঁটে এসে এদিকের ফুটপাথে দাঁড়ালো। প্রথমে মনে হলো, তারা ট্যাক্সি খুঁজছে। কিন্তু ভাবভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে।

দীনু গোলাপির চোখের দিকে ইশারা করে বললো, যা—
গোলাপি বললো, ধুর! এরা টিকবে না। মাতাল।

—মাতাল তো কী হয়েছে! মাতালরাই পয়সা খসায়।
—না ভাই, বেশি মাতালদের আমার ভয় করে।
—এর মধ্যে আবার ভয়ের কী আছে? ফেল কড়ি মাখো তেল।
লোক দুটো ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে বলে গোলাপি টুল ছেড়ে উঠলো।
তারপর অলস গমনে লোক দুটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। গোলাপির রীতিমতন রোগা চেহারা। ভালো করে খেতে পায় না বলে পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গেছে। তবু শাড়ির আঁচল দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখে। আর একটু ঢং করার জন্য দু হাতে পাকাতে থাকে।
একটি লোক মাথা হেলিয়ে জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করে, কি, যাবে?
গোলাপি অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, কেন যাবো না।
—কত?
—কতক্ষণ টাইম?
—কত নেবে তাই বলো না?
—কতক্ষণ টাইম তা বলবে তো? সারা রাত না একঘন্টা।
—ধরো সারা রাত।
—পনেরো টাকা। জায়গা আছে?
—জাহাজে যেতে পারব? খিদিরপুরে?
—ওরে বাবা, জাহাজে আমি যাবো না।
—কেন, জাহাজে যেতে কী হয়েছে?
—যাবো না বলছি তো।
অপর লোকটি বেশি মাতাল। সে রীতিমতন রাগ করে বললো, কেন যাবি না রে? টাকা দেবো, আলবৎ যাবি!
গোলাপিও রাগ করে বললো, একশো টাকা দিলেও যাবো না। জাহাজে গেলে পাঁচজনে মিলে ছিঁড়ে খায়।
—এঃ, একশো টাকা! তোর মতন পেত্নিকে কে একশো টাকা দেবে রে?
—দূর হ মুখপোড়া।
চটি ফটাস ফটাস করে গোলাপি আবার ফিরে এলো গুমটিতে। মুখে রাগ নেই, একটু তেতো তেতো ভাব।
দীনু জিজ্ঞেস করলো, কি, হলো না?
গোলাপি মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, দূর দূর ওসব ফোর টুয়েণ্টি পার্টি। শুধু শুধু দরদস্তুর করে। একটু ওঠ না, বসতে দে টুলটায়।
—তুই তো একটু আগে বসেছিলি।
—যা, যা, লালবাত্তি, লালবাত্তি
গাড়িগুলো থেমেছে, দীনুকে আবার ছুটে যেতেই হলো। গোলাপি এ ফাঁকে বসে পড়ল টুলটায়।
চা-ওয়ালা বুড়ো বসে বসে ঢুলছে। এরা না গেলে সে সবকিছু বন্ধটন্ধ করে শুতে পারছে না। যে-চাটা ফুটিয়ে ফেলেছে, সেটা বিক্রি না হলে ওইটুকুই ক্ষতি।
গোলাপি জিজ্ঞেস করলো, কি চাচা, তোমার আর খদ্দের আসবে? ঘুম চোখে চা-ওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হাতটা তুলে কপালে ছোঁয়ালো। এই ভঙ্গির অনেক রকম মানে হয়। রাত প্রায় বারোটা।
দীনু ফিরে এসে বললো, দূর এ খেপে আমার একটাও গেল না।
—তোর আর বিক্রি হবে না আজ।
—তুই বুঝি এখনও খদ্দের পাবি!
—আলবৎ পাবো। এখন আর এমন কি রাত। এই তো সবে শুরু।
—দ্যাখ না। বৃষ্টি আসছে।
—ওরকম অলুক্ষণে কথা বলবি না।
—যা, এই যে একজন এসেছে। এবার বোধহয় হয়ে যাবে। কলেজের ছেলে মনে হয়।
অদূরে একটি পাতলা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ ফুলবাবুর মতন সাজ। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।
গোলাপি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটি বেশি স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললো, কি গো, চিনতে পারছো?
গোলাপি একগাল হেসে বললো, তা চিনতে পারবুনি কেন? রোজ দেখছি।
—কত নেবে?

—তোমার সঙ্গে আর কি দরাদরি করবো, দশ দিও!
—দশ! পাঁচে হয় না।
—পাঁচ? তাহলে কেল্লার ওপারে হিজড়েদের কাছে যাওনা কেন?
—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দশই হবে।
—তোমার জায়গা আছে?
—জায়গা?
—বুঝেছি, জায়গা নেই। ট্যাক্সিতে উঠবে? সে পয়সা আছে তো? না কি ময়দানে যাবে?
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ময়দানে, ময়দানেই ভালো।
—চলো—
ছেলেটিকে পাশে নিয়ে গোলাপি বড় রাস্তা পার হলো। সবেমাত্র ময়দানের মধ্যে পা দিয়েছে এমন সময় দূরে দেখা গেল একটি পুলিশ সেপাইকে।
ছেলেটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে বললে, আমি যাবো না।
গোলাপি তার হাত ধরে বললো, আরে চলো না, ভয় নেই। ও কিছু বলবে না।
ছেলেটি তার হাত ছাড়িয়ে এক ঝটকা দিয়ে পালিয়ে গেল দৌড়ে।
গোলাপি এবার বাস-গুমটিতে ফিরে এসে দেখলো দীনু হ্যা হ্যা করে হাসছে।
—কি হলো রে, ফক্কে গেল?
—চুমমার!
—কি রকম দৌড়ালো, মাইরি, ঠিক যেন ইঁদুর।
—বলছি না চুপ কর।
দীনু হাসি সামলে নিয়ে বললো, সেপাই দু জন এদিকেই আসছে কিন্তু গোলাপি বললো, আসুক না। আজ এক পয়সাও দেবো না। সারাদিনে মোটে তিন টাকা রোজগার হয়েছে। এর থেকে আবার কি দেবো।
সিপাহী দু জন ওদের ছেড়ে এক লরিওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।
দুনু চা-ওয়ালাকে বললো, ও চাচা, তোমার আর খদ্দের আসবে না। দাও, আমাদেরই দু কাপ চা দাও।
গোলাপি বললো, আমি চা খাবো না। এত রাত্রে চা খাই না আমি।
দীনু চোখ দিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, খা না। চা খেলে খিদে মরে। রোজগার করেছিস তো মোটে তিন টাকা।
গোলাপি বললো, আর একটা বড় খদ্দের ধরতে না পারলে—
ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো। আকাশটা একেবারে গম্ভীর হয়ে আছে, এই বৃষ্টি সহজে থামবে না। এই সময়কার বৃষ্টিটা বড্ড বিচ্ছিরি, ব্যবসাপাতি সব নষ্ট করে দেয়।
বৃষ্টি ভিজেই দীনু দু একবার গেল ফুল বেচতে। কেউ নিল না।
গোলাপিও বৃষ্টি ভিজে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ল্যাম্প পোস্টের নিচে। কেউ এলো না। দুজন লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, গোলাপি নিজে থেকেই তাদের একটু ইঙ্গিত করতে তারাই ধমকে দিল ওকে।
ক্রমশ রাস্তা একবারে জনশূন্য হয়ে এলো। গাড়িও প্রায় নেই। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।
চায়ের শেষ বিন্দুটুকু তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে দীনু বললো, দূর শালা, আজ দিনটা বড় লোকসান গেল। তিন ডজন ফুল বিক্রি হলো না...
গোলাপি বললো, ওগুলো তো কবরখানা থেকে চুরি করে এনেছিস, ওর জন্য তো পয়সা খরচ হয় নি।
দীনু বললো, তুই-ও তা হলে মুখ ভার করে আছিস কেন? তোরও তো বিনি পয়সার কারবার। তোকে কি পয়সা খরচা করতে হয়?
গোলাপি মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, যা না। দুবেলা না খেতে পেলে গতরখানা টিকবে কি করে।
পেয়েছিস তো তিন টাকা।
—তিন টাকায় খাওয়া জোটে! শুধু কি আমার একার, বাড়িতে পাঁচখানা পেট হাঁ করে আছে। কাল রেশন তোলার শেষ দিন। অন্তত সতেরোটা টাকাও যদিও জুটতো।
চল, চল, কালকের চিন্তা কাল হবে।
চা-ওয়ালার কাছ থেকে একটা পুঁটলি চেয়ে এনে গোলাপি চলে গেল একটা পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতে। অন্ধকারের মধ্যে বদলে নিল পোশাক। ঝ্যালমেলে সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে পরে নিল একটা মলিন সাদা শাড়ি। এ সিল্কের

কাপড় পরে তো সে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। ওগুলো জমা থাকে চা-ওয়ালার কাছে। তার বস্তিতে সবাই জানে, সে এক সাহেববাড়িতে আয়ার কাজ করে। তাতেই সম্মানটুকু টিকে থাকে।

চা-ওয়ালা চায়ের পয়সা চাইতেই দীনু একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে। ফেলেই তো দিতে, তার আবার দাম কি।

চা-ওয়ালা নিরীহ লোক। তবু সে হাত বাড়িয়ে বলে অন্তত পাঁচটা করে পয়সা দিয়ে যা।

—কাল হবে, কাল হবে।

গোলাপি থাকে বেলেঘাটায়, দীনু পার্ক সার্কাসে। খানিকটা পথ ওরা একসঙ্গে যাবে।

দীনুর দু হাত ভর্তি ফুল।

গোলাপি জিজ্ঞেস করলো, ফুলগুলো নিয়ে এখন কি করবি?

দীনু অবহেলার সঙ্গে বললো, রজনীগন্ধার ইষ্টিকগুলো কালকেও চলে যাবে! কিন্তু গোলাপগুলো তাজা থাকবে না।

—তাও বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

—কি করবো? ফেলে দেবো? তুই নে না।

—আ মুখপোড়া। ফুল নিয়ে আমি কি করবো? তরকারি করে খাবো নাকি?

—রান্না করে দ্যাখ না, যদি খাওয়া যায়।

—তুই দেখ গে যা।

—খাওয়া গেলে কি আর ফেলতাম? রোজই খেয়ে নিতাম!

রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এবার দু জনকে দু দিকে যেতে হবে। দীনু জোর করে গোলাপির হাতে ফুলের তোড়াটা দিয়ে বললো, মাইরি, আজ তুই এটা নে—

—ফের ন্যাকড়া করছিস। ফুল নিয়ে কি করবো আমি, অ্যাঁ? বাসরঘর সাজাবো? কত সোহাগ।

—তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। ফেলে দিতে হয় ফেলে দিস না একটু বাদে।

দীনু আর দাঁড়ালো না, নিজের রাস্তা ধরলো।

ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে গোলাপিও হাঁটতে লাগলো অন্যদিকে।

গোলাপের গন্ধের ঝাপটা এসে লাগছে তার নাকে। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ফুলগুলো ফেলে দিলেই হবে।

এখন পর বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, মধ্যরাত্রে ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে একজন নারী।

হোক না কবরখানা থেকে চুরি করা, তবুও তো ফুল। হোক না, না খেতে পেয়ে দেহ বিক্রি করা একজন রাস্তার মেয়েছেলে। তবুও তো নারী।

ইরফান আলি দু নম্বর

সূর্য ওঠবার আগেই কাছাকাছি পাঁচখানা গ্রামের জোয়ান-মদ্দরা সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। বাবলা গাছের ডাল ভেঙে দাঁত-খড়ি করে বাড়ির কাছাকাছি পুকুরে বা ডোবায় একসঙ্গে মুখ ধুয়ে স্নান করে নিয়েছে। জলখাবার বা নাস্তা সেরেছে দুমুঠো মুড়ি বা একমুঠো পান্তা দিয়ে। তার পরই দৌড় মেরেছে।

প্রত্যেকদিন ভোরবেলা দেখা যায় কাতারে কাতারে মানুষ ছুটছে হাতিপোতা বাঁধের দিকে। মাঠ ভেঙে, আলের পথে পথে সারবন্দি মানুষ। এ ওর আগে গিয়ে পৌঁছতে চায়। দৌড়োদৌড়ি করে এসেও দেখে তারও আগে আরো অনেক মানুষ পৌঁছে গেছে।

প্রায় হাজার খানেক পুরুষমানুষ হাতিপোতা বাঁধের সামনে দাঁড়িয়ে কাদার মধ্যে ঠ্যালাঠেলি করে। এখনো ভালো করে আলো ফোটে নি। বিড়ির গন্ধে ম-ম করে হাওয়া।

কাদার মধ্যে বাঁশ পুঁতে বসানো হয়েছে গেট। তার ওপাশে সারি সারি তাঁবু। ওই সব তাঁবু থেকেও কুলি-কামিনরা বেরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ওরা সব 'পারমেণ্ট'—ওদের মধ্যে পঞ্চাশ-যাট জন মেয়েও আছে। কালো চকচকে চেহারার স্ত্রীলোকেরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আড়মোড়া ভাঙে—বাঁশের গেটের এপাশ থেকে হাজার খানেক পুরুষের চোখ পড়ে সেদিকে। সবচেয়ে বড় তাঁবুটায় থাকে পুলিশরা। একবার হঠাৎ লাঠালাঠি শুরু হওয়ার পর সেই যে পুলিশ এসেছিল আর যায় নি।

বাঁধ কাটার কাজ শুরু হয়েছে তিন সপ্তাহ ধরে। সরকারি ঠিকাদার নিজস্ব কুলি-কামিন আর যন্ত্রপাতি এনে তাঁবু ফেলেছিল। কাজ শেষ হতে অন্তত ছ মাসের ধাক্কা। তাই সব কিছুরই পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

সপ্তাহখানেক বাদেই এম এল এ ছোটফণীবাবু একদল লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসে কাজ আটকে দিলেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে এখন আকালের হাহাকার—মাটি কাটার কাজ স্থানীয় লোকদের দিতে হবে। বাইরে থেকে লোক আনা চলবে না।

শুরু হল দাঙ্গাহাঙ্গামা আর থানা-পুলিশ। তারপর এক মন্ত্রী এসে মিটমাট করে দিলেন। ঠিকাদারের নিজস্ব লোক থাকবে অর্ধেক, আর বাকি অর্ধেক নেওয়া হবে স্থানীয় লোকদের মধ্যে থেকে জনমজুর হিসেবে।

প্রত্যেকদিন শ দেড়েক লোককে নেওয়া হয়। হিসেব বড় জটিল। হাজার খানেক লোকের মধ্যে শ দেড়েক লোক বেছে নেওয়া। অথচ সবাইকেই সুযোগ দেওয়া দরকার। তাই মস্তবড় একটা খাতায় সবার নাম লেখা আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাম ডাকা হয়। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না—কোনদিন কার ডাক পড়বে। তাই আশায় আশায় প্রত্যেকদিনই আসে সবাই। সাড়ে তিনটাকা রোজ—আর দুপুরে পাঁচখানা করে রুটি ও একটুকরো গুড়। টাকার হিসেব পরে—দুপুরে ওই রুটি-গুড়ের লোভেই জিভ লকলক করে ওঠা।

হঠাৎ একটা শোরগোল পড়ে গেল। এসে গেছে আজকের দিনটির ভাগ্য-বিচারক—মস্তবড় খাতাটা হাতে নিয়ে ঘোষবাবু আসছেন। ঘোষবাবুর চোখ দুটো ঘুমে এখনো ঢুলুঢুলু, প্যান্টলুন পরা থাকলেও খালি গা—বুকে ঘন রোমের বন-জঙ্গল।

গত বছরেও ঘোষবাবু এই সব গেঁয়ো লোকগুলোর সঙ্গে তুইতোকারি করে কথা বলতেন। হারামজাদা—শুয়োরের বাচ্চা ছিল তাঁর জিভে জল। বহুকাল ধরে এসব কাজ করেছেন, তিনি জানেন গালাগালি দিয়ে কথা না বললে এই লোকগুলো কিছু বোঝে না—কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টে গেছে।

ঘোষবাবু মস্ত বড় একটা হাই তুললেন। তারপর হঠাৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, ভাই সব! কেউ কোনো গোলমাল করবে না। আমি নাম ডাকলে একে একে ঢুকবে। পর পর দু দিন কেউ কাজ পাবে না—এটা মনে রেখো।

কলগুঞ্জন এক মুহূর্তের জন্য থেমে আবার শুরু হয়। ঘোষবাবুকে ক্রমশ গলা চড়াতে হয়।

রাঘবগঞ্জের কালু শেখ!

হারাণ মণ্ডল!

দিগম্বর দাঁ!

যতীন সাঁপুই।

আশাভান চৌধুরী!

আসলাম মোল্লা...

এবার পোড়া বিশলাইপুর—কার্তিক হাজরা

রসুল মোল্লা...

ক্রমে ক্রমে পাঁচখানা গাঁয়ের নাম ডাকা শেষ হয়। তারপর ঘোষবাবু যেই ধপাস করে খাতাখানা বন্ধ করেন, অমনি বাকি লোকগুলোর বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। আজ আর হল না! পাঁচখানা রুটি গুড়, করকরে সাড়ে তিন টাকা!

ইরফান আলি দাঁড়িয়ে ছিল ঘোষবাবুর কাছেই। সে একেবারে হামলে পড়ল, বড়বাবু, আমার?

ঘোষবাবু বললেন, আজ আর হবে না। আবার কাল!

ইরফানের সঙ্গে আরও সাত আট জন এগিয়ে এসে বলল, আমরা গত হপ্তায় একদিনও কাজ পাই নি!

তারা হিসেব না বুঝলেও এটুকু বোঝে, সাতদিনের মধ্যে তারা একদিনও কাজ পায় নি—কিন্তু অনেকে দু-তিন দিন পেয়েছে। এটা অন্যায় নয়?

তারা গোলমাল শুরু করতে ঘোষবাবু বললেন, দাঁড়াও বাবা, দাঁড়াও। আবার সবার নাম চেক করতে হবে। এ কি সোজা কথা! দেখি ব্যবস্থা হয় কি না।

ওদের জনকয়েককে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে এনে ঘোষবাবু বললেন, বাকি সবাই চলে যাও। চলে যাও। ছোটফণীবাবু গেটের সামনে ভিড় করতে মানা করেছেন!

ঘোষবাবু অভিজ্ঞ লোক। দেড়শো জন লোক নেওয়া হবে—তিনি প্রত্যেকদিন একশো তিরিশ জনের বেশি নাম ডাকেন না। কে আর গুণে গুণে মিলিয়ে দেখছে। এইসব লোকগুলো বুঝুক না বুঝুক গোলমাল করবেই। তাই কুড়িটা নাম তিনি হাতে রেখে দেন। পরে তিনি এমন ভাব দেখান যে, তাঁর দয়াতেই বাকি কুড়িজনের কাজ হল সেদিনকার মতন। এতে সুনাম হয় তাঁর। এই লোকগুলো হাতে থাকে।

ঘোষবাবু এবার একটা টুল নিয়ে বসেন। কাছের তাঁবু থেকে একজন কামিন এসে তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে যায়। আদিবাসী রমণীদের তেল চকচকে শরীরে চোখের দৃষ্টি যেন পিছলে পড়ে।

ঘোষবাবু চায়ে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগ দিয়ে খাতা পরীক্ষা করেন। মাথা নেড়ে বলেন, উঁহু এ নাম তো নেই—আপিস থেকে যদি ভুল করে তো আমি কি করব বলো!

তবু একে একে তিনি কয়েকজনের ব্যবস্থা করে দেন। তারা কৃতজ্ঞতায় একেবারে মাটিতে মিশে যায়।

সকলেরই হয়, শুধু ইরফান আলির হয় না। ঘোষবাবু তাকে খেঁকিয়ে বলেন, তোমার আবার কি চাই! এই তো একজন ইরফান আলি—তার কাজ হয়ে গেছে। তুমি আবার কে?

ইরফান হাউমাউ করে বলে, বড়বাবু, সে তো হল গে ইরফান আলি এক নম্বর, আমি দু নম্বর!

—এক নম্বর দু নম্বর আবার কি!

তখন আর পাঁচজন সাক্ষী দিল, এক গাঁয়ে দু জন ইরফান আলি আছে বলে ওদের এক নম্বর, দু নম্বর বলে লোকে ডাকে। দ্বিতীয় ইরফান আলির নামই অনেকে বলে না, শুধু বলে দু নম্বর।

ঘোষবাবু দু নম্বর ইরফান আলির আপাদমস্তক দেখলেন। রোগা ডিগডিগে চেহারা, থুতনিতে রুখু দাড়ি, চোখে সব সময় একটা ভিতু ভিতু ভাব। কোনো রকমে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। ঘোষবাবুর কড়া দৃষ্টির সামনে সে প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে হাত কচলাচ্ছে। ঘোষবাবুর একটি কথার ওপর নির্ভর করছে তার পরিবারের পাঁচজন লোকের জন্য দু মুঠো ভাত—তার নিজের জন্য পাঁচখানা রুটি।

ঘোষবাবুর সেই চেয়ে থাকা যেন অনন্ত সময়ের জন্য। একটা কিছু মীমাংসা হবার আগেই ইরফান আলি দু নম্বরের সারা জীবনটাই কেটে যাবে। সেকি ঘোষবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!

ঘোষবাবু বললেন, ঠিক আছে, যাও কাজে লেগে যাও! নামটা বদলাতে পার না!

ইরফান আমি দু নম্বর অতি ব্যস্ত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ঘোষবাবুর পায়ে হাত দিতে গিয়ে চায়ের কাপটাই উল্টে দিল। নরম মাটিতে পড়ে কাপটা ভাঙল না বটে, কিন্তু ইরফান আলি ভয়ে আধখানা হয়ে গেল একেবারে। সব কাজেই সে একটা কিছু গন্ডগোল করে ফেলে। খোদাতাল্লা যে কেন তাকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন কে জানে!

অন্য যারা কাজের আশায় দাঁড়িয়েছিল, তারাই খেঁকিয়ে উঠল ইরফানের ওপর।

ঘোষবাবু কিন্তু রাগ করলেন না। একটা মজা পেয়ে গেলেন হঠাৎ। হাসতে হাসতে বললেন, সাধে কি আর এর নাম দু নম্বর রেখেছে। এ কোনোদিনই এক নম্বর হতে পারবে না।

ইরফান হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোষবাবু বললেন, যাও কাজে লাগ গে!

এরপর আর কৃতজ্ঞতা জানাবার নতুন কোনো প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। তাই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খাকি রঙের তাঁবুটার দিকে। এখান থেকে বলে দেবে, কাকে কোন সেকটরে কাজ করতে হবে—কোদাল গাঁইতি ঝোড়াও মিলবে এখানে।

ঘোষবাবুর কাছে সে একটা বেয়াকুবি করে ফেললেও ঘোষবাবুর কথাটা তার মনে বড্ড লেগেছে। সে কোনোদিন এ নম্বর হতে পারবে না। অনেকে গালাগালির সময় তাকে বলে, ভাগ শালা, দু নম্বরী মাল!

সে কি ইচ্ছে করে নিজের নাম রেখেছে! এক নম্বর দু নম্বর কি সে বানিয়েছে?

সিদ্দীকি সাহেবের ছেলে ইরফান তারই সমবয়েসি। বরং একটু ছোটই হবে। কিন্তু সে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান, গলার আওয়াজটা বাজখাঁই। ভোটের সময় সে গলায় রুমাল বেঁধে সারা গাঁ হামলে বেড়ায়। ঝগড়া কাজিয়ার সময়েও সে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই জন্যই সবাই তার নাম দিয়েছে এক নম্বর। ইরফান আলি দু নম্বরকে কেউ মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না।

ঝোড়া আর কোদাল নিয়ে ইরফান কাজে লেগে যায়। মাটি এখানে নরম, কোদালের কোপ বসলেই চাঙর উঠে আসে। এককালে নাকি এখানে নদী ছিল একটা—কবে সেটা শুকিয়ে-বুকিয়ে গেছে। এখন এটাকে খাল কেটে জুড়ে দিতে হবে কংসাবতীর সঙ্গে। তাহলে সারা বছর জল আসবে। চাষি তার জমিতে জল পাবে—হা-পিত্যেশ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না।

ইরফান নিজেও ভাগ-চাষ করে। কিন্তু বছরে পাঁচ মাস দেশে কাজ থাকে না। জলের অভাবে রবিশস্য হয় না এদিকে। সেই পাঁচ মাস ইরফান এদিক ওদিক জনমজুরির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। কিছু জুটল তো খাবার জুটল না জুটল হরিমটর।

গত পাঁচদিন একবেলার বেশি খাওয়া জোটে নি। হাতে-পায়ে জোর নেই। একটুতেই শিরদাঁড়ায় ব্যথা ওঠে। নিচু হয়ে মাটিতে কোপাতে কোপাতে এক এক সময় মনে হয় আর কোনো দিনও সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

মাটি কেটে কেটে এক জায়গায় জড়ো করার পর ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আবার আর এক জায়গায় ফেলতে হচ্ছে। মাটি জমে জমে হয়ে উঠেছে পাহাড়ের মতন। সেইটুকু উঁচুতে উঠতেই ইরফানের হাঁপ ধরে। আদিবাসী মেয়েগুলো কিন্তু ঝুড়ি মাথায় নিয়ে তরতর করে উঠে যায়। পাহাড় দেশের মেয়ে তো! ইরফান সেইদিকে একদৃষ্টে মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে।

এক একবার সে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য কত দূর এগুলো। আকাশের সূর্য কি একদিন দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এগোতে পারে না? সূর্য মাঝগগনে এলে তবেই দুপুরের ভোঁ পড়বে। তখন রুটি বিলি হবে। খাবারের চিন্তাতেই ইরফানের জিভে জল আসে। কতদিন যে সে পরিপাটি করে পেট ভরে খায় নি।

একটুক্ষণ কাজ থামিয়ে সে কোমরের গিটটা সামলে নিল। পানির তেষ্টা লেগেছে খুব। কিন্তু পানি খেতে হলে অনেকটা দূর যেতে হবে—সেই খাঁকি রঙের তাঁবুর কাছে। তার চেয়ে একটা বিড়ি খেয়ে নিলে হত না। ইরফানের ট্যাঁকে গুটিকয়েক বিড়ি আছে—কিন্তু ম্যাচিস। ম্যাচিস কেনার বিলাসিতা সে করতে পারে না। সনাতন সাঁপুইয়ের কাছে ম্যাচিস পাওয়া যেতে পারে—সেই দিকে সে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে, এই সময় পেছনে একজন কেউ হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

ইরফান আলি দু নম্বর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইরফান আলি এক নম্বর এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে।

ইরফান আলি এক নম্বরের হাতে কোদাল নেই। তার বদলে একটা ছোট লাঠি। অন্যদের মতন তার খালি গা নয়, সে একটা খাকি জামা পেয়েছে।

ইরফান আলি এক নম্বর বাবুদের গা-শোঁকাশুঁকি করে, বাবুদের পেয়ারের লোক—তাই সে কুলির সর্দার হয়েছে। আর হবি তো হ' এই লটেরই সর্দার। তার চালচলনই এখন অন্যরকম।

সে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কি রে, কাজ ফেলে চললি কোথায়?

ইরফান আলি দু নম্বর ওকে দেখে ভয় পায়। অনেকেই ভয় পায় এক নম্বর ইরফান আলিকে।

দু নম্বর ওকে একটু খাতির করার জন্যে বলে, একটা বিড়ি খেতে যাচ্ছিলাম। নেবে নাকি একটা বিড়ি?

ইরফান আলি এক নম্বর আজকাল বিড়ির বদলে সিগারেট খায়। সে একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, কাজের সময় বিড়ি খেলে দম ফেটে যায়।

এ সব কথা সে নিশ্চয়ই বাবুদের কাছ থেকে শিখেছে। শুনলেই মনে হয়, মুখস্থ কথা। কাজের সময় বিড়ি খাবে না তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়ি খাবে মানুষে?

এক গ্রামের ছেলে হলেও এক নম্বর ইরফান আলি দু নম্বরকে মোটেই পাত্তা দিতে চায় না। সে মুরুব্বি চালে বলে, হাত চালাও সব, হাত চালাও!

দু নম্বর বলল, ও ইরফান ভাই, দুপুরের ভোঁ বাজতে আর কতক্ষণ দেরি?

এক নম্বর বলে, এর মধ্যেই সে হিসেব? কাজ করতে এয়েছ না শুধু খানা খেতে এয়েছ? গরমেন্ট এমনি এমনি পয়সা দেবে?

ইরফান আলি দু নম্বরের মাথাটা নিচু হয়ে যায়। দুপুরের ভোঁয়ের কথাটা তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। ওটা না বললেই হত। কিন্তু এক নম্বর এমনভাবে কথা বলল, যেন ওর বাপের খাবার কেউ খেতে এসেছে।

ইরফান আলি এক নম্বর তার হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যায়। দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিকচিক করে মাটিতে থুতু ফেলে। এই কায়দাটা যেন সে নতুন শিখেছে। দু নম্বর ইরফান আলি সেই দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ— আপন মনেই একটা গালাগাল দেয়, তারপর আবার মাটি কোপাতে শুরু করে।

সূর্য আজ অত্যন্ত অকরুণ। অসহ্য উত্তাপে মানুষের রক্ত পর্যন্ত চুষে নিচ্ছে। আচ্ছা একটু মেঘলা ছায়া ছায়া হলে বিশ্ব-সংসারে কার কি ক্ষতি হত। বেলাও যেন এক জায়গায় থেমে আছে—কখন যে দুপুর হবে, তার ঠিক নেই।

দু নম্বর ইরফান আলি একমনে মাটি কোপাতে কোপাতে ভাবে—কতদিনে এই খাল কাটা হবে, কংসাবতী নদীতে বাঁধ দেওয়া হবে—তারপর গরমেন্টের লোক ইচ্ছেমতন জল ছাড়বে—তখন আর চাষিদের দুঃখ থাকবে না। ততদিন সে কি আর বাঁচবে? তা ছাড়া জল এলেই বা কি হবে—তার তো কখনো নিজের জমি হবে না?

খিদের চোটে বোধহয় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে। গতকালও এতক্ষণ কোনো খাওয়া জোটে নি, গতকাল তো এত খিদে পায় নি। আজ পাঁচখানা রুটি পাওয়ার সম্ভাবনাতেই খিদে যেন অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার বৌ আমিনা এখন নিশ্চয়ই কচুর শাক সেদ্ধ করতে বসেছে। বন জঙ্গল, পুকুর থেকে কচু আর কলমিশাক তুলে আনে—সেদ্ধ করে খেলে পেটের জ্বালা অনেকটা মেটে। সন্ধের আগেই সে আজ মজুরির টাকা দিয়ে চাল কিনে নিয়ে যাবে। এক সের, দেড় সের যা জোটে। ভাত না খেলে কি আর মহাপ্রাণী সুস্থ হয়। ভাত এমন চীজ, খোদার সঙ্গে উনিশ বিশ।

পাশ থেকে ভক্তিপদ সরকার বলল, ও ইরফান, কাঁদতেছিস কেন?

ইরফান তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, কই, কাঁদব কেন?

ভক্তি সরকার বলল, দেখলাম যে চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে।

—আপনা আপনি পানি পড়ে গো দাদা!

—আরে দু নম্বর পেটে গিঁট বাঁধ, চোখের জল বন্ধ হয়ে যাবে!

ভক্তিপদকে সব সময়ই বেশ উৎফুল্ল দেখায়। ঝপাং ঝপাং করে কোদালের কোপ মারে আর স্ত্রীলোক সংক্রান্ত উপমা দেয় মাটির সঙ্গে।

ইরফান ভাবে, ভক্তিপদরও তো তার মতন দিন আনি দিন খাই অবস্থা—তবু এমন হাসিখুশি থাকে কি করে? আবার রাত জেগে যাত্রা শুনতে যায়। কিন্তু ভক্তিপদ তো এক নম্বর, ও তো দু নম্বর নয়।

একটু বাদেই এক নম্বর ইরফান আলি সেখানে এসে দাঁড়াল। বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চোখ ঘোরাতে লাগল এদিক ওদিক। একজন মজুরের মাথা থেকে মাটি-ভর্তি ঝুড়িটা পড়ে যেতেই সে লাফিয়ে গেল সেদিকে। এক হাতে সে অবলীলাক্রমে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে বললে, হেঃ এটুকুও মাথায় রাখতে পার না? এ কি মাথা না কুমড়োর ডগা। ল্যাগব্যাগ করছে যে হে!

দু নম্বর ইরফান আলি সেদিকে সরু চোখে তাকায়। তার রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পায় না। ওই এক নম্বরটার গায়ে মোষের মত জোর—অথচ সে পেয়েছে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুরফুরিয়ে ঘুরে বেড়াবার কাজ। গরমেন্টের পোষ্য-পুত্তুর হয়ে সবার ওপর চোখ রাঙাচ্ছে। আর খেটে খেটে মরতে হচ্ছে তাদের। ওই কাজটা সে নিজে যদি পেত!

হঠাৎ ইরফান আলি দু নম্বরের মনে হয়, তার জীবনের যা যা পাওয়ার কথা ছিল সবই ওই এক নম্বরটা নিয়ে নিয়েছে। ওর তাগড়াই স্বাস্থ্য, ওর বিবি চনমনে, ও বাবুদের নেকনজরে পড়ে। জীবনে যা কিছু পাবার আছে, এক নম্বরই আগে থেকে পেয়ে যাবে। দু নম্বরের জন্য আর কিছু থাকবে না। ঘোষবাবু ঠিকই বলেছিলেন, এ কোনোদিনই এক নম্বর হতে পারবে না।

ভক্তিপদ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, আরে, আরে, এ লোকটার কি হল রে?

অনেকেই ফিরে তাকায়। ইরফান আলি দু নম্বর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। মুখ-চোখ কাদায় মাখামাখি। রোদ্দুরে নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে গেছে। এমন কিছু ব্যাপার নয়।

সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে ওঠায়। সে যেন ঠিক পায়ে জোর পাচ্ছে না—নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চোখ মুখে মাটি-কাদা মেখে বিহুলভাবে তাকায় সবার মুখের দিকে।

সবাই তাকে পরামর্শ দেয় একটু জিরিয়ে নিতে।

এক নম্বর ইরফান আলি এসে বলে, যাও, ঘরে চলে যাও, আজ আর তোমার দ্বারা কাজ হবে না।

দু নম্বরের বাড়ির কাছেই থাকে বদন শেখ। সে বলল, একা যেতে পারবি? না আমি নিয়ে যাব সঙ্গে?

দু নম্বরের মাথা চিড়িক করে ওঠে। এখন সে বাড়ি যাবে কি? এখনো দুপুরের ঘন্টা বাজে নি। এখন বাড়ি গেলে সে পাঁচখানা রুটিও পাবে না, অর্ধেক দিনের রোজও পাবে না। সে হাউহাউ করে বলে, না, না, বাড়ি যাব না, বাড়ি যাব না—

বদন শেখ তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে নরমভাবে বলে, ছাওয়াতে একটু বসে থাক দিকি নি। যদি একটু ভালো বুঝিস—

দু নম্বরের চোখে হঠাৎ আবার জল এসে যায়। সেই জল সামলাতে গিয়ে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, একটু ম্যাচিস দিতে পার, একটা বিড়ি খেতাম!

এক নম্বর ইরফান আলি দরাজ গলায় হা হা করে হেসে ওঠে। সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, কি রকম শেয়ানা—খালি কাজ ফাঁকি দেবার মতলব—খাটতে খাটতে সবার দম ফেটে যাচ্ছে, আর ইনি এখন বিড়ি খাবার ছুতোয়—

দু নম্বর ইরফান আলি ঘোলাটে চোখে তাকায় এক নম্বরের দিকে। তার চোখের সামনে, সারা আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওই এক নম্বর। তার জীবনে যা কিছু পাওয়ার সব ওর কাছে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধ রাগে সে হাতের কোদালটা বসিয়ে দিল সেই বলশালী লোকটির মাথায়। দেখা যাক, এবার সে এক নম্বর হতে পারে কিনা।

হলুদ বাড়ি

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে একটা হলুদ রঙের বাড়ি। ও বাড়িতে যারা থাকে, মনে হয় যেন তারা এই পৃথিবীর কেউ নয়।

ভোরবেলা আমি চলে আসি পাহাড়ের ধারে সেই হলদে বাড়ির ঠিক পেছনেই মুসলমান বস্তিতে। ইয়াকুব মিঞা এখানে প্রত্যেকদিন একটা পাঁঠা কেটে বিক্রি করে। ছোট জায়গায় এর বেশি লাগে না এবং এই একটিই মাত্র মাংসর দোকান। কোনো কোনোদিন সব মাংস বিক্রি হয়ে যায় চোখের নিমেষে, আবার এক একদিন বেলা নটা পর্যন্ত পরিত্যক্ত মাংসখণ্ডের ওপর মাছি ভন ভন করে।

আমার মায়ের অসুখ। পাঁঠার মেটুলি সেদ্ধ করে সেই জল তাঁকে প্রত্যেকদিন খাওয়ানো ডাক্তারের নির্দেশ। আমার মায়ের অসুখ খুব কঠিন, তিনি আর কতদিন বাঁচবেন সেটাই এখন প্রশ্ন। অথচ মনের মধ্যে তবু একটা ক্ষীণ আশা থাকে—মা হয়তো আবার একদিন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠবেন। অত্যন্ত ঝাল দিয়ে মাংস রান্না করে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করবেন আমাকে, কেমন হয়েছে বল তো? কেমন হয়েছে?

মাকে এখন অত্যন্ত বিস্বাদ খাবার খেতে হয়।

কিন্তু প্রত্যেকদিন পাঁঠার মেটুলি পাওয়াই শক্ত। ইয়াকুব মিঞাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে এইটুকু রাজি করানো গেছে যে অন্য খদ্দেররা না নিতে চাইলে তবে তিনি আমাকে দেবেন।

আমাদের বাঙালিদের স্বভাব, আড়াই শো, পাঁচ শো গ্রাম—যে যতটাই মাংস কিনি, তার সঙ্গে দু-এক টুকরো মেটুলি চাই ফাউ। সুতরাং পাঁঠাটা কাটবার আগে থেকেই আমাকে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রথম খদ্দের থেকে শেষ খদ্দেরটিকে পর্যন্ত বোঝাতে হয়, দয়া করে মেটুলি নেবেন না, আমার বাড়িতে রুগী আছে—

অনেকে বোঝে, দু একজন মানতে চায় না। দোষ দিতে পারি না তাদের। দু এক টুকরো সুস্বাদু ফাউ মেটুলি কেনই বা ছাড়বে সকলে? কেউ কেউ আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। কেউ বা অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে বলে, আচ্ছা। বৃদ্ধরা আমার মায়ের অসুখের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা যে আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করতে চান শুধু, তা নয়। যাদের নিজেদের শরীরে অসুখ আছে, তারা অন্যের অসুখের বিবরণ শুনে আনন্দ পায়।

ইয়াকুব মিঞার দোকানের পাশে একটা পাকুড় গাছের গুঁড়িতে আমি বসে থাকি। যেদিন দশটা বেজে গেলেও কিছুটা মাংস পড়ে থাকে—সেদিন মেটুলির সঙ্গে ওই বাকি মাংসও কিনতে হয় আমাকে। বেশ গায়ে লাগে। আমাদের অবস্থা সেরকম নয়।

ইয়াকুব মিঞার গায়ের রং টকটকে ফর্সা, লম্বা চওড়া শরীর, এখন একটু বয়েস হলেও এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। মাংস বিক্রেতা না হলে চলচ্চিত্রের অভিনেতা হলে তাঁকে মানাতো। কিংবা, প্রকাণ্ড ছুরিটা নিয়ে তিনি যে-ভাবে পাঁঠাটার ঘাড় কচ করে কেটে ফেলেন, নিপুণ হাতে ছাল ছাড়িয়ে নেন, হাড়গুলোকে টুকরো করেন দেশলাই কাঠি ভাঙবার মতন—তাতে মনে হয়, উনি সামান্য দোকানদারি না করে একটা ডাকাতের দল খুললেই পারতেন তো। ওঁর থেকে অনেক অযোগ্য ডাকাতে দেশটা গিজগিজ করছে।

অবশ্য ইয়াকুব মিঞা লোকটি দয়ালু। ওঁর ছেলে যখন ওঁর জন্য চা নিয়ে আসেন, উনি আমার দিকে আঙুল তুলে বলেন, ওই বাবুকে চা দে।

আমি প্রত্যেকদিন আসি এবং বসে থাকি বলে আমার সঙ্গে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা দাম হলে, উনি আমাকে পঁচিশ পয়সা ছেড়ে দেন! আমার আপত্তি শোনেন না।

সকালবেলা এই মাংসের দোকানের সামনে বসে বসে সময় কাটাবার জন্য আমি অনবরত সিগারেট ফুঁকি আর সুযোগ পেলেই তাকিয়ে দেখি ওই হলুদ বাড়িটার দিকে।

হলুদ বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে একটু উঁচুতে, তাই এখান থেকে সব কিছু দেখা যায় না। তার ফলে দেখা না দেখার নেশা এক রহস্য।

ও বাড়ির সকলে ভোরে ওঠে। প্রথমে দেখতে পাই একজন বৃদ্ধকে যার মাথার চুল ধপধপে সাদা। তিনি দোতলার বারান্দায় প্রত্যেকদিন ভোরবেলা এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেন এবং বিড়বিড় করে উচ্চারণ করেন মন্ত্র।

বলাই বাহুল্য, তিনি আমাকে প্রণাম করেন না। আমি যেদিকে বসে থাকি, সেই দিকেই সূর্য ওঠে। তবু আমি খেলাচ্ছলে, তিনি প্রণাম করার পর, হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করি।

বৃদ্ধের চেহারা বড় সুন্দর। বস্তুত, ও বাড়ির সকলেই সুন্দর। আলাপ পরিচয় না হলেও আমি জানি, ও বাড়িতে কে কে থাকে। ওই বৃদ্ধ, যিনি রিটায়ার্ড জজ, তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী, এক ছেলে, তিন মেয়ে, বড় মেয়ের জামাই এবং দুটি নাতি নাতনি। ছেলে ও জামাইটি গ্রীক যুবকের মতন সুঠাম। তিন বোনকে দেখলে মনে হয় রুবেনস-এর ছবি থেকে উঠে এসেছে, বিবাহিতা মেয়েটি একটু পৃথুলা—কিন্তু রুবেনস তো পৃথুলা মেয়েদেরও রূপ দেখিয়েছেন। বাচ্চা দুটি যেন স্বর্গশিশু।

বাচ্চা দুটিকে নিয়ে সেই তিন নারী যখন পাহাড়ের ওপর দিকে বেড়াতে যায়, তখন আমি মাঝে মাঝে চোখ রগড়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করি। আমি কি সত্যিই এরকম একটি কিছু দেখছি, না অলৌকিক কোন দৃশ্য। নারীরা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা, শিশুদুটি টকটকে লাল রঙের জামা পরেছে—এক্ষুণি যেন ওরা ফুল বা প্রজাপতি হয়ে মিলিয়ে যাবে। কিংবা, পাহাড়ের চূড়োয় উঠে, হঠাৎ ডানা মেলে উঠে একটু বেরিয়ে আসবে স্বর্গে।

আমি একটু বেশি রোমান্টিক প্রকৃতির বটে। এরকম কল্পনা করতে ভালোবাসি। কিন্তু বসে আছি একটা মাংসের দোকানের সামনে, মাটিতে সদ্যকাটা পাঁঠাটার রক্ত একটা কুকুর চকচক করে চেটে নিয়ে এখন বসে আছে টুকরো টাকরা হাড়ের আশায়। ভন ভন করছে নীল মাছি, ইয়াকুব মিঞার হাতে বিরাট ছুরি, খদ্দেররা কেউ লোভী, কেউ কৃপণ। এটা একটা বাস্তব দৃশ্য। কিন্তু একটু দূরের ওই হলদে বাড়িটা, ওই বাড়িতে যে সুন্দরের অধিবাস, তাও কি বাস্তব?

মনে হয়, ও বাড়িতে কোনো নীচতা, ক্ষুদ্রতা নেই। কোনোদিন ও বাড়িতে ঝগড়াঝাটির আওয়াজ তো দূরের কথা উঁচু গলার কথা পর্যন্ত শুনিনি। শুনছি বটে হাসির ঝংকার, প্রায়ই। কেউ বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, পরের মুহূর্তে ঘরগুলির এক একটা জানালার পাশ দিয়ে চলচ্চিত্রের মতন একজন হেঁটে যায়, কে যেন কাকে ডাকে, *এই মৌ, মৌ—*। সব মিলিয়ে যেন একটা খেলা। বাগানের সামনে কোনো কোনো সকালে ওরা ব্যাড-মিন্টন খেলে।

ওদের বাড়ির কেউ মাংস কিনতে আসে না। চাকর পাঠায়। চাকরটা পর্যন্ত বেশ ভদ্র।

মাংসর থলিটা হাতে নিয়ে প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে হাঁটি। বাড়িতে পৌঁছে স্বপ্ন ভেঙে যায়।

বাবা একটা ঘি-ওয়ালাকে মারতে উঠেছেন। তার মুখের সামনে বিরাট হাতখানা তুলে বাবা বলছেন, একখানা চড় মেরে তোর দাঁতগুলো ভেঙে দিই হারামজাদা।

ঘি-ওয়ালার রোগা পটকা চেহারা। ঘিয়ের ব্যবসা করা লোকটা নিজে নিশ্চয়ই ঘি খায় না। তা ছাড়া, আবার ভেজাল ঘি।

চোট্টারদের সবাই ঠকাতে চায়, এ তো জানা কথা। কিন্তু আমার বাবাকে ঠকানো সোজা কথা নয়। আমার বাবা দুর্দান্ত প্রকৃতির পুরুষ। তাঁর স্বাস্থ্য বিশাল, গলার আওয়াজ বাজখাঁই, রাগও তেমনি ভয়ংকর। অথচ এইরকম চেহারা ও মেজাজ নিয়েও তিনি সারাজীবন করপোরেশনের অ্যাসেসিং ইন্সপেক্টর হয়েই রইলেন। ওই চাকরি কি এই লোককে মানায়? ইয়াকুব মিঞার যে রকম ফিল্ম স্টার কিংবা ডাকাতের সর্দার হওয়া উচিত ছিল, তেমন আমার বাবারও হওয়া উচিত ছিল গত শতাব্দীর জমিদার কিংবা চা বাগানের ম্যানেজার। জমিহীন জমিদারি মেজাজের জীবন সুখের হয় না। তার ওপর তিনি যদি এক শতাব্দী পরে জন্মান।

আমি ঘি-ওয়ালাকে বিদায় করে দিলাম। তখন বাবা বকাবকি করতে লাগলেন আমাদের রাঁধুনি দুখিয়ার মাকে। সেই ঘি-ওয়ালাকে ডেকে এনেছে।

বকুনি খেয়ে দুখিয়ার মা বললো, আমি কাল একজনকে ডেকে আনবো, সে একেবারে এক নম্বর আদমি। কোনদিন ঝুট বলে না।

বাবা বিদ্রূপ করে বললেন, থাক, তোমাকে আর লোক ডাকতে হবে না। আমি খাদি ভাণ্ডার থেকে ঘি আনবো। যত সব চোরের রাজত্ব।

আসল ব্যাপারটা আমি জানি। আমাদের ঘিয়ের দরকার নেই। ওসব বিলাসিতার সময় এখন নয়। কিন্তু দুখিয়ার মা আগে সব বড় লোকদের বাড়িতে রান্না করেছে। সে ঘি ছাড়া মাংস রান্নার কাজ ভাবতেই পারে না। রুগীর রান্না না হয় আলাদা হলো, তা বলে অন্যদেরও—। আমার দিদি সেই শুনে বলেছিল, দ্যাখো না, এদিকে তো শুনেছি, সস্তায় ভালো ঘি পাওয়া যায়।

দিদি বরাবরই একটু বোকাসোকা মানুষ। কোথায় কি কথা বলতে হয় জানে না। মায়ের এরকম অসুখের কথা শুনে দিদি আর জামাইবাবু এখানে এসেছিল পাটনা থেকে। কলকাতা পর্যন্ত এতদূর সহজে যাওয়া হয় না, কিন্তু

মধুপুর অনেক কাছাকাছি। জামাইবাবুর অনেক কাজ, তাই দুদিন থেকেই দিদিকে আর ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে কেটে পড়েছেন। মায়ের তো সেবা করার লোকের দরকার।

বউদি আবার এই জন্য চটে আগুন। সেবা করার যেন লোকের অভাব। মায়ের চিকিৎসার জন্য জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে, এর মধ্যে আবার বাচ্চাদের নিয়ে দিদির থেকে যাওয়ার খরচ বাড়লো। তা ছাড়া, দিদির বাচ্চা দুটো দারুণ। দাদা কলকাতায় থেকে খেটে খেটে মরছে, প্রত্যেকদিন ওভারটাইম খেটে টাকা রোজগার করে পাঠাচ্ছেন এখানে। বৌদির রাগ তো হবেই।

এই সময় দিদির থেকে যাওয়াটা বাবা কিংবা মা-ও পছন্দ করেন নি। তবু ওঁদের, এক কালের আদরের মেয়ে, মুখে কিছু বলেন নি। কিন্তু বৌদি অন্য বাড়ির মেয়ে, সে কেন অত সহ্য করবে, সে বলতে ছাড়ে না। সুতরাং আমার বোকাসোকা ভালোমানুষ দিদিকে প্রায়ই বৌদির কটাক্ষ সইতে হয়। দিদির দুটি ছেলে মেয়ে, সন্তু আর ঝুনাকে একটু আড়ালে পেলেই বৌদি দারুণ মুখ ঝামটা দেন।

ওটাও একটা বাস্তব দৃশ্য। ওই মাংসের দোকানের মতন। কিন্তু পাহাড়ের ধার ঘেঁষা, ওই হলদে বাড়িটা? সেটাও কি এরই মতন বাস্তব? সেই বাড়ির বাগানে পায়ে লাল চটি পরা রমণীরা সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছন্দোময় ভঙ্গিতে হাঁটে। কে যেন কাকে মধুর গলায় ডাকে, মৌ, এই মৌ—। এ যেন একটা শিল্প।

আমি এখনও বেকার বলেই বৌদির মন জুগিয়ে চলি সব সময়। এটা আমার ইনসটিংকটিভ। বৌদির সঙ্গে প্রায় আধা-প্রেমিকের মতন ব্যবহার করি বলেই দাদার অনুপস্থিতিতে মাংসের নলি হাড় আমার পাতেই পড়ে। খিদের সময় খাবার কম পেলে একদম মন ভালো থাকে না।

এই বাস্তব দৃশ্যে বাবা আবার এক দুপুরে আরও একটু বাস্তবতা যোগ করলেন।

আমার লুকিয়ে সিগারেট খাবার আলাদা জায়গা ছাদ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে উঁকি মেরেই সঙ্গে সঙ্গে মুখটা আবার সরিয়ে নিতে হলো। বাবা দুখিয়ার মাকে নিয়ে খেলা করছেন।

এ যেন বয়স্ক পুরুষের পুতুল খেলার দৃশ্য। বাবা তাঁর দৈত্যের মতন শরীর নিয়ে দুখিয়ার মাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়েছেন। ছটফট করছে দুখিয়ার মা, কিন্তু তার কোমরের কাছটা শক্ত মুষ্টিতে আটকানো।

ঠিক সময়ে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিলাম, তাই আমাকে দেখতে পাননি বাবা। তবু আমার মধ্যে একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে হতে লাগলো, আর একবার মুখ বাড়িয়ে বাকি অংশটুকু দেখার। অতি কষ্টে এই ইচ্ছেটুকু সামলালাম।

দুখিয়ার মার নামটা শুনলে একটা মলিন ছবি ফুটে উঠলেও, বস্তুতপক্ষে সে একটি অতি স্বাস্থ্যবান আদিবাসি যুবতি। সে ভিজে কাপড়ে থাকলে মুনি ঋষিরাও তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারবে না। এখন সে ভিজে কাপড়ে আছে। এবং আমার বাবা মুনি-ঋষি নন।

আমার বয়েস তেইশ, বাবার বয়েস চুয়ান্ন। নারী সঙ্গের জন্য শরীরের মধ্যে কি রকম ঝড় ঝাপটা ওঠে, তা আমি জানি। আর প্রবল স্বাস্থ্য নিয়ে বাবা যে অসহায় বোধ করবেন, তা তো স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। আমার মা দু বছর ধরে শয্যাশায়ী। বাবা যদি গত শতাব্দীর জমিদার কিংবা চা বাগানের ম্যানেজার হতেন, তা হলে তাঁর কোন অসুবিধে হতো না। তাঁর নিজের চরিত্রের পক্ষে ভুল সময়ে জন্মেছেন বলেই, দুপুরবেলা ছাদে—ছেলেমেয়েদের দেখে ফেলার ঝুঁকি নিয়েও—।

দুখিয়ার মায়ের সঙ্গে আমি নিজেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে নেবো ভেবেছিলাম কয়েকদিন ধরে। বাজারের খরচ থেকে এই মতলবেই দু এক টাকা সরাচ্ছিলাম। দুখিয়ার মার স্বামী ভালো খেতে দিতে পারে না। তার স্বামী কাজ করে এখান থেকে একশো ষোল মাইল দূরে, বছরে দুবার মাত্র বাড়ি আসে। সুতরাং সে যদি কখনো দুরন্ত প্রকৃতির মনিবের আলিঙ্গনে ধরা দেয় দু একবার, তা হলে আশ্চর্য কি আছে? এ-ও যদি বাস্তবতা না হয়, তা হলে বাস্তব কাকে বলে?

চুপি চুপি নিচে এসে এই সব কথা ভাবলেও আমার বুক কাঁপতে থাকে। সিগারেট ধরাবার সময় যে হাত কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারি। নিজেকে সহজ করতে পারি না কিছুতেই। এতখানি বিচলিত হয়ে পড়ার কারণ আমি নিজেই ধরতে পারি না। আমার কি বাল্যস্মৃতি মনে পড়ছে? অনেক ছেলেবেলায় বাবাকে-মাকে ঠিক এইরকম ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দু একবার দেখে ফেলেছিলাম। তার সঙ্গে আজকের ঘটনার তফাৎ আছে। তখন বোধ করেছিলাম ঈর্ষা। আজ বোধ করছি করুণা। বাবার সম্পর্কে মায়া জন্মে আমার।

মাকে ভালবাসতাম আমি। তাই ছেলেবেলার দৃশ্য দেখে ঈর্ষা বোধ হয়েছিল। আর দুখিয়ার মাকে আমি নিজেই চেয়েছিলাম শারীরিক ভাবে—তবু আজ ঈর্ষা হয় না। বরং আস্তে আস্তে একটা দানের আনন্দ পাই।

কি খেয়ালে ঢুকে পড়লাম মায়ের ঘরে। মা ঘুমিয়ে আছেন। চেহারাটা এতই ক্ষীণ, যে চেনাই যায় না। মায়ের

কপালে একবার হাত ছোঁয়ালাম, তবু মায়ের ঘুম ভাঙলো না। হঠাৎ মনে হলো আমিই যেন ছদ্মবেশী মৃত্যু, চুপি চুপি মাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি সরে এলাম বিছানার ধার থেকে।

পরদিন সকালে পাকুড় গাছের গুঁড়িতে বসে সিগারেট ধরিয়ে ইয়াকুব মিঞাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ওই হলদে বাড়িতে কারা থাকে?

ইয়াকুব মিঞা হাতের রক্তমাখা ছুরিখানা পাথরে ঘষতে বললেন, ওটা তো জজ সাহেবের বাড়ি। বছরে একবার আসেন।

তাকিয়ে দেখলাম, মাথা ভর্তি সাদা চুল সেই বৃদ্ধ বারান্দায় এসে আমার দিকে হাতজোড় করে যথারীতি প্রণাম জানাচ্ছেন।

বাগানের ছোট ছোট চেয়ারে বসে আছে রমণীরা ও যুবক পুরুষ দুজন।

ট্রেতে চা ও বিস্কুট এলো। একটু বাদে ওরা পাহাড়ে ওপরের দিকে বেড়াতে যাবে। ওটা একটা সুন্দরের বাড়ি। ওটা অবাস্তব।

আমি ইয়াকুব মিঞাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িটা সারা বছর খালি পড়েই থাকে?

—জী, ভাড়া দেন না ওরা।

—তবু এত সুন্দর সাজানো। চুরি টুরি যায় না কখনো?

ইয়াকুব মিঞা একটু বিরক্তভাবে বললেন, আমাদের এখানে চোর নেই।

আমি মনে মনে বললুম হুঁ! চোর নেই বললেই হলো, এটা কি একটা অবাস্তব জায়গা? কোনো ভেজাল ঘি-ওয়ালাও কি ও বাড়িতে ঢোকে না? যত কিছু বাস্তবতা কি শুধু আমাদের বাড়িতেই?

এরপর ইয়াকুব মিঞা নিজে থেকে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের হিন্দুদের মধ্যে তো বিয়ে ভাঙার আইন পাশ হয়ে গেছে না?

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। এ আবার কি প্রশ্ন? মুখে হ্যাঁ বলে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইলাম।

—বুড়ো কর্তার মধ্যের মেয়েটি নিজেই একটা হাওয়া ছেলেকে শাদি করেছিল। সে এখন কোথায় ভেগে পড়েছে। কর্তা তার আবার শাদি দেন না কেন বুঝি না!

ব্যস, আর কিছু দরকার নেই আমার। ওই সুন্দরের বাড়িতেও দুঃখ আছে।

অলৌকিক ধোঁয়া সরে গেল, দেখতে পেলাম, সেই হলুদ বাড়িটার ছাদের কাছে একটা কাটা দাগ। আগে চোখে পড়েনি। এখন জানি, ওদের বাড়িতে ফিসফিস করে ঝগড়া হয়। ওই সব নারীদের প্রত্যেকেরই একটা আলাদা চেহারা আছে। ওই গ্রীক মূর্তির মতন সুঠাম পুরুষ দুজন শহরের ভিড়ের মধ্যে নগণ্য মানুষ। ওই বৃদ্ধ, ওই সৌম্য মুখ—ওঁকে আমি কল্পনায় নিয়ে যাই আমাদের বাড়িতে, আমার মায়ের সাথী হিসাবে ওঁকে প্রতিষ্ঠিত করি, আমার মুখরা বৌদির সামনে ওঁর অসহায় চেহারা দেখে আমি বেশ আনন্দ পাই।

আমার বাবাকে আমি এনে দাঁড় করাই এই হলুদ বাড়ির বারান্দায়। দ্বিধাহীন মনে আমি আমার বাবাকে ক্ষমা করে দিই।

স্বপ্নপরী

চামেলি যে দিন এ পাড়া ছেড়ে চলে যায়, হ্যাঁ, অন্তত সাত আট বছর আগেকার কথা, সেই দিনটির কথা অনেকেরই মনে আছে। সেই দিন আর এই দিন, কত তফাত। বাড়িটার নাম পদ্মরানির ফ্ল্যাট। এ পাড়ার অন্য কোনো বাড়ির নাম নেই, শুধু নম্বর, শুধু এই বাড়িটাই লোকের মুখে মুখে পদ্মরানির ফ্ল্যাট হিসেবে নাম রটে গেল কী করে, তা বলা মুশকিল। পদ্মরানি নামে কেউ নেই, কস্মিনকালেও কোনো পদ্মরানি এ বাড়ির মালকিন ছিল না, আরও তিনখানা বাড়ি সমেত এ বাড়িটা ও মল্লিকবাবুদের সম্পত্তি। এই পদ্মরানির ফ্ল্যাটের দোতলার ডান দিকের কোণের ঘরটায় থাকত চামেলি। মোট সতেরো জনের একজন। তার নোকরের নাম ছিল হরিয়া।

নোকরদের যে কত প্রতাপ, তা বাইরের লোকরা বিশেষ টের পায় না। হরিয়া অনেকবার থাপ্পড় কষিয়েছে চামেলিকে, চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। কারুর কাছে নালিশ জানাবার উপায় নেই। এক একজন বাবু চলে যাওয়ার পরেই হরিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে বলত, কেত্তে রুপিয়া দিল? নিকাল, নিকাল! বাবু পঞ্চাশ টাকা দিলে তার থেকে হরিয়া নেবে পনেরো টাকা। কার ঘরে কজন বাবু আসে সে হিসেব রাখে মালিকের প্রতিনিধি রূপলাল, ঘর ভাড়া নেয় সেই অনুযায়ী, প্রতি বাবুর জন্য কুড়ি টাকা। গতর খাটায় চামেলির মতন মেয়েরা, হরিয়ার মতন নোকরদের রোজগার তাদের চেয়ে অনেক বেশি। বাবুরা মদের পাঁইট আনায়, তার থেকে হরিয়ার দশ-বারো টাকা লাভ থাকে, মাংস-সিগারেট আনতে দিলেও সে দু-পাঁচ টাকা তার থেকে নাফা করে।

তবু এই হরিয়ার জন্যই চামেলির ভাগ্য খুলে গিয়েছিল।

আট বছর আগেকার কথা। সে দিন ছিল এক প্রবল বর্ষণের সন্ধ্যা। রাস্তায় হাঁটু-ডোবা জল জমে গেছে, তবু ওইসব সন্ধেতেই বাবুদের আনাগোনা বেশি হয়। দুনিচাঁদ এসেছিলেন চামেলির ঘরে। পদ্মরানির ফ্ল্যাটের সতেরোটি মেয়ের মধ্যে চামেলি মোটেই রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং কুলসম, রতুরানি আর মালতীর ঠমক-ঠামক আর চেহারার চটক অনেক বেশি, তবু যে দুনিচাঁদ চামেলির ঘরে বসতে এসেছিল, তার কারণ সেই সন্ধেবেলা লোক ছিল আর সব কটা ঘরে। শুধু চামেলিই একমাত্র দরজায় দাঁড়িয়ে। একে নিয়তি ছাড়া আর কী বলা যায়।

চেহারা খুব বড়সড় নয় দুনিচাঁদের, কিন্তু গলার আওয়াজ বাজখাঁই, ঘাড় উঁচু করে হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় যে, সে বেশ তেজি পুরুষ। দুনিচাঁদ যেমনই দিলদরিয়া, তেমনই হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠে। প্রথম দিন অবশ্য সে একবারও রাগারাগি করেনি, ছিল বেশ খোশমেজাজে, হরিয়াকে চুরি করার সুযোগ না দিয়ে আগেই বখশিস দিল কুড়ি টাকা, এক বোতল রাম, এক ভাঁড় কষা মাংস ও চারখানা রুটি আনিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলল তিনটে রুটি, বেশ খিদে পেয়েছিল তার। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চামেলিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার এখনকার নাম চামেলি, আগে কী নাম ছিল?

চামেলি বলল, ওই একই নাম।

দুনিচাঁদ বলল, বাজে কথা! যত মেয়ে দেখি, সব ফুলের নামে নাম। চামেলি, শেফালি, পদ্ম, কুসুম, মল্লিকা। যত রাজ্যের ফুলেরা এসে এখানে জোটে? তোমার বাড়ি ছিল কোথায়?

অনেক বাবুই পূর্ব-ইতিহাস জানতে চায়। একটা গল্প খোঁজে। গ্রাম থেকে কোনো প্রেমিক বিয়ে করার নাম করে ফুসলিয়ে শহরে এনে দু-একদিন ফুর্তি করে এ পাড়ায় ছেড়ে দিয়ে গেছে, এই গল্পটাই বাবুরা বেশি পছন্দ করে। খেতে না পাওয়া বাপ-মা মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে দালালের কাছে, এ কাহিনী বাবুরা পুরোটা শুনতে চায় না, মাঝপথে থামিয়ে দেয়। চামেলি এক নম্বর গল্পটাই বলল।

তা শুনে দুনিচাঁদ বলল, সে হারামজাদাটা এখন কোথায়? তার কান দুটো কেটে নিতে ইচ্ছে করে না তোমার?

এক ঘণ্টা বসলে একরকম রেট আর হোল নাইট থাকলে আলাদা রেট। দুনিচাঁদ হোল নাইট থাকার কথাই বলেছিল, কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক বাদে চলে গেল পুরো টাকা দিয়ে। আবার ফিরে এল তিন দিন পরে। সে দিন রতুরানি আর মালতীর ঘর খালি ছিল, তারা চোখ দিয়ে টানতেও চেয়েছিল, কিন্তু দুনিচাঁদ সোজা চলে এল চামেলির ঘরে। চামেলিকে তার মনে ধরেছে।

তিন মাস নিয়মিত যাতায়াত করেছিল দুনিচাঁদ, মাঝেমধ্যে হোল নাইটও থেকেছে, পরদিন সকালেও যায়নি, চামেলির হাতে রান্না খেয়ে ঘুমিয়েছে দুপুরে। হরিয়ার সঙ্গেও তার বেশ ভাব জমে গিয়েছিল, হরিয়ার সঙ্গে নানারকম

মজা করত। নিজের কথা কখনো কিছু বলেনি দুনিচাঁদ। নাম শুনলে বাঙালি মনে হয় না, অথচ অনর্গল বাংলা কথা বলে।

পকেট ভর্তি টাকা থাকে, কিন্তু তার পেশা বা জীবিকা কী তা বোঝা যায় না। মানুষটাকে ভালই লেগেছিল চামেলির, কখনও কর্কশ ব্যবহার করেনি। বেশ ঘরোয়া মতন।

এক সন্ধেবেলা এসে জামা-টামা খুলে মদের বোতল নিয়ে বসেছিল। হোল নাইট থাকবে। হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল তার, কোনো জরুরি কাজ ফেলে এসেছে যেন, ধড়ফড় করে উঠে জামা গলিয়ে বলল, আজ চলি গো চামেলি, আজ থাকতে পারব না।

সে বেরিয়ে যাওয়ার পর হরিয়া ঘরে ঢুকে বখরা চেয়েছিল। কত টাকা দিয়েছে দুনিচাঁদ? চামেলি বলল, আজ তো এক ঘন্টাও থাকেনি, পঞ্চাশ দিয়ে গেছে। হরিয়া চোখ গরম করে বলল, তুই ঝুট বলছিস আমাকে! ওই বাবুটা হোল নাইট থাকার কড়ার করলে যখনই যাক পুরো টাকা দিয়ে যায়। দুশো টাকা। নিকাল, নিকাল।

প্রথমে চামেলির আঁচল ধরে টানল হরিয়া, আঁচলে বাঁধা আছে টাকা, চামেলি ছাড়বে না, তখন হরিয়া তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারল এক থাবড়া। সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ঢুকে এল দুনিচাঁদ। সে তার সিগারেট-লাইটার ফেলে গেছে। ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু রক্তবর্ণ হল। চিৎকার করে বলল, হারামজাদা! তারপর বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিয়ার ওপর। দুনিচাঁদের বিকট গর্জন শোনা গেল সারা বাড়িতে, ফট ফট করে খুলে গেল অনেকগুলো দরজা।

হরিয়াই তো এ বাড়ির একমাত্র নোকর নয়, আরও নোকর আছে। এক নোকরকে মারলে অন্যরা ছুটে আসে। তারা সবাই এককাট্টা। রূপলাল বসে থাকে বাইরের গেটের কাছে, গোলমাল শুনে সেও ওপরে উঠে এল। অন্য নোকররা লাঠি-ডাণ্ডা নিয়ে এসেছে, তারা দুনিচাঁদকে ছাড়বে না। চামেলি দুনিচাঁদকে আড়াল করে আছে।

রূপলাল এসেই বলল, চোপ, সব চোপ। এটা কি মেছোহাটা পেয়েছিস?

চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়ির বাইরে গেলে বাড়ির বদনাম হয়। অন্য খদ্দেররা ফিরে যায়। পদ্মরানির ফ্ল্যাটে আজেবাজে লোকের স্থান নেই।

সবাই চুপ করলে রূপলাল প্রথমে শান্তভাবে দুনিচাঁদকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে মারলেন কেন?

দুনিচাঁদ সামনে এগিয়ে এসে বলল, ও মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে কেন? এত সাহস, আমি চামেলির কাছে আসি, এই নিমকহারামটাকে কত বখশিস দিয়েছি, তবু চামেলিকে চুল ধরে টেনে...।

রূপলাল বলল, ঠিক আছে, আপনি যান। চলে যান।

দুনিচাঁদ বলল, চলে যাব মানে ও কান ধরে সবার সামনে বলুক, আর কোনোদিন আমার বাঁধা মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলবে না।

রূপলাল এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, এ লোকটাকে দূর করে দে। আর কোনোদিন ঢুকতে দিবি না। ঝনঝাটিয়া পার্টি আমি চাই না।

রূপলালের সমর্থন পেয়ে সাহস বেড়ে গেল হরিয়ার। সে একটা পেতলের ফুলদানি তুলে মারতে গেল দুনিচাঁদকে। নিপুণ খেলোয়াড়ের মতন মাথা বাঁচিয়ে সরে গিয়ে দুনিচাঁদ হা-হা করে হেসে উঠল।

এমন অবস্থায় কোনো মানুষ হাসে? রূপলালের দারোয়ান আর সব নোকররা একযোগে আক্রমণ করলে সে যে ছাতু হয়ে যাবে। এখান থেকে দৌড়ে পালাতেও পারবে না, এটা বাঘের গুহা।

দুনিচাঁদকে কেমন যেন দুর্বোধ্য দেখাচ্ছে। তার মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। বরং সে চামেলির বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘাবড়াসনি, কেউ তোকে কিছু করবে না। তারপর হরিয়াকে বলল, কইরে কান ধর, ওর পা ধরে ক্ষমা চা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

এবারে হরিয়া অতি কুৎসিত একটা গালাগাল দিয়ে উঠল। এভাবে সময় নষ্ট করাটাও রূপলালের পছন্দ নয়, সে দারোয়ানের দিকে ইঙ্গিত করল, লোকটাকে পেটাবার জন্য।

দুনিচাঁদ তবু হাসছে, এটা যেন একটা খেলা, দৌড়ে দৌড়ে ঘুরছে ঘরের মধ্যে। এক লাফে একটা চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের পকেট থেকে ফস করে বার করল একটা রিভলভার। হরিয়ার কপালের দিকে তাক করে বলল, মরতে চাস নাকি? তুই মরলে দেশে তোর বউ-বাচ্চার কী হবে?

ওটা খেলনার অস্ত্র নয়, আসল, দেখলেই বোঝা যায়।

এ পাড়ায় খুন-জখম কিছু অভাবিত ব্যাপার নয়। গত সোমবারই এগারো নম্বর বাড়িতে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে। দুই বন্ধু এসেছিল বীণা নামে একটি মেয়ের ঘরে। মদ খেতে খেতে দুই বন্ধুর মধ্যে কথা কাটাকাটি, বীণা কী করেছিল কে জানে, একজন হঠাৎ মস্ত বড় ছুরি বার করে প্রথমে বন্ধুকে মেরেছে, তারপর বীণার গলা কেটে দিয়েছে। ধরা পড়েনি লোকটা, ছুরি লকলকিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকের চোখের সামনে দিয়ে।

রূপলাল ভয়ে দেওয়াল সিঁটিয়ে দাঁড়াল। হুড়োহুড়ি করে পালাল অন্য নোকররা, হরিয়ার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে গেছে।

এতবার এসেছে চামেলির কাছে, কিন্তু দুনিচাঁদ চামেলিকে নিয়ে কোনো আদিখ্যেতা করেনি। প্রশংসা-ট্রশংসা যেন সে করতেই জানে না। এসেছে, কাজ সেরে পয়সা ফেলে চলে গেছে। আজ হরিয়ার কাছে চামেলির লাঞ্ছনা দেখে সে কি হঠাৎ বদলে গেল!

এক হাতে রিভলভার, আততায়ী হওয়ার বদলে যেন প্রেমিক হয়ে উঠল দুনিচাঁদ। সে চামেলির দিকে মুগ্ধভাবে চেয়ে বলল, এ মেয়েটা বড় ভাল! কী নরম, কী সরল আর কী বোকা। ঠিক যেন একটা ফুল, যে কেউ ঘাড় মুচড়ে দিতে পারে। আহা রে! আমি বহুৎ মেয়েছেলে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, এমন ফেইথফুল আর দেখিনি। সব কথা শোনে। ফলস দম নেয় না। আমার বড় পছন্দ হয়েছে। তুই আমার সঙ্গে যাবি চামেলি? যত্ন করে রাখব। মান দিয়ে রাখব। ঘরের বউয়ের মতন থাকবি। এমনকি আমি তোকে বিয়েও করতে পারি। হ্যাঁ, কেন বিয়ে করব না? আমার ইচ্ছে হয়েছে বিয়ে করব। আলবাত করব!

একটা রিভলভার দেখার চেয়েও এরকম প্রেমের সংলাপ শুনে সবাই বেশি স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিয়ে করবে? বলে কী লোকটা?

চেয়ার থেকে নেমে দুনিচাঁদ রূপলালকে বলল, তুমি তো মালিক? শুনে রাখ, আজ থেকে চামেলির ঘরে আর কোনো বাবু আসবে না। খবরদার, মনে থাকে যেন, আমার নাম দুনিচাঁদ! আমাকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে, ঠিক সাতদিন পরে আমি আসব, চামেলিকে বিয়ে করে নিয়ে যাব। সবাই সাক্ষী থাকবে।

পকেট থেকে একটা নোটের তাড়া বার করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রূপলালের গায়ের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার ঘরভাড়া।

তারপর সকৌতুকে হরিয়ার এক কানের মধ্যে রিভলভার নল ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, একটু আঙুল নাড়ালেই ফুস! ঘিলু-ফিলু সব বেরিয়ে যাবে, বুঝলি? নিমকহারামি করিস কেন? যার কাছ থেকে পয়সা নিবি, আবার তাকেই বেইজ্জতি করবি? আর অমন করিস না!

এক হাত উঁচু করে রিভলভারটা ধরে দুনিচাঁদ যখন বেরিয়ে গেল, তখন মনে হল সে যেন কোনো নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যের নায়ক। চটপট হাততালি পড়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই নিঃশব্দ, নির্বাক।

পরে অবশ্য সবাই বলাবলি করতে লাগল, এ সব মাতালের বারফট্টাই! নেশার ঝোঁকে এক একজন নিজেকে মনে করে খাঞ্জা খাঁ। বিয়ে করবে না ছাই! ও আর এ মুখোই হবে না।

দুনিচাঁদের নামটা আগে রূপলালরা জানত না। পাড়ার গুণ্ডা-মাস্তানদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে দেখল, এ নামের বাজারদর আছে। কয়েকজন এ নাম শুনেছে। একজন বলল, ওরস্ শালা, লোকটা দারুণ রগচটা, কেউ বেগড়বাই করতে গেলেই ঝটকসে গুলি চালিয়ে দেয়। ওর আর এক নাম ফান্দা দুনিচাঁদ।

সাতদিন সময় দিয়ে গেছে, হাজার খানেক টাকা দিয়ে গেছে, সাতদিন অপেক্ষা করতেই হয়। রূপলাল এই সাতদিন চামেলির ঘরে কোনো লোক বসাল না। হরিয়া ভয়ের চোটে ও ঘরের কাছেই যায় না। চামেলি সন্ধের পর দরজা বন্ধ করে রাখে।

ঠিক সাত দিনের মাথায় ফিরে এল দুনিচাঁদ। ফিরে এল মানে কী, একেবারে রাজার মতন। জরির কাজ করা পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা পরা, ঘাড়ে পাউডার। দুখানা ট্যাক্সি করে কয়েকজন স্যাঙাত নিয়ে এসেছে সে, ট্যাক্সির মিটারে লাল কাপড় বাঁধা। চামেলির জন্য এনেছে বেনারসি শাড়ি। রূপলালের থুতনি ধরে নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কী গো, সব ঠিক আছে তো?

দিনের বেলা, দুপুর বারোটা। কুলসম, মালতীরা যত্ন করে সাজিয়ে দিল চামেলিকে। কপালে চন্দনের ফোঁটা, যেন সত্যি সত্যি বিয়ের কনে। বিয়ে হবে আহিরিটোলার কালীবাড়িতে, সেখানকার পুরুতের সঙ্গে ঠিকঠাক করা আছে। আরও চমকের ব্যবস্থা করে এসেছে দুনিচাঁদ, ট্যাক্সি থেকে নামানো হল কেটল ড্রাম আর বিউগল, দুনিচাঁদের বন্ধুরা বাজাবে, মিছিল করে যাওয়া হবে কালীমন্দির পর্যন্ত। পদ্মরানির ফ্ল্যাটের সব মেয়ের নেমন্তন্ন।

দুখানা ট্যাক্সি চলছে আস্তে আস্তে, সামনে দিয়ে হাঁটছে একগুচ্ছের স্ত্রীলোক, তারও সামনে ভ্যাঁপোর ভ্যাঁপোর শব্দে বাজছে ব্যান্ডপার্টি। রাস্তার লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়েও কিছু বুঝল না। রুপোগাছির বারবনিতাদের এমন মিছিল আগে কেউ কখনও দেখেছে? ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল দুনিচাঁদ।

পদ্মরানির ফ্ল্যাটের অনেক রমণীই চোখের জল ফেলল চামেলিকে বিদায় জানাবার সময়।

বউকে নিয়ে দুনিচাঁদ প্রথমেই গেল ভাইজাগ শহরে, সেখানে ন দিন কাটাবার পর গোয়াতে ছ দিন, তারপর ম্যাঙ্গালোরে আরো কয়েকটা দিন। হোটেলে হোটেলে থাকা। মুর্শিদাবাদের এক গ্রাম থেকে দুই দালালের হাত ঘুরে উত্তর কলকাতার নিষিদ্ধপল্লীতে এসে ঠেকেছিল চামেলি, সেখানকার কয়েকটা গলি, আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটা সিনেমা হলে কয়েকবার হিন্দি সিনেমা দেখতে যাওয়া ছাড়া পৃথিবী সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই ছিল না।

এত দূরদেশের নতুন নতুন শহর, অন্যরকম মানুষ, অন্যরকম ভাষা চামেলি তো হকচকিয়ে যাবেই। দুনিচাঁদের ব্যবহারে ত্রুটি নেই, সবসময় হাসিঠাট্টা করে, এমন মানুষকেও লোকে রগচটা বলে?

প্রায় একমাস ঘোরাঘুরির পর দুনিচাঁদ চামেলিকে এনে তুলল নিউ ব্যারাকপুরে এক দোতলা বাড়িতে। একতলায় সপরিবার থাকে দুনিচাঁদের দাদা, তার তিনটি ছেলেমেয়ে। ওপরে দুখানা ঘর। দুনিচাঁদ বলল, এবার তোর সংসার গুছিয়ে নে চামেলি। কাজের জন্য আমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, একটানা বিশ-পঁচিশ দিন থাকব না, তাই তোকে তো কোথাও একা রাখতে পারি না। নীচে দাদা-বউদি রইল, তোর কোনো বিপদ হবে না এখানে। ডাঁটের ওপর থাকবি, কারুকে গেরাহ্য করার দরকার নেই। দাদার সংসার খরচ চলে আমার টাকায়।

সত্যি দুনিচাঁদ মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে এসে আট-দশ দিন বাড়িতে থেকে যায়, বেরুতেই চায় না, শুয়ে বসে কাটায়। তখন তাকে মনে হয় আদর্শ স্বামী। বকাঝকা দেয় না, আদর করে, এমনকি সংসারের কাজে সাহায্যও করে। নিজে মাংস রাঁধে। বেশি মদ খায় না। চামেলির হাতে মাঝে মাঝে পাঁচশো, সাতশো টাকা দিয়ে বলে, তুই ইচ্ছেমতন খরচ করবি।

চামেলি অবশ্য বাড়ি থেকে বেরোয় না। এই বাড়ি সমেত গোটা পাঁচেক বাড়ি নিয়ে একটা কম্পাউন্ড, পেছন দিকে বস্তি, তারপর রেললাইন। কী করে যেন রটে গেছে, চামেলি রুপোগাছির মেয়ে। এ সব কথা চাপা থাকে না। কিংবা দুনিচাঁদ হয়তো নিজেই জাঁক করে বলেছে। তার তো কোনো ঢাক গুড় গুড় নেই, একটি মেয়েকে তার পছন্দ হয়েছে, তাকে বিয়ে করে এনেছে, সে আগে কুলটা না কুলনারী কী ছিল, তাতে অন্যের কী আসে যায়।

দুনিচাঁদের বউদি চামেলির সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না। দু-একবার দোকান-টোকানে গিয়েছিল চামেলি, পাড়ার অন্য মেয়েরা তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, পুরুষরা ভুরু বাঁকিয়ে তাকায়। এ নিয়ে দুনিচাঁদের কাছে নালিশ করা চলে না। বরং এ সব অগ্রাহ্য করাই ভাল। তার স্বামী তাকে আশাতিরিক্ত সুখে রেখেছে। এমন স্বামী কজন পায়?

একটি অল্পবয়সী কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে, দুনিচাঁদ যখন থাকে না, তখন তার সঙ্গেই গল্প করে সময় কাটায় চামেলি। মেয়েটির নাম পূর্ণিমা, ডাকনাম পুনি, বছর পনেরো বয়েস। রোগা, কালো, রেললাইনের ধারের বস্তিতে থাকে। এই বয়সেই পুনির খুব বিয়ে করার শখ। সে জানে, তার চেহারা সুন্দর নয়, তার বাবা-মা তার বিয়ে দিতে পারবে না। রেল স্টেশনে একজন লোক তাকে বলেছে, কলকাতায় নিয়ে গিলে ভাল কাজ জুটিয়ে দেবে।

পুনিও জানে, চামেলি আগে কোথায় ছিল। তার ধারণা, সেটা খুব ফুর্তির জায়গা। সে একদিন জিজ্ঞেস করল, ওখানে খুব মজা, তাই না? কত লোক আসে, রোজ নতুন নতুন, সে ছেড়ে তুমি চলে এলে কেন গো?

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে চামেলি বলল, না রে, মজা নেই। একটুও মজা নেই। সবাই মারে। বাড়ির মালিক, এমনকি বাড়ির চাকর পর্যন্ত মারে। রোজগারের পয়সা অন্যরা নিয়ে নেয়। বাবুদের কতরকম বায়না। গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা পর্যন্ত দিয়ে দেয়। ওরে পুনি, মেয়েমানুষকে সবাই মারে। এমনকি আমি শুনেছি, অনেক বিয়ে করা বরও বউদের ধরে পেটায়। আমার সোয়ামি যে আমাকে মারে না, সেই আমার সাতপুরুষের ভাগ্য।

এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চামেলির একটি সন্তান জন্মাল। কন্যাসন্তান। তাতেই দুনিচাঁদ কী খুশি। তার নিজের সন্তান। কোলে নিয়ে শিশুটিকে আদর করে। বাইরের অনেকে দুনিচাঁদকে নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ বলে জানে, কিন্তু এখন বোধ হয় সে শান্ত হয়ে ঘর বাঁধতে চায়। মাঝে মাঝেই সে বলে, চামেলি, আমার চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে চাই। দিতে পারবি না? আমার নেশা একটা বড় ফ্যামিলি হবে।

দুনিচাঁদ মেয়ের নাম রাখল চাঁদনি। ওদের পদবি সাউ। দুনিচাঁদের বাবা ছিলেন ওড়িয়া, মা বাঙালি। জন্মকর্ম সব ধানবাদে, সেখানেই দুনিচাঁদের ডানপিটেমির হাতেখড়ি। মেয়ের ওই নাম দেওয়ার পর দুনিচাঁদ বলেছিল, ইস্কুলে ভর্তি করার সময় ওর নাম হবে চাঁদনি সাহা, তাতে সবাই ভাববে বাঙালি। আমরা তো বাঙালিই হয়ে গেছি।

চামেলি অমনি কল্পনায় দেখতে পায়, তার মেয়ে ফ্রক পরে বেনি দুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। তাদের মুর্শিদাবাদের গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না, গ্রামের কিছু ছেলে সাত মাইল দূরে অন্য গ্রামের স্কুলে পড়তে যেত, মেয়েদের বেলায় সে প্রশ্ন ছিল না।

এই মেয়ের টানেই দুনিচাঁদ এখন বেশি বেশি বাড়িতে থাকে। কাজের জন্য বাইরে গেলেও ফিরে আসে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে। মেয়েকে কোলে নিয়ে দুনিচাঁদ পাড়া বেড়াতে যায়। যারা চামেলিকে ঘেন্না করে, তারাও দুনিচাঁদের সঙ্গে খাঁতির করে কথা বলে, জানলা দিয়ে চামেলি দেখতে পায়, পড়শিরা কেউ কেউ তার মেয়ের গাল ছুঁয়ে আদর করছে। দেখে বুকের মধ্যে কেমন যেন হয় চামেলির। রুপোগাছিতে থাকার সময় এক এক দিন হরিয়ার হাতে মার খেতে খেতে তার মনে হত, সে সারা জীবনের জন্য দণ্ডিত, ওখানেই তার জীবন কাটাতে হবে। তবু সে মুক্তি পেয়ে গেল কী করে? দুনিচাঁদ যখন বিয়ের কথা বলে চলে যায়, সেই সাতদিন তার মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, লোকটার কাছে বন্দুক পিস্তল থাকে, লোকটা খুনি, সে যদি বিয়ে করার নাম করে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করে? তারপর সে ঠিক করেছিল, হরিয়ার হাতে নিয়মিত মার খাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু কোথায়

খুনি, এ লোকটা তাকে কখনও একটা চড়ও মারেনি। কোনো মন্ত্রে তার জীবনটা এমন বদলে গেল? তবে কি স্বপ্নপরী তাকে দয়া করেছে?

দুনিচাঁদের আরো একটি ছেলেমেয়ের জনক হওয়ার সাধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরে আর কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারল না। চাঁদনি পাড়ার শিশুমঙ্গল স্কুলে ভর্তি হয়েছে, সে মাকে ছড়া মুখস্থ করে শোনায়। চামেলি যেরকম স্বপ্ন দেখেছিল, ঠিক সেইরকমই সেজেগুজে স্কুলে যায় তার মেয়ে।

পরের বছর চাঁদনি হঠাৎ অসুখে পড়ল। হঠাৎ হঠাৎ তার পেট ব্যথা করে, এমন ব্যথা যে বলি দেওয়া পাঁঠার মতন মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে ছটফট করে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোয়। ডাক্তার-কবিরাজদের ওষুধে কোনো কাজ হয় না। কী যে অসুখ, সেটাই ধরা যাচ্ছে না, এক্সরে করানো হল, রক্ত পরীক্ষা করানো হল, তবু কিছু বোঝা যায় না। ক্রমেই অসুখ বাড়ছে, একসময় মনে হল, এ মেয়েকে আর বাঁচানো যাবে না, যখন-তখন পেট ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যায়, খেতেও চায় না কিছু।

একজন ডাক্তার বললেন, হাসপাতালে পাঠিয়ে শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে।

হাসপাতালের নামে চামেলির বিষম ভয়। তার ধারণা, হাসপাতাল থেকে কেউ ফেরে না। পদ্মরানির ফ্ল্যাটে তার পাশের ঘরেই থাকত নিভাননী, একদিন তার ধুম জ্বর হল, পাড়ার ডাক্তার বলল, টাইফয়েড। রূপলাল তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল, সে দিন খুব বৃষ্টি ছিল মনে আছে, অত জ্বরের মধ্যেও নিভাননী হেসে হেসে কথা বলছিল, ওমা পরদিনই খবর এল নিভাননী আর নেই।

আকুলি-বিকুলি করে কাঁদতে লাগল চামেলি। মেয়েকে সে হাসপাতালে কিছুতেই পাঠাবে না। দুনিচাঁদ ধমকাতে লাগল তাকে। ডাক্তারের চেয়ে সে বেশি বোঝে? বাড়িতে রেখে তো মেয়েটাকে এক গেরাস ভাতও খাওয়ানো যাচ্ছে না, ওরা নল দিয়ে খাওয়ায়। আজও বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে, কালিবর্ণ আকাশ দেখে চামেলির মনে পড়ছে নিভাননীর কথা। সে দুনিচাঁদের পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, ওগো, অন্তত বৃষ্টিটা থামতে দাও, কাল পাঠিও।

সন্ধের পর অনেকক্ষণ ব্যথায় ছটফট করে মেয়ে ঘুমিয়েছে। মাঝরাতে দুনিচাঁদ ঘুম ভেঙে দেখল, মেয়ের খাটের পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চামেলি বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। চক্ষু দুটি বোজা, একটু একটু দুলছে শরীর।

দুনিচাঁদের বড় কষ্ট হল। মেয়েটা না বাঁচলে শোকে দুঃখে বউটা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। সেও পাশে গিয়ে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কোন ঠাকুরকে ডাকছিস?

চামেলি চোখ না মেলেই বলল, স্বপ্নপরী।

এখানে পাড়ার মধ্যেই রয়েছে কালীমন্দির। একটু দূরে মস্ত বড় জগদ্ধাত্রী মন্দির, দু জায়গাতেই পুজো দেওয়া হয়েছে। স্বপ্নপরী আবার কী ঠাকুর? দুনিচাঁদ কোনোদিন নাম শোনেনি।

চামেলি মেয়েকে ঠেলা দিয়ে বলল, মা রে, একবার চোখ মেলে তাকা।

দুনিচাঁদ বলল, ওর ঘুম ভাঙাচ্ছিস কেন?

চামেলি বলল, ওর নিজে না ডাকলে ফল হবে না। আমার স্বপ্নপরীকে ডাকলাম তো কতবার। একবার দেখা দিয়ে বলল, আমার স্বপ্নপরী আর ওর স্বপ্নপরী আলাদা। ওরটা আমি চিনব না।

দুনিচাঁদ অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী বলছিস তুই? পরী কখনও ঠাকুর হয় নাকি?

চামেলি বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের গ্রামে একটা পাগল ছিল। সে স্বপ্নপরী স্বপ্নপরী বলে খুব চেঁচাত। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলত, আমার স্বপ্নপরীকে তোরা দেখতে পাবি না। প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা স্বপ্নপরী থাকে। তাকে ডাকতে হয়, সাধ্যসাধনা করতে হয়, তা হলে ঘুমের মধ্যে দেখা দেয়।

দুনিচাঁদ বলল, হুঁ, পাগলের কথা।

চামেলি তবু মেয়েকে জাগিয়ে বলল, একবার বলল তো মা, স্বপ্নপরী, স্বপ্নপরী, দেখা দাও। আমার ভাগ্য বদলে দাও।

চাঁদনি একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল, স্বপ্ন...স্বপ্ন...স্বপ্নপরী।

পরদিন চাঁদনিকে পাঠাতে হল হাসপাতালে। বৃষ্টি থেমে গেছে শেষ রাতে। তাতে চামেলি খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছে, বৃষ্টির মধ্যে পরী আসবে কী করে।

এগারো দিন বাদে হাসপাতালে থেকে অনেকটা সুস্থ হয়ে ফিরে এল চাঁদনি। ডাক্তারদের হাতযশ, না স্বপ্নপরীর দয়ায়, তা বোঝার উপায় নেই। চাঁদনিকে জিজ্ঞেস করলে সে দুদিকে মাথা নাড়ে, না সে দেখেনি স্বপ্নপরীকে। চামেলি তা বিশ্বাস করে না, তার দৃঢ় বিশ্বাস ঘুমের মধ্যে চাঁদনির নিজস্ব স্বপ্নপরী এসে ওর কপাল ছুঁয়ে গেছে, স্বপ্নের কথা অনেকের মনে থাকে না।

চাঁদনি সুস্থ হয়ে ওঠায় এ সংসারে আবার স্বস্তি ফিরে এল। শুধু কাজের মেয়েটা এর মধ্যে ডুব দিয়েছে। চামেলির কথা সে শোনেনি, সে পালিয়েছে স্টেশনের একটা ছোকরার সঙ্গে।

অনেক দিন কাজকারবারে যাওয়া হয়নি, দুনিচাঁদ এবার বাইরে গেল। সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসার কথা। দেখতে দেখতে দু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ কেটে গেল, তার কোনো খবর নেই। মেয়ের চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হয়ে গেছে, চামেলির হাতে বিশেষ টাকা নেই। দুনিচাঁদ যাওয়ার সময় পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছে, তাতে কতদিন চলে? প্রায় মাস ঘুরে যাওয়ার উপক্রম, এত দেরি দুনিচাঁদ কখনও করে না।

একদিন দুটো লোক এল দুনিচাঁদের খোঁজে। লোক দুটির মুখ চেনা; চামেলি ওদের বিয়ের দিন দেখেছে। এর মধ্যে ওরা একবারও আসেনি। ঘরে ঢুকেই একজন চারদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ছাদের দরজায় চাবি দেওয়া থাকে?

সত্যিই তাই, ছাদের দরজায় সবসময় চাবি দিয়ে রাখে দুনিচাঁদ, কারুকে উঠতে দেয় না। সে চাবি কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে? না, একটা দেরাজে পাওয়া গেল চাবি। লোক দুটি ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্কে নেমে পড়ল। সেখান থেকে তুলে আনল তিনটে রিভলভার। সেগুলো নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে তারা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

তারপর একটু পরেই দোতলায় উঠে এল দুনিচাঁদের দাদা আর তার ষণ্ডামার্কা দুই ছেলে। ব্যস্তসমস্তভাবে বলল, আর কোথায় কী লুকিয়ে রেখে গেছে? এক্ষুনি দেখতে হবে। পুলিশ এসে কিছু পেলে আমাদেরও হাতে দড়ি দেবে।

আলমারি বাক্স সব খুলে দেখল, বাথরুম, রান্নাঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অবশ্য আর কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল না। বড় ছেলেটা চামেলির গয়নাগুলো হাতিয়ে নিল।

দুনিচাঁদের দাদা চামেলির দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে বলল, হারামজাদি, আমার ভাইটাকে খেলি? আমি আগেই জানতাম—

দুই

ট্যাক্সি চেপেই এ পাড়া থেকে এক দিন চলে গিয়েছিল, ট্যাক্সিতেই ফিরে এল চামেলি। সেই দিন আর এই দিন।

ট্যাক্সিটা থামল বুড়োর দোকানের সামনে। ভেতর থেকে কারা যেন চামেলিকে ঠেলে নামিয়ে দিল, ছুড়ে দিল তার মেয়েকে আর একটা কাপড়ের পুঁটলি। তারপর হুস করে চলে গেল ট্যাক্সিটা।

বুড়োর দোকানে দিনেরবেলা পান-বিড়ি, সোডা, লেমনেড বিক্রি হয়, রাত্তিরে চোলাই মদ। দোকানের মালিক বৃদ্ধ নয়, বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স, তার নামই বুড়ো। দিনেরবেলা সে আসে না, দোকানে বসে পটল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন ছেলে পটলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, তারা তাচ্ছিল্য চোখে তাকাল চামেলির দিকে। একজন চিনতে পারল, এ মেয়েটা পদ্মরানির ফ্ল্যাটে একসময় থাকত না? চেহারাটা টিমসে মেরে গেছে।

মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবে চামেলি? একটাই বাড়ি সে চেনে। আস্তে আস্তে হেঁটে পদ্মরানির ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দাঁড়াতেই রূপলাল হেঁকে বলল, কে রে?

চামেলি মিনমিন করে বলল, দাদা, আমি চামেলি!

গেটের সামনে একটা চেয়ারে রূপলাল দুপুর থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকে। পাজামার ওপর গেঞ্জি পরা, ডান বাহুতে সোনার মাদুলি বাঁধা। দুজন নেপালি দারোয়ান থাকে কাছাকাছি। এ বাড়িতে সবরকম গণ্ডগোল সামলাবার দায়িত্ব তার।

রূপলাল চিনতে পারল না। ভুরু কুঁচকে চামেলিকে আপাদমস্তক দেখে বলল, কী চাই এখানে? ভিক্ষেটিক্ষে হবে না, যা ভাগ।

সত্যি চেহারাটা হঠাৎ বেশ খারাপ হয়ে গেছে চামেলির। দুনিচাঁদ আর ফেরেনি, কী করে যেন জানা গেছে যে লালগোলার কাছে সে খুন হয়েছে, তার কোনও পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছুরি মেরেছে পেছন থেকে। এ খবর শোনা মাত্র দুনিচাঁদের দাদা ও বাড়ির অন্যান্য লোকরা চামেলিকে তাড়াবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। চামেলি একটা নষ্ট মেয়ে, বিয়েটিয়ে সব বাজে কথা। দুনিচাঁদের সম্পত্তির ওপর তার কোনো অধিকার নেই। প্রথমে ধমকানি ও হুমকি, তারপর ধাক্কাধাক্কি, তারপর মার। চামেলির অবশ্য দৃঢ়বিশ্বাস দুনিচাঁদ মরেনি, কোনো কারণে লুকিয়ে আছে, আবার ঠিক ফিরে আসবে, সে জন্য সে বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই যাবে না। কিন্তু কতদিন মার সহ্য করবে? ও পাড়ার একজনও তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি। তার দাদার দুই ছেলে আরো সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়ে আজ গলা ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ির বার করে দিয়েছে। তারপর বেড়াল পার করার মতন ট্যাক্সি করে এনে ফেলে দিয়ে গেছে এখানে।

দোতলার একটা ছোট ছাদ আছে। এই সময় এ বাড়ির মেয়েরা দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে খোলা চুলে মেলে ছাদে দাঁড়ায়, চুল শুকোয়। কে উঁকি মেরে বলল, ও মা, ও তো চামেলি, ফিরে এসেছে। আয় আয়, ওপরে আয়!

সে গল্পটা শুনতে চায়। গল্প শোনার লোভে আরো অনেক মেয়ে কুলসমের ঘরে এসে চামেলিকে ঘিরে বসল। কত ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল চামেলির, বেনারসি শাড়িতে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আজ তার মলিন চেহারা সব গল্প লেখা আছে। বিয়ের সুখ কি সকলের কপালে সয়। কেউ হাসিঠাট্টা করল না, কেউ বিদ্রূপের হুল ফোটাল না। স্বামী নামে সেই লোকটা তাড়িয়ে দেয়নি, সে মারা গেছে, এটাই যেন খানিকটা সান্ত্বনার মতন।

চাঁদনির থুতনি ধরে আদর করে কুলসম বলল, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে মেয়েটা। আহা রে, মুখখানা শুকিয়ে গেছে কেন? সারাদিন খায়নি বুঝি কিছু?

ওদের দুজনকেই খাওয়ানো দাওয়ানো তো হল, কিন্তু আশ্রয় দেবে কে? পদ্মরানির ফ্ল্যাটে একটাও ঘর খালি নেই। তা ছাড়া এখানে বাছাই করা মেয়ে রাখা হয়। চামেলির যা চেহারা হয়েছে, তাতে রূপলাল তাকে রাখতে চাইবে না। চার নম্বর বাড়িতে হরিমতী মারা গেছে গত সপ্তাহে, তার ঘরে নতুন কেউ এসেছে? সে ঘরখানা যদি খালি থাকে—

চামেলি বলল, ও দিদি, আমি আর এ লাইনে আসতে পারব না।

কুলসম বলল, লাইন ছেড়ে দিতে চাস, তা বেশ কথা। টাকাপয়সা কিছু জমিয়েছিস। গয়নাগাঁটি সব সঙ্গে এনেছিস তো?

এতক্ষণ বাদে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে চামেলি। সব কেড়ে নিয়েছে। পুরুষ মানুষদের সঙ্গে সে গায়ের জোরে পারবে কেন। জোর করে গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে। আলমারি খুলে সাফ করে নিয়েছে একেবারে। বাধা দিতে গিয়ে মার খেয়েছে চামেলি। চেঁচাবার চেষ্টা করলে ওরা গলা টিপে ধরেছিল।

যেন সেই সব অত্যাচারীর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, কুলসম দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, হারামি! কুত্তার বাচ্চা। কোনোদিনও মায়ের দুধ খায়নি।

শুধু মেয়ের কানে রয়েছে দুটো সোনার দুল, ওর বাবা সাধ করে এ বছরেই কিনে দিয়েছিল, সে দুটো ওরা নিতে পারেনি।

এ লাইনে যদি আর আসতে না চায় চামেলি, তা হলে সে খাবে কী? মেয়েকেই বা বাঁচাবে কী করে? আর কোন্ কোন্ পথ খোলা আছে চামেলির জন্য? লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে পার। রাজমিস্তিরিদের জোগাড়ে হতে পারে। অথবা শেষ উপায় রাস্তায় ভিক্ষে করা, রাস্তাতেই আশ্রয়।

বীণা বলল, এ লাইন ছেড়ে তুই আর যেখানেই যা, সঙ্গে যদি মরদ না থাকে, অন্য পুরুষ মানুষরা যখন তখন ফোকটে ঠুকরে ঠুকরে তোকে খাবে। মেয়েমানুষের শরীর যতদিন না একেবারে রসকস শুকিয়ে দড়ি হয়ে যায়, ততদিন পুরুষ মানুষেরা ছাড়ে না। ভগবানের এই বিচার।

এ লাইন ছেড়ে দেওয়ার স্বপ্ন কি আগেও কেউ কেউ দেখেনি? হেনা, মল্লিকা, বীণারা অনেক আলোচনা করেও কোনো কুলকিনারা পায় না। এখানে তবু নিজস্ব একটা ঘর আছে। মেয়েমানুষ রাস্তা চায় না, ঘর চায়।

কুলসম বলল, যদি সত্যিই এ লাইন আসতে ইচ্ছে না করে, তা হলে রেললাইনে গিয়ে গলা দিগে যা। সেটাই সবচেয়ে ভাল।

কিন্তু তা হলে মেয়েটার কী হবে?

চার নম্বর বাড়িতে মৃত হরিমতীর ঘরেই উঠতে হল চামেলিকে। আবার আগেকার মতন জীবন। মাঝখানের সাড়ে ছটা বছর যেন একটা স্বপ্ন। সে সময়টা অলীক, এ জীবনই বাস্তব। প্রতিদিন বারবার ধর্ষিত হওয়াই তার নিয়তি।

এ বাড়িতে তার নোকরের নাম লালুরাম, মাঝবয়েসি, কঠোর চেহারার মানুষ। হরিয়ার সঙ্গে তার একটা তফাত আছে, সে গায়ে হাত তোলে না, কিন্তু হিসেব না বোঝার ভান করে প্রাপ্য টাকার চেয়েও বেশি চায়, না দিলে ঘ্যান ঘ্যান করে, শেষ পর্যন্ত পাঁচ-দশ টাকা বেশি আদায় করে ছাড়ে। তা নিক। নোকরদের ওপর নির্ভর না করেও তো উপায় নেই। ওরা সবসময় বাইরে বসে পাহারা দেয়, খদ্দেরদের মধ্যে কেউ বেশি গণ্ডগোল করলে ওদের সাহায্য নিতে হয়। আসেও তেমন কিছু কিছু, মানুষ না যেন বনমানুষ, আঁচড়ে কামড়ে অতিষ্ঠ করে তোলে।

লালুরামের সঙ্গে হরিয়ার গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়তা আছে। এ বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে। চামেলির ওপর হরিয়ার এখনও খুব রাগ। দুনিচাঁদ তাকে মেরে দাঁত ভেঙে দিয়েছিল, সেটা যেন চামেলির দোষ।

চামেলি ছাড়া আরো তিন-চার জনের ছেলেমেয়ে আছে। ছাদের ওপর টালির চাল দেওয়া একটা ঘরে থাকে সেইসব ছেলেমেয়ে। সন্ধের সময় তাদের নীচে নামা নিষিদ্ধ। রাতের মোহিনীদের কেউ মা হিসেবে দেখতে চায় না।

চাঁদনি এখানে এসে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। বাবা আর মা ছাড়া আর কারুর স্নেহ বা সান্নিধ্য সে পায়নি। বাবা অদৃশ্য হয়ে গেছে, মাকেও সে খুব কম সময় দেখে। তার শিশুমন এখানকার ধরনধারণ বুঝতে পারে না, সেইজন্যই বোধ হয় নির্বাক হয়ে গেছে। সমবয়েসিদের মতন দৌড়োদৌড়ি বা খেলাধুলোও করতে চায় না সে।

একটু ফাঁক পেলেই চামেলি ওপরে চলে আসে। সন্ধের পর মায়েদেরও ওপরে আসার নিয়ম নেই। এ জন্য এ বাড়ির মালকিন হিরেমাসির কাছে সে একদিন ধমক খেয়েছে। ঘর ফাঁকা দেখে ফিরে গেছে খদ্দের।

রাত বারোটার পর সদর বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় টহল দেয় পুলিশ। এর পর আর কেউ আসবে না। শেষ বাবুটি বিদায় হলেই চামেলি ওপর থেকে মেয়েকে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। বেশিরভাগ দিনই ঘুমন্ত চাঁদনিকে কোলে নিয়ে আসতে হয়। কোনোদিন যদি চামেলির ঘরে হোল নাইট বাবু থাকে, চামেলির সারাক্ষণ অস্বস্তি হয়। তার শরীরটা শুয়ে থাকে এক অচেনা পুরুষের পাশে, মন চলে যায় মেয়ের কাছে। এক দিন কী কারণে যেন চাঁদনি ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে নীচে নেমে এসেছিল রাত তিনটের সময়। সেদিন চামেলির হোল নাইট বাবু রয়েছে, দরজা খুলে মেয়েকে দেখে তাকে আবার ওপরে পাঠিয়ে দিতে বুক ভেঙে গিয়েছিল চামেলির।

ভবিষ্যতে মেয়ের কী হবে? দুনিচাঁদ তার মেয়েকে স্কুলে পড়িয়ে ভদ্রঘরের মেয়ে হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাকেও চামেলির মতন এ লাইনে নামাত হবে? না না না, তা কিছুতেই হয় না। হে ভগবান, একটা পথ দেখিয়ে দাও!

চামেলির এখনও আশা, দুনিচাঁদ হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে। নিউ ব্যারাকপুরের বাড়িতে চামেলিকে দেখতে না পেয়ে সে কি এ পাড়ায় খোঁজ নিতে আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে। পদ্মরানির ফ্লাটে খোঁজ করলে কুলসম-বীণারা চার নম্বর বাড়ির সন্ধান দিয়ে দেবে।

চামেলি আবার এ লাইনে ফিরে এসেছে দেখে দুনিচাঁদ যদি রেগে যায়? তাকে ঘেন্না করে? করুক। চামেলির জীবন এভাবেই কাটবে, কিন্তু দুনিচাঁদ মেয়েকে নিশ্চিত ফেরত নিয়ে যাবে। তার অত আদরের মেয়ে, সে তো নষ্ট হয়নি। চামেলি তাকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না।

প্রায়ই সকালবেলা চামেলি মেয়েকে শেখায়, ঘুমোবার আগে রোজ স্বপ্নপরীকে ডাকবি। বলবি, স্বপ্নপরী, স্বপ্নপরী, তোমার পায়ে ধরি, দেখা দাও, একবার দেখা দাও!

চামেলি নিজেও তার স্বপ্নপরীকে ডাকে। ভগবানকে ডাকে। কেউ সাড়া দেয় না। বছরের পর বছর কেটে গেল, দুনিচাঁদও ফিরে এল না।

চাঁদনি নবছর পেরিয়ে দশে পা দিয়েছে, বেশ ডাগর চেহারা হয়েছে। নতুন করে চিন্তা শুরু হয়েছে চামেলির। এই বয়েসটাই ভয়ের। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে মেয়েরা এই বয়েসে পড়লেই পুরুষরা নজর দিতে শুরু করে। বয়স্করা জড়িয়ে ধরে স্নেহ দেখবার ছলে। মেয়েরাও চঞ্চল হয়ে যায়, কারুর মিষ্টির কথা শুনলেই ভুলে যায়। চাঁদনির বয়েসি এ বাড়ির মেয়েরা কুৎসিত গালাগালি শিখে গেছে, যেন নারী-পুরুষের শরীরের সম্পর্ক তারা বোঝে।

একতলায় মুখোমুখি দুখানা ঘরে থাকে জবা আর সোহাগী। ওরা মা আর মেয়ে। জবার মা পদ্মাও নাকি এ বাড়িতে ছিল। ওদের দুজনকে দেখলেই চামেলি শিউরে ওঠে। তার মেয়ের অদৃষ্টেও এরকম লেখা আছে?

একদিন বিকেল চারটের সময় চামেলির ঘরে দুটি বাবু এল। এরকম সময় সাধারণত বদ্ধ মাতাল ছাড়া কেউ আসে না। সন্ধের পরই এখানে মাংসের বাজার খোলে।

এই বাবু দুটি এক ফোঁটা মদ খায়নি, নেহাতই ছোকরা, মনে হয় যেন কুড়ি-বাইশ বছরের বেশি বয়েস নয়। তেমন শীত পড়েনি, তবু ওরা এসেছে প্যান্ট-কোট পরে, দুজনেরই মুখে পাতালা দাড়িগোঁফ। ঠোঁটে সিগারেট।

লালুরাম বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল, পায়ের আওয়াজ পেয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। দরদাম ঠিক হয়ে গেল, এক ঘণ্টার খদ্দের। মালের বোতল আনতে হবে? না। মাংস? না। ফ্রেঞ্চ ক্যাপ? না, তাদের সঙ্গে আছে। কিছুই লাগবে না। তারা যখন দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, লালুরাম মনে করিয়ে দিল, কাজের সময় কিন্তু একজনকে বাইরে দাঁড়াতে হবে।

ঘরে কোনো চেয়ার থাকে না, পুরু তোশকের বিছানা পাতা। একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোট টুল। দেওয়ালে মদের কোম্পানির দুটো ক্যালেন্ডার, আর একটি লক্ষ্মী ঠাকুরের ফটো।

সবাই এসে বিছানার ওপর বসে, এই বাবু দুটি দাঁড়িয়ে রইল, মুখ ঘুরিয়ে ঘরের সব কিছু দেখল। চোখাচোখি করল নিজেদের মধ্যে।

চামেলি বলল, কই গো, বসো।

একজন বাবু বসল ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে, একজন বলল, একটা মোড়াটোড়া কিছু নেই?

চামেলি বলল, কেন, আমার বিছানায় বসতে বুঝি ঘেন্না করে?

সে হি হি করে হেসে উঠল।

এইসব অল্পবয়েসি ছোকরাদের ধরনধারণ সে জানে। একটা কিছু নিষিদ্ধ কাজ করার বীরত্ব দেখাবার জন্য আসে। এরা শরীর দেখতে চায়, তার বেশি কিছু না। যারা মাল খেয়ে নেশা করে না, তারা অনেকেই পুরোপুরি বসতে

চায় না। বড়জোর একটু টেপাটেপি করে। কেউ কেউ দূর থেকে শরীর দেখেই চলে যায়। এ রকম অল্পবয়েসি ছোকরাদের পছন্দ করে চামেলি, তেমন খাটাখাটনি থাকে না।

অন্য বাবুটি সত্যি বসল না, দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। চামেলি আঁচল ফেলে দিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলতে যেতেই একজন হাত তুলে বলল, এই এই, দাঁড়াও, ও সব দরকার নেই।

চামেলি ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তা হলে আর কী করতে হবে? নাচ দেখতে এসেছ নাকি? আমি নাচফাচ জানি না।

দাঁড়িয়ে থাকা বাবুটি বলল, তুমি নিয়মিত ব্লাড টেস্ট, মানে রক্ত পরীক্ষা করাও?

পদ্মরানির ফ্ল্যাটে থাকার সময় দু একবার রক্ত পরীক্ষা করানো হত বটে। বছরে একবার দুবার একজন ডাক্তার এসে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে যেত। এ বাড়িতে কেউ সে রকম কিছু বলেনি।

সে বলল, হ্যাঁ গো, হয়, রক্ত পরীক্ষা হয়। বাবুটি বলল, কই, রিপোর্ট দেখি! কাগজটা কোথায়?

চামেলি বলল, আ মোলো যা। কাগজ কোথায় পাব, সে বোধহয় মাসির কাছে আছে। আমার বাপু শরীরে কোনো রোগভোগ নেই।

টুলে বসা বাবুটি বলল, কী করে জানলে তোমার কোনো রোগ নেই? এমন অনেক মারাত্মক রোগ আছে, যার হয়, সে নিজেই অনেক দিন জানতে পারে না।

আগন্তুক দুজনেই খলখলিয়ে হেসে উঠল। যে দণ্ডায়মান, সে অপরজনকে বলল, তোকে কথা বলতে বারণ করেছিলুম না। তোর গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়। ধরা পড়ে গেলি তো!

একজন নয়, দুজনেই যুবতী। ছোট করে চুল ছাঁটা, গোঁফ লাগিয়ে, কায়দা করে সিগারেট টানছিল বলে প্রথমটায় বোঝা যায়নি।

হাসতে হাসতে একজন বলল, তোমার কাজের লোকটি কিন্তু ধরতে পারেনি।

চামেলি হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, তোমরা কেন এসেছ? আমার কাছে ও-সব হবে না। টাইম নিয়েছ। পয়সা দিয়ে যেতে হবে।

সে বলল, ঠিক আছে, পয়সা দিয়ে যাব। আমরা 'ও সবের' জন্য আসিনি। কিছু কথা বলতে এসেছি। আমার নাম শ্রীলেখা, ওর নাম দীপা। আমাদের একটা সংস্থা আছে, তার তরফ থেকে কিছু জানতে চাই। তোমার নাম তো চামেলি, তাই না?

দীপা বলল, আচ্ছা চামেলি, তুমি কী জানো, এডস নামে একটা সাঙ্ঘাতিক রোগ আছে? আগে যৌনকর্মীদের মধ্যে সিফিলিস-গনোরিয়া খুব হত। সে সব রোগের ঠিকমতন চিকিৎসা করালে সুস্থ হওয়া যায়, ওষুধ আছে, এডস-এর কিন্তু কোনো ওষুধ এখনো বেরোয়নি। হলে নির্ঘাত মৃত্যু। তোমার যদি এইচ আই ভি পজিটিভ হয়, মানে এই রোগের প্রথম দিকে তুমি টেরও পাবে না। তোমার কাছে যারা আসবে, তাদের মধ্যেও এই রোগ ছড়াতে পারে। পারে মানে, ছড়াবেই!

চামেলি বিবর্ণভাবে বলল, আমার ওই রোগ হয়েছে?

দীপা বলল, হয়েছেই যে তা রক্ত পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না। হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তোমাদের মতন যৌনকর্মীদের মাধ্যমেই এই রোগ ছড়ায়। শোনো, তোমাদের পাড়ায়, বড় রাস্তার মুখে যে পেট্রোল পাম্প আছে, তার উলটোদিকে আমাদের সমিতির অফিস খুলেছি। সেখানে তুমি যদি আস, বিনা পয়সায় রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। আমরা এ পাড়ার বাচ্চাদের জন্য স্কুলও খুলেছি, তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

পরদিন বেলা এগোরোটায় মেয়ের হাত ধরে চামেলি চলে এল সেই সমিতির অফিসে। কাছেই একটা গাড়ি বারান্দার নীচে ফুটপাথে স্কুল বসেছে। অফিসঘরের মধ্যে ভদ্দরলোকদের বাড়ির তিনজন মেয়েমানুষ ব্যস্ত হয়ে কাজকর্ম করছে, তারা খাতির করে চামেলিদের চেয়ারে বসতে দিল।

এই লাইনে প্রায় বারো বছর কেটে গেল চামেলির। মাতাল লম্পট, গুণ্ডা শ্রেণীর লোকই বেশি দেখেছে। তার মতন মেয়েদের সঙ্গেই কথা বলেছে। এই মেয়ে তিনটি সম্পূর্ণ বাইরের জগতের, এরা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? এর উত্তর পাওয়া সোজা নয়।

চাঁদনির বাবার সাধ ছিল তার মেয়ে স্কুলে পড়বে। হ্যাঁ পড়ছে তো, ফুটপাথের হলেও সেটা স্কুল। কিছু লেখাপড়া শিখলে মেয়ে অন্য লাইনে যেতে পারবে না!

দীপা আর শ্রীলেখার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে চামেলির। দীপা সব কথা বেশ সহজভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে। চামেলির রক্তে দোষ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাকে বলে দেওয়া হয়েছে, ফ্রেঞ্চ ক্যাপ ছাড়া কোনো বাবুর সঙ্গে বসবে না। তাতে খদ্দের একটু কম হয় হোক। বাড়ির অন্য মেয়েদেরও এটা বোঝাবার ভার চামেলির ওপর।

একদিন দুপুরে ছাদের ঘরে বসে চামেলি দেখল, হরিয়া সেখানে চকলেট বিলি করছে। চাঁদনির হাতেও একটা চকলেট। হরিয়া নিজের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে কেন ঘন ঘন আসে? পদ্মরানির ফ্ল্যাটে বাচ্চা রাখার কোনো ব্যবস্থাই নেই। এ পাড়ার কিছু কিছু কচি মেয়ে নাকি বিক্রি হয়ে মুম্বইতে চালান হয়ে যায়। হরিয়াটা এমনই অর্থপিশাচ, ওর অসাধ্য কিছু নেই।

সে চাঁদনির হাত থেকে চকলেটটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, খবরদার, তুমি আমার মেয়েকে কিছু দেবে না!

হরিয়া রক্তচক্ষে নীচে নেমে গেল। কিন্তু বুক কাঁপতে লাগল চামেলির। দুনিচাঁদের সেই মারের প্রতিশোধ নেবার জন্য হরিয়া যদি চাঁদনির সর্বনাশ করে দেয়? হরিয়াকে সে কী করে বাধা দেবে?

এই ভয়ের কথা দীপাকে জানাতে দীপা বলল, তুমি হরিয়ার নামে পুলিশকে জানিয়েছ? থানায় আগে থেকে ডায়েরি করে রাখো।

চামেলি বলল, পুলিশ? পুলিশ আমার মতন মেয়ের কথা শুনবে? ও বাড়িতে কুমকুমের ঘরে একদিন কী ঝামেলা হয়েছিল, পুলিশ এসে ওর কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে গেছে। সবাই বলে, বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে বাহান্ন ঘা।

একটা রিকসা ডেকে দীপা বলল, চল্, আমার সঙ্গে। পুলিশ তোমাদের কথা শুনবে না ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাক বলেই পুলিশ তোমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। পুলিশের কাছে নালিশ জানাবার আমার যেমন অধিকার আছে, তোমারও সেইরকম অধিকার আছে।

থানা থেকে বেরিয়ে এসে চামেলি বলল, তুমি আমার সঙ্গে ছিলে বলে বড়বাবু সব কথা শুনল। আমি একলা এলে পাত্তাই দিত না।

দীপা বলল, একদিন তুমি একলা এসো। যদি পাত্তা না দেয়, আরো ওপর মহলে যাবো। খবরের কাগজে চিঠি লিখবে।

চামেলি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, হা কপাল! আমি কি লেখাপড়া জানি!

দীপা বলল, তোমার মেয়ে শিখছে। তাকে দিয়ে লেখাবে!

চামেলি হঠাৎ দীপার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ওগো দিদি, তোমরা আমাদের জন্য এত করছ, একটা ব্যবস্থা করে দাও না, আমি এ পাড়া ছেড়ে চলে যাই। এ লাইনে আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে!

দীপা বলল, দেখ, সে সাধ্য আমাদের নেই। আমাদের ছোট্ট প্রতিষ্ঠান, তোমাদের রাখব কোথায়, কী কাজ দেব? সে অনেক টাকার ব্যাপার। আমরা শুধু চেষ্টা করছি, তোমাদের যথাসম্ভব স্বাস্থ্যের নিয়ম শেখাতে, আর তোমাদের ওপর যাতে কেউ অন্যায় অত্যাচার না করে সেটুকু দেখা। ভাল কথা, আমরা ছেলেমেয়েদের দিয়ে একটা নাটক করাচ্ছি। তোমার মেয়ে পার্ট করবে, তোমার আপত্তি নেই তো?

এক বছরের মধ্যে চাঁদনি দিব্যি বাংলা পড়তে-লিখতে শিখে গেছে। কোথায় যেন দলবেঁধে নাটকও করে এল। এখন তার আর সেই থমথমে ভাবটা নেই। ইস্কুলে কী কী পড়া হয়, তার গল্প শোনায় মাকে। কোনো একজন বড় দিদিমণি এসে বলে গেছে, একদিন সবাইকে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে নিয়ে যাবে। এ বাড়িরই একটা ছেলে হারু, সে ইংলিশ কবিতা মুখস্থ বলতে পারে।

হোল নাইটের বাবুরা চলে গেলেই সকালবেলা চাঁদনিকে নিজের ঘরে ডেকে আনে চামেলি। তাকে বই খুলে পড়তে বলে তার সামনে। চাঁদনি যখন জোরে জোরে পড়ে, তখন কেন যেন চোখে জল এসে যায় চামেলির। চাঁদনি কি উদ্ধার পাবে এখান থেকে? কে উদ্ধার করবে? চাঁদনি যে এখনো একবারও স্বপ্নপরীকে দেখেনি ঘুমের মধ্যে। এ সব বাড়িতে স্বপ্নেও ওরা আসে না?

দীপা একদিন বলল, শোনো চামেলি, এই শনিবার সকাল দশটা থেকে শিশির মঞ্চে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা যে-যার জীবনের কথা বলবে। একেবারে সত্যি কথা। তোমাকে কিন্তু যেতে হবে শুনতে। তুমি ওদের থিয়েটার দেখতে যাওনি।

চামেলি বলল, আমার যে ও সব জায়গায় যেতে লজ্জা করে। যদি লোকে চিনে ফেলে? চাঁদনির মা কে, তা না হয় লোকে না-ই জানল!

দীপা বলল, এসব কথা লুকিয়ে রাখা যায়? লুকোবার চেষ্টার মধ্যেই দৈন্য ফুটে ওঠে। তুমি কি ইচ্ছে করে যৌনকর্মী হয়েছ? এই সমাজ তোমাকে ওই দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারপর সমাজ তোমাদের দিকে চোখ বুজে থাকলেও তোমরা ছেড়ে দেবে কেন? বাঁচার জন্য তোমরা এই জীবিকা নিয়েছ, এর চেয়েও অনেক খারাপ জীবিকা সভ্যসমাজের অনেকে নেয়।

দশ বছর, এগারো বছর, বারো বছরের সব ছেলেমেয়ে, মঞ্চে এসে কিছু না-কিছু বলে যাচ্ছে। কেউ গান গাইছে, কেউ শোনাচ্ছে ছড়া। দু একজন কিছুই বলতে না পেরে লজ্জায় পালিয়ে যাচ্ছে। চাঁদনিকে আজ শাড়ি পরিয়ে এনেছে চামেলি, তাকে দেখাচ্ছে কিশোরীর মতন।

মঞ্চে চাঁদনির কথা শুনে চামেলি হতবাক। কোনো দ্বিধা নেই, আড়ষ্টতা নেই। এমন পরিষ্কার বাংলা বলতে সে শিখল কবে?

চাঁদনি বলল, আমার নাম চাঁদনী সাউ। আমার বাবা নেই, মা আছে। আমার বাবার কথা খানিকটা খানিকটা মনে আছে। বাবা বাড়ির মধ্যে খুব ভাল লোক ছিলেন, বাড়ির বাইরে খারাপ লোক ছিলেন। খারাপ লোকদের সঙ্গে মিশতেন। তারাই একদিন বাবাকে মেরে ফেলেন। আমার মা আমার বাবার বউ ছিল, কিন্তু সে কথা কেউ মানে না। জ্যাঠামশাইরা আমাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার মা এখন একজন বারবনিতা। দীপামাসিরা অবশ্য বারবনিতা বলেন না, বলেন যৌনকর্মী। প্রতিদিন তিনজন কি চারজন পুরুষ আসে আমার মায়ের কাছে। যে দিন মোটে একজন কিংবা কেউই আসে না, সে দিন মাকে সবাই বকে। বাড়িউলি মাসি বলে, লোক না এলে খাবি কী। হরিয়া নামে একজন লোক আমাকে বলে, তুই তাড়াতাড়ি শুরু কর, মায়ের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাবি। হারু আমাকে বলেছে, ছেলেরাও বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। মেয়েরা পারে না। বারবনিতার মেয়ে বারবনিতাই হয়। সমাজের সবাই আমাদের ঘেন্না করে, আমরা যেন নর্দমার প্রাণী...।

চাঁদনির কথা শুনতে শুনতে চামেলির মতন আরও অনেকের চোখ সজল হয়ে এল।

শেষের দিকে, তখনও গানবাজনা চলছে, দীপা পেছন দিকের সিট থেকে চামেলিকে ডেকে নিয়ে গেল একেবারে সামনে। একজন বয়স্কা মহিলা প্রথম সারিতে বসে আছেন, ভারী চেহারা, মাথার অধিকাংশ চুলই সাদা, গায়ের রং একেবারে সোনার মতন, চক্ষু দুটি ভারী স্নিগ্ধ, মায়াময়।

দীপা আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, চামেলি, ইনি হচ্ছেন মিসেস সোম। ইন্দ্রাণী সোম, খুব নামকরা বাড়ির মেয়ে, বিয়েও হয়েছে এক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে, এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দেশের অনেক কাজ করেন। ইনি চাঁদনির কথা শুনে খুব অভিভূত হয়েছেন। এখন থেকে ইনি চাঁদনির লেখাপড়ার সব ভার নিতে চান। হস্টেলে থাকার খরচ দেবেন। তোমার আপত্তি নেই তো?

ইন্দ্রাণী সোম স্মিতভাবে হাসলেন।

চামেলি কথা বলতে পারছে না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার খালি মনে হচ্ছে, স্বপ্নপরীদেরও বয়েস বাড়ে, চামড়া কুঁচকে যায়, চুল পাকে?

মনের অসুখ

এত রাত হবার কথা ছিল না, পর পর দুটো লেভেল ক্রশিঙে-এই অনেক দেরি হয়ে গেল। পেছনের বাঁদিকের চাকাটা ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছিল ধানবাদের কাছে, দেবকুমার নিজেই জ্যাক নামিয়ে চাকা বদলে ফেলেছেন। এখন একটু একটু ভয় হচ্ছে, আবার আর একটা চাকা যদি খারাপ হয়ে যায়—সেটা বদলাবার তো কোনো উপায় নেই। অবশ্য, এক রাত্তিরে দুটো চাকা খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সাড়ে বারোটার মধ্যে দুর্গাপুর পৌঁছে যেতে পারবেন, দেবকুমার ভাবলেন। সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে পৌঁছনোর কথা ছিল। বাড়িতে ওরা একটু ভাববে। নীপার বুকের ব্যথাটা আজ আবার একটু বেড়েছে, তার ওপর উদ্বেগ হলে আরো বাড়তে পারে। অবশ্য নীপার এতক্ষণ জেগে থাকার কথা নয়, তার ওষুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্রোমাইড মেশানো থাকে—দশটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু যদি ওষুধ খেতে ভুলে যায় নীপা? দেবকুমারই তাকে প্রত্যেকবার মনে করিয়ে দেন। দুপুরে ফ্যাক্টরি থেকে টেলিফোন করেন, খাবার পরের ওষুধটা খেয়েছ? যাও, আমি টেলিফোন ধরে আছি, ওষুধ খেয়ে এসে আমাকে বলবে। না, কোনো কথা নয়, আগে ওষুধটা খেয়ে এসো—

বুক ধড়ফড়ানি খুব শক্ত অসুখ নয়। অন্তত ডজনখানেক ডাক্তার বলেছে, নীপার হার্টের অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। দু মাস আগেও কার্ডিওগ্রাম করানো হয়েছে। আর নীপার বয়েসও তো মাত্র সাঁইত্রিশ। অসুখটা নীপার শরীরের নয়, মনের—এই মন মানে হৃৎপিণ্ড নয়। বুক ধড়ফড় করতে করতে এমন কষ্ট পায় নীপা যে গোটা বিছানায় ছটফট করে, অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ কষ্ট পায় শরীর। নীপার মনেও তো কষ্ট থাকার কোনো কথা নয়। কেউ কেউ বলেছেন, পেটে খুব বেশি উইন্ড হলে বুকে এমন ধাক্কা মারে। কিন্তু এ কী ধরনের বুনো হাওয়া?

দেরি হবার কথা ছিল না দেবকুমারের। সাড়ে সাতটার মধ্যেও বেরুতে পারলে এতক্ষণ দুর্গাপুরে পৌঁছে যেতেন কিন্তু সিন্ড্রিতে ক্যাপ্টেন চোপরা একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব, ঠিক সন্ধে সাতটার সময় ডিনার খান। সাতটা বেজে গেলে ডিনার না বলে বলে কুইক সাপার। দেবকুমার এ সব জানবেন কী করে? কথা বলতে বলতে সাতটা বেজে গিয়েছিল, চোপরার জন্য তখন ডিনারের টেবল সাজানো হয়ে গেছে, তিনি জোর জবরদস্তি করে দেবকুমারকেও ডিনার খাইয়ে ছাড়লেন। ডিনারের পর তিনি আবার ব্রান্ডির বোতল খুলে বসে ছিলেন, দেবকুমার সেটা খেতে আর রাজি হন নি। চোপরা বলেছিলেন, ভাইয়া, দু এক পেগ ব্রান্ডি খেলে আরো ভালভাবে গাড়ি চালানো যায়। অ্যাট লিস্ট ওয়ান ফর দা রোড তো কমসে কম...। এ সব রাস্তা দেবকুমারের নখদর্পণে, গাড়ি চালাবার জন্য ব্রান্ডি খাওয়া-না খাওয়া কিছু আসে যায় না—কিন্তু অ্যালকহল তাঁর সহ্য হয় না। একটু খেলেই গা দিয়ে র‍্যাশ বেরোয়। ট্রেনিং-এর সময় যখন রাশিয়ায় ছিলেন, তখন সেই প্রচণ্ড শীতেও রুশ বন্ধুদের অনুরোধে ভডকা খেতে পারেননি।

আসানসোলের খানিক আগে আবার একটা লেভেল ক্রশিং বন্ধ। এবার সত্যিই দেবকুমারের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একটা মালগাড়ি যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কখন এনার আবার চলার মর্জি হবে তার ঠিক নেই। রাগ করেও কোনো লাভ নেই, চোয়াল দুটো শুধু শক্ত হয়ে রইল, ইঞ্জিন বন্ধ করে দেবকুমার একটা সিগারেট ধরালেন।

রাউরকেলাতে নীপার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। দুর্গাপুরে আসার পর থেকেই বুকের ব্যথাটা বেড়েছে। দুটি সন্তানের জননী, কিন্তু কিছুদিন আগেও নীপা কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে কী সুন্দর ব্যাডমিন্টন খেলত। লোকজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে ভালোবাসত, রান্না-বান্না করত নিজেই। এখন নীপার কোনোরকম কাজ করা বারণ, সুন্দর পোর্সিলিনের পুতুলের মতন খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখতে হয় তাকে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ও যাতে নীপা তাড়াতাড়ি করে না ফেলে, তাই দেবকুমার নিজে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে আস্তে আস্তে নামেন। দেবকুমার ফ্যাক্টরিতে যাবার সময় নীপা বারান্দার ইজিচেয়ারে শাল মুড়ি দিয়ে বসে থাকে—মুখে একটা শীর্ণ হাসি—দূর থেকে এখনও নীপাকে ভারি সুন্দর দেখায়। অসুখটা মনের, কিন্তু কষ্ট হয় শরীরের।

মালগাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে। কতটা লম্বা কে জানে। অনেক সময় মালগাড়িগুলোকে এক মাইল দেড় মাইল লম্বা মনে হয়। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে দেবকুমারের চাবিতে হাত দিলেন।

—বাবু! বাবু!

দেবকুমার চমকে তাকালেন। অন্ধকার ভেদ করে কারা এসেছে গাড়ির কাছে। প্রথমে দেখতে পেলেন একটি স্ত্রীলোককে। মনে হয় কুলিরমণী। উসকোখুসকো চুল, চোখে মুখে দারুণ আতঙ্কের ছাপ, বোধহয় ছুটতে ছুটতে এসেছে, তাই হাঁপাচ্ছে।

—বাবু, আমার আদমির ভারী অসুখ—হাসপাতালে...বাবু মেহেরবানি করে...মুরীদ...বাবু, আপনার পায়ে ধরছি...

তার আদমি কোথায়, এ কথা জিজ্ঞেস করতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হল আর একটা লোক, তার কাঁধে কম্বল জড়ানো একটা মানুষ। লোকটার পা দুখানা ঝুলছে লটপট করে, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা প্রৌঢ় মুখ, ঠোঁটের পাশে গ্যাঁজলা লেগে আছে, এতক্ষণে মরে গেছে কি না ঠিক নেই। এ সব জায়গায় হাসপাতালে অনেক সময় রোগী মরে যাবার পর পৌঁছয়।

মালগাড়িটা পার হয়ে গেছে, গেট খুলে যাচ্ছে। দেবকুমার ইচ্ছে করলে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যেতে পারতেন। একটা ট্রাক পেছন থেকে হর্ন দিচ্ছে। জি টি রোডে রাত্তিরবেলা কতরকম বিপদ হয়, কে না জানে। অচেনা লোককে গাড়িতে তোলার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকটির গলার আওয়াজে এমন একটা আর্ত সুর ছিল যে দেবকুমারের বুকের ভেতরে সেটা ঝনঝন করে বাজতে লাগল। তা ছাড়া মুমূর্ষু লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখটা না দেখে ফেললেও কথা ছিল। মাইল সাতেক দূরে আসানসোল—সেখানে হাসপাতাল আছে। বিশেষ কিছু সময় পেলেন না, ঝট করে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে দেবকুমার বললেন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো।

লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে গিয়েই দেবকুমার গাড়ি থামালেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, দেখি ওর হাত দেখি।

দেবকুমার দেখে নিতে চান, লোকটা এখনো বেঁচে আছে কি না। শুধু শুধু একটা মড়া বয়ে নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। কম্বলে জড়ামড়ি হওয়া অবস্থা থেকে লোকটার হাত খুঁজে বার করতে বেশ সময় লাগল, দেবকুমার কবজি ধরে বুঝলেন, এখনো নাড়ী আছে। কতটা দুর্বল তা বুঝতে পারলেন না, তবে বেঁচে আছে ঠিকই। ঠিকভাবে বসার ক্ষমতা নেই, দুমড়ে মুচড়ে কোনো রকমে পড়ে আছে, নড়বড়ে ঘাড়টা স্ত্রীলোকটার গায়ে হেলানো।

—কী হয়েছে কি?

—দিনভর টাট্টি আর বমি, ঘণ্টা দুঘণ্টা হল একদম নেতিয়ে গেল।

—কবার গেছে?

—তিশ-চল্লিশ দফে তো।

—তিরিশ-চল্লিশবার? ডাক্তার দেখাওনি? এখানে ডাক্তার নেই?

—ডাক্তারবাবু ছুটিতে গেছেন।

কথা বলছে স্ত্রীলোকটিই। বাকি লোকটি চুপ করে আড়ষ্টভাবে বসে আছে। এদের জীবনে ঘটনা বেশি নেই, তাই মৃত্যুর মতন ঘটনার প্রতিক্রিয়াও সহজে বোঝা যায় না। লোকটার কলেরা হয়েছে, এখন বাঁচার সম্ভাবনা আর নেই-ই বলতে গেলে। কিছুদিন আগেও বাড়ির খাটিয়ায় শুয়েই মরত—সবাই বলত ভবিতব্য, এখন হাসপাতালে পাঠাবার কথা ভাবে।

—এ তোমার স্বামী?

—হ্যাঁ বাবু।

—আর এই ছেলেটি? তোমার ছেলে?

—না, এ আমার ভাই আছে। আমার দুটো মেয়ে কয়লাখনিতে কাজ করে। কালা পাহাড়িতে—

দেবকুমার একটু অবাক না হয়ে পারলেন না। ওদের সংসার আর তাঁর সংসার ঠিক একরকম। তাঁরও দুটি মেয়ে শান্তিনিকেতনে থাকে। দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতন এত কাছে, যখন তখন দেখতে যাবার কোনো অসুবিধে নেই—আর শনি-রবিবার তারা চলে আসে মা-কে দেখার জন্য। নীপার ভাই তিমিরও কিছুদিন ধরে দুর্গাপুরে এসে আছে। বি.এস.সি পাস করতে পারেনি—এসেছে চাকরির চেষ্টায়—দেবকুমার এখনো তাকে কোথাও ঢোকাতে পারেননি। তিমিরের যে রকম তাস খেলার নেশা ধরেছে এই বয়েসে, চাকরিতে ঢুকলেও বিশেষ উন্নতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। বাড়ির বিশেষ কাজ হয় না তাকে দিয়ে।

তাঁর বাড়িতেও নীপার অসুখ আর এই স্ত্রীলোকটির স্বামীর অসুখ। মনের অসুখ নয়, শরীরের, মৃত্যু খুব কাছাকাছি। ওদের তো কখনো মনের অসুখ হয় না! স্বামীকে হাসপাতালে দিয়ে স্ত্রীলোকটি সারারাত বসে থাকবে হাসপাতালের গেটে, ভোরের আগেই বোধ হয় মৃত্যুর খবর পেয়ে যাবে—তারপর...। দেবকুমার ও সব জটিল চিন্তার মধ্যে যেতে চান না।

বাড়ি পৌঁছুতে আর একটু দেরি হয়ে যাবে, তা হোক। স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছিল, অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু সে পাক। হাসপাতালে এদের চিকিৎসা করাতে কত টাকাপয়সা লাগে দেবকুমার তা কিছুই জানেন না। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যেভাবে মানুষ হয়েছেন, তাতে এরা খুব দূরের মানুষ। আগে এদের জন্মমৃত্যু সম্পর্কে দেবকুমার কখনো গাঢ়ভাবে চিন্তা করেননি। কিন্তু আজ এই উদ্‌ভ্রান্ত স্ত্রীলোকটির স্বামী তার গাড়িতে উঠেছে, একে বাঁচাবার সবরকম চেষ্টার জন্য দেবকুমার একটা দায়িত্ব অনুভব করলেন। মনে মনে হিসেব করলেন,

তার ব্যাগে এখনও পঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে, পেট্রোল যা আছে, তাতেই চলে যাবে, আর কিনতে হবে না। হাসপাতালে পৌঁছে ওদের গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিলেই হবে।

নীপার অসুখ আর সারবে না—এ কথা দেবকুমার যেমন জেনে গেছেন। কিন্তু একদিনের জন্যও চিকিৎসার ত্রুটি তো করেননি দেবকুমার। আসলে চিকিৎসাটাই সান্ত্বনা—। নীপা একদিন রাত্রে বলেছিল, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না—শুধু শুধু তোমাকে আমি...। দেবকুমার বলেছিলেন, তুমি মরে গেলে আমিই বা আর বাঁচব কী করে? হেরে গিয়ে মানুষ আর কতদিন বাঁচতে পারে? নীপা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কার কাছে হেরে গিয়ে? দেবকুমার উত্তর দিয়েছিলেন তোমার মনের কাছে—

অসুস্থ লোকটা একটা গোঙানি দিয়ে নড়েচড়ে উঠল। জ্ঞান ফিরছে যখন, আশার কথা। রীতিমত যন্ত্রণায় আবার কুঁকিয়ে উঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল লোকটা। স্ত্রীলোকটি ডাকল, বাবু বাবু!

ঘাড় না ঘুরিয়ে দেবকুমার বললেন কী? এই তো এসে গেছি, আর দেরি নেই—

—টাট্টি লেগেছে।

—অ্যাঁ?

দেবকুমার গাড়ি নষ্ট করতে চান না। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নামতে পারবে? ধরে ধরে নামাতে পারবে? স্ত্রীলোকটি জানাল, পারব।

পেছনের ট্রাকটাকে পাশ দিয়ে দেবকুমার রাস্তার ধারে গাড়ি থামালেন। অসুস্থ লোকটি এক ঝটকায় কম্বল সরিয়ে ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসল। হাতে তার ডাণ্ডা।

দেবকুমার বেশি অবাক হবারও সময় পেলেন না। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে কী যেন বলতে গেলেন। প্রথম আঘাতটা হাতের ওপর লাগল। দেবকুমার চেঁচিয়ে বললেন, না না দয়া করো। দয়া করো আমাকে—। দ্বিতীয় আঘাত সরাসরি মাথার মাঝখানে পড়তেই দেবকুমার সিট থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন হাওয়া, বুকের মধ্যে আগুনের হলকা চোখের ওপর গরম চটচটে রক্ত, চেঁচিয়ে বলতে গেলেন, আমাকে দয়া করো, আমাকে বাঁচাও—আর একটা চোট খেয়েই টলে কাত হয়ে পড়লেন। গলায় সাঁড়াশির মতন একটা হাত। স্ত্রীলোকটিই প্রথমে দেবকুমারের কবজি থেকে ঘড়ি খুলে নিল। স্টিয়ারিঙের ওপর থেকে মাথাটা ঝুলে পড়তেই কী ভেবে যেন কম্বল গায়ে লোকটি অনাবশ্যকভাবে আর এক ঘা ডাণ্ডা বসিয়ে দিল দেবকুমারের ঘাড়ে।

দেবকুমার মারা যাননি। ভোরের আগেই একটা পুলিশের গাড়ি তাঁকে দেখতে পায়। যে হাসপাতালে দেবকুমার ওদের নিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন, সেখানেই তাঁকে ভর্তি করা হল। তাঁর পকেটে কোনো রকম কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি বলে, বাড়িতে খবর-পাঠাতে পুরো একদিন দেরি হয়ে যায়। তা হোক, তবু প্রথম চোখ মেলে দেবকুমার নীপাকেই দেখেছিলেন।

সেই ঘটনার পর কেটে গেছে দেড় বছর। দেবকুমারের শরীরে আর কোনো ক্ষত নেই, বাঁ হাতের আঙুলগুলো শুধু বেঁকাতে পারেন না। চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে, সিউড়িতে নিজেদের বাড়িটাই একটু সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে সেখানে এসে আছেন। দেবকুমারের মাথায় একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতে চান না, বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকেন ইজিচেয়ারে। নীপা এখন অনেকটা সুস্থ, অনেকদিন তার বুকের ব্যথাটা হয়নি, এখন নীপা নিজের হাতে সব কাজ-টাজ করে, দেবকুমারের সেবা করে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, দেবকুমারকে নিয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছে নীপা। দেবকুমারের সেই আগের মতনই দীর্ঘ উন্নত-সুদর্শন চেহারা, বিশাল দুটি চোখ—কিন্তু মুখখানা বড় বিমর্ষ ম্লান—নীপা নানারকম মজার কথা বলে দেবকুমারের মন ভাল রাখার চেষ্টা করছে।

সে দিন রাত্রির সেই ঘটনাটা দেবকুমার কারুকে বলেননি। ডাক্তারকে পুলিশকে এমনকি নীপাকেও না। শুধু বলেছিলেন, রাস্তায় হঠাৎ ডাকাতরা আমার গাড়ি আটকে ছিল, আমার আর কিছু মনে নেই।

অথচ দেবকুমারের সবই মনে আছে। সেই তিনটি মুখ এখনো তার চোখে ভাসে। মাথার মধ্যে অন্য অনেক কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে অবশ্য, অফিসে কিছুদিনের জন্য জয়েন করে নিজেই বুঝেছিলেন, আর তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়—সব কিছু গুলিয়ে গেছে, নিজে একটু আগে কী বলেছেন, তাই মনে থাকে না। কিন্তু সেই তিনটি মুখ, সে দিনের রাত্রের ঘটনা একটুও ভোলেননি।

তবু নীপাকে বলেন, আমাকে একটু গাড়িতে করে ওই আসানসোলের কাছে জি টি রোডে ঘুরিয়ে আনবে? ওখানে গিয়ে যদি সব কথা মনে পড়ে—। নীপা দুবার নিয়ে গিয়েছিল, দিনের বেলা অবশ্য। দেবকুমার সেখানেও কিছু বলেননি নীপাকে, রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পয়সা বিলিয়েছেন। নীপা কিছুই বুঝতে পারে না।

দেবকুমার এখন মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখেন। কোনো কোনো দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, দেবকুমার বিছানা থেকে উঠে এক গ্লাস জল খান, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। নীপা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর ঘুম আসতে চায় না দেবকুমারের, তিনি তখন ডায়েরি লিখতে বসেন—সে ডায়েরি নীপাকেও দেখাননি।

তাঁর ডায়েরির দুটি অংশ : "সেই লোকটির কোনো অসুখ ছিল না, এ কথা ভাবা ভুল। কম্বল গায়ে সেই লোকটি, তাঁর স্ত্রী, স্ত্রীর ভাই—ওরাও মানসিক রোগী। ওদের চোখের দৃষ্টির কথা ভাবলে এখন বুঝতে পারি—তা সুস্থ মানুষের দৃষ্টি নয়। সাধারণ ডাকাত ওরা নয়। ওদের অসুখ এখন এমন একটা জায়গায় এসেছে, সেখানে ওরা উপকারীকেও আঘাত করতে চায়। গোটা সমাজের অসুখ না সারলে, ওরাও সারবে না। ওরা সুস্থ হয়ে না উঠলে, সুস্থ হবার আশা নেই।"

আর একটি অংশ : "নীপার মনের অসুখ সম্পর্কে আগে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। এখন দেখছি আমার নিজেরই মনের অসুখ। হ্যাঁ, অসুখটা আমার মনের, মস্তিষ্কের নয়। আমার স্মৃতিভ্রংশ হলেও পুরোপুরি হয়নি কেন? আমি প্রায় একটা স্বপ্ন দেখি। সে দিন রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায় এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম—তারপর প্রায়ই দেখতে পাই।—কয়েকদিন অন্তর আমি দেখি, আমার হঠাৎ দারুণ অসুখ হয়েছে মাঝরাত্রে, কিছুতেই কোনো ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না,—শহরের সব ডাক্তার এখন ছুটিতে—আমার গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, নীপা আর তিমির আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তার সামনে, একটা গাড়ি পেলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। নীপার চোখে মুখে দারুণ ত্রাস, সে যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তাড়াতে চাইছে প্রাণপণে। অবিকল সেই স্ত্রীলোকটির মতন, কিন্তু অভিনয়। নীপা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই মৃত্যু সম্পর্কে তার খাঁটি ভয়। আমার অসহ্য কষ্ট, কিন্তু আমার অসুখের জন্য নীপার এই ব্যাকুলতা দেখে একটু আরামও পাচ্ছি।...দূর থেকে একটা মোটরগাড়ি আসছে হেড লাইট জ্বালিয়ে, নীপা হাত তুলে ব্যাকুলভাবে চিৎকার করে গাড়িটা থামাতে চাইছে...স্বপ্নের মধ্যে এই জায়গাটায় আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই, ঘামে আমার শরীর ভিজে যায়, বুকের মধ্যে ধকধক করে আর বার বার মনে হয়, যদি গাড়িটা না থামে; যদি গাড়িটা আমাদের না নিতে চায়? এই মাঝরাতে, যদি আমাদের ডাকাত মনে করে?"

শূন্য বাড়ি

একজন আমাকে বলল, ওই যে ওইটা অনন্ত সরকারের বাড়ি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন অনন্ত সরকার?'

একটি বৃদ্ধ জানালেন, ডা: অনন্ত সরকারের নাম শোনেন নাই? মস্তবড় ডাক্তার, কলকাতায় ওনার ডিসপেনসারি ছিল।

এই গ্রামের একজন ডাক্তারের কলকাতায় গিয়ে ডিসপেনসারি খোলা নিশ্চয়ই একটা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। কিন্তু আমি কলকাতার নাগরিক হলেও তো কলকাতার সব ডাক্তারকে চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ডা: অনন্ত সরকারের নাম শুনিনি।

গ্রামের নাম মামুদপুর। মাত্র পাঁচদিন আগেও এখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা ছিল। এখন তারা পালিয়েছে খুলনার দিকে। লড়াই এখনও শেষ হয়নি। গতকালও এখান থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে।

রাস্তার দুধারে বাঙ্কার আর ফক্স হোল, এখনো সেখানে যুদ্ধের চিহ্ন রয়েছে, বাড়ির দেয়ালে গুলির দাগ, পথের ওপর শুকনো রক্ত। পালাবার আগে কয়েকটা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানিরা, কাঠের তক্তা ফেলে কোনোরকমে কাজ চালাবার মত মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। বিজয়ী মুক্তিফৌজদের সঙ্গে আমরা কয়েকজন সেখানে ঢুকলাম। আট-ন মাস বাদে সেই গ্রামের রাস্তা দিয়ে সাধারণ পোশাক পরা মানুষ স্বাভাবিকভাবে হাঁটল।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। অনেক নির্যাতন, অনেক মৃত্যুর কাহিনী। স্বাধীনতার জন্য আনন্দ, প্রিয়জনকে হারাবার দুঃখ। এর মধ্যে একজন আমাকে ডাক্তার অনন্ত সরকারের বাড়ির কথা উল্লেখ করলেন। গ্রামের মানুষজনের কথা শুনে মনে হল ডাক্তারটি এ গ্রামে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে বলল, চলুন, আপনাদের ওই বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, ওখানে কী আছে? ছেলেটি হাত উলটে বলল, কিছু নেই!

আমি ভয় পাচ্ছিলাম, গিয়ে হয়তো কোনো মৃতদেহ দেখতে হবে, কিংবা অত্যাচারের জ্বলন্ত চিহ্ন। দেখতে দেখতে মন অবশ হয়ে আসে, আর দেখতে ইচ্ছে করে না। চতুর্দিকে এত মৃত্যু, তবু একটি মৃতদেহ দেখলেও আমি শিউরে উঠি। কিন্তু ছেলেটি বলল, কিছু নেই। যে বাড়িতে কিছুই নেই সেখানেই বা দেখার কী আছে? এই দুঃসহ কয়েকমাসে অনেক মুসলমান মরেছে, অনেক হিন্দু মরেছে—হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি মরেছে ও নির্যাতিত হয়েছে তা-ও ঠিক, তবু আলাদাভাবে কোনো হিন্দুর বাড়ি দেখতে যাবার কোনো বাসনা আমার মনে জাগে না। এই মুহূর্তে আলাদাভাবে হিন্দু মুসলমান আর কিছু নেই, সবাই বাঙালি।

তবু ছেলেটি বলল, চলুন, বাড়িটা দেখবেন না?

অনিচ্ছার সঙ্গে আমি বললাম, চলো!

ভাগ্যিস গিয়েছিলাম!

আমার সঙ্গী ছেলেটির নাম আনোয়ার। ওরা পালিয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে, পরশুদিন ফিরেছে। ওর দাদা মুক্তিবাহিনীর সৈনিক। ওর জ্যাঠামশায়কে মেরে ফেলেছে রাজাকাররা! সে সব কাহিনী আগেই শুনেছি। এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে বলেই ছেলেটির চোখ-মুখ এমন জ্বল জ্বল করছে—যে রকম আমি আগে আর অন্য কোনো এগারো বছরের ছেলের মুখে দেখিনি। গ্রামের সব বাড়িতেই একজন দুজন করে মানুষ ফিরেছে। অনেকে পোড়া ঘরে আবার বেড়া দিচ্ছে, কেউ কেউ সাফ-সুতরো করছে ভাঙা বাড়ি। কিন্তু, আনোয়ার আমাকে বলল, ডাক্তারবাবুর বাড়ির আর কেউ ফিরবে না!

সে বাড়ির চৌহদ্দিতে আমি তখন সদ্য পা দিয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ফিরবে না কেন?

আনোয়ার ক্ষুণ্নভাবে বলল, ওনার কি আর কেউ আছেন?

—নেই?

—মনে তো হয় না।

গেট পেরিয়ে ঢুকলে প্রথমেই একটা ছোট পুকুর। তার পরিষ্কার জল টলটল করছে। একটা ফড়িং জলের ওপর ভেসে থাকা পানার ওপর একবার করে বসতে যাচ্ছে আর উঠে আসছে।

সেই পুকুরের পাড় দিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি ঢোকার সদর দরজা। পুরানো অভ্যাসবশত সেই সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটু ইতস্তত করি। পরের বাড়িতে কি বিনা অনুমতিতে ঢোকা যায়? পরক্ষণেই মনে পড়ল, আনোয়ার জানিয়েছে, এ বাড়িতে কেউ নেই, কিছু নেই।

এ গ্রামে পাকাবাড়ি খুব বেশি নেই, তার মধ্যে এ বাড়িটা বেশ বড়ই বলতে হবে। অনেক দূর থেকে দেখা যায়। চারদিকে দেওয়াল ঘেরা। ভেতরে মস্ত বড় উঠোন, একপাশে বাগান, একপাশে ধানের গোলা, আরেক পাশ টিউবওয়েল আর একপাশে রান্নাঘর। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বাড়িতেই রান্নাঘর মূল বাড়ি থেকে একটু দূরেই হয়।

টিউবওয়েলটা এখনও সচল, টিপে দেখলাম জল পড়ে। বাগানে এখনও কিছু ফুল ফুটে আছে। গাঁদা ফুল অযত্নেও ফোটে। কিন্তু বাড়িতে একটাও মানুষ নেই। সারা বাড়িটা অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ। জীবনে কখনো ফাঁকা বাড়িতে ঢুকিনি তা নয়, কিন্তু এ বাড়িটা অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ মনে হল। একটা চড়াই বা শালিকও নেই। কাকের ডাকও শুনিনি। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে এই বাড়িটা। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

—এইখানে ডাক্তারবাবুকে মেরেছিল!

—কি?

আনোয়ারের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। উঠোন থেকে সবে মাত্র বাড়ির সিঁড়িতে ওঠার জন্য পা দিয়েছি, এমন সময় আনোয়ার বলল, ওই কথাটা। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলাম।

আনোয়ার সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বলল, ওইখানে ডাক্তারবাবুকে মেরেছিল। ঠিক যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন।

—কে মেরেছিল?

—খান সেনারা।

—কেন?

এই প্রশ্নটা করেই বুঝলাম, বোকার মতন প্রশ্ন করছি। কেন মেরেছে তার কারণ ওইটুকু ছেলে আনোয়ার কী করে জানবে? এত লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেন মেরেছে? কোনো যুক্তিই তো নেই।

ডাঃ অনন্ত সরকারের ভাগ্য ভাল ছিল না। গ্রাম ছেড়ে শহরে ডিসপেনসারি খুলে বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। হ্যারিসন রোড অর্থাৎ বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোডে ছিল ওঁর ডিসপেনসারি। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু একবার কলকাতার দাঙ্গায় ওঁর দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। প্রাণে বেঁচে ছিলেন কোনোক্রমে, আবার ফিরে এলেন দেশের বাড়িতে। গ্রামের মুসলমানরা তাঁকে ভালবাসত খুব, ওই গ্রামে তিনিই একমাত্র অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। গ্রামের মানুষ ভিড় করে এসে ওঁকে জানিয়েছিল, ওঁর যাতে কোনো ক্ষতি কেউ না করতে পারে, তারা তা দেখবে, ডাক্তারবাবু যেন গ্রাম ছেড়ে না যান। ডাক্তারবাবু কথা দিয়েছিলেন, তিনি এ গ্রাম ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। এমনকি যশোরের সরকারি হাসপাতালের ভার নেবার জন্য যখন তাঁকে পাকিস্তান সরকার ডেকেছিলেন তখনও তিনি বলেছিলেন, না, আমি গ্রামেই থাকব, শহরে যাব না।

ডাঃ অনন্ত সরকার বিয়ে করেননি। তাঁর ছোট দুভাই বিবাহিত এবং এ বাড়িতেই থাকত। মেজ ভাইয়ের বৌ আগেই মারা গেল—মেজো ভাই দাদার কম্পাউন্ডারের কাজ করতেন।

ছোট ভাই ইস্কুল মাস্টার, তার বিয়ে হয়েছিল মাত্র দেড় বছর আগে। আনোয়ার আমাকে বলল, ছোট বৌদিদির নাম ছিল নিরুপমা—কী সোন্দর দ্যাখতে ছিল তেনারে।

ডাক্তারবাবুকে কেন খান সেনারা মারল, আনোয়ার তা-ও জানে। আমাকে সে গল্প শোনাবেই। আমি মৃত্যুর কাহিনী আর শুনতে চাই না—তবু আনোয়ার ছাড়বে না।

খান সেনারা যখন এ গ্রামে আস্তানা গেড়েছিল, তখন গ্রামের লোক ডাক্তারবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিল লুকিয়ে থাকতে। চার পাঁচ মাস আগেকার কথা। তার আগে এ গ্রামে বিশেষ কোনো গণ্ডগোল হয়নি—এখানে মুসলিম লিগের চিহ্ন নেই, আওয়ামি লিগেরই একচেটিয়া আধিপত্য। কিন্তু গ্রামের পাশেই নদী। সেই নদীর ওপরে ব্রিজের দুপাশে বসল পাক সেনাদের ঘাঁটি। ততদিনে এ গ্রামেও খবর এসে গেছে যে খান সেনারা হিন্দু আর আওয়ামি লিগের সমর্থকদের দেখলেই মারছে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ডাক্তারবাবুর পক্ষে এখন পালিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়—যেতে হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের ছাউনি পেরিয়ে যেতে হবে—তারা যদি না ছাড়ে? ডাক্তারবাবু লুকিয়ে থাকুন। গ্রামের মুসলমানরা তাঁকে রক্ষা করবে।

এক মাস দেড় মাস লুকিয়ে ছিলেন ডাক্তারবাবু। গ্রামের একটি মানুষও তাঁর কথা জানায়নি। তবু জেনে গেল ওরা, ভিন গ্রামের কোনো রাজাকার হয়তো জানিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারবাবু আশপাশের কয়েকটি গ্রামে চিকিৎসা করতে যেতেন, চিনত তাঁকে অনেকে।

প্রথম যেদিন খান সেনা এল এ বাড়িতে, সেদিন কিন্তু তারা মারতে আসেনি। ডাক্তারবাবুকে খানিকটা সম্মান দেখিয়েই নিয়ে গেল সেনা ছাউনিতে। ততদিনে গ্রামের লোকেরা জেনে গেছে, সেনা ছাউনিতে যারা যায়, তাদের মধ্যে প্রায় কেউই ফেরে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন। একজন কম্যান্ডারের কলেরা হয়েছে তার চিকিৎসা

করতে হবে। ডাক্তারবাবু নাকি পরীক্ষা করে বলেছিলেন, একে এক্ষুনি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে বাঁচানো যাবে না, এখানে এর ঠিক মতন চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়।

তখন একজন সৈন্য ডাক্তারবাবুর গালে এক চড় মেরে বলেছিল, তোর কাছে উপদেশ চাওয়া হয়নি, তোকে যা করতে বলা হয়েছে তাই কর।

ডাক্তারবাবু অসাধ্য সাধন করেছিলেন। দুদিন সেখানে থেকে চিকিৎসা করে কম্যান্ডারকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। সেইজন্য খান সেনারা ডাক্তারবাবুকে মস্তবড় পুরস্কার দিয়েছে, তাঁকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে আসার পর গাঁয়ের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক বলেছিলেন, ডাক্তারবাবু, আপনি এইবেলা পালিয়ে যান। আপনি খান সেনাদের চিকিৎসা করেছেন—এ কথা জানতে পারলে হয়তো মুক্তি যোদ্ধারাই আপনাকে মারবে। তারা ভাববে, আপনি ওদের দালাল। আপনি ওদের সাহায্য করেছেন—কিন্তু তখন ডাক্তারবাবুর পালাবার পথ নেই।

পরদিনই সেনা ছাউনিতে ডাক্তারবাবুর আবার ডাক পড়ল। আরও তিনজন অসুস্থ, তার মধ্যে একজন খান সেনা মুক্তি যোদ্ধাদের বুলেটে আহত। চিকিৎসা না করে ডাক্তারবাবুর উপায় নেই। ইঞ্জেকশান দিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে ফিরে এলেন। সন্ধেবেলাতেই এক গাড়ি খান সেনা এল তাঁর বাড়িতে। ডাক্তারবাবুকে ডাকল। ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরুনো মাত্রই মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হল তাঁকে। তাঁর চিকিৎসায় একজন খান সেনা মারা গেছে—নিশ্চয়ই ওই শয়তান কাফের ডাক্তারটা ইচ্ছে করেই তাকে মেরেছে।

আনোয়ার আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ঠিক যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, ওইখেনটাতেই পড়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। সারারাত ওইখানেই ছিলেন।

আমি আনোয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—বাঁশ বাগানে পালিয়ে ছিলাম। চক্ষে কিছু দেখিনি, গুলির শব্দ শুনেছি।

—ডাক্তারবাবুর বাড়ির অন্য লোকেরা?

—তেনারা ছিলেন আমাদের বাড়িতে। সারারাত ধরে তো খান সেনারা এ বাড়ি লুঠ করল।

সিঁড়ির সেই অংশটা এড়িয়ে ওপরে উঠলাম। সামনেই প্রথম ঘরটিতে বসে ডাক্তারবাবু রোগী দেখতেন। আলমারি, চেয়ার, টেবিল সব লণ্ডভণ্ড। এখনো কয়েকটা ওষুধের শিশি গড়াচ্ছে। যে সালে অনন্ত সরকার ডাক্তারি পাশ করেছিলেন, সেই সালের মেডিক্যাল কলেজের ইউনিয়নের একটা গ্রুপ ফটো এখনো দেওয়ালে ঝুলছে। আনোয়ার আমাকে দেখিয়ে দিল। ডান দিকের কোণে—ওই যে ডাক্তার দাদার ছবি। প্যান্ট-কোট পরা একটি তরুণ, অনেক বছর আগের চেহারা, নিশ্চয়ই ইদানীং ডাক্তারবাবুর চেহারা অনেক বদলে গিয়েছিল।

পাশের ঘরটি ছিল ডাক্তারবাবুর শয়নকক্ষ। ফাটা বালিশের তুলোয় ঘর ভর্তি। ভাঙা গড়গড়া পড়ে আছে দরজার পাশে, ডাক্তারবাবুর তামাক খাবার শখ ছিল।

—তোমাদের বাড়িতে ডাক্তারবাবুর বাড়ির লোকেরা কদিন লুকিয়ে ছিল, আনোয়ার?

—পাঁচ দিন না ছদিন হবে। আমার ঠিক মনে নেই।

—তারপর ওরা গেলেন কোথায়?

—এ বাড়িতেই আবার ফিরে এলেন।

হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র পথ ছিল। রাজাকাররা চারদিকে শুঁকে বেড়াচ্ছে! রাত বিরেতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হানা দেয়। আওয়ামি লিগের নেতা বশির আহমদ আর রজ্জব আলি কোথায় লুকিয়ে আছেন, তাঁদের খোঁজে। হিন্দুদের খোঁজে। অনেকে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ির ওপর যখন একবার হামলা হয়ে গেছে, তখন ওখানে আর ওরা আসবে না। কেউ যে ওখানে আছে, তা সন্দেহই করতে পারবে না। ডাক্তারবাবুর দুই ভাই আর ওঁর ছোট ভাইয়ের বৌ এসে লুকিয়ে রইল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের পেছনে দরজা আছে, প্রয়োজন হলে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে।

এই ঘরটা ডাক্তারবাবুর মেজ ভাই বসন্ত সরকারের। উনি হাঁপানিতে ভুগতেন। ওঁর যখন-তখন কাশির আওয়াজটাই ছিল লুকিয়ে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক। বসন্ত সরকারের ঘরটা একেবারে ফাঁকা। এক টুকরো সুতোও সেখানে পড়ে নেই।

বসন্ত সরকার মারা গেছেন নভেম্বর মাসের দশ তারিখ। আনোয়ারের মনে আছে। ওর জ্যাঠামশাই আবদুর রৌফও সে দিন মারা যান। রাজাকাররা খুঁজে পেয়েছিল বসন্ত সরকারকে এবং তাঁকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রামের আরো তিনজন প্রৌঢ় মুসলমানকেও সে দিন তারা ধরে নিয়ে যায়। আনোয়ারদের বাড়িতে আগুন লাগে সে দিন—ছ্যাঁচা বাঁশের ছাউনি, সবটাই পুড়ে গেছে।

রাজাকাররা বসন্ত সরকার, আবদুর রৌফ ও আর দুজনকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে। বসন্ত সরকার অনবরত কাশছিলেন হাঁপানির টানে। সারা গ্রামের লোক শুনেছে কাশির শব্দ। কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি। কাশির শব্দ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় সবাই বুঝল, বসন্ত সরকার আর হাঁপানির জন্য কষ্ট পাবে না কখনো। নদীর বাঁধের ওপর

নিয়ে গিয়ে বসন্ত সরকারে গলা কেটে দেওয়া হয়। তারপর আবদুর রৌফ ও আর দুজনকে বলা হয়, সেই মৃতদেহটা নদীর জলে ফেলে দিতে। প্রাণের দায়ে ওঁরা তাও করেছেন—তারপর আবদুর রৌফকে মেরে আর দুজনকে বলা হল সেই দেহটা নদীতে ফেলতে। বাকি দুজন তখন দৌড়তে শুরু করেন এবং গুলি খেয়ে মারা যান।

এই ঘরটা দেখলেই বোঝা যায়, এটাতে ছোট ভাই হেমন্ত সরকার এবং তার স্ত্রী নিরুপমা থাকত। ঘরটাতে এখনও খানিকটা মেয়েলি গন্ধ আছে। মাত্র দেড় বছর আগে ওদের বিয়ে হয়েছিল। সারা ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ভাঙা কাচ ছড়ানো। আমার পায়ে বুট জুতো, কিন্তু আনোয়ারের খালি পা—ওকে সাবধান হতে বললাম। একটা জানলায় ছেঁড়া পরদা এখনও একটু একটু দুলছে হাওয়ায়। ওই পরদা সেলাই করেছিল একটি মেয়েলি হাত। খাটটা মাঝখান ভাঙা অবস্থায় কাত হয়ে রয়েছে। ড্রেসিং টেবিলটা মনে হয় যেন কেউ কুড়ুল দিয়ে কুপিয়েছে প্রচণ্ড রাগে। কে করেছে এ রকম, এ সব জিনিস এমনভাবে ভেঙে নষ্ট করে খান সেনাদের কী লাভ। নিয়ে যেতে পারত, রাজাকারদের লুঠ করার অধিকার দিতে পারত। নাকি হেমন্ত সরকার নিজেই ভেঙে নষ্ট করে দিয়ে গেছে?

আনোয়ার টানাটানি করে একটা ড্রয়ার খুলল। ভেতরে কতকগুলো চুলের কাঁটা আর ফিতে। ড্রয়ারে যে খবরের কাগজ পাতা আছে, সেটা তুলে দেখলাম, ইত্তেফাকের একটা পাতা। খবরের কাগজের নীচ থেকে একটা ছবি বার করে আনোয়ার আমাকে দেখাল। স্বামী-স্ত্রীর ছবি, গোপন জায়গায় রাখা ছিল। আনোয়ার খুব একটা বাড়িয়ে বলেনি, নিরুপমাকে দেখতে ভালই ছিল, একটু গ্রাম্য ধরনের সুন্দরী, কপালে মস্ত বড় টিপ, ঠোঁটে যে লাজুক হাসিটি তার কোনো বর্ণনা হয় না। হঠাৎ যেন মনে হয়, কিছুই হারায়নি। সবই আছে। এই ঘরে এখনো নিরুপমা আর হেমন্ত সরকারের নিঃশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে।

হেমন্ত সরকার বৌকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে মাঝরাতে। হেমন্ত সরকারকে মাঠের মাঝখানে মেরে রেখে নিরুপমাকে ছাউনিতে নিয়ে যায় খান সেনারা। তবে, অনেকের ধারণা, হেমন্ত সরকার মারা যায়নি, কেননা, পরদিন সকালে কেউ তার লাশ দেখেনি। এমনও হতে পারে, শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গেছে। আবার কারুর দৃঢ় বিশ্বাস হেমন্ত সরকার সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় মাঠে পড়েছিল—তারপর কোনোক্রমে পালিয়ে যায় নদী পেরিয়ে একদিন সে ফিরে আসবে প্রতিশোধ নিতে।

উঁকি মেরে দেখলাম, খাটের নীচে একটা ছেঁড়াখোঁড়া বই পড়ে আছে। কৌতূহল হল, হাঁটু গেড়ে বসে বইটা টেনে আনলাম। মলাট ছেঁড়া বহু পুরনো বই, উপেন গাঙ্গুলির 'বিদুষী ভার্যা'। এই অবস্থাতেও আমার ঠোঁটে সামান্য হাসি আসে। বোধহয় নিরুপমার গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল। সে কি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছিল? সে কি ভাল রান্না করতে পারত? তার কি শখ ছিল, স্বামীর সঙ্গে একবার কোথাও অনেক দূরে বেড়াতে যাওয়ার? তার বুকে ছিল সন্তান পাওয়ার স্বপ্ন? বইটার মাঝখানে একটা পাতার কোণ তেকোণ করে মোড়া—এমনও হতে পারে, যে-সময় খান সেনারা ডাক্তারবাবুকে মারতে আসে তখন সে বইটার এই পাতাটা পড়ছিল?—লোকজনের আওয়াজ শুনে সে পাতা মুড়ে রেখে কৌতূহলী হয়ে বাইরে যায়।

নিরুপমাকে খান সেনারা ইস্কুল বাড়ির একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে কয়েকদিন। দিনরাত সে অশ্রান্তভাবে চেঁচাত—পশুর মতন অর্থহীন চিৎকার। গ্রামের অনেক মানুষ সেই চিৎকার শুনেছে। এক একজন খান সেনা সেই ঘরে ঢুকলে চিৎকার বেড়ে যেত। প্রথম রাতেই নিরুপমা পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার পরনে শাড়ি ছিল না, পাছে সে আত্মহত্যা করে। দিন-রাত্রে সে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোয়নি—দুর্বোধ্য চিৎকার এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

বইটার ভাঁজ মুড়ে রেখে দিলাম খাটের ওপর। চোখ বুলোলাম চারদিকে। মাত্র দেড় বছর নিরুপমা এই ঘরে সংসার পেতেছিল। নিশ্চয়ই যত্ন করে গুছিয়েছিল ঘরখানা। এখন তা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। নিরুপমা যদি আবার এ বাড়িতে ফিরে আসে, কান্নাকাটি না করে প্রথমেই নিশ্চয়ই কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘর গুছতে লেগে যাবে।

খান সেনারা চলে যাবার পর ইস্কুল বাড়ির ওই ঘরে নিরুপমার পচা গলা দেহ পাওয়া গিয়েছিল, গলায় একটা বেল্ট জড়ানো। কেউ বলে, কোনো একজন খান সেনা নিরুপমার চ্যাঁচানি বন্ধ করার জন্য বিরক্ত হয়ে ওর গলায় বেল্ট জড়িয়ে ফাঁস টেনে দিয়েছে। আবার কেউ বলে, নিরুপমা নিজেই একজন খান সেনার বেল্ট কেড়ে নিয়ে গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করে।

ঘটনার বিবরণ শোনাতে শোনাতে আনোয়ার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ছোট বৌদি আমারে বড় ভালবাসতেন। আমারে বড় ভালবাসতেন।

আনোয়ারের কান্না থামানো যায় না। আমি ওকে কাঁদতে দিলাম কিছুক্ষণ। চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। মৃতদের বদলে এগারো বছরের এই জীবন্ত বালকটি এই মুহূর্তে আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। কৈশোর কালের কান্না কত আন্তরিক। কাঁদুক এখন আনোয়ার। আমার মত বয়স হয়ে গেলে আর প্রাণ খুলে এরকম কাঁদতে পারবে না। ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমি একটু শান্তি পেলাম।

স্বর্গের বারান্দায়

আমি প্রায়ই স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। আমি এমনিতেই স্বপ্ন দেখি একটু বেশি, বলা যায় স্বপ্ন দেখা আমার রোগ বিশেষ। আমার পেট ও মাথা দুই-ই গরম, কোনো রাত্রেই ভালভাবে ঘুম হয় না, তাই সিনেমার মতো অজস্র স্বপ্ন আমার চোখের সামনে ভেসে যায় এবং অধিকাংশ স্বপ্নই তার পরে সকালবেলাতেও আমার মনে থাকে। সেই সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিলে ফ্রয়েড কিংবা ইয়ুং সাহেবরাও হিমশিম খেয়ে যেতেন।

অন্যান্য লক্ষ লক্ষ স্বপ্নের মধ্যে স্বর্গের স্বপ্নটাই ঘুরে ফিরে আসে। এই স্বপ্নটাতে আমি অত্যধিক উল্লসিত হয়েও উঠি না কিংবা ভয়ও পাই না। স্বর্গ আমার চেনা হয়ে গেছে। এই স্বর্গের সঙ্গে কিন্তু পুরাণে-ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত স্বর্গের দৃশ্যের কোনো যোগ নেই। আমার স্বপ্নে দেখা স্বর্গে কখনো দেব-দেবীদের দেখিনি, অপ্সরা-উর্বশীদেরও দেখিনি—একবার মাত্র কয়েক পলকের জন্য রম্ভা নামের নর্তকীকে দেখেছিলাম—যমরাজ বা চিত্রগুপ্তকেও দেখিনি।

আমার দেখা স্বর্গ অনেকটা সুন্দরভাবে সাজানো কোনো ডাকবাংলোর মতন। পাহাড়ি জায়গায় ডাকবাংলোর মতন বেশ খানিকটা উঁচু ভিতের ওপর একটা ধপধপে সাদা রঙের বাড়ি, অনেকগুলি কাচের দরজা ও জানালা। সামনে বেশ বড় একটি পরিচ্ছন্ন বাগান, বাড়িটার পিছনে অরণ্য। তবে স্বর্গে মাত্র ওই একটা মোটে বাড়ি তো হতে পারে না, তাই আমার মনে হয়, ওই অরণ্যের মধ্যে আরও অনেক বাড়ি আছে—সেগুলো আমি দেখিনি। সামনের ওই বাড়িটা স্বর্গের বিশ্রাম-গৃহ, তাই ডাকবাংলোর মতন চেহারা। বহুদূরের পথ পেরিয়েই তো মানুষ স্বর্গে পৌঁছবার পরে ওই বাড়িতে প্রথমে একটু বিশ্রাম নেয়।

ওই দৃশ্যটাই যে স্বর্গের দৃশ্য, তা আমি চিনলাম কী করে?

কোথাও তো কোনো সাইন-বোর্ড লেখা নেই! তবু আমি ঠিকই চিনেছিলাম। আমি জীবনে বহু ডাকবাংলোতে থেকেছি কিন্তু ওই বাড়িটা দেখামাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম, এটা সব কিছুর থেকে আলাদা। তাকিয়ে থাকলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, যদি ওখানে আশ্রয় পাওয়া যেত তা হলে জীবনে আর কিছু চাই না।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সামনের বাগানটুকু। অসংখ্য ফুলে ফুটে আছে। অথচ একটাও চেনা ফুল নয়। সবুজ, কালো কিংবা বেগুনি রঙের ফুল কি পৃথিবীতে তেমন দেখা যায়; স্বর্গের বাগানে বেগুনি রঙের প্রাধান্য। রামধনুর প্রথম রং বেগুনি বলেই বোধ হয় এরকম। পৃথিবীতে একধরনের লাল শাক আছে, ইট চাপা ঘাসের রং হয় হলদে, এ ছাড়া সব গাছই সবুজ। ওই বাগানের সব গাছই বেগুনি এবং সেই গাছগুলোর ভেতর থেকে আলো বেরোয় ঠিক যেন ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অথচ তৈরি নয়, সজীব।

প্রথমবার এই দৃশ্যটাই দেখে ঠিক চিনতে পারিনি অবশ্য গাছগুলো দেখেই বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমি যেন বেড়াতে বেড়াতে সেই বাগানের কাছে গেছি, ফুলগাছগুলো দেখে অবাক। ভাবছি এগিয়ে গিয়ে ফুল ছিঁড়ে নেব কিন্তু পরের বাগানের ফুল কাউকে না জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত নয়। খানিক পরে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলাম। তিনি নিচু হয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকছেন। মেমসাহেবরা সাঁতার কাটার সময় যেটুকু পোশাক পরে, মহিলার শরীরে সেইটুকু পোশাক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহিলার ঊরু দুটি। কলাগাছের মতন সুডৌল এবং এত মসৃণ ও ঝকঝকে যে মনে হয় ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে, কলাগাছেরই মতন সবুজ ও হলদে মেশা আলোর আভা। পরে জেনেছিলাম, ওই মহিলারই নাম রম্ভা। লোকে কথায় কথায় রম্ভোরু বলে না?

আমি বাগানের বাইরে থেকে ভদ্রমহিলাকে বললাম, ফুলগুলো আশ্চর্য সুন্দর তো! এই জায়গাটার নাম কী?

মহিলা উত্তর দিলেন, আপনি জানেন না? লোকে এই জায়গাটাকে স্বর্গ বলে।

শুনে একটুও চমকে উঠলাম না। বরং আমার মনে হল, তা তো হবেই। স্বর্গ না হলে এ রকম হয়!

আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম, শুনুন আপনি আমাকে ফুলগাছের একটা চারা দেবেন? মায়ের জন্য নিয়ে যাব। আমার মায়ের ফুলগাছের খুব শখ।

মহিলা খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, ভিতরে আসুন না। ওই যে আপনার ডানদিকেই গেট আছে। একটু ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

বুক সমান উঁচু কাচের তৈরি গেট। বাগানের ধারেও মেহেদি গাছের বেড়া, কাঁটা তার বা দেয়াল-টেয়াল নেই। একটু জোর করলে গেটটা ভেঙে ফেলা যায়, কিংবা লাফিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। আমি সে-রকম করলাম না। আস্তে গেটে ঠেলা দিলাম। খুলল না। আমার খুব দুঃখ হল। ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ আমার বুকের মধ্যে

সেই দুঃখবোধ চাপ বেঁধে ছিল। আমার জন্য স্বর্গের দরজা খুলল না, আমি কি পাপী? খানিকটা বাদে মনে পড়ল, আমি তো এখনো মরিইনি। আমার তো স্বর্গে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তখন মনটা হালকা হয়ে গেল।

এরপর মাঝে মাঝেই আমি স্বর্গের স্বপ্ন দেখছি। যে দিন আমি কোনো জায়গা থেকে বড় রকমের মানসিক আঘাত পাই, সেই রাত্রেই স্বর্গের স্বপ্ন আমার চোখে আসে। কখনো আর ঢোকার চেষ্টা করিনি ভিতরে। দাঁড়িয়ে থেকেছি বাগানের পাশে। দেখতাম মাঝে মাঝেই অনেক নারী পুরুষ বাইরে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে ওই গেটের সামনে। কেউ কেউ হাত দিয়ে ঠেললেই আপনি খুলে যাচ্ছে গেট—তখন তারা বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে উঠছে সেই সাদা বাড়িটার বারান্দায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেহারাগুলো ভারী সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো মানুষ গেট ঠেললেও খুলছে না। তখন তাদের চোখে জল আসে। সেই জলের ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি এ পর্যন্ত আমার পরিচিত কোনো মানুষকে স্বর্গের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে দেখিনি। একবার শুধু...

তার আগে দুটি মৃত্যুর কথা বলা দরকার। আমার যখন আটাশ বছর বয়স সেই সময় আমি পশ্চিম দিনাজপুর থেকে একটি প্রেমপত্র পাই। বন্দনা সরকার নামে একটি মেয়ে আমার লেখা-টেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে তার ভীষণ ভাল লাগে ইত্যাদি। চিঠির শেষে সে আমার উদ্দেশ্যে দু লাইন কবিতাও লিখেছে। যেহেতু সেই চিঠিতে তিনটি বানান ভুল ছিল, তাই সে চিঠির উত্তর আমি দিইনি।

মাস দু এক পরে সে মেয়েটিই আমাকে চিঠি লিখল ডায়মন্ডহারবার থেকে। এবং আর তিন মাস পরে আবার মেদিনীপুর থেকে। ব্যাপারটা একটু রহস্যময় লাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু রহস্যভেদের কোনো উদ্যোগ করিনি, কারণ মেয়েটির চিঠিতে বানান ভুলের সংখ্যা কমেনি। তারপর মেয়েটি নিজেই একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির হল।

বন্দনা বলেছিল ওর বয়স তখন পঁচিশ, কারণ ও জানত আমার বয়েস তখন আটাশ। আসলে বন্দনা তখন তিরিশ ছুঁয়েছে এবং দেখলেই বোঝা যায়। বন্দনা স্কুল মাস্টারি করে এবং এক জায়গায় তার মন টেকে না বলে ঘন ঘন চাকরি বদলায়। আমি তাকে বলেছিলাম, স্কুল শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে এরকম বানান ভুল করা উচিত নয়—তার উত্তরে সে জানিয়েছিল যে সে অঙ্কের টিচার, বাংলা বানান তার ভাল না জানলেও চলে। তা হয়তো ঠিক, কিন্তু বানান ভাল না জেনে যে প্রেমপত্র লেখা চলে না এটা কে তাকে বোঝাবে!

আমার সেই বয়সে কত বন্ধু-বান্ধব, কত হই-হুল্লোড় আড্ডা, সারা শহর তোলপাড় করে ছোটাছুটি, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। কখনো অসম্ভব নেশা করে গুণ্ডাদের সঙ্গে জুয়া খেলতে যাই, কখনো শ্মশানে গিয়ে কোরাস গান করি। মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা ছিল তখন আমার প্রিয় বিলাসিতা। বিশেষত একটি মফস্বলের মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কোনো সময়ই আমার ছিল না।

বন্দনার চিঠির বানান ভুল অনায়াসে ক্ষমা করা যেত, যদি তার শরীরে রূপ থাকত। অবশ্য কোনো রূপসী মেয়ে আমাকে প্রেমপত্র পাঠাবেই বা কেন? বন্দনাকে ঠিক কুৎসিতও বলা যায় না—লম্বাটে ধরনের চেহারা, গায়ের রং মাজা মাজা, নাক চোখও ঠিকঠাক। তবু তার চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল, যে জন্য তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। বন্দনার প্রধান দোষ ছিল চোখ পিটপিট করা। কোনো মেয়ের এই রোগ আমি আগে দেখিনি, বন্দনা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আর অনবরত চোখ পিটপিট করছে, দেখলেই কী রকম অস্বস্তি লাগে। শুকনো ভদ্রতা দেখিয়ে বন্দনাকে আমি বিদায় করলাম। তবু বন্দনা নিয়মিত চিঠি লেখে। আমি উত্তর দিচ্ছি না অথচ একজন আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখে যাচ্ছে এও তো এক দারুণ যন্ত্রণা। বন্দনার পর পর আটখানা চিঠি পাবার পর আমি সংক্ষিপ্ত ভদ্রতায় একবার উত্তর দিলাম। তাতে বন্দনা এত বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল যে দুদিন পরেই স্কুল কামাই করে দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়ির বসবার ঘরে সে বসে রইল দু ঘন্টা, আমি ব্যস্ততার ইঙ্গিত করাতেও উঠল না। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা আমার হাতের আঙুল নিয়ে সে খেলা করতে চায়। তখন তার চোখ পিটপিট করাও বেড়ে যায় খুব।

এই অবস্থায় আমার করণীয় কী ছিল? আমার দোষ এই, আমি আমার কর্তব্য ঠিক করতে পারি না চট করে। বিশেষত এই রকম অদ্ভুত সমস্যায় পড়লে। বন্দনা আমার প্রেমে পড়তে চায়। বস্তুত আমার প্রেমে পড়ার জন্য সে বদ্ধপরিকর। আমি আমার কোনো লেখায় লিখেছিলুম, এ পর্যন্ত কোনো মেয়ে আমাকে ভালবাসেনি। সেটা পড়েই বন্দনা ধরে নিয়েছিল, আমি খুব দুঃখী মানুষ এবং সে এসেছিল আমার উদ্ধারকর্তা হিসাবে। সে দেখিয়ে দিতে চায়, মেয়েরাও ভালবাসতে জানে।

ভদ্রতাসম্মতভাবে বন্দনাকে প্রত্যাখ্যান করার যতগুলি উপায় আছে সবগুলিই আমি ব্যবহার করেছি। বন্দনা কিছুতেই বুঝবে না। ওর ধারণা, এ সব আমার অভিমানের কথা। কী যে মুশকিলে পড়া গেল।

মোট কথা, বন্দনা তারপর থেকে অতিষ্ঠ করে তুলল আমার জীবন। স্কুলের ছুটি হলেই সে ঘন ঘন কলকাতায় চলে আসে এবং ছায়ার মতো আমায় অনুসরণ করে। ছোটখাটো অপমান সে গায়েই মাখে না। বন্ধুরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি শুরু করেছে।

একদিন বন্দনা চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে আমার কাছে এসে বলল, তার বাবা মা তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে।

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, এ তো চমৎকার কথা। পাত্রটি কী করে?

বন্দনা বলল, পাত্র একটি কলেজে পড়ায়। কিন্তু মরে গেলেও সে তাকে বিয়ে করবে না। আমি কি বন্দনাকে সাহায্য করব না?

আমি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাষাতেই জানালাম যে আমার কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা যেন সে না করে।

বন্দনার আসল ইচ্ছাটি আস্তে আস্তে জানা গেল। ছেলেবেলা থেকেই তার প্রতিজ্ঞা সে কখনো বাপ-মায়ের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করবে না। সে কারুকে ভালবাসবে, তারপর তার সঙ্গে যদি বিয়ে হয়—কিংবা তাকে যদি কেউ ভালবেসে বিয়ে করতে চায়—। দীর্ঘ তিরিশ বছরের মধ্যে বন্দনার প্রেমে কেউ পড়েনি। এইজন্যই লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বন্দনার চেয়ে ঢের খারাপ চেহারার মেয়ের প্রেমেও অনেক লোক পড়ে—কিন্তু বন্দনার কোনো প্রেমিক জোটেনি। এতদিন পর বাবা মা জোর করে বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। তখন বন্দনা আমাকে তার প্রেমিক হিসাবে বেছে নিয়েছে—তার কারণ আমার সেই লেখা, যার মধ্যে লিখেছিলাম, আমি কখনো ভালবাসা পাইনি। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! আমি তিন চারটি মেয়ের নাম বলেছি আমার প্রেমিকা হিসেবে—দুজনের সঙ্গে বন্দনার আলাপও করে দিয়েছি, তাও বন্দনা নিবৃত্ত হয় না।

বাবা-মায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে বন্দনার বিয়ের কথা যত পাকা হতে লাগল বন্দনা ততই মরিয়া হয়ে উঠল। একদিন আমার কাছে এসে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিল। বন্দনা বেশ কয়েক বছর মাস্টারি করে সাতশো টাকা জমিয়েছে, সেই টাকা নিয়ে সে আমার সঙ্গে ছুটিতে বাইরে কোনো হোটেলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কাটিয়ে আসতে চায়! বিয়ে না হয় না-ই হল, তবু তো সাতটা দিন তার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেই প্রস্তাব শুনে আমি নিষ্ঠুরের মতো বলেছিলাম, সাতশো টাকার বদলে তুমি যদি সত্তর হাজার টাকা আনতে তা হলে না হয় চিন্তা করে দেখা যেত। তুমি বরং অন্য কোনো ছেলেকে খুঁজে নাও। অন্য অনেকে রাজি হতে পারে। যদি চাও তো আমিই অন্য ছেলে জোগাড় করে দিচ্ছি।

বন্দনা সে দিন কেঁদে ফেলেছিল। আমারও অসহ্য লেগেছিল তখন।

দিন দশেক বাদে পি জি হাসপাতাল থেকে একটা চিঠি পেলাম। পেন্সিলে লেখা খামটাও খুব ময়লা। বন্দনার চিঠি। লিখেছে যে হঠাৎ তার পেটে খুব ব্যথা হওয়ায় ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আমি যেন অবশ্যই ওর সঙ্গে দেখা করি। চিঠি লেখার সরঞ্জাম অতি কষ্টে জোগাড় করতে হয়েছে।

হাসপাতালের ত্রিসীমানায় আমি পারতপক্ষে যাই না। বন্দনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার তো কথাই ওঠে না। পেটে ব্যথা হয়েছে তো আমি দেখতে গিয়ে কী করব!

দু দিন বাদে বন্দনার আর একটা চিঠি এল। সেই চিঠিখানা আমার কাছে এখনো আছে। তাতে লিখেছে, আমি বুঝতে পারছি আমি আর দু তিন দিনের বেশি বাঁচব না। তুমিই আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমি একটু ভালবাসার জন্য কাঙাল ছিলাম। তুমি এত কৃপণ, যে আমাকে একটু ভালবাসতে পারলে না! একবার আসবে? তুমি যদি এসে একবার আমাকে একটা চুমু দাও, শান্তিতে মরতে পারব তা হলে। কোনো ক্ষোভ থাকবে না।

এ চিঠিখানাও আমার অসহ্য ন্যাকামি বলে মনে হয়েছিল। দু তিন দিন বাদে যে মারা যাবে, তার চিঠি লেখার ক্ষমতা থাকে না। পেটে ব্যথা হলে কেউ মরে না। তা ছাড়া হাসপাতালে গিয়ে চুমু দেব—এ কি ইয়ারকি নাকি? বাচ্চা মেয়ে হলেও কথা ছিল, অত বড় ধিঙ্গি মেয়েকে হাসপাতালে চুমু! ভেবেছিলাম, সময় পেলে হাসপাতালে গিয়ে বন্দনাকে আর একবার ধমকে দিয়ে আসব। সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিনদিনের দিন বন্দনা মারা গেল।

আসলে তার লিউকোমিয়া ছিল, সে জানত না। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথার জন্য অপারেশন করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

বন্দনার মৃত্যুর খবর শুনে আমি বেশ রেগে গিয়েছিলাম। এ রকম দুম করে মরে যাবার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া তার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করা কেন? পি জি হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেছে। আমার পক্ষে কি জোর করে ভালবাসা সম্ভব? আমি ওর সঙ্গে বেলেল্লা করিনি, সেটা কি আমার অপরাধ?

অতৃপ্ত ভালবাসা নিয়ে বন্দনা মরে গেল তিরিশ বছর বয়সে?

বন্দনাকে হাসপাতালে দেখতে যাইনি কিন্তু নির্মলকে দেখতে গিয়েছিলাম। খবর পেয়েই বুঝেছিলাম নির্মল বাঁচবে না। আমরা গিয়েছিলাম ওকে সান্ত্বনা দিতে, ওর কপালে হাত রেখে বলেছি, ভয় নেই দু দিনেই সেরে উঠবি।

নির্মল ছিল ওর বাবা-মায়ের এক ছেলে। আসলে ওরা ছিল পাঁচ ভাইবোন। কিন্তু আশ্চর্য নিয়তির খেলায় ওর অন্য সব ভাই-বোনই অল্প বয়সে মারা যায়। সেইজন্যই নির্মলের মা ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন, কয়েক ঘণ্টা না দেখলে উতলা হয়ে উঠতেন। আমরা সন্ধ্যাবেলায় যখন তুমুল আড্ডা দিচ্ছি, তখন নির্মলকে নিরস মুখে

বাড়ি ফিরে যেতে হতে। কেউ ঠাট্টা করলে নির্মল বলত, জানিস না তো আমার মাকে, একটু দেরি হলেই মা আবার ফিট হয়ে যাবেন। আমি তাই মাকে কষ্ট দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত নির্মলের মা-ই তার মৃত্যুর কারণ হন।

নির্মলরা থাকত দমদমে—ওদের বাড়ির পাশেই ইস্কুল বা কলেজ। বাড়ির পাশে কলেজ না থাকলে নির্মলের পড়াশুনো করাই হত না। তা-ও তো দু তিন পিরিয়ড পর পর নির্মলকে একবার বাড়ি এসে দেখা দিয়ে যেতে হত। নির্মল যখন দিল্লি কিংবা বেনারসে বেড়াতে গেছে, ওর মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছে। মাকে কষ্ট দেবার কোনো উপায়ই ছিল না নির্মলের—ওর মা তা হলে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যেতেন—তখন ডাক্তার ডাকা, ছুটোছুটি।

এইরকমভাবে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় থাকতে থাকতে নির্মলের স্বভাবটাও একটু অদ্ভুতরকমের হয়ে গিয়েছিল। বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে পারত না, কথা বলতে পারত না। বেশিরভাগ সময়েই বাড়িতে কাটাত, আমরা আড্ডা দিতে ওদের বাড়িতেই যেতাম, ওর মা অবশ্য যত্ন করতেন খুব।

বাবা মারা যাবার পর নির্মল আরও একা হয়ে পড়ে। বাড়িতে শুধু মা আর ছেলে, বাড়িখানা ওদের নিজস্ব। আত্মীয় স্বজনেরা পরামর্শ দিলেন নির্মলের বিয়ে দেবার জন্য। নির্মল জীবনে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশেনি। নির্মলের মা চতুর্দিকে পাত্রী দেখে বেড়াতে লাগলেন। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না—উনি ডানাকাটা পরী খুঁজছেন। আমরা গেলে নির্মল একগাদা মেয়ের ছবি তাসের মতো মেলে জিজ্ঞেস করত, বল তো, কাকে পছন্দ করা যায়?

নির্মলের বাড়ির পাশের মাঠে প্রতি বছর সরস্বতী পুজো হয়। সকালবেলা নির্মলের পরনে ধুতি গেঞ্জি। নির্মল নিজেদের পাঁচিল দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে—পুজো শেষ হয়েছে কি না। অঞ্জলি না দিয়ে নির্মল চা খেতে পারছে না। পাঁচিলের পাশেই একটা তোলা উনুন ধরতে দেওয়া ছিল, নির্মল সেটা দেখতে পায় না। সেই উনুন থেকে লকলকে শিখা উঠে নির্মলের ধুতিতে লাগল। নির্মল যখন খেয়াল করল, তখন তার ধুতি দাউদাউ করে জ্বলছে।

সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল ধুতিটা কোনোক্রমে খুলে ফেলা কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলেও আগুন নিভে যেত। এ সব তো সবাই জানে। নির্মলও কি জানত না! তবু ওর মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল আগুন দেখে। প্রচণ্ড ভয়ে পেয়ে মা মা চিৎকার করে ছুটে গেল নির্মল। মা তখন দোতলায়। সেই ছুটে যাওয়ায় আগুন জ্বলতে লাগল আরো বেশি। দোতলার বাথরুম থেকে সেই আর্তচিৎকার শুনে বেরিয়েই মা দেখলেন তার জ্বলন্ত সন্তানকে। একটা কম্বল এনে চেপে ধরার বদলে মা তাড়াতাড়ি এক বালতি জল এনে ঢেলে দিলেন নির্মলের গায়ে। তারপর আরও এক বালতি। নির্মলের যদিও বাঁচার আশা ছিল কিন্তু ওই জল ঢালার ফলে সেই সম্ভাবনাও ঘুচে গেল।

তিনদিনের মধ্যে নির্মলের জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তাররা বিমর্ষভাবে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, বাঁচার আশা নেই। যদি বা কোনোক্রমে বাঁচে, পা দুটো আর ব্যবহার করতে পারবে না—সে আর পুরুষ থাকবে না।

তিনদিন পর নির্মলের জ্ঞান ফিরল। তখন আমরা গেলাম ওকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে। নির্মল মানুষ চিনতে পারছে, কথাও বলছে। লোকজনের ভিড় করা একেবারে নিষেধ। নির্মল তার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত আমার হাতে রেখে জিজ্ঞেস করল, সুনীল, আমি সত্যিই বাঁচব তো? বল, সত্যি করে বল, বাঁচব?

নির্মলের দুচোখে জল। আমি অম্লান বদনে বললাম, কী বলছিস পাগলের মতন! এক সপ্তাহের মধ্যেই তোকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।

—নারে, আমি বাঁচব না। আমি জানি! আমি জানি! দু চোখে অনর্গল জল, নির্মল আস্তে আস্তে বলল, অতগুলো ছবি, যদি যে কোনো একজনকে আগেই পছন্দ করে ফেলতাম, আমি এ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে ছুঁয়ে দেখিনি। মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যে কী জিনিস জানি না, আমার ভাগ্যে নেই...

কয়েক ঘণ্টা বাদেই নির্মল মারা যায়। ওর শবদেহ দাহ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেল। পরপর দু রাত্তির আমারও ঘুম হয়নি। বাড়ি ফিরে স্নান করে চা খেয়েই শুয়ে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

সে দিন আবার দেখলাম স্বর্গের দৃশ্য। বাগানটা আজ ফাঁকা, বাড়িটাতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না—আলোর মতন জ্বলন্ত ফুলগাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। চারপাশে একটা অস্পষ্ট নীল আলোর আভা।

বাগানের বাইরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নির্মল! অর্ধদগ্ধ বিকৃত শরীর। দগদগে ঘা-গুলো দেখা যাচ্ছে। দরজার ওপর হাত রেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠ্যালা দিতে সাহস পাচ্ছে না—যদি ঢুকতে না পায়। ঝলসানো মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তো দাঁড়িয়েই রইল।

হঠাৎ তার হাতের ওপর আর একখানি হাত এসে পড়ল। নারীর হাত। দূর থেকে আমি দেখলাম, বন্দনা এসে দাঁড়িয়েছে গেটের সামনে। নির্মল তাকাল বন্দনার দিকে। এই প্রথম তার শরীরে মা ছাড়া অন্য নারীর স্পর্শ। চমকে উঠেছে নির্মল। বন্দনা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নির্মলের দিকে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, বন্দনা আর চোখ পিটপিট করছে না।

বন্দনা চাপ দিতেই গেট খুলে গেল। নির্মলের দিকে ফিরে ডাকল আসুন!

আমি জানতাম, নির্মলের জন্য দরজা বন্ধ থাকবে না। ওরা দুজনেই ভালবাসার অতৃপ্তি নিয়ে পৃথিবী ছেড়েছে।

বাগানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নির্মলের শরীরের পরিবর্তন দেখা দিল, আবার সে সজীব স্বাস্থ্যবান শরীর ফিরে পেয়েছে। বন্দনার মুখে এসেছে আশ্চর্য কমনীয়তা। পরস্পর হাত ধরাধরি করে ওরা বাগান পেরিয়ে উঠল সেই সাদা বাড়িটার সিঁড়িতে।

অল্পক্ষণের জন্য ওরা আমার চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল সেই সাদা বাড়ির বারান্দায়। হাস্য-উজ্জ্বল মুখ দুজনেরই। কী যেন একটা রসিকতায় ওরা হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠল—তারপরই বালক-বালিকার মতন আনন্দে লঘু পায়ে ছোটাছুটি করতে লাগল বারান্দায়। একটু পরেই সুখী পায়রার মতন ওরা পরস্পরের মুখ চুম্বন করল। যেন একজনের ঠোঁট থেকে আর একজন সত্যিকারের মিষ্টি কিছু পান করছে।

আমার বুকখানা আনন্দে ভরে গেল। মনে হল এমন সুন্দর কোনো দৃশ্য আমি সারা জীবনে কখনো দেখিনি। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, নির্মল! বন্দনা! ওরা দুজনেই শুনতে পেয়েছে ঠিক। উজ্জ্বল রেলিং ধরে শিশুর মতন ঝুঁকে হাত নাড়তে লাগল আমার দিকে। আমার প্রতি খানিকটা দয়া কিংবা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে ওদের মুখে। যেন ওরা বলতে চাইছে, তুমি আসতে পারবে না, তুমি কোনোদিন এখানে আসতে পারবে না।

সোনালি দিন

ও মশাই, উঠুন, উঠুন!

পিনাকী চোখ মেলে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। সে কোথায়? কে তাকে ডাকছে? এত নিচু মতন একটা লম্বা ঘর। খাকি পোশাকপরা লোকটি আবার বলল, কী মশাই, বাড়ি যাবেন না?

তখন পিনাকী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। সে বাসের দোতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন পিনাকী বাসে উঠেছিল তখন ভিড়ে গিজগিজ করছিল। দোতলাতেও অনেক; প্রায় অর্ধেকেরও বেশি রাস্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসে হঠাৎ সে একটা সিট পেয়েছিল। এখন বাসটা একদম ফাঁকা, গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে আছে।

লজ্জিত মুখ করে, কণ্ডাক্টরকে কিছুই না বলে সে অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে নেমে গেল। পাদানির ঠিক নীচেই ছিল খানিকটা মাটি খোঁড়া। সেখানে জল জমা, পিনাকী না দেখে সেখানে ডান পা ফেলতেই তার প্যান্টে অনেকখানি জল কাদা লেগে গেল। যাক, এমন কিছু ক্ষতি হয়নি।

বেশি রাত হয়নি, মাত্র পৌনে এগারোটা। এর মধ্যেই বাস গ্যারাজে ঢুকে যায়? জেগে থাকলে পিনাকীর সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে তো! জায়গাটা কোথায়? বেলঘরিয়া নাকি?

বাইরে এসে পিনাকী দেখল, না পাইকপাড়া। তা হলে বেশি দূর নয়। এখন কি আর উলটোদিকের বাস পাওয়া যাবে? এটুকু রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে মনে হচ্ছে।

সিগারেট খোঁজার জন্য পিনাকী পকেটে হাত দিল। তার পকেটে সিগারেট দেশলাই, খুচরো পয়সা, একটা দু টাকার নোট, কয়েকটা ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজপত্র—কিচ্ছু নেই। প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট মিলিয়ে মোট তিনটি পকেট একেবারে শূন্য। এতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল বাসের মধ্যে, কেউ না কেউ তুলে নিয়ে গেছে। চোর কি সিগারেট দেশলাইও নেয়? কিংবা পকেট থেকে পড়ে গেছে? যাক, আবার ফিরে গিয়ে খুঁজে দেখার কোনো মানে হয় না।

পিনাকী আপন মনে একটু হাসল। সে যে বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে? তার তো এখন খুবই চিন্তাভাবনায় দুঃখিত মুখ করে থাকার কথা।

ফুটপাথ ধরে কয়েক পা এগিয়েই পিনাকী দেখল সামনে একটা কলম পড়ে আছে। কলম নয়, ডট পেন। কোনোরকম দ্বিধা না করে সে সেটা তুলে নিল। তার নিজের জিনিস হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে সুতরাং রাস্তায় অন্যের হারানো জিনিস সে নেবে না কেন? পিনাকীর চোখ খুব তীক্ষ্ণ। সে পৌনে এগারোটার অন্ধকার রাস্তাতেও একটা ডট পেন দেখতে পায়।

সিসটা ঠিক আছে কি না দেখবার জন্যে এক টুকরো কাগজ পেলে ভাল হত। তার পকেটে তো কিচ্ছু নেই। একটা কাগজের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। কিছুই চোখে পড়লো না। তখন সে সিসটা নিজের বাঁ হাতের তালুতে ঘষল কয়েকবার, বেশ জোরে। তবু কোনো দাগ পড়ে না। শুধু তাই নয়, ডট পেনটার একটা পাশ ফাটা। এটা হারায়নি, কেউ ইচ্ছে করে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠিক এইখানেই, কেন? পিনাকীকে ঠকাবার জন্য? তা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে? সেই জন্যই অন্য কেউও এটা আগে তোলেনি। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে পিনাকীকে ঠকাবার জন্য। কিন্তু পিনাকীকে ঠকিয়ে অন্যদের কী লাভ?

আর যাতে কেউ না ঠকে, সেই জন্য পিনাকী রাস্তার পাশের একটা ড্রেন খুঁজে তার মধ্যে খুব যত্ন করে ফেলে দিল জিনিসটা। পিনাকী কারুকে ঠকাতে চায় না।

তখন তার মনে পড়ে গেল একটা জ্যামিতির বাক্সর কথা। তার ছোটভাই পল্টু ক্লাস সেভেনে পড়ে, তার জ্যামিতির ইন্সট্রুমেন্ট বক্স নেই বলে ক্লাসে বকুনি খায়। তাকে সেটা কিনে দেওয়া হয়নি। পল্টুর পড়ার বইগুলো কেনা হয়েছে কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে। জ্যামিতির বাক্সের দাম বারো টাকা। কে যেন বলেছিল জ্যামিতির বাক্সও কোথায় যেন পুরনো কিনতে পাওয়া যায়। সেই আশাতেই কেনা হয়নি। পুরনোও পাওয়া যায়নি।

অন্ধকার রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পিনাকী একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলল। সে অনুচ্চ স্বরে বলল, পল্টু, তোকে আমি সামনের মাসেই ঠিক জ্যামিতির বাক্স কিনে দেব, দেবই দেব। নতুন হলদে রঙের সুন্দর বাক্স, ভেতরের জিনিসগুলো ঝকঝকে।

প্রতিজ্ঞাটা করার পরেই সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেল পল্টুর বইপত্তরের ওপরে শোভা পাচ্ছে সেই বাক্সটা। পল্টু পড়াশোনায় ভাল, সে খুশি হবে। পিনাকীও আগে থেকে খুশি হয়ে গেল এবং জোরে পা চালাল।

পিনাকীকে যেতে হবে দত্তবাগানের দিকে। তখন শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে গেলে ওদিকের বাস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পিনাকীর পকেটে তো একটাও পয়সা নেই। সুতরাং পাইকপাড়ার ভেতর দিয়ে কোনাকুনি পায়ে হেঁটে যাওয়াই সহজ উপায়।

কিন্তু পিনাকী ঠিক সহজ পথটাতে গেল না। রানি হর্ষমুখী রোড থেকে সে একবার বাঁয়ে বেঁকল। এ দিকের গলিঘুঁজি ধরে ঘুরে ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়া যায়। এ পাড়ার কুকুরগুলো বড্ড বেশি চ্যাঁচায়। গলির মোড়ে পানের দোকানটা এখনো খোলা আছে। সেখানে গুলতানি করছে চার-পাঁচটি ছেলে। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। সেটা দেখেই সিগারেটের জন্য মনটা আবার আনচান করে উঠল পিনাকীর। কিন্তু কোনো উপায় তো নেই। ওদের কাছে একটা সিগারেট ধার চাইবে? অচেনা লোকের কাছেও নস্যি চাওয়া যায়, কিন্তু সিগারেট চাওয়া যায় না। পকেটে একটাও পয়সা নেই বলে কিন্তু পিনাকীর তেমন বেশি দুঃখ হচ্ছে না। মোটে তো দুটো টাকা আর কিছু খুচরো! যদি থাকত দু হাজার টাকা...অবশ্য অত টাকা থাকলে পিনাকী বাসে না চেপে ট্যাক্সিতেই আসত। বছর দু-একের মধ্যে পিনাকী ট্যাক্সিতে চাপেনি। প্রথম গলির পর আবার ডানদিকে বেঁকলে সাতখানা বাড়ির পর রত্নাদের বাড়ি। গলিটা ফাঁকা একদম। রত্নাদের বাড়ির সবগুলো ঘরই অন্ধকার। এ তো বাড়ি নয়, পাখির বাসা। ওইটুকু একটা তিনতলা বাড়িতে সাতটা পরিবার থাকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণ জেগে থেকে কিই-বা করবে? পাখিদের মতনই সাধারণ মানুষও বেশিক্ষণ জেগে থাকে না। যদি না তাদের বাড়ির কোনো ছেলে পিনাকীর মতন এখনো বাড়ি না ফিরে থাকে।

রত্না তো ঘুমোবেই, কারণ তাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। সে একটা সকালের ইস্কুলে পড়ায়, তাও যেতে হয় বৌবাজারে। প্রথম প্রথম পিনাকী রত্নাকে পৌঁছে দেবার জন্য শ্যামবাজার বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকত খুব সকালে এসে। আজকাল আর হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া রোজ এক জায়গায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দাঁড়ালে কাছাকাছি লোকজনেরা চিনে যায়, তাতে বড় অস্বস্তি লাগে।

রত্না তিনতলার কোন ঘরটাতে থাকে তা পিনাকী জানে। যদিও সে কোনোদিন রত্নাদের বাড়ির তিনতলায় ওঠেনি। রত্নাদের মাত্র দুটো ঘরের ফ্ল্যাট। দুজন লোক।

একদিন ভোরবেলায় পিনাকী দেখেছিল রত্না বৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়ে বাসস্টপের দিকে হেঁটে আসছে। পিনাকী তখন পাশের দোকানের ছাউনির মধ্যে দাঁড়িয়ে।

রত্না সেই বৃষ্টির মধ্যে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাসের দেখা নেই। পিনাকী ছাউনি ছেড়ে ছুটে এল রত্নার কাছে। একটু বকুনি দিয়ে বলল, শুধু শুধু ভিজছ কেন? রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াও।

রত্না বলল, আর কী হবে? একদম ভিজেই তো গেছি।

—কেন ভিজলে? একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

—এ বৃষ্টি কি থামবে? কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

—একটা ছাতা নাওনি কেন?

—থাকলে তো নেব।

—নেই?

—ছিল একটা বাবার...গোল বাঁকানো হাতল। ওই রকম ছাতা নিয়ে মেয়েরা বেরয় না।

—এ সব তোমাদের বাড়াবাড়ি। কাজ চললেই হল। শুধু শুধু ফ্যাশন করতে গিয়ে বৃষ্টি ভেজার কোনো মানে হয়?

রত্না তার ভেজা মুখ তুলে সম্পূর্ণভাবে তাকিয়েছিল। পিনাকীর দিকে। পিনাকীর গলার বকুনির সুর শুনেও সে হেসেছিল। রত্না সহজে রাগে না। বরং পিনাকীকেই সে রাগাতে ভালবাসে।

সে বলেছিল, সেই ছাতার কাপড়ে আবার অনেকগুলো তাপ্পিমারা। সেই রকম ছাতা নিয়ে যদি আমি বেরতুম তুমি খুশি হতে?

পিনাকী তবু জেদ ধরে বসল, হ্যাঁ। বৃষ্টি ভিজে অসুখ বাধানোর চেয়ে সেরকম ছাতা নিয়ে বেরুনও ভাল। লোকে যা বলে বলুক।

রত্না বলল, সেটা নিয়েই বেরুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু খুলতে যেতেই শিকটিকগুলো সব ছটকে গেল। আর একটু হলে আমার চোখে লাগছিল আর কি। ওটা আর সারানোও যাবে না। বাবা বললেন ছাতাটা ছাব্বিশ বছরের পুরনো। তার মধ্যে গত তিন বছর সেলাই হয়নি।

পিনাকী তবু হার মানল না। বলল, একদিন স্কুলে না গেলে কি হত? বৃষ্টি ভিজেও যেতে হবে?

—কদিন ধরে প্রায়ই তো ভোরের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে! কদিন আর স্কুল কামাই করব?

কেন ঠিক ভোরের দিকে বৃষ্টি হবে? পিনাকী ক্রুদ্ধভাবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সকাল ছটার সময় বৃষ্টি নামতে পারে না? রত্নার স্কুলে যাবার সময়টা বাদ দিয়ে? রত্নার একবার প্লুরিসি হয়েছিল। বৃষ্টিভেজা তার পক্ষে খুব খারাপ।

রত্না বলল, তা ছাড়া...একটু থেমে গেল। আঙুল দিয়ে ভুরুর ওপরের জল মুছল। তারপর আবার বলল, তা ছাড়া তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে জানতাম তবু আমার বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগবে?

—আজ আর স্কুলে যেও না!

—কিন্তু বাড়িতেও ফিরব না।

—কেন?

—বাবা খিটখিট করবে! বাবার ধারণা একদিন স্কুলে না গেলেই চাকরি চলে যায়।

—ঠিক আছে, আমাদের বাড়িতে চলো।

—যাচ্ছি। আমার চাকরি গেলে তুমি দায়ী থাকবে কিন্তু...

এটা দেড়মাস আগেকার কথা। পিনাকী আকাশের দিকে তাকাল। মেঘের গায়ে লাল লাল আভা। সারারাত গুমোট গরমে সবাইকে ভুগিয়ে ঠিক ভোরের দিকে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে।

রত্না এখনো ছাতা কেনেনি। বেসরকারি ছোট ইস্কুলটাতে রত্না মাইনে পায় একশো পনেরো টাকা। এর মধ্যে বাসভাড়া আছে, টিফিনেও কিছু খেতে হয়। রত্নার বাবার এখন এক পয়সা রোজগার নেই। রত্না একটু ভাল মাইনে—এই সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি একটা মাস্টারির কাজ পেয়েছিল আসানসোলে। পিনাকী সেখানে রত্নাকে যেতে দেয়নি। রত্না অতদূরে চলে গেলে সে কী নিয়ে থাকবে? তা ছাড়া সেখানেও রত্নার বাবা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে যেতে হবে—মাত্র সাড়ে তিনশো টাকায়...তার চেয়ে কলকাতায় টিউশনি আছে, আরও যদি কিছু পাওয়া যায়...

রত্নাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পিনাকী, ডান পায়ের জুতো ও প্যান্ট কাদায় মাখামাখি, পকেটে একটাও পয়সা নেই। তবু সে আর একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলল। সে খুব আস্তে আস্তে বলল, রত্না খুব শিগগিরই তোমাকে একটা ছাতা কিনে দেব। রঙিন ফুলকাটা ছাতা। সেই যেগুলো বোতাম টিপলেই খোলে আর গুটিয়ে ছোট্ট করে ফেলা যায়, হাত ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো যায়—ঠিক সেইরকম, রত্না খুব শিগগিরই তোমার জন্য...

রত্নাকে যে দিন ছাতাটা উপহার দেবে সে দিন নিশ্চয় রত্না একটু বকবে তাকে বাজে খরচ করার জন্য। পিনাকী উদার হেসে বলবে এ আর এমন কী? এই তো তোমাকে রাজছত্র দিলাম। এর পর তোমাকে রাজপ্রাসাদ উপহার দেব...। মহারানি হর্ষকুমারীর বদলে এই রাস্তার নাম হবে মহারানি রত্নাকুমারীর নামে—কারুর বাপের সাধ্য নেই যে আটকায়।

পিনাকী এরপর পা চালাল বেশ জোরে। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। তাদের পাড়ার কাছাকাছি পানের দোকানটা তখন ঝাঁপ ফেলতে শুরু করেছে। পিনাকী এক দৌড় লাগাল। কোনোক্রমে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দীনুদা এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই।

দীনুদা নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে একবারটি আড়চোখে দেখল পিনাকীকে। সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল না।

—দীনুদা এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই।

—কই পয়সা দিন।

—হ্যাঁ দেব আজ নয়...মানে আমার কত যেন হয়েছে।

—পনেরো টাকা! আপনি নিজেই তো কাল বলে গেলেন যে ওটা শোধ দেবার আগে আর ধার নেবেন না। এখন থেকে নগদা পয়সায়।

—দিতাম, আজই দিতাম। কুড়ি টাকা পকেটমার হয়ে গেল কিনা। বৌবাজারে বাসে কত ভিড়...লোকটাকে আগেই সন্দেহ করেছিলাম।

এ গল্প শোনার ব্যাপারে দীনুদার কোনো উৎসাহ নেই। এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই ছুড়ে দিয়ে বলল, পনেরো টাকা তিরাশি পয়সা হল! সরুন, দোকান বন্ধ করব।

পিনাকী বলল, দিয়ে দেব তোমাকে, সব শোধ করে দেব দীনুদা। আর কোনো চিন্তা নেই।

পিনাকী এমন সুরে বলল কথাটা, যেন সে নতুন চাকরি কিংবা লটারির পুরস্কার পেয়েছে। দীনুদা একবার মুখ ঘুরিয়ে পিনাকীকে না দেখে পারল না। পিনাকী আর দাঁড়াল না সেখানে।

এ পাড়ার কুকুররা পিনাকীকে চেনে। পাশের বড় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর দু-একটা ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। পিনাকী গলির মধ্যে ঢুকল।

তাদের বাড়ির দরজাটা বন্ধ। সন্ধে থেকেই বন্ধ থাকে, না হলে ছিঁচকে চোর ঢুকে পড়ে। দরজার গায়ে স্ক্রু দিয়ে লাগানো পিনাকীর বাবার আমলের লেটার বক্স। রং আর লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ভেতরে উঁকি মেরে দেখল, কোনো চিঠি আছে কি নেই।

পিনাকী মনে মনে ঠিক করলো লেটার বক্সটায় রং করাতে হবে। সুন্দর ঝকঝকে লেটার বক্স না হলে কী আর ভাল ভাল চিঠি আসে? বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর নামে কত চিঠি আসত, পিনাকীর নামে কোনো চিঠি আসে না। একদিন আসবে ঠিকই।

দরজার কড়া নাড়লে একতলার ভাড়াটেরা বিরক্ত হয়। তাদের ঘুম ভেঙে যায়। দরজায় একটা কলিং বেল লাগালে এ সমস্যা মিটে যায়। সাউথ ক্যালকাটার সব বাড়িতেই কলিং বেল থাকে। সেখানে কড়া নেড়ে ডাকে না পিনাকী দেখেছে। এবার তাদের বাড়িতেও একটা কলিং বেল লাগাতে হবে। নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি।

কড়া নাড়তে হল না। তার আগেই দরজা খুলে গেল। মা।

তাদের বাড়িতে বারান্দা নেই। পিনাকী তো দোতলার জানলাতেও কারুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। তবু মা কী করে টের পেল!

—কী করে, এত দেরি করলি?

পিনাকী অস্পষ্টভাবে বলল, এই একটু হয়ে গেল দেরি...। দোতলায় এসে পিনাকী আগে পায়ের কাদা ধুলো...তারপর জুতো জামা খুলতে লাগল একটা একটা করে। মা সর্বক্ষণ তাকিয়ে আছেন পিনাকীর দিকে, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা।

—দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তারপর কী হল? কিছু বলছিস না কেন?

—দাঁড়াও, বলছি বলছি, প্যান্টটা ছেড়ে আসি।

নিজের ঘরে গিয়ে পিনাকী আলো জ্বালল না। তার ছোট ভাইটা ঘুমিয়ে আছে যদি জেগে যায়। অন্ধকারে নগ্ন হয়ে সে পোশাক বদলাল। বেরিয়ে এসে বলল, মা খাবার দাও!

মেঝের ওপর আসন পাতা, তার সামনে খাবার ঢাকাই রয়েছে। রুটি, ডাল আর ঢেঁড়সের তরকারি। খিদেয় পেট চড়চড় করছিল, এতক্ষণ পিনাকী টের পায়নি। সে বেশ উপভোগ করে খেতে লাগল।

—উনি তোকে চিনতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ব্যানার্জি।

—আসল কথাটা কী হল তাই বল না।

পিনাকী হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর খুব সহজভাবে বলল, চাকরিটা হয়নি মা।

মা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। রক্তশূন্য মুখ। তারপর তিনি ফ্যাকাশেভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, তুই আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছিস। তোর তো সব তাতেই ইয়ারকি করা স্বভাব।

পিনাকী মায়ের সঙ্গে একটু ইয়ারকি করবেই ঠিক করেছিল। যদি চাকরিটা হয়ে যেত তা হলে মায়ের কাছে সহজে সে কথাটা ভাঙত না। শেষমুহূর্তে মা কান্নাকাটি শুরু করলে খবরটা দিয়ে মাকে চমকে দিত। কিন্তু যে চাকরি হয়নি তা নিয়ে আবার ইয়ারকি কি? এ ইয়ারকির শেষে তা কোনো চমক নেই।

সে বললে, মিঃ ব্যানার্জি খুব দুঃখ করলেন। ওঁর কোনো হাত নেই এখন। ওঁর সাধ্য থাকলে উনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করতেন আমার জন্য। ওই পোস্টে আগেই লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

মা শুধু বললেন, যাঃ!

—ভালই হয়েছে, চাকরিটা পেলে দুর্গাপুর চলে যেতে হত!

—কিন্তু মাইনে তো ছিল সাতশো টাকা।

—তা ছিল।

—ওটা পেলে আমরাও দুর্গাপুরে গিয়ে থাকতাম।

—পিনাকী দেখল, মা ছেঁড়া শাড়ি পরে আছেন। বিধবার থানের কতই বা দাম, তাও ছেঁড়া? বাবা মারা গেছেন দু বছর আগে। অবস্থা এতটা খারাপ হত না, যদি না বৌদির সঙ্গে মায়ের দারুণ ঝগড়া হওয়ার ফলে দাদা আট মাস আগে আলাদা হয়ে না যেত! দাদা ভালই চাকরি করে। মাসে দেড়শো টাকা করে এখনো এ বাড়িতে দেয়। দাদার পাঠানো টাকা মা ছোঁন না। পিনাকী অবশ্য টাকাটা ফেরত দিতে পারেনি, নিজে চাকরি পেলে দাদাকে সব টাকা শোধ করে দেবে ঠিক করেছে। দাদার টাকায় মা কাপড় কিনবেন না।

পিনাকীই মায়ের জন্য একজোড়া ভাল শাড়ি কিনে দেবে। তার কোনো বন্ধুবান্ধবের মা ছেঁড়া শাড়ি পরেন না। শুধু তার মা একা কেন ছেঁড়া শাড়ি পরবেন? চালাকি নাকি? পিনাকী এটা কিছুতেই সহ্য করবে না।

সে বলল, মা চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে!

মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। মায়ের কান্নাটা যে এখন ঠিক কী কারণে, তা পিনাকী বুঝতে পারল না। মা কি প্রফুল্ল ব্যানার্জির কথা ভাবছেন?

মা-ই পিনাকীকে পাঠিয়েছিলেন প্রফুল্ল ব্যানার্জির কাছে। পিনাকী নিজের চেষ্টায় এতদিন চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মা পিনাকীকে বলেছিলেন, তুই ওঁর সঙ্গে গিয়ে সরাসরি দেখা কর, আমার নাম বলবি, বলবি বেহালার চৌধুরীদের বাড়ির মেয়ে, উনি ঠিক চিনবেন, ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন।

পিনাকী পরে জেনেছিল ওই প্রফুল্ল ব্যানার্জির সঙ্গে আটত্রিশ বছর আগে তার মায়ের বিয়ে হবার কথা ছিল। তখন মায়ের একুশ। বেনি ঝুলিয়ে দুপুরে সিনেমা দেখতে যেতেন। প্রফুল্ল ব্যানার্জি মাকে বিয়ে করার জন্য খুব পাগল হয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত দু-বাড়ির ঘোর আপত্তিতে হয়নি।

প্রফুল্ল ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়ে পিনাকীর বেশ মজা লেগেছিল। এই লোকটি তার বাবা হলেও পারত। তা হলে সে এই কেয়াতলা রোডের বাড়িতে থাকত, কুকুরের গলায় চেন বেঁধে বেড়াতে যেত বিকেলে।

আটত্রিশ বছর আগেকার দুর্বলতার কথা মিঃ ব্যানার্জি বিশেষ মনে রাখেননি। তিনি মায়ের এই নাম শুনে চিনতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর এই হলেও-হতে-পারত ছেলেটির প্রতি আলাদা কোনো আগ্রহ দেখাননি। শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে আপনি আপনি সম্বোধনে কথা বলেছেন পিনাকীর সঙ্গে। চাকরিটা পেয়েছে তারই বর্তমনা শালা।

তিনতলা-চারতলায় অত ভাড়াটে আছে কিন্তু ছাদের দরজাটা খোলাই থাকে। খেয়ে উঠে পিনাকী সিগারেট-দেশলাই নিয়ে ছাদে উঠে গেল। ঠান্ডা হাওয়ায় বসে এই সময় গোটা দুই সিগারেট টানতে চমৎকার আরাম।

তিনতলার ভাড়াটেদের রেডিওর এরিয়ালের তারটা বেশ উঁচু। আগে পিনাকী লাফিয়ে সেটা ছুঁতে পারত। এখন কি পারে? তিনবার লাফিয়ে সেটা ছুঁয়ে দিল। এখনো পারে। তার গায়ে জোর আছে, শরীরে কোনো অসুখ নেই, একটা কমার্স ডিগ্রি আছে, সে কেন হেরে যাবে?

ইদানীং পিনাকী বড্ড বেশি হেরে যাচ্ছিল। সব সময় তার মুখে একটা তেতো স্বাদ। সতেরো জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবার পর ও ভেবেছিল আর কিছুই হবে না তার দ্বারা। ছোট ভাইটা পড়াশুনোর ব্যাপার নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে এলে, দু দিন আগে পিনাকী তাকে ধমক দিয়েছে কুৎসিত ভাষায়। পরপর কয়েকদিন রত্নাকেও সে এড়িয়ে গেছে। দূর থেকে রত্নাকে দেখেও কাছে যায়নি। সিগারেট কেনেনি পাড়ার দোকান থেকে। মায়ের মুখের দিকে তাকায়নি। সে হেরে গিয়ে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। দারিদ্র্য শুধু তাকে বিপদে ফেলেনি, তার মনটাকেও ছোট করে দিচ্ছিল। সে ছোট ভাইয়ের জ্যামিতির বাক্সও পুরনো কেনার কথা ভাবে।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা মাটিতে জোর ছুড়ে ফেলে সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি পিনাকী সরকার, আমাকে আটকাবে কোন শালা!

এবার নীচে ফিরে যেতে হবে। সে না গেলে মা ঘুমোবে না। মা কি এখনো কাঁদছে?

পিনাকী ফিসফিস করে বললো, মা, চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য দুটো নতুন শাড়ি...আনি পল্টুর জন্য নতুন চকচকে জ্যামিতির বাক্স...আমাদের দরজা, কলিং বেল...রত্নার জন্যে ফুলকাটা ছাতা...রত্না তার সবচেয়ে প্রিয় শাড়িটা পরে আসবে সে দিন, ঝকঝকে রোদের মধ্যেও ওর মাথায় রঙিন ছাতা—ওর মুখে একটা অন্যরকম আলো পড়বে—রত্না আসবে এ বাড়িতে...

পল্টু ছুটে যাবে মোড়ের দোকান থেকে সন্দেশ কিনে আনতে, মা, তুমি হাসবে, কতদিন পরে তোমার মুখে এরকম হাসি...মা, আমি দিতে পারি এইসব। বিশ্বাস করো, আর সবাই কত কী পারে, আর আমি এই সামান্য কটা জিনিস...কেন পারব না? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...মা আমি তোমাদের জন্য সবকিছু...আমি পারি। আমি পারি, আমি কেন পারব না? আমি অন্যদের থেকে কম কিসে।

কিন্তু সবচেয়ে আগে চিঠির বাক্সটা রং করা দরকার। কাল সে নিজের হাতে ওটা রং করবে। রঙিন ঝলমলে ডাক বাক্সটাতে একদিন একটা সুন্দর চিঠি আসবে। যে চিঠিটা তাকে বলবে, পিনাকী, তুমি পারো, তুমি পারো, তুমি সব পারো!

বিজন তুমি কি

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছো?

—না, করিনি!

বিজন, তুমি অত জোর দিয়ে বলছো কেন? তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা আছে? ভালো করে ভেবে দ্যাখো!

—না, কোনো দ্বিধা নেই। খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি। আমি আদর্শের জন্য লড়াই করছি।

—তা হলে তুমি এরকমভাবে একজন হীন অপরাধীর মতন লুকিয়ে রয়েছো কেন?

যে আদর্শবাদী, তাকে কি এরকম মানায়?

—নিশ্চয়ই মানায়। এটা একটা স্ট্রাটেজি। আমি এখন বাইরে বেরুলেই পাগলা কুকুরগুলো আমায় ছিঁড়ে খাবে। যতদিন সব কটা কুকুরকে পিটিয়ে না মারা হচ্ছে—

অন্ধকার ঘরটার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে বিজন। প্রচণ্ড গরমকালের দুপুর, আশেপাশে কোথাও কোনো মানুষজন নেই, বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, ঘুম এসে যাচ্ছে বিজনের। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে গেছে, গত তিনদিন ধরে পরে আছে এই গেঞ্জিটা। জামাটা খুলে রেখে দিয়েছে মেঝের ওপর, তার নিচে ঢাকা পড়েছে বড় ছুরিটা।

ছুরিটায় এখন রক্ত লেগে নেই। বিজনের হাতেও রক্ত নেই—সে তো তিনদিন আগেকার ঘটনা। কাল রাত্তিরবেলা স্নান করেছিল পুকুরে, এখন আবার স্নান করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বেরুবার উপায় নেই দিনের বেলা। রতনটা জোর করে গোঁয়ারের মতন বেরোলো। এখনো আসছে না কেন রতন? বিজন মনে মনে বুঝতে পারছে এরকমভাবে নির্জন পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে থাকবার মানে হয় না। এখানেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। লোকজনের মধ্যে ফিরে যেতে হবে, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকাই নিরাপদ।

রতন গেছে খাবার জোগাড় করে আনতে। তিন দিন ধরেই তো তাকে বাজে খাবার খেয়ে কাটাতে হচ্ছে। গরম গরম ভাত, ডাল আর আলুসিদ্ধ যদি পাওয়া যেত এখন, ঠিক অমৃতের মতন লাগতো। উঃ, কতদিন যেন ওসব খাওয়া হয় নি। হিরণ্ময় যে কোনদিকে ছিটকে চলে গেল কে জানে। ধরা পড়ে নি, খবরে কাগজে নাম নেই কিন্তু একা একা গেল কোথায়? ও তো জানতোই যে—এখানে এসে....

বাঁ পা মচকে গেছে বিজনের, ব্যাথায় অসাড়। খিদে তেষ্টা গরমে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। রতনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। রতন না আসা পর্যন্ত ঘুমোলেও চলবে না, যদি কোনো উটকো লোক হঠাৎ এসে পড়ে—

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছো?

—না, করিনি।

আবার ভেবে দ্যাখো। এখন তো তুমি একা, নিজের কাছে লুকোবার দরকার নেই।

—না, অন্যায় করিনি।

অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, দলের নির্দেশ ছিল হেম চৌধুরীকে শেষ করে দেবার। হেম চৌধুরী ছিল প্রগতিশীল দলের শত্রু। মুক্তির লড়াই চালাবার জন্যই তাকে সরিয়ে দেবার দরকার হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিগত অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনদিন আগে ভোরবেলা বিজন, হিরণ্ময় আর রতন দাঁড়িয়ে ছিল, হেম চৌধুরীর বাড়ির সামনের রাস্তার মোড়ে। হেম চৌধুরী রোজ ভোরবেলা বেড়াতে বেরুতেন। রতন আগে থেকেই খবর এনেছিল—উনি রোজ ঠিক সাড়ে ছটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েন। আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু সাড়ে ছটা বেজে গেলেও উনি বেরোন নি। ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু দূরে দূরে, যেন কেউ কারুকে চেনে না। প্ল্যান সব ঠিক করাই ছিল আগে থেকে। অথচ সেই দিনই হেম চৌধুরীর বাড়ি থেকে না বেরুবার কারণ কী—খবর পেয়ে গেছে আগে থেকে! অসম্ভব, ওদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতক নয়।

হিরণ্ময় কাছে এসে বলেছিল, আজ বোধ হয় আর মক্কেল বেরুবে না। চল, আবার কাল এসে অ্যাটেম্পট করে যাবো। রতন জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বেরুলো না কেন?

—ঘুম ভাঙে নি বোধ হয়!

—মর্নিং ওয়াক করা যাদের স্বভাব, তাদের ঠিকই ঘুম ভাঙে।

—সর্দি জ্বর-টর হয়েছে বোধ হয়!

—বোধহয়-টোধহয় নয়। ডেফিনিটলি জেনে যেতে হবে।

—আজ আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, খবর-টবর নিয়ে কাল আবার আসা যাবে।

এরকম সামান্য কারণে প্ল্যান করা যায় না।

বিজন চুপ করে শুনছিল ওদের কথা। এবার সেও বলেছিল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। ফট করে প্লান বদলানো উচিত নয়। মোটে তো পৌনে সাতটা বাজে। আরও অন্তত আধঘণ্টা ওয়েট করে যাবো। হিরণ্ময় বলেছিল, এরপর বেশি রোদ উঠে গেলে কি আর কেউ মর্নিং ওয়াকে যায়! রাস্তাতেও লোকজন বেড়ে যাবে অনেক।

—বাড়ুক।

—বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছে। চল, ঝট করে এক রাউণ্ড চা মেরে আসি।

—পজিশন ছেড়ে এক পাও নড়বি না, হিরণ্ময়। পরে চা খাবার ঢের সময় পাবি। আমরা সোলজার, আমাদের প্রত্যেক স্টেপে ডিসিপ্লিন মানতে হবে।

রতন খুব জোর দিয়ে বলেছিল কথাগুলো। রতনের উপর যে কোনো কাজের ভার দিয়ে নির্ভর করা যায়। রতন এখনো আসছে না কেন? খাবার পায়নি? না পেলেও ফিরে আসা উচিত ছিল। এখানে কেউ ওকে চেনে না। যাই হোক রতন পুলিশের হাতে ধরা পড়বে না কিছুতেই—ও ঠিক বেরিয়ে আসবে। তবে দালাল পার্টির লোকেরা যদি—

আবার ঘুম এসে যাচ্ছে বিজনের। জোর করেও চোখ খুলে রাখতে পারছে না। আর কিছু না, যদি এক কাপ চা-ও পাওয়া যেত এখন। রতন বলেছিল, পরে চা খাওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সময় আসবে, সমাজের শত্রুগুলো যেদিন সব কটা খতম হবে। হিরণ্ময়ের মনটা একটু দুর্বল ছিল—যদি বেশি নার্ভাস হয়ে যায়...

ঘুম আসছে, দারুণ ঘুম—এদিকে তো কোনো লোকজন নেই। বিজন কি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে না? একটুখানি ঘুম, অন্তত পাঁচ মিনিট...

—দাদু! দাদু!

একটা কচি গলার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে বিজন ধড়মড় করে জেগে উঠলো; সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কে চ্যাঁচাচ্ছে? একটুক্ষণ কান পেতে শুনলো। কোনো শব্দ নেই। মচকানো পা-টা ঘষতে ঘষতে বিজন উঁকি মারলো বাইরে। কেউ কোথাও নেই। অথচ সে স্পষ্ট শুনলো, একটা বাচ্চা মায়ের চিৎকার। তাহলে কি সে স্বপ্নের মধ্যে শুনেছে? সেই মেয়েটা—

বিজন, তুমি কি কোনো অন্যায় করেছ?

—না, কোনো অন্যায় করি নি।

হেম চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে। বিজন, হিরণ্ময় আর রতন একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। রতনের কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। তিনজনেরই পকেটে হাত। তিনজন একবার চোখাচোখি করলো। হেম চৌধুরী গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই—

না, বিজন সে দৃশ্যটা আর ভাবতে চায় না। কেন বারবার মনে আসছে! অতীতের দিকে তাকানোর কোনো মানে হয় না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন তাকে বাঁচতে হবে। আবার কাজে নামতে হবে। সামনে কত কাজ, এখনো মানুষের সমাজে দুশমনরা গিজগিজ করছে। বাঁচতে হবে, এরকমভাবে পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে থাকলে আর চলবে না। আর রাত্তিরেই এখান থেকে বেরিয়ে—বাঁ পা-টায় কিছু ওষুধ-টষুধ না লাগালে যদি বেড়ে যায়—

হেম চৌধুরীকে চিনতোই না বিজন। আগে কোনোদিনও দেখে নি। সুতরাং তাকে খতম করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোনো কারণের প্রশ্নই আসে না। রতন তাকে বলেছিল হেম চৌধুরী একজন শ্রেণী শত্রু, তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। দলের নির্দেশে কাজ করেছে বিজন। শুধু সেই মেয়েটা—। আশ্চর্য! একজন মানুষ সম্পর্কে যখন ভাবা হয়, তখন কথাটা মনেই পড়ে না যে, সে কারুর সন্তান বা কারুর ভাই বা কারুর বাবা, তার জীবনের সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত।

বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছো।

—না, আমি কোনো অন্যায় করি নি।

প্রথম ছুরির আঘাত করেছিল রতন। তারপর ওরা তিনজনেই, ওরা তিনজনেই একসঙ্গে এত জোরে দৌড়ে গিয়ে হেম চৌধুরীর গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল যে তিনি আত্মরক্ষা করার সামান্য সুযোগও পাননি। হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, চোখ ভর্তি বিস্ময় নিয়েই মারা গেলেন। প্রথম আঘাত খেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরে বাবারে, একি, একি। মেরো না, আমাকে মেরো না—। সেই সঙ্গে একটা শিশুর চিৎকার।

খবর রাখা হয়েছিল যে হেম চৌধুরী রোজ সকালে বেড়াতে বেরোন। কিন্তু একথা কেউ বলেনি যে ওর সঙ্গে ওর নাতনিও থাকে। পাঁচ ছ বছর বয়েস, টুকটুকে সুন্দর চেহারা, জাপানি পুতুলের মতন দেখতে। মাথার চুলগুলো রেশমের মতন।

আগে ওই বাচ্চা মেয়েটিকে ওরা লক্ষ্যই করে নি। বিজন প্রথম ছুরি তুলেই ওকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। তখন রতন পর পর দুবার ছুরি মেরেছে হেম চৌধুরীর ঘাড়ে। কথা ছিল প্রত্যেককেই করতে হবে, প্রত্যেকেরই হাতে যেন লাগে রক্ত, কেউ যেন দায়িত্ব এড়াতে না পারে।

তখন আর ফেরার পথ নেই বিজনের। হেম চৌধুরী পড়ে গেছেন মাটিতে। রতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—বিজনও ছুরিটা তুলে মারলো, আর একদিক হিরণ্ময়—হেম চৌধুরী পড়ে চিনতে পেরেছেন, রতনের হাত জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলছেন, এক, রতন বাঁচাও, মেরো না আমাকে। সুতরাং তখন আর হেম চৌধুরীকে একটুও বাঁচিয়ে রাখা চলে না—একেবারে শেষ করে দিয়ে যেতে হবে—।

অনেক সময়, এই রকম পরিস্থিতিতে বয়স্ক সঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে যায়, হেম চৌধুরীর সঙ্গেও যদি বয়স্ক কেউ থাকতো, ওদের বাধা দেবার বদলে নিজের প্রাণ সামলাতো। কিন্তু শিশুর তো ওরকম ভয় বোধ নেই, সে বোধহয় প্রথমে বুঝতেই পারে নি কি হয়ে যাচ্ছে। সে দাদু দাদু বলে চিৎকারে করে জড়িয়ে ধরলো হেম চৌধুরীকে। তখনও হেম চৌধুরীর শরীরে প্রাণ আছে—এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না, যেটুকু সময় বেঁচে থাকবে, তার মধ্যেই রতনের নাম বলে দেবে। কিন্তু আবার মারতে গেলে মেয়েটার গায়ে লাগবে।

রতন চাপা গর্জন করে বিজনের দিকে তাকিয়ে বলে দিল, মেয়েটাকে সরা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বোমা বার করেছে রতন, পালাবার সময় ব্যবহার করতে হবে। বিজন টেনে হিঁচড়ে দূরে সরিয়ে দিল মেয়েটাকে, তার হাতের রক্ত লাগলো মেয়েটার বাহুতে। রতন ততক্ষণ বোমা ছুঁড়েছে হেম চৌধুরীর গায়ে—। শেষবারের মতন দেখছিল বিজন, সেই মেয়েটার মুখখানা যেন নীল হয়ে গেছে, বিস্ফারিত দুটি চোখ—

বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছো?

—না, করি নি। আগে জানতাম না, সঙ্গে ওই বাচ্চা মেয়েটা থাকবে।

একটা নিষ্পাপ শিশু। তার চোখের সামনে এই বীভৎস কাণ্ড হয়ে গেল—ওকি সারাজীবনে আর সুস্থ হতে পারবে? ওতো কোনো দোষ করে নি—ওর জীবনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়—

আমি দায়ি নই। সেজন্য আমি দায়ি নই। একটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ওই মেয়েটার দাদু তো গাড়ি চাপা পড়েও মারা যেতে পারতো।

কিন্তু মানুষের হাতে মানুষের মরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্য। ওই মেয়েটির চোখের সামনে—

—ভুলে যাবে। সব ভুলে যাবে।

যদি না ভোলে? বিজন তোমার মনে কি কোনো কথা দাগ কাটে নি?

—না, আমি যা করেছি আদর্শের জন্যে, ও রকম একটা বাচ্চা মেয়ে এসে ভিকটিমের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা তো আগে ভাবি নি।

সন্ধে হয়ে গেল, তখনও রতন ফিরলো না। খিদে আর পায়ের যন্ত্রণা—মিলিয়ে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো বিজনের কাছে। কিছুই যখন করার নেই, বিজন আবার ঘুমিয়ে পড়লো। সারা অঙ্গে, সারা রাত মড়ার মতন পড়ে পড়ে ঘুমোলো বিজন। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লো সেই লুকোনো আশ্রয় থেকে। এখন আর তার কোনো ভয় নেই, এখন আর সে আত্মা ক্ষমার জন্য সতর্ক নয়, তাকে মানুষের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে।

দিন সাতেকের মধ্যে বিজন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। ফিরে এল বাড়িতে। তাকে কেউ সন্দেহ করে নি, পুলিশ তাকে খোঁজ করে না। সে এখন পরিষ্কার জামা পরে, রোজ দাড়ি কামায়—রাস্তায় যখন বেরোয়—সমস্ত মানুষের মধ্যে সে মিশে যায়, তাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কেউ বুঝতেই পারবে না, মাত্র দিন দশেক আগে তার হাত মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল।

মাঝে মাঝেই বিজন নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি অন্যায় করেছি? সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃঢ়ভাবে উত্তর দে, না অন্যায় করিনি। কোনো অন্যায় করিনি। আদর্শের জন্য—

হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে বিজন হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হেম চৌধুরীর বাড়ির রাস্তায়। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে বাড়িটার দিকে। কি একটা দুর্বোধ্য কারণে তার ইচ্ছে হয় ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে। ইচ্ছেটা এমনই তীব্র যে এক একদিন সে একেবারে ওই বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাড়িটাতে কিংবা সামনের ওই রাস্তায় সেদিনের কোনো চিহ্নই নেই। বাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ, নিস্তব্ধ; কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঠিক আগের মতই লোক চলাচল করে, পানের দোকানের সামনে ভিড়, বাড়িতে বাড়িতে রেডিও বাজে।

ঠিক যে জায়গায় হেম চৌধুরী পড়ে গিয়েছিলেন বিজন সেখানে দাঁড়ায়। আজ তার হাতে রক্ত নেই কেউ তাকে চেনে না।

পর পর কয়েকদিন ও পাড়ায় এসে ঘোরাঘুরি করার পর বিজন নিজেই আবার সচেতন হয়ে গেল। এ রকমভাবে সে আসছে কেন? এটা কি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তার মধ্যে কি বিবেক যন্ত্রণা জেগেছে? না, মোটেই না, সে তো কোনো অন্যায় করে নি।

তবু যুক্তিহীন ভাবে তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় হেম চৌধুরীর বাড়িতে একবার ঢুকতে, একবার সে দেখে আসতে চায়—। একজন মানুষ শুধু একজন আলাদ মানুষ নয়—সে কারুর ভাই। কারুর স্বামী...

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে না বিজন কিন্তু ও পাড়ার পানের দোকানের সামনে অনাবশ্যকভাবে অনেকক্ষণই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কিছু না ভেবেই পানওয়ালাটাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা হেম চৌধুরী কোন বাড়িতে থাকেন?

পানওয়ালা সন্ত্রস্তভাবে তাকায়। তারপর দ্রুত উত্তর দেয়, উনি তো মারা গেছেন।

এ কথা শুনে চমকাবার ভান করা উচিত ছিল বিজনের। কিন্তু সে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, একটা ছোট মেয়ে, ওই বাড়িতে থাকে, পাঁচ দশ বছর বয়েস, তার কোনো খবর জানো?

পানওয়ালা চোখ নিচু করে, দ্রুত রাস্তার দিকে তাকায়, তারপর নিঃস্ব মানুষের মতন বললো, তার কথা আর বলবেন না বাবু, রোজ আমার দোকান থেকে টফি কিনে নিয়ে যেত—আজ দশদিন ধরে তার জ্ঞান ফেরেনি—অনবরত ভুল বকছে...ওরই তো চোখের সামনে...বোধ হয় বাঁচবে না, এরপর আর না বাঁচাই ভালো—

বিজন হনহন করে চলে গেল দোকানটার সামনে থেকে। আর কোনো দিকে তাকালে না। হাঁটাতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে—হাঁপিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর একটা পার্কের রেলিং ধরে যেই দাঁড়িয়েছে অমনি তার মনের মধ্যে আবার সেই প্রশ্ন ঃ

বিজন তুমি অন্যায় করেছ?

বিজন জোর দিয়ে বললো, না। সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে সেই অন্ধকারে একা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

দূর উদাস

এই ডাবু, বুড়োকে ডাক।

—ডাকছি ওস্তাদ।

—ছুটে যাবি, দৌড়ে আসবি। কুত্তাকা চাল। বিল্লিকা চাল নেহি, সমঝা?

—সমঝা গিয়া ওস্তাদ! চা-টা মেরে দিয়েই যাচ্ছি।

—যাবার সময় খোঁজ নিয়ে যাবি, নটা পঁচিশের রাণাঘাট লোক্যালে লেট আছে কি না।

—এস্টেশানে যাবো?

—হ্যাঁ, যাবি। আর বুড়োকে বলবি এক্ষুণি আসতে।

চায়ের দোকান থেকে উঠে ডাবু বেরিয়ে গেল। তার চলার ধরনটা একটু অদ্ভুত। দেখলে মনে হয় তার কোনো স্নায়ুর অসুখ আছে। সে সামনে তাকিয়ে চলতে জানে না, হঠাৎ ডান দিকে বাঁ দিকে। পেছনে মাথা ঘোরায়। তার দুটো হাত কখনও এক সঙ্গে বাইরে থাকে না—একটা হাত পকেটে থাকবেই। চলতে চলতে সে অনবরত রাস্তার পার হয়ে ফুটপাথ বদল করে। কোনো মেয়ে দেখলেই তার চোখ আটকে যায়। তখন সে একটুখানি থামে। তখন সে ঠোঁট নাড়ে ও চোখ পিটপিট করে। মেয়েটির স্বাস্থ্য যত ভালো হবে, তার এই ধরনের প্রক্রিয়া তত বৃদ্ধি পাবে।

—এই পরী, এদিকে আয়।

—কী ওস্তাদ!

—দ্যাখ তো এই লাইটারটার কী হয়েছে? জ্বলছে না শালা! কাল সকালেই তেল ভরেছি।

—পাথর ফুরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

—ধ্যাৎ তেরিকা।

—সে কি ওস্তাদ। ফেলে দিলে। দামি জিনিসটা।

—চুপ মার। আবার আসবে।

পরী চুপ করে গেল। ওস্তাদ অর্থাৎ পল্টুর এরকম উপসর্গ সে চিনতে পারে। এক একদিন হয় এরকম পল্টুর, যেদিন জিনিসপত্তর নষ্ট করার একটা ঝোঁক চাপে তার। ওই যে দামি লাইটারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, ওটা পরী যদি এখন কুড়িয়ে নিতে চায়, প্রচণ্ড ধাতানি খাবে। খানিকটা আগে সিগারেট কিনে টাকা ভাঙাবার সময় পল্টুর হাত থেকে একটা টাকা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, পল্টু আর টাকাটা তুললোই না। কাছেই একটা ভিখিরির ছেলে অন্য একজন লোকের পাশে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিল, পল্টু তাকে ডেকে টাকাটা দেখিয়ে বললো, এই লে লে এই যে, লে।

আরও অনেক কিছু পল্টু আজ ফেলে দেবে বা নষ্ট করবে।

পল্টু, পরী, ডাবু, বুড়ো—ওদের প্রত্যেকেরই একটা করে ভালো নাম আছে। কিন্তু বহুদিন সেই নাম ব্যবহৃত হয়নি, কেউ ডাকেনি।

ওরা বসেছিল চায়ের দোকানের একটা কেবিনের মধ্যে। পর্দা ফেলা নেই, কিন্তু ওদের ওখানে কেউ ঢুকবে না। না ডাকলে বেয়ারাও আসবে না উঁকি মারতে।

পল্টু তার কাপে যেটুকু চা ছিল সেটা ঢেলে ফেলে দিল অ্যাসট্রেতে। তারপর মাটিতে রাখা ঝোলাটা থেকে নিচু হয়ে সাবধানে হাত চালিয়ে আনলো একটা মদের বোতল। নিজের কাপে পুরো ভর্তি করে পরীকে বললো দে কাপ দে। ডাবুর সামনে বার করিনি, ও একটুতেই ধচকে যায়, কি জিনিস দেখেছিস?

পরী মদের বোতলটার লেবেল পরীক্ষা করে বললো, আরে ঃ বাস। দারুণ—

পল্টু কাপটা মুখের কাছে তুলে সেই র জিনিসটা খেয়ে ফেললো এক চুমুকে। মুখের একটা শিরাও কাঁপলো না, হেঁচকি উঠলো না। পরী সপ্রশংসভাবে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এই না হলে আর ওস্তাদ।

ওই তীব্র আরক পান করার প্রতিক্রিয়া মাত্র দেখা গেল পল্টুর চোখে।

চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে লালচে হয়ে গেল।

কাপ আবার ভর্তি করে পল্টু বললো, এইসব দিনে কাকে বেশি মনে পড়ে জানিস? পাগল্যাকে। পাগল্যা চলে গিয়ে আমার ডান হাতখানা নষ্ট হয়ে গেছে।

পরী বললো, পাগলা শালা কেন পলিটিকসে ভিড়তে গেল। আমি তখুনি বলেছিলাম, ও সব ছেঁড়া ঝামেলা। এক একদিন এক এক রকম কথা বলে—

পল্টু গম্ভীর হয়ে যায়। আপন মনে বলে, পাগলার মাগিটাও ছিল ঝনঝটিয়া।

ডাবু এসে বললো, বুড়ো আসতে পারবেনা। ও বললো ওর জ্বর হয়েছে।

পল্টু ক্রুদ্ধভাবে বললো, ও বললো, না তুই দেখলি?

—বুড়ো শুয়ে আছে দেখলাম। সাবি আমাকে বললো—

পল্টু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল, দেখে আসি। ট্রেন লেট আছে?

—কুড়ি মিনিট।

রাস্তা দিয়ে ওরা তিনজন পাশাপাশি হাঁটে না। ছড়িয়ে থাকে। এই শহরতলির পথ, ঘাট, বাড়ি, দোকানপাট ও জীবনযাত্রার যে একটি নিজস্ব নিয়ম আছে, ওরা তার থেকে একটু বাইরে। ওরা একই সঙ্গে সতর্ক ও ছটফটে।

মানুষ শিকারির জাত। পশু শিকারকে ভিত্তি করে এক সময় মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। অনেকদিন কাটলো এই পৃথিবীতে। এখন বড় বড় পশুরা প্রায় নির্মূল, খাবারের জন্য পোষ মানা পশুদের চাষ হয়। তবু নিসপিস করে মানুষের হাত। মানুষ এখন শিকার করে মানুষকে। সুসভ্য প্রাসাদ-নিবাসী মানুষও মানুষ শিকারি। এরা তারই একটা উল্টো পিঠ।

এখানকার রাস্তার সব ভাগ করা। এরকম দুটি দলের একই সময়ে একই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। অরণ্যের নিয়মও এই রকম।

তবে পল্টু উপস্থিত থাকলে তার দলকে কেউ বিশেষ ঘাঁটায় না। এখন কিন্তু পল্টুই ওদের নির্বিঘ্নে চলে যাবার অধিকার দিল। দল নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে পল্টু। হাতের সিগারেটটা আদ্ধেকও শেষ হয়নি, সেটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরালো মনোযোগ দিয়ে—

রেল লাইন পেরিয়ে গেলে বস্তি। বস্তির এক কোণে বুড়োর ঘর। বুড়োর বয়স বছর তিরিশেক। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বুড়ো, খাটিয়ার পাশে একটি পাতলা চেহারার মেয়ে দাঁড়িয়ে।

পল্টু ঘরে ঢুকে বুড়োর গা থেকে চাদরটা একটানে তুলে ফেলে বললো, ওই শালা!

—মাইরি, আমার জ্বর হয়েছে, আজ আমি যাবো না!

—ভাল্লুক শালা! তোর জ্বরের ইয়ে মারি।

পরী হাসছে পল্টুর যেমন জিনিসপত্তর নষ্ট করা, বুড়োর তেমন জ্বর। প্রত্যেকবার এই রকম হয়।

পল্টু মদের বোতলটা বার করে বুড়োর মুখে ঠেসে দিয়ে বললো, খা শালা, তোর জ্বরের বাপ পালাবে।

পাতলা চেহারার মেয়েটি পল্টুকে তেজের সঙ্গে বললো, কি হচ্ছে কি? ও আজ যাবে না। আমি বলছি, যাবে না!

পল্টু হাসলো। এরকম ভয়ংকরভাবে হাসা কি সে অভ্যেস করেছে, না তার সহজাত? দেখলেই গা শিরশির করে।

খপ করে সে মেয়েটির একটি হাত চেপে ধরেই সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে দিয়ে বললো, দিই ভেঙে দিই?

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে মেয়েটি বললো, উঃ লাগছে, লাগছে—

পল্টু হাসতে হাসতে আরও মোচড়াতে লাগলো। বুড়ো ততক্ষণে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। খানিকটা অনুনয়, খানিকটা ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললো, কি যে করো তুমি ওস্তাদ। মেয়েছেলের গায়ে হাত দাও কেন?

পল্টু সে কথা গ্রাহ্য না করে মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষালো। বললো, আমার মুখের ওপর কোনোদিন কথা বলবি না, বুঝলি?

তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বললো, যন্তর নিয়েছিস? ৮-৭।

মেয়েটি তার যন্ত্রণাকাতর হাতটি আদর করতে করতে বললো, মরো, আজই তোমরা সব্বাই মরো! আমি হরির লুট দেবো! মা শেতলার পুজো দেবো। তোমাদের চিতায় বসে কেত্তন গাইবো!

একটা দশ টাকার নোট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পল্টু বললো, চলি সাবি! তোর বুড়োকে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেবো। আমি মরি আর না মরি, তোর বুড়োকে ঠিক ফেরত পাবি মাংস আনিয়ে রাখবি, বুঝলি?

এরপর ওরা বস্তির পেছনে দাঁড় করানো একটা জীপ গাড়িতে চেপে অনর্থক ঘোরাঘুরি করলো মিনিট পনেরো। কোনো উদ্দেশ্য নেই, একটি গাড়ি চেপে ঘোরা। গাড়িতে ঘুরতে ঘুরতেই মদের বোতলটা শেষ হয়ে গেছে। পল্টু সেটা ছুঁড়ে দিল রাস্তায়, ঝনঝন করে ভাঙলো। জীপ এসে থামলো রেল স্টেশনের সামনে, ওরা তিনজন নামলো. পরী জীপটা চালিয়ে চলে গেল অন্য কোথাও।

স্টেশনেও ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ট্রেন আসতে তিনজনে উঠলো তিনটে কামরায়। যেন কেউ কারুকে চেনে না। মিনিট পনেরো চলার পর ট্রেনটা দুটো লম্বা একটা ছোট হুইসিল দিতে দিতে গতি মন্থর করে থেমে গেল অন্ধকার মাঠে। কেন থামলো, কেউ জানে না।

তিনটে কামরা থেকে টপাটপ নেমে নড়লো ওরা তিনজন। দুএক মুহূর্ত কি কথার বিনিময় হল। তারপর তিনজনেই উঠে পড়লো একটা কামরায়। ট্রেন আবার খুব আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে।

পল্টুর হাতে রিভলবার। ডাবু আর বুড়োর হাতে ছুরি। কামরাটায় উনিশ কুড়ি জনের বেশি যাত্রী নেই। পল্টু হিংস্র দাঁত দেখিয়ে বললো, কেউ একটু চেল্লালে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো! বার কর শালারা কি আছে!

কামরার লোকেরা পুতুলের মতন নিথর নিস্তব্ধ। শুধু একজন মাঝ বয়েসি মহিলা আর্ত শব্দ করে উঠলেন। তিনিই ওখানে একমাত্র মহিলা। কেউ কিছু বার করে দিল না। বুড়ো সত্যিকারে একজন বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, ঘড়িটা খোল শালা। হাঁ করে দেখছিস কি?

ঘড়ি খোলার অনুরোধে, কিংবা শালা বলে সম্বোধন করার জন্যই হোক—বৃদ্ধটি রীতিমতন হতভম্ব হয়ে যায়।

নিতান্ত অকারণেই, শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, পল্টু তার কাছাকাছি যে লোকটি ছিল তার বুকে রিভলবারটা ঠেকিয়ে চারটি বীভৎসতম গালাগালি দিল, তারপর এত জোর ঘুষি মারলো তার মুখে যে লোকটির ঠোঁট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল। এবার টাকা পয়সা, ঘড়ি পড়তে লাগলো টপাটপ। ডাবু সেসব ভরে নিচ্ছে থলিতে, বুড়ো গিয়ে জনে জনে পরীক্ষা করছে। একজন লোকের গেঁজের মধ্যে সাত হাজার টাকা পাওয়া গেল। অত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে রাত্রির ট্রেনে ঘোরে কেন তার বা উত্তর কে দেবে!

প্রৌঢ়া মহিলা তার গলার হারটা কিছুতেই দেবেন না। অলংকারের প্রতি মেয়েদের বড্ড বেশি মায়া। পল্টু নিজে এগিয়ে গেল মহিলার কাছে। হারটা ধরে হ্যাঁচটা টান দিয়ে ছিঁড়তে গেল। সহজে ছেঁড়ে না। মেয়েদের প্রতি পল্টু স্বভাবতই নিষ্ঠুর, মহিলার বুকে এক হাতের ভর রেখে অন্য হাতে টানাটানি করতে লাগলো হারটা। যখন সেটা ছিঁড়লো, তখন মহিলা দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন একটা আর্তনাদ করলেন। শারীরিক যন্ত্রণায় কিংবা সোনা হারাবার দুঃখে।

সব মিলিয়ে জিনিসপত্তর মন্দ হয় নি। কিন্তু তবু ওদের নামার তাড়া নেই। দুজন লোককে বেছে নিয়ে ডাবু আর বুড়ো তাদের বুকের কাছে ছুরি ধরে প্যান্ট খোলাচ্ছে। এটা নিছক খেলা নয়। প্যান্টগুলোর সত্তর-আশী টাকা করে দাম, টেরিলিন। একজন লোক প্যান্ট ও শার্ট দুটোই খুলে দিয়েছে। অন্য লোকটির লজ্জা বেশি। সে কিছুতেই প্যান্ট খুলতে চায় না। বুড়োর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ছুরিটা বসিয়ে দিল লোকটির পেটে। লোকটির লজ্জার মূল্য।

রক্ত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা বদলে গেল। এতক্ষণ সবাই চুপ ছিল। এবার ভয়ার্ত চেঁচামেচি। ওরাও এবার অতি দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। ট্রেন চলছে তখনও খুব আস্তে আস্তে। ওরা লাফিয়ে নেমে পড়লো। এবং কামরার চেঁচামেচি বেড়ে গেল বহুগুণ।

এরপর বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব বুড়োর। ঝোলা থেকে বার করে পর পর তিনটে বোমা ফাটালো পালাবার আগে। ট্রেন থেমে গেছে একেবারে। কয়েকজন পুলিশ ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করছে—ঠিক যে কামরাটায় গোলমাল সেটা বাদ দিয়ে। এবং পল্টুরা যেদিকে ছুটে গেছে, তার বিপরীত দিকে ওরা তাড়া করে গেল। শূন্য অন্ধকারের উদ্দেশ্যে।

পরী জীপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরা উঠে পড়তেই জিজ্ঞেস করলো, মালঝাল কি রকম, ভালো?

পল্টু বললো, মন্দ না! চল।

যেন রসগোল্লার রস, এই ভঙ্গিতে পল্টু বুড়োকে বললো, এই তোর হাতে রক্ত লেগে আছে, আমার গায়ে লাগাস নি।

জীপ ছুটছে। নিখুঁত প্রোগ্রাম। এর আগের দুটি অনুষ্ঠানও এইভাবে সফল হয়েছে। কোনো জায়গা থেকে কোনো বাধা আসে না। এবার কিন্তু তা হলো না। একটু বাদেই দেখা গেল, আর দুটি জীপ ওদের তাড়া করে আসছে। এরকম তো কথা ছিল না।

পরীর মাথা ঠাণ্ডা, তাদের গাড়ি অনেকটা এগিয়ে আছে, খুব বেশি ভয়ের কারণ নেই। কিছুক্ষণ রেস চলবার পর পরী বললে, ওস্তাদ, সামনের চেক পোস্টে বামপ আছে। গাড়ি এসস্লো করতে হবে।

পল্টু গাড়ি ঘুরিয়ে পেছন দেখবার চেষ্টা করে বললো, ওই জীপে ও সি আছে নাকি দ্যাখ তো? ও সি যদি থাকে—

ডাবুও এতক্ষণ পেছনে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টি বাইনোকুলারের মতন দূরকে কাছে আনে। এবার আঁতকে উঠে বললো, পুলিশ নয়, মিলিটারি!

মিলিটারির সঙ্গে রেস দেবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া এমনও হতে পারে। মিলিটারি ওদের তাড়া করছে না। ওরা সাইড দিলেই চলে যাবে। একটু এগিয়েই ডান পাশে একটু সরু রাস্তা আছে। সেটাতে যদি ওরা বেঁকতে চায়, তাহলেও গাড়িটার গতি কমাতে হবে ওদের।

পল্টু বললো, সাইড কর, পরী সাইড কর।

কিন্তু গাড়ির গতি কমে আসতেই ও গাড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো, আর তো উপায় নেই। কপালের গেরো যাকে বলে। হয়তো এ তল্লাটটায় হঠাৎ কারফিউ হয়ে গেছে, মিলিটারি নেমেছে। পলিটিকসের ছোঁড়ারা কিছু একটা করেছে এদিকটায়। ওদের দোষে পল্টুদের এই বিপদ।

হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়েই পরী এক লাফে নেমে অন্ধকারে পালালো। এত দ্রুত সে চম্পট দিল যে তার সঙ্গীরাও এক মুহূর্ত আগে বুঝতে পারে নি তার মতলব। ভাবুও নেমে পড়েছে। পল্টুর হাতে রিভলবার। কিন্তু এটা নিয়ে মিলিটারির সঙ্গে লড়া যাবে না। পালাবার সুবিধের জন্য বুড়ো ও পল্টু বোমা ছুঁড়তে লাগলো রাস্তায়।

দৌড়ে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল, ততক্ষণে মিলিটারিও গাড়ি থেকে নেমে তাড়া করছে। সরাসরি পিঠের মধ্যে গুলি খেয়ে বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়লো। একটা মোটা অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়েছে পল্টু। এখনো পালানো যায়। কিন্তু একজন লোক এগিয়ে আসছে বুড়োর দেহটার দিকে। বদলা না নিয়ে পালিয়ে যাওয়া পল্টুর রক্তে নেই। বুড়ো যদি এখনো বেঁচে থাকে—

বুট দিয়ে বুড়োর দেহটা ধাক্কা দিয়েছিল যে-লোকটা, পল্টু পরপর তিনটে গুলি চালিয়ে তার দেহটা ফুঁড়ে দিল। তারপর কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগলো তার ডান বাহুতে।

পল্টুদের দুর্ভাগ্য, তারা পড়ে গিয়েছিল সামরিক অফিসারদের দুটি জীপের সামনে। ট্রেন থেকে কিছু লোক নেমে সামরিক অফিসারদের জীপ অবরোধ করে ডাকাতির কথা জানিয়েছে।

গুলি খেয়ে পল্টু পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আবার ছুটতে গেল। একটা সবল হাত চেপে ধরলো তার ঘাড়।

হাতের যন্ত্রণায় পল্টু তখন মরীয়া। পাগলা কুকুরের মতন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুরি তুলতে যেতেই খেল একটা প্রচণ্ড থাপ্পড়। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে পল্টু বললো, সাধনদা!

সামরিক অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, কে?

—সাধনদা, আমি পল্টু ছেড়ে দাও।

—কে?

সামান্য একটু হাত আলগা হয়েছিল সেই সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পল্টু আবার ছুটেছে। যাবার আগে পল্টু তার প্রতিপক্ষের থুতনিতে তার মাথা দিয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা ও একটি গালাগাল দিতে পেরেছে শুধু। এবার আর তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

পেছন থেকে চিৎকার ভেসে এলো, হল্ট। গুলি করবো!

পল্টু আর দাঁড়ায় কখনো! তার দুপায়ে এখনো শক্তি আছে, বুড়োকে মারার বদলা নিয়েছে, আর তার কোনো দায় নেই।

আবার চিৎকার শোনা গেল, দাঁড়াও।

পল্টু দাঁড়াতে পারলো না। স্টেনগানের গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলো না। শরীরটা মাটিতে পড়ার আগেই তার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে।

—কি রে পল্টু তোর খবর কি?

—সাধনদা, আমার মা মারা গেছেন।

—তাই নাকি? কবে? ইস—

—এই তো, মাস দেড়েক হলো—

—তা তোর ন্যাড়া মাথা দেখে আমি ভাবছিলাম—প্রথমে ঠিক চিনতেই পারিনি। কি হয়েছিল?

—কিছুই না, এমনি একটু সর্দি জ্বরটর আসলে ভেতরে ভেতরে—

—ইস, খবরই পাই নি। তোর মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

—তোমরা তো ছিলে না কলকাতায়।

—হ্যাঁ, আমরা তো এখন দিল্লিতেই থাকি। তোরা এখন থাকিস কোথায়? তোর বাবা, ইয়ে, উনি বেঁচে আছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ। বাবা খড়দায় একটা ছোট দোকান করেছে। আমরা ওখানেই থাকি।

—তোর চেহারাটা এরকম চোয়াড়ে চোয়াড়ে হয়ে গেছে কেন? পড়াশুনো তো আর করলি না!

পল্টু লজ্জা পেল। মুখ নিচু করে বললো, আমার দ্বারা হল না। আমার মাথা নেই।

সাধন হাসতে হাসতে বললো, দিব্যি একটা মাথা তো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি? স্কুল ফাইন্যালে কবার ফেল করলি?

—দুবার।

—বারবার তিনবার হবে না?

—তুমি তো জান সাধনদা, মা নেই, বাবা আমাকে আর পড়াবে না।

—তুই তা হলে এখন কি করবি?

—একটা চাকরি-বাকরি দেখতে হবে। ড্রাইভিং শিখছি। যদি ড্রাইভারির চাকরি পাই।

—এত কম বয়েসে তোকে কে চাকরি দেবে? কত বয়েস তোর এখন? ষোলো না সতেরো?

—উনিশ।

—উনিশ হয়ে গেল? ড্রাইভারি করে কি করবি? দ্যাখ যদি কোনো কারখানায় ঢুকতে পারিস।

—তোমার তো অনেক জায়গায় চেনা আছে। একটু চেষ্টা করো না আমার জন্য!

—আচ্ছা দেখবো। আজকাল চাকরি বাকরির বাজার এত টাইট।

—তুমি কি আবার দিল্লি ফিরে যাবে?

—হ্যাঁ। এখন এক মাসের ছুটিতে আছি। জানিস তো, আমি এখন আর্মিতে—

—জানি। তোমরা এখনো সেই মনোহরপুকুরের বাড়িতেই আছো তো?

—ওইখানেই। আসিস একদিন। চলি—

—দাঁড়াও না। অনেকদিন বাদে তোমাকে দেখলাম।

—চল, চা খাবি?

সাধন পল্টুর কাঁধে হাত রেখে কাছাকাছি চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। যেতে যেতে আন্তরিকভাবে বললো, তোর মা মারা গেছেন শুনে আমার মনটা খুব খারাপ লাগছে। আমাকে এত ভালবাসতেন। আমার মাও খবরটা শুনে খুব দুঃখ পাবেন।

—মা ওই দ্যাখো, সাধনদা!

—কোথায়? ওমা তাই তো, সাধনই তো।

—ডাকবো?

—যা, যা ডাক ডাক।

—এই সাধনদা, সাধনদা। আমায় চিনতে পারছো না?

—কে?

—আমি পল্টু!

—আরেঃ, পল্টু! তোকে চিনতেই পারিনি। কত বড় হয়ে গেছিস।

—বাঃ, তুমিও তো বড় হয়েছো! ওই যে মা দাঁড়িয়ে আছেন!

—তাই নাকি? চল দেখা করে আসি।

সাধন এসে নিচু হয়ে পল্টুর মায়ের পায়ের ধুলো নিল। মা আশীর্বাদ করলেন, বেঁচে থাক বাবা। সুখী হও। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম!

সাধন বললো, হ্যাঁ, খুড়িমা। অনেকদিন পর পল্টুকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, চিনতেই পারি না। কত বড় হয়ে গেছে। তুই কোন ক্লাসে পড়িস রে পল্টু?

—ক্লাস সেভেন। দেশবন্ধু বিদ্যালয়।

মা জিজ্ঞেস করলেন, সাধন, তুমি এখন কি পড়ো?

—আমি এবার আই এস সি পরীক্ষা দিলাম।

—বেশ বেশ। আরও লেখাপড়া শেখো, বাপমায়ের মুখ উজ্জ্বল করো। এখানে হঠাৎ কি করে এলে?

—বন্ধুদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে এসেছি। এই বহরমপুরে স্টেশনের ধারে একটা হোটেলে উঠেছি।

—হোটেলে উঠেছো? কেন? তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে চলো।

—না খুড়িমা, বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি তো। তা ছাড়া আমরা কালই চলে যাবো—

—তোমার মা কেমন আছে? কলকাতায় কোথায় থাকো তোমরা?

—আমরা মনোহরপুকুরে একটা বাড়ি কিনেছি। একদিন আসুন না— মা খুব খুশি হবেন। মাকে বলবো আপনাদের কথা।

—আমি আর গেছি! কেই বা নিয়ে যাবে! ওনার তো অসুখ—

—কেন, পল্টু নিয়ে যেতে পারে না? এই পল্টে তুই ট্রেনে চেপে যেতে পারবি না? শিয়ালদায় নেমে এইট বি বাসে চাপবি।

—হ্যাঁ, পারবো—

মা বললেন, চলো সাধন, একটু আমাদের বাসায় বসবে চলো। কাছেই, বেশি দূর না। এতদিন পর তোমাকে দেখলাম—

—খুড়িমা একটু দাঁড়ান, আমার বন্ধুদের একটু বলে আসি—

—দরজা খুলে ঘরে ঢুকে মা বললেন, বসো, এই খাটের ওপর বসো। থাক, থাক, জুতো খুলতে হবে না। ঘরদোরের যা অবস্থা! মানুষজন কেউ এলে লজ্জা করে। তোমার কাছে লজ্জা নেই। দেশে থাকতে তোমার মা আর আমি কত বন্ধু ছিলাম। ওর বাড়ি যা রান্না হতো আমাকে না দিয়ে খেতো না। আমিও নিজে রান্না করে—

—হ্যাঁ খুড়িমা, মনে আছে আমার।

—তোমার বোন চন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ বিয়ে হয়ে গেছে। দিদিও এখন দিল্লিতে থাকে। জামাইবাবু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার।

—বাঃ! খুব ভালো! খুব খুশি হয়েছি। সুখ শান্তিতে থাকুক। আর তোমার ছোটভাই নয়ন?

—ও দার্জিলিং-এ পড়ছে। ঝর্ণাদি কোথায় খুড়িমা?

—ঝর্ণাকে তো নার্সিং-এ দিয়েছে। ট্রেনিং পাস করলে যদি কিছু রোজগার করতে পারে। বিয়ে তো দিতে পারলাম না। দেবোই বা কোত্থেকে, রোজগার নেই সংসারে কারুর। তোমার কাকার তো অসুখ। ওই যে কাশির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না? মাঝে মাঝেই জ্বর আর কাশি!

—ডাক্তার দেখান নি।

—হাসপাতালে দেখিয়েছি। তারা বলে ওখানে ভর্তি হতে। কিন্তু ভর্তি হওয়া কি সহজ!

—খুড়িমা, আপনারও তো চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। আগে কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল আপনার!

—না, না, আমার কিছু হয় নি। আমি ভালো আছি।

—আমি তা হলে এখন উঠি? বন্ধুরা অপেক্ষা করবে। পল্টু কোথায় গেল?

—বসো, আর একটু বসো। তোমাকে এতদিন পরে দেখে কত ভালো লাগলো। তোমরা সব সুখে শান্তিতে আছো শুনেও প্রাণে আনন্দ হয়।

—এই পল্টু, কোথায় গিয়েছিলি? একি খুড়িমা, আপনি আবার এসব খাবারটাবার আনালেন কেন? না, না—

—কিছু না, কিছু না, একটু মিষ্টি। এতদিন পরে দেখলাম, তুমি আমায় প্রণাম করলে, আর একটু মিষ্টি খাওয়াবো না?

—গ্রামে থাকার সময়, যখনই আপনার বাড়িতে যেতাম, কত কি খেতাম—মনে আছে আমার—

—সে সব কথা আর—

—এই পল্টু, তোর থুতনিতে ওরকমভাবে কাটালো কি করে রে?

পল্টু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। একবার মায়ের মুখের দিকে তাকালো, একবার সাধনদার দিকে। তারপর আড়ষ্টভাবে বললো, কালকে পড়ে গিয়েছিলাম।

পল্টুর মা কেঁদে ফেললেন। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন, না পড়ে যায় নি। মানুষ কত নিষ্ঠুর হয়। কাছেই একটা বাড়িতে পল্টু খেলতে যায়। তারা বড়লোক, আমরা না হয় কিছুই না, তবু আমাদের ছেলেও তো ছেলে। তার বাপমায়ের মনে কি লাগে না? বাড়ির মধ্যে লুকোচুরি খেলছিল, পল্টুর হাতে ধাক্কা লেগে নাকি একটা দামি ফুলদানি ভেঙে গেছে। না হয় ভেঙেইছে। কিন্তু ও তো ছেলেমানুষ, ওকি, বুঝে-সুঝে ইচ্ছে করে ভেঙেছে? তাদের ছেলের হাতে লেগেও তো ভাঙতে পারে। তাই জন্য কেউ মারে? কীরকমভাবে মেরেছে দ্যাখো! জামায় রক্ত মেখে কাঁদতে কাঁদতে যখন ছেলেটা বাড়িতে এলো, আমার বুকের মধ্যে কী রকম...আমি ঠোঙা বিক্রি করে কত কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি—যদি ও মানুষ হয়ে একদিন আমাদের দুঃখ দূর করে—

একটি পাঁচ বছরের ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে বললো, মা, তুমি সাধনকে পায়েস দিয়েছো। আমাকে দাওনি।

—ছিঃ পল্টু, সাধন বলতে নেই, সাধনদাদা বলতে হয়। তোমার চেয়ে বয়েসে বড় না?

—তুমি সাধনদাদাকে কেন পায়েস দিয়েছো আগে? আমাকে দাও নি!

লম্বা টানা বারান্দায় কার্পেটের আসনের ওপর বাবু হয়ে বসেছে আট বছরের ছেলে সাধন। মন দিয়ে পায়েস খাচ্ছে।

মা বললেন, দিচ্ছি, যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো!

পল্টু লাফাতে লাফাতে হাত ধুতে গেল। মা সাধনকে জিজ্ঞেস করলেন, আর একটু নেবে? নাও আর দুহাতা, নারকেলের নাড়ু নাও! এই তো লক্ষ্মী ছেলে, কী সুন্দর কথা শোনে।

পল্টু এসেই সাধনের দেখাদেখি বাবু হয়ে বসে বললো, আমাকেও সাধনদাদার মতন নাড়ু দাও!

—তুই তো সকালে খেয়েছিস। পেট কামড়াবে!

—না, আমাকে এখন দাও!

—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তাহলে। তারপর দুজনে খেলা করতে যাবে। কেমন? ঝগড়া করবে না কিন্তু!

সাধন পরিপাটি করে চেটেপুটে পায়েস খেয়ে উঠলো। পল্টুর মা তার মুখ ধুইয়ে মুছে দিলেন। সিকনি গড়াচ্ছিল সাধনের নাক দিয়ে, মুছে দিলেন সেটাও। তারপর পল্টুর মুখ ধুইয়ে দিয়ে বললেন, যাও এবার খেলতে যাও।

সাধনের বাবা আর মা এলেন সেই সময়। ওঁরা পাশের আর একটা বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সাধনের মা সাধনকে বললেন, চল, এবার বাড়ি যেতে হবে।

পল্টুর মা বললেন, এক্ষুনি কি যাবি! বোস, ওরা খেলা করুক ততক্ষণ।

সাধনের মা পল্টুকে কোলে নেবার চেষ্টা করলেন। পল্টু কিছুতেই কোলে উঠবে না। তিনি বললেন, কনক, তোর ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। মাথা ভর্তি চুল, টানাটানা চোখ—

পল্টুর মা স্মিত হেসে চেয়ে রইলেন, ছেলের দিকে। সাধন আর পল্টু খেলা করতে চলে গেল।

নদীর পার দিয়ে উঁচু বাঁধ। বর্ষাকাল, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ বনানী পৃথ্বী এখন জলে ধোওয়া পরিষ্কার। ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু জল। ফুরফুর করছে বিকেলবেলার হাওয়া। তার মধ্যে খেলা করছে দুটি শিশু।

একটা ঝাঁকড়া কদমগাছে থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে অজস্র। ফুলগুলো পর্যন্ত ওদের হাত যায় না। লাফিয়ে লাফিয়েও ধরতে পারলো না।

পল্টু বললো, সাধনদাদা, তুমি গাছে উঠতে পারো?

সাধন বিজ্ঞের মতন বললো, বর্ষাকালে গাছে উঠতে নেই। গাছের মধ্যে সাপ থাকে। সবুজ সবুজ সাপ।

—আমি সাপ দেখেছি। তুমি দেখেছো?

—অনেক। অনেক।

—কদম ফুল গাছে সাপ থাকে না।

—হ্যাঁ, তোকে বলেছে! তুই ভারি জানিস!

—হ্যাঁ, জানিই তো। দিদি আর আমি এই গাছটায় একদিন উঠেছিলাম।

—যা মিথ্যুক!

—সত্যি! দেখবে, আবার উঠবো?

—আমি তাহলে খুড়ি মাকে বলে দেবো। গাছ ভিজে। আয় আমরা লুকোচুরি খেলি!

খানিকটা বাদে পল্টু ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো। মা, সাধনদাদা আমাকে মেরেছে।

সাধনের মা বললেন মেরেছে তোমাকে? ডাকো সাধনকে বকে দিই। এসো, সোনা ছেলে, কোথায় লেগেছে তোমার? আদর করে দিচ্ছি। একটু না বেশি?

পল্টু বললো, একটু।

পল্টুর মা ধমকে বললেন, যাও। খেলতে খেলতে ওরকম নালিশ করে না। খেলার সময় ওরকম হয়। আবার গিয়ে খেলা করো!

লুকোচুরি খেলায় সাধন পল্টুকে আর খুঁজে পায় না। খুব সাবধানে নদীর বাঁধে উঠে উঁকি মেরে দেখলো সেখানে কেউ নেই। কোথাও নেই পল্টু।

ভয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় সাধন চেঁচিয়ে উঠলো, এই পল্টু! কোথায় গেলি?

পল্টু—উ-উ-উ।

কাছে থেকেই আওয়াজ ভেসে এলো, টুকি!

সাধন ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও দেখতে পেল না।

কদম গাছের ওপরে ফুলের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে পল্টু। রিনরিনে গলায় বলে উঠলো, টুকি! আমায় ধরতে পারে না! আমায় ধরতে পারে না! আমায় ধরতে পারে না! সাধনদাদা আমায় ধরতে পারে না!...

ঈর্ষা

বিনয়েন্দ্র বললেন : সব ঠিক হয়ে গেল। আজ অ্যাডভান্স জমা দিয়ে এলুম। বুঝলে!

অনিমা ড্রেসিং টেবিলের আয়না মুছছিলেন, বললেন : জানালাগুলো রং করে দেবে তো? বারান্দার কোলাপসিবল গেটটাও ঢকঢক করে নড়ছিল।

—সব ঠিক করে দেবে। বাড়িওলা লোকটি ভালো। একতিরিশ তারিখে রোববার আছে, সেদিনই সিফট করবো। যতীনকে বলেছি দুটো লরি পাঠাতে।

বাবলু আর অদিতি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কৌতূহলে ছটফট করছে।

বাবলু বললো : বাবা, ওখানে ফুটবল খেলার মাঠ আছে?

বিনয়েন্দ্র হাসলেন। বললেন : অত বড় মাঠ নেই, তবে ছোট একটা লন আছে। ইচ্ছে করলে ব্যাডমিন্টনের নেট ফেলতে পারবি।

—রাস্তার নাম কি বাবা?

—রত্নাকর সেন রোড। সিক্স রত্নাকর সেন রোড, মুখস্থ করে রাখো। পোস্ট অফিসে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।

বাবলু তাড়াতাড়ি ছুটে গেল পাশের ফ্ল্যাটে ওর বন্ধু সুজিতকে খবরটা জানাতে। অদিতি এসে দাঁড়ালো মায়ের পাশ ঘেঁষে। অনিমা বললেন : হ্যাঁ গো, ভাড়া সেই সাড়ে পাঁচশোই রইলো? এত টাকা ভাড়া দিয়ে কুলোতে পারবে তো? কমালো না?

—নাঃ। ভাড়া কি আজকাল কেউ কমায়? তবে পাড়াটা ভালো, ওদের ইস্কুল কাছে হল। সামনের বছর অদিতি পাস করলে ওকে ব্রেবোর্নে ভর্তি করবো—তাও খুব দূরে হবে না।

—যাক, ভালোই হল। এ বাড়িটা আর আমার একটুও পছন্দ হচ্ছিল, না। আশেপাশে যা হৈ-হট্টগোল দিনরাত!

অদিতি অনুযোগের সুরে বললো : বাড়ি ঠিক হয়ে গেল, আমরা এখনো দেখলুম না। যদি এর থেকে ভালো না হয়!

—এর চেয়ে ঢের ভালো। বাইরে থেকেও কত সুন্দর দেখতে, গোলাপি গোলাপি রঙ, সামনের লনে একটা ছোট ইউক্যালিপটাস গাছ আছে—কলকাতা শহরে কোন বাড়িতে তুই ইউক্যালিপটাস গাছ পাবি? ওটা একেবারে ঠিক আমাদের জানালার পাশে। একটা ছোট ঘর আছে—ওটা আমি ভেবে রেখেছি তোর জন্য একেবারে আলাদা। পড়াশুনোর সুবিধে হবে—সঙ্গে ছোট ব্যালকনি, অ্যাটাচড বাথরুম।

—বাথরুমে শাওয়ার আছে?

—হ্যাঁ, খুব মোটা জল পড়ে দেখে এলুম।

—কলিং বেল আছে?

—কলিং বেল কি বাড়িওলা দেয়। ওটা আমাদেরই গিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। আজ বা কাল তোরা গিয়ে বাড়িটা দেখে আয় না। দেখিস, তোদের ঠিক পছন্দ হবে।

বাবলু গিয়ে সুজিতকে বললো : জানিস, আমরা সামনের মাস থেকে চলে যাচ্ছি। সব ঠিক হয়ে গেছে।

—কোথায় রে? অনেক দূরে?

—হুঁ, বহুত দূর, বালিগঞ্জে যাচ্ছি।

—বালিগঞ্জ আবার দূর নাকি? এই তো পরশুদিন টুবলুমামার গাড়িতে ঘুরে এলুম বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ—একটা দোকানে আইসক্রিম খাওয়ালেন, দোকানটা কি ঠাণ্ডা। তোরা বেশ রোজ রোজ ওই দোকানে আইসক্রিম খেতে পারবি।

—বাবা বলেছেন, আমাদের নতুন বাড়ির ঠিক পাশেই একটা আইসক্রিমের দোকান আছে। জানিস, আমি এই ইস্কুল ছেড়ে দেবো।

—ইস্কুল ছেড়ে দিবি? তারপর কী করবি?

—ওখানে ইংরিজি ইস্কুলে পড়বো। সেই ইস্কুলের বাস আছে। রোজ আমাদের বাড়ির সামনে বাস থামবে।

সুজিত একটুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো : যাবার সময় তোরা ছাদ থেকে রেডিও-র এরিয়ালটা খুলে নিয়ে যাবি?

—হ্যাঁ। এরিয়াল নিয়ে যাবো, জানালার পর্দা, নিয়ন লাইট সব নিয়ে যাবো।

সুজিত বললো : ভালোই হল। তোদের এরিয়ালটার জন্য ছাদে ভালো করে ঘুড়ি ওড়াতে পারতুম না। এখন পুরো ছাদটা ফাঁকা পাবো। তোদের ফ্ল্যাটে যতদিন না অন্য ভাড়াটে আসে ততদিন তো দোতলাটাই আমাদের—কী মজা হবে তখন! শানু, পিন্টু শুভাদের ডেকে রোজ চোর-চোর খেলবো।

বাবলু গম্ভীরভাবে জানালো : আমাদের নতুন বাড়িতে ব্যাডমিন্টন খেলা হবে।

সুজিতের দাদা ইন্দ্রজিৎ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছে ইন্দ্রজিৎ, এই কিছুদিন আগেও সে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াতো—এখন উল্টে আঁচড়ায় বলে মুখখানা একটু বদলে গেছে। স্বভাবও একটু বদলেছে তার—আগে সে যখন তখন বাবলুদের সঙ্গে ক্যারাম খেলতে বসতো—এখন আর খেলতে চায় না। সে গম্ভীরভাবে বললো : তোমাদের বাড়ি বদলানো ঠিক হয়ে গেল বাবলু?

—হ্যাঁ ইন্দ্রদা, খুব চমৎকার বাড়ি। বাবা বলেছেন...

—তোমাদের তো বদলানো দরকারই। তোমার বাবার কাছে কত লোক আসেন? কিন্তু এখানে তোমাদের ভালো বসবার ঘর নেই...

—ওখানে আমাদের ছখানা ঘর। তার মধ্যে দুটো বসবার ঘর। বাবার একটা মা'র একটা।

—কবে যাচ্ছো তোমরা?

—এই তো একত্রিশ তারিখ রোববার—বাবা বলেছেন সকালবেলায় চলে যেতে হবে—চারখানা লরি আসবে—

—চারখানা লরি কিসে লাগবে?

—বাঃ, অ্যাত্ত জিনিস, আমি প্রথম লরিটায় ড্রাইভারের পাশে বসবো।

অনিমা বললেন : বাড়িটা তো ভালোই ঠিক হয়েছে। কিন্তু আপনাদের ছেড়ে চলে যাবো—ভাবতে এত খারাপ লাগছে—

সুজিতের মা রত্নপ্রভা বললেন : এমন কিছু তো দূর নয়। বাসে চড়লেই দশ মিনিট। যাওয়া-আসা তো থাকবেই।

—আচ্ছা তা তো থাকবেই। তবু এখানে যেমন আপনজনের মতন পাশাপাশি ছিলুম শান্তিতে—কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, এসব ছেড়ে নতুন জায়গায়—অবশ্য পাড়াটা ভালো—আশেপাশে কোন বস্তি নেই, সবই নতুন বাড়ি।

—আমার এক মাসতুতো ভাইও ওই সি. আই. টি. রোডে বাড়ি করেছে। বলছিল যে সবই ভালো, শুধু বর্ষাকালে বড্ড জল জমে। আর মশা খুব। আমাদের এদিকটায় কিন্তু মশা নেই। তোমাদের ভাড়া কত পড়বে?

—ভাড়া? ইয়ে, সাড়ে ছশো ঠিক হয়েছে, গ্যারেজ নিলে পুরো সাতশো-ই পড়বে। ভাবছি আপিসের গাড়িটা এখন থেকে বাড়িতেই রাখবো।

—আমরাও ভাবছি যাদবপুরের জমিটায় এইবার একটা বাড়ি তোলা শুরু করবো। এখন ব্রিজ হয়ে গেছে তো—ওদিকটা এমন সুন্দর হয়েছে—ভাড়া বাড়িতে আর ভালো লাগে না। অজিত এবার কানপুরের ট্রেনিং শেষ করে ফিরবে—তখন আর কি এইসব বাড়িতে থাকতে চাইবে?

—তা ঠিক। নিজের বাড়ির তুলনায় কী আর ভাড়া বাড়ি! আমাকেও তো মা আর দাদারা বলছেন বাড়ি করো, বাড়ি করো। বাড়ি তো করাই যায়—কিন্তু ওর আপিস থেকে যে এতগুলো টাকা বাড়িভাড়া দেয়—নিজের বাড়ি হলে তো তা আর দেবে না। শুধু শুধু এতগুলো টাকা ছাড়ি কেন বলুন!

—তোমার কি ইয়ে অদিতির বাবার আর কবছর চাকরি আছে?

—এখনো সাত বছর। যাই, প্রেসার কুকারে মাংস চাপিয়ে এসেছি। দূরে চলে যাচ্ছি বলে ভুলে যাবেন না আমাদের রত্নাদি। বিপদে আপদে আপনাদের কাছে কত রকম সাহায্য পেয়েছি!

—আহা সাহায্য আবার কি? পাশাপাশি ছিলুম দু'বোনের মতন—দূরে গেলেও তুমিও কি আমাদের ভুলতে পারবে?

ছাদে একটা ছোট্ট ঘর, সেটা ইন্দ্রজিতের দখলে। একটা চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা ছোট বুকশেলফ—এখানেই সে জানালা ধারে বসে পড়াশুনো করে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখে পায়রাদের ওড়াউড়ি। আর তার নতুন শেখা সিগারেট খাওয়ার জন্যই সারা বাড়িতে এই একটি মাত্র জায়গা। যখনই তার মন খারাপ হয়—আজকাল প্রায়ই হয়—সে এসে সেই ছাদের ঘরে জানালার পাশে বসে। এখান থেকে সে বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে পারে—তার আস্তে আস্তে মন ভালো হয়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ সেই ঘরে বসে ছিল, পিছন দিক দিয়ে অদিতি এসে টপ করে টেবিলের উপর একটা বাটি রেখে বললো : এই নাও!

ইন্দ্রজিৎ মনোযোগ দিয়ে উপন্যাস পড়ছে, ঘাড় না ফিরিয়ে বললো : কী?

—আচার। যা ঝাল হয়েছে না, আমরা কেউ খেতে পারছি না—তোমার খুব পছন্দ হবে।

—উঁহু, আমি এখন আচার খাবো না।

—কেন?

—আমি এইমাত্র সিগারেট খেয়েছি। এখন আচার খেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।

—ইস, এর মধ্যেই পাকা নেশাখোরের মতন কথা। রঞ্জিতদাকে বলে দেবো একদিন, তখন বুঝবে।

—বলতে হয় তো এখুনি বল, পরে তো আর সুযোগ পাবে না।

অদিতির কিশোরী মুখখানি এমন ঝকঝকে স্পষ্ট যে সমস্ত মনোভাবের তৎক্ষণাৎ ছায়া পড়ে। ছাদের সিঁড়িতে ওঠার সময় তার মুখ ছিল ঝাল লেগে বিব্রত, ঘরে ঢোকার পর কৌতুকের, এইমাত্র সে মুখে ম্লান ছায়া পড়লো। সে ইন্দ্রজিতের কাছে সরে এসে বললে ঃ আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তুমি শুনেছো?

—হুঁ।—তোমার বইটা এখন রাখো তো! আমার এখন মন খারাপ লাগছে—আর উনি বসে বসে বই পড়ছেন!

—কেন, মন খারাপ লাগছে কেন?

—নতুন বাড়িতে যাবো শুনে বেশ আনন্দও হচ্ছে, আবার মন খারাপও লাগছে।

—মন খারাপ লাগছে কী জন্য?

—তুমি জানো না বুঝি?

—না তো। আমি কেমন করে জানবো—কি জন্য তোমার মন খারাপ?

—ঠিক আছে জানতেও হবে না। জানি তো, আমার কথা কেউ ভাবে না—

অদিতি সত্যিই রাগ করে চলে যাচ্ছিল, ইন্দ্রজিৎ দ্রুত উঠে গিয়ে তার হাত ধরলো। বললো ঃ এই, রাগ করো না। শোনো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—

—না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না—আমার সময় নেই!

ইন্দ্রজিৎ জোর করে ওকে টেনে চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসালো, নিজেও বসলো পাশে। অদিতির কচি হাতের আঙুলগুলো নিয়ে লেখা করতে করতে বললো ঃ জানো অদিতি, তোমরা চলে যাবে শুনে প্রথমটায় আমারও মন খারাপ লাগছিল—এখন কিন্তু বেশ ভালো লাগছে।

—কেন, ভালো লাগছে কেন?

—আমি বিকেলবেলা কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রত্যেকদিন তোমাদের বাড়িতে যাবো—

—সত্যি যাবে? না, মিথ্যে কথা, বিকেলবেলা তোমার কত বন্ধু-বান্ধব।

—না, না, সত্যিই। শোনো, বিকেলবেলা তো এ বাড়িতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না—মায়েরা তখন ছাদে আসেন, তা ছাড়া, দাদা তো আমাকে দেখলেই একটা না একটা কাজে পাঠাবে—তোমাদের বাড়িতে তো আর কোনো কাজ থাকবে না, আমরা তখন—

—আমরা বিকেলে ওখানে ব্যাডমিন্টন খেলবো।

—হ্যাঁ খেলবো, আর বাগানে বসে গল্প করবো। আমার প্রত্যেকটি বিকেলবেলা কেমন যেন মন খারাপ মন খারাপ লাগে, কলেজ থেকে বাড়ি আসতে ইচ্ছে করে না—এখন থেকে আমাদের নতুন বাড়িতে...

অদিতি আলতোভাবে ইন্দ্রজিতের আঙুলে চাপ দেয়। সে মনোভাব লুকোতে জানে না, খুশি ঝলমল চোখে বললো ঃ বাড়ি বদলে তাহলে খুবই ভালো হল না? ভালো কি খারাপ, আমি এতক্ষণ বুঝতে পারছিলাম না।

—খুব ভালো হল। মাঝে মাঝে আমরা আলাদা বেড়াতে যাবো। কি করে যাবো জানো? তোমার মাকে বলবে ঃ মাসিমা, অদিতিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি! আসলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসবো না। আমরা আলাদা বেড়াবো—

—মা জানতে পারবেন না?

—উহু ঃ! এমন কায়দা করে ম্যানেজ করবো—আমরা কখনো একসঙ্গে বেড়াইনি, দেখো কী ভালো লাগবে! তুমি লেকে গেছো কখনো? আমি তোমাকে লেক দেখাতে নিয়ে যাবো—

—যদি আমাদের কেউ রাস্তায় দেখে ফেলে?

—কেউ দেখবে না, আমি অনেক অচেনা অচেনা রাস্তা জানি।

আর পাঁচদিন বাদেই একতিরিশের রোববার। জিনিসপত্র গুছোনো, বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেছে। ইন্দ্রজিতের দাদা রঞ্জিত এসব কাজে খুব পাকা, সে ওদের সাহায্য করছে খুব। একটা পায়া ভাঙা টেবিল অনিমা রঞ্জিতকে দানই করে দিলেন। বাবলুর খুব ইচ্ছে আগে একবার গিয়ে নতুন বাড়িটা দেখে আসে। রোজই তাই নিয়ে বায়না ধরছে. বিনয়েন্দ্রের সময় নেই, অনিমা তাই বললেন ঃ আচ্ছা তুই আর দিদি আজ বিকেলবেলা ঘুরে আয়। ইন্দ্রজিৎকে বল না তোদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।

বাইরে বেরুবার সময় অদিতি আজকাল ফ্রক পরে না, একটা কালো রঙের সিল্কের শাড়িতে ওকে একটা ফুরফুরে দোয়েল পাখির মতন দেখাচ্ছে. বাবলু কিছুতেই মোজা পরতে চায় না, অদিতি ওকে জোর করে সু এবং মোজা পরিয়েছে। ইন্দ্রজিৎ পরেছে পায়জামা আর মুগার পাঞ্জাবি, তার চটি পরা পা দুখানি তার মুখের মতনই ঝকঝকে পরিষ্কার। পথে বেরিয়ে অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন মানুষের মতন সে বাবলুর হাত ধরে রইলো, বাসে ওঠবার সময় সে সাবধানে বললো ঃ লেডিজ, একদম রোখকে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে গম্ভীরভাবে টিকিট কাটলো। মাঝে মাঝে অদিতির সঙ্গে চোখাচোখি হতে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলো, বাবলু সঙ্গে আছে—তাই যে-সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে তা সে বলতে পারছে না। একবার সে শুধু একটু ফিসফিস করে বলেছিল ঃ তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে অদিতি, সত্যি!

অদিতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, যাঃ।

ইন্দ্রজিৎকে কেউ বলে দেয়নি, তবু যেন সে মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিল—

অদিতিদের নতুন বাড়ি হবে একটা সুন্দর বাংলো ধরনের একতলা, আলাদা বাড়ি। সামনে থাকবে চমৎকার একটা বাগান, কেন জানি না সে ভেবেছিল, বাড়িটার রং হবে ধবধবে সাদা। বাগান পেরিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, তার কাছেই থাকবে বৈঠকখানা।

ঠিকানা মিলিয়ে এসে দেখলো, একটা লালচে রঙের দোতালা বাড়ি, সামনে একটুখানি জমি আছে বটে, তাতে কয়েকটা এলোমেলো গাছ—কোনো বাগান নেই। বাড়ির দোতলায় বাড়িওলা থাকে, একতলাটা শুধু অদিতিদের। দরজায় অন্যলোকের নাম লেখা পাথরের ট্যাবলেট লাগানো। গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা বিশাল কুকুর ঘেউঘেউ করে ছুটে এল। ইন্দ্রজিৎ কুকুরকে বিষম ভয় পায়, সে সঙ্কুচিত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

একটু পরেই ভেতর থেকে একুশ-বাইশ বছরের একটি সুন্দর মতন ছেলে বেরিয়ে এল, তার পরনে প্যান্ট ও তোয়ালে জামা, মাথায় ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুল। ছেলেটি বললো ঃ কী চাই? ওরা কেউ কিছু বলার আগেই বাবলু বলে উঠলো ঃ আমরা এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। আমরা বাড়ি দেখতে এসেছি। ছেলেটির বললো ঃ ও আপনারা মিঃ সেনগুপ্তর ফ্যামিলি থেকে? আসুন!

ছেলেটি শক্ত হাতে কুকুরটার বগলস চেপে ধরে গেট খুললো। মাঠটা পেরুবার সময় বললো ঃ আপনারা তিন ভাই বোন?

ইন্দ্রজিৎ বললো ঃ না, না...

অদিতি বললো ঃ উনি আমার দাদা নন।

ইন্দ্রজিৎ বললো ঃ ওদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকি। সঙ্গে এসেছি।

ছেলেটি বললো ঃ ও, নমস্কার। আমার নাম সিদ্ধার্থ মজুমদার।

ইন্দ্রজিৎ বললো ঃ নমস্কার। আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী, ওর নাম অদিতি, আর এর নাম বাবলু, ভালো নাম দেবকুমার।

একতলায় সাড়ে তিনখানা ঘর অদিতিদের, নতুন বাড়ি—তাই ঘরগুলো বেশ পরিষ্কার, বাথরুমটা বেশ বড়োসড়ো, রান্নাঘরে গ্যাসের কানেকশান আছে। সিদ্ধার্থ ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। সিঁড়ির পাশের ঘরটাও ওরা ভেবেছিল অদিতিদের, কিন্তু সেই ঘরের দরজা খুলে সিদ্ধার্থ বললো ঃ এইটে আমার পড়ার ঘর। আসুন, একটু বসবেন। চা খাবেন তো? আপনি নিশ্চয়ই খাবেন? আর আপনি? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হলো অদিতিকে, সে উত্তর দেবার আগেই বাবলু বললো ঃ আমিও চা খাবো।

অদিতিকে এর আগে কোনো ছেলে আপনি বলে কথা বলে নি, সে লাজুকভাবে ঘাড় হেলালো শুধু। সিদ্ধার্থ বললো ঃ বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

বেশ ছিমছাম সাজানো ঘর। রেক্সিন মোড়া বড় টেবিল, বইয়ের র‍্যাকে অনেক বই—বেশির ভাগই ইংরেজি। দেওয়ালে ব্র্যাডম্যান, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, ডব্লু জি. গ্রেস ইত্যাদির বাঁধানো ছবি। চাকর এসে চা দিয়ে গেল। ইন্দ্রজিৎ ছবিগুলো দেখছিল, তাই সিদ্ধার্থ বললো ঃ আমি কলেজের ক্রিকেট টিমের স্কিপার। আপনার কোন কলেজ? আমার স্টেন্ট জেভিয়ার্স। থার্ড ইয়ার।

ইন্দ্রজিৎ বললো ঃ আমি আশুতোষে পড়ি।

—ও। কোন ইয়ার?

—ফার্স্ট ইয়ার।

দুনিয়ার সমস্ত থার্ড ইয়ারের ছেলে, সমস্ত ফার্স্ট ইয়ারের বালকদের দিকে যে রকম কৃপার দৃষ্টিতে তাকায়, সিদ্ধার্থ সেইরকম সূক্ষ্মভাবে তাকিয়ে বললো ঃ আপনাদের আশুতোষে স্পোর্টসের ব্যাপারে বোধহয় তেমন এনকারেজমেন্ট নেই। ওখানে তো ইউনিয়ন নিয়েই সমসময় গণ্ডগোল লেগে আছে—

ইন্দ্রজিৎ বিব্রতভাবে বললো ঃ আমি ও সবের মধ্যে থাকি না। বাড়ির কাছে বলেই আমি আশুতোষে ভর্তি হয়েছি, ইচ্ছে করলে প্রেসিডেন্সিতেও আমি ভর্তি হতে পারতুম। আমিও ফার্স্ট ডিভিশান পেয়েছিলুম।

কথাটা বলেই ইন্দ্রজিৎ লজ্জা পেল। ছি, ছি ফার্স্ট ডিভিশনের কথাটা নিজের মুখে বলা তা উচিত হয় নি। অদিতি চকিতে একবার ওর দিকে তাকালো। সিদ্ধার্থ খুব ভদ্র, সে ওর লজ্জা ঢাকা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললো ঃ না, সব কলেজেই পড়াশুনো প্রায় এক। বাড়ির কাছে কলেজেই ভালো। আননেসেসারিলি বাস জার্নির অরডিয়েল ভোগ করতে হয় না। আর আপনি কোন কলেজে?

এবার অদিতির লজ্জা পাবার পালা, সে টেবিলে আঙুল নিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বললো ঃ আমি কলেজে পড়ি না। আমার ক্লাস ইলেভেন।

বাবলু বললো ঃ আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। আচ্ছা এ বাড়ির ছাদ আছে?

—হ্যাঁ আছে, ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে যাও, যাও না, কোনো ভয় নেই ঃ আমি কুকুর বেঁধে রেখেছি।

অদিতি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো ঃ কুকুরটার নাম কি?

—জুলি। আপনি কুকুর খুব ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ।

—ওই কুকুরটাকে নিয়েই আমার বেশি সময় কাটে। বাড়ি তো ফাঁকা—মা, বাবা আর আমি। আমার বাবা টেনান্ট নেবার ব্যাপারে খুব সিলেকটিভ। পছন্দ না হলে নেন না, তিনমাস আমাদের ওই অ্যাপার্টমেণ্ট খালি পড়ে আছে। আপনারা এলে আবার বাড়িটা বেশ জমজমাট হবে।

বেশি দেরি করলে বাড়িতে চিন্তা করবেন, তাই ইন্দ্রজিৎ একবার ওঠার কথা বললো। বাবলুকে ডেকে আনা হল। ঢোকার সময় নজর করেনি। এবার ওরা লক্ষ্য করলো সামনের জমিটায় একটা ছিপছিপে সাদা রঙের গাছ। ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলো ঃ এইটা ইউক্যালিপটাস, না?

—হ্যাঁ, আমাদের মধুপুরের বাড়িতে অনেক ইউক্যালিপটাস আছে। এখানে তিনটে লাগানো হয়েছিল, মাত্র ওই একটাই বেঁচেছে।

—এর পাতাগুলোর গন্ধ এমন সুন্দর হয়!

বাবলু বললো ঃ ইন্দ্রদা, আমায় দুটো পাতা পেড়ে দাও না।

ইন্দ্রজিৎ বললো ঃ না, এখন না, এ বাড়িতে তো থাকবেই, মাটিতে অনেক শুকনো পাতা পাবে—শুকনো পাতাতেও গন্ধ হয়।

—না, এখন দাও।

নিচে একটাও শুকনো পাতা পড়ে নেই। ইন্দ্রজিৎ এদিকে ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল। সিঁড়িতে দাঁড়ানো সিদ্ধার্থ বললো ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিন না কয়েকটা পাতা। গন্ধটা ভালো লাগবে।

হাতের নাগলে একটাও পাতা নেই। সাদা রঙের গুঁড়িটা সোজা উঠে গেছে। একটু উঁচুতে কচি কচি চিকন পাতা। ইন্দ্রজিৎ গোড়ালির ওপর ভর দিয়েও পাতা ছুঁতে পারলো না। তখন একটু ছোট লাফ দিয়ে ধরার চেষ্টা করলো, তাও হাত যায় না। বাবলু সোৎসাহে বললে ঃ ইন্দ্রদা, আরও জোরে লাফাও, আর একটু। ইন্দ্রজিৎ আরও জোরে লাফালো, তবু হাত যায় না, আরও জোরে লাফাতেই পকেট থেকে মানিব্যাগ, কলম ছিটকে পড়ে গেল। সে সেগুলো নিচু হয়ে তুলতে যেতেই সিদ্ধার্থ বললো ঃ দাঁড়ান, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

সিদ্ধার্থ সাবলীলভাবে একটি মাত্র লাফ দিয়ে একটা ছোট ডাল ধরে ফেললো। কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে এনে, দুটো দিল বাবলুকে, বাকিগুলো হাতের তালুতে মুড়ে কচলাবার পর বললো ঃ এবার দেখুন কী সুন্দর গন্ধ। অদিতি মুখ নিচু করে বড় শ্বাস টেনে বললো ঃ আঃ, কি সুন্দর কচি কচি গন্ধ! আঃ—অদিতি নিজের থেকেই নাকটা কাছে এনে সিদ্ধার্থের হাতে ছুঁইয়ে বললো ঃ কী চমৎকার লাগছে না গন্ধটা, ইন্দ্রদা, দেখুন।

ইন্দ্রজিৎ নিজের নাকটা নিয়ে এল সিদ্ধার্থর হাতের দিকে। কিন্তু দমবন্ধ করে রইলো। নিশ্বাসে ঘ্রাণ নিলো না।

বাইরে বেরিয়ে বাবলু অবিরাম বকবক করছিল, আর অদিতি একবার জিজ্ঞেস করলো ঃ ইন্দ্রদা অ্যাপার্টমেণ্ট মানে কি?

—ভাড়া দেয়ার ফ্ল্যাটকেই কায়দা করে অ্যাপার্টমেণ্ট বলছিল।

—ওঁর ইংরিজি উচ্চারণ ভারি চমৎকার না? কী রকম সুন্দরভাবে বলছিলেন!

কথা ছিল ইন্দ্রজিৎ আর রঞ্জিত মালপত্র নিয়ে ওদের সঙ্গেই যাবে। কিন্তু শনিবার দিন বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে ইন্দ্রজিৎ মাকে বললো ঃ মা, কাল আমায় খুব ভোরে ডেকে দেবে। আমাদের কলেজের পিকনিক আছে।

রত্নপ্রভা বললেন ঃ সে কি রে? কাল ওরা বাড়ি পাল্টাচ্ছে, তুই ওদের সঙ্গে যাবি না?

—না, উপায় নেই। কলেজের প্রফেসাররা সব যাচ্ছেন—আমাকে যেতেই হবে। ডেকে দিও, ঠিক।

ইন্দ্রজিৎ পাশের ঘরে যেতেই রত্নপ্রভা স্বামীকে বললেন : ও পাশের গিন্নি মিষ্টি কথা বলে ছেলে দুটোকে একেবারে চাকরের মতন খাটাচ্ছে। আমি পরের ছেলেকে ওরকমভাবে খাটাতে পারতুম না।

ইন্দ্রজিৎকে ডাকতেও হয়নি, সারা রাত বুঝি সে জেগেই ছিল। খুব ভোরে, তখন আলো ফোটেনি, কারুকে কিছু না বলে হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে সে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে শুনলো ফার্স্ট ট্রেন ছাড়ছে ক্যানিং-এর দিকে। ক্যানিং-এর টিকিট কেটে সে উঠে পড়লো। এই প্রথম সে একা একা ট্রেনে যাচ্ছে, কিন্তু তার একটুও ভয় করছে না। জানালার ধারে মাথা রেখে সে ভোরের টাটকা হাওয়া বুক ভরে নিতে লাগলো।

খানিকটা বাদেই দেখলো একটা স্টেশনের নাম চম্পাহাটি; হঠাৎ সেখানেই নেমে পড়লো ইন্দ্রজিৎ। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে চা আর এস বিস্কুট খেল। তারপর স্টেশন ছেড়ে, পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে এসে পৌঁছুলো। বাজার পেরিয়েও সোজা রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখলো একটা কচুরিপানা ভরতি খাল। খালের উঁচু পাড় ধরে ইন্দ্রজিৎ আপন মনে হাঁটতে লাগলো। পাশে দুএকখানা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে—তারপর ফাঁকা মাঠ। একটা ফণিমনসার গাছে দুটো প্রজাপতি ছুঁই ছুঁই খেলার মতন একবার করে বসছে আর উড়ে যাচ্ছে, বসছে আর উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ আপন মনে বললো : সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়লেই ভালো ইংরেজি জানা হয় না। আমিও ইংরিজিতে সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট নম্বর পেয়েছিলুম। অমন কথায় কথায় কায়দা করে ইংরেজি বলা পছন্দ করি না। বুঝলে?

খালের পাড়ে ধরেই ইন্দ্রজিৎ হাঁটতে লাগলো। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় তার এত ভালো লাগছিল যে সে ঠিক করলে সারাদিন ওই মাঠের মধ্যেই থাকবে একটু বাদে সে আপন খেয়ালে দৌড়তে লাগলো। যেন সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ওই খালটা কোথায় শেষ হয়েছে—তাই দেখবে। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়বার পর সে হাঁপিয়ে গিয়ে একজায়গায় বসলো। তখনো বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছে। খালের জলে অল্প স্রোতে কচুরিপানাগুলো ভেসে যাচ্ছে। কয়েকটা মাটির ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে টুপটুপ করে জলে ছুঁড়তে লাগলো। এবার আমি ওই ফুলটায় লাগাবো, ওই যে ওইটা।

ঠিক টিপ মতন একজায়গায় ঢিল লাগাবার পর ইন্দ্রজিৎ মনে মনে বললো : সবাই উঁচু দিকে লাফাতে পারে না। আমি হাইজাম্পে পারবো না। কিন্তু আমার সঙ্গে রানে রেস দিয়ে কেউ পারবে? আসুক দেখি! আমি সামনে ছুটে যাবার প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হবো?

মুখাগ্নি

বাবা বললেন ঃ দ্যাখতো, কে যেন একজন মেয়েলোক ঘরের মধ্যে দিয়ে ওদিকে চলে গেল।

সুবিমল টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওষুধ ঢালছিল, বললো ঃ কই, কেউ না তো! নিন, আপনি ওষুধটা খেয়ে নিন।

এত দুর্বল যে বিছানা থেকে হাতটা পর্যন্ত তুলতে পারছেন না বাবা। তিন চারদিন দাড়ি কামানো হয় নি, কুচো কুচো পাকা দাড়িতে মানুষের মুখ এমনিতেই অসহায় দেখায়, শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। বললেন ঃ হ্যাঁ, তুই দেখ না ওই বারান্দাটায়। একজন লালপাড় শাড়ি-পরা মেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। কি যেন বলতে চাইছিল, বোধহয় লজ্জা পেয়ে ওদিকে চলে গেল। দেখে আয় না, কি চায়?

সুবিমল বারান্দায় এসে নিচে উঁকি দিল। বাড়ির রকে গামছা পেতে দুজন মজুরশ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছে। ডাস্টবিন উপচে-পড়া ময়লার মধ্যে একটা মরা বেড়ালছানা। হা-হা করছে রোদ। কোথায় মেয়ে? পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে দেশলাইয়ের পেছন দিকটায় একটা কাঠি গুঁজে দিল। পকেটে দেশলাইটা বাবার সামনেও খচখচে আওয়াজ করছিল। ঘরে ঢুকে বললো ঃ হ্যাঁ, তপনের মা জানতে এসেছেন যে, বার্লি-টার্লি তৈরি করে দিতে হবে কিনা।

—তপনের মা, দেখলুম যে অল্পবয়েসি মেয়ে!

—ভুল দেখেছেন। তপনের মা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। কি বলবো?

—বার্লি-টার্লি আমি খাবো না। একটু মাগুর মাছের ঝোল যদি...বেশ কাঁচকলা আর জিরে বাটা দিয়ে...

—মাগুর মাছ এখন কোথায় পাবো? আচ্ছা, কাল দেখবো এখন, যদি জোগাড় করতে পারি। আপনি এখন ঘুমোন।

—উনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে। ওঁকে তবে বল—

—আমি আমাদের বারান্দার দরজা খুলে দিচ্ছি। এপাশ দিয়েই ওঁদের ছাদে চলে যাবেন। চাবিটা কোথায়? ড্রয়ারে আছে?

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে ফের বারান্দায় এসে সশব্দে দরজাটা খুললো সুবিমল। এ দরজা দিয়ে পাশের পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদে যাওয়া যায়। কোনো একসময় এ দুটো বাড়িই বোধহয় একই লোকের ছিল। সুবিমল শূন্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললো ঃ না মাসিমা, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কিছু দরকার হলে আমি নিজেই চাইবো, তা ছাড়া দিদি এসে পড়বে আজ-কালের মধ্যেই।

পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদে অনেকগুলি ফুলের টব। তার ভর্তি সায়া ব্লাউজ শুকোচ্ছে। চোরের মত টপ করে ও বাড়ির ছাদে এসে সুবিমল দুটো কচি কচি গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিলো। ছেঁড়া মাত্রই তার অনুতাপ হলো একটু, কি হবে ফুল দিয়ে! শুধু পরের জিনিস নষ্ট করা। ফুল দুটো টবের ওপরেই ফেলে দিল। একবার সতর্কভাবে ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে সুবিমল আলতোভাবে তারে শুকোতে দেওয়া জিনিসগুলোর ওপর হাত বুলোতে লাগলো। এই লাল রঙের সায়াটা কার? এত টকটকে রঙের সায়া নিশ্চয়ই মা-মাসির বয়েসিরা পরে না। এটা নীলা বৌদির হতে পারে। সায়াটা চেপে ধরে মাঝখানের জায়গায় একটা চুমু খেয়ে সুবিমল ফিরে এলো বারান্দায়। দরজায় তালা এঁটে দিল। কতদিন নীলা বৌদির সঙ্গে দেখা হয় না!

দরজার দিকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাবা। চোখ ভর্তি ত্রাস। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এতক্ষণ কি করছিলি ওখানে? সত্যি কে এসেছিল বলতো?

—বললুম তো, তপনের মা।

—কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলুম একজন কমবয়েসি মেয়ে। লাল পাড় শাড়ি পরা—.

সুবিমল একটু একটু অধৈর্য হয়ে উঠছিল। ইচ্ছে করছিল 'দূর ছাই!' বলে উঠতে। তবু সামলে নিয়ে গলার স্বর নরম করে বললো ঃ তপনের মারই তো লাল পাড় শাড়ি পরা ছিল। আপনি তো মুখ দেখেন নি!

—এলো কি করে এ ঘরে?

—উনি তো নিচের নতুন ভাড়াটেদের ঘরে প্রায়ই আসেন। ওখান থেকেই বোধহয় খবর শুনে একবার দেখতে এসেছিলেন।

বাবার চোখ দুটো এবার সজল। বললেন ঃ তপনের মা-কে খুব ভালোবাসতেন।

—আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

—আমার আর ঘুম আসবে না এ জন্মে—আঃ।

হঠাৎ বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মতন। সুবিমল দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে তারপর কাছে এসে বললো ঃ এ কি, কি হল! এরকম করলে অসুখ—আরো—

বাবা কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না। তারপর আপন মনেই বললেন ঃ তোকে কষ্ট দিচ্ছি! কিছুই করে যেতে পারলাম না তোদের জন্যে—

—আমার আর কি কষ্ট! আপনি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন না। অন্তত চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেও ভালো।

—করুণাকে আসতে লিখেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ, জামাইবাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। ছুটি পেলে আজ বা কালই আসবে।

—কেন আসতে লিখলি? আমার কি এমন হয়েছে?

—তা নয়। তবু বাড়িতে কোনো মেয়েছেলে না থাকলে—অসুখের সময়, আমি কি একা সব পারি?

—নগেন ছুটি পায় না, গত মাসেও একবার এসেছিল, এখন আবার কি করে আসবে?

—সুবিধে হলে তবেই আসবে, জোর করে তো আসতে বলিনি। দিদিকে একাও পাঠিয়ে দিতে পারে। দিদি কাছে কাছে থাকলে আপনারও ভালো লাগবে।

—আমার আর কিছুতে ভালো লাগবে না।

ছোটভাই ঝণ্টু ইস্কুল থেকে ফিরলে ওকে বাবার ঘরে বসিয়ে সুবিমল বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির সামনে রাস্তায় ছেলেরা তিন নম্বর বল নিয়ে পেটাপিটি করছে, ঝণ্টু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ওর বেরুবার উপায় নেই। ঝণ্টুর ওপর এখন অনেক দায়িত্ব, ঠিকে ঝি এসে বাসন মেজে দিয়ে যাবে—তার একটু চুরির স্বভাব আছে, ঝণ্টুকে নজর রাখতে হবে, দরকার হলে বাবার বিছানায় ও বেড প্যান এনে দেবে, এমন কি খুব বুক ধড়ফড় করলে কোরামিন দিতেও জানে ঝণ্টু। সারা দুপুর সে যখন ইস্কুলে, তখন দাদাকে বাড়িতে থাকতে হয়, দাদার কষ্ট সে বোঝে। সুতরাং খেলাধুলো ছেড়েও ঘরে বসে থাকতে সে আপত্তি করে না।

হাঁটতে হাঁটাতে সুবিমল ডাক্তারখানায় এলো। ডাক্তারকে সুবিমল কল্যাণদা বলে, ইস্কুল দুক্লাস উঁচুতে পড়তেন কল্যাণদা, তা ছাড়া বাবার ছাত্র ছিলেন। এক সময় বাবা কল্যাণদার প্রাইভেট টিউটরও ছিলেন। অল্প বয়সেই বেশ পসার হয়েছে কল্যাণ মজুমদারের, ওঁর বাবারও ডাক্তার ছিলেন তো। ঘর ভর্তি লোক, এর মধ্যে দুএকজন রোগী নয়, তারা কাগজ পড়তে এসেছে। এত লোকের মধ্যেও সুবিমলকে দেখতে পেয়ে ব্যগ্র হয়ে কল্যাণদা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী, স্যার কেমন আছেন আজ?

একজন বুড়ো মতন লোকও জিজ্ঞেস করলো ঃ ধীরেনবাবুর অসুখ বুঝি? তাই মাসখানেক ধরে বাজার করার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা হয় না। কী অসুখ?

কল্যাণদা সুবিমলকে চোখের ইশারা করে বসতে বলেন। বসতে অর্থাৎ অপেক্ষা করতে। পসার জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটা হতে শুরু করেছেন কল্যাণ মজুমদার। মাথার সামনে সামান্য টাক পড়েছে। তবু, জামার হাতা গোটালে বেশ স্মার্ট দেখায়। কয়েকজন রোগীকে বিদায় করে, হাঁপ ছাড়ার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন, সুবিমলকেও একটা দিলেন। তারপর বললেন ঃ আমার মনে হয় কোনো স্পেশালিস্ট দেখানো উচিত এবার! আমার যতটুকু বিদ্যে, তা দিয়ে যদ্দুর সম্ভব চেষ্টা করে তো দেখলাম!

সুবিমল বললো ঃ এমনিতে তো ভালোই আছেন। ট্রাবলটা কোথায়?

—হার্টটা অসম্ভব দুর্বল। পেচ্ছাব অত কম হওয়াও ভালো লক্ষ্মণ নয়। আমি ভয় পাচ্ছি, সুবিমল।

—ভয় পাচ্ছেন? সে রকম কিছু কি—

—হার্টের যা অবস্থা, যে-কোনো দিনই একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। একজন স্পেশালিস্টকেই দেখাও। পি, জি'র ডাঃ আর. এন. বাসু আছেন— আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—স্পেশালিস্ট ডাকবো, তার টাকা কোথায়?

—তা বললে কি চলে? বাঁচবার সব রকম চেষ্টা তো করতে হবে!

—দুমাস ধরে বেকার। বাড়িতে কারুর একটি পয়সা রোজগার নেই। কল্যাণদা, আপনি এ সব কথা বুঝবেন না—

—স্যার রিটায়ার করবার পর ইস্কুল থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা-পয়সা কিছু পাননি?

—কি জানি। পেয়েছিলেন বোধ হয়, বাড়িতে তো এখন কোনো টাকাকড়ি দেখছি না!

—আমার কি মনে হয় জানো! কোনো একটা ব্যাপারের জন্য তোমার বাবা সব সময় কষ্ট পাচ্ছেন। অসুখের কষ্ট ছাড়াও, এইটাতেই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। সেদিন আমায় বলছিলেন, আমি এমন অন্যায় করেছি যে শুনলে আমায় সবাই ঘেন্না করবে! আমার মরাই ভালো।—কী ব্যাপার, তুমি জানো কিছু?

উঁহু। এখন আবার একটা অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ভূত দেখছেন যখন তখন। আজ দুপুরেই তো—

টাইটায় আলগা করে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে কল্যাণদাকে খুবই চিন্তিত মনে হয়, ভূতপূর্ব শিক্ষকের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা বেশ আন্তরিক। সুবিমলকে কিন্তু তেমন চিন্তিত দেখায় না। বেশ গাঢ় করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে হয় একটা তামাকের টুকরো তার জিভের সঙ্গে চলে গিয়ে পুরো মুখটাই তেতো হয়ে গেছে। অনুমতি না নিয়েই সে ডাক্তারের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়। তারপর বলে ঃ আমার আর ভালো লাগছে না!

কল্যাণদা একটু অসহিষ্ণু মুখ করে বললেন ঃ পরেশবাবুকে আমি তোমার চাকরির জন্য বলে রেখেছি। সামনের মাসেই হয়ে যাবে বোধ হয়। এবার আর ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করো না! করুণাদি আসছেন নাকি?

—হ্যাঁ, দিদি কালকের মধ্যেই এসে যাবে বোধ হয়।

—বাড়িতে কোনো মেয়ে না থাকলে কি আর অসুখের সেবা হয়? তুমি আর একলা কতদূর করবে? তুমি এই গ্লুকোজের ফাইলগুলো নিয়ে যাও—আমি স্যাম্পল হিসাবে পেয়েছিলাম, এর দাম লাগে নি। ওষুধ-টষুধ সব আছে তো?

সুবিমল উঠে দাঁড়ায়। অন্য অনেক শাঁসালো রুগী বসে আছে, বিনা পয়সার খদ্দের সুবিমলের সঙ্গে আরও বেশিক্ষণ কথা বললে কল্যাণদার মুখে এরপর তেলতেলে ধরনের দাগ ফুটে উঠবে। দরজার কাছে গিয়েও আবার ফিরে এসে অদরকারি কথার মতন সুবিমল জিজ্ঞেস করে ঃ একটা কথা সত্যি বলুন তো বাবার এবারের অসুখ সারবে?

—না সারার কিছু নেই। তবে প্রগনোসিসের কথা যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে কিছু বলা যায় না। আমার একটু ভয় ঢুকেছে।

বাড়ি গিয়ে রান্না করতে হবে ভেবেই সুবিমলের গা জ্বলে যায়। রান্নার কাজটা বাবাই করতেন, অসুখ হবার পর পাশের বস্তি থেকে একজন উড়ে-ঠাকুর আনা হয়েছিল, দুদিন ধরে তারও জ্বর। মায়ের কথা ভেবে রাগ হয় সুবিমলের। অত সাত তাড়াতাড়ি মরার দরকারটা কি ছিল। এখন আমার ওপর যত ঝামেলা! সারা শরীরটা ঘামে ভিজে থাকার মতন বিশ্রি লাগে।

দেড় বছর আগে যে দোকান থেকে ঘড়িটা কিনেছিল, সেই দোকানেই গিয়ে সুবিমল হাত থেকে ঘড়িটা খুলে বললো ঃ কিনবেন? দোকানদার বললো ঃ ও আমরা পুরনো ঘড়ি কিনি না।

সুবিমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ পুরনো ঘড়ি কি বলছেন? মাত্র এক বছর আগে, আপনারই দোকান থেকে—

দোকানদারের একজন বন্ধু পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললো ঃ দেখি, দেখি, কতোয় বেচবেন?

আশিটা টাকা পকেটে আসতে সুবিমল বেশ খুশি হয়ে ওঠে। বেশ লাভ করতে পেরেছে বলেই মনে হয়। রেস্টুরেন্টে বসে বেশ মেজাজের সঙ্গে প্রশ্ন করলো ঃ তোমাদের সুপ নেই?

মোগলাই পরোটা ও মুর্গির মাংস শেষ করার পর সুবিমল পর পর দুকাপ চা খায় আরাম করে। তারপর খুরিতে করে আরও খানিকটা মাংস কিনে নেয় বেরিয়ে আসার সময়। ঝন্টুর আবার তাড়াতাড়ি ঘুম পায়।

বাবার চিৎকার শুনে ধড়ফড় করে ছুটে আসে সুবিমল। অসম্ভব ভয় পাওয়া চিৎকার। দিদি এসে পড়ায় একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল এ রাতটা, কিন্তু ও রকম চিৎকারে কার না ঘুম ভাঙে?

বাবার খাটের কাছেই মাটিতে বিছানা করে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে শুয়েছিল করুণা। হাঁটু গেড়ে বসে বাবার পা ছুঁয়ে বললো ঃ কি হলো বাবা?

ঝন্টুও ঘুম ভেঙে উদভ্রান্তের মতন তাকিয়ে ছিল, পাশের ঘর থেকে প্রায় লাফিয়ে চলে এলো সুবিমল। বাবা খাটের ওপর উঠে বসেছেন, তিনদিন পর এই প্রথম উঠে বসা, গালটা এই তিনদিনেই এমন চুপসে গেছে! চোখ দেখলে মনে হয় দৃষ্টি নেই! করুণা তখনও ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে ঃ কি হলো? কি হলো ঃ বাবা, এই যে আমি—

বাবা আস্তে আস্তে বললেন ঃ আর কেউ নেই? আর কেউ নেই?

—আর কে থাকবে?

—আমি সেই মেয়েটাকে দেখলাম। স্পষ্ট আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো।

—কোন মেয়েটা?

—দুপুরে যে মেয়েটা এসেছিল।

সুবিমল বললো ঃ দুপুরে তো কেউ আসে নি। শুধু তপনের মা।

—না, না, সেই মেয়েটাই এসেছিল। ওঃ, ওঃ ওঃ।

—ঝণ্টু, কোরামিন কোথায় রেখেছিস? চামচেটা?

বড় মাসিমার ননদের বিয়ের সময়, বিয়ে বাড়ির নানান গণ্ডগোল ও হৈ-চৈ-এর মধ্যে সুবিমল বড় মাসির মেয়ে তপতীকে চুমু খেয়ে ফেলেছিল সিঁড়ির তলায়। আসলে চুমু পাবার জন্য তপতীই নিজের ঠোঁট ও হৃদয় ব্যাকুল করে রেখেছিল, কিন্তু সে যাই হোক, ঘটনাটা মেসোমশাইর চোখে পড়ে যায়। সাক্ষাত মাসতুতো বোনকে চুমু খাওয়ায় বেশ একটা কেলেঙ্কারির আবহাওয়া জমে ওঠে। বাবা সকলের সামনে চটি জুতো খুলে মেরেছিলেন সুবিমলকে। সেই থেকে সুবিমল আর বড় মাসিমার বাড়ি যায় না। কিন্তু বড় মেসোমশাই নাম করা ডাক্তার তাঁর সাহায্য এখন খুবই দরকার। করুণা নিজে থেকেই সকালবেলা বললো ঃ খোকন, তুই একটু বাড়িতে থাক, আমি কালীঘাট থেকে ঘুরে আসি। থাকবি তো?

যেন দিদি আসার আগে এই একমাস সুবিমল বাড়িতে থাকে নি! চাকরি যখন নেই তখন তো রুগ্ন বাবাকে ফেলে রেখে বাড়ি ছেড়ে যাবার কোনো যুক্তিও নেই তার। সুবিমল খবরের কাগজটা নিচের ভাড়াটেদের কাছ থেকে চেয়ে এনে বাবার খাটের সামনে এসে বসে থাকে। বাবার মুখে কোনো কথা নেই, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন শুধু। করুণা যতক্ষণ শাড়ি জামা পরে তৈরি হয়ে নিল, ততক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে এইদিকে চেয়ে রইলেন। করুণা বেরিয়ে যেতেই বললেন ঃ বাবার গলার আওয়াজ বসে গেছে, কি রকম যেন ফ্যাসফেসে। কাল রাত্রে সত্যি এ ঘরে কেউ আসে নি?

—কে আর আসবে? দিদি তো ছিলই—

—একটু কাছে সরে আয়। সত্যি কি ভুল দেখলুম? স্পষ্ট দেখতে পেলুন, মেয়েটা, আমার মাথার কাছে এসে—আঃ ঝণ্টু, অত জোরে জোরে পড়ছে কেন, জোরে পড়লেই বুঝি বেশি পড়া হয়? বারণ কর না?

—কাল কি দেখলেন?

—মেয়েটি এসে আমায় বললো ঃ দিন, আমার গয়না দিন!

—কিসের গয়না?

—তোর মায়ের গয়না।

সুবিমল বাবার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই দেখতে পায় বাবার দুচোখ জলে ভরে এল। সব মানুষের চোখের জলের রং এরকম হয় না, বাবার চোখের জল কেমন যেন ময়লা। বাবার চোখের জল দেখাতো দূরের কথা, বছর দশেকের মধ্যে সে বাবার মুখের দিকে এ রকম একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছে কিনা, তাই সন্দেহ। সুবিমল গামছা দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললো ঃ থাক, থাক। আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন।

—আমি এক বিন্দু ঘুমোই নি। স্বপ্ন না।

—থাক না ও কথা। এখন ঘুমোন। আমি দেখি আজ মাগুর মাছ পাই কিনা।

—একটু জল দে।

এই সুযোগে জলের মধ্যে খানিকটা গ্লুকোজ গুলে দিল সুবিমল।

পাশের পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদে কি যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে। মোড়ের চায়ের দোকানে বন্ধুরা এখন খুব আড্ডা জমিয়েছে—সেখানে যাবার জন্য একবার তার মন ছটফট করে ওঠে। বাবা আবার ফিসফিস করে বললেন ঃ বারবার একটাই মেয়ে আসে, এসে হাত পেতে দাঁড়ায়। বলে, দাও, আমার জিনিস দাও, আমার গয়না।

—আঃ, থাক না ও কথা। কেউ আসেনি।

—এসেছিল। তুই মেয়েটাকে চিনিস। কে রে?

—আমি কি করে চিনবো। আমি দেখেছি নাকি?

—তোরই চেনার কথা। তোর জন্য তো—কি নাম মেয়েটার?

—কি মুশকিল! আমি কি করে নাম জানবো?

—জানিস না? মিথ্যে কথা বলছিস! জানি, আমাকে তোর সহ্য হয় না! আসলে বিরক্তি ও রাগই হয়েছিল সুবিমলের কিন্তু অনুনয়ে কাতর হয়ে বললো ঃ বাবা, কেন এসব কথা বলছেন? শুধু শুধু আরও শরীর খারাপ করছেন। কে এসে গয়না চাইছে, আমি তা কি করে জানবো?

—তোর জন্যই রেখেছিলাম। করুণাকেও দিইনি। তোর মায়ের সোনার রুলি একজোড়া, তার ছেলের বউয়ের জন্য রাখা ছিল, তোর মা দিতে বলে গিয়েছিল—

—বেশ তো দেবেন! যখন সময় হবে।

—আর সময় হবে না কোনোদিন।

—কেন এসব ভাবছেন। কল্যাণদা বললেন ঃ আপনার এ অসুখ সারতে আর সাতদিনও লাগবে না। এই ইনজেকশানগুলোর রি-অ্যাকশান শুরু হলেই—

—সেরে উঠে লাভ কি? সে রুলি দু'গাছা নেই।

—নেই! কোথায় গেল? চুরি গেছে?

—আমি খেয়ে ফেলেছি।

অনেকদিন থেকেই সুবিমলের সন্দেহ ছিল, সামান্য দুএকটা কথা জেনে নিতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সুবিমলের বন্ধু নিরঞ্জন একদিন বলেছিল ঃ তোর বাবাকে দেখেছি ডালিমতলায় গুপীদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি করতে। ও জায়গাটা ভালো নয়, বুড়ো মানুষ—একটা বিপদে পড়বেন। সুবিমল হাসতে হাসতে বলেছিল ঃ আমার বাবাকে আমি শাসন করবো নাকি? যেখানে ইচ্ছে যাবেন।

ডালিমতলার মোড়ের কাছে একদল বখা ছোঁড়া জটলা পাকিয়ে আড্ডা দেয়। বাজার করে একদিন ফিরছেন ধীরেনবাবু, একটা ছেলে এসে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো ঃ স্যার, আমায় চিনতে পারেন? আমি ফটি এইটের ব্যাচে ছিলুম।—সব ছাত্রের মুখ মনে থাকে না, সেইজন্য যে কোনো যুবককেই চেনা চেনা লাগে। বললেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নামটা কি যেন? —আমার নাম যতীন, আমার কাকারাও আপনার ছাত্র ছিল। স্যার, আপনি নাকি ঘর ভাড়া খুঁজছেন?

—হ্যাঁ, তোমার সন্ধানে আছে নাকি? যেখানে থাকি, ছাদ দিয়ে বড্ড জল পড়ে।

—স্যার, আপনি একটা বাড়ি কিনবেন?

কলকাতা শহরের বুকের ওপর একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি, মাত্র তেরো হাজার টাকা দাম। তালা খুলে যতীন ওঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। এখন খালিই পড়ে আছে, চারখানা বড় বড় ঘর, ছোট উঠোন, রান্নাঘর, বাথরুম—বাথরুমের চৌবাচ্চাটা কি বিরাট। একটা ঘরে একটা ময়লা শতরঞ্জি পাতা, এখানে ওখানে ঝোলের দাগ আর মাংসের হাড়, কয়েক প্যাকেট তাস। ঘরভর্তি ছড়ানো। পনেরো বৎসর আগে মাত্র সাড়ে চারশো টাকা কাঠায় টালিগঞ্জে দুকাঠা জমি কিনে রাখতে বলেছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার। তখন কেনা হয় নি। আজ একটা গোটা বাড়ি! ধীরেনবাবু হেসে বলেছিলেন ঃ এ বাড়ির দাম তো অনেক বেশি হে!—সঙ্কুচিতভাবে যতীন বলে ঃ তাতো অনেক বেশি হবেই কিন্তু আপনি আমাদের মাস্টার মশাই, আপনি তো এই বয়সেও অনেক বেশি কষ্ট করে আছেন, তা আমাদের ভালো লাগে না। আপনাকে আমি ওই দামেই দিতে চাই।

শুনে ধীরেনবাবুর লোভ হয়। লোভ তো আর হিসেব করে আসে না। গল্পেও তো শোনা যায়, গুরুর-দক্ষিণা হিসেবে কোনো মহৎ ছাত্র বাড়ি বা জমি দানও করে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন ঃ তুমি যে এইটুকু বললে, তাই যথেষ্ট। তোমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করি। ও বাড়ি কেনার সামর্থ্য আমার নেই। তেরো হাজার টাকাই বা আমি পাবো কোথায়?

—আপনি রিটায়ার করেছেন শুনলুম। আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নেই?

—সে সামান্য টাকা। অনেক ধার-টার ছিল, স্ত্রীর শ্রাদ্ধেও খরচ হল, মেয়ের বিয়েতে গেছে, এখন হাজার চারেক টাকা পড়ে আছে পোস্টাফিসে— বাড়ি কেনা আমাদের পক্ষে স্বপ্ন। তুমি যদি বরং ভাড়া দাও—

দুদিন বাদে ধীরেনবাবু আবার সেখানে ঘুরে এল সন্ধ্যাবেলা। ভেতরে তুমুল তাস খেলা চলছে। হাতের সিগারেট ফেলে উঠে এসে যতীন বললো ঃ স্যার কিছু ঠিক করলেন? ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন ঃ না, জানতে এলাম তুমি ভাড়া দিতে রাজি আছো কিনা। কেনার সামর্থ্য আমার নেই। আদর করার মতন, সারা বাড়িটার গায়ে চোখ বুলোতে লাগলেন। ছোটোর ওপর বেশ ছিমছাম বাড়িটা।

ওঁকে বাইরে নিয়ে এসে যতীন বললো ঃ আমার কিছু ক্যাশ টাকা দরকার, সেইজন্যই বিক্রি করতে চাইছি। একটা বিজনেস করছি, কিছু ক্যাপিটাল দরকার। আপনি আমার পার্টনার হবেন?

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেটা ফ্যাক্টরির ইউনিয়ন নিয়ে মেতে থাকে। সারাদিন কাজের মধ্যে ছোট ছেলেটাকে সকালে পড়ানো, বাজার আর রান্না, সন্ধেবেলা একটা টিউশানি। পোস্টাফিসের টাকাগুলো আস্তে আস্তে কমে আসছে। সুবিমলটা যদি মানুষ হতো। ভালো করে দাঁড়াতে পারতো, তাহলে কি আর আজ কোনো দুঃখ থাকতো। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের বিজনেস?

—কাস্টমসে যে সব স্মাগল করা জিনিসপত্র ধরা পড়ে, সেগুলোর নিলাম হয়। কাস্টমসে আমাদের চেনা লোক আছে। ওগুলো সস্তায় নিলামে কিনে বাজারে দুনো দামে বিক্রি করবো। একটু বেশি ক্যাপিটাল চাই, কিন্তু লাভ সেন্ট পারসেন্ট।

প্রথম এক হাজার টাকা নিয়ে যতীন স্ট্যাম্পে সই করা রসিদ দিয়েছিল। ধীরেনবাবুই বলেছিলেন ঃ রসিদের কি দরকার! নিজের ছাত্রকে কেউ অবিশ্বাস করে? যতীন বলেছিল ঃ না স্যার, কাগজপত্রে ঠিক রাখা ভালো, টাকা-পয়সার ব্যাপার তো!

পাঁচদিন বাদে সেই খালি বাড়ির কোণের ঘরে সাত আটটা ছেলে। গুপী নামে যণ্ডা ছেলেটা হাত ব্যাগ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা বার করতে লাগলো। ধীরেনবাবু সেদিন সতেরো শো টাকা পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। মাত্র পাঁচদিনে সাতশো টাকা লাভ? মাত্র দশ বছর আগেও তাঁর মাইনে ছিল পঁচাশি টাকা, বছরে সাতশো টাকা হতো কিনা সন্দেহ। টাকাটা পেয়েই তিনি ভাবলেন, আর না, এই যথেষ্ট। কিন্তু বাড়ি? বাড়িটা কিনে দুখানা ঘর ভাড়া দিলে, সারা জীবনে আর চিন্তা থাকে না। আজ সাতাশ বছর ধরে কলকাতায় এগারোখানা ভাড়া-বাড়ি বদলানো হয়েছে। এখন ইচ্ছে হয় না কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে? যতীনকে বললেন ঃ এ বাড়ি কিন্তু তুমি আমাকে না-বলে অন্য কারুকে বিক্রি করতে পারবে না! বাড়ির টাইটেল ঠিক আছে তো?

মাস দেড়েক বাদে গুপী ঠোঁট উল্টে বললো ঃ ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি তো আছেই। তা না জেনেই ব্যবসা করতে এসেছিলেন? স্যার আপনি তো আর কচি খোকা নন। আবার টাকা জোগাড় করুন।

ধীরেনবাবু যতীনের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন ঃ বাবা, আমার টাকা চাই না। আমার গয়নাগুলো অন্তত ফেরত দে। আমার স্বর্গতা স্ত্রী গয়না।

যতীন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল ঃ আপনি ভাববেন না স্যার, ওগুলো নষ্ট করিনি। বাঁধা দেওয়া আছে, আর একটা দাঁও মারলেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো।

যতীন আজ আর সিগারেট ফেলে নি। গুপী আর তার বন্ধুরা গ্লাসে করে মদ খাচ্ছে। মাংসের ঝোলের মধ্যে একটা মাছি আটকে আছে। এতদিন পর এই প্রথম যেন এসব চোখে পড়লো, কি বিশ্রী পরিবেশ, কি বিশ্রী এদের ব্যবহার আর ভাষা। মাস্টারমশাই বলে আর সম্মান করে না, ব্যবসার পার্টনারের মতন দেখছে। লোভে তাঁকে কোথায় নিয়ে এসেছে? এই বাড়ি, এই বাড়িটার জন্যেই তো, সামান্য একটা একতলা বাড়ি, খুব বেশি লোভ কি? ধীরেনবাবু কেঁদে ফেললেন। গুপী যতীনকে ধমকে বললো ঃ এইজন্য তোকে বলি, বুড়োফুড়োকে এর মধ্যে ঢোকাস নি। রিসক নিতে জানে না, তবু ব্যবসার সখ আছে। মাস্টারমশাই আপনি এবার কেটে পড়ুন আর একটা লট ধরতে পারলে আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেবো।

ধীরেনবাবুর আর তো উপায় নেই। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা এখানে এসে বসে থাকেন। ওরা নির্বিকারভাবে সব ভুলে খিস্তি-খেউড়, তাস, মদ নিয়ে বসে আছে। একদিন কোথা থেকে দুটো মেয়েছেলেকে নিয়ে এলো। গা ঘিনঘিন করে। লোকে তাঁকে এখানে দেখলে কি বলবে? কিন্তু উপায় তো নেই। কাকে গিয়ে একথা বলবেন ঃ এইসব বদছেলের সঙ্গে তিনি চোরাই জিনিসের ব্যবসার অংশীদার হয়েছিলেন! এদের ছেড়ে দিলেও তো সর্বস্ব গেল। এখন এদের হাতে-পায়ে ধরেও যদি কিছু ফেরত পাওয়া যায়! হাতজোড় করে ওদের কাছে বললেন ঃ আমার গয়নাগুলো ফেরত দে বাবা! টাকা আমার নিজের—তা গেছে গেছে, গয়নাগুলো আমার স্ত্রীর, ওতে তোদের মহাপাপ হবে!

পুলিশরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সাত-আট জন গুণ্ডা শ্রেণীর ছোকরা, দুটো বেশ্যা। তার মধ্যে একজন ছাতা হাতে নিরীহ চেহারার বুড়ো। ইন্সপেক্টরের পায়ে আছড়ে পড়ে ধীরেনবাবু বললেন ঃ আমায় ছেড়ে দিন, আমার যথাসর্বস্ব গেছে, আমার সম্মানটুকুও নষ্ট করবেন না। আমি একজন শিক্ষক।

ইন্সপেক্টর বাঁকাভাবে বলেছিল ঃ শিক্ষক! চোরাই ব্যবসা করতে সম্মানে বাধে নি, এখন ধরা পড়েই যত সম্মানের কথা! চলুন থানায়!

থানার বড়বাবু বললেন ঃ আপনি অমুক ইস্কুলে অঙ্ক পড়াতেন না? আমিও আপনার ছাত্র ছিলাম। ছি, ছি, এসব কি করেছেন? এদের সঙ্গে—

হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ধীরেনবাবু বলেছেন ঃ ভুল করে ফেলেছি। মানুষের কি একটাও ভুল হয় না? আমার ছেলেমেয়ে আছে, আমায় এ কলঙ্ক থেকে বাঁচাও।

—মাস্টার মানুষ, সমাজের পাঁচজন আপনাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করবে তা না, হঠাৎ বড়লোক হবার জন্য এসব জঘন্য কাজ যদি আপনারাও করেন—

—আমার ভুল হয়ে গেছে। ছাত্র বলেই ওদের বিশ্বাস করছিলুম।

—ছাত্র হলেই কি ধোয়া তুলসী হয়! ছাত্র বলে না হয় বিশ্বাস করেছিলেন কিন্তু কাজটাও যে অতি জঘন্য তা বোঝেন নি? নাকি ভেবেছিলেন সবাই যখন জোচ্চুরি করছে, আপনিও এই ফাঁকতালে বড়লোক হয়ে যাবেন!

—বড়লোক হতে চাই নি, শুধু একটা বাড়ি চেয়েছিলাম।

—চুপ করুন! ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদবেন না।

মাস আষ্টেক আগে, সুবিমল তখন ইউনিয়ন নিয়ে মত্ত, নাওয়া-খাওয়া নেই, প্রায়ই রাত্রিতে বাড়ি ফেরে না, ফ্যাক্টরিতে তখন লক-আউট চলছে, একদিন সকালবেলা বাড়ির সামনে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে দেখে সে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু পুলিশটি এসে তার বাবাকে খোঁজ করে এবং হৃদ্যতার সঙ্গে কিছু কথা বলে চলে যায়। সুবিমল ভেবেছিল পুলিশের লোকেরাও তো তাদের ছেলেদের পাস করাবার জন্য মাস্টারদের ঘুষ দেয়। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। ওর বন্ধু নিরঞ্জন বলেছিল ঃ তোর বাবা গুপীদের আড্ডায় কেন যে যান বুঝি না। ওরা ডেঞ্জারাস! শুনলুম গুপীদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে। দেখিস, তোর বাবাও বিপদে না জড়িয়ে পড়েন।

সুবিমল হাসতে হাসতে বলেছিল! কি মুশকিল, বাবাকেও কি আমি চালচলন শেখাবো নাকি? বাবার যা ইচ্ছে তাই করবেন। আমি কি ওঁকে উপদেশ দিতে পারি! ছেলেমানুষ তো নন!

বড় মেসোমশাই বাবার নাড়ী ধরে আছেন, সুবিমল বড় মেসোমশাইয়ের চোখের দিকে তাকাতে পারে না বলে অস্বস্তি বোধ করছিল। ঘর ভর্তি লোক, পাড়াসুদ্ধ লোক রুগী দেখতে এসেছে। এতদিন বাড়িতে মেয়েমানুষ ছিল না বলে, অন্য মেয়েরাও আসে নি। এখন করুণা এসেছে, দুপুরের ঘুম নষ্ট করে পাড়ার যাবতীয় মেয়ে আজ এ ঘরে।

বাড়িওয়ালা বললো ঃ মাস্টারমশাইয়ের এ-রকম অসুখ কিন্তু আমার ছেলের যে সামনেই পরীক্ষা। তুমিই একটু পড়িয়ে দাও না একদিন?

সুবিমল উত্তর দিল ঃ আপনার ছেলেকে আমি খুব ভালো চিনি। ওর লেখাপড়া হবে না, ওকে আপনি ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিন।

পাশের ঘরে এসে সুবিমল জামাকাপড় বদলাচ্ছিল। নীলা বৌদি এসে একেবারে কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললে ঃ ভেঙে পড়ছো কেন? পুরুষমানুষ, কি চেহারা হয়েছে এই কদিনে?

সুবিমল অবাক হয়ে ঘুরে তাকালো। যাচ্চলে! তার ভেঙে পড়ার খবর নীলা বৌদি কি রকম করে জানে? নীলা বৌদি নীল-রঙা শাড়ি পরতে ভালবাসেন সব সময়। সেই লাল সায়াটাও পরেছে নাকি আজ? কোনো কথা না বলে সুবিমল নীলা বৌদির দুই স্তনের ওপর মুখ ও হাত চেপে দিতেই ঝটকা মেরে সরে গিয়ে নীলা বৌদি বললো ঃ ছিঃ, এ সময়ে—

সন্ধেবেলা নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ঃ তোর বাবা কেমন আছে রে?

সুবিমল উৎফুল্লভাবে বললে ঃ খুব ভালো ঃ সেরে গেছেন প্রায় বলা যায়। এখন ওঁকে দেখার অনেক লোক। নিরঞ্জন বললো ঃ চল, তাহলে আজ কোথাও গিয়ে বসা যাক।

দোকান থেকে বেরুবার পর সুবিমল বুঝলে, ওর বেশি নেশা হয়ে গেছে। নিরঞ্জন বললো ঃ তুই ওদের সঙ্গে পারবি না। ওরা কথায় কথায় ছোরা-ছুরি চালাতেও পারে। এ শহরে ওরাই তো দলে ভারী। সুবিমল হাত নাড়তে নাড়তে বললো ঃ তুই আমার পেছনে পেছনে আসছিস কেন? তুই বাড়ি যা না—

জুয়া, খেলতে এসেছিস টাকা আছে? আগে বার কর—

সুবিমল গুপীর চোখের দিকে তীব্রভাবে চেয়ে আছে। ওর পকেটে তখনো ষাট টাকা। বললো ঃ আয় না, দেখি তোর কত মুরোদ!

—এ ছেলেটা মদ খেতে খেতে আজ মরে যাবে নাকি?

—তিনশো টাকা জিতেছি আজ। দে শালা, আমার মায়ের গয়না দে!

—কে নিয়েছে তোর মায়ের গয়না?

—দে আমার মায়ের গয়না দে! আমার মায়ের গয়না নইলে তোর (ছাপার অযোগ্য, অশ্লীল, অশ্লীল, অশ্লীল)—

—মুখ খারাপ করবি না শালা! জান নিকলে দেবো—

—আমার মায়ের গয়না দে। নইলে সব্বাইকে বার করে দেবো বাড়ি থেকে। বেরো! এটা আমার বাবার বাড়ি!

—তোর কোন বাপের? তোর অনেকগুলো বাপ—

—মুখ ভেঙে দেবো। ভাগ—

—এই গুপী ডাণ্ডা দিয়ে মারিস নি খুন হয়ে যাবে—

—আমার মায়ের গয়না দে। আমার জেতা টাকা, ওঃ ওঃ—

শাড়ি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার পর করুণা বললো ঃ তুই এই চেহারা নিয়ে আর বাবার সামনে যাস না, বাবা তাহলে এমনিতেই হার্টফেল করবে।

দুপুর থেকেই অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল, রাত নটা বেজে আট মিনিটে সবাই বললো ঃ আহা, লোকটা সারা জীবন শুধু কষ্টই পেয়ে গেল! রিটায়ার করার পর কোথায় এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে একটু সুখের মুখ দেখবে, তা ভগবান আর—

করুণা ছাড়া চেঁচিয়ে কাঁদার আর কেউ নেই। আর সব বোবার মতন বসে আছে। কল্যাণদা বললেন ঃ ডেথ সার্টিফিকেট আমি লিখতে পারবো না। আমার কলম দিয়ে মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর কথা লেখা অসম্ভব। তুমি অন্য ডাক্তার আনো। তপনের মা ঝণ্টুকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। নীলা বৌদি করুণাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আধঘণ্টার মধ্যেই মেসোমশাই এসে সার্টিফিকেট লিখলেন। মাসিমার এখন নমাস চলছে, তিনি আসতে পারেন নি।

—বসে থেকে কী হবে, তোমার বন্ধুবান্ধবদের খবর দাও।

বন্ধুবান্ধব? নিরঞ্জনের আজ নাইট-ডিউটি। অবিনাশ আর শেখর শিলং বেড়াতে গেছে। রাত্তির বেশি হয় নি, মাত্র সাড়ে এগারোটা। ডালিমতলা বেশি দূর নয়।

দড়াম করে দরজা খুলে সুবিমল বললো ঃ আমার বাবা মারা গেছেন।

ঘরের কেউ কোনো কথা বললো না, চুপ করে চেয়ে রইলো। সুবিমল চিৎকার করে বললো ঃ দে, আমার টাকা ফেরত দে। সেদিন তিনশো টাকা জিতেছিলুম, দে আমার টাকা!

কেউ কোনো কথা বললো না। গুপী চুমুক শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলো। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি সুবিমল, ভয়ংকর চেহারা মুখের। যতীন বললো ঃ স্যারের আসুখ হয়েছে শুনেনি তো। আহা, এমন ভালো লোক ছিলেন।

—গয়না চাই না, দে, আমার টাকা দে! শ্মশানে পোড়াবার খরচ নেই আমার!

যতীন নিচু হয়ে শতরঞ্জি থেকে নোট ও খুচরোগুলো জড়ো করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো ঃ নিয়ে যাবার লোকও তো লাগবে? চল আমরা যাচ্ছি। আয় গুপী!

—ইস, শরীরটা এমন চুপসে গেছে? একমাস আগেও তো দেখেছিলুম—

—মুখটা অতখানি হাঁ করা, বুজিয়ে দে না—

—চোখ দুটোও খোলা, পাতা দুটো টেনে নামিয়ে দে।

—মরা মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না।

নীলা বৌদির ছাদের টবের ফুল ছিঁড়ে আনা হয়েছে সাজাবার জন্য। করুণা বাবার পায়ে আলতা মাখিয়ে ছাপ তুলে নিল। করুণা, মরার আগে তোমার বাবা কি কথা বলেছেন?

কী আর বলবেন, গোটা দিনটাই আজ কোনো জ্ঞান ছিল না! কাল রাত্তিরে শুধু বিড়বিড় করেছেন বাড়ি, বাড়ি—

মেসোমশাই নিজের ছোট ছেলেকে বললেন ঃ উঁহু, ঘাটের ধারে যেও না, এখন জোয়ার, নদী একেবারে ভরা। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে,গলার বোতামটা আটকে দাও।

বাবার খুড়তুতো ভাই হীরেনকাকা বললেন ঃ আমি আর থাকতে পারছি নারে সুবিমল। আমার কাল অফিসে বেরুতেই হবে। এক্সটেনশনের চাকরি—

রোগা পুরুত বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। ডোমেরা কাঠ সাজিয়ে বললো ঃ হাল্কা লাশ আছে, পুড়তে বেশি সময় লাগবে না, ঘণ্টাচারেক বড় জোর—

একগোছা প্যাঁকাটিতে আগুন জ্বালিয়ে পুরুত বললো ঃ নিন, আপনি জ্যেষ্ঠ সন্তান তো? আপনি প্রথম মুখাগ্নি করুন!

মুখটা তো হাঁ করা আছেই, কি ক্ষুধার্ত আর লোভীর মতন দেখাচ্ছে। জ্বলন্ত প্যাঁকাটির গোছা হাতে নিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুবিমল। তারপর গুপী যতীনের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললো ঃ তোরাই মুখে আগুন দে। বাবা বলতেন, ছাত্ররা সবাই আমার সন্তানের মতন।

বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য

চার্চ লেনের মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে বিজন সিঙ্গাপুরী কলা খাচ্ছিল। দুপুরের দিকে অফিস পাড়ায় টিফিন শুরু হয়ে গেছে, রাস্তায় বেশ ভিড়। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় বিজন কিছুদিন বয়স্কাউট হয়েছিল, সেই সময়কার কতকগুলো পুরোনো অভ্যেস তার এখনো রয়ে গেছে। যেমন, রাস্তার কল থেকে শুধু শুধু জল পড়ছে দেখলে বিজন এসে বন্ধ করে দেয়, ফল খেয়ে রাস্তায় খোসা ফেলে না। সুতরাং খোসাগুলো এক হাতে রেখে শেষ কলাটা যখন মুখে পুরেছে, এই সময় ছোট্ট দুটি ঘটনা ঘটলো।

বিজনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক সস্তার ফাউন্টেন পেন বিক্রি করছিল, সেই লোকটা কি কারণে যেন একটু সরে এসে বিজনকে একটা ধাক্কা দেয়। বিজনের হাত থেকে কলার খোসাগুলো মাটিতে পড়ে গেল। বিজন লোকটাকে একটা ধমক দেবে ভেবে ছিল, কিন্তু লোকটা একজন বোকাস্তন মহিলাকে প্রায় একটা পেন গছাচ্ছে সেই মুহূর্তে, তাই বিজনের একটু মায়া হল। কলার খোসা তিনটে এমনভাবে ফুটপাথে ছড়িয়ে আছে যে, অবিলম্বে কোনো লোক আছাড় খেতে পারে। বিজন এমন কি নিচু হয়ে খোসাগুলো মাটি থেকে তুলতে যাচ্ছিল, তারপর ভাবলো, এটা বড্ডই বাড়াবাড়ি। তখন সে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ওগুলোকে ফুটপাথ থেকে সরিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এই সময়, রাস্তার ওপাশ থেকে স্যুট পরা দুজন সম্ভ্রান্ত কুলীন চেহারার লোক অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিল, রাস্তার এলোমেলো ভিড় থেকে স্পর্শ বাঁচাতে গিয়ে তাদের মধ্যে একজন বিজনের বাঁ পাশে গুঁতো মারলো। বিজন সেই মুহূর্তে পা দিয়ে কলার খোসা সরাতে ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক, ধাক্কায় বিজনের অন্য পা কলার খোসার ওপরে পড়লো, খানিকটা পিছলে গিয়ে বিজন বেশ জোরালোভাবে একখানা আছাড় খেল। স্যুট পরা লোক দুটি নিজেদের মধ্যে এমনই মশগুল ছিল যে, পিছনের ঘটনা লক্ষ্য করলো না, এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট দিকে। একটা বাচ্চা মেয়ে সামনে ত্যানা মেলে সুর করা করুণ গলায় ভিক্ষে চাইছিল, সে পর্যন্ত ফিক করে হেসে উঠলো অত বড় একটা লোককে আছাড় খেতে দেখে।

আছাড় খেয়ে বিজনের বেশি কিছু ক্ষতি হয় নি, শুধু ও বিষম অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই সামান্য ঘটনার যেন কি একটা বিশাল অর্থ আছে। জন্মের সময় যে নার্স বা দাই উপস্থিত থাকে—বহুকাল বাদে তার সঙ্গে পরিচয় হলে মানুষের যেরকম মনে হয়—বিজনের সেইরকম একটা দমবন্ধ করা অভিজ্ঞতা হল। শরীরে তেমন চোট লাগে নি, চশমাটা শুধু ছিটকে গিয়ে ভেঙে গেছে, খালি চোখে সেই অতিমানুষ ভর্তি রাস্তার দিকে এক মুহূর্তে তাকিয়েই বিজন সবকিছু পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে পারলো।

বিজন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ফাউন্টেন পেনওয়ালা তার বোকা খদ্দেরনীকে তখনো খুচরো ফেরত দেয় নি, কিন্তু সে বিজনের দিকে এগিয়ে এসে বললো, কলার খোসা নিয়ে কেউ খেলা করে? তখন থেকেই দেখছি.....বেশি লাগলো নাকি?

বিজন ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রুক্ষ গলায় বললো, না, কিছু হয় নি।

ফাউন্টেন পেনওলা বললো, ইস চশমাটা ভেঙে গেল দাদা। আমিই ধাক্কা দিলাম নাকি?

বিজনের আর দেরি করার সময় নেই, লোকটার হাত থেকে চশমাটা কেড়ে নিতে গেল প্রায়। লোকটা তবু বললো, মাপ করবেন, দেখি নাই, ইস, এই বাজারে—

বিজন হনহন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কালো স্যুট পরা লোক দুটি তখনও চোখের আড়ালে যায় নি। একটি লোক খুবই রোগা, পোশাক ঢলঢল করছে শরীরে, কিন্তু হাঁটার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা আছে। তার পাশের লোকটি—যে বিজনকে ধাক্কা দিয়েছে, তার মাঝারি স্বাস্থ্য, ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতন মুখ। পাছে না হারায়—তাই বিজন খুব দ্রুত এগিয়ে এল। কিন্তু কাছাকাছি এসে পৌঁছোবার আগেই ওরা দু'জন ঢুকে পড়লো একটা অফিসে। দারোয়ান ওদের সেলাম করলো, লিফট থেমেই ছিল, সেইরকমই কথা বলতে বলতে ওরা লিফটের মধ্যে দাঁড়াতেই, লিফট শূন্যে উঠে গেল।

ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে বিজন সামান্য একটু হাসলো। সিগারেট-দেশলাই বার করে ধরিয়ে বিজন দেয়ালে সাঁটা পিতলের ফলকগুলো পড়তে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে বিজন অবাক হয়ে গেল, চশমা ছাড়াও পড়তে তার কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। আবহাওয়া অনুযায়ী স্বাভাবিক রং যা হওয়া উচিত ছিল—বিজনের কাছে তার থেকে একটু গাঢ়, কিন্তু সব কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য।

সেই বাড়িটাতে ৭টা অফিস, সুতরাং খুঁজে পাওয়া মুশকিল। লিফটটা আবার ফিরে আসতে বিজন লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করলো ওই দুই বাবু কোন অফিসে কাজ করেন ভাই?

লিফটম্যান বললো, দুজন দু তলায়, আপনি কাকে চান?

বিজন হাত দিয়ে শরীরের আকার বোঝাবার চেষ্টা করে বললো, ওই যে যিনি ইয়ে মতন—

—দাশগুপ্ত সাহেব? মুলিগান-ডেভিস, চারতালা, যাবেন?

—না, এইমাত্র তো ফিরলেন, এখন ব্যস্ত থাকবেন, পরে দেখা করবো।

আড়াইটে বাজে, অফিসগুলো ছুটি হয় সাড়ে পাঁচটায় সুতরাং বিজনের হাতে অনেক সময় আছে। চার্চ লেন ধরে বিজন আবার খুব মন্থরভাবে হাঁটতে লাগলো। মোড়ের মাথায় এসে দেখলো ফাউন্টেন পেনওয়ালা আর একটা বোকা বুড়োকে ভজাচ্ছে। ভিখিরি মেয়েটার ত্যানায় কয়েকটা খুচরো পয়সা পড়েছে। ঠিক একই রকম চেহারার মানুষের ভিড়। একটা গরু সেই কলার খোসাগুলো খাচ্ছে মহানন্দে। নোংরা জলের মধ্যে পড়ে আছে তার চশমার ভাঙা কাঁচ, প্রায় সাত বছর ওগুলো তার চোখের সামনে ছিল। মিঃ দাশগুপ্তর কি মোটরগাড়ি আছে? না তাহলে তিনি হেঁটে রাস্তা পার হবেন কেন?

মিন্টুদির অফিসে দেখা করতে গেলে তার কলিগরা বিজনকে মিন্টুদির প্রেমিক ভাবে। অথচ আপন পিসতুতো বোন। ভাই-এর ছদ্মবেশ ধরতে কি প্রেমিকদের সম্মানে বাধে না? আগে তুমি বলতো, এখন মিন্টুদির অফিসে গেলে বিজন সকলকে সাড়ম্বরে শুনিয়ে মিন্টুদির সঙ্গে তুই-তুকারি করে। মিন্টুদি, তোদের বেয়ারাকে বল এক গ্লাস জল আনতে, তোদের অফিসটা বড্ড গুমোট—এইরকম। কিন্তু আগে প্রেমিকারই মতন খেলাচ্ছলে মিন্টুদিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ভয় দেখিয়েছে, বলেছে, তোমার বন্ধু স্বপ্নার সঙ্গে আমার একটু ভাব করিয়ে দাও না মিন্টুদি, বেশ সিনেমা-টিনেমা দেখবো একসঙ্গে বড্ড একা একা লাগে।

মিন্টুদির টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে একজন অচেনা লোক বসে আছে। কে জানে, ও সত্যিই মিন্টুদির প্রেমিক কি না। ঢুকে পড়ে একটু অস্বস্তি লাগছিল বিজনের, কিন্তু লোকটি সেই মুহূর্তে উঠে পড়ে বিজনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অপরের গরম-করা চেয়ারে বসতে বিজনের ভালো লাগে না। চেয়ারের হাল ধরে দাঁড়িয়ে বিজন জিজ্ঞেস করলো, তুই কি বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস?

ধড়মড় করে চমকে উঠে মিন্টুদি বললো—বিয়ে? তার মানে?

বিজন বিস্ফারিত মুখে বললো, সে কি, এখনো অফিসের লোকদের বলিস নি? নেমন্তন্নে ফাঁকি দিবি বুঝি?

জ্ঞানী অপরাধিনীর মতন বিবর্ণমুখে মিন্টুদি বললো, দিদির সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে, না? জ্বালাতে এসেছিস, অফিস পাড়ায় এসেছিস কেন?

—একটা ব্যাঙ্কে এসেছিলুম।

—ব্যাঙ্কে? আজকাল কি তুই ব্যাঙ্কেও টাকা রাখতে শুরু করেছিস নাকি? এত টাকা? কে দিল?

টাকা রাখতে নয়, ব্যাঙ্কে একটা ইন্টারভিউ দিলাম।

—ইন্টারভিউ? এ মাসে কটা হলো?

—এটাই শেষ। চাকরি হয়ে যাচ্ছে সামনের মাস থেকে।

—সত্যি? দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস না। কি হলো বল?

আজ আমার একটা শুভদিন, চাকরির পাকা কথা হয়ে গেল। তোর বিয়েতে আমি ডানলোপিলোর গদি উপহার দেবো!

আবার ফাজলামি। কত মাইনে? ও কি, তোর চশমা কোথায়?

নেই। সেইজন্যই তো আজ দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তোর বিয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মিন্টুদি, দশটা টাকা ধার দে।

চা ও সন্দেশ খাবার পর মিন্টুদি জিজ্ঞেস করলো, এখন কোন দিকে যাবি? চল, একসঙ্গে ফিরবো, তুই বোস।

কোন দিকে? বিজন এক মুহূর্তে থামলো। কোনদিকে বাড়ি হতে পারে ওর? দাশগুপ্ত কি খুব বড় অফিসার? গাড়ি নেই যখন—গাড়ি যে নেই সে বিষয়ে বিজন এখন নিশ্চিত, তবুও উত্তর কলকাতায় বাড়ি না হওয়াই সম্ভব, টালিগঞ্জ কিংবা গড়িয়াহাটার দিকে—বিজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না কোন দিকে যাবো ঠিক নেই।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর লাইব্রেরি থেকে বিজন যখন বেরুলো, তখন পাঁচটা পঁচিশ। তবুও বিজনের কোনো তাড়া নেই। কেরানি আর অফিসাররা একসঙ্গে বেরোয় না, অফিসারদের দেরিতে বেরোনোই নিয়ম। দাশগুপ্ত যে অফিসার সে সম্পর্কে বিজনের কোনো সন্দেহই নেই, কেননা লিফটম্যান বাবু না বলে বলেছিল দাশগুপ্ত সাহেব। বিজন ধীর পায়ে লালদীঘি পেরিয়ে চার্চ লেনে ঢুকলো।

হুড়হুড় করে বেরুচ্ছে সবাই যারা সাধারণ এবং নিচু তাদের ব্যস্ততা তত বেশি। বিজন মানুষগুলোর মুখের দিকে না তাকিয়ে চলন্ত জুতোগুলো লক্ষ্য করতে লাগলো। চটি, পাম্প, বুট, কাবুলি স্যামসন—যে জুতোগুলো সস্তা সেগুলোই দ্রুত চলেছে, দামি জুতোগুলোর নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। সামনের মাস থেকে বিজনকেও এই ভিড়ের মধ্যে রোজ মিশতে হবে—বিজন ঠিক করলো একজোড়া দামি নতুন জুতো কিনে নেবে।

সেই অফিস বাড়িটার সামনে এসে বিজন পর পর দুটো সিগারেট শেষ করলো। চারজনকে নিয়ে লিফট নামলো, একবার মাত্র মুখ দেখেছে, কিন্তু দাশগুপ্তকে ওদের মধ্য থেকে চিনতে বিজনের অসুবিধা হল না। চারজনই একসঙ্গে বেরিয়ে এল, খুব একটা জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলছে বোধ হয়— অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বাইরে এসে ওরা সবাই সামনে দাঁড়ানো স্টেশন ওয়াগানটায় উঠে পড়লো। সেই গাড়িতে দুজন মেম সমেত আরও ছজন ব্যক্তি আগেই বসেছিল। বিজন এটা ভেবে রাখে নি। অনেক অফিসে অফিসারদের পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি বন্দোবস্ত আছে।

স্টেশন ওয়াগানটা ছেড়ে যেতেই বিজন আবার আপন মনে হাসলো। তারপর সোজা সেই বাড়িটায় ঢুকে পড়ে লিফট না নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠলো। মুলিগান-ডেভিস কোম্পানির অফিসে তখনও দুচারজন লোক আছে, লোহার গেটটা টেনে বন্ধ করা হচ্ছে। বিজন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, দাশগুপ্ত সাহেব বেরিয়ে গেছেন?

একজন বেয়ারা বললো, হ্যাঁ, এই তো, এইমাত্র—

ইস। দেখা হল না।

কোলাপসিবল গেটের হাতল ধরে একটু থেমে থেকে বিজন আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাশগুপ্ত সাহেবের বাড়ি কোথায়? বিশেষ দরকার—

আমির আলি এভিনিউতে থাকেন, নম্বর জানি না।

—ও বুঝতে পেরেছি। দাশগুপ্ত সাহেবের পুরো নাম কি যেন?

—পি. এন. দাশগুপ্ত।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এল বিজন। ট্রামে বাসে এখন খুব ভিড়, একটু বাদে উঠতে হবে। শীতের দিন বলে বিকেলটা চুরি হয়ে গেছে। এর মধ্যেই প্রগাঢ় সন্ধ্যা! মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়ে একটা দমকল ছুটে গেল। দমকলগুলো তো সারাদিনই বসেই থাকে—প্রত্যেক সন্ধেবেলা এইরকম সারা শহর ঘুরে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে গেল মন্দ হয় না। পি. এন? প্রিয়নাথ? উহু এ নামগুলো মানাচ্ছে না। পিনাকীনাথ? প্রবুদ্ধ কিংবা প্রমথনাথ?

সি টি ও-তে ঢুকে বিজন টেলিফোন গাইডটা খুললো। পি. এন. দাশ-গুপ্ত দুজন আছে আমির আলি এভিনিউতে। এমনও হতে পারে—গলির মধ্যে অন্য কোনো নামের রাস্তায় বাড়ি। দেখা যাক। একজন পি. এন. দাশগুপ্ত ডাক্তার তাকে বাদ দেওয়া যায়।

কমলা রঙের তিনতলা বাড়ি। বসতবাড়ি না ফ্ল্যাটবাড়ি ঠিক বোঝা যায় না। দরজার দুপাশে দুই প্রস্থ নেমপ্লেট, দাশগুপ্ত আর সেনগুপ্ত। দাশগুপ্ত দুজন—অনিন্দ্যনয়ন আর প্রশান্তনয়ন। এর মধ্যে প্রশান্তনয়ন একজন কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট—তাও লেখা আছে। এই সে নিশ্চয়ই। কী কাণ্ড। প্রশান্তনয়ন একজন কস্ট অ্যাকাউনটেন্টের নাম—যার হাওয়া উচিত শকুন-চক্ষু! উপন্যাসের থেকেও জীবন অনেক অবিশ্বাস্য।

দরজার দুপাশে দুটো কলিং বেল, দাশগুপ্তের দিকটায় বিজন বেল টিপতেই পিছন থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, কাকে ডাকছেন? ঘুরে তাকিয়ে বিজন দেখলো, একটা বছর সতেরো বয়সের মেয়ে, বেশ দেখতে, চকচকে মুখ, চোখের দৃষ্টিতে যৌবন এসে গেছে, হাতে একটা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। বিজন মুখখানা হাসি হাসি করে খুব আলগাভাবে জিজ্ঞেস করলো প্রশান্ত ফিরেছে নাকি অফিস থেকে?

মেয়েটি হাসির উত্তরে হাসি দেখালো না। অত সহজে আপনার সামনে হাসব কেন—এইরকম একটা মুখের ভাব নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, দাঁড়ান দেখছি। তারপর মেয়েটি ডেকে উঠলো, মেজদা—তার ডাক আস্তে আস্তে দূরে এবং সিঁড়ির ওপরে মিলিয়ে যায়।

প্রশান্তনয়ন বাড়ি থাক বা না থাক—এই মেয়েটি কি আবার খবর দিতে আসবে? বিজন নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, বাজি? পকেট থেকে একটা সিকি বার করে বলো, হেড না টেল? হেড? খুব সন্তর্পণে টুসকি মেরে সিকিটাকে শূন্যে পাঠিয়ে আবার মুঠোয় পুরলো। খুলে দেখলো, টেল। অনেক সময় হেড টেল করে যেটা ওঠে বিজনের, আসলে ঘটে তার উল্টোটা। পরীক্ষার সময় হেড টেল করে প্রতিবার ওর ফেল উঠেছে, অথচ পাস করে গেছে ঠিক। যাই হোক, বিজন নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিল, মেয়েটি যদি ফিরে আসে, তাহলে সব কিছু বদলে যাবে। তাহলে সব অন্যরকম।

বুড়ো চাকরটা এসে বললে, দাদাবাবু বাড়ি নেই, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বিজন হতাশ বিরক্তিতে বললো, এখনও অফিস থেকে ফেরে নি?

—না।

—ঠিক আছে—

—আপনার কি নাম বলবো?

বলো, ওর এক বন্ধু এসেছিল দেখা করতে, বিজন রায়চৌধুরী।

মিন্টুদি যদিও ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি করে, কিন্তু বি এ পাস করেছিল ফিলসফি অনার্স নিয়ে। মিন্টুদি বিজনকে প্রায়ই বলে, কি ভাবে দিনগুলো নষ্ট করছিস বাউন্ডুলেপনা করে। প্রত্যেকেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। সব মেয়েরাই উপদেশ দিতে ভালোবাসে, তাদের মধ্যে কেউ ফিলসফিতে পাস করলে তো কথাই নেই। বিজনের যে-সব বন্ধু-বান্ধবরা তাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী সার্থক হয়েছে তারাও কথায় কথায় বিজনকে বলেছে, জন্তু-জানোয়ারের মতন উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবন কাটাবার কোনো মানে হয়? জীবনে একটা কিছু করতে গেলে...।

বস্তুত, জন্তু-জানোয়ারদের সম্পর্কে ওই অপবাদটা বিজনের পছন্দ হয় নি। বিজন এ পর্যন্ত একটাও এমন জন্তু দেখেনি— যে বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়।

আজ যেন বিজন ওর জীবনের একটা সত্যিকারের উদ্দেশ্য পেয়ে গেছে। ওর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রশান্তনয়ন দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করা। সেই সন্ধেবেলাতেই বিজন ওই বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ফিরে এল—কিন্তু প্রশান্ত বা সেই সতেরো বছরের মেয়েটি—কারুর সঙ্গেই আর দেখা হল না। বিজন অবশ্য নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে—প্রশান্ত না ওই মেয়েটি—কার সঙ্গে দেখা করা তার বিশেষ ইচ্ছে। না, এ সম্পর্কে ওর সঠিক উত্তর আছে, প্রশান্তর সঙ্গেই ওর দেখা করা উদ্দেশ্য, কিন্তু ওই মেয়েটির সঙ্গেও যদি ওর দেখা হয় এবং ওর হাসিটুকুর উত্তরে সেও হাসি মুখ দেখায়, তবে বিজন পরবর্তী ঘটনাগুলো বদলে ফেলবে। একটা অযৌক্তিক ব্যাপারের মুখোমুখি শুধু আর একটা ওইরকম অযৌক্তিক ব্যাপারকেই দাঁড় করানো যায়। প্রশান্তনয়নের বোনের নাম কি? যদি শোনে হরিণ-নয়না, তাহলেও বিজন খুব বেশি অবাক হবে না।

সেদিন সন্ধের পর বিজন তিনবার প্রশান্তনয়নকে ডাকতে এসেছিল। একবারও পাওয়া গেল না। অফিসের গাড়ি করেই ফিরেছে অথচ বাড়ি ফিরলো না—এ আবার কি রকম! হয়তো মাঝপথে কোনো বন্ধুর বাড়িতে নেমে গেছে। আড্ডা মারছে। প্রশান্তনয়নের বিয়ে হয়েছে কিনা তাও তো বিজন জানে না, হয়তো কোথাও প্রেম-ট্রেম করতে গেছে। কিন্তু অফিসের পোশাকে প্রেম? তা হলে প্রেমালাপের মাঝে-মাঝে 'হেনসফোর্থ' কিংবা 'নটউইথস্ট্যান্ডিং'—প্রভৃতি কথাগুলো ঢুকে যাবে না?

পরদিন সকাল আটটায় বিজন এসে আবার দরজার বেল টিপলো। বুড়ো চাকর এসে বললো, ওপরে আসুন। সিঁড়ির পাশের দেয়াল ধপধপে সাদা, এত সাদা রঙে গায়ে ঠান্ডা লাগে। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরে কালকের সেই মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নামছে, বিজন জানে একবার চোখাচোখি হবেই। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে বিজন তার উদ্ভাসিত হাসি মুখ মেয়েটির দিকে মেলে ধরলো, কিন্তু ওইটুকু মেয়ে কী গম্ভীর, হাসলো না, নিরেট মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে নেমে গেল। একজন অপরিচিত পুরুষের হাসি দেখে কোনো মেয়েকে হাসতে হবেই, এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু একটা যুক্তিহীন ব্যাপারই তো বিজন আশা করছিল, তাহলে, তখন, সেই মুহূর্ত থেকেও সে ঘটনাগুলো বদলে দিতে পারতো। কিন্তু আর উপায় নেই।

দোতলার মুখে প্রশান্তনয়ন ড্রেসিং গাউন পরে দাঁড়িয়েছিল, ওকে দেখেই বললো, এই যে আসুন, আসুন। আপনিই কাল দু-তিনবার এসেছিলেন?

প্রশান্তনয়ন সদ্য দাড়ি কামিয়েছে, মুখখানা ভিজে ভিজে, ঘরে তখনও ক্রিমের সুগন্ধ। সোফা সেটটি সাজানো, দেয়ালে দুতিনখানা ক্যালেন্ডার ছাড়া কোনো ছবি নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে বিজন বললো, কেমন আছেন? বাঃ, বেশ চমৎকার ঘরখানা আপনার। দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা—

প্রশান্তনয়নের মুখ দেখে বোঝা যায়, ভিতরে খুব অনুসন্ধান চলছে। প্রতিনমস্কার করে বললো, আপনি...

—চিনতে পারেন নি তো?

—হ্যাঁ মানে, কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না।

বিজন কৌতুক করা গলায় বললো, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে চিনতে পারেন নি। আমার নাম, বিজন। বিজন রায়চৌধুরী।

—আপনার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন তো?

—আলাপ ঠিক হয় নি, দেখা হয়েছিল। কাল দুপুরে, চার্চ লেনের মোড়ে—

কাল?

প্রশান্তনয়ন ভ্রূকুঁচকে খানিকক্ষণ ভাবার চেষ্টা করলো। তারপর খানিকটা বিনীত হাস্যে বললো, আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো না, মনে করতে পারছি না কিন্তু যাকগে আপনি কি......

হ্যাঁ, আমি একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। আপনার নামটা কিন্তু বেশ আনইউজুয়াল, বুঝতে পারি নি। আপনার বোনের নাম কি?

—আমার বোন? কোন বোন?

—ওই যে যার বয়েস ১৭-১৮ হবে। একটু সিঁড়িতে দেখলাম।

প্রশান্তনয়নের মুখ এবার সতর্ক হয়ে গেল, একটু রুক্ষ গলায় বললো, কেন বলুন তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

—না, এমনিই, কৌতূহলে। আমার দরকারটা অবশ্য অন্য। কাল দুপুর ঠিক দুটো বেজে তেত্রিশ মিনিটের সময় আমি চার্চ লেনের মুখে দাঁড়িয়ে সিঙ্গাপুরী কলা খাচ্ছিলুম। আমি কলা খেতে ভালবাসি না, ওটা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ রেখেছি, একমাত্র সিঙ্গাপুরী কলা, মানে, শুধু সবুজ রঙের ফলের ওপর আমার একটু লোভ আছে।

প্রশান্তনয়ন তখন পি. এন. দাশগুপ্ত হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে নীরসভাবে বললো, মাপ করবেন, আমার সাড়ে নটায় অফিস, আপনার দরকারের কথাটা যদি সংক্ষেপে বলেন।

কোনো কথা না বলে বিজন প্রায় এক মিনিট তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর উদাসীনভাবে হেসে বললো, আপনার কোনো উপায়ই নেই। আপনাকে সবটুকু শুনতেই হবে।

—তার মানে?

বিজন এই সাময়িক বাধা উপেক্ষা করে আবার খুব শান্ত গলায় বলতে লাগলো, কলার খোলাগুলো আমি হাতে রেখেছিলুম, একজন ফাউন্টেন পেনওয়ালার ধাক্কায় সেগুলো মাটিতে পড়ে যায়, সে অবশ্য সেজন্য ক্ষমা চেয়েছে, তারপর আমি সেগুলোকে পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি আপনার এক বন্ধুর সঙ্গে যেতে যেতে আমাকে অন্যমনস্কভাবে ধাক্কা দিলেন, মানুষের শরীরে মানুষের ছোঁয়া লাগলো—তবু আপনি ফিরে তাকান নি, এমনই ব্যস্ত ছিলেন।

—আমি? কাল দুপুরে? অ্যাবসলিউটলি ননসেন্স। আমি কাল দুপুরে কারুকে কোনো ধাক্কা দিইনি, তা হলে আমার মনে থাকত।

আপনার ধাক্কা লাগার ফলে আমি বেশ জোরে আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। আমার কোমরে সামান্য চোট লেগেছে এবং চশমাটা যদিও ভেঙে গেছে, কিন্তু জীবনে আগে আর কখনো কারুর ধাক্কা খাইনি কিংবা পড়ে যাই নি তা তো নয়। সুতরাং এটাকে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যেতো না, যদি না কাল দুপুরে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটা জরুরি প্রশ্ন জাগতো।

—আপনি ভুল করেছেন মিঃ রায়চৌধুরী। কার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে আপনার চশমা ভেঙে গেছে—এটা নিশ্চয়ই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু সে অন্য লোক, আমি নই, বোধ হয় ভুল হয়েছে।

বিজন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব ধীর গলায় বললো, কাল দুপুরের পর থেকে আজ এই পর্যন্ত সর্বক্ষণ আমি শুধু আপনার কথা ভাবছি। আপনার মুখ, চোখ, হাঁটার ভঙ্গি—আপনার সঙ্গে আমি মনে মনে এত কথা বলেছি যে আপনি আমার বন্ধুর মত চেনা। আমার ভুল হতে পারে না।

প্রশান্তনয়ন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললো, এমন ধাক্কা দিলুম যে, পড়ে গেল একটা লোক, অথচ আমি, আশ্চর্য, চশমা পর্যন্ত ভাঙলো—

চশমাটা ভেঙে বোধ হয় ভালোই হয়েছে। সেইজন্য আমার মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো জাগলো, না হলে হয়তো.....

—ঠিক আছে, যদি আমার জন্য আপনার চশমা ভেঙেই থাকে, ইট ইজ এ লস নো ডাউট, আমি কি করতে পারি বলুন?

—আপনি এখন অফিস যাবেন, নিশ্চয়ই ব্যস্ত, আপনার সঙ্গে পরে অন্য কোথাও দেখা করে কিছু কথা বলতে চাই। আমার দু একটি প্রশ্ন আছে—

—আর তো কথার কিছু নেই। আমি আপনার চশমার দাম দিয়ে দিতে পারি। কত টাকা, বলুন?

—টাকা?

বিজন একেবারে আমূল অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো। বললো, টাকার কথা তো আমি বলি নি। আপনি টাকা দিতে চান?

—তা ছাড়া আর আপনার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে। কত টাকা গচ্চা দিতে হবে চটপট বলুন।

কত টাকা? বিজন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সারা ঘরটা দেখলো, যেন পরিবেশের মূল্য যাচাই করে নিচ্ছে। তারপর হাসতে হাসতে বললো, ঠিক আছে, তা হলে আপনি আমাকে এক লক্ষ টাকা দিন!

—কী! এক লক্ষ টাকা? চশমার দাম!

—আমি তো চশমার দাম চাই নি! চশমাটা আর কি! আমি আমার দৃষ্টি বদলের জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছিলুম—টাকার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এক লক্ষ টাকা তো আর নয়, একটা সমগ্র জীবন, ওতে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

পি. এন. দাশগুপ্ত গলা চড়িয়ে ডাকলেন, তপু, তপু, একবার শুনে যা—।

দরজার কাছে আর একটি যুবা এসে দাঁড়ালো, গেঞ্জি গায়ে—শরীরে অনেক সবল পেশি। পি. এন. দাশগুপ্ত বললো, তপু, দ্যাখ তো, এই লোকটা পাগল না জোচ্চোর—কি চায়। একবার বলছে, আমি নাকি ধাক্কা দিয়ে ওর চশমা ভেঙে দিয়েছি, আবার বলছে, আপনার বোনের নাম কি—

তপু নামের সেই শারীরিক শক্তি এগিয়ে এসে বললো, কার কথা জিজ্ঞেস করছে, রিন্টুর কথা? আপনি কোন পাড়ায় থাকেন দাদা?

বিজন হাসতে হাসতেই মানুষের প্রতি মানুষের কথা বলার ভঙ্গিতে বললো, না, এমনিই নাম জিজ্ঞেস করছিলাম শুধু। আর কোন বদ মতলব আমার নেই। আপনার দাদা আমার বন্ধু ওর সঙ্গে আমি দু একটা দরকারি কথা বলতে এসেছিলাম।

পি. এন. দাশগুপ্ত বললো, বন্ধু হুঃ! তপু বললো, ঠিক আছে বন্ধু, ওঁর যখন কথা বলার সময় নেই, অফিস যেতে হবে, তাহলে আপনি এবার চটপট কেটে পড়ুন।

বিজন বললো, ওঁর এখন সময় নেই, সেইজন্যই আমি পরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছিলুম। আমার দরকারটা খুব জরুরি।

পি. এন. দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলো, আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছে নেই। মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর। ভেবেছ, যা তা বলে টাকা আদায় করবে।

তপু বিজনের কাঁধে হাত রেখে সামান্য ঠেলে বললো, বাইরে, বাইরে, আর কোনো কথা নয়, ভালোয় ভালোয়। বিজন বললো, ছিঃ এরকমভাবে গায়ে হাত দেওয়া ঠিক নয়।

তপুর চোয়াল শক্ত হয়ে এলো, পি. এন. দাশগুপ্ত বললো, তপু বেশি কিছু করিস না। নো স্ক্যান্ডাল। তপু হিংস্রভাবে বললো, স্ক্যান্ডাল আবার কি। পাড়াটায় যত লুচ্চা-বদমাইশ এসে ভিড় করছে আজকাল,—যা-ও। তপু জোরে ধাক্কা দিতেই বিজনের মাথা আর একটু হলে দরজায় ঠুকে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে, বিজন খুবই ক্লান্ত ও দুঃখিতভাবে বললো, ছিঃ, নিজের বাড়িতে বসে কারুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। অন্যায়।

প্রশান্তনয়ন বিজনের হাত দুখানা চেপে ধরে চরম কাতরভাবে বললো, আমি না দেখে আপনাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি আপনি পড়ে গেছেন বা চশমা ভেঙে গেছে—কিন্তু সেটা কি খুব মারাত্মক কোনো অপরাধ? বলুন!

সন্ধের অন্ধকারে নির্জন গঙ্গার পাড়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে। বিজন হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে শুকনোভাবে জবাব দিল, আমি তো বলিনি আপনার সেরকম কিছু দোষ হয়েছে।

তা হলে আপনি আমাদের বেঁচে থাকা অসহ্য করে তুলেছেন কেন? কেন আপনি দিনরাত ছায়ার মতন লেগে আছেন আমার সঙ্গে। গত একুশ দিন ধরে আমার বাড়ির সামনে অফিসে, ক্লাবে, রাস্তায় যেখানেই তাকিয়েছি—সব সময় আপনাকে নিয়তির মতন ঘুরতে দেখেছি। আমার বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে গেলেও দেখেছি দূরে আপনি পাথরের মতন চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। আপনাকে কতবার অপমান করিয়েছি লোক দিয়ে তবু আপনি যান নি—শেষপর্যন্ত আমার নার্ভে অসহ্য হয়ে উঠেলো, আমি অফিসে কাজ করতে পারি না, খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না—সব সময় শুধু দুঃস্বপ্ন দেখি—একজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—কেন?

ব্যাপারটা আপনিই এতখানি ঘোরালো করে তুলেছেন।

—স্বীকার করছি, আপনি যেদিন আমার বাড়িতে এলেন, সেদিন চশমার দাম দিতে চাওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছিল, আমার ভাই গোঁয়ারের মতন আপনাকে অপমান করেছে—সে জন্য আপনি আমায় কী শাস্তি দিতে চান দিন।

—শাস্তির কথা আমার মনে পড়ে নি। আপনাকে শুধু আমার দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, আপনি চঞ্চল হয়ে নিতেই চাইলেন না—

শুধু আমাকেই বা আপনি প্রশ্ন করবেন কেন? আরও তো কতো লোক আছে—পথেঘাটে এরকম ধাক্কা কি লাগে না?

তা লাগে। কিন্তু আপনিই যে প্রশ্নগুলো আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমার জীবনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, আপনাকে দেখে উদ্দেশ্য পেয়ে গেলাম। দোষ আপনার নয়, আমার নয়, সেই মুহূর্তটার দোষ—

সেদিন আপনাকে ধাক্কা মারার ব্যাপারটা আমি টের পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ওরকমভাবে পড়ে যেতেই—আমি আর ফিরে আসতে সাহস করিনি। আমার সঙ্গে আমাদের বোম্বে অফিসের ম্যানেজার ছিলেন—যদি তাঁর সামনেই আপনি আমাকে যা-তা অপমান করেন সেইজন্য.....

—আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করবেন?

গঙ্গা থেকে হুহু করে ভিজে হাওয়া ঝাপটা মারছে ওদের চোখে মুখে। কুহকের মতন ডাক দিয়ে বিজন ভুলিয়ে এনেছে প্রশান্তনয়নকে। এই কদিনে ওদের দুজনেরই মুখ খানিকটা পাংশু ও চোখ বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। ক্লান্তভাবে চোয়ালে হাত বুলতে বুলতে বিজন বললো, এই একুশ দিনে প্রশ্নটা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি এত বেশি ভেবেছি যে, এর ধার কমে গেছে। কাল থেকে আমি নতুন চাকরিতে জয়েন করবো—এখন আর এসব প্রশ্ন না তুললেও হয়। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে আমার মনে প্রশ্নগুলো জেগেছিল—তখন ভেবেছিলাম—তার উত্তর জানাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এখন যদি আবার ওগুলো ভুলে যাই আবর প্রমাণ হবে—আমার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। সারাজীবন আমি কলার খোসা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছি—যাতে অন্যলোক তাতে পা দিয়ে না আছাড় খায়। কিন্তু সেগুলো সরাতে গিয়ে যদি একদিন আমি নিজেই আছাড় খাই—তা হলেও আমার মনে কোনোরকম প্রশ্ন জাগবে না?

প্রশান্তনয়ন শরীরটাকে ছোট করে ফেলার ভঙ্গি করে উত্তর দিল, ব্যাপারটা আমি এরকমভাবে ভেবে দেখিনি।

—তখন আমার মনে হল—এটাই কি তা হলে আমার সারাজীবনের ব্যর্থতার কারণ? তবে কি, সারাজীবন আমি যত কলার খোসা রাস্তার পাশে সরিয়ে দিয়েছি—সেগুলোকে আবার রাস্তার মাঝখানে এনে রাখা শুরু করবো?....আমি জানি—এর কোনো উত্তর হয় না। তারপরই আপনার দিকে আমার চোখ পড়লো। তখনই মনে হল, আপনার কাছে আর একটা জিনিসের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

বিজন একটু চুপ করলো। প্রশান্তনয়ন জলের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, বহুদিন সে জলের দিকে এরকম একদৃষ্টে তাকায় নি। বিজনের গলার আওয়াজ ক্রমশ উৎসাহহীন ও নিস্তেজ হয়ে আসছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিজন আবার বললো, আপনার বাড়ি, ঘর-সংসারের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চেয়েছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল আপনার সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করা। এতদিন আমি নিজে যে-ভাবে জীবন কাটিয়েছি—কোনোদিন সেটাকে ভুল ভাবি নি। মানুষের সঙ্গে সমস্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছি। তারপর মনে হলে, জীবনটা বদলানো দরকার। কিন্তু সেটা কি রকম? পাশে যদি বন্ধু বা অফিসের বড়কর্তা কিংবা প্রেমিকা থাকে—তবে পথের যে কোনো লোককে ধাক্কা দিয়ে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না-করে চলে যাওয়া —সেই কি অন্যরকম জীবন? সেই জীবন কত উঁচুতে পৌঁছোয়, সেই জীবনে সুখ কতখানি—সেটা জানার জন্যই আপনাকে জানা আমার দরকার ছিল।

প্রশান্তনয়ন অতি দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বললো, আপনি আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দিন, আমাকে আর অপমান করবেন না। এখানে কেউ নেই, আপনি আমাকে কান ধরতে বলুন জুতো—

বিজন দুঃখের সুরে বললো, আপনাকে অপমান করা বা শাস্তি দেবার কথা আমি একবারও কল্পনা করিনি। আপনাকে আমার জীবনের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা আমি সেই কথাই জানতে চেয়েছিলুম। আমার নিজের জীবনটা ত্যাগ করে আরেক রকম জীবন অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম আমি—যে জীবনের একটু স্থির উদ্দেশ্য আছে, যে জীবন উন্নতি করে, যে জীবন বড় হয়, কিন্তু সেই জীবন আয়ত্ত করার পদ্ধতি কি—কতখানি ত্যাগ করতে হয়—আমার জানার কৌতূহল ছিল কিন্তু—

—দয়া করে আর ওসব কথা তাহলে তুলবেন না। আপনাকে শুধু আর একটা কথা বলি, এরকমভাবে জীবন কাটানো যায় না। এত প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে জীবনের কিছুই যায় আসে না। এক এক মানুষের জীবনের এক এক রকম নিয়ম আছে—মানে, কতকগুলো স্বভাবের ইয়ে, মানে সবাই নিজের নিজের কল্পনা অনুযায়ী ভাল থাকতে চায়—এত সব যুক্তি তর্ক'...

সম্পূর্ণ পরাজিতের ভঙ্গিতে বিজন বললো, তাতো জানিই। তা কি আর আমি জানি না। শুধু ওই মুহূর্তটিতে আমার অন্যরকম মনে হয়েছিল। সেইজন্যই তো বলছিলাম, দোষ আপনার নয়, আমার নয়, ওই মুহূর্তটারই দোষ।

ধর্মাধর্ম

সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে থেমে যায়, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয় না। এ রকমভাবে সারাদিন চলার পর সন্ধের সময় থেকে একেবারে দুর্যোগ শুরু হল।

এই সব দিনে বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে বসে আলস্য করার দিন। তবু, এই সব দিনেও চুরি-ডাকাতি-মারামারি হয়, থানায় লোকজন আসার বিরাম থাকে না।

এ তল্লাটে এখনো বিজলি বাতি আসে নি, দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে টেবিলে, মাঝে মাঝেই হাওয়ার দাপটে সে দুটোর নিভু নিভু অবস্থা।

রহমান সাহেব বললেন, এই দরজা জানলা সব বন্ধ করে দে!

তারপর রহমান সাহেব ডাইরি বইটা সরিয়ে রেখে টেবিলের ওপর পা তুলে দিলেন। কোমরে বেল্ট আলগা করে দিয়ে বললেন, যথেষ্ট কাজ হয়েছে। আর পারি না। এই আলি, আলি, মুড়ি কিনে নিয়ে আয় তো।

আলির চেহারা রোগা চিমসে মতন, বয়েস বোঝা যায় না—তিরিশও হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। কোনো রকম হুকুম শুনলেই সে অতি ব্যস্ত হয়ে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে।

আলি এসে দারোগা সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

রহমান সাহেব বিশাল চেহারার পুরুষ। টকটকে ফর্সা রং, নাকের নিচে পুরুষ্ট গোঁফ।

কথা বলেন বাজখাঁই গলায়। কিন্তু মানুষটি ভালো। সাধারণ লোক এসেও রহমান সাহেবের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে।

রহমান সাহেব পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দিয়ে বললেন, আট আনার মুড়ি নিয়ে আয় আর আট আনার তেলেভাজা। তেলেভাজা গরম দেখে আনবি। গরম যদি না পাস তো দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়ে আনবি। বুঝলি?

আলি হাত জোড় করে বলল, জী।

রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, দশ মিনিটের বেশি সময় লাগলে তোর গর্দান নেব। যা, দৌড়ে যা। ছাতা নিয়ে যাবি—

আলি চলে যাবার পর রহমান সাহেব অন্যমনস্কভাবে পা নাচাতে লাগলেন। এস আই ধীরেন সাহা তিনদিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে। লিটারেট কনসটেবল জগদীশ ত্রিপাঠী টালফার হয়ে যাওয়ার পর এখনো নতুন লোক আসে নি। কদিন ধরে থানার সব কাজ রহমান সাহেবকে একা সামলাতে হচ্ছে।

টেবিলের ওপাশে বেঞ্চে জনাপাঁচেক ছিঁচকে চোর, দাঙ্গাবাজ আর দালাল বসে আছে চুপ করে। এরা সবাই জানে—এখন দারোগা সাহেবের খিদে পেয়েছে, এখন বিরক্ত করা ঠিক নয়।

কনস্টেবল হরনাথ আর সিদ্দিকী থানার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খৈনি বিনিময় করছে। হরনাথের আজ নাইট ডিউটি, সিদ্দিকীর এখন ছুটি হবার প্রায় সময় হল। কিন্তু দারোগা সাহেব মুড়ি কিনতে পাঠানোয় সে আরো কিছুক্ষণ থেকে যেতে চায়। আলি বেশ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। টেবিলের ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর মুড়ি ঢালল। গরম গরম আলুর বড়া এনেছে।

রহমান সাহেব এক মুঠো মুড়ি গালে ফেলে বললেন, কাঁচা মরিচ কই? মরিচ আনিস নি?

আলি বলল, জী না।

রহমান সাহেব ধমকে বললেন তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে, অ্যাঁ? কাঁচা মরিচ ছাড়া মুড়ি খাওয়া যায়? যা, কাঁচা মরিচ নিয়ে আয়।

আলি আবার দৌড়ে গেল।

রহমান সাহেব বললেন, কই হে হরনাথ, সিদ্দিকী—এস এদিকে, নাও—

চোর-ছ্যাঁচোড় দালালরা সামনের টুলে নিঃশব্দে বসে আছে। রহমান সাহেব সেদিকে একবার তাকালেন। তিনি ভদ্রলোক, অন্যদের সামনে একা একা খেতে পারেন না। বললেন ও হরনাথ, ওদেরও দাও এক মুঠো করে। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে—

দারোগা সাহেবের নিজের পয়সায় কেনামুড়ি চোর-ছ্যাঁচোড়দের খাওয়াবার ব্যাপারটা হরনাথের একেবারেই পছন্দ হয় না।

সে খুবই ছোট ছোট মুঠোয়, মুড়ি তাদের হাতে দিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, এই নাও, খাও, দারোগা সাহেব দিচ্ছেন—

আলি আবার যখন ফিরে এল, তখন মুড়ি প্রায় সব শেষ।

রহমান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে গেল যে। তাহলে আবার মুড়ি আনবি নাকি? বাদলার দিনে মুড়ির মতন—

আলির সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোক এসেছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ও কে?

লোকটা এগিয়ে এসে বলল, হুজুর, আমি প্রতাপ সিং—

লোকটি ধুতি পরা, রোগা, খেতে না পাওয়া চেহারা। বাংলা ছাড়া কোনো ভাষাই জানে না। এই লোকের নাম প্রতাপ সিং শুনলে একটু অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় নানা জাতের লোকের মিশ্রণ হয়েছে। নবাবী আমলে কত রাজপুত, পাঠান, পাঞ্জাবি এখানে এসেছিল ভাগ্যের সন্ধানে—তাদের অনেকেই বংশধর এখন ভেতো-বাঙালি হয়ে মিশে গেছে সাধারণ লোকের মধ্যে।

প্রতাপ সিং লোকটা আগে ছিল ছিঁচকে চোর, এখন সে পুলিশের ইনফর্মার। জিয়াগঞ্জে একটা বিড়ির দোকান খুলেছে।

প্রতাপ সিংকে এই সময় রহমান সাহেব ঠিক পছন্দ করলেন না। লোকটা প্রায়ই নানান উড়ো খবর নিয়ে আসে।

রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আবার কি চাই?

প্রতাপ সিং দু পা এগিয়ে এসে বলল, সাহেব পাকা খবর আছে।

—কি? বলো না—

প্রতাপ সিং রহমান সাহেবের একেবারে কানের কাছে এসে ফিসফিস করে কি বলতে লাগল। রহমান সাহেব টেবিল থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ির ভাঙা দু একটা টুকরো মুখে দিতে লাগলেন। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে এক সময় বললেন সত্যি?

—আজ্ঞে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

—এর আগেও তো অনেকবার নিজের চোখে দেখেছ।

—এবার কোনো ভুল নেই।

রহমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে বেল্ট বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন। হাঁক দিলেন, দরওয়াজা!

আলি দৌড়ে এসে বলল, হুজুর।

—চল আমার সঙ্গে। আর কে যাবে? হরনাথ?

হরনাথ বলল, তাহলে থানায় কে থাকবে?

ঠিক কথা। থানায় একজন কারো থাকা দরকার। হরনাথের সেই ডিউটি। এদিকে একজন আর্মড কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। আলিটা কোনো কম্মের না। তাহলে সিদ্দিকীই চলুক।

সিদ্দিকীর ডিউটি অফ হয়ে গেলেও সে আপত্তি করল না।

জেলার এস. পি.-র কাছে অনেকবার দরবার করেও এই থানার জন্য এখনো জীপ পাওয়া যায় নি। সাইকেলেই দারোগাকে কাজ সারতে হয়। তিনটে সাইকেল বেরল—সিদ্দিকী তার সাইকেলের পেছনে তুলে নিল প্রতাপ সিংকে।

প্রতাপ সিং খবর এনেছে শিবমঙ্গলের। গত এক বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও শিবমঙ্গলকে ধরা যাচ্ছে না। শিবমঙ্গল সাধারণ কোনো ক্রিমিন্যাল হলে এই ঝড় বাদলার মধ্যে রহমান সাহেব নিশ্চয় তার খোঁজে বেরতেন না। খাস দিল্লি থেকে সারকুলার এসেছে শিবমঙ্গলের নামে। সে দেশের দামি দামি জিনিস বিদেশে পাচার করে। হাজার দুয়ারির মিউজিয়াম থেকেও সে জিনিস চুরি করেছে।

বৃষ্টির তেজ বেশি নেই। ঝোড়ো হাওয়া বইছে সমানে। রাস্তাঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এবার কোন দিকে?

প্রতাপ সিং বলল, হুজুর, হাটখোলার পেছনে ঠিক গঙ্গার ধারে। চপলার ঘরে।

রহমান সাহেব অবাক হলেন। চপলাকে তিনি চেনেন। হাটখোলার পেছনে যে তিন-চার ঘর বেশ্যা আছে, চপলা তাদের একজন। নেহাতই দুঃস্থ হাটুরে লোকজন শুধু যায় ওঁদের কাছে। শিবমঙ্গল সেখানে কি করছে?

শিবমঙ্গল দুধুষ চোর হলেও বয়সে বৃদ্ধ। বহুকাল ধরে সে এই কাজ করে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার বয়েস এখন ষাট বছরের কম নয়। সে বেশ্যার ঘরে আসবে কেন?

প্রতাপ সিং বললেন, হুজুর, চপলা ওর মেয়ে।

রহমান সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। চোর হোক, যাই হোক, তিনি শুনেছিলেন শিবমঙ্গল খানদান বংশের লোক। শিবমঙ্গলের এক চাচা কলকাতায় বেশ বড় ব্যবসায়ী। আর এক চাচার স্বদেশি আমলে কালাপানি হয়েছিল—আজাদীর

পর বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই মন্ত্রী হত। একই পরিবারের মানুষ এ রকম হয়? শিবমঙ্গলেরও পদবী সিং—কিন্তু তার পরিবারের কেউ কেউ এখন সিং-র বদলে সিংহ লিখে পুরোপুরি বাঙালি বনে গেছে।

বেশ্যাদের ঘরগুলো বেশির ভাগই অন্ধকার! এই রাতে আর খদ্দের জোটে নি, দরজা জানলা বন্ধ করে বৃষ্টির মধ্যে আরাম করে ঘুমোচ্ছে। চপলার ঘরেরও দরজা জানলা বন্ধ—কিন্তু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যায়।

সাইকেল থেকে নেমে রহমান সাহেব হেঁটে এগুতে লাগলেন। প্রতাপ সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খবরটা পেলে কি করে?

প্রতাপ সিং একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, আমি চপলার ঘরে আসি মাঝে মাঝে।

—আজও আসছিলে?

—জী হুজুর।

—তারপর?

—দেখলাম চপলার ঘরে লোক আছে। তাই কৌতূহল হল, পেছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম—

হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রতাপ সিং বলল, আপনি দরজায় ধাক্কা মারুন, আমি আর যাব না।

কথাটা বলেই প্রতাপ সিং দ্রুত পেছন ফিরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রহমান সাহেব সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। এই প্রতাপ সিং-র মতন আর একটা লোক কি কেউ খুঁজে আনতে পারবে? নিজে চোর ছিল, এখন অন্য চোরদের ধরিয়ে দেয়। চপলার কাছে আসে—কিন্তু এখানকার অন্য মেয়েদের কাছে আসে না। তাহলে তো অন্য ঘরে ঢুকে পড়লেই পারত। চপলার জন্য নিশ্চয়ই তার একটু টান আছে। চপলার বাবা এসেছে বলে সে পুলিশে খবর দিতে গেল, ইনাম পাবার লোভে।

এ সব মিটে গেলে ও নিশ্চয়ই আবার একদিন চপলার ঘরে আসবে—চপলার বাবা ধরা পড়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে।

রহমান সাহেব আলি আর সিদ্দিকীকে বললেন, তোমরা পেছন দিকে দাঁড়াও বুড়ো ব্যাটা যদি পালাবার চেষ্টা করে, সোজা গুলি করবে।

তিনি নিজে গিয়ে চপলার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভেতরে ফিসফাস কথা হচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল।

আর একবার ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে চপলা বলল, হবে না, হবে না! সারা রাতের লোক আছে।

রহমান সাহেব এবার জোরে ধাক্কা দিলেন। দরজা একটু খুলতেই তিনি ঠেলে ঢুকে পড়লেন।

ঘরের ঠিক মাঝখানে শিবমঙ্গল খেতে বসেছিল। দারোগাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। বেশ বড় একটা পোরসিলিনের প্লেটে তাকে ডাল, ভাত ও আলু সেদ্ধ দিয়েছে। শিবমঙ্গল দু-এক গেরাস মুখে দিয়েছিল মাত্র। পাশে দুটো বেশ বড় রুপোর বাটিতে ছানা আর দই।

শিবমঙ্গল এঁটো হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চপলার মুখখানা ভয়ে রক্তশূন্য।

রহমান সাহেব ডাকলেন, সিদ্দিকী। সিদ্দিকী।

সিদ্দিকী রাইফেল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। রহমান সাহেব তাকে বললেন, ওর পাশে দাঁড়াও।

সিদ্দিকী কাছে গিয়েই শিবমঙ্গলের কাঁধের কাছটা খিমচে ধরল।

চপলা প্রায় কেঁদে উঠে বলল, বাবু, ওকে খাবারটা খেয়ে নিতে দিন। মুখের ভাত—

রহমান সাহেব বললেন, মুসলমান ওকে ছুঁয়ে দিয়েছে, এখন কি ও আর খেতে পারবে?

শিবমঙ্গল বলল, বড় খিদে পেয়েছে আজ। না খেলে হাঁটতেই পারব না।

—সিদ্দিকী, ছেড়ে দাও ওকে।

শিবমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে আবার বসে পড়ল। দু-তিন গেরাস খেয়ে আবার মুখ তুলে বলল, এই চপলা, দারোগা সাহেবকে বসতে দে।

একটি মাত্র খাট ছাড়া চপলার ঘরে বসবার আর কোনো জায়গা নেই। দারোগা সাহেব ওই খাটে বসবেন না। চপলা আর একটা আসন পেতে দিল মাটিতে। আসামীর মুখোমুখি মাটিতে বসে পড়াটা হাস্যকর—তবু রহমান সাহেব সেখানে বসলেন।

—হুজুর, চা পানি কিছু খাবেন?

—না।

শিবমঙ্গল খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। চপলা বাটিতে করে আরো খানিকটা ভাত এনে বলল, আর একটু ভাত নাও।

শিবমঙ্গল বলল, দে। ডাল আছে আর?

—আছে।

রহমান সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মেয়ে তার বাবাকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছে। চপলাকে দেখলে এখন আর পাঁচটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। আজ সে গালে রং মাখে নি, জ্যালজেলে নাইলনের শাড়ি পরে নি—আটপৌরে একটা লালপেড়ে শাড়ি পরে আছে। যদিও নিজের বাবা সম্পর্কে সে বলেছিল সারা রাতের লোক।

রহমান সাহেব শিবমঙ্গলের খাওয়া দেখে মুখ টিপে হাসলেন। সস্তা চিনে মাটির প্লেটই এখানে অনেকের জোটে না—আর এখানে একেবারে খাঁটি পোরসিলিনের প্লেট। দু দুটো রুপোর বাটি। খানদান বংশ তো। জল দিয়েছে অবশ্য কাঁচের গেলাসে। শিবমঙ্গল নিশ্চয়ই এতদিনে অনেক টাকার কারবার করেছে। —সে সব টাকা সে কি করে ওড়ায় কে জানে? তার মেয়েকে এই হাটখোলায় ঘর নিতে হয়।

প্লেট ও বাটি দুটো চেটেপুটে শেষ করল শিবমঙ্গল। তারপর বলল, হুজুর, হাত ধুয়ে আসি?

রহমান সাহেব সিদ্দিকীকে সঙ্গে যাবার জন্য চোখের ইশারা করলেন, তারপর আলিকে ডেকে বললেন, এই প্লেট আর বাটি দুটো তুই নিজে ধুয়ে নিয়ে আয়। থানায় নিয়ে যেতে হবে।

একটা হিন্দু চোরের এঁটো বাসন ধোওয়ার কথায় আলির মুখে চোখে আপত্তির ভাব ফুটে ওঠে। রহমান সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি, তাই কর।

চপলা বলল, আমি ধুয়ে দিচ্ছি। দরজার সামনেই—

রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আর সব জিনিসপত্তর কোথায়?

চপলা বলল, আমি তো কিছু জানি না।

রহমান সাহেব কটমট করে তাকালেন চপলার দিকে। তাঁর এই মুখভঙ্গি দেখলে সবাই ভয় পায়। চপলা ভয় পেল না। সে হেসে বললে, আমার কি দোষ?

চপলার কি দোষ, তা রহমান সাহেব জানেন না। চপলার ঘরে নানা রকম গুণ্ডা বদমাশ ধরনের লোকও নিশ্চয় আসে—সকলকে ভয় পেলে এতদিন তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব হত না। সে যেন সব কিছুই মেনে নিয়েছে।

—শিবমঙ্গল তোমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—তোমার মা কোথায়?

—অনেকদিন নেই।

—শিবমঙ্গল এইখানেই থাকে? তার নিজের আর কোনো থাকার জায়গা নেই?

—ছিল এক সময়। এখন নেই।

শিবমঙ্গল হাত ধুয়ে ফিরে আসতেই রহমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে তার গালে বিরাট জোরে এক চড় কষালেন।

শিবমঙ্গলের ওপর তিনি হঠাৎ অসম্ভব রেগে গেছেন। লোকটা শুধু চোর বলে নয়। চোর ডাকাত তিনি অনেক দেখেছেন। নিজের মেয়েকে বেশ্যা বানিয়ে আবার তার বাড়িতেই এসে এ রকমভাবে তৃপ্তি করে খাওয়ার দৃশ্য তাঁর সহ্য হয় না। এই মেয়েটির জন্য কোনো অভিযোগ কিংবা দুঃখবোধ পর্যন্ত নেই।

অত জোরে চড় খেয়ে শিবমঙ্গল ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ঝিম হয়ে রইল। লোকটির মাথায় অনেক চুল পেকে গেলেও শরীর বেশ মজবুত আছে। মুখ দেখলে চোর ডাকাত মনে হয় না। ভালো সাজ-পোশাক পরে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশে থাকলে অনেকেই তাকে সম্মান করে কথা বলবে। সেইটাই ওর চুরি করার টেকনিক। নানান ছদ্ম পরিচয়ে পুরনো বনেদি বাড়িগুলোতে ঢুকে পড়ে—তারপর মূল্যবান জিনিসপত্র সরায়।

রহমান সাহেব কর্কশভাবে বললেন, মালপত্তর কোথায়?

—মারবেন না। দিচ্ছি।

নিচু হয়ে খাটের তলা থেকে শিবমঙ্গল একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করল। গিট খুলতেই তার ভেতর ঝকঝকে কয়েকটা রুপোর ছুরি, কাঁটা, একটা হাতির দাঁতের নস্যদান, জেড পাথরের দুটো পুতুল, অনেক কারুকার্যময় খাপওয়ালা একটা শৌখিন ছুরি দেখা গেল।

—এই সব?

—হ্যাঁ হুজুর।

মাত্র এই কয়েকটা জিনিস চুরির দায়ে শিবমঙ্গলের বড় জোর মাস ছয়েক জেল হতে পারে। শিবমঙ্গল অনেক গভীর জলের মাছ। ধরা পড়ার জন্য সে সব সময় তৈরি হয়েই থাকে। সামান্য কিছু জিনিসপত্র হাতের কাছেই রেখে দেয়।

রহমান সাহেব তাকে মারার জন্য আবার হাত তুলতেই সে নিচু হয়ে বলল, সত্যি হুজুর আর কিছু নেই। আর কটা পাথরের পুতুল আছে, তার দাম বেশি নয়।

পুতুলগুলো বেরলো কাঠের আলমারির পেছন থেকে। শিবমঙ্গলই বার করল। কোনো পুরনো মন্দিরের গা থেকে ভেঙে নেওয়া টেরাকোটার মূর্তি—সাহেবদের কাছে এগুলোর দাম আছে।

রহমান সাহেব বুঝলেন এগুলো দ্বিতীয় সেট। এও সাজিয়ে রাখা। আসল জিনিস এখনো বেরয়নি। শিবমঙ্গলের চোখের দৃষ্টি চঞ্চল।

আলি আর সিদ্দিকীকে হুকুম দিলেন ঘর খুঁজে দেখার জন্য। চপলার একটি মাত্র টিনের সুটকেস, একটা আলনা ও কাঠের আলমারি। এ সব খুলে দেখতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। আর কিছু নেই—শুধু আর একটি রুপোর চামচ ছাড়া। এটা বোধহয় চপলা তার বাপকেও না জানিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল—শিবঙ্গলের চোখ দেখলে তাই মনে হয়।

রহমান সাহেব টর্চ জ্বালিয়ে সমস্ত অন্ধকার আনাচ-কানাচ দেখছেন। মেঝেতে গর্ত থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। তন্নতন্ন করে দেখছেন কোথাও মাটি খোঁড়া আছে কিনা।

দরজার ওপরেই কুলুঙ্গিতে কি একটা ঠাকুরের মূর্তি ফুল বেলপাতায় ঢাকা। সেখানে যতবার টর্চের আলো পড়ছে কি যেন ঝকঝক করে উঠেছে। ওখানে কিছু লুকিয়ে রাখাও বিচিত্র নয়।

রহমান সাহেব স্থিরভাবে সেই দিকে টর্চ ফেলে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর চপলাকে বললেন, ওখানে কি ঠাকুর, আছে, সরাও। পেছনে কি আছে দেখব।

চপলা বলল, আমি ঠাকুর ছোঁব কি করে?

ঠিক। বেশ্যা কি কোনো ঠাকুর-দেবতার গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে। ওদের ধর্মে বড় কড়াকড়ি।

—তাহলে ও ঠাকুর ওখানে বসাল কে?

—বামুন ঠাকুরকে দিয়ে বসিয়েছি।

রহমান সাহেব আফশোস করতে লাগলেন, সিদ্দিকীর বদলে কেন হরনাথকে নিয়ে এল না। হরনাথ জাতে ব্রাহ্মণ, সে পুলিশ হলেও ঠাকুরের গায়ে হাত ছোঁয়ালে অন্যায় ছিল না। তিনি নিজে কিংবা আলি বা সিদ্দিকী তো হিন্দুর ঠাকুর ছুঁতে পারেন না।

শিবমঙ্গল নিজেই বলল, আমি সরিয়ে দিচ্ছি। দেখুন না হুজুর, সন্দেহ রাখবেন কেন?

শিবমঙ্গল চোর হলেও ঠাকুর-দেবতা ছুঁতে পারে। তাতে বোধহয় কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু তার মেয়ে পারবে না।

শিবমঙ্গল ঠাকুরের মূর্তিটা মুঠোয় চেপে ধরে ফুল বেলপাতা সরিয়ে দিলো। তার পেছনে আর কিছুই নেই।

দেখলেন তো। আর কিছুই নেই।

রহমান সাহেব অন্যমনস্কভাবে শিবমঙ্গলের হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। ভাল করে সেদিকে টর্চ ফেলে মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়ের শব্দ করলেন।

ছোট্ট একটা কালী ঠাকুরের মূর্তি। মূর্তির জিভ আর চোখ দটো খাঁটি সোনার। অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। শুধু সেই জন্যেই নয়—এর মূল্য আরো অনেক বেশি। আকন্দপুরের জমিদারবাড়ির ঠাকুরঘর থেকে মূর্তি চুরি গেছে দু-সপ্তাহ আগে—সমস্ত কাগজে বড় বড় করে খবর বেরিয়েছে—প্রত্যেক থানায় সারকুলার এসেছে—আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

শিবমঙ্গল বলল, এটা আমি নাটরের মেলা থেকে কিনেছিলাম মেয়ের জন্যে। পেতলের কাজ করা।

রহমান সাহেব কটমট করে তাকালেন। এত বড় জিনিসের খোঁজ তিনি এখানে এসে পেয়ে যাবেন, আশাই করেননি।

—উল্লু কা পাট্যে! দে ওটা আমার হাতে দে।

শিবমঙ্গল মূর্তিটা শক্ত করে ধরে বলল, হুজুর হিন্দুর ঠাকুর আপনি ছোঁবেন না।

—ঠাকুর আবার কি? চোরাই মাল—

—আমরা এঁটা রোজ পুজো করি।

রহমান সাহেব হাত বাড়িয়েও আবার হাত সরিয়ে নিলেন, এ সব বড় গোলমেলে ব্যাপার। হিন্দুর ঠাকুর ছুঁয়ে দিলে সত্যি যদি কোনো গোলমাল হয়। ফুল বেলপাতা দিয়ে এটাকে যে পুজো করা হয়েছে, তা ঠিক। শিবমঙ্গল অতি ধুরন্ধর।

শিবমঙ্গলকে বেধড়ক মারবার জন্য তাঁর হাত নিশপিশ করছিল। কিন্তু মারতে পারলেন না। লোকটা এখন ঠাকুর ধরে আছে—এই অবস্থায় ওকে ছোঁয়াই দোষের কিনা কে জানে!

আলি দারোগা সাহেবকে বললেন, সরকার, আপনি ওতে হাত দেবেন না।
রহমান সাহেব সিদ্দিকীকে বললেন, ভালো করে দেখ তো—আকন্দপুরের চোরাই কালী ঠাকুরের ডেসক্রিপশনের সঙ্গে মেলে কিনা!
সিদ্দিকী বলল, কোনো সন্দেহ নেই।
পুলিশের আগমনের খবর পেয়ে বাইরে কয়েকজন লোক উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। রহমান সাহেব বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বামুন কেউ আছে?
লোকগুলো উত্তর না দিয়ে দুপদাপ করে পালাল। রহমান সাহেবও জানেন, মুসলমান প্রধান এলাকা—এখানে বামুন বিশেষ কেউ নেই। যে-লোকটা তেলেভাজা বিক্রি করে—সে বোধহয় বামুন। কিন্তু এত রাত্তিরে তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?
তিনি চপলাকে জিজ্ঞেস করলেন, রোজ এই ঠাকুর পুজো হয়েছে?
চপলা বলল, জাগ্রত ঠাকুর, পুজো না করলে ওলাওঠা হবে না?
রহমান সাহেব ভাবলেন, জাগ্রত ঠাকুর চুরি করে আনতে বিবেকের কোনো বাধা নেই—কিন্তু পুজো ঠিক করতে হবে। শিবমঙ্গল কি পুজো করার জন্য এনেছে না বিক্রি করার জন্যে?
—কে পুজো করে?
—বামুন ঠাকুর। গঙ্গার ওপারে থাকেন।
গঙ্গার ওপারে এমন কোনো বামুন ঠাকুর থাকেন, যিনি বেশ্যার ঘরে এসেও পুজো করে যান। মহৎ লোক নিশ্চয়ই। এখন তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?
তিনি শিবমঙ্গলকে বললেন, ওটা তোর হাতেই থাকুক। চল, বাইরে চল—
শিবমঙ্গল জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলল, রহমান সাহেব, আপনি হিন্দুর ঠাকুর জোর করে নিয়ে যাবেন ঘর থেকে?
দিনের বেলা হলে লোকটা বোধহয় একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করত। এখন ফাঁকা হাট, লোকজন বিশেষ নেই।
তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, দরকার হলে তোকে গুলি করে মেরে ফেলার হুকুম আছে আমার কাছে। চল—
সিদ্দিকী মারতে যাচ্ছিল শিবমঙ্গলকে—রহমান সাহেব তাকে বাধা দিলেন। ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে তিনি যেতে চান না। রাইফেলটা কাঠ ও লোহার—এটা দিয়ে ছুঁলে দোষ নেই। তিনি বললেন, রাইফেল দিয়ে ওর পেছনে গুঁতো মার—
চপলা বলল, ঘর থেকে ঠাকুর নিয়ে গেলে আমার কি হবে দারোগা সাহেব!
রহমান সাহেব বললেন, এটা আর একজনের ঘর থেকে এসেছে। রাস্তা ছাড়্—
শিবমঙ্গল সাইকেলে উঠবে না। কালী ঠাকুর হাতে নিয়ে সে মুসলমানের সঙ্গে এক সাইকেলে উঠবে কি করে?
রহমান সাহেব বললেন, সবাই হেঁটে চলো।
বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। কালো হয়ে আছে আকাশ। সাত মাইল পথ এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। উপায়ই বা কি। হরনাথকে সঙ্গে নিয়ে এলে এ রকম ঝামেলায় পড়তে হতো না। হিন্দুদের জাগ্রত ঠাকুর থানাতেই বা কিভাবে রাখা হবে। কোথা দিয়ে যে কোন দোষ বেরিয়ে যায়। থানায় ফিরেই তিনি এস আই ধীরেন সাহাকে জ্বর থেকে তুললেন—তার আর হরনাথের হাতে সব চার্জ বুঝিয়ে দেবেন। এরকম ঝামেলায় তিনি জীবনে কখনো পড়েন নি।
কাদায় প্যাচপেচে রাস্তা। সামনে কিছুই দেখা যায় না। শেয়ালের ডাক কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম।
শিবমঙ্গল হঠাৎ থেমে পড়ে বলল, দারোগা সাহেব, আপনারা রুপোর জিনিসগুলো নিয়ে যান, আমাকে ছেড়ে দিন।
—চল, হারামজাদা।
—এই একটা পুতুল নিয়ে আপনারা কি করবেন?
—এগো, এগো বলছি।
আমি এটা বিক্কিরি করবো না। জাগ্রত ঠাকুর, বিক্কিরি করলে আমার হাতে কুষ্ঠ হবে। আমাকে ছেড়ে দিন।
—চল, আগে চল।
শিবমঙ্গল হাতটা ওপরে তুলে বলল, তাহলে গোল্লায় যাক!
কালীমূর্তিটা সে দূরে ছুড়ে দিয়েছে। নিজের হাতে সে প্রমাণ রাখতে চায় না। ঝুপ করে মূর্তিটা পড়ার শব্দ হল। ওদের তিনজনের পুঞ্জীভূত রাগ এতক্ষণ ওর গায়ে হাত দিতে পারে নি, এখন আর কোনো বাধা নেই।
সিদ্দিকী বলল, মার! মার শালাকে।

বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওর পিঠে ঘা দিলো দমাদ্দম করে। আলি যেখানে সেখানে ঘুঁষি মারতে লাগল। সত্যি সত্যি না ভান তা কে জানে—শিবমঙ্গল তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

রহমান সাহেব টর্চ হাতে দৌড়ে গেলেন যেখানে মূর্তিটা পড়েছিল সেই দিকে। একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল। মূর্তিটা চিত হয়ে পড়েছে কাদার মধ্যে—সোনার চোখ দুটি টর্চের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

তিনি নিচু হয়ে সেটাকে তুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। এখানে কেউ দেখছে না—তবু দরকার কি! অন্যের ধর্ম, অন্যের ঠাকুর—কিন্তু তাঁর ছোঁওয়ায় যদি অপবিত্র হয়ে যায়!

রহমান সাহেব হাঁক দিয়ে বললেন, এই, তোরা ওটাকে সাইকেলে চাপিয়ে থানায় নিয়ে যা। হাত পা বেঁধে ফ্যাল। খুব সাবধান কিন্তু—ও ভারি চালাক। ওকে লকআপে দিয়ে তেলেভাজার দোকানের বামনু ঠাকুরকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবি। যদি না পাস, শুধু হরনাথকেই নিয়ে আসবি। এস আই সাহেবকে খবর দিবি—

ওরা চলে যাবার পর সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে রহমান সাহেব একা দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে তাঁকে আক্রমণ করল।

তাঁর সাইকেলটা রাস্তার ধারে পড়ে আছে। অন্য কোনো চোরাইমাল হলে তিনি সেটা অনায়াসে তুলে নিয়ে সাইকেলে চেপে থানায় পৌঁছে যেতেন। একটা পুতুল।

—পুতুল? এই পুতুলের সামনেই অনেকে এসে কাঁদে—অনেকে কত কি মানত করে। কেউ কেউ বলে জাগ্রত ঠাকুর—

কাদার মধ্যে পড়ে আছে সেই ঠাকুর। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার জায়গায় রেখে দেওয়া কি অন্যায়? শিবমঙ্গল যে এটা ছুড়ে ফেলে দিল—একটুও ওর বুক কাঁপল না? সাহেবদের কাছে মূল্যবান অ্যান্টিক হিসেবে বিক্রি হয়ে যেত।

রহমান সাহেব মূর্তির চোখের ওপর আবার টর্চ ফেললেন। পাথরের মূর্তিতে সোনার চোখ ও জিভ থাকায় ভারি সুন্দর সমন্বয় হয়েছে।

আজ কি অমাবস্যা? হঠাৎ রহমান সাহেবের একটু একটু ভয় করতে লাগল। নিজেই লজ্জা পেয়ে ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। শৈশব থেকেই তিনি হিন্দুদের আচার আচরণ দেখেছেন। তাঁর নিজের ধর্ম এ সব কিছুর থেকে অনেক দূরে। তবু শরীরের মধ্যে একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। তিনি এখান থেকে দূরে সরে যেতে পারছেন না—এই মশার কামড় ও অন্ধকারের মধ্যেও তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ হরনাথ না আসে।

হঠাৎ রহমান সাহেবের মনে হল, শিবমঙ্গল, চপলা, সিদ্দিকী, আলি, হরনাথ কিংবা তাঁর জীবনের যে কয়েকটা আলাদা বৃত্ত আছে, সেখানে ধর্ম আর অধর্মের বেশ পাশাপাশি জায়গা হয়ে যায়। তিনি নিজে যেন সেই মুহূর্তে তাঁর জীবনের নিজস্ব বৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বসংসারে তিনি একা। এই অমাবস্যার অন্ধকারে তিনি যে পরধর্মের বিগ্রহের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন—এ জন্যে তাঁর একটু গর্ব হল। কেউ দেখছে না, তবু তাতে কিছু আসে যায় না।

দৈববাণী

একটা শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পারিবারিক পরিবেশ তছনছ করে দিল একটা টেলিফোন।

রাত সাড়ে নটা, সদ্য টি.ভি. প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে, এবার নৈশ ভোজের সময়। টি.ভি. থামবার পর মিনিট পাঁচেক অখণ্ড নিস্তব্ধতা। তারপর মিংকা নিজের পছন্দ মতন রেকর্ড বাজাতে শুরু করে স্টিরিওতে। টি.ভি.র ইংরিজি খবরটা শোনার পর সুরজিৎ হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে চলে যায় বারান্দায়, এখন তার আকাশ দেখার সময়। সুমিত্রা চলে যায় বাথরুমে শরীর জুড়োতে, রান্নাঘরে আলু ভাজার শব্দ হয়।

এই সময় বেজে উঠলো টেলিফোন।

কে টেলিফোন ধরবে, তা ঠিক করার আগে চার পাঁচবার বাজে। সুরজিৎই আকাশের তারাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে বসবার ঘরে এসে রিসিভারটা তোলে। সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যায়।

সুরজিৎ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে আসে। বেনিফিট অব ডাউট দেওয়া যেতে পারে। লাইন পেলেও যেকোনো মুহূর্তে কানেকশন কেটে যাওয়া কলকাতা শহরে আশ্চর্য কিছু নয়। আবার এমনও হতে পারে, মিংকার কোনো ছেলে বন্ধু-টন্ধু...মিংকার বয়েস এখন সতেরো।

এক মিনিট পরেই আবার টেলিফোন বাজল।

সুরজিৎকে কিছু বলতে হল না, মিংকাই চেঁচিয়ে বলল, আমি ধরছি, বাপি।

এবারও বাজল পাঁচবার। মিংকা রিসিভার তুলেই বিরক্তির সঙ্গে বলল, যাঃ, লাইন কেটে গেল।

বাকি রইলো সুমিত্রা। সাঁইত্রিশ বছর বয়েস, এখনো অনেকেই সুমিত্রাকে মিংকার দিদি বলে ভুল করে। সুতরাং তারও বিশেষ টেলিফোন-বন্ধু থাকা সম্ভব। কিন্তু সুমিত্রা তো মিনিট পনেরোর আগে বেরুবে না বাথরুম থেকে।

মিনিট পাঁচেক বাদে তৃতীয়বার টেলিফোন ঝনঝন করতেই সুরজিৎ বাথরুমের দরজায় এসে টোকা দিয়ে বলল, এই!

ভেতরে ধারাজলের শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কিছুটা অলৌকিক সুরে সুমিত্রা বলল, কী?

—তোমার টেলিফোন।

—কে? কে ডাকছে?

—তোমার চার নম্বর প্রেমিক।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দেরি করে সুমিত্রা বলল, ধরতে বল।

কিন্তু তার আগেই মিংকা ধরেছে এবং আবার কেটে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুমিত্রা সুরজিৎকে বলল, প্রায়ই দুপুরবেলা একজন কেউ ফোন করে, আমি ধরলেই লাইন কেটে দেয়। মনে হয় কোনো মেয়ে তোমায় পাগলের মতন খোঁজে।

সুরজিৎ বলল, উইক ডেইজ-এ আমি দুপুরে বাড়িতে থাকব, একথা যদি কোনো মেয়ে ভাবে, তা হলে সে পাগল তো বটেই।

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সুরজিৎ আর একটু হুইস্কি নেবে কিনা তাই নিয়ে দোনামনা করছিল, শেষ পর্যন্ত না-নেওয়াই ঠিক করল।

খাওয়া শুরু করার পরই বাজল আবার টেলিফোন। সুরজিৎ স্ত্রীকে বলল, তোমার টার্ন।

সুমিত্রা এঁটো হাতেই উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল। এবার একজন বলল। উঃ, কতক্ষণ ধরে লাইনটা পাওয়ার চেষ্টা করছি, কিছুতেই পাওয়া যায় না, আপনি খবরটা শুনেছেন তো?

মহিলা কণ্ঠ। সুমিত্রা প্রথমে ঠিক চিনতে পারল না। পেছনে ফিরে স্বামীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সে আবার নরম গলায় বলল, না, কোনো খবর শুনিনি তো। কী হয়েছে? আপনি...

—আমি মিসেস সেন বলছি, অমিতাভর মা।

সুমিত্রা এবার অত্যন্ত বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলল, ও মিসেস সেন, বলুন, কী খবর?

—মিসেস মৈত্র, এত রাতে আমি ফোন করলুম, আগে অনেকবার চেষ্টা করেছিলুম, মানে আমি ভাবলুম, আপনি যদি খবরটা না শুনে থাকেন।

—কী খবর?

—অস্ত্রের ঝড়।

—অস্ত্রের বর? কী বললেন?

—আপনাকে অরিজিৎ কিছু বলে নি?

বিন্টু অথবা অরিজিৎ আর কোকো অর্থাৎ অমিতাভ একই স্কুলের ক্লাস এইট-এ পড়ে। এদের দু'জনের মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে স্কুলের টিফিনের সময়, এক সঙ্গে ফিরেছেও কয়েকবার। এবং এর বাড়ি ও ওর বাড়িতে দু'বার দুটি নিমন্ত্রণও হয়েছিল। পরস্পরের কাছে এদের পরিচয় অরিজিতের মা আর অমিতাভর মা, কিন্তু এই পরিচয় অনেকটা ঝি ঝি শোনায় বলে এরা পরস্পরকে মিসেস সেন ও মিসেস মৈত্র বলে সম্বোধন করে। কেউ কারুর নাম জানেনা, কিংবা জানলেও তা উচ্চারণযোগ্য ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এত রাতে টেলিফোন করবার মতন ঘনিষ্ঠতাও নয়।

—না, বিন্টু কিছু বলেনি। ও ঘুমচ্ছে। আপনি কী খবর বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। অন্দরের ঘর? তার মানে কী?

—অস্ত্রের ঝড়! অস্ত্রের ঝড়! কাল ওদের 'এসে' আসবে...বাংলা পরীক্ষায়।

—অ্যাঁ? বাংলা পরীক্ষার এসে—

—হ্যাঁ।

—আপনি কী করে জানলেন? মানে, জানা গেল কী করে? কে বলল?

—আমাকে সন্ধেবেলাতেই ফোন করে বলেছিলেন মিসেস ঘোষাল। তখনই ভাবলুম আপনাকে জানিয়ে দিই। কিন্তু টেলিফোনে...। মিসেস ঘোষালকে বলেছেন অণিমাদির...আপনি অণিমাদিকে বোধহয় চেনেন না।

—হ্যাঁ চিনি। সিদ্ধার্থের মা তো?

—হ্যাঁ। সেই অণিমাদির বাড়িতে গগনানন্দ মহারাজ এসেছেন, জানেন তো? তিনি শুধু বড় সাধক নন, খুব জ্ঞানী, আগে রামযশপুর কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম একদিন...তিনি আজ অণিমাদিকে বলেছেন, খোকা কি অস্ত্রের ঝড় বিষয়ে কিছু জানে? একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, কাল পরীক্ষায় কাজে লাগবে।

—উনি বললেন এই কথা?

—হ্যাঁ। কালকেই যে বাংলা পরীক্ষা তাও উনি জানতেন না, এমনিই বললেন...আর অণিমাদি কি ভাল দেখুন, কথাটা শুনে উনি শুধু নিজের ছেলের জন্যই তো...তা নয়, উনি কিন্তু সবাইকে বলে দিচ্ছেন, এখনো তৈরি করে নেবার সময় আছে...পাঁচ মিনিট বাদে ফোন রেখে সুমিত্রা যখন খাবার টেবিলে ফিরে এল, তখন তার মুখ দেখে মনে হয়, সে সদ্য ভূত দেখেছে।

শৈবালের অনেকখানি খাওয়া হয়ে গেছে, সে মুখ তুলতেই সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, অস্ত্রের ঝড়! তার মানে কী? অস্ত্রতে খুব ঝড় হচ্ছে বুঝি?

মেয়েদের পক্ষেই যখন তখন এরকম উদ্ভট কথা বলা সম্ভব, তা সুরজিৎ জানে, তাই সে অবাক হয় না। সে বলল, নিউজে তো কিছু শুনিনি।

—নিউজে তো আজেবাজে কথাই বলে বেশি, আসল দরকারি খবর...কী করে এখন জানা যায়!

—কিন্তু অস্ত্রে ঝড় হচ্ছে কিনা...হাউ ইজ ইট সো ইম্প্যান্ট টু য়ু?

—বিন্টুদের কাল বাংলা পরীক্ষায় রচনা আসবে...অস্ত্রের ঝড়।

—আজকাল মিশনারি ইস্কুলেও কোশ্চেন লীক হয়ে যাচ্ছে বুঝি?

—একজন বলেছে, ডেফিনিটলি আসবে।

—সেই একজনটা কে? কোনো জ্যোতিষী?

—তুমি নাম শোন নি, কিন্তু গগনানন্দ মহারাজ খুব বিখ্যাত, ওঁর মুখের প্রত্যেকটা কথা ফলে যায়।

—সাধু? মাই গড! তোমরা আজকাল ছেলের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন জানবার জন্য সাধুদের কাছে যাচ্ছ? তাও ক্লাস এইটের পরীক্ষা!

—আমি যাই নি...মিসেস সেন খবরটা দিলেন...উনি কত ভালো, কষ্ট করে এত রাতে...

—গুরুদেরও এতখানি ডিজেনারেশন...

—শোন, কোথা থেকে এখন অস্ত্রের ঝড় বিষয়ে জানা যায় বলো তো?

—ফরগেট ইট অ্যাজ আ ব্যাড জোক!

—ইট্স ভেরি ইজি ফর ইউ টু ফরগেট এভরিথিং।

সুরজিতের ইচ্ছে হল এক্ষুনি দুহাত দিয়ে কান চেপে ধরতে। এরপরেই সুমিত্রা একে একে বলে যাবে অনেকগুলো অভিযোগ, সুরজিৎ বাড়ির কোনো খবর রাখে না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সব দায়িত্ব তো সুমিত্রাই এতদিন...এত চেষ্টা করেও একজন অঙ্কের টিচার পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি তো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও...

প্রাণপণে অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করে সুরজিৎ শুধু সুমিত্রার বাক্য-স্রোতের শেষ অংশটা শুনল।

—যদি সত্যিই কাল আসে এই রচনাটা, বিল্টু এক লাইনও লিখতে পারবে? অন্ধ্রের ঝড় বিষয়ে আমি নিজেই কিছু জানি না। বিল্টুদের বাংলার টিচারটা মহাপাজি...ক্লাসে কিছু পড়াবার নাম নেই, পরীক্ষার সময় শক্ত শক্ত প্রশ্ন দেবে...

মিংকা খাবার সময় মিল্‌স অ্যাণ্ড বুন্‌স উপন্যাস পড়ে, নইলে খাওয়াতে তার মনই লাগে না। বাবা-মায়ের কথা কাটাকাটিতে সে কখনো অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু আজ বিল্টুর পরীক্ষার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই সে কান খাড়া করে শুনছে।

এবার মিংকা প্রশ্ন করল, মা, হোয়াট ইজ সো স্পেশাল অ্যাবাউট অন্ধ্রের ঝড়? ঝড় তো সব জায়গাতেই হয়।

সুমিত্রা ঝংকার দিয়ে বলল, আমি তা কী করে জানব। রেডিও স্টেশানে ফোন করলে ওরা বলতে পারবে না? কিংবা আলিপুরে ওয়েদার অফিসে...

সুরজিৎ বলল, কয়েক বছর আগে অন্ধ্রের কোস্টাল রিজিয়ানে একটা বিরাট ডিজাস্টার হয়েছিল...দারুণ ঝড়ে সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তিন-চারতলা উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা গ্রাম, বোধহয় কয়েক হাজার মানুষ—

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুমিত্রার মুখ। পথহারা যেন পেয়েছে আলোর সন্ধান। কিংবা ধোপার হিসেবের খাতার মধ্যে যেন পাওয়া গেছে একটা একশো টাকার নোট।

—ঠিক বলেছ! এটাই তো রচনার সাবজেক্ট। সেই জন্যই গগনানন্দ অন্ধ্রের ঝড়ের কথা বলেছেন এখন কী হবে।

সুরজিতের খাওয়া হয়ে গেছে, সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সুমিত্রা অনুনয় করে বলল, এই শোন, লক্ষ্মীটি, তুমি একটা লিখে দাও, বেশ পয়েন্ট ধরে ধরে—

সুরজিৎ প্রকাণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আমি লিখব বাংলায় রচনা? আর ইউ ক্রেজি! জীবনে এক পাতা বাংলায় চিঠি লিখিনি কখনো...বেঙ্গলি আমার সেকেণ্ড সাবজেক্ট ছিল, কোনোরকমে তেত্রিশ পেয়েছিলুম।

—তোমাদের বেলায় খুব সুবিধে ছিল। এখন বাঙালিদের কিছুতেই বেঙ্গলি সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ নিতে দেয় না...মহাঝামেলা! বিল্টু শুধু বাংলাতেই উইক।

মিংকা বলল, হোয়াট অ্যাবাউট বিল্টুর বাংলা টিচার, মা?

—তাকে এত রাত্রে কোথায় পাব? তা ছাড়া ছেলেটি বড্ড কামাই করে, কিচ্ছু পড়ায় না, ওকে আর রাখব না ভাবছি।

সুরজিৎ বলল, সে ছোকরা কবিতা লেখে না? প্রথম দিন চেহারা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল...এই ধরনের ছেলেরা জেনারেলি আনরিলায়েবল হয়।

—ছেলেটি এ পাড়াতেই কোথায় থাকে না বিল্টুর খাতায় বোধহয় ঠিকানা লেখা আছে। তুমি প্লীজ একটু দেখবে? ওকে ডেকে এনে যদি রচনাটা লিখিয়ে ফেলা যায়, আমি বিল্টুকে মুখস্থ করিয়ে দেব।

সুরজিৎ ভাবল, তার মতন নরম স্বামীদেরই বউয়েরা এরকম উৎকট অনুরোধ করার সাহস পায়। রাত সাড়ে দশটার সময় সে যাবে ছেলের প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি খুঁজতে? সে কি শ্যামবাজারে ছিট কাপড় বিক্রি করে না যাদবপুরের আলুওয়ালা? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। মুস্কিল হচ্ছে এই, সুমিত্রার মতন মেয়েরা হুইস্কি বা সিগারেট খেতে শিখেছে, পার্টিতে গিয়ে দিব্যি ইংরেজি বলে, ডিস্কো বাজনার সঙ্গে নাচতেও জানে অন্য পুরুষদের সঙ্গে, কিন্তু জ্যোতিষী কিংবা গুরুঠাকুর ছাড়তে পারেনি এখনো। কে না কে বলেছে অন্ধ্রের ঝড়!

সামান্য কারণে সুমিত্রা যখন দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, তখন তার মুখখানি দারুণ সুন্দর দেখায়। মুখের চামড়া যেন টসটস করে। এই সময় সুরজিৎ তার স্ত্রীর মনে কোনো আঘাত দিতে চায় না।

রূঢ় কিছু বলার বদলে সে অমায়িকভাবে হেসে বলল, আমি গেলেই কি তোমার বাংলার টিচারকে এখন বাড়িতে পাব ভাবছ! ওই সব কবিটবিরা রাত দেড়টা-দুটোর আগে বাড়িই ফেরে না। তাও কী অবস্থায় ফিরবে...কাল সকালে চেষ্টা করো।

—কাল সকালে মাত্র দু ঘণ্টা সময়। আচ্ছা, তুমি অন্তত পয়েন্টসগুলো বলে দিতে পারবে? কোন্ বছরে ওই ঝড় হয়েছিল?

—তা তো ঠিক মনে নেই।
—কত লোক মরেছিল?
—এগ্‌জ্যাক্টলি তা-ও বলতে পারব না। যত দূর মনে আছে, কয়েক হাজার।
—এরকম শক্ত এসে দেবার কোনো মানে হয়, তুমি বলো?
—আসবেই যে তুমি কী করে জানছ? হয়ত সব ব্যাপারটাই...
—আমি জানি, আসবেই! নইলে উনি এমনি এমনি বলবেন? ইস, মিসেস সেন যদি সন্ধেবেলাতেও খবরটা দিতে পারতেন...

মিল্‌স অ্যাণ্ড বুন্‌স থেকে আবার মুখ তুলে মিংকা বলল, মাদার টেরিজাকে ফোন করো না? ডেড অর ডায়িংদের ব্যাপারে শী নোজ্‌ এভরিথিং!

সুরজিৎ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল মেয়ের দিকে। তারপর একটু কড়া গলায় বলল, হাতের এঁটো শুকিয়ে গেছে, যা ধুয়ে আয়?

মেয়ের প্রস্তাব সামান্য সংশোধন করে সুমিত্রা বলল, রামকৃষ্ণ মিশন নিশ্চয়ই জানবে! কিংবা খবরের কাগজ। স্টেটসম্যানে তোমার কে যেন চেনা আছে না?

—তুমি খবরের কাগজে ফোন করো, তারপর কালই কাগজে ছাপা হয়ে যাবে যে বিল্টুদের স্কুলে কোয়েশ্চেন আউট হয়ে যায়। তার চেয়ে ছেড়ে দাও না, বাংলায় একটু কম নম্বর পেলে কী ক্ষতি হবে? ওর বাবাই বাংলা জানে না, ও কী করে বাংলায় দিগ্‌গজ হবে!
—আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল বাংলা জানি।
—তুমি বাংলা নভেল পড়ো, তা হলে তুমিই লিখে ফেলো রচনাটা—
—ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগারস জানতে হবে তো! তোমার কাছ থেকে তো কোনো সাহায্য পাবার উপায় নেই।

সুরজিতের আবার কান চাপা দিতে ইচ্ছে হল।

রাত পৌনে এগারোটা, তবু সুমিত্রা নিরুদ্যম হল না। সে একটার পর একটা টেলিফোন করে যেতে লাগল। আর যেহেতু এখন সুরজিতের পক্ষে বিছানায় শুয়ে পড়া অপরাধ হবে, তাই সুরজিৎ বসবার ঘরে সোফায় এলিয়ে বসে পাইপ ধরাল।

যাকে নিয়ে এত ব্যাপার, সেই বিল্টু এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। বিকেলবেলা দারুণ খেলাধুলো করে বলে বিল্টু একদম রাত জাগতে পারে না। পরীক্ষার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার বলে সুমিত্রাও তাকে সাড়ে আটটার মধ্যে খাইয়ে দেয়। পরীক্ষা থাক আর না থাক, ঘুমের আগে কিছুক্ষণ কমিকস পড়া চাই-ই বিল্টুর।

কৈশোরের সুন্দর, মসৃণ, নির্ভেজাল ঘুম মাখা আছে তার মুখে।

কার কার কাছ থেকে যেন বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করে ফেলল সুমিত্রা। টপাটপ কাগজে লিখেও ফেলল সেগুলো।

তারপর এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে সে পা বাড়াল বিল্টুর ঘরের দিকে।

সুরজিৎ মৃদু আপত্তির সুরে বলল, তুমি এখন বিল্টুকে পড়াবে? এত রাত্তিরে?

সুমিত্রা এমন একটা ভ্রূভঙ্গি করল, যার ওপর আর কোনো কথা চলে না।

তা ছাড়া, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তার কিছু বলারও অধিকার নেই। কেননা, অন্যান্য অনেক আদর্শ স্বামীর মতন, সে কখনো নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াবার চেষ্টাও করেনি। ডায়াসেশানে পড়া মেয়েকে সে বিয়ে করেছে তো এই জন্যই প্রায় বলতে গেলে।

সুমিত্রা খুব আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বিল্টুকে জাগাল। প্রথমে সে জেদীর মতন দু হাত দিয়ে মাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছিল, তারপর এক সময় চোখ মেলে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, মা?

—দুধটা খেয়ে নে তো, লক্ষ্মী সোনা।

ঘুমের ঘোরেই দুধটা খেতে খেতে বিল্টু এক সময় পরিপূর্ণ সজাগ হল।

—শোন বিল্টু, কাল বাংলা পরীক্ষায় যদি অন্ধ্রের ঝড় সম্পর্কে এসে আসে, তুই কিছু লিখতে পারবি?
—অন্ধ্র কী মা?
—অন্ধ্র হচ্ছে ইণ্ডিয়ার একটা স্টেট।
—আঃ, বাংলায় বলো না! স্টেট বাংলায় কী?
—স্টেট হচ্ছে রাজ্য। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যেমন একটা স্টেট! সেই রকম অন্ধ্র হল সাউথে।

বিল্টু ভাল ছেলে, পড়াশোনায় তার আগ্রহ আছে। সে মায়ের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগল। অবশ্য এক একবার তার চোখ বুজে আসছে, আর মা তাকে আদর করে বলছে, আর একটু শোন, এইটাই লাস্ট পয়েন্ট, তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে, তা হলে তুমি কী করতে? স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন...দুর্গতদের সেবা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলল এরকম। সুরজিতেরও ধৈর্য কম নয়, সেও জেগে বসে আছে। বিল্টুর ঘর থেকে সুমিত্রা বেরিয়ে আসবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার পিঠে হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল, সত্যি, ইউ আর গ্রেট!

সুমিত্রা বলল, তোমার তো কোনো হুঁস নেই, আজকাল বাংলায় ফেল করলে পুরো ফেল!

পরদিন সকালে, শুধু স্নানের সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়, এমনকি খাবার সময়েও বিল্টুকে পাখি পড়াতে লাগল। বিল্টু একবার একটু আপত্তি করেছিল, কেননা, আজ বাংলার সঙ্গে জিওগ্রাফি পরীক্ষাও আছে, কিন্তু মা জিওগ্রাফি পড়তে দিচ্ছে না। কিন্তু জিওগ্রাফির জন্য সুমিত্রার চিন্তা নেই, ওতে বিল্টু বরাবর এইট্টি পারসেন্ট নম্বর পায়।

মধু দিয়ে টোস্ট আর এগ্ পোচ বিল্টুকে খাওয়াতে খাওয়াতে একেবারে শেষবারের মতন সুমিত্রা মনে করিয়ে দিলো, ভুলে যাস না, ভলান্টিয়ার্স-এর বাংলা হল স্বেচ্ছাসেবক। স-এ ব-ফলা আছে! আর দুর্গত...আর লঙ্গরখানা হল যেখানে ফ্রি খাবার দেওয়া হয়—।

মহাপুরুষদের দিব্যদৃষ্টি একেবারে মিথ্যে হয় না। গগনানন্দ সম্ভবত সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, তাই তাঁর দিব্যদৃষ্টি একটু অন্যদিকে সরে গিয়েছিল। বিল্টুদের রচনা এসেছে, পশ্চিমবঙ্গে বন্যা।

প্রশ্নপত্রটি পড়বার পর মায়ের ওপর খুব অভিমান হল বিল্টুর। সমুদ্রের ঢেউ এসে বন্যা হয় কি না তা সে জানেনা। ঝড় থেকে হয়? অন্ধ্রে স্বেচ্ছাসেবক থাকে, পশ্চিমবাংলায় তাদের কী বলে? মা কেন এ সব বলে দেয়নি?

একটু দূরে বসা অমিতাভর সঙ্গে চোখাচোখি হল বিল্টুর। দুজনের চোখে একই রকম ভাষা।

দুই অভিমানী কিশোর মুখ গোঁজ করে বসে রইল খাতার সামনে।

পুরোহিতের হাতঘড়ি

ট্রেনের শব্দ শুনে সর্বানন্দ মন্দিরের চাতালে এসে নিজের ছায়া দেখলেন। ছায়া ছোট হয়ে এসেছে, আকাশে সূর্যের রং সাদা, সর্বানন্দ ভাবলেন, তা হলে ট্রেনটা আজ ঠিক টাইমেই যাচ্ছে।

মন্দিরে ঘড়ি নেই, কিন্তু সর্বানন্দের নিজস্ব একটি হাতঘড়ি আছে। বছর দেড়েক আগে সুরেশ উকিলের বউ এই ঘড়িটা দিয়েছিল সর্বানন্দকে। বিলিতি ঘড়ি তাতে দম দিতে হয় না। চামড়ার ব্যাণ্ডটা খুলে সর্বানন্দ একটা কাপড়ের ব্যাণ্ড লাগিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর কবজিতে বেশ মানানসই হয়েছিল।

দিন কাল পালটে গেছে। আগে বিলিতি ঘড়ি শুনলেই মনে হত খুব দামি জিনিস। হঠাৎ একদিন সেটা বন্ধ হয়ে যাবার পর মুদিখানার মালিক কেষ্ট ঘোষ তাঁকে জানাল যে—আসলে ওটা নাকি বেশ সস্তা দামের ঘড়ি। বিলেত কেন, কলকাতার ফুটপাতেও পঁচিশ-তিরিশ টাকায় পাওয়া যায়। ব্যাটারিতে চলে। আবার ব্যাটারি না ভরলে কিছুতেই আর চালাবার উপায় নেই। যেটাকে তিনি চামড়ার ব্যাণ্ড ভেবেছিলেন, সেটাও আসলে প্ল্যাস্টিক, ওই চামড়া চামড়া নকল ভাব।

আগে শুধু দিন আর রাত্রি দিয়ে ছিল জীবনটা ভাগ করা, ঘড়িটা পাওয়ার পর সর্বানন্দের সময় দেখা খুব অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেও বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখতেন, কটা বাজে। খুব মেঘলা কোনো সকালে তিনি ঘড়ি দেখেই বলে উঠতেন ওরে বাপরে, সাড়ে আটটা বেজে গেল। ভুতাই, তুই এখনও চন্দন বাটা করলি নি? আসন সাজালি নি?

ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবার পর সর্বানন্দের অস্বস্তি লাগে। কেষ্ট ঘোষ শহর বাজারে গেলে ব্যাটারি কিনে আনবে বলে কথা দিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভুলে যায়।

সর্বানন্দ তাই ট্রেন চলাচল দিয়ে সময় মাপবার চেষ্টা করেন।

এ গ্রামে রেল-স্টেশন নেই। লাইন গেছে অনেকটা দূরের খাল পাড় দিয়ে। এখান থেকে ট্রেনের কামরাগুলোকে মোষের পালের মতন মনে হয়। চলন্ত ট্রেনের শব্দটাও এই দূরত্বের জন্য অনেকখানি কর্কশতা খসিয়ে বেশ সুরেলা ওঠে। সর্বানন্দের শুনতে ভাল লাগে।

ট্রেনটা শেষ হবার পর সর্বানন্দ ডাকলেন, ভুতাই ভুতাই, আমার চটি জোড়া এনে দে।

এই গরমে কেউ দুপুরবেলা মন্দিরের ধারে কাছে আসে না। সিমেন্ট বাঁধানো চাতালটা রুটি সেঁকা চাটুর মতন তেতে থাকে।

মায়ের গায়ে কয়েক টুকরো সোনার গয়না আছে। তাই বাইরে কোথাও যাবার সময় সর্বানন্দ মন্দিরের দরজায় তালা দিয়ে যান। কিন্তু কেষ্ট ঘোষের সৎ ভাই গজেন ঘোষের বউ সেই সকাল থেকে বসে আছে বিগ্রহের সামনে, মাথায় ঘোমটা টানা, টপ টপ করে পড়ছে চোখের জল, মুখে কোনো কথা নেই। বেশি বয়েস নয় গজেন ঘোষের, মাত্র চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে, হঠাৎ পক্ষাঘাতে তার ডান দিকটা পড়ে গেছে।

গজেন ঘোষের বউকে তো এখন উঠে যেতে বলা যায় না, তাই দরজা খোলাই রাখতে হবে। ভক্তের জন্যই মন্দির। বিপদে আপদেই তো মানুষ ঠাকুর-দেবতার কাছে আসে।

ভুতাই এসে এক জোড়া রবারের চটি এনে রাখল সর্বানন্দের পায়ের কাছে।

সর্বানন্দ বললেন, আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাবি না। তোকে বলেছিলুম না কাটারিটা দিয়ে এই অশ্বত্থ গাছটা কাটতে, কোনো কাজে মন নেই ছোঁড়ার!

ভুতাইয়ের বয়েস তেরো-চৌদ্দো বছর, একটা চারহাতি লাল গামছা সে ধুতির মতন করে পরে। ঠাকুরমশাইয়ের বকুনি খেয়েও সে চোখ পিটপিট করে আর মুচকি মুচকি হাসে।

বগলে একটা ছাতা নিয়ে সর্বানন্দ চটি ফটফটিয়ে বাগানটা পার হতে লাগলেন।

এককালে জমিদার ছিল মজুমদারেরা, তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল এই কালী মন্দির-এর, সংলগ্ন কিছুটা জমি দেবোত্তর করা। যতদিন মজুমদারের অবস্থার রমরমা ছিল, ততদিন এই মন্দিরেও জাঁকজমক ছিল যথেষ্ট। এখন মজুমদারদের বসত বাড়িটাই ভেঙে পড়েছে, একালের বংশধররা পালিয়েছে কলকাতায়, একজন নাকি পুলিশে দারোগাগিরি করে।

দেবোত্তর সম্পত্তি বলেই টিঁকে আছে মন্দির সংলগ্ন বাগানটি। সর্বানন্দ নিজে গাছপালা ভালবাসেন, তাঁর নিজের হাতের পরিচর্যায় এখানে ফোটে নানান বাহারি ফুল।

বড় স্থলপদ্মের গাছটির কাছে এসে সর্বানন্দ থমকে দাঁড়ালেন। যেন তিনি দেখতে পেলেন টুকটুকে লাগল শাড়ি পরা এক কিশোরীকে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা টানা চোখ, গায়ের রং অতসী ফুলের মতন। দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময়।

প্রথম যেদিন বিভাকে এই স্থলপদ্ম গাছটির পাশে দেখেছিলেন সর্বানন্দ, হঠাৎ যেন এক অলৌকিক শিহরণ বোধ করেছিলেন শরীরে। কখন যে মানুষের কী হয়, তা কেউ বলতে পারে না। এই মন্দিরে—বাগানে কাছাকাছি দু'পাঁচ খানা গ্রামের অনেক লোকজনই তো আসে। বিভার বয়স মেয়েও কি আগে আসে নি? ঢের এসেছে! তবু বিভাকে দেখেই বা হঠাৎ অমন চমকে উঠেছিলেন কেন সর্বানন্দ? যেন প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছিল। একটা জবা ফুলের গাছের পাশে কিশোরী মেয়ের সাজে মা কালীকে দেখেছিলেন না রামপ্রসাদ? ঠিক যেন সেই রকম অনুভূতি!

বিভাকে তিনি আগে দেখেননি, সে এ গ্রামের মেয়ে নয়।

তাই ওরকম নিষ্পাপ, সুন্দর মুখখানি দেখে সর্বানন্দের কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, এ বুঝি দৈব আবির্ভাব।

সে পাঁচ বছর আগেকার কথা, সেবারেই এ গ্রামের জুনিয়ার হাই স্কুলটা হায়ার সেকেণ্ডারি হল আর বর্ধমান থেকে এল একজন নতুন হেডমাস্টার। তারই মেয়ে ওই বিভা।

ওই কিশোরীটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সর্বানন্দ, সেই মুগ্ধতার জন্য তিনি কষ্টও পেতে পারতেন। আজকাল ওই বয়েসী মেয়েদের ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি থাকে না, এক ভাঙা মন্দিরের প্রৌঢ় পুরুষকে বিভা যদি হেলাফেলার চোখে দেখত, সেটাও কিছু অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু মা-ই যেন বিভাকে এনে দিয়েছিলেন সর্বানন্দের কাছে। বিভা মেয়েটির স্বভাব অতি নরম ও মধুর, একালে ঠ্যাটা মেয়েদের মতন সে মুখে মুখে তর্কও করে না, ভাল কথা শুনলে বোকার মতন হেসেও ওঠে না।

ঠাকুর দেবতাদের সম্পর্কে বিভার বেশি-বেশি ভক্তিও নেই, আবার অভক্তিও নেই। সে ভালবাসে ফুল। এই বাগানের টানেই সে এখানে প্রায়ই আসে, এই ফুলের সম্পর্কেই সর্বানন্দের সঙ্গে তার ভাব।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পাঁচ বছর।

স্থলপদ্ম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিভা আর সেই কিশোরী মেয়েটি নেই। সে যথেষ্ট ডাগর হয়েছে। এবার সে হারিয়ে যাবে। আজ সকাল থেকেই এই কথাটা বারবার মনে পড়ছে, বিভা আর বেশিদিন এখানে থাকবে না।

বাগান থেকে বেরিয়ে সর্বানন্দ পা চালাতে লাগলেন জোরে জোরে। লম্বা ছিপছিপে শরীরটি একেবারে সোজা, মুখের চামড়াতেও বয়সের ছাপ পড়ে নি। মাথার চুল কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে।

রাস্তাটা এত খারাপ যে গোরুর গাড়িও চলতে পারে না। মজুমদারদের আমলে এই রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি আসতো। সর্বানন্দের স্পষ্ট মনে আছে ও বাড়ির মেজোবাবু গাড়ি কেনার পর সেই গাড়ি চেপে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। গত পনেরো কুড়ি বছরে এই রাস্তা আর কেউ মেরামত করে নি। কেষ্ট ঘোষ বলে, রাস্তাটা যদি ভালো হতো, বুঝলেন ঠাকুরমশাই, এ মন্দিরে আরও দূর দূর থেকে অনেক ভক্ত আসতো। আমাদের মা তো একেবারে জাগ্রত।

শোনা যাচ্ছে হলদিয়ার দিকে একটা পাকা রাস্তা এগচ্ছে, সেটা এ গ্রামের খাল ধার দিয়ে যাবে। বাস চলার মতন রাস্তা। সে রকম একটা রাস্তা হলে এ গ্রামের গুরুত্ব বেড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরেরও। বাইরের লোক, বাসযাত্রীরা এই মন্দিরের নাম জানবে। সর্বানন্দ জপে বসে প্রায়ই সেই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়।

হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ি মন্দির থেকে মাত্র মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ। বাড়ির এক পাশে একটি ছোট পাকা পুকুর, তাতে লাল শালুক ফুটেছে।

এ বাড়ির সামনেও একটি কঞ্চির বেড়া দেওয়া ছোটখাটো বাগান। এ বাগানেও সর্বানন্দের হাত আছে। মন্দিরের বাগান থেকে তিনি নানা রকম চারা এনে দিয়েছেন বিভাকে, গাছের যত্ন করতে শিখিয়েছেন। গাছে সুন্দর ফুল দেখলে অনেকেই বলে, বাঃ। কিন্তু ক'জন আর ফুল ফোটাতে জানে!

এই দুপুর রোদেও বিভা বাগানে হাঁটু গেড়ে বসে আগাছা নিড়োচ্ছে।

সেই প্রথমদিন স্থলপদ্ম গাছটির পাশে বিভাকে দেখে সর্বানন্দের যে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, আজও সেটা যায় নি। তিনি মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলেন। এ মেয়ে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতন নয়, এর মধ্যে একটা বিশেষ কিছু আছে। এটা মাধুর্যের চুম্বক।

ঘামে ভিজে গেছে বিভার মুখ, একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরা, আঁচলটা লুটচ্ছে মাটিতে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। সে যখন চলে যাবে, তখন কে দেখবে এই বাগান? বিভার মা-বাবার এ দিকে ঝোঁক নেই। গত বছর হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বসে আছে বিভা, শহরের হস্টেলে রেখে তাকে কলেজে পড়াবার সামর্থ নেই রবীন মাস্টারের, তাই তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

সর্বানন্দ ডাকলেন, বিভা মা!

বিভা চমকে মুখ ফেরাল।

সর্বানন্দ ছাতাটা মুড়ে নামিয়ে রেখে বললেন, একটা কাঁচি আনো তো মা, গোলাপের কয়েকটা ডাল ছেঁটে দিই। শুকনো শুকনো হয়ে গেছে, ছেঁটে দিলে তেজি হবে। বিভা দৌড়ে ভেতরে চলে গেল কাঁচি আনতে। সর্বানন্দ বাগানের মধ্যে এসে বিভা যে-জায়গায় বসেছিল, সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিকটা আগে জল দেওয়া হয়েছে মাটি ভিজে ভিজে, তাতে পড়েছে বিভার পায়ের ছাপ। ঠিক যেন মা লক্ষ্মীর পায়ের মতন।

বিভার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তার মা। তিনি বললেন, ও ঠাকুরমশাই এখন বাগানে বসবেন না। বাগানে বসলে তো আপনাদের হুঁস থাকে না। রান্না করে বসে আছি সেই কখন থেকে, আগে সেরে নিন।

সর্বানন্দ বললেন, আসছি, আসছি।

প্রত্যেক রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে এ বাড়িতে সর্বানন্দর বাঁধা নেমতন্ন। তাঁর জন্য যে আলাদা আলাদা বিশেষ কিছু বন্দোবস্ত হয় তা নয়, এ বাড়িতে সাধারণ যা রান্না হয় তিনিও তাই খান। প্রথম প্রথম বিভাই তাঁকে ডেকে নিয়ে আসত।

শাড়ির পাড় দিয়ে বোনা দু খানা আসন পাতা হয়েছে বারান্দায়। কিছুদিন আগেও বেশ মোটা সোটা ভারিক্কি চেহারা ছিল রবীন মাস্টারের, হঠাৎ ডায়াবিটিস ধরা পড়ার পর শরীরটা চুপসে যেতে শুরু করেছে। আগে থালা ভর্তি করে ভাত খেতেন, এখন ডাক্তারের নির্দেশে দু হাতার বেশি ভাত দেওয়া হয় না তাঁকে, সেটুকু ভাত শেষ হয়ে যাবার পর তিনি লোভীর মতন থালা চাটতে থাকেন।

রবীন মাস্টার বললেন, ঠাকুরমশাই, আজ বিকেলে খড়্গপুরের সেই পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে বিভাকে। সেই সম্বন্ধটা যদি লেগে যায়, বড় ভাল হয়।

সর্বানন্দ বললেন, পাত্রের কুষ্ঠী পাঠিয়েছে?

রবীন মাস্টার বললেন, না, আমার এক শালা তো এনেছে এই সম্বন্ধটা, তাকে বলেছিলুম, তা সে বললে যে পাত্রের কুষ্ঠী নেই।

সর্বানন্দ বললেন, জন্ম ছকটা পেলেও মিলিয়ে নেওয়া যেত।

—ওরা এলে জিজ্ঞেস করব এখন। পাত্রটি বড় ভাল। এখন আমার মেয়ের যদি ভাগ্যে থাকে।

—ছেলে কী করে?

—ওদের লেখাপড়া জানা বংশ, বুঝলেন! ছেলের কাকা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার। ছেলেও হিস্ট্রিতে এম. এ. পাশ করে এখন হিজলি হাই স্কুলে ঢুকেছে। পরে কোনো কেলেজেও চান্স পেতে পারে। রেজাল্ট ভাল। সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন। কোনো দাবি-দাওয়া নেই। পণ তো চায়ই না, সোনাদানার ব্যাপারেও বলেছে, আপনাদের যা ইচ্ছে হয় দেবেন, না দিলেও আপত্তি নেই। ভাবুন তো, আজকালকার বাজারে বিনা পণে এম. এ. পাশ জামাই পাওয়া কি ভাগ্যে না থাকলে হয়। ওদের একটাই কথা, পাত্রের মেয়ে পছন্দ হওয়া চাই!

—বিভা মা-কে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে। এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে।

—দেখুন যদি আপনাদের আশীর্বাদে লেগে যায়। আমার বরাবরের ইচ্ছে শিক্ষিত পরিবারে মেয়ে দেওয়া।

বিভার মা বললেন, খড়্গপুর শহরে ওদের নিজস্ব বাড়ি আছে। অবস্থা ভাল।

সর্বানন্দ চোখ তুলে দেখলেন, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বিভা। মুখখানা লজ্জারুণ। সে যেন মনে মনে পাত্রকে পছন্দ করে ফেলেছে এর মধ্যেই। আজ সকাল থেকেই সর্বানন্দের মনে হচ্ছিল, বিভা চলে যাবে।

রবীন মাস্টারের ইচ্ছে, পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সর্বানন্দও উপস্থিত থাকুন। কিন্তু সর্বানন্দ রইলেন না। ফিরে গেলেন মন্দিরে। তাঁকে সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করতে হবে।

যাবার সময় তিনি বিভাকে বললেন, বিভা মা, লোকজন সব চলে গেলে একবার মন্দিরে এস। আসবে? হারুকে সঙ্গে নিয়ে এস।

বিভা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সর্বানন্দ মন্দিরে ফিরে এসে দেখলেন, গজেন ঘোষের বউ ঠায় বসে আছে সেই একই জায়গায়। তার দুই ছেলেমেয়ে তাকে ডাকতে এসেছে, তবু সে যাবে না।

সর্বানন্দ তাকে বললেন, বাড়ি যাও মা, মুখে কিছু দাও। আমি তোমার হয়ে মায়ের কাছে আরজি জানাব। ভাল হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।

মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু সর্বানন্দের কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসের জোর নেই। গজেন ঘোষকে তিনি দেখে এসেছেন, তার ও রোগ সারার নয়। মাকে ডাকলেই যদি দুনিয়ার সকলের রোগ ভোগ সেরে যেত, তা হলে তো পৃথিবীতে এতদিনে আর পা ফেলারও জায়গা থাকত না। মানুষের আয়ুর নিয়ন্তা হচ্ছে মহাকাল। সৃষ্টির সঙ্গে বিনাশও চলতে থাকে সমান তালে।

ছেলেমেয়ে দুটি প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেল তাদের মাকে।

সর্বানন্দ ডাকলেন, ভূতাই! ভূতাই!

তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যখন তখন সে বাজারের দিকে চলে যায়। সে মানুষজন দেখতে ভালবাসে। অবশ্য মন্দিরের ভেতরটা সে মুছে টুছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

এই মন্দিরের কালীমূর্তিটি বেশ বড়। প্রায় প্রমাণ সাইজের, পাথরের তৈরি। জমিদাররা নাকি জয়পুর থেকে আনিয়েছিলেন এই মূর্তি। জিভের ডগায় খানিকটা খাঁটি সোনার পাত, চক্ষু দুটি রুপোর। পদতলে শয়ান মহাদেবের মাথার সাপ ও ডান হাতটি ভাঙা। সে আর সারান যায় নি। মন্দিরটাই ভেঙে পড়ার মতন অবস্থা। বছরে দুবার পুজো হয়, তখন কিছু লোকজন আসে, অন্য সময় প্রায় কিছুই রোজগার নেই।

প্রায় সন্ধে হব-হব সময়ে সর্বানন্দ দেখলেন বাগানে ঘুরছে দুটি অচেনা যুবক। তাদের সঙ্গে বিভার ছোট ভাই হারু।

বিভা আসে নি। হারু পাত্রপক্ষের লোকজনদের মন্দির দেখাতে এসেছে। এ গ্রামে আর কিছুই তো দেখার নেই।

সর্বানন্দ এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। যুবক দুটির মধ্যে একজন স্বয়ং পাত্র, তার নাম মলয়কুমার মণ্ডল। হারু বলল, ঠাকুরমশাই, ইনি মলয়দা।

প্যান্ট ও শার্ট পরা বেশ সুশ্রী চেহারার যুবকটি। বিভার সঙ্গে মানাবে ভাল।

স্থলপদ্ম গাছটি থেকে সে একটি ফুল ছিঁড়েছে। পুজোর প্রয়োজনে ছাড়া এ বাগানের ফুল ছিঁড়তে দেন না কারুকে সর্বানন্দ, তিনি একটু দুঃখিত হলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। শহরের ছেলে, ওরা অত ফুলের মর্ম বোঝে না।

তিনি বললেন, এস বাবা, এস, মাকে দর্শন করবে এস।

মন্দিরের চাতালের কাছে এসে মলয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, এই মন্দিরটা কত দিনের?

প্রাচীনত্বের একটা গৌরব থাকে, তা সর্বানন্দ জানেন। সেইজন্যই তিনি খানিকটা বাড়িয়ে বললেন, তা প্রায় আড়াই শো বছর হবে। আমার বাবার কাছে শুনেছি, বর্গিরা এসে এই মন্দিরে পুজো দিত।

মলয়কুমার তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললে, ইটগুলো দেখেছিস? মোটা মোটা। আগেকার ইট অনেক সরু হতো। এ মন্দিরের বয়স ষাটসত্তর বছরের বেশি হবে না। তাছাড়া বর্গিদের রুট এটা ছিল না।

সর্বানন্দের মুখের ওপর তাঁকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করে মলয়কুমার একটু হাসল। তারপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কারুর কাছ থেকে মাইনে পান, না প্রণামীর টাকাতেই সব কিছু চলে?

সর্বানন্দ বললেন, না, মাইনে আর কে দেবে। জমিদাররা তো আর নেই। ভক্তরা আসে, তারা যা দেয়, তাতেই কোনোক্রমে চলে।

মলয়কুমার আবার তার বন্ধুকে বলল, জমিদারতন্ত্র চলে গিয়ে এই সব ঠাকুর দেবতাদের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য ব্যবসায়ীরাও অনেক জায়গায় মন্দির টন্দির নিয়ে ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছে। তুই দিল্লিতে বিড়লাদের মন্দির দেখেছিস?

সর্বানন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, এই গ্রামের লোক ছাড়া বাইরের লোকজনও আসে এই মন্দিরে? মাসে অ্যাভারেজ কতজন হবে?

সর্বানন্দ বললেন, রাস্তাটা যে অতি খারাপ। লোকজন আসতে পারে না। হলদিয়ার দিক থেকে একটা নতুন রাস্তা হবে বলে শোনা যাচ্ছে অনেকদিন, সেটা হলে অনেকে আসবে।

মলয়কুমার বলল, আপনার মাকে ভাল করে ডাকুন, যদি রাস্তাটা তৈরি করে দেন তাড়াতাড়ি।

মন্দিরের দরজাটা ভাল করে খুলে দিয়ে সর্বানন্দ বললেন, এস বাবা, ভেতরে এস তোমরা।

মলয়কুমারের পায়ে ফিতে বাঁধা সু। সে একটু ইতস্তত করে বলল, ভেতরে যেতে গেলে তো জুতো খুলতে হবে। থাক, এই তো বাইরে থেকেই দেখছি।

চাতালের নিচে, মূর্তির সোজাসুজি দাঁড়িয়ে সে ঠাট্টার সুরে বন্ধুকে বলল, জমিদার টমিদারদের টেস্ট কত ক্রুড ছিল দেখেছিস। পাথরের মূর্তিতে সোনার জিভ লাগিয়েছে। কী হরিবল্ দেখাচ্ছে না! কালী ঠাকুরের জিভ তো লাল হবার কথা। বন্ধুটির পায়ে চটি। সে খালি পায়ে ভেতরে ঢুকে একটুক্ষণ দেখেই ফিরে এসে বললে, জিভটা সোনার

নয় রে। পেতল-টেতল হবে মনে হচ্ছে। অনেক সময় এই সব ঠাকুর-দেবতাদের দু সেট গয়না থাকে। এক সেট হয়তো অরিজিনাল সোনার টোনার, আর এক সেট গিল্টির! পুরুতরা চুরি যাবার ভয়ে আসল গয়নাগুলো সরিয়ে রাখে। উৎসব-টুৎসবের দিনে পরিয়ে দেয়।

সর্বানন্দ বললেন, এটা পেতলের নয়। সোনারই।

মলয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই মন্দির থেকে কখনো গয়না-টয়না চুরি যায় নি?

সর্বানন্দ স্বীকার করলেন যে তাঁর আমলেই একবার চুরি হয়েছে বটে। তাঁর আগের আমলে আরও দুবার।

মলয়কুমার হেসে বললেন, আপনার মা কালীর অভিশাপে সেই চোর মুখে রক্ত উঠে মরে নি?

তারপর হঠাৎই সে বললেন, আচ্ছা চলি নমস্কার? চলো হারু।

সর্বানন্দ বিবর্ণ মুখে সেই অপসৃয়মান তিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মলয়কুমারের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে ঝরে পড়ছিল অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ! যেন সে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে গেল সর্বানন্দর গালে।

সে এসেই বাগানের ফুল ছিঁড়েছে, জুতো খুলতে হবে বলে মন্দিরে ঢোকে নি, একবার প্রণামও করল না। এই ছেলে নিয়ে চলে যাবে বিভাকে?

পরদিনই সর্বানন্দ শুনলেন, পাত্রপক্ষ পাকা কথা দিয়ে গেছে। বিভাকে খুব পছন্দ হয়েছে তাদের। আগামী মাসেই ভাল দিন আছে।

পাত্রের বাবার কাছ থেকে রবীন মাস্টার মলয়কুমারের জন্মক্ষণ ও তারিখ এবং রাশিগণ জেনে রেখেছেন, তা দিয়ে একটি ছক বানালেন সর্বানন্দ। ভাল করে বিচার করে দেখলেন। এই পাত্রের সঙ্গে বিভার বিবাহ যোগ নেই। জোর করে এ বিয়ে দিলেও তা মঙ্গলের হবে না। পাত্র ও পাত্রী দুজনেরই সিংহ রাশি। এ রকম বিবাহে কন্যার নিশ্চিত বৈধব্যযোগ থাকে।

রবীন মাস্টার সব শুনে বললেন, ঠাকুরমশাই, ওসব আর আজকাল কেউ মানে না। ছেলেটি ভাল, কোনো দাবি দাওয়া নেই। এরকম পাত্র আমি আর পাব কোথায়? আমার যে রোগ হয়েছে, তাতে আর কদিন বাঁচব তার ঠিক নেই, তার আগে যদি মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেতে পারি...

সর্বানন্দ বারবার বিভা ও মলয়কুমারের ছক মিলিয়ে দেখলেন, গণনার ভুল নেই। এ বিয়ে হতে পারে না। রবীন মাস্টার কিন্তু সে কথা কিছুতেই বুঝতে চান না।

সর্বানন্দ আরো খবর পেলেন যে মলয়কুমার কমুনিস্ট, সে পার্টি করে। অর্থাৎ সে ঘোর নাস্তিক। বিয়ের পর সে কি তা হলে আর কখনো বিভাকে এই মন্দিরে আসতে দেবে?

না, না, সর্বানন্দ সে জন্য চিন্তিত নন। বিয়ের পর বিভা প্রবাসে চলে গেলে হয়তো আর কখনো মন্দিরে আসবে না, তা না আসুক, কিন্তু সে সুখে থাকুক, তার জীবন আনন্দময় হোক, তাই তো চান সর্বানন্দ। কিন্তু এ বিবাহ যে মঙ্গলজনক হতে পারে না।। বিভা দুঃখ পেলে তা তিনি কি করে সইবেন?

কিন্তু এ বিবাহ তিনি বন্ধ করবেনই বা কী করে!

সেই সন্ধেবেলার পর থেকে বিভা আর মন্দির কিংবা বাগান দেখতে আসে নি। বিয়ের কথা ঠিকঠাক হয়ে গেলে মেয়েরা যেন অতিরিক্ত লাজুক হয়ে যায়। তারা আর বাড়ি থেকে বেরয় না। সর্বানন্দ ও-বাড়িতে গেলেও বিভার সঙ্গে কথা হয় না।

একদিন তিনি বললেন, কামিনী গাছটা লাগিয়েছিলুম, এবার তাতে ফুল এসেছে। একবার দেখতে আসবে না, বিভা মা?

বিভা দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কামিনী ফুল ফুটেছে?

হ্যাঁ, দেখতে যাব। কালই দুপুরে যাব।

কিন্তু তবু বিভা এলো না। তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে মাসিপিসির দল। তারা এখন বিভাকে বাড়ি থেকে বেরতে দিতে চায় না।

সর্বানন্দ বিয়েতে পুরুতগিরি করেন না। বিভার বিয়ের জন্য অন্য গ্রামের পুরুত ঠিক করা হয়েছে। সেই পুরুতকে সর্বানন্দ দুটি ছক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলুন তো, এই বিবাহ কি শুভ হতে পারে?

অন্য গ্রামের পুরোহিতটি সর্বানন্দের চেয়েও বয়েসে প্রবীণ। তিনি ছক না দেখেই বললেন, পাত্রপক্ষ পণ নেবে না শুনেছি। এই ঘোর কলিতে তার চেয়ে শুভ আর কী হতে পারে? তারপর ওদের ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

বিভার বিয়ের দিনে দুপুরবেলার ঘুমে সর্বানন্দ এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন।

স্থলপদ্ম গাছটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিভা। তার পরনে বৈধব্যের বেশ। কোলে একটি শিশু। সেই শিশুটি গাছের ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

ধড়মড় করে জেগে উঠলেন সর্বানন্দ। তাঁর শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

যেমন করেই হোক, এই বিয়ে বন্ধ করতে হবে। সেদিন বিভার ভাবী স্বামীর ব্যবহারে মা নিশ্চয় রুষ্ট হয়েছেন। তিনিই বিভাকে বাঁচাতে পারেন এখনো।

এই কদিনে সর্বানন্দ অনেকবার বিভার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। আজ মাকে ভাল করে ডেকে বলতে হবে, মা, তুমি এই বিয়ে বন্ধ করে দাও। বিভা রূপসী, গুণবতী মেয়ে, তার জন্য আরো ঢের ভাল পাত্র পাওয়া যাবে এই দেশে। কত দুপুর বিভা কাটিয়ে গেছে এই বাগানে। মন্দিরেই প্রদীপ জ্বালার সলতে বিভাই পাকিয়ে দিয়েছে বরাবর। সর্বানন্দ যেদিকে তাকাচ্ছেন, সেদিকেই যেন দেখতে পাচ্ছেন বিভার মায়া ছবি। পাঁচটি বছর সে সর্বানন্দর জীবন মাধুর্যে পূর্ণ করে দিয়েছে, তিনি তার কোনো প্রতিদান দিতে পারবেন না?

অনেকদিন পর সর্বানন্দ একটা দেশি মদের বোতল খুলে কোষায় ঢাললেন খানিকটা। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি বসলেন বিগ্রহের সামনে। গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে সেই কারণবারি পান করার পর তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন, আজ তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করবেন।

ফুল-বিল্বপত্র নিবেদন করে তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন স্তোত্র :

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরব ছিন্নমস্তকা।।
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া
সর্বশক্তি স্বরূপা ত্বং স্বরূপদেবময়ী তনুঃ।।
ত্বমেব সূক্ষ্ম স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিনী
নিরাকারাপি সাকারা কাস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।।
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধস্তনুঃ।।

তারপর তিনি গলদাশ্রু নয়নে বলতে লাগলেন, মা, মা, তুমি সব পার, তুমি বিভার জীবন থেকে অমঙ্গল দূরে সরিয়ে দাও। বিভার হাতের গাঁথা জবা ফুলের মালা তুমি তোমার গলায় পরেছ, সে চন্দন বেটে দিয়েছে, নৈবেদ্যর ফল কুটে দিয়েছে, সেই বিভা যেন দুঃখ না পায়, তুমি দ্যাখো মা। তুমি ওর বিবাহ বন্ধ করে দাও। নাস্তিকের সঙ্গে বিভার বিয়ে হবে, তুমি সহ্য করবে কেন মা? তোমার সোনার জিভ বলে ছেলেটি সেদিন বিদ্রূপ করেছিল, তুমি শোন নি? ওরা খড়গপুর থেকে আসবে, তুমি আজ ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দাও মা। বিভা লগ্নভ্রষ্টা হোক, তবু তা অকাল বৈধব্যের চেয়ে ভাল। তার অন্য জায়গায় আবার বিয়ে হবে, আমি নিজে তার পাত্র খুঁজব, কিংবা যদি বিয়ে নাও হয়, যদি সে সারাজীবন কুমারী থাকে...এই বাগানে সে নিত্য আসবে, তোমার সেবা করবে, তার সরল সুন্দর হাসিতে ঝঙ্কৃত হবে এই ভাঙা মন্দির...

সর্বানন্দ হঠাৎ শুনতে পেলেন ট্রেনের তীক্ষ্ন হুইশল!

পাঁচটা পঁয়তিরিশের ট্রেন ঠিক সময়ে এসে গেল? অন্যদিন ট্রেনের শব্দ শুধু শোনা যায় হুইশল দেয় না, আজ যেন সর্বানন্দের প্রার্থনার উত্তরে বিদ্রূপের হাসির মতন বেজে উঠলো ওই হুইশল।

পাশের গ্রামের স্টেশন আছে। সেখানে নামবে বর ও বরযাত্রীরা তারপর পাল্কিতে নিয়ে আসা হবে তাদের। সর্বানন্দ এসব কালই শুনেছেন। তিনি বিস্ফারিত চোখে কালী মূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন। ট্রেন ঠিক সময়ে এল? এখনো দুর্ঘটনাটা ঘটতে পারে! পাশের গ্রামের স্টেশনে পৌঁছবার আগে...

বাকি কারণবারিটুকু পান করে সর্বানন্দ ভাবলেন, হলদিয়ার রাস্তাটা আজও তৈরি হল না। যারা রাস্তা বানায়, মা কি তাদের স্বপ্নে ভয় দেখাতে পারতেন না? মলয়কুমার মণ্ডল নামে দুর্বিনীত ছেলেটি সেদিন সেই ইঙ্গিতই করে গেল। তবু মা কোনো ব্যবস্থা নিলেন না? এখনো যদি রবীন মাস্টারের মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা যায়। সর্বানন্দ সবাইকে জানিয়ে দেবেন যে সাতকোনা গ্রামের জাগ্রত কালীর আদেশেই এই বিয়ে সাব্যস্ত হয়নি।

পাশের গ্রামের স্টেশনে যদি ট্রেন থামে তা হলে বরযাত্রীদের পার্টি এই মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়েই কন্যাপক্ষের বাড়িতে যাবে। সর্বানন্দ ধ্যানে বসলেন, আটকাতেই হবে ওদের। তিনি নিজে বিয়ে করেননি, সংসার করেননি, এই মন্দিরে পড়ে আছেন এতগুলো বছর, তিনি না থাকলে এই ভাঙা মন্দিরের পুজোই বন্ধ হয়ে যেত! নিজের জন্য তিনি কিছু চাননি, সবই এই মন্দিরের জন্য। তাঁর সেই পূজাকর্মের কি এতটুকু জোর নেই?

একসময় তাঁর ঘোর ভাঙলো। সানাইয়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বরযাত্রীর পার্টি পৌঁছে গেল নাকি বিয়ে বাড়িতে? বাইরের রাস্তায় কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না?

সর্বানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বাগান খোঁড়া শাবলটা তুলে নিয়ে গেলেন। তবে আজই সব শেষ হয়ে যাক। হারামজাদী, তুই শুধু পাথর? তোর কোনো শক্তি নেই? একটা রাস্তা বানাতে পারিস না? চোরেরা তোর গয়না নিয়ে গেলে তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতাও তোর নেই? চাতালে দাঁড়িয়ে তোকে যারা অপমান করে যায়...

শাবলটা তুলে মারতে গিয়েও থেমে গেলেন সর্বানন্দ। হঠাৎ তিনি দেখলেন কালীমূর্তির চোখ দুটি যেন বেশি চকচক করছে, সোনালি জিভ বার করা ঠোঁটে এমন একটা হাসি, যা তিনি অন্য কোনোদিন দেখেননি। বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কৌতুক করছে তাঁর সঙ্গে।

শাবলটা ফেলে দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন সর্বানন্দ! এবার তিনি বুঝতে পেরেছেন। ঈর্ষা! বিভাকে ঈর্ষা করেছিলেন এই কালীমূর্তি। সর্বানন্দ গত পাঁচবছর ধরে কালীমূর্তির বদলে বিভার কথাই বেশি চিন্তা করতেন বলে বিভাকে সরিয়ে দিলেন মা কালী। পাথরের মূর্তি হলেও নারী তো!

সর্বানন্দ বললেন, ঠিক আছে, আজ থেকে আর তোকে মা বলব না। বিভা বলে ডাকব।

তিনি সেই পাথরের মূর্তির একটি স্তনে হাত রাখলেন। যেন অবিকল রক্ত-মাংসের মূর্তি, যেন সত্যিই বিভা।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাই!

সোনামণির অশ্রু

লোকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করুন!

রোগা-প্যাতলা, লম্বাটে চেহারা, বছর চল্লিশেক বয়েস। মাথার চুল বেশ ঘন, তার মধ্যে দু-চারটে সাদা। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, লোকটির মুখখানা অনেকটা ঘোড়ার মতন। তা বলে খারাপ দেখতে বা হাস্যকর কিছু নয়, অনেক মানুষের মুখই এরকম হয়। ধুতির ওপর সাদা হাফ শার্ট পরা, তার পোশাক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, বাঁ-হাতে একটা সোনার আংটি।

লোকটি জগুবাবুর বাজারের বাইরের ফুটপাথ থেকে দুপুর দেড়টার সময় তালশাঁস কিনছে। দুপুর দেড়টা!

রাস্তার অনেক মানুষের মধ্যে সাধারণ একটি মানুষ। ওকে দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই যে ওই লোকটি একটি খুনি।

খুনিরা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তালশাঁস কেনে? টাকায় সাতটা দেবে না আটটা তাই নিয়ে দরাদরি করে?

দু টাকায় পনেরোটিতে রফা হল। লোকটি কাগজের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগল হাজরার মোড়ের দিকে।

কালিকা সিনেমার এক পাশের একটা তিনতলা বাড়ির দরজায় তিনটে চিঠির বাক্স। লোকটি দেখল মাঝখানের বাক্সটি ফাঁকা।

দোতলায় আলো হাওয়া যুক্ত স্বতন্ত্র তিন কামরার ফ্ল্যাট। পনেরো বছর আগেকার ভাড়া। বেশ সস্তা। সল্ট লেকে জমি রয়েছে তার, কিন্তু বাড়ি করার উৎসাহ নেই, দোকান থেকে অনেক দূর পড়ে যায়।

লোকটির স্ত্রী বাংলা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল বিছানায় শুয়ে। মোটার দিকে গড়ন, দুপুরে ব্রা পরে না। এই তো একটু আগে স্নান সেরে এসেছে, দুপুরবেলা এই সময় প্রত্যেক দিন তার স্বামী দোকানে অন্য কর্মচারী বসিয়ে রেখে বাড়িতে ভাত খেতে আসে।

ওদের ছেলেটি বড়, এই সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আর মেয়ে ছোট, ন বছর মাত্র বয়েস, স্কুল বাসে সেও ফিরেছে একটু আগে।

দরজার বেল শুনে মাসিক পত্রিকাটি মুড়ে রেখে স্ত্রী বলল, পুষি, দোর খুলে দে, তোর বাবা এসেছে!

এক বুড়ি এ বাড়িতে রান্নার কাজ করে, তিনদিন ধরে সে দেশে গেছে। গৃহকর্ত্রীকেই আজ খাবার গরম করতে হবে, আর গোটা কয়েক বেগুন ভাজা। একটা কিছু ভাজাভুজি না করলে ওর স্বামীর মুখে ভাত রোচে না।

খাট থেকে নেমে তক্ষুনি সে রান্নাঘরের দিকে না গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। গুমোট গরম, দু চারটি ঘামাচি হয়েছে তার বুকে, বাঁ হাত দিয়ে নিজের বাম স্তনটি চেপে ধরে সে ডান হাত দিয়ে ঘামাচি মারতে লাগল।

মেয়ে দরজা খুলে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা, কী এনেছ? কী এনেছ?

ঠোঙাটি মেয়ের হাতে দিয়ে লোকটি তার গাল টিপে একটু আদর করল তারপর ঢুকল শয়ন ঘরে।

রক্ত মাংসের স্ত্রীর শরীরের চেয়েও আয়নায় আধো উন্মুক্ত বেশ বড় একটি বর্তুল স্তন তাকে মুগ্ধ করল বেশি। সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

দেয়ালে কালী ঠাকুরের ছবি, তাতে কাগজের লাল ফুলের মালা। ড্রেসিং টেব্‌লের দু পাশে দুটি বাঁকুড়ার ঘোড়া। জানলায় একটি পুরোন বিলিতি মদের বোতলে মানি প্ল্যান্ট।

খুনির বাড়ি।

সেলিমপুরের এ পাশটা থেকে বড় রাস্তা পেরলেই যোধপুর পার্ক। খানিকটা ভেতরে ঢুকলেই সোনামণির মাসির বাড়ি।

সোনামণির মা আর বাবা দুজনেই অফিসে যান, ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায় বলে সোনামণি ইস্কুল থেকে ফিরেই মাসির বাড়িতে চলে যায়! বাড়ির ঝি তাকে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে।

সোনামণির বয়েস এগারো। গল্পেরই বই-র জগত ছেড়ে সে এখনো বাস্তব পৃথিবীতে পা দেয়নি। এইবার দেবে দেবে করছে। তার গায়ের রং বেশ ফর্সা, সারসের সৌন্দর্যে তার মুখখানা অপরূপ, খুব বাচ্চা বয়েস থেকেই লোকে তাকে দেখলে বলতো ইস, একেবারে পুতুলের মতন দেখতে হয়েছে মেয়েটা। এক এক সময় এই কথা শুনলে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলত। সবাই এক কথা বলে, তার মোটেই পুতুল হতে ইচ্ছে করে না।

এখন সোনামণিকে কেউ কেউ আদর করে বলে আধখানের পরী। সে সবেমাত্র লম্বা হতে শুরু করেছে, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় কাজল টানা। পড়াশোনাতে সোনামণির তীক্ষ্ণ মেধা।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটা বাজে, সোনামণি মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছে। খানিক আগেই লোডশেডিং হয়েছে, রাস্তাঘাট একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিকেলে প্রবল তোড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় এখানে সেখানে জমে আছে কালো জল।

বাড়ির দাসি বিমলা সোনামণির হাত ধরে ধরে হাঁটছিল, কিন্তু সোনামণি নিজেই মাঝে মাঝে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে আর অত ছোট নেই। আর দু'দিন বাদেই তার জন্মদিন। তখন সে বারোতে পা দিয়ে বড়দের জগতেও পা দেবে।

এত অন্ধকারেও রাস্তায় মানুষজন কম নেই। হেডলাইট জ্বালিয়ে যাচ্ছে গাড়ি তারই মধ্যে সাইকেল রিকশা, একটা গরু....।

ফুটপাথ থেকে বড় রাস্তায় নামতেই খানিকটা জল। সোনামণি সেখানে পা দেওয়া মাত্র কেউ যেন তাকে নিচে টানল হুস করে। সোনামণি হাত বাড়িয়ে বিমলাকে ধরতে গেল, পারল না। চিৎকার করতে গেল, পারল না।

রাস্তায় হাঁটু ডোবার চেয়েও কম জলে সোনামণি ডুবে গেল।

বিমলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। কোনো গাড়ির হেডলাইটে এক পলকের জন্য সোনামণির গায়ের সাদা ফ্রকটাকে দুমড়ে নিচে পড়ে যেতে দেখল।

ও খুকু কোথায় গেলে? ও খুকু! কী হল গো? ও খুকু!

বিমলা হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেল জলে, কিন্তু সে ডুবল না। এবং সে জানতেও পারল না তারই গোড়ালির ধাক্কায় সোনামণি আবার ডুবে গেল খোলা হাইড্র্যান্টের মধ্যে। একবার সে কোনো ক্রমে ভেসে ওঠার চেষ্টা করেছিল।

বিমলার চ্যাঁচামেচির কারণটা রাস্তার লোকদের বুঝতেই অনেকটা সময় লাগল। সবাই তিতি বিরক্ত, কে আর অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়?

আড়াইঘণ্টা বাদে নরকের পাঁক মাখা সোনামণির মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। যাক, তখনও মিশমিশে অন্ধকার রাস্তায়, কেউ তার বিকৃত বিভৎস মুখখানা দেখতে পায়নি।

রাত পৌনে একটা। এ সময় শহর প্রায় ঘুমন্ত হলেও কেউ কেউ জেগে থাকে।

পঞ্চাননতলা বস্তির পাশে রেললাইনের ওপরেই জনা পাঁচেক যুবক আড্ডা জমিয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের এখনো গোঁফ গজায়নি, তবু তারা টেনেটুনে যুবকদের দলে ঢুকতে চাইছে।

সামনে বাংলা মদের বোতল, আর ঝাল ঝাল কিমার চাঁট। চারজনের মুখে সিগারেট একজন গাঁজা পাকাচ্ছে।

রাতের দিকে দু একটা মালগাড়ি চলে মাঝে মাঝে। তাও ইদানিং বেশ কমে গেছে। মালগাড়ি এলে ওদের কাজ কারবার ভাল হয়। কিছুদিন ধরে বাজার মন্দা যাচ্ছে তাই হ্যাঁচড়া কাজ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ একজন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ভূ-ভূ-ভূ-ভূত।

আর একজন তার উরুতে একটা থাবড়া মেরে বলল, চুপ বে! চেল্লাসনি। রঙ চড়ে গেছে?

প্রথম ছেলেটি তবু আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওই, ওই, ওই, ওই যে দ্যাখ! ভূ-ভূ-ভূত!

এবারে পাঁচজনেই দেখতে পেল। ধপধপে সাদা ফ্রক পরা, ফুটফুটে ফর্সা, এগারো বারো বছরের একটি পরী তাদের সামনে শূন্যে ভাসছে।

পাঁচজনে একেবারে থ। চোখের ভুল নয়, সত্যি দেখছে।

পরীটি খুব মিনতিপূর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, ওগো, তোমরা আমায় মারলে কেন?

আমি কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে?

পাঁচ যুবকের শরীরে কাঁপুনি ধরল এবার। যেমন পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে ফল্স কেস চাপিয়ে দিয়েছে। এবারে ফাঁসি দেবে। এরা তো ছুরি-ছোরা বা পেটো-পিস্তলের কারবার করে না। সে জন্য অন্য দল আছে। ওরা তো সবে মাত্র ছোটখাটো মাল সরাবার কাজে হাত পাকাচ্ছে।

বিনা নির্বাচনেই ওদের যে দলপতি, সেই গণা বলল, তোমায় কে মেরেছে? আমরা তো কোনো মেয়েছেলের গায়ে হাত দিই না? তুমি ভুল জায়গায় এসেছ!

কিশোরী পরী বলল, হ্যাঁ, তোমরাই মেরেছো। কেন মারলে, বলো, কেন মারলে?

আমি কী দোষ করেছি? আমার বাবা-মা-কি তোমাদের কাছে কোনো দোষ করেছে?

গণা বলল, আরে কি মুস্কিল, সত্যি বলছি, আমরা ওসব কাজ করি না। তোমাকে আমরা মারিনি!

কিশোরী পরী বলল, আর দুদিন বাদে আমার জন্মদিন। আর হল না। আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না! মা-বাবা আমায় আর দেখতে পাবে না। ওগো, তোমরা কেন আমায় এই শাস্তি দিলে। তোমরা যোধপুর পার্কের সামনে রাস্তার তিনটে হাইড্রান্টের লোহার ঢাকা খুলে নিয়েছ...

গণা এবারে চোখ বুজল। পুলিশ যেন চোরাই মাল তুলে ধরে তার চোখের সামনে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ও কাজটা তাদেরই বটে।

এবারে দ্বিতীয় নেতা নেবু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করেছে। সে বলল, হ্যাঁ নিয়েছি। পেটের দায়ে। তুমি যোধপুরে থাকতে, তোমরা বড়লোক, গাড়ি করে যাও, তোমাদের নর্দমায় পা দেবার কথা নয়!

সোনামণি বলল, আমাদের গাড়ি নেই। আমি বিমলার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, নর্দমায় পড়ে গিয়ে ডুবে গেছি, বিমলার পা ভেঙে গেল...ওগো, তোমাদের কি একটুও দয়া নেই?

গণা বলল, আজ শালা সন্ধেবেলা হেভি বৃষ্টি হয়েছে?

নেবু বলল, বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল জমেছে সে তো শালা ভগবানের দোষ!

গণা সোনামণির উদ্দেশ্যে বলল, তুমি দয়ার কথা বলছ; আমরা যখন খেতে পাই না, তখন কেউ দয়া করে? তোমার বাপ-মা কি আমাদের খেতে দেবে? কোনো শালা খেতে দেয় না। কিছু চাইতে গেলে দূর দূর করে খেদিয়ে দেয়।.

—তোমরা অন্য কাজ করতে পার না? বড়রা যেমন অফিসে কাজ করে—

—হাঃ! তুমি কোথাকার পরী গো? কিছু জান না। শুধুমুধু আমাদের দোষ দিতে এসেছ? অন্য কাজ, হেঃ! নন্টেদা বেহালার কারখানায় কাজ করত, তার চাকরি গেছে। এখন সেও আমাদের লাইনে ঢুকেছে।

—ছিঃ, তা বলে তোমরা খারাপ কাজ করবে? যাতে মানুষ মরে?

—আবার ওই কথা বলছ? তুমি যে মরেছ, সে জন্য যদি কেউ দায়ি হয়, তা হল জগুবাবুর বাজারের শিববাবু!

—সে কে?

—তার লোহার দোকান। সে আমাদের কাছ থেকে মাল কেনে। পার্কের রেলিং ভেঙে নিয়ে গেলে কম দর দেয়। নর্দমার ঢাকনা নিয়ে গেলে ভাল পয়সা। একখানা নিয়ে গেলে বলে আর মাল নেই?

—হ্যাঁ গো পরী, তোমার মৃত্যুর জন্য শিববাবু দায়ি। ও মাল যদি সে না কিনত, তাহলে কি আমরা এমনি এমনি খুলতুম? সেই শিববাবু শালা আবার খুব কালী ভক্ত। দোকানে অ্যাত্ত বড় ফটো!

সোনামণির আত্মা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালিকা সিনেমার পাশে দোতলার ফ্ল্যাটে শিববাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

স্বামী স্ত্রীর ডবল খাট, ছেলে মেয়েদের আলাদা আলাদা ঘরে বিছানা। কিন্তু মেয়েটা বড় বাবার ভক্ত, প্রায়ই নিজের বিছানা ছেড়ে বাবা-মায়ের মাঝখানে শুয়ে পড়ে।

শিববাবু চোখ মেলে আঁতকে উঠল প্রথমটা।

জানলা দিয়ে ধোঁয়ার মতন কী যেন ঢুকেছে। তারপর সেই ধোঁয়া একটি মূর্তি নিল। একটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী মেয়ে, গায়ে সাদা ফ্রক, সে হাওয়ায় ভাসছে।

শিববাবু ভাবলেন, কোনো দেবতা বুঝি এসেছে তার ঘরে। লক্ষ্মী ঠাকুরুণ? একটা লটারির টিকিট কিনেছে সে, যদি দু কোটি·দু লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজটা লেগে যায়...

ভাসমান পরী দুঃখের সুরে বলল, ওগো, তুমি আমায় মারলে কেন? আমি কি দোষ করেছি তোমার কাছে?

—অ্যাঁ?

শিববাবু আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে ঘাম বইতে লাগল তার শরীরে। এই মেয়েটা খুন হয়েছে? বাপরে বাপ, কী সাংঘাতিক কথা! এমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে যারা মারে, তারা কি মানুষ না শয়তান?

কিন্তু মেয়েটি তার কাছে এসেছে কেন? তার নামে অভিযোগ করছে? একি আশ্চর্য কথা।

ওগো, তুমি কেন আমায় মারলে? আর দুদিন পরে আমার জন্মদিন—

—এ কী কথা বলছ, মা? আমি কেন তোমায় মারব? আমি বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করি, আমি তো খুন-জখমের ব্যাপারে থাকি না। তোমারই বয়েসি মেয়ে আছে আমার—

—কেন, রেললাইনের কাছে লোকগুলো যে বলল, তুমি আমাকে মেরেছো?

—রেললাইনের পাশের লোক? তারা কারা? আমি তো চিনি না। তোমার কী হয়েছিল, খুলে বল তো?

—আমি যোধপুর পার্ক থেকে আসছিলুম, সন্ধেবেলা লোডশেডিং ছিল, রাস্তায় জল ছিল।

—ও হ্যাঁ, রেডিওর রাত্তিরের খবরে শুনলুম বটে, ওদিকে একটি মেয়ে রাস্তায় দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আহা গো! এমন কাঁচা বয়সের মেয়ে, ছি-ছি-ছি, গাড়ি চাপা দিয়েছিল?

—রাস্তার নিচে পাতাল থাকে, আমি সেখানে ডুবে গেছি। পাতালের ঢাকনা ছিল না।

—কী বললে, পাতাল?

—রেললাইনের লোকেরা বললে, তুমি সেই পাতালের ঢাকনা কেনো, তাই ওরা সেগুলো তুলে আনে। তুমি না কিনলে ওরা আনত না।

—ও, এবার বুঝেছি! ওরা বাজে কথা বলেছে। আমি না কিনলে ওরা অন্য কারুর কাছে বেচত। আমি দোকান খুলেছি, কেউ পুরোন লোহা আনলেই কিনি। সে কোথা থেকে এনেছে তা আমার দেখার দরকার কী?

—তুমি জান না, ওগুলো খুলে নিলে মানুষ মরে যেতে পারে? যেমন আমি মরে গেলাম? আমি কি দোষ করেছি যে এমনি করে আমাকে মরতে হবে?

—তুমি শুধু শুধু আমায় দোষ দিচ্ছো মা। জানো, ওই লোহার ঢাকনাগুলো আমার কাছ থেকে কে কেনে? কর্পোরেশনেরই অফিসার। আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসায়, গণা-নেবুরা সেগুলো আবার তুলে আনে, কর্পোরেশনের অফিসার আবার কিনতে আসে আমার কাছে। এর মধ্যে আমি কে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। কর্পোরেশনের মিঃ দাস, তার কাছে যাও। সে তো জেনে শুনেই এসব করাচ্ছে!

—তুমিও তো জানতে?

—আমি অত শত চিন্তা করি না। আমি মাল কিনি, মাল বেচি; রাস্তা রক্ষা করার দায়িত্ব তো আমার নয়। পুলিশ এই চুরি বন্ধ করতে পারে না? পুলিশ ইচ্ছে করে ওদের ধরে না, বুঝলে? ওখানকার থানার ওসি-কে গিয়ে বলো, সে তোমাকে মেরেছে। আর যারা রোজ সন্ধেবেলা লোডশেডিং করে? তারা জানে না যে রাস্তায় এত গর্ত, কত নর্দমার ঢাকনা নেই, সারা সন্ধে অন্ধকার থাকলে কত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। হচ্ছেও তো রোজই। তারা দোষ স্বীকার করেছে কখনো, তুমি তাদের কাছে যাও। দ্যাখো গিয়ে, তারা সবাই এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে! তুমি একলা আমাকে দুষতে এসেছ কেন, মা? আহা, তোমার মতন একটা মেয়ে?...

সোনামণি আবার ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

শিববাবুর বুক কাঁপছে। হাত জোড় করে সে প্রণাম জানাল ঠাকুরের উদ্দেশ্যে।

তারপর পাশের ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে স্নেহের হাত রাখল।

তখুনি সে ঠিক করল, পুষিকে সে কোনোদিন সন্ধের পর রাস্তায় বেরতে দেবে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরের আকাশে দুলতে লাগল সোনামণির আত্মা।

শিববাবু নামে লোকটি কতগুলো লোকের নাম বলল। সে এখন কোথায় যাবে, কার কাছে তার দুঃখের কথা জানাবে। তার জন্মদিন আর হবে না। সে আর এই পৃথিবীতে বড়দের জগতে পা দিতে পারবে না।

এত বড় শহরের তো কিছুই চেনে না সোনামণি। শিববাবু যাদের নাম বলল, তাদেরকে এখন কোথায় খুঁজে পাবে?

ঢেউ-এর মতন অভিমান ঝাপটা দিতে লাগল তার বুকে। রাত্রির শিশিরের মতন টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে লাগল তার চোখের জল।

নিম্নগামী

স্নেহের বাবাজীবন অমিয়,

আমায় তুমি চিনিবা না। তোমার পিতাঠাকুর অকালে স্বর্গগত হইয়াছেন জানিয়া মর্মাহত হইলাম। এতদিন তোমাদের কোনো সন্ধানাদি জানিতাম না। সংবাদপত্রে তোমার পিতা শ্রীমান ভক্তিপদ'র মৃত্যু সংবাদ দেখিয়া তোমাদের ঠিকানা জানিলাম। তোমায়ের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার পুব মাইজপাড়া গ্রামে, এমনই আমি মনে করিতেছি, আশা করি ইহাতে কোনো ভুল নাই। ভক্তিপদ ও শক্তিপদকে আমি অতি বাল্যকাল হইতেই স্নেহ করি। যাহা হউক, এখন কাজের কথা বলি। পুব মাইজপাড়া গ্রামে আমার দশকর্ম ভাণ্ডার দোকান ছিল, নিশ্চয় তোমার বাবা-কাকার নিকট সে দোকানের কথা শুনিয়াছ। তোমাদের পরিবার আমার খাতক ছিল। হিসাবপত্রে দেখিতেছি তাং তেরো শত ছাপ্পান্ন, তেইশে আষাঢ় পর্যন্ত আমার দোকান হইতে দুই শত বত্রিশ টাকার তৈজস ও একখানি লেপ বাবদ আরও একান্ন টাকা তোমরা ধারে লইয়াছ। আজও তাহা পরিশোধ করা হয় নাই। তুমি কৃতী হইয়াছ, আশা করি বংশের এই ঋণ তুমি জানিবা মাত্র শোধ করিয়া দিবে। আমি এই শনিবার অর্থাৎ ৪ঠা শ্রাবণ সকাল নয়টায় তোমার গৃহে যাইব। টাকার জোগাড় রাখিও। ইতি আং তোমার জ্যেঠা হরিনাথ পাইন।

চিঠিখানা পড়ে দলা-মোচা করে ফেলে দিতে গিয়েও অমিয় থেমে গেল। তার মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। এই রকম সময় কারুর সঙ্গে কথা বলতে হয়, নইলে শুধু নিজের ভেতরে ভেতরে গজরে গেলে একটা বিষবাষ্প মনকে আরও দুর্বল করে দেয়।

সে জোরে ডাকল, বুলা, বুলা।

সাড়া পাওয়া গেল না। দুটি ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। অর্থাৎ বুলা এখন বাথরুমে। সন্ধে থেকেই অন্ধকার। অফিস থেকে ফিরে খাবার টেবিলেই চুপ করে বসেছিল অমিয়, সামনে একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে। বুলা চা তৈরি করে দিয়ে এই একটু আগেও তো এখানে বসে কথা বলছিল। গরম লাগলেই বুলা বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার খুলে তার নিচে দাঁড়ায়। অথচ বেরিয়ে এলেই তো আবার ঘাম হবে।

অমিয়র মনের মধ্যে রাগ জমছে। সে টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিল। এটা বাংলা কত সাল? বাড়িতে একটি মোটে ইংরেজি কাগজ রাখা হয়, তাতে বাংলা তারিখ নেই। ক্যালেণ্ডারও একটি মাত্র, বিদেশি কোম্পানির। তখন অমিয় মনে মনে হিসেব করতে লাগল। বাংলা সালের সঙ্গে পাঁচ শো তিরানব্বই যোগ করলে ইংরেজি বছর। তাহলে...তা হলে...উনিশ শো উনপঞ্চাশ।

অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে কিছু একটা অস্ফুট খারাপ কথা বলল।

আধঘণ্টা বাদে বুলা তখন বাথরুম থেকে বেরুল তখন অমিয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। সামনে রাস্তা-ঘাট মিশমিশে অন্ধকার, দেখবার কিছু নেই।

বুলা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আজ যদি রান্না না করি...বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে নিলে হয় না? সস্তা কোনো জায়গায়...

মাসের তিন তারিখ মাত্র, এখন দু-একদিন এরকম বিলাসিতা করা যায়। অমিয় বলল, চলো, ক টার সময় যাবে, সাড়ে আটটা? এখন তুমি মিনিট দশেক সময় দিতে পারবে, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

বুলা একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ গলার আওয়াজ এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে!

—শোন একটা ব্যাপারে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আলোচনা করলে আমার মনটা একটু হালকা হতে পারে। কিন্তু সেটা এক হিসেবে স্বার্থপরতাও হবে। আমার খারাপ-লাগাটা তোমার মনের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে খানিকটা।

—কী হয়েছে বলো তো?

—এই চিঠিটা পড়ো।

বুলাকে খাবারের টেবিলের আলোর কাছে গিয়ে পড়তে হল। ফিরে এসে বলল,

এটা কি অদ্ভুত চিঠি?

—মনে হচ্ছে, এই শনিবার এক দ্বিতীয় শাইলক আসতে চাইছে আমাদের বাড়িতে।

—টাকা চাইছে তোমার কাছে! কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলুম না। তোমার জ্যাঠামশাই হন?

—আমার কোনো জ্যাঠামশাই নেই। লোকটা কী রকম পাজি ভেবে দ্যাখো, বাবা মারা যাবার খবর কাগজে দেখে লোকটা আমাকে লিখেছে, আসল উদ্দেশ্য টাকা চাওয়া!

—কিসের টাকা? তৈজস, লেপ এসব তোমার বাবা কিনেছিলেন ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকে?

—কী করে আমি জানব? কবেকার কথা বলছে জান? নাইনটিন ফর্টি নাইন, তখন আমি জন্মাইনি। আমার জন্মের আগে বাবা কারুর কাছ থেকে কিছু ধার করেছিলেন কি করেননি, সেই টাকা ওই লোকটা আমার কাছে চাইছে হাইট অব অর্ডাসিটি!

—এতদিন চায়নি কেন?

—তার মানে বাবা ধার করেননি ওর কাছ থেকে। এ সব মিথ্যে কথা। কাকা আগেই মারা গেছেন, বাবাও গেলেন, তাই ও এখন আমার সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে টাকাটা বাগিয়ে নিতে চাইছে। ওঁরা বেঁচে থাকলে জোচ্চুরিটা ধরে ফেলতেন।

—এ রকমভাবে টাকা চায়, আমি আগে কখনো শুনিনি।

—লোকটা অতি নীচ। মানুষের এমন নীচতা আমি সহ্য করতে পারি না। যারা অন্যকে ঠকিয়ে নিজের সুখ চায়, তারা নরকের কীট।

—তুমি বেশি রেগে যাচ্ছো।

—রাগব না? ও আমাকে এমন বোকা ভেবেছে!

—তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো ব্যাপারটা।

—কাগজে খবরটা দেখেই লোকটা মনে মনে এই মতলব ভেঁজেছে। কিন্তু আমার ঠিকানা পেল কী করে?

—কাগজের রিপোর্টেই তো ছিল।

—কাগজে আমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল? না তো!

—ছিল না?

অমিয়র বাবা বিখ্যাত লোক ছিলেন না। তবু তাঁর মৃত্যু সংবাদ ও ছবি ছাপা হয়েছিল প্রায় সব খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। স্কুল মাস্টারি থেকে রিটায়ার করেছিলেন, সাতষট্টি বছর বয়েসে, তাঁর স্বভাব ছিল রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ান। কেন যে তিনি ভোরবেলা রাজভবনের সামনে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। ওই সময় রাস্তা ফাঁকা থাকে তবু তিনি গাড়ি চাপা পড়লেন। কলকাতায় প্রত্যেক দিনই দু-তিনজন গাড়ি চাপা পড়ে মরে, খবরের কাগজে তারা এক লাইন দু লাইন স্থান পায়, কিন্তু ভক্তিপদবাবু চাপা পড়েছিলেন স্বয়ং রাজ্যপালের গাড়ির নিচে। সে গাড়িতে রাজ্যপাল তখন ছিলেন, না ছিলেন না, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু মুমূর্ষু ভক্তিপদবাবুকে রাজভবনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। সেই জন্যই রিপোর্টারদের হুড়োহুড়ি। কয়েকজন রিপোর্টার এসেছিল অমিয়র কাছে। তার রি-অ্যাকশান জানতে।

ভক্তিপদ মৃত্যুর আগে বড় ছেলের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু এ বাড়িতে তিনি থাকতেন না। অমিয়র ছোটো ভাই থাকে বেহালায়, মা-বাবা সেখানেই থাকতেন। বুলার সঙ্গে বিয়েটা মা ঠিক মেনে নিতে পারেন নি।

বাবা নিজেই অমিয়কে বলেছিলেন, বেহালার বাড়িতে জায়গা এত কম, এখানে তুই নতুন বউকে নিয়ে কী করে থাকবি। একটা ফ্ল্যাট দেখে নে—যাওয়া আসা তো থাকবেই।

মৃত্যুর আগে ছ মাস বাবার সঙ্গে দেখাই হয়নি অমিয়র। শ্রাদ্ধের পর একুশ দিন কেটে গেছে, আজ সেজন্য একটু অনুতপ্ত বোধ করল অমিয়।

বুলা বলল, শনিবার লোকটা আসবে, তুমি কী বলবে?

অমিয় রুক্ষ গলায় বলল, দরজা থেকে ভাগিয়ে দেব। কিংবা আমি দেখা করব না, তুমি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিও। এই রকম লোভী লোকদের দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়, হয়ত একটা থাপ্পড়ই মেরে বসব।

একটু বাদে, বাইরে বেরুবার জন্য যখন তৈরি হচ্ছে বুলা, অমিয় আবার উত্তেজিতভাবে বলল, আর একটা কথা মনে পড়েছে। আমার বাবা আমাদের দেশের বাড়িতে লাস্ট গিয়েছিলেন নাইনটিন ফর্টি এইটে, তা হলে ফর্টি নাইনে কী করে বাবা ধার করে লেপ কিনবেন? লোকটা তা হলে কী রকম জোচ্চোর বুঝে দ্যাখ!

বুলা স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল অমিয়র দিকে। তারপর বলল, তুমি বরং একটা চিঠি লিখে লোকটিকে আসতে বারণ করে দাও। তোমার যা মেজাজ দেখছি!

—শোন, আমার বাবার জন্য আমি দু-তিন শো টাকা নিশ্চয়ই খরচ করতে পারি কিন্তু কেউ একজন ঠকিয়ে নেবে...

—চিঠি লেখ।
—অন্ধকারের মধ্যে কী করে চিঠি লিখব? সন্ধের পর কি বাড়িতে ফিরে কোনো কাজ করার উপায় আছে?
—আমাকে এমন ধমকাচ্ছ কেন, অন্ধকারের জন্য কি আমি দায়ি?
রাত্তিরবেলা বাইরে থেকে ওরা যখন ফিরল, তখন রাত সোওয়া এগারোটা, বিদ্যুৎও তখনই এসেছে।
জুতো-টুতো না খুলেই চিঠি লিখতে বসে গেল অমিয়।

সবিনয় নিবেদন,

আমার বাবার কোনো বড় ভাই ছিল না। অচেনা কোনো লোক আমার কাছে নিজেকে যদি জ্যাঠা বলে জাহির করে, তাও আমি মোটেই পছন্দ করি না। পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে আমাদের একটি পৈতৃক বাড়ি ছিল বটে কিন্তু সে বাড়ি বা গ্রাম আমি চোখে দেখিনি। সেই গ্রাম সম্পর্কে আমার কোনো দুর্বলতা থাকারও কারণ নেই। আমার বাবা শেষবার দেশে গিয়েছিলেন, উনিশ শো আটচল্লিশ সালে, তার পরের বছরেও তিনি আপনাদের দোকান থেকে কী ভাবে ধারে জিনিসপত্র কিনলেন তা আমার বুদ্ধির অতীত। আমার জন্যে আগেকার সময়ের ধার শোধ করতে আপনি আমায় কেন বলছেন, তাও বুঝতে পারলুম না। আমার বাড়িতে আপনার আসবার কোনো প্রয়োজন নেই।

নমস্কারান্তে
অমিয় মজুমদার

শেষ করার পর চিঠিটা দুবার পড়ল অমিয়। যথেষ্ট কড়া হল না। কিন্তু মুখের কথায় যত রাগ আসে, লিখতে গেলে তা অন্যরকম হয়ে যায়। দুটো ভাষা যে আলাদা।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর বুলা বলল, এবারে কয়েকদিন তোমার মাকে নিয়ে এসে এখানে রাখ। বেহালার বাড়িতে সব সময় ওই স্মৃতির মধ্যে...

—মাকে তো অনেকবার বলেছি। মা আসতে চায় না। বেহালার বাড়িতে কতগুলো গাছ পুঁতেছে তো, যদি অন্য কেউ জল না দেয়...মা এখন মানুষের চেয়ে গাছপালাদের বেশি পছন্দ করে—

—কদিন না হয় আমি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি।

অমিয় কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে বলল, তার মানে?

বুলা স্বাভাবিক গলাতেই উত্তর দিলো, আমি না থাকলে তখন উনি আসতে পারেন। তুমি তো বেহালায় যাবার সময় পাও না, উনি এখানে এসে থাকলে তবু তোমার সঙ্গে কথা-টথা বলতে পারবেন। সেটা এ সময় খুব দরকার।

—তুমি থাকলে আসবেন না, তুমি না থাকলে আসবেন, এর মানে কী?

—আমি না থাকলে তোমার দেখাশোনার জন্যও তো উনি আসতে পারেন।

—আমার মা তোমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেছেন?

—না, খারাপ ব্যবহার কখনো করেননি। বরং দু এক সময় এত বেশি ভালো ব্যবহার করেন যে আমার লজ্জা করে।

—তা হলে, তুমি কী বলতে চাও?

—উনি আমাকে পছন্দ করেননি, এখনো করেন না। সে তো হতেই পারে। সবাই সবাইকে ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেই। আমি তোমার মাকে খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু কোনোদিন কি খারাপ ব্যবহার করেছি?

অমিয় হঠাৎ চুপ করে গেল। তার মনে পড়ল বাবার মুখ। বাবা বুদ্ধিমান ছিলেন, মা আর বুলার মাঝখানের এই ফাটলটা বাবা বুঝতেন, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ থাকতেন। এখন প্রায়ই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এর মধ্যে একদিনও অমিয় বাবাকে স্বপ্নে দেখেনি।

কয়েকদিন পরেই চিঠিটার উত্তর এল।

স্নেহের বাবাজীবন অমিয়,

এই শনিবার আমি তোমার বাটিতে যাইতে পারি নাই তাহার কারণ পূর্বরাত্রে, অর্থাৎ শুক্রবার আমার জ্বর আসিল। টেম্পারেচার তেমন বেশি নহে, এক শতের মধ্যেই, কিন্তু সর্বাঙ্গ বেদনা। তবু যাইতে পারিতাম কিন্তু বড় ঝড়-বৃষ্টি হইল। সোদপুরের এ বাটি হইতে সাইকেলরিকশা যোগে স্টেশনে যাইতে হয়। রাস্তা ভালো নহে, ঝড় বৃষ্টিতে খুবই অসুবিধা। ট্রেনেরও কী যেন গোলযোগ ছিল। এইসব কারণে যাওয়া হইল না। তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার পত্রের মর্ম ভুল বুঝিয়াছ পিতৃঋণ কখনো রাখিতে নাই। পিতার যাবতীয় ঋণ যে পুত্র শোধ করিয়া দিয়া যায়, সে পুত্র মহাপুণ্যবান হয়। আমার দোকান হইতে তোমার বাবা-কাকারা ধারে যাহা খরিদ করিয়াছিলেন, তাহা তোমারই বংশের ঋণ। সংবাদপত্রে দেখিলাম তুমি চাকুরি ভালোই করিতেছ। সুতরাং পিতার এই সামান্য ঋণের বোঝা

তুমি সানন্দে মস্তকে পাতিয়া নিবে, তাহাই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছ নিশ্চয়, তিরিশ বৎসরের অধিক সময় পার হইলেও আমি সেই অর্থের কোনো সুদ চাহি নাই। চক্রবৃদ্ধি হারে ধরিলে কত টাকা হইতে পারিত, তাহা তুমি ভালোই বুঝিবে। কিন্তু সেরূপ আমি চাহিতে পারি না, তোমরা আমার স্নেহের ধন। যাই হউক, আমি আগামী রবিবার, ইং ১৪ তারিখে অবশ্যই তোমার বাসায় যাইব। তুমি টাকার জোগাড় রাখিও। দুই শত বত্রিশ ও একান্ন, একুনে দুইশত তিরাশি দিলেই তুমি দায়মুক্ত হইবে।

তোমার পিতা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সেই সূত্রে আমি তোমার জ্যেঠা। বৌমা ও নাতি নাতনিদের আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও।

ইতি
হরিনাথ পাইন

আজও অফিস থেকে ফিরে অন্ধকারের মধ্যে বসে লণ্ঠনের আলোয় অমিয় পড়ল চিঠিটা, সঙ্গে সঙ্গে তিরিক্ষি হয়ে গেল তার মেজাজ।

বুলা চিঠিটা আগেই পড়েছে। আজ কোনো কারণে তার মনটা বেশ ফুরফুরে আছে। অফিস থেকে ফিরেই সে নতুন ধরনের কিছু একটা রান্নার জোগাড়-যন্তর করছে।

বুলা বলল, তোমার এই বুড়ো কিন্তু মহা ঘুঘু। কী কায়দায় চিঠিটা লিখেছে দেখেছ?

অমিয় চেঁচিয়ে বলল, ওল্ড সোয়াইন! শনিবার আসতে পারেনি বলে লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে, অথচ আমি ওকে আসতে বারণ করেছি।

—তোমাকে পুণ্যের লোভ দেখিয়েছে। তুমি এতবড় একটা পুণ্য করার সুযোগ পাচ্ছ, উনি তো তোমার উপকারই করছেন!

—কত বড় শয়তান! যারা এই রকম ধর্মের দোহাই দেয়, তারা নিজেরা যে কত পাপ করে।

—যাই বলো, ভদ্রলোকের হাতের লেখাটি সুন্দর, আগেকার দিনের মতন টানা টানা, বেশ গুছিয়ে লিখতে পারেন। একটা কথা ঠিকই লিখেছে, গ্রাম সম্পর্কে সবাই সবাইকে খুড়ো-জ্যাঠা বলে। তোমার বাবা ওকে দাদা বলে ডাকতেন, সেই সূত্রে উনি তো তোমার জ্যেঠা হতেই পারেন।

—তুমি কী করে জানলে? তুমি তো কখনো গ্রামে থাকনি।

—এটা সবাই জানে।

—ব্যাটা মুদি আবার আমাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ভয় দেখিয়েছে! আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, পুরো ব্যাপারটাই ভাঁওতা। কোনো রকমে ব্যাটা আমাদের গ্রামের নাম আর বাবা-কাকার নাম জেনেছে।

—তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো, উনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

—হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ অফিসে খোকন এসেছিল, ওকে বলতে ভুলে গেলুম।

—খোকন এসেছিল? কী বলল?

—এমনিই...বিশেষ কিছু না...মা এখন কান্নাকাটি কম করছে, অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

—খোকনকে বলনি, মাকে কিছুদিনের জন্য এ বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে?

—না বলিনি।

অমিয় উঠে চলে গেল জামাকাপড় ছাড়তে। রান্নাঘরের গ্যাস স্টোভের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বুলা। আর মুখে মৃদু মৃদু হাসি। স্বামী-স্ত্রী দুজনের সংসার, দুজনেই চাকরি করে। বাসন মাজা, কাপড় কাচার একজন ঠিকে লোক আছে শুধু সর্বক্ষণের লোক পাওয়া যায়নি। অফিস থেকে ফিরে এক একদিন বুলার রান্না করতে ইচ্ছে করে না। আবার এক একদিন বেশ রান্না নিয়ে মেতে থাকে। অমিয় তাকে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে আলু কেটে সাহায্য করে।

অমিয় আবার রান্নাঘরে এসে বললে, আর একখানা কড়া চিঠি লিখে দিই, কী বলো? রবিবারে যদি সত্যিই লোকটা আসে, আমি মেজাজ সামলাতে পারবো না।

বুলা বলল, আসুক না, লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।

—কুটিল, নীচ টাইপের লোকদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

—আমার কিন্তু বুদ্ধিমান বদমাশদের দেখতে বেশ লাগে। আসুক না লোকটা। সেদিন আমাদের দরজার কাছটায় সাবান জল ছড়িয়ে রাখব, যাতে এসেই ও আছাড় খেয়ে পড়ে।

বুলা বেশ শব্দ করে হেসে উঠল। অমিয় বলল, তুমি হাসছো, কিন্তু আমি ব্যাপারটা একেবারে সহ্য করতে পারছি না!

বুলা আরও জোরে হেসে বলল, নাতি-নাতনিদের আশীর্বাদ...হো-হো-হো।

বিয়ের আগেই ওরা ঠিক করেছিল, প্রথমে তিন বছর ওরা কোনো বাচ্চা-কাচ্চা চায় না। তারপর একটু গুছিয়ে নিলে সে সম্পর্কে ভাবা যাবে। দু মাস আগে ওদের তৃতীয় বিবাহ-বার্ষিকী উদ্যাপিত হয়ে গেছে।

অমিয় বুল্যর পিঠে হাত রাখল।

বুলা মুখ ফিরিয়ে বলল, আজ তোমায় একটা ভালো খবর দেব।

বুকটা কেঁপে উঠল অমিয়র। অনেক গল্প উপন্যাসে এই রকম সিচুয়েশানে এইরকম সংলাপ পড়েছে সে। সিনেমাতে দেখেছে। এই কথার একটাই অর্থ হতে পারে।

গল্পের চরিত্রের মতনই কণ্ঠস্বরে খানিকটা অতিরিক্ত আবেগ এনে, বুলাকে দু হাতে ধরে, নিজের দিকে টেনে এনে বলল, সত্যি? বুলা, সত্যি?

বুলা হাসতে হাসতেই বলল, তুমি কি ভাবলে বলো? না, না, তা নয়।

—তবে? কী ভালো খবর?

—আজ একটা ইনভার্টারের অর্ডার দিয়েছি। ব্যাটারি সমেত সবসুদ্ধু পড়বে চব্বিশ শো টাকা। বেশ সস্তা নয়? তাও ইনস্টলমেন্টে দেয়া যাবে। আমাদের অফিসের এক কলিগ এজেন্সি নিয়েছে। অনেক কমিশন পাওয়া গেল। দু দিনের মধ্যেই এসে যাবে।

কোথায় যেন বিরাট শব্দে একটা বজ্রপাত হল। কেউ যেন সজোরে এক থাপ্পড় কষিয়েছে অমিয়র মুখে।

বুলাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিষ্প্রাণ, বিবর্ণ গলায় বলল, তুমি অর্ডার দিয়েছ? ও!

—হ্যাঁ, দেখেছ তো অবস্থা। প্রত্যেকদিন দশ-বারো ঘণ্টা লোডশেডিং। সারাদিন খাটাখাটুনির পর বাড়িতে এসে...অন্ধকার...পাখা নেই, কোনো কাজ করা যায় না। তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে...তাই দেখলুম যখন অনেকটা কনসেশানে পাওয়া যাচ্ছে।

—দ্যাখ, চায়ের জল ফুটে গেছে।

—এতে তিনটে আলো-পাখা চলবে। বুঝলে, আমাদের তো তার বেশি দরকার নেই...পাখা ছাড়া আমি একদম ঘুমতে পারি না, কদিন ধরে এমন গুমোট চলছে...কালকে জানো তো, ভোর চারটেয় কারেন্ট চলে গেল, অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল, তুমি তো কিছু টেরও পাওনি!

—তাই বুঝি?

—তুমিও অফিস থেকে ফিরে লেখাপড়ার কাজ করতে পারবে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বুলা তার স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে রইল। অমিয় তখন রান্নাঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত।

বুলা বলল, শোনো। কী ব্যাপার বলতো? তুমি হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে? খবরটা শুনে তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে? বউয়ের টাকায় ইনভার্টার কেনা হচ্ছে তোমার মনে লেগেছে নাকি?

—আরে না, না।

—আমার টাকা আর তোমার টাকা আলাদা?

—কী ছেলেমানুষি কথা বলছ! ওরকম বোকা বোকা চিন্তা আমার মাথায় কখনো আসে না। সত্যি বেশ সস্তায় পেয়েছ। আমার ধারণা ছিল তিন হাজার টাকার কমে হয় না। সেইজন্যই তো আমি কিনতে ভয় পাচ্ছিলুম, তা ছাড়া শ্রাদ্ধের জন্য বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল।

—এটা ইনস্টলমেন্টে পাচ্ছি, এটুকু বিলাসিতা আমরা করতে পারি।

—মোটেই বিলাসিতা নয়...সন্ধে হলেই অন্ধকার, এইভাবে আধুনিককালের সভ্য মানুষ বাঁচতে পারে?

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অমিয়। তারপর খাটে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। তার মনের মধ্যে একটা প্রবল যাতনা হচ্ছে। এখন বুলার সঙ্গে গল্পে করলেও এই কষ্টটা দূর করা যাবে না। অথচ একলা একলা শুয়ে থাকলে কষ্টটা বাড়বে। ট্রানজিস্টার নিয়ে সে কাঁটা ঘোরাতে লাগল।

এক সময় তার ইচ্ছে হল আছাড় মেরে রেডিওটা ভেঙে ফেলতে। সে ইচ্ছে দমন করে সে নিজেই শিস দিয়ে একটা গান বাজাতে লাগল।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটা সূক্ষ্ম বোঝাপড়া থাকে। আবার এমন কিছু কথাও থাকে, যা এত কাছের দু জন মানুষও পরস্পরকে বলতে পারে না।

পরদিন সকালবেলা বাথরুম থেকে বেরিয়েই বুলা বলল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল ইনভার্টারের কথা শুনেই তুমি কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে। কী হয়েছে বলো তো? ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হয়নি? এখনো অর্ডারটা ক্যানসেল করে দিতে পারি।

—আরে না, না, পছন্দ হবে না কেন? রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে গরমে ঘামছিলুম, একটা ইনভার্টার তো আমাদের সত্যি এক্ষুনি দরকার, এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে যখন।

—বাজে কথা বলো না! তোমার কী হয়েছে সত্যি করে বলো তো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিয় বলল, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই একটু খারাপ লাগছিল।

—কী কথা আমাকে বলা যায়?

—হ্যাঁ, বলা যাবে না কেন?

—তবে কেন কালকে বললে না তক্ষুণি।

—তুমি তখন খুব খুশি মুডে ছিলে।

—এখন জানতে পারি?

ব্যাপারটা হয়েছে কী, বছরখানেক আগে খোকনের ছেলের মুখেভাতে বেহালার বাড়িতে গিয়েছিলুম মনে আছে?

—আমার অফিসে অডিট ছিল বলে আমি সকালবেলা ঘুরে এসেছিলুম। তুমি দুপুরে খেতে গিয়েছিলে।

—হ্যাঁ, তাই হবে। অসহ্য গরম ছিল সেদিন। আমাদের বেহালার বাড়িটা জান তো, একতলা, তিনদিক চাপা, একদম হাওয়া ঢুকতে চায় না। যে দিন গুমোট থাকে, সে দিন আর ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায় না। বাবার একটু হাঁপানির টান ছিল। সেই গরমে একেবারে দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা...সেদিন একটা ইনভার্টার কেনার কথা উঠেছিল..। তা হলে বাবা-মা রাত্তিরে অন্তত একটু ঘুমোতে পারতেন।

—কিনে দাওনি কেন?

—খোকন বলেছিল ইনভার্টার মেশিনটা জোগাড় করবে, আমি ব্যাটারিটা পাঠিয়ে দেব...তারপর খোকন আর আমায় মনে করিয়ে দেয়নি।

—একথা তো তুমি আমাকে বলনি। তা হলে আমি মনে করিয়ে দিতুম।

—বলিনি, তাই না? ভুলেই গিয়েছিলুম...সেদিন মা বলেছিলেন, তোর বাবা গরমের চোটে মাঝরাত্রে উঠে বসে থাকে। ভোর হতে না হতেই উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। হাঁপানি রোগীর গরমে বড় কষ্ট...আমার কি মনে হয় জান, বুলা ওই যে সেদিন বাবা অত ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, তাও ওই গরমের জন্য বোধহয়।

—শুধু ব্যাটারি কেন, পুরো ইনভার্টারটাই তোমার কিনে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা ধার করেও কিনে দিতে পারতুম।

—উচিত তো অনেক কিছুই থাকে, আবার অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠে না। এই সব ভুলের জন্য আমাদের আত্মগ্লানি হয়, কিন্তু স্ত্রীর কাছ থেকে কোনটা উচিত কোনটা উচিত নয়, তা শুনতে ভাল লাগে না।

—এই ব্যাপারটা যদি তুমি সেই এক বছর আগেই আমায় বলতে, তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত নিশ্চয়ই।

—তা ঠিক। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট।

—তা হলে কি আমাদেরটা এখন কেনা উচিত নয়?

—না, না, না, এসব ন্যাকামির কোনো মানে হয় না যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মানুষ বর্তমান নিয়ে বাঁচে।

—তোমার মা-কে কিছুদিন এখানে এনে রাখ। এই গরমে উনি তবু একটু আরাম করতে পারবেন।

হঠাৎ বুলার ওপর চটে গেল অমিয়। বুলা কেন যে এই কথাটা বারবার বলে!

রবিবার সকালে চা খাওয়ার পর বুলা বলল, আজ কিন্তু সেই ঘোড়েল বুড়োটি আসবে। তোমার মার কাছে গিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করে এলে না?

অমিয় চমকে উঠল। এই ক দিন নানান কাজে সে ওই চিঠির প্রসঙ্গ ভুলেই গিয়েছিল, মায়ের সঙ্গেও দেখা করা হয়ে ওঠেনি। বেহালায় যাতায়াত করাও কম ঝামেলা নয়।

অমিয় বলল, আমি এক্ষুনি কেটে পড়ছি বাড়ি থেকে। তুমি ম্যানেজ করো।

বুলা বলল, আমি কী কথা বলব? আমি তোমাদের গ্রামের কথা কিছুই জানি না।

—আমিই বা কী জানি! কোনোদিন দেখিনি, শুধু গল্প শুনেছি। তবে আই অ্যাম শিওর, লোকটা মিথ্যেবাদী। বাবা তো কোনোদিন আমায় কোনো পুরনো ধারের কথা বলেননি। এইরকম একটা স্বার্থপর, লোককে দেখলে আমি যদি বেশি মেজাজ খারাপ করে ফেলি, সেটা কি ভালো হবে?

—কিন্তু আমি ওকে কী করে ট্যাক্‌ল করব বলো তো?

—তুমি বলে দিও, সামনের রবিবার আসতে, এর মধ্যে আমি সব খবর নিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু অমিয় বেরুবার আগেই দরজায় বেল বাজল। দরজা খুলল বুলা। এবং সে কিছু বোঝবার আগেই এক বৃদ্ধ এই যে বউমা, নাও বলেই তার হাতে তুলে দিলেন একটা মিষ্টির হাঁড়ি।

ফর্সা, ছোটোখাটো চেহারা বৃদ্ধটির। বয়েস অন্তত আশি তো হবেই। পরিষ্কার সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, হাতে একটি রুপো বাঁধানো লাঠি। দেখলে গ্রাম্য মুদি বলে মনে হবার কোনো উপায় নেই। সঙ্গে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে। তার হাতে একটি পাকা কাঁঠাল।

ভেতরে ঢুকেই বৃদ্ধ বললেন, এইটি আমার নাতনি, সঙ্গে আনলাম, আইজ কাল তো একা একা চলাফিরা করতে পারি না। ওরে পুষ্প, কাঁঠালটা নামাইয়া রাখ, প্রণাম কর, প্রণাম কর, কই, বাবাজীবন কোথায়?

অমিয় শোওয়ার ঘরে পালাবার উদ্যোগ করছিল কিন্তু তার আগেই বৃদ্ধ ঘরে ঢুকে পড়ায় সে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সেদিকে এগিয়ে এসে বৃদ্ধ বললেন, আমার দ্বিতীয় চিঠিখান পাইছিলা নিশ্চয়? দ্যাখ, ঠিক আইলাম।

বুলা ভুরু কুঁচকে বলল, এসব এনেছেন কেন?

বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন, গ্রামের মানুষের বাড়িতে আইলাম, মিষ্টি হাতে ছাড়া কি আসা যায়? আর কাঁঠালটা আমাগো বাড়িতে হইছে। সোদপুরে বাড়ি করছি তেরো কাঠা জমি, দুইখান আমগাছ, দুইখান কাঁঠালগাছ, একখান জম্বুরা গাছও আছে—। তোমাগো দ্যাশের বাড়িতে খুব ভালো বাগান ছিল...

কিশোরী মেয়েটি এসে অমিয়কে প্রণাম করল। বৃদ্ধটি দু পা জোড়া করে অমিয়র দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন তিনিও প্রণাম প্রত্যাশী। কিন্তু বুলা কিংবা অমিয় ওসবের ধার ধারে না।

বুলা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? তুমি কোন ক্লাসে পড়?

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে অমিয়র কাঁধে হাত দিয়ে গাঢ় গলায় বললেন, তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ দেইখ্যা দুঃখ পাইছি ঠিকই, আবার আনন্দও হইছে। মরতে তো হবেই সকলেরে, তবু এমন মৃত্যু কয়জনের হয়? কোথা থিকা যাত্রা আর কোথায় শেষ। পূর্ব বাংলার গ্রামের মাটির উঠোনে জন্ম আর মৃত্যু হইল কইলকাতার লাটসাহেবের বাড়িতে। কাগজে কাগজে ছবি।

এই ধরনের কথায় নাক কুঁচকে যায় অমিয়র। লাটসাহেব? এরা কোন যুগে আছে—

কিন্তু অমিয় একজন ভদ্রলোক। একজন বুড়ো লোক বাড়িতে মিষ্টি ফিষ্টি নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আবার একটা বাচ্চা মেয়ে, এখন কড়া কথায় অপমান করা যায় না। সে গম্ভীরভাবে বলল, আপনি বসুন, আগে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক।

বৃদ্ধ উদারভাবে বললেন, না, না, কাজের কথা কিছু নাই। অমনিই দেখা করতে আইছি। আমার বড় ছেলে তোমার চিঠিখানা পড়েছে। সে আমারে কইল, বাবা, আপনে...

মাঝপথে বাধা দিয়ে অমিয় বলল, খাতাপত্র কিছু এনেছেন?

—কিসের খাতাপত্তর?

—আপনাদের দোকানের হিসেবের খাতা? আমার বাবার কোনো সই আছে? উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমি আপনাকে বিশ্বাস করব কী করে? যে কেউ এসেই তো টাকা চাইতে পারে।

বৃদ্ধ চোখ বুজে, মুখে চুক চুক করে বললেন, আমি কি তোমারে মিথ্যা কমু? আমাগো সে সম্পর্ক না।

—দেখুন আপনাকে আমি চিনি না। আমাদের গ্রাম আমি কখনো চোখে দেখিনি। বাবার কাছে কোনো ঋণের কথাও আমি শুনিনি। আমার মা হয়তো কিছু জানতে পারেন, তাঁর কাছে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়নি এখনো—

—তোমার মায় কোথায়? কেমন আছেন তিনি?

—মা অন্য জায়গায় থাকেন, ভালো আছেন। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলে আমি আপনার দাবি মেনে নিতে পারব না।

—শোনো, তাহলে তোমারে বুঝাইয়া কই।

এরপর বৃদ্ধ অনেকখানি কথা বলে গেলেন। তার মর্ম হচ্ছে এই যে, শুধু এক গ্রামে নয়, প্রায় কাছাকাছি বাড়ি ছিল অমিয়র পূর্বপুরুষদের এবং এই বৃদ্ধদের। এদের বেশ বড় মুদিখানা ছিল, তিন চারখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র দোকান। অমিয়র বাবা কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, সেই সময় দেশে তাঁদের পরিবারের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দামও খুব বেড়ে যায়। দেশের বাড়িতে সেই সময় অমিয়র ঠাকুরদা, ঠাকুমা আর বিধবা পিসিমা থাকতেন। ধারে জিনিসপত্র না কিনে তাঁদের বেঁচে থাকার কোনো উপায় ছিল না। তারপর তো দেশ ভাগ হয়ে গেল, অনেক ডামাডোল শুরু হল।

অমিয় বলল, আমার বাবা সেই ধার এতদিন শোধ করেননি।

—শোনো, বাবা, আমরা দুই পরিবার ছিলাম অনেকখানি আপনা-আপনির মইধ্যে। সেই বাজারে আড়াই শো তিন শো টাকা মানে অনেক টাকা। এখনকার দুই তিন হাজার তো হবেই। অত টাকার-মাল কেউ কি বাকিতে দেয়? আমি পনেরো কুড়ি টাকার বেশি হাওলাৎ দিতাম না কারুরে। তোমার বাবারে আমি ছুটো ভাইয়ের মতন দ্যাখতাম।

যুদ্ধের শ্যাষ দিকে সে বেতন পায় নাই, বড় কষ্টের মধ্যে আছিল, তবু আমি জানতাম, সে সৎ মানুষ, ভগবানে বিশ্বাস করে, সে আমারে কোনোদিন ঠকাইতে পারবে না। তার সাথে আর দেখা হইল না, সবই তো দূরাদৃষ্টি! ওই ল্যাপের কথা আমি লেখছি, তুমি সেই ল্যাপের কথা জান?

বুলা কিশোরী মেয়েটিকে জল খাবার দিয়ে আর একটা প্লেট নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জিজ্ঞেস করলো, ল্যাপ মানে?

অমিয় বলল, লেপ। শীতকালে গায়ে দেবার।

বৃদ্ধ বললেন, তোমার ঠাকুরদারে আমরা সকলডিই বড় খুড়া কইতাম! তুমি দ্যাখছো তোমার ঠাকুরদারে? ও না, তোমার জন্মের আগেই তো তিনি গত হইছেন। খুব উঁচাদরের মানুষ আছিলেন বড় খুড়া। যেমন সইত্যবাদী আর তেমন রাগী। তেনার কথা কইতে গেলে অনেক কইতে হয়। যাই হউক, তোমার বাবা যখন শ্যাষবার দ্যাশে গ্যালেন...

—নাইনটিন ফট্টি এইট।

—সেই সময়ে তোমার ঠাকুরদার একেবারে যায় যায় অবস্থা। নিউমোনিয়া হইছিল। খবর পাইয়্যা তোমার বাবায় তারে দ্যাখতে গেল। কবিরাজে জবাব দিয়া দিছে, চিকিৎসার কিছু নাই, তোমার বাপে তবু চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তার নিজেরও তখন চাকরি নাই, অনেক কষ্ট কইর‍্যা দ্যাশে আইছে। মরার দুইদিন আগে তোমার ঠাকুরদার সে কি কাঁপুনি। থর থর কইর‍্যা কাঁপে আর চিখরায়, শীত, মলাম রে, বড় শীত! উঃ, উঃ, বড় শীত! বাড়িতে কাঁথা-কম্বল যত ছিল সব চাপা দিল, তবু শীত যায় না। এক সময় বড় খুড়া কইলো, ভক্তি, আমারে নতুন ল্যাপ আইন্যা দে। লাল রঙের ল্যাপ। আমার শীত করে, আমারে বাঁচা, আমারে লাল ল্যাপ দে! তখন ভক্তিপদ দৌড়াইয়া আইল আমার দোকানে, কইল কি, হরিদাদা, যামন কইরা পারো আমারে একটা লাল ল্যাপ দাও। আমার বাবার শেষ সাধ, এ না মিটাইলে আমি নরকে যামু। আমার কাছে টাকা নাই, হরিদাদা, তুমি একখান লাল ল্যাপ দাও। আমি যেমন কইর‍্যা পারি, তোমারে এই টাকা শোধ দিমু! আমি কইলাম, ওরে ভক্তি, তোর বাপে শীতে কষ্ট পায়, তিনি আমাগো বড় খুড়া, তার জন্য ল্যাপ দিমু না, নিশ্চয় দিমু। লাল ল্যাপ তো এস্টকে ছিল না, তয় লাল কাপড় আছিল, এক ঘন্টায় ল্যাপ বানাইয়া দিলাম। সে ল্যাপ তোমার ঠাকুরদা গায় দিছে, গায় দিয়া কইছে, আঃ বড় আরাম, তারপর মরছে।

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। এমনিই নিস্তব্ধতা যে পাখা ঘোরার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায়।

গলা পরিষ্কার করে অমিয় বলল, বহুদিন আগেকার কথা, এর মধ্যে বাবা সেই ধার শোধ করার চেষ্টা করেন নি? আপনাদের তো আর যোগাযোগ হয়নি?

বৃদ্ধ বললেন, তার দোষ নাই, এর পরের সনেই পাকিস্তানে বড় রকম গোলমাল শুরু হইল, আমার দোকানে আগুন লাগাইয়া দিল, আমার বড় ছেলে মারা গেল, আমরা দ্যাশ ছাইড়া পালাইলাম। কে কোথায় গেল তার ঠিক নাই। আমরা গিয়া ঠ্যাকলাম ফুলিয়ায়। তোমার বাবা কোথায় থাকেন তাও জানি না, সেও জানে না আমরা কোথায়।

বুলা চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল অমিয়কে। অমিয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে ক্যাশ দিতে পারছি না, চেক দিয়ে দিচ্ছি।

খপ করে অমিয়র হাত ধরে বৃদ্ধ বললেন, আরে না, না, সেই কথাই তো কইতে আইছি। আমার মেজ ছেলে এখন পাটের কোম্পানিতে ভালো চাকরি করে, ছোট ছেলেটিও ব্যবসায় নামছে। সোদপুরে বাড়ি করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এখন আর আমাগো অভাব নাই! তোমার চিঠিখানা আমার মেজ ছেলে দ্যাখছে। সে আমারে খুব বকল। কইল কি, বাবা, আপনে এতদিন পরেও ওই সামান্য টাকার জন্য মানুষরে বিরক্ত করতে আছেন? ছি ছি! আপনি ক্ষমা চাইয়া চিঠি লেখেন। আমি যত কই যে আমি শুধু টাকার জন্যই চিঠি লিখি নাই, তা সে শোনে না। পুতের বউ সেই কথাই কয়। তাই তোমার কাছে আজ আইছি।

অমিয় বলল, না, না, আপনি তো ঠিক কাজই করেছেন, টাকা নেবেন না কেন?

বিপদের সময় আমাদের পরিবারকে সাহায্য করেছেন, এখন সেই ধার শোধ করা তো আমাদের কর্তব্য নিশ্চয়ই।

বৃদ্ধ বলল, না, না, না, সে টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারব না। তাইলে আমার পোলারা আমার মুখ দ্যাখবে না। তুমি ও টাকা আমারে নিতে কইয়ো না।

—আপনি আমাদের ঋণী করে রাখবেন?

—আমি দুইদিন পরে মইর‍্যা যামু, আমার কাছে আর ঋণ কি! ও টাকা আমি দাদুভাই আর দিদিভাইদের আশীর্বাদ হিসাবে দিয়া গ্যালাম। কই, নাতি-নাতনিরা কোথায়, তাদের দেখছি না যে?

অন্য মানুষ

সোমেন রায়চৌধুরী রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন ক্লাবে গিয়ে তিনি স্নুকার খেলেন আর তিন পেগ হুইস্কি খান। আজ এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে খেতে হয়েছে পাঁচ পেগ।

যাইহোক, তিনি সঠিক ভাবেই গাড়ি চালিয়ে ফিরেছেন বাড়িতে। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনি সদর দরজার কাছে এসে দেখলেন, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

লোকটির চেহারা তাঁর খুব চেনা চেনা মনে হল। কিন্তু ঠিক ধরতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

লোকটি দু হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সোমেন রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে, কী ব্যাপার?

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

—খুব চেনা চেনা লাগছে। ঠিক ধরতে পারছি না।

—ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো।

সোমেন রায়চৌধুরী ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন, তো বটেই। তারপর নিজের গায়ে খুব জোরে একটা চিমটি কাটলেন। তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে পড়েছেন?

লোকটিকে তিনি বললেন, আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন তো?

লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি সেটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, হুঁ, মানুষই তো বটে, ভূত-টুত নয়। এতটাই নেশা হয়ে গেল যে চোখে উলটো পালটা দেখছি? তুমি কে ভাই? কোথা থেকে এলে? আমার তো কোনো যমজ ভাই নেই?

লোকটি বলল, ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

সোমেন রায়চৌধুরী ওপরের দিকে একবার তাকালেন। তিনতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর স্ত্রী। স্বামীর ফিরতে বেশি রাত হলে রত্না বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

খানিকটা জড়ানো গলায় সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা কী জান ভাই। রাত্তিরবেলা নেশা করে ফিরি তো, তখন আমার কোনো বন্ধু-টন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে আমার স্ত্রী বড্ড চটে যান। কাল আবার অফিস আছে, তুমি বরং কাল সকালে এস।

লোকটি বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে।

সোমেন রায়চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে, না, না, যেও না। ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে যাবে, রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না। এস ভেতরে এস। এটা আমার নিজের বাড়ি। বউয়ের ভয়ে কি একটা লোককে একটু বসিয়ে কথা বলতে পারব না? এস এস—

বাবুর সাড়া পেয়ে চাকর আগেই দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। এবার দু জনকে এক সঙ্গে ঢুকতে দেখে বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো এক টাকার রসগোল্লার সাইজের গোল গোল।

সোমেন রায়চৌধুরী তার ওই অবস্থা দেখে বললেন, কীরে ব্যাটা, অমন করছিস কেন? তুইও নেশা করেছিস নাকি?

চাকরটি দৌড়ে ওপরে পালাল।

বসবার ঘরে ঢুকে, আলো জ্বেলে সে আলোয় লোকটিকে দেখে তিনি দারুণ চমকে উঠলেন। তিনি ঠিক যেন একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য লোকটির পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবিকল তাঁর মতন। পয়তাল্লিশ বছর বয়েসেই সোমেন রায়চৌধুরীর মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে, লোকটিরও তাই। তাঁর থুতনির কাছে একটা কাটা দাগ, ছেলেবেলায় ফুটবল খেলার স্মৃতি, এই লোকটিরও থুতনিতে হুবহু সেই রকম দাগ।

তিনি ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার? তুমি...আপনি... কে? আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন?

লোকটি বিনীতভাবে বলল, আপনি ভয় পাবেন না! আমি আপনার কোনো রকম ক্ষতি করতে আসি নি। আমার সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন।

সোমেন রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললেন, আমি ভয় না পেলেও আমার স্ত্রীর হঠাৎ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যদি আমাকেই চিনতে না পারে? আপনাকেই আমি ভেবে নেয়! এবার বলুন, আপনি কে? আমার মতন চেহারা পেলেন কী করে? আমি চোখে ঠিক দেখছি, না ভুল দেখছি?

লোকটি জিজ্ঞেস করল, তার আগে আমি জানতে চাই, স্ত্রী কাকে বলে?

সোমেন রায়চৌধুরী আরও অবাক হয়ে বললেন, সে কি মশাই? আপনি স্ত্রী কাকে বলে জানেন না? আপনি বিয়ে করেন নি?

—আমি বিয়ের ব্যাপারও জানি না!

সোমেন রায়চৌধুরী ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আপনি স্ত্রীর সংজ্ঞা জানতে চান? মানুষ যেমন বাড়িতে গোরু পোষে দুধ খাবার জন্য, তেমনি বাড়িতে একটি করে মেয়েছেলে রাখে বিনে পয়সায় নানারকম আনন্দ-টানন্দ পাবার জন্য। ভদ্রভাবে এরকম একটি মেয়েছেলে রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে, তার নামই বিয়ে।

পরক্ষণেই জিভ কেটে তিনি বললেন, আরে ছি ছি, নেশার ঝোঁকে কী সব আবোল-তাবোল কথা বলছি, আমার স্ত্রী এ সব শুনতে পেলেই সর্বনাশ। না শুনুন, স্ত্রী হচ্ছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে জীবন সঙ্গিনী, সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে পুরুষের সমান অংশীদার। ছেলে-মেয়ের জননী... বাড়িতে এই স্ত্রী যদি একটু ক্ষেপে থাকে মশাই, বুঝবেন যে জীবনের সব শান্তি তা হলে নষ্ট! এই যে দেখুন, আমি সামান্য দু তিন পেগ ড্রিংক করি, তার জন্যই রোজ কত রাগারাগি।

লোকটি বসে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, আপনি আসছেন কোথা থেকে? জানেন, আমি ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলাম, আমার মা বলতেন, তোর মতন আর একজনও দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন যে দেখছি, ঠিক আমার মতন আর একজন লোক? আপনি কি অন্য গ্রহ থেকে আসছেন নাকি?

লোকটি মুখ তুলে বললেন ঠিক তাই।

সোমেন রায়চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, জানেন মশাই, যত রাত বাড়ে ততই আড্ডা জমাতে বেশি ভালো লাগে। বাড়িতে একটু হুইস্কি আছে, এখন যদি সেটা নিয়ে বসা যেত, কিন্তু ওই যে, জীবন-সঙ্গিনী আছেন। এক্ষুনি জীবন সঙ্গীন করে তুলবেন। কাজের কথাটা চটপট করে বলে ফেলুন। আপনি যাত্রাদলে পার্ট করেন নাকি? ভালো মেক-আপ নিয়েছেন তো।

লোকটি বলল, আপনাদের ভাষায় যাকে নীহারিকা বলে, সেই রকম এক নীহারিকা—সাত আলোকবর্ষ দূরে, সেখান থেকে আমি আসছি।

—ওসব গাঁজাখুরি কথা ছাড়ুন। কাজের কথা বলুন।

—জানি, আমার কথা আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, তাই আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন।

সোমেন রায়চৌধুরী দেখলেন, চোখের নিমেষে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বললেন, যাঃ বাবা!

আবার ঠিক এক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল লোকটি ঠিক সেখানেই বসে আছে।

সোমেন রায়চৌধুরী খুব একটা অভিভূত হলেন না। হাই তুলে বললেন, এ তো ভেল্কি! পি. সি. সরকার এ রকম কত মানুষ অদৃশ্য করে দিয়েছে। হঠাৎ রাত্তিরবেলা আমাকে ম্যাজিক দেখাতে এলেন কেন? পয়সা-টয়সা পাওয়ার আশা নেই কিন্তু। আমি মহা কঞ্জুষ! কারকে এক পয়সা দিই না।

লোকটি বলল, আমি আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। পৃথিবীতে আমার মতন কয়েকজনকে পাঠান হয়েছে কয়েকটি পরীক্ষা চালাবার জন্য। প্রায় এক মাস ধরে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি। আপনার বাইরের জীবন মোটামুটি সব জানি। এখন আপনার বাড়ির ভেতরকার জীবনটা জানতে চাই।

—আপনি আমার সম্পর্কে কী জানেন? শুনি তো!

—আপনি স্টিফেন ব্যাককক অ্যাণ্ড কোম্পানির চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট। অফিসে সাতটা পর্যন্ত থাকেন। আপনার অফিসের চেয়ারের মাথায় একটা তোয়ালে ঢাকা থাকে। আপনি দুপুরে লাঞ্চ খেতে যান একটা চিনে দোকানে। আপনি বেশি ঝাল পছন্দ করেন।

—এ সব জানা আর শক্ত কী? এ তো আমার অফিসের বেয়ারাটাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

—ঠিক চল্লিশ মিনিট অন্তর আপনার বাঁ দিকের ভুরু কাঁপে, আপনি ইংরেজি ভাষা লেখবার সময় টি'র মাথা কাটতে আর আই এর ডট দিতে ভুলে যান। আপনি অকারণে বাথরুমে বেশি সময় থাকেন, আয়নার সামনে দাঁড়ালেই অন্যমনস্ক হয়ে যান।

—ঠিক, ঠিক।

—আপনি সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় থেকে রাত্রে ফেরার সময় পর্যন্ত আপনাকে সব জায়গায় অনুসরণ করেছি। আপনার সেই জীবন আমি সবটুকু জানি। এখন আপনার বাড়ির ভেতরের জীবনটা জানা দরকার আমার। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু, পৃথিবীর একজন মানুষের জীবন।

সোমেন রায়চৌধুরী এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি সীরিয়াস? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না তো?

—না।

—আপনি সত্যি অন্য গ্রহ থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—কত দূরে আপনাদের গ্রহ?

—আপনাদের হিসেবে পাঁচ আলোকবর্ষ দূরে।

—আপনার বয়স কত? আপনাদের ওখানে সাধারণ মানুষের বয়স কত?

—আমার বয়স তেইশ। আমাদের ওখানকার গড় আয়ু এক শো।

—দেখুন, আমিও খানিকটা লেখাপড়া জানি, সামান্য বিজ্ঞান বুঝি। আমি এটুকু বলতে পারি যে পাঁচ আলোকবর্ষের পথ তেইশ বছরের কোন ছেলের পক্ষে পেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। এক আলোকবর্ষ মানে কত মাইল দূর জান? ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল। এবার হিসেবটা করতে পারবে? আমি পারি কারণ আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট। গুল ঝাড়বার আর জায়গা পাও নি?

লোকটি তবু মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল, আমি কিন্তু আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।

—এত স্পীডে তোমাদের রকেট ছুটতে পারে? তা তোমার সেই রথখানা কোথায় রেখে এসেছ? কলকাতার গড়ের মাঠে?

—না, আমরা রকেটে আসিনি। কোনো রকেট সত্যিই এত জোরে ছুটতে পারে না। আমাদের সেরকম রকেট নেই। কিন্তু আমরা একটা জিনিস পারি, যা পৃথিবীর মানুষ এখনো পারে না। আমরা শরীরের প্রতিটি উপাদানকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। অর্থাৎ ম্যাটার থেকে এনার্জি। তারপর সেই এনার্জি মিশিয়ে দিই আলোর সঙ্গে। এই রকম ভাবে ঠিক পাঁচ বছর আগে আমাদের গ্রহ থেকে যাত্রা করে আমরা এখানে পৌঁছেছি।

—আমরা মানে?

—আমরা একশো জন ছাত্র এসেছি পৃথিবীতে গবেষণা করতে।

—একদম সব নেশা কাটিয়ে দিলে ভাই! এ সমস্ত কী কথা এত রাত্রে? হঠাৎ এত লোক থাকতে আমার কাছেই বা এলে কেন?

—এমনিই এক একজন মানুষকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

—এখন কী করতে চাও?

—আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি আপনার বাড়িতে সাতদিন থাকতে চাই। আমি অদৃশ্য হয়েও থাকতে পারতাম। কিন্তু তাতে শারীরিক দুঃখ কষ্ট, আনন্দের অনুভূতি হয় না। সেগুলোও আমার বোঝা দরকার।

—তুমি এই চেহারায় আমাদের বাড়িতে থাকবে?

—হ্যাঁ।

যদি আমি না বলি? যদি আমার আপত্তি থাকে?

—কেন, আপনি আপত্তি করবেন কেন?

—এই বাজারে কেউ কোনো লোককে বাড়িতে রাখে? জানা নেই শোনা নেই, একটা লোককে রাখলেই হল?

—আপনার সেরকম আপত্তি থাকলে আমি চলে যাব। আমাকে আবার নতুন ভাবে কাজ শুরু করতে হবে। অনেকটা সময় নষ্ট হবে।

সোমেন রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আরে, আরে, তুমি অভিমান করলে নাকি?

—অভিমান? সেটা কী?

—তুমি অভিমান কাকে বলে জানো না? সাহেবরাও জানে না। যাই হোক, আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না। তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি? তুমি জান, আমার স্ত্রী সুন্দরী?

—আপনাদের সৌন্দর্যের ধারণা আর আমাদের সৌন্দর্যের ধারণা এক নাও হতে পারে।

—তোমাদের ওখানে কোন্ রকমের মেয়েদের সুন্দরী বলে?

—সেটা খুব জটিল ব্যাপার, আপনাকে এক্ষুনি বোঝান যাবে না।

—যাই হোক, তুমি এখন পৃথিবীর মানুষ সেজে আছ, পৃথিবীর মেয়েদের তুলনায় আমার স্ত্রীকে যথেষ্ট সুন্দরী বলা যায়। তুমি যদি আমার স্ত্রীর প্রেমে পড়ে যাও, তাহলে কী হবে?

—প্রেম?

—ও তুমি প্রেমও বোঝ না? যাই হোক, মোট কথা তোমাকে আমার স্ত্রী যে-কোনো সময় নিজের স্বামী ভেবে ফেলতে পারে। তারপর? তুমিই রত্নার স্বামী হয়ে রইলে, আর আমাকে তাড়িয়ে দিলে এমন যদি হয়? আমি কী করে প্রমাণ করব যে আমি আমিই?

—আপনার সে বিষয়ে কোনো চিন্তা নেই। আপনাদের সময়ের হিসেবে ঠিক সাতদিন বাদে আমি চলে যাব।

—তাও না হয় বিশ্বাস করলুম। কিন্তু আমার স্ত্রী কি রাজি হবে? একই বাড়িতে একজন মেয়ের দুজন স্বামী, এটা কি সমাজ মেনে নেবে?

দরজার বাইরে আওয়াজ হল, বাবু, বাবু।

ভয়ার্ত গলায় বাড়ির চাকর ডাকছে।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ওই দেখুন! ওপর থেকে ডাক এসে গেছে। রত্না ভেবেছে আমি নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুকে ডেকে এনে আবার বোতল খুলে বসেছি।

উঠে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, এই যা দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো?

কিন্তু রত্না নিজেও নেমে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে।

সোমেন রায়চৌধুরী ছুটে ফিরে গিয়ে সেই লোকটির পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললেন, এই রঘু তোর দিদিমণিকে ভেতরে আসতে বল।

রত্না দরজার সামনে দাঁড়িয়েই বলল, একি?

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ভেতরে এস, ভেতরে এসে ভালো করে দ্যাখ।

রত্না ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

সোমেন রায়চৌধুরী মজা করে বললেন, এইবার বেছে নাও তো কে তোমার স্বামী। চিনতে পারবে? মনে করো দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হচ্ছে। দময়ন্তী কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল নলকে।

রত্না এবার নিজের স্বামীর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, উনি কে?

—চিনতে পেরেছ তাহলে? দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সময় যেমন স্বর্গ থেকে দেবতারা এসেছিলেন, তেমনি ইনিও এসেছেন গ্রহান্তর থেকে। দেখ, এঁকে তোমার পছন্দ হয়? এঁর কিন্তু বয়স অনেক কম।

রত্না আবার জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? বলো না, ইনি কে?

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে নমস্কার করল রত্নাকে।

রত্নার স্বামী বললেন, ইনি আমাদের গ্রহান্তরের বন্ধু। আমি এর নাম জানি না অবশ্য। তবে ধরে নাও এর নামও সোমেন রায়চৌধুরী।

রত্না এবার সেই লোকটিকেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

লোকটি বলল, আপনার স্বামী ঠিক কথাই বলেছেন।

—একরকম চেহারা? এরকম সত্যি হয়?

সোমেন রায়চৌধুরী স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, একদম হুবহু এক চেহারা নয়? রত্না তুমি কি করে আমাকে চিনতে পারলে?

—তোমার গলার আওয়াজ শুনে।

—ওর গলার আওয়াজও তো আমারই মতন।

—কিন্তু ওর গলা শুনলেই মনে হয় উনি অচেনা কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। তোমার মতন স্বাভাবিক নয়।

—ইনি কী বলছেন জান? ইনি কয়েকদিন তোমার স্বামী হিসেবে এখানে থাকতে চান। তুমি যদি রাজি থাক, বলো, সেই সাতদিন ছুটি নিয়ে আমি অন্য কোথাও কাটিয়ে আসব।

—কী পাগলের মত কথা বলছ? খুব বেশি নেশা করেছো আজ?

—অমনি নেশার দোষ হয়ে গেল। তুমি তো নেশা করো নি? তুমি সত্যিই আমার মতন আর একটা লোক দেখতে পাচ্ছ কিনা?

—তা তো পাচ্ছি! কিন্তু কে ইনি?

লোকটি এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্য গ্রহ থেকে এসেছি, মানুষের জীবন নিয়ে কিছু গবেষণা করতে। আমি কয়েকদিন এ বাড়িতে থেকে আপনার স্বামীর মতন জীবন কাটাতে চাই।

সোমেন রায়চৌধুরী ইয়ার্কি করে বললেন, একেবারে ঠিক ঠিক আমার মতন জীবন কাটাতে গেলে, রত্নার সঙ্গে তোমাকেও ভাই এক বিছানায় শুতে হবে। আবার বকুনি খেতে হবে।

রত্না বলল, তুমি চুপ কর তো। বড্ড বাজে কথা বলছ।

—এই যে দেখছেন তো, শুরু হয়ে গেছে বকুনি।

লোকটি রত্নাকে বলল, আপনার যদি আপত্তি থাকে—

রত্না বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ কখনো হয় নাকি?

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, বেশ মজার ব্যাপার হবে কিন্তু।

লোকটি বলল, আচ্ছা তা হলে আর একটা কাজ করা যায়। ধরুন যদি আপনার স্ত্রীর মতন ঠিক এক রকম আর একজন কেউ এখানে আসে?

—আর একজন কারুকে পাবেন কোথায়? ঠিক রত্নার মতন আর একটি মেয়ে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এরকম মেয়ে শুধু পৃথিবীতে কেন, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, মহাকাশের কোথাও পাওয়া যাবে না। কী রত্না, ঠিক বলিনি?

—আঃ, তুমি সব সময় বড্ড ইয়ারকি করো।

লোকটি বলল, ধরুন যদি পাওয়া যায়।

—তা হলে কী হবে?

—তার সঙ্গে আমি স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকব, আপনারা দুজনে যেমন ভাবে জীবন কাটান, ঠিক সেটা অনুকরণ করে যাবো।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, পারবেন না। আমি বাজি রেখে বলছি, আর কোনো মেয়ে রত্নার মতন ব্যবহার করতেই পারবে না।

লোকটি দুবার শিস দিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যাশ্চর্য আর একটা কাণ্ড হল। প্রথমে আলো নিভে গেল ঘরের। রত্না ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। তখন মনে হল ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বইছে।

আবার দুটি শিসের শব্দ শোনা গেল।

অমনি আবার জ্বলে উঠল আলো। তাতে দেখা গেল, হুবহু একেবারে পায়ের শেষ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবিকল রত্নার মতন একজন নারী দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে।

সোমেন রায়চৌধুরী আর রত্না দুজনেই স্তম্ভিত। সোমেন রায়চৌধুরী ভাবলেন, এরকম ভেল্কি পি. সি. সরকারও পারতেন না।

অন্য সোমেন বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি আমাদের গ্রহের একজন ছাত্রী। আমরা দুজনে একসঙ্গে এখানে থেকে গবেষণা করব।

রত্না অপলক ভাবে তাকিয়ে রইল দ্বিতীয় রত্নার দিকে। সেও দেখছে রত্নাকে। সোমেন রায়চৌধুরী দুই রত্নাকেই দেখতে লাগলেন বারবার। তারপর বললেন, চলুন, এই খেলাটা খেলে দেখা যাক। রত্না ওকে ওপরে নিয়ে চল।

রত্না অন্য রত্নাকে বলল, আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার আলো নিভে গেল। আবার সেই রকম ঝড় বইলো। দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন আবার জ্বলে উঠল আলো।

ঘরের মধ্যে সোমেন আর রত্না ছাড়া আর কেউ নেই। তখনও রত্না আসুন বলার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে আছে। সোমেন রায়চৌধুরীও অন্য লোকটির পিঠে হাত রাখবার মত হাতটা শূন্যে তুলে রেখেছেন।

রত্না বলল, একি হল।

—তাই তো কোথায় গেল ওরা?

—একি স্বপ্ন দেখলাম?

—দুজনে মিলে কি এক স্বপ্ন দেখা যায়?

দুজনে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। বাইরে তুমুল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। এক মিনিট আগেও বৃষ্টি ছিল না। রত্না জানলার গায়ে এসে দেখল, এত বৃষ্টি যে রাস্তায় জল জমে গেছে। এত বৃষ্টি সে টের পায় নি?

সোমেন রায়চৌধুরীও রাস্তার পাশের জানলার কাছে এসে বললেন, কখন বৃষ্টি হল কিছুই জানলাম না? ওরা দুজন আবার অদৃশ্য হয়ে গেল? রাস্তার মাঝখানে ওটা কি?

—পাড়ার ছেলেরা বিশ্বকর্মা পূজো করছে। ঐ তো ঠাকুর।

—বিশ্বকর্মা পুজো তো সাতদিন পরে। আজ থেকেই...

আসলে যেটাকে মনে হয়েছিল এক মুহূর্ত, তার মধ্যেই হয়ে গেছে সাতদিন। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজনে বুঝতে পারল সেটা। মাঝখানে সাতদিনের কথা ওদের একদম মনে নেই।

ওপরে এসে ওরা দেখল, পাশের ঘরে দুটি আলাদা খাট বিছানা পাতা, বাথরুমে দুটি অতিরিক্ত টুথব্রাস। আরো অনেক চিহ্ন ছড়ান। সত্যি তা হলে আরও দুজনে এসেছিল এখানে। কিন্তু ওরা কিছুই মনে করতে পারছে না।

বিছানার ওপরে দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, সাতটা দিন নিশ্চয়ই কেটে গেছে রত্না। আমি কেমন যেন টের পাচ্ছি। মানুষ হিসেবে আমি যেন খানিকটা বদলে গেছি। নিজেকে অন্য মানুষের মতন লাগছে। তোমার মনে হচ্ছে এরকম?

রত্না ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ঘুম জাগরণ

এক সময়ে যে এখানে একটা বেশ বড় নদী ছিল, তা এখনো বোঝা যায়, যদিও নদীর চিহ্ন বিশেষ নেই। অনেকখানি ঢালু খাত, সেখানে এখন সর্ষের চাষ হচ্ছে, হাওয়ায় দুলছে অজস্র সর্ষে ফুল।

তাপস হাত বাড়িয়ে বলল, এইখান থেকে ওই পর্যন্ত নদীটা চওড়া ছিল, বুঝতে পারছিস? ওই যে ওপাশের অশ্বত্থ গাছটা, তার ধার পর্যন্ত।

ঢালু জমি দেখে অনুমান করা যায়। তবে জল নেই কোথাও। এরকম মরা নদী আমি আগে কখনো দেখিনি। কি রকম যেন একটু দুঃখ হতে লাগল। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীটা এরকমভাবে মরে গেল কি করে?

তাপস বলল, কত নদীই তো মরে যায়। অনেক নদী দিক পাল্টায়। এটাও সে রকমই।

—বর্ষাকালেও জল হয় না?

—হয় একটু একটু। সে তো পুকুর বা খানা ডোবাও বৃষ্টির জলে ভরে যায়। কিন্তু এটার আর স্রোত নেই। দুদিন বাদে মাটি ভরাট হয়ে গেলে সেটুকু জলও জমবে না।

দূরের মাঠে কয়েকজন চাষিকে দেখা যায়। এ ছাড়া আশেপাশে আর লোকালয় নেই। আছে শুধু একটা বিরাট বাড়ি। প্রাসাদই বলা যায়।

বাড়িটার বয়েসও বেশি না। সত্তর আশি হবে বড় জোর। মানুষের পক্ষে এই বয়েসটা যথেষ্ট হলেও একটা বাড়ির পক্ষে কিছু না। এখনো বেশ শক্ত সমর্থ আছে। প্রত্যেক ঘরের জানলায় নীল কাচ বসানো হয়েছিল তৈরির সময়, তার মধ্যে অনেক কাচ আজও অক্ষত।

বাড়িটা তৈরি করেছিলেন তাপসের ঠাকুরদার বাবা। শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। তখন এখানে নদী ছিল জ্যান্ত, প্রকৃতি ছিল সুন্দর। নদীর পাড়ে বসিয়েছিলেন বিশ্রাম ভবন। শুধু বিশ্রামের জন্য এত বড় বাড়ি না বানালেও চলত। কিন্তু তখনকার দিনের লোকেরা ছোট কিছু বানাতেই পারতেন না। তাছাড়া ওঁদের টাকাপয়সাও ছিল যথেষ্ট।

এই সুন্দর অট্টালিকাটিরও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। নদী শুকিয়ে গেছে। লোকালয় সরে গেছে। এখন এই মাঠের মধ্যে বাড়িটাকে বেখাপ্পা দেখায়। সেই আসল জমিদার নেই, তাপসদের অবস্থাও আগেকার মতো নয়। এতবড় বিশ্রাম ভবন ওদের কাজে লাগে না।

এত বড় একটা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করাও যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। সারা বছর ওদের পরিবারের প্রায় কেউই আসে না এখানে—শুধু শুধু বাড়িটাকে টিকিয়ে রাখার আর যুক্তি নেই।

বাড়িটাকে আর কোনো কাজেও লাগানো যাচ্ছে না। এখানে কেউ এতবড় বাড়ি ভাড়া নেবে না। রেল স্টেশন বেশ দূরে বলে মিল ফ্যাকটারি করার পক্ষেও অনুপযোগী।

তাপসরা চেয়েছিল বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দিতে। সরকারও উৎসাহী হয়নি।

এই জনমানবহীন জায়গায় বাড়িটাকে ইস্কুল কলেজ বা হাসপাতাল করাও কোনো মানে হয় না। কাছাকাছি কোনো বড় রাস্তা বা বাসরুট পর্যন্ত নেই। বাড়িটা বিক্রির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি, তাপসরা তাই বিরক্ত হয়ে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবে ঠিক করেছে। অন্তত জানালা দরজা আর কিছু ইট বিক্রি হবে। অর্থাৎ একেবারে নষ্টই হবে সব কিছু।

আগামী মাসেই তিন তারিখে নিলাম হবে জানালা দরজা। শেষবারের মতো তাপস তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে এসেছে কয়েক দিনের জন্য। সেই টানে টানে আমিও উপস্থিত।

এত বড় একটা বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে শুনলে কার না মন খারাপ হয়। বাড়িটা যে দেখতে সুন্দর, শুধু সেই কারণেই যেন এর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এখন সব কিছুই বিচার হয় প্রয়োজনের মাপ কাঠিতে। আমার বারবার মনে হতে লাগল, আমার যদি টাকা থাকত, আমি ঠিক কিনে নিতাম এ বাড়িটা। তারপর কি করতাম? কিছুই না। এমনিই থাকত। তাপস আর মিলি ঘুরে ঘুরে দেখাল আমাকে সারা বাড়িটা। শুধু দোতলা আর তিন তলাতেই চোদ্দখানা ঘর। এ ছাড়া বিরাট বারান্দা, মোটা মোটা থাম আর খিলান। একতলায় ঘরগুলি রাখা হয়েছিল শুধু চাকর-বাকরদের জন্য। এখন অবশ্য একমি মাত্র চাকর ও একজন দারোয়ান থাকে। বাড়ির সব কটা ঘর খোলাই হয়নি বহুদিন।

আমরা আশ্রয় নিয়েছি দোতলার দক্ষিণ কোণের দিকে পাশাপাশি দুটি ঘরে। আরো অনেক বন্ধু-বান্ধব এলে বেশ জমজমাট হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। দু একজন আসবে বলেও আসতে পারেনি।

দিনের বেলাটা অবশ্য আমাদের ভালোই কাটে। অল্প অল্প শীত পড়েছে। দোতলার বিশাল বারান্দায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। দুপুরবেলা একট লম্বা ঘুম দিই। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতেই সন্ধে হয়ে যায়।

সন্ধের পর আর ঠিক মতো আড্ডা হতে চায় না। শহরের কোনো বাড়িতে তিনজন নারী পুরুষের আড্ডা দিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে এই প্রকাণ্ড নির্জনতার মধ্যে আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী, খুবই অকিঞ্চিৎকর লাগে নিজেদের। একতলায় চাকর দারোয়ানদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কোন কিছুর দরকার হলে চিৎকার করে ডাকতে হয়।

ইলেকট্রিক নেই, সন্ধের পরই ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুটো হ্যাজাক জ্বেলেও সেই অন্ধকারে বেশি ফাটল ধরানো যায় না। তাপস সঙ্গে ট্রানজিস্টার রেডিও আর টেপ রেকর্ডার এনেছে—তাতে গান শোনা হয় সন্ধের পর। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনতেও একঘেয়ে লাগে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাপস হুইস্কির বোতল বার করে।

তাতে আবার মিলির আপত্তি। মদ্যপান বিষয়েই যে মিলির কোনো আপত্তি আছে তা নয়। কিন্তু ও বলে তোমরা তো বসে বসে এখন মদ খাবে। আর আমি একা একা কি করব? দুজন মদ্যপায়ীর সঙ্গে তৃতীয় কারুর গল্প যে বেশিক্ষণ জমে না সে কথাও ঠিক।

মিলিকেও একটু হুইস্কি খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গন্ধটা ওর কিছুতেই সহ্য হয় না। বমি আসে। একবার কোন্ পার্টিতে সে একটু শেরি খেয়েছিল, সেটা তার খুব ভাল লেগে ছিল। সে শেরি খেতে চায়। কিন্তু শেরি কোথায় পাওয়া যাবে।

চার বছর আগে বিয়ে হয়েছে। মিলির এখনো ছেলেমেয়ে হয়নি। সে সব সময় সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। এখানে দেখবার কেউ নেই, তবু সে বিকেলবেলা স্নান করে খুব সাজগোজ করে এসে বসে আমাদের সঙ্গে। টেপ রেকর্ডারে গান বাজায়। সেই আসরে তাপস গেলাসে হুইস্কি ঢালতেই মিলি অমনি বলে, এই আবার শুরু হল তো তোমাদের। তারপর রাত্তিরবেলা একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়, হাজার ডাকলেও উঠবে না।

তাপসের শরীরে এখনো জমিদারি রক্ত। সে বউকে ভয় পায় না। মিলির আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই সে হুইস্কির বোতল খোলে। আমারই বরং একটু সঙ্কোচ লাগে।

তৃতীয় রাত্রে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ বাড়িতে ভুত-টুত নেই।

তাপস হেসে উঠে বলল, ভুত? তুই আমার ভূতে বিশ্বাস করতে শুরু করলি কবে থেকে?

আমি বললাম, তা নয়, মানে, খুব পুরনো বাড়ি তো। এই সব বাড়ি সম্পর্কে সাধারণত অনেক রকম গল্প থাকে।

তাপস বলল, খুবই দুঃখের বিষয়, সে রকম কোনো গল্প তোকে শোনাতে পারছি না। এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন কিছু দেখেনি। আগে যখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল, তখন অনেক সময় তিরিশ চল্লিশজন লোক একসঙ্গে বেড়াতে এসেছে, সব কটা ঘর খোলা হত, কেউ কিছু দেখেনি।

—চাকর বাকররাও কিছু দেখেনি?

—শুনিনি কখনো। কেন, তুই বুঝি গল্পের খোরাক খুঁজছিস?

মিলি চুপ করে শুনছিল। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ ভূতের কথা মনে হল কেন আপনার?

আমি বললাম, ভূত-টুত থাকলে আমাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী বাড়ত। আমরা যে রকম সঙ্গীর অভাব বোধ করছি—

—আপনি ভুতের ভয় পান না?

—রাত্তিরবেলা একটু একটু পাই, দিনেরবেলা পাইনা। তবে, আজকালকার ভুতেরা তো খুব ভদ্র হয়। ভয়টয় বিশেষ দেখায় না।

মিলি একটু চুপ করে থেকে বলল, ভূত আছে কিনা জানি না। তবে, আমার মনে হয়, এ বাড়িটাতে একটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার আছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, তার মানে? আপনার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে।

—কি, কি শুনি? আগে বলেননি তো? এইবারই হয়েছে না অন্যবার।

—যতবার এ বাড়িতে এসেছি ততবারই হয়েছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আমার মনে হয়, আমায় যেন কেউ ডাকে।

তাপস বলল, ননসেন্স।

মিলি দুঃখিতভাবে বলল, তুমি তো আমার সব ব্যাপারেই ননসেন্স বলো।

আমি তাপসকে বাধা দিয়ে বললাম, দাঁড়া না, ব্যাপারটা শুনতে দে না!

তাপস বলল, ব্যাপারটা আর কিছুই না। মিলির একটা অসুখ আছে। সোমনামবুলিজম্ কাকে বলে জানিস তো? ঘুমের মধ্যে ঘোরের মাথায় ঘুরে বেড়ানো। সোজা বাংলায় স্লিপ ওয়াকিং যাকে বলে। মিলি এই রকম হঠাৎ হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে জেগে হেঁটে বেড়ায়।

মিলি বললো, মোটেই আমার সে রকম কোনো অসুখ নেই।

তাপস বলল, বাঃ, তোমার দাদা সেবার বলেন নি যে ছেলেবেলায় তুমি এরকম কয়েকবার বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলে পর্যন্ত।

—সে তো খুব ছেলেবেলায়।

—আবার সেটা দেখা দিয়েছে।

—কিন্তু এ বাড়িতে এলেই সে রকম হয় কেন?

—মনের জোর আনো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি মিলিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কেউ ডাকে তার মানে কি? কারুকে চোখে দেখতে পান?

মিলিকে কোনো কথাই বলতে দিল না তাপস। বিরক্তভাবে বলল, থাক, ও কথা থাক, ওসব আজেবাজে কথা আমার ভাল লাগে না।

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তাপস ঘোরতর নাস্তিক। ভগবান কিম্বা ভূত কোনোটাই সে গ্রাহ্য করে না। মিলি হঠাৎ চলে গেল ঘরের মধ্যে। বুঝলাম সে রাগ করেছে।

ঘটনাটা ঘটল সেই রাত্রেই। মিলি চলে যাবার পর তাপস আর আমি আরও অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তাপস বোতলটা পুরোই শেষ করতে চায়। চাকর এসে দু-একবার জিজ্ঞেস করেছে খাবার দেবে কিনা, তাপস তাকে ধমকে ফিরিয়ে দিল। বোতলটা শেষ হবার পর তাপস বেশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। আমি কম খেয়েছিলাম। তাপস সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোনোক্রমে তাকে ধরাধরি করে এনে বসালাম খাবার টেবিলে। কিন্তু খাদ্যে তার আর রুচি নেই। সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগল।

খাবারের টেবিলে মিলি আগাগোড়া খুব গম্ভীর। আমি একটু অপরাধী বোধ করতে লাগলাম। মিলি বোধ হয় ভাবল, আমিই ওর স্বামীকে মাতাল করে দিয়েছি। সকলেই এরকম ভাবে।

খাওয়া শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসব?

মিলি বলল, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। আপনার যাবার দরকার নেই।

আমি নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বই পড়া আমার অভ্যাস। কিন্তু হ্যাজাকের আলোয় বই পড়তে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। আলো নিভিয়ে দিতেই চতুর্দিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। কেন ঘুম ভাঙল জানি না। ঘুম ভাঙাও দুরকম হয়। কখনো কখনো ঘুমটা একটু টিরে যায়, অস্পষ্ট জাগরণের অনুভূতি, কিন্তু চোখ মেলতে ইচ্ছে করে না। আবার কখনো হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে যায়, চোখ দুটো খুলে যায় সম্পূর্ণ ভাবে। আমার দ্বিতীয় রকম হল, চোখ মেলার পর কোনো চিন্তা না করেই আমি খাট থেকে নেমে এলাম। তারপর দেখলাম আমার ঘরের দরজা খোলা।

এজন্য কোনো খট্‌কা লাগল না। ঘরের দরজা আমি নিজেই বন্ধ করিনি হয়তো। কিংবা ভেজানো ছিল, হাওয়া খুলে গেছে। এখানে চুরি-টুরির ভয় নেই, দরজা বন্ধ করার সতর্কতারও দরকার হয় না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পাশেই তাপসদের ঘরের দরজা বন্ধ। আমার ডান পাশে বিরাট লম্বা বারান্দায় পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম বারান্দা দিয়ে। কেন এগোচ্ছি তা আমি জানি না। এবং বেশ জোরে জোরেই হাঁটছি আমি। সারা বাড়িটা একেবারে নিঃশব্দ, সুচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। আমি শুনতে পাচ্ছি শুধু আমার পায়ের আওয়াজ।

বারান্দার একপাশে সিঁড়ি। কোনো কিছু না ভেবেই আমি তিনতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলাম। তিনতলাতেও সমান লম্বা বারান্দা। ঘরগুলিতে সব তালা বন্ধ। পুরো বারান্দাটা পার হয়ে আমি চলে এলাম আর এক কোণে। এখানে রয়েছে একটা ঝুল বারান্দা।

সেই ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। আমার দিকে পেছন ফেরা। পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে একরাশ চুল। মেয়েটির হাতে একটা মোমবাতি, হাওয়ায় তার শিখাটা অল্প অল্প কাঁপছে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

এই প্রথম আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। আমি এখানে এলাম কেন? এই মেয়েটি কে?

আমার পায়ের শব্দ শুনেই বোধ হয় মেয়েটি ফিরে তাকাল। মিলি! আমাকে দেখে সে কিন্তু একটুও চমকে উঠল না। একটু হেসে বলল, আসুন। এত দেরি করলেন যে।

আমার গলাটা শুকনো লাগল। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম সেইখানে। মিলি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, আসুন। দেখবেন না?

এবার আমিও শুকনোভাবে বললাম, কি দেখব?

—একদিকে আসুন।

মিলি আমার হাত ধরে এনে পাঁচিলের কোণে দাঁড় করালো। তারপর বলল, সামনে তাকিয়ে দেখুন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। আমি ভাবছিলাম, আপনি আরো আগে আসবেন।

সামনের মাঠ অল্প জ্যোৎস্নায় আবছা ভাবে দেখা যায়। আমি সেদিকে তাকালাম।

মিলি বলল, দেখেছেন, নদীতে কত জল? নদীটা আবার বেঁচে উঠেছে। আবার এখানে মানুষজন আসবে। এ বাড়ি ভাঙা হবে না।

সামনে তাকিয়ে মনে হল, সত্যিই নদীটা যেন জলে ভর্তি। জলের ওপর ঢেউ খেলা করছে জ্যোৎস্নায়।

আমি বললাম, বাঃ কি সুন্দর।

আপনাকে আমি বলেছিলাম না! এখন দেখলেন তো? বিশ্বাস হল তো?

একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, সব কিছুই চোখের ভ্রম। নদীর শুকনো গর্ভে সর্ষের খেত, এই জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখাচ্ছে।

মিলি বলল, এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না?

আমি বললাম, মিলি, ঘরে চলুন।

মিলি চাপা গলায় বলল, না। আমি যাব না। আপনি আমার সঙ্গে এখানে থাকবেন না সুনীলদা?

—এখানে কতক্ষণ থাকবেন?

—যতক্ষণ ইচ্ছে।

—না ঘরে চলুন।

আমি মিলির বাহুতে হাত ছোঁয়াতেই সে আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। কি রকম যেন আনন্দ ভাব। চোখ দুটো বোজা। আমি ওর হাত ধরে টেনে আনলাম। মিলি আর কোনো আপত্তি করল না।

দোতলায় নেমে আসতেই মিলি আমার হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি আর আমি ছাড়া নদীটাকে কেউ দেখেনি।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মিলি দ্রুত হেঁটে চলে গেল নিজের ঘরে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হল। চোখ মেলার পরেই ভাবলাম, গতকাল রাত্রের ব্যাপারটা কি সত্যি? নাকি আমি স্বপ্ন দেখেছি? একবার মনে হচ্ছে স্বপ্ন, আবার মনে হচ্ছে সত্যি।

আমি উঠে চলে এলাম তিনতলায়। সেই ঝুল বারান্দায় এসে মনে হল, হ্যাঁ, কাল রাত্রে আমি এখানে এসেছিলাম ঠিকই। একটা মোমবাতির টুকরো পড়ে আছে। মিলিও কাল রাত্রে এসেছিল এখানে।

সকালবেলা মিলির চেহারা একেবারে অন্যরকম। স্নান করে নিয়েছে। তাপসের সঙ্গে কি একটা কথায় হাসছে খুব। বুঝলাম ওদের ঝগড়া মিটে গেছে।

গত রাত্রের ব্যাপারটা মিলি একবারও উল্লেখ করল না। আমার সঙ্গে ব্যবহারেরও কোনো আড়ষ্টতা নেই। সারাদিন ধরে আমি লক্ষ্য করলাম মিলিকে। ওকি কাল রাত্তিরের ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে? ও কিছু বলল না বলেই আমি তাপসকে কিছু জানাতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত মনে হল, মিলি সব ঘটনাটা ভুলে গেছে নিশ্চয়—যদি না ও খুবই সাংঘাতিক অভিনেত্রী হয়। শুনেছি স্লিপ ওয়াকাররা আগের রাত্রের কোনো ঘটনাই মনে রাখতে পারে না। এটাও হয়তো সেই ব্যাপার।

কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান হল না কখনো। মিলি কেন আমাকে দেখে চমকে যায় নি। কেন আমাকে দেখে বলেছিল, আপনি এত দেরি করলেন কেন? আমার তো কোনো কথা ছিল না মিলির সঙ্গে মধ্যরাত্রে নিরালায় দেখা করার? এমনকি চোখের কোণে ইশারাও হয় নি।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে সোজা তিনতলায় গেলাম কেন? মিলি যে ওখানে থাকবে আমি তো তার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না।

তাহলে আমিও কি ঘুমের মধ্যে হেঁটে গেছি? কিন্তু আমার যে সব মনে আছে।

কোনোদিন এই ঘটনাটা মিলির কাছে আর উল্লেখ করতে পারিনি। কি জানি, যদি মিলিও আমাকে অবিশ্বাস করে।

একটি নদীর নাম

বাগানটা সত্যি চমৎকার। ফুলগুলোর স্বাস্থ্য দেখলেই বোঝা যায়, এদের পেছনে অনেক যত্ন আছে। ফুলের গাছও নানা ধরনের। প্রবাল কিংবা জয়া অবশ্য এর একটি গাছও লাগায় নি, সরকারি মালিও এমন কিছু উদ্যম নিয়ে বাগানের পরিচর্যা করে না। প্রবালের আগে যিনি এখানে ছিলেন, সেই সুরঞ্জন মজুমদারের ছিল সত্যিকারের গাছপালার শখ, প্রত্যেকদিন ভোরে তিনি হাফ প্যান্ট পরে খুরপি নিয়ে নিজের হাতের বাগানের কাজ করতেন। দূর দূর জায়গা থেকে তিনি নিয়ে আসতেন ফুলগাছের চারা।

সুরঞ্জন মজুমদার বদলি হয়ে গেছেন ঠিক এক মাস আগে। অপরের বাগান এখন ভোগ করছে প্রবাল ও জয়া।

একটা বড় ছাতা বসানো হয়েছে এই বাগানের এক পাশে। সেখানে এক একদিন সন্ধেবেলা ওরা দুজনে চা খেতে বসে। আজকের আকাশ মেঘলা, বাতাস বইছে মৃদু মন্দ, এমন দিনে ঘরের মধ্যে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

আরদালি ট্রে-তে করে চায়ের পট ও দু প্লেট গরম গরম নিমকি দিয়ে গেছে। জয়া বানাচ্ছে চা, টুং টাং শব্দ হচ্ছে পেয়ালায়। হাস্নুহানার ঝাড়টার দিকে চেয়ে গুনগুন করছে প্রবাল। রবিবার সন্ধ্যায় নিতান্ত কোনো রাজনৈতিক হোমরা-চোমড়া ছাড়া কোনো ভিজিটারের সঙ্গে সে দেখা করে না।

চায়ের কাপে সবে মাত্র দুবার চুমুক দিয়েছে প্রবাল, গেটের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। গেটের দুজন গার্ডের হাত ছাড়িয়ে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে একজন প্রৌঢ়। সাদা ধুতি ও সাদা টুইলের শার্ট পরা, দুটোই বেশ মলিন, পায়ে ময়লা কেড্স। রোগা লম্বাটে চেহারা, মাথার চুল কাঁচা পাকা, কাঁধে ঝোলানো একটা থলে।

ভূত দেখার মতন ফ্যাকাসে মুখ হয়ে গেল প্রবালের। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ভেতরে যাচ্ছি।

জয়া প্রথমে অবাক হয়ে বলল, নিমকি খেলে না? চা-ওতো শেষ কর নি।

তারপর গেটের দিকে তাকিয়ে সেও দেখতে পেল প্রৌঢ়টিকে। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি।

সে বলল, এবার ডি এম সাহেবের পলায়ন।

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না প্রবাল, সে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

জয়া বলল, আমাকে ফেলে পালাচ্ছ?

প্রবাল বলল, তুমিও কেটে পড়।

জয়া তাড়াতাড়ি শেষ করল চা, দু খানা নিমকি হাতে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল বাগানের মধ্যে। শকুন্তলার মত সে মাধবী ও চাঁপা ফুলগাছের আড়ালে মিশে গেল।

প্রৌঢ় লোকটি গার্ডদের হাত ছাড়িয়ে অনেকখানি চলে এসেছে ভেতরে। একজন গার্ড তার সঙ্গে সঙ্গে এসে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু তার ওপর জোর জবরদস্তি করছে না।

এর আগে একদিন গার্ডরা ওই লোকটির হাত চেপে ধরায় লোকটি সরু গলায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। গার্ডরা তখন তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল ডি. এম. সাহেবের কাছে।

লোকটি বলেছিল, আই অ্যাম এ হাম্বল স্কুল টিচার স্যার। আই ওয়ান্ট টু সাবমিট এ পিটিশান।

প্রবাল রূঢ় ভাবে গার্ডদের বলেছিল, ছেড়ে দাও। ওরকম বিশ্রী ভাবে ধরে এনেছ কেন? চোর না ডাকাত। দেখে বুঝতে পার না নিরীহ লোক?

প্রথম দিনই ভুলটা করে ফেলেছিল প্রবাল। তারপরেও সে অবশ্য আদেশ বদল করেনি।

প্রবালের বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। সেই জন্যেই বোধহয় সে একজন গ্রাম্য শিক্ষককে বন্দুকধারী গার্ডদের দিয়ে আটকাবার হুকুম দিতে পারে না। তবে লোকটিকে দেখলে সে নিজেই আত্মগোপন করে।

প্রবাল একেবারে উঠে গেল দোতলায়। প্রৌঢ় শিক্ষকটি আর যাই করুক ডি. এম. সাহেবের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে আসতে সাহস পাবে না।

জয়া গাছপালার আড়াল থেকে দেখল, সেই লোকটি প্রথমে ঢুকে গেল একতলার অফিস ঘরে। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল বাইরে। নাজির সাহেব নিশ্চয়ই অফিস ঘর থেকে ভাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রৌঢ়টি এদিক ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে এল বাগানের দিকে।

ছাতাটির নিচে এসে সে চায়ের টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। সরু মুখখানিতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে।

চায়ের পটে এখনো অনেকটা চা রয়ে গেছে। একজন অতিথিকে অনায়াসে আপ্যায়ন করা যেত। কিন্তু জয়া আর প্রবাল নিজেরাই ভাল করে চা উপভোগ করতে পারেনি!

প্রৌঢ়টি বাগানের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল, স্যার? ম্যাডাম? জয়া কোনো উত্তর দিল না। সে একটুও শব্দ করছে না।

নাজির এখানে এসে রুক্ষ ভাবে বলল, কেন ঝামেলা করছেন ভট্টাচার্যিবাবু? বললাম না, এখন দেখা হবে না? সাহেব আর মেমসাহেব এখন ওপরে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

প্রৌঢ়টি বলল, ডি. এম. সাহেব কি এই গরিব ব্রাহ্মণকে দয়া করবেন না? একবার না হয় মেমসাহেবকেও বলে দেখতাম?

নাজির বলল, আপনাকে কতবার বলেছি, উইক ডেইজ-এ অফিস টাইমে আসবেন। তখন আপনার যা বলার আছে মন খুলে বলবেন। মেমসাহেব কোনো অফিশিয়াল ব্যাপারে মাথা গলান না। তাঁকে বলে কোনো লাভ নেই।

প্রৌঢ়টি বলল, অন্যদিন ইস্কুল থেকে ছুটি পাই না। অনেকখানি তো দূর!

নাজির বলল, তা বললে কি চলে? এই সব অফিশিয়াল কাজ কি রবিবারে হয়? সাহেবকে সারাসপ্তাহ খাটতে হয়, একটা দিন বিশ্রাম দেবেন না।

প্রৌঢ়টি বলল, তা অবশ্য ঠিক। আমারই দোষ। আমায় ক্ষমা করবেন স্যার। দেখি, যদি আর একদিন।

নাজির বলল, আপনি বরং আর একখানা পিটিশান দিয়ে যান।

প্রৌঢ়টি বাগানের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যেন সে ফুলগাছের আড়ালেও কিছু দেখতে পাচ্ছে। জয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল।

নাজির সাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সে প্রৌঢ়টির হাত ধরে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মোলায়েম গলায় বলল, চলুন, চলুন। সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে অন্য একদিন ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আসবেন!

জয়া অপেক্ষা করল আরও একটুক্ষণ। প্রৌঢ়টিকে গেটের বাইরে চলে যেতে দেখে তারপর বেরুলো সে। তার এখন বেশ রাগ হচ্ছে। নিজের বাড়িতে তাকে এমন চোরের মতন লুকোতে হবে কেন? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সামান্য একজন লোককে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে, এটা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে!

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিমকিগুলোই আর কে খাবে?

ও সব সেখানেই ফেলে রেখে জয়া চলে এল দোতলায়।

প্রবাল টেলিফোনে কথা বলছিল তখনই নামিয়ে রেখে বলল, সইফুল ওর ওখানে ডাকছে, চল ঘুরে আসি। তৈরি হয়ে নাও।

জয়া রাগ রাগ মুখ করে জিজ্ঞেস করল, সইফুলের ওখানে আবার কী আছে?

প্রবাল বলল, আড্ডা মারা হবে। কলকাতা থেকে বিজন এসেছে। বিজন তো তোমার গ্রেট অ্যাডমায়ারার। সন্ধেটা কাটিয়ে আসব।

জয়ার মুখ থেকে রাগ মুছে গেল খানিকটা। সন্ধেগুলো এখানে কাটতেই চায় না। টি ভি আছে বটে, কিন্তু ছবি আসে না ভাল। ক্যাসেটের গান শুনে আর বই পড়ে দিনের পর দিন কাটানো যায় না। প্রবাল যখন ইন্সপেকশানে কিংবা অন্য কাজে ডিসট্রিকটের অন্যান্য জায়গায় যায়, রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারে না, তখন তো একেবারে অসীম একাকিত্ব। এত বড় বাড়িটাকে সে সময় ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটের বউ বলেই এখানে যার তার সঙ্গে মিশতেও পারে না জয়া। সেও এক জ্বালা। প্রায় সমান সমান বা কাছাকাছি সরকারি অফিসারদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত নেই।

প্রথম প্রথম জয়া স্বাভাবিক ভাবে অনেকের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তারদের স্ত্রীদের নিজের বাড়িতে ডাকত। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল তারা জয়াকে ধরে প্রবালকে দিয়ে কিছু না কিছু কাজ করিয়ে নিতে চায়। সুবিধে চায়, সুযোগ চায়। এই ভাবে কি বন্ধুত্ব হয়!

সইফুল এই জেলার এস. পি.। খুব আমুদে মানুষ। তার স্ত্রীও বেশ সুন্দর ও ভারি চমৎকার তার ব্যবহার, ওদের বাড়িতে সময় কাটে বেশ ভালই।

নতুন করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জয়া জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে খাওয়ার কথা কিছু বলেছে নাকি?

প্রবাল বলল, না সেরকম কিছু বলল না। সইফুলের যা ভুলো মন, হয়তো ব্যবস্থা আছে। নীলা তো কোনোদিনই না খাইয়ে ছাড়ে না।

জয়া বলল, আমরা ওদের বাড়িতে গিয়ে বারবার খেয়ে আসছি। আমাদের এখানে ওদের একবার ডাকা উচিত। কিন্তু ওদের মতন অত চমৎকার কাবাব আর বিরিয়ানি তো আমরা বানাতে পারব না।

প্রবাল হাসতে হাসতে বলল, আমরা ডাল ভাত খাওয়াব!

একটু বাদে তৈরি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে জয়া আবার জিজ্ঞেস করল, এ বুড়ো লোকটির ব্যাপারটা কী বলো তো? শুধু শুধু ঘোরাচ্ছো কেন?

প্রবাল বলল, ও যা চায়, তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই যে! আগেকার দিনে বাংলা উপন্যাসে লেখা হত, ডিসট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে সেই জেলার 'দণ্ড মুণ্ডের কর্তা'। কথাটা শুনলেই একজন প্রকাণ্ড চেহারা, রাগী, গোঁফ পাকানো লোকের কথা মনে হয় না? তাদের তুলনায় আমরা...

প্রবাল হাসতে শুরু করল আপন মনে।

জয়া বলল, ভদ্রলোককে স্ট্রেট না বলে দিলেই তো পার! শুধু শুধু আসেন অত দূর থেকে।

হাসি থামিয়ে প্রবাল বলল, পৃথিবীতে অনেক কিছুই স্ট্রেট না কিংবা স্ট্রেট হ্যাঁ বলা যায় না। বেশির ভাগ ব্যাপারই এর মাঝামাঝি ঝুলতে থাকে। তাই না? তা ছাড়া উনি আমার কথা বুঝতেই পারছেন না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রবাল বলল, তোমার ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে। মুছে নাও। বেশি সাজগোজ করেছ মনে হচ্ছে! বিজন আসছে বলে?

জয়া প্রবালের দিকে একটা নিষেধের ভ্রূভঙ্গি করল।

ড্রাইভার ছাড়াও সামনের সিটে একজন আর্মড গার্ড থাকে সব সময়। এই চাকরিতে শুধু স্বামী-স্ত্রীর নিরিবিলি বেড়াবার অধিকার নেই। ড্রাইভার আর গার্ডের সামনে সব রকম রসিকতা যে করা যায় না, সে কথা মনে রাখতে পারে না প্রবাল।

এস পি সইফুল আলমের কোয়ার্টার পুলিশ লাইনের বাইরে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির চেয়েও এক হিসেবে এ বাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর। প্রবালরা থাকে একটা সাহেবি আমলের ঢাউস দোতলা বাড়িতে, অনেকগুলো ঘর খোলার দরকারই হয় না। আর সইফুলের বাড়িটা একতলা, ছিমছাম, কিন্তু পেছনে অনেকখানি জমি, প্রায় একটা জঙ্গলের মতন, তার মধ্যে একটা পুকুরও আছে। শুধু বাগান নয়, এই জমিতে বেগুন, টোমাটো, ঝিঙে, লাউ এ সবও হয়, পুকুরে বড় বড় মাছ আছে।

সইফুল বাইরে দাঁড়িয়ে দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল, প্রবালদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে লোকদুটিকে বিদায় করে দেবার জন্য বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল কথা হবে।

তারপরই সে ঠক করে দুপায়ের জুতো ঠুকে, অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বলল, আসুন স্যার।

এটা সইফুলের ঠিক রসিকতা নয়, নিয়ম রক্ষার বাড়াবাড়ি।

সার্ভিসে প্রবাল মাত্র এক বছরের সিনিয়ার, বয়েসে যদিও দুজন সমান। তবু ঘরের মধ্যে সে ডাকবে প্রবালদা, অন্য সময় বলবে স্যার। প্রবাল অনেকবার বলেছে, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাক না কেন? সইফুল শোনে না।

বিজন সেনগুপ্ত বসবার ঘরের মেঝেতে বসে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে, তার হাতে রামের গেলাস। সইফুলের কলেজ জীবনের বন্ধু এই বিজন কাজ করে কলকাতার এক বিদেশি দূতাবাসে, এখানে আসে প্রায়ই। এর আগেও একটা জেলাতে সইফুল আর প্রবাল একসঙ্গে পোস্টিং ছিল, সেখানেই বিজনের সঙ্গে প্রবাল-জয়ার আলাপ। দু-একদিনের মধ্যেই দারুণ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে কেউ এলেই কলকাতার গল্প বেশি হয়। কে কোন্ পাড়াতে থাকে, কোন্ ইয়ারে পাশ করেছে, কমন বন্ধু কেউ আছে কি না! কথায় কথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, এই বিজন সেনগুপ্তের সঙ্গে জয়ার একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল! কথাবার্তা এগিয়েও ছিল অনেকখানি, তারপর হঠাৎ জয়ার বাবার এক বন্ধু প্রবালের খবর নিয়ে আসেন। অনেকটা বাবার সেই বন্ধুর আগ্রহে এবং উদ্যোগেই প্রবালের সঙ্গে জয়ার বিয়ে হয়ে যায়।

সেই সম্বন্ধের কথাটা বেরিয়ে পড়বার পর বিজন হো-হো করে হেসে উঠেছিল। এগারো বছর আগেকার কথা, এ সব এখন হাসি ঠাট্টারই ব্যাপার। জয়াকে বিজন বলেছিল, আমাকে আপনি রিজেক্ট করে দিলেন। আমি কি পাত্র হিসেবে খুব খারাপ? না হয় ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারিনি।

বিজনও এখন বিবাহিত, কিন্তু তার স্ত্রীকে এখানে আনে না।

বিজনের সঙ্গে জয়ার এখনকার সম্পর্কটাতে প্রবাল মজা পায়। ওদের বিয়ে হলেও হতে পারত, হয়নি, তাই বিজনের মধ্যে একটা প্রেমিক প্রেমিক ভাব ফুটে ওঠে জয়াকে দেখলেই। বিজনের মুখে প্রশংসা আর স্তুতি বেশ উপভোগ করে জয়া।

আড্ডার মধ্যে একটু পরে রসভঙ্গ করল আর একজন এসে। এর নাম কল্যাণ দত্ত, সইফুলের একজন এস. ডি. পি. ও.। কল্যাণ এদের চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট, কিন্তু কাজের ব্যাপারে বড্ড সিরিয়াস। আড্ডার মধ্যেও কাজের

কথা ভোলে না। সে ঘরে ঢুকে বসে পড়ার পরেই সইফুলকে বলল, স্যার, ফুলমনি মার্ডার কেসের দুজন আসামি আজ ধরা পড়েছে, খবর পেয়েছেন?

সইফুল অবাক হয়ে বলল, ধরা পড়েছে, কখন?

কল্যাণ বলল, আজই দুপুরবেলা। নদীর চরে লুকিয়েছিল।

তারপর কল্যাণ লম্বা করে শুরু করল পুলিশি বিবরণ। তা মোটেই গল্পের মতন নয়, যেন সরকারি রিপোর্ট।

জয়া হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ধমক দিয়ে বলল, এবার চুপ করুন তো! আপনারা শুধু আজেবাজে লোকদের ধরেন। টিয়াজালি গ্রামের কেসটার তো কিছুই করতে পারলেন না এতদিনে!

কল্যাণ থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেল।

সইফুল বলল, টিয়াজালি গ্রামের কেসটার কিছুই করা যাবে না। আসামিরা এই জেলার লোক নয়। বাইরে থেকে এসেছিল, আবার পালিয়েছে!

জয়া বলল, বাইরে থেকে এসেছিল বলেই তাদের ধরা যাবে না? কলকাতা থেকে কেউ এ জেলায় এসে যদি একটা খুন করে আবার কলকাতায় ফিরে যায়, তা হলে তাকে কে ধরবে? তার কোনো শাস্তি হবে না? আপনারা বলবেন, আসামি এ জেলায় থাকে না, তাকে আমরা কী ধরব? আর কলকাতার পুলিশ বলবে, ক্রাইমটা বাইরে হয়েছে, সুতরাং আমরা কী জানি!

বিজন হেসে উঠে বলল, বেশ মজা তো! আমিও তা হলে এখানে এসে যা খুশি করে কলকাতায় ফিরে যেতে পারি?

সইফুল বলল, ব্যাপারটা তা নয়। টিয়াজালির কেসটা তো ভাল করে ইনভেস্টিগেট করাই গেল না। মেয়েটির বাবা, ভেরি পিকিউলিয়ার পার্সন, পুলিশের সঙ্গে কো-অপারেটই করতে চায় না।

প্রবাল বলল, সেই বুড়ো ভদ্রলোক আজও বিকেলে এসেছিলেন আমার ওখানে!

জয়া বলল, আপনারা কিছু করছেন না। আর সেই বুড়ো আমাদের গিয়ে প্রায়ই জ্বালাচ্ছে।

সইফুল বলল, কেন, প্রবালদা, ওই বুড়ো আপনার কাছে যাচ্ছে কেন? আপনি ভাগিয়ে দেবেন। না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। জানেন, আমি নিজে টিয়াজালিতে ওই বুড়োটার বাড়ি গিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা ফিলোসফিক্যাল ভাব নিয়ে কথা বলতে লাগল আমার সঙ্গে। কোনো ইনফরমেশান দেবে না, খালি বলে, সবই ভগবানের ইচ্ছে! যে যায়, তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

কল্যাণ এবার বলল, জানেন, ঘটনাটা ঘটে যাবার পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় কোনো খবর দেয় নি? সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলে নিশ্চয়ই ধরে ফেলা যেত। শুধু শুধু পাঁচ-পাঁচটা দিন কেটে গেল।

প্রবাল বলল, খবর না দেবার কারণ ছিল। সেটা বোঝা শক্ত নয়।

সইফুল বলল, কী কারণ থাকতে পারে, আপনি বলুন? একজন হারিয়ে গেল, বাড়ির লোক সে খবর থানায় জানাবে না?

প্রবাল বলল, একটি মেয়ে, তাও বামুন বাড়ির যুবতী মেয়ে, রাত্তিরে বাড়ি ফিরল না। বাড়ির লোকেরা কি সে খবর কারুকে জানাতে চায়? বামুনেরা, বিশেষ করে গরিব বামুনেরা সবচেয়ে বেশি কী ভয় পায় জান? বংশের বদনাম। কোনো মেয়ের নামে কলঙ্ক! ওরা নিশ্চয়ই ধরেই নিয়েছিল যে মেয়েটি তার কোনো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে। তাই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। কোনো মেয়ের কুলত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল, এই রকম এখনো অনেকে মনে করে।

বিজন সোজা হয়ে বসে বলল, শুনি, শুনি কেসটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। কী হয়েছিল ব্যাপারটা?

প্রবাল বলল, কেসটা খুবই ট্র্যাজিক। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখের সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না। আমার বুকের ভেতরটা শিরশির করে।

জয়া বলল, জানেন, ওই বুড়োটাকে দেখলেই ও পালায়।

প্রবাল জয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার বিমর্ষ ভাবে তাকাল। তার ওই ব্যাপারটা সবার কাছে বলে দেওয়াটা সে পছন্দ করেনি। ওই বৃদ্ধকে দেখলেই যে প্রবালের বাবার কথা মনে পড়ে, তা জয়া কিছুতেই বুঝবে না। জয়া এসেছে এক সচ্ছল পরিবার থেকে, কিন্তু প্রবাল এক গরিব ইস্কুল মাস্টারের ছেলে।

সইফুল কল্যাণকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলে?

কল্যাণ বলল, হ্যাঁ, দু বার দেখেছি।

সইফুল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ওয়াজ শী রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল? অ্যাণ্ড ট্যালেন্টেড?

কল্যাণ বলল, রিয়েলি। খুব সুন্দরী হয়তো বলা যায় না, তবে মোটামুটি দেখতে বেশ ভালই ছিল। তার অনেক গুণ ছিল। গ্রামে এরকম মেয়ে চট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সইফুলের স্ত্রী একটি বড় প্লেট ভর্তি মাছ ভাজা নিয়ে সেই সময় ঘরে এসে বলল, কোন্ মেয়েটার কথা হচ্ছে? কোন্ মেয়েটা!

জয়া বলল, ওই যে টিয়াজালি গ্রামের একটা মেয়ে...

নীলা বলল, খুন হয়েছিল? ওরে বাবা, না, না। শুনব না। ওইসব কথা এখন থামাও তো! বাড়িতে সর্বক্ষণ খুন আর ডাকাতি আর মারামারির কথা শুনতে শুনতে কান একেবারে পচে গেছে।

জয়া বলল, যাক, ওই সব কথা এখন থাক।

সইফুলের স্ত্রীর নাম এখানে সবাই জানে নীলা, একমাত্র বিজনই তাকে আসল নামে ডাকে। সে বলল, নীলোফার, তোমরা তো ঘটনাটা সব জান। আমাকে একটু শুনতে দাও। তুমি এখানে আমার পাশে এসে বস!

সইফুল বলল, কল্যাণই ভাল বলতে পারবে। ওর মহকুমার ঘটনা। কল্যাণ, আমি যেটা জানতে চাই, তুমি বেঁচে থাকা অবস্থায় মেয়েটিকে যখন দেখেছিলে, তখন তোমার কী ইমপ্রেশন হয়েছিল? মেয়েটা কি বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য কারুর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারত?

কল্যাণ বলল, অতটা আমি বলতে পারব না। আমি ওকে দু-বারই দেখেছি একটা স্কুলের ফাংশানে। প্রথমবার প্রায় দু বছর আগে...তখন সে সেই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল, বয়েস হবে পনেরো-ষোলো। স্কুলের ফাংশান যে-রকম হয় আর কি, দু'তিনটে গান, কিছু আবৃত্তি, সেক্রেটারির ভাষণ এইসব পরিচালনা করছিল ওই মেয়েটি।

বিজন জিজ্ঞেস করল, মেয়েটির নাম কী?

কল্যাণ বলল, নামটাও বেশ আন্ ইউজুয়্যলি। গ্রাম-ট্রামে এরকম নাম শোনা যায় না। সেইজন্য প্রথমবার শুনেই মনে গেঁথে গিয়েছিল। ওর নাম বেদবতী। বেদবতী ভট্টাচার্য।

—বেদবতী? কখনো শুনিনি। মানে কি এই নামের। যে মেয়ে বেদ জানে? বেদের সব জ্ঞান হজম করে ফেলেছে? বাচ্চা মেয়েদের এরকম খটোমটো নাম রাখা মোটেই উচিত না।

—ওর বাবা যে বামুন পণ্ডিত।

—হলেই বা। আজকাল কটা বামুন পণ্ডিত বেদ পড়ে? কেউ পড়ে না। এই যে আমরা এই ক-জন রয়েছি এই ঘরে, সইফুল আর নীলোফারকে না হয় বাদ দাও, আমরাই কি বেদ-টেদ কিছু বুঝি?

প্রবাল বলল, বেদবতী নামটার অন্য একটা মানে আছে। এটা একটা পৌরাণিক নাম। বেদবতী হচ্ছে দেবতাদের কুলগুরু বৃহস্পতির নাতনি। বৃহস্পতির ছেলে কুশধ্বজ, তার মেয়ে। এই কুশধ্বজ চেয়েছিলেন...

বিজন বাধা দিয়ে বলল, ওসব গল্প বাদ দিন। ওসব সেকেলে গল্প আমার শুনতে ইচ্ছে করে না। এই মেয়েটির কী হল তাই বলুন।

সইফুল বলল, বিজন, তুমি বললে বেদ কেউ পড়ে না। কিন্তু প্রবালদা পড়েছেন, উনি অনেক রেফারেন্স দিতে পারেন।

প্রবাল শুকনো ভাবে হেসে বলল না, সে রকম কিছু না। ঠিক আছে, কল্যাণ, তুমি তোমার অ্যাঙ্গেল থেকেই ঘটনাটা বল।

কল্যাণ বলল, মেয়েটির নামই শুধু অন্যরকম নয়। সব দিক থেকেই সে আলাদা, অন্য সব ছাত্র-ছাত্রীর থেকে তাকে বিশেষ ভাবে চোখে পড়বেই। দেখতে বেশ ভাল, আর খুব পরিষ্কার উচ্চারণ। আমার মনে হচ্ছিল, সেই টিয়াজালির মতন গণ্ডগ্রামে যেন হঠাৎ একটা বালিগঞ্জের মেয়ে এসে পড়েছে। একটা লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরেছিল, কোনো সাজগোজ করেনি, তবু তাকে দেখলে গরিব ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। সে মেঘনাদ বধ থেকে দু-পাতা আবৃত্তি করে শোনাল, একেবারে নিখুঁত উচ্চারণ, অত শক্ত শক্ত কথা, তবু পুরোটাই তার মুখস্থ।

সইফুল বলল, বালিগঞ্জের কোনো মেয়ে মেঘনাদ বধ আবৃত্তি করতে পারবে না। সবাই ওখানে এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে।

জয়া বলল, গ্রামের কোনো মেয়ের মুখেও আমি এ পর্যন্ত ভাল উচ্চারণ শুনিনি। তালব্য শ-টা কেউ যেন বলতেই জানে না।

কল্যাণ বলল, বৌদি, এ মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ ছিল। হেড মাস্টারমশাই আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এই ছাত্রীটি আমাদের গ্রামের গর্ব। আমরা আশা করে আছি, ও হায়ার সেকেণ্ডারিতে নিশ্চয়ই স্ট্যাণ্ড করবে।

জয়া বলল, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টও করেছিল, তাই না?

সইফুল বলল, প্রথম দশজনের মধ্যে আসেনি। মেয়েদের মধ্যে ওর পজিশান ছিল ফোরটিন্থ। একটা অজ পাড়াগাঁর মেয়ের পক্ষে অবশ্য সেটাও কম নয়।

প্রবাল অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে মাথা নিচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছে একমনে। তার মুখখানা থমথম করছে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, দেন হোয়াট হ্যাপেনড?

কল্যাণ বলল, আমি ওই দেববতী ভট্টাচার্যকে দ্বিতীয়বার দেখি, সেই একই ইস্কুলে। তখন সে এক্স-স্টুডেন্ট, তবু স্কুলের ফাংশানে এসেছিল। দু-বছরেই অনেকটা বড় হয়ে গেছে, রূপ আরও খুলেছে। সেবার সে গান গেয়েও শোনালো। অতুলপ্রসাদের গান। কারুর কাছে শেখেনি, রেকর্ড শুনে শুনে গলায় তুলেছে। তাও নিজের কোনো ক্যাসেট প্লেয়ার নেই, পাশের বাড়ির একজনের। চমৎকার গেয়েছিল, মেয়েটা সত্যিই গুণী। আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম ওর সঙ্গে।

—মেয়েটা কলেজে ভর্তি হয়েছিল?

—হ্যাঁ, কলেজে পড়ছিল। কিন্তু তা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল। ওদের গ্রামের কাছাকাছি তো কলেজ নেই। নিয়ারেস্ট কলেজ বদরপুরে, টিয়াজালি থেকে ১৪ মাইল দূরে। কিন্তু বদরপুর কলেজে মেয়েদের হস্টেল নেই। বড় শহরে ভাল কোনো কলেজে পড়ালে ও মেয়ে অনেক সাইন করতে পারত, কিন্তু ওর বাবা তো খুব গরিব, সে সামর্থ কোথায়? সাধারণত গ্রামের গরিবঘরের এই সব মেয়েদের কী হয়, তাতো জানেনই, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে, তাই ঢের, তারপরেই সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু মেয়েটির তো ইচ্ছে ছিলই, ওর বাবা দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যিও চেয়েছিলেন মেয়েকে কলেজে পড়াবেন, যত কষ্টই হোক। বদরপুরে থাকার জায়গা নেই, তাই মেয়েটিকে গ্রাম থেকেই রোজ কলেজে যাতায়াত করতে হত। ওদের বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল হাঁটলে পাকা রাস্তা, সেখান থেকে দিনে দুটো বাস যায়। সকাল সাড়ে নটার বাসটা মিস করলে আর সেদিন কলেজ যাওয়া হবে না। আর এদিককার বাসে ভিড়ও সাংঘাতিক...

প্রবাল হঠাৎ উঠে পড়ল। বাথরুমে যাবার ছলে সে উঠে এল বারান্দায়। এক হাতে রামের গেলাস, অন্য হাতে সিগারেট। সে ম্লান মুখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, তবু আকাশে এখনো গাঢ় মেঘ।

ঘরের মধ্যে কল্যাণ তার কাহিনীটা বলে চলেছে।

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ে ওই বেদবতী, তার আর কোনো ভাইবোন নেই, বাচ্চা বয়েস থেকেই মেয়েটির পড়াশোনায় খুব মাথা। তার বাবা সে-রকম একটা কিছু পণ্ডিত নয়, খুব একটা বিদ্যে-বুদ্ধি নেই, আগের দিনের আই এ. পাশ, স্কুলে বাংলা আর ভূগোল পড়ান। বেদবতী নিজে নিজেই পড়াশুনো করেছে, যে-কোন বই পড়লে সে চট করে মুখস্থ করে ফেলতে পারে। সব কিছু শেখার দিকে তার তীব্র ঝোঁক। কত কষ্ট করে তাকে কলেজে যেতে হয়। বাড়ি থেকে খেয়ে বেরয় সকাল নটায়। ভিড়ের বাসে কোনো ক্রমে ঠেলাঠেলি করে ওঠে, কোনোদিন বসার জায়গা পায় না। ১৪ মাইল রাস্তা যেতেই বাসটা প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। কলেজ থেকে ফিরতে তার সাতটা বেজে যায়। তার আগে বাস নেই। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তাকে দেড় মাইল হেঁটে ফিরতে হয়। প্রথম প্রথম তার বাবা গিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন সন্ধেবেলা। যুবতী মেয়ে, দেখতে সুন্দর, তার অনেক রকম বিপদ। কিন্তু বেদবতী খুব আপত্তি করত। বাবা কেন কষ্ট করে অতক্ষণ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে? গ্রামের রাস্তায় তার কোনো বিপদের ভয় নেই, গ্রামের সব মানুষ তাকে চেনে, তাকে ভালবাসে। বেদবতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে সহজে ভয়ও পায় না।

গ্রামের লোক সত্যিই তাকে ভালবাসে। ভাল রেজাল্ট করার জন্য স্কুল কমিটি তাকে পাঁচশো টাকা অনুদান দিয়েছে কলেজে পড়ার জন্য। বদরপুর কলেজেও সে ফ্রি। রেজাল্ট বেরুবার পর গ্রামের পাঁচ-ছটি পরিবার তাকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে ও একটি করে শাড়ি দিয়েছে। চালের কারবারি বিষ্ণুপদ সাহা বলেছে, যতদিন বেদবতী পড়াশোনা করবে, ততদিন তার বই-খাতাপত্রের সব খরচ সে দেবে।

কলেজে যাওয়া-আসার কষ্ট ছাড়া বেদবতীর পড়াশোনার অন্য কোনো অসুবিধে ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল, সে একদিন কলকাতায় গিয়ে এম. এ. পড়বে। তারপর রিসার্চ করবে।

কল্যাণ বলল, মেয়েটি যদি দেখতে কুৎসিত হত, স্বাস্থ্য খুব খারাপ রোগা, কোল কুঁজো, শ্যাওলা শ্যাওলা মতন চামড়া, তাহলে হয়তো ঠিকই কলকাতা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছে যেত, নামকরা ছাত্রী হত। ডক্টরেটও পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমাদের দেশে সুন্দরী মেয়েদের বেশি লেখাপড়া হয় না। বিশেষত গরিব ঘরের। তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই বোধহয় ঠিক কাজ। চোদ্দ মাইল বাস ঠেঙিয়ে রোজ এরকম কোনো মেয়েকে কলেজে পড়তে পাঠানো বোধহয় বোকামিই।

বিজন জিজ্ঞেস করল, শেষ পর্যন্ত কী হল মেয়েটির?

কল্যাণ গম্ভীর ভাবে বলল, একদিন সে কলেজ থেকে আর ফিরল না।

সইফুল রাগের সঙ্গে বলল, ওর বাপটা একটা ড্যাম ফুল। বাস থেকে মেয়ে নামল না দেখে ফিরে গেল বাড়িতে। পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় একটা খবর দেয় নি।

—মেয়েটা পালিয়ে গেছে কারুর সঙ্গে? কেউ ধরে নিয়ে গেল?

—ছ দিন বাদে তার ডেড বডি ভেসে উঠল কেলেঘাই নদীতে। শী ওয়াজ রেপড অ্যাণ্ড মার্ডারড।

সইফুলকে তার পেশার জন্য অনেক খুন-জখম প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। অনেক রক্ত সে দেখেছে। এই সব ব্যাপারে সে আর তেমন আবেগে উত্তেজিত হয় না। এই কেসটা ঠিক মতন হ্যাণ্ডল করা যায়নি বলে সে ক্ষুব্ধ।

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল।

তারপর নীলা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, তোমরা পুলিশরাই তো কিছু পার না। একটা মেয়ে কলেজে যাবে-আসবে, তার সেফটিও তোমরা দিতে পার না? এই তো ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবস্থা!

সইফুল বিদ্রুপের সুরে বলল, তুমি গ্রামের সম্পর্কে এই কথা বলছ? দিল্লিতে তোমার কী হয়েছিল?

নীলা ঠোঁট উলটে চুপ করে গেল।

বাবার ট্রান্সফারের চাকরি বলে নীলাকে দু বছর দিল্লিতে কলেজে পড়তে হয়েছিল। সে স্মৃতি নীলার কাছে তিক্ত। একদিন দুপুরে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল রাজেন্দ্রনগরের রাস্তায়। খুব গরমের দিন, রাস্তায় বিশেষ লোক থাকে না। হঠাৎ দুটি মোটর সাইকেল এসে থামল তার দুপাশে। দুটি ছেলে জোর করে তাকে তুলে নেবার চেষ্টা করল সেই দিন-দুপুরে। নরম, লাজুক ও ভীরু স্বভাবের মেয়ে ছিল নীলা, কোনোদিন সে চেঁচিয়ে কথা বলেনি, তবু ছেলেদুটিকে বাধা দিয়েছিল প্রাণপণে, সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল, একটি ছেলে তার চুল ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল পর্যন্ত। নীলা সেবার বেঁচে যায় আকস্মিক ভাবে, হঠাৎ একটা বাস এসে পড়েছিল সেখানে। বাস ভর্তি মানুষদের চোখের সামনে আততায়ী দুজন পালাল।

সেই ঘটনার পর নীলা সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তারপর থেকে বাড়ির একজন লোক প্রত্যেকদিন তার সঙ্গে যেত কলেজ পর্যন্ত। সেটাও কম লজ্জার ব্যাপার নয়। কিন্তু নীলা আর একা বেরুতে সাহস করে নি।

সাইফুল বলল, রাজধানী দিল্লিতেই যদি ওই রকম কাণ্ড হয়, তা হলে আমরা এতগুলো গ্রামের ব্যাপার কী করে সামলাব? ক-খানা মাত্র গাড়ি আমাদের। দরকারের তুলনায় পুলিশ ফোর্স অনেক কম।

বিজন বলল, সেই মেয়েটাকে মেরেই ফেলল একেবারে? যারা রেপ করে, তারা খুনিও হয়।

প্রবাল এই সময় আবার ঘরে ফিরে এসে বলল, আজ আবার বৃষ্টি নামছে।

জয়া এতক্ষণ যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতি লক্ষই করেনি। সে বলল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

প্রবাল কোনো উত্তর দিল না। সে যেন কোনো অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। কারুকে চেনে না।

সইফুল উঠে গিয়ে প্রবালের হাতের খালি গেলাসটা নিয়ে তাতে রাম ঢালল, সোডা মেশাল। গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, প্রবালদা, আই অ্যাম ভেরি সরি। ওই বুড়োটা আপনাকে গিয়ে বিরক্ত করে, আপনি ওকে আমার কাছে রেফার করে দেবেন। আমরা কালপ্রিটদের ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেসটা কোর্টেই ড্রপ করা হয়নি।

প্রবাল নিজের শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠে বলল, তিনি তো আমার কাছে সে জন্য আসেন না। কালপ্রিটরা ধরা পড়ল কি পড়ল না, সে ব্যাপারে ওঁর কোনো আগ্রহই নেই। উনি আমার কাছে তো সে কথাটাই তোলেননি কখনো।

—তা হলে উনি আপনার কাছে কিসের নালিশ জানাতে আসেন?

—নালিশ না। একটা দাবি। উনি চান, যে-নদীতে ওঁর মেয়ের মৃতদেহটা ভেসে উঠেছিল, সেই নদীর নামটা বদলে দিতে।

বিজন বলে উঠল, এটা তো অদ্ভুত প্রস্তাব। নদীটা কী দোষ করল?

প্রবাল বলল, অদ্ভুত প্রস্তাব? হ্যাঁ, অদ্ভুতই বোধহয়। আবার ভেবে দেখতে গেলে তেমন অদ্ভুতও কিছু না। কিন্তু এই দাবি মানবার সাধ্য আমার নেই।

২

রাত্তিরের বৃষ্টি জয়ার বেশ পছন্দ। চুল টুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম মেখে, রাত-পোশাক পরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছে। খুব জোরে নয়, ঝিরঝির ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

পা-জামা আর গেঞ্জি পরে প্রবাল শরীর এলিয়ে আছে একটা বিরাট সেকেলে ইজিচেয়ারে।

এই ইজিচেয়ারটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এই বাড়িতে এরকম অনেক পুরনো ফার্নিচার রয়েছে। তার হাতে একটা রাম ভর্তি গেলাস। প্রবাল রোজ মদ্যপান করে না। কিন্তু যেদিন খায়, সেদিন খুব কমে থামতে পারে না। সইফুলের বাড়িতে সে দুবারের বেশি নেয়নি, এখন তার আবার খেতে ইচ্ছে করছে।

জয়া মুখ ফিরিয়ে বলল, আজ এস পি সাহেবের বাড়ির পার্টিটা তেমন জমল না।

প্রবাল বলল, হুঁ!

—তুমি হঠাৎ অফ-মুড হয়ে গেলে! নীলা অত ভাল ভাল রান্না করেছিল, তুমি কিছুই খেলে না কেন?

—ইচ্ছে করল না।

—তোমার কী হয়েছে বল তো? ওই মেয়েটির ব্যাপারটা খুবই ট্র্যাজিক, খুবই স্যাড। কিন্তু তোমার চাকরির কেরিয়ারে এরকম আগে কখনো ঘটেনি? আমার তো মনে পড়ছে, পুরুলিয়ায় সেই যে জোড়া খুন।

প্রবাল হাত তুলে জয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল, খাটের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দেবে প্লিজ?

প্যাকেটটা এনে প্রবালের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বুঝতে পারছি, আজ তোমার কথা বলার মুড নেই। তুমি কিন্তু আর ড্রিংক করবে না। এটাই শেষ। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি শুয়ে পড়েছি।

প্রবাল এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে বলল, আর খাব না। এই শেষ আজকের মতন। শোন, একটু বসো! আজ কল্যাণ যখন ওই বেদবতীর বাড়ির কথা, ইস্কুলে পড়াশুনোর কথা বলছিল, আমার মনে হচ্ছিল, আমি ওর মুখে আমারই জীবন কাহিনী শুনছি!

জয়া অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী?

প্রবাল বলল, আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, সবাই আমাকে কী বলতো জানো? জিনিয়াস?

আপনমনে হা-হা করে হেসে উঠল প্রবাল। নিজের হাসি সে নিজেই খুব উপভোগ করছে।

হাসতে হাসতে দু-তিনবার বলল, জিনিয়াস! জিনিয়াস!

তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বলল, আসলে কিন্তু আমি জিনিয়াস ফিনিয়াস কিছু নই! তাহলে আর শুধু আই এ এস হব কেন? আমার মেমারিটা খুব ভাল ছিল, মুখস্থ করতে পারতাম খুব, ইংরিজি-বাংলা পাতার পর পাতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারতাম। তাতেই লোকে অবাক হয়ে যেত! ইস্কুলের মাস্টাররা মনে করত আমি বড় হয়ে দারুণ একটা কিছু হবো।

জয়া বলল, তুমি কিছু খারাপ হওনি। এম এ-তে ইংলিশে ফার্স্ট হয়েছিলে। এবার উঠে পড় তো। তোমার নেশা হয়ে গেছে।

—শোন, শোন। আসল কথাটা শোন। তুমি আমাদের নবীপুরের বাড়িতে যাওনি। এখন সে বাড়িতে আমার এক কাকা থাকে। মাটির বাড়ি বুঝলে, টিনের চাল। আমরা ছেলেবেলায় কখনো পাকা বাড়িতে থাকিনি। বাবা স্কুল মাস্টার, জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন, তার সংসারটাও বাবার ঘাড়ে পড়েছিল। ভাল করে খাওয়া জুটত না। সেই বাড়ির ছেলে আমি। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর আমি কী করে কলেজে পড়ব, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। বাবার তো সামর্থ ছিল না। স্কলারশীপ পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে টাকা নিয়মিত প্রতি মাসে পাওয়া যায় না। আর সেই সামান্য টাকায় হস্টেলেও থাকা যায় না। আমার পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে যাবার কথা ছিল।

—আহারে, অথচ তুমি তো তোমার বাবার একমাত্র ছেলে ছিলে?

—ঠিক ওই বেদবতীর মতন। সে মেয়ে। আমি ছেলে। শেষ পর্যন্ত আমিও বাস আর ট্রেন বদল করে একুশ মাইল দূরের কলেজে যেতাম। বাস ভাড়া লাগত না। ট্রেনের টিকিট কাটতাম না প্রায়ই। তবু আমি ঠিক চালিয়ে গেছি। তার কারণ, আমি একটা ছেলে। আর বেদবতী পারে নি, তার কারণ সে একটা মেয়ে। ছাত্র অবস্থায় আমি যদি মরে যেতাম, তা হলে আমার বাবা-মায়ের কী অবস্থা হত বল তো? ইউ ক্যান ওয়েল ইমাজিন। আর এই বেদবতী, তার বাবা-মায়েরও নিশ্চয়ই অনেক সাধ আর স্বপ্ন ছিল এই মেয়েটিকে ঘিরে। একটা মেয়ে, মাত্র সতেরো বছর বয়েস, সুন্দরী, মেধাবিনী, গান গাইতে পারে ভাল, মনের জোর আছে, সেই রকম একটা মেয়েকে কয়েকটা লোক ধরে নিয়ে গেল, শুধু কয়েকবার তার শরীরটা ভোগ করার জন্য, তারপর তাকে খুন করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই লোকগুলো কি মানুষ, না রাক্ষস?

—পুলিশ তাদের কোনো ট্রেসই পেল না। কী আশ্চর্য বল তো! লোকে যে পুলিশের নামে বদনাম দেয়, তা কি এমনি এমনি? অথচ সইফুলকে দেখলে মনে হয়, খুব কাজের!

—জয়া, তুমি বাড়ির গাড়ি করে প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতে, তাই না?

—ভ্যাট। প্রথম প্রথম দু-একদিন, তারপর বাসে করেই তো গেছি রোজ। কলকাতার শহরে আবার ভয় কি! সবাই বাসে করেই তো যায়!

—কলকাতার বাস আর এখানকার বাস তো এক নয়। সেদিন বদরপুর থেকে বাসটা আসতে আসতে মাঝপথে থেমে যায়। কিছুক্ষণ বনেট তুলে ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বলে দিল আর যাবে না। তখন রাত হয়ে গেছে। আর কোনো বাস নেই। গ্রামের লোক হেঁটেই পাঁচ-দশ মাইল চলে যেতে পারে। কিন্তু একটি সতেরো বছরের সুন্দর চেহারার মেয়ে কি তা পারে? পারলেও অন্যরা তাকে পারতে দেবে না। সেইখান থেকেই বেদবতীকে আর পাওয়া যায়নি।

কেউ বলে ওই রাস্তা দিয়ে একটা জিপ গিয়েছিল, সেই জিপটাই মেয়েটিকে তুলে নিয়েছে। আবার অনেকেই জিপ টিপ কিছু দেখেনি।

—আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। যদি বাইরের লোকেরাই এই কাণ্ডটা করে থাকে, তা হলে মেয়েটি মাঝখানের পাঁচ দিন ছিল কোথায়? লোকেরা তাকে ধরে অন্য কোথাও নিয়ে গেল, তারপর মেরে আবার এখানকার নদীতেই ফেলে গেল?

—হয়তো এখানেই কোথাও লোকগুলো ঘাপটি মেরে ছিল কয়েকদিন। মেয়েটার শরীরের সঙ্গে পাথর-টাথর বেঁধে ফেলে দিয়েছিল। কোনো রকমে পাথরগুলো খুলে গিয়ে বডিটা ভেসে ওঠে। শরীরে একটা সুতোও ছিল না। শরীরে আর কোনো ক্ষতও নেই, গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

—থাক, আর বলতে হবে না।

—রাবণ এসেছিল। রাবণকে আটকাতে পারল না মেয়েটা।

—অ্যাঁ, রাবণ? কী বলছ? এই তোমার নেশা হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি।

—হ্যাঁ রাবণই তো। কিন্তু হেরে গেল মেয়েটা!

—আর বাজে বকবক করো না তো। তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড ক্রুড করছ। এবার শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি।

—শোন, কুশধ্বজ আর মালাবতীর মেয়ে হচ্ছে বেদবতী। ওরা স্বামী স্ত্রী চেয়েছিল, স্বয়ং লক্ষ্মীকে মেয়ে হিসেবে পেতে। কিন্তু যে মেয়ে জন্মাল, সে জন্মের পরই বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। এ তো লক্ষ্মী নয়! এ অন্য মেয়ে। এর নাম রাখা হল বেদবতী। মেয়ে পড়াশোনায় খুব ভাল, আই মীন, বেদ-টেদ সব মুখস্থ ছিল। কিন্তু যখন সে জানল, তার মা-বাবা লক্ষ্মীকে মেয়ে হিসেবে চেয়েছিল, তখন সে কঠোর তপস্যায় লক্ষ্মী হতে চলে গেল। আমাদের এই টিয়াজালি গ্রামের দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য আর তার বউ নিশ্চয়ই মেয়ের বদলে ছেলে চেয়েছিল। সব গরিবরাই তাই চায়। আমার বাবা-মাও তাই চেয়েছিলেন। আমার মাকে সবাই বলত ভাগ্যবতী। কারণ আমি হীরের টুকরো ছেলে। হে-হে-হে-হে! তা ওই দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের ছেলে হল না, শুধু এক মেয়ে, তখন সেই মেয়েকেই ছেলের মতন মানুষ করতে লাগল। বেদবতীও বুঝতে পেয়েছিল বাবা-মায়ের দুঃখ। ছেলেরা ভবিষ্যতের ভরসা। বেদবতী চেষ্টা করছিল, সে ছেলের মতনই হয়ে উঠবে, লেখাপড়া শিখবে অনেক, ভাল চাকরি পাবে, বাবা-মায়ের দুঃখ দূর করবে। কিন্তু রাবণ এসে গেল।

—এর মধ্যে আবার রাবণ আসছে কোথা থেকে?

—রাবণ এসেছিল। হ্যাঁ, সত্যি। এই বেদবতী না, পুরাণের সেই বেদবতী, সে পাহাড়ে গেল তপস্যা করতে। আমাদের এই বেদবতী যেমন অনেক দূরের কলেজে পড়তে গিয়েছিল। পুরাণের সেই বেদবতী নির্জন পাহাড়ে গেল তপস্যা করতে, সে লক্ষ্মী হতে চেয়েছিল। সেখানে একদিন রাবণ এল। অতিথি হয়ে। অতিথিকে সেবা করতে হয়, তাই বেদবতী তার সামনে ফল-মূল সাজিয়ে সেবা করতে গেল। কিন্তু রাবণ শালা ছিল মহা কামুক। সুন্দরী মেয়ে দেখলে দশটা মাথাই ক্ষেপে যেত একসঙ্গে। সে বেদবতীকে ভোগ করার জন্য হাত বাড়াতেই সেই তপস্বিনী বলল, তিষ্ঠ! সেকালে মেয়েদের তেজ থাকত, বুঝলে! আর সে মেয়ে সাঙ্ঘাতিক তপস্বিনী। সে তিষ্ঠ বলতেই ব্যাস, রাবণ আর এগোতে পারে না। স্তম্ভিত হয়ে গেল একেবারে। স্ট্যাচুর মতন। কিন্তু দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ে তো তা পারল না। কেন পারল না। সীতা, সে সীতা হবে?

জয়া কাছে এসে প্রবালের হাত ধরে বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলছ। রামায়ণের গল্পের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ। এবার আমি কিন্তু আলো নিভিয়ে দেব!

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে প্রবাল খানিকটা টলে গেল। জয়ার দু কাঁধে হাত রেখে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কিচ্ছু গুলিয়ে ফেলিনি। সব ঠিক বলছি। পুরাণ-টুরান আমার ভাল করে পড়া আছে। ওই যে বেদবতী রাবণকে স্তম্ভিত করে দিল, তারপরই কি তার কাহিনী ফুরিয়ে গেল! না। আরও আছে। রাবণ যে তার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছিল, তার জন্য রাবণের আর কোনো শাস্তি হবে না? বেদবতীর যে অপমান হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেবে না? রাবণের মতন একটা লম্পট তার দিকে কামাতুর চোখে চেয়েছিল বলে বেদবতী ক্ষোভে-দুঃখে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে স্বেচ্ছায় পুড়ে মরে। কিন্তু তার আগে সে রাবণকে বলে গেল, আমি আবার শিগগিরই এক অযোনিজ কন্যা হয়ে জন্মাব। তখন আমারই জন্য সবংশে ধ্বংস হবে! সেই মেয়ে পরের জন্মে কী হল বল তো? সীতা! জনক রাজার মেয়ে, কিন্তু তার কোনো মা ছিল না। বিষ্ণুর অবতার তো রাম, তার সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে হল, সুতরাং সে লক্ষ্মীর জায়গাটাও পেল। তার তপস্যা সার্থক। আর তার জন্যই রাবণকে মরতে হয়নি? এবার বুঝলে? আমি ঠিক বলেছি, না ভুল বলেছি?

জয়া প্রবালকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকালে সে অন্য মানুষ। ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ। দফায় দফায় মিটিং। বিভিন্ন দলের দাবি-দাওয়া শোনা। নানান জায়গা পরিদর্শন। সার্কিট হাউসে একজন মন্ত্রী এসে উঠলেন হঠাৎ, তাঁর সঙ্গে রাত দেড়টা পর্যন্ত কাটাতে হল জরুরি আলোচনায়। এক ফোঁটা মদ তো দূরের কথা, বয়স্ক মন্ত্রীর সামনে সে সিগারেটও খেতে পারে না।

তিন দিন পরেই তাকে জিপ নিয়ে সোজা চলে যেতে হল কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী সব ডি. এম-দের ডেকেছেন কোন গোপন পরামর্শের জন্য। সেখান থেকে পরদিন ফিরেই প্রবাল আবার গেল একটা মহকুমা সদরে, কিছুটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছিল, বড় কিছু ঘটার আগেই থামান গেল কোনোক্রমে।

এর মধ্যে জয়ার সঙ্গে ভাল করে কথা বলারই সময় পায় না সে। দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ের কথা আর উত্থাপন করল না একবারও।

মহকুমা থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরছে প্রবাল, অ্যামবাসেডরে বসে বসে সে ঝিমুচ্ছে। এসকর্টের গাড়িটা পেছনে। রাত প্রায় নটা। আজও বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। কয়েকদিনের পরিশ্রমে অনেক ক্লান্তি জমেছে তার শরীরে।

হঠাৎ তার ড্রাইভার খুব জোরে ব্রেক কষল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, স্যার, স্যার!

প্রবাল চমকে চোখ মেলল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় শুধু গাড়ির হেড লাইট পড়েছে। বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কুয়াশার মতন। তার মধ্যে দেখা গেল একজন মানুষকে, ধুতি ও শার্ট পরা, দু-হাত উঁচু করে কী যেন বলতে চাইছে।

যেন এক প্রেতাত্মা। আবছা।

ঘুমের আবেশ কাটেনি বলে প্রবালের মনে হল, এ কি হ্যামলেটের বাবার মতন কোনো কিছুকে সে দেখছে? এই ধুতি শার্ট পরা মূর্তিটি তো অবিকল তার অনেক বছর আগে মৃত বাবা। বাবা কি কোনো গোপন কথা বলতে এসেছে তাকে?

তারপর গাড়ির দরজা খুলে নেমে, গটমট করে হেঁটে গিয়ে প্রবাল খানিকটা কঠোর গলায় বলল, কী ব্যাপার? আপনি এ ভাবে আমার গাড়ি আটকালেন কেন?

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য হাত জোড় করে অনুনয় করল, এক মিনিট স্যার, এক মিনিট আপনি আমার কথাটা শুনে যান।

প্রবাল আবার বলল, আপনার বয়েস হয়েছে, তবু এমন ছেলেমানুষি করতে আছে? আমার গার্ড আগেই গুলি চালিয়ে দিতে পারত। তাকে দোষও দেওয়া যেত না। এমন ভাবে ডাকাতরা গাড়ি আটকায়।

দারুকেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন, স্যার। বুঝতে পারিনি স্যার।

—বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকার রাস্তায় আপনি এ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? কী করে বুঝলেন, আমি এই সময় এ রাস্তা দিয়ে যাব।

—আমি রোজই এখানে দাঁড়িয়ে থাকি এই সময়টায়।

—তার মানে এটা আপনাদের গ্রামের বাস স্টপ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভট্টাচার্যিমশাই আপনি শিক্ষিত মানুষ, একটা স্কুলে পড়ান। এ আপনি কী পাগলামি করছেন? আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আপনার মেয়ে আবার একদিন এখানে কলেজ থেকে ফিরে বাস থেকে নামবে?

—না, না, তা বিশ্বাস করি না। সে কি আর হয়। এমনিই অভ্যেস। এখানে রোজ এসে দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তো। সেই টানে চলে আসি। আমার বউ নিষেধ করে।

শুধু শুধু বৃষ্টি ভেজার কোনো মানে হয় না। দারুকেশ্বরের অবশ্য সর্বাঙ্গ ভিজে। বুড়ো মানুষটার না নিউমোনিয়া হয়ে যায়।

গাড়ি দুটোকে সাইড করতে বলল, প্রবাল।

তারপর নিজের গাড়ির দরজাটা খুলে বলল, আপনি ভেতরে এসে বসুন। সামনের সীটের ওপর দেখুন একটা তোয়ালে আছে, সেটা দিয়ে ভাল করে মাথাটা মুছে নিন।

দারুকেশ্বর বলল, থাক থাক, ওসব লাগবে না। আপনি দয়া করে...

প্রবাল বেশ জোর দিয়ে বলল, আগে মাথাটা মুছে নিন! পরে কথা শুনব।

নিজেও ভেতরে এসে প্রবাল বলল, ভটচার্যি মশাই, আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি? কিছু মনে করবেন না তো?

দারুকেশ্বর প্রায় মরমে মরে গিয়ে জিভ কেটে বলল, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। এ কী বলছেন স্যার! আপনি কত বড়, আপনি আমার অনুমতি নেবেন কেন? আমি অতি নগণ্য মানুষ। স্যার, আপনাকে আমি যে পিটিশনটা দিয়েছিলাম।

—আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো! আপনার মেয়ে একদিন কলেজ থেকে ফিরল না। সারা রাত কেটে গেল। তারপরেও আপনি থানায় খবর দেন নি কেন?

—কেউ কেউ যে বলল, সে রতন দাসের সঙ্গে বাসে উঠেছিল, তার সঙ্গেই শহরে চলে গেছে। কলকাতা শহরে। যেখানে কোনো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

—রতন দাসটি কে?

—পরের দিন সকালেই আমি বদরপুর কলেজে খোঁজ নিতে গেলাম। দুটি মেয়ে বলল, আগের দিন বিকালে তারা আমার কন্যাকে রতন দাসের সঙ্গে এক বাসে উঠতে দেখেছে। রতন উঁচু ক্লাসের ছাত্র। পলিটিক্স করে। কলকাতায় যাওয়া-আসা করে। একদিন সে সীতার সঙ্গে আমাদের বাড়িতেও এসেছিল। দুপুরে খেয়ে গেল ভাত।

—সীতা কে? আপনার মেয়ের ডাক নাম?

—বেদবতীরই তো আর এক নাম সীতা।

প্রবাল এমন একটা মুখের ভাব করল, যেন এ সব বিষয়ে সে কিছুই জানে না, জানার আগ্রহও নেই। ঠিক বিজনের মতন।

সে জিজ্ঞেস করল, রতন দাস? পুলিশ এর খোঁজ পায় নি?

দারুকেশ্বর প্রায় আর্তভাবে বলে উঠল না, না, তার কোনো দোষ নেই। রতন দাস কোথাও যায় নি। সে সীতা-মার সঙ্গে বাসে উঠেছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই নেমে যায়। তার বাড়ি পাশের গ্রামে।

—রতন দাস কিছু জানে না? তবু আপনি একটা বাজে সন্দেহ করে পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় গেলেন না?

—আসল ব্যাপার কী হয়েছিল জানেন স্যার। একদিন দুপুরে ওই রতন আমাদের মেয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল তো। ছেলেটি ভাল, কথাবার্তাও ভাল। কিন্তু দাসেদের বাড়ির ছেলে সীতার সঙ্গে তার অমনধারা মেলামেশা ঠিক ভাল দেখায় না। আমার স্ত্রী সীতাকে সেদিন বলেছিল, তুই ওই রতনকে বিয়ে করবি নাকি? খবরদার, অমন কথা মনেও স্থান দিবি না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু জাত-ধর্ম গেলে আর মানুষের কী থাকে? এই কথা শুনে সীতা খুব রাগ করেছিল। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তারপর কান্নাকাটি করেছিল খুব।

—মেয়েকে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না? একদিন একটা ছেলে বাড়িতে গিয়েছিল বলেই বিয়ের কথা ভাবতে হবে?

—আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। ন্যায্য কথা বলেছেন। দিন কাল পালটে গেছে। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে ইস্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু আমরা তো পুরনো আমলের, বিশেষত আমার ব্রাহ্মণী এ সব ঠিক বুঝতে পারেন না। দাসেদের ছেলে দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে এসে ভাত-টাত খেল, মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, তাই কেমন কেমন লাগে। মেয়ে যখন ফিরল না, আমরা ভাবলাম, মা-বাবার ওপর রাগ করে সে ওই ছেলের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে, তাতে আমরা কপাল চাপড়ে কাঁদতে পারি। আর তো কিছু পারি না। পুলিশ আর কী সাহায্য করবে বলুন।

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রবাল নিষ্ঠুরের মতন বলল, আপনার মেয়ে খুন হয়েছে, তার বদলে সে যদি রতন দাসের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত, সেটা বোধহয় আরও খারাপ হত, তাই না? ধরুন পুলিশ ওদের কলকাতা থেকে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে এল, তখন কি মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিতেন?

প্রবালকে অবাক করে দিয়ে দারুকেশ্বর বলল, এটা আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। সে যদি এক শুদ্দুরের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে যেত, বাপ-মাকে অগ্রাহ্য করে, তিলে তিলে তাকে গড়ে তুলেছি, নিজেরা না খেয়ে তার বই-পত্তর কিনে দিয়েছি, সেই মেয়ে যদি এমন অকৃতজ্ঞ হত। তবে সেই আঘাত কি সহ্য করতে পারতাম? বোধহয় পারতাম না। এখন যা ঘটেছে, তাতে আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই। নিয়তি। ভবিতব্য। মানুষের তো এতে কোনো হাত নেই।

—মানুষেরই হাত। মানুষের হাতেই খুনটা হয়েছে। নিয়তির কোনো হাত থাকে না। আপনি নাকি খুনিদের শাস্তি হোক, তাও চান না?

—শাস্তি তারা পাবেই। যিনি শাস্তি দেবার তিনিই দেবেন। সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত করতে চাই না স্যার।

—আপনার মতন আরও বহু লোক যদি ভগবানের ওপর এমন পুরোপুরি নির্ভর করত, তা হলে পুলিশের কাজ, আমাদের কাজ অনেক কমে যেত।

—আপনি স্যার, শুধু আমার সামান্য আর্জিটা...আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

—না, পারি না। নদীর নাম কি হঠাৎ বদলানো যায়? এরকম শুনেছেন কখনো? কত রকম কাগজে পত্রে, দলিলে, ম্যাপে নদীর নাম লেখা থাকে। সে সব কে বদলাবে?

—কেন স্যার, রাস্তার নাম যে বদলায়? কলকাতায় হ্যারিসন রোড যে হয়ে গেল মহাত্মা গান্ধি রোড। আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট হয়ে গেল বিধান সরণী। হয়নি?

—সে তো সব বিদেশি নাম বদলানো হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর বিদেশি নামের রাস্তা কেউ রাখে?

—সব বিদেশি নাম নয়। ধর্মতলার নাম হল লেনিন সরণী, চৌরঙ্গির নাম জওহরলাল নেহরু রোড। তারপর ধরুন স্যার, মাদ্রাজ হয়ে গেল তামিলনাড়ু। গুজরাটের নামও কী যেন হয়েছে। এত বড় বড় জায়গার নাম যদি বদল হতে পারে তা হলে একটা ছোট নদীর নাম কি বদলানো যায় না?

প্রবাল এবার খানিকটা অধৈর্য হয়ে বলল, আঃ! এ সব তো রাজনৈতিক ব্যাপার। তা ছাড়া নদীর নামটা বদলেই বা আপনার কী লাভ হতে পারে? কেন এটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন?

এতক্ষণ পর্যন্ত দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা হলেও চোখ ছিল শুকনো। এবার সে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। হাউ হাউ করে কেঁদে বলতে লাগল, লাভ হবে না কিছু, আমি লাভের কথা বলিনি স্যার, আমার মেয়েটার একটি স্মৃতি...সে কি একেবারে হারিয়ে যাবে....আমার সীতা, তাকে কেউ মনে রাখবে না? ওঃ হো-হো, আমার সীতা মা...

প্রবাল কান্না সহ্য করতে পারে না। বাধাও দিতে পারে না, সান্ত্বনাও দিতে পারে না। সে চুপ করে থেকে প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটিকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল।

নদীর নাম কেলেঘাই। শীত-গ্রীষ্মে প্রায় শুকিয়ে যায়, তার চেহারা দেখে তখন নদী বলে মনেই হয় না, তার গর্ভে নেমে গিয়ে ছেলেরা খেলা করে, রাখালরা গরু চরায়, বাড়ির ভিত করার জন্য অনেকে মাটি তুলে নিয়ে যায়। একমাত্র বর্ষাকালেই দেখা যায় তার তেজ। তখন তার ঢেউ যেন টগবগ করে ফোটে। স্রোতের টানে নৌকো ভেসে যায়। এক এক বছর এই নদী উপছে উঠে বন্যাও হয়। দু পাড়ের বাড়ি ভাসায়।

কেলেঘাই কোনো ঠাকুর দেবতার নয়। পীর-ফকিরের নাম নয়। স্থানীয় কোনো সংস্কৃতির সঙ্গেও এর যোগ নেই। নিতান্তই একটা অর্থহীন শব্দ। এ নামের বদলে একটা ফুটফুটে সুন্দর কিশোরী মেয়ের নাম দিয়ে তার স্মৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখলে দোষের কী আছে?

কিন্তু একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়েই এ রকম নাম পালটাতে পারে না। অনেক প্রশ্ন উঠবে।

দারুকেশ্বরের কান্নায় সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে গেল। ধুতির খুঁট দিয়ে নাক মুছে সে সামলে নিল খানিকটা।

প্রবাল ভারি গলায় বলল, পণ্ডিতমশাই, আপনি জেলা বোর্ডের কাছে আপিল করুন। স্থানীয় এম. এল. এ-কে ধরুন। ওঁরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পলিটিক্যাল লেভেলে সিদ্ধান্ত নিলে আমি সেটা কার্যকর করতে পারি। তার বেশি আমার ক্ষমতা নেই।

দারুকেশ্বর অসহায় মুখখানি তুলে বলল, আমরা অল্প বয়েস থেকে দেখেছি, ডি. এম. সাহেব ইচ্ছে করলে সবই পারেন।

প্রবাল হেসে বলল, সে সব দিন আর নেই। চলুন, পণ্ডিতমশাই, আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দারুকেশ্বর তাতে প্রবল আপত্তি করে উঠল। তাকে পৌঁছে দিতে হবে না, সে হেঁটেই যেতে পারে। তা ছাড়া জল-কাদার রাস্তা, তার বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায়ই না।

প্রবাল বলল, যতটুকু যাওয়া যায়, ততটুকু এগিয়ে দিচ্ছি। এই অন্ধকারের মধ্যে হাঁটবেন কেন?

দারুকেশ্বর কিছুতেই রাজি হল না। না, না, না বলতে বলতে প্রায় জোর করেই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। হনহন করে হেঁটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। বৃষ্টি পড়ছে এখনো।

অন্যসময় দারুকেশ্বর এত বিনীত, কিন্তু বিদায় নেবার সময় সে একটাও কিছু বলল না প্রবালকে। তার রাগ কিংবা অভিমান হয়েছে। তাই সে প্রবালের গাড়িতে চড়তে চায় না।

প্রবাল একবার কাঁধ ঝাঁকাল। সে আর কী করতে পারে।

ড্রাইভারকে সাক্ষী মেনে বলল, দেখলে তো, এত করে বোঝালাম, তবু কিছুতেই বুঝবেন না। আমি আর কী করতে পারি বল।

ড্রাইভার বলল, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে স্যার। একটাই মোটে মেয়ে, সে অমন ভাবে মরেছে, কী করে সহ্য করবে। আমি শুনেছি স্যার, টিয়াজালির ওই মেয়েটার সঙ্গে অনেকেই ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। কলেজে পড়তে না পাঠিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলে বেঁচে যেত। ঠিক কি না স্যার, বলুন।

প্রবাল এই আলোচনা আর চালাতে চায় না। সে বলল, স্টার্ট দাও। চল, অনেকটা দেরি হয়ে গেল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করতে প্রবাল মাথা এলিয়ে দিল। এখনো ঘন্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে পৌঁছোতে। আবার খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে হয়। এই রাস্তাটা যে টিয়াজালি গ্রামের ওপর দিয়ে গেছে, তা প্রবালের আগে খেয়াল হয়নি। অন্য একটা রাস্তা দিয়েও ফেরা যেত।

কিন্তু ঘুম আর এল না। এলমেলো চিন্তা ঘুরতে লাগল মাথায়।

বাবার কথা মনে পড়ল। দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার বাবার যেন চেহারারও মিল ছিল খানিকটা। বাবাও এরকম দুর্বল ধরনের মানুষ ছিলেন।

এম. এ. পাশ করার পরই একটা কমার্শিয়াল ফর্মে চাকরি পেয়ে যায় প্রবাল। সেই চাকরি করতে করতেই সে আই এ. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেই সময় কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাবা-মাকে গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে। তখন তার গাড়ি থাকার কোনো প্রশ্নই ছিল না। বাবা ট্রামে-বাসেও চড়তেন না। হেঁটে হেঁটেই ঘুরতেন কলকাতা শহরে। প্রবালের ভয় হত, বাবা গাড়ি চাপা না পড়েন। কলকাতায় কখনো থাকেননি তো আগে। সেবারও বেশিদিন রইলেন না। কলকাতা তাঁর ভাল লাগেনি। মাকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে গেলেন। প্রবালকে বলে গেলেন, তুই যখন বড় চাকরি করবি, গ্রামের বাড়িটার একখানা ঘর অন্তত পাকা করে দিস। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে সাপ ঢোকে। আর এক জোড়া গরু কিনব। আসলে তো আমরা ঘোষ গয়লা, গরু পালতে পারব ভালই।

আই. এ. এস পরীক্ষাতেও ভাল রেজাল্ট করেছিল প্রবাল। উত্তর ভারতের এক পাহাড়ি শহরে সে যখন ট্রেনিং নিচ্ছে, সেখানে হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পেল বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। অ্যাটাক হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া যায়নি।

ছেলের 'বড় চাকরি' দেখে যেতে পারেননি বাবা। প্রবাল তার পিতৃঋণ কিছুই শোধ করতে পারেনি।

গ্রামের বাড়িটা আর পাকা করা হয়নি। বাড়ির অংশ নিয়ে কাকা ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। ওই তো সামান্য সম্পত্তি, তা নিয়ে আবার ভাগাভাগি। সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল প্রবাল। বাবা নেই, সে কি ওই গ্রামে আর কোনোদিন বাস করতে যেত? মা এরপর বেঁচে ছিলেন পাঁচ বছর।

প্রবালের ছেলেবেলার গ্রাম, মফস্বল শহরের কলেজ জীবনের সঙ্গী-সাথী, এসব কিছুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে একেবারে। কলেজটার পঁচিশ বছরের জয়ন্তীতে তাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, প্রবাল তখন দিল্লিতে, যেতে পারেনি।

রতন দাস ছেলেটি কেমন? ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। সে একা একদিন চোদ্দ মাইল দূরে বেদবতীর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে ভাত খেয়েছে। সেখানে সে কী রকম ব্যবহার পেয়েছিল বেদবতীর বাবা-মায়ের কাছ থেকে? রতন প্রায়ই বেদবতীর সঙ্গে বাসে ফিরত। শুধু কি বন্ধুত্ব, না সে ভালবেসেছিল বেদবতীকে? মনে মনে তাঁকে বিয়ে করার সাধ ছিল? কিংবা সে জানত, ভট্টাচার্যি বাড়ির মেয়ের সঙ্গে দাসদের বাড়ির ছেলের বিয়ে হয় না।

জয়া বিয়ের আগে ছিল চক্রবর্তী। প্রবাল ঘোষের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে জাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। জয়াদের বাড়িতে ওসব কেউ মানে না। শহরের অনেকেই এসব গ্রাহ্য করে না আজকাল। শহর থেকে এই সব গ্রামগুলো কত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে।

বহু পুরনো একটা ব্যথা প্রবালের বুকে কাঁটার মতন বিঁধল আবার। প্রবাল অস্বস্তিতে ছটফট করে এপাশ ওপাশ ফিরল, আর একটা সিগারেট ধরাল, তবু ব্যথাটা যাচ্ছে না।

মেয়েটির নাম মালিনী। ষোলো-সতেরো বছর বয়েস হবে তখন। প্রবাল সেই সময় মফস্বল কলেজের ছাত্র। ভাল রেজাল্ট করার জন্য সহপাঠীরা অনেকে তাকে খাতির করত। সন্তোষ ব্যানার্জি নামে একটি ছেলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল প্রবালের।

সন্তোষদের অবস্থা ছিল সচ্ছল, মাঝে মাঝে সে প্রবালকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো। গরিবের ছেলে প্রবাল ভাল করে খেতে পায় না, কলেজে কখনো টিফিন করে না, এইসব কারণেই সন্তোষ ডাকত প্রবালকে। সন্তোষের মা-ও খুব স্নেহ করতেন তাকে। সন্তোষের বাবা প্রায়ই তাঁর ছেলেকে ধমক দিয়ে বলতেন, এই প্রবালকে দেখে দেখে শেখ। গ্রামের ইস্কুলে পড়েও স্কলারশীপ পাওয়া যায়।

সেই সন্তোষের বোন ছিল মালিনী। খুব চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে ছিল, ব্যবহারে জড়তা ছিল না একটুও। দেখতে খুব একটা সুন্দর না, আবার খারাপও না, তার সঙ্গে সাবলীল ব্যবহারের একটা আলাদা সৌন্দর্য ছিল। পড়াশোনায় তেমন কিছু ভাল ছিলনা মালিনী, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করত চমৎকার। নানান অনুষ্ঠানে সে আবৃত্তি করতে যেত।

সেই মালিনীর সঙ্গে কি তার প্রেম হয়েছিল? না, না, তখন প্রেম ট্রেমের কোনো চিন্তাই মাথাতে ছিল না প্রবালের। একমাত্র জেদ ছিল, পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করে কলকাতায় এম. এ. পড়তে যেতে হবে। মফস্বলের গণ্ডি ছেড়ে বড় জায়গায় যেতেই হবে তাকে।

মালিনীর সঙ্গে প্রেম ছিল না, ভাব ছিল বেশ। নানারকম ইয়ার্কি, ঠাট্টা হত, তার বেশি কিছু না। সেই মালিনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। একটিমাত্র পাত্র পক্ষ দেখতে এসেই পছন্দ করে ফেলল, মালিনীকে, পণ-যৌতুক নিয়েও বেশি দরাদরি হল না। সবাই বেশ খুশি।

সেই সময় সন্তোষের একটা কথা প্রবালের গালে একটা থাপ্পড়ের মতন লেগেছিল!

সন্তোষ হাসতে হাসতে জানিয়েছিল, বাবা কী বলছিল জানিস? বাবা আফশোস করে বলল, তোর ওই বন্ধু, প্রবাল, ছেলেটাকে আমার মেয়ের খুব পছন্দ, ও যদি ঘোষ না হয়ে বামুন হত, ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতাম। গরিব হলেও আমার আপত্তি ছিল না।

সন্তোষ ভেবেছিল, এটা প্রবাল সম্পর্কে প্রশংসার কথা। কিন্তু অপমান প্রবালের সমস্ত শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সে মালিনীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যায়নি, সন্তোষের সঙ্গেও আর মিশত না বিশেষ।

সেই অপমানের জ্বালাটা এতদিন পরেও রয়ে গেছে।

মালিনীর মুখখানাও মনে আছে স্পষ্ট। যদিও মালিনীর সঙ্গে জয়ার কোনো তুলনাই হয় না। জয়ার রূপ-গুণ অনেক বেশি। জয়াও ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে। তবু এখনো প্রবালের ইচ্ছে হয়, সেই মফস্বল শহরে গিয়ে সন্তোষের বাবাকে কোনো এক ছুতোয় ধরে এনে চাবকাতে।

রতন দাসের সঙ্গে নিজের অনেক মিল খুঁজে পাচ্ছে প্রবাল। আহা, ওই রতন ছেলেটা এখন নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। ভট্টচাজ বাড়ি থেকে বেদবতীকে হরণ করে নিয়ে যাবার সাহস হল না কেন তার? মেয়েটা তা হলে হয়তো সত্যি বেঁচে যেত।

৩

বৃষ্টি এবার পাকাপাকি বিদায় নিয়েছে। আকাশের মেঘ কাশ ফুলের সঙ্গে রং মিলিয়ে সাদা হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে উঁকি মারে গাঢ় নীল।

সোমবার একটা সরকারি ছুটি। শনিবার দুপুর থেকে লং উইক এণ্ড। এই ছুটিটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। একটা কিছু প্রোগ্রাম করার জন্য জয়া ছটফট করছে। কলকাতা ঘুরে এলে কেমন হয়?

প্রবালের খুব আপত্তি নেই। মঙ্গলবার যদি রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা কাজের ব্যাপার তৈরি করা যায়, তা হলে সরকারি গাড়ি নিয়েই যাওয়া যেতে পারে। তার সরকারি ট্যুর হবে। রাইটার্স বিল্ডিংসে কিছু কাজও আছে সত্যিই।

জয়ার দিদি-জামাইবাবু কানপুর থেকে কলকাতায় এসেছে, এখন ওখানে গেলে বেশ আড্ডা হবে। প্রবালের নিজস্ব কেউ আর নেই। শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গেই তার প্রধান সামাজিক সম্পর্ক।

কিন্তু অন্য একটা প্রস্তাব এল সইফুলের কাছ থেকে।

সইফুলের বন্ধু বিজন একটা বাড়ি কিনেছে শান্তিনিকেতনে। খুব সুন্দর করে নাকি সাজিয়েছে সেই বাড়ি। এই ছুটিতে সে একটা হাউজ ওয়ার্মিং পার্টি দিতে চায়।

শুক্রবার রাত্রে সইফুল আর নীলা এল কিছুক্ষণের জন্য। সইফুল বলল, চলুন প্রবালদা, শান্তিনিকেতন ঘুরে আসি। এখন জেলাটা মোটামুটি পিসফুল, কোথাও কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

নীলা বলল, চলুন, চলুন। আমি কখনো শান্তিনিকেতন যাইনি।

জয়া তাকাল প্রবালের দিকে। মুখ দেখে মনে হয়, তার আপত্তি নেই।

প্রবাল বলল, তুমি ঠিক কর, কলকাতায় যাবে, না শান্তিনিকেতন যাবে?

জয়া বলল, দিদিরা তো এখন কিছুদিন থাকবে। কলকাতায় পরেও যেতে পারি। তুমি না পারলেও আমি একলাই চলে যাব।

প্রবাল মুচকি হাসল। নিজের দিদির চেয়েও বিজনের প্রতিই জয়ার টান বেশি দেখা যাচ্ছে।

জয়া আবার বলল, শান্তিনিকেতনে কী রকম বাড়ি বানিয়েছে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আমারও শান্তিনিকেতনে জমি কেনার ইচ্ছে আছে।

প্রবালের এখনও নিজস্ব কোনো বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেই। কলকাতায় গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে উঠতে হয়। শান্তিনিকেতনে জমি কেনার আগে কলকাতাতেই আগে একটা কিছু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রবাল বলল, ঠিক আছে, চল তা হলে যাওয়া যাক।

এখান থেকে শান্তিনিকেতনে যেতে ঘণ্টা ছয়েক লাগবে। সইফুল গাড়ি নেবে, একটা গাড়িতেই চলে যাবে।

কাল দুপুর বারোটায় একটা স্কুল কমিটির মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে হবে প্রবালকে, এটা অনেক আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। সুতরাং দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরেই বেরুতে হবে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে অবশ্য। তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। বোলপুর থানায় ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে রাখলে বিজনকে জানিয়ে দিতে পারবে, বিজন রান্না-বান্না তৈরি রাখবে।

পরদিন সকাল থেকে জয়া ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে তৈরি। কিন্তু বেলা এগারোটার সময় একটা সমস্যার সৃষ্টি হল।

একটি লোক নিয়ে এল স্থানীয় এম. এল. এ-র চিঠি। তিনি আজ কলকাতা থেকে ফিরছেন। আজ সন্ধেবেলাতেই তিনি ডি. এম. এ.-র সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব জরুরি গোপন ব্যাপার আছে। সার্কিট হাউজে নয়, ডি. এম. এ-র কোয়ার্টারেই তিনি আসছেন।

চিঠিখানা নিয়ে প্রবাল ওপরে এসে জয়াকে দেখাতেই সে জ্বলে উঠল তেলে বেগুনে। এম. এল. এ. যখন তখন চিঠি পাঠালেই ডি. এম.-কে থাকতে হবে নাকি? ডি. এম.-এর ছুটি বলে কোনো বস্তু নেই? সরকারি ছুটি প্রত্যেক সরকারি কর্মচারি অবশ্যই পেতে পারে।

প্রবাল কপাল কুঁচকে বলল, তবু যাওয়া মুস্কিল। আগে বেরিয়ে পড়লে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু চিঠি যখন রিসিভ করেছি, উনি লিখেছেন জরুরি ব্যাপার।

জয়া বলল, যতই জরুরি ব্যাপার হোক। তুমি ছুটির দিনে ছুটি পাবে না? তুমি কি. এম. এল. এ-র চাকর নাকি? সার্ভিস রুলে এরকম লেখা আছে?

প্রবাল দুর্বল ভাবে হেসে বলল, সব কিছু লেখা থাকে না। সরকারি চাকরি অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। সরকারি কাজে যে কোনো সময় আমায় ডাকতে পারে।

—এটা আবার কিসের সরকারি কাজ? কোনো মন্ত্রী যদি ডাকতেন, তাহলেও না হয় বোঝা যেত। এম. এল. এ সরকারের কে?

—রুলিং পার্টির এম. এল. এ-সরকারের প্রতিনিধি। নাঃ, আমার পক্ষে যাওয়া মুস্কিল!

—ঠিক আছে, আমি আর জীবনে কোথাও যাব না। এই মফস্বলে পচে মরব। কলকাতাতেও আর যাব না কোনোদিন।

—আহা হা, অত রাগ করছ কেন? আজকের বদলে আমরা কালকে বেরুতে পারি। কাল ভোর ভোর বেরিয়ে দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব।

—নীলারা আজ দুপুরে যাবে বলে রেডি হয়ে আছে। ওরা শুধু শুধু একটা দিন নষ্ট করবে কেন? ওদের বন্ধুর কাছে ওরা আনন্দ করতে যাচ্ছে, আমরা কেন স্বার্থপরের মতন ওদের আটকাব। তাছাড়া তোমার ওই এম. এল. এ. কোন্ জরুরি কাজের কথা বলবে তার কোনো ঠিক আছে? কালকেও তোমাকে আটকে দেবে।

—না, সেটা আমি ম্যানেজ করব। একবার ওঁর সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারব যে রবিবার আমার ব্যক্তিগত কাজ আছে।

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। তাছাড়া সইফুলরা চলে গেলে তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে যাবে? গাড়ির ব্যাপারে তোমার যা পিটপিটানি। সইফুলরা গাড়ি নিয়ে কত জায়গায় যায়। আর তুমি একটু সরকারি গাড়ি ব্যবহার করলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় একেবারে।

—গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা নিয়ে চিন্তা কর না।

—আজ এম. এল. এ আসছে, কাল যদি কোনো মন্ত্রী এসে পড়ে? আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া হবে না, আমি ঠিক বুঝে গেছি।

—তাহলে এক কাজ করা যাক। তুমি সইফুলদের সঙ্গে আজ চলে যাও। যেমন ঠিক করা আছে।

—আমি তোমাকে রেখে একা যাব? তা হয় নাকি? না, আমার কিচ্ছু দরকার নেই।

শোন, শোন তুমি আজ সইফুল-নীলাদের সঙ্গে যাও। আমি কাল গিয়ে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব। এতে অসুবিধে কী আছে? প্ল্যানটা ঠিকই রইল।

—না, আমি যাব না!

কিন্তু প্রবাল লক্ষ্য করল, জয়ার আপত্তিটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে। বেচারি বেড়াতে যাবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে ছিল। সে আর একটু পেড়াপিড়ি করতেই জয়া রাজি হয়ে গেল। প্রবাল তো একদিন পরে যোগ দিচ্ছেই তাদের সঙ্গে।

স্কুল কমিটির মিটিং সেরে এসে প্রবাল ওদের বিদায় জানাল। যাবার আগে সইফুল জিজ্ঞেস করল, এম. এল. এ সাহেব আমার খোঁজ করবেন না তো? আপনি তাহলে একটু ম্যানেজ করে দেবেন।

প্রবাল বলল, চিঠিতে তোমার কথা কিছু লেখেননি।

সইফুল চোখ টিপে বলল, বলে দেবেন, আপনার চিঠি আসবার আগেই আমি বেরিয়ে গেছি। আমি অনেকদিন ছুটিও নিইনি।

জয়া বলল, তুমি কিন্তু কাল ঠিক আসছ।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর প্রবাল অফিসে গিয়ে বসল। এম. এল. এ. জরুরি কাজের কথা লিখেছেন, নিশ্চয়ই এ জেলা সংক্রান্ত কাজ। আপাতত কোথাও কোনো গোলমাল নেই। হয়তো উনি নতুন কোনো প্রজেক্টের কথা বলবেন।

বিভিন্ন এস. ডি. ও-দের রিপোর্ট পড়তে লাগল প্রবাল।

অন্যান্য কর্মচারিরা চলে গেল একে একে, রয়ে গেল শুধু নাজির সাহেব। এর কোয়ার্টার পাশেই। নাজির সাহেব একেবারে কাজের পোকা।

দুপুর তিনটে আন্দাজ প্রবাল বলল, নাজির সাহেব, আরদালিকে চা দিতে বলুন তো!

নাজির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করে প্রবালের কাছে এসে বসে পড়ে বলল, স্যার, সেই ভটচাজ্যি মাস্টার, এখন কী করছেন জানেন? ওই যে ইস্কুল মাস্টার, যার মেয়ে মারা গেছে!

প্রবাল মুখ তুলে বলল, কী করছেন তিনি?

নাজির হাসতে হাসতে বলল, লম্বা লম্বা ছড়া বানিয়েছে। মেয়ের নামে। সেই সব ছড়া শোনায় হাটে হাটে ঘুরে। পরশুদিন পলাশপুরের হাটে আমি শুনলাম। নেচে নেচে ছড়া বলে। মাথাটা একেবারে গেছে।

নাজির সাহেবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে প্রবাল জিজ্ঞেস করল, আপনি নিজে শুনলেন? কেমন হয়েছে ছড়াগুলো?

নাজির সাহেব বললেন, মন্দ না, স্যার। লাইনের শেষে মিল আছে। মেয়ের জীবন কাহিনী শুরু করেছে একেবারে জন্ম থেকে। খুনের কথা, ধর্ষণের কথা সব আছে। এমনকি পরজন্মের কথাও কী যেন আছে। সবশেষে হাতজোড় করে সবাইকে বলে, বাবা সকল, এখন থেকে কেলেঘাই নদীর নাম হল ওই দুখিনী কন্যার নামে। তোমরা কেউ আর কেলেঘাই বলো না। বাবাসকল, তোমাদের কাছে অনুরোধ...

—লোকজন শুনে কী বলে?

—কেউ বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করে না। পণ্ডিতের গলাটা তো ভাল না, ভাঙা ভাঙা, সব কথা বোঝা যায় না। লোকেরা ওকে পাগল বলেই মনে করে বোধহয়।

—উনি তা হলে নদীর নাম বদলাবার চেষ্টা এখনো ছাড়েননি। আচ্ছা, নাজির সাহেব, নদীর নামটা পালটে দিলেও তো হয়। ওর যখন এতই ইচ্ছে। এরকম একটা বড় ঘটনা থেকেই তো গ্রামের নাম, নদীর নাম হয়। জেলা বোর্ডকে প্রস্তাবটা দিলে হয় না?

—ওই ছড়ার মধ্যেই আছে, স্যার, জেলা বোর্ড প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছে। জেলা বোর্ডের কাছেও পিটিশান দিয়েছিল। আপনার নামও আছে।

—আমার নামও আছে? আমাকে পাষণ্ড-টাষণ্ড বলেছেন বুঝি?

—না, অতটা নয়। আপনার সম্পর্কে এইরকম আছে, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় মহা ব্যস্ত অতি। যাবতীয় কর্মকাণ্ড সবই রাজনীতি।

নাজির সাহেব হা-হা করে হেসে উঠল, প্রবালও গলা মেলাল তাতে।

তারপর প্রবাল বলল, আমাকে রাজনীতির লোক বানিয়ে দিল? যাক, বেশি গালাগালি দেয়নি ভাগ্যিস। আমি ওঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। আজ তো এম. এল. এ আসছেন, ওঁর কাছে একবার প্রস্তাবটা তুলব নাকি?

নাজির সাহেব বেশ আপত্তির সুরে বললেন, এম. এল. এ সাহেব কি জানেন না ভাবছেন? নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু একজন লোকের কথায় শুধু একটা নদীর নাম পালটাতে যাবেন কেন?

—রাস্তার নাম, জায়গার নামও তো বদলানো হয় অনেক সময়। নদীর নাম যদি সুন্দর হয়, কেলেঘাই শব্দটার কি কোনো মানে আছে? সেই তুলনায় বেদবতী, শুনতে ভাল না?

—আমার কিন্তু স্যার কেলেঘাই নামটাই ভাল লাগে। মানে যাই হোক, একটা বেশ লোক্যাল ফ্লেভার আছে নামটার মধ্যে। শুনলে মনে হয়, বেশ গভীর কালো জল, বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে।

—আপনি খুব বেশি কল্পনা করছেন, নাজির সাহেব। ও নদীতে গভীর কালো জল কোথায় দেখলেন? বড় বড় ঢেউই বা বছরে কদিন থাকে? আমি তো শুকনো চিড়চিড়েই দেখি।

—এই তো বর্ষা গেল, এখন ওই নদীর চেহারা একবার দেখে আসুন গিয়ে, স্যার। কত তেজী নদী। এবার আর একটুর জন্য বন্যা হল না। যাই বলুন, স্যার, বেদবতীর চেয়ে কেলেঘাই নাম অনেক ভাল।

—আপনিও তা হলে নাম বদলের পক্ষপাতী নন?

—বেদবতী নামটা খটোমটো, না? তাছাড়া, বেদ আপনাদের পবিত্র গ্রন্থের নাম। লোকের মুখে এর বিকৃত উচ্চারণ হবে, সেটা কি ভাল? অনেক গোঁড়া মুসলমান এ নাম মানতে চাইবে না। হিন্দুদেরও আপত্তি থাকতে পারে।

—হিন্দু দেব-দেবীদের নামেও তো নদী নাম আছে। গঙ্গা, সরস্বতী, ভৈরব, আরও কত আছে। সেসব নাম মুসলমানরা উচ্চারণ করে না?

—সে আগেকার যা আছে তা আছে। নতুন করে এরকম নাম দিতে গেলে গোলমাল হতে পারে, স্যার। সরকারি দিক থেকে এরকম চেষ্টা না করাই ভাল।

—ও, তাহলে একটা অন্য অ্যাঙ্গেলও আছে? এটা আমি ভেবে দেখিনি।

—সরকারের লোকদের সব সময় সাবধানে থাকাই ভাল। কে কোথায় বলে দেবে, নতুন করে হিন্দুয়ানি চালাবার চেষ্টা হচ্ছে নদীর নাম বদলে।

—একটা করুণ ঘটনা, এক শোকার্ত পিতৃ-হৃদয়ের দাবি, সেটাকে নিয়েও যদি কেউ কেউ ধর্মীয় ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করে, তবে তাদের ধরে ধরে জুতোপেটা করা উচিত। যাক গে, আমার হাতে নাম বদলাবার ক্ষমতাও নেই, আমি এ নিয়ে আর মাথাও ঘামাচ্ছি না।

—সেই ভাল স্যার। আপনি এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। কেলেঘাই নদীতে খুব বড় বড় কালবোশ মাছ পাওয়া যায়, আপনি কখনো খেয়েছেন? খুব মিষ্টি স্বাদ। একদিন এনে দেব আপনার জন্য।

প্রবালের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। পাথর বাঁধা অবস্থায় সতেরো বছরের বেদবতী নাম্নী মেয়েটির নগ্ন শরীর অনেকক্ষণ পড়ে ছিল নদীর গর্ভে। মাছেরা নিশ্চয়ই ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে সেই শরীর। জলজ গুল্মও জড়িয়ে গিয়েছিল তার গায়ে?

হঠাৎ ফিসফিস করে সে বলে উঠল : হোয়েন ডাউন হার উইডী ট্রফিজ এ্যাণ্ড হারসেলফ/ফেল ইন দ্য উইপিং ব্রুক/হার ক্লোদস্ স্প্রেড ওয়াইড/এণ্ড মারমেইড-লাইক, এ হোয়াইল দে বোর হার আপ...

নাজির সাহেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে দেখে প্রবাল লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যামলেট, ওফেলিয়ার মৃত্যুদৃশ্য। এমনি মনে পড়ল হঠাৎ। নাঃ, আপনাকে মাছ আনতে হবে না, আমি অত মাছের ভক্ত নই।

ওপরে উঠে এসে দোতলার একটা ছোট ছাদে চেয়ার নিয়ে বসল প্রবাল। শুধু জয়া নেই বলে দোতলাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। জয়া থাকলে কি চ্যাঁচামেচি করে? একজনের উপস্থিতিই অনেকটা শূন্যতা ভরিয়ে দেয়।

আর এক কাপ চা খেয়ে প্রবাল ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা। এম. এল. এ পাঁচটার মধ্যে আসবেন বলেছিলেন।

আরও এক ঘণ্টা বাদে একজন এসে খবর দিলেন, এম. এল. এ. আজ কলকাতা থেকে ফিরতে পারছেন না। তিনি আসবেন বুধবার।

খুব জরুরি আলোচনা ছিল, অথচ সেটা পাঁচদিন পিছিয়ে গেল। তাহলে সেটা কতখানি জরুরি? এরা ব্যস্ত লোক, যখন তখন এদের প্রোগ্রাম পালটায়। প্রবালের বুঝি সময়ের কোন মূল্য নেই? অবশ্য এম. এল. এ মহোদয় জানত না যে প্রবালের এই ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ছিল।

ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জমলেও প্রবাল সে কথা কাকে এখন জানাবে! এম. এল. এ.-এর চিঠি অগ্রাহ্য করে দুপুরবেলা চলে গেলেই হত। এ. ডি. এম.-কে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া ছিল। তবু, চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর যাওয়া যায় না। এই চাকরির এটাই একটা বিরক্তিকর চরম ব্যাপার। একটু এদিক ওদিক হলেই একটা অপ্রয়োজনীয় দফতরে ঠেলে দেবে।

ভেতরের ঘরে এসে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রবাল। এরপর সারা সন্ধে তার কিছুই করার নেই। কথা বলার কেউ নেই।

এখন সে ইচ্ছে করলে শান্তিনিকেতনের দিকে বেরিয়ে যেতে পারে অবশ্য। হঠাৎ মাঝরাত্রে পৌঁছে জয়াদের চমকে দেবে। কিন্তু একা সে একটা গাড়ি নিয়ে যাবে? জয়া ঠিকই বলেছে, সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে তার একটা খুঁতখুঁতুনি আছে। এরকম সবাই করে। প্রবাল তবু এখনো পারে না। এখান থেকে শান্তিনিকেতনের সরাসরি ট্রেনও নেই। বর্ধমান গিয়ে পালটাতে হবে, সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার, আজ আর হবে না। কাল দেখা যাবে।

তাছাড়া, জয়া আজ একটু অন্যরকম আনন্দ করুক না। স্বামী কাছে না থাকলে অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের ব্যবহার কিছুটা পালটেই যায়। বিজন বেশ খাতির করে জয়াকে। আজ একটু বেশি খাতির করবে। জ্যোৎস্না রাতে ওরা সবাই মিলে বেড়াতে যাবে। তবে জয়ার একটা ডিগনিটি আছে, সে কখনো মাত্রা ছাড়াবে না, তা প্রবাল জানে। বিজন আজ চেষ্টা করবে জয়াকে বেশি জিন্ খাইয়ে টিপসি করে দিতে। এরকম সে অন্যদিনও চেষ্টা করে। আজ প্রবাল কাছে থাকবে না। আজ জোরাজুরি করবে। করুক না। এক আধদিন এরকম হলে দোষ নেই তো কিছু।

ঘরের আলো জ্বালেনি প্রবাল, সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শান্তিনিকেতনে জয়াদের আনন্দ-ফুর্তির দৃশ্য। প্রবালকে কেউ যেন নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে।

অফিসার মহলে পরস্পরের বউদের সঙ্গে খানিকটা ফস্টি-নস্টি, ঠাট্টা-ইয়ারকি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রবালও ওখানে থাকলে নীলার সঙ্গে নানারকম মজা করত। কিন্তু গ্রামের মানুষ এসব কী চোখে দেখে? তারা হয়তো এগুলোকেই মনে করে উঁচু সমাজের ব্যভিচার। বাবা আর মা যদি এখন এখানে প্রবালের কাছে থাকতেন, তাঁরা কি সমর্থন করতেন জয়ার এরকম সইফুলদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া?

বাবার ইচ্ছে ছিল দুটো দুধেল গাই বাড়িতে রাখার। শেষ পর্যন্ত আর কিনে দেওয়া হয়নি। সেই সময়ই তো পেল না প্রবাল। গ্রামের বাড়িটা জয়াকে দেখানোই হল না।

সন্ধেবেলা আর কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা যায়। একবার উঠে প্রবাল নিচে নেমে বাগানে চলে এল। গ্রামের ছেলে হয়েও প্রবালের তেমন গাছপালার শখ নেই। ছোটবেলা থেকে সে শুধু পড়াশোনাই করেছে। তাদের গ্রামের বাড়িতে ফুল গাছ ছিল না। ঘরের চালে লাউ কুমড়ো হত। উঠোনে ছিল বেগুনগাছ কয়েকটা।

এখানে এত সুন্দর বাগান, রোজ আসাই হয় না বাগানে। জয়া অবশ্য প্রত্যেকদিন সকালে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ফুল ছেঁড়ে না, গন্ধ শোঁকে। বেদবতী যদি বেঁচে থাকত, এম. এম. পড়ার জন্য কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারত, তারও কি কোনো ডাক্তার-অধ্যাপক আই. এ. এস-এর সঙ্গে বিয়ে হত পারত না!

একজন আরদালি এসে বলল, আর টি-তে একটা কল এসেছে স্যার। আপনি ধরবেন?

প্রবাল বিরক্ত হয়ে না বলে দিতে যাচ্ছিল। কোনো মন্ত্রী হলেও সে আর ধরবে না। সে এখন ছুটতে। তবু অভ্যেস বশে সে জিজ্ঞেস করল, কে ফোন করেছে?

আরদালি আবার ছুটে গেল জিজ্ঞেস করে আসতে।

প্রবালের মনে হল, চীফ সেক্রেটারি হতে পারেন। এর আগেরবার কলকাতায় দেখা হলে তিনি প্রবালকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে পাঠাবার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। প্রবালেরই একজন ব্যাচমেট জাপান ঘুরে এল।

আরদালি ফিরে এসে বলল, এস. ডি. পি. ও কল্যাণ দত্ত ফোন করছেন স্যার।

এটা প্রবাল অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করতে পারত, তবু দ্রুত হেঁটে এসে সে ফোন তুলে জিজ্ঞেস করল, কী খবর, কল্যাণ?

কল্যাণ বলল, আপনাকে কি ডিসটার্ব করলাম, স্যার? এস. পি. ছুটিতে গেছেন, শুনলাম উনি স্টেশন লীভ করেছেন। তাই ভাবলাম, খবরটা আপনাকে জানিয়ে রাখি।

প্রবাল বলল, খবরটা কী তাই বল।

কল্যাণ বলল এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজ একজন নৌকার মাঝিকে অ্যারেস্ট করেছি। এর সঙ্গে টিয়াজালি কেসটার কানেকশন আছে। মনে হচ্ছে, এবার কেসটার একটা ব্রেক থ্রু হবে।

—টিয়াজালির কেস মানে, কোন্ কেস?

—ওই যে দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ের মার্ডার কেস।

—তার সঙ্গে নৌকোর মাঝির কী সম্পর্ক?

—এর নৌকোয় তিনজন লোক গোটা একদিন ছিল। মেয়েটাও সঙ্গে ছিল।

—মেয়েটার ছবি ও আইডেন্টিফাই করেছে?

—তার দরকার হয়নি, স্যার। ও যে ঘটনাটা বলল, তা এই কেসটার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে। এই লোকটা একজন অ্যাকসেসরি। যদি ও বলছে, ওর কোনো দোষ নেই।

—লোকটা এখন কোথায়?

—আপাতত আমার অফিসে বসিয়ে রেখেছি। আরও কথা বার করার চেষ্টা করছি।

—আমি এক্ষুনি আসছি। ওখানেই রাখ ওকে।

ফোন রেখেই ব্যস্ত হয়ে প্রবাল আরদালিকে বলল, গাড়ি বার করতে বল। গার্ড রেডি আছে তো? একজন গার্ড সঙ্গে যাবে, ফিরতে রাত হতে পারে।

প্রবাল দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। পাজামা-পাঞ্জাবি ছেড়ে পরে নিল প্যান্ট-শার্ট। সিগারেট-দেশলাই পকেটে ভরে নিয়ে নেমে এল তরতর করে। গাড়িতে উঠেই সে বলল, তাড়াতাড়ি চল, এস. ডি. পি. ও কল্যাণ দত্তর অফিসে।

আর্মড গার্ড তখনো এসে পৌঁছোয়নি বলে বিরাট ভাবে বকুনি দিল প্রবাল। সে সাধারণত সাবঅরডিনেটদের উঁচু গলায় ধমকায় না।

গাড়ি চলার পর প্রবাল নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। সে এত অস্থির হচ্ছে কেন? খুনের আসামি ধরা তার কাজ নয়। কল্যাণ যথেষ্ট পারদর্শী, সে ঠিক মতোই এগচ্ছে। প্রবালের এখানে মাথা গলাবার কোনো প্রয়োজনই নেই।

সে কি তবে ঘটনার ছিন্ন সূত্রগুলো জোড়া লাগাতে চায়? মেয়েটা নিজে থেকেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, না কেউ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? এখানেই, একটা নদীর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা একটা নৌকোতে কাটাল মেয়েটি, কেউ জানতে পারল না? মেয়েটি চিৎকার করে কারুর সাহায্যও চায়নি?

কল্যাণ দত্তর অফিসে পৌঁছে প্রবাল অবশ্য অত ব্যস্ততা দেখাল না। সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে ঢুকল। যেন সন্ধেবেলা তার কোনো কাজ নেই বলে সে কল্যাণের কাছে বেড়াতে এসেছে।

মাঝিটাকে রাখা হয়েছে পাশের ঘরে। মাঝবয়েসি দাড়িওয়ালা একজন লোক, এর মধ্যেই মার খেয়েছে প্রচণ্ড, কষের ধারে রক্ত জমে আছে। হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধা। একটা আহত পশুর মতন দেয়ালের এক কোণে বসে আছে লোকটা। মুখে অপরাধের স্পষ্ট চিহ্ন। প্রবালের ধারণা, সে মুখ দেখে মানুষের চরিত্র বুঝতে পারে।

কল্যাণের ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে সে বসল। তাকে দেখেই কল্যাণ দাঁড়িয়ে উঠেছে, প্রবাল হাতের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল, এই মাঝিটার স্টোরিটা কি? ওকে ধরলে কী করে?

কল্যাণ বলল, অন্য একজন মাঝি খবর দিয়েছে। মেয়েটার বডি যেদিন কেলেঘাই নদীতে ভেসে ওঠে, তার দু দিন আগে কয়েকজন লোক ওর নৌকো ভাড়া নিয়েছিল।

প্রবাল বলল, বাইরের লোক?

কল্যাণ বলল, এই মাঝিটা তো এখন তাই বলছে। ভাল করে চেক করতে হবে। এর একটা বড় নৌকো আছে, স্যার। খড় নিয়ে যায়। ভেতরে ছই আছে, মানে থাকবার জায়গা আছে। চারপাশটা খড়ের গাদায় ঢাকা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তিনজন লোক সেই মেয়েটাকে নিয়ে এই নৌকোয় উঠেছিল। নদীর বুকেই একটা দিন আর একটা রাত কাটিয়েছে। খুব সম্ভবত মনে হচ্ছে স্যার, বর্ধমানের ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসের তিনজনই এরকমভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল।

প্রবাল বলল, আশ্চর্য, একদিন এক রাত এখানে নৌকোয় কাটাল, কেউ টের পেল না? পুলিশও কিছু জানল না? বর্ধমানের ডাকাতির পর তো সব কটা জেলায় পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

কল্যাণ বলল, বর্ষাকালে নদী এখন অনেক চওড়া। অনেক নৌকো যায়। আমাদের তো স্যার মটোর বোট নেই। নদীর ওপর চেক করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। খেয়াঘাটগুলোর ওপর নজর রাখা হয়েছিল শুধু।

—মাঝিটা বুঝেছিল ওরা গুণ্ডা-বদমায়েশ। তবু কোনো খবর দেয়নি।

—এখন ও বলছে অবশ্য যে লোকগুলো ওকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল।

—তারপর প্রায় দু-মাস কেটে গেছে। এর মধ্যেও সে নিজে থেকে এসে পুলিশকে কোনো খবর দেয়নি?

—অ্যাকরডিং টু দিস সবুর আলি মাঝি, সেই লোকগুলো ওকে শাসিয়ে গেছে যে, কোনোদিন যদি ও মুখ খোলে, পুলিশকে কিছু জানায়, তা হলেই তারা এসে ওকে খুন করবে।

—আর সেই মেয়েটি? সে স্বেচ্ছায় লোকগুলোর সঙ্গে ছিল?

—না। মেয়েটির মুখ বাঁধা ছিল। মেয়েটিকে ওরা নৌকোর খোলের মধ্যে ভরে রেখেছিল, যাতে অন্য কোনো নৌকো থেকে কেউ দেখে না ফেলে।

—নৌকোয় এই মাঝি ছাড়া আর কেউ ছিল না?

—এই সবুর আলির ছেলে ছিল, তার বয়েস হবে চোদ্দ পনেরো। তার নাম কাশেম। তাকে এখনো ধরিনি। নৌকোটা সীজ করা আছে। কাশেম সেই নৌকোতেই রয়েছে।

—এখান থেকে কত দূরে আছে নৌকোটা?

—বড় জোর তিন চার কিলোমিটার হবে। স্যার, যাবেন সেখানে? আমিও ভাবছিলাম, এই সবুর আলিকে নৌকোর ওপরে নিয়ে গিয়ে জেরা করব। অ্যাকচুয়াল সীন অফ দা ক্রাইমে গেলে অনেক কিছু আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।

—চলো তা হলে যাওয়া যাক। আমার এখন কোনো কাজ নেই। তুমি ইনভেস্টিগেশন কনডাক্ট কর, আমি শুধু পাশ থেকে দেখব।

কল্যাণ উঠল প্রবালের গাড়িতে। আর একখানা গাড়িতে সবুর আলিকে নিয়ে উঠল দুজন কনস্টেবল। লোকটা জেদি আছে, কী নিয়ে যেন আপত্তি জানাতে গিয়ে আবার গুঁতো খেল পুলিশের কাছে। রেপ কেসের ব্যাপারে কারুকে ধরলেই পুলিশ প্রথম থেকেই বেদম পেটায়। বোধহয় এক ধরনের পুরুষমানুষের ঈর্ষা কাজ করে।

কল্যাণ বলল, আমি মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি বলেই আমি এই ঘটনাটায় খুব বেশি আঘাত পেয়েছি। চাকরির ব্যাপার ছাড়াও আমার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, কালপ্রিটদের ধরবই। এই লোকটার মুখ থেকে একটা যা কথা শুনলাম স্যার, শুনলে আপনারও খুব কষ্ট হবে।

প্রবাল বলল, কী ব্যাপার?

কল্যাণ বলল, এই সবুর আলি বেশ কয়েকবার শপথ করে বলেছে যে সে তার নৌকোয় বেদবতীর ওপর কোনো পাশবিক অত্যাচার করতে দেখেনি। মেয়েটার ওপর যা কিছু অত্যাচার করেছে ওই তিনটে লোক, যা আগেই হয়ে গেছে। মেয়েটার তখন নির্জীবের মতন অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে, তা ওরা ভেবে পাচ্ছিল না। ওদের খুন করার মতলব ছিল না। ওরা যদি ব্যাঙ্ক ডাকাত হয়েও থাকে, কিন্তু ঠিক খুনি টাইপের নয়। কিন্তু মেয়েটাকে ছেড়ে দিলেও ওদের বিপদ। মেয়েটা ওদের আইডেন্টিফাই করে দেবে পুলিশের কাছে।

প্রবাল বলল, রেপের পর এই জন্যই তো খুন করে।

কল্যাণ বলল, সবুর আলি বলল, ও নিজে শুনেছে, মাঝরাত্তিরে ওরা মেয়েটাকে নৌকোর খোল থেকে বার করে মুখের বাঁধন খুলে খেতে দিয়েছিল। একজন বলছিল, গালাগাল দিয়ে নয়, ভাল ভাবে, মেয়েটা ওদের সঙ্গে অনেক দূর যেতে রাজি আছে কিনা। ওরা মেয়েটার আর কোনো ক্ষতি করবে না।

—মেয়েটি কোনো উত্তর দিয়েছিল?

—মেয়েটি হঠাৎ নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল।

—অ্যাঁ? পালাবার চেষ্টা করেছিল? গ্রামের মেয়ে সাঁতার জানত নিশ্চয়ই।

—তা জানি না। কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও মেয়েটা পালাতে পারেনি। ওই বদমাশগুলো ভালই সাঁতার জানে। ওদের মধ্যে দুজনও জলে ঝাঁপ দেয় সঙ্গে সঙ্গে। তারপর নদীর মধ্যেই ধস্তাধস্তি হয়, সেই অবস্থাতেই বেদবতী শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। সবুর আলির বিবৃতি অনুযায়ী ওরা যখন মেয়েটিকে জল থেকে নৌকোয় তোলে, তখনই তার প্রাণ নেই। তারপর ওরা ডেডবডিটা ডিসপোজ করার কথা চিন্তা করে।

প্রবাল দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। অন্ধকার নদীতে সাঁতার কেটে পালাবার চেষ্টার করছে একটি কিশোরী মেয়ে, দুটো গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দুজনের সঙ্গে এক সে লড়াই করবে কী করে? ওদের একজন নিশ্চয়ই ওর গলা টিপে ধরেছিল।

কল্যাণ আরও অনেক কিছু বলছে, প্রবাল কিছুই শুনছে না। সে শুধু ওই দৃশ্যটাই দেখে যাচ্ছে।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করল, কল্যাণ, তুমি রতন দাস নামে একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছ?

কল্যাণ একটু সময় নিল বুঝতে। তারপর বলল, রতন দাস? হ্যাঁ, স্যার তার সঙ্গে আমি দু-তিনবার কথা বলেছি। সে এই কেসে ইনভলভ্‌ড নয়। অন্তত পাঁচজন সাক্ষী আছে, সে বাস থেকে আগেই নেমে গিয়েছিল। রাত্তিরে সে বাড়িতেই ছিল। কলেজে ও গিয়েছিল পরের দিন।

—কেমন ছেলে সে?

—ভালই ছেলে। পলিটিক্‌স করে। মেয়েদের পেছনে লাগে না। তবে বেদবতী সম্পর্কে তার জেনুইন দুর্বলতা ছিল। খুবই ভেঙে পড়েছে দেখলাম। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না। সবচেয়ে আয়রনিক ব্যাপার হচ্ছে, সেই সন্ধেবেলা কী জানি কেন সে চেয়েছিল বেদবতীকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। বেদবতী রাজি হয়নি। তার বাবা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন ছেলের সঙ্গে বেদবতী ফিরছে দেখলে তিনি রাগ করতেন।

প্রবাল নিজের ছাত্র বয়সের চেহারাটা দেখতে পেল। মালিনী এখন কোথায় আছে কে জানে। মালিনীকে দেখলে সে হয়তো এখন চিনতেও পারবে না।

কেলেঘাই নদীর ঘাটে বড় নৌকোটার পাশে আরও দুটো ছোট নৌকো বাঁধা। সবুর আলির এখন দাঁড় বাইবার ক্ষমতা নেই। অন্য দু জন মাঝিকে ডেকে, তোলা হল সেই নৌকোয়। পুলিশের আদেশ ওরা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

সবুর আলির ছেলে কাশেমকে এক ঝলক দেখল। রোগা, পাতলা, সরল চেহারার এক কিশোর। এর চোখের সামনেই ওই বীভৎস কাণ্ডগুলো ঘটেছে? সারাজীবন ও কি সে কথা ভুলতে পারবে? এই বয়েসে ওর ইস্কুলে যাবার কথা। তার বদলে ও নৌকোর হাল ধরতে শিখেছে।

প্রবাল এপ্রিল মাসের পর আর এই নদীর ধারে আসেনি। বর্ষার পর কেলেঘাই এমন স্বাস্থ্যবতী হয়েছে যে সত্যিই চেনা যায় না। কানায় কানায় উপচে উঠছে জল। অন্ধকারে মনে হচ্ছে অতল কালো জলে জমছে নতুন ঢেউয়ের খেলা।

নৌকোটা চলেছে অকুস্থলে। কল্যাণ সবুর আলি আর অন্য মাঝিদের জেরা করে যাচ্ছে, প্রবালের যেন আর কোনো আগ্রহ নেই। সে বসে আছে গলুইয়ের কাছে। আকাশে আজ বেশ জ্যোৎস্না। জয়ারা অনেক আগেই পৌঁছে গেছে শান্তিনিকেতন। এখন খুব মজা করছে ওরা। বিজন প্রবালের মতন গরিবের ছেলে নয়। নানান জায়গায় সম্পত্তি আছে। শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই জমি কেনা ছিল, নিশ্চয়ই বড় বাড়ি বানিয়েছে। জয়ার কি একবারও মনে হয়, প্রবালের বদলে বিজনের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভাল হত? অবশ্য জয়া বলে, বিজনের সঙ্গে পার্টিতে আড্ডা দিতেই মজা লাগে আসলে মানুষটা খুব হালকা। বিশেষ পড়াশোনা নেই। অমন মানুষের সঙ্গে জয়া সারাজীবন কাটাতে পারত না।

নৌকোটা এসে থেমেছে এক জায়গায়, নদীর মাঝখানে। সবুর আলিকে প্রবালের কাছে টেনে এনে কল্যাণ বলল, স্যার, এর মধ্যে আর একটা জিনিস জানা গেল। এর বাড়ি সার্চ করে আমাদের লোক একটা শাড়ি পেয়েছে। ওই বেদবতীর শাড়ি। মেয়েটা মরে যাবার পর ডেডবডিটা জলে ফেলে দেবার আগে এই সবুর আলিই বলেছিল, তাহলে আর শুধু শুধু শাড়িটা নষ্ট করার কী দরকার। ও, শাড়ি আর জামা-টামা খুলে নিয়েছিল বডি থেকে।

প্রবাল বলল, মেয়েটার শরীরের সঙ্গে পাথর বেঁধে ফেলা হয়েছিল, তা ঠিক?

—হ্যাঁ স্যার, পাথর বাঁধা হয়েছিল সেই জন্যই ভেসে উঠেছে আরও একদিন পরে।

—এখানে পাথর পেল কোথা থেকে?

—নৌকোয় এরা রান্না করে খায়। মশলাবাটার শিল-নোড়া ছিল, সেই শিলনোড়াই বেঁধে দিয়েছিল।

—কে বেঁধেছে?

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল প্রবাল। বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, কে সেই পাথর বেঁধেছিল? কে? তুই বেঁধেছিলি?

সবুর আলির গলা টিপে ধরে তাকে পাটাতনের ওপর আছড়ে ফেলে দিল প্রবাল। তারপর তার বুকের ওপর চড়ে বসে চিৎকার করতে লাগল, বল, বল, তুই বেঁধেছিলি? নিজের হাতের....

কল্যাণ আর একজন পুলিশ জোর করে টেনে তুলল প্রবালকে। সে এমন জোরে সবুর আলির গলা টিপে ধরেছিল যে লোকটা মরেও যেতে পারত। তা হলে কেলেঙ্কারি হত একটা। আজকাল এসব ব্যাপার চাপা দেওয়া যায় না।

কল্যাণ বেশ ভর্ৎসনার সুরে বলল, এ আপনি কী করছিলেন, স্যার? হঠাৎ এমন খেপে গেলেন কেন? যা জিজ্ঞেসাবাদ করার আমিই তো করছিলাম।

প্রবালের শরীরটা এখনো থরথর করে কাঁপছে। সে কোনো কথা বলতে পারছে না।

কল্যাণ তার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। প্রবাল নিল না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। সবুর আলির বদলে এখন তার এই নদীর গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বাসঘাতিনী নদী! মেয়েটা আত্মরক্ষার জন্য এর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তবু নদী তাকে বাঁচাতে পারল না!

নৌকোটা কোন্ দিকে যাচ্ছে এখন তা কিছুই খেয়াল করছে না প্রবাল। তার বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই। এরকম একটা জ্যোৎস্না রাতে নদীর ওপর নৌকো ভ্রমণ অন্য কোনো উপলক্ষে কত উপভোগ্য হতে পারত। কিন্তু এই নদীতে একটি নিষ্পাপ মেয়ের মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল, এই নৌকোতে তার শরীর থেকে সব বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়েছে!

একটু পরে একজন কনস্টেবলের কথা শুনে আবার চমকে উঠল প্রবাল।

সেই পুলিশটি কল্যাণকে বলছে, ওই যে দেখুন স্যার, ডান দিকের পাড়ে একজন হারিকেন নিয়ে বসে বসে মাটি খুঁড়ছে। বোধহয় সেই বুড়ো!

কল্যাণ জিজ্ঞেস করল, কোন্ বুড়ো? মাটি খুঁড়ছে কেন?

পুলিশটি বলল, আজ দুপুর থেকে স্যার একজন এই নদীর ধারে ধারে সাইনবোর্ড বসাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে গেঁথে দিচ্ছে। সেগুলো তুলে ফেলতে হবে কি না, সেরকম কোনো অর্ডার পাইনি।

—কিসের সাইনবোর্ড?

—এই নদীর নাম বদলে কী যেন একটা অন্য নাম।

—সেই মেয়েটির বাবা?

—বোধহয় তাই হবে। বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এত রাতেও মাটি খুঁড়ছে।

কল্যাণ গলা তুলে প্রবালকে বলল, স্যার শুনলেন ব্যাপারটা?

দারুকেশ্বর ভটচাজ নিজেই সাইনবোর্ড বসাচ্ছে! ওগুলো কি তুলে ফেলা হবে?

প্রবাল উত্তর না দিয়ে ডান দিকে তাকাল। নৌকোটা পাড় ঘেঁষেই যাচ্ছে এখন। এদিকটা ফাঁকা। এক জায়গায় হারিকেনের পাশে বসে আছে একজন মানুষ। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, সে যে মাঝে মাঝে শাবল তুলছে, বোঝা যাচ্ছে সেটুকু।

প্রবাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। একা নামব। তোমরা কেউ সঙ্গে এস না।

কল্যাণ বলল, এখানে নামবেন কেন? আপনার গাড়ি অনেক দূরে। আমরা এখন সেদিকেই ফিরছি।

প্রবাল আদেশের সুরে বলল, নৌকো ভেরাতে বল! আমি নামব।

নৌকোটা লাগল একটু দূরে। কাদার মধ্যে লাফিয়ে নেমে প্রবাল বলল, কল্যাণ, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি একটু পরে আসছি। যাও, এগিয়ে যাও!

বৃদ্ধটি এক মনে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে। তার কাছে কে এল, না এল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘামে জবজব করছে তার গায়ের জামা। কপাল দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে ঘাম।

সাইনবোর্ডটি পড়ে আছে একপাশে। প্রবাল সেটা তুলে নিয়ে দেখল বড় বড় অক্ষরে লেখা বেদবতী। তলায় ব্রাকেটে ছোট অক্ষরে লেখা কেলেঘাই নদীর নতুন নাম। তার নিচে লেখা, এই নদীর জলে বেদবতী নামে এক কন্যা প্রাণ দিয়াছে, এই নদীর নামে সেই কন্যা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে।

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল প্রবালকে। অন্যদিনের মতন সে বিনয়ে বা ভক্তিতে গদগদ হল না। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি এগুলো তুলে দিতে এসেছেন?

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রবাল বলল, না। নদীর ধারে কে কী সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে, তা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাতে যাবে কেন? সবশুদ্ধ এরকম কটা লাগিয়েছেন?

—পাঁচটা। আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, নিজের হাতে লিখেছি।

—বেশ ভালই বানিয়েছেন। তবে টিনের দাম আছে। সরকার কিছু না বললেও অন্য লোকেরা খুলে নিয়ে যেতে পারে।

—তা নেয় নিক। যার ধর্ম সে নেবে। আমার লাগাতে ইচ্ছে হয়েছে আমি লাগাচ্ছি। আমার কর্ম আমি করছি।

—এই সাইনবোর্ড লাগালেই কি এ জেলার মানুষ এই নদীর নাম বদল মেনে নেবে?

—তা জানি না। আমি যতদিন বাঁচব, চেষ্টা করে যাব।

শাবল খোঁড়া থামিয়ে প্রবালের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে দারুকেশ্বর জিজ্ঞেস করল, ডি. এম. সাহেব, আপনি পরজন্মে বিশ্বাস করেন?

একটু ইতস্তত করে প্রবাল বলল, না। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে পারিনা।

দারুকেশ্বর বলল, আমি করি। আমরা পুরনো লোক, আমরা মানি। আমার মেয়ে আবার জন্মাবে। আমার মতন গরিব আর দুর্বলের ঘরে নয়, অনেক বড় ঘরে সে জন্মাবে। এ জন্মে সে বড় কষ্ট পেয়ে, বড় ব্যথা নিয়ে গেছে। পরের জন্মে সে শোধ তুলবে। সে সব দুষ্টের দমন করবে! আর কেউ কোনো নারীর ওপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি চোখ বুজব।

প্রবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তারপর বলল, পণ্ডিতমশাই, আপনি বড্ড ঘেমে গেছেন। শাবলটা এবার আমাকে দিন। আমি গর্ত খুঁড়ে দিচ্ছি। তারপর আপনি সাইনবোর্ড বসিয়ে দেবেন।

দারুকেশ্বর বলল না, না, তার দরকার নেই। আমিই পারব। আপনি কেন কষ্ট করবেন!

প্রবাল তবু জোর করেই নিয়ে নিল শাবলটা।

সেটা মাটিতে পোঁতার পর তার মনে হল, সে যেন তার বাবার জন্য গ্রামের বাড়িটা পাকা করে দেবার ভিত খুঁড়ছে।

সে জোরে জোরে শাবল চালাতে লাগল।

নিঃসঙ্গ গয়লানি

সেই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলকাতার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। আমরা কয়েক বন্ধু গোল হয়ে বসে আড্ডা জমিয়েছিলুম। গরুর সঙ্গে আমাদের বেশ একটা মিল আছে, গরুর মতই গানবাজনার চেয়েও আমরা ঘাস বেশি ভালবাসি। ঘাসের ওপর বসার লোভেই আমরা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে যেতাম।

উদ্যোক্তাদের একজন সঙ্গে করে একটি মেমসাহেবকে এনে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন একদিন। মেমসাহেবটিকে প্রায় প্রৌঢ়া বলা যায়, কিন্তু শেষ সূর্যাস্তের মতন বড় অপূর্ব বর্ণ সম্ভারে শেষ যৌবনকে শরীরে সাজিয়ে রেখেছিল। সোনালি চুলে এখনও সাদার আভাস প্রকট হয়নি, চোখের দৃষ্টিতে আসেনি ক্লান্তি, আঙুলের নখে এখনো উজ্জ্বলতা। খুব সূক্ষ্মভাবে তাকালে বোঝা যায়, চামড়া ঈষৎ কুঁচকেছে। কিন্তু প্রথম দেখার মুহূর্তেই কোনো মহিলার দিকে অত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাব কেন? মহিলার পোশাকটা অতি মূল্যবান, গলায় একছড়া পান্নার মালা।

উদ্যোক্তাটি বললেন ইনি একজন আমেরিকান কবি—এখানকার যুবকদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। তাই তোমাদের কাছে নিয়ে এলুম। এঁর নাম হচ্ছে, ইয়ে, মানে, কি বলে যেন, মিসেস ইয়ে—

মহিলা গোপনহাস্যে বললেন, আমার নাম ডরোথি ফ্রিডম্যান। আমি তোমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারি?

আমেরিকান কবিতা বিশেষ পড়িনি, যেটুকু জানা ছিল—তাতে ও নামের কোনো কবির কথা কস্মিন্‌কালেও শুনিনি। কিন্তু যাই হোক, মহিলা তো! সুতরাং, ঘাসের ওপর চাপড় মেরে বললাম, বসুন, এখানে বসুন।

গাউন পরে ঘাসের ওপর বসা একটু কঠিন। তবু অতি কৌশলে পা-টা বেঁকিয়ে কোনোক্রমে বসে মহিলাটি আমাদের সবার সঙ্গে আলাপ করলেন। হাতব্যাগ খুলে ক্যামেল সিগারেট বার করে দিলেন সবাইকে। বন্ধুদের মধ্যে একজন দেশলাই ধরিয়ে দিল ওঁকে।

সেদিনের কথাটা আমার খুব মনে আছে একটা বিশেষ কারণে। কথা বলতে বলতে সিগারেট যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি বললেন, এই টুকরোটা কোথায় ফেলব? তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। ঘাসের ওপর বসে সিগারেটের টুকরো কোথায় ফেলা হবে—তা নিয়ে আবার মাথা ব্যথা! আমরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, যেখানে ইচ্ছে ছুঁড়ে ফেল না! এখানে সবাই ওরকম ফেলে।

ডরোথির সঙ্গে তখন বেশ ভাব জমে উঠেছে, আমরা মিসেস ফ্রিডম্যান না বলে তার অনুরোধে ডরোথি বলে ডাকছিলুম। ডরোথি তার চম্পকবর্ণ আঙুলের রুপোলি নখ দিয়ে সামান্য একটু মাটি খুঁড়ে সিগারেটের টুকরোটাকে কবর দিয়ে তার ওপর আবার মাটি চাপিয়ে বলল, আমাদের দেশে, বিশেষত নিউইয়র্ক শহরে যেখানে সেখানে এরকম সিগারেট ফেললে—অন্তত পঞ্চাশ ডলার ফাইন হয়ে যেতে পারে।

স্মৃতির রহস্য এই, মানুষের কোন কথা বা কোন ঘটনা, যে সঞ্চয়ের জন্য বেছে নেবে—তার কিছুই বোঝা যায় না। ডরোথির সঙ্গে সেই সন্ধ্যে এবং তারপর আরও তিনদিন আমাদের একসঙ্গে কেটেছিল। সে ছিল কবিতা পাগল, কথায় কথায় গড় গড় করে নিজের কবিতা আবৃত্তি করত (আমার সামান্য জ্ঞানেই আমি বুঝেছিলুম, সেগুলো অত্যন্ত বাজে কবিতা)—এবং এতগুলো তরুণ যুবক তাকে খাতির করছে এই আনন্দে সে গদগদ। ডরোথি উঠেছিল গ্র্যান্ড হোটেলে, তার সেই ঘরে মদের ফোয়ারা ছড়িয়ে আমাদের পার্টি হয়েছিল, ওকে নিয়ে আমরা দল বেঁধে গেছি গঙ্গার পাড়ে। আমাদের দলের মধ্য থেকে ওর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—আমার নয়, আমার বন্ধু পরাশরের। পরাশর ছেলেবেলায় একবার বিলেত ঘুরে এসেছিল—সুতরাং কোন মেমসাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সবচেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত অধিকার যে তারই—সেটা আমরা সকলে মেনে নিয়েছিলাম। পরাশর ঈষৎ পানোন্মত্ত হয়ে ডরোথির কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে, আমরা নাচ জানি না—আমরা হাততালি দিচ্ছিলুম, বাচ্চা খুকির মতন খুশি হয়ে ডরোথি অনবরত হাসছিল, অকস্মাৎ পরাশরের ওষ্ঠে একটা গাঢ় চুম্বন দিল।

বেশ হৈ-হল্লোড় মজা করেই কয়েকটা দিন কেটেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ডরোথি সেই যে বলেছিল—ওদের দেশে সিগারেটের টুকরো যেখানে সেখানে ফেললে পঞ্চাশ ডলার ফাইন হয়—এই সামান্য কথাটা আমি কখনও ভুলতে পারিনি। একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—তবু মনের মধ্যে গেঁথে আছে। ওইরকম পরিচ্ছন্ন ছিমছাম মূল্যবান পোশাক পরা একজন সৌখিন মহিলা হয়েও আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা চাপা দিয়েছিল—হয়তো সেই দৃশ্যটাই অভিনব লেগেছিল।

নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছে প্রথম দিন আমার ডরোথির কথা মনে পড়েছিল এবং রাগ হয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে আছি, আপন মনে বলেছি মিথ্যুক! ডাহা মিথ্যুক!

হয়েছিল কি, প্রথম দিনই তো আমি সন্ধেবেলা একা বেড়াতে বেরিয়ে নিউইয়র্ক শহরের পঞ্চম এভিনিউ ধরে হাঁটবার সময় আপনমনে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ডরোথির কথাটা। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। শেষ হলে, টুকরোটা ফেলব কোথায়? ডরোথি তো সেকথা বলে নি। পঞ্চাশ ডলার ফাইন? পথচলতি অনেকের মুখেই সিগারেট—তারা নির্ভয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অথচ আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত একটা লোককে বেছে নিলাম—তাকে অনুসরণ করে চললাম, ও যেখানে ফেলবে আমিও সেখানে ফেলব। কিন্তু লোকটি তার সিগারেট সদ্য ধরিয়েছে, আমারটা প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। কলকাতায় একটা সিগারেট ধরিয়ে পাঁচজন মিলে খেয়েছি—কিন্তু আমার সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে সিকি ইঞ্চি হয়ে এল, আঙুলে আগুনের আঁচ লাগছে, আর রাখা যায় না—এই সময় চোখে পড়ল পথের মোড়ে ভাত খাওয়ার থালার সাইজের একটা অ্যাশট্রে রাখা আছে। আমি প্রায় ছুটে সেটার দিকে গেলাম। আমার সামনের সেই লোকটাও সেই মোড়ে এসে থামল। কি একটা চিন্তায় সে মগ্ন—অ্যাশট্রের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করল না, তার সিগারেটটা দু আঙুলের ডগায় ধরে টুসকি দিয়ে রাস্তার মাঝখানে ফেলে আবার গটগট করে হেঁটে গেল। আমি স্তম্ভিত, ততক্ষণে আমার আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেছে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ডরোথির উদ্দেশ্যে বললুম, মিথ্যুক! ড্যামলায়ার! খুব চালমারা হয়েছিল।

তারপর লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেক লোকই—বিশেষ করে ওই অ্যাশট্রেগুলোর কাছে এসেই যেন ইচ্ছে করে রাস্তায় সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে। কোনো পুলিশকে এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতেও দেখিনি। (এমন কি, অনেক নির্জন রাস্তায় দু-একটা গরিব সাহেবকে আমি পেচ্ছাপ করতেও দেখেছি।) সমস্ত বড় শহরের মানুষই খানিকটা বিশৃঙ্খল।

শুধু ওই টুকুই, ডরোথি ফ্রিডম্যানের কথা আর আমার তেমন মনে পড়ে নি। নতুন দেশে অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল, ক্রমশ সে দেশের সব রীতিনীতি শিখে নিয়ে আমি চালু হয়ে উঠলুম। নির্ভয়ে তখন গলায় টাই না বেঁধেই ঘুরতে পারি, জুতোয় পালিশ না থাকলেও মন খচখচ করে না, জামার বোতাম না থাকলেও বয়ে গেল। নতুন দেশে গেলে প্রথম কিছুদিন সবার মুখটা একটু তেলতেলে থাকে—নতুন কলেজে ঢোকা ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের মতন। তোরাও নিশ্চয়ই সবাই একটা লক্ষ্য করেছিস? সেই আড়ষ্টতা কাটতে আমার দেরি হল না, কারুকে কিছু জিজ্ঞেস না করে টিউব ট্রেনে শহরের যে কোনো অঞ্চলে হরদম একলা ঘুরতে পারি। নতুন দেশের জাঁক-জমক আড়ম্বর ঐশ্বর্য সম্পর্কে মোহ যেমন আস্তে আস্তে কেটে যায়, তেমনি চোখধাঁধানো নারী-পুরুষ সম্পর্কেও মনে হয়—এরাও রাম-শ্যাম-যদু, গীতা-সীতা-মিতার চেয়ে কিছু মাত্র আলাদা নয়। পোশাক খুলে নিলেও পৃথিবী বড়ই সরল ও পরিচিত।

গোটা মহাদেশ ঘুরে নিউইয়র্ক শহরে আমি আবার ফিরে এলাম মাস দশেক বাদে। আগেরবার খুব বড় হোটেলে উঠেছিলাম। এবারে পকেট ঢন-ঢন নিউইয়র্কের লোয়ার ইস্ট সাইড অনেকটা বস্তি ধরনের—যদিও বাড়িগুলো ছতলা আটতলা ঠিকই, কিন্তু নোংরা গলি, নিগ্রো-ইহুদি আর পরটুরি-ক্যানদের ভিড়। ওইখানেই এক বীটনিক কবির বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রইলুম। ছতলার ওপর তার ঘর, লিফট নেই সে বাড়িতে, সিঁড়িগুলো নোংরা অন্ধকার—কিন্তু বন্ধুটির আন্তরিকতায় সব কিছুই ভাল লাগে। সারাদিন আমি পথে পথে ঘুরি, কোন্ দোকানে সবচেয়ে সস্তায় খাবার পাওয়া যায়—সেই সন্ধান করি, কিছু একটা চাকরি জোটানো যায় কিনা তারও চেষ্টা চালিয়ে যাই।

একদিন একটা টেলিভিশন সেট-এর দোকানের পাশ দিয়ে আসছিলুম, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। একজন খদ্দের নানারকম টেলিভিশন সেট নেড়ে চেড়ে দেখছিল, কোনোটার সুইচ অন করে একটুখানি দেখছে। সেই রকমই একটা মুহূর্তে টেলিভিশনে ভেসে ওঠা একটা দৃশ্যে একজন মহিলাকে দেখে আমি খুব চমকে উঠলুম। কোথায় যেন তাকে দেখেছি? কোথায়? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, কলকাতায় দেখেছিলাম, এই সেই ডরোথি ফ্রিডম্যান।

একটু দেখেতে না দেখতেই সেই দৃশ্যটা আবার মুছে গেল। কি প্রোগ্রাম, কিসের দৃশ্য কিছু বোঝা গেল না। খুব অবাক লাগল। কারণ এদেশেও কবি হিসেবে ডরোথির নাম কোথাও শুনিনি, কোথাও তার লেখা দেখিনি। কোনো সাহিত্য আলোচনাতে ডরোথির নাম কেউ একবারও উচ্চারণ করে নি। অথচ, সে টেলিভিশনে সুযোগ পাবার মতন বিখ্যাত?

সেদিন বাড়ি ফিরে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ডরোথি ফ্রিডম্যানকে চেনো? কিংবা কখনো নাম শুনেছ? বন্ধুটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি তার নাম জানলে কি করে।

—আমার সঙ্গে কলকাতায় ওই নামে এক মহিলার আলাপ হয়েছিল। কবিতা-টবিতা লেখে, খুব আমুদে মহিলা।

—ডরোথি ফ্রিডম্যানের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? সত্যি? সে তোমায় চিনতে পারবে?

—কেন পারবে না! আমরা তিন-চারদিন একসঙ্গে কত হৈ-হুল্লোড় করেছি! একসঙ্গে ঘুরেছি কত জায়গায়, মদ খেয়েছি, নেচেছি, আমার বন্ধু পরাশর নেশার ঝোঁকে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রায় পরের দিনই বিয়ে হয়ে যায় এই অবস্থা। একটু বয়েস হলেও ভদ্রমহিলা খুব ফুর্তি করতে জানেন।

বন্ধুর চোখে অবিশ্বাস। বলল, কোন্ ডরোথি ফ্রিডম্যানের কথা বলছ? সে তোমাদের সঙ্গে ওইভাবে মিশেছিল! তাকে কিরকম দেখতে বলত?

আমি বর্ণনা দিয়ে বললুম, আজও তাকে টেলিভিশনে দেখলুম এক পলক। সে খুব বিখ্যাত নাকি? কলকাতায় তো কিছু মনে হয় নি!

বন্ধুটি তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বলল, রেফ্রিজারেটারটা খুলে মাখনের প্যাকেটটা আনো তো!

হঠাৎ মাখনের প্যাকেটের কথা কি প্রসঙ্গে এল বুঝতে পারলুম না। যাই হোক সেটা নিয়ে এলুম। বন্ধু বলল, মাখনের লেবেলটা পড়ো, কিন্তু লেখা আছে?

একটা বিখ্যাত মাখনের ব্র্যান্ড। বেশির ভাগ বাড়িতেই এই মাখন ব্যবহার করতে দেখেছি। পড়লাম, লেখা আছে, ফ্রিডম্যান'স বাটার জাস্ট দা রাইট থিং ফর ইউ।

বন্ধু বলল, আমেরিকায় একুশ কোটি লোক, অন্তত দশ লাখ লোক প্রতিদিন এই মাখন এক প্যাকেট করে কেনে। প্রত্যেক প্যাকেটে যদি এক সেন্টও লাভ থাকে, তাহলে প্রতিদিন লাভ হয় দশ হাজার ডলার। এছাড়া ওই একই কোম্পানির আছে মার্জারিন, কুকিং অয়েল, ইয়োগোর্ট (পাতলা দই) এই সব। এবং ওই কোম্পানির একমাত্র মালিক হচ্ছে তোমার ওই ডরোথি ফ্রিডম্যান। সে কত বড়লোক তুমি ভাবতে পার? এছাড়া শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে, টাকার শেষ নেই। হ্যাঁ, তার কবিতা লেখারও বাতিক আছে জানি—রাবিশ, রদ্দি কবিতা লেখে। কলকাতায় তার সঙ্গে তোমরা তিনদিন একসঙ্গে কাটিয়েছিলে এখন সে তোমায় চিনতে পারবে?

—নিশ্চয়ই। না চেনার কি আছে।

—ব্লাডিফুল! ডরোথি ফ্রিডম্যানের সঙ্গে তোমার চেনা—তা হলে তুমি আমার এখানে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছ কেন? আমি তো শুনেছি সে কারুর সঙ্গে মেশে না, আর কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে ওই রকম হল্লোড় করেছে? আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

—সত্যি, বিশ্বাস কর।

—তা হলে তার সঙ্গে দেখা করনি কেন এতদিন?

—আগে তো এ সব জানতুম না। কিন্তু এখন অত বড়লোক শুনে আমার ভয় ভয় করছে। থাক দরকার নেই!

—পাগলামি করো না। ডরোথি ফ্রিডম্যান নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের নিউ হ্যাভেন বলে একটা জায়গায় থাকে শুনেছি। ওখানকার এক্সচেঞ্জকে ওর নাম বললেই টেলিফোন নম্বর পাওয়া যাবে। রাত বারোটার পর টেলিফোন কর আজই।

—রাত বারোটার পরে কেন?

—তখন টেলিফোনের রেট সস্তা। তুমি ডরোথি ফ্রিডম্যানের অতিথি হয়ে মজা লুটবে—আর আমি টেলিফোনের বিল দিয়ে সর্বস্বান্ত হব নাকি?

নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। সিনেমায় এইসব দৃশ্য আগে বহুবার দেখেছি, কিন্তু তার মধ্যে আমি নিজে উপস্থিত সেইটুকুই অবিশ্বাস্য। কানেটিকাটের অপরূপ এলাকা পেরিয়ে এসে মোটরগাড়ি থামল একটা দুর্গের মতন প্রাসাদের বিশাল লোহার গেটের সামনে। আমাদের দেখে সিংহদ্বার আপনি খুলে গেল। তারপর দুপাশের ঝাউগাছের সারি দেওয়া প্রশস্ত ড্রাইভ, মাঝে মাঝে আলাদা আলাদা ডিজাইনের বাগান। গাড়ি এসে মূল প্রাসাদের সামনে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল, গাড়ির ড্রাইভার আমায় দরজা খুলে দিয়ে বিনীতভাবে অভিবাদন করল। আমি ঈষৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ডারোথি। আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে উল্লাসে বলল, হ্যাল্লো সুনীল, হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! কাম অন ইন!

আগের দিন রাত বারোটার পর টেলিফোন করতেও ডরোথি এক মুহূর্তেই আমাকে চিনতে পেরে এরকম উল্লাস জানিয়েছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চেয়েছিল আমি কোথায় আছি, কোন্ রাস্তায়, কোন্ ঠিকানায়।

পরদিন সকালবেলাতেই সেই নোংরা গলির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা থান্ডারবার্ড গাড়ি, সুসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার আমাকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল।

ডরোথি আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, দুষ্টু ছেলে, কলকাতায় যখন দেখা হয়েছিল, তখন বলনি কেন, তুমি দু-এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে আসবে?

আমি বললুম, তখন তো স্বপ্নেও এ কথা জানতুম না!

পুরো বাড়িটাই শ্বেতপাথরের তৈরি। বিশাল বিশাল ঘরে নিখুঁতভাবে সাজানো—লম্বা ডাইনিং রুমে অন্তত ষাটজন লোক বসে খেতে পারে, এত বড় টেবিল পাতা, রুপোর কাটলারিতে চোখ ঝলসে যায়। দু-তিনটে বসবার ঘর, তার দেয়ালে দেয়ালে পিকাসো, মাতিস, রুয়ো-র মূল ছবি। ঐশ্বর্য আর রুচি পাশাপাশি সহাবস্থান করে আছে।

ডরোথি আমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। কোনোদিন এত সম্পদ এত কাছাকাছি থেকে দেখিনি। কিন্তু ঐশ্বর্যের ভেতরে যে কত দুঃখ লুকোনো থাকে সেদিন ভাল করে বুঝতে পারলুম। এই বিশ্বসংসারে ডরোথির কেউ নেই। দু বার বিয়ে করেছিল, দুটি স্বামীই দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু দুটি স্বামীই ওকে আরও বিত্ত দিয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে হয় নি, ডরোথি আর কাউকে বিশ্বাস করে না—কারুকে কাছে এসে থাকতে দেয় না—এই বিশাল পুরীতে চাকরবেষ্টিত হয়ে একা থাকে। চাকর-বাকরদের মধ্যে দুজন মাইনে করা ডিটেকটিভও আছে শুনলুম। ডরোথি সেই যে বলেছিল, ওদের দেশে রাস্তায় সিগারেটের টুকরো ফেললে ফাইন হয়—বুঝতে পারলুম, কেন ওকথা বলেছিল। হয়তো ওরকম একটা অপ্রচলিত আইন আছে। কিন্তু ডরোথি বহু বছর এ দেশের রাস্তায় পায়ে হেঁটে ঘোরে নি, কোথাও যাবার দরকার হলে বন্ধ গাড়িতে যাতায়াত করেছে—সে কি করে জানবে—রাস্তার মানুষরা কি করে? রাস্তার লোকদের কথা সে কিছুই জানে না।

ভাবতে আমার বেশ মজা লাগল, কলকাতার রাস্তায় এই শৌখিন ধনবতীকে কিভাবে আমরা ঘুরিয়েছিলুম। ঘাসের ওপর টেনে বসিয়েছি, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়েছি, সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে একবার ওকে আমরা বিড়ি অফার করেছিলুম। সোনার কেস্ থেকে ওর ন' শো নিরানব্বই মার্কা সিগারেট নিতে নিতে সে কথা ভেবে আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখানে ডরোথির মুখে সব সময় একটা চাপা বিষাদ, অথচ কলকাতায় ও কিন্তু সত্যিই ফুর্তিতে ঝলমল করেছিল। কলকাতায় ওর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতুম না—তাই ও আমাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশতে পেরেছিল। এখানে যে কেউ ওর সঙ্গে খাতির করতে এলেই ও ভয় পায়, সবাই বুঝি টাকার লোভে ওর কাছে আসছে।

একতলা থেকে দোতলায় এলুম। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে যাচ্ছি, সব কটিই সেইরকম নিখুঁতভাবে সাজানো—কিন্তু ব্যবহার করার কেউ নেই। ডরোথি বলে যাচ্ছিল, এই ঘরে সকালবেলা রোদ আসে। এখানে আমি সকালে বসি, ওপাশের ঘরটায় বসি কোনোদিন বৃষ্টি এলে, আর এই ছোট ঘরটাতে আমি লিখি। শয়নকক্ষ দেখেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এত বড় শোবার ঘর? সমস্ত ঘরটা থেকেই একটা গোলাপি আভা আসছে—পর্দা, কার্পেট, বেড স্প্রেড—সবই মধুর গোলাপি রঙের। আমি বললুম, এত বড় ঘরে তুমি শোও? তোমার ভয় করে না?

ডরোথি মুচকি হেসে বলল, না, ভয় করে না। ভয় করার দিন আমি পেরিয়ে এসেছি।

—ফাঁকা ফাঁকাও লাগে না ?

—তা লাগে। কিন্তু কি দিয়ে ভরাব?

—আবার বিয়ে কর না?

—বিয়ে করব? কাকে? হুকে?

আমার কানে ভাসছে এখনো সেই স্বর। ডরোথি ব্যাকুলভাবে বলেছিল, বাট হু? বাট হু? কে শুধু আমার জন্যই আমাকে ভালবাসবে? বেশ কয়েক মুহূর্ত চাপা বিষণ্ণতায় ও আচ্ছন্ন হয়ে রইল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, তোমার বন্ধু পরাশর নেশার ঝোঁকে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল—ইস্ কেন যে সেদিন ওকে বিয়ে করে ফেলিনি। এ দেশে আমার মতন বুড়িকে তো আর কেউ ভালবাসবে না। সবাই আসে অন্য কিছুর লোভে।

—মোটেই তুমি বুড়ি নও।

ডরোথি আবার হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ইয়ং অ্যাডমায়ারার। বলো তো আমার বয়স কত?

ডরোথিকে দেখলে আমার মনে হয় তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ, কিন্তু ওকে খুশি করার জন্য আমি বললুম, কত আর? পঁয়তিরিশ।

—ইউ আর কিডিং। ঠাট্টা করছ। তোমার ডবল বয়েস আমার। একান্ন।

সত্যিই বোঝা যায় না। আমি আন্তরিকভাবে বললুম, সত্যি, একটুও বোঝা যায় না। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ। এখনো কি সুন্দর তুমি।

জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল ডরোথি, আমাকে হাতছানি দিয়ে বলল, দেখ দেখ ওই মেয়েটিকে?—আমি জানালা দিয়ে দেখলুম তিন চাকার ভ্যান চালিয়ে একটি মেয়ে এসে বাড়ির সামনে থামল। সাদা স্কার্ট পরা পুরুষ্টু চেহারার এক গ্রাম্য যুবতী। ডরোথি বলল, ওর নাম জ্যানেট, ও এসেছে খালি দুধের বোতল ফেরত নিতে। আমাদের গয়লানি। আমি ওকে হিংসে করি। আমার বি দুধের ব্যবসা, আমিও তো আসলে গয়লানি। আচ্ছা, জ্যানেটের মতন একটা ছোট্ট বাড়িতে স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে যদি আমিও সুখে থাকতে পারতুম।

আমি সেদিন বিকেলেই ফিরে যাব শুনে ডরোথি বিষম আপত্তি করতে লাগল। না, না, তা কিছুতেই হয় না। আমার গেস্ট হাউস আছে, তুমি সেখানে সাতদিন থাকবে অন্তত। প্লীজ! কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছিল, আমার দম আটকে আসছিল। এই অতুল ঐশ্বর্য আর এই নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়ার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থেকেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। কলকাতায় কত সহজ ভাবে ডরোথির হাত ধরেছি, অনায়াসে এক ট্যাক্সিতে ছ জন বসেছি গাদাগাদি করে, ডরোথির কবিতা-বাতিক নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে পেরেছি। এখন তাকে মিলিওনেয়ারেস জেনে আমি সত্যিই খানিকটা আড়ষ্টবোধ করছিলুম। আর একটা জিনিসও আমার নজর এড়ায়নি—আমরা যেখানেই থাকি—দু-তিন জন ভৃত্য অলক্ষ্যে আমাদের ওপর নজর রাখে।

বাড়ির পিছনে অরণ্য, মাঝখান দিয়ে সার্পেন্টাইন লেক। দুপুরে দুর্লভ ফরাসি মদ্য সহযোগে এলাহী লাঞ্চ শেষ করার পর ডরোথি বলল, চল, লেকে একটু রোয়িং করে আসি!

এ প্রস্তাবে আমি বেশ বিচলিত বোধ করলুম। আমি পূর্ব বাংলার ছেলে, জলকে ভয় করি না। কিন্তু এ কথাও জানি, কোনো মহিলাকে নিয়ে নৌকারোহণে বেরুলে পুরুষ সঙ্গীকেই নৌকো চালাতে হয়। কিন্তু দাঁড় বেয়ে নৌকো চালানোর অভ্যেস আমার নেই। অথচ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাও চরম অভদ্রতা।

ধপধপে সাদা রঙের ছোট একটা ডিঙি নৌকো পাড়ে বাঁধা। দুজনে উঠে আমিই দাঁড় দুটো হাতে নিলুম। কিছুতেই দু-হাত সমান তালে পড়ে না, নৌকো এঁকেবেঁকে এগোতে লাগল। আমি রীতিমত ভয় পাচ্ছি, আমার জন্য নয়, সঙ্গের মহিলার জন্য। ভৃত্য এবং বাটলাররা পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, দু-তিনটে স্পীড বোটও বাঁধা আছে—সামান্য ইঙ্গিতেই তারা ছুটে আসবে। ডরোথি কিন্তু হাতের ইশারায় ওদের চলে যেতে বলল, শিশুর মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে আমাকে বলল, তোমার মতন এমন কাঁচা নৌকো চালক আমি আগে কখনো দেখিনি। এর আগে যাদের সঙ্গেই উঠেছি, তারা সবাই নিখুঁতভাবে চালাতে জানে। সেগুলো একঘেয়ে। তোমারটাই মজার!

আমি বললুম, যদি নৌকো উল্টে যায়?

—যাক না। বেশ মজা হবে।

—তুমি সাঁতার জানো তো?

—না জানলেই বা। তুমি আমাকে বাঁচাবে না?

—তাও পারব কি না জানি না।

নৌকো হেলতে দুলতে চলে এল বেশ দূরে। জঙ্গলের আড়ালে। এর মধ্যেই আমার হাত ব্যথা করতে শুরু করেছে। আবার ফিরে যেতে হবে। শীতের মধ্যেও আমি ঘেমে উঠেছি একটু একটু। আর বেশি দূর গেলে ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে। আমি বললুম, ডরোথি, আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। চলো এবার ফিরে যাই। শেষ পর্যন্ত নৌকো উল্টে গেলে একটা কেলেঙ্কারী হবে।

ডরোথি বলল, ওল্টাক না! একটা কিছু ঘটুক অন্তত। আর এই এক-ঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না। কোথাও কোনো বৈচিত্র্য নেই।

আমি বললুম, এখানে না থেকে তুমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেই পার, কত নতুন নতুন দেশ—

—সারা পৃথিবী আমি তিনবার ঘুরেছি। আমার বেড়াতেও ক্লান্তি লাগে। এক জায়গায় চুপচাপ থাকলেও ক্লান্তি লাগে। আমি কি করি বল তো।

ডরোথি ওর একটা হাত আমার বাহুতে রাখল। আমি তার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব; আমি চুপ করেই রইলুম। বুঝতে পারলুম, এ প্রশ্ন ও ঠিক আমাকে করছে না, নিজেকেই করছে। উত্তর যে পাবে না তাও ও জানে।

হ্রদ খুব গভীর নয়, স্বচ্ছ টলটলে জল। এমন কি নিচের ছোট গুল্ম পর্যন্ত দেখা যায়। কয়েকটা রুপোলি মাছ টিড়িক টিড়িক করে ছোটাছুটি করছে। ডরোথি একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থেকে বলল, এক এক সময় মনে হয় এই মাছগুলোও আমার চেয়ে সুখী।

হঠাৎ আমার মনে হল, এত টাকা পয়সা ডরোথি বিলিয়ে দিলেও তো পারে। তাহলে তো ও শান্তি পেতে পারত। ওর নিজের জন্য কতটুকুই বা দরকার। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলুম, আমার ভারতীয় ধারণা থেকেই এ কথা আমি ভাবছি, সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার কথা। ডরোথির পক্ষে তা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্রের অভিশাপ দু-চারজনকে তো বহন করতেই হবে।

ডরোথি বলল, তুমি চোখ অন্যদিকে ফেরাও তো। আমি একটু সাঁতার কাটব, পোশাকটা খুলে নিচ্ছি। ওপরের সমস্ত পোশাক নৌকায় খুলে রেখে ডরোথি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জল ছিটকে এসে লাগল আমার চোখে-মুখে।

ডরোথি খুব ভাল সাঁতার জানে। সুখী রুপোলি মাছদের জগতে একটি দুঃখিত রুপোলি মানবী সাঁতার কেটে খেলা করতে লাগল।

কার্য-কারণ

একজনের খেতে না খেতেই ঘুম পায়, আরেকজনের রাত জাগা অভ্যেস। ঘর একখানাই, দু দেয়াল ঘেঁষে দুটি নেয়ারের খাট পাতা, মাঝখানের একটা টুলের ওপর হ্যাজাক জ্বলে। একজনের নাক ডাকে, আরেকজন বইখাতা নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

সন্ধের পরই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রায় একই রকম। এখানে চাঁদের আলোতেও জেল্লা নেই। দূরে কাছে কোথাও একবিন্দু আলো চোখে পড়ে না। মাঠের মধ্যে একখানা অস্থায়ী বাড়ি, সামনের দিকে নদীর উঁচু পাড়, তার ওপাশে দেখা যায় না কিছুই। জানলার পাশে একটা বুনো কুলগাছ, কিন্তু জানলা খোলারও কি উপায় আছে? অমনি সাঁই সাঁই করে রাশি রাশি মশা আর পোকামাকড় ঢুকে পড়বে! হ্যাজাকের আলোর লোভে কত বিচিত্র রকমের পোকাই যে আসে। এর মধ্যে অনেক পোকা কুমুদ আগে কখনও দেখেইনি।

সন্ধেবেলা গ্রাম থেকে ফিরেই খগো রান্না চাপিয়ে দেয়। দুপুরের খাওয়ার কোন ঠিক নেই, রাত্তিরের খাওয়াটাই বড় খাওয়া। প্রায় রোজই খিচুড়ি। ভাত আর ডাল আলাদা রান্নার ধৈর্য থাকে না, খিদেও পেয়ে যায় জোর। সঙ্গে আলু-সেদ্ধ বা ডিম সেদ্ধ। মাছ খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু রান্নার বড় ঝামেলা। মাছ জোগাড় করা শক্ত নয়, হাকিম পাড়ার বাওড়ে বাঁধ দেওয়ার কাজ চলছে, সেখানকার জেলেরা মাছ দিতে চায়। প্রথম যেদিন মাছ ওঠে সেদিন তো প্রায় পৌনে এক কেজির একখানা কাতলা জোর করেই কুমুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল গুণো সর্দার। কুমুদ বিনা পয়সায় নেয়নি, ন্যায্য দাম দিয়েছিল। প্রীতিময় ওখানকার জেলেদের নিয়ে সমবায় গড়েছে, একটা মাছও যাতে এদিক ওদিক না হয় সেদিকে তার কড়া দৃষ্টি।

সেই কাতলা মাছ আঁশ ছাড়িয়ে, কুটে রান্না করা কি পুরুষের কাজ। খগো ডেকে এনেছিল গোলাপিকে। গোলাপি গ্রাম সেবিকা, দিনেরবেলা প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হয়। থাকে সে মাইল তিনেক দূরে। দিব্যি রান্নার হাত গোলাপির, সামান্য মশলা দিয়েই ঝোল আর মুড়োর ঝাল রেঁধে ফেলল।

তারপর থেকে হাকিমপাড়ায় বাওড়ের কাছে গেলেই কুমুদ মাছ কিনে আনত। জলজ্যান্ত টাটকা মাছ তার স্বাদই আলাদা। গোলাপি রান্না করে রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যায়, খগো কিংবা দীপু তাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসে। এর মধ্যে এক সন্ধেবেলা মণিদা এসে হাজির, পঁচিশ বস্তা রিলিফের গম নিয়ে। মাছ দেখে খুশি হলেন তিনি, সেদিন একটা বেশ বড় মৃগেল পাওয়া গিয়েছিল, গোলাপিকে বললেন, সব ঝোল করিস নি, আগে কয়েকখানা ভাজ, চায়ের সঙ্গে খাব।

সে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া বেশ জমেছিল। গোলাপি চলে যাওয়ার পর মণিদা খগো আর কুমুদকে নিয়ে মিটিং করতে বসলেন দরজা বন্ধ করে। দীনুকে বললেন বাইরে থাকতে।

মণিদার প্রথম বাক্যটাই হল, বৃন্দাবন? তোরা এখানে বৃন্দাবন সাজিয়ে বসেছিস, অ্যাঁ?

মণিদার ধমক খেয়ে খগো আর কুমুদ দুজনেই অবাক। গোলাপিকে ডাকিয়ে এনে মাছ রান্না করানো নাকি দারুণ অন্যায় হয়েছে।

মণিদা যখন কথা বলতে শুরু করেন তখন অন্য কারুকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেন না। একটানা বকাবকি করার পর হঠাৎ একজায়গায় থেমে মণিদা বললেন, দেশলাই আছে কার কাছে? দেখছিস না, সিগারেটটা হাতে নিয়ে বসে আছি, ধরাতে পারছি না?

কুমুদ দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না মণিদা, গোলাপিদি আমাদের জন্য মাছ রান্না করে দেওয়ায় কী দোষ হয়েছে? মাছ তো আমরা পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি।

মণিদা বললেন, সেটাও মাথায় ঢুকল না? গ্রামে কাজ করতে আসা মানে কি পিকনিক? গোলাপি রোজ তোদের জন্য মাছ রান্না করে দিচ্ছে, অনেক রাত পর্যন্ত এখানে থাকছে, এরপর সবাই বলবে, তোরা এখানে মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করছিস।

গোলাপিদি প্রায় আমাদের ডবল বয়েসি।

তাতে কিছু যায় আসে না। অত যদি তোর মাছ খাওয়ার লোভ, তাহলে রাত্তিরে এখানে থাকিস কেন? বাড়ি ফিরে গেলেই পারিস? মায়ের হাতের রান্না খাবি।

এই কথা বললেন বটে, অথচ মণিদা নিজেই ওদের রাত্তিরে জন্য থাকার এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নইলে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

খগোর বাড়ি তিনখানা গ্রাম পরে, সে অনায়াসে ফিরে যেতে পারে সন্ধের পর। কিন্তু বাড়িতে তার বিশেষ কেউ নেই তাই বাড়ি ফেরার টান নেই। কিন্তু কুমুদকে বাড়ি ফিরতে হলে সাইকেল নিয়ে যেতে হবে স্টেশানে। সেখানে সাইকেল জমা রেখে ট্রেনে এক ঘন্টা বারাসত। সেখান থেকে আবার সাইকেল রিকশা। রোজ যাওয়া-আসায় অন্তত চার ঘন্টা সময় লাগে, তার ওপর আবার খরচেরও ব্যাপার আছে।

মণিদা নিজেই উদ্যোগ করে মাঠের মধ্যে এই বাড়িটা বানিয়েছে। ইটখোলা থেকে ইট চেয়ে এনে বলেছেন, যবে পারব দাম দেব। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে রাস্তার ধারের একটা মুমূর্ষু গাছ কাটিয়ে বানিয়েছেন দরজা-জানলা। মণিদাকে এদিকে অনেকেই মানে, তাঁর ধমকের সুরে কথা বলা শুনে হাসে।

মণিদা ডাক্তার, তিনি আসেন শুধু শনি আর রবিবার। তবে সপ্তাহের মধ্যেও হুট-হাট করে যখন তখন এসে হাজির হন। সেই মাছ খাওয়ার পরের সপ্তাহেই মণিদা একটা অদ্ভুদ কাণ্ড করেছিলেন। রাত আটটার সময় একটা সাইকেল ভ্যানে চেপে উপস্থিত হলেন, হাতে একটা মস্ত বড় ইলিশ মাছ।

বাংলাদেশের মাছ, বুঝলি! স্মাগলড হয়ে এসেছে। স্টেশনের পাশে বিক্রি হচ্ছে দেখে কিনে ফেললুম।

খগো বলল, এই রাত্তিরে এত বড় মাছ নিয়ে কি হবে? গোলাপিকে ডাকা তো নিষেধ।

দেখ না কী হয়! শেষ পর্যন্ত তো একটা টুকরোও পড়ে থাকবে না।

প্যান্ট-কোট ছেড়ে লুঙ্গি পরে মণিদা নিজেই সেই মাছ কুটতে বসলেন। বঁটি নেই, রয়েছে শুধু একটা দা, তাই দিয়েই কাজ চলল। আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে মণিদা বললেন, ইলিশমাছ বলে কথা, একটা সুতো দিয়েই কেটে ফেলা যায়।

মণিদা মোটামুটি নিজেই মাছ কুটলেন এবং নিজেই ভেজে ফেললেন সব মাছ। কুমুদকে বললেন, গ্রামে থাকতে হলে সব রকমই শিখে নিতে হয়, বুঝলি। মাছ কোটা থেকে রামায়ণ পাঠ। তুই রামায়ণ পড়েছিস। আজকালকার ছেলেরা তো তাও পড়ে না।

রেল-স্টেশন থেকে আসবার পথে মণিদা সাত-আটজনকে নেমতন্ন করে এসেছেন। এল দশ বারোজন। সবাইকেই সেই মাছ খাওয়ানো হল। মণিদা গর্বের সঙ্গে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কেমন রেঁধেছি, বলো অ্যাঁ? কেমন রেঁধেছি? মেয়েরা ভাবে ওদের ছাড়া আমরা ভাল-মন্দ রান্না করে খেতে পারি না।

কুমুদ বুঝতে পারে, মণিদার কাছ থেকে অনেককিছু শেখবার আছে। মণিদা বিলেত ফেরত ডাক্তার হয়েও যেমনভাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন, সেরকম তো সে পারে না। গ্রামের মানুষের শুধু সাহায্য করার চেষ্টাটাই বড় কথা নয়, আগে তাদের বিশ্বাস অর্জন করা দরকার।

রাত্তিরে খগো যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, কুমুদ তখন একটা দু বছরের পুরনো মোটা ডাইরি খুলে লিখতে বসে। কলেজে পড়ার সময় আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের দেখাদেখি কুমুদও কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। একটা দেয়াল পত্রিকার সহ-সম্পাদকও হয়েছিল। প্রত্যেকদিন চার-পাঁচটা কবিতা লিখে ফেলত, ছাপার অক্ষরে দু-তিনটে বেরিয়ে গেল। তারপর ওদের কলেজের একটি সাহিত্যসভায় একদিন একজন নাম করা কবিকে ডেকে আনা হল। কুমুদ লাজুকতা কাটিয়ে সেই কবির কাছে গিয়ে বলেছিল, স্যার, আপনি আমার জন্য কিছুটা সময় দিতে পারবেন? আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা দরকার আছে।

নাম করা কবি কুমুদের দিকে কয়েক পলক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমাকে স্যার বলছ কেন, আমি কি তোমার মাস্টারমশাই? যে কোন রোববার চলে এসো আমার বাড়ি, সকাল নটা থেকে এগারোটার মধ্যে। তার আগেও না, পরেও না। তখন তোমার ব্যক্তিগত কথা শুনব।

ঠিক পরের রবিবারই সাড়ে নটার সময় সেই কবির বাড়িতে হাজির হয়েছিল কুমুদ। বসবার ঘরে আরও দু তিনজন উপস্থিত। সেই কবি কুমুদকে দেখে চিনতেও পারলেন না, ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

কুমুদ বলেছিল, আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, আমাদের কলেজে গত বৃহস্পতিবার—

কবির তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল। তিনি বললেন, ও হ্যাঁ, তোমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে আমার সঙ্গে....বলে ফেল।

কুমুদ সঙ্কুচিত বোধ করছিল। অন্য লোকজনের সামনে.....।

ভেতর থেকে চা এল তিন কাপ। কবি আরও দুটি ফাঁকা কাপ চেয়ে নিয়ে সেই চা সবাইকে ভাগ করে দিলেন। কুমুদের দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, প্রথম আলাপেই ব্যক্তিগত কথা বলা খুবই শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু এর পরে আরও বেশি লোক আসতে পারে, আর এগারোটার সময় আমি বেরিয়ে যাব। সুতরাং তুমি পরে তো আর সময় পাবে না।

কাঁধের ঝোলা থেকে কুমুদ বার করেছিল একটা খাতা। মৃদু গলায় বলেছিল, জানি আপনার সময় নষ্ট করছি। আমি কিছু কবিতা লিখেছি, জানি না, এগুলো কবিতা হয়েছে কিনা। বন্ধুরা লিটল ম্যাগাজিন বার করে, তাতে দু-একটা ছাপা হয়। কিন্তু আপনার কাছ থেকে মতামত চাই, আপনি যদি দয়া করে একটু পড়ে দেখেন!

কবি খাতাটি নিয়ে প্রথম কবিতাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। দু-তিনবার। পরের কবিতাগুলি দু-তিন লাইন পড়েই পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। তারপর খাতাটি বন্ধ করে কুমুদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে রইলেন।

ঘরের অন্যরাও চুপ। একটু বাদে একজন বলে উঠল, জামতাড়ায় আমি একটা বাড়ি যোগাড় করতে পারি।

কবি হাত উঁচু করে তাকে থামতে বলে কুমুদের দিকে ফিরে বললেন, দেখ, আমি উপদেশ দেওয়া পছন্দ করি না। ব্যক্তিগত মতামত জানাতে পারি শুধু। আমার মতামতেরও কোন মূল্য নাও থাকতে পারে। তুমি কবিতা লিখবে কিনা সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। আমার মত হচ্ছে, তোমার এই লেখাগুলি ঠিক কবিতা হয়নি। তুমি এই যে লিখেছ, এ বছর আর তিলফুলে মধু আসবে না। কারণ মেয়েরা উধাও, আর এক জায়গায় লিখেছ, মালবিকাকে আমি রোজ দেখি না, কারণ আমার ধৈর্য কম। দেখা যাচ্ছে কার্য-কারণ খোঁজার দিকে তোমার একটা ঝোঁক আছে। কিন্তু কবিতা তো যুক্তি-তর্কের মামলা নয়। কবিতা অনেকটা স্বপ্নের মতন......। তুমি কবিতার বদলে বরং প্রবন্ধ লেখ।

পৌনে এগারোটায় বেরিয়ে এসেছিল কুমুদ, মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় কবিকে আর ততটা প্রিয় লাগছিল না, মনে পড়ছিল সেই কবির নানান দুর্বলতার কথা।

তার পরেও বছরখানেক সে কবিতা লেখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল, ছাপাও হচ্ছিল দু-একটা করে। ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে সেই উৎসাহ অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছিল। মালবিকাদের বাড়ি, তাদের পারিবারিক সংস্কৃতি, প্রচুর নাম করা লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ দেখে কুমুদ বুঝতে পেরেছিল সে মালবিকার ঠিক যোগ্য নয়। বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে তাকে দুঃখ পেতে হবে।

কবির একটা কথা তার মনে লেগে গিয়েছিল। কুমুদের কার্য-কারণ খোঁজার দিকে ঝোঁক আছে, এটা সে নিজেই অস্বীকার করতে পারে না। বে-হিসেবি কল্পনায় সে নিজেকে কখনো ছেড়ে দিতে পারে না।

কুমুদের আর কবিতা লেখা হয়নি, প্রবন্ধ লেখাতেও সে হাত দেয়নি।

গ্র্যাজুয়েশানের পরেই কুমুদের চাকরি খোঁজার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দাদা একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে চলে গেলেন। বৃদ্ধ বাবার রোজগারে সংসার চলতে চায় না। ছোট বোনটার বিয়ে দিতে হবে।

রেজাল্ট ভাল হয়নি, সুতরাং ভাল চাকরির আশাও কম। এই অবস্থায় স্কুলমাস্টারিই একমাত্র ভরসা। চতুর্দিকে দরখাস্ত পাঠাচ্ছে কুমুদ, কয়েক জায়গায় ইন্টারভিউ দেবার পর সে বুঝল যে আজকাল ইস্কুল মাস্টারির জন্যও কোনো না কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের ছাতার নিচে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার।

এই সময় দাদার বন্ধু মণিদাই একদিন বললেন, এই, তুই তো বেকার বসে আছিস। গ্রামে গিয়ে কাজ করবি আমার সঙ্গে? কিছু হাত খরচ পাবি, কিন্তু খাটতে হবে খুব। জল-কাদা মাখতে হবে, মাঝে মাঝে এক আধবেলা খাবার জুটবে না.......।

দাদার বন্ধু হিসেবে মণিদা তাদের বাড়িতে দু একবার বাবা-মাকে চিকিৎসা করতে এসেছেন। একটু পাগলাটে ধরনের মানুষ। বেশি জোরে জোরে কথা বলেন। মণিদার চেম্বারে গিয়েও কুমুদ দেখেছে, সেখানে বহু মানুষের ভিড়, অনেকেই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে এসেছে। মণিদা প্রায়ই গ্রামে সমাজ সেবা করতে যান সেকথাও কুমুদ শুনেছিল।

মণিদার প্রস্তাবে কুমুদ রাজি হয়ে গেল। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা কাজ করা অনেক ভাল। কাজ করতে এসে দেখল, পরিশ্রম আছে বটে, কিন্তু এ কাজে আনন্দও আছে।

চোদ্দখানা গ্রাম নিয়ে প্রজেক্ট। খুবই অনুন্নত এলাকা। এদিককার জমিতে ফসল ভাল হয় না, গ্রামের মানুষের কোনো রকম রোজগারই নেই। কী করে এরা বেঁচে থাকে সেটাই রহস্য। কেউ কেউ বছরের কয়েক মাস দিন মজুরির কাজ পায়, বাকি সময়টা বেকার।

কেউ কেউ চুরি-ডাকাতি করে। এদের স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য দু বছরের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, টাকা দিচ্ছে একটি বিদেশি সংস্থা। কিছু সরকারি সাহায্যও আছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই কুমুদ এই কাজে বেশ মেতে উঠল। নিছক চাকরি তো নয়, দেশের কাজ। চতুর্দিকেই তো এখন দলাদলি, মারামারি, এর মধ্যেই যদি কিছু ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্তত বাঁচার একটা পথ দেখানো যায়, তাতে কিছুটা আত্মপ্রসাদ আসে। প্রথম যে-দিন ভোলাডাঙ্গায় কুমুদরা এক পাল শুয়োর নিয়ে গিয়েছিল।

ভোলাডাঙ্গায় সবাই নিম্ন বর্ণের মানুষ, অতি গরিব। সে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে এক জোড়া করে শুয়োর-শুয়োরি দেওয়া হয়েছে। শূকর পালনের নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। কুমুদ নিজেই এ ব্যাপারে তিন

সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ব্যারাকপুর থেকে। শুয়োর একসঙ্গে অনেকগুলি বাচ্চা দেয়। তারা যে-কোনো জিনিস খায়। বাচ্চাগুলোকে একটু বড় করতে পারলেই বিক্রি করে বেশ লাভ হয়। এই ভাবে সারা বছর গ্রামের মানুষের একটা আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে।

সব গ্রামে একই ব্যবস্থা নয়। মুসলমান প্রধান গ্রামে শুয়োর দেওয়া যায় না, সেখানে দেওয়া হচ্ছে পাঠা-ছাগল। কিংবা মুরগি। এ ছাড়া সব গ্রামের মহিলাদেরই দেওয়া হচ্ছে 'ধান ভেনে চাল দাও' কাজ। প্রত্যেক বাড়িতে দু-বস্তা করে ধান দেওয়া হবে, বাড়ির মেয়েরা সেই ধান সেদ্ধ করে, শুকিয়ে, ঢেঁকিতে ভেনে চাল ফেরত দেবে। সবটা নয়, চার ভাগের তিন ভাগ। জুন-জুলাই মাসে চালের দাম সবচেয়ে বেশি ওঠে, সেই সময় গ্রামের মানুষরাই ন্যায্য দামে ওই চাল কিনবে সোসাইটির কাছ থেকে।

রাত জেগে মোটা ডাইরিতে কুমুদ কবিতা লেখে না, তার সারাদিনের কাজের নোট রাখে। কোন কাজে কী ভুল হল, তার কার্য-কারণ খোঁজে।

ভোলাডাঙায় তাদের প্রজেক্ট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সেই দিনটার কথা মনে পড়লে কুমুদের এখনো বুক কাঁপে।

সন্ধের পর কুমুদরা কেউ গ্রামে থাকে না, কিন্তু সেদিন থাকতে হয়েছিল। একজন সরকারি ইন্সপেক্টরের আসবার কথা। তিনি অন্যান্য গ্রাম ঘুরে সময় দিয়েছিলেন ভোলাডাঙায় আসবেন সাড়ে পাঁচটার সময়। প্রীতিময় আর কুমুদ গ্রামের সর্দারের বাড়িতে বসে সরকারি কর্মচারিটির জন্য অপেক্ষা করছিল। বিকেল থেকেই বৃষ্টি নামল, সে বৃষ্টি থামল, দু ঘণ্টা বাদে। এর মধ্যে সরকারি কর্মচারিটি যদি না আসতে পারেন সেজন্য তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। সাইকেল ছাড়া এ গ্রামে আসবার আর কোনো উপায় নেই, এত জল কাদার মধ্যে সাইকেলও চলে না।

প্রীতিময় আর কুমুদ তাদের সাইকেল দুটো ঠেলতে ঠেলতে ফিরছিল অন্ধকারের মধ্যে। দুজনেই নিঃশব্দ। এমন সময় শুনতে পেল ঢোলের শব্দ। গ্রামের একেবারে একটেরো একটা বাড়ি, সে বাড়ির উঠোনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর কারা যেন ঢোল বাজাচ্ছে। কুমুদ আর প্রীতিময় প্রায় ছুটতে ছুটতেই হাজির হল সেখানে।

একটুক্ষণের মধ্যেই তারা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সে বাড়িতে একটা শুয়োর মারা হয়েছে। খানিকটা মাংস বেচে সেই পয়সায় কেনা হয়েছে চুল্লু, বাকি মাংস ঝলসানো হচ্ছে আগুনে। সে বাড়িতে তিনজন নারী-পুরুষ, আরও দুজন জুটেছে। কোথা থেকে, চুল্লু খেয়ে এরই মধ্যে তারা ঘোর মাতাল।

মাতাল বলেই ওদের মধ্যে কোন অপরাধ বোধ নেই। শুয়োর মেরেছি, বেশ করেছি! আমাদের দিয়ে দিয়েছিল তো, নিজের টাকাতে তো কিনে দিসনি, সরকারি টাকায়। আমাদের জিনিস আমরা কাটব, বেচব, যা খুশি করব!

এ বাড়ির একটা মেয়ের নাম রুইয়া। কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গেছে, তাই বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। রোগা-ভোগা চেহারা, কোনদিন তাকে দর্শনীয় মনে হয়নি। সেদিন চুল্লু খেয়ে তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। মাথার সব চুল পাগলিনীর মতন এলো, বুকের আঁচলের ঠিক নেই। কাঠের আগুনে তাকে দেখাচ্ছে যেন ডাকিনীর মতন। কুমুদের একটা হাত চেপে ধরে সে টানতে টানতে নিয়ে এল আগুনের পাশে। এক টুকরো মাংস তুলে ধরে বলল, খা, খা! তুরা তো বাবু, আমাদের হাতের মাংস খাবি না? খা! খা!

কুমুদের একেবারে মুখের সামনে রুইয়ার মুখ, তার হাতখানা রুইয়ার বুকের ওপর চেপে ধরা, সে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অন্য সবাই হা হা করে হাসছে। কুমুদের মনে হয়েছিল রুইয়া তাকে কামড়ে দেবে। সে অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল প্রীতিময়ের দিকে।

প্রীতিময় এখানকার পুরনো কর্মী, অনেক বেশি অভিজ্ঞ। সে এগিয়ে এসে এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে বলেছিল, ইস, নুন দিসনি কেন? নুন ছাড়া মাংস তোরা খাস কী করে?

নিজে সেই মাংস খেয়ে সে কুমুদকেও সেই মাংস খাইয়েছিল।

সেদিন ফেরার পথে প্রীতিময় বলেছিল, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলে না রে কুমুদ! আমরা শুধু ওদের পেটের খিদের কথাই ভাবি, কিন্তু ওদের যে একটা উৎসবেরও ক্ষুধা আছে, সেটা কি অস্বীকার করা যায়? ওদেরও তো ইচ্ছে হয় বছরে অন্তত বেশি করে রান্না হবে, নাচ গান হবে...।

ভোলাডাঙায় একে একে সব পরিবারই তাদের শুয়োরগুলো বাচ্চা হবার আগেই বেচে দিল কিংবা কেটে খেয়ে ফেলল।

যাদের হাঁস-মুরগি দেওয়া হয়েছিল, তাদের অবস্থাও একই। যাদের ধান দেওয়া হয়েছিল, তারা চাল ফেরত দেয় না। দেখা করতে গেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

কুমুদ কিছুতেই বুঝতে পারে না, এরা এদের ভবিষ্যতের কথা বুঝতে পারে না কেন? আগেও তো এরা না খেয়েই থাকত। কটা দিন একটু বেশি খেয়ে কিংবা মাংস-টাংস খেয়ে এরা একটা সীমিত উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিল!

তবু হাল ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এখন প্রত্যেক পরিবারকে আলাদাভাবে কিছু জিনিসপত্র না দিয়ে গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ গড়া হচ্ছে। গ্রামের মানুষদের এখন যৌথ দায়িত্ব নিতে শেখানো দরকার।

সেই রুইয়া নামের মেয়েটা এখন আবার আগের মতন সাধারণ হয়ে গেছে। কুমুদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ সেই সন্ধেবেলা তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। রুইয়াকে দেখলেই তার সেই সন্ধেবেলার রূপটা মনে পড়ে।

গৃহপালিত শুয়োরটাকে হঠাৎ একদিন কেটে ফেলে, তার মাংস ঝলছে খেতে খেতে, অর্থাৎ নিজেদের সর্বনাশ করার সময়টাতেই রুইয়াকে কেন অত উজ্জ্বল ও অপরূপ দেখাচ্ছিল? কুমুদ কিছুতেই এর কার্য-কারণ খুঁজে পায় না, তাই তার অসহায় লাগে।

হাতঘড়িতে কুমুদ দেখল, রাত সওয়া এগোরোটা। এবারে বাতিটা নিভিয়ে দিলেই হয়। বাইরে কিসের যেন খচর-মচর শব্দ। প্রথম প্রথম এরকম শব্দ হলেই কুমুদ দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারত। দু-একটা শেয়াল চোখে পড়েছে। খগো অবশ্য বারণ করে, খবরদার রাত্রে দরজা খুলবে না। একলা অন্ধকারের দিকে তাকালে মানুষ কত কী দেখে ভয় পেতে পারে!

কাল ভোরবেলা বাওড়ের কাছে যেতে হবে গম নিয়ে। ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য বেশ কিছু গম এসেছে তাদের কাছে। সারাদিন বাওড়ের বাঁধ বাঁধার কাজের জন্য মাথাপিছু আড়াই কেজি গম দেওয়া হয়। এই কাজ পাওয়ার জন্য সবাই লোলুপ। এক একটা গ্রামের লোকদের ভাগ ভাগ করে প্রতিদিনের কাজ চালানো হচ্ছে। প্রীতিময়ের মাথা ঠাণ্ডা, সে এই সব ভাল পারে, তার বিলি-বন্দোবস্তে কেউ চটে যায় না।

একটা জিনিস কুমুদ বুঝতে পারে, গ্রামের মানুষ তাদের ভালবাসতে শুরু করেছে। ওরা নিজেদের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়। এক একদিন চুল্লু খেয়ে খুব হৈ-হল্লা করলেও পরের দিন সুর নরম হয়ে যায়। দারিদ্র্যের মধ্যেও কেউ নিজের গাছের একটা পাকা পেঁপে কিংবা একটা দুটো এঁচোড় উপহার দিতে চায়।

আলোটা নিভিয়ে দেবার পর কুমুদের সবে চোখ জুড়িয়ে এসেছে এমন সময় বেশ জোরে শব্দ পাওয়া গেল বাইরে। শেয়াল কি বারান্দায় উঠে এসেছে? গমের বস্তা আছে, সেই গন্ধে গন্ধে আসতে পারে।

আর একবার শব্দ হতেই কুমুদ বেশ চমকে উঠল। এতো শেয়ালের শব্দ নয়। কেউ এসেছে নিশ্চয়ই।

কুমুদ চেঁচিয়ে উঠল কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল, তোর বাপ!

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দম দম লাথি পড়তে লাগল।

খগোকে আর ডাকতে হল না, তার নাক বাদ্য থেমে গেল, সে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল, কে? কী হয়েছে? কিসের শব্দ?

বাইরে থেকে একজন বলল, দরজা খুলবি না আগুন লাগিয়ে দেব?

খগো কাঁপতে কাঁপতে বলল, ডাকাত পড়েছে গো! আজ শেষ হয়ে গেলাম! একেবারে খতম করে দেবে।

ডাকাত? কুমুদ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার যুক্তিবাদী মন মানতেই চাইছে না যে কাছাকাছি কোন গ্রামের মানুষ তাদের ওপর ডাকাতি করতে আসবে। দূর গ্রাম থেকেও তো ডাকাতরা সব খোঁজ খবর নিয়ে আসে। তাদের কাছে আছে কী? প্রায় বছরখানেক হল তারা এই মাঠের মধ্যে আস্তানা গেড়ে আছে। গ্রামে সব কথাই জানাজানি হয়ে যায়। সবাই জানে তারা দু জন সমাজসেবক এখানে রাত কাটায়, তাদের সম্বল যৎসামান্য।

কুমুদেরও ভয় করছে খুবই। তার শরীর কাঁপছে। তবু সে গলার আওয়াজ সহজ করার চেষ্টা করে বলল, কে আপনারা। শুধু আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমরা কী দোষ করেছি?

বাইরে লোকের সংখ্যা অন্তত তিনজন। তাদের মধ্যে একজন একটা খুব খারাপ গালাগালি দিয়ে উঠল। আর একজন বলল, দরজা খোল, সাইকেল দুটো বার করে দে!

সাইকেলের লোভে এসেছে! প্রজেক্ট থেকে প্রত্যেক কর্মীকে একটা করে সাইকেল দেওয়া হয়েছে, সাইকেল ছাড়া ঠুঁটো জগন্নাথ। এদিকে কোন পাকা রাস্তা নেই। সাইকেল ছাড়া পনেরোটি গ্রাম ঘোরাঘুরি করা অসম্ভব! দরজার ওপর শাবল বা ওই রকম কিছু দিয়ে ঘা মারছে বাইরে থেকে। সাধারণ দরজা ওই আঘাত আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে?

খগো বলল, দরজা খুলে দাও গো! নইলে কেটে কুচি কুচি করবে।

খগো গ্রামের মানুষ তবু তারই ভয় বেশি। কুমুদই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ওরা।

ওদের একজনের হাতে টর্চ। অন্ধকারে ওদের মুখ প্রায় দেখা যায় না, তবু যেন মনে হয় মুখে কাপড় বাঁধা। পরিচয় গোপন করতে চাইছে। ওরা যে গলায় কথা বলছে সেটা ওদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয়। অর্থাৎ ওরা জানে, খগো বা কুমুদ ওদের চিনে ফেলতে পারে।

দুজনের বিছানা থেকে চাদর দুটো তুলে নিয়ে ওরা খগো আর কুমুদকে সেই চাদর দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল। বাঁধার সময় পাশে একজন শাবল তুলে ধরে থেকে বলল, টুঁ শব্দটি করবি তো মাথা দু ফাঁক করে দেব!

সাইকেল দুটো ঘরেই রাখা হয়। খগোর সাইকেলে আবার তালা দেওয়া। খগো একটু শৌখিন, সে তার সাইকেলে অন্য কারুকে হাত দিতে দেয় না। রোজ সন্ধেবেলা সে তার সাইকেল ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে।

খগোর সাইকেলটা নাড়াতে না পেরে একজন বলল, চাবি দে, সুমুন্ধির পুত!

খগো বলল, বালিশের নিচে!

কুমুদের ভয় চলে গেছে। গভীর দুঃখে ভরে গেছে তার বুক। সে বুঝতে পেরেছে যে এরা কাছাকাছি গ্রামেরই লোক। এরা জানে না কুমুদরা কত কষ্ট করে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে? দেশ স্বাধীন হবার এতগুলো বছর পরেও এই গ্রামগুলোর সামান্য একটুও উন্নতি হয়নি, বরং আরও যেন অবনতি হয়েছে। যারা দেশ চালায় তারা এইসব গ্রামের কোন খবরই রাখে না। কুমুদরা তবু তো কিছুটা চেষ্টা করছে, তা কি এরা বোঝে না?

কুমুদ বলল, আপনারা চান না আমরা গ্রামে কাজ করি? আপনারা কি চান আমরা এখান থেকে চলে যাই?

খগো বলল, দাদা, চুপ কর।

একজন ডাকাত কুমুদের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বলল, ফের ফটর-ফটর করছিস! জানে মরতে চাস?

সাইকেল দুটো বার করার পর ওরা গমের বস্তায় হাত দিল। গ্রামের মানুষের জন্যই এই গম, গ্রামের মানুষই তা চুরি করছে। এই গম ওরা খেতে পারবে না, কেন না, কারুর বাড়িতে এত গম জমা দেখলে প্রতিবেশীরাই সন্দেহ করবে। এই গম ওরা রাতারাতি বিক্রি করে দেবে। চোরাই গম কেনার জন্য মহাজনের অভাব নেই। পঁচিশ বস্তার মধ্যে দশটা বস্তা বার করে নিল ওরা। কুমুদ এক এক করে গুণছে। দশটা বস্তা পাচার হবার পর একজন বলল, আর থাক।

তাই নিয়ে ডাকাতদের মধ্যে সামান্য মতভেদ হল। কিন্তু তা মিটেও গেল সহজে। আর দুটি মাত্র বস্তা টেনে বার করে ওরা বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট, দু মিনিট, দশ মিনিট .....ওরা আর ফিরে এল না। ওরা চলেই গেছে তাহলে। বাকি গমগুলো রেখে গেল কেন? নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে।

রাত্তিরে দীনুর এখানে পাহারা দেবার কথা। নাইট-গার্ড হিসেবে সে মাইনে পায়। কিন্তু দীনু কোনো রাতেই থাকে না। পাশের গ্রামে তার বাড়ি, সে খাওয়া-দাওয়ার পরে বসে যায়। কুমুদ কোনোদিন আপত্তিও করেনি। পাহারা দেবার প্রয়োজনও তো বোধ করেনি আগে।

ভোর হতে না হতেই চলে আসে। ততক্ষণ তাদের হাত বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে হবে?

খগো বলল, বড় জোর প্রাণে বেঁচে গিইছি। এ তল্লাটের ডাকাতরা সাক্ষী রেখে যায় না।

কুমুদ জিজ্ঞেস করল, যারা এসেছিল চিনতে পারলি?

ওরে বাবা, আমি চিনব কী করে? তুমি চেনার চেষ্টাও করো না। তাতে আরো বিপদ হবে।

কুমুদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যারা নিজেদের ভাল বোঝে না তাদের ভাল কি অন্য কেউ করতে পারে? গ্রামের মানুষ তাদের চায় না। এর পর কী আর প্রজেক্ট চলবে? চালাবারই বা কী মানে হয়?

আবার পায়ের শব্দ। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। ফিরে এসেছে, বাকি গমের বস্তাগুলো নিতে এসেছে।

ওরা ঘরে ঢুকে খগো আর কুমুদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। একজন বলল, চ্যাঁচামেচি করো না, শুয়ে পড়ো। অনেক খারাপ কথা বলিছি, দোষ নিও না। তোমরা ভাল লোক জানি, গরিবদের দুঃখ বোঝ, কিন্তু আমাদের যে বড় বিপদ!

অভিমানে কুমুদের গলায় বাষ্প জমে গেল। ডাকাতি করার পর এ আবার কী আদিখ্যেতা! তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোল না।

লোকটি বলল, ধান কাটার জন্য রোজ খাটতে গেসলুম, দারোগা শালা আমাদের নামে ডাকাতির কেস লিখিয়ে দিয়েছে। জম্মে কখনো চুরি ডাকাতি করিনি, বিশ্বাস করুন। এখন থানার লোকদের টাকা না খাওয়ালে ফাটকে ভরে দেবে। কী করি বলুন দেখি? টাকা পাই কোথায়? কালকের মধ্যেই কিছু না করতে পারলে একেবারে জেরবার করে দেবে...

লোকগুলো চলে যাবার পর খগো বলল, ওরে বাপরে, আমি আর রাতে থাকছিনি! আগামী হপ্তায় নাকি এক গাড়ি গুঁড়ো দুধ দেবে, কে তা পাহারা দেবে?

কুমুদ তবু কোনো কথা বলতে পারছে না। তার সব কিছু গুলিয়ে গেছে। সে কার্য-কারণ কিছুই বুঝতে পারছে না।

উত্তরপুরুষ

সকালবেলা খাবার টেবিলে সেঁকা পাউরুটি আসবার পর দেখা গেল মাখন নেই।

রান্নাবান্না সব বামুনদিদিই করেন, কিন্তু স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খাবার নিজের হাতে পরিবেশন করেন সুমিত্রা। স্বামী ও মেয়ে দু'জনেই টেবিলের দুই প্রান্তে খবরের কাগজ ও ইংরেজি গল্পের বই পড়ায় ব্যস্ত, ছেলে এখনো আসেনি, তাকে অনেক ডাকাডাকি, সাধাসাধি করে খাবার টেবিলে আনতে হয়।

মাখন লাগাবার ছুরি আর সেঁকা রুটি হাতে নিয়ে সুমিত্রা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রত্নেশের চোখ খবরের কাগজে সাঁটা। সুমিত্রা অনুচ্চ গলায় বললেন, মাখন নেই, তোমায় জ্যাম মাখিয়ে দেব?

কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে রত্নেশ স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সুমিত্রা আবার বললেন, মাখন ফুরিয়ে গেছে।

রত্নেশ বললেন, আমাকে শুকনো টোস্ট দাও।

সুমিত্রা অন্য রুটিগুলোতে জ্যাম মাখাতে মন দিলেন। একটু পরে মাথা তুলে আবার বললেন, বাড়িতে পেঁয়াজও ফুরিয়ে গেছে।

রত্নেশ বললেন, তাতে কী হয়েছে? পেঁয়াজ ছাড়া রান্না হয় না?

পেঁয়াজ ছাড়া মাংস, তুমি খেতে পারবে?

হঠাৎ রত্নেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমরা সামান্য জিনিস নিয়ে আমাকে এত বিরক্ত কর কেন বলত?

কফির কাপটা হাতে নিয়ে রত্নেশ চলে গেলেন শোবার ঘরে। তেরো বছরের মেয়ে মিলি এইসব কথার মধ্যেও একবারও বই থেকে চোখ তুলল না।

খাবার ঘরটিতে এই দিনেরবেলাতেও আলো জ্বালা। বাইরের দিকের সব কটি জানালা বন্ধ।

সুমিত্রা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, রাজা, রাজা, খাবি আয়!

একডাকে রাজাকে কখনো পাওয়া যায় না, তার খোঁজে ভানুকে পাঠাতে হয়। কিন্তু ভানু নেই। ভানুর কথা মনে পড়তেই সুমিত্রার মুখে দুঃখ আর রাগ একসঙ্গে মিশে গেল। মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়?

সুমিত্রা আপন মনেই বললেন, থাক, না খেয়ে থাক। আমি আর ডাকব না।

মিলি এবার বইটা সরিয়ে রাখল। মায়ের গলা অন্যরকম। এই রকম মেজাজ দেখলে সে ভয় পায়। সে উঠে গেল ছোট ভাইকে ডাকতে।

রাজা তখন ছাদের সিঁড়িতে হুটোপাটি করছে। ছাদের দরজায় তালা বন্ধ। মস্ত বড় ছাদ, রাজাকে তার খেলার জায়গা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ বাড়ির কেউ যেন বাইরে উঁকি মারতে না পারে সেইরকম ব্যবস্থা।

রাজা একটা কাগজের মুখোশ পরে অরণ্যদেব সেজেছে, সে অবশ্য অরণ্যদেব নামটি জানে না, সে বলে ফ্যান্টম। তার দু-হাতে দুটি পিস্তল-পিচকিরি, রেলিং-এর ওপর বসে সে বিপজ্জনকভাবে ঘোড়া চালাচ্ছে। দিদিকে দেখেই সে ঠাঁ-ঠাঁ, ডিসুম ডিসুম শব্দে দুটি পিস্তল খালি করে দিল।

রাজাকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে আনতে হল খাবার ঘরে। তার অফুরন্ত জীবনীশক্তির জন্য যেন খাদ্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। খাওয়াটা তার প্রতি তার মায়ের একটা অত্যাচার। টোস্টে মাখন আছে কি নেই তা সে গ্রাহ্যই করল না, কচমচ করে কামড়ে খেতে লাগল, দুধের গেলাসে একটু চুমুক দিল, সামনের প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বলল, আমি ডিম খাব না, কিছুতেই খাব না।

সেটা সে একটু বেশি জোরে ঠেলে দিয়েছিল, সেদ্ধ ডিমটা গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সুমিত্রা চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, তুই...তুই ডিমটা ফেলে দিলি? অসভ্য ছেলে!

ঠাস ঠাস করে দুটি চড় মারলেন রাজার গালে। তারপরও বললেন, তুমি বড্ড বেড়ে গেছ, তাই না? দিন দিন আনম্যানেজেবল হয়ে উঠছ?

রাজা হাঁ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। মিলির অবস্থাও তাই। সুমিত্রা ছেলের গায়ে হাত তুলেছেন, এ দৃশ্য এ বাড়িতে অকল্পনীয়।

সেদ্ধ ডিমটা পড়েছে রাজার চটির ওপর। সুমিত্রা সেটা তুলে নিয়ে একবার ভাবলেন ধুয়ে নেবেন কি না, তারপর সেটা আবার ফেলে দিলেন ট্র্যাশ ক্যানে।

সুমিত্রা ধরা গলায় বললেন, যখন কিছু খেতে পাবি না, তখন বুঝবি!

মিলি উঠে এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। সে বুঝেছে যে গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সে বলল, মা, ওই লোকগুলো যাবে না?

সুমিত্রা বললেন, না। ওরা যাবে না! আগে আমাদের শেষ করে দেবে, তারপর—

—বাপি কেন পুলিশ ডেকে ওদের সরিয়ে দিচ্ছে না?

সে তোর বাপিকেই জিজ্ঞেস কর! কী যে জেদ!

রাজা এই সুযোগে একটা দৌড় মেরে চলে গেল তার খেলার জায়গায়। গেলাসের দুধটা তৃতীয় চুমুকে শেষ করতে গিয়ে তার ঠোঁটে সাদা গোঁফ আঁকা হয়ে গেছে।

একতলায় রত্নেশের পিসতুতো ভাই অনুপ থাকে সস্ত্রীক, তাদের আলাদা রান্না। অনুপ চাকরি করত পাটনায়, মাত্র দেড় বছর আগে রত্নেশ তাকে নিজের কারখানায় ম্যানেজার করে নিয়ে এসেছেন। অনুপ কাজের ব্যাপারে খুব দক্ষ হলেও তার ব্যবহার রুক্ষ। গোড়া থেকেই ইউনিয়নের পাণ্ডাদের সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি।

সিল্কের লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা অনুপ সিঁড়ি দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, সেজদা কোথায়? ঘুমোচ্ছে এখনও!

সুমিত্রা মাথা দু দিকে নেড়ে শোবার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

—বৌদি, চা র‍্যাশান নাকি? আর এক কাপ হতে পারে?

—দিচ্ছি!

—এ কী বৌদি, তোমার চোখে জল? তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ? আরে, এরকম তো হয়ই!

—তিনদিন কেটে গেল, ওরা কি আমাদের উপোস করিয়ে মারবে?

—তোমার পতিদেবতাটি যে শুনছেন না! নইলে আমি সব ঠিক করে দিতাম! দাঁড়াও, আজ আবার দেখি রাজী করাতে পারি কি না!

এগিয়ে গিয়ে সে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কয়েকবার খটখট করল। ডায়াল টোন নেই। বিরক্তির সঙ্গে রিসিভারটা আবার নামিয়ে রেখে সে বলল, ধুৎ। ফোনটা এমনিই খারাপ হয়ে গেল না ওরা লাইন কেটে দিল তাও তো বোঝা যাচ্ছে না!

শোবার ঘরেরও সবকটা জানালা বন্ধ। আলো জ্বলছে। রত্নেশ একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। মুখটা নিচু করা। এই তিনদিনেই রত্নেশের চোখের নিচে কাকের পায়ের ছাপ পড়েছে, তার দৃষ্টিও বিভ্রান্ত।

অনুপ ঘরে ঢুকে বলল, সেজদা, লেবার কমিশনারের সঙ্গে আজ একবার গিয়ে দেখা করি? আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না। আমি গিয়ে পড়লে ঠিকই দেখা হবে।

রত্নেশ মুখ তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন অনুপের দিকে। যেন তিনি কোনো দুর্বোধ্য ভাষা শুনছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, লীনার কাল জ্বর হয়েছে শুনলুম। এখন কেমন আছে?

অনুপ এই ধরনের অবান্তর কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বলল, ও সাধারণ জ্বর—ফ্লু। ভাববার কিছু নেই। তাহলে যাব লেবার কমিশনারের কাছে?

—কী করে যাবি তুই?

—আমি বেরুতে চাইলে ঠিকই বেরুতে পারি। আমাকে আটকাক তো দেখি ওদের কত সাহস।

—তুই একটা গণ্ডগোল পাকাতে চাস, তা হলে আমাদের আরও বেশি ক্ষতি। তুই ওদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে গেলে ওরা বলবে আমরা ওদের ওপর গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছি!

—তুমি পুলিশে খবর দিতে চাইছ না কেন বলতো? তোমার বন্ধু মিঃ হালদার আছেন!

—ফোন ডেড, কী করে পুলিশকে খবর দেব!

—তার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ছাদ থেকে পাশের বাড়িতে চিঠি ফেলা যায়। ও বাড়ির মিঃ ঘোষালকে রিকোয়েস্ট করলে উনি পুলিশকে খবরটা দিয়ে দেবেন! ইন ফ্যাক্ট উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, সেরকম কোনো দরকার আছে কি না।

—না, থাক, এখন দরকার নেই।

—যত দেরি হবে তত কিন্তু ওরা পেয়ে বসবে।

—শোন, অনুপ, কারখানাটা তো আমি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে চাই না? আবার চালাতে চাই। চালাতে গেলে ঐ লোকগুলোকে দিয়েই চালাতে হবে। ওদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করে কী আমার লাভ হবে?

—তিক্ততার আর বাকি আছে কী? ঐ মাধবটাই পালের গোদা, ওকে যদি সরানো যেত?

বাইরে হঠাৎ শ্লোগান শুরু হয়ে গেল। সমস্ত জানালা বন্ধ রাখলেও সে আওয়াজ শোনা যায়।

রত্নেশ আর অনুপ চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

রত্নেশের কাচ কারখানার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে ছ-মাস আগে থেকে। নানা ধরনের কাচের জিনিস সে রাজ্য সরকারকে সাপ্লাই করে, রাজ্য সরকারের হাতে এখন টাকা নেই, তাই অর্ডারও কমে গেছে। বাইরের বিল পাওনা আছে অনেকগুলো। রত্নেশের মূলধন বেশি নয়। ব্যাঙ্কের সুদ দিতে দিতে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়।

এই সময়ে আবার শুরু হল শ্রমিক বিক্ষোভ। ক্যান্টিনে সস্তা খাবারের দাবি। ব্লো-পাইপ সেকশানে কাজ অনেকদিনই বন্ধ, তার ওপর সেখানে একদিন ভাঙচুর হতে অনুপ চারজন কর্মীকে সাসপেণ্ড করে। সে কিছু অন্যায় করেনি, কারখানায় অন্তত ডিসিপ্লিন রাখতে হবে তো!

সেই ঘটনা উপলক্ষ্য করে ইউনিয়ন লাগাতার স্ট্রাইক ডাকল। তখন লক-আউট ঘোষণা করা ছাড়া আর উপায় নেই। সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে রত্নেশের কান্না পেয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তো ব্যবসা নয়, কারখানাটা তার নিজের হাতে গড়া, অনেক শ্রম, অনেক স্বপ্ন মিশে আছে। মোট সাতান্নজন কর্মীর প্রত্যেককে নাম ধরে চেনেন রত্নেশ, এর আগে কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়নি। বিধু দাস নামে একজন পুরনো কর্মী রিটায়ার করার পর তার ছেলে মাধবকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল সেই একই পোস্টে, এই মাধবই ইউনিয়নের নেতা হয়ে বসেছে, বছর খানেক ধরে সে নানান ছুতোয় গোলমাল পাকাচ্ছে।

লক-আউট ঘোষণা আইনসঙ্গতভাবে জারি করার আগেই কী করে যেন ওরা টের পেয়ে যায়, ওরা দল বেঁধে আসে মালিকের বাড়ি ঘেরাও করতে। অনুপ ছুটতে ছুটতে এসে রত্নেশকে সে খবর দিয়ে বলেছিল, সেজদা, তুমি পুলিশ প্রোটেকশানের ব্যবস্থা কর। ডি সি ডি ডি মিঃ হালদার তো তোমার বন্ধু.......

রত্নেশ রাজি হননি। পুলিশ এসে যদি লাঠি চালায়, গুলি চালায়? তাঁর নিজের কারখানার শ্রমিক, তাদের তো তিনি শত্রু মনে করেন না। রত্নেশের যে এখন টাকাপয়সার সাঙ্ঘাতিক টানাটানি চলছে, ব্যাংক ওভার-ড্রাফ্‌ট দেবে না বলেছে, তা ওদের বুঝিয়ে বললে কি কিছুদিনের জন্য ওরা মেনে নেবে না?

তাড়াহুড়ো করে কিছু চাল-ডাল, মাছ-মাংস বাজার করে আনা হয়েছে। ওরা দরজা আটকে রাখলেও রত্নেশরা অনাহারে থাকবেন না। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের পর রত্নেশের দু পেগ হুইস্কি খাওয়া অভ্যেস, হুইস্কিরও স্টক আছে, সোডা আনানো যাবে না, এই যা!

মাত্র তিনদিন কেটেছে, এর মধ্যে সেরকম কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু মনের ওপর সাঙ্ঘাতিক একটা চাপ। সব সময় মনে হয় তাঁরা গৃহবন্দি। কেউ হাসে না, কেউ জোরে কথা বলে না, একমাত্র রাজা ছাড়া। সে শিশু, সে এখনো কিছুই বোঝে না, সারা বাড়িময় সে খেলতে খেলতে চ্যাঁচায়। সুমিত্রাই ভেঙে পড়েছেন বেশি, যখন তখন তাঁর চোখে জল আসে।

রত্নেশের তবু এই এক জেদ, কিছুতেই তিনি পুলিশ ডাকবেন না।

এর মধ্যে দুবার আলোচনার চেষ্টা চালিয়েও ভেস্তে গেছে। আলোচনা চালাতে গিয়েছিল অনুপ, রত্নেশকে সে যেতে দেয়নি ওদের সামনে। রত্নেশ নরম স্বভাবের মানুষ, ওরা সেন্টিমেন্টের ওপর খুব চাপ দিলে উনি হয়তো ফট করে কিছু একটা কমিট করে বসবেন। কিন্তু ব্যাংকের সুদ কোনো সেন্টিমেন্টকে রেয়াৎ করে না।

ওরা পালা করে করে ধর্না দিচ্ছে বাড়ির সামনে। এমনকি রাত্তিরেও থাকে কয়েকজন। মাঝে মাঝে শ্লোগানের ঝড় তোলে, গতকাল থেকে অশ্রাব্য গালা-গালও শুরু হয়েছে। যে চারজনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, তাদের গলাই বেশি শোনা যায়।

গালিগালাজ শুনলেই অনুপের চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে, সে সেজদার দিকে তাকায়। পুলিশের ওপর মহলে এত চেনা জানা, অথচ এত অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে?

ঝট করে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় চলে এল অনুপ। তার সাহস আছে, বিক্ষোভকারীরা তাকে ইট মারতে পারে, সে ঝুঁকি নিতেও সে ভয় পায় না। ইট ছুড়ল না বটে, নিচের লোকেরা তার উদ্দেশ্যে শ্লোগান ও গালাগাল ছুড়তে লাগল অজস্র।

অনুপ চেঁচিয়ে বলল, মাধব কোথায়? আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই!

দু-তিনজন একসঙ্গে উত্তর দিল, তোমাকে চাই না, মালিককে পাঠাও!

আড়াল থেকে একজন কেউ বলল, শালা, দালাল!

সুমিত্রা চা নিয়ে এসেছেন, রত্নেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমিই যাব, ওদের সঙ্গে কথা বলব!

সুমিত্রা ত্রস্তভাবে বললেন, না, তুমি যাবে না। ওরা গুণ্ডা এনেছে!

রত্নেশ বললেন, আমাকে মারবে? আমার কারখানার লোক আমাকে মারবে? তা যদি সত্যিই হয়, তা হলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?

পায়ে চটি গলিয়ে রত্নেশ চলে এলেন সিঁড়ির দিকে। ওপর থেকে রাজা বলল, বা-বা! বাবা! আমার ইস্কুল আজও ছুটি?

ছেলের সঙ্গে লঘুকৌতুকে যোগ দিতে পারলেন না রত্নেশ। কোনোক্রমে মাথা নেড়ে নেমে এলেন নিচে।

সদর দরজাটা খুলতেই শ্লোগান থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটা ঠেলাঠেলি শুরু হল। ওদের মধ্যে রত্নেশ দেখতে পেলেন ভানুকে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন। গ্রাম থেকে বাচ্চা বয়সে ভানুকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন। বাড়িতে ফাইফরমাশ খাটত। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। দেশে ওদের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ বলে রত্নেশ ওকে কারখানার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ বাড়িতেই থাকে, খায়, কারখানার মাইনে পায়। সেই ভানুও গিয়ে ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

ভিড় ঠেলে মাধব সামনে এগিয়ে এসে সকলকে চুপ করতে ইশারা করল, তারপর রত্নেশের চোখে সোজাসুজি চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, মিঃ রায়, কিছু ঠিক করলেন?

মাধবের বাবা বরাবর রত্নেশকে স্যার বলে সম্বোধন করেছে। এখন দিন কাল বদলেছে।

রত্নেশ বললেন, আমার বাড়ির সামনে এরকম নাটক করলে কী লাভ হবে? আমি তো বলেছি, আমাকে তোমরা সময় দাও, একটু সামলে উঠতে দাও, এর আগে আমি তোমাদের.............

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মাধব বলল, কতদিন সময় চান? সাতদিন? দশদিন? আমাদের রিট্‌ন অ্যাশিওরেন্স দিন!

রত্নেশ বললেন, সাত-দশদিনের প্রশ্ন নয়। বাজার মন্দা, নতুন অর্ডার না পেলে প্রোডাকশান হবে কি করে? আর মাল বিক্রি না করতে পারলে আমি টাকাই বা পাব কোথায়? আমার বাড়িতে কি টাকার খনি আছে? তবে আশা করছি, তিন চার মাসের মধ্যে বাজার ফেভারেবল হবে, নেক্‌সট বাজেটের সময়....

পেছন থেকে একজন কেউ চেঁচিয়ে উঠল, ততদিন কি আমরা না খেয়ে থাকব? অন্য সবাই গুঞ্জন করে তার সমর্থন জানাল।

মাধব বলল, মিঃ রায়, প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে, এটা মানবেন তো? কারখানার প্রোডাকশান কমে গেলে আপনার পরিবারের খাওয়া-পরার যদি কোনো অসুবিধে না হয়, তাহলে আমাদেরই বা হবে কেন? আমাদের ছেলেমেয়েরা না খেয়ে থাকবে?

পেছন থেকে অনুপ বলল, এ সব অবান্তর কথা। সস্তা সেন্টিমেন্ট। এইভাবে কথা বললে প্র্যাকটিক্যাল সলিউশানে আসা যায় না।

ওরা সবাই হৈ হৈ করে আবার শ্লোগান দিয়ে উঠল।

রত্নেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন, তোমরা ট্রেড ইউনিয়নের নামে বাঙালির সর্বনাশ করছ। সব ব্যবসা মাড়োয়ারিদের হাতে চলে যাচ্ছে, সেখানে তোমরা কিছু কর না। রক্ত জল করা পরিশ্রমে কারখানাটা গড়ে তুলেছি, সেটার তোমরা সর্বনাশ করতে চাও! সিক ইণ্ডাস্ট্রি ডিকলেয়ার করলেও তো সরকার নেবে না।

মাধব চেঁচিয়ে উঠল, চুপ! চুপ! সবাই আস্তে, আমাকে কথা বলতে দিন।

তারপর সে রত্নেশের দিকে ফিরে বললেন, শুনুন মিস্টার রায়, কারখানার মালিক ইংরেজ হবে না মাড়োয়ারি হবে না বাঙালি হবে, তা ঠিক করবেন দেশের সরকার। আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। আমরা চাই আমাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক। কারখানাটা বাঙালির হলে কি আমাদের খিদে বাগ মানবে?

কথার পিঠে কথা চলতেই থাকে। তর্কের উত্তপ্ত ঝাঁজ ছড়িয়ে পড়ে। অনুপ এগিয়ে এসে কিছু বলতে গেলেই অন্য পক্ষ বাধা দেয়। রত্নেশ ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করেন।

এক সময়ে তিনি বললেন, তোমরা কী চাও, সত্যি করে বলত? আমার কারখানাটা ধ্বংস করতে চাও? দেশে এত বেকার, কারখানাটা বন্ধ হলে যে আরও বেকারের সংখ্যা বাড়বে, তা তোমরা বোঝো না?

মাধব পরিষ্কার গলায় বলল, আমরা কারখানাটা খুলতে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনি যাতে গোপনে গোপনে কারখানাটা বিক্রি করে পালিয়ে যেতে না পারেন, সেইজন্যই তো আপনার বাড়ি আমরা ঘেরাও করে রেখেছি।

—আমি পালিয়ে যাব, এরকম কথা বলতে পারলে?

—আপনি পালিয়ে যাবেন, সে কথা তো বলিনি। বলেছি, যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন।

পেছনে হাসির ধুম পড়ে গেল। একজন কেউ মন্তব্য করল, রোজ মাংস রান্না হয়, বাইরে থেকে গন্ধ পাই। আমরা শালা বাইরে বসে মুড়ি চিবোচ্ছি........

অনুপ রত্নেশের হাত ধরে টেনে বলল, সেজদা, ভেতরে চলে এসো, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

রত্নেশ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাধবের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, শোনো, আমি শেষ প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একশো টাকা করে ইনটারিম রিলিফ দিতে রাজি আছি, তোমরা ধর্মঘট তুলে নাও, কাল থেকে কারখানা চালু করো।

অবস্থা এমন সংকটজনক যে রত্নেশের পক্ষে এখন হুট করে পাঁচ-ছ হাজার টাকা জোগাড় করাও শক্ত, তবু তিনি বেপরোয়াভাবে প্রত্যেককে একশো টাকা করে রিলিফ দেবার প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন। অনুপের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেননি।

রত্নেশ আশা করেছিলেন, তাঁর এই আকস্মিক উদারতার পরিচয় পেয়ে সকলের মুখে হাসি ফুটবে, তারা জয়ধ্বনি দেবে। প্রতিক্রিয়া হল ঠিক উল্টো।

মাধব ভুরু তুলে বলল, আপনি আমাদের অপমান করছেন? আমরা কি ভিখিরি? আপনার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে রোদ্দুর-বৃষ্টি মাথায় করে বসে আছি বলে আপনি একটা একশো টাকার নোট ছুড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে? আমরা চাই সম্মানজনক চুক্তি। আমাদের যে সাতদফা দাবি আছে, তার প্রত্যেকটি ধরে ধরে।

রত্নেশের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল, তিনি আর মেজাজ সামলাতে পারলেন না, তিনি বলে উঠলেন, নিমকহারাম! ড্যাম ইয়োর সাতদফা চুক্তি! আমার যা বলার বলেছি, যদি মানতে না চাও তো আমি কারখানা তুলে দেব!

সঙ্গে সঙ্গে উঠল তুমুল শ্লোগানের ঝড়। ঠেলাঠেলিও শুরু হয়ে গেল, কয়েকজন রত্নেশকে টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করল, মাধব বাধা দিতে লাগল তাদের।

অনুপ কোনোক্রমে রত্নেশকে উদ্ধার করে এনে বন্ধ করে দিল দরজা। দুমদাম করে আওয়াজ হতে লাগল তার ওপর।

ভেতরে এসেও রত্নেশ রাগে চিৎকার করতে লাগলেন, এ দেশটা কি সোসালিস্ট হয়ে গেছে? বোঝা গেছে তো সরকারের মুরোদ। তোদের পার্টি মাড়োয়ারিদের পায়ে তেল দেয়, মাড়োয়ারিদের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করে....না খেয়ে থাকতে হয় তাও সই, তবু আমি ওই কারখানা আর খুলব না।

রত্নেশের উঁচু ব্লাডপেশার আছে, এরকম রাগারাগি করলে হঠাৎ খারাপ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে, তাই সুমিত্রা তাঁর মাথাটা বুকে চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন, চুপ করো, প্লীজ, শান্ত হও, প্লীজ।

এক সময় রত্নেশ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

অনুপ বলল, সেজদা, তা হলে পুলিশে।

সেই অবস্থাতেও মাথা তুলে রত্নেশ বললেন, না—।

কিন্তু পরবর্তী দুই দিনে অবস্থা অনেক ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে ইঁট পড়তে লাগল জানলায়, সন্ধ্যেবেলা কাছাকাছি দুটি বোমা ফাটল। মাধব মাইকে ঘোষণা করল, বন্ধুগণ, আপনারা সংযতভাবে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলুন। সমাজবিরোধীরা এই সুযোগ নিয়ে গোলমাল পাকাতে চাইবে। প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের ওপর গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে চাইবে। মালিকপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে একটি ইঁটও আমরা ছুঁড়িনি, আমরা বোমা ফাটাইনি, তবে আমাদের ওপর যদি আক্রমণ করা হয়, আমরা প্রতিরোধ করব।.....

পুলিশ নিজে থেকেই এল, দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

অনুপ আর সুমিত্রা রত্নেশকে অনবরত বোঝাচ্ছে যে এইভাবে দিনের পর দিন বাড়িতে বন্দি থেকে লাভ কী হবে? তাতে কী সমস্যার সুরাহা হবে? একটা কিছু তো করা দরকার। পুলিশের সাহায্য না নিলে।......

রত্নেশ দু দিকে মাথা নাড়েন। ওরা বেপরোয়া হয়ে আছে, যদি রক্তপাত হয়? না, না, না, সে দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না।

পরদিন সকালে অনুপ নিজেই একটা ঝুঁকি নিল। সে জোর করে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরে চড়-চাপড় শুরু করতে না করতেই হস্তক্ষেপ করল পুলিশ। পাশের বাড়ির সাহায্য নিয়ে সে পুলিশকে আগে থেকেই খবর দিয়ে রেখেছিল নিশ্চয়ই।

পুলিশ অনুপকে উদ্ধার করে তুলে নিয়ে গেল গাড়িতে। অনুপ হাইকোর্টে গিয়ে ইনজাংশন এবং একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করাল। রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করল। সরকার পক্ষ এখন বন্ধ কারখানাগুলো খুলতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, নতুন করে কোনো কারখানা বন্ধ করতে আর উৎসাহী নন, মালিকদের সঙ্গে আপোসের নীতি নিয়েছেন। শ্রমিক বিক্ষোভ সম্পর্কে তাঁরা তুষ্ণীমনোভাব দেখালেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিকেলের মধ্যেই পুলিশ এসে অবস্থানকারীদের সরিয়ে দিয়ে গেল, তারা আর ফিরে এল না। লেবার কমিশনার আগামী সপ্তাহে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দিয়েছেন।

সন্ধেবেলা এ বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার, সব কিছু আবার স্বাভাবিক। তবু রত্নেশের মেজাজ ভাল নেই, তিনি গুম হয়ে আছেন, কোনো কথা বলছেন না। সুমিত্রা কিছু বলতে এলেও তিনি উত্তর দিচ্ছেন না। অনুপ ইশারায় সুমিত্রাকে জানাল, আজকের দিনটা যাক, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

সারা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, হঠাৎ এক সময় একটা সুরেলা রিনরিনে কণ্ঠ শোনা গেল, মালিকের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও! শ্রমিকের ক্ষুধার অন্ন কাড়তে চাও, রত্নেশ রায় জবাব দাও, জবাব দাও!

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে আসছে রাজা।

কোথা থেকে সে একটুকরো লাল কাপড় জোগাড় করেছে, সেটা বেঁধেছে একটা লাঠির মাথায়। এই কদিন অনেক শ্লোগান শুনে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আজকে এইটাই তার নতুন খেলা।

ঝাণ্ডা বাঁধা লাঠিটা দোলাতে দোলাতে বাবার সামনে এসে সে বলতে লাগল, মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও! রত্নেশ রায় জবাব দাও, জবাব দাও! মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই!

সুমিত্রা আঁতকে উঠে ছেলের দিকে ধেয়ে গিয়ে বললেন, রাজা! চুপ, চুপ! কী বলছিস তুই!

রাজা দৌড়ে দৌড়ে ঘুরতে লাগল, ঘরের চারদিকে। মুখে সেই এক কথা।

রত্নেশ রায় মুখ তুলে কাতর ভাবে হাসলেন। তারপর সুমিত্রাকে বললেন থাক, ওকে ধরো না! বলুক!

ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস

তৃষ্ণার্ত রাজা এসে থামলেন এক স্বচ্ছ সরোবরের সামনে।

নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কী যেন মোহ ভর করেছিল তাঁর ওপর, তিনি মানুষের কথা ভুলে গিয়ে অরণ্যের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ক্রমশ একাকী চলে এসেছেন গভীর থেকে গহনে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে সেই জলাশয়ের ধারে বসে আজলা ভরে পান করতে যাবেন, এমন সময় কয়েকটি নারী কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, হে রাজন! এই জল ছুঁয়ো না। এই জল পান করো না। তুমি অন্য সরোবরে যাও!

রাজা মুখ তুলে দেখছিলেন তিনটি যুবতী সেই সরোবরে হংসের মতো ভাসছে। হলুদ রেশমের মতো তাদের মুখ, পদ্ম পলাশ চক্ষু, উড়ন্ত পাখির মতো ওষ্ঠাধর।

রাজা কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন।

রমনী বিলাসে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর, দেশ-বিদেশের বহু নারী তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিন্তু তাঁর মনে হল এই যুবতীত্রয়ী প্রত্যেকেই যেন তিলোত্তমা।

একটি মেয়ে একটু এগিয়ে এসে মধুর হেসে বলল, রাজা, আমরা নিরালায় এখানে কেলি করছি, এখানে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। এই জল তোমার পেয় নয়, তুমি শিগ্র অন্যত্র যাও!

রাজা বললেন। অয়ি, বরবর্ণিনী, তোমাদের দেখে আমার তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। চোখের সামনে স্বাদু পানীয় দেখলে কি কোনো তৃষ্ণার্ত দূরে চলে যেতে পারে? কেন আমাকে নিবারণ করছ? কেন আমাকে চলে যেতে বলছ?

সেই মেয়েটি বলল, রাজা, সব ফুলের ঘ্রাণ নিতে নেই, সব পানীয় পান করা যায় না, সব ফল ভক্ষণ করা ঠিক নয়। এই সরোবর তোমার জন্য নয়, তুমি অন্য কোথাও যাও!

রাজা এবারে হেসে বললেন, তোমরা আমার পরিচয় জান না। আমি রাজা কোনো প্রকার নিষেধ শুনানই আমাদের বাসনা বেশি বলবান হয়। যে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুই আমরা জয় সাধ্য মনে করি । আমি অচিরেই তৃষ্ণা মেটাব এবং তৃষ্ণা মেটাব।

তিন নারী আবার একত্রে কলকণ্ঠে বলে উঠল, রাজা অমত করো না, এমন করো না! নিবৃত্ত হও!

রাজা শুনলেন না। তিনি গণ্ডূষ জল পান করলেন। তারপর তাঁর বস্ত্র খুলে রেখে নেমে পড়লেন সরোবরে।

রাজা সন্তরণ-পটু। জলাশয়টিও তেমন বড় নয়। রাজা ভাবলেন, মেয়ে তিনটি পালাবার চেষ্টা করলেও তিনি অন্তত একজনকে বাহুবন্ধনে আনতে পারবেন ঠিকই। এরা অপ্সরা হলেও নিষ্কৃতি নেই।

যুবতী তিনটি কিন্তু দূরে সরে গেল না। বক্ষ জলে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

রাজা কাছে আসতেই তারা বলে উঠল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা এদের মুখপাত্রীটির হাত ধরলেন। তারপর বললেন, কবিতা এবং বনিতা স্বয়পসত্ত্ব হলেও সুখদা নয়। হে সুন্দরী, আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি তোমার রূপ প্রার্থনা করি, তুমি আমার হও।

মেয়েটি তবু হাসতে লাগল।

রাজা মেয়েটিকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করতে গেলেন।

কিন্তু পারলেন না। তাঁর বিচিত্র এক অনুভূতি হল। তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ নেই, শিহরণ নেই। এমন এক দুর্লভ রূপসীকে তিনি স্পর্শ করেছেন, তবু তাঁর কামনা যথোচিত জাগ্রত হচ্ছে না কেন?

মেয়েটি বলল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছ, তুমি? কার নিয়তি?

মেয়েটি বলল, তোমার! হায় ভূতপূর্ব রাজা তুমি আর ইহজীবনে কোনো রমণী-রমন সুখ পাবে না।

—কেন?

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ!

রাজা আপন শরীরের দিকে তাকিয়ে আমূল চমকে উঠলেন।

তিনি আর রাজা নেই। তিনি এক নারীতে পরিণত হয়েছেন। আর তিনটি নারীরই মতো।

সেই তিন রমণীর মধ্যে একজন বলল, তোমাকে এখন কী বলব, রাজা না রানি! শুধু রমণীই বলি। ওহে রমণী,

আমরা দিব্যাঙ্গনা। পৃথিবীর কোনো পুরুষ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। এটা একটা মায়াসরোবর। সাধারণ মানুষ এটা দেখতেও পায় না। তোমার নিয়তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।

পর মুহূর্তেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। চিনিয়ে গেল সেই মায়াসরসী। সবটাই যেন স্বপ্ন।

কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার শরীরটা স্বপ্ন নয়। তিনি রমণী হয়েই রইলেন। কিন্তু নগ্ন বলে তাঁর ব্রীড়া এল। তিনি প্রথমে স্তনদ্বয় ঢাকলেন দু হাত দিয়ে। তারপর এক হাত বুকে রেখে, অন্য হাতে চাপা দিলেন নিম্ননাভি, তাঁর ভঙ্গিটি হল চিরকালীন প্রথাসিদ্ধ নিরাবরণ নারীর মতোই।

রাজার অশ্ব আর রাজাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল।

রাজা আস্তে আস্তে তাঁর রাজ্য, তাঁর মহিষীবৃন্দ, তাঁর সন্তানাদির কথা ভুলতে লাগলেন। অরণ্যের মধ্যে একাকিনী অবস্থায় তাঁর ভয় করতে লাগল।

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণ পরে তিনি এক নবীন যুবার সাক্ষাৎ পেলেন।

যুবকটি ঋষি-কুমার, অঙ্গে গেরুয়া, মাথায় জট-বাঁধা চুল।

যুবকটি এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, হে অচেনা, তুমি কে?

রাজার তখনও স্মরণে আছে যে তিনি পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরটি নারীর। তিনি বললেন, আমি কেউ না।'

যুবকটি বলল, তোমাকে দেখে আমার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ এক অনুভূতি জাগছে। তুমি কি স্বপ্ন না মায়া? মতিভ্রম না তাবৎ জীবনের গুণফল?

নারীরূপিনী রাজা আবার বললেন, আমি কেউ না!

তখন সেই মুনিকুমার এগিয়ে এসে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার জীবনে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার হল। জীবনে তিনি বহু নারীকে স্পর্শ করেছেন, কিন্তু আজ তাঁর শরীরে এই পুরুষের স্পর্শে যে তরঙ্গ খেলে গেল, তেমনটি তো আগে কখনো হয় নি! তাঁর তীব্র ইচ্ছা হল এই যুবা তাকে বক্ষে টেনে নিক। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে একটু দূরে সরে গেলেন।

তরুণ ঋষি আবার কাছে এসে তাঁর বক্ষে হাত রাখতে যেতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, না।

তখন সেই কামার্ত যুবা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, হে রূপসী-শ্রেষ্ঠা, তোমার নয়ন কাছে আহত। তোমার অধর সুধায় আমায় সঞ্জীবিত করো। আমার যাগ-যজ্ঞ সব জলাঞ্জলি যাক। আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হতে চাই।

আরও কিছুক্ষণ স্তব স্তুতি শোনার পর নারী-রাজা সম্মত হলেন।

তারপর তিনি পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। রমকে এত সুখ তা তিনি জানতেন না। আগে মনে করতেন রতি সুখ মানে জয়ের আনন্দ। এতকাল তিনি ওপরে থাকবেন, আজ নিচে। পিঠের তলায় যে মাটি কাঁপে, ওপরে আকাশও যে কাঁপে তা বোধহয় কোনো পুরুষই জানে না।

চরম উল্লাসে তিনি আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন।

মুনি-কুমার তাঁর ক্রীড়া সাঙ্গ করা মাত্রই রমণী-রাজার ইচ্ছে হল, আবার হোক, আবার হোক। এই যুবা তাকে পীড়ন করুক, দংশন করুক, তাকে স্বর্গ সুখ দিক।

সেই যুবা-ঋষিকেই বিয়ে করে রমণী-রাজা বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে ঘর-সংসার করতে লাগলেন।

বেশ কয়েক বছর পর সেই রাজার প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ঋষিপত্নীর সামনে সসম্মানে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রী বললেন, হে আত্মবিস্মৃত রাজা ভঙ্গস্বন, আমরা অতিকষ্টে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ইন্দ্রের সঙ্গে আপনি একবার কলহ করেছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার মনে মোহ এনে দিয়ে আপনাকে নারীতে পরিণত করেছেন। আমরা যাগ-যজ্ঞে ইন্দ্রকে তুষ্ট করেছি। ইন্দ্র আবার আপনাকে পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।

ঋষিপত্নীর সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ফিক করে হাসলেন।

মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন, রথ প্রস্তুত, আপনি চলুন!

ঋষিপত্নী বললেন, পাগল নাকি! কোনো রমণী কখনো পুরুষ হতে চায়? হে মন্ত্রী, পৃথিবীর কোনো পুরুষ এতকাল ধরে যে গুপ্তকথা জানতে পারে নি, আমি তা জেনেছি। পুরুষরা তো চতুর্দিকে দাপিয়ে বেড়ায় কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নারীদের কাছে এসে পরাভূত হয়। শরীরের যে কী আনন্দ তা পুরুষরা সঠিক ভাবে কোনদিন টেরই পেল না! আমি

যেমন আছি, চমৎকার আছি। এই আনন্দের তুলনায় রাজপদ অতি তুচ্ছ। আপনারা ফিরে যান। আমার আগের ছেলেদের সিংহাসন দিন। আমার এই পক্ষের সন্তানদের প্রতি স্নেহ বেশি। তাদের ছেড়েও কোথাও যেতে পারব না।

বহুকাল পর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে, ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে দক্ষিণায়নের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞানের কথা জেনে নিতে নিতে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, পিতামহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনসুখ কে বেশি পায়?

ভীষ্ম বললেন, তোমাকে আমি ভঙ্গস্বন রাজার উপাখ্যান শোনাচ্ছি!

কাহিনীটি শুরু করার আগে ভীষ্ম প্রথমে মৃদু হাস্য করলেন। মনে মনে ভাবলেন, তাঁর এই ধার্মিক নাতিটি সত্যিই বড় গো-বেচারা। কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এই প্রশ্ন কি কেউ কোনো মৃত্যুপথযাত্রী জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে করে?

তারপরই ভীষ্মের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যেন এক বায়ুময় হাহাকার! জিতেন্দ্রিয়? সাধারণ মানুষের চারগুণ লম্বা একটা জীবন কাটিয়ে গেলেন, তবু নারীর রহস্য কিছুই জানলেন না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ!

পুরুষের চোখ

রাজকন্যা সুকন্যা একলা একলা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মানুষের সঙ্গ আর তাঁর ভাল লাগে না। চেনা-অচেনা কোনো পুরুষ তাঁকে দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সেই দৃষ্টির মধ্যে আছে লোভ। আর মেয়েরা তাঁকে ঈর্ষা করে। সুকন্যার কোনো বন্ধু নেই, তার জন্য দায়ি তাঁর রূপ। এমন রূপ বুঝি মানুষের হয় না!

সুকন্যার বিয়ের ব্যাপারেও দারুণ গোলযোগ। দেশ-বিদেশ থেকে রাজকুমারেরা এসে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, সবাই সুকন্যাকে চায়। সুকন্যা যেন শুধু একটা লোভনীয় ভোগ্যবস্তু। সুকন্যা এর প্রতিশোধ নেন নিষ্ঠুরভাবে। রাজকুমারদের লড়াইতে নামিয়ে তিনি কৌতুক বোধ করেন। কারুকেই বিয়ে করতে তাঁর মন চায় না।

সুকন্যার বাবার চার হাজার স্ত্রী। এমন ভোগী রাজা আর ভূ-ভারতে নেই। ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে সর্বক্ষণ উৎসবের মাতামাতি দেখে দেখে ভোগ বিলাসের প্রতি সুকন্যার ঘেন্না ধরে গেছে।

রাজা শর্যাতি তাঁর সমস্ত স্ত্রী এবং প্রচুর লোক-লস্কর নিয়ে বনে এসেছেন বিহার করতে, সুকন্যাকেও সঙ্গে আসতে হয়েছে। কিন্তু তিনি দূরে দূরে থাকছেন।

বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সুকন্যা এক জায়গায় একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেলেন। একটা বড় গাছতলায় একটা উইপোকার ঢিবি জমে আছে, তার মধ্যে দুটো হীরের টুকরো জ্বলজ্বল করছে। এখানে হীরে এল কী করে? সুকন্যার মাথার চুলে যে সোনার কাঁটা ছিল সেটা দিয়ে তিনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হীরে দুটো তোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে দুটো সহজে উঠতে চায় না, উপরন্তু সেই ঢিবির মধ্যে থেকে খুব ক্ষীণ ভাবে যেন একজন মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। সুকন্যা তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি আরও জোরে খোঁচাতে লাগলেন। তখন সেই হীরের মতন উজ্জ্বল চোখ দুটি থেকে রক্ত গড়াতে লাগল। তা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেলেন সুকন্যা। একটা জলাশয়ের ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন কারুকে কিছু বললেন না।

পরদিন একটা সাংঘাতিক অলৌকিক কাণ্ড হল। রাজা-রানি, পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সামন্ত সকলের মল-মূত্র বন্ধ হয়ে গেল। প্রাত্যহিক এই স্বাভাবিক কৃত্যটি সম্পর্কে এমনিতে কেউ কিছু খেয়ালই করে না, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলেই টের পাওয়া যায় যে এটা শরীরের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়। পর পর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন।

তখন প্রবীণ মন্ত্রীরা রাজাকে বললেন, দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ঋষি ছাড়া এরকম শাস্তি দেওয়া আর কারুর সাধ্য নয়। শোনা যায়, মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন এই বনে তপস্যা করেন। অনেককাল অবশ্য তাঁকে কেউ দেখেনি। কোনো কারণে তিনি রুষ্ট হননি তো?

সকলকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ কোনো ঋষিকে সেই বনে দেখেছে কি না বা তাঁর প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করেছে কি না। সকলেই বললেন, না।

সুকন্যা তখন জানালেন যে এক জায়গায় একটা উইঢিবির মধ্যে জোনাকির মতন কিছু জ্বলতে দেখে তিনি কৌতূহলবশে চুলের কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়েছেন, তাতে রক্ত গড়াতে দেখেছেন। জোনাকির কি রক্ত আছে?

রাজা দৌড়ে গেলেন সেই গাছতলায়। লোকজনেরা সন্তর্পণে সেই উইঢিবি ভাঙল। তার মধ্যে বসে আছে এক অতি কুৎসিত চেহারার, অতি বৃদ্ধ ঋষি। ইনিই ভৃগুতনয় চ্যবন, কতকাল যে এখানে এক ঠাঁইতে বসে আছেন তার ঠিক নেই, উইয়ের ঢিবি এঁর শরীর ঢেকে দিয়েছিল।

রাজা হাতজোড় করে ঋষির কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমার মেয়েটি বড় অস্থিরমতি, লঘু। বললেন, সে একটা দোষ করে ফেলেছে। আপনি ক্ষমা করুন।

সুকন্যার চুলের কাঁটার খোঁচায় চ্যবন ঋষির দু চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। তিনি ধীর স্বরে বললেন, রাজা, আমার চক্ষু নষ্ট হয়েছে সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়, আমার দিব্য চক্ষু আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় ক্ষতি এই যে আমার ধ্যান নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার মেয়েকে আমি কয়েক পলক মাত্র দেখেছি, ওই রূপ আমার হৃদয় ঝলসে দিয়েছে। দর্প ও অবজ্ঞার বশে তোমার মেয়ে যা করেছে, তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাকে এই বুড়োকে বিয়ে করতে হবে। দেখ, রাজি থাক তো বল, তাহলে তোমাদের শাপমুক্ত করব।

অরাজি হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রাজা নিজেই তখন পেটের ব্যথায় কাতর। রানিদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেছে। রাজা সেই দণ্ডেই লোল চর্ম বৃদ্ধ ঋষির হাতে রমণীশ্রেষ্ঠা সুকন্যাকে তুলে দিলেন।

সুকন্যা প্রথম কয়েকদিন খুব কান্নাকাটি করলেন বটে, কিন্তু এক পক্ষকাল কেটে যাবার পর তার অন্যরকম অনুভূতি হল। বনের মধ্যে পাতার কুটিরে ফল-মূল খেয়ে থাকা, জলাশয় থেকে জল তুলে আনা, বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করা, এ যেন অনেকটা রূপকথার গল্পের মতন! রাজার দুলালী এখন সামান্য বনবালা। এক সময় শত শত দাস-দাসী তাঁর সেবা করত, আজ স্বামীর পা টিপে দেবার সময় অন্যমনস্ক হলে তিনি বকুনি খান। এই ভূমিকাটা তার বেশ পছন্দই হল।

সুকন্যার ধারণা ছিল জঙ্গলের মুনি ঋষিরা বুঝি সব সময় শক্ত শক্ত সংস্কৃতে কথা বলেন, তা তো নয়, ঋষি চ্যবন প্রাকৃত ভাষা বেশ ভালই জানেন আর অনেক রসের গল্প শোনান। শাস্ত্র বচন ঝেড়ে সুকন্যাকে কাবু করার বদলে আদি রসাত্মক কাহিনী শুনিয়ে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তবে চ্যবন ঋষি বড্ডই বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কাম কলায় অভিজ্ঞ হলেও শরীর এখন আর উত্তপ্ত হয় না। শরীর এমনই জিনিস যে শত ধ্যানের পুণ্য ফলেও আর যৌবন ফিরে পাওয়া যায় না।

ভালই দিন কাটছিল। সুকন্যা আস্তে আস্তে প্রকৃতি-কন্যা হয়ে উঠলেন। তিনি গাছপালার সঙ্গে কথা বলেন, পাখির ডাকের সঙ্গে গলা মেলান। রাজবাড়িতে থাকার সময় লোকজনদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা আর স্তুতিবাক্য শুনতে শুনতে তাঁর কান পচে গিয়েছিল, এখানে, এই নির্মল বাতাসে, নির্জনতায়, তিনি যেন অমৃতের স্বাদ পেতে লাগলেন।

এই জঙ্গলের মধ্যে তাঁর পোশাক পরারও প্রয়োজন হয় না সব সময়। তাঁর স্বামী অন্ধ, অন্য কেউও দেখবার নেই। স্নানের সময় তিনি নগ্ন হয়ে জলকেলি করেন।

একদিন স্নান সেরে সুকন্যা সেই অবস্থায় উঠে আসছেন। এমন সময় দেখলেন তীরে দুটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তারা যথেষ্ট রূপবান ও ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরনে, তবে দু জনকে দেখতে হুবহু এক রকম, খুব সম্ভব যমজ।

লোক দুটি ঠিক দুর্বৃত্ত নয়। সুকন্যাকে দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল না। চক্ষু দিয়ে তাঁর রূপের বন্দনা করতে লাগল। সুকন্যা ভাবলেন, এরা নিশ্চয়ই তাঁর আগেকার ব্যর্থ প্রেমিক দুই রাজপুত্র, এখনো হাল ছাড়ে নি, খুঁজতে খুঁজতে এই পর্যন্ত চলে এসেছে। বিরক্তিতে তাঁর অধর একটু কুঁচকে গেল।

যুবকদের মধ্যে একজন বলল, হে ভাবিনী, তুমি কার ঘরণী বা কার বালা? এই গহন অরণ্যে একা রয়েছ কেন?

সুকন্যা বললেন, বনের মধ্যে কারুর একা থাকার স্বাধীনতা নেই বুঝি?

অন্য যুবকটি বলল, তোমার এই দেবদুর্লভ রূপ, এ তো জগত জয় করবার জন্য। তোমার তো একা থাকার কথা নয়। কেউ কি তোমাকে এখানে নির্বাসনে পাঠিয়েছে?

সুকন্যা বললেন, না, আমি স্বেচ্ছায় এখানে আছি। আপনারা যেখানে খুশি যেতে পারেন, আপনাদের সঙ্গে আমি এই অবস্থায় আর বাক্যালাপ করতে চাই না।

একজন যুবক বলল, আপনি আপনার রূপের এই অপমান করছেন কেন? শ্রেষ্ঠ বস্ত্র, মণি-মাণিক্যের অলঙ্কারগুলো তৈরি হয়েছে কেন, যদি তা আপনার অঙ্গে না ওঠে? চলুন, আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা আপনাকে এই বসুন্ধরার চেয়েও সুন্দর করে সাজাব।

সুকন্যা বললেন, ভাল ভাল পোশাক, হীরে মুক্তোর গয়না এক সময় আমার অনেক ছিল, অনেক দেখেছি। ওসবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আপনারা আমার পথ ছাড়ুন। আমি মহারাজ শর্যাতির মেয়ে, যোগী শ্রেষ্ঠ চ্যবন আমার স্বামী।

দুই যুবক প্রায় হাহাকার করে উঠল, চ্যবন আপনার স্বামী? হায় হায়, সে যে সাত বুড়োর এক বুড়ো। এ খুব অন্যায়! ঘোর অন্যায়। আপনার মতন সুন্দরী চ্যবনের হাতে পড়ে জীবনটা নষ্ট করবে? এ হয় না। আপনি ওকে ত্যাগ করে আমাদের দুজনের যে-কোনো একজনকে বরণ করুন। আপনি চ্যবন ঋষির অভিশাপের ভয় পাবেন না। ও সব আমাদের গায়ে লাগে না।

সুকন্যা বললেন, আপনাদের মতন শত শত রাজকুমারকে আমি এর আগে প্রত্যাখ্যান করেছি। আপনারা তাদের তুলনায় এমন কিছু আহামরি নন। আমার এই বুড়ো বর আর পাতার ঘরই পছন্দ।

একজন যুবক বলল, তা হলে আর একটা প্রস্তাব শুনুন। আমরা নানারকম চিকিৎসা জানি। আমরা আপনার স্বামীর যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারি, তাকে রূপবান করে দিতে পারি। তাঁর দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসবে। তার বদলে আপনি......

অন্য যুবকটি বলল, বদলে দরকার নেই। চিকিৎসার বিনিময়ে আমরা কিছু চাই না। তবে আপনার স্বামী রূপ-যৌবন ফিরে পেলে আপনি আমাদের তিনজনের মধ্য থেকে যে-কোনো একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নেবেন। রাজি? দেখুন, এটা অন্যায় কিছু বলি নি।

সুকন্যা বললেন, আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি যৌবন ফিরে পেতে রাজি কিনা সেটা আগে জানা দরকার।

আশ্রমে ফিরে এসে সুকন্যা চ্যবন ঋষিকে সব কথা খুলে বললেন। চ্যবন ঋষি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যৌবন ও স্বাস্থ্য ফিরে পেতে কার না ইচ্ছে হয়! আমরাও লোভ হচ্ছে ! কিন্তু তার বদলে তোমাকে হারাতে হবে। কী করি বলতো?

সুকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমাকে হারাতে হবে কেন? আমি ওদের পছন্দ করব না!

চ্যবন বললেন, ওই ছোকরা দুটি দেবতাদের চিকিৎসক। ওদের নাম অশ্বিনীকুমার দ্বয়। ওরা নানারকম জাদু জানে। ওদের মায়ায় তুমি আর আমাকে চিনতে পারবে না! তবু চল, পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সুকন্যা বুঝলেন যে যৌবন ফিরে পাওয়ার প্রস্তাবটা তাঁর স্বামীর খুব মনে ধরেছে।

বাইরে এসে অশ্বিনীকুমারদের সুকন্যা তাঁর সম্মতি জানালেন। ওরা দুজন চ্যবন ঋষির হাত ধরে ধরে সেই জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেল। তারপর তিনজনে একসঙ্গে ডুব দিয়ে ফের উঠে আসতেই সুকন্যা দেখলেন যমজের বদলে ত্রয়ী। তিনজনের এক রকম রূপ, এক রকম পোষাক, এক রকম মুখশ্রী।

সুকন্যা আবার তাঁর শাড়িটি খুলে নগ্ন হলেন। কয়েকটি মুহূর্ত তিনি সেই তিন যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর এগিয়ে গিয়ে একজনের বুকে হাত রেখে বললেন, ইনিই আমার স্বামী!

সঙ্গে সঙ্গে চ্যবন ঋষি বললেন, সুকন্যা, তুমি ধন্য!

অশ্বিনীকুমার দুটি তো অবাক। তারা দু জনে চ্যবন ঋষির দিকে ফিরে তাকাল।

একজন বলল, ঋষি, আশা করি, আপনি আমাদের সঙ্গে ছলনা করেননি!

অন্যজন বলল, আপনি আপনার স্ত্রীকে আগে থেকে কিছু শিখিয়ে দিয়েছিলেন? কিংবা কিছু ইঙ্গিত করেছেন?

চ্যবন ঋষি বললেন, আরে ছি ছি, সে রকম কী আমি করতে পারি? সে তো জুয়াচুরি। না, না, আমি সে রকম কিছুই করিনি। সুকন্যার কাণ্ড দেখে আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেছি!

ওরা তখন সুকন্যাকে বলল, আমরা হার স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি বলুন তো, কী করে আপনি আমাদের মধ্যে থেকে ঠিক ঠিক আপনার স্বামীকে চিনে নিলেন?

সুকন্যা বললেন, এ তো খুব সোজা। আপনারা তো অনেক মেয়ে দেখেছেন, অনেক ভোগ করেছেন! আমি যেই শাড়িটা খুলে ফেললুম, অমনি আপনাদের দু জনেরই চোখে ফুটে উঠল চকচকে লোভ। আর উনি তো বহুদিন কোনো যুবতী মেয়ে দেখেননি, তাই ওঁর চোখে ফুটে উঠল দারুণ বিস্ময়। আমি লোভী চোখ অনেক দেখেছি, ওরকম বিস্ময় ভরা চোখ আগে দেখিনি। তাই ওই চোখ দুটিই আমার পছন্দ হল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশ্বিনীকুমার দুটি বলল, সুকন্যা, আপনি সত্যিই ধন্য! নিন, শাড়িটা পরে নিন। এখন থেকে আপনাকে আমরা অন্য চোখে দেখব, আপনাকে বৌদি বলে ডাকব।

চ্যবন ঋষি বললেন, সুকন্যা, ওদের কিছু ফল-মূল খেতে দাও।

প্রথম উপহার

দফ্‌তরিখানা খোলবার আগেই পৌঁছে গেল প্রদীপ। একটা নয়, তিনখানা তালা ঝুলছে দরজায়। প্রদীপ শুধু হতাশ হল না, অবাকও হল খুব। তার ধারণা ছিল, এই দফ্‌তরিখানা বন্ধ হয় না। দফ্‌তরিরা এই ঘরের মধ্যেই থাকে। গতকাল রাত পৌনে নটা পর্যন্ত সে এখানে ছিল। দফ্‌তরিরা সব লুঙ্গি পরা আর খালি গা, কাজের মাঝে মাঝেই ওরা আঠা মাখা হাতে অ্যালুমিনিয়ামের থালা থেকে মুড়ি খাচ্ছিল, একজন ঘুমোচ্ছিল মাদুর পেতে। প্রদীপ ভেবেছিল, এখানেই ওদের বাড়ি ঘর।

জায়গাটা আধা বস্তি ধরনের। একদিকে কয়েকটা পাকা বাড়ি, তার পরেই সারি সারি খোলার চাল, টালির চালের ঘর। একটা টিউবওয়েলের সামনে এক দঙ্গল স্ত্রীলোক ও বাচ্চাদের ভিড়। কর্কশ শব্দ হচ্ছে টিউবওয়েলটার হাতলে। প্রদীপ একবার লিখেছিল, 'টিউকলের আর্তনাদ'! পরে অবশ্য বুঝেছে, লোহার কোনো কষ্ট নেই, তারা কাঁদে না, ওই আর্তনাদ আসলে মানুষগুলোর!

দফ্‌তরিরা কি এই বস্তির মধ্যেই থাকে?

প্রদীপ ভাবল কারুকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ওই স্ত্রীলোক ও বাচ্চার দল ছাড়া আর তো কাছাকাছি কেউ নেই। তাহলে একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক।

পাঞ্জাবির পকেটে দুটি সিগারেট, প্রদীপ তার থেকে একটা বার করল। একটু দুমড়ে গেছে, কিন্তু ফাটে নি। হাত দিয়ে সিগারেটটা প্লেন করে তারপর ধরালো দেশলাই জ্বেলে। সঙ্গে সঙ্গে কাশির দমক। সিগারেট তার সহ্য হয় না, তবু সে ফেলে দিল না।

সকাল এখন পৌনে আটটার বেশি নয়। দফ্‌তরিখানা কখন খোলে? কাল সেটা জিজ্ঞেস করা হয় নি। কাল পার্থ আর সুবিমল ছিল প্রদীপের সঙ্গে। কালই বই পাওয়ার কথা ছিল। ফর্মা ভাঁজ করা, জুস সেলাই, পুস্তানির কাগজ ও মলাট লাগানো পর্যন্ত তারা দেখেছে। তবু তারা বই পায় নি। এর পর নাকি অন্তত আট ঘণ্টা বই হটপ্রেসে না রাখলে বই বেঁকে যায়। প্রদীপের এটা জানা ছিল না। দফ্‌তরিখানার মালিক বলল, এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? কাল সকালে দেখবেন বইয়ের চেহারা খুলে গেছে।

সকাল মানে কত সকাল? সারা রাত প্রদীপের ঘুমই হয়নি ভাল করে। তার প্রথম বই! ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে প্রদীপ অসম্ভব দৃশ্য দেখেছে কাল, তার দু-একটা মনে পড়লে তার নিজেরই লজ্জা করছে। প্রথম বই বেরুনো মাত্র চতুর্দিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে, এরকম আশা করা যায় না। কিংবা যেতেও তো পারে! সুবিমল বলেছিল.......।

টিউবওয়েলের সামনের মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন বলছে চেঁচিয়ে। প্রদীপের সম্পর্কেই নাকি? মেয়েরা চান করছে ওখানে, কারুর বুকে জামা নেই। কিন্তু প্রদীপ তো ওদের দিকে ভাল করে চেয়েই দেখেনি। তবু একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা........

প্রদীপ হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় চলে এল। সুবিমল আর পার্থ দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে এসে পড়বে বলেছিল, কিন্তু প্রদীপ আর থাকতে পারছিল না বাড়িতে। তিনটে তালা ঝুলছে, কী এমন মূল্যবান সম্পত্তি থাকে দফ্‌তরিখানায়?

—এই যে এসে গেছেন এর মধ্যে?

প্রদীপ চমকে উঠল। দফ্‌তরিখানার মালিক আর সামনে দাঁড়িয়ে। যার জন্য প্রদীপ এতক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছে, সে যে কখন সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে গেল, তা প্রদীপ লক্ষ্যই করে নি। সে যে-দিকে চেয়ে আছে সে দিকে কিছুই দেখছে না।

পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, এখন অন্যরকম দেখাল মালিকটিকে। কাল একেও গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখেছিল প্রদীপ। দফ্‌তরিখানার মধ্যে বড্ড গরম।

মালিকের নাম মুজিবর রহমান। নাম শুনে প্রদীপ আর তার বন্ধুরা চমকে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর নামে নাম! শুধু এই নামের জন্যই লোকটির প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রম জেগেছিল।

পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে তিনটি তালা খুললেন তিনি। কোথা থেকে দু জন দফ্‌তরিও হাজির হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। তা হলে এরা এই বস্তিতেই থাকে।

রহমান সাহেব একজনকে বললেন, একখানা বই আগে আমার হাতে দে।

হটপ্রেস মেশিনটা প্রকাণ্ড, তার মধ্যে শুধু প্রদীপের বই। এই জন্যই দরজায় তিনটে তালা ছিল। প্রদীপের বই কত মূল্যবান এরা বুঝেছে!

রহমান সাহেব একটা বই নিয়ে মলাটের বোর্ড টিপে টিপে দেখলেন, সেলাই পরীক্ষা করলেন, পুস্তানির কাগজ ধরে একবার টান মারলেন। তারপর বইটা টেবিলের ওপর ফেলে বললেন, আপনার মলাটের ছাপা বিশেষ সুবিধের হয়নি। তা ছাড়া দেখতে বেশ ভালই হয়েছে, কী বলেন?

প্রদীপ বইটা তুলে নিয়ে প্রথমেই বইটা শুঁকল। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতে তার ভাল লাগে। অনেকে বলে, ওটা আঠার গন্ধ। কিন্তু শুধু আঠা শুঁকলে তো এরকম মাদক গন্ধ পাওয়া যায় না। যে-কোনো নতুন বই হাতে নিয়েই প্রদীপ আগে এই ঘ্রাণটা নেয়। এটা তার নিজের বই! এর আগে দু-তিনটি সংকলনে তার কবিতা স্থান পেলেও, তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। এ তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, একক কাব্যগ্রন্থ। 'বিষাদ প্রতিমা', মলাটের ঠিক মাঝখানে লেখা, প্রদীপ গুপ্ত। তাদের পারিবারিক পদবী সেনগুপ্ত, কিন্তু প্রদীপ সেনটা বাদ দিয়েছে, শুধু গুপ্ত পদবীটি তার পছন্দ।

মলাট এঁকেছে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু পার্থ। এ মলাট তার খুবই পছন্দ। মলাট ছাপার কোনখানে দোষ হয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না, সব মিলিয়ে তার চমৎকার লাগছে। শুধু ছাপা হলেই তো বই হয় না। বাঁধাবার পরই বইটা একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা পায়।

রহমান সাহেবের দু হাত জড়িয়ে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে হল।

রহমান সাহেব বললেন, আপনি এখন ডেলিভারি নেবেন? তা হলে ক্যাশমেমো করে দিই? ক্যাশ টাকা এনেছেন তো? আমরা কিন্তু চেক নিই না।

প্রদীপ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। টাকা? টাকা দেবার কথা তো ছিল না। চেক দেবে কি, প্রদীপের কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টই নেই। আর ক্যাশ টাকা, প্রদীপের পকেটে আছে মাত্র তিন টাকা।

গলা শুকিয়ে গেছে। এরপর কী বলবে তা প্রদীপের জানা আছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

মুকুল প্রেসের মালিকের সঙ্গে প্রদীপের বন্ধু পার্থর খানিকটা চেনা আছে। সেই প্রেসের সঙ্গেই বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রদীপ তার দু-মাসের টিউশানির টাকা ও আরও কিছু টাকা ধার করে কিনে দিয়েছে কাগজ। প্রেসের খরচ আস্তে আস্তে মিটিয়ে দেবার কথা। মুকুল প্রেসের গণেশবাবুর কাছ থেকেই খোঁজ পেয়ে কাল সন্ধেবেলা তারা এই দফ্‌তরিখানায় বই দেখতে এসেছিল।

রহমান সাহেব হাসি হাসি মুখে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে ক্যাশমেমো বইখানা টেনে নিলেন। প্রদীপ বলল, টাকা-পয়সার কথা তো গণেশবাবুর সঙ্গে.......

অমনি রহমান সাহেবের মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল, ক্যাশমেমো বইটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তা হলে গণেশবাবুর কাছ থেকেই বই ডেলিভারি নেবেন।

প্রদীপ একবার ডান পাশে তাকাল। দফ্‌তরি দু জন তার বই পাঁচখানা পাঁচখানা করে প্যাকেট বানাতে শুরু করেছে। এই সব তার নিজের বই, অথচ তার এখন হাত দেবার অধিকার নেই। এই সময় পার্থ আর সুবিমল সঙ্গে থাকলে ভরসা পাওয়া যেত।

—বই দেবেন না আমাকে?

—আগে গণেশবাবুর সঙ্গে কথা বলি, উনি পেমেন্টের কী ব্যবস্থা করেন।

একটা বাচ্চা ছেলে বাইরে থেকে এসে এক কাপ চা ও একটা খবরের কাগজ রাখল রহমান সাহেবের সামনের টেবিলে। এটা বোধহয় প্রতিদিনের বন্দোবস্ত আর একজন দফ্‌তরি দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই খুলে ফেলল গায়ের জামা।

মুকুল প্রেস খোলে দশটার সময়। সেখানকার মালিক গণেশবাবু সাড়ে বারোটার আগে আসেন না। তিনি কি তখুনি দফ্‌তরিখানায় লোক পাঠাবেন? কিংবা তিনি যদি বলেন, প্রেসে ছাপার খরচ আমি ধার রাখতে রাজি হয়েছি, কিন্তু বাঁধাই খরচ তো আপনাকেই দিতে হবে। সে টাকা কি আমি গ্যাঁট থেকে দেব?

রহমান সাহেব নিজের থুতনি চুলকোচ্ছেন। দাড়ি কামানো পরিষ্কার গাল, তবু চুলকোবার কী আছে? ওইভাবে ব্যক্তিত্ব দেখাবার চেষ্টা।

বাঁধাই খরচ কত? সব মিলিয়ে পাঁচশো বই ছাপা হয়েছে। প্রায় ফিসফিস করে প্রদীপ জিজ্ঞেস করল, আপনার কত হয়েছে?

—আড়াই শো টাকা! পার পীস আট আনা ধরেছি। এ রকম সস্তা রেট অন্য কোথাও পাবেন না!

পীস? প্রদীপের কবিতার বইকে লোকটা....ওর কাছে সব বইই পার পীস? বইখানা যখন উলট পালট দেখছিল, তখন একটা লাইনও পড়ে দেখে নি। একদম কবিতা না পড়ে মানুষ বাঁচে কী করে?

—আমি তো সঙ্গে টাকা আনি নি। ভেবেছিলাম গণেশবাবু সব ব্যবস্থা করবেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের খুব চেনা আছে।

—ঠিক আছে। গণেশবাবু বললেই আমরা প্রেসে মাল ডেলিভারি দিয়ে দেব। ওঁর সঙ্গে তো আর একদিনের কারবার নয়?

প্রদীপ মুখটা নিচু করল। পীসের বদলে এবার বলল মাল। এরপর জঞ্জাল বলবে কি না তারও ঠিক নেই।

প্রদীপ ভেবেছিল, কফি হাউস খুললেই সে তার বই নিয়ে গিয়ে সবাইকে চমকে দেবে।

আড়াইশো টাকা। টিউশানিতে প্রদীপের মাসে একশো টাকা উপার্জন। তার থেকেই ট্রাম-বাস ভাড়া, হাত খরচ। আড়াইশো টাকা কতদিনে জমবে? পার্থ বলেছিল বই বিক্রি করে প্রেসের ধার শোধ দিলেই হবে। কিন্তু দফ্‌তরিখানা থেকে যদি বই না দেয়, তা হলে টাকা তোলা হবে কী করে?

রহমান সাহেব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছেন।

—আচ্ছা, এখন অন্তত দশখানা বই দিন?

রহমান সাহেব মুখ তুলে বললেন, দশ খানা? আপনাকে দেব? কেন?

এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। প্রদীপ তার নিজের লেখা বই চাইতে পারবে না? সেটা অপরাধ? বাকি চারশো নব্বইখানা বই তো থাকছেই, টাকা দিয়ে ছাড়ানো হবে।

—মাত্র দশখানা চাইছি এখন!

—শুনুন, একটা কথা বলি। এসব পদ্যর বই বাজারে চলে না আমি জানি।

অনেকে দশখানা বই নিয়ে চলে যায়, বাকিগুলো ডেলিভারি নেয়ই না। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? গণেশবাবুর সঙ্গে যখন আপনার ব্যবস্থা করা আছে, তখন ওঁকে গিয়েই বলুন গে।

—গণেশবাবু দু-দিন প্রেসে আসবেন না কিনা! উনি বলছিলেন, বাড়িতে বিয়ে না অন্নপ্রাশন কী যেন ব্যাপার আছে!

টপ করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলে প্রদীপের মুখটা লাল হয়ে গেল। মিথ্যে কথা বলা তার অভ্যেস আছে। কিন্তু এখন খুব নার্ভাস লাগছে। পার্থ আর সুবিমল সঙ্গে থাকলে সে আরও অনেক গুছিয়ে, বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানাতে পারত।

বাইরে কিসের যেন একটা গোলমাল হচ্ছে। টিউবওয়েলের সামনে জল নিয়ে ঝগড়া? মেয়েদের গলার আওয়াজই বেশি।

রহমান সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্রদীপের দিকে। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। প্রদীপের গুলটা ধরে ফেলেছেন?

—ঠিক আছে, দু দিন পরেই নেবেন। মাল তো রেডি রইলই, দেখে গেলেন!

প্রথম পরিচয়ে লোকটিকে ভাল লেগেছিল, এখন মনে হচ্ছে এমন অর্থ-পিশাচ, এমন ক্ষমতা-লোলুপ আর হয় না। কবিতা যারা পড়ে না, তারাই এরকম হৃদয়-হীন হয়।

আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কাল সন্ধেবেলা রহমান সাহেব তাদের চা খাইয়েছিল, আজ নিজে একা চা খাচ্ছে, প্রদীপকে চা দিতেও বলে নি।

—আচ্ছা, এই এক কপি নিয়ে যেতে পারি? স্যাম্পেল হিসেবে!

—মাপ করবেন। এখনো বউনি হয় নি। সকালে দোকান খুলেই যদি লোককে ফ্রি দিতে শুরু করি।

এর থেকে প্রদীপের গালে ঠাস করে একটা চড় মারলেও সে কম অপমানিত বোধ করত। তার নিজের বই, একটা কপিও নেবার অধিকার তার নেই। টাকাটাই বড় হল, কবিতাগুলো লিখতে যে কত রক্ত জল করেছে, তা এরা জানে না।

রহমান সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেছে। সেদিকে আর তাকানো যায় না। আর দাঁড়িয়ে থাকলে লোকটা আরও অপমান করবে। আর কিছু না বলে প্রদীপ পেছন ফিরল।

তখন একজন দফ্‌তরি তার মালিককে বলল, দ্যান কর্তা, একখানা বই দিয়ে দ্যান। ভদ্দরলোকের ছেলে, সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

—ঠিক আছে নিন, এই একখানা নিয়ে যান!

ঠিক যেন হাত পেতে ভিক্ষে নিচ্ছে প্রদীপ। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। একবার ভাবল, থাক, দরকার নেই। কিন্তু ততক্ষণে দফ্‌তরিটি বইটা তার হাতে তুলে দিয়েছে।

বাইরে যেতে যেতে সে শুনল রহমান সাহেব সেই দফ্‌তরিটিকে ধমকে বললে, এই আবদুল, সোভিয়েট দেশের ফর্মা গুনেছিস? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

প্রদীপের মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। বইটার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। পার্থ-সুবিমলকে সঙ্গে না নিয়ে আসাটা তার ভুল হয়েছে। এ রকম কত ভুল হয়ে তার জীবনে।

আজ থেকে সে একজন গ্রন্থকার, কিন্তু এখনো কেউ তা জানে না।

খানিকদূর হেঁটে এসে, লোহার রেলিং ডিঙিয়ে সে হেদোতে ঢুকল। এই সময় অনেক বেঞ্চিই ফাঁকা থাকে। জলের ধারে একটা বেঞ্চে সে বসল। প্রথম পাতাটা খুলল বইয়ের। পার্থ আর সুবিমল এই দু'জনের নামেই উৎসর্গ করেছে। প্রথম কপিটা সে পার্থকে দেবে ভেবেছিল, পার্থই সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। অবশ্য সুবিমল পার্থর চেয়ে কবিতা অনেক ভাল বোঝে। সুবিমল তার দু-একটা উপমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। সুবিমলের কাছে সে ঋণী।

এই বইটা সে কাকে দেবে? আর কোনো কপি অন্তত দু-চারদিনের মধ্যে পাওয়ার আশা নেই।

একবার মনে পড়ল নিরঞ্জনদার কথা। নিরঞ্জন চৌধুরী অনেক সিনিয়র কবি। একটা পত্রিকার সম্পাদক, প্রদীপকে স্নেহ করেন, উৎসাহ দেন। নিরঞ্জনদাকে তার বই বেরুবার কথা বলে এসেছিল।

কিন্তু এই একটা মাত্র কপি, সে যদি পার্থ বা সুবিমলকে না দিয়ে নিরঞ্জনদাকে দিয়ে আসে, তাহলে সে খবর কফি হাউসের অন্য বন্ধুদের ঠিক কানে যাবে। ওরা বলবে, প্রথম কপিটাই নিরঞ্জনদাকে? এস্টাব্লিশমেন্টের পায়ে তেল দিচ্ছিস, অ্যাঁ?

হঠাৎ ইচ্ছে হল বইটাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

তার বই বেরিয়েছে, অথচ বেরয় নি। বই ছাপা হয়েছে, কিন্তু সে বই দফ্‌তরির গুদামে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকবে। তার লেখাগুলোর কোনো মূল্য নেই।

এক সময় সে উঠে হাঁটতে আরম্ভ করল। কোথায় যাচ্ছে, সে জানে না। শম্পা তার কবিতা ভালবাসে। একবার শম্পা তার কবিতা পড়ে একটা চিঠি দিয়েছিল। শম্পা থাকে শ্রীরামপুরে। কিন্তু প্রদীপের এখন শ্রীরামপুরের কথা মনে পড়ছে না।

বিবেকানন্দ রোড পার হয়ে, আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে খানিকটা যাওয়ার পর প্রদীপ একটি বাড়ির দোতলায় উঠে গেল। একতলার দরজা খোলাই থাকে, দোতলার দরজা বন্ধ। প্রদীপ বেল বাজাল।

যদি এ বাড়ির কাজের লোকটি কিংবা রাঁধুনি বুড়িটি দরজা খুলত, তাহলে প্রদীপ ফিরে যেত সেখান থেকেই। কিন্তু দরজা খুললেন এক মহিলা। পঁয়তিরিশ ছত্রিশ বছর বয়েস, ঘরোয়া ভাবে শাড়ি পরা, মাথার চুল ভিজে, হাতে একটা তোয়ালে।

গভীর বিস্ময়ে ভুরু তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, প্রদীপ, তুমি? হঠাৎ এই সময়ে?

প্রদীপও বিস্মিত ভাবে বলল, পিন্টু-রিনা, ওরা নেই?

—আজ কী বার?

রবিবার আর বৃহস্পতিবার সকালে প্রদীপ এই বাড়িতে পিন্টু আর রিনা নামে দুটি স্কুলের ছেলেমেয়েকে পড়াতে আসে। সেই দুদিন ওদের ছুটি থাকে। আজ মঙ্গলবার।

প্রদীপ সেটা ভুলে গেছে না জেনে শুনেই এসেছে, তা সে নিজেই যেন এসব ঠিক করতে পারছে না।

সে আড়ষ্ট গলায় বলল, কেন যেন মনে হয়েছিল, আজ ওদের ছুটি থাকবে।

মহিলাটি হেসে ফেলে বললেন, তোমারও দেখছি আমারই মতন ভুলো মন! এস। ভেতরে এস।

—না, তাহলে আমি যাই!

—এসেছ, চলে যাবে কেন? একটু বস, চা খেয়ে যাও। স্বামী বেরিয়ে যান আটটার মধ্যে, রিষড়ার একটি কারখানায় যেতে হয় তাকে। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় সাড়ে আটটায়। তারপরেই মানসীর অফুরন্ত খালি সময়। এক-একদিন তিনি এলগিন রোডে তাঁর বাপের বাড়ি যান এই সময়, আজ সেই দিন নয়। কাজের লোকটিকে বাজারে পাঠানো হয়েছে, রাঁধুনি ছুটি নিয়েছে তিন দিন।

দোতলার ফ্ল্যাটটি একেবারে নিস্তব্ধ।

প্রদীপ এসে বসল বসবার ঘরে, মানসী নিজেই চায়ের জল বসাতে গেলেন।

বসবার ঘরটি বেশ ঝকঝকে ভাবে সাজানো। ফুলদানিতে দু-তিন রকমের টাটকা ফুল। সাদা, লাল ও বেগুনি। ছাদে মানসীর টবের ফুলগাছের বাগান আছে।

প্রদীপের বইয়ের মলাটটা শাদা আর বেগুনি। আর একটা রং তার দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাই কালার ব্লকে খরচা বেশি। প্রদীপ ফুলের গুচ্ছের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এ বাড়িতে প্রত্যেক দিনই সে টাটকা ফুল দেখে।

প্রদীপের এক বন্ধুর এটা কাকার বাড়ি। তার কাছ থেকেই প্রদীপ টিউশ্যানিটা পেয়েছে। সেই সূত্রে মানসীকেও সে কাকিমা বলে।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মানসী আবার ঘরে ঢুকে বললেন, প্রদীপ, তোমার ক্লাস নেই আজ?

এম এ পলিটিক্যাল সাইন্সের ক্লাসে প্রদীপের নাম লেখানো আছে, কিন্তু প্রদীপ প্রায়ই যায় না। তার ভাল লাগে না। বাড়িতে সে বলে রেখেছে, সে চাকরি খুঁজছে। কলকাতার বাইরে, খুব ছোট কোনো জায়গায় সে একটা চাকরি চায়।

প্রদীপ বলল, না।

—তোমার চোখ লালচে লালচে দেখাচ্ছে কেন? রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি বুঝি?

প্রদীপ কিছু উত্তর না দিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মানসীর দিকে। মানসীর মুখখানা এখন ফুলের মতনই টাটকা। প্রদীপের চেয়ে মানসী বয়েসে অন্তত চোদ্দ-পনেরো বছর বড়ো। কিন্তু তাকে দেখে তার বয়েস বোঝা যায় না। এর আগে প্রদীপ কখনো মানসীকে একলা ঘরে এতক্ষণ তাকিয়ে দেখে নি।

মানসী আবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। প্রদীপ এক জায়গায় বসে রইল নিথর হয়ে। কাছেই রয়েছে আজকের দুটি খবরের কাগজ, প্রদীপের তা দেখতেও ইচ্ছে হল না।

চায়ের দুটি কাপ এনে রাখলেন মানসী। সঙ্গে একটা বিস্কুটের কৌটো।

তিনি বললেন, তোমাকে একটা ডিম ভেজে দেব? বিস্কুট ছাড়া আর তো কিছু নেই!

প্রদীপ প্রথমে বলল, না, না লাগবে না!

তারপর মুখ তুলে বলল, আপনি নিজে চা করলেন? বাড়িতে কেউ নেই?

মানসী হেসে উত্তর দিলেন, না কেউ নেই। বামুনদি ছুটি নিয়েছে। এই কথাটা শোনার সঙ্গে মানসীকে একেবারে অন্য চোখে দেখলে প্রদীপ। মানসীর স্বামী নেই, ছেলে-মেয়ে নেই, বাপ-মা নেই, সে একা। সে এখন শুধু প্রদীপের। এই নির্জনতায় তার রূপ অনেক বেশি খুলে গেছে। প্রদীপ মনে মনে মানসীর এই রূপ অনেকবার দেখেছে। আজই প্রথম বাস্তবে দেখল।

আজ ভোরবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতার বইটার কথা মনে পড়বার পরেই কি মানসীর মুখখানা একবার তার চোখে ভেসে ওঠে নি? সেই সময় কার্যকারণটা মনে আসে নি তার।

—নাও, চা নাও!

বইটা সামনে এনে প্রদীপ বলল, কাকিমা, আমার একটা কবিতার বই বেরিয়েছে, আপনার জন্য এনেছি......আপনি নেবেন?

মানসী ভুরু তুলে, সাদার ওপর লাল রঙের মতন, বিস্ময়ের সঙ্গে খুশি মিশিয়ে বললেন, কবিতার বই? তোমার? ওমা, তুমি কবিতা লেখ বুঝি? আগে কোনোদিন বলো নি তো?

বইটা তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বইটা!

প্রদীপ মানসীর শরীর থেকে একটা সুন্দর গন্ধ পেল। এটা কোনো পারফিউমের গন্ধ নয়, মানসীর নিজস্ব গন্ধ। মানসী বইটা খুলে প্রথম কবিতাটায় একটুক্ষণ চোখ রেখে বললেন, বাঃ, খুব সুন্দর লিখেছ! তিনি একটা লাইন উচ্চারণ করে পড়লেন।

মানসী কখনো শখ করে কবিতা পড়েন না। তিনি তাঁর সুন্দর শরীরটা আরও সুন্দর করে তোলার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাঁর শখ পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, ও নানারকম পোশাক কেনা। তার স্বামীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে যে সমাজ সেখানে বাংলা কবিতা ভুলেও ছায়াপাত করে না কখনো।

তবু তিনি জানেন যে কেউ একটা বই উপহার দিলে উৎসাহ দেখাতে হয়। কেউ নিজের লেখা বই দিলে শুধু মলাটের প্রশংসা না করে তার সামনেই পড়তে হয় কিছুটা।

তিনি পড়লেন, এই নদী, বিকেলের ছায়াপথ, ঘরে ফিরছে ঘর নেই যার.....।

পড়তে পড়তে তিনি পাকা অভিনেত্রীর মতন আন্তরিক গলায় বললেন, বাঃ চমৎকার তো.....।

বসবার ঘরটাতে মানসীকে ঘিরে যেন অনেকখানি আলো জ্বলে উঠল। মানসীর মুখ যেন মুক্তো দিয়ে গড়া। পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই, শুধু মানসী ছাড়া, সে পড়ছে প্রদীপের কবিতা।

খানিক আগে প্রদীপ দফ্‌তরিখানা থেকে তার এক কপি বই ভিক্ষে নিয়েছিল। এখন সে যেন দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে, এক অপরূপ পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এল একটি নতুন ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার জলস্রোতের শব্দ তার কবিতার লাইনের মতন.....।

লোভী

ভিক্ষে কর কেন? জোয়ানমরদ, গায়ে খেটে খেতে পার না?

এই কথা বলে বাবা বিপদে পড়ে গেলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবু, একটা কাজ দিতে পারেন? কাজ দ্যান, ভিক্ষা করব না।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কাজ পার? রান্না জান?

লোকটি বলল, আইজ্ঞা না। রান্না করি নাই কখনো।

বাবা আবার বললেন, তাহলে তুমি কী কাজ জান? লোকে যে তোমাকে চাকরি দেবে, কী দেখে দেবে?

লোকটি বলল, চাষের কাজ জানি। জমিতে হাল দিতে পারি। নিড়ুনির কাজ পারি। গাই-বলদ চরাতেও পারি। দেবেন বাবু কাজ? একবার দিয়ে দ্যাখেন।

কলকাতা শহরে এসে লোকটা চাষের কাজ চাইছে। চাষের জমি দূরে থাক, সারা পৃথিবীতে আমাদের এক টুকরো ভূমিও নেই। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি। কলকাতায় কারই বা গোয়াল ঘর আছে?

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, চাষের কাজ জান তো গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় ভিক্ষে করতে এসেছ কেন? তোমার জমি নেই?

লোকটি দু দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমার ছিল না। আমার বাপেরও ছিল না।

আমরা না হয় রিফিউজিদের বংশ, তাই আমাদের মাটি নেই। কিন্তু পশ্চিম বাংলাতেও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন চাষি। এবং কেন তারা গ্রাম ছেড়ে এক এক সময় শহরে ভিক্ষে করতে আসে, তা জিজ্ঞেস করাই বাহুল্যমাত্র। এ শহর এমন কত পরগাছাকে কত আশ্রয় দেয়। লোকটি আমাদের দরজার সামনে বসে পড়ে বলল, বাবু, আপনি বললেন, তাই আমি আর ভিক্ষা করব না। ভিক্ষা করা খারাপ। আপনি আমাকে যে-কোনো একটা কাজ দ্যান।

মুখের কথা ফিরিয়ে নেওয়া বাবার স্বভাব নয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন লোকটির দিকে। তারপর বললেন, উঠে এস। এখন কিছুদিন এখানেই থাক। তারপর তোমাকে মাটি কাটার কাজ দেব। অনেক দূরে যেতে হবে। ঠিক মতন খাটতে পারলে ভালই রোজগার করবে। তোমার নাম কী?

হারাধন।

ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, এই মিনু তোর মাকে ডাকতো। এই হারাধন এখন থেকে বাড়ির কাজ করবে। আগে ওকে দুটি খেতে দে।

বাবা জেদি পুরুষ। আমাদের পরিবারের হিটলার। বাবার মুখের কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারুর নেই। মা অনেক সময় ঝগড়া ও কান্নাকাটি করেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার জেদটাই বজায় থাকে। আমাদের ভাই-বোনদের মতামতের তো কোনো মূল্যই নেই। বাঙাল পরিবারের এটাই রীতি। আমি তখন বি. এস. সি. পাশ করে প্রায় বেকার, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রায়ই ভিক্ষে করি, বাবা তা জানতে পারেন না।

বাবার কাণ্ডজ্ঞান সত্যিই কম। আমাদের মাত্র ছোট ছোট তিনখানা ঘর, আমরা চার ভাই-বোন, ছোট কাকাও আমাদের সঙ্গে থাকে, এর মধ্যে একটা বয়স্ক বাইরের লোককে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে? একটা বারান্দা পর্যন্ত নেই।

হারাধনের বেশ চওড়া শরীর, লম্বাও কম নয়, মুখে রুখু দাড়ি, বয়েস হবে বছর পঁয়তাল্লিশেক। কানা-খোঁড়া কিছু নয়, এরকম পুরুষকে ভিক্ষে করতে দেখলে রাগ হবারই কথা। তা বলে কি ওকে আমাদের বাড়িতেই রাখতে হবে? এদের আশ্রয় দেবার জন্য আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না কলকাতা শহরে?

বাবার বন্ধু গৌতমকাকা একজন মাটি-কাটা কন্ট্রাক্টার। যে সব জায়গায় রাস্তা বা ব্রিজ বানানো হয়, সেখান তিনি আড়াইশো তিনশো মজুর খাটান। গৌতমকাকাকে বলে সেই কাজেই হারাধনকে ভিড়িয়ে দেবেন, বাবা এরকম ভেবে রেখেছিলেন। গৌতমকাকা আপাতত মালদায় একটা খাল কাটাচ্ছেন। মাস তিনেক আমাদের বাড়িতে আসেননি।

মুড়ির সঙ্গে বাদাম আর পেঁয়াজকুচি মিশিয়ে মাখা আর চা, এই আমাদের সকালের জলখাবার। হারাধনকেও সেই মুড়ি মাখা দেওয়া হল এক বাটি। বাথরুমে যাবার সরু প্যাসেজটায় উবু হয়ে বসে সে মুড়ি থেকে খোসা ছাড়ানো বাদাম কয়েকটা বেছে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলা কী?

আমি বললুম, তুমি বাদাম চেন না?

সে বিহ্বল ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আপন মনে বলল, বাদাম! বাদাম!

তারপর কয়েকটা মুখে দিয়ে এমন আস্তে চিবুতে লাগল, যেন বাদাম এক বিস্ময়কর বস্তু। লোকটা আগে কখনো বাদাম খায়নি নাকি?

আমার ছোড়দি ওকে জিজ্ঞেস করল, তোমার আর কে আছে? বউ, ছেলে-মেয়ে নেই? তারা কোথায়?

হারাধন বলল, আমার আর কেউ নাই।

হঠাৎ ঝপাঝপ বাদাম-মুড়ি সব শেষ করে ফেলে সে লোভীর মতন বলল, আর একটু দেবেন? বড় ভাল! বড় ভাল!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা বললেন, প্রথম দিনই এত! এখানে ওসব আব্দার চলবে না! যা দেওয়া হবে, তাই খাবে!

হারাধন মায়ের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, মা জননী, এই চরণে এস্থান দিয়েছেন কোনোদিন নেমকহারামি করব না, আপনি বললে আমি নিজের গলাটাও কেটে ফেলতে পারি!

মা আঁতকে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, কী হে, তুমি কি গ্রামে যাত্রা-টাত্রা করতে নাকি?

সে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলল, আইজ্ঞে! তিনখানা পালায় অ্যাক্টো করিচি!

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, হারাধনের মাথায় বেশ গোলমাল আছে।

সে বেশি কথা বলে। রান্নাঘরের দরজায় বসে সে মায়ের সঙ্গে অনবরত বকবক করতে লাগল। তার গ্রামের গল্প। বনগাঁ সীমান্তের কাছে সরদার পাড়ায় তার বাড়ি। দু'পুরুষ আগেও তারা বিহারের লোকছিল। তার বউ এবং তিনটি ছেলে-মেয়েও ছিল এক সময়। বউ আর এক মেয়ে মারা গেছে, ছেলেদুটো অন্যের বাড়িতে থাকে।

মাথার দোষ আছে বলেই সে কোনো কথা গোপন করতে পারে না। বিকেলের মধ্যেই জানা গেল যে ডাকাতির দায়ে সে দু বছর জেলও খেটেছে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, একটা মুস্কো মতন জোয়ান, যার মাথার গণ্ডগোল আছে, সে আবার ডাকাতও বটে, এরকম একজনকে রাখতে হবে আমাদের বাড়িতে! মা তখনই ভয় পেয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাবা অবশ্য এতেও দমে যাবার পাত্র নন। স্বদেশি আমলে তিনি কিছুদিন জেল খেটেছিলেন, এখন জীবিকার তাড়নায় সদা ব্যস্ত হলেও মনের মধ্যে দেশ-দশের জন্য কিছুটা খচখচানি রয়ে গেছে।

বাবা বললেন, যে লোক নিজের থেকেই ডাকাতির কথা স্বীকার করে, তার মতো লোক খারাপ হতে পারে না। একবার একটা অপরাধ করে ফেললে কি আর ক্ষমা নেই? অত ভয় পাবার কী আছে?

এই ব্যাপারে অবশ্য আমি বাবার সঙ্গে এক মত। তাঁর ওই যুক্তির জন্য নয়, লোকটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যে পাগলাটে সুরটা বেশ মজার। বাড়িতে আমরা তিনজন পুরুষ মানুষ, ওকে ভয় পাব কেন?

ওকে দিয়ে আধ-মণ কয়লা ভাঙানো হল! একতলা থেকে বালতি করে জল টেনে টেনে ধোওয়ানো হল পুরো ছাদটা। তাতে ওর কোনো আপত্তি নেই। মুখে হাসিটিও লেগে থাকে।

সারাদিন হারাধন এখানে সেখানে কাটায়, কাজ না থাকলে সদর দরজার বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্তিরে ওর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের ঘরে।

একঘরে বাবা-মা, এক ঘরে বোনেরা, আর কোথাও তো ওর জন্য জায়গা করা যাবে না। বসবার ঘরটাতেই দুখানা খাটে কাকা আর আমি শুই। তারই এক পাশে হারাধনের জন্য একটা মাদুর আর বালিশ পাতা হল। হারাধনের সঙ্গে তো বিছানা-টিছানা কিছুই ছিল না। ও আগে শ্রীমানী মার্কেটের গাড়ি বারান্দার তলায় শুয়ে থাকত।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটকাকার সঙ্গে এটা আমার আড্ডার সময়। ঘরের মধ্যে একটা উটকো লোক ঢোকাবার জন্য ছোটকাকা খুবই রেগে গেলেও কিছুইতো করার নেই। ছোটকাকার সামান্য দুটো টিউশানির রোজগার। হিটলারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস নেই ছোটকাকার।

ছোটকাকা চুরুট খায়, একটা লম্বা চুরুট শেষ না করা পর্যন্ত আমাদের গল্প চলে।

হারাধন তার মাদুরের ওপর বসে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন জপ করতে লাগল। তার গলায় একটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা আগেই দেখেছি। সেটা তার ভিক্ষে করার ভেক মনে হয়েছিল। কিন্তু তার সত্যিই ভক্তি ভাব আছে দেখা যাচ্ছে।

চুরুট ধরিয়ে ছোটকাকা বলল, এই, তুই কী রকম ডাকাতি করেছিলি রে? মানুষ মেরেছিলি?

চোখ বোজা অবস্থাতেই জিভ কেটে সে বলল, আইজ্ঞে না বাবু, সে রকম অধর্ম করি নাই। সিন্দুক ভেঙেছি আর ধানের গোলা লুটেছি।

ছোটকাকা বলল, এগুলো বুঝি ধর্মের কাজ। একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। শোন, এ বাড়ির বড়বাবু দয়া করে তোকে রেখেছেন, কোনো রকম চুরি-ডাকাতির মতলব যদি করিস, তা হলে মাথা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব।

হারাধন বলল, বড়বাবু তো আমারে মাটি-কাটার কাজ দেবেন বলেছেন। সেই কাজ আমি ভাল পারব।

ছোটকাকা আবার জিজ্ঞেস করলে, ডাকাতি করে কত টাকা পেয়েছিলি?

এক গাল হেসে হারাধন বলল, কিছুই পাই নাই বাবু, ধরা পড়ে গেলাম যে।

হারাধন লম্বা করে গল্পটা বলার চেষ্টা করছিল, তাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিয়ে আমরা যে কাহিনীটা উদ্ধার করলুম, তাতে বোঝা গেল। ডাকাত হিসেবেও সে একটা অপদার্থ। খিদের ঠ্যালা সহ্য করতে না পেরেই সে একটা ডাকাতদের দলে ভিড়েছিল। প্রথমবারেই বনগাঁর এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। পালাবার সময় একখানা রামদা ঘুরিয়ে বাড়ির লোকদের ভয় দেখানোই ছিল তার কাজ। হঠাৎ তার হাত থেকে রামদাটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে। সেটা সে কুড়োতে যেতেই তিন চারজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

এমনই অদ্ভুত হাসি চোখে মুখে লাগিয়ে রেখে হারাধন গল্পটা বলে যায় যেন এটা তার জীবনের একটা দারুণ মজার অভিজ্ঞতা।

ধরা পড়ার পর সে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। তারপর পুলিশের হাতে মার খায়। জেল থেকে গ্রামে ফেরার পর তার পুরনো স্যাঙাতরাও তার ভুলের জন্য তাকে বেধড়ক পিটিয়েছিল। একজনের শাবলের কোপে তার পায়ের দুটো আঙুল উড়ে যায়।

বাঁ পা তুলে সে তার পুরোনো ক্ষতস্থানটা দেখাবার চেষ্টা করতেই ছোটকাকা বলল, থাক থাক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ওই একবারই ডাকাতি করেছ? তার আগে চুরি-টুরি করনি দু-একবার?

হারাধন বলল, খেজুর রস চুরি করিছি অল্প বয়েসে। তারপর ধরেন কখনো খিদের জ্বালায় লোকের বাড়ি থেকে কলাটা-মূলোটা নিয়েছি, কিন্তু টাকা-পয়সা—

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সে ছোটকাকার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর বলল, ওটা কী?

ছোটকাকা বললে, এটা চুরুট। তুই কখনো চুরুট দেখিসনি?

দু দিকে মাথা নেড়ে সে বললে, আইজ্ঞে না।

তারপর চিন্তিত ভাবে প্যাঁচার মতন দু-একবার চোখ পালটে বলল, হ্যাঁ, দেখিছি বোধহয় একবার। জেলখানার এক বাবুর মুখে। ওডা কেমন লাগে? হুঁকোর মতন!

লোকটা খোসা ছাড়ানো সাদা চীনে বাদাম দেখেনি। চুরুট দেখলে অবাক হয়, এ কেমন ধরনের গেঁইয়া? এমন গ্রামও আছে এখনো? হুঁকোর মতন শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল।

ছোটকাকা জিজ্ঞেস করল, তুই গাঁজা খেয়েছিস কখনো?

সে উত্তর না দিয়ে বলল, বাবু আমারে একখানা দেবেন? একবার টেনে দ্যাখব? জীবনটা বেথা যাবে! দ্যান না।

ছোটকাকা আর আমি স্তম্ভিত হয়ে চোখাচোখি করলুম।

বাড়ির একটা চাকর, তাও সদ্য নতুন, বাড়ির বাবুদের কাছে সিগারেট কিংবা চুরুট চাইছে, এ কখনো কেউ শুনেছে?

ছোটকাকা তো বাবারই ছোট ভাই, সেও কম রাগী নয়! সে হুংকার দিয়ে বলল, একটা লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেব। বেশি বেশি আবদার পেয়েছিস তাই না?

হারাধন হি হি করে হেসে বলল; মারেন, মারেন, যত জোরে ইচ্ছা মারেন। লাথি আমি অনেক খাইছি, তাতে আমার বেশি লাগে না। কিন্তু ওই লম্বা তামুক কখনো খাই নাই। জীবনে একবার খাইয়া দ্যাখব না? দ্যান ছোটবাবু, একবার দ্যান।

পাগল না হলে কেউ এই ভাবে চাইতে পারে না।

এমনভাবে চাইলে না-ও বলা যায় না।

গলায় ধোঁয়া আটকে ছোটকাকা একবার বিষম খেল। তারপর তিন-চতুর্থাংশ শেষ হয়ে আসা চুরুটটা সে ছুড়ে দিল হারাধনের দিকে।

বাবুদের সামনে যে ধূমপান করতে নেই, সে জ্ঞানটুকু আছে হারাধনের। চুরুটের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ধাড়ি হনুমানের মতন লাফাতে লাফাতে চলে গেল বাইরে।

একটু বাদে ফিরে এসে সে টিপ করে প্রণাম করল ছোটকাকার পা ছুঁয়ে।

গদগদ ভাবে বলল, জীবনটা ধন্য হল গো ছোটবাবু! এমন সরেশ বস্তু কোনোদিন খাই নাই। গলার মইধ্যে কী আরাম!

প্রায় ল্যাথি মারার ভঙ্গিতেই বিরক্ত হয়ে পা সরিয়ে নিল ছোটকাকা।

পরবর্তী তিন-চরদিন হারাধনকে নিয়ে বেশ হৈ হৈ করেই কাটল। প্রায়ই তাকে নিয়ে মজা করা যায়। আমরা গ্রামে বিশেষ থাকিনি, হারাধনের কাছ থেকে আমরা গ্রামের সব অদ্ভুত গল্প শুনি। অবশ্য গ্রামের সব লোকই নিশ্চয়ই হারাধনের মতন অজ্ঞ হয় না।

বাবা একদিন গোটা চারেক মাগুর মাছ আনলেন বাজার থেকে। তার মধ্যে একটা দুরন্ত মাগুর হঠাৎ বাজারের থলে থেকে লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। কাঁটার ভয়ে কেউ সেটাকে ধরতে সাহস পাচ্ছে না। মা বললেন, ও হারাধন, মাছটা তুলে আন।

মাছ ধরবে কি, হারাধন ড্যাবডেবে চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে। ফিসফিস করে বলল, এত বড় মাগুর? জন্মে দেখি নাই।

কথাটা আমাদের খুব বাড়াবাড়ি মনে হল। মাগুরটা পেল্লায় কিছু না, বাজারে এইরকম মাগুরই তো বিক্রি হয়, এক বিঘতের চেয়ে একটু লম্বা। গ্রামের লোক একটা এরকম মাগুর দেখেনি?

বাবা বললেন, কলকাতার বাজারে বেশিরভাগই চালানি মাগুর আসে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের গ্রামে বেশি বড় মাগুর হয় না। ছোট থাকতেই ধরে খেয়ে ফেলে।

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। যা কলকাতার বাজারে সারাবছর পাওয়া যায়, তা একজন গ্রামের মানুষ সারা জীবনে একবারও দেখেনি? এ কি হতে পারে?

হারাধন মহা বিস্ময়ের সঙ্গে সেই মাগুর মাছ কোটা দেখতে লাগল রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে। এক সময় সে বলে ফেলল, মা, আমারে এক টুকরা দেবেন তো?

মা ধমক দিয়ে বললেন, যা রান্না হয়, তার কোন্‌টা তোমাকে দেওয়া হয় না? এখানে বসে বসে নজর দিতে হবে না, ওঠ তো!

দুদিন বাদে হারাধনের একটা চুরি ধরা পড়ে গেল।

দুপুরের দিকে মা একটু ঘুমিয়ে নেন। আমারও দুপুরের ঘুম বেশ প্রিয়। যতদিন চাকরি পাচ্ছি না, ততদিন দুপুরের ঘুমটা আর ছাড়ি কেন? ছোটকাকা টো-টো-করে ঘুরে বেড়ায়।

ছোড়দি এসে ঠ্যালা মেরে আমায় জাগিয়ে বলল, খোকন, এই খোকন, দেখবি আয়!

ছোড়দির মুখে ঠিক ভয় নয়, অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের ঘোর। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে শব্দ না করার ইঙ্গিত করে ছোড়দি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

নিভে যাওয়া উনুনের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের দুধের কড়াইটা চাপানো। আধকড়াই ভর্তি দুধের ওপর একটা পাতলা সর পড়েছে। একটা মস্ত হুলো বেড়ালের মতন উপুড় হয়ে হারাধন সরাসরি সেই কড়াই থেকেই চুমুক মারছে দুধে।

আমাদের উপস্থিতিতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই!

আমি চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুললুম। তার গোঁফ-দাড়িতেও দুধ লেগে গেছে।

ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই তার মুখে। বরং একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, দশ-বারো বছর দুধ খাই নাই! কেমন খেতে লাগে ভুইলেই গেছিলাম। তাই একটু ইচ্ছে হল...

আমি নিজেও তো দশ বারো-বছর চুমুক দিয়ে দুধ খাইনি। চায়ের সঙ্গে যে-টুকু দুধ পেটে যায়, দুধের সঙ্গে সেইটুকুই সম্পর্ক।

দাঁত কিড়মিড় করে আমি বললুম, হারামজাদা? আমাদের বাড়িতে একেবারে ছোট বোনটা ছাড়া আর কে দুধ খায়? বাকি দুধটা তো চায়ের জন্য।

ছোড়দি বলল, ভাগ্যি আমি দেখে ফেললুম! নইলে ওর এঁটোটা আমাদেরকে খেতে হত।

হারাধন বলল, বড় ভাল সোয়াদ? আর একটু খাব ও দিদিমণি! খাব?

সেইদিনই হারাধনের চাকরি যাবার কথা।

কিন্তু ছোড়দির দয়ার শরীর। প্রথম অপরাধের জন্য ছোড়দি তাকে ক্ষমা করে দিতে চাইল। ঘটনাটা কাউকে জানান হল না। হারাধনের এঁটো দুধ রেখে দেবারও কোনো মানে হয় না। পুরো দুধটাই হারাধনকে দিয়ে বলা হল, সে যদি ভবিষ্যতে আর কোনো খাবারে মুখ দেয় কিংবা না বলে কোনো জিনিস নেয়, তাহলেই পুলিশে দেওয়া হবে তাকে।

আনন্দে চোখ চকচক করে উঠল হারাধনের। পুরো কড়াইটা দুহাতে তুলে প্রায় এক চুমুকে সাবাড় করে দিল পুরো দুধ। আঙুলে সর তুলে চেটে চেটে খেল আর মুগ্ধভাবে তাকাতে লাগল ছোড়দির দিকে।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ছোড়দিকে প্রণাম জানিয়ে বলল যে আর কখনো সে না জানিয়ে কিছু খাবে না।

কড়াইটা উলটে দোষ দেওয়া হল পাশের বাড়ির পোষা বেড়ালটার নামে।

এরপর কয়েকদিন ছোড়দি আর আমি পালা করে দুপুরবেলা গোপনে লক্ষ্য করেছি। হারাধনের আর কোনো চৌর্যকর্ম চোখে পড়েনি।

গৌতমকাকা বাবার চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসে একটা দুঃসংবাদ দিলেন।

সরকারের কাছে তাঁর আড়াই লাখ টাকা বিল বাকি পড়ে আছে, তাঁর মাটি-কাটার ব্যবসা আপাতত লাটে উঠে গেছে। মজুরদের প্রাপ্য টাকা দিতে পারছেন না বলে তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

হারাধনকে দেখে তিনি মুখ বাঁকিয়ে বাবাকে বললেন, এরকম একটা মুস্কো জোয়ানকে বাড়িতে রেখেছ, তুমি কি পাগল নাকি? আজই একে বিদায় করে দাও। দিনকাল খারাপ, কখন কিসে কী সর্বনাশ হয়ে যায়, কোনো ঠিক নেই।

হারাধনকে অবশ্য তখনই তাড়ানো হল না। পাগলাটে মানুষটা এমনিতে নিরীহ, হাজার ধমক দিলেও প্রতিবাদ করে না। মাঝে মাঝে জিনিসপত্র ভাঙে, এর মধ্যে দুটো কাচের গেলাস আর একটা কাপ ভেঙেছে, দোকান থেকে কোনো জিনিস আনতে বললে অন্য একটা নিয়ে আসে। তবু কোনো কাজেই তার না নেই। আমাদের ঠিকে ঝি-টা আবার দিন চারেক ধরে আসছে না।

এমনকি মা-ও হারাধনকে একটু একটু পছন্দ করে ফেলেছেন। হারাধনের এক-একটা অদ্ভুত কথা শুনে তিনি হেসে গড়াগড়ি যান।. ছোড়দির বান্ধবীরা বেড়াতে এলে ছোড়দি হারাধনকে ডেকে তার বোকামির নিদর্শনগুলি দেখিয়ে বান্ধবীদের আনন্দ দেয়।

একদিন একটা গায়ে মাখা সাবান কিনে আনার জন্য ওকে একটা দশ টাকার নোট দেওয়া হল। তা দিয়ে ও সাবানের বদলে নিয়ে এল চারখানা ফজলি আম। চোখ বড় বড় করে সগর্বে বলল, দ্যাখেন কত বড় আম আনছি। এত বড় আম বাপের জম্মে দেখি নাই।

সেদিন ছোড়দি পর্যন্ত রেগে কাঁই। ছোড়দি তখন বাথরুমে, সাবানের অপেক্ষায়।

ছোটকাকা হারাধনের কান ধরে টানতেই সে মচুকি হেসে বলল, আমাদের আধখান আম দেবেন তো?

দিন পনেরো কেটে যাবার পর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল।

সেদিন রবিবার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা পাশের বাড়িতে তাস খেলতে যান। মা খবরের কাগজের রবিবারের পাতা শেষ করে বেলা করে ঘুমোন। হঠাৎ দরজায় একটা আওয়াজ পেয়ে মা ভাবলেন, কোনো কারণে তাস খেলা বন্ধ, তাই বাবা আজ ফিরে এসেছেন।

বিছানায় তার পাশে একজনের শুয়ে পড়ার শব্দ হল। অন্য দিকে ফিরে কাগজ পড়তে পড়তে মা জিজ্ঞেস করলেন, আজ আর খেলা হল না বুঝি? তোমাকে কতদিন বলেছি, সুমিতা পছন্দ করে না......

উত্তরের বদলে একটা অন্যরকম হাসির শব্দ শুনে মা চমকে পাশ ফিরলেন। তিনি দেখলেন দাড়িগোঁফওয়ালা একটা বিকট মুখ, সেই মুখখানা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

বিরাট আর্তনাদ করে মা পালাবার চেষ্টা করতেই গড়িয়ে পড়ে গেলেন খাট থেকে।

আরশোলা দেখে ভয় পায় ছোড়দি। মায়ের ওসব বাতিক নেই।

এমনকি মায়ের ভূতের ভয়ও নেই। মার গলায় ওরকম চিৎকার আমরা কখনো শুনিনি।

আমরা সবাই ছুটে গেলুম একসঙ্গে।

খাটের ওপর, ঠিক পাখার নিচে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে হারাধন। খাটের গদিতে সে একটু একটু দোলবার চেষ্টা করছে।

একটাক্রিকেট ব্যাট তুলে ছোটকাকা যেভাবে মারতে উঠেছিল, সেটা ঠিক মতন লাগলে হারাধন বোধহয় তক্ষুনি খুন হয়ে যেত। ছোড়দি ছোটকাকার হাতটা ধরে ফেলল।

তারপর চলল লাথি-ঘুঁষি।

হারাধনের মুখে একটিও শব্দ নেই। যেন সে ধরেই নিয়েছে এই সব মার তার প্রাপ্য। কোনো প্রশ্নেরও সে উত্তর দেয় না। লোকটার অকৃতজ্ঞতাতেই আমাদের সকলের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে ঘৃণা। একটা জেলখাটা ডাকাত জেনেও ওকে এ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, তার এই প্রতিদান!

মায়ের ধারণা, হারাধন ওঁর গলা টিপে ধরতে চেয়েছিল

খবর পেয়ে বাবা ছুটে এলেন পাশের বাড়ি থেকে। এখন বাবাকে সামলানোই একটা বড় কাজ আমাদের। বাবার খুব ব্লাড প্রেশার আছে।

বাবা কিন্তু রাগারাগি করলেন না একেবারেই। গুম হয়ে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। তাঁর মুখে নিদারুণ দুঃখের ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন খুব অন্যায়ভাবে তাঁকে কেউ কোনো একটা খেলায় হারিয়ে দিয়েছে।

আমার মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে হারাধন শুয়েছে, এই কথাটা জানাজানি হয়ে গেলেই পাড়ার লোক অনেক কথা বলতে পারে। তারপর কী ঘটেছে না ঘটেছে, তা কেউ শুনতে চাইবে না। যাদের জিভ সব সময় শুলশুল করে, তারা যা ইচ্ছে বানাবে।

এই ব্যাপারটা ছোড়দি বুঝতে পেরে বলল, বাবা, আর চ্যাঁচামেচি করার দরকার নেই। ওকে বরং বনগাঁয় পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

বাবা যুক্তিটা মানলেন। ছোটকাকা আর আমার ওপর সেই ভার দেওয়া হল।

হারাধনের দিকে তাকিয়ে বাবা শুধু গম্ভীরভাবে বললেন, তুই আর কোনোদিন কলকাতা শহরে ভিক্ষে করতেও আসবি না। তাহলে কিন্তু কেউ আর তোকে বাঁচাতে পারবে না।

শিয়ালদায় পৌঁছে হারাধনের কাছে আমাকে পাহারায় দাঁড় করিয়ে ছোটকাকা গেল টিকিট কেটে আনতে।

মার খেয়ে হারাধনের মুখ ফুলে গেছে। থুতনির কাছে তার কেটেও গেছে খানিকটা। কিন্তু তাকে মোটেই বিমর্ষ দেখাচ্ছে না। বরং বনগাঁয় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সে যেন বেশ উৎফুল্ল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হারাধন, সত্যি করে বল তো, তুমি এটা করতে গেলে কেন? মা তোমাকে কোনোদিন কম খাবার দিয়েছে? তোমাকে একটা জামা কিনে দেওয়া হল পরশুদিন।

হারাধন বলল, জামা তো আমার একটা ছিলই। আর জামা লাগত না।

আমি বললুম, তোমার জামাটা ছেঁড়া আর নোংরা। সেই জন্যই একটা নতুন জামা দেওয়া হল। ছোড়দি সেদিন.......

হারাধন আবার বলল, জামা লাগত না। কিন্তু আমি কোনোদিন গদির বিছানায় শুই নাই। মাথার উপরে পাখা ঘোরে, গদির বিছানা, কেমন লাগে তাই তো জানি না! তাই ভাবলাম, জীবনটা ব্রেথা যাবে, কোনোদিন শোব না? তাই একটু বড়বাবুর মতন.....হে হে হে; বড় ভাল লাগছে। একটু মার খেয়েছি, তাতে কী হয়েছে, বড় ভাল লেগেছে গো বাবু!

আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল পরম পরিতৃপ্তিতে।

চক্ষু বোজা চক্ষু খোলা

লঞ্চ থেকে নেমে বালির ওপর দাঁড়িয়ে প্রবীর মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগল, তার শরীরে রোমাঞ্চ হল।

শেষ বিকেলের লাল রঙের আলোয় সামনের প্রান্তরের শূন্যতা যেন সাধারণ শূন্যতার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। শূন্যতা বাতাসে উড়ছে, শূন্যতা মাটিতে শুয়ে আছে।

প্রবীর বছর চারেক আগে একবার এখানে এসেছিল। সরকারি অফিসার হিসেবে নয়, বন্ধুদের সঙ্গে দল মিলে। তখন এখানে ছিল অসংখ্য তাঁবু আর হোগলার ঘর। চতুর্দিকে গিসগিস করছে মানুষ, অনেকে মাথার ওপর ছাউনি পায়নি। শীতের মধ্যে থেকেছে খোলা আকাশের নিচে। সেবারের মেলায় সাত লাখ তীর্থযাত্রী এসেছিল।

সেই জায়গাটাই এখন সম্পূর্ণ নির্জন। গা ছমছম করে।

লঞ্চ থেকে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে, প্রবীর পেছন ফিরে তাকাল। সমুদ্র এখন রক্তবর্ণ, ঢেউ বিশেষ নেই, একেবারে দিগন্তে একটা স্থির জাহাজ, কোলরিজের কবিতার মতন, চিত্রিত সমুদ্রে একটা জাহাজের ছবি।

ভিজে বালির ওপর দৌড়োদৌড়ি করছে ছোট ছোট কমলা রঙের কাঁকড়া। অসংখ্য। প্রবীর দু পা এগোতেই চোখের নিমেষে তারা মিলিয়ে গেল। প্রবীর আবার স্থির হতেই তারা গর্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্বদেশ সেনগুপ্ত চেঁচিয়ে বললেন, চেষ্টা করে দ্যাখ, যদি একটাও ধরতে পারিস। এক বোতল স্কচ দেব।

প্রবীর চেষ্টা করল না। সে জানে, খালি হাতে ওদের ধরা যায় না। ওই টুকু প্রাণী, অথচ ওদের সূক্ষ্ম চোখ আর কান? সন্ধের সময় ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে কি গায়ে সূর্যের রং লাগাবার জন্য।

বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ওরা এগিয়ে গেল ডাক বাংলোর দিকে।

এই বাংলোটি একেবারে নতুন। এখানে টাটকা চুনকামের গন্ধ নাকে আসে। জানলা দরজার রং দেখলে মনে হয় শুকয়নি।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্বদেশ সেনগুপ্ত ভেতরে ঢুকেই বাথরুমের কল খুলে দেখলেন। কমোডের ফ্লাস টানলেন। তারপর গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বললেন, আমি তো কলের মিস্তিরি। আগেই এদিকে নজর পড়ে। হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিকই আছে। আজ আর কি কিছু কাজ হবে?

সুখেন বলল, স্যার, এখন একটু চা খেয়ে নেবেন? সঙ্গে টোস্ট আর টিনের সার্ডিন মাছও আছে।

স্বদেশ সেনগুপ্ত একটু বেশি লম্বা, তাই তাঁকে ল্যাকপেকে দেখায়, কথা বলার সময় মাথাটা দোলে। বিস্ময়, রাগ, খুশির রেখাগুলো তাঁর মুখে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি ভুরু তুলে বললেন, টিনের মাছও এনেছ নাকি?

সুখেন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। যা চাইবেন সব পাবেন।

স্বদেশ বললেন, ধুস! সমুদ্রের ধারে এসে টিনের মাছ। কাল সকালে টাটকা মাছ জোগাড় করা চাই। মাছের নৌকা যায় এদিক দিয়ে। এখন চায়ের সঙ্গে মুড়ি মাখ, বেশ বাদাম-টাদাম দিয়ে, পাঁপড় ভেজে গুঁড়ো করে, আর কাঁচা লংকা।

লঞ্চ থেকে শেষ দুটো প্যাকেট বয়ে নিয়ে এসে নিখিল বলল, এক ব্যাটা সাধু এর মধ্যেই এসে গেছে।

স্বদেশ যেন একটা দুঃসংবাদ শুনে চমকে ওঠার মতন বললেন, এর মধ্যেই আসতে শুরু করেছে? এখনো তো দু সপ্তাহ দেরি আছে।

নিখিল বলল, ওই একজনকেই তো দেখলুম। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি একটা পাথর। কাছে গিয়ে দেখি বেশ গাঁটাগোট্টা এক জটাধারী চোখ বুজে বসে আছে।

স্বদেশ বললেন, ওদের আর কি! যে-কোনো এক জায়গায় বসে গেলেই হল।

দু সপ্তাহেরও বেশি, আরও উনিশ দিন বাকি আছে চৈত্র সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে। কপিল মুনির আশ্রম এখনো খোলেনি, অযোধ্যা থেকে মোহান্ত পাণ্ডারা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অফিসারদের এই দলটি আজ এসেছে আগে থেকেই পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থার পরিদর্শন করতে। এই কাজে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের আসার এখনই কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি স্বয়ং এসেছেন বলে তাঁকে খাতির করাটাই অন্যদের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও কাজের মানুষ। কাজ ভালবাসেন।

সুখেন আর দুজন এসেছে কন্ট্রাকটারদের প্রতিনিধি হিসাবে। আপাতত তাদের কাজ এই ছোট দলটির সেবা-যত্ন করা। বাঘের পেছনে ফেউয়ের মতন, সরকারি অফিসাররা বাইরে সফরে গেলে তাদের সঙ্গে কন্ট্রাকটাররা থাকবেই। এক এক সময় কে বাঘ আর কে ফেউ, তা ঠিক বোঝা যায় না।

স্বদেশ সেনগুপ্ত ছটফটে মানুষ। চা তৈরি করতে দেরি হচ্ছে বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল প্রবীর। পুরো অন্ধকার হবার আগে একবার সাইটটা ঘুরে দেখে আসি। গ্রাউণ্ড প্ল্যানটা নিয়ে নে। টর্চ এনেছিস তো?

জুনিয়ার অফিসাদের তুই-তুকারি করার নিয়ম নেই। কিন্তু স্বদেশ কারুর কারুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন, তাদের বাড়িতে যান, অসুখ বিসুখ হলে খোঁজ খবর নেন, তিনি স্বদেশদা হয়ে যান।

বাইরের অন্ধকার আকাশের রঙ অনেকটা খেয়ে ফেলেছে। সমুদ্রের ওপর লাফ দিয়ে নামছে অন্ধকার। এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে।

প্রবীর আর নিখিলকে নিয়ে স্বদেশ ঘুরতে লাগলেন কোথায় কোথায় জলের কলগুলো বসবে তা নির্দেশ করার জন্য। এর মধ্যেই একবার ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়ে গেছে, সমুদ্র-বাতাসের লবণ গন্ধের সঙ্গে সেই গন্ধ মিশে যায়।

এক সময় নিখিল বলল, ওই যে দেখুন সেই সাধু!

তিনজনে এগিয়ে গেল কাছে।

একেবারে উলঙ্গ নয়, একটা সরু ল্যাঙোট পরে আছেন সাধুটি। কালো শরীরে ছাই মাখা, বেশ সবল দেহ, মাথা ভর্তি জটা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসে আছেন, চক্ষুদুটি বোজা।

স্বদেশ বললেন, চেহারাখানা বেশ ইমপ্রেসিভ। খাঁটি সাধু সাধু দেখতে। তাই না?

নিখিল বলল, এই ব্যাটা গত বছর থেকেই বোধহয় এখানে রয়ে গেছে।

প্রবীর বলল, আস্তে। ব্যাটা ব্যাটা বলবেন না, শুনতে পাবে।

নিখিল বলল, শুনলেও বাংলা বুঝবে না।

স্বদেশ বললেন, হিন্দিতে ব্যাটা মানে খারাপ কিছু নয়। আচ্ছা, এই সাধু মহারাজ খায় দায় কি? এখানে কে ওকে খাবার দেবে? অথচ শরীরখানা বেশ তাগড়াই।

নিখিল বলল জিজ্ঞেস করব?

স্বদেশ বললেন, না, না, থাক। ধ্যান ভাঙালে যদি পাপ টাপ হয়।

প্রবীর স্বদেশের দিকে তাকিয়ে, একটু দ্বিধা করে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি এসব মানেন?

স্বদেশ থুতনিতে হাত দিয়ে দ্বিধার সঙ্গে বললেন, মানি না বোধহয়, ঠিক বুঝিই না। তবে ভয় পাই। এদের দেখলেই একটা আনক্যানি ফিলিং হয়। এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে আছে।

স্বদেশের পরনে টাই-বিহীন, উলের স্যুট, নিখিল আর প্রবীরের গায়ে ফুল হাতা মোটা সোয়েটার? এখন বাতাসের বেগ বেড়েছে বলে তাতেও শীত শীত লাগছে।

নিখিল হালকাভাবে বলল, হয়তো এই সাধুই স্বয়ং কপিলমুনি। বছরের এই টাইমে মাটির তলা থেকে উঠে আসেন একবার করে। কপিলমুনি তো অমর।

স্বদেশ বললেন, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস.....সাতজন অমর কারা কারা যেন?

প্রবীর বলল, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ আর পরশুরাম, এই সপ্ততে চিরজীবিনঃ।

স্বদেশ বললেন, এই লিস্টে নাম না থাকলেও কপিলমুনিও বোধহয় অমর। নিখিল ঠিকই বলেছে। পরশুরাম মাঝে মাঝে কপিলমুনির সঙ্গে দেখা করতে আসে না?

তারপর গলা নিচু করে স্বদেশ আবার হাসতে হাসতে বললেন, এই জায়গাটি কপিলমুনির হতে পারে অথবা নর্থ বিহারের কোনো খুনির হতে পারে।

অদূরে এই তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও সাধুটির চোখের পাতা একবারও খোলেনি, শরীরও একটুও নড়েনি।

একজন বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে সুখেন সেখানে চায়ের পট, কাপ ও এক গামলা মুড়ি-মশলা নিয়ে উপস্থিত হল।

সে বিগলিত ভাবে বলল, স্যার, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখানেই খেয়ে নিন না।

স্বদেশ এক খাবলা মুড়ি তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ বেশ হয়েছে। নুন একটু কম দিলে পারতে।

নিখিল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, সাধুজী, চায়ে পিয়েঙ্গে?

কোনো উত্তর এল না।

সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই নির্জনে চোখ বুজে বসে আছে যে সাধু, সে নিশ্চয়ই ভিক্ষের প্রত্যাশী নয়। চা খেতে সাধুদের কোনো নিষেধ নেই, পরিতোষ অনেক সাধুকে তা খেতে দেখেছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে একটু চা খেলে ভাল লাগবার কথা, তবু সাধুটি লোভ করল না।

এর সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াটাও প্রবীরের ভাল্গার মনে হল। সে বললো, চলুন স্বদেশদা, আমরা বাংলোয় যাই।

স্বদেশ বললেন, একটু সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসা যাক বরং।

কিন্তু সমুদ্রতীর বেশিক্ষণ উপভোগ্য হল না। এ বছর বেশ জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। অবশ্য, কলকাতায় এরকম ঠাণ্ডা টের পাওয়া যায় না। বাতাস এমন প্রবল যে সিগারেট টানারও উপায় নেই।

বাংলোতে বিদ্যুতের আলো আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে স্বদেশ তার সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের বিষয় আলোচনা করলেন, তারপর হঠাৎ কাগজপত্র ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এনাফ! কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। এখন একটু তাস খেলা যাক। কে কে ব্রিজ খেলবে?

খাটের ওপর বসে তাস বাঁটতে বাঁটতে স্বদেশ বললেন, ঠাণ্ডায় একেবারে কালিয়ে গেলুম। শরীর গরম করার কিছু আছে নাকি?

সুখেন বলল, আছে স্যার। সব রকম স্টক আছে। গেলাস আনছি।

সুখেন বেশ গর্বের সঙ্গে এক বোতল স্কচ এনে রাখল বিছানায় ওপর। গেলাস, সোডা এবং বরফও এল। সত্যি সুখেনের আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই।

প্রবীর ভাবল, গ্রেট ব্রিটেনের একটা ছোট্ট জায়গার বিশেষ ধরনের জল দিয়ে তৈরি হয় এই মদ। অন্য জলে সেরকম স্বাদ হয় না। ওরা কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বোতল বানায়? পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সন্ধের পর কত লোক এই স্কচ পান করে, এমনকি গঙ্গাসাগরের মতন এমন রিমোট জায়গাতেও একটি বোতল উপস্থিত।

স্বদেশ বোতলটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, আজকাল খুব ভ্যাজাল হয়। শালারা বোতলের তলা দিয়ে গরম সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে নাকি স্কচ বার করে নেয়।

গেলাসে একটুখানি র ঢেলে তিনি মুখে দিলেন, ওয়াইন টেস্টারের ভঙ্গিতে জিভে ঘোরাতে লাগলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

প্রবীর বলল, স্বদেশদা, আপনি আগে খেলেন কেন? যদি বিষাক্ত হত?

স্বদেশ হা-হা করে হেসে বললেন, ওই যে গান আছে না, আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান। তোরা বাচ্চা ছেলে, তোদের সামনে অনেকখানি কেরিয়ার পড়ে আছে, কত ল্যাং মারামারি, কত চুকলি কাটা, কত মিনিস্টারের ইয়েতে তেল দেওয়া.....

সবাই জানে, বেশি পান করার দরকার হয় না, মদের বোতল দেখলেই স্বদেশ সেনগুপ্তর নেশা শুরু হয়ে যায়। মদ্যপানের আড়ম্বরটাই উনি পছন্দ করেন, নিজে বেশি খেতে পারেন না, খেতে চানও না। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দু পেগ খাবেন এবং প্রচুর বকবক করবেন।

খানিকবাদে হঠাৎ এমন জোর মেঘ ডেকে উঠল যেন কাছেই কামান দাগা হয়েছে। স্বদেশই বললেন, জাহাজ থেকে কামান দাগছে নাকি রে?

নিখিল বলল, না বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

স্বদেশ বললেন, শীতকালে এমন তেজি মেঘ! জানিস এক সময় এখানে সত্যি সত্যি কামান দাগা হত!

নিখিল বা প্রবীররা এ খবর নিশ্চয়ই জানে না। তাদের কৌতূহলী চোখ দেখে স্বদেশ আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, এই জায়গাটা তো সুন্দরবনের সঙ্গে কানেকটেড ছিল এক সময়। প্রচুর বাঘ আসত। গঙ্গাসাগর মেলার সময় বাঘের হামলায় অনেক মানুষ মরত। বাঘেদের ফিস্ট লেগে যেতে। বঙ্কিমবাবুর ঐ যে নভেলটা, কী যেন নাম, কাপালিক আর ফুলের গয়না পরা মেয়ে, হ্যাঁ, কপালকুণ্ডলা, তাতে নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে ভেবে সবাই পালাল মনে নেই? একসঙ্গে এখানে কতগুলো বাঘ আসত ভেবে দ্যাখ, যে একবার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বাঘ তাড়াবার জন্য এখানে কামান বসিয়েছিল, তার ডকুমেন্ট আছে।

এর মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল প্রবল তোড়ে।

স্বদেশ বললেন, জানলা বন্ধ কর! শীতকালে এমন বৃষ্টি বাপের জম্মে দেখিনি! নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশানের ধাক্কায় ওয়েদার-ফোয়েদার সব গুবলেট হয়ে গেছে!

নিখিল বলল, গত বছর মেলার মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে? অনেকগুলো তাঁবু উল্টে গেল, লোকগুলোর কী অবস্থা! কলেরা আর ঠাণ্ডায় লাস্ট ইয়ারে প্রায় সত্তরজন ক্যাজুয়ালটি! মেলায় এত সাধু-সন্ন্যাসী আসে, সব ব্যাটার খালি পয়সা মারার ধান্ধা, ধ্যান করে যে বৃষ্টি আটকাবে, সে হিম্মত নেই কারুর।

স্বদেশ বললেন, কলিকালে আর ব্রহ্মতেজ নেই, সব মন্দা। রাজার দোষে প্রজা নষ্ট! পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর স্বার্থের লড়াইতে বুরোক্রাট, টেকনোক্রাটরা সব হাত গুটিয়ে বসে আছে, দে। উচ্ছন্নে যাচ্ছে!

প্রবীর বলল, স্বদেশদা, ঐ সাধুটি বৃষ্টিতে ভিজছে। ওকে এখানে ডেকে আনলে হয় না?

স্বদেশ বললেন, তুই কি ভাবছিস, এ বৃষ্টির মধ্যে সে এখনো বসে আছে? মাথা খারাপ তোর! ও নিশ্চয়ই মন্দিরে ঢুকে পড়েছে, কিংবা ওর ঠিক থাকার জায়গা আছে। ওকি চল্লিশ ঘণ্টা ওখানে চোখ বুজে বসে থাকে? ইম্পসিবল্। না খেলে শরীর টেঁকে না, না ঘুমোলে মানুষ বাঁচে না। সাধুই হোক আর যেই হোক। সাধুরা নেচারস কল-এ যায় না?

প্রবীর বলল, একবার দেখে আসব?

সবাই হেসে উঠল।

নিখিল বলল, আপনার দেখছি মশাই খুব রস! আপনার কি ওদের ওপর খুব ভক্তি আছে নাকি? সব কটা বুজরুক।

স্বদেশ বললেন, দেব-দিজে ভক্তি থাকা ভাল। তাতে তাড়াতাড়ি চাকরির উন্নতি হয়। তবে কি জানিস প্রবীণ, একবার দ্বারভাঙ্গায় গেসলুম, আমার বন্ধু বিষ্ণুপ্রসাদ ওখানকার কমিশনার ছিল। তার মুখে শুনেছি, ওদিককার গ্রামে প্রায়ই রাগের মাথায় কেউ আর একজনকে খুন করে। তারপর সেই খুনি পালিয়ে গিয়ে গায়ে ছাইভস্ম মেখে সাধু সেজে যায়। সাধু হলে তো আর পুলিশে ছোঁবে না। সেই ভাবে আট-দশ বছর এদিক-ওদিক ঘুরে আবার গ্রামে ফিরে আসে। তখন পুরনো কথা সবাই ভুলে যায়। আজকের সাধুবাবাটির যা চেহারার বহর দেখলুম, তাতে মার্ডারার হওয়া নট আনলাইকলি!

প্রবীর বলল, সাধু সাজতে গেলেও এতখানি কঠোর সাধু হতে হবে কেন? ওই লোকটা যদি এমনি এক জায়গায় বসে গাঁজা টানত, তা হলেও তো ওকে আমরা ডিসটার্ব করতুম না। শীতের মধ্যে ওরকম খালি গায়ে বসে থাকা.....অনেক সাধু তো গায়ে কম্বল দেয়।

নিখিল বলল, আমাদের ইম্প্রেস করার চেষ্টা করছে। লঞ্চটা আসতে দেখেই ভড়ং শুরু করেছে, সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট!

প্রবীর বলল, ওকে ডেকে এনে জেরা করলে হয় না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। খুনি হলে আমরা ধরে ফেলতে পারব না!

স্বদেশ বললেন, আমরা ওসবে মাথা ঘামাতে যাব কেন বল! আমরা তো পুলিশ নই! আমাদের সে রকম কোনো পাওয়ার নেই।

সুখেন বলল, ঠিক বলেছেন স্যার! ওসব সাধু-টাধুদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। কিসে কী হয়ে যায়, বলা তো যায় না। কিছু কিছু সাধু জেনুইন আছে স্যার, আমি দেখেছি, ইন মাই ওউন আইজ, এই মেলায় কয়েকজন সাধু দিনের পর দিন এক জায়গায় বসে থাকে, একবারও ওঠে না। জল ছাড়া কিছু খায় না।

নিখিল বলল, পেচ্ছাব-পাইখানাও করে না? সব হজম করে ফেলে? আরে বাবা, শুধু জল খেলেও তো পেচ্ছাব করতেই হবে।

স্বদেশ বললেন, হ্যাঁ এবারে ল্যাট্রিন করবে, মেয়েদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন বেশি করে বানিও, ভাল করে ঢেকে দিও। গতবারে মহিলারা ওপন্ এয়ারে, সে বড় বীভৎস দৃশ্য, আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না।

কথা অন্যদিকে ঘুরে গেলেও প্রবীরের মাথায় ঐ সাধুর চিন্তাটাই গেঁথে রইল। তারা যখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে চা-মুড়ি খাচ্ছিল, তখনও সে একবারও চোখ খোলেনি। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের পক্ষে এতখানি সংযম সম্ভব? এর থেকে অনেক কম সংযমেও তো তার ভেক ধরার কাজ চলে যায়।

কেন ওরা খালি গায়ে চোখ বুজে বসে থাকে? কী পায়? মানুষের প্রবৃত্তি হল পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর সব পুরুষই চায় এক টুকরো জমি। অন্তত একটি নারী, মাথার ওপর আচ্ছাদন, রুচিমতন পর্যাপ্ত ভোজ্যবস্তু। এরপর আরও অনেক কিছু আছে। জৈব প্রবৃত্তিই তাকে শিখিয়ে দেয় সন্তান উৎপাদন করতে, প্রকৃতি সেই সন্তানদের গায়ে মায়া মাখিয়ে দেয়।

বড় বড় দার্শনিক ও শিল্পীরা হয়তো এইসব ভোগ ও মায়ার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন, তাঁদের মনোজগতের পরিশীলন, তাঁদের অহংকার, তাঁদের নিজস্ব বাসনার পথে চালায়। কিন্তু হাজার হাজার সাধু, অধিকাংশই অকাট অশিক্ষিত, তারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে ছাই মেখে ঘুরে বেড়ায় কিসের টানে? পাগলামি? নিষ্কর্ম বাইগুলেপনার লোভ? কিংবা কবে কে একজন পারলৌকিক মুক্তির গুজব ছড়িয়ে গেছে, এরা সবাই ভেড়ার পালের মতন সেইদিকে ছুটছে?

এরা কী করে এবং কেন এত শারীরিক কষ্ট সহ্য করে, সেটাই প্রবীরের কাছে ধাঁধার মতন লাগে। আশ্রম বানিয়ে যে-সব সাধু মহারাজরা প্রচুর চেলা চামুণ্ডা সংগ্রহ করে, বড়লোকের বউদের দিয়ে পা টেপায়, তাদের কথা সে বোঝে। কিন্তু এই যে লোকগুলো, এরা ধর্মেরই বা কী জানে? এরা পার্থিব সুখ অস্বীকার করার মতন মনের জোর পায় কোথা থেকে?

মুরগির ঝোল, খাঁটি ঘিয়ের পরোটা আর আলু-ফুলকপির তরকারি দিয়ে ডিনার সারা হল। স্বদেশের এরই মধ্যে নেশায় ও ঘুমে চোখ টেনে আসছে। নিখিল প্রচুর টেনেও আবার খুলেছে দ্বিতীয় বোতল। তার সঙ্গে আরও দু একজন আছে।

সুখেন বলল, সাধুবাবার সামনে কয়েকটা চাপাটি আর তরকারি রেখে এসেছি। সাড়াশব্দ করল না অবশ্য।

প্রবীর চমকে উঠল।

স্বদেশ বললেন, লোকটা এখনো সেই এক জায়গায় বসে আছে? আই মাস্ট অ্যাডমিট, কল্‌জের জোর আছে।

সুখেন বলল, একে বলে স্যার সমুদ্রকল্প যোগ। চব্বিশ ঘন্টা টানা ধ্যান করতে হয়। একদিন অন্তর একদিন। প্রতিবছরই এইজন্য কয়েকজন আগে থেকে আসে।

স্বদেশ জোরালো গলায় বললেন, করুক, যার যা খুশি করুক। ঠিক বারোটায় লাইট্‌স অফ। নিখিল শেষ কর। অন্য ঘরে আলো জ্বললেও আমার ঘুম আসে না।

বৃষ্টির সেই বেগ কমে গেলেও একেবারে থামেনি। টিপটিপ করে পড়ছে এখনো। জানলার বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। যেন এই বাংলোটাকে হঠাৎ ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে প্রবীর শুয়ে পড়ল স্বদেশের পাশের খাটে। নিখিলরা অন্য ঘরে টর্চ জ্বেলে মদ্যপান চালিয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের ফিসফিস কথা ও হাসির শব্দ। এক সময় তাও থেমে গেল। স্বদেশ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকছেন।

প্রবীরের ঘুম আসছে না। সাধুটা বৃষ্টির মধ্যেও বসেছিল? উন্মাদ ছাড়া একে আর কী বলা যায়? এ যেন তার প্রতিই ব্যক্তিগত অপমান। সে তো অনেক কিছুই চায়। সাচ্ছন্দ্য চায়, ভালবাসা চায়, ভাল একটা বাড়িতে থাকতে চায়, রতি-সুখ চায়, ইচ্ছে মতন টাকা খরচ করতে পারলে আনন্দ হয়। আর ঐ লোকটা এসব কিছুই না চেয়ে বালির ওপর চোখ বুজে বসে থাকবে কেন?

মৃত্যুর পর আর কিছু নেই, যদি বা থাকেও তার সামান্যতম আভাসও পৃথিবীর মানুষ আজ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জানতে পারেনি। তবু বেঁচে থাকার মূল্যবোধকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর পরের পরমার্থের জন্য এমন হ্যাংলামি করে কেন মানুষ?

চার পেগ হুইস্কি খেয়ে প্রবীরের মাথা গরম হয়ে গেছে, সে বিছানায় ছটফট করছে।

এক সময় সে উঠে পড়ল। জগ থেকে ঢক ঢক করে জল খেল খানিকটা। তারপর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে, টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাথাটা একটু টলটল করছে প্রবীরের। স্কচ খাওয়া অভ্যেস নেই, প্রবীরের পক্ষে একটু বেশিই হয়ে গেছে। সে জোরে জোরে পা ফেলতে লাগল।

টর্চের আলো বুলিয়ে বুলিয়ে জায়গাটা খুঁজে পেয়ে গেল প্রবীর। সাধুটি সেখানেই রয়েছে, ঘুমোয়নি বা শুয়ে পড়েনি। একটা শালপাতার ঠোঙায় পাশে পড়ে আছে রুটি ও তরকারি, সে ছোঁয়নি বোঝা যায়।

আকাশ মেঘলা হলেও একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, আবছাভাবে চারপাশটা দেখা যায়। হয়তো সমুদ্রের একটা নিজস্ব আভা আছে।

সরকারি লঞ্চটি ফিরে গেছে নামখানায়, দিগন্তে ছবির মতন জাহাজটিও এখন অদৃশ্য। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের জীবন্ত শব্দ।

এখানে ওকে কেউ দেখছে না, তবু কেন এই কৃচ্ছ্রসাধনা? নাকি ওর ধারণা, আকাশ থেকে কেউ উঁকি মেরে দেখে?

ধ্যান করার জন্য কি চোখ বুজে থাকার কোনো দরকার আছে? চোখ মেলে সাধারণত দেখা যায় একটাই দৃশ্য, চোখ বুজে থাকলে দেখা যায় অনেক কিছু। যা খুশি! কিংবা এরা চোখ বুজে থাকতে থাকতে শুধু একটা কিছুরই চিন্তা করে, সেটাই দেখা অভ্যেস করেছে? কী সেটা, কোনো মূর্তি? পাথর কিংবা পেতলের একটা পুতুল?

বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেও বসে আছে এই মানুষটি, তাতে তার মুখে একটা গরিমা ফুটে উঠেছে ঠিকই, মাথার জটা ভেজা, সারা গা চকচক করছে। কিন্তু সে একেবারে নিঃসাড় নয়, প্রবীরের উপস্থিতিতেও টের পেয়েছে মনে হয়।

প্রবীর টর্চ নিবিয়ে দিল, সাধুটিকে ডাকল না। একটু দূরত্ব রেখে সে-ও বসে পড়ল ভিজে বালির ওপর। তারপর সে একটা সিগারেট ধরাল।

সে এখানে কেন এসেছে তা সে নিজেই জানে না। সাধুটিকে কোনো আঘাত দেবার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র নেই। সে কোনো প্রশ্নও করতে চায় না। যে-কোনো প্রশ্নেরই তো এ ধরাবাঁধা মুখস্থ বুলি শোনাবে। কিংবা এর যদি নিজস্ব কোনো উপলব্ধি থাকে, তা প্রকাশ করার ভাষা কি এর আয়ত্তে থাকতে পারে? মামুলি কথা শুনে লাভ কি?

একটা প্রবল কৌতূহল হয়েছিল, লোকটি এখনও বসে আছে কি না দেখার জন্য। লোকটি না থাকলেই যেন প্রবীর খুশি হত। এখন তারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

একজন চোখ বোজা মানুষের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। প্রবীর চোখ বুজল।

প্রথমে অন্ধকার। কালোর সঙ্গে একটু নীল মেশানো। একটু একটু কাঁপছে। তারপরেই সে দেখতে পেল কৃষ্ণের মুখ। বালক কৃষ্ণ। ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি, মাথায় ময়ূরের পালক, একেবারে জীবন্ত। সেই সঙ্গে সে যেন একটা গানও শুনতে পেল, 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে......'

প্রবীরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সাধু সংসর্গে এসেই তার কৃতিদর্শন হয়ে গেল! কী দারুণ ব্যাপার! ভগবানকে পাওয়া এত সহজ!

এটা আসলে কিছুদিন আগে দেখা 'মীরা' সিনেমার একটা টুকরো দৃশ্য। একটু পরেই বাংলা গানটা বদলে গিয়ে হল, ম্যায়নে চাকর রাখ জী, পাশ থেকে উঁকি মারল হেমা মালিনী!

তারপরেই সে দেখতে পেল, শত শত স্ত্রী-লোক উন্মুক্ত স্থানে বড় বাথরুম করতে বসে গেছে, একটু দূরে নাক কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বদেশদা। তারপর স্বদেশদা নিজের হাতে ল্যাট্রিনের ছাউনি বসাবার জন্য বাঁশ পুতছেন। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন পরিবর্তিত হচ্ছে দৃশ্য, শর্মিলা তরতর করে নেমে যাচ্ছে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে। তার স্তনদুটি দোলে, পিঠের ওপর ভিজে চুল........যখন একলা অন্যমনস্ক থাকে, তখন শর্মিলাকে বেশি সুন্দর দেখায়.......। বাবা বাজার করে ফিরলেন, কাঁধ দুটো ঝুলে গেছে, চোখের নিচে কালো দাগ.......

এক সময় প্রবীরের চোখে জল এসে গেল। নিজেই সে বুঝতে পারল না, তার হঠাৎ কান্না পাচ্ছে কেন? কেনই বা এখানে সে ঠাণ্ডার মধ্যে বসে আছে। নেশার ঝোঁক, তা ছাড়া আর কী! এই সাধুটিও সেরকম কোনো নেশাতেই মেতে আছে? গাঁজার চেয়েও উঁচুদরের কিছু? আত্ম-নির্যাতনের নেশা? এক ধরনের মেসোবিজ্‌ম।

প্রবীরের এক একবার মনে হচ্ছে, সে যদি এর মতন হতে পারত! পরমার্থের প্রত্যাশী হয়ে নয়। এইরকম সমুদ্রের ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকার মতন বৈরাগ্য তাকে আকর্ষণ করছে। কিছুই না চাওয়া। চাকরিতে উন্নতি নয়, প্রেমের জন্য কাঙালপনা নয়, সংসারের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি.....। আসলে কি প্রবীর সত্যিই এরকম হতে চায়? না, এক ধরনের ইচ্ছের বিলাসিতা। কোনো সুন্দর বাচ্চাছেলেকে খেলা করতে দেখলে হঠাৎ যেমন মনে হয়, আহা যদি ওই বয়েসটায় ফিরে যেতে পারতুম! আসলে কেউই শৈশবে ফিরে যেতে চায় না। পরিণত বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে শৈশবে ফিরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসবে!

এই ধরনের সাধুরা, কিংবা প্রতিদিন দেখা অজস্র সংসারি মানুষও তো প্রায় শৈশবের স্তরেই রয়ে গেছে। সভ্যতার অনেক নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সন্তুষ্ট। মূর্তিহীন যে শিল্প, কাহিনী বা বক্তব্যহীন যে কাব্য, কথাহীন যে সঙ্গীত, তার মর্ম, তার যে নিগূঢ় উপভোগ, তা এরা জানলোই না। একটি নারীকে পাওয়া কিংবা না-পাওয়া নয়, অতি সামান্যক্ষণের জন্য চোখে চোখ রাখলে যে মাধুর্যের তরঙ্গ, তার মূল্য কি কম! জীবনে পরম পাওয়ার চেয়ে তাৎক্ষণিক ছোট ছোট পাওয়ার যে মূল্য অনেক বেশি, মানুষের সভ্যতাই তা শিখিয়েছে, তবু বহু মানুষ এখনো তা জানল না।

সিনেমার কৃষ্ণ নয় চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে যদি কোনো ভেলকির দৃশ্য দেখা যায়, তাতেই বা কী আসে যায়? এই শরীর, এই আয়ুকে অস্বীকার করে মানুষ আর বেশি কী পেতে পারে!

চোখ খোলার কি কোনো শব্দ আছে? প্রবীর যেন সেই রকমই একটা শব্দ পেল। সে নিজে চোখ মেলে দেখল, সাধুটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার একটু শিহরণ হল প্রবীরের। যদি সত্যিই নর্থ বিহারের খুনি হয়?

তারপরেই সে ভয়টা কাটিয়ে উঠল। সাধুটির দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিস্মিত কৌতূহল।

প্রবীর কোনো কথা বলল না, তার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এই সাধুটি যদি কিছু জানতে চায় তো প্রশ্ন করুক।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘ সরেছে, মাথার ওপর এক ঝলক শীতের আকাশ, চাপা অন্তরীক্ষের আলো। সমুদ্র বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ওরা তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

কোনো কথা নেই, কথার কোনো প্রয়োজনও নেই বোধহয়।

প্রবীর বুঝতে পারল, অনেক ব্যর্থতা, ভুল ঠেলে ঠেলে জীবনটাকে নির্মাণ করে যেতে হবে। সেই এগিয়ে যাওয়াটাই একটা রোমাঞ্চকর অভিযান। যার সেই অভিযান সম্পর্কে আগ্রহ নেই, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করুক। সে ওতেও আনন্দ পাচ্ছে। তবে সেও নির্লোভ, সর্বত্যাগী নয়, সেও কিছু চাইছে। সেও পারলৌকিক অলীকের কোনো চরম পাওয়ার জন্য আত্মনিগ্রহ করে যাচ্ছে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই, গ্রামীণ সভ্যতার আমল থেকেই চলে আসছে এমন।

সাধুটির ওষ্ঠে কোনো কাঠিন্য নেই, তাই প্রবীরও মুখখানা হাসি হাসি করে রেখেছে। প্রবীরের গায়ে একটা শাল জড়ানো, এই লোকটি খালি গায়ে, এরা দু জনে যেন দুই ভূমণ্ডলের প্রতিনিধি।

এই লোকটির মতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে ধ্যান করার প্রবৃত্তি নেই প্রবীরের। কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে থাকতে সে অনায়াসেই পারে অনেকক্ষণ। পকেট থেকে সে সিগারেট দেশলাই বার করলে, কিন্তু সাধুটির দিক থেকে চোখ সরাল না। দেখ, তুমি আমাকে দেখ, আমিও তোমায় দেখছি। তোমার যদি বিশ্বাসের প্রবল শক্তি থাকে, আমার অবিশ্বাসের জোরও কম নয়। তুমি এই জীবনটা বাউণ্ডুলের মতন ঘুরে ঘুরে চাইছ পরবর্তী জীবনের অমূল্য আশ্রয়। আমি বিবর্তনের চক্রে পাক খেতে খেতে এখানে এসে পৌঁছেছি, আমি জানি, মানুষের কোনো আশ্রয় নেই, সে নিজেই ক্রমশই অতি মানব থেকে অতি মানবতর হতে থাকবে, যদি না তার আগে সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে।

ওরা দুজনে চেয়ে আছে, শুধু চেয়ে আছে।

কতক্ষণ পর, এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা সাধুটিই আগে উঠল। সোজা এগিয়ে গেল জলের দিকে। প্রবীর জলের তোলপাড় শব্দ শুনতে পেল, সাধুটি স্নান করছে! এই মধ্য ডিসেম্বরের শেষ রাতে। হয়তো ভালই লাগে। কারুর লেপের তলায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে। কারুর ঠাণ্ডা জলে।

সাধুটি আবার নিজের জায়গায় ফিরে বসল। এখন সে গুণগুণ করে গানের মতন একটা শব্দ করত। খুব শীত লাগলে সম্পূর্ণ বেসুরে মানুষের গলা থেকেও এরকম আওয়াজ বেরোয়। প্রবীর লক্ষ করল, সাধুটি রীতিমতন কাঁপছে এখন।

সে শালপাতার ঠোঙা খুলে খাবার খেতে শুরু করল। তার খাওয়ার ভঙ্গিটি শিশুর মতন। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে সে দেখছে প্রবীরকে। এখন তার চোখের ভাষা বোঝা অনেক সহজ।

প্রবীর উঠে গিয়ে তার শালটা খুলে সাধুটির গায়ে জড়িয়ে দিল। সে আপত্তি করল না। দ্রুত খাবারগুলো শেষ করে লাজুক গলায় বললো, একঠো সিগ্রেট!

প্রবীর সিগারেট দিয়ে খুব বন্ধুর মতন ভঙ্গিতে দেশলাই জেলে নিয়ে গেল তার মুখের কাছে।

আসলে তো ওরা অনেকদিনের চেনা!

দুই বন্ধু

ন মাসে ছ মাসে সত্যচরণ একবার করে আসেন বন্ধু সদাশিবের সঙ্গে দেখা করতে।

দুজনেরই বয়েস এখন আশি ছুঁই-ছুঁই। সদাশিবের তুলনায় সত্যচরণ এখনো বেশ শক্তসমর্থ আছেন, দিব্যি একাই হেঁটে চলে আসেন নারকেলডাঙা থেকে ভবানীপুর। ভিড়ের ট্রামে-বাসে চড়তে-নামতেই বরং তাঁর অসুবিধে হয়। হাঁটার অভ্যেসটা তাঁর বরাবরের।

সদাশিব নিজস্ব গাড়ি চালিয়েছেন যৌবন বয়েস থেকেই। এক সময় তাঁর স্টুডিবেকার গাড়ি ছিল। হাঁটা দূরের কথা, তিনি ট্রাম-বাসেও চেপেছেন জীবনে খুবই কম। হয়তো সেই কারণেই তাঁর দুটো হাঁটুই গেছে, এখন সিঁড়ি দিয়ে একটুখানি উঠতেই প্রবল কষ্ট হয়। সেইজন্য তিনি তিনতলাতেই বসে থাকেন প্রায় সর্বক্ষণ।

সত্যচরণের রোগা, লম্বা চেহারা। হাতে সব সময় একটা ছাতা থাকে, সেই ছাতাটাই তাঁর লাঠির কাজ করে। তিনি অবশ্য ধুতির বদলে প্যান্ট-শার্ট পছন্দ করেন, বরাবর একটা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করেছেন বলেই। এখন অবশ্য তাঁর বড় ছেলেরই প্রায় রিটায়ার করার বয়স হয়ে গেল।

সন্ধের সময় তিনি ভবানীপুরে এসে বন্ধুর বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন, সদাশিব! সদাশিব!

এ বাড়ির গেটে কলিং বেল আছে, কিন্তু সে কথা মনে থাকে না সত্যচরণের। বরাবর এই রকম চেঁচিয়ে ডাকাই অভ্যেস।

সদাশিবের বাড়িটা বেশ বড়। নাতি-নাতনি, ভাগে-ভাগ্নি নিয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশজনের সংসার। প্রেসের ব্যবসা করে সদাশিব প্রচুর সম্পত্তি করেছেন। সে ব্যবসা এখনো ভালোই চলছে। দুই ছেলে সেই ব্যবসা দেখে, কিন্তু এই বয়সেও সদাশিব সব কিছুর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন নি। নিজে আর প্রেসে যেতে পারেন না, তবু ঘরে বসেই টেলিফোনে সব খবরাখবর নেন, নির্দেশ পাঠান। এখনও পাঁচ হাজার টাকার বেশি অঙ্কের সই করার অধিকার শুধু তাঁর একার।

সত্যচরণকে এ বাড়ির সবাই চেনে, সবাই খাতির করে। তিনি এ বাড়ির কর্তাবাবুর বন্ধু। একমাত্র প্রাণের বন্ধু বলা যেতে পারে। সদাশিবের সঙ্গে সত্যচরণের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই, ব্যবসার সম্পর্ক নেই। কোনোদিন তিনি সদাশিবের প্রেস থেকে বিনা পয়সায় নিজের নামের একটা প্যাডও ছাপান নি। বরং যেদিনই তিনি এ বাড়িতে আসেন, কুড়ি-পঁচিশ টাকার একটা মিষ্টির হাঁড়ি আনেন বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্য।

সন্ধের পর সদাশিব বেশ কিছুক্ষণ পুজো-আচ্চায় কাটান। তিন-তলাতেই ঠাকুরের ঘর। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করেন সদাশিব। এক এক সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তাঁদের পরিবার আগে ছিল শাক্ত, কিন্তু সদাশিব বৈষ্ণব হয়েছেন অনেকটা। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর শোবার ঘরে মস্ত বড় একটা কৃষ্ণের ছবি।

এই বয়েসেও অবশ্য সত্যচরণের ধর্মে মতি হয় নি। তাঁর পুজো-আচ্চার বালাই নেই। বাড়ি থেকে না বেরুলে তিনি সন্ধের সময় থেকে একমনে টিভি দেখেন, একেবারে শেষ পর্যন্ত।

দুই বন্ধুর স্বভাবে কিংবা জীবনযাত্রায় প্রায় কোনো মিলই নেই। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। তবু, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দুজনের বন্ধুত্ব টিকে আছে, কখনো বড় রকমের মনোমালিন্য হয়নি। বেশ কিছুদিন পরস্পরকে না দেখলে দুজনেই ছটফট করেন।

তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেও সত্যচরণ ডাকেন, সদাশিব! সদাশিব!

বন্ধুর ডাক শুনলেই সদাশিব পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। পুজো শেষ হোক বা না হোক। খুশিতে ঝলমল করে তাঁর মুখ। তিনি হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন, এসো সতু, এসো! এবার অনেকদিন পর এলে!

তারপর তিনি বন্ধুকে নিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন!

দুই বৃদ্ধের এমন কি গোপন কথা থাকতে পারে, যা দরজা বন্ধ করে বলতে হবে? সদাশিবের ছেলেমেয়েদের ধারণা, ওঁরা দুজনে ওই সময় মদ খান!

তা এই বয়েসে এত ঢাক ঢাক গুড়গুড়েরই বা দরকার কী? সদাশিব এ বাড়ির বড় কর্তা, তিনি মদ খেলেই বা কে আপত্তি করবে? তাঁর স্ত্রীও বেঁচে নেই। দুই ছেলেই নিয়মিত মদ্যপান করে। আজকাল বড় বড় কোম্পানির অর্ডার আদায় করতে গেলে পার্টি দিতে হয়। আর পার্টিতে কি মদ ছাড়া চলে?

সদাশিবের ঘরের দেয়াল-আলমারিতে সত্যিই থাকে রকমারি মদের বোতল। কিন্তু তিনি মাসের পর মাস মদ ছুঁয়েও দেখেন না। একমাত্র সত্যচরণ এলেই দুটি গেলাস নিয়ে বসেন। সে সময়ে তাঁর ঘরে অন্য কারুর ঢোকা নিষেধ।

সত্যচরণ জীবনে কখনো দু পেগের বেশি মদ্যপান করেননি এক বৈঠকে। নেশা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিন আবার তো হেঁটেই ফেরেন নারকেলডাঙায়। কোনোদিন তাঁকে কেউ বেচাল হতে দেখেনি।

এতদূর থেকে আসেন তিনি, সদাশিবও তাঁকে দেখলে যথার্থ খুশি হন, তবু দুই বন্ধুর গল্প করার ধরনটা অদ্ভুত!

প্রথমে পারিবারিক কুশল প্রশ্ন, তারপর দু'জনের শারীরিক খবরাখবর তো বিনিময় হবেই। তাও বেশ সংক্ষেপে ও মৃদু গলায়, তারপর দুজনেই চুপ।

এই বয়েসে বোধ হয় সামনাসামনি বসলেই অনেক কিছু বোঝাবুঝি হয়ে যায়, মুখে আর কিছু বলার দরকার হয় না।

অনেকক্ষণ পর দ্বিতীয় পেগ প্রায় অর্ধেক শেষ করার পর সদাশিব হঠাৎ বলে ওঠেন, তা হলে ওটা কুকুরই ছিল, কী বলো, সতু?

সত্যচরণ মাথা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিলেন, না হে, অত ছোট প্রাণী তো নয়! কুকুর হবে কী করে?

সদাশিব আরও জোর দিয়ে বলেন, অনেক বড় সাইজের কুকুরও হয়। মনে করো, ওটা অ্যালসেশিয়ান!

সত্যচরণ বলেন, ওই ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে কে অ্যালসেশিয়ান পুষবে? অত রাতে লোকের পোষা দামী কুকুর রাস্তায় ছাড়া থাকবেই বা কেন?

সদাশিব ব্যগ্রভাবে বললেন, তবে কি গাধা? হ্যাঁ, গাধাই হবে নিশ্চয়। ওদিকে ধোপাটোপারা থাকে।.

সত্যচরণ আর কিছু না বলে মুচকি মুচকি হাসেন। এবার তাঁর ওঠবার সময় হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে দুই বন্ধুর প্রায় এই একই ধরনের আড্ডা চলে আসছে। শেষের দিকে উত্তেজিত ভাবে সদাশিব বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন, আমি বলছি ওটা গরু ছিল না। গাধা কিংবা কুকুর? এমন কি ছাগলও হতে পারে.....

সত্যচরণ আর কোনো কথা বললেন না।

সদাশিব ব্যাকুল ভাবে বলেন, বিশ্বাস করো, সতু, আমি গো হত্যা করিনি! আমি নিজের চোখে দেখেছি.....

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার এক ঘটনা। তখন সদাশিবের একটা বাগানবাড়ি ছিল মধ্যমগ্রামে। সেই বাড়িটা এখনও তাঁর আছে, তবে বাগান আর নেই, ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে শনিবার সন্ধেতে সদাশিব বন্ধুবান্ধব নিয়ে সেই বাগানবাড়িতে যেতেন ফুর্তি করতে। মেয়েঘটিত দোষ তাঁর ছিল না, গান-বাজনার খুব শখ ছিল। ওইখানে মদ্যপানের সঙ্গে গান-বাজনারই চর্চা হত।

একবার বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তা প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। সত্যচরণকে পাশে বসিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন সদাশিব। ঈষৎ নেশা হলেও তাঁর হাতে স্টিয়ারিং ঠিক ছিল। কথা বলছিলেন একটু বেশি, সিগারেট টানছিলেন ঘন ঘন।

গঙ্গানগরের মোড়টার কাছে গাড়ি ঘোরাতে যাবেন, এমন সময় আচম্বিতে সাদা সাদা মতন কী যেন একটা দৌড়ে এল রাস্তার মাঝখানে। সদাশিব ব্রেক কষতে একটু দেরি করে ফেললেন, অত ভারি গাড়িতে মড়মড় করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হল।

সদাশিব হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, কী হল, সতু, কী হল, কী চাপা দিলাম?

একটু দূরেই মাঠের মধ্যে যাত্রাপালা হচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মঞ্চটা, নাকি-নাকি গলায় পুরুষেরা ফিমেল পার্ট করছে, তখনও যাত্রায় আসল মেয়েদের নেওয়াটা চল হয় নি। কয়েক হাজার লোক মুগ্ধ হয়ে শুনছে সেই যাত্রা, তারা ব্রেক কষার কর্কশ শব্দটা শুনতে পেয়েছে।

এই বুঝি তেড়ে তেড়ে আসবে দলে দলে মানুষ!

সামান্য একটা ছাগল চাপা দিলেও এখন লোকে একশো দুশো টাকা দাবি করে। পাড়ার কুকুর মরলেও তাদের শোক উথলে উঠে।

সত্যচরণ বন্ধুকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, থেমে রইলি কেন? লোকের হাতে মার খেয়ে মরবি যে! শিগগির স্টার্ট দে!

সদাশিব তবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলেছিলেন, কী চাপা দিলাম?

সত্যচরণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওটা একটা গরু! শিগগির চল!

যাত্রার শ্রোতারা রাস্তায় এসে পৌঁছবার আগেই সদাশিব গাড়ি স্টার্ট দিলেন আবার, হুশ করে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজন লোক ইট ছুঁড়ে মেরেছিল, তাও গাড়িতে লাগে নি।

বিপদ হল না আর কিছু। কেউ কিছু জানতেও পারল না।

তারপর থেকেই সদাশিব নিজে গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতে এখন দুজন ড্রাইভার। মধ্যমগ্রামের সেই বাড়িতেও আর কখনো ফূর্তি করতে যাওয়া হয় নি।

সদাশিব বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি একটা গরুকে চাপা দিয়েছিলেন। এমন কিছু নয়।

বছর কয়েক পরে তাঁর মনে খটকা লাগল। গো-হত্যা তো মহাপাপ। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কিন্তু সত্যিই কি সেটা গরু ছিল? সত্যচরণের মুখের কথা ছাড়া আর কী প্রমাণ আছে? গরু চাপা দিলেও পাবলিক রেগে যায়, গাড়িকে তাড়া করে। সেই জন্যই কি সত্যচরণ বলেছিলেন গরুর কথা? কিন্তু একটা ধোপার গাধাকে যদি চাপা দেওয়া হয়, সে রাগ করে তেড়ে আসবে না? কিংবা যদি কারো বাড়ির পোষা কুকুর হয়? অনেক সময় পাড়ার একটা নেড়ি কুত্তাও কিছু মানুষের বড় ন্যাওটা হয়ে যায়, সেই কুকুরটা অপঘাতে মরলেও তারা দুঃখ পায়!

সেই দুর্ঘটনার কথা সদাশিব এ পর্যন্ত আর কারুকে ঘুণাক্ষরেও বলেননি। শুধু সত্যচরণ ছাড়া আর কেউ জানে না। সত্যচরণও নিজে থেকে কখনো তোলেন না সেই প্রসঙ্গ।

গরু চাপা দেবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে তো স্বীকার করা হয়েই গেল যে তিনি গো-হত্যা করেছেন। সারাজীবন সেজন্য কি একটা অনুশোচনা থেকে যাবে না? কিন্তু কুকুর কিংবা গাধা হলে প্রায়শ্চিত্তও করার প্রশ্ন নেই, অনুশোচনাও হবে না। একমাত্র সত্যচরণই পারে সেটা ঠিক করে দিতে।

কিন্তু সত্যচরণ সেই যে একবার গরু বলেছে, আর কিছুতেই ফেরাবে না সে কথা!

সত্যচরণের ছেলের বিয়ের সময় সদাশিব তাঁর বরানগরের একটা ছোট বাড়ি তাঁকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। সত্যচরণ হেসে বলেছিলেন, পাগল নাকি! তোর বাড়ি নিতে যাব কেন, সদু? ছেলের যদি যোগ্যতা থাকে, সে নিজেই একদিন বাড়ি করবে।

সত্যচরণ চাকুরীজীবী ছিলেন, চিরকাল ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে গেলেন। তাঁর ছেলেও আজও বাড়ি করতে পারে নি।

সত্যচরণের ছোট মেয়ের সঙ্গে সদাশিবের নিজের মেজ ছেলের বিয়ে দেবার জন্য খুব উঠে পড়ে লেগেছিলেন। দুই পরিবারে জাতেরও অমিল নেই, থাকলেও সদাশিব বোধহয় গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুর চেয়ে বড় জাত আর হতে পারে নাকি? সে বিয়ের ব্যাপারে সত্যচরণ উৎসাহও দেখাননি, আপত্তিও করেননি। পরে জানা গেল, সেই মেয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধুকে পছন্দ করে বসে আছে। সত্যচরণ মেয়েকে শাসন করে, সেই সম্পর্ক ভেঙে, বন্ধুর ঘরে কন্যা দেয়ার জন্য কোন উদ্যোগ নিলেন না, মেয়ে সেই সহপাঠীকে বিয়ে করেই দিল্লি চলে গেল।

সত্যচরণের মতিগতি বোঝা বড় শক্ত।

মাঝে মাঝে সদাশিবের সন্দেহ হয়, তিনি গো হত্যাকারী এই ভেবেই কি সত্যচরণ তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না এ বাড়িতে? তাঁর বন্ধু কি তাঁকে মনে মনে ঘৃণা করে? কিন্তু সত্যচরণ নিজে থেকেই তো আসেন এই বাড়িতে বন্ধুর খোঁজ নিতে।

এক শীতকালের সন্ধেবেলা সত্যচরণ আবার নারকেলডাঙা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলেন ভবানীপুরে। এসে দেখলেন, সদাশিবের বাড়িতে যেন কিসের হুলুস্থূল। বাড়ির সামনে দু খানা অন্য লোকের গাড়ি। কিছু লোক ব্যস্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে আসছে যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বসে আছে এক দঙ্গল লোক।

সত্যচরণ রাস্তা থেকে বন্ধুর নাম ধরে ডাকবার আগেই সদাশিবের মেজ ছেলে আদিত্য হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এই যে সত্যকাকা, আপনি এসে গেছেন? আপনার বাড়িতে টেলিফোন করেও লাইন পাইনি, একজন লোক পাঠাচ্ছিলুম।

সত্যচরণ বিপদের গন্ধ পেলেন। তবে কি এরই মধ্যে সব শেষ?

আদিত্য বলল, আজ বেলা এগারোটায় বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কলকাতার সবচেয়ে বড় দুজন স্পেসালিস্টকে ডেকে এনেছি, কিন্তু কী মুশকিল বলুন তো, একজন বলছেন, এই অবস্থায় রিমুভ করাটা খুব রিস্কি। আর একজন বলছেন, নার্সিং হোমে নিয়ে না গেলে ঠিক চিকিৎসা হবে না। এখন কী করি বলুন তো! এদিকে বাড়ির সবাই আর আত্মীয়স্বজনেরাও দু রকম বলছেন। বড়দা এখানে নেই, সব দায়িত্ব আমার। এখন যাচ্ছি, একজন থার্ড ডাক্তারের ওপিনিয়ান নিতে।

সত্যচরণ জোর করে নিজের মতামত জাহির করেন না। তা ছাড়া এইসব ব্যাপারে ডাক্তাররাই ভাল বুঝবে। তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবার সঙ্গে কি দেখা করা যাবে? দেখা করা ঠিক হবে?

আদিত্য বলল, এখন ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি চলে যাবেন না। বুকে ব্যথার সময় বাবা বার বার আপনার কথা বলছিলেন। আপনি বরং বাবার কাছে গিয়ে একটু বসুন।

সত্যচরণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন ধীরে ধীরে। তিনি ভাবলেন, যথেষ্ট বয়স হয়েছে সদাশিবের, নার্সিংহোমে হাসপাতালে যাওয়ার আর কী দরকার, বাড়িতে আপনজনদের মুখ দেখতে দেখতে শান্তিতে চলে যাওয়াই তো ভাল!

তাঁর মনে হল, এবার বোধহয় তাঁরও দিন ঘনিয়ে এসেছে!

গরম নেই আর তেমন, একটু বরং ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবই পড়েছে, তবু সদাশিবের শিয়রের কাছে বসে পুরনো আমলের ঝালর দেওয়া পাখা দিয়ে বাতাস করছে তাঁর এক পুত্রবধূ। অন্য এক পুত্রবধূ সদাশিবের পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এর কোনোটাই দরকার নেই, তবু এ সব সেবার চিহ্ন। সদাশিব উইল করে রেখেছেন কিনা, তাই-ই বা কে জানে!

সত্যচরণ একটা চেয়ার টেনে বসলেন, সদাশিবের দুই পুত্রবধূ তাঁকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানার একটা ভঙ্গি করল। এ বাড়িতে এখনো এসব প্রথার চল আছে। সদাশিব চলে গেলে আর থাকবে না।

চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন সদাশিব। মুখে স্পষ্ট আসন্ন মৃত্যুর রং। তবে আজকালকার কড়া ওষুধে এই অবস্থা থেকেও অনেকে বেঁচে উঠে আরও দু চার বছর হেসে কেঁদে কাটিয়ে যায়।

প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই সদাশিবের জ্ঞান ফিরে এল কিম্বা ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই সত্যচরণকে দেখে তিনি স্পষ্টত খুশি হয়ে উঠলেন। দুই পুত্রবধূকে তিনি বললেন ঘরের বাইরে যেতে। তারা কিছুটা আপত্তি জানিয়েও চলে যেতে বাধ্য হল।

সত্যচরণকে আরও কাছে আসার ইঙ্গিত করে সদাশিব ফিসফিস করে বললেন, তোকে কেউ খবর দিয়েছে?

সত্যচরণ চেয়ারটা টেনে এনে বললেন, না, আমি আগে খবর পাইনি। এমনিই চলে এলাম।

সদাশিব বললেন, আমি আজ সারাদিন তোকে মনে মনে ডেকেছি, তাই তুই আসতে বাধ্য হয়েছিস, সতু! তুই না এলে মরেও আমার শান্তি হত না। দরজাটা বন্ধ করে দে। ওই আলমারিতে দ্যাখ হুইস্কি আছে, গেলাস আছে।

বন্ধু, এতখানি অসুস্থ, সেই অবস্থায় তাঁর পাশে বসে সত্যচরণ মদ্যপান করবেন, এ কী অদ্ভুত প্রস্তাব!

সত্যচরণ মাথা নেড়ে বললেন, না, আজ আর ওসবের দরকার নেই।

সদাশিব কাতরভাবে বললেন, তুই একটু খা, সতু। তাতে আমার তৃপ্তি হবে। এতকাল আমরা একসঙ্গে.....আজ তুই শুধু শুধু বসে থাকবি, তা কি হয়?

সত্যচরণ দৃঢ়ভাবে বললেন, সে প্রশ্নই ওঠে না। তুই ভাল হয়ে ওঠ, তারপর আবার আমরা একসঙ্গে বসে খাব।

সদাশিব বললেন, ভাল হয়ে উঠব? হ্যাঁ, কিন্তু যদি এ যাত্রা না উঠি? মাথায় একটা পাপের বোঝা নিয়ে চলে যাব? সতু, এখন অন্তত সত্যি করে বল, ওটা কি গরুই ছিল, না অন্য কোনো জানোয়ার?

সত্যচরণ চুপ করে রইলেন।

সদাশিব মাথাটা একটু উঁচু করে বললেন, সতু, তুই একবার সেদিনের ঘটনাটা ভাল করে ভেবে বল।

সত্যচরণ তবু চুপ করে রইলেন। মধ্যমগ্রাম থেকে সেই রাতে ফেরার ঘটনাটা তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

সদাশিব দুর্বল হাতখানি তুলে বন্ধুর গায়ে রেখে বললেন, আর কেউ না জানুক, তুই তো জানবি, আমি গো-হত্যার পাপ মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি! কিন্তু তোর তো ভুল হতেও পারে, সেদিন অন্ধকার রাত ছিল, অমাবস্যার ঠিক পরের দিন.....

সত্যচরণ এক দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মৃত্যুপথযাত্রীকে যে-কোনো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে দোষ নেই। তিনি মৃদু হেসে বললেন, তোর সঙ্গে আমি এতকাল ঠাট্টা করতুম রে। সেটা ছিল আসলে একটা গাধা। কুকুর-টুকুর না, গাধা! স্পষ্ট দেখেছি! তুই গো-হত্যা করিস নি। গাধারা তো এরকম মরেই!

একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সদাশিব। দু চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল জল। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি তোশকের তলা থেকে টেনে বের করলেন একটা বড় খাম। তার মধ্যে অনেককালের পুরনো একটা মলিন খবরের কাগজের কাটিং। সেটা সদাশিব ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। তিনি যে গো-হত্যা করেন নি, তার অকাট্য প্রমাণ এতদিন তাঁর কাছে জমা ছিল।

ওই কাগজের কাটিংটা সত্যচরণের চেনা। তাঁর কাছেও একটা আছে। ওই কাগজে ছাপা হয়েছিল গঙ্গানগরের মোড়ে সেই নিহত যুবকটির ছবি।

পাখির মা

ছেলেটা বিশেষ কথা বলে না। বেড়ার বাইরের পেঁপে গাছটা জড়িয়ে ধরে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খোঁড়ে। একটা আট হাত ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা। খালি গা বেশ তেল চকচকে কালো। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সেই চুলে লাল পট্টি বাঁধা, তাতে আবার গুঁজেছে শকুনের পালক। বয়েস বাইশ তেইশের বেশি না।

উঠোনটা ঝাঁট দিতে দিতে মঙ্গলা মুখ তুলে তৃতীয়বার বলল, আজ কিছু নেই রে!

উঠোনের এক কোণে প্যাঁক প্যাঁক আর হ্যাঁস হ্যাঁস করছে তিনটে হাঁসা আর হাঁসী। তেঁতুল গাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় বসে আছে কুকুরটা। ধানের গোলার পাশে খাটিয়া পেতে বসে পুরনো খবরের কাগজ লম্বা করে মেলে পড়ছে জগদীশ। ভাঁজ করা লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা, তার একটা পা অস্বাভাবিক সরু, জীবনে কখনো সে সোজা হয়ে দু পায়ে হাঁটেনি।

জগদীশ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কে এসেছে? কী চাই?

মঙ্গলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ডুরে শাড়ির আঁচলে মুখটা মুছে বলল, ও সেই লোধাদের ছেলেটা। ডুলুং।

একটা আতা গাছের আড়াল পড়েছে বলে জগদীশ ছেলেটিকে ঠিক দেখতে পাচ্ছেনা। তার ভুরুদুটো ঘোঁচ হয়ে গেল, সে নিম্নস্বরে বলল, ওকে দিয়ে আজ কী করাবে?

মঙ্গলা উত্তর দিল, সেই তো বলছি, আজ কোনো কাজ নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছে।

এটা হাসির কথা নয়, তবু মঙ্গলা হাসল। অত বড় একটা জোয়ান ছেলে, তবু যেন সব কথার মানে বোঝে না। পেঁপে গাছতলায় নখ দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে সে একটা গর্ত করে ফেলেছে।

জগদীশ বলল, ওকে যেতে বলে দাও। বলো, দু'তিন মাসের মধ্যে আমাদের আর লাগবে না।

কুকুরটা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল বেড়ার দিকে।

কুকুরটাকে অ্যাই চুপ মার বলে মঙ্গলা ডাকল, কমলা একবাটি মুড়ি নিয়ে আয় তো!

জগদীশ দাঁতে দাঁত পিষে বলল, আবার ওকে মুড়ি খাওয়াবে?

মঙ্গলা তো গ্রাহ্য করল না। জমি-জিরেত, টাকাপয়সার ব্যাপারে সে যেমন তার স্বামীর মতামতের প্রতিবাদ করে না, সেইরকম সংসারের জিনিসপত্র, কিংবা কে কী খাবে সে ব্যাপারেও সে জগদীশের মতামতের মূল্য দেয় না।

ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরী কমলা একটা কলাই করা বাটিতে নিয়ে এল মুড়ি। সে আগেই ডুলুংকে দেখেছে, মুড়ির সঙ্গে তিনটে পেঁয়াজ আর গোটা দশেক কাঁচা লঙ্কাও এনেছে।

বেড়ার ধারে গিয়ে বললে এই নাও!

হাতের টাঙ্গিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ডুলুং প্রথমে দু হাত অঞ্জলিবদ্ধ করল, তারপর মুড়ির পরিমাণ অনেকটা দেখে সে ধুতির কাছাটা খুলে মেলে ধরল।

এ রকম একটা শক্ত সমর্থ পুরুষকে ভিক্ষের মতন মুড়ি দিতে কমলার খারাপ লাগে, আবার ডুলুং-কে সে একটু ভয়ও পায়। কেমন যেন খয়েরি ধরনের চোখ, তাতে রাগ রাগ ভাব।

মুড়ি পেয়েই পুঁটুলি বেঁধে মাঠের দিকে নেমে গেল ডুলুং। উঠোনে এসে হাসিতে ফেটে পড়ল কমলা, মঙ্গলাও কোমরে হাত দিয়ে হাসতে লাগল। জগদীশ মন দিয়ে আবার কাগজ পড়ছে।

সপ্তাহ দু-এক আগে ধান সেদ্ধ করার সময়ে অনেক কাঠের দরকার পড়েছিল। এদিকে পাটকাঠি পাওয়া যায় না। এদের বাগানেই একটা জারুল গাছে উই ধরে ফোঁপরা অবস্থায় ছিল, সেটাকে আর রেখে লাভ নেই, কিন্তু অত বড় গাছটাকে চ্যালা করবে কে? বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে তো ওই একজন, জগদীশ, তার এক পায়ে জোর নেই, সর্বক্ষণ বসে থাকে বলে ইদানীং তার কোমরেও জোর কমে গেছে।

লোধাদের এই ছেলেটা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, তাকে ডেকেছিল মঙ্গলা। তা এক বেলাতেই ছেলেটা জারুল গাছটাকে কেটে কুটি কুটি করে ফেললে। তার বদলে পাঁচটা টাকা দিতেই সে খুশি!

এদের একটা জমিতে মুড়ির ধান হয়। মঙ্গলা সেদিন মুড়ি ভাজছিল। ডুলুং অত খাটল, তাকে কিছু মুড়ি খেতে দেওয়া হল। সে একখানা দৃশ্য বটে!

ছেলেটার ডান-বাঁ জ্ঞান নেই, সে দু হাতে মুড়ি খায়। প্রায় চোখের নিমেষে এক বাটি মুড়ি শেষ। আর দুটি দেব? সে ঘাড় হেলাল।

বাঘা ঝাল কাঁচা লঙ্কা সে এমন কচ কচ করে চিবোয় যেন টিয়াপাখি, তার ঝালের কোনো বোধই নেই। আবার মুড়ি দেওয়া হল, তাতে সে, জল ঢেলে দলা পাকিয়ে খেতে লাগল, যেন আগে কখনো সে মুড়ির মতন অমৃত খায়নি! বড় মজা হয়েছিল সেদিন।

লোধাদের ছেলেদের দিয়ে কাজ করানো পছন্দ হয়নি জগদীশের। ওদের একবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলেই সব ঘাঁত-ঘোঁত জেনে যায়। তারপর কখন এসে যে চুরি করে সব ফাঁক করে দেবে, তার ঠিক নেই। তা ছাড়া এ বাড়িতে কখনো জন খাটাবার দরকার হলে পরিচিত সাঁওতাল পরিবার থেকে ডাকা হয়, অন্য গ্রামের লোধাদের কাজ দিলে সাঁওতালরা চটে যাবে!

তা নিত্যি নিত্যি কীই-বা এমন কাজ থাকে। তবু ছেলেটা খোঁজ নিতে আসে, বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কথা বলে না, কোনো দাবি জানায় না। তাকে একবাটি মুড়ি দিলে সে খুশি হয়ে চলে যায়। কাজের খোঁজে, না মুড়ির লোভে সে আসে? মুড়ি কি আর কোথাও পাওয়া যায় না?

একদিন মঙ্গলা বাড়ি ছিল না, কনক-দুর্গার মন্দিরে মানতের পুজো দিতে গিয়েছিল। ওই ডুলুং বেড়া ঠেলে ঢুকে পড়েছিল উঠোনে, পেঁপে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বোধ হয় আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছিল না। জগদীশ হুংকার দিয়ে বলে উঠেছিল, অ্যাই ছোঁড়া, তুই হুট করে ভেতরে ঢুকলি যে? কে তোকে হুকুম দিয়েছে? ভূতের মতন দাঁড়িয়ে রইলি যে, বাইরে যা! বাড়িতে কেউ নেই!

পাথরের মতন শক্ত শরীর, বুকখানা যেন লোহার পাত, মাথায় বাবরি চুল, হাতে ধারাল টাঙ্গি, তবু সেই ছেলে জগদীশের মতন একজন পঙ্গু মানুষের ধমক খেয়ে কুঁকড়ে যায়, পায়ে পায়ে পালায় উঠোন ছেড়ে।

যার শরীরে শক্তি নেই, তার তাগদ হল টাকা। যার টাকার জোর থাকে, তার বন্দুকও থাকে। জগদীশের বন্দুক তো আছেই, তাছাড়াও আশেপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামের মানুষ জানে, জগদীশের মতন সেরা মাথা আর কারুর নয়।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্রতিদিন বসে থাকে উঠোনের ওই খাটিয়ায়। খুব বৃষ্টির সময় খাটিয়াটা টেনে আনা হয় একটা ছাউনির তলায়। ওইখানে বসে বসে জগদীশ তার বিষয় সম্পত্তি চালায়। তার জমি চাষ করে বর্গাদার। জগদীশ কখনো তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলে, কখনো ধমকায়, কখনো অযাচিতভাবে দু পয়সা বেশি দেয়, কিন্তু কেউ তাকে এক কড়া ফাঁকি দিতে পারে না। সব দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই ভাবে সে তার দু মেয়ের বিয়ে দিয়েও জমি বাড়িয়েছে।

তবে নিছক বিষয়ী নয় জগদীশ, সে পড়াশুনো করা মানুষ। ইস্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর এই খাটিয়ায় বসে বসেই সে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছে। যখনই সময় পায়, সে কিছু না কিছু পড়ে। পোস্টাফিসে তার নামে খবরের কাগজ আসে, পত্র-পত্রিকা আসে। পঙ্গু পা নিয়ে সে কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যায় বটে কিন্তু সারা দেশে কোথায় কী ঘটছে, সে সব খবর তার জানা। এমনকি বিদেশি অতিথিও আসে তার বাড়িতে।

ধানের গোলাটা নিছক শোভা। গোমুখ্যু ছাড়া কি কেউ আজকাল উঠোনের গোলায় ধান ভরে রাখে? এ যেন নেমন্তন্ন করে চোর ডাকাতদের ডেকে আনা। এক বস্তা খোরাকির চাল রেখে বাকি সব দাদন দিয়ে দেয় জগদীশ। কাঁচা টাকাও সে বাড়িতে রাখে না। তা হলে আর গ্রামে পোস্ট অফিস হয়েছে কেন? তার বন্দুক আছে বটে কিন্তু কখনো বার করে না, বছরে একবার শুধু এস ডি ও অফিসে সে লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়ে আসে। বছর সাতেক আগে জগদীশ একবার একটা পাগলা কুকুরকে একগুলিতে খতম করে তার হাতের টিপ বুঝিয়ে দিয়েছিল। গ্রামের বহুলোক এখনো সেইগল্প করে।

ধানের গোলা একেবারে শূন্য রাখতে নেই, তাই দু কুলো ধান সেখানে ঢালা হয় প্রতি মরসুমে। জগদীশ মঙ্গলাকে বলে, মাঝে মাঝে গোবরছড়া দিয়ে গোলাটা লেপে দিতে, তখন গোলাটা বাপদাদার আমলের মতন সুন্দর দেখায়। জগদীশের দেখতে ভাল লাগে।

গোলাটায় হেলান দিয়ে সে বসে। তার বাড়ির ডানপাশে নিজস্ব বাগান, তারপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে খাঁ খাঁ মাঠ, তারপর নদী। সেদিকে চোখ চলে যায়।

অনেক দূরে, একটা পাকুড় গাছের নিচে বসে আছে লোধাদের সেই জোয়ান ছেলেটা। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। মাঝে মাঝে সে হাতের টাঙ্গিটা তুলে লাফাচ্ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মাটিতে। ঠিক যেন একটা ছায়া পুতুলের নাচ।

চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে এসে কমলা ওইদিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা, ওই ছেলেটা সারাদুপুর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় কেন, ও কোনো কাজ করে না?

জগদীশ বলল, ওরা কী কাজ করবে? চাষের কাজ জানে না, কিছু জানে না। কোনো কাজেই ওদের একদিনের বেশি দু দিন মন বসে না। মাঠে মাঠে ঘোরে কেন জানিস? ইঁদুর খোঁজে।

ইঁদুর?

হ্যাঁ রে, ইঁদুর। ফসল কাটা হয়ে গেছে, এখন ঝুরো ধানের লোভে মোটা মোটা ইঁদুর মাঠে এসে হুটোপুটি করবে। ওরা ইঁদুর ধরে সেই মাংস খায়।

ইঁদুরের মাংস খায়? অ্যাঃ! থুঃ!

ইঁদুরের মাংস বোধ হয় খেতে খুব খারাপ হবে না রে! খরগোশের থেকে খারাপ হবার তো কোনো যুক্তি নাই!

ও সারাবছর ইঁদুর খায়?

নাঃ, অত ইঁদুর পাবে কোথা থেকে। তাছাড়া ইঁদুর ধরাও তো সোজা কম্ম নয়! যখন মাঠে কিছু পায় না, তখন জঙ্গলে যায়। নদীর ওধারে ওই যে জঙ্গল। ওখানে দু-একটা খরগোশ-মরগোশ যদি পেয়ে যায়। অনেক গাছতলায় ছাতু হয়। বুনো জাম আর কুসুম ফল খায়। ওরা বিয়ের সময় কী করে জানিস?

কমলা দু দিকে মাথা নাড়ে।

ওই যে ছোঁড়াটা, ডুলুং, মনে কর ওর বিয়ে করার শখ হয়েছে। একটা মেয়েকে মনেও ধরেছে বেশ। তখন ও মেয়ের বাপকে জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যাবে। তড়বড় তড়বড় করে একটা বড় গাছের ডগায় উঠে গিয়ে এক হাত ছড়িয়ে হেঁকে বলবে, ওই যে দেখছ টিলাটার মাথায় একটা শিমুল গাছ লি লি করছে, এখেন থেকে ওই পর্যন্তক জঙ্গল হল গে আম্মার! তার মানে কী বল তো?

কমল আবার দুদিকে মাথা নাড়ে।

জগদীশ বলল, জঙ্গলের মালিক তো আর ও নয়। জঙ্গল সরকারের। বিয়ের পাত্তর জানাবে যে এতখানি জঙ্গলের ফল মুল কুড়োবার সে হক্কদার। সেই রোজগারে সে বউকে খাওয়াবে।

কমলা একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বাবার দিকে। তার জ্ঞানের বয়েস থেকে সে বাবাকে এই খাটিয়ার সঙ্গে সেঁটে থাকতে দেখেছে, কখনো জগদীশ ওই ডাঙা জমি কিংবা নদীর ওপারের জঙ্গলে যায়নি। খোঁড়া পা-টা এখন প্রায় অসাড় হয়ে গেছে বলে সে আর হাঁটতেই চায় না। কমলা একদিন শুনেছিল, তার বাবা একজনকে রাগ করে বলেছিল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ভিখিরিরা। আমাকে কি সেই পেয়েছ!

মাঠে বা জঙ্গলে যায় না জগদীশ। তবু সে মাঠ আর জঙ্গলের সব বৃত্তান্ত জানে।

কমলা তারপর চেয়ে রইল নদীর ওপারের অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে।

সে যেন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল, একজন সুঠাম যুবক একটা বিশাল শিরীষ গাছের মগডালে উঠে চিৎকার করে বলছে, এই জঙ্গল আমার।

ডুলুং-এর কি বিয়ে হয়ে গেছে? ওর মুখ দিয়ে তো কোনো কথাই বেরোয় না।

এক ঝলক শীতের হাওয়া এসে শরীরে আদর করে দিল। এখন রোদ্দুরটা কী মনোরম লাগছে। এক্কা দোক্কা খেলার মতন পা ফেলার ভঙ্গিতে কমলা ছুটে চলে গেল পুকুর ধারে।

।। ২ ।।

প্রথমে ঘুম ভাঙল মঙ্গলার।

যাকে গোটা সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেই মেয়ে মানুষের ঘুম কখনো গাঢ় হয় না। এই তো মাস দু-এক আগে এক চোর এসেছিল, কুকুরটা ঘেউ ঘেউয়োবার আগেই সামান্য শব্দ শুনে মঙ্গলা উঠে বসে চেঁচিয়েছিল, কে? কে?

তার সেই চিৎকার শুনে ভেগে গিয়েছিল চোরেরা। রাত-বিরেতে একা বাইরে বেরুতেও ভয় পায় না মঙ্গলা।

আজও মঙ্গলা চোখ মেলে উৎকর্ণ হল। প্রথমে মনে হয় স্বপ্ন।

ঝড় এল নাকি? সবেমাত্র কুমড়োর ডগাগুলো ঘরের চালে তুলে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। না, না, অগ্রাণ মাসে ঝড় আসবে কেন! তা হলে কি অনেক মানুষজন জড়ো হয়ে কথা বলছে?

কয়েক মুহূর্তেই মঙ্গলার ঘোর কেটে গেল। স্বামীর গায়ে ধাক্কা মেরে সে চেঁচিয়ে উঠল, ওরা এসে গেছে গো এসে গেছে!

পাশের ঘরে কমলা, তার ছোট বোন নীতি, বুড়ি পিসি, তার ছেলে নাড়ু সবাই জেগে উঠেছে। জগদীশ লম্বা টর্চটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে এল।

জ্যোৎস্না ধুয়ে যাচ্ছে উঠোন, ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই তবু শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে মাথার ওপরে। লম্বা ডানা মেলে বিশাল আকারের এক একটা পাখি বাড়িটার ওপর দু-এক চক্কর ঘুরে তারপর ঝুপ করে এসে বসছে শিরীষ গাছে। একটার পর একটা!

কমলা ফিসফিস করে বলল, মা, আগের বছর ওরা দুপুরবেলা এসেছিল না?

মঙ্গলা মাথা নাড়ল। কোনো বছরই ওরা রাত্তিরে আসেনি। এখন রাত অন্তত তিন প্রহর হবে। কতদূর থেকে, রাত্রির আকাশ পেরিয়ে ওরা আসে, তবু এই বাড়ির বাগান চিনতে ভুল হয় না।

নাড়ু গুণতে লাগল, তের-চোদ্দ-পনেরো.....

একবার দিনের বেলা ওরা গুণেছিল, দুশো সাতটা।

গাছে বসার পর ওরা ডাকছে কঁক কঁক, কঁক কঁক, কঁক.....এক একসময় মানুষের গলার আওয়াজ বলে ভুল হয়। ঠিক যেন মানুষের মতনই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে।

যেন ওরা বলতে চাইছে, আমরা আবার এসেছি গো। তোমাদের অতিথি। চিনতে পারছ?

শেষ দুটো পাখি এখনো বসেনি, ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে, ডানা ঝটপটিয়ে যেন ওদের প্রণাম জানাচ্ছে।

কমলা বলে উঠল, কী সুন্দর!

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না জগদীশ, সে একটা মাচিয়া পেতে বসল, সিগারেট ধরাল। ঠাণ্ডা বাতাস চাঁদের আলোয় নির্মল, তার মধ্যে সাদা ধপধপে একটা একটা পাখিকে মনে হয় যেন স্বর্গের পরী।

একসময় মঙ্গলা বলল, এবার ভেতরে চল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে!

জগদীশ বলল, তোমরা শুয়ে পড়ো গে, আমি আর একটু বসি।

এখন প্রত্যেকদিনই এই পাখিগুলোকে দেখা যাবে, তবু এই চাঁদের আলোয় ওদের ওড়াউড়ির দৃশ্য জগদীশকে মুগ্ধ করে রাখে।

প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জগদীশের এই পাখিগুলো সম্পর্কে প্রীতি অনেকের কাছে রহস্যময় মনে হয়। এদের সঙ্গে তার লাভ-লোকসানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তবে এটা বিস্ময়কর ঠিকই, এই বিদেশি পাখিরা এ গ্রামের আর কোনো বাড়িতে যায় না, আর কোনো গাছে বসে না। জগদীশের বাগানে দুটি মাত্র শিরীষ গাছ তাদের পছন্দ, সেই দুটি গাছে অতগুলো পাখি গাদাগাদি করে থাকে। এক একসময় ওরা সবাই মিলে যখন কঁক কঁক করে, তখন আর কোনো শব্দ শোনা যায় না।

এই সারস জাতের পাখিগুলো যে ঠিক কোথা থেকে আসে, তা সঠিক জানে না কেউ। কেউ বলে অস্ট্রেলিয়া, কেউ বলে সুইডেন। এই দুটো দেশ যে পৃথিবীর একেবারে বিপরীত দিকে, সে জ্ঞান জগদীশের আছে। পাখি সম্পর্কে সে বাংলা বইও আনিয়েছে কলকাতায় অর্ডার দিয়ে। মাইগ্রেটরি বার্ডদের সম্পর্কে সে পড়েছে, কিন্তু তার বাগানের পাখিগুলো যে ঠিক কোন্ দেশ থেকে উড়ে আসে, তার হদিশ সে পায়নি।

সাঁওতালরা বলে সাহেব পাখি!

নিজের বাড়ির উঠোন ছেড়ে কোথাও যায় না জগদীশ, এই পাখিগুলো তার কাছে বাইরের পৃথিবীর দূত।

শহরের মানুষ এদিকে বেড়াতে এলে পাখিগুলো দেখতে আসে। এক একজন এক একরকম ইংরিজি নাম বলে, বাংলায় কেউ কিছু স্পষ্ট করে বোঝাতে পারে না। খবরের কাগজের লোক এসে দু একবার ছবি তুলে নিয়ে গেছে। বাইরের লোক এ গ্রামে এসে জিজ্ঞেস করে, পাখাওয়ালা জগদীশ মণ্ডলের বাড়ি কোন্‌টা?

এ গ্রামের মানুষ কেউ ঐ পাখিদের মারে না। সাঁওতালরাও মারে না। পাখিগুলো তাদের অতিথি। শুধু ভয় লোধাদের সম্পর্কে। এককালে ওরা ছিল যাযাবর, এখন ঘর-বাড়ি বেঁধে থাকলেও ওদের কারুর কারুর স্বভাব আজও অনেকটা বনচর ধরনের রয়ে গেছে। মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। যে-জঙ্গলে কোনো জানোয়ার নেই বলে সবাই ভাবে, সেখান থেকেও ওরা হঠাৎ একটা শুয়োর মেরে নিয়ে আসে। সাপ মারে, ইঁদুর মারে। কবুতর মেরে পুড়িয়ে খায়। এরকম বড় বড় সারস পাখি পেলে তো তারা মারবেই। এক একটা পাখির মাংস হবে অন্তত চার-পাঁচ কিলো।

লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক ভাল না। লোধারা সাধারণত প্রকাশ্যে নিজেদের এলাকা ছেড়ে এ গ্রামে আসেও না। তবু কয়েকজনকে ধরে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের কোনো বাড়িতে বড় রকমের চুরি হলে দু-চারটে লোধাকে ধরে ঠ্যাঙানি দেওয়া হয় এক চোট, তারা চুরি করুক, বা না করুক, সে প্রমাণের দরকার নেই, ওদের ভয় পাইয়ে রাখাটাই দরকার।

জগদীশ সারারাত বসে রইল জ্যোৎস্নার মধ্যে।

সকালবেলায় মঙ্গলা বাগানের শিরীষ গাছদুটোর তলায় গিয়ে কুলোয় ধান-দুব্বো নিয়ে পাখিগুলোকে বরণ করল। কমলা শাঁখ বাজাল। উলু দিল বুড়ি পিসি।

ধানগুলো দুটো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিল মঙ্গলা। যদিও এই পাখিরা ধান খায় না।

গাছদুটো একেবারে সাদা ধপধপে হয়ে গেছে। যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। পাখিগুলো ঠেলাঠেলি করছে নিজেদের মধ্যে। তবু ওরা অন্য গাছে যাবে না। এই গাছদুটোই যে ওদের কেন এত পছন্দ কে জানে! কত শত মাইল দূর থেকে তারা উড়ে আসে, এখানে নামে, একবারও ভুল করেও অন্য কোনো গাছে বসে না।

কমলা বলল, দ্যাখ নাড়ু, এবার মনে হচ্ছে তিন চারটে নতুন বাচ্চা এসেছে!

পাখিগুলোর মধ্যে ছোটো বড়ো আছে, কিন্তু কোনগুলো যে ঠিক বাচ্চা, তা ওরা বুঝতে পারে না।

তবু নাড়ু বিজ্ঞের মতন বলল। তিন-চারটে নয়, এগারোটা বাচ্চা, আমি গুণেছি।

বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত এই পাখিগুলোকে চেনে, কোনো পাখি কখনো দৈবাৎ গাছ থেকে খসে পড়লেও সে তেড়ে যায় না, কুঁই কুঁই শব্দ করে ল্যাজ নাড়ে। এক এক সময় সে গাছতলায় গেলেই তার গায়ে পিচিৎ পিচিৎ করে পাখিদের পুরীষ পড়ে। মঙ্গলা—নাড়ুরা হেসে ওঠে।

সব পাখিগুলো এক সঙ্গে খাবারের সন্ধানে যায় না। এক ঝাঁক যায়, এক ঝাঁক ফিরে আসে। ওরা জঙ্গলের মধ্যে যেতে চায় না, নদীর ধারটাতেই বেশির ভাগ সময় বসে। ওরা যে ঠিক কী খেয়ে বেঁচে থাকে, তাও বোঝা যায় না। শীতের শীর্ণ নদীতে কী-ই বা মাছ আছে! গেঁড়ি-গুগলিও তেমন চোখে পড়ে না। তবে ওরা লম্বা লম্বা ঠোঁট ডুবিয়ে প্রায়ই জল পান করে অনেকখানি।

সব পাখির মধ্যে সারস জাতীয় পাখিরই জলপিপাসা বেশি, এ কথা জানিয়েছে জগদীশ। হয়তো এই ছোট্ট নদীর জলটাই ওদের বেশি পছন্দ, সেইজন্যই ওরা এখানে আসে।

ওরা মানুষ দেখে ভয় পায় না। তবে মানুষদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রাখে। নদীর ধারে, জঙ্গলের দিকটায় ওরা দল বেঁধে বসে, সেদিকে কখনো মানুষ এসে পড়লে ওরা মুখ তুলে দেখে, একটুক্ষণ অপেক্ষা করে, যেন ওরা মানুষ চেনে, কোনো কোনো মানুষের চোখ দেখে কিছু বোঝে, হঠাৎ দল বেঁধে এক সঙ্গে উড়ে যায়। আবার কোনো কোনো মানুষ দেখলে একটু সরেও না।

প্রথম কয়েকদিন কমলা, নীতি, নাড়ুদের খুব উৎসাহ থাকে। অনেকক্ষণ বাগানে বসে থেকে পাখিগুলোর ডাক শোনে, কীর্তিকলাপ দেখে। নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে কোনো পাথরের আড়ালে বসে থাকে। গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরা এলে তাদের দিকে কমলা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। এসব তাদের বাড়ির পাখি, তাদের নিজস্ব!

নদীর ধারের সব কাশ ফুল এখনো শুকিয়ে যায়নি। তাদের সঙ্গে যেন মিশে গেছে ঝাঁক ঝাঁক সারস। মাঝে মাঝে এক একটা লম্বা ডানা ঝাপটে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে, আবার ফিরে আসছে, নদীর ওপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে নামিয়ে দিচ্ছে দুটি পা, নখগুলো ছড়ানো, একটা ছাতার মতন আস্তে আস্তে পড়ছে নদীর জলে।

পাকুড়গাছের তলায় বড় পাথরটার আড়ালে বসে ছিল ডুলুং, কমলাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। মাথার লাল ফেট্টিতে শকুনের পালকের বদলে আজ একটা সাদা পালক গোঁজা, হাতে টাঙ্গি। খয়েরি চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক।

নাড়ুর বয়েস মাত্র এগারো, বড়োদের গলার আওয়াজ নকল করে সে তড়পে বলল, অ্যাই তুই এখানে কী করছিস?

ডুলুং কোনো উত্তর দিল না।

নাড়ু কমলার দিকে তাকিয়ে বলল, এ ব্যাটার মতলব খারাপ!

কমলা একটু লজ্জা পেয়েছে ওকে দেখে। গতকাল সকালেও এই ডুলুং এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের বেড়ার পাশে, মঙ্গলা তখন পুকুরে স্নান করতে গেছে। জগদীশ খুব জোর দাবড়ি দিয়েছে ডুলুংকে। রোজ রোজ মুড়ি ভিক্ষে করতে আসিস, তোর লজ্জা করে না? এ বাড়িতে কোনো কাজ নেই, যা ভাগ!

বাড়িতে মুড়ি ফুরিয়ে এসেছে, অন্যদের দান করার মতন বিশেষ নেই, তবু মঙ্গলা থাকলে দুটি দিত নিশ্চয়ই।

ডুলুং কমলার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সব দোষ তার।

এই বছরই পুরুষ মানুষের সোজাসুজি দৃষ্টি দেখলে কমলার গা শিরশির করতে শুরু করে। সামনের বৈশাখে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। নীলমণির হাটের জগন্নাথ দাসের ছেলে গগনের সঙ্গে। ওদের একটা মুদির দোকান আছে, গোয়ালে পাঁচটা গরু আছে। মাত্র তো দুখানা গ্রাম পরে, ওই বাড়িতে যদি ডুলুং কখনো যায়, কমলা তাকে পেট ভরে মুড়ি খেতে দেবে।

কমলা জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, তোমার বিয়ে হয়েছে? তুমি একটা গাছের মাথায় চড়ে......

কমলার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না ডুলুং, দৌড়ে নেমে গেল নদীতে; তারপর হাঁটু সমান জল ছপছপিয়ে নদী পার হয়ে নল খাগড়ার জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

সেদিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল কমলা। সেই ছোটবেলায় সে ওই জঙ্গলে গিয়েছিল, এখন সবাই যেতে বারণ করে। ওখানে নাকি লুকিয়ে থাকে চোর-ডাকাতেরা। কারা যেন গাছ কাটে। মড় মড় করে ভেঙে পড়ে বড় বড় শাল গাছ। জঙ্গল নিকেশ হয়ে যাচ্ছে প্রায়। উঁচু উঁচু গাছগুলো সব নষ্ট হয়ে গেলে ডুলুং কোন্ গাছের ডগায় চড়ে বলবে, এই জঙ্গল আমার?

পাখিগুলো হঠাৎ জোরে জোরে ডাকতে শুরু করেছে। এক জায়গায় দশ বারোটা পাখি কঁক কঁক করতে করতে লাফাচ্ছে। কিসের যেন একটা চাঞ্চল্য ওখানে। নদীতে গা ভাসিয়ে যে পাখিগুলো অপ্সরার মতন স্নান করছিল, তারাও ডেকে উঠল।

নাডু উত্তেজিত ভাবে বললো, ইঁদুর! ইঁদুর!

একটা মস্ত ধেড়ে ইঁদুর প্রাণ ভয়ে ছুটছে এদিক-ওদিক, দশ বারোটা সারস তাকে ঘিরে ধরে ঠোকরাবার চেষ্টা করছে। ইঁদুরটা পালাতে পারল না, মিনিট খানেকের মধ্যেই একেবারে নিশ্চিহ্ন!

কমলার গা-টা গুলিয়ে উঠল। এমন সুন্দর ধপধপে সারসগুলো ইঁদুর খায়? ডুলুং এখানে ইঁদুর খুঁজতে এসেছিল, প্রতি বছর এই সারসরা এসে ডুলুংদের খাদ্যে ভাগ বসায়।

পরক্ষণেই কমলা আবার ভাবল, ও মা, এ আবার কী কথা! ইঁদুর বুঝি মানুষের খাদ্য ! সাপ কিংবা পাখিদেরই তো ইঁদুর মারার কথা। কাক-চিলরাও তো ইঁদুর পেলেই ধরে।

॥ ৩ ॥

নদীর ওপারে কাশ বনের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আছে ডুলুং। হাতে তার গুলতি। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে সে, সারা শরীরে তার আশঙ্কা ও উত্তেজনা, ফস্কে যাচ্ছে বারবার। একবার সে ঠিক লাগিয়ে দিল। একটা ছোট মতন সারস ঢলে পড়েছে।

এক লাফে বেরিয়ে এল ডুলুং। দ্রুত দেখে নিল এদিক-ওদিক। পাখিটা খোঁড়াচ্ছে, ওড়ার চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না উঁচুতে, কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছে। ডুলুং ঝাঁপিয়ে পড়েই টাঙ্গি দিয়ে এক কোপ বসাল পাখিটার গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে পড়ল ডুলুং-এর গায়ে, কিন্তু পাখিটা এখনো মরেনি, নদীতে নেমে পড়ার চেষ্টা করছে, ডুলুং আবার গিয়ে পা চেপে ধরল, এলোপাতাড়ি টাঙ্গি চালাতে লাগল।

অন্য সারসগুলো প্রথমটায় ভয় পেয়ে হুস করে উড়ে গেল একসঙ্গে, একটু দূরে গিয়ে বসল, উঁচু গলায় চিৎকার করতে লাগল, যেন অন্য সঙ্গী-সাথীদের ডাকছে, আবার তারা লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে লাগল। এতবড় পাখি, লম্বা ধারালো ঠোঁট, একসঙ্গে অন্তত তিরিশটা রয়েছে। তবু ওরা মানুষকে আক্রমণ করতে জানেনা। শুধু চিৎকার করে।

ডুলুং যেটাকে ধরেছে, সেটা প্রায় বাচ্চাই। বেশিক্ষণ সে যুঝতে পারল না। মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলেছে ডুলুং, পাখিটার চোখ দুটো স্থির। তাড়াতাড়ি পালক আর চামড়া ছাড়িয়ে সে জলে ভাসিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু এখন তার মাথার ওপর চার-পাঁচটা পাখি খুব কাছে এসে তীব্র স্বরে কঁক কঁক করছে। চিলে ছোঁ মারে, কাকেরাও মাথায় ঠোকর দেয়, ডুলুং ভয় পেয়ে গেল, সে প্রথমে পাখিটার ধড়টা নিয়ে দৌড়লো, তারপর আবার ফিরে এসে মুণ্ডুটাও কুড়িয়ে নিল, এক হাতে টাঙ্গিটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটল প্রাণপণে।

পাখিদের ডাক আর আর্তনাদের মধ্যে একটা তফাত বোঝা যায় ঠিকই। রক্তাক্ত পালক খসে খসে পড়ছে, পাখিটাকে এক হাতে ঝুলিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে ডুলুং, তাকে নদীর এপার থেকে দেখতে পেয়ে গেল নাডু।

নাডুও রক্তের গন্ধ পেয়েছে।

জঙ্গলে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উবু হয়ে বসে রইলো ডুলুং। তার সারাশরীরে একটা কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। তার পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল সকাল থেকে। সেটাও কমে গেছে অনেকটা। এতবড় শিকার সে কোনোদিন পায়নি। এই শিকারের বিপদটাও সে জানে। কিন্তু ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে চোখের সামনে এমন লোভনীয় খাদ্য দেখে সে আর মাথাটা ঠিক রাখতে পারেনি।

কেউ তাকে তাড়া করে এল না। কোনো হৈচৈ রব শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে পালকগুলো সব ছাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করল সে। ওগুলোও কাজে লাগবে। মাংসগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে বুনো কলাপাতায় মুড়ে নিল। তারপর সন্ধের মুখে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেল সে। বেশি লোককে জানানো যাবে না, আজ তাদের বাড়িতে ভোজ হবে। সে জঙ্গল থেকে পাখি মেরে এনেছে।

নাডু গিয়ে প্রথমেই বলল কমলাকে। তার আনন্দ এই যে জগদীশমামা এবার গুলি করে ডুলুংকে মারবে!

নাডুর চেয়ে কমলার বয়েস বেশি, সে বিপদের সম্ভাবনাটা ঠিক বুঝল। সে নাডুর চুলের মুঠি ধরে শাসাল, খবরদার বাবাকে বলবি না! তা হলে তোকে খেতে দেব না! মা তোকে ভাত দেবে না!

মঙ্গলা শুনে মুখ কালো করে ফেলল। এই পাখি মারলে বাড়ির অকল্যাণ হবে। এরা অতিথি। ছোট মেয়েটার কাল থেকে জ্বর।

চিক করে মাটিতে থুতু ফেলে মঙ্গলা বলল, নিমকহারাম!

কিন্তু জগদীশকে জানানো চলবে না। জগদীশ শুনলেই সব দোষ চাপাবে লোধাদের ঘাড়ে। ডুলুংকে বাড়িতে ডেকে এনে কাজ দেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলাও দোষের ভাগী হবে।

আজ শিরীষ গাছদুটোয় সন্ধের পরেও কোলাহল খুব বেশি।

জগদীশ আপনমনে বলল, গাছে সাপ উঠল নাকি?

মঙ্গলা বলল, শীত পড়ে গেছে, এখন আবার সাপ আসবে কোথা থেকে?

জগদীশ বলল, একটা ঢ্যামনাকে পরশুও আমি দেখেছি বেগুন ক্ষেতের পাশে।

গায়ে চাদর জড়িয়ে, লম্বা টর্চটা নিয়ে জগদীশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল শিরীষ গাছতলায়। আলো দেখে পাখিরা আরও জোরে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোনো সাপ চোখে পড়ল না।

খাওয়া দাওয়ার পর জগদীশ দাওয়ায় বসে পরপর সিগারেট টেনে যেতে লাগল। আজ তার চোখে ঘুম নেই। এক সময় সে মঙ্গলাকে ডেকে বলল, শোনো, একটা পাখি কাঁদছে। একেবারে ঠিক কান্নার শব্দের মতন!

সারাদিন খাটিয়ায় বসে থাকে জগদীশ, পাখির ডাক শুনতে শুনতে সে বোধ হয় পাখির ভাষাও শিখে ফেলেছে।

মঙ্গলা কান পেতে শুনল। কঁক কঁক কঁক-এর মধ্যে শুধু একটা যেন কোঁ কোঁ টানা সুর। কান্নার মতনই শোনায় বটে! মানুষের কান্নার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই।

খুব সাবধানে মঙ্গলা বলল, দুটো একটা বাচ্চা তো মরেই!

সে কথা ঠিক। এখানে সে দু-আড়াই মাস থাকে তার মধ্যে বেশ কয়েকটা পাখি নিজে নিজেই মারা যায়। গাছ থেকে খসে পড়ে। শুকনো, রক্তশূন্য চেহারা। পাখিরাও বুড়ো হয়। পাখিদেরও শিশুর মৃত্যু আছে।

মরা পাখিগুলোকে ওরা কুকুরটাকেও খেতে দেয় না। যত্ন করে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে আসে। গাছের ওপরের পাখিরা সব লক্ষ করে। গাছ থেকে খসে পড়া মৃত পাখিদের জন্য জীবন্ত পাখিরা কোনোদিন শোক করেনি।

কিন্তু আজ যেন স্পষ্ট কোনো কান্নার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জগদীশকে অন্যমনস্ক করার জন্য মঙ্গলা পাঁচ রকম সংসারের কথা তোলে। ধান-চাষের হিসেব নিতে নিতেও জগদীশ এক সময় বলে উঠল, ঠিক মানুষের মতন কাঁদছে মনে হচ্ছে না? এ রকম আগে শুনেছ?

মঙ্গলা বলল, কমলা কখন থেকে পাত পেড়ে বসে আছে, তুমি খাবে না? এস—

কান্নার আওয়াজটা শুনতে শুনতে জগদীশ অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে ছটফট করল। পাশের ঘরে নাড়ুকে কমলা আরও অনেকবার ভয় দেখিয়েছে।

ভোর হতে না হতেই জগদীশ আবার গেল গাছতলায়। একটাও মরা পাখি নেই সেখানে।

এর পর দু দিন পাকুড় গাছতলায় পাথরের পাশে বসে তীক্ষ্ণ নজর রাখল কমলা আর নাড়ু। নীতির জ্বর খুব বেড়েছে। টিলকিগড় থেকে ডাক্তার ডেকে আনা হয়েছিল তার জন্য। মঙ্গলা কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। এক একবার সে কমলার দিকে রোষের দৃষ্টিতে তাকায়। মা-মেয়েতে যুক্তি হয়েছিল যে অশুভ সংবাদটা জগদীশকে জানানো হবে না, কিন্তু এখন এক একবার মঙ্গলার মনে হয়, ডুলুং-র শাস্তি পাওয়া দরকার। নইলে পাখির মায়ের কান্না থামবে না। ওর অভিশাপেই কি মঙ্গলাকে সারাজীবন কাঁদতে হবে?

কমলা আর নাড়ু দেখতে পায় না ডুলুংকে। সে বোধহয় ভয় পেয়ে আর আসছে না এদিকে।

ডুলুং অবশ্য ঠিকই আসে। এই গ্রামে ঢোকে না। জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকে, বিকেলের পর গুঁড়ি মেরে এগোয় নদীর দিকে। এক ঝাঁক পাখি সন্ধের পরেও স্নান করতে ভালবাসে। লম্বা গলাটা তুলে আকাশের দিকে জল ছড়ায়। ওপরে উঠে ডানা ঝাপটায়। একজন আরেকজনের ঘাড়ে আদর করে। প্রথম চাঁদের আলোয় ওদের ধপধপে শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে।

একটা মারার পর ডুলুং-র সাহস বেড়ে গেছে। সে খুব তাকেতাকে থাকে। কাশ বনের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে। অপেক্ষাকৃত ছোট কোনো সারস দেখলে সে টাঙ্গির এক কোপে গলাটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কমলা আস্তে আস্তে ডাকে, ডুলুং। ডুলুং।

কোনো সাড়া আসে না।

একদিন জ্যোৎস্না রাতে ওরা এসেছিল, এক সকালে ওরা ফিরে যেতে শুরু করে। এবার মাত্র পনেরো দিন কেটেছে।

ওদের উড়ে যাবার সময় একটা আলাদা ডাক আছে। প্রথমে একজন ডাকে, তারপর আর একজন, তারপর একসঙ্গে অনেকে। প্রথমে তিন-চারজন গাছ ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তারপর এক একটা দল শূন্যচারী হয়। দশ মিনিটের মধ্যে গাছদুটো ফাঁকা হয়ে যায়।

জগদীশ ঠিক ধরতে পেরে যায়। এ তো অন্যদিনের মতন আহারের সন্ধানে উড়ে যাওয়া নয়। তার বাড়ি ঘিরে পাখিগুলো উড়ছে যেন বিদায় জানাচ্ছে। আকাশ সাদা হয়ে গেছে একেবারে। তাদের ডানার শব্দ ঠিক ঝড়ের মতন। তাদের কঁক কঁক ডাকের মধ্যে যেন ঝরে পড়ছে অভিমান।

প্রত্যেক বছর এরা মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত থাকে। এবারে ভাল করে শীতই এল না, তবু ওরা চলে যাচ্ছে কেন?

জগদীশ চেঁচিয়ে ডাকল, মঙ্গলা, মঙ্গলা!

কমলা, নাড়ু পিসিমা সবাই এসেছে, এমনকি নীতির জ্বর ছেড়েছে গতকাল, সেও ছুটে এল উঠোনে। সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে। সবাই বুঝেছে।

জগদীশ হাহাকার করে বলল, তোমাকে বলেছিলুম না, পাখির মা রোজই কাঁদে। এবার কিছু একটা হয়েছে ওদের!

নাড়ু আর কথা চেপে রাখতে পারল না। সে বলল, ডুলুং পাখি মেরেছে!

কমলা এক চড় কষালো নাড়ুকে।

জগদীশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওরা আর কোনোদিন আসবে না ফিরে।

জগদীশের অনুগত সাঁওতালরা নদীর ওপারের কাশবন আর জঙ্গল ঘুরে দেখে এল। অন্তত চার জায়গায় সাদা পালক, রোঁয়া আর রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। লোধারা নিয়মিত এই পাখি মারতে শুরু করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এই হিংস্র মানুষদের দেশে ওই সুন্দর পাখিরা আর থাকবে কেন? সারা পৃথিবীতে কি আর জায়গা নেই?

সাঁওতালদের কাছে এই পাখি পবিত্রতার প্রতীক, তারা দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জগদীশ শুয়ে পড়েছে খাটিয়ায়। তার মুখে ম্লান ছায়া। যেন এই বিশ্বনিখিল থেকে সে আজই চির নির্বাসিত হল একটা ছোট্ট উঠোনে।

দুপুরের দিকে একটা ভিড় জমে গেল। গ্রামের অনেকেই শোক প্রকাশ করতে এল। পাখিগুলো অসময়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, এ তো এ গ্রামেরই অপমান। বাইরের লোকেরা এর পরে এসে ছি ছি করবে। অথচ তাদের তো কোনো দোষ নেই।

লোধাদের একটা ছেলেকে যে এ বাড়িতে আস্কারা দেওয়া হয়েছিল, সে কথা উঠলই। গ্রামে চুরি বেড়েছে, সে কথাও বলল কেউ কেউ। পরশুদিন হাট থেকে সাঁওতাল মেয়েরা ফিরছিল সন্ধের পর, ফুলমণি নামে একটি মেয়ের পায়ে কাচ ফুটেছিল, সে হাঁটতে পারছিল না ভাল করে। পিছিয়ে পড়েছিল খানিকটা। হঠাৎ দুটি ছেলে শাল জঙ্গলের আড়াল থেকে এসে তাকে চেপে ধরে। কোনো সাঁওতাল ছেলে এমন কাজ করবে না। এ নিশ্চয়ই লোধাদেরই অপকীর্তি।

উত্তেজনা বাড়তেই লাগল ক্রমশ। সন্ধের পর প্রায় পাঁচশো লোকের বিরাট একটা দল টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে আক্রমণ করল লোধাদের গ্রাম।

লোধারা প্রথমেই এগিয়ে দিয়েছিল ডুলুংকে। মাংস অনেকেই খেয়েছে। তবু সব দোষ ডুলুং-র। প্রথমে একটা শাবলের বাড়ি খেয়ে সে ছিটকে পড়ল মাটিতে, বাচ্চা সারসটার মতনই সে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে পালাবার চেষ্টা করল, পারল না, একটা টাঙ্গির কোপ পড়ল তার ঘাড়ে।

তাকে খুন করার পরেও জনতার ক্রোধ কমল না। মরল আরও তিনজন, জখম হল সাতাশ জন। পুলিশ এল আড়াই দিন পর।

জগদীশকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারল না। সে পঙ্গু শরীর নিয়ে দাঙ্গা করতেও যায়নি, তার বন্দুকও সে অন্যকে ধার দেয়নি। সে খাটিয়াতেই শুয়েছিল আগাগোড়া। দারোগাবাবু তার বাড়িতে এসে চা খেয়ে গেল।

জনা দশেক সাঁওতাল চালান হয়ে গেল সদরে। তারাও পার্টির দৌলতে জামিন পেয়ে গেল কয়েকদিন বাদে। লোধাদের তুলনায় সাঁওতালরা সংখ্যায় অনেক বেশি, সেই জন্য তাদের প্রতি দরদ আছে রাজনৈতিক দলগুলির। এরপর মামলা কবে উঠবে ঠিক নেই, সব কিছু চুকে বুকেই গেল বলা যায়।

কমলা মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে ঘুমের মধ্যে। সে যেন দেখতে পায়, একটা ঝাঁকড়া শিরীষ গাছের ডগায় উঠে সেই কালো কুচকুচে চেহারার যুবকটি হাত বাড়িয়ে বলছে, এই সব জঙ্গল আমার!

তারপরই সে দেখতে পায় মড়মড় করে গাছ ভেঙে পড়ছে, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। কমলা তখন হাত-পা ছুড়ে আঁ আঁ শব্দ করতে থাকে।

মেয়ের তড়কা রোগ হয়েছে এই ভয় পেয়ে মঙ্গলা তাকে নিয়ে গেল কনক-দুর্গার মন্দিরে। পুরুতমশাই তাকে মন্ত্রপড়া জল দিয়ে বললেন, ও কিছু নয়, বিয়ের পরই সেরে যাবে।

জগদীশ মাঝে মাঝে মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে বলে, পাখির মায়ের কান্না শুনতে পাচ্ছ? শোনো, শোনো, ঠিক সেই কাঁ কাঁ শব্দ আসছে গাছ থেকে।

মঙ্গলা অনেক শক্ত মনের মেয়েমানুষ। সে বলল, কোথায় শব্দ? ও তোমার মনের ভুল!

জগদীশ বিষণ্ণভাবে বলল, তাই হবে বোধ হয়। ওরা অসময়ে চলে গেল, আর কোনোদিন আসবে না, না গো?

মঙ্গলা বলল, দেখই না সামনের বছর কী হয়। আমরা তো আর কোনো দোষ করিনি!

জগদীশ আবার বালিশে মাথা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ক্রমে শীত এল জাঁকিয়ে।

সাঁওতালরা তাদের বাৎসরিক শিকার করতে জঙ্গলে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এল! হরিণ-শুয়োর তো দূরের কথা, একটা খরগোশও পায়নি এবার। সাপ, ইঁদুররাও এই শীতে গর্তে ঢুকে থাকে। জঙ্গলের আর কোনো ঢক নেই। সেই জঙ্গলই বা কোথায়। কারা যেন ওর মধ্যে চাষও শুরু করেছে।

চালের দাম এই শীতে বেড়ে গেল হু হু করে।

নদী শুকিয়ে গেছে। এ বছর তেমন শাকসবজিও ওঠেনি। এ বছরটা বড় নির্দয়। সবাই পাখিদের কথা ভুলে গেছে। শীতে কোনো আনন্দ নেই। আবার কবে বর্ষা আসবে, সবাই চেয়ে আছে সেই আশায়।

উঠোনে বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ডালের বড়ি দিচ্ছে মঙ্গলা। খাটিয়ায় পা ছড়িয়ে আধ শোওয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে জগদীশ। কুকুরটা হঠাৎ ঘ্যা ঘ্যা করে তেড়ে গেল বেড়ার দিকে। পেঁপে গাছটার তলায় কোনো মানুষ বসে আছে।

মঙ্গলা বলল, কে দেখ তো কমলা।

কমলা আর নাডু এক সঙ্গে ছুটে গেল। পুরুষ নয়, একজন স্ত্রীলোক। বুড়ি। পেঁপে গাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে। গায়ে একখানা কাদা রঙের ছেঁড়া শাড়ি। মুখে অসংখ্য রেখা, মাথার চুল শনের নুড়ির মতন। ঘোলাটে ঘোলাটে চোখ।

কী চাই?

বুড়িটা ফ্যাস ফ্যাস করে কী যে বলল বোঝাই গেল না। তার গলা ভাঙা। কিংবা কোনোকালেই বোধ হয় তার কথা বলার শক্তি ছিল না।

তোমার কী চাই এখানে?

বুড়িটা কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে ঠিকই। পেটের ভিতর থেকে একটা শব্দ বার করার চেষ্টা করছে।

নাডু হঠাৎ চিনতে পেরে বলল, এ তো ডুলুং-র মা। বাজারের কাছে দেখেছি!

কমলা শিউরে উঠল। আবার লোধারা এই গ্রামে আসতে শুরু করেছে!

চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে ডুলুং, সে আর আসবে না। এই তার মা? এর মুখে এত রকম আঁকিবুঁকি যেন মনে হয় একহাজার বছর বয়েস। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে কমলার, এখন তার আনন্দ করার সময়। তবু তার চোখ জ্বালা করে উঠল।

বুড়িটা উঠে দাঁড়িয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে কী যেন বলল।

অতি কষ্টে তার দু-একটা শব্দ উদ্ধার করা গেল। বুড়িটা বলছে, একটু.....মুড়ি!

অলীক নগরী

শেষরাত্রি, ভোর আর সকালের মধ্যে ঠিক কতটা যে পার্থক্য তা অনুভব করেছি জীবনে ক দিন? ভোর খুব সুন্দর, তার স্মৃতি আছে, কবিতায় বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু অধিকাংশ দিনই ঘুম ভাঙে কটকটে রোদ ওঠার পর।

খবরের কাগজ আসে সাতটা দশে, সেটা সকাল। তার একঘণ্টা আগে ভোর। তা বলে পৌনে পাঁচটা নিশ্চয়ই শেষরাত্রি, এই রকম ধারণা ছিল। হঠাৎ মধ্য সেপ্টেম্বরে একদিন অসময়ে জেগে উঠলুম। সাধারণ চোখ মেলে পাশ ফেরা নয়। চোখ একেবারে ঘুমশূন্য, কে যেন আমাকে ডেকে বলল, বাইরে এস!

পাজামা ছেড়ে দ্রুত জাঙ্গিয়া, প্যান্ট, শার্ট পরে রবারের চপ্পল পায়ে গলিয়ে ব্যস্ত ভাবে নেমে এলুম সিঁড়ি দিয়ে। যেন আমার কোন জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

পুবের আকাশে সূর্য নেই, কিন্তু লেবু-রঙের আলো ফুটে উঠেছে। তা হলে এটা শেষ রাত্রি, না ভোর? ব্রাহ্ম-মুহূর্ত বলে একটা গালভরা শব্দ ছেলেবেলায় শুনেছি।

এরই মধ্যে রাস্তায় বিভিন্ন বয়েসি পুরুষ বেরিয়েছে, স্ত্রীলোকেরা আছে, টাটকা সবজি ভর্তি ঠেলাগাড়ি ছুটছে প্রাণপণে। আমি না জাগলেও প্রত্যেক দিন এই সময়ের মধ্যেই শহর জেগে ওঠে? এত মানুষ! মন্দিরের মতন কাঁসর বাজিয়ে একটা ট্রাম ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমারই জন্য এই ট্রামটা এইমাত্র এখানে এল, তাতে সন্দেহ কী? উঠে পড়লুম।

আমার পকেটে গত দিনের দু খানা দু টাকার লাল নোট। নতুন টাকাপয়সা নেবার কথা মনে পড়ে নি। কনডাকটর আসতেই তার দিকে বাড়িয়ে দিলুম একটি নোট, সে জিজ্ঞেস করল, পার্ক স্ট্রিট?

কেন নিজের থেকে বলল ওই কথা? আমাকে অন্য কোনো মানুষ বলে ভুল করেছে? তা হলে আমাকে পার্কস্ট্রিটেই যেতে হবে। কনডাকটার গালে মেহেদি লাগানো কমলা রঙের দাড়ি।

এত সকালে কে পার্ক স্ট্রিট যায়?

ট্রামটা এত জোরে ছুটছে যেন মাঝখানে অন্য কোথাও থামবে না। এই সময়ে ফুটপাতে অনেক ফুল পড়ে থাকে।

পার্কসার্কাসের মোড়ে নেমে আমি হাঁটতে লাগলুম পুরনো কবরখানার পাশ দিয়ে। আমি ছাড়া আর কোন যাত্রী এখানে নামল না কেন? ফুটপাতে লাগান হয়েছে নতুন কয়েকটা ফুলের গাছ। একটি ভিখিরি পরিবার এরই মধ্যে কাঠের আগুনে রান্না চাপিয়েছে। খিচুড়ির গন্ধ। এত ভোরে ওরা খায়? একটি কিশোরী এক গোছা জ্যাকোরাণ্ডা ফুল ছিঁড়ে এনে দিয়ে দিল সেই ফুটন্ত খিচুড়ির মধ্যে। তার মা খলখল করে হেসে উঠল।

কেমন স্বাদ হয় ওই খিচুড়ির? ওর মধ্যে আরও কী কী দেয়? ভোরবেলা কবরখানার পাশের জীবন্ত মানুষরা যে এমন আনন্দে থাকে, তা তো জানতুম না।

এ পাশের ফুটপাথ দিয়ে একজন দীর্ঘকায় কালো রঙের লোক একটা সাদা রঙের লোমশ কুকুর নিয়ে যাচ্ছে চেন বেঁধে, জার্মান স্পিৎস। অন্যদিকে একজন গাউন পরা মহিলা টান-টান করে ধরে রেখেছে একটা চকচকে কালো রঙের কুকুর, ল্যাব্রাডর না, ককার স্প্যানিয়েল? দু জাতের কুকুর পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না। তারা ফুঁসে ফুঁসে ডেকে উঠছে, মহিলা ও পুরুষটিও রাস্তার দুপাশ থেকে চোখাচোখি করছে এক এক বার। এই স্নিগ্ধ ভোরেও তাদের চোখে ঝলসে উঠছে ক্রোধ।

আমার পাশ দিয়ে চারজন সাপুড়ে গেরুয়া কাপড় দিয়ে বাঁধা বেতের ঝুড়ি ঝুলিয়ে চলে গেল। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি আরও চারজন, তাদের মধ্যে দুজন কিশোর প্রায়। এত সাপুড়ে একসঙ্গে? সত্যিই এরা সাপুড়ে? ভোরবেলা সাপুড়েদের মিছিল? সারারাত এরা কোথায় থাকে?

কিছু কিছু মানুষ সটান ঘুমিয়ে আছে ফুটপাতের ওপর। তারা সবাই ভবঘুরে বলে মনে হয় না। একটি দোকানের সিঁড়িতে পেছন ফিরে শুয়ে আছে একজন, তার জুতোজোড়া বেশ দামি মনে হয়।

শুধু কিছু কাক ডাকছে, আর কোনো পাখির স্বর শুনতে পাচ্ছি না।

একটি গাছতলায় ন্যাকড়া পেতে, তার ওপর একটা ছোট বাক্স রেখে বেশ পরিপাটি ভাবে বসেছে একজন নাপিত। আমাকে দেখে সে মুচকি হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

আমি নিজে দাড়ি কামাই। রাস্তার নাপিতের কাছে উবু হয়ে বসে গালটা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই লোকটা পার্ক স্ট্রিটেও খদ্দের পায়?

লোকটিকে অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছিলুম, তবু সে আবার ডাকল। যেন সে আমাকে কোন গোপন কথা বলতে চায়।

সে আঙুল তুলে গাছের ওপরটা দেখিয়ে বলল, একটা হনুমান!

এটা অশ্বত্থ গাছ। ডগার দিকে সত্যিই একটা হনুমান বসে আছে, তার গলায় একটা হলুদ রঙের কলার। সে একটা ডাল দোলাচ্ছে।

আমিও নাপিতটির সঙ্গে হাসি বদল করলুম। এটা একটা দেখার মতন দৃশ্যই বটে।

হঠাৎ হনুমানটি তরতর করে নেমে এল গাছ থেকে। আমি একটু ভয় পেয়ে দেয়াল সেঁটে দাঁড়ালুম। হনুমানটি ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হতে গিয়ে মাঝখান ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় একবার দাঁড়াল। এদিক ওদিক চেয়ে খুব জোরে ছুট লাগাল, এখন কী তীব্র তার গতি, লাফাতে লাফাতে ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে।

নাপিতটি পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে বলল, দেশলাই আছে, স্যার?

আমি লাইটারটি তার হাতে না দিয়ে মুখের সামনে জ্বেলে দিলুম কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে। সেই ধোঁয়ার গন্ধে আমার গলাটা আনচান করলেও চা খাওয়ার আগে আমি ধূমপান করি না।

অবিকল যেন আমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেই সে বলল, আর একটু এগিয়ে দেখুন, চা পাবেন।

তার কথার সুর শুনে মনে হয়, যেন সে আমার বাপ-ঠাকুরদাকে ও চেনে!

কালো কুকুর সমেত গাউন পরা মহিলাটি তাড়াতাড়িতে ব্রা না পরেই বেরিয়েছে। এরকম তো হতেই পারে। ভোরবেলা কে আর সাজগোজ করে। কিন্তু মহিলাটির ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। একটু ঝুঁকলেই তার বর্তুল স্তনদ্বয় দোলে। এখন রাঙা আলোয় তার মুখখানা রক্তিম। কালো, লম্বা লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ছে উলটো দিকের ফুটপাতে, হীরের মতন তার চোখ দুটো জ্বলছে।

একটু দূরে, ফুলছাপ শাড়ি-পরা একটি আদিবাসী রমণী চাপাকলে পোড়া কয়লা ধুচ্ছে। ঊরু পর্যন্ত ভিজে গেছে তার শাড়ি। সে আপন মনে কয়লা ধুয়েই চলেছে। ওই কয়লায় সে ক'পয়সা পাবে? লোকে বলে, পার্ক স্ট্রিটে নাকি কোটি কোটি টাকা রোজ ওড়ে?

এখন এখানে টাকা পয়সার কোনো গন্ধ নেই।

মধ্য শিক্ষা পর্ষদের মোড়টার কাছে গোল হয়ে বসেছে সেই সাপুড়েরা। গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো তাদের বাঁশিগুলো খুলছে। এই ভোরে এখানে এত সাপুড়ে বসেছে কেন?

আমার মতন আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে পড়ে শুনছে তাদের বাঁশি। একজন পাঠান, তার গায়ের জামাটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা। অবশ্য সে সত্যিই পাঠান কি-না তা আমার জানার কথা নয়। তবে ওই রকমই মনে হয়। একজন প্রৌঢ় সাহেব, সম্ভবত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, একজন লুঙ্গিপরা মুসলমান, তার মাথায় একটা ডিম ভর্তি ঝুড়ি।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানটি বিড়বিড় করে বলল, ওয়েইট আ মিনিট। দে'ল ক্যাচ আ স্নেক।

এই সাহেবটি প্রত্যেক ভোরবেলা এখানে সাপ ধরা দেখতে আসে নাকি?

উলটোদিকে একটা বাচ্চাদের পার্ক। বাগানটিকে ঝোপ জঙ্গলও বলা যায়। ওই বাগানে সাপ আছে নাকি? খুব খারাপ কথা। সকালবেলা আমার সাপ দেখার একটুও ইচ্ছে নেই।

সাপুড়েদের বাঁশির শব্দ ও হাতের ভঙ্গিতে আমারও মাথা দুলছিল। সাপধরা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে চাইলুম না।

পেট্রল পাম্পের ভেতর থেকে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ। শিশুটিকে দেখা যাচ্ছে না। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাশ দিয়ে ধীর মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে একটি মোষ, চকচক করছে তার কালো গা। তার শিং দুটো সাদা রং করা। ওই রংটুকু না থাকলে মনে হত, সে এইমাত্র কোনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

একটি দুটি গাড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

ছোট একটা মরিস মাইনর গাড়ি এসে থামল ফুটপাত ঘেঁষে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় নামলেন সেই গাড়ি থেকে, তার মুখ নাক অনেকটা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন। ধুতির কোঁচটা হাতে নিয়ে তিনি সাপুড়েদের বললেন, বাজাও, ভালো করে বাজাও!

যেন তিনি বিলায়েত খাঁ-র সরোদ বাজনা উপভোগ করতে এসেছেন।

পাঠানটি অকস্মাৎ মোষটির দিকে তাকিয়েই দৌড়তে শুরু করল। কিন্তু সে মোষটিকে ধরতে গেল না, সে মিলিয়ে গেল উলটোদিকে।

ডিমওয়ালাটি আমার কাছে, এসে বলল, বাবু, দেশলাই আছে?

এক সকালে পরপর নাপিত ও ডিমওয়ালা একই সুরে আমার কাছে আগুন চাইছে কেন?

আমি বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামলুম নিলামের দোকানটার সামনে। লোহার গেট টানা, গেটের ওপাশে সিঁড়ির ওপরে একটা ব্রোঞ্জের বুদ্ধের মুণ্ডু। ভেতরে না রেখে এই মূর্তিটা সিঁড়ির ওপরে বসানোর মানে কী? প্রতিদিন দোকান খোলার সময় এটাকে সরাতে হয়। দোকানদাররা কি বুদ্ধকে পাহারাদার হিসেবে রেখে যায়?

একটা নীল রঙের বেলুন উড়তে উড়তে আসছে। নিঃসঙ্গ, দূরের যাত্রীর মতন। আজকের আকাশ মেঘলা। কেন যেন আমার ধারণা ছিল, প্রত্যেকদিনই ভোরের সময় আকাশ নীল থাকে। ওই বেলুনটা ছাড়া আর কোনো নীলের চিহ্নমাত্র নেই। কিছু মেঘ এখন সোনালি, বেশ কিছু ধূপের গন্ধ দেওয়া, নর্তকীর চুলের মতন। ঈশান কোণ কোন্ দিকে?

লম্বা, কালো লোকটি এবং গাউন পরা মহিলাটি এখন দুই কুকুর নিয়ে এক ফুটপাতে। দুটো কুকুরই গজরাচ্ছে। কুকুরে কুকুরের মাংস খায় না, আলাদা জাতের কুকুর সচরাচর প্রেমও করে না, তবু ওরা দেখা হলেই তেড়ে ঝগড়া করতে যায় কেন?

কুকুর নিয়ে যারা বেড়াতে বেরোয়, সাধারণত তাদের হাতে একটা ছোট লাঠি থাকে। এদের দু'জনেরই হাত শূন্য। কালো লোকটির বুকের বোতাম সব খোলা, গোরিলার মতন লোমশ বুক। কিন্তু তার ঝকমকে দুই চোখের মাঝখানে টিকালো নাক। সে অলিম্পিকের খেলোয়াড়দের মতন সুপুরুষ।

মহিলাটি তার কুকুরের চেনটা ছেড়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রঙের কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদা কুকুরের ওপর। প্রবল ঘেউ ঘেউয়ের সঙ্গে উলটে-পালটে যাচ্ছে দুটিতে। লম্বা লোকটি কোনো বাধা দিল না। সে হাসছে। সে শিস দিয়ে বলল, মেক লাভ, নট ওয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে খসে পড়ল একটা দোকানের সাইনবোর্ড।

লম্বা, ঢোলা জামা পরা পাঠানটি দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরে এসে থমকে গেল। সাইনবোর্ডটি তুলে নিল যত্ন করে। তাতে আইসক্রিম হাতে একটা বালিকার ছবি আঁকা। পাঠানটি লম্বা, লাল জিভ্ বার করে সেই বালিকার গালটা চেটে দিল, তারপর সাইনবোর্ডটা দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে সে ছুটল আবার।

কুকুর দুটি ঝগড়া থামিয়ে পরস্পরের নাক শুঁকছে।

লম্বা লোকটি মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, হোয়াট্স ইয়োর ফোন নাম্বার?

সাপুড়েদের বাঁশি এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। ওরা কি এখনো সাপ ধরতে পারেনি?

নীল বেলুনটা মাঝরাস্তায় দুলছে।

ডোরাকাটা জাঙ্গিয়া পরা একজন টিনেম্যান বেরিয়ে এল একটা বন্ধ রেস্তরাঁ থেকে। অনেকখানি হাঁ করে সে মুখের মধ্যে আঙুল চালিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর বার করে আনলো একটা সোনার দাঁত। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে হাতেই রেখে দিল।

এবার সে একটা গান শুরু করল। মুখে সোনার দাঁত থাকলে যে গান গাওয়া যায় না, এই সহজ ব্যাপারটা এতদিন বুঝিনি।

পাশের গাড়ি বারান্দাটায় পাশাপাশি সাতজন লোক কলাগাছের মতন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। যদিও কলাগাছের উপুড় বা চিৎ কিছু হয় না, তবু এরকমটা মনে হয়। একটু দূরে লাঠিতে জড়ানো পতাকার মতন একজন স্ত্রীলোক। তার পাশ-ফেরা মুখখানিতে ঘাম মাখা, তাঁর ঠোঁটের হাসিতে একটু একটু স্বপ্ন লেগে আছে।

সাইলেন্সার পাইপ ছাড়া একটাই গাড়ি প্রবল শব্দ করে চলে গেল। কিন্তু সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না।

স্ত্রীলোকটির পাশে একজন রুখু দাড়িওয়ালা লোক উঠে বসে খড়ি দিয়ে মাটিতে অঙ্ক কষছে। আমি উঁকি দিয়ে দেখলুম, অঙ্ক নয়, ছক কাটা, সে জ্যোতিষের চর্চা করছে মন দিয়ে। তার হোমওয়ার্ক। একটা ছক শেষ করে সে আর একটা ছক আঁকল। তার কাছেই দুটো ক্রাচ রাখা। লোকটির ডান পা, না বাঁ পা, কোনটা জখম? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যে টিনেম্যানটি সোনার দাঁত হাতে নিয়ে গান গাইতে শুরু করল, তার কি একটা চোখ পাথরের?

একটা তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে।

একটা নয়, দুটো তালা, পেতলের।

মোষটা এই পর্যন্ত এসে গেছে। রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে গাঁ গাঁ করে ডেকে উঠল দু বার। ও কি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? কেউ কি ওর শিং-এর সাদা রং ধুয়ে মুছে দিতে পারে না, তা হলে ও জঙ্গলে ফিরে যেতে পারত।

সাদা ও কালো কুকুর দুটো পাশাপাশি যাচ্ছে। ওদের মালিকেরা কোথায় গেল? অন্যদিকে আর-একজন গোলগাল লোকের সঙ্গে দুটি অ্যালসেশিয়ান, তারা এদের গ্রাহ্যই করছে না। গোলগাল লোকটির পাজামার ওপর ফতুয়া পরা। মাথায় একটাও চুল নেই। লোকটি মোষটাকে দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে লুঃ লুঃ করে উঠল। কিন্তু তার পোষা কুকুর তার প্ররোচনা উপেক্ষা করে সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে লাগল আপন মনে।

বেলুনটা কি উড়ে গেল একেবারে, আর দেখতে পাচ্ছি না!

রঙিন পাউডারের মতন মিহি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টিতে গা ভেজে না। বাতাসের সঙ্গে খেলা করে।

দুটি বামন অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে। আগে তাদের বালক মনে হয়েছিল। কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বেশ খর্ব মানুষ, তারা হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে এ ওর গায়ে। তাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। একজনের হাসির উত্তরে অন্যজন হেসে উঠছে আরও জোরে। ওদের হাসির একটা ভাষা আছে। সে ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু ওরা যেন একটা গোপন খুশির বন্যা তুলে দিয়েছে। এত আনন্দ কী থেকে পাচ্ছে ওরা!

সাপুড়েদের বাঁশির সুর ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। সাপ কোনোরকম সুর, গান, শব্দই নাকি শুনতে পায় না। ওদের এই বাঁশি বাজানো তাহলে সাপ ধরার জন্য নয়? ওরা এখানকার মানুষদের ওই বাঁশির সুর শুনিয়ে রোজ জাগায়!

আমি এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। হঠাৎ কেন এসেছি এই রাস্তায়? শহরের শ্রেষ্ঠ অংশে। অথচ কিছুই চিনতে পারছি না। দিনের বেলা এই রাস্তাটা একেবারে অন্য রকম হয়ে যায়, সেটাই কি এর সত্য রূপ? অথবা দিনের বেলাতেই খুব অবাস্তব, অদ্ভুত সেজে থাকে নাকি?

গাউন পরা মহিলাটি ও কালো পুরুষটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল? কুকুর দুটো খেলা করছে, কালো ও সাদা, সাদা আর কালো। ঠিক যেন দুটো ঢেউ।

মাথায় কী যেন একটা লাগতেই চমকে উঠলুম।

সেই নীল বেলুনটা। কখন নেমে এসেছে! আমার গালে আর চুলে আদর করছে, তা হলে এই বেলুনটার সঙ্গেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

বেলুনটার গায়ে লেখা ওয়েল কাম!

দেরি

একতলায় পর পর চারটি দোকান ঘর। দোকাদের কর্মচারিদের বাড়ির মধ্যে যাওয়ার অনুমতি নেই, তাদের জন্য বাইরের দিকে একটা বাথরুম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো আমলের বাড়ি, ভেতরে একটা ঠাকুর দালান, সেখানে সারাবছর নানা রকম আবর্জনা জমে, শুধু অন্নপূর্ণা পুজোর সময় একবার সাফ সুতরো করা হয়, তখন আলো জ্বলে, মেয়েরা আলপনা দেয়। একতলায় ভেতরের দিকে আরও কয়েকটা ছোট ছোট অন্ধকার খুপরি রয়েছে, সেগুলো কিসের গুদাম কে জানে সেইসব ঘরে কোনো মানুষ থাকে না, ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর এক সময় বেরিয়ে আসে বাইরে।

দোতলায় লম্বা টানা বারান্দা, তার পাশে পাশে ঘর। সিঁড়ির মাঝখানে জুতো খোলার জায়গা। সাদা-কালো মার্বেল পাথরের বারান্দাটায় খালি পায়ে হাঁটলে একটা মোলায়েম অনুভূতি হয়। এমন সুন্দর বারান্দাটার মাঝখানে দু বছর আগে একটা উৎকট দেয়াল উঠেছে, তাতে আবার একটা বিচ্ছিরি ক্যাটকেটে সবুজ রঙের ছোট দরজা। দুই ভাইয়ের ঝগড়ায় বাড়ি পার্টিশান হয়ে গেছে, এখন ওই দেয়ালের দু-দিকে দুমহল, দুই পরিবার গম্ভীর ভাববাচ্যে কথাবার্তা হয়। কিন্তু সিঁড়ি একটাই।

তিনতলায় একটি মাত্র ঘর। সামনে বড় ছাদ। নিচের চাতাল থেকে ওঠা দুটি দেবদারু গাছের মাথা ছাদের কার্নিশ ছুঁয়ে আছে। ছাদের এক পাশে টবের গাছের বাগান।

ছাদের ওই ঘরটায় মিলির জ্যাঠতুতো ভাই দেবব্রত আত্মহত্যা করেছিল। সে তখন ডাক্তারির ছাত্র, ফোর্থ ইয়ার, টেবিল টেনিসে চাম্পিয়ন ছিল, তবু কেন সে এক রাতে গলায় দড়ি দিল, সে রহস্য সে নিজের সঙ্গেই নিয়ে চলে গেছে। তারপর প্রায় দু বছর খালি পড়ে ছিল ওই ঘরটা। সন্ধের পর এ বাড়ির অনেকেই ছাদে আসতে ভয় পেত। এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার পর মিলি ওই ঘর জোর করে দখল করে নিয়েছে। ছাদ আর ওই ঘর দুই শরিকেরই এজমালি সম্পত্তি, কিন্তু দেবব্রতর পর মিলি ওখানে উঠে এলেও তার জ্যাঠামশাইরা এখনও আপত্তি করেননি। দেবব্রত খুব ভালবাসত মিলিকে।

রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়ালে তিনতলার ওই ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটে জানলা, সব জানলায় গোলাপি রঙের পর্দা। সন্ধের পর ওই ঘর আলোয় ঝলমল করে। ওই ঘরটি যেন স্বর্গের একটা টুকরো।

রাস্তার উলটোদিকে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করে অতনুর। সে দু-তিনবার হেঁটে যায়, তাকায় তিনতলার ঘরটির দিকে, কোনো জানলায় মিলির রেখাচিত্র নেই। বই হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়া তৈরি করা স্বভাব মিলির, সে এখন পড়ছে না, সে একবারও জানলার কাছে দাঁড়ায় না। তা হলে মিলি এখন শুধু শুয়ে থাকে। কতটা অসুখ করেছে মিলির?

মিলি একটাও চিঠি লেখেনি। জ্বর হলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে, ম্যালেরিয়া হলে, ফুড পয়জনিং হলেও তো চিঠি লেখা যায়। সাধারণত অসুখই তো হয় মানুষের। মেয়েদের আর একটা অসুখের নাম শুনেছে অতনু, বিকোলাই, সেটা যে ঠিক কী অসুখ, তা সে জানে না। মিলির চমৎকার স্বাস্থ্য, গত মাসেও সে অল বেঙ্গল সুইমিং কম্পিটিশানে, ব্রেস্ট স্ট্রোকে সেকেণ্ড হয়েছে, মিলি প্রাণ খুলে হাসতে জানে। মিলির সঙ্গে কারুর ঝগড়া হয় না, সেই মেয়ের কোনো আজে-বাজে অসুখ হতেই পারে না।

চিঠি লেখার কি কোনো অসুবিধে আছে মিলির? কিংবা যাকে পোস্ট করতে দিয়েছে, সে চিঠিটা ফেলেনি ডাক বাক্সে? কলকাতায় এখন চিঠির বেশ গণ্ডগোল, তবু মিলি চিঠি লিখে থাকলে সাত দিনেও তা পৌঁছোবে না অতনুর কাছে? অতনু তো চিঠি লিখেছে, তাও কি পেয়েছে মিলি? ওদের বাড়িতে কি কেউ চিঠি খুলে দেখে?

এককালে এ বাড়ির দরজাটা চোখে পড়বার মতন ছিল নিশ্চয়ই। বিশাল, পুরু কাঠের দরজা, চারপাশে লোহার বড় বল্টু মাঝখানটায় নানা রকম ডিজাইন। কিন্তু দরজাটা কোনো এক সময় ভেঙে যাওয়ার পর মেরামত করা হয়েছে, পুরনো কাঠ ও নতুন কম-দামি কাঠের অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকটু দেখায়, তলার দিকটাও এখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে।

দরজাটা খোলাই থাকে। তার বাইরে টুলের ওপর বসে থাকে একজন বুড়ো দারোয়ান। অনেককাল থেকে আছে, তাই একে ছাড়ানো হয়নি, এর মৃত্যু হলে এ বাড়িতে দারোয়ান রাখার প্রয়োজন হবে না।

দারোয়ানটি বসে বসেই প্যাঁচার মতন চোখ উলটে ঘুমোয়। কিন্তু তার পাশ দিয়ে কেউ গেলেই সে দেখতে পায়। দু-দিন আগে, খুব গাঢ় দুপুরবেলায় অতনু তার কাছে জিজ্ঞেস করেছিল, মিলি দিদিমণি আছেন? দারোয়ানটি হাই তুলে বলেছিল, কোউন দিদিমনি? মিল্লি দিদিমনি? হাঁ আছে, দিদিমনির বোখার হয়েছে।

—অসুখ হয়েছে? কী অসুখ?

—কেয়া মালুম।

মিলির অসুখের পাকা খবর শুনে অতনু বেশ নিশ্চিন্তই বোধ করছিল। অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। অতনুর ভয় ছিল অন্য। শনিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে অতনুর পৌঁছোতে দেরি হয়েছিল ঠিক বারো মিনিট। মিলির কাছেই ছিল টিকিট। নাটক শুরু হয়ে গেছে, অতনু ভেবেছিল, মিলি তার জন্য আর অপেক্ষা না করে ঢুকে গেছে ভেতরে। গেটের লোকটির কাছে সে টিকিট রেখে যায়নি।

টিকিটের নম্বর মনে ছিল অতনুর, গেটের লোকটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে সে ঢুকে গিয়েছিল হলের মধ্যে। পাশাপাশি দুটো সীটই খালি। মিলি আসেনি, না রাগ করে ফিরে গেছে? এমনও তো হতে পারে, যে মিলিরই দেরি হচ্ছে। অতনু বসে পড়েছিল। মিলি আর এল না। কিন্তু এতই ভাল নাটক যে অতনু উঠে যেতে পারল না, সে পুরোটা দেখল, মিলিকে বাদ দিয়ে।

তারপরেই তার সাঙ্ঘাতিক এক অপরাধ বোধ জাগল। সে বারো মিনিট দেরি করে এসেছে, মিলি হয়তো আরও আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল। নাটক শুরু হয়ে যাবার পর। সে একা দেখতে চায়নি বলে ফিরে গেছে, আর অতনু স্বার্থপরের মতন....

সেই রাতেই মিলির কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো উপায় নেই। পরদিন সকল ছ'টা দশের ট্রেনে অতনুর জামসেদপুর যাবার কথা। মিলি জানে, অফিসের কাজে যেতেই হবে অতনুকে। সেদিন যেতে যেতে অতনুর মনে হয়েছিল, ট্রেনের কামরায় আর একটিও মানুষ নেই, জানলার বাইরের পৃথিবীটা সাদা রঙের। বাতাসে মিলির অভিমান।

বর্ষাকালে মিলির সঙ্গে একদিন ট্রেনে চেপে কোলাঘাটে বেড়াতে যাবার কথা আছে। এখনও বর্ষা নামেনি। যে-মানুষ থিয়েটার দেখতে বারো মিনিট দেরি করে আসে, তার সঙ্গে কি আর কোনোদিন কোথাও যেতে রাজি হবে মিলি? দু দিন বাদে জামসেদপুর থেকে ফিরে এসে মিলির খোঁজে সে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে, কফি হাউসে গিয়েছিল। মিলির বন্ধু-বান্ধবীদের সে দেখতে পেয়েছে, মিলি ছিল না। মিলির কথা কেউ জানে না।

ভালবাসার মধ্যে সন্দেহ, ঈর্ষা, আশঙ্কা, ভুল বোঝাবুঝি এরকম কত কাঁটা যে থাকে। অতনুর মনে হয়েছিল, এমনই রাগ হয়েছে মিলির যে সে অতনুর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। অতনুর সঙ্গে মিলির আর দেখা হবে না।

একবার এরকম সন্দেহ জাগলে জিভটা তেতো হয়ে যায়, সিগারেটে স্বাদ থাকে না। বইয়ের পাতায় চোখ থাকলেও মন থাকে না, স্নানের ঘরে দশ মিনিট শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কেউ কোনো কাজের কথা বলতে এলে কান বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং মিলির অসুখের খবর শুনলে অতনুর খুশি হবার কথা। এ তো সাময়িক বিচ্ছেদ। মিলি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না, মিলির চিঠি লেখার নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধে আছে। মিলিদের বাড়ির ওপরে কখনো যায়নি অতনু। মিলি আসতে বলেনি। মিলি তার মা সম্পর্কে অনেক কথা বলে, কিন্তু বাবা সম্পর্কে না। মিলির ভাই নেই, দুই দিদি জামাইবাবু, তার মধ্যে এক জামাইবাবু সম্পর্কে অনেক গল্প, অন্যজনের নামও উল্লেখ করে না একবারও, এইসব কিছুর মধ্যে একটা অজানা গল্প আছে নিশ্চিত। তার এক জ্যাঠতুতো বোন সব সময় হিংসে করে তাকে। জ্যাঠামশাই এক সময় খুব ভালবাসতেন মিলিকে। কিন্তু দেবব্রতর মৃত্যুর পর তিনি আর কারুর সঙ্গেই কথা বলেন না। বাড়ি পার্টিশান হয়েছে জ্যাঠাইমার উদ্যোগে।

মিলির কাছে যেতে হবে, মিলির কাছে যেতে হবে।

এটা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার? ওই বুড়ো দারোয়ানের কাছে, কিংবা ও বাড়ির যে-কোনো লোকের কাছে গিয়ে বললেই তো হয়, আমি মিলির বন্ধু, আমি একবার মিলির সঙ্গে দেখা করতে চাই। নিশ্চয়ই তাতে কেউ আপত্তি করবে না।

কিন্তু এমন একটা সহজ কাজও অতনু সেনগুপ্তর পক্ষে দুঃসাধ্যতম। লাজুকতা তো পৃথিবী থেকে উঠে গেছে। একটি চব্বিশ বছরের যুবক, পড়াশুনো শেষ করে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, তার কি লাজুক হলে চলে? যে-কেউ শুনে হাসবে, মিলির অসুখ হয়েছে, অতনু তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে?

আমি মিলির বন্ধু, আমি একবার মিলির সঙ্গে দেখা করতে চাই, এই কথাটা মুখ ফুটে বলার মতন সাহস কিছুতেই মনে আনতে পারে না অতনু। মিলি তার বাড়ির কারুর সঙ্গে এ পর্যন্ত পরিচয় করিয়ে দেয়নি, যদি কেউ অতনুকে দেখে ভুরু কুঁচকোয়? যদি বুড়ো দারোয়ানটি বলে, হুকুম নেহি!

যারা কোনো রকম প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারে না, তারাই তো লাজুক হয় বেশি।

অতনুর যদি হঠাৎ অসুখ হত, তা হলে মিলি নিশ্চিত তাদের বাড়িতে দেখা করতে যেত। অতনুও তিনতলার ঘরে থাকে, কারুকে কিছু না বলে মিলি সোজা উঠে যেত তিনতলায়। মিলি মাঝে মাঝে অতনুকে বলে, আমার বদলে তোমারই মেয়ে হওয়া উচিত ছিল। মিলি এ কথাও বলে, পুরুষ মানুষদের লজ্জা দেখতে আমার ভাল লাগে। চারদিকে এত সব নির্লজ্জ, বেহায়াদের ভিড়!

থিয়েটার দেখার দিন অতনু বারো মিনিট দেরি করেছিল, আর এখন সে সাতদিন দেরি করে ফেলছে। মিলি নিশ্চয়ই প্রত্যেকবেলাই ভাবছে, এই অতনু এল, এই অতনু এল!

মিলিদের বাড়ি বড় রাস্তার ওপরে, পাশ দিয়ে একটা গলি। সেই গলি দিয়ে পেছনে একটা খেলার মাঠ। এখান থেকেও মিলিদের বাড়ির ছাদ দেখতে পাওয়া যায়। দুটি সতৃষ্ণ চোখ সেই ছাদের দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে মিলির কোনো চিহ্ন নেই।

ছাদ থেকে দুটি মোটামোটা জলের পাইপ নেমেছে, তাতে কাঁটাতার জড়ানো। কারুর কাছ থেকে অনুমতি চাওয়ার বদলে, সন্ধের পর ওই পাইপ বেয়ে ওঠা অতনুর পক্ষে সহজ। যা সহজ, তাও করা যায় না সব সময়। মিলি জিজ্ঞেস করবে, তুমি কী করে এলে? অতনু উত্তর দেবে, আমি পাইপ বেয়ে উঠেছি! যাঃ, সে কী হিন্দী সিনেমার নায়ক নাকি?

মিলির কাছে যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, মিলির কাছে একবার যেতে হবে।

অফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে একবার এই রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায় অতনু। দারোয়ানের টুলটা খালি, সে কোথায় যেন গেছে। কোনো চিন্তা না করে অতনু ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একতলার বারান্দাটা অন্ধকার মত আর ঠাণ্ডা। ওপর থেকে একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়েছে, কিচির মিচির করছে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি। গোটা বাড়িতে আর কোনো শব্দ নেই। অতনু জানে, সকাল ন'টা দশটায় কিংবা বিকেল পাঁচটা ছ'টায় এ রকমভাবে ঢুকে পড়লেও খুব বিসদৃশ দেখাত না। ওইরকম সময়ে লোকে দেখা করতে আসে। কিন্তু এখন দুপুর পৌনে তিনটে। এখন হঠাৎ কেউ তাকে দেখতে পেলে চোর ভাবতে পারে। আমি মিলির বন্ধু, একথা শুনলে ভাববে বন্ধু নয়, লম্পট! কিন্তু সকালে বা বিকেলের ভদ্র সময়ে অতনু আসতে পারে না, তখন মিলির ঘরে নিশ্চয়ই অন্য লোক থাকবে, তাদের সামনে অতনু একটাও কথা বলতে পারবে না। সে পারে না। মিলির অন্য বন্ধুদের সামনেও সে সহজ হতে পারে না। অতনু সেনগুপ্ত এই রকমই, তো কী করা যাবে?

ঠাকুর দালানের পাশ দিয়েই সিঁড়ি। সিঁড়ির মাঝখানে একটা দরজা। দুপুরবেলা ওরা এই দরজাটা বন্ধ করে রাখে। বুড়ো দারোয়ানকে বিশ্বাস নেই। তাহলে অতনুকে ফিরতে হবে। বন্ধ দরজা খোলার জন্য সে তো কারুকে ডাকাডাকি করতে পারবে না।

অতনু তক্ষুনি ফিরে না গিয়ে ঠাকুর দালানের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল। যদি কেউ সিঁড়ির দরজা খুলে নেমে আসে, এখানে লুকোবার অনেক জায়গা আছে। মিলিদের বাড়ির মধ্যে এসেছে, তার মানেই যেন মিলির অনেকটা কাছাকাছি এসেছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেও কেউ নেমে এল না। তখন অতনুর মনে হল, এমনও তো হতে পারে, সিঁড়ির ওই দরজাটা শুধু ভেজানো, আজ কেউ বন্ধ করতে ভুলে গেছে। একবার দেখতে দোষ কী?

পা টিপে টিপে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠল। আস্তে ঠেলল দরজাটা। সত্যি সেটা খোলা। এই দরজার পাশে অনেক জুতো। দেয়ালে জুতোর র‍্যাক। অতনু সু খুলল, মোজা পরা রইল পায়ে। এতে পায়ের আওয়াজ কম হবে। চোরেরা কি পায়ে মোজা পরে আসে? প্রথম মহলটা মিলির জ্যাঠামশাইদের, অতনু তা জানে। কে আসছে, যাচ্ছে, ওঁরা কি নজর রাখেন? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কে? অতনু কী উত্তর দেবে? পেছনে ফিরে দৌড়ে পালাবে?

সিঁড়ির মুখটায় বেশ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অতনু। তার বুকের মধ্যে একটা ইঞ্জিন চলছে। কিন্তু তার উপায় নেই, সে আর ফিরে যেতে পারবে না।

এখানে কোথাও পায়রার বাসা আছে, শোনা যাচ্ছে শুধু পায়রাদের ঝটপটানি, মৃদু বকম বকম, কোনো মানুষের শব্দ নেই।

অতনু নিজের মনে মনে দু-বার বলল, আমি অতনু সেনগুপ্ত, আমি চোর নই। আমি খারাপ লোক নই, আমায় ভুল বুঝবেন না।

তারপর সে আস্তেও নয়, জোরে নয়, স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে লাগল সাদা-কালো পাথরের বারান্দা দিয়ে। একটা ঘরে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, এক নারী ও এক পুরুষ, কিন্তু তারা বারান্দার দিকে চেয়ে নেই। ওরা যদি বেরিয়ে আসে। অতনু বলবে, আমি ডাক্তার। আমি মিলিকে দেখতে এসেছি। ডাক্তাররা অসময়ে আসতে পারে। তারা ঘোর দুপুরে আসে। তারা মাঝরাতে আসে।

মনে মনে এই রকম কৈফিয়ত তৈরি করা অতনুর পক্ষে সহজ। কেউ বেরিয়ে এল না। দুই মহলের মাঝখানে দেওয়াল ও সবুজ দরজা। এ দরজা বন্ধ থাকবে নির্ঘাত। এখানে ডাক্তার পরিচয় দেওয়াও চলবে না। মিলির জ্যাঠামশাইদের বাড়ির লোকেরা মিলিদের ডাক্তারকে চিনতে নাও পারেন, কিন্তু মিলির বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিনবে! রাস্তা থেকে একটা ডাক্তার তো এমনি এমনি মিলিকে দেখতে আসতে পারে না।

আমি মিলির বন্ধু ও ডাক্তার.....মিলির অসুখ হয়েছে শুনে.....হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে....অন্য সময়, সময় পাই না......

কী আশ্চর্য, এই দরজাটাও খোলা। দুই শরিকের ঝগড়া, তবু দরজটা খোলা থাকে কেন? কেউ যেন অতনুর জন্যই খুলে রেখেছে। মিলির বাবা এই সময় নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকবেন না। আজ ছুটির দিন নয়। তবে তিনি রিটায়ার করেছেন কিনা, তা মিলি বলেনি। তার বাবা বেঁচে আছেন, তবু বাবা সম্পর্কে সে নীরব। দুই জামাইবাবুর পক্ষে এই সময় উপস্থিত থাকা খুবই অস্বাভাবিক। মা ছাড়া আর কে কে আছেন বাড়িতে?

কাছেই পরিষ্কার পুরুষ কণ্ঠ। রাগারাগি করছে যেন কার সঙ্গে। বেশ জোরে জোরে। এবার অতনু ধরা পড়ে যাবেই। এখন যে-যাই বলুক, মিলির সঙ্গে অন্তত এক পলক দেখা না করে সে কিছুতেই ফিরবে না।

ওটা রেডিওর নাটক। পুরুষ কণ্ঠের রাগারাগির পর নারী কণ্ঠের কান্না, সে সঙ্গে সেতারের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক। একজন কেউ জেগে জেগে রেডিও শুনছে।

বারান্দা আরও অনেকটা চলে গেলেও ছাদের সিঁড়িটা একেবারে পাশেই। সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অতনু সেই সিঁড়িতে পা দিল। যে কথাটা মিলিকে এতদিন বলা হয়নি, সেটা আজ বলতে হবে। মিলি, তুমি আমার হও। আর দূরে দূরে থাকা যাচ্ছে না। তোমার এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। তুমি পরের বছর প্রাইভেটে এম-এ দিও।

অসুখের সময় মিলিকে কি একলা রেখেছে? এ ঘরে অন্য কেউ শোয় তার সঙ্গে? মিলির মা? কোনো বয়স্কা দাসী? অতনুর মুখখানা কাতর হয়ে এল, মনে মনে বলল, না প্লিজ, এতদূর আসবার পর এখন মিলির ঘরে আর কারুর থাকার দরকার তো নেই। বিশেষত মিলির মা থাকলে সে মরমে মরে যাবে।

ছাদের টবের গাছগুলোতে অনেকদিন কেউ জল দেয়নি। এই গরমে গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। মিলির ওপরেই বোধহয় জল দেওয়ার ভার ছিল। মিলি একটা ঝারি নিয়ে ফুলের গাছে জল দেবে সেই অবস্থায় মিলিকে একদিন দেখতে চায় অতনু।

মিলির ঘরের দরজা খোলা, সেখানে ঝুলছে পর্দা। ঠিক চোরেরই মতন, পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে আগে দেখে নিল অতনু, না। মেঝেতে কেউ শুয়ে নই, চেয়ারে কেউ বসে নেই, খাটের ওপর একটাই শরীর।

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে অতনু তিনবার ডাকলো, মিলি, মিলি, মিলি!

মিলি জাগল না। অতনু কি ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকবে? হঠাৎ যদি মিলি ভয় পেয়ে যায়? চেঁচিয়ে ওঠে?

তবু আস্তে করে মিলির কপালে হাত রাখল অতনু। তবু মিলির কোনো সাড়া নেই। মিলি কি ঘুমিয়ে আছে, না অজ্ঞান? কিংবা তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। তা হলে তো ওকে জাগানো ঠিক নয়। মিলি জানতে পারবে না যে অতনু এসেছিল?

অতনুর বুক কাঁপতে লাগল। এমন দুর্বল বোধ হচ্ছে, যেন সে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। এতক্ষণ সে প্রাণপণে তার মনের সমস্ত জোর একাগ্র করেছিল, এখন যেন সব নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সে জানে, এই অবস্থায় ফিরে যাবার সময় সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। সবাই তাকে অপমান করবে। মিলি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে আছে, সে জাগে নি। তবু তার ঘরে ঢুকেছিল কোন্ বদমাশ!

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মিলি। বালিশে ছড়ানো তার গুচ্ছ চুল। হলুদ রঙের শাড়ি পরা। একটু একটু কাঁপছে তার বুক। এই মিলি তার নিজস্ব।

কয়েক পলক চুপ করে রইলো অতনু। মিলি যেন সেই রূপকথার রাজকন্যা। সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি অদল-বদল না করলে তার চেতনা ফিরবে না। কোথায় সেই সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি!

মিলির মাথার কাছে ছোট টেবিলে টিক টিক করছে একটা ঘড়ি। অতনু ঘড়িটা তুলে নিয়ে মিলির পায়ের কাছে রাখল। কিছুই হলো না। মিলির পায়ের কাছে একটা জাপানি হাতপাখা, খুব সম্ভবত লোডশেডিং-এর জন্য। সেটা তুলে নিয়ে অতনু রাখল মিলির মাথার কাছে। আর কিছু নেই।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা বই। ঘুমোবার আগে মিলি পড়ছিল নিশ্চয়ই। বইটা তুলে নিয়ে দেখল অতনু। রাইনের মারিয়া রিল্‌কের কবিতা সংগ্রহ। মিলির প্রিয় কবি। বইটা বন্ধ করে সে মিলির বুকের কাছে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মিলি চোখ মেলল। প্রথমে একটুখানি, আস্তে আস্তে পুরোপুরি। অতনুকে দেখে সে একটুও অবাক হল না। সে খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, তুমি এসেছ? এত দেরি করলে?

অতনু বলল হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল। তোমার কী হয়েছে মিলি?

মিলি বলল, আমার সারা গায়ে খুব ব্যথা। সেদিন তুমি থিয়েটারে আসতে দেরি করলে, তখনই আমার জ্বর এসে গেল, তারপর থেকেই খুব ব্যথা। তুমি আর কখনো দেরি করো না।

অতনু বলল, না, আর দেরি হবে না। কিসের ব্যথা তোমার, ডাক্তার কী বলছেন?

মিলি বলল, জানি না। কোনো ওষুধ খেয়েও সারছে না। শরীরের সব জায়গায়, প্রতিটি ইঞ্চিতে ব্যথা! আঃ ভীষণ ব্যথা! অতনু, আমি কি মরে যাব?

অতনু বলল, না, এমন বলতে নেই, তোমার ব্যথা কমে যাবে।

মিলি বলল, তুকি কী করে জানলে? তুমি কি ডাক্তার?

অতনু বলল, এবার তুমি সেরে উঠবে। আমি আর দেরি করব না। তোমার শরীরে সাত লক্ষ চুমু খাব, প্রতিটি ইঞ্চিতে, তা হলে সব ব্যথা কমে যাবে।

মিলি এবার হাসল। অতনুর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, তুমি পারবে? দাও, আমার ব্যথা কমিয়ে দাও।

অতনু মিলির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, তার পায়ের পাতার ওপর থেকে শাড়ি সরিয়ে দিয়ে বলল, এইখান থেকে শুরু করি?

মিলি বলল, ঠিক গুনে গুনে সাত লক্ষটা চাই কিন্তু, একটাও কম হলে চলবে না!

সুর সুন্দরী

ওরা চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বীরেন শুনতে পেলেন দুটি শালিক পাখির ঝগড়া, একতলার কল থেকে জল পড়ার ছড়ছড় শব্দ, কোনো একটি ঘরের জানলার সামান্য ক্যাঁচকোঁচ। এইসব আওয়াজগুলো যেন নিস্তব্ধতার ভূষণ, বাড়িতে লোকজন থাকলে শোনা যায় না।

এখানে সমুদ্রের একটানা শব্দ পৌঁছোয় না। কাগজ পড়া ছেড়ে বীরেন পাশের ঘরের টেবিলের ড্রয়ার কয়েকটা খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। সুকান্ত তার সিগারেট এখানেই রাখে। কালই বীরেন তাকে একসঙ্গে পাঁচ প্যাকেট কিনতে দেখেছেন। এখন একটাও পাওয়া গেল না। পাঁচ প্যাকেটই সঙ্গে নিয়ে গেল?

অ্যাসট্রেতে একটা সিগারেট অর্ধেক অবস্থায় ঠেসে দেওয়া। বীরেন সেটাই তুলে ডগার কালো ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। মোম জ্বালাবার জন্য দেশলাই আছে তাঁর ঘরে। বীরেনের সিগারেট খাওয়া নিষেধ হয়ে গেছে। আজ তিনি অনিয়ম করবেন।

সিগারেটের টুকরোটা ধরবার পর তিনি অনেক দূরে যেন থুপ থুপ শব্দ শুনতে পেলেন। একটু মনোযোগ দেবার পর তিনি বুঝলেন শব্দটা আসছে তাঁদেরই বাড়ির একতলা থেকে। তিনি বারান্দার রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

পুরনো আমলের বাড়ি। মাঝখানে উঠোন, তিনদিকে বারান্দা, সেই বারান্দার সঙ্গে ঘর। একতলা, দোতলা, তিনতলা একই রকম। বীরেনের হাইকোর্টের বন্ধু অশোক মহাপাত্রদের এই বাড়িটা অনেকদিন খালি পড়ে আছে। বিক্রি করতে চায়। বীরেন বাড়িটা কেনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখালে অশোক মহাপাত্র জোর করে তাঁকে সপরিবারে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভালই হল, বীরেনের মেয়ে-জামাই অনেকদিন বাদে বিদেশ থেকে ফিরেছে, একসঙ্গে পুরী বেড়ানো হল।

বাড়িটার একটাই দোষ। এখান থেকে সমুদ্রের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না, শব্দও শোনা যায় না।

তিনতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বীরেন উঁকি মেরে দেখলেন, একতলার উঠোনে একজন রমণী একটা পিঁড়ি পেতে তার ওপরে কিছু জামা-কাপড় সাবান কাচা করছে। রমণীটিকে বীরেন আগে দেখেননি। স্থানীয় কোনো মেয়েকে আজই নিযুক্ত করা হয়েছে নিশ্চয়ই। এসব ব্যবস্থাপনার ভার অঞ্জনার। তাঁর এই পুত্রবধূটি খুবই কাজের, কোনো নতুন জায়গায় গেলে চোখের নিমেষে সংসার গুছিয়ে ফেলে। বীরেনের ছেলে রণিত অতি অলস প্রকৃতির, তার বউ তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। স্ত্রীলোকটির এক উরুর ওপর থেকে শাড়ি সরে গেছে, এখানে এরা বিচিত্রভাবে শাড়ি পরে, প্রায়ই এক উরু খোলা দেখা যায়। বিশেষ করে তেলেঙ্গিরা এই রকম শাড়ি পরে। তাছাড়া, স্ত্রীলোকটি বোধহয় ভেবেছে, বাড়িতে কেউ নেই।

বেশ মসৃণ, তৈলাক্ত উরু, রঙটা বীরেনের চশমার ফ্রেমের মতন। স্ত্রীলোকটির মাথার চুলও অনেক, পিঠের ওপর ঢাল দেওয়া, বয়েস বেশি নয় বোধহয়।

বীরেন কয়েক পলক মাত্র দেখলেন, তারপর সরে এলেন। তাঁর ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। ওরা কি তাঁকে আর পুরুষ মানুষ বলে গণ্যই করে না? একটি যুবতী স্ত্রীলোককে তাঁর সঙ্গে এই ফাঁকা বাড়িতে রেখে গেছে। কিংবা বীরেনকে ওরা এমনই বুড়োর দলে ঠেলে দিয়েছে যে আর সন্দেহের যোগ্যই মনে করে না।

বীরেনের বয়েস চৌষট্টি, তাঁর ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। মন্দিরা আর সুকান্ত থাকে কানাডায়। ছেলে ও মেয়ে দু ঘরেই নাতি-নাতনি এসেছে, তিনি এখন ঠাকুরদা।

নিজেকে ঠাকুরদা ভেবে বীরেন আবার হাসলেন। আগেকার দিনের এই ঠাকুরদা শ্রেণীর লোকদের নাম হত নিশানাথ বা বরদাকান্ত, তারা হাতে ছড়ি নিয়ে মর্নিংওয়াকে যেত, কুমারী মেয়েদের মা বলে ডাকত, প্রকাশ্যে অসুখ-বিসুখের আলোচনা করতে লজ্জা পেত না। নিজেকে সেই দলে ফেলার কথা বীরেন কল্পনাও করতে পারেন না। তাঁর এখনো দাঁতের জোর আছে, পেশীতে শক্তি আছে, চারতলার সিঁড়ি অনায়াসে উঠে যেতে পারেন, বড় মাছের মুড়ো খেতে ভালবাসেন। একবার একটু সামান্য ইসকিমিয়ার খোঁচা ছাড়া আর কোনো রোগ-ভোগ নেই শরীরে। ওই ইসকিমিয়ার অজুহাতে অঞ্জনা জোর করে তাঁর সিগারেট টানার অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

দু বছর আগে সুমিত্রা হঠাৎ বিনা নোটিসে পৃথিবী থেকে কেটে পড়ায় অঞ্জনাই এখন খবরদারি করে শ্বশুরের ওপর। সুমিত্রা তাঁর জেদি স্বামীর ওপর এতটা জোর খাটাতে পারতেন না।

বীরেন এসে আবার খাটে শুয়ে পড়ে খবরের কাগজটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। আজ ওরা সবাই কোনারক দেখতে গেল। একটা স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করেছে। বীরেন যেন যাবেনই না ওরা ধরেই নিয়েছিল। বীরেনকে একবারও

জিজ্ঞেস করেনি। অঞ্জনা কাল রাত্তিরে খাবার টেবিলে বলেছিল, বাবা, আপনি একা থাকবেন, অসুবিধে হবে না তো? অর্থাৎ, বীরেন তো বুড়ো মানুষ, তাঁর কোনারক দেখতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওরা খুব আধুনিক হয়েছে, বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে গেছে, বীরেনকে নিতে চায়নি। গাড়িতে জায়গা হবে না, সেটাই কি আসল কারণ? বীরেন নিজের মুখে যেতে চাইলে ওরা কি না বলতে পারত? বীরেন তো তাঁর ছেলে-মেয়ে-জামাইয়ের ওপর নির্ভরশীল নন, তাঁর ভাল টাকা পেনশন আছে। বেশ কিছু টাকা জমা আছে ব্যাঙ্কে, কলকাতার বাড়িটি এখনো তাঁর নামে। সেইজন্যই অঞ্জনা প্রতিদিন ঠিক সময়ে, সস্নেহ অনুযোগ করে, বীরেনকে ওষুধ খাওয়াতে আসে না। ওরা তাঁকে কোনারক নিয়ে গেলনা বলে বীরেন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, একবার ভেবেছিলেন, তিনি নিজে আলাদা একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাবেন। একটু পরেই অবশ্য নিবৃত্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ছেলে-মেয়ে, জামাই-পুত্রবধূর সঙ্গে তো তাঁর ঝগড়া হয়নি! ওরা তাঁকে ঠিক মতন বুঝতে পারে না।

কোনারক মন্দির অবশ্য তিনি আগে দু বার দেখেছেন। একবার সেই অনেক আগে, তখন তিনি বিয়েও করেননি, তাঁর এক বন্ধু তখন চাকরি করত ওই মন্দিরের চত্বরেই, সেখানে তাঁর কোয়ার্টার ছিল। বীরেনরা এসেছিলেন চার বন্ধু মিলে। সেই বন্ধুর কোয়ার্টারে রান্না করে খেতেন নিজেরা। তিনদিন ধরে দেখেছেন মন্দির, কোন মূর্তিই বাকি থাকেনি। একদিন রাত্তিরে খানিকটা মদ্যপানের পর বীরেন একলাই উঠে গিয়েছিলেন মন্দিরের একেবারে চূড়ার কাছাকাছি। বন্ধুরা সমস্বরে বারণ করেছিল, ওরা দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু বীরেন উঠেছিলেন ও নেমেছিলেন ঠিকঠাক। ছেলেমেয়েদের কাছে এই গল্প করলে তারা বিশ্বাস করবে? বীরেনের চুলগুলো পেকে গেছে, তাঁকে এখন বুড়োই দেখায়। এই বুড়ো বাপ কোন একদিন ছোকরা ছিল এবং অতবড় মন্দিরের গা বেয়ে বাঁদরের মতন উঠে গিয়েছিল একেবারে ডগায়, এটা শুনলে তারা হাসবে না? বীরেন সেইজন্যই বলেননি কিছু।

তিনি আরও যা করেছিলেন, তা তো বলাই যায় না।

সেবার কোনারকে আসবার আগেই বীরেন সুর সুন্দরী মূর্তির একটা ছবি দেখেছিলেন। সেই সুর সুন্দরীর ঠোঁটের হাসির ভঙ্গিটি দেখে তাঁর বুক আনচান করে উঠেছিল। কোথায় লাগে মোনালিসার হাসি। যত সব সাহেবদের পাবলিসিটি! সুর সুন্দরীর হাসির চেয়ে আর সুন্দর কিছু হতে পারে?

মদ্যপান করে মন্দিরের গা বেয়ে ওপরে ওঠার প্রধান কারণই ছিল সুর সুন্দরী মূর্তির কাছে যাওয়া। অনেকটা উঁচুতে দুটি মূর্তি। হাতে কী যেন একটা বাদ্যযন্ত্র, অপূর্ব নাচের ভঙ্গি, আর সেই দেবদুর্লভ হাসি। ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না ছিল সেদিন, মন্দিরের ওপর থেকে তাকিয়ে বহুদূর পর্যন্ত কোনো সভ্যতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, বীরেনের মনে হয়েছিল তিনি হাজার খানেক বছর পিছিয়ে গেছেন।

সুর সুন্দরী মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে তিনি হঠাৎ উতলা হয়ে পড়েন। তাঁর দুটি হাত রাখেন সেই পাথরের মূর্তির স্তনে, তারপর সেই মূর্তির ওষ্ঠের হাসিটুকু তুলে নেবার জন্য তিনি সেখানে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালেন। যেন পাথর হঠাৎ রক্ত-মাংস হয়ে উঠবে। একটা যেন স্পন্দন অনুভব করা গিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার এসেছিলেন বিয়ের পর, সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর সেই বন্ধুটি আর সেখানে কাজ করে না। সেবারে মন্দিরের গা বেয়ে ওঠার কোনো প্রশ্নই ছিল না। অন্যান্য টুরিস্টদের মতনই তাঁরা দুজন ঘুরলেন, পিছন পিছন নাছোড়বান্দা গাইড, মন্দিরের পটভূমিকার ছবি তুলে দেবার জন্য স্থানীয় ফটোগ্রাফার। ওদের কাটিয়ে একটু নিরালা পাবার পর বীরেন সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলেন ওপরের সুর সুন্দরী মূর্তির দিকে। এখনো সেই অম্লান হাসি। সেই বিপুল নিতম্বিনী, পৃথুল স্তনী রমণী যেন তাঁকে ডাকছে। তিনি সুমিত্রাকে বলেছিলেন, ওই যে দেখছ মূর্তিটা, একবার আমি ওপরে উঠে ওকে চুমু খেয়েছিলাম। সুমিত্রাও বিশ্বাস করেনি, যাঃ অসভ্য বলে অরুণ বর্ণ মুখ করে তিনি কথা ঘোরাবার জন্য বলেছিলেন, এই বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে, ওই ডাবওয়ালাকে ডাক না!

তারপর আর আসা হয়নি বহুবছর, কিন্তু সুর সুন্দরী মূর্তির মুখ চোখের সামনে ভাসছে। এবারে গেলে দেখা যেত, তার হাসিটা ঠিক একইরকম আছে কি না! সুর সুন্দরীর বুকে তিনি হাত দিয়েছিলেন, এই কথা মনে পড়তেই, এত বছর বাদে, চৌষট্টি বছর বয়সে, তাঁর যৌন উত্তেজনা হল।

বীরেন উঠে পড়লেন খাট থেকে। আজ সিগারেট খেতেই হবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্বর্গদ্বারের দিকে গেলে অবশ্য মনটা অন্যদিকে ফেরানো যায়। কিন্তু ওরা তাঁকে কোনারকে নিয়ে গেল না, এই ক্ষোভটা তিনি কিছুতেই চাপা দিতে পারছেন না। একবার জিজ্ঞেস করল না পর্যন্ত! সুমিত্রা বেঁচে থাকলে তিনি আর সুমিত্রা নিশ্চয়ই আলাদা যেতেন। সুমিত্রার জন্য বুকের মধ্যে এক ঝলক টনটনে ব্যথা অনুভব করলেন।

সুকান্তর ঘরটা ভাল করে খোঁজার পর একটি প্যাকেটে দুটি মাত্র সিগারেট পেলেন তিনি। এতেই আপাতত কাজ চলে যাবে। একটি আস্ত সিগারেট ধরাবার পর তিনি যেন আত্মমর্যাদা ফিরে পেলেন। এর আগে তিনি অ্যাসট্রে থেকে আধপোড়া সিগারেট তুলে খেয়েছেন, এটা তার ছেলে-মেয়ে-পুত্রবধূরা বিশ্বাস করতে পারবে? একলা বাড়িতে থাকলে সবই সম্ভব!

সিগারেটের সঙ্গে একটু চা খেলে বেশ হত। তিনি বারান্দার রেলিং-এর কাছে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন। স্ত্রীলোকটি এখনও কাপড় কেচে যাচ্ছে মন দিয়ে। তার এক উরু এখনও খোলা। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। বীরেন ডাকলেন, এই যে, শোন!

মেয়েটি রীতিমতন চমকে উঠল। নেহাৎ খটখটে দিনেরবেলা তাই, নইলে ভূতের ভয় পেতে পারত। একটা অস্ফুট শব্দ করে সে তাকাল ওপরের দিকে।

বীরেন তাকে এক ঝলক অভয় হাসি উপহার দিয়ে বললেন, এক কাপ চায়ে লানে সেকে গা! পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল, হিন্দির দরকার নেই, এরা বাংলা বোঝে। তিনি আবার বললেন, এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে? মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল।

ঢোলা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বীরেন একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলেন। তারপর প্রজাপতির মতন সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, একটু চা নিয়ে এস তো!

টাকাটা উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উঠোনের জলে পড়ার আগেই মেয়েটি খপ করে ধরে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

বীরেন নিশ্চিন্ত হলেন। মেয়েটি তাঁর কথা বুঝেছে।

আবার তিনি খাটে ফিরে এসে খবরের কাগজ খুললেন। কিন্তু চোখ আর মন এক জায়গায় মিলছে না। চা আনতে কতটা সময় লাগবে? প্রথম সিগারেটটা শেষ হয়ে এল। দোকান অবশ্য বেশি দূরে নয়। ওকে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট কিনে আনানো যেতে পারে। নিচের রান্নাঘরে চায়ের সব সরঞ্জাম আছে, সেখানেও বানানো যেতে পারে। কিন্তু অঞ্জনা কি সব চাবি বন্ধ করে যায়নি? সেটাই তার স্বভাব।

আপাতত দোকানের চাতেই চলবে।

কাজের মেয়েটি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় চা নিয়ে এলো। গেলাসে নয়, একটা ট্রে-তে কাপ-সসার সাজিয়ে এনেছে। সহবৎ শিক্ষা আছে।

বীরেন ভাবলেন, পাঁচ টাকার ফেরতটা পুরোটাই মেয়েটিকে বকশিস দেবেন। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসছে।

মেয়েটি বেশ লম্বা, ভারীর ওপরে গড়ন, তার বন্ধনীহীন দুটি বুক শাড়ির আঁচল চাপিয়ে স্পষ্ট। দুটি উরুই এখন ঢাকা অবশ্য। চোখ দুটি গভীর কালো কাজল টানা মনে হয়। যদিও কাজল দেয়নি নিশ্চয়ই। পরের বাড়িতে যারা ফুরনে জামা-কাপড় কাচতে আসে, তারা কি চোখে কাজল দেয়?

চায়ের কাপটি বীরেনের হাতে তুলে দিয়েও দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি।

বীরেন প্রথম চুমুক দেবার পর আবার চোখ তুললেন। তাঁর চৌষট্টি বছরের বুক কাঁপছে। এ মেয়েটির ঠোঁটের হাসি খুব চেনা। মোনালিসাকে লজ্জা দেবার মতন হাসি শুধু পাথরের ঠোঁটে নয়, কোনো সাধারণ মেয়ের ঠোঁটেও ফোটে?

বীরেন প্রায় খানিকটা কম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

মেয়েটি কিন্তু অনেক সপ্রতিভ। আমার নাম পদ্মা। বাড়ির সব লোক বেড়াতে গেল, তুমি যাওনি?

বীরেন কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন। মিথ্যে কথা সহজে তার মুখে আসে না। কিন্তু ওরা তাঁকে নেয়নি, একথা তিনি এখন এই মেয়েটির সামনে কিছুতেই স্বীকার করতে পারবেন না।

তিনি খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বললেন, নাঃ, আমি গেলুম না। আমি ওই মন্দির কতবার দেখেছি!

পদ্মা তবু দাঁড়িয়ে রইল। বোধহয় বীরেনের চা খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর সে কাপ নিয়ে যেতে চায়। কলকাতার বাড়ির কাজের মেয়েরা এরকম বাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না।

এখানেও এই মেয়েটি কোনো অল্পবয়েসি বাবুর সামনে কী দাঁড়িয়ে থাকত? বীরেনের মাথায় পাকাচুল বলেই.....

হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে বীরেন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা পদ্মা, তুমি কোনারক মন্দিরে গেছ নিশ্চয়ই। সুর সুন্দরী নামে মূর্তিটার কথা তোমার মনে আছে?

পদ্মা আকৃত্রিম সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, কোন মন্দির বললেন?

বীরেন দু-তিনবার কোনারক মন্দিরের নাম বলার পদ্মা বুঝতে পারল। ওরা কোনারককে অন্যভাবে উচ্চারণ করে। বোঝার পর সে জানাল যে, সে কখনো ওই মন্দির দেখতে যায়নি। একবার যাওয়ার কথা হয়েছিল, কিন্তু সেবারে খুব বৃষ্টি নামল....।

বীরেন প্রথমে একটু অবাক হলেও তারপরে ঠিকই বুঝলেন। কত-টুকুই বা দূরত্ব, তবু পদ্মা সেই জগ বিখ্যাত মন্দির দেখেনি। বাইরের লোকরাই তো দেখতে আসে, যেমন তার মেয়ে-জামাই কানাডা থেকে দেখতে এসেছে।

বীরেন একবার তারকেশ্বর লাইনে আগুনি নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ

মাইল দূর। কিন্তু সেই গ্রামের কয়েকজন বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে কথা বলে তিনি জেনেছিলেন, তাঁরা কোনোদিনই কলকাতা শহর দেখতে আসেননি। সেজন্য তাঁদের কোনো আফশোসও নেই। তাঁরা তাজমহলের নামও শোনেননি, তবু দিব্যি কেটে যাচ্ছে তাঁদের জীবন।

পদ্মা জিজ্ঞেস করল, কী আছে সেই মন্দিরে? কোন্ ঠাকুর আছে?

বীরেন বললেন, সেখানে কোনো ঠাকুর নেই।

পদ্মা তার চোখ দুটি বিস্ফারিত করে নিজস্ব ভাষায় জিজ্ঞেস করল, ঠাকুর নেই, তবু মন্দির? তা হলে সেখানে এত মানুষ যায় কেন?

বীরেন কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন পদ্মার দিকে। যদিও তার দুটি উরুই এখন শাড়িতে ঢাকা, তবু তাকে রম্ভার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়।

কী স্বচ্ছ ওর চোখের দৃষ্টি। সোজা ভাবে চেয়ে আছে বীরেনের দিকে, ঠোঁটে টেপা হাসিটা লেগেই আছে।

বীরেন সংক্ষেপে কোনারকের মন্দিরের বর্ণনা দিলেন। তিনি ওই মন্দির সম্পর্কে ইতিহাস—কিংবদন্তি সবই জানেন। অতসব এই মেয়েটিকে বলার কোন মানে হয় না। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে তিনি বলে ফেললেন, জানো, পদ্মা, ওই মন্দিরে তোমার একটা মূর্তি আছে!

এরকম একটা কথা শুনেও অবিশ্বাস বা লজ্জা প্রকাশ করল না পদ্মা। হয়তো মূর্তি শব্দটার সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। কিংবা কোথায় তার মূর্তি আছে বা না আছে, সে বিষয়ে তার কোনো কৌতূহলও নেই, সে বলল, আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে? দিন, কাপ দিন।

কাপ দেবার সময় পদ্মার আঙুলের সঙ্গে একবার বীরেনের আঙুল ছুঁয়ে যেতেই যেন ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ!

তিনি খাট থেকে নেমে এসে পদ্মার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, সেই মূর্তিটা কেমন জানো? এই যে, আয়নার সামনে দাঁড়াও, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি!

পদ্মার কাঁধে হাত দিয়ে তিনি কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন। পদ্মা কি চেঁচিয়ে উঠবে? কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দেবে? সেরকম কিছুই হল না। এ ঘরে একটা ড্রেসিং টেব্‌ল আগে থেকেই রয়েছে, আয়নাটা পারা-চটা হলেও পদ্মা তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে।

বীরেন এবারে পদ্মার আঁচলটা ফেলে দিলেন বুক থেকে। পদ্মার স্তনদ্বয় ফরাসি শিল্পী রেনোয়া-র নারীদের লজ্জা দেবে। বৃন্তদুটি জীবন্ত হয়ে কাঁপছে।

বীরেন পদ্মার কোমরে হাত দিয়ে বললেন, একটু বেঁকে দাঁড়াও তো। এই, এই রকম!

পদ্মা বাধ্য মেয়ের মতন তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করল। পদ্মার হাতে চায়ের কাপ, মনে করা যাক সেটাই একটা বাদ্যযন্ত্র।

ড্রেসিং টেব্‌লের আয়নার সামনে দাঁড়ান পদ্মার দিকে বীরেন মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন। এ যেন তাঁর নিজেরই শিল্পসৃষ্টি। কোনারকে ওরা গিয়ে এর চেয়ে ভাল কিছু কি দেখতে পাবে? অমন সুর সুন্দরীর মূর্তির এখন কী অবস্থা হয়েছে কে জানে!

তিনি তাকালেন পদ্মার মুখের দিকে। হাসিটা তাকে শেখাতে হয়নি, ওটা শেখানো যায় না। পদ্মার ওষ্ঠে একটা তরল রহস্য যেন হাসি হয়ে ঝলসাচ্ছে।

বীরেন চাইলেন সেই হাসিটুকু নিজের ওষ্ঠাধরে পান করতে।

তারপরই তিনি অনুচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন আবার। রাগ পড়ে গেছে, সময়টা মন্দ কাটছে না।

তিনি শুনতে পাচ্ছেন শালিকদের কিচির মিচির, কোনো একটি ঘরের জানালার ক্যাঁচকোঁচ। তিনি খাটে শুয়ে আছেন, তাঁর চোখের সামনে গতকালের খবরের কাগজটি মেলা; তিনি কিছুই পড়ছেন না এবং প্রথমবার বারান্দার রেলিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারার পর তিনি আর কিছুই করেননি। শোনা যাচ্ছে থুপথুপ শব্দ, ওই কাপড়-কাচা মেয়েটিকে ডাকেননি একবারও। ওর মুখ তিনি এখনও দেখেননি। বীরেন ভাবলেন, এই-ই ভাল, ওকে ডাকার কোনো মানে হয় না। হয়তো মেয়েটি একটি ঘাগী ঝি, বীরেন চা আনতে বললে মুখ ঝামটা দিত কিংবা পয়সার লোভে বীরেনের যে-কোনো নির্দেশ মানতে রাজি হলেও, খুব সম্ভবত ওর বয়েসের গাছ পাথর নেই, ওর গায়ের ঘামে আঁশটে গন্ধ, ওর ঠোঁট দুটি অতিরিক্ত পুরু হওয়া খুবই স্বাভাবিক, ওর ভাষা সহ্য করা যেত কি! আর ওর হাসি? যারা দশ-পনেরো টাকার জন্য পরের বাড়িতে কাপড় কাচতে আসে, তাদের হাসির মধ্যে আর যাই-ই থাক কোনো রহস্য নেই।

বীরেনের যদিও চা-তেষ্টা পাচ্ছে, তবু তিনি একতলার মেয়েটিকে ডাকতে সাহস পেলেন না। তাঁর সমস্ত রোমকূপ এখনো শিহরিত। খবরের কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে দু হাতে ওকে আলিঙ্গনে জড়ালেন, তারপর সুর সুন্দরীর মুখ চুম্বন করতে করতে এলিয়ে পড়লেন তন্দ্রায়।

খেলা-খেলার নায়ক

সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিশির ভাবল, এখন কোথায় যাওয়া যায়? কোন্ দিকে?

সারাদিন সে বাড়িতে কাটিয়েছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে খবরের কাগজের ছোট ছোট বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত মুখস্ত করে ফেলেছে, পিঠের নিচে গরম হয়ে গেছে বিছানাটা, জায়গা বদলে বদলে শুয়েও আর আরাম হয় না। শেষ পর্যন্ত শরীরটা ছটফট করতে লাগল, ঠিক যেন শয্যাকন্টকী হওয়ার মতন।

বেকার ছেলেরা সাধারণত বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না, তাদের একটা ব্যস্ততার ভান করতে হয়। বাবা-মায়ের কাছে প্রমাণ করতে হবে তো যে তার চেষ্টায় ত্রুটি নেই! শিশিরের দু-তিন দিন ধরে জ্বর, তাই সে বাড়িতে শুয়ে থাকবার ছুতো পেয়েছিল। আজ তার জ্বর নেই, বিকেল থেকেই তার অসহ্য লাগছে।

একটা সাদা প্যান্ট আর হালকা নীল হাওয়াই সার্ট পরে বেরিয়েছে শিশির। তার স্বাস্থ্য ভাল, চব্বিশ বছর বয়েস, সেই এই পৃথিবীতে নিজের ভূমিকা পালক করে যাবার জন্য তৈরি কিন্তু তার সামনে কোনো সুযোগ নেই। বার বার চাকুরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হতে তার ঠোঁটে একটা তিক্ত স্বাদ এসে গেছে।

কোথায় এখন যাবে শিশির?

সারাদিন গুমোট গরম ছিল বটে কিন্তু এখন বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তার লোকজনের মুখে বিরক্ত ভাব মুছে গেছে অনেকটা। মাণিকতলার মোড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শিশির।

তার পকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে। আর কিছু খুচরো পয়সা। খুব কম বলা যায় না। আর কিছু না হোক একটা সিনেমা দেখা যায় অনায়াসেই। কিন্তু সারাদিন বাড়ির মধ্যে কাটিয়ে এখন আবার একটা বন্ধ সিনেমা হলের মধ্যে ঢোকার ইচ্ছে নেই তার। তা ছাড়া সে রকম কোনো সিনেমাও নেই।

গঙ্গার ধারে যাওয়া যায়, এমন কিছু বাস ভাড়া পড়বে না। এই টাকাতেই বাস ভাড়া দিয়েও সে চিনেবাদাম, চা ও সিগারেট কিনতে পারে। কিন্তু গঙ্গার ধারে কি কেউ একা বেড়াতে যায়। জোড়ায়-জোড়ায় ছেলে-মেয়েরা ঘোরে, কিংবা নিরালা জায়গা খুঁজে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, তাদের সুখী সুখী মুখ দেখলে ভেতরটা আরও জ্বলে যায়। শিশিরের সে রকম কোনো মেয়ে বন্ধু নেই। মুখ-চেনা আছে অনেকের সঙ্গে কিন্তু এমন কেউ নেই যাকে বলা যায়, চল, আজ আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে!

তা বলে বেকার ছেলেদের কি কারুরই বান্ধবী থাকে না? থাকে। বেকার মেয়েও তো কত আছে। বেকার ছেলেরা তাদের পয়সার অভাব কিংবা হীনমান্যতা চাপা দেয় কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে। শিশির তার কয়েকজন বন্ধুকে এরকম দেখেছে। কিন্তু সে পারে না, সে লাজুক। এ যুগে লাজুক ছেলেরা সবদিক দিয়ে পিছিয়ে যায়। এই যুগটাই হল সেলস্‌ম্যানশীপের যুগ।

পাড়ার একটা ক্লাব আছে, সেখানে বিকেলে গেলে খেলা-ধুলো করা যায়। কিন্তু এখন খেলায় সময় পার হয়ে গেছে। সন্ধের পর সেই ক্লাবের বয়স্ক মেম্বাররা তাস খেলতে বসে। শিশির তাস খেলতে জানে না।

মাণিকতলার মোড়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শিশির অনুভব করল তার মনটা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করা দরকার।

পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সাগুলো নাড়তে চাড়তে সে ভাবল, একটা খেলা খেললে কেমন হয়? নিজের সঙ্গে নিজের খেলা। মনে মনে সে সেই খেলার নিয়ম তৈরি করে ফেলল।

সে এখন শিশির মজুমদার নয়, সে একজন অন্য মানুষ। ধরা যাক তার নাম সৌমিত্র সরকার। দু জনের একই বয়েস। তবে শিশির মজুমদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভাবছিল, আর সৌমিত্র সরকার সারাদিন কাজকর্মের পর বাড়ি ফিরছে।

সৌমিত্র সরকার কী কাজ করে? মাণিকতলার কাছে কি অফিস আছে? সে রকম কিছু নেই, তাহলে কি সৌমিত্র সরকার ডালহৌসির কোনো অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে মাণিকতলায় কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে দেখা করতে এসেছিল?

কিংবা, এমনও হতে পারে, সৌমিত্র সরকার একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। ওদের কোনো নির্দিষ্ট অফিস টাইম থাকে না। নানান হাসপাতালে ও ডাক্তারদের চেম্বারে ডিউটি হয়। এ পাড়ায় অনেক বড় ডাক্তার আছেন। তাঁদের অ্যাটেণ্ড করার পর সৌমিত্র সরকারের ডিউটি আজকের মতন শেষ, এখন সে বাড়ি ফিরছে।

সৌমিত্রর বাড়ি কোন্ দিকে?

শিশির শিয়ালদার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। তার গলায় অদৃশ্য টাই, বাঁ হাতে একটা ভারি ব্যাগ, সেটাও কাল্পনিক। শিশির এই চাকরির জন্য দু-তিনবার ইন্টারভিউ দিয়েছে, কিন্তু তার বায়োলজি ছিল না বলে পায়নি। ওদের সংক্ষেপে বলে সেলস রেপ।

সেলস রেপরা প্রায় সবাই সিগারেট খায়। পকেটে প্যাকেট রাখে, অন্যদের অফার করে।

শিশির দশটা সিগারেটের একটা প্যাকেট কিনল, অবশ্য সস্তার। নিজে একটি ধরাল। তারপর হালকা ভাবে শিস দিতে লাগল। শিশিরের শিস দেবার অভ্যেস নেই, কিন্তু সৌমিত্র সরকার হয়তো দেয়।

নতুন ভূমিকায় শিশির এখন বেশ উৎফুল্ল বোধ করছে। সারাদিন কাজের শেষে সে বাড়ি ফিরছে। ফিরে সে স্নান করবে, পা-জামা পাঞ্জাবি পরবে, তারপর সে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। সৌমিত্র সরকারের বন্ধুরা মদ খায়, তাদের বান্ধবী থাকে।

সৌমিত্র সরকার কি থিয়েটার করে? বহুরূপী বা নান্দীকার কোনো দলে যেন পার্ট করে একজন, কফি হাউসে একবার আলাপ হয়েছিল শিশিরের সঙ্গে, সে বলেছিল, থিয়েটারটা তার সখের, তার জীবিকা ওই সেলস-রেপ। তাহলে সৌমিত্র সরকারেরও কোনো থিয়েটারের দলের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে।

সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে আসবার সময় শিশির দেখল, উলটো দিক থেকে হেঁটে আসছে বিজনদা আর বীথি। বিজনদা শিশিরের ছোটকাকার বন্ধু কিন্তু বীথির সঙ্গে শিশির খুব ছোটবেলায় এক স্কুলে পড়েছে। সেই সুবাদে ওরা তুই তুই বলে। বিজনদার সঙ্গে বীথির এখনো বিয়ে হয়নি, তবে হবে হবে বলে শোনা যায়। যদি হয় তাহলে কি বীথিকে তখন বৌদি বলে ডাকবে শিশির? বৌদি আর আপনি সেটা একটা হাসির ব্যাপার হবে না?

বিজনদাকে দেখে শিশিরের সিগারেট লুকোবার কথা, কিন্তু সৌমিত্র সরকার তো বিজনদাকে চেনে না। সে সিগারেট ফেলল না। ফুটপাত পালটাল না। সে শুধু বীথির ওপরেই চোখ রাখল। সামনে একজোড়া অচেনা নারী-পুরুষ দেখলে সৌমিত্র নিশ্চয়ই শুধু মেয়েটিকেই দেখত ভাল করে।

ওরা পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় শিশির কোনো কথা বলল না, যেন সে খুব অন্যমনস্ক। বিজনদা আর বীথিও বলল না কিছুই, নিজেদের মধ্যে কথা বলায় তারা মশগুল, যেন শিশিরকে দেখতেও পায়নি।

কিংবা শিশিরকে দেখেও চিনতে পারেনি, কারণ সে তো এখন শিশির নয়, সৌমিত্র। যাক, তাহলে প্রথম পরীক্ষায় পাশ। সে সত্যিই সৌমিত্র হয়ে উঠেছে।

শিয়ালদার গেটের কাছে এসে একটা কমলালেবুওয়ালার সামনে সে থমকে দাঁড়াল। তার কমলালেবু কিনতে ইচ্ছে করছে। কেন? গত এক দু-বছরের মধ্যে তো শিশির কখনো নিজের হাতে কমলালেবু কেনেনি। বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে কিংবা কেউ দিলে সে খায়। নিজে কেনে না।

তাহলে কি সৌমিত্র সরকারের রোজ কমলালেবু কেনা অভ্যেস? ওরা সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তো, ওদের স্বাস্থ্যবাতিক থাকে। কমলালেবু মানেই খাঁটি স্বাস্থ্য। যেমন, ভেজানো ছোলা। যেমন বেলের সরবৎ।

সৌমিত্র সরকার কটা কমলালেবু কেনে? শিশির একটাই কিনল। খোলা ছাড়িয়ে খেতে খেতে সে আরও অবাক হল, বেশ ভাল লাগছে তো। আগে কোনোদিন সে কমলালেবুতে এত স্বাদ পায়নি। চমৎকার। সন্ধেবেলা চা খাওয়ার চেয়ে হাজার গুণ উপকারী।

শিশিরের দ্রুত পয়সা ফুরিয়ে আসছে। তা হোক না, সে তো এখন বাড়ি ফিরছে। বাড়ি ফেরার পথে লোকে পকেটের সব পয়সা খরচ করে ফেলতে পারে।

সৌমিত্র সরকারের বাড়ি কোথায়?

শিয়ালদা পর্যন্ত যখন হেঁটে এসেছে, তখন এখান থেকে নিশ্চয়ই ট্রেন ধরতে হয়।

সোজা স্টেশানের মধ্যে ঢুকে এসে শিশির টিকিট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াল। তার সামনের লোকটি ঢাকুরিয়ার টিকিট কাটছে শুনে সেও বিনা দ্বিধায় বলল, একখানা ঢাকুরিয়া!

অনেকদিন আগে, প্রায় ছেলেবেলায় শিশির তার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিল পিকনিক করতে। তারপর সে আর কখনো এদিককার ট্রেনে চাপেনি। ঢাকুরিয়ায় তার কেউ চেনা নেই।

ট্রেনটা ছাড়তে মিনিট দশেক দেরি আছে। এর মধ্যেই সব কম্পার্টমেন্টগুলো ভর্তি, বসবার জায়গা পাবার কোনো আশা নেই। শিশির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। এত ভিড়ের মধ্যেও কিছু লোক ছুটোছুটি করছে। শিশিরের কোনো চাঞ্চল্য নেই।

তারপর হুইস্‌ল দিয়ে ট্রেন ছাড়ল, কিন্তু শিশিরের সিগারেট অর্ধেকও শেষ হয়নি। এটা তো ফেলে দেওয়া যায় না। সে ব্যস্ততা না দেখিয়ে ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকতে লাগল, তারপর দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল একেবারে শেষ কামরায়। অবিকল ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের ভঙ্গিতে।

এই কামরাতেও বেশ ভিড়, তবু একজন লোক তাকে ডেকে বলল, এই যে দাদা বসুন। বসুন, জায়গা হয়ে যাবে!

লোকটিকে শিশির জীবনে দেখেনি। তবে কি এ সৌমিত্র সরকারের চেনা? ট্রেনে কেউ কি কোনো অচেনা লোককে ডেকে বসবার জায়গা দেয়? তাহলে কি সৌমিত্র সরকার নামে সত্যিই কেউ আছে, যার সঙ্গে শিশিরের চেহারার মিল আছে?

লোকটি কিন্তু আর কিছু বলল না। হাতের একটা পত্রিকা পড়ায় মন দিল।

শিশিরের পাশেই একটি তরুণী বসে আছে। দেখে মনে হয় নিত্যযাত্রিনী। সঙ্গে দুটি বড় বড় ব্যাগ, ট্রেনে ওঠার আগে বাজার করে এনেছে। একটি ব্যাগ মেঝেতে, একটি কোলের ওপর, সেই অবস্থাতেও মেয়েটি একটি বাংলা পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করছে। কামরায় আলো বেশ কম, এর মধ্যে কিছু পড়াও বেশ কষ্টকর।

শিশির কুণ্ঠিতভাবে মেয়েটিকে বলল, আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো? তা হলে আমি উঠে দাঁড়াতে পারি।

মেয়েটি পত্রিকা থেকে চোখ তুলে শিশিরকে দেখল।

তারপর নম্রভাবে বলল, না, ঠিক আছে।

শিশির আবার বলল, ঐ ব্যাগটা ধরতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, ওটা আমাকে দিতে পারেন।

মেয়েটিও আবার বলল, না, ঠিক আছে।

শিশির হাত বাড়িয়ে বললো, দিন না আমাকে। আমার হাতে কিছু নেই।

মেয়েটি এবারে ব্যাগটি তুলে দিল শিশিরের কোলে। তারপর বলল, হঠাৎ কিরকম গরম পড়ে গেল! দুপুরে আর বেরুনোই যায় না!

আপনাকে বুঝি দুপুরে বেরুতে হয়?

হ্যাঁ, দুপুরে তিন-চারটে অফিসে ঘুরতে হয়। আমি অফিস-স্টেশনারি সাপ্লাই করি তো।

কি কি সাপ্লাই করেন?

পেন্সিল, কলম, ইরেজার, কার্বন পেপার, পিন-জেম্‌স ক্লিপ এইসব।

আপনি কি কারুর এজেন্সিতে কাজ করেন, না নিজেরই কোম্পানি?

এজেন্সি। নিজের কোম্পানি করার ক্যাপিটাল পাব কোথায়?

ব্যাঙ্কের লোন পাওয়া যায় না এইসব ব্যাপারে?

এখন শিশিরের চেনা কেউ যদি দেখত তাহলে খুবই অবাক হয়ে যেত। সে একটি অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে এরকম সাবলীলভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে? তার চরিত্রের সঙ্গে একদম মানায় না।

কিন্তু সে তো এখন শিশির মজুমদার নয়, সে সৌমিত্র সরকারের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সত্যিই বদলে গেছে।

মেয়েটি থাকে সোনারপুরে, সেটাও শিশিরের জানা হয়ে গেল। বাবা, মা আর ওরা তিন বোন, ওদের কোনো ভাই নেই। মেয়েটি বি এস. সি. পর্যন্ত পড়াশুনো করে এখন এই কাজ করছে।

মেয়েটি কিন্তু শিশির সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে চাইল না। সে নিজের কথা শোনাতে ভালবাসে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আপনিও কি সোনারপুরে যাবেন?

শিশির বলল, না, ঢাকুরিয়া।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বলল, এই তো ঢাকুরিয়ায় থেমেছে। যান নামুন! ট্রেন ছেড়ে দেবে যে!

ঢাকুরিয়া যে শিয়ালদা থেকে এত কাছে সে সম্পর্কে শিশিরের কোনো ধারণা ছিল না। সে লাফিয়ে উঠে, লোকজনকে ঠেলে-ঠুলে নেমে পড়ল কোনোক্রমে।

ইলেকট্রিক ট্রেন, অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শিশির ভাবল, সে কেন ঢাকুরিয়ার বদলে সোনারপুরের টিকিট কাটেনি! তাহলে সে সোনারপুর পর্যন্ত যেতে পারত, ওই মেয়েটির সঙ্গে আরও ভাব হত, এমনকি ওই মেয়েটি তাকে তার বাড়িতেও নেমন্তন্ন করতে পারত হয়তো! মেয়েটির কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেত, ওইরকম কাজের এজেন্সি কিরকম ভাবে নেওয়া যায়। তাহলে শিশিরও লেগে যেতে পারত ওই কাজে।

কিন্তু সে তো এখন শিশির মজুমদার নয়, সে সৌমিত্র সরকার, তার বাড়ি ঢাকুরিয়া সেইজন্যই সে ঢাকুরিয়ার টিকিট কেটেছে। সে বাড়ি ফিরছে।

সৌমিত্র সরকারের বাড়িতে কে কে আছে? সৌমিত্র কি বিবাহিত? আজকাল চব্বিশ বছরে কেউ বিয়ে করে? শিশির তো ভাবতেই পারে না। সৌমিত্র অবশ্য চাকরি করে। চাকরি পেলেও কিছুটা উন্নতি না করে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। না, সৌমিত্র বিয়ে করেনি। অনেক মেয়ের সঙ্গে তার ভাব আছে বটে কিন্তু কাকে বিয়ে করবে তা এখনো ঠিক করতে পারেনি। সৌমিত্র কি মা-বাবার সঙ্গে থাকে?

না, দাদা-বৌদির সঙ্গে। শিশির যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, দাদা-বৌদির ছোট্ট সংসার, সৌমিত্রর একটা নিজস্ব ঘর। বৌদির সঙ্গে সৌমিত্রর যেমন ঝগড়া, তেমন ভাব। ঝগড়াটা অবশ্য কৃত্রিম, ভাবটাই বেশি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল শিশির। ঢাকুরিয়ার পথ-ঘাট সে চেনে না। সৌমিত্রর বাড়ি কোন রাস্তায় হতে পারে?

কেন যে শিশির ডানদিকে বেঁকল, তা সে নিজেই জানে না। ডানদিকে-বাঁ-দিকে দু দিকেই রাস্তা। এদিকে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে।

শিশির প্রত্যেকটা বাড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সন্ধেবেলা, ঢাকুরিয়ার রাস্তায় আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে শিশির মজুমদার নিজেকে ভুলে গেল একেবারে। যে খেলাটা সে নিজে শুরু করেছিল, সেই খেলার পরিণতির কথা তার মনে এল না। তার আর মাণিকতলায় ফেরার দরকার নেই। সৌমিত্র সরকার কেন মানিকতলা ফিরতে যাবে?

একটা বাড়ি বেশ পছন্দ হল শিশিরের। দোতলা বাড়ি, গোলাপি রঙের। সদ্য তৈরি হয়েছে। দোতলায় ওই কোণের ঘরটা তার নয়?

দরজাটা বন্ধ। শিশির বিনা দ্বিধায় আঙুল ছোঁয়ালো কলিং বেলে।

একটু বাদে দরজা খুললেন এক মহিলা। বছর পঁয়ত্রিশেক বয়েস। লাল রঙের ছাপা শাড়ি পরা, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। বড় বড় চোখ মেলে তিনি তাকালেন শিশিরের দিকে। শিশির লাজুকভাবে ডাকল, বৌদি!

মহিলাটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, এস, ভেতরে এস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বন্ধ জানালা

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই পিসিমা একেবারে যেন আঁতকে উঠে বললেন, আরে থাক, থাক, ও কী করছিস, পা ছুঁতে হবে না, বোস, ওই চেয়ারটাতে বোস!

চেয়ারে বসল না, পলাশ দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতে একটা ব্রাউন রঙের প্যাকেট। ধপধপে সাদা প্যান্ট ও টকটকে লাল রঙের জামা পরা, চোখে কালো চশমা। এই শীতের মধ্যেও তার কপালে ও ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘরের দরজার কাছে এক রাশ লোক ভিড় করে আছে, পিসতুতো ভাই কাজল চ্যাঁচাচ্ছে, ভেতরে আসবে না, কেউ ভেতরে আসবে না।

পলাশ চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘরের এক দেয়ালের দিকে একটা খাট, অন্য দিকের দেয়ালের দিকে কয়েকটা পুরনো টিনের ট্রাঙ্ক চাদর চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। একটা আলনা একেবারে শূন্য, অগোছাল, অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়গুলো একটু আগে একটানে সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

খাটের ওপর বসে আছেন পিসিমা, এই এগারো বছরের মধ্যে গাল দুটো আরও বেশি তুবড়ে গেছে, এছাড়া আর যেন কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে নস্যি রঙের শালটা গায়ে জড়িয়ে আছেন, সেটাও চেনা। এই ঘরটারও কোনো পরিবর্তন হয়নি, দেওয়ালে একটা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ঝুলছে, সেটাই শুধু নতুন।

দরজার ভিড়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পলাশ বলল, কেমন আছ, পিসিমা?

পিসিমা বললেন, আমি ভাল আছি। তুমি এখন কত বড় হয়েছিস, কত কাগজে ছবি থাকে, সবাই ধন্য ধন্য করে! তুমি এখানে আসতে গেলি কেন, পিলু! তোর কষ্ট হল।

পলাশ বলল, বাঃ, আমার বুঝি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না! কষ্টের কি আছে!

পিসিমা হেসে বললেন, বাপরে বাপ! কী চ্যাঁচামেচি, কী হুড়োহুড়ি, মনে হয় যেন দরজা ভেঙে ফেলবে!

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে পলাশ বলল, ও তো আছেই! কী আর করা যাবে। নিশ্চয়ই কাজল কিংবা সজল খবরটা পাড়ায় বলে দিয়েছে।

সজল সেখানে নেই, কাজল বলল, আমি বলিনি। আমি কারুকে কিছু বলিনি।

দরজার কাছ থেকে একটি ছেলে ক্যামেরা তুলে চেঁচিয়ে বলল, গুরু, একবার মুখ ফেরাও! একটা স্ন্যাপ নেব।

একটি মেয়ে বলল, আমি একটু পাশে গিয়ে দাঁড়াব। ও কাজলদা, প্লীজ, একবার।

কাজল বলল, এখন যা। এখন না, সব পরে হবে। সরে যাও এখন, দরজাটা ক্লিয়ার কর।

ধীরুদা বলল, কেউ যাবে না। দরজাটা বন্ধ করে দে।

এত গোলমাল হলে কোনো কথাই তো বলা যাবে না।

পিসিমাকে প্রণাম করলেও ধীরুদাকে প্রণাম করেনি পলাশ। হাতের প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, পিসিমা, তোমার জন্য গরদের একটা শাড়ি এনেছি।

পিসিমা চোখ কপালে তুলে বললেন, এত দামি শাড়ি, এ দিয়ে আমি কী করব রে? তুই কি পাগল হয়েছিস, পিলু! এটা নিয়ে যা! তোর মাকে গিয়ে দে বরং।

একটু আহতভাবে পলাশ বলল, তোমার জন্য এনেছি, তুমি নেবে না? আমি দিলে তুমি পরবে না?

ধীরুদা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ পরবে। তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন, পিলু, বস!

পলাশ চেয়ারে বসল না, বসল পিসিমার খাটের এক কোণে। পিসিমা তার একটা হাত টেনে নিয়ে বললেন, ইস, কী সুন্দর হয়েছিস?

পলাশ তখনই অনুভব করল, এইরকম জামা ও প্যান্ট পরা অবস্থায় সে এই খাটের ওপর বেমানান। একবার সে ভেবেছিল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসবে, কিন্তু হোটেলে পুলিশের লোক যখন খবর দিল সকাল থেকেই এ বাড়ির সামনে কয়েকশো ছেলে-মেয়ে জমে গেছে, তখনই সে বুঝেছিল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! ভিড়ের মধ্যে টানাটানিতে তার ধুতি খুলে যেতে পারে, তাছাড়া...।

ধীরুদা বলল, আজকের সব কাগজে তোর ছবি বেরিয়েছে, ফার্স্ট পেজে, তুই কাল চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি।

কাজল সগর্বে বলল, কাল চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে, আজ মায়ের সঙ্গে! আচ্ছা পলাশদা, আমাদের বাড়ির সামনে পুলিশ এল কী করে? ওরা আগে থেকে কী করে টের পায়?

পলাশ কিছু উত্তর দেবার আগেই ধীরুদা বলল, পুলিশ তো বড়লোকের দারোয়ান। টাকা দিলে যখন তখন ভাড়া করা যায়। কত বিয়ে বাড়ির সামনে দেখিস না পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধীরুদা, গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পাজামা পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার কথার মধ্যে খানিকটা শ্লেষ পলাশের কান এড়াল না। সে উত্তর দিতে পারত যে, সে টাকা দিয়ে পুলিশ ভাড়া করেনি। পুলিশের লোকরাই তাকে জিজ্ঞেস করছে, সে কখন কোথায় যাবে, সেই অনুযায়ী ওরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছে।

কিন্তু পলাশ ধীরুদার কথায় গা করল না। সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। রাস্তার দিকের জানালাটা খোলা, সেখান থেকে নিচের গোলমাল ভেসে আসছে। রাস্তার উলটোদিকে একটা হলদে রঙের বাড়ি, সে বাড়ির তিনতলার সব জানালা বন্ধ।

কাজল জিজ্ঞেস করল, পলাশদা, চীফ মিনিস্টার তোমাকে চিনতে পারলেন? তোমার কোনো ফিল্‌ম উনি দেখেছেন!

পলাশ এই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বলল, যাঃ! উনি ব্যস্ত মানুষ....

ধীরুদা বলল, কাগজেই তো লিখেছে, উনি না দেখলেও ওঁর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি দেখেছে!

কাজল বলল, জানুয়ারি মাসে বিরাট ফাংশান হবে, না? বম্বের সব স্টার আসবে?

পলাশ বলল, মোটামুটি অনেকেই...

আমরা টিকিট পাব না!

পলাশ পিসিমার দিকে ফিরে বলল, আমি টিকিট পাঠিয়ে দেব। পিসিমা আমরা ফ্লাড রিলিফের জন্য একটা ফাংশান করছি, তোমাকে যেতে হবে।

পিসিমা ফোকলা দাঁতে বালিকার মতন হেসে বললেন, যাঃ, আমি কী করে যাব রে! পায়ে ব্যথা, আমি আজকাল সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। তাছাড়া আমার মতন বুড়ি-টুড়িরা কি ওখানে যায়?

না, পিসিমা তোমাকে যেতেই হবে!

কাজল বলল, পলাশদা, তুমি নাকি ওই ফাংশানে গান গাইবে?

পলাশ শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

ধীরুদা বাঁকাভাবে বলল, তুই আবার গান শিখলি কবে?

ধীরুদার কথা বলার ভঙ্গি পলাশের একটুও ভাল লাগছে না। এখন এখান থেকে চলে গেলেই হয়।

এগারো-বারো বছর আগে এই বাড়িতে পলাশকে থাকতে হয়েছিল প্রায় সাত-আট মাস। বেকার অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় একটা পুলিশ কেস ছিল তার নামে। নিজের বাড়িতে থাকলে সে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেত। এই পিসিমা তার আপন পিসিমা নন, বাবার পিসতুতো বোন। কিন্তু সেই দুঃসময়ে, সে কষ্টের দিনে পিসিমা তাকে আপন সন্তানের মতন বুকের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কলকাতায় এলে এখন পলাশকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠতে হয়! ইচ্ছে মতন রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে ধরবে।

তবু সে ভেবেছিল, একদিন চুপি চুপি এসে পিসিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। অনেকক্ষণ গল্প করবে। তাই সে খবর পাঠিয়েছিল, আজ দুপুরে পিসিমার হাতের রান্না খেয়ে যাবে।

কিন্তু পিসিমার ঘরে যে সর্বক্ষণ ধীরুদা উপস্থিত থাকবে, এ কথাটা তার খেয়াল হয়নি। তা হলে হয়তো সে আসত না।

কাজল দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। এ বাড়ির অন্য ভাড়াটে ও কাজল-সজলের বন্ধু-বান্ধবরা আগে থেকেই খবর পেয়ে একতলা থেকে তিন তলার সিঁড়ি পর্যন্ত ভর্তি করে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ সে বলে ফেলল, কোথাও নিরিবিলিতে দু দণ্ড থাকার উপায় নেই, বুঝলে পিসিমা। সব সময় লোকে জ্বালাতন করে। সিনেমা করি বলে আমাদের যেন প্রাইভেট লাইফ থাকতে নেই। কতদিন যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলুকাবলি খাইনি।

কাজল বলল, সে আর তুমি এ জীবনে পারবে না।

ধীরুদা বলল, আবার তোদের দেখে যদি রাস্তায় লোকের ভিড় না জমে তা হলেও বিপদ। তার মানে পপুলারিটি কমে যাচ্ছে। আমি তো শুনেছি কিছু কিছু ফিল্‌মস্টার নিজেদের এজেন্ট লাগিয়ে ভিড় জমায়। আমারও তাই মনে হয়। না হলে, এত ছেলে-মেয়ে তাদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, শুধু ফিল্‌মস্টারদের পেছনে দৌড়বে? ওয়েস্ট বেঙ্গলের পলিটিক্যালি কন্সাস ইউথ....নিশ্চয়ই আগে থেকে পয়সা দিয়ে ভাড়া করে আনা কিছু লোক চ্যাঁচামেচি করে একটা হুজুগ লাগিয়ে দেয়।

পলাশ ইচ্ছে করেই ধীরুদার এ সব কথা শুনছে না। ধীরুদার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে লাভ নেই। সে তাকিয়ে আছে রাস্তার উলটোদিকের হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটার বন্ধ জানালার দিকে। তার অন্য কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কাজল বলল, তুমি বলছ কি বড়দা, রাস্তার ভিড়ের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের বাড়িতে যে এত লোক ঢুকে বসে আছে, তাদের কি আমি পয়সা দিয়ে আনিয়েছি? ওরা এসেছে শুধু পলাশদাকে একবার কাছ থেকে দেখবে বলে। পলাশদা এখন বম্বেতে নাম্বার টু, অমিতাভ বচ্চনের পরেই!

ধীরুদা বলল, পিলুকে এ পাড়ার লোক কি আগে দেখেনি নাকি? টানা দেড় বছর এ বাড়িতে থেকে গেছে।

সে কতদিন আগের কথা!

কথা ঘোরাবার জন্য পলাশ বলল, কি রান্না করেছ, বলো পিসিমা! কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি!

পিসিমা বললেন, হায় আমার পোড়া কপাল! আমার কি আর সে শক্তি আছে রে! নিজে আর রান্নাঘরে যাই না। দুই বউমাই রেঁধেছে, তুই ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক ভালবাসতি।

তোমার হাঁটুতে ব্যথা, তুমি চিকিৎসা করাও না কেন, পিসিমা?

ওষুধ তো খাই, সারে না।

তুমি বম্বেতে আসবে? ওখানে খুব ভাল চিকিৎসা হয়, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

দূর, আমি এখন আর কোথায় যাব! মাঝে মাঝে কমে যায়। ও নিয়ে তুই ভাবিস না। তুই যে ওই কথাটা বললি তাতেই আমি কত খুশি হলাম। হ্যাঁরে, তোদের কাজে খুব খাটনি, তাই না? তোর তো দেখছি চোখের নিচে কালি!

পলাশের দু চোখ জ্বালা করে এল। এমন স্নেহের স্বরের একটা প্রচণ্ড ঝাপটায় সে কয়েক মুহূর্ত অভিভূত ভাবে চুপ হয়ে গেল। এই দিকটা কেউ ভেবে দেখে না। সবাই ভাবে সে কত টাকা রোজগার করছে! লাখ লাখ টাকা! কিন্তু এই কাজে যে কত খাটুনি, কখনো সারারাত টানা শুটিং থাকে, চড়া আলোর সামনে কৃত্রিম হাসি কান্না..... এক এক সময় শরীর আর বইতে চায় না, সে কথা কেউ বোঝে না। পিসিমা বুঝেছেন!

পিসিমা পলাশের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ধীরুদা বলল, এখন তো শুনছি বম্বেতে অনেক স্টারের বাড়িতে ইনকামট্যাক্স রেইড হচ্ছে, তোর বাড়িতেও হয়েছে নাকি রে পিলু?

পলাশ মুখে কিছু না বলে দুদিকে মাথা নাড়ল।

কাজলই যেন এখন পলাশের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে গেছে। পলাশ যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন কাজল বেশ ছোট ছিল, পলাশের সাধারণ চেহারাটা তার মনে নেই। ছবির মানুষ পলাশের সে ভক্ত।

সে তার বড়দার কথার উত্তরে বলল, তুমি জান না বড়দা, পলাশদা কত দান-ধ্যান করে। আজকের কাগজেই তো বেরিয়েছে, উনি ক্যান্সার হাসপাতালে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছেন। তারপর বন্যাত্রাণের জন্য........

ধীরুদা বলল, ওসব ট্যাক্স ফাঁকি দেবার একটা রাস্তা!

তাহলে অন্যরা দেয় না কেন?

ধীরুদার কথার বাঁকা সুর এখন পিসিমা পর্যন্ত লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, ওসব কথা ছাড়ত! যার মন ভাল, সেই-ই অন্যদের দেয়। পিলুর মনটা কত নরম তা তো আমি জানি! আরও দিস, পারলে গরিব মানুষদের জন্য আরও কিছু কিছু দিস, পিলু। মানুষকে দিয়ে-থুয়ে ভোগ করলে বেশি আনন্দ হয়! তোর মা এখন কোথায় রে পিলু?

জামসেদপুরে, আমার ভায়ের কাছে থাকেন! আমি গত মাসে দেখা করে এসেছি, বিহারের জঙ্গলে একটা শুটিং ছিল।

কাজল ব্যগ্রভাবে বলল, কী বই। কী বই পলাশদা।

এখনো নাম ঠিক হয়নি।

সেকি, নাম ঠিক না করেই শুটিং আরম্ভ হয়ে যায়?

ধীরুদা বলল, নাম তো যে কোনো একটা দিলেই হল। ওইসব হিন্দি ফিল্মের সব গল্পই তো এক। খানিকটা মারামারি, খানিকটা কান্না, খানিকটা ধেই ধেই নাচ।

এবারে পলাশ চট করে জিজ্ঞেস করল, আপনিও হিন্দি ছবি দেখেন নাকি, ধীরুদা?

কস্মিন কালেও না। তবে টি. ভি.-তে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

কাজল বলল, বড়দা, তুমি দিল-কা-দুসমন পুরোটা দেখেছ! সেটাতে পলাশদা ছিল।

দেখলুম পিলু কী রকম লাফালাফি করতে শিখেছে।

পলাশ ভাবল, ধীরুদার সব কথায় কি ব্যঙ্গ না ঈর্ষা ঝরে পড়ছে? তার ওপর ধীরুদার রাগ আছে। ধীরুদা সেই সময় পলাশকে বেশি করে রাজনীতিতে জড়াতে চেয়েছিল। কিছু কিছু বিপজ্জনক কাজও করিয়েছে। ধীরুদা বলেছিল, তুই ফুল টাইমার হয়ে যা, তারপর পুলিশের হাত থেকে পার্টিই তোকে প্রোটেকশান দেবে।

পলাশ সে কথা শোনেনি। সে পালিয়ে গিয়েছিল পুনায়।

কিন্তু ধীরুদার নিজের দু ভাই, ছেলেমেয়েরা কী করছে? তারাও তো সাধারণ চাকরি করে, বিয়ে করে, ঘর সংসার সাজিয়ে গেরস্থ হয়ে আছে। তাদের রাজনীতিতে ভেড়াতে পারেনি ধীরুদা?

পলাশ ঠিক করেছে আজ এখানে এসে রাগারাগি করবে না। একটাও অপ্রীতিকর কথা বলবে না। ধীরুদা যতই তাকে খোঁচাবার চেষ্টা করুক!

পরিবেশটা হালকা করার জন্য সে বলল, আজ এখানে আসবার সময় দর্পণা সিনেমা হলটা দেখে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। কতদিন ওই হলে টিকিট কাটার জন্য লাইন দিয়েছি। পিসিমা, তোমার জন্যও তো টিকিট কেটে এনে দিয়েছি! ওই হলের মালিক আমাকে বুকিং কাউন্টারে চাকরি দেবে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত দেয়নি!

কাজল বলল, এখন এই দর্পণাতে তোমার কোনো ছবি এলে টিকিট ব্ল্যাক হয়, আমরাই টিকিট পাই না। টি. ভি. সেটটা কেনার আগে মা তো তোমার কোনো ফিল্মই দেখেনি।

ধীরুদা ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু তোরা যাই-ই বলিস পিলু, তোদের এই হিন্দি সিনেমাগুলো ডেফিনিটলি অপসংস্কৃতি। দেশের অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মন বিগড়ে দিচ্ছে!

পলাশ বলল, তবে কেন তোমাদের চীফ মিনিস্টার আমাদের দিয়েই..........

পলাশের কথাটা শেষ হল না, দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়ল। সাধারণ ধাক্কা নয়, শব্দটার মধ্যে কর্তৃত্বের জোর আছে।

কাজল উঠে দরজা খুলে দিল।

একজন পুলিশ অফিসার ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে। টুপিটা খুলে সে পলাশের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, বাইরের ভিড় ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। ক্রাউড আনকন্ট্রোলেবল হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির মধ্যে এত লোক ঢুকতে অ্যালাউ করা হয়েছে সে জন্যই তো বাইরের লোক খেপে গেছে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে স্যার।

পলাশ কড়া গলায় বলল, আমি আমার একজন আত্মীয়ের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে এসেছি। রাস্তায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সামলানোর দায়িত্ব আপনাদের।

অফিসারটি বিগলিত ভাবে বলল, সে তো নিশ্চয়ই। আপনি শুধু একটিবার....মানে ভেতরে এত লোক ঢুকে পড়েছে তো, তাই পাবলিক চাইছে..আপনি শুধু একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান, তারপর আমি ক্রাউড ডিসপার্স করে দেব।

বিরক্তি ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে পলাশ বলল, আমি ঠিক এক মিনিট দাঁড়াব।

তাতেই হবে স্যার।

কাজল দৌড়ে গিয়ে খুলে দিল বারান্দার দিকের দরজাটা। কোনো দরকার নেই, তবু সে পলাশের হাত ধরে নিয়ে বলল, সেও পলাশের পাশে দাঁড়াবে।

ধীরুদা পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে স্যার স্যার বলছেন কেন?

একটুও লজ্জা না পেয়ে অফিসারটি বলল, আমি ওনার খুব ভক্ত!

কথাটা শুনতে পেয়ে পলাশ বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। এগারো বছর আগে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে এই অফিসারটির মতনই কেউ একজন তাকে রুল দিয়ে পেটাত। গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত। এখন টুপি খুলে স্যার বলছে। ধীরুদা যতই হিংসে করুক তাকে, এক সময় যারা তাকে পাত্তা দিত না, যারা অপমান করত আজ তারাই পলাশকুমারকে খাতির করে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তুমুল একটা অট্টরোল ভেসে এল নিচ থেকে। পলাশ এক নজরে হিসেব করে নিল, অন্তত হাজার দুয়েক তো হবেই। রাইটার্সবিল্ডিংসে যখন গিয়েছিল, খন সব কর্মচারিরা ছুটে এসেছিল কাজ বন্ধ করে, অথচ ওই রাইটার্সবিল্ডিংসেই সে একটা কেরানির চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছে এক সময়। মানুষ এক জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারে?

উলটোদিকের হলুদ বাড়িটার দিকে তাকাল সে। এখনো জানালা বন্ধ তিনতলার। একতলা, দোতলার সব দরজা-জানালা খোলা, সেখানে ভিড় করে আছে মানুষ।

তিনতলার ওরা খবর পায়নি? রাস্তায় এত চিৎকার, তবু ওরা কৌতূহলী হয়ে জানালা খুলে দেখবে না? ইচ্ছে করে জানালা বন্ধ করে রেখেছে।

কী নাম ছিল মেয়েটার? মল্লিকা না বল্লরী? ঠিক মনে নেই। হিস্ট্রিতে এম. এ. পড়ত তখন। তার বিয়ে হয়ে অন্য বাড়িতে চলে গেছে? ওদের বাড়িতে অন্য কেউ নেই? সেই এগারো বছর আগে, পলাশ এই বারান্দায় এসে দাঁড়ালে, মল্লিকা কিংবা বল্লরী নামের সেই মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হলে জানালা বন্ধ করে দিত। রাস্তায় একদিন ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল পলাশ, ভুরু তুলে নিঃশব্দ ধমক দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। পলাশকে অশিক্ষিত মনে করত মেয়েটা! কাকে যেন বলেছিল.....

ইচ্ছে করে ওদের বাড়ির লোক জানালা বন্ধ করে রেখেছে। কিসের এত অহঙ্কার ওদের? পলাশ ইচ্ছে করলে কালই ওই বাড়িটা কিনে, ভেঙে ফেলে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। কত দাম হবে বাড়িটার, পাঁচ লাখ, সাত লাখ?

রাস্তার ছেলেমেয়েরা শিস দিচ্ছে, কতরকম নাম ধরে ডাকছে তাকে, কেউ কেউ ঠোঁটে হাত দিচ্ছে, কয়েকজন ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুলের মালা। অসংখ্য মানুষ এখন তাকে ভালবাসে। শুধু একটা বাড়ির জানালা বন্ধ, তাতে কী আসে যায়? মল্লিকা কিংবা বল্লরীর চেয়ে একহাজার গুণ সুন্দরী মেয়েরা তার পায়ে লুটবে, কত এম. এ. পাশ ছেলেমেয়ে তার কাছে সামান্য একটা সুযোগ পাবার জন্য আসে...........

তবু পলাশ ওই বন্ধ জানালার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

নামহীনা

দূর পাল্লার বিমানযাত্রায় সকাল-বিকেলগুলো হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

জানলা দিয়ে দেখা যায় না কিছুই, শুধু মেঘ, শুধু মেঘ। বেশিক্ষণ বইও পড়া যায় না। চোখ ঢুলে আসে। যখন তখন ঘুম ভাঙিয়ে এয়ারহোস্টেসরা খাবার দিয়ে যায়। খুব ভাল ভাল খাবার হলেও একসময় তাতেও অরুচি আসে। এই একঘেয়েমির মধ্যে এক একবার মনে হয়, দূর ছাই, দু-চারটে ডাকাত উঠে এই প্লেনটা হাইজ্যাক করার চেষ্টা করলেও তো পারে।

সে রকম অভিজ্ঞতা আমার কখনো হয়নি। তবে একটা মর্মান্তিক নাটকে আমাকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল।

সেবারে আকাশপথের যাত্রাটি ছিল খুবই লম্বা। শিকাগো থেকে নিউইয়র্ক, তারপর লণ্ডন, তারপর ব্যাংকক, মাঝখানে কোথাও যাত্রা-বিরতি নেই। নিউইয়র্কে একবার প্লেন পাল্টাতে হয়েছে শুধু, তাও এক প্লেন্ থেকে নেমেই প্রায় দৌড়ে গিয়ে উঠতে হয়েছে অন্য প্লেনে। লণ্ডনেও কিছুক্ষণের জন্য প্লেন থেকে নামিয়ে দিল, তখন আমার ঘড়ি অনুযায়ী ভোর হলেও লণ্ডনে দশটা বাজে। অর্থাৎ একটি ভোর আমার জীবন থেকে বাদ পড়ে গেল।

প্লেনে আমার ভাল ঘুম হয় না। সহযাত্রীদের সঙ্গে আমি আলাপ জমাতেও পারি না। নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন পর্যন্ত আমার পাশে বসেছিল অতি গোমড়ামুখ এক প্রৌঢ় সাহেব, তার সঙ্গে আলাপ জমাবার প্রশ্নই ওঠে না। লোকটি অবশ্য নেমে গেল এখানেই।

প্লেনের চা ভাল হয় না কখনো। কফি বরং চলনসই। কিন্তু সকালবেলা এক কাপ চা খাওয়া আমাদের অভ্যেস। ইংরেজরা চা-এর সমঝদার, তাই লণ্ডন এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জের রেস্তরাঁয় এক কাপ চা খেয়ে নিলুম। আসল দার্জিলিং-এর চা, দাম বেশি নিলেও আরাম হল খুব।

আবার প্লেন ছাড়ার পর ঠিক করলুম, এবারে একটু ভাল করে ঘুমের আরাধনা করতে হবে। এবারে আমার পাশের দুটো সীটই ফাঁকা। মাঝখানের হাতলগুলো তুলে দিয়ে ইচ্ছে করলে পা ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

ব্যাংককের আগে এই প্লেনটা যে মাঝপথে আবার ফ্রাংকফুর্টে থামবে তা আমার জানা ছিল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের স্টপ। আমি আর নামলুম না। সব এয়ারপোর্টই দেখতে প্রায় একই রকম। আমার কেনাকাটি করারও কিছু নেই, পয়সাও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ব্যাংককে এক রাত্তির থাকার হোটেল খরচ প্লেন কোম্পানিই দেবে। একই দিনে কানেকটিং ফ্লাইট নেই বলেই আমার বাধ্য হয়ে সেখানে থাকা, নইলে আমি সোজা কলকাতায় চলে যেতুম। মাস দেড়েক ধরে অনেকগুলো জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, তখন নিজের বাড়ির বিছানাটা আমাকে টানছে।

ফ্রাংকফুর্ট থেকে প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে এল, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সীট বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠেছে, এমন সময় আবার দরজা খুলে গেল। সাত আটটি মেয়ে প্যাসেঞ্জার উঠল, তাদের চেহারা ও পোশাক প্রায় একই রকম। এত দেরি করে আসার জন্যই বোধহয় তাদের ওপর এয়ারহস্টেসরা খুব রেগে গেল, প্রায় ঠেলতে ঠেলতে তাদের বসিয়ে দেওয়া হল এক একটা খালি সীটে।

আমার পাশে এসে বসল একজন।

একজন মহিলা পাশে এসে বসলে তার চেহারাটা এক ঝলক দেখে নিতেই হয়। এই মহিলাটি সুন্দরী নয়, আবার কুৎসিতও বলা যায় না। বয়েসটাও বোঝা মুস্কিল। কম বয়েসি যুবতী নয়, আবার প্রৌঢ়াও নয় মোটেই। গড়াপেটা স্বাস্থ্য। সাধারণ স্কার্ট-ব্লাউজ পরা। মুখের চেহারা জাপানিদের মতন, কিন্তু গায়ের রং জাপানিদের মতন উজ্জ্বল হলুদ নয়, একটু ময়লা ময়লা। কোরিয়ান বা ভিয়েৎনামী বা মালয়েশিয়ান হতে পারে।

প্লেনটা গড়াতে শুরু করেছে, একজন এয়ারহস্টেস এসে তাকে ধমক দিয়ে বলল, এখনও সীট বেল্ট বাঁধনি? শিগগির বেঁধে নাও।

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। হয় সে এয়ারহস্টেসটির ভাষা বুঝতে পারছে না, অথবা সীট বেল্ট বাঁধতে জানে না। এয়ারহস্টেসটি আর বাক্যব্যয় না করে নিজেই তার সীট বেল্ট আটকে দিল।

প্লেনটা আকাশে ওড়া মাত্রই মেয়েটি দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

প্রিয়জনকে ছেড়ে যাবার সময় অনেকেই এরকম কাঁদে। এসব ক্ষেত্রে অচেনা মানুষদের কথা বলা উচিত নয় বলে আমি মুখ ফিরিয়ে রইলুম জানলার দিকে।

একটু বাদেই সে কান্না থামিয়ে চোখ মুছল। আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও টের পেলুম সে একদৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। যেন আমি একটা কৌতূহলের সামগ্রী। কিংবা আমি যে তার কান্না দেখে ফেলেছি, তাতে সে লজ্জা পেয়েছে।

প্লেনটা আকাশে উড়ে সোজা হবার কিছু পরেই এসে গেল খাবার। এখন আমার কিছু খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে বোধহয় আমার একটু ঝিমুনি এসেছিল, তাই আমি না বলার আগেই এয়ারহস্টেস আমার সামনের টেবিল নামিয়ে তাতে খাবার রেখে গেছে। আবার ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করলো, চা না কফি?

খাবারের প্লেটে আইসক্রিম, কেক, স্যাণ্ডুইচের সঙ্গে রয়েছে একটি গরম সসেজ। আমি ঠিক করলুম, এক কাপ কফির সঙ্গে শুধু ওই সসেজটা খাওয়া যেতে পারে। এরকম ভাল সসেজ দেশে ফিরে গেলে আমার খাওয়ার সুযোগ ঘটবে না।

আমার পাশের মেয়েটিও কিছু না খেয়ে চুপ করে বসে আছে। এয়ারহস্টেস যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, চা না কফি তাতেও সে কোনো উত্তর দিল না।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলুম। ঠিক কী ভাষায় সে মুখের বর্ণনা দেব, জানি না। দুঃখ, লজ্জা, ভয়, রাগ এই রকম অনেকগুলো অনুভূতি যেন একসঙ্গে মিলে অদ্ভুত একটা রং তৈরি হয়েছে। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটি। সেদিকে তাকিয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল। গায়ে কেরোসিন ঢেলে যে-সব মেয়েরা আত্মহত্যা করে, শেষ মুহূর্তে তাদের মুখের চেহারা বোধহয় এরকম হয়।

খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলে উঠল। সেটা যে কী ভাষা তা পর্যন্ত আমি বুঝলুম না। মেয়েটি আমাকে ওর দেশের লোক ভেবেছে?

আমি খানিকটা অস্বস্তিজনক হাসির সঙ্গে দু দিকে মাথা নাড়লুম।

মেয়েটি এবারে তার খাবারের প্লেট থেকে আইসক্রিমটা তুলে দিল আমার প্লেটে।

ব্যাপার কী, পাগল-টাগল নাকি? আমি নিজের খাবারই খাব না, ওরটা নিয়ে কী করব! প্লেনের কোনো যাত্রী বা যাত্রিনী তো কক্ষণো এরকম ব্যবহার করে না। আমি তাকে সরল ইংরিজিতে বললুম, ও কী করছেন, আমি আপনার খাবার চাই না।

সে তার স্যাণ্ডুইচ ও সসেজও আমার প্লেটে তুলে দিয়ে বলল, ইউ টেক! ইউ টেক। প্লীজ!

এবারে আমি বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললুম, ওরকম করে না! আমার প্লেটে আপনার খাবার দিচ্ছেন কেন? আপনি না খেতে চান রেখে দিন!

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি আবার জানলার বাইরের মেঘ দেখায় মন দিলুম।

খানিক বাদে মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরল। শুধু একটি মেয়ের স্পর্শের জন্যই নয়, আমি আরও বেশি চমকে উঠলুম এই কারণে যে মেয়েটির হাত কী ঠাণ্ডা!

আমি তার দিকে ফিরতেই সে ব্যাকুলভাবে বলল, স্যার, স্যার, গীভ মি মানি!

এবারে আমি শুধু অবাক নয়, যাকে বলে স্তম্ভিত। দিনকাল অনেক পাল্টেছে জানি, তা বলে প্লেনেও ভিক্ষে চাওয়া শুরু হয়েছে? আট-দশ হাজার টাকা লাগে টিকিট কাটতে, টিকিট ছাড়া প্লেনে লুকিয়ে চুরিয়ে উঠে পড়ার কোনো উপায়ই নেই। অত টাকা দিয়ে টিকিট কিনে কেউ ভিক্ষে চায়?

মেয়েটি আবার বলল, প্লীজ স্যার, গীভ মি মানি।

মেয়েটি ইংরিজি খুবই কম জানে, তার উচ্চারণ বোঝা শক্ত। তবে সে যে টাকা চাইছে আমার কাছে তাতে কোনো ভুল নেই।

আমি বললুম, আমার কাছে টাকা নেই। আমি তোমাকে কিছু দিতে পারব না। দুঃখিত।

সে যেন আমার কথা শুনতে বা বুঝতে পারল না, বারবার একই কথা বলতে লাগল, টাকা দাও, টাকা দাও!

যেন এক্ষুণি তার টাকা দরকার। নইলে সে বিপদে পড়বে। তার শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে।

অনেক সময় ভিক্ষে দেবার ইচ্ছে না থাকলেও কোনো ভিখিরির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই কিছু দিয়ে ফেলি। এখন বাড়ি ফেরার পথে আমার নিজেরই খুব টানাটানি। বিদেশি মুদ্রা প্রায় সবই ফুরিয়ে গেছে, ব্যাংককে ট্যাক্সি ভাড়া টাড়া যদি লাগে সেইজন্য কিছু রাখতেই হয়েছে।

পকেটে হাত দিয়ে একটি দশ ডলারের নোট বার করলুম। সেটি দেখা মাত্রই মেয়েটি প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল। আমি অবাক ধাঁধায় পড়লুম। মেয়েটি দশ ডলার নেবে না! দশ ডলার নেহাত কম টাকা নয়। শিকাগোতে এক সাহেব ভিখিরি রাস্তায় আমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিল, আমি তাকে আধ ডলার দিয়েছিলুম।

মেয়েটি বলল, ইউ বাই মি টিকিট! ম্যানিলা!

মেয়েটি টাকা চায় না। আমাকে টিকিট কিনে দিতে বলছে! এ তো নিশ্চিত বদ্ধ পাগল দেখছি!

এবারে এয়ারহস্টেসের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলুম, একটু দূরে একজন এয়ারহস্টেস দাঁড়িয়ে। সোনালি চুলের এই শ্বেতাঙ্গিনীটি অনায়াসেই হলিউডের সিনেমার নায়িকা হতে পারত, শুধু এর একমাত্র দোষ, গলার আওয়াজটি কর্কশ।

আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, এই মেয়েটির কী ব্যাপার বলো তো?

সোনালি চুলের মেয়েটি ভুরু দুটি কালো পেন্সিলে আঁকা। সেই ভুরু দুটি অনেকখানি তুলে সে বলল, কেন, কী হয়েছে?

সেই মুহূর্তে আমি একটু দ্বিধায় পড়লুম। প্লেনে ভিক্ষে চাওয়া নিশ্চয়ই বে-আইনী ব্যাপার। এই মেয়েটি টিকিট কিনে দেবার কথা বলছে, তা হলে কি ওর কাছে টিকিট নেই? আমি ওকে ধরিয়ে দেব।

মেয়েটির অসহায় ব্যাকুল মুখ দেখে আমার দ্বিধা আরও বেড়ে গেল। এখন কী করা যায়? অথচ এয়ারহস্টেসটিকে ডেকে ফেলেছি, একটা কিছু বলতেই হয়।

আমি কিন্তু কিন্তু ভাবে বললুম, এই ভদ্রমহিলা বোধহয় টিকিট হারিয়ে ফেলেছেন। খুব বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে। তুমি যদি কিছু সাহায্য কর।

সোনালি-চুল মেয়েটি খানিকটা বকুনির সুরে বলল, টিকিট হারিয়ে ফেলেছে মানে? ওর তো টিকিটই ছিল না। এক পিঠের টিকিট কিনে ফ্রাংকফুর্ট এসেছে, জার্মানির ভিসা নেই, তাই ওদের সব ক জনকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে!

ঝড়ের বেগে কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

বিনা ভিসায় পশ্চিমের কোনো দেশে যাওয়া আর টিকিটের পুরো টাকা জলাঞ্জলি দেওয়া একই ব্যাপার। এই মেয়েটি ম্যানিলার নাম বলল, অর্থাৎ ফিলিপিন্সের মেয়ে। এ প্লেন তো ম্যানিলা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক নিয়ম বোধহয় এই, যে কোনো যাত্রী বা যাত্রিনীর ভিসা না থাকলে তাকে পরবর্তী প্লেনেই তুলে দেওয়া হয়। এই বিমান কোম্পানি ওদের ব্যাংককে নামিয়ে দেবে, তারপর আর ওদের দায়িত্ব নেই।

মেয়েটি আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ভিসা না নিয়ে জার্মানি এসেছিলে কেন?

ভাঙা ভাঙা গলায় মেয়েটি বলল, আমাকে একজন বলেছিল চাকরি দেবে।

এই রকমই আমি অনুমান করেছিলুম। আগেকার ক্রীতদাস প্রথা এখনও অন্যভাবে চলছে। গরিব দেশের মেয়েদের আরব দেশে ভাল চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে একজন ব্যবসায়ী। চাকরির নামে মেয়েগুলোকে বিক্রি করে দেয়। অনেক সময় তাও হয় না, অনেক সময় মেয়েগুলোর কাছ থেকেই কিছু টাকা আদায় করে তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় যে কোনো এয়ারপোর্টে।

এই মেয়েটি বোধহয় জানেই না, ভিসা কাকে বলে। চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি যে আগে দেখে নিতে হয় তাও জানে না।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, স্যার, তুমি কি ম্যানিলায় যাচ্ছো? তুমি আমায় সাহায্য করবে?

আমি বললুম, না, আমি ম্যানিলায় যাচ্ছি না। এই প্লেনও ম্যানিলায় যাবে না। আমি যাচ্ছি ইণ্ডিয়ায়।

—স্যার, তুমি আমাকে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবে?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই হয় না। আধুনিক পৃথিবী অতি নির্মম।

সে আবার বলল, স্যার, তুমি আমায় সাহায্য করবে না?

আমি বললুম, শোনো, আমার ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে কী সাহায্য করব বলো? তোমার ম্যানিলা যাওয়ার টিকিট কিনে দেবার মতন সামর্থ্য আমার নেই। তোমাকে আমি ইণ্ডিয়াতেও নিয়ে যেতে পারব না।

—ব্যাংককে নামলেই ওরা আমাকে জেলে দেবে। আমার কাছে এক পয়সা নেই। আমি কাল থেকে কিছু খাইনি।

—তখন প্লেনের খাবার খেলে না কেন?

—আমি বিনা টিকিটে উঠেছি, এদের খাবার খাব কী করে?

—তা হলেও, এরা খাবার তো দিয়েছিল। খেয়ে নিলেই পারতে।

—আমার খুব ভয় করছে। আমাকে ওরা জেলে দেবে। এর আগে আমাকে আর একবার জেলে দিয়েছিল, খুব কষ্ট।

কেন যে মেয়েটি আগেও একবার জেল খেটেছে তা আর আমি জানতে চাইলুম না। মেয়েটির ইংরেজি উচ্চারণ এমনই অদ্ভুত যে সব কথা বুঝতে আমার বেশ অসুবিধে হচ্ছে। কিছু প্রতিকার করার সাধ্য যখন নেই, তখন এর দুঃখের কাহিনী শুনেই বা কী হবে?

আমার নিরাসক্ত ভাব দেখে মেয়েটি আবার আমার হাত চেপে ধরে বলল, স্যার, আমায় ইণ্ডিয়ায় নিয়ে চল। তুমি যা কাজ করতে বলবে, আমি করব।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, তা অসম্ভব।

—আমি তোমার জন্য রান্না করে দেব!

—শোনো, তা হয় না।

—আমি তোমার জামা সেলাই করে দেব। আমি তোমার ঘর ঝাঁট দেব। আমি তোমার বাথরুম পরিষ্কার করে দেব। স্যার, তুমি আমাকে নিয়ে চল, তুমি যা চাও সব আমি করতে রাজি আছি।

—কি মুস্কিল। এরকম ভাবে কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না। ইণ্ডিয়ায় ঢুকতে গেলেও তোমার ভিসা লাগবে।

—স্যার, আমাকে সাহায্য কর, স্যার, আমাকে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে চল.....

এর হাত এড়াবার জন্য এবারে আমি বাথরুমে যাবার নাম করে উঠে পড়লুম। বাথরুম থেকে ফিরে বসলুম বেশ খানিকটা দূরে অন্য একটা সীটে।

এই অসহায় মেয়েটিকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি, তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলুম আকাশ-পাতাল। আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার তো কোনো কথাই ওঠে না। আমার টাকা থাকলে ওর ম্যানিলা যাওয়ার টিকিট কিনে দিতে পারতুম, কিন্তু ওর টিকিটের দামের দশ ভাগের এক ভাগ টাকাও আমার কাছে নেই। সুতরাং আমার কিছুই করার নেই।

ব্যাংককে যখন প্লেন নামাল তখন আমি কোনোক্রমে আমার হাতব্যাগটি নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলুম। কিন্তু নিস্তার পাওয়া গেল না। সেই মেয়েটি ছুটে এসে আমার কোট শক্ত করে চেপে ধরে বলল, স্যার, তুমি আমাকে ফেলে যেও না। আমাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে চল।

এ তো পোকা-মাকড় নয় যে গা থেকে ঝেড়ে ফেলব। জলজ্যান্ত একটি নারী। সে আমার সাহায্য চাইছে। আমি একজন পুরুষ। বিপন্ন যুবতীকে আমি কোনো সাহায্যই করতে পারব না!

মেয়েটি এমনভাবে আমার কোট চেপে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলেছে তা অনেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আমি কিছুতেই তার দিকে তাকাতে পারছি না। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার পৌরুষ।

ইমিগ্রেশান কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। ওইখানে আমাকে ধরবে। এই বে-আইনী যাত্রিনীটি আমার সঙ্গে আছে শুনলে ওরা আমাকেও ধরবে। যদি ওরা মনে করে যে, যে-পাপ-চক্র এইসব মেয়ে পাচার করে আমি তাদেরই একজন?

হঠাৎ এয়ারপোর্টের একজন অফিসারকে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালুম। লোকটার মুখ দেখলে সহৃদয় মনে হয়। এর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

আমি অফিসারটিকে বললুম, দেখুন, এই মহিলাটি ম্যানিলা যাবে, ওর টিকিট নেই, ওকে জার্মানি থেকে —

আমি কথা শেষ করতে পারলুম না, অফিসারটি খপ করে মেয়েটির হাত চেপে ধরে বলল, ও, একেই তো খুঁজছি। অন্য ক'জন ধরা পড়েছে। এ কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিল?

অফিসারটি তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগল, স্যার স্যার......

আমার ইচ্ছে করল দু হাতে কান চাপা দিই। দ্রুত ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লুম ইমিগ্রেশান কাউন্টারে।

মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করিনি, কী নাম জানি না। কিন্তু ওর মুখটা যদি ভুলতে পারতুম। আজও ভোলা গেল না।

শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী

গাজীপুরের হাট একদিন হঠাৎ গোলমাল লাগল। মিঠে আলু আর কুমড়োর ব্যাপারীদের মধ্যে বসবার জায়গা নিয়ে প্রায়ই কথার টক্কর হয়, এক-একদিন আগুন জ্বলে। তা সেদিনকার আগুন এমন-কিছু নয়, ধোঁয়াই বেশি। গলা ফাটানো চিৎকার, পেট উজাড় করা গালমন্দ, ঠেলাঠেলি, দু-একজন লাঠিও তুলেছিল। সেই লাঠির ঘা শুধু একজনের মাথাতেই পড়ল। সে আর কে হবে, হাজু ছাড়া? সে মিঠে আলুও বেচে না, কুমড়োও বেচে না। সে একটা মধ্যে নাচে-ঘোড়া।

হাজুর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরুতেই দু-দলই আঁতকে উঠল। কাজিয়া থামিয়ে দু-দলই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। তখন কত আহা উহু। লাঠির ঘা খেয়ে হাজু মাটিতে বসে পড়লেও অবশ্য একটা টু-শব্দ পর্যন্ত করেনি, দু-হাতে মাথা চেপে ধরে সে ভীত জন্তুর মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। যেন সবটাই তার দোষ। সত্যিই তো তাই, সহানুভূতি ফুরিয়ে যাবার পর সবাই বলতে লাগল, তুই মাঝখানে এসে পড়লি কেন হারামজাদা?

হাজুর ভাগ্যটাই এ রকম। বিপদ যেন তাকে টানে। এর আগে একদিন এই হাটেই কে যেন একটা ষাঁড়ের ল্যাজ মুড়ে ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন সেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়টা শুধু হাজুকেই তো গুঁতিয়ে সপাট করে গেল। আর কারুর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। তার আগে একদিন পুকুর থেকে শাপলা তুলতে গেলে একটা জল-ঢোঁড়া সাপ কামড়ে দিয়েছিল হাজুকে। গাজীপুরের কোনো মানুষকে জল-ঢোঁড়া সাপের দংশন সেই প্রথম।

গাজীপুরের হাটে হাজু কেন ঘুরে বেড়ায় জিজ্ঞেস কর তো? সে ব্যাপারীও না, খদ্দেরও না। সে এমনিই ঘুরে বেড়ায়। পরনে সবুজ-কালো লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি। সরলরেখার মতন চেহারা, সেইজন্যই তার হাত-পা বেশি লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা দেখায়। সাতদিন-দশদিন অন্তর সে দাড়ি কামায়। চেনা বা অচেনা যে-কোনো লোকের মুখের দিকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাঝে মাঝে। তা বলে তার দৃষ্টিতে কোনো কাঙালপনা নেই বরং উল্টোই, সে যেন একজন উদাসী।

গাজীপুরের হাট ভাল জায়গা নয়। অনেক টাকার লেনদেন হয়, তাই শকুনিদের নজর আছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খটাখটি লাগাবার কিংবা হাঙ্গামা উস্কে দেবার মতন লোকেরও অভাব নেই। দোকানীরা অধিকাংশ হিন্দু হলেও মহাজন মুসলমান। নতুন এম. এল. এ. হয়েছে শেখ আনোয়ার আলী, কিন্তু পরাজিত এম. এল. এ. বিষ্ণু সিকদারের দাপট এখন যথেষ্ট। এইসব মিলিয়ে এখানে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় আছে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর, যে-কোনো সময় সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে।

এইরকম জায়গায় ধুরন্ধর মানুষ ছাড়া সুবিধে করতে পারে না। চোপার জোর কিংবা হাতের গুলির জোর কিংবা টাকার জোর, একটা কিছু জোর থাকা চাই। হাজুর এর কোনোটাই নেই। তার যেন কোনো বোধ-ভাষ্যই নেই। সে কারুর কাছে কিছু চাইতে জানে না, দিতেও জানে না। তার বয়েস যখন আর একটু কম ছিল, তখন প্রায়ই দেখা যেত ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা তালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। সূর্যাস্তের সময় সময় আকাশের একটা দিক ডুবে থাকে লাল রঙে, হাজু সেই রঙের মধ্যে কী যেন দেখে। অনেকে ভাবতো, এ ছেলেটা ফকির-টকির হয়ে যাবে না তো!

সেই তালগাছ থেকে একদিন নিচে পড়ে গিয়েছিল হাজু। এখন আর সে সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে না। এখন সে খালের জলে সেই লাল রঙের আকাশের ছবি দেখে।

হাজুর মাথা ফাটার পর তার চাচার বন্ধু মোজাম্মেল গাঁদা ফুলের পাতা ছেঁচে রস লাগিয়ে দিল সেখানে। তারপর তার হাতে একটা বিড়ি দিয়ে বলল, ভাল করে দ্যাখতো, কে তোকে মেরেছে? তুই দেখতে পেয়েছিলিস?

হাজু শেখ দু-দিকে ঘাড় নেড়ে বললে, না, মোজাম্মেল চাচা।

মোজাম্মেল তার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, কে বলে তুই কোনো কম্মের না? তুই মার খেলি বলেই তো ঝগড়া থেমে গেল, নইলে আরো কতদূর গড়াত কে জানে! যা, বাড়ি যা! তোকে মেরেছি আমি!

বিড়িটা ধরিয়ে হাজু বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। মোজাম্মেলের কথায় একটুও দাগ কাটে না তার মনে। তার মাথা এখনো দপদপ করছে। একটা রক্তের ধারা তার কাঁধ বেয়ে নেমে এসে পিঠের কাছে গেঞ্জিটা রক্তিম করে দিয়েছে।

শীতের শুকনো খাল পায়ে হেঁটে পার হয়ে হাজু মাঠের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। কেউ তাকে কোনোদিন

হনহনিয়ে হাঁটতে দেখেনি। তার জীবনে সব-কিছুই শ্লথ! খোদাতাল্লা তাকে এইভাবে গড়েছেন, সে কী করবে! দুপুরবেলায় আকাশের নিচ দিয়ে তার ছায়া দেখতে দেখতে চলে।

মোল্লা বাড়ির ছেলে হাজু যেন হিন্দু বাড়ির এঁড়ে। সে কখনো কোনো কাজে লাগল না। মাঠের কাজ, জলের কাজ, ঘর-বাড়ির কাজ কিছুই সে পারে না। সে তার বাপ-চাচার কাছে এইজন্য মার খেয়েছে অনেক, তারপর একসময় সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। ও তো ফাঁকিবাজ নয়। ও পারে না। মাঠের আগাছা নিড়োতে দিলেও সে হাতের কাস্তেখানা নিয়ে উবু হয়ে চুপ করে বসে থাকে। সে আগাছাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে। যেন সে কত কী চিন্তা করছে, আসলে সে কিছুই ভাবে না।

সংসারের নিয়ম অনুযায়ী হাজুরও বয়েসকালে বিয়ে হয়েছে। জন্মে গেছে চারটি সন্তান। তবু হাজু ঠিক স্বামী হল না, পিতা হল না। তার ছেলেরা কেউ তাকে মানে না, ফক্কুড়ির সুরে কথা বলে। তার স্ত্রী সায়েদা অতি মুখরা, সারা দিনরাত বকতে বকতে সায়েদার মুখে ফেনা উঠে যায় তবু হাজুর সামান্য হুঁশ-বোধ নেই। সে রাগও করে না, করিৎকর্মাও হয় না। সে যে-রকম সেইরকমই থাকে।

বাড়ি পৌঁছোবার মুখে পুকুরে পা ধুয়ে নেয় হাজু। এক পায়ের পাতা দিয়ে আর-এক পায়ের পাতা রগড়ায় খুব ধীর স্থিরভাবে, তার কোনো ব্যস্ততা নেই। এখন থেকে রাত্তির পর্যন্ত সে ঠায় বসে থাকবে বারান্দায়, যতক্ষণ না তাকে খাবার দেওয়া হবে। একমাত্র খাওয়ার প্রতিই টান আছে হাজুর, সে খেতে ভালবাসে।

ইদানীং অবশ্য রোজ-দু-বেলার খাওয়া ঠিক ঠিক পাওয়া পাচ্ছে না। এতকাল বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে গোলে-হরিবোলে তারটা জুটে যেত। রোগা ছেলের ওপরে মায়ের টান বেশি। এই ব্যর্থ ছেলেটির প্রতিও তার আম্মার বড়ো মায়া ছিল। আম্মার ইন্তেকাল হয়েছে গত সালে। বাপ গেছে আগেই। বড়ো ভাই নিজের অন্ন আলাদা করে নিয়েছে। এখন কী করে সংসার চলে তা হাজু জানে না।

সায়েদারই চোখ পড়ল প্রথম। আপনের মাথায় রক্ত?

হাজু বলল, হ্যাঁ। রক্ত।

—কী করে কাটলো? অ্যাঁ? আবার কোথা থেকে পড়ে গ্যালেন? কথা বলতে বলতে সায়েদা এগিয়ে আসে, আর তার গলাও চড়তে থাকে। আঁট, মজবুত চেহারা সায়েদার, চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে বোঝাই যায় না। সারাদিন তাকে খাটা-খাটনি করতে হয়, দু-জন পুরুষ মানুষের কাজ সে একলা করে। তার জিভেও খুব ধার।

হাজুর বড়ো ছেলের বয়স তেরো, কিন্তু এর মধ্যেই সে শেয়ানা মানুষের মতন কথা বলতে শিখেছে। এক বাড়িতে সে রাখালির কাজ করে। সেও মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাপকে ঠেস দিয়ে কথা শোনাতে লাগল। ক্রমে ক্রমে বাড়ির অন্য লোকজনও সেখানে এসে ভিড় জমায়।

হাজুর কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। সে জানে, এই দিনটাও অন্য সব দিনের মতনই। কিছুক্ষণ সবাই মিলে তাকে বকাবকি করবে, তারপর একসময় থেমেও যাবে। রাতের অন্ধকার নামবে, শেয়াল ও রাত-চরা পাখি ডাকবে, তারপর একসময় সব চুপ। যেমন সব দিন হয়। কিন্তু তখনো হাজু জানে না, আজ তার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে।

একটু বাদেই জানাজানি হয়ে গেল, যে হাজু আছাড় খেয়ে মাথা ফাটায়নি, তাকে কেউ লাঠি দিয়ে মেরেছে। তা শুনে কারুর উষ্মা জাগলো, কারুর ক্ষোভ, কারুর দুঃখ। সবাই জানে, হাজুর মতন নিপাট ভালমানুষ কখনো মার খাওয়ার মতন কোনো কাজ করতে পারে না। তবু কী বিচিত্র এই দুনিয়া, হাজুই মার খায়।

রক্তে মাথার চুল খানিকটা চাপ বেঁধে আছে। এত লোকের এত কথা শুনেও হাজুর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। কারুর বিরুদ্ধে তার কোনো রাগ নেই, অভিযোগ নেই, সে শুধু বলল, কী জানি, কী করে লাগল। মাথায় একটা বাড়ি পড়ল, আমি বইসে পড়লাম। বেশি লাগেনি, এই মোটে একটুখানি রক্ত.........।

সায়েদার দাদা একলাস এসে পৌঁচেছে একটু আগে। সেও সব শুনলো। একলাস জীবনে পোড়-খাওয়া মানুষ, সে অনেক দেখেছে, সে জানে, আজকালকার দিনে নিরীহ, ভালোমানুষ হওয়ার বিপদ কতখানি। তাদের বাড়ি দুখানা গ্রাম পরেই। যদিও সে অনেকদিন ধরে শহরে আছে, তবু গ্রামের খবর রাখে। শহরে থাকা শাণিত কান দিয়ে সে শুনতে পায় গ্রাম-পতনের শব্দ।

শহরে যাবার পথে বোনের বাড়িতে দু-দণ্ড থেমেছিল, সব বুঝে শুনে একলাস হঠাৎ প্রস্তাব দিল, হাজু তার সঙ্গে শহরে চলুক। সেখানে সে হাজুকে মানুষ করে দেবে, দু-পয়সা রোজগারও করতে পারবে।

প্রথম প্রথম কথাটায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। ল্যাবাগোবা হাজু শহরে গেল তো দু-দিনেই গাড়ি চাপা পড়ে মরবে। আর ও করবে পয়সা রোজগার? ও কী কাজ জানে? গ্রামেই কিছু পারলো না, শহরে তো কাকের মাংস কাকে ছিঁড়ে খায়!

একলাস সকলের আপত্তি খণ্ডন করে দিল। ঘরে আগুন লাগলে অতি নির্বোধও বাঁচতে চেষ্টা করে। শহরে সর্বক্ষণ জ্বলছে সেই আগুন। সেই আগুনই ওক বাঁচাতে শেখাবে। এতোদিন গ্রামে থেকেও তো ওর কিছু সুসার হল না। শহরে গেলে আর কিছু না হোক বিড়ি বেঁধেও দিনে পাঁচ-সাত টাকা পাবে। শহরে কেউ না খেয়ে থাকে না।

হাজু একলাসের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুনতে লাগল এ-সব কথা। শহর কী তা সে জানে না। ওদিকে মুন্সীডাঙা আর এদিকে সুলেমানপুর, এই আট-দশখানা গ্রামের বৃত্তের বাইরে সে যায়নি কখনো। তবু একলাস যখন জিজ্ঞেস করল, হাজু, তুমি যাবে তো আমার সঙ্গে? হাজু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

রাত্রিবেলা যাত্রা স্থগিত রইল। পরদিন সকালে দুটি পোঁটলা বেঁধে নিয়ে হাজু রওনা হল একলাসের সঙ্গে। তার মুখে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। একলাস সায়েদাকে ব'লে গেল, তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি। দেখিস, এক মাস দু-মাস পরেই ও তোর নামে টাকা পাঠাবে মানি অর্ডারে।

আড়ংঘাটা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হবে, মাঝখানে সাত মাইল রাস্তা। খালের মাটি কেটে নতুন পথ তৈরি হয়েছে। আজকের সকালটি বেশ ছিমছাম। রোদ্দুরের তাপ নেই, বাতাস বইছে ফিনফিনে। খালের জলে আকাশের ছায়া দেখতে দেখতে হাজু হাঁটতে লাগল। একলাস কথা বলতে ভালবাসে, অনেক কথা সে অনর্গল বলে যাচ্ছে, তার অর্ধেকই হাজুর মাথায় ঢুকছে না। জলের মধ্যে আকাশকে যে এত সুন্দর দেখায় তা যেন সে আজই আবিষ্কার করল।

সুলেমানপুরের কাছাকাছি এসে একলাস বলল, ওরে বাবা, ও কি! ও হাজু, ডানদিকে মাঠের মধ্যে চেয়ে দ্যাখ।

ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে একটি মিছিল আসছে ডান দিক থেকে। অন্তত শ-দেড়েক লোক হবে। কী যেন চিৎকারও করছে তারা। এদিকে খালের এপাশেও একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও হাতে ঝাণ্ডা, লাঠি, খন্তা, কুড়ুলওআছে।

একলাস বলল, আজ বুঝি এখানে কাজিয়া লাগবে! ও হাজু, জোরে পা চালা। আমরা আবার এর মধ্যে না পড়ে যাই।

হাজু তো জোরে হাঁটতে পারে না, সে অবাক চোখে মিছিলটা দেখে। মাঠ ছেড়ে এমব্যাঙ্কমেণ্টের ওপর উঠছে মিছিলটা, ঠিক যেন একটা মস্তবড় দাঁড়ানো সাপের মতন এঁকেবেঁকে। কাছেই একটা বাঁশের সাঁকো, সেই সাঁকো দিয়ে খাল পার হয়ে ওরা ওদিকের মাঠে নামবে। তারপরই শুরু হবে লড়াই।

হাজু এর আগে যখন সুলেমানপুরে এসেছিল, তখন ওই সাঁকোটা সে দেখে নি। ওটা এর মধ্যে কারা বানালো? এই লড়াইয়ের জন্যই বানিয়েছে?

একলাস হনহনিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, হাজু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে তাকিয়ে আছে মিছিলটার দিকে। সব জিনিসই সে এ-রকম মনোযোগ দিয়ে দেখে।

ওদিকে মিছিল ও মাঠের লোকেদের চ্যাঁচামেচি তুঙ্গে উঠেছে।

একলাস ফিরে এসে হাজুর হাত ধরে টান মেরে ধমকে বলল, হাঁ করে দেখতেছিস কি, বেওকুফ? আবার মাথায় লাঠির বাড়ি খাবার শখ হয়েছে? চল।

প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে তাকে টেনে চলল একলাস। থামল একেবারে সুলেমানপুর ছাড়িয়ে রতন আগরওয়ালের কোল্ড স্টোরেজের কাছে এসে। হাঁপাতে হাঁপাতে খানিকক্ষণ দম ফিরিয়ে আনলো দু-জনে।

তারপর একলাস বলল, আজ যা ব্যাপার দ্যাখলাম, অ্যাতক্ষণে পাঁচ-সাতটা লাশ পইড়ে গ্যাছে ওখানে।

হাজু যেন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মাটিতে চিৎ, উপুড়, কাৎ হয়ে পড়ে আছে সাতজন মানুষ। যে-জমিতে ধান হবার কথা, সেখানে চাপ চাপ রক্ত।

একলাস বলল, মানুষ কেন মানুষকে মারে জানিস?

সায়েদা বলে যে হাজু যখন চিন্তা করে তখন তার চোখের চাউনি একেবারে গাই-গোরুর মতন হয়ে যায়। সেইরকমই চোখ এখন হাজুর। সে একলাসের প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠে বলল, আমি ও-সব বুঝি না একলাসভাই।

—কেন বুঝিস না? একটু ভাবলেই বোঝা যায়।

—ভাবি তো। আমার ছোটোবেলায় বড়ো মোল্লা কয়েছিলেন যে আমার মাথার মধ্যে গোবর পোরা, তাই আমি কিছু বুঝি না।

—হেঃ! যত্তসব! মানুষ মানুষরে মারে নিজেরে বাঁচাবার জন্যে। তোরে যদি কেউ মারতে আসে, তুই আগ বাড়ায়ে তারে মারবি। নইলে বাঁচতে পারবি না।

—আমি তো কারুরে মারি না, তবু মানুষে কেন আমারে মারে?

—তুই যে একটা বল্‌দা গরু হয়েছিলি। চল কলকাতায় তোরে মানুষ করে দেব।

কোল্ড স্টোরেজের সামনের টিউবওয়েল থেকে পেট ভরে পানি খেয়ে নিয়ে ওরা শরীর ঠাণ্ডা করে নেয়। তারপর আবার হাঁটতে থাকে।

কলকাতার মৌলালির কাছে দরগা রোডে একলাসের ডেরা। একখানা দোতলা মাঠকোঠায় থাকে বারো-চোদ্দ জন। এটা ওদের মেস বাড়ির মতন। সকলেরই বৌ-বাচ্চা আছে গ্রামে। এখানে ওরা নিজেরাই রান্নাবাড়ি করে খায়। সকালে উঠেই প্রত্যেকে চলে যায় যে-যার কাজে, ফেরে সেই সন্ধের পর।

এত লোকের রান্নার মধ্যে একজন অতিরিক্ত মানুষের খাওয়া দিতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু হাজুকে একটা কিছু করতে হবে তো? প্রথমে তাকে দেওয়া হল রান্নার কাজ। হাজু ও-কাজের কিছু জানে না, শুধু যে ভাত পোড়ালো তাই নয়, নিজের হাতও পোড়ালো। উনুনের আগুনের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, যেন ওই আগুনও খুব একটা দেখবার জিনিস।

তারপর তাকে দেওয়া হল জামা-কাপড় কাচা আর বাসনপত্র মাজার কাজ। সন্ধেবেলা অন্য সবাই কাজ থেকে ফিরে এসে দেখলো, উঠোনে ডাঁই করা বাসনপত্র ও ভিজে জামাকাপড় ছড়িয়ে বসে আছে হাজু। কল থেকে পানি পড়ছে দরদর করে, সেই পানি ঝরে পড়ার দৃশ্য ও শব্দে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে।

এ বাড়ির মুরুব্বি হল সইফুল্লা। সে স্মল কজেজ কোর্টে চাপরাসির কাজ করে, বেশ রাশভারী মানুষ। সারাদিন খেটে পিটে আসার পর এ-রকম দৃশ্য দেখে মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল, সে তেড়ে গিয়ে হাজুকে কান ঝাঁপাটি এক ঝাঁপড় মেরে বলল, শালা, শয়তানের ঢেঁকি!

পাশে দাঁড়িয়েছিল একলাস, সে গম্ভীর ভাবে বলল, ওরে আমি মানুষ করবার জন্য এনিছি, দু-চারটে চড়-চাপাটি তো দিতেই হবে।

তা হাজু একটু মানুষ হল বৈকি। সেই সন্ধেবেলা তাকে সব বাসন মাজতে হল। কাপড়ও কাচতে হল। সর্বক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে রইলো একলাস আর সইফুল্লা, সে হাত চালানো একটু বন্ধ করলেই দুজনে তার পিঠে কোঁৎকা দেয়।

হাজুর অবশ্য এজন্য কোনো দুঃখ নেই। বড়ো ভাল লাগছে তার এ জায়গাটা। কয়েকদিনের মধ্যেই সে এখানকার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেল। এই মাঠকোঠার বাসিন্দা চোদ্দজন লোকই তাকে পালাক্রমে মানুষ হবার জন্য উপদেশ দেয়, কাজে ভুল করলে মারে। এর মধ্যে তিন-চার জন তো প্রায় তার ছেলের বয়েসি। তারাও হাজুর ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলা মারে, তবু হাজুর বেশ লাগে।

দুপুরবেলা সারা বাড়ি শুনশান, রাস্তা দিয়ে কতরকম মানুষ হেঁটে যায়, কত বিচিত্র সব ফেরিওয়ালা। বাড়ির সামনের রকে বসে হাজু একদৃষ্টে সেই-সব মানুষ দেখে।

কাছেই একটা মসজিদ। সকাল-সন্ধে সেখান থেকে আজানের সুর শোনা যায় মাইক্রোফোনে। হাজু আগে কখনো এ-রকম মাইক্রোফোনে আজান শোনেনি। এই সুর শোনা মাত্র তার রোমাঞ্চ হয়, যেন বেহেস্ত থেকে স্বয়ং খোদা মালিকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

হাজু একবার নামাজে বসলে তার উঠতেই চায় না। সে মাটির দিকে স্থিরভাবে চেয়ে থাকে। ওই ভাবেই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। নঈম আর কাদের তাকে দুহাত ধরে টেনে তোলে।

একলাস তার বোনকে কথা দিয়ে এসেছিল যে হাজুর রোজগারের ব্যবস্থাও সে করে দেবে। এ-রকম ভাবে আর-পাঁচজনের দয়ায় বসে খেলে তো তার জীবনের কোনো সুরাহা হবে না। কাছাকাছি এক বস্তিতে বিড়িবাঁধার কাজ হয়। একলাস বলে কয়ে হাজুকে সেখানে ভিড়িয়ে দিল। কাজ খুব সোজা, দৌড়োদৌড়ি নেই, হুড়োহুড়ি নেই, গায়ে খাটনি নেই। ওপরওয়ালার হুকুম শোনারও ব্যাপার নেই। একজায়গায় পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপর মশলার ডালা নিয়ে বিড়ি বেঁধে যাবে। হাজার ছ টাকা। কেউ কেউ দিনে দেড়-দু হাজারও পেরে যায়। হাজুর প্রথম প্রথম হাজারই বাঁধুক। অন্তত পাঁচশো।

প্রথম দিন হাজু বিড়ি বাঁধলো পাঁচটা। তারপরের দিন সাতটা। অন্য কারিগররা হাসাহাসি করে। ঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে তারা চেঁচিয়ে বলে, ও মিঞা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

হাজু কিন্তু ঘুমোয় না। বিড়ির মশলার দিকে চেয়ে থেকেই তার আর পলক পড়ে না। বিড়ির মশলার রূপ আর গন্ধেই সে মোহিত, সেইজন্যই তার হাত চলে না। অনেক ধাতানিতেও দিনে দশটার বেশি উৎপাদন করতে পারলো না হাজু। মালিক একলাসকে ডেকে বলল, এ লোককে রাখা অসম্ভব। শুধু শুধু একটা ডালা আটকে রাখে। দশটা বিড়ির মজুরিই তো হয় না।

সংসারে আর পাঁচজন যে-সব কাজ জানে, হাজু তার কোনোটাই পারে না। হয়তো তার জন্য অন্য ধরণের কোনো কাজ নির্দিষ্ট ছিল। সেটা সে কখনো খুঁজে পায়নি।

এরপর আরেকজন হয়তো সে-রকমই একটা কাজের সন্ধান এনে দিল। মাঠকোঠার মেসে মাঝে মাঝে বেশি রাত্তিরের দিকে এসে হাজির হয় ইমতিয়াজ। সুন্দর নাদুসনুদুস চেহারা, মুখে চাপ দাড়ি ইমতিয়াজ খুব বড় একটা হোটেলের রাঁধুনির সহকারীর কাজ করে। সে সইফুল্লার এক গাঁয়ের লোক। মানুষটি বেশ আমুদে, সে এখানে আসে ইয়ার-

দোস্তদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সে এলে এখানেও বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। কারণ, ইমতিয়াজ বড় একটা ডেকচি ভর্তি করে আনে নানা রকম উপাদেয় খাবার। বিরিয়ানি, মুর্গির ঝোল, কিমা আর মটর সুঁটির ঝোল। এ-সব খাবার সে চুরি করে আনে, না হোটেলের বাড়তি পরিত্যক্ত সে প্রশ্ন কেউ করে না।

হাজু এ-রকম খাদ্য কখনো খায়নি আগে। সে বড় উপভোগ করে এ-সব খায়। ইমতিয়াজও পছন্দ করে হাজুকে। অন্যরা যখন কোনো কারণে হাজুকে বকাঝকা দেয়, তখন ইমতিয়াজ বলে, আহা রে, এরকম ভালোমানুষই বা আজকাল কটা দেখা যায়? যে নিজের ভালটুকু পর্যন্ত বোঝে না, সে দুনিয়ার কারুর বাড়া ভাতে ছাই দেয় না।

সইফুল্লা বলল, দুপুরে এ বাড়িতে যদি চোর পড়ে, আমাদের হাজু কিচ্ছু করবে না। শুধু ড্যাবডেবিয়ে দ্যাখবে। চোরগুলোনরে ও ভালবাসবে।

ইমতিয়াজ হা-হা করে হেসে বলে, যা দিনকাল পড়েছে দুলাভাই, কে যে চোর আর কে চোর না, তা বাছা বড় শক্ত। যাই হোক, হাজুকে আমি আমার হোটেলে একটা কাজ দিতে পারি।

বাকি সবাই আঁতকে উঠলে। কত বড় হোটেলে কাজ করে ইমতিয়াজ, সেখানে সাহেব-মেমরা থাকে। দিল্লি-বোম্বাই থেকে বড় মানুষরা এসে থাকে। পেল্লায় একখানা দালান দূর থেকে দেখলেই তাক লেগে যায়। একবার কী একটা বিপদে পড়ে কাদের গিয়েছিল ইমতিয়াজের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে, হোটেলের দারোয়ান তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। ডিউটির সময় রসুইঘর থেকে কেউ বেরুতেও পারবে না, বাইরের কোনো লোক সেখানে ঢুকতেও পারবে না।

হোটেলের কাজে সব সময়ই দু-দশ টাকা উপরি রোজগারের সুযোগ থাকে বলে এখানকার অনেকেই ওই হোটেলে চাকরির জন্য আর্জি জানিয়ে রেখেছে। ইমতিয়াজ এতদিন সুবিধে করতে পারেনি। আজ কিনা সে হাজুকে চাকরি দিতে চায়?

সকলে একসঙ্গে নানা কথা বলতে যাচ্ছিল, তাদের হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে প্রকৃত মুরুব্বির মতন গম্ভীরভাবে সইফুল্লা বলল, এ-সব কোনো কাজের কথা নয়। শেষে তোর নিজেরই কোনো বিপদ হবে। এই গাধাটা হোটেলের জিনিসপত্তর কোনটা ভাঙবে, কোনটা হারাবে, কোনটা নষ্ট করবে, পানির সাথে প্যাচ্ছাব মিশায়ে দেবে, তখন তোর চাকরি নিয়ে টানাটানি হোক আর কি। যে বিড়িবাঁধার কাজটাও পারে না, সে আর কোন্ কাজটা পারবে? তারচে ও খোদার খাসিটা এখানে যেমন বসে বসে খাচ্ছে, তেমনই থাক। আল্লার জীব, ওরে ফেলে তো দিতে পারি না।

ইমতিয়াজ এ-সব শুনেও নিবৃত্ত হল না। সে বলল, সে-রকম ভয় কিছু নাই। ও যে কাজ করবে, তাতে ভাঙাভাঙির কিছু নেই। কাজ খুব সহজ।

কাদের বলল, তাহলে সে কাজটা আমাদের দিলেন না কেন? আমাদের কারখানা লক আউট হবে শুনেছি—

ইমতিয়াজ বললো, সে কাজ তুই পারবি না। সবাই কি সব কাজ পারে? আমি যে-কাজের কথা বলছি, তা শুধু এই হাজুই পাবে। কাজ হল শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সেলাম দেওয়া।

কাদের আর নঈম একসঙ্গে বলে উঠলো, ও ভুলে যাবে। ও সেলাম দিতেও ভুলে যাবে।

ইমতিয়াজ বললো, তা দু-চারবার ভুলে গেলেও ক্ষেতি নেই। কেউ অত লক্ষ্য করে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই হল।

একলাস জিজ্ঞেস করলো, কী রে হাজু, তুই হোটেলে কাজ করতে যাবি?

হাজু সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। সে যে তখুনি সুগন্ধ পেল ভাল ভাল রান্নার। কোপ্তা, কাবাব, কালিয়া, আরো হরেক রকম সব পদ।

ইমতিয়াজই গরজ করে এন্টালি বাজার থেকে দুটি পাৎলুন আর দুখানা কুর্তা কিনে দিল হাজুকে। তারপর নিয়ে গেল হোটেলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে কাজ দারুণ পছন্দ হয়ে গেল হাজুর। বড়ো সুন্দর চাকরি। দৌড়োদৌড়ি নেই, গায়ে খাটা নেই, ওপরওয়ালার বকাঝকা নেই। বিড়ি বাঁধার চেয়ে অনেক সহজ।

হোটেল ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের একতলায় ধপধপে সাদা রঙের পুরুষ পেচ্ছাপখানার মধ্যে সে দেয়াল ঘেঁষে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবুরা দরজা ঠেলে ঢুকলে সে একটা সেলাম ঠোকে। অবশ্য সে সেলাম দিল কি না দিল তা কোনো বাবু দেখেই না। সে বাবুদের পেচ্ছাপের ছড়ছড় শব্দ শোনে। বিভিন্ন বাবুর পেচ্ছাপের বিভিন্ন রকম শব্দ। গন্ধও আলাদা। তারপর বাবুরা যদি বেসিনে এসে হাত ধোয়, তাহলে সে সাবান তোয়ালে এগিয়ে দেবে। অনেক বাবুই ও-সব নেয় না। এমন-কি পেচ্ছাপ করার পর হাতে পানি পর্যন্ত না ছুঁইয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়।

এটা গোসলখানা নয়, শুধু পেচ্ছাপখানা। পেচ্ছাপের মতন একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য যে মানুষ এত সুন্দর ঘর বানাতে পারে, তা এমন-কি সবজান্তা সইফুল্লা পর্যন্ত জানে কী? দেয়াল থেকে যেন চোখ পিছলে যায়। আর কত বড়ো আয়না। যখন আর কিছু দেখার থাকে না, তখন হাজু সেই আয়নায় নিজেকে দেখে।

দুপুর একটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ডিউটি। মাঝখানে দুবার তার আধঘন্টার জন্য ছুটি। বাকি সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। তাতে কোনো কষ্ট নেই হাজুর, কোনো বিকার নেই এতদিনে সে এমন একটা জায়গায় আশ্রয় পেয়েছে, যেখানে সারাদিনে তাকে বকবার কেউ নেই।

বাবুরা কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। অনেকে তাকে দেখতেই পায় না। আবার কেউ কেউ যাবার সময় তাকে খুচরো কুড়ি-পঁচিশ পয়সা দিয়ে যায় এমনি এমনি।

দিনের বেলা তেমন ভিড় থাকে না। সন্ধের পর থেকে বাবুরা আসতে শুরু করে। একতলায় দুখানা বার রুম, যত রাত বাড়ে যতই সেখানে রঙ-তামাসা বেশি জমে, আর ততই হাজুর সাদা ঘরখানায় ঘন ঘন দরজা খোলে।

সরাবী যে আগে দু-চারজন দেখে নি হাজু, তা নয়। তাদের গাজীপুরের হাটে তাড়ি বিক্রি হয়। সে কোনোদিন যায় নি বটে তবে চেনাশুনো লোকদের সেই তাড়ি খেয়ে হল্লা করতে দেখেছে। কিন্তু এখানকার সরাবীরা একেবারে অন্য কিসিমের। হল্লা নেই, ঝগড়া মারামারি নেই। হ্যাঁ, অনেক বাবুর সে পা টলতে দেখেছে বটে, অনেকে দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলে, কেউ কেউ হিসির পর আর প্যান্টুলের বোতামের জায়গা বন্ধ করতে পারেনা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দোলে। দু-একজন বমি করে। দু-একজন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানাই যেন চিনতে পারে না।

হাজু দেয়াল ঘেঁষে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে সব দেখে। কোনো কোনো বাবু বমি করলেও সে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায় না। ইমতিয়াজ তাকে পই পই করে বলে দিয়েছে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে হাজু কোনো কথা বলবে না, কেউ না ডাকলে সে কাছে যাবে না।

দুপুরবেলা থাকে শুধু ন্যাপথালিনের গন্ধ, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধটা বদলায়।

একদিন রাত প্রায় পৌনে দশটার সময় দু-জন ছোকরা বাবু ঢুকলো সেই বাথরুমে। চোখ লাল, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, বেশ টলটলে অবস্থা।

হাজু এর মধ্যেই অনেক নিয়মিত বাবুর মুখ চিনে গেছে। এই দুজনকে সে প্রথম দেখলো। নতুন মুখ দেখলেই সে আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে সেদিকে দেখে, তার কথাবার্তা শোনে, অবশ্য বাবুদের বেশির ভাগ কথাবার্তাই সে বুঝতে পারে না।

ছোকরা বাবু দুজন কবি। এতবড়ো হোটেলে কবিদের যাতায়াত বিশেষ নেই, তবে কখনো কখনো কোনো ধনী ভক্ত তাদের নিয়ে আসে এখানে।

এক কবি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে খুব কাতর গলায় বলল, এটা আমি সহ্য করতে পারি না। যতবার দেখি, রাগে আমার গা জ্বলে যায়।

অন্য কবি দেয়ালকে জিজ্ঞেস করল, কোন্‌টা? ওই মেয়েটার সঙ্গে বেঁটে লোকটা তো? বকবক করে কানের পোকা খসিয়ে দিচ্ছে। এরপর আমি ওকে মারব।

প্রথম কবি বলল, তা নয়। ওই যে পেচ্ছাপখানার অ্যাটেডেণ্ড। কোনো মানে হয়, পেচ্ছাপখানার মধ্যে সারাক্ষণ একটা লোককে দাঁড় করিয়ে রাখা।

—ব্রিটিশ লিগেসি। ইংরেজদের কায়দার কুৎসিততম অনুকরণ।

—খোদ ইংল্যান্ডে এখনো এ-রকম আছে?

—কলোনিগুলোতে গিয়েই তো ওরা এইসব নোংরামি করত।

—এ দেশটা এখনো মারোয়াড়িদের কলোনি।

দুই কবি বেসিনে এল হাত ধুতে। একজন চোখেমুখে জল ছেটাতে লাগল। অন্যজন একদৃষ্টে আয়নায় দেখতে লাগল নিজেকে।

সাবান আর তোয়ালে হাতে পাথরের মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হাজু।

একজন কবি হঠাৎ তার দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, ঘর কাঁহা? মুল্লুক কাঁহা হ্যায়?

খুঁটোয় বাঁধা গোরুর মতন চোখ করে দাঁড়িয়ে রইলো হাজু। অতর্কিত প্রশ্নের সে উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

মাতালের একরকম জেদ থাকে। যেন এই লোকটার দেশ কোথায় তা না জানতে পারলে পরবর্তী পেগটি বিস্বাদ হয়ে যাবে। তাই সেই কবিটি হাজুর থুতনি ধরে আবার কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, উত্তর দিচ্ছ না কেন? বাড়ি কোথায় তোমায়?

হাজু ঈষৎ কেঁপে গিয়ে বললো, গাজীপুর সাহেব।

—কোন জেলায়?

—মেদিনীপুর।

—নাম কী?

—হাজু।

—হাজু? হাজু আবার নাম হয় নাকি? তোমার মা তোমায় কী নাম-ধরে ডাকে তা জানতে চাইছি? ভাল নাম কী?

জন্মের পর থেকে সবাই তাকে হাজু বলেই ডাকছে। তবে তার আর একটা নাম আছে বটে, কিন্তু বহুদিন তার ব্যবহার নেই।

সে বললো, সাজান্, সাহেব।

কবিটি বিরক্তিভাবে বলল, পিকিউলিয়ার ম্যান! উইথ আ পিকিউলিয়ার নেইম! সাজান্ কারো নাম শুনেছিস আগে? হিন্দু না মুসলমান?

হাজু আর-একবার কেঁদে উঠে মিনমিনে গলায় বললো, আমরা মোছলমান।

দ্বিতীয় কবিটি এবারে অট্টহাস্য করে উঠলো, তারপর বললো, বুঝলি না? শাজাহান! তা বাবা, সম্রাট শাজাহান, তোমায় এই পেচ্ছাপখানায় কে বন্দি করে রাখলো। আগ্রা ফোর্ট কী হল?

প্রথম কবিটি তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, চল চল। ডিসগাস্টিং! আমরা এ-সব সিস্টেম এখনো মেনে নিচ্ছি, ম্যানেজারকে গিয়ে এখনো লাথি মারতে পারছি না—

—পাঁচ পেগ খাবার পর এ-সব কথা তোর মনে পড়ে! কাল সকালে আবার ফুস! ম্যানেজারকে লাথি মারলে কী হবে, আমাদেরই আর ঢুকতে দেবে না এখানে!

—তবু একদিন ম্যানেজারের পেছনে লাথি মারবো ঠিক!

দরজার কাছে গিয়ে দ্বিতীয় কবিটি ঈষৎ টলে গিয়ে জড়ানো গলায় বললো বন্দেগি, সম্রাট। একসময় তুমি সারে হিন্দুস্তানকা মালেক থা, এখন থাকো এই পেচ্ছাপখানায় বন্দী হয়ে। গুড নাইট!

দুই বাবুর এইসব কথায় একটুও রেখাপাত হল না হাজুর মনে। প্রায় কিছুই সে বোঝেনি। এ-সব সরাবী বাবুদের খেয়ালের কথা। বাবুরা যে তাকে মারধোর করেনি, মাথা ফাটিয়ে দেয়নি, এই যথেষ্ট!

কিন্তু এর জের মিটলো না। একটু পরেই আর-একজন বাঙালিবাবু ঢুকলো। একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্যান্টের সামনেটা খুলতে খুলতে পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ বাবা, তোমার নাম নাকি শাজাহান? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

বার রুমে কবিদ্বয় নাকি এই নাম নিয়ে খুব দাপাদাপি করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা এমনই বেসামাল হয়ে যায় যে তাদের বার করে দেয়। কিন্তু সেই থেকে অনেকেই এই পেচ্ছাপখানার অকিঞ্চিৎকর মানুষটির নাম জেনে গেছে। এরপর থেকে কোনো বাবু তার নাম ধরে ডেকে বলে, এই শাজাহান, তোয়ালে দে।

তার নামের এই পদোন্নতিতে হাজুর অবশ্য কোনো পরিবর্তন হয় না। অনেক সময় বাবুরা ওই নামে ডাকলে সে ঠিক বুঝতেও পারে না। বাবুদের উচ্চারণ অন্য রকম। তাছাড়া কয়েকপাত্র পেটে পড়লে বাবুদের জিভও বদলে যায়।

হাজুর অবশ্য সবচেয়ে ভাল লাগে দুপুরের দিকটা। শনি-রবি ছাড়া অন্যদিন দুপুর তিনটে থেকে ছটার মধ্যে একজন দু-জন বাবুও আসে কি না সন্দেহ। ইচ্ছে করলে সে এই সময় একটু বাইরে যেতেও পারে। কিন্তু হাজু যায় না। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চকচকে দেয়াল দেখে। তার কাছে এমন সুন্দর দৃশ্য আর নেই।

একদিন দুপুরে সে দেখলো, সেই দেয়াল দিয়ে নেমে আসছে পিঁপড়ের সারি। অনেকখানি লম্বা। সব লাল পিঁপড়ে, তারা অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ, কেউ লাইন ভাঙে না। কেন পিঁপড়েগুলো বাথরুমের দেয়াল দিয়ে আসছে, কোথায় তারা যেতে চায়, তা হাজু বোঝাবারও চেষ্টা করলো না। দেওয়ালের সাদা টালির ওপর সেই লাল পিঁপড়ের রেখায় বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে, হাজুর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলো সেদিকে।

হঠাৎ হাজুর মনে পড়লো একলাসের সঙ্গে আসবার সময় সুলেমানপুরের কাছে সেই মিছিলটার কথা। খাল ধার দিয়ে এসে সাঁকো পার হচ্ছিল। সেই মিছিলটাও এ-রকমই দেখতে ছিল না?

কল থেকে খানিকটা পানি নিয়ে হাজু দেয়ালে একটা রেখা আঁকলো। এই হল সেই খালটা। আর এই হল সাঁকো। এত পিচ্ছিল দেয়ালে পানি ধরে না। তাই হাজু মোটা করে দাগ দিতে লাগল।

পিঁপড়ের সারি এসে থেমে গেল সেই জলের রেখার কাছে। সামনের দিকে কয়েকটি পিঁপড়ে দাঁড়িয়ে গেলো দুপাশে, একটা দুটো আবার দৌড়ে ফিরে যেতে লাগল পেছন দিকে। যেন কোনো পরামর্শ করতে যাচ্ছে।

হাজু দারুণ অবাক। পিঁপড়ের মিছিল সাঁকোর ওপর দিয়ে খাল পার হবে না? বাঃ বেশ মজা তো! সে ফিসফিস করে বললো, সেই ভাল বাপজানেরা, কী দরকার ওদিক পানে যাবার? শুধু শুধু দাঙ্গা-কাজিয়া করে কী লাভ? এদিকেও তো কত জায়গা রয়েছে।

আর একটু মোটা করে জলের দাগ দিতেই পিঁপড়ের মিছিলটি পাশ ফিরলো। তারা ধরলো অন্য পথ। হাজু জীবনে যেন এত আনন্দ পায়নি। এরা তার কথা শুনছে। এরা তাকে মানে।

দেয়ালে নানা রকম জলের রেখা টানতে টানতে সে বলতে লাগলো, এই দিকে! এই দিকে—

চূড়ামণি উপাখ্যান

ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা আসে, শেষ রাত্তিরের দিকে। কোথা থেকে আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না!

ঘোড়াগুলো ছোট হলেও দারুণ তেজী, চৈত্র মাসের ঝড়ের মতন হঠাৎ শোনা যায় তাদের আগমন-শব্দ। কিছুই সামাল দেবার সময় পাওয়া যায় না, আবার উধাও হয়ে যায় চোখের নিমেষে।

সংখ্যায় তারা জনা ছয়েকের বেশি নয়, যদিও বাড়ি ঘেরাও করার পর তারা এমনভাবে ছোটাছুটি করে যেন সবদিকেই কেউ না কেউ আছে, এক একজনকেই মনে হয় অনেকজন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘোড়াগুলো গুনছে।

এমন নয় যে তারা শুধু অমাবস্যার রাতে মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। গত কোজাগরি পূর্ণিমায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে তারা এসেছিল। সেদিন পীতাম্বর গড়াই-এর বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো। সারাদিন তুমুল ধুমধাম, সন্ধেবেলা কীর্তন গানের আসর বসেছিল, রাত্তিরে আত্মীয় কুটুমরা পাত পেড়ে খেয়েছে, সবাই বাড়ি ফেরেনি, থেকেও গেছে কয়েকজন। সব কাজকর্ম মিটিয়ে হ্যাজাক নেবাতে নেবাতে রাত প্রায় একটা। ওরা এল তার প্রায় দুঘণ্টা পরে।

শেষ রাতের ঘুম বড্ড গাঢ় ঘুম। চোখ মেললেও সহজে চৈতন্য আসে না। কী হয়েছে বুঝতে না বুঝতেই সব শেষ। উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল মোংলা, সে নাকি প্রথম থেকে সব দেখেছে। এবারে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এসে গেছে আগে আগেই, একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়েছিল মোংলা, কপা কপ কপা কপ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভাঙলেও সে ভেবেছিল বুঝি ঘুটিয়ারি শরিফে ঘোড়দৌড়ের স্বপ্ন দেখছে। তারপর সেই আওয়াজ একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। কিন্তু খাটিয়া থেকে নামবারও সময় পেল না, একটা বিকট কালো মূর্তি দাঁড়ালো তার বুকের ওপর এক পা চাপিয়ে। সেই পা জগদ্দল পাথরের মতন ভারি, তার ওপর মোংলার নাকের ডগার কাছে তরোয়াল।

মোংলার বর্ণনা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তার কপালে রয়েছে তরোয়ালের খোঁচার ঘা, ডাকাতরা যাবার সময় তার এক চোখের ওপর চাবুক মেরে গিয়েছিল, তারপর থেকে সে আর বাঁ চোখটা খুলতে পারে না। তবু সেই অবস্থার মধ্যেই মোংলা অনেক কিছু দেখে ছিল। পীতাম্বর গড়াইয়ের বাড়ি মেটে বাড়ি হলেও দু'মহলা। ডাকাতরা সে বাড়ির অন্ধিসন্ধি সব আগে থেকেই জানে। তারা অন্য কোনো ঘরে খোঁজাখুঁজি করেনি, তাদের মধ্যে দুজন সোজা পীতাম্বরের ঘরের সামনে গিয়ে দুই লাথিতে দরজা ভেঙেছে। পীতাম্বরের চুলের মুঠি ধরে খাট থেকে নামিয়ে তাকে শেষ করেছে এক কোপে, তারপর এক ঝটকায় বিছানা থেকে তোশকটা তুলে নিয়েছে। তারা জানতো, পীতাম্বরের সব টাকা ওই তোশকের মধ্যে সেলাই করা।

পীতাম্বরের ঘরে যখন এইসব কাণ্ড চলছিল, তার মধ্যেই মোংলা শুনতে পাচ্ছিল জল ছেটানোর শব্দ। কেউ যেন সারা বাড়িতে গোবর ছড়া দিচ্ছে। আসলে জলও নয়, গোবর ছড়াও নয়, ডাকাতদের একজন কেরোসিন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। চটপট কাজ হাসিল হতেই আগুন লাগিয়ে দিল, গোটা বাড়ি জ্বলে উঠল একসঙ্গে।

এই রকমই করে ওরা, যাবার সময় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তাই কেউ আর ওদের পিছু ধাওয়া করতে পারে না। সবাই তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

কেমন চেহারা ওই ডাকাতদের? মোংলার বর্ণনায় তাদের সকলেরই কুচকুচে কালো পোশাক, মুখও কালো কাপড়ে ঢাকা, তাই তাদের সকলকে একরকম দেখায়। তাদের বয়েস বোঝা যায় না। মোংলার মতে তারা 'শয়তানের জীব'। অনেকে এটা বিশ্বাস করে। কারণ, খলসেখালির রতুবাবু এ ডাকাতদের দিকে বন্দুক চালিয়েছিলেন বলে শোনা যায়, রতুবাবুর বন্দুকের জোর আছে, তিনি একবার একটা বাঘ মেরেছিলেন, ধান লুটের সময় দুটি মানুষও মেরেছিলেন কিন্তু তাঁর গুলিতে ওই ডাকাতদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি, তাদের ঘোড়াগুলোও জখম হয়নি। এক পক্ষকাল পরে তারা ফিরে এসে রতুবাবুর বাড়ি জ্বালিয়ে তাঁর গলা কেটে দিয়ে গেছে।

ওরা যে শুধু ধনবান লোকদের বাড়িতেই টাকা লুট করতে আসে তাও নয়। হারুণ শেখ মানুষটা তেজী, কিন্তু তার ধন সম্পদ তো বিশেষ ছিল না। সেই হারুণ শেখের বাড়িতেও এক রাতে ডাকাত পড়লো। ঘোড়সওয়াররা হারুণ শেখকে শুধু খুন করেনি, তার হৃৎপিণ্ডটাই নাকি উপড়ে নিয়ে গেছে। এমন হৃৎপিণ্ড ওপড়াবার ঘটনা আরও

শোনা যায়। আবার কোনো কোনো বাড়িতে আসে ওরা যুবতি মেয়ে লুঠ করার জন্য। জীবন নায়েকের বাড়িতে পাঁচ ভরি সোনা ছিল। সে খবর ডাকাতরা পায়নি, সে বাড়ি থেকে জীবন নায়েকের সোমত্থ সুন্দরী বউটাকে শুধু তুলে নিয়েছে, অবশ্য সে বাড়িতেও আগুন জ্বালিয়ে যেতে ভুল করেনি।

অশ্বারোহী ডাকাতদের তাণ্ডবে গোটা তল্লাটটার মানুষজনের রোম খাড়া হয়ে আছে। হাট-বাজারে, গঞ্জে এই ডাকাতদের কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই, গল্পও উড়ছে নানারকম। তবে আসল ঘটনাই এমন নৃশংস যে তার ওপর বেশি রং চড়াবার মতন কল্পনাশক্তি এদিককার মানুষদের নেই। রাত্তিরবেলা দূরে কোনো গ্রামে আগুন জ্বলে উঠলেই বোঝা যায়, এইমাত্র ডাকাতরা টগবগিয়ে চলে গেল। কোথায় যায় ওরা? এই প্রশ্নের কোনো হদিশ নেই বলেই অলৌকিক কথা মনে আসে। 'শয়তানের জীব', ওরা ঘোড়া সুদ্ধু ডুব দেয় গাঙের জলে।

এই নদী-নালার দেশেও ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি, ঘোড়া কোথায় এদেশে? বড় বড় নৌকোয় যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করতে আসে, তারা এই প্রশ্ন করে।

দিনেরবেলা ফনফন করে ওড়ে নোনা বাতাস, পাতলা রোদ্দুরে দুলে দুলে উড়ে যায় বগেরি পাখির ঝাঁক, মাছ ধরা ডিঙ্গিগুলো রূপোলি জলে ছায়ার মতন ভাসে। রাত্তিরের ওই বিভীষিকা তখন মনে হয় অলীক।

হ্যাঁ, এই জল-কাদার দেশেও ঘোড়া আছে। এখানে জঙ্গলে আছে বাঘ, জলে আছে কামোঠ-কুমীর। কিন্তু ঘোড়া এমনই তেজী প্রাণী যে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায়, কুমীর কামোঠ তাকে ছুঁতে পারে না। জঙ্গলের বাঘ নাগাল পাবার আগেই ঘোড়া জঙ্গলের পথ কাবার করে দেয়। তাই বর্ধিষ্ণু লোকেরা কেউ কেউ ঘোড়া রাখে। বনমালি ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যান। তা-ছাড়া ঘুটিয়ারি শরীফে ঘোড়দৌড় হয়। ইস্কুল ডাঙ্গার মাঠে সত্যিকারের ঘোড়দৌড়, প্রতি হাটবারে, দশ-টাকা বিশ-টাকার বাজি থাকে প্রতি দৌড়ে। সাত আটটা ঘোড়া দৌড়োয়, বেশ কিছু টাকার লেনদেন হয়।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, ওই ঘোড়দৌড়ের ছেলেগুলিই বুঝি ডাকাতি শুরু করেছে। কিন্তু এই ছোঁড়াগুলো যে বড়ই বাচ্চা। এদিককার ঘোড়াও বেশ ছোট, প্রায় গাধার সঙ্গে উনিশ বিশ, বয়স্ক মানুষদেরও বহন করতে পারে বটে কিন্তু তাহলেও ছোটার গতি থাকে না। তাই ঘোড়দৌড়ের সওয়াররা সবাই পাতলা চেহারায় কিশোর। যে ছোঁড়াটা প্রায় প্রতিবারই ফার্স্ট হয়, সেই কামরুল তো অন্যান্য দিন কাজ করে বাজারের মুদিখানায়। রোগা ডিগডিগে শরীর, মুণ্ডুটা বড়, মনে হয় এক চড় মারলে ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু ওই কামরুলই যখন ঘোড়া ছোটায়, কী তার তেজ, মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে যায়, বাতাসের বেগকেও যেন সে জয় করে নিতে পারে, ছপটি মারতে মারতে এক এক সময় সে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠে। কামরুলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম বলরাম, কালু মিস্তিরির ছেলে, তার সারা গায়ে পাঁচড়া হলে কী হয়, গলার জোরেই সে তার ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে ছোটায়।

এই কামরুল, বলরাম, আনিসুল এরা কী ডাকাত হতে পারে?

অনেকে বলাবলি করতে লাগল, আজকাল গুঁড়ো-গাঁড়াদেরও বিশ্বাস নেই। দিনকাল পাল্টে গেছে। এখন মায়ের পেট থেকে পড়তে না পড়তেই এরা বুলি শেখে। দশ এগারো বছর বয়েস হতে না হতেই টাকা পয়সা চিনে যায় খুব, মুখে শোভা পায় জ্বলন্ত বিড়ি। বগলে চুল গজাবার আগেই এরা মেয়েলোকদের দিকে নজর দিতে শুরু করে। চৌদ্দ বছর বয়েসেই এক একজন লায়েক।

এদের চেহারা ডাকাতসুলভ না হলেও এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সন্দেহের কারণ এদের অশ্বশক্তি। এমন জোরে ঘোড়া ছোটাতে তো আর কেউ পারে না এ তল্লাটে। ইস্কুল মাস্টার মধু নস্কর জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে থানা পুলিশের কাছে আর্জি জানালেন এই ছোঁড়াগুলোর বিরুদ্ধে। ঘুটিয়ারি শরীফের ঘোড়দৌড়ে প্রতি হাটবারে অনেক চাষি তাদের রক্তজল করা পরিশ্রমের টাকা জলাঞ্জলি দেয়। লাভের টাকা যায় ঘোড়ার মালিকদের ঘরে। যে ছোঁড়াগুলো ঘোড়া ছোটায় তারা পায় মাত্র দশ টাকা করে, তবু ওই ছোঁড়াগুলোর ওপরেই মধু নস্করের রাগ বেশি।

এক হাটবারে পুলিশ এসে ঘোড়দৌড় মাঝপথে থামিয়ে কামরুল, বলরাম, কাদের, এককড়ি, আনিসুল সবাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। যারা ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলতে এসেছে, তারা অসন্তুষ্ট হল খুব, ডাকাতির কথা তাদের তখন মনে নেই।

যেন মধু নস্কর আর তার জনসাধারণকে উপহাস করার জন্য সেই রাত্রেই ডাকাত পড়লো মধু নস্করের কাকা যাদব নস্করের বাড়িতে। গভীর রাতে সেই রকমই ঘোড়া ছুটিয়ে এল ছজন ডাকাত, যাদব নস্করের ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে, দুজনকে খুন করে একবারে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল। যাদব নস্করের সদ্য বিধবা শাপ-শাপান্ত করতে লাগল মধু নস্করকে।

এই অঞ্চলে থানা পুলিশের ওপর মানুষের ভরসা নেই। খুন-জখম, ডাকাতি লেগেই আছে। পুলিশকে খবর দিলেও গা করে না। যদি বা কখনো পুলিশ আসে, এসে আস্তানা গাড়ে গ্রামের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়িতে পেট ভরে

খাওয়া দাওয়ার পর দারোগা সাহেব হাই তুলতে থাকেন। লোকজনের অভিযোগ শুনতে শুনতে তাঁর চোখ টেনে আসে ঘুমে।

কেউ কেউ বলে, ওই পুলিসও যা, ডাকাতও তা। রূপকথার গল্পে যেমন থাকে, দিনের বেলা যে পাটরাণী রাত্তিরবেলা সে-ই রাক্ষসী। সেইরকম দিনের বেলায় যারা পুলিশ, রাত্তিরে তারাই ডাকাত। যে রক্ষক সেই ভক্ষক বলে কথা আছে না?

তেঁতুলছড়ি গ্রামে এখনো ডাকাত পড়েনি। আশ-পাশের কোনো গ্রামই প্রায় বাদ যায়নি, সবাই ভাবে এবারে তেঁতুলছড়ির পালা। কবে আসবে, কবে আসবে এই ত্রাস। এই গ্রামের মানুষ রাতের পর রাত জেগে কাটায়, যদিও জানে, রাত জেগে পাহারা দিয়েও লাভ নেই, ওই ডাকাতদের রোখার সাধ্য নেই তাদের। এক বাড়িতে ডাকাত পড়লে অন্য বাড়ির কেউ ছুটে আসবে না, সাধ করে কে নিজের প্রাণটা খোয়াতে চাইবে।

তেঁতুলছড়িতে অবশ্য সে-রকম ধনবান কেউ নেই, প্রায় সবই চাষাভুষো আর কয়েক ঘর জেলে-তাঁতি। রতনমণি ঘোষের বাবা গোয়ালা ছিল, এখন ওরা নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়, ওদের জমি-জমা কিছু বেশি, আবার ও বাড়িতে পোষ্যও অনেক। কিছু জমা ধান-চাল থাকলেও টাকা-পয়সা সোনা-দানা বিশেষ নেই, ছজন ডাকাতের এক রাত্তিরের খরচা পোষাবে না।

কিন্তু টাকা পয়সা পাবার আশা না থাকলেও তো ওরা আসে। এমনি এমনি এসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মানুষ খুন করে। তাতে সন্দেহ হয়, ওরা বুঝি আসল ডাকাত নয়। ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। এই কারুর ওপর রাগ আছে, অমনি কিছু টাকা খরচ করে লেলিয়ে দেওয়া হল ডাকাত। হারুণ শেখের বেলাতেই পাকা হয় সন্দেহটা। টাকার জোর ছিল না তার মোটেই কিন্তু হিম্মতের জোর ছিল, কারুকে সে ছেড়ে কথা কইতো না, রামলাল ব্যাপারীকেও সে মুখের ওপর তুড়ে দিয়েছিল। ডাকাতরা এসে তাকে কচুকাটা করে গেল নিশ্চয়ই অন্য কারুর প্ররোচনায়।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে অবশ্য সেরকম তেজী মানুষও কেউ নেই। তা বলে কি আর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া হয় না কিংবা ভাই ভাইকে মারতে দা উঁচিয়ে তেড়ে যায় না! কিন্তু ওই বাপ-মা তুলে গালমন্দ কিংবা তেড়ে যাওয়া পর্যন্তই, তার চেয়ে বড় কোনো ঘটনা অনেকদিন এখানে ঘটেনি।

তবু ভয় যায় না, নিজের অজ্ঞাতেই কে, ভিন্ গাঁয়ের কার চক্ষুশূল হয়ে বসে আছে, তার ঠিক কী? তাছাড়া দু-পাঁচটি স্বাস্থ্যবতী কন্যা বা বউ রয়েছেই এ গ্রামে, সেও তো কম বিপদের কথা নয়, বাড়িতে অমন রমণী থাকা আর হরিণ পুষে রাখা তো একই কথা।

সন্ধে হলেই ভয়ে গা ছমছম করে। গরম ভাতের গ্রাস মুখে তুলতেও সুখ আসে না। কারুর সঙ্গে কারুর কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। ছোট কোনো বাচ্চা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলে বড়োরা রেগে যায়, তারা বাচ্চাটাকে থাবড়া মারে।

ইদানীং আর এদিকে বাঘের উপদ্রব নেই। বুড়ো বুড়িদের মুখে শোনা বাঘের গল্প এখন পানসে লাগে। বাঘ তো ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যেত না।

কেউ কেউ ভাবে, ডাকাতরা একবার এসে পড়লে বাঁচি। রোজ রোজ এই ঘাড় শক্ত করে থাকা সহ্য হয় না। ডাকাতরা এলে একখানা-দুখানা বাড়ি পোড়াবে। দু'চারজনকে মারবে বড় জোর, তারপর তো অন্য সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা তা শোনে না। কাজে-কর্মে তাদের মাঠে যেতে হয়, দোকানে যেতে হয়। সন্ধের পর একবার নদীর ধারে না গেলে তো চলবেই না।

নদীর ওপরে একটা বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো পার হয়ে ওপারের গ্রামে গেলে পাওয়া যায় মিষ্টি জলের পুকুর। ওই পুকুরের জল ছাড়া ডাল রাঁধা যায় না। ওই গ্রামে আছে বড় মুদির দোকান, সেখানে পাওয়া যায় সর্ষের তেল। সেই গ্রাম পেরিয়ে তার পরের গ্রামে শুক্রবারের হাট।

সন্ধের পর নদীর ধারে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সার বেঁধে বসে। তখন পুরুষ মানুষদের এদিকে আসা নিষেধ।

তবু একদিন প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায় ওই সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়েছিল মন্মথ পাইকারের ছেলে শ্রীধর। কেষ্ট ঠাকুরের মতন সে বাঁশী বাজায়। সেই শ্রীধর তেঁতুলছড়ি গ্রামের বাতাসীকে একলা পেয়ে কুপ্রস্তাব দিল। বাতাসী তো আর শ্রীরাধিকের মতন আলুথালু নয়, ঢলানীও নয়, বড় তেজী মেয়ে সে, জঙ্গল থেকে সে মস্ত বড় কাঠের বোঝা মাথায় করে আনে, একবার সে জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ দিয়ে একটা গোখরো সাপ পিটিয়ে মেরেছে। বংশীবাদক শ্রীধর যখন বাতাসীর হাত চেপে ধরতে গেল, তখন বাতাসী তাকে ঠেলে ফেলে দিল জলে। তারপর তার কী হি হি হি হাসি। সেই হাসি যেন মাছরাঙা পাখির ডাক।

এই ঘটনায় তেঁতুলছড়ি গ্রামে আরও জাঁকিয়ে বসল ভয়। বাতাসী এ কাজটা বড় মন্দ করেছে। এখন শ্রীধর রাগের চোটে যদি ডাকাত লেলিয়ে দেয়?

এতদিনে সবার খেয়াল হল যে কাঠকুড়ুনী বাতাসীর শরীরে একটা জেল্লা আছে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে সে, তার নিজের সাধ আহ্লাদ না থাকতে পারে। কিন্তু তাকে দেখে দুষ্টু প্রকৃতির লোকদের সাধ আহ্লাদ তো জাগতেই পারে! যারা বাতাসীর দিকে আগে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি, এখন দেখতে শুরু করল।

কেউ কেউ অবশ্য বলল, না, না, শ্রীধর অমন মানুষই নয়। সে একটু তরলমতি হতে পারে, কিন্তু চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব নেই। তবু ভয়ের কাঁটা খচখচ করে। শ্রীধর না বলুক অন্য কেউ তো রটিয়ে দিতে পারে যে তেঁতুলছড়ি গ্রামে আছে বাতাসীর মতন এক আগুনের ঢেলা। আগুনের টানেই তো আগুন আসে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামের প্রবীণরা শলাপরামর্শ করতে বসে অশ্বত্থতলায়। কারুর কারুর হাতে হুঁকো, কয়েকজনের হাতে বিড়ি। অনেক তামাক পুড়ে যায়, কোনো বুদ্ধি আসে না। কেউ কেউ বলে, বাতাসীকে এ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কাঠ কুড়োনোই যার জীবিকা, সে তো যে-কোনো গ্রামেই থাকতে পারে, সাঁকোর ওপারে শ্রীধরদের গ্রামেই গিয়ে থাকুক। তারপর বাতাসীকে শ্রীধর খাবে না ডাকাতরা খাবে, এ তারা বুঝবে, তেঁতুলছড়ি গ্রামের লোব তো বাঁচবে!

কথাটা অনেকের মনঃপূত হয়, কিন্তু কে যে বাতাসী বা তার মাকে এই কথাটা বলবে, তা ঠিক হয় না। সকলেরই বুকের মধ্যে থাকে একই সঙ্গে গরম আর ঠাণ্ডা। যার মনে হয় যে বাতাসীটাকে তাড়াতে পারলেই শান্তি, সে-ই আবার ভাবে, যতদিন আছে থাক না, তবু তো পাছা-ভারি মেয়েটিকে দু'চোখ ভরে দেখেও খানিকটা আরাম পাওয়া যায়।

বাতাসীর মায়ের নাম তুলসী হলেও লোকে তাকে আড়ালে বলে কাঁদুনী। কারণ তার গলার আওয়াজটা খোনা খোনা। মা আর মেয়ে এই দুজনের সংসার। দুজনেই বাল্যবিধবা। গ্রাম-প্রধানদের প্রস্তাবটা ক্রমে বাতাসীর মায়ের কানে আসে।

এক সন্ধেবেলা অশ্বত্থতলায় গিয়ে কাঁদুনী এক দঙ্গল পুরুষ মানুষের সামনে কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, হায় রে, এ গ্রামে কি পুরুষ মানুষ নেই? মেনিমুখোরা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়। আমরা কারুর সাতে পাঁচে নেই, দিন আনি দিন খাই, ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে আমাদের? আজ যদি থাকতো চূড়ামণি......আজ যদি থাকতো চূড়ামণি......

চূড়ামণি নামটা শুনেই থেমে যায় সব গুঞ্জন। কেউ আর বিড়ি টানে না, যার হাতে হুঁকো, সে গুড়ুক টানতে ভুলে যায়। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। চূড়ামণি নামটায় যেন একটা যাদু আছে। অশ্বত্থতলায় যারা জমায়েত হয়েছে তারা অনেকেই চূড়ামণিকে চোখে দেখেনি, কিংবা অল্প বয়েসে দেখলেও এখন আর স্মরণে নেই। কিন্তু সকলেই চূড়ামণির কথা শুনেছে। তার নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

শুধু এই তেঁতুলছড়ি গ্রাম নয়, আশপাশের পাঁচ দশখানা গ্রামের নয়নমণি ছিল ওই চূড়ামণি। যেমন ছিল তার হাসিমাখা সুন্দর মুখ, তেমনই ছিল তার লোহার মতন বুকের পাটা। সংসারে আর কেউ ছিল না তার। যে-কোনো লোকের বিপদ আপদের কথা শুনলে সে দৌড়ে গিয়ে বুক পেতে দিত। একবার এ গ্রামের একটি শিশুকে কুমীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, চূড়ামণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে সেই শিশুটিকে উদ্ধার করে। কুমীরটাকে ছিঁড়ে দুভাগ করে দিয়েছিল সে।

এই কাহিনীর কতটা সত্য আর কতটা কল্পনায় রঙিন তা এখন জানার উপায় নেই। এখন নদীটিকে দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত যে কোনোদিন ওখানে কুমীর আসা সম্ভব ছিল, তবু লোকে চূড়ামণির ওই বীরত্বের কথা বিশাস করে। আর, অনেক কথা রটেছে তার নামে। সে নাকি একবার শুধু কয়েকটা ধমক দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দিয়েছিল। এক খুনে ডাকাতের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে চূড়ামণি তার চুল ধরে এমন টান দিয়েছিল যে সেই মুহূর্তে ডাকাতটি ন্যাড়া। সারা জীবনে তার মাথায় আর চুল গজায়নি। নিশ্চয়ই অনেক গুণ ছিল চূড়ামণির, নইলে তার নামেই বা এতসব কথা রটবে কেন?

যখন পূর্ণ যৌবন বয়েস তখন হঠাৎ-ই একদিন চূড়ামণি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় চিরতরে। কেন যে সে গেল, কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে জনশ্রুতি আরও বাড়তে থাকে। যে-কেউ বিপদে পড়লেই কপাল চাপড়ে বলে, আজ যদি চূড়ামণি থাকত, তাহলে আর দুঃখ ছিল না।

এসব বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। অনেকদিন পর বাতাসীর মা কাঁদুনির মুখে কথা শোনা গেল সেই খেদ বাক্য। অমনি সকলের মনে পড়ে গেল।

এরপর কয়েকদিন ঘোড়সওয়ার ডাকাতদের কথা উঠলেই কেউ না কেউ বলে ওঠে, হায় রে, আজ যদি চূড়ামণি থাকতো। দুর্দমনীয় ডাকাতদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সেই অতীতের চূড়ামণি।

নতুন করে চূড়ামণির কীর্তি-কাহিনীর কথা মুখে মুখে ছড়ায়, অল্প বয়েসিরা রোমাঞ্চিত হয়ে শোনে, সবাই ভাবে, চূড়ামণি থাকলে সব মুশকিল আশান হয়ে যেত। সে নেই, তাই এত দুর্দশা। ডাকাতগুলো এসে কবে যে কার গলা কাটবে তার ঠিক নেই।

এর মধ্যেই একদিন অন্য গ্রামে আর একবার ডাকাতির খবর এল! অর্থাৎ তারা থেমে নেই। তেঁতুলছড়ি গ্রামে তারা একদিন আসবেই! পাশের গ্রামে শ্রীধরকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি তবে ওই ডাকাতদের সন্ধানেই গেছে? শীতের রাতে বাতাসী তাকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে।

বাতাসীর অবশ্য বিশেষ ভয় ডর নেই। সন্ধে গাঢ় হলে নদীর ধার থেকে অন্য স্ত্রীলোকেরা চলে এলেও সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে সাঁকোর ধারে।

জ্যোৎস্নায় ধু ধু করে ওপরের মাঠ। দূরের তালগাছ গুলোকে মনে হয় সারি সারি ঠুঁটো জগন্নাথ। বাতাসে মিশে থাকে ভীতু মানুষদের নিঃশ্বাস। বাতাসী তাকিয়ে থাকে শূন্যের দিকে। সে যেন হঠাৎ কল্পনার চোখে দেখতে পায় চূড়ামণিকে। সেই এক রূপবান যুবক, পরের দুঃখে যার পাথরের মতন বুকখানা কাতর। সে মাঠ ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে আসছে, সে বাতাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি তো আছি, তোমার ভয় কী!

যারা অল্প বয়েসে চলে যায়, তাদের বয়েস বাড়ে না।

কিছুদিন ধরে চূড়ামণির কাহিনী খুব চলবার পর ছিরু বৈরাগী একটা নতুন কথা শোনালো। চূড়ামণি ঠাকুর মারা যায়নি গো, নিরুদ্দেশেও যায়নি। কয়েক মাস আগেই ছিরু বৈরাগী তাকে দেখেছে পিয়ালী নদীর বাঁকে কানা ফকিরের আখড়ায়। অবশ্য এখন তাকে চেনাই যায় না, সে এখন বুড়ো, নেশাখোর, আত্মবিস্মৃ। সব সময় কাঁদে। চূড়ামণি ঠাকুর এখনো শুধু নিজের নামটা শুনলে জেগে ওঠে।

ছিরু বৈরাগীর কথা শুনে সকলের মনে আঘাত লাগে, আবার কেউ পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারে না। ভিক্ষে করতে করতে ছিরু বৈরাগী দেশ-বিদেশে চলে যায়। সে ক্যানিং, মোল্লাখালি, মুর্শিদাবাদ, যশোর এই সব দূর দেশের গল্প বলে। এককালের চূড়ামণি দাস এখন চূড়ামণি ঠাকুর হয়ে গেছে শুনেও কেউ আপত্তি জানায় না।

পিয়ালী নদী তো বেশি দূরে নয়। সে নদীর যতগুলো বাঁকই থাক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে এক বেলাও লাগবে না। গ্রামের কয়েকটি অল্প বয়েসি ছেলে কানা ফকিরের আখড়া খুঁজে বার করবার জন্য বেরিয়ে পড়তে চায়। তাই শুনে বাতাসী বললো, আমিও যাবো, আমিও যাবো!

কানা ফকিরের যে-চক্ষুটি ভালো সেই চক্ষুটি যেন বেশি জ্বলজ্বলে। মাথা ভর্তি চুলের জঙ্গলে উকুনের বাসা। মাঝে মাঝেই সে ঘ্যাস ঘ্যাস করে মাথা চুলকোয়। খিদে পেলে সে খায় কিন্তু আঁচায় না, অর্ধেক খাবার লেগে থাকে দাড়ি-গোঁফে। চরস-গাঁজার নেশায় সে সারাদিনই প্রায় বোম্ হয়ে থাকে। যখন একটু মাথা পরিষ্কার হয় তখন সে উরুতে চাপড় মেরে গান ধরে।

> যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
> নারীর তবে কী হয় বিধান
> বামন চিনি পৈতা প্রমাণ।
> বামনী চিনি কিসে রে!

তার বেশিরভাগ গানই তার নিজের রচিত নয়, লালন ফকিরের। এক দঙ্গল চেলা জুটেছে তার, তাদের কে হিন্দু, কে মুসলমান বোঝার কোনো উপায় নেই। সকলের মুখেই ওই এক গান, চরস-গাঁজার দিকে চেলাদের টান বেশি ছাড়া কম নয়। দিন-রাত তারা নেশার ঘোরে, গানের ঘোরে মহানন্দে আছে।

বাতাসী আর তার দলবল সেই কানা ফকিরের আখড়ায় এসে পৌঁছোল সন্ধের ঝোঁকে। তারা যে কয়েকজন নতুন মানুষ এসে দাঁড়াল, তাতে কারুরই কোনো হুঁস বোধ নেই। জায়গাটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, তার মধ্যেই চলছে চ্যাঁচামেচির সঙ্গীত।

একবার গান শেষ হবার পর কানা ফকির যখন আবার ছিলিম সাজতে বসল, চ্যালারা ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে, সেই সময় এক অপেক্ষাকৃত তরুণ সুপুরুষ চ্যালার পায়ে বাতাসী আর তার সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বাঁচাও!

যেন পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এইভাবে আঁতকে উঠে সেই চ্যালাটি বলল, আরে, আরে, আরে, এ কী উৎপাত! আমি কে, তোমরা কে, চূড়ামণি ঠাকুর কে? কেউই না! তুমি ওই! তুমি ওই!

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি ওই! তুমি ওই!

বাতাসীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কানা ফকির তার জ্বলজ্বলে একচক্ষু দিয়ে বাতাসীকে নেক নজরে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠল।

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে উজলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফণী মণি সৌদামিনী
জিনি এ রূপ উছলে.....

তুমি কে বাছা? কার খোঁজে এয়েছ?

বাতাসী হাতজোড় করে ভক্তিভরে বলল, বাবা, আমরা তেঁতুলছড়ি গ্রামের মানুষ। আমাদের বড় বিপদ। আমরা এসেছি চূড়ামণি ঠাকুরের খোঁজে! শুনেছি তিনি আপনার ছিরি পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন।

তখন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা প্রায় অচেতন একজন ন্যালা মাথা তুলে জড়ানো গলায় বলল, কে রে? কে রে? কে রে? কে আমার নাম ধরে কথা বলে? তুমি ওই! তুমি ওই!

কানা ফকির বলল, তোমরা চূড়ামণির খোঁজে এয়েছ? ওই তো চূড়ামণি! এখানে তোমাদের কোনো ডর নেই, যা প্রাণে চায় খুলে বল।

কানা ফকির যার দিকে আঙুল দেখালেন, সেই লোকটির বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার অর্ধেক চুল পাকা, একদা বলবান শরীরটি এখন দড়ির মতন পাকান, শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ দুটি পাকা করমচার মতন লাল।

বাতাসীর সঙ্গে যারা এসেছে তাদের ভক্তি চটে গেছে এরই মধ্যে। তারা ভাবল, তারা ভুল জায়গায় এসেছে। কিংবা ওই মরকুট্টে বুড়োটা যদি চূড়ামণি হয়, তবে তার খুরে খুরে দণ্ডবৎ, দরকার নেই ওই ঝামেলাটিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে। তাদের একজন আর সকলকে বলল, চল রে চল, এখন হাঁটা শুরু করলে লোকালয়ে ফিরতে পারব।

কানা ফকিরের কিন্তু কৌতূহল জন্মেছে। তিনি বাতাসীর মুখ থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে বললেন, জয় রাধেশ্যাম, জয় সত্য পীর! তুমি ওই! তুমি ওই! এবারে খুলে বল তো বাছা, তোমার বৃত্তান্তখানি।

বাতাসী তখন সব কথা সাত কাহন করে সবিস্তারে শোনাল।

তাই শুনে কানা ফকির দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললো ওরে চূড়ামণি, তুই অবোধমণি হয়ে আছিস। তোর গ্রামের মানুষের মাথায় বিপদের খাঁড়া, তুই গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়া। সাঁই-এর কৃপা হলে তুই আবার ফিরে আসবি।

দড়ি-পাকানো চেহারার বুড়টি এই আদেশ শুনে কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ ভেউ করে।

কানা ফকির তার দিকে ছিলিম এগিয়ে দিয়ে বললেন, লে বেটা! দু'তিন টান দে। তারপর সুস্থ হয়ে সব কথা বুঝে দ্যাখ। আহা রে, এরা এসেছে কত দূর থেকে তোর নিয়তি ধরে টান দিতে। এই নারীটির বদন যেন ছাই বর্ণ হয়ে গেছে। এদের সাথে না যাস যদি তবে তোর মুক্তি হবে না। তুমি ওই! তুমি ওই!

ছিলিমে কয়েক টান দিয়ে সেই দড়ি-পাকান চেহারার লোকটি অনেকটা তাজা হয়ে বলল, বাবা, তুমি সব পার! এরা যা চায়, তুমিই সাধ মিটিয়ে দাও না! এই বুড়কে নিয়ে টানাটানি কেন?

আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর কানা ফকিরের চরম আদেশ হল এই যে, দড়ি-পাকান চেহারার চূড়ামণিকে যেতেই হবে তেঁতুলছড়ি গ্রামে। বাতাসীকে তিনি বললেন, যাওয়ার পথে ওরা যেন চূড়ামণিকে কোনো পুকুরের পানিতে চুবিয়ে নিয়ে যায়। তাতে ওর জ্ঞান ফিরবে!

বাতাসী আর তার দলবল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে চলল চূড়ামণিকে। এ বুড়োকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কী উপকার হবে? তাও সে নিজে চলতে পারে না, ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে। এক একবার চেঁচিয়ে ওঠে। বড় তৃষ্ণা! জল দে, জল! গুরু তুমি কোথায় পাঠাচ্ছ আমাকে? তুমি ওই!

খানিক দূর যাওয়ার পর পথের পাশে দেখা গেল এক পুষ্করিণী। কানা ফকিরের কথা মতন বাতাসীরা বুড়োটাকে সেখানে ঠেলে ফেলে দেবার উদ্যোগ করছে, তার আগেই সে ছুটে গিয়ে পুকুরের জলে উপুড় হয়ে পড়ল। শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল এবং এক পুষ্করিণী ভর্তি জল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পান করে নিল চেটেপুটে।

তারপর পাড়ে উঠে এসে সে কাঁদতে লাগল। অস্ফুটভাবে বলতে লাগল। যে-দেশে ভালবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার! এই একই কথা বারবার বলতে লাগল আর ঝরতে লাগল তার চোখের জল। সে কী কান্না! ক্রমে তার চোখের জলেই আবার প্রায় ভরে গেল সেই পুকুরটা।

এই কাণ্ড দেখে বাতাসী ও তার দলবলের বাক্যরহিত হয়ে গেছে। তারা আরও চমৎকৃত হল যখন সেই বৃদ্ধ বাতাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি তুলসী না? ডাক নাম কাঁদুনী?

পাশের ছেলেটিকে বলল, তুমি ভূধর না? তার পাশের ছেলেটিকে বলল, তুমি তো একলাস? আর তুমি মঈনুদ্দিন?

একে একে প্রত্যেকের বাবা-মায়ের নাম নির্ভুল বলে গেল সে। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই লোকটিই প্রকৃত চূড়ামণি। সে নতুনদের চেনে না। পুরোনোদের চেনে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌঁছবার আগেই আরও কিছু কাণ্ড হয়ে গেল চূড়ামণিকে নিয়ে। কয়েক পা করে হাঁটার পরই সে বসে পড়ে আর হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদে বলে, ওগো, আমায় নিয়ে যাচ্ছ কেন? ডাকাত তাড়াবার মতন শক্তি কি আমার আছে? আমি যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি!

কিন্তু বাতাসীরা তখন তাকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এ বুড়োকে দিয়ে ডাকাত আটকান যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতকালের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ চূড়ামণিকে দেখে গ্রামের মানুষ আবার তো নতুন করে গল্পের উপাদান পাবে। একটা মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছে, এ রকম ঘটনা গ্রামে তো সচরাচর ঘটে না। চূড়ামণির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তো তারা একটু আগে নিজের চোখেই দেখল।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌঁছবার প্রায় এক ক্রোশ আগে চূড়ামণি হঠাৎ বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে। অন্যদের হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, এ আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি? তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

বাতাসী বলল, ঠাকুর, তুমি ফিরে যাচ্ছ তোমার নিজের গ্রামে। তোমার গ্রামের নাম তেঁতুলছড়ি, মনে নেই?

চূড়ামণি জিজ্ঞেস করল, সেখানে কী ভালবাসা আছে?

বাতাসী চট করে উত্তর দিতে পারল না। অন্যরাও নিরুত্তর। ভালবাসার কথা কেউ জানে না।

চূড়ামণি গান গেয়ে উঠল, যে দেশে ভালবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার! আমি তেঁতুলছড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কেন জানিস? সেখানে কেউ কারুকে ভালোবাসে না।

বাতাসী চূড়ামণির হাত ধরে সকাতরে বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বড় বিপদ, তুমি আমাদের বাঁচাও। তোমাকে সবাই ভালবাসবে।

চূড়ামণি আকাশের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, তুমি ওই! তুমি ওই! কে কাকে বাঁচায়! কে কাকে মারে? মানুষ নিজেকেই নিজে মারে। নিজেকেই নিজে বাঁচায়।

বাতাসী এবার হাঁটু গেড়ে চূড়ামণির পা চেপে ধরল।

চূড়ামণি একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। আবার তার চোখ ছলছল করে আসছে। তার মুখে কথা নেই। সন্ধের আকাশ জুড়ে কালি কালি মেঘ। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। বাঁশ বনে শোনা যাচ্ছে শেয়ালের রা।

চূড়ামণি একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে কাতরভাবে বলল, আমার শরীরের তাগৎ কমে গেছে। তোরা একটু একটু ভালবাসা দিলে যদি শক্তি ফিরে পাই! দিবি? তোরা ভালোবাসা দিবি?

বাতাসী বলল, আমার বুকে যত ভালবাসা আছে সব তোমায় দেব।

গঙ্গাধর, কামাল, মাণিকচন্দ্র, সঙ্গিফুদ্দিনরাও বলল, হ্যাঁ দেব, হ্যাঁ দেব।

চূড়ামণি হাত বাড়িয়ে বলল, দে ভালবাসা দে!

এমনভাবে কী ভালবাসা দেওয়া যায়! মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল সকলে।

চূড়ামণি এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের সামনে দাঁড়াল। একটা বাঁশ ধরে টানাটানি করে বলল, দ্যাখ, বুড়ো হয়ে গেছি, হাড় ঝুনো হয়ে গেছে, শরীরে বল নাই। তোরা ভালবাসা দে, তবে যদি মনের বল ফিরে পাই! তোরা আমার গায়ে হাত বুলা।

তখন সবাই চূড়ামণিকে ঘিরে তার গায়ে হাত বুলতে লাগল। বাতাসী তার মুখখানা ঘষতে লাগল চূড়ামণির পিঠে।

আস্তে আস্তে যেন চূড়ামণির শরীর সোজা হয়ে যেতে লাগল, খুলে গেল চুলের জট, চাপা পড়ে গেল হাতের শিরা-উপশিরা, চক্ষে ফুটে উঠল জ্যোতি।

চূড়ামণি হুংকার দিল, তুমি ওই! তুমি ওই!

তারপর একটানে সে পট করে তুলে ফেলল একটা মস্ত বড় বাঁশ।

তাই দেখে বাতাসী আর গঙ্গাধর আর কামালরা কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে। তাদের ভালবাসার যে এত জোর তা তারা নিজেরাই জানত না এতদিন!

চূড়ামণি বাঁশটাকে মাটিতে ফেলে উল্টোদিকে ফিরে দুহাত জোড় করে বলল, আমার গুরু কানা ফকির, তিনি সব দেখতে পান, তিনিও কাঁদছেন তোদের জন্য। বাবা, তুমি আর কেঁদ না। এরাই এখন আমায় সামাল দেবে।

আবার খানিক দূরে যাবার পর চূড়ামণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে। কে আমাকে খেতে দেবে?

বাতাসী বলল, ঠাকুর, আর মাত্র দু'ক্রোশ পথ। তুমি গ্রামে গেলে সবাই তোমাকে খাবার দেবে।

চূড়ামণি বিহ্বলভাবে বলল, সবাই আমাকে খাবার দেবে? বলিস কী?

বাতাসী আর তার সঙ্গীরা একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ ঠাকুর দেবে।
চূড়ামণি বলল, আমি যে অনেক খাই!
—তুমি যত চাও সব দেবে। তুমি পেট ভরে খেও।
—সত্যি দেবে? শেষে কথা ফিরাবি না তো?
ওরা গ্রামে পৌঁছবার পর এমন হৈ চৈ পড়ে গেল যে, এদিক-ওদিকের গ্রামের লোক ভাবল ডাকাত এসেছে বুঝি!
ভিড় ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে এসে ছিরু বৈরাগী বলল, হ্যাঁ, এই তো সেই মানুষ! বাতাসী অতদূর থেকে ধরে এনেছে, অসাধ্য সাধন করেছে মেয়েটা।
কিন্তু অনেকে মানতে চায় না। অনেকের চোখেই সন্দেহ। এই কি সেই অজেয় বীর চূড়ামণি। এই মাথার চুল পাকা, খসখসে বুড়ো? এরকম নেশাখোর চেহারার মানুষ তো যে-কোন শ্মশানঘাটে দেখতে পাওয়া যায়!
তাদের চোখে চূড়ামণির চেহারা হবে নব কার্তিকের মতন। কোথায় সেই কপাট বুক, কোথায় সেই চোখের দীপ্তি। পঁচিশ বছর আগে যে উধাও হয়ে গেছে, সে কি আর আসতে পারে!
তবু কেউ কেউ বললো হ্যাঁ, এই-ই সেই! অন্যরা প্রতিবাদ করে ওঠে। ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে ছুটে এসে ঐ বুড়োকে দেখে থমকে যায়। হতাশায় তাদের মুখ ঝুলে পড়ে।
প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমেই। বাতাসী আর তার সঙ্গীরা আসার পথে যা যা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছে তা বলতে যেতেই হা হা করে হেসে উঠে অনেকে। এই অপদার্থটা এক পুকুর জল শুষে খেয়েছে, একটা আস্ত তলতা বাঁশ উপড়ে তুলেছে? গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাওনি? এই লোকটা তো গাঁজাখোর বটেই, বাতাসীরাও কি গাঁজা টেনে এসেছে কানা ফকিরের আখড়া থেকে?
চূড়ামণি কোনো কথা বলে না, কোনো সাড়াশব্দ করে না। ঠায় বসে থাকে অশ্বত্থতলার চাতালে। ক্রমেই সে যেন বেশি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হৈ হৈ চরমে উঠতে সে একপাশে ঢলে পড়ল। অজ্ঞান হল না মরেই গেল তা বোঝা গেল না।
চূড়ামণিকে গড়িয়ে পড়ে যেতে দেখে এক নিমেষে থেমে গেল গোলমাল। সবাই থমকে গেছে।
বাতাসীর মা কাঁদুনী ছুটে এসে চূড়ামণির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে বলে উঠল, ওগো; তোমরা ওকে মেরে ফেললে? মানুষটা অ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এল তাকে তোমরা কেউ কিছু দিলে না?
বাতাসীর মনে পড়ল, মানুষটা বলেছিল খিদে পেয়েছে।
ছিরু বৈরাগী বলল, ওর নাম ধরে ডাকো। ওকে ডাকলে ও জেগে ওঠে।
বাতাসীরও সেই কথাই মনে হল। কানা ফকিরের আশ্রমে নাম শুনেই চূড়ামণি উঠে বসেছিল।
সে চূড়ামণির কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকল, চূড়ামণি ঠাকুর! চূড়ামণি ঠাকুর! ফিরে এসো।
আরও অনেকে সেই নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।
ছিরু বৈরাগী দুহাত তুলে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, সবাই ডাকো! সবাই ডাকো! জোরে, আরও জোরে।
দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে যারা অবিশ্বাসী তারাও গলা মেলাল। যখন আর একজনও বাকি রইল না, সবাই সমস্বরে ডাকছে, তখন চোখ মেলল চূড়ামণি। আস্তে আস্তে উঠে বসে বলল, আমায় ডাকছিলে কেন গো? আমি তো দিব্যি ফিরে যাচ্ছিলুম, কেন ডেকে আনলে?
ছিরু বৈরাগী বলল, মানুষটা এতদিন বাদে গ্রামে ফিরল, তোমরা কেউ ওকে একটু খেতেটেতে দেবে না? অন্তত একটু জল-মিষ্টি দাও!
বাতাসী বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, তুমি আমাদের বাড়ি চল, তোমাকে ভাত রেঁধে খাওয়াব।
চূড়ামণি বাতাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে সমস্ত মানুষদের দেখল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি খাওয়াবে? তবে যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ আমায় খাওয়াবে?
বাতাসীর মা কাঁদুনী বলল, আমরা কাঠকুড়ুনী, তবু তোমায় পেটভরা ভাত দিতে পারব। চল ঠাকুর!
চূড়ামণি তবু বাতাসীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ খাওয়াবে? তুমি কথা রাখলে না।
তারপর অবুঝ শিশুর মতন মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলতে লাগল, না, আমি খাব না। সবাই মিলে আমায় না খাওয়ালে আমি খাব না।
সবাই অবাক। একটা মানুষের জন্য সব বাড়িতে রান্না হবে নাকি? এ কি মানুষ না রাক্ষস?
ছিরু বৈরাগী বলল, আরে না, না, চূড়ামণি ঠাকুর সে কথা বলেনি। তোমরা সব বাড়ি থেকে পাঁচ দানা করে চাল দাও। তারপর সেই চাল একত্র করে একজন কেউ ফুটিয়ে দিক। তাহলেই সবাই মিলে খাওয়ান হবে।

একটা মাটির সরা নিয়ে বাতাসী আর অন্য ছেলেরা ঘুরল সব বাড়ি বাড়ি। গ্রাম শেষ করে ঘুরে আসার পরেও, সেই সরা অর্ধেক ভরলো না।

বাতাসী সেই সরাটা এনে ছিরু বৈরাগীর সামনে এসে খুব দুঃখী গলায় বলল, এইটুকু চালে কি এত বড় মানুষটার পেট ভরবে? তুমি কেন মাত্র পাঁচ দানা বললে?

সেই কথা শুনে চূড়ামণি মিটিমিটি হেসে ছিরু বৈরাগীর দিকে তাকাল। ছিরু বৈরাগী কপাল চাপড়ে বলল, ওরে, ভিক্ষের তণ্ডুল আমি ভালই চিনি! সবাই পাঁচ দানা দেয়নি। কেউ কেউ দিয়েছে তিন দানা, কেউ কেউ দিয়েছে দুদানা, কেউ কেউ দিয়েছে ভুষি! যে গ্রামের মানুষ এত তঞ্চক হয়, সে গ্রামের মানুষকে ডাকাতে মারবে না তো কী?

তখন লজ্জা পেয়ে আরও অনেকে দুদানা, তিন দানা করে চাল দিয়ে গেল। শুধু তিনজন এসে বলল, আমাদের ঘরে এক দানাও চাল নেই, ঠাকুর! দোষ দিও না, ইচ্ছে থাকলেও দেওয়ার সাধ্য নেই। আর একদিন দেব।

বাতাসী ভাত ফুটিয়ে এনে কলাপাতায় বেড়ে দিল। সঙ্গে একটু নুন, দুটি লঙ্কা। সেই ভাতই অমৃতের মতন খেল চূড়ামণি। তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ!

ছিরু বৈরাগী বলল, ঠাকুর, এবার তুমি একটু শোও। আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নাও। কত দূর থেকে এসেছ। কাল সব কথা শুন।

কিন্তু বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল না। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ে বলল, আসছে! আসছে! নদীর ওপারের মাঠে ধুলোর ঝড় এসেছে, ডাকাতরা আসছে।

সবাই একদৃষ্টে তাকাল চূড়ামণি দিকে। এইবার। আসল না নকল তার প্রমাণ দাও। দেখি তোমার কেমন মুরোদ!

বাতাসী ব্যাকুলভাবে বলল, ঠাকুর, ওঠো, ডাকাতরা আসছে।

চূড়ামণির মুখে ভয়ের ছায়া। শরীরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে মাটিতে মিশে যেতে চায়।

বাতাসী তার হাত ধরে টেনে বলল, ঠাকুর, ওঠো! নদী পেরিয়ে ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

চূড়ামণি কাতরভাবে বলল, আমি ঠাকুর নই, আমি শুধু চূড়ামণি। আমি কী করে পারব অতগুলো ডাকাতের সঙ্গে? আমার যে শরীরে আর সেই শক্তি নেই। আমাকে তোমরা ভালবাসা দাও।

বাতাসী অমনি উন্মাদিনীর মতন সকলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওগো, তোমরা সবাই এস। চূড়ামণি ঠাকুরকে ভালবেসে ছুঁয়ে দাও। হাত বুলিয়ে দাও।

ডাকাতরা এসে পড়ল বলে, আর দ্বিধা করার সময় নেই। সবাই ছুটে এসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল চূড়ামণির গায়ে মাথায়।

চূড়ামণি বলতে লাগল, আরও দাও, আরও ভালবাসো। ভালবাসায় আমার মন ভরে না। আরও দাও।

বাতাসী চুমো দিতে লাগল চূড়ামণির সারা শরীরে। তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও। সে কি ব্যাকুলতা। যেন মাঝখানে চূড়ামণি নেই, সবাই সবাইকে চুমু দিচ্ছে।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সবাইকে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল চূড়ামণি। দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে বলল, এবারে আমি বল পেয়েছি! আর ভয় নেই।

সকলেই দেখল, চোখের নিমেষে যেন রূপান্তর হয়েছে চূড়ামণির। তার শরীরে ঝকঝক করছে তেজ। তার ম্লান মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, সেরকম হাসি আগে কেউ কখনো দেখেনি। তার বুক যেন লোহার কপাট আর দুই হাত যেন মুদ্গর। মাথার চুল তো পাকা নয়, ধুলোবালি মাখা।

চূড়ামণি বলল, আমার অস্ত্র কই?

ডাকাতদের কাছে কত মারাত্মক অস্ত্র থাকে, তাদের বিরুদ্ধে চূড়ামণি একা খালি হাতে দাঁড়াবে কী করে? একটা অস্ত্র তো নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু এ গ্রামে লাঠি-সোঁটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু রতনমণির কাছে আছে একটা রাম দা। সে সেটাই এনে দিল।

চূড়ামণি বলল, শুধু ওতে তো হবে না। সকলের কাছ থেকে কিছু কিছু চাই। আর যদি কিছু দিতে না পার তো প্রত্যেকে মাথা থেকে একগাছা চুল ছিঁড়ে দাও!

সবাই পট পট করে ছিঁড়তে লাগলো মাথার চুল।

বাতাসী নিজের চুল ছিঁড়তে যেতেই কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। একটা সাঙ্ঘাতিক ভয়ের তরঙ্গ। এই মানুষটা পারবে তো? ডাকাতরা এসে যদি এক কোপে এর মাথাটা কেটে ফেলে?

সে ফিসফিস করে বলল, ঠাকুর, তুমি পালাও, তুমি পালাও! তুমি ডাকাতদের সামনে যেও না।

ডাকাতরা নদী পেরিয়ে এসেছে, কপাকপ শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অন্য সবাই ভয়ে পালাচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে মাঠের দিকে।

চূড়ামণি বলল এখন আর কোথায় পালাব? আর যে উপায় নেই।

বাতাসী বলল, তুমি কি পারবে ওদের সঙ্গে? একলা কি কেউ পারে? তোমায় ওরা ছাড়বে না!

চূড়ামণি বলল, পালালেই গ্রামের লোক কি আমায় ছাড়বে? আর যদি বা ডাকাতদের সঙ্গে পারি, কিন্তু তারপর আমার কী হবে? আমার ভয় করছে কিসের জান। তারপর আর আমি মানুষ থাকব না। বাতাসী, আমার খুব মানুষ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে!

বাতাসী বলল, তুমি মানুষ থাকবে না তো কী হবে?

চূড়ামণি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মাটি! মাটি!

মূল রাস্তার ওপরে এসে গেছে ডাকাতেরা। চূড়ামণি দৌড়ে মাঝরাস্তায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার দিল, তুমি ওই।

এই প্রথম দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল থমকে গেল।

পর পর ছজন ঘোড় সওয়ার, তাদের সারা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা, তাদের মুখও দেখা যায় না। তাদের তিন জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

চূড়ামণি নিজের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে হাতের চুলের ডেলাটার সঙ্গে মেশাল। তারপর সেই ডেলাটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, তোরা আগে এইটা কাট, তারপর আমার মাথা কাটবি।

একজন ঘোড় সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সে চুলের গোছাটা কাটার জন্য তলোয়ার তুলতেই অট্টহাসি করে উঠল চূড়ামণি। সে হাসিতে যেন মেঘের গর্জন। সে হাসিতে সমুদ্রের ঢেউ।

তলোয়ারের প্রচণ্ড কোপে সেই চুলের গোছার একটাও কাটল না। ডাকাতদের সর্দারটি পরপর তিনটি কোপ লাগাল, চতুর্থ কোপে দু'টুকরো হয়ে গেল তার তলোয়ার।

চূড়ামণি আবার হেসে উঠে বলল, আর একটা অস্ত্র আন। এবারে আমার মাথায় একটা কোপ মেরে দ্যাখ কী হয়।

ডাকাতদের সর্দার ভাঙা তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চূড়ামণির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পিত গলায় বলল, ঠাকুর, আমরা অনেক পাপ করেছি। তুমি আমাদের কী শাস্তি দেবে দাও। আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।

চূড়ামণি তার ডান পাটা তুলে ডাকাত সর্দারের মাথার ওপরে রাখল।

অন্য ডাকাতরা ঘোড়া থেকে নেমে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল দূরে।

চূড়ামণি আর ডাকাত সর্দার সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রইল। আস্তে আস্তে তাদের দুজনেরই শরীর থেকে খসে খসে যেতে লাগল মাংস, তাদের হাড়ের খাঁচাটি হয়ে গেল কঞ্চির, তার ওপর লাগল মাটি আর রং।

যারা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ফিরে এল, কাছে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ উচ্চারণ করতে লাগল দোয়া, কেউ কেউ নিয়ে এল ফুল আর বেল পাতা। শুধু বাতাসী ভাসল নয়ন জলে।

তাজমহলে এক কাপ চা

রাম রাম ওস্তাদজী! কুছ্ খুস খবর শুনাইয়ে!

ওস্তাদজীর পরনে একটা আলখাল্লার মতন পোশাক, নানান জায়গায় তাপ্পি মারা, মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। গালে পাঁচ-সাতদিনের রুখু দাড়ি। বয়েস হবে পঞ্চাশের ধারে কাছে। কোথায় তার বাড়ি ঘর কিংবা তার নিজের বৌ-বাচ্চা আছে কিনা তা কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করলে মৃদু মৃদু হাসে।

মাঝে মাঝে সে এসে উদয় হয়। খাটিয়ায় বসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। আপদ-বিপদে শলা-পরামর্শ দেয়। দু-একদিন এর তার বাড়িতে থাকে, ছাতু কিংবা রুটি আর ভেণ্ডির তরকারি যা দেওয়া হয় তাই-ই আরাম করে খায়, আবার উধাও হয়ে যায়।

গত বছর খরার সময়ে এ গাঁওয়ের ঠিকাদার বড় বে-শরম, কঠিন-হৃদয়ের মতন ব্যবহার করেছিল। ওই সময় বাঁধ বাঁধার কাজ কি বন্ধ রাখা ঠিক? জমিতে ধান নেই, হাতে পয়সা নেই, তখন সরকারি মজুরি না পেলে মানুষ বাঁচবে কী করে? সেই সময় ওস্তাদজী এসে ঠিকাদার ব্যাটাকে ভারি জব্দ করেছিল। সবাই এক কাট্টা হয়ে তাকে এক খেজুর গাছের নিচে ঘিরে রেখে চব্বিশ ঘন্টা দানাপানি ছুঁতে দেয়নি!

ওস্তাদজী এসে যে-দু'একদিন থাকে তখন নানারকম মজা হয়। সারাদিন খাটা খাটনি তো আছেই, একেবারে শেষবার চোখ বোজার আগে পর্যন্ত বাঁচার জন্য খেটে যেতে হবে, এটাই নিয়তি। কিন্তু খাটতে খাটতে আনন্দ ফূর্তির কথা মনে থাকে না। ওস্তাদজী সেটাই মনে করিয়ে দেয়। পিঠে চাপড় মেরে বলে, আরে কাজ-কাম তো আছেই লেকিন তা বলে হাসবি না! দ্যাখ না জঙ্গলের আনবার আর আকাশের পংখী, তারাও নাচা-গানা করে।

ওস্তাদজী এসে প্রতি সন্ধেবেলা সবাইকে জড়ো করে মজলিশ বসায়। সে নিজেই গান ধরে। গলায় বিশেষ সুর নেই কিন্তু চ্যাঁচামেচির জোর আছে, একটা হাত কানে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। ওই গানের জন্যই তার নাম ওস্তাদজী।

ওস্তাদজীর আলখাল্লার পকেটে একটা খবরের কাগজ। ওস্তাদজী পড়ে-লিখে আদমি, এই গ্রামের বাইরে যে দেশ, যে পৃথিবী, তার খবর সে রাখে। এমনকি একদিন আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, এ আশমানে, অনেক অনেক উঁচুতে, যেখানে দৃষ্টি পৌঁছোয় না, সেখানেও নাকি মানুষ লড়াই-এর জন্য তৈরী হচ্ছে। কে জানে, ওস্তাদজী মজাক্ করার জন্য গপ্ বানায় কিনা!

ওস্তাদজীর গলা শুনে আরও দু'চারজন এসে জমায়েত হল সেখানে। বুড়ো রামখেলাওনের খাটিয়া ঘিরে তারা মাটিতে উবু হয়ে বসে। সবাই এক এক করে রাম রাম জানিয়ে অনুরোধ করে, বল ওস্তাদজী, তোমার আখবরে কী খুস খবর আছে?

ওস্তাদজী খাটিয়ার এক পাশে বসে বলে, আরে দূর। আখবরে তো তোর আমার মতন গরিব মানুষের কথা লেখে না। শুধু বড় বড় শেঠ আর মিনিস্টারদের কথা থাকে। তা শুনে কী করবি?

বুড়ো রামখেলাওন ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, ওস্তাদজী, গরিবের জীবনে আছেটা কী যে আখবরে লিখবে? গরিবের খবর আমরাও শুনতে চাই না। তুমি শেঠ আর মিনিস্টারজীদের কিস্যাই শুনাও।

ফুলসরিয়া নামে একটি বউ বলল, গত বারে তুমি আফ্রিকা নামে একটা কোন গাঁওয়ের খুব মজাদার একটা কাহিনী শুনিয়েছিলে, সে রকম আর একটা বল।

তাঁর স্বামী ধনিয়া বলল, আচ্ছা ওস্তাদজী, ইন্দিরাজীর লেড়কা রাজীবজী তো এখন গদ্দিতে বসেছে, ঠিক কি না? তা রাজীবজীর কটা লেড়কা আছে? কত বড়? ধরো যদি, ভগোয়ান না করে, রাজীবজী আচানক খতম হয়ে যায়.....

কয়েকজন হাসতে থাকে, কয়েকজন চোখ বড় বড় করে উদ্বেগের সঙ্গে তাকায়। এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়, ওস্তাদজীর একটা মতামত এই বিষয়ে শুনতে চায় তারা।

আজ কোনো কাজ নেই। আকাশ খরখরে, তাই চাষের কাজ শুরু হয়নি, এখন শুধু বৃষ্টির প্রতীক্ষা। অলস সময় বয়ে যায়।

নানারকম গল্প করতে করতে ওস্তাদজী হঠাৎ বলল, কেউ এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে হায় হায় করে ওঠে। ছি ছি, কী লজ্জার কথা, মানুষটা নিজের মুখে কথাটা বললে, সামান্য এক কাপ চা, কিন্তু কী করে তা খাওয়ানো যায়? এখানে তো কোনো বাড়িতে চায়ের চল নেই।

ওদের মুখের ভাব দেখেই ওস্তাদজী ব্যাপারটা বুঝল। শহরে গিয়ে গিয়ে ওস্তাদজীর চায়ের নেশা হয়েছে। সে হাত তুলে বলল, থাক, থাক। চায়ের দরকার নেই। এক গিলাস পানি দাও কেউ। তারপর আমি শুনাব এক শেঠজীর কিস্যা।

এক নওজোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পাক্কীতে এক সর্দারজীর হোটেল আছে, সেখান থেকে আমি নিয়ে আসছি চা। কেউ একটা বর্তন দাও।

পাক্কী মানে পাকা সড়কি, হাইওয়ে। এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে। যুবকটি ছুটে যাবে আর আসবে।

ধনিয়া বলল, অতদূর থেকে চা আনবি; তাতে তোর ঘাম গরম হবে কিন্তু চা যে ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা চা খেতে একেবারে বিল্লির প্রসাবের মতন।

যেন সে সত্যিই কখনো বিড়ালের পেচ্ছাপ পান করেছে, সেইরকম একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে, হেসে ওঠে সবাই।

ফুলসরিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, কেন, আমরা চা গরম করে দিতে পারি না? যা, যা ছুটে যা!

রামখেলাওন বলল, একটা বড় বর্তন নিয়ে যা। বেশি করে আনিস!

ওস্তাদজী নওজোয়ানের দিকে হাত তুলে বলে, দাঁড়া।

তারপর সে চুপ করে থাকে। কিছু বলে না। তার কপালে কী যেন একটা মতলবের রেখা ছোটাছুটি করছে।

একটু পরে খাটিয়া ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুই কেন একলা যাবি? চল, আমরা সবাই মিলে যাই। এখানে বসে থেকে কী হবে? পাক্কী দিয়ে কত গাড়ি যায়, কত ট্রাক এক হাজার, দু হাজার মাইল যায়, ওসব দেখলেও ভাল লাগে। ঠিক কিনা!

অনেকে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ করে বলল, চল, চল, চল!

তিরিশ পঁয়তিরিশ জন জুটে গেল। খবর পেয়ে আরও দু-চারজন ছুটে আসে।

রামখেলাওন বলল, আরে আরে, এত আদেখলার দিল নিয়ে যাওয়া হবে কোথায়? এত চায়ের পয়সা দেবে কে?

ওস্তাদজী হাত তুলে বলল, চলুক, সবাই চলুক, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ফুলসরিয়া বলল, ওস্তাদজী যেতে বলেছে, তবু তুমি বখেড়া করছ? ওস্তাদজীর কথার দাম নেই?

একটি অকারণের মিছিল। অলস জীবনে একটি আকস্মিক পিকনিক। পাক্কীতে গিয়ে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায় এদিকে একটা দূরের দেশ আছে, ওদিকে আর একটা দূরের দেশ। এর মধ্যে একটা দিকে এদেশের রাজধানী। মাইলের হিসেবে পঁচিশ-তিরিশ মাইল হলেও আসলে অনেক দূর।

পাক্কীতে পৌঁছে আরও আধ মাইল ডান দিকে হেঁটে সর্দারজীর দোকান পাওয়া গেল। কিন্তু সে দোকানের ঝাঁপ ফেলা। দেখলে মনে হয় সে দোকানে বেশ কিছুদিন কেনাবেচা বন্ধ আছে।

ধনিয়া কপাল চাপড়ে বলল, হায় রাম! এই কথাটা আমার মনে ছিল না? অমৃতসরে কী যেন গোলমাল হয়েছে, সর্দারজীরা খুব রেগে আছে, অনেক সর্দার ভাগলবা হয়েছে। ইন্দিরাজীর দেহান্ত হবার পর এই সর্দারজীকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

আর দু একজন বলল, ঠিক ঠিক। দোকানটা তো বেশ কিছুদিন বন্ধ!

সবার মুখে শোকের ছায়া। পিকনিকটা ব্যর্থ হয়ে গেল! ওস্তাদজী আজ নিজে সবাইকে চা খাওয়াতে চাইলেন!

ওস্তাদজী বলল, কই ফিক্‌র নেই। এ দোকান বন্ধ তাতে কী হয়েছে, আরও তো দোকান আছে। চল, সামনে চল!

রামখেলাওন বলল, আর কোথায় যাবে ওস্তাদজী? যত সামনে যাবে তত শহর এসে যাবে। সেখানে দোকানে দাম বেশি। তা ছাড়া আমরা কুর্তা পরে আসিনি, পায়ে জুতা নেই, আমাদের ঢুকতেই দেবে না!

আরও কয়েকজন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মনেও এই চিন্তা এসেছে। রাস্তার ধারের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবু চা খাওয়া যায়। ভাল দোকানে তাদের ঢুকতে দেবে কেন?

ওস্তাদজী বলল, আঃ, কুর্তা-জুতা কি চা খাবে, না মানুষ চা খাবে!

মুখে তার এক পলক হাসি ফুটে উঠল। যেন একটা নতুন দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

পকেট থেকে খবরের কাগজটা বার করে গোল করে মুখের সামনে এনে সে তাতে দুবার চুমু খেল। তারপর বলল, চল, তোদের আজ আমি তাজমহলে চা পিলাব!

ওস্তাদজী মাঝে মাঝে এমন কথা বলে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না! তাজমহলটা আবার কী জিনিস! এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ধনিয়ার মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব আছে। সে বলল, তাজমহল হচ্ছে বাদশাহের এক বহৎ ভারি মোকান। আমি ফটো দেখেছি। ঠিকাদারবাবুর বাড়িতে ক্যালেণ্ডারে ছিল।

ওস্তাদজী বলল, ঠিক বলেছিস। তোরা আকবর বাদশার নাম শুনেছিস? শুনিস নি! সেই আকবর বাদশার নাতি তার বেগমের জন্য এটা মস্ত বড় কুঠি বানিয়েছিল। এ-ই রোদ্দুরের মতন শফেদ। বহৎ চমকদার!

একজন ফক্কুড়ি করে বলল, সেখানে আমরা যাব কেন? বাদশা কি আমাদের দাওয়াত দিয়েছে।

ধনিয়া বলল, আরে, বাদশা-বেগমের জমানা খতম। তারা আর নেই। তাও জানিস না?

একজন বলল, তাহলে নিশ্চয় সেখানে এখন মন্ত্রীজীরা তাদের বিবিদের নিয়ে থাকে?

ওস্তাদজী বলল, না রে, সে কুঠি এখন পাবলিকের জিনিস। তোর আমার মতন বেহদা আদমিরাও সেখানে যেতে পারে।

তবু অনেকের সংশয় ঘোচে না। সে জায়গা কত দূর? সেখানে চা খেতে কত পয়সা লাগে? ফেরা হবে কখন?

ওস্তাদজীর মুখে মিটিমিটি হাসি। সে ফস করে একটা একশো টাকার নোট বার করে তার নাকের সামনে নাচাতে লাগল।

আরে, কেয়া তাজ্জব! ওস্তাদজীর তাপ্পি মারা আলখাল্লার জেব থেকে বেরুল একশো টাকার নোট? লোকটা ভানুমতীর খেল্ জানে নাকি?

—এটা কী দেখালে, ওস্তাদ? কোথায় পেলে?

—তোরা আমাকে কী ভাবিস? আমি একেবারে ফাল্‌তু? এটা আমি গান গেয়ে ইনাম পেয়েছি।

আবহাওয়া আবার হালকা হয়ে যায়। অনেকেই হাসতে শুরু করে। ওস্তাদজীর গান শুনে কেউ টাকা দিয়েছে, এটা সত্যি বলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু একশো টাকার নোটটা সত্যি। এখনো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি।

ধনিয়া বলল, ওস্তাদজী, তুমি ওই টাকাটা আমাদের জন্য খরচ করবে!

—আমি টাকা জমাই না, আচানক পেয়েছি। একদিনেই ফুঁকে দিতে রাজি আছি।

—তা হলে এক কাজ কর না! এত টাকা, চা খেয়ে কী হবে? মন্দিরে পূজা দাও।

—দুর পাগলা! আমি শুধু পেট পূজার কথা জানি, আর অন্য কোনো পূজা মানি না।

—শোনই না কথাটা। দেওতার কাছে একটা খাঁসী কিংবা একটা ভৈঁস মানত কর। তারপর আমরা সবাই মিলে সেই মাংস খাব।

—একশো টাকার খাঁসী কিম্বা ভৈঁস হয়? একটা-দুটো ছুছুন্দুর হতে পারে।

ফুলসরিয়া বলল, আমার মরদটা সব সময় ফালতু কথা বলে। ওসব মাংস-টাংসের কথা থাক। বেঁচে থাকলে একদিন দুদিন মাংস ঠিকই খাওয়া যাবে। ওস্তাদজী ওই যে হাওয়া মহল না কোন মহলের কথা বলল, আমি সেখানেই গিয়ে চা খেতে চাই।

অনেকেরই সেই মত হল। বাড়ি ফেরার তাড়া তো নেই, তাই সামনের দিকে এগিয়ে চলল এই গ্রাম্য বাহিনী। রাজধানীর দিকে।

খানিকদূর যাবার পর তারা দেখল রাস্তা দিয়ে একটা লোক ডুগডুগি বাজিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে একটা লোম ওঠা, রোগাটে ভাল্লুক আর দুটো বাঁদর। ওস্তাদজী এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কেয়া দোস্ত কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি ওস্তাদজীর মুখ চেনে বোঝা গেল। সে বলল, আমার কি দিকের ঠিক আছে, যখন যেদিকে খুশি যাই। তুমি এই দলবল নিয়ে চললে কোথায়?

ওস্তাদজী বলল, আমরা এক জায়গায় চা খেতে যাচ্ছি। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। তোমাকে পেয়ে খুব ভাল হয়েছে।

ভাল্লুকওয়ালা বলল, এত লোক যাচ্ছে শুধু চা খেতে?

—চলই না। ভাল চা খাওয়াব। সে রকম চা বাপের জন্মে খাওনি।

একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, আমরা তাজমহলে চা খেতে যাচ্ছি।

লোকটি থমকে দাঁড়াল। কাঁধ থেকে ওস্তাদজীর হাতটা নামিয়ে দিয়ে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। সে বহুদর্শী মানুষ। সে চট করে মানুষের মুখের কথায় ভুলে যায় না।

সে জিগ্যেস করল, ওই লোকটা তাজমহলের কথা কী বলল? কোথায় চা খেতে যাওয়া হচ্ছে?

ওস্তাদজী মুচকি হেসে বললো, তাজমহলে।

লোকটি বলল, আমাকে কি বুদ্‌বাক পেয়েছ? আমি তাজমহল চিনি না? আমি সব চিনি। তাজমহল তো অনেক দূরে? এদিকে তো রাজধানী!

ওস্তাদজী বলল, আরে দোস্ত, চলই না। তুমিই তো বললে তোমার দিকের ঠিক নেই। না হয় রাজধানীতেই গেলে।

—কিন্তু রাজধানী পর্যন্ত তুমি পয়দলে যাবে নাকি! মানুষ তো ছার, আমার ভাল্লুক-বান্দররাও থকে যাবে।

—তা হলে একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

উল্টোদিক থেকে তিনটে ট্রাক আছে। ওস্তাদজী দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার মাঝখানে। তার দেখাদেখি আরও অনেকে।

এই সব রাস্তায় এক-আধজন মানুষ সামনে পড়লে ট্রাক থামে না, চাপা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এখানে প্রায় চল্লিশ জন নারী-পুরুষ। বিকট শব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল তিনটে ট্রাক।

তিনটিতেই ভর্তি আছে ছাগল। ট্রাক ড্রাইভাররা নেমে দাঁড়িয়ে ভাবছে এটা আবার কোন পার্টির চাঁদার ব্যাপার!

ফুলসরিয়া জিগ্যেস করল। ওস্তাদজী এরা এত খাঁসী নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

ওস্তাদজী বলল, রাজধানীতে। সেখানকার মানুষের এই অ্যাত্ত বড় খিদে? গাঁও গাঁও থেকে চুন চুন করে সেইজন্য ওরা খাঁসী, মুর্গি, গোরু, মাছ, দুধ সব নিয়ে যায়। মেয়েমানুষও নিয়ে যায়।

—তাদেরও খায় নাকি!

—হা-হা-হা-হা। তুমহার ডর নেই, ফুলসরিয়া, আমরা এতজন আছি, তুমহাকে কেউ খেতে পারবে না।

এগিয়ে গিয়ে ওস্তাদজী ট্রাক ড্রাইভারদের সামনে হাত জোড় করে বলল, ভাই সাহাব, মেরে দোস্ত, মেহেরবানী করে আমাদের একটু রাজধানী পৌঁছে দেবে।

এই উৎকট প্রস্তাব শুনে কিন্তু ট্রাক ড্রাইভাররা খুশিই হল। এই হারামজাদাগুলো রাস্তা আটকে বসে থাকলে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ এসে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা, তাতে অনেক খরচের ধাক্কা। তা ছাড়া এরা চাঁদাও চায়নি।

প্রথমে জায়গা নেই বলে খানিকটা গাঁইগুঁই করল তারা। তারপর কিছু ভাড়া পাওয়া যাবে কি না তার ইঙ্গিত করল। ওস্তাদজী বলল, তার লোকজন ছাগল কোলে করে বসতে পারে, তাতে জায়গা হয়ে যাবে। ভাড়ার কোনো প্রশ্ন নেই, তবে রাজধানীতে পৌঁছে সে ট্রাক ড্রাইভারদের চা খাওয়াতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তারা রাজি হলেও আপত্তি হল ভাল্লুক আর বাঁদর দুটিকে নিয়ে। ওস্তাদজী বলল, বেচারা ভাল্লুকটার চেহারা দেখছ। তোমার এক একটা খাঁসী ওর চেয়ে বড়। ওকে দেখে কেউ ভয় পাবে না। চল, চল, আর দেরি নয়।

ফুলসরিয়া আর কয়েকটি মেয়ে দারুণ খুশি। প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনে এ একটা দারুণ মজা। ওস্তাদজী না হলে এরকম বুদ্ধি আর কে দেবে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে কে জানে। কুছ পরোয়া নেই।

দু'একজন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে। অন্যরা সঙ্গে হাততালি দেয়। কত মজা, কত ফুর্তি? কী যে চা-খাওয়ার একটা ভেল্‌কি তুললে ওস্তাদজী, তাতেই আজকের দিনটা বদলে গেল।

দূর থেকে রাজধানীর হর্ম্যরেখা দেখে সবার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন স্বর্গপুরী। এখানে আকাশও যেন নিচু।

এই দলের দু-দশ জন অবশ্য আগেও কয়েকবার রাজধানীতে এসেছে জনমজুরের কাজ করতে। কিন্তু সে অন্যরকম আসা। আজ যেন তারা রাজধানী জয় করতে যাচ্ছে।

ফুলসরিয়া জিজ্ঞেস করল, ওস্তাদজী, তাজমহল তো সবসে বড়া কোঠী। সেটা এখান থেকে দেখা যাবে না।

—দেখবে, দেখবে। ঠিক সময়ে দেখবে। তখন তুমহার আঁখ ঠিকরে যাবে, ফুলসরিয়া।

রাজধানীর উপকণ্ঠে ট্রাক ড্রাইভার তাদের নামিয়ে দিল। আর যেতে তাদের মানা আছে। ওস্তাদজীর চা খাওয়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল তারা।

সেই মায়াপুরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল ওস্তাদজীর দলবল। বাপরে বাপ কত কিসিমের হাওয়া গাড়ি আর কত পুলিশ। ইস্, ওস্তাদজী যদি আগে বলত তবে যার যার ভাল পোশাক পরে আসত। ফুলসরিয়ার একটা গোলাপ ফুল-ছাপা শাড়ি ছিল। তার বদলে সে পরে এসেছে একটা মামুলি হলদে শাড়ি। তাও আবার ছেঁড়া, কোনো মানে হয়?

ওস্তাদজী মাঝে মাঝে রাস্তার লোকদের কী যেন জিজ্ঞেস করছে। তার খুব সাহস, সে পুলিশদের সঙ্গেও কথা বলতে দ্বিধা করে না। কত রাস্তায় যে ঘোরা হল তার ঠিক নেই। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় মোকামের সামনে এসে ওস্তাদজী বললা, থামো। এহি হ্যায় তাজমহল।

অনেকেই হতাশ হল। তারা ভেবেছিল, বাদশা বেগমের ব্যাপার, নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক অন্যরকম কিছু হবে। কোথায় সেই রাজপ্রাসাদ? এই বাড়িটা বেশ বড় বটে কিন্তু এরকম বড় বাড়ি তো তারা আসতে আসতে বেশ কয়েকটা দেখছে। এর থেকেও বড় বাড়ি দেখেছে। রোদ্দুরের মতন শফেদও তো না এটা?

ধনিয়া বলল, এহি?

ভাল্লুকওয়ালা ওস্তাদজীকে বলল, কেন দিল্লাগী করছে, ওস্তাদ? এই তোমার তাজমহল? এ তো একটা হোটেল?

ওস্তাদজী বলল, হ্যাঁ হোটেলই তো। হোটেল ছাড়া চা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

—সে কথা আগে বলনি কেন?

—আগে বললে এইসব আমার সাথীরা ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু আমি কিছু ঝুট বলিনি। এই হোটেলের নাম তাজমহল। বিশ্ওয়াস না কর তো তুমি ওই দারোয়ানকে পুছকে দেখ!

হোটেলের কথা শুনে অনেকেই ঘাবড়ে গেছে। এতবড় হোটেলে ঢোকার সাহস তাদের নেই। ওস্তাদজী একশো টাকার নোট দেখিয়েছে বটে, একশো টাকা কম কিছু নয়, আবার বেশিও নয়। এই টাকায় একটা ভৈঁস বা খাঁসীও পাওয়া যায় না। এতবড় সাহেবদের হোটেলে কি এই টাকায় চা পাওয়া যায়? পাওয়া গেলেও তাদের ঢুকতে দেবে?

হোটেলে হেড দারোয়ানের চেহারা আগেকার কোনো নবাব-বাদশার মতনই। নাকের নিচে প্রকাণ্ড মোচ, মাথায় নিভাঁজ পাগড়ি, গায়ে মখমলের জামা। হাতে একটা ছোট লাঠি, তার মুণ্ডিটা পেতলের হলেও সোনার মতন চকচকে। এগুলো নোংরা-ছেঁড়া পোশাক পরা, খালি-পা ভিখিরি দেখে সে হুংকার দিয়ে উঠল, আরে রে-রে-রে-রে, ভাগ্ হিঁয়াসে।

সেই বজ্র গর্জন শুনে চুপসে গেল অনেকের মুখ। একজন অন্যের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করল, সবাই পেছন চায়।

ওস্তাদজী কিন্তু এগিয়ে গেল সামনে, একেবারে হেড দারোয়ানের মুখোমুখি। বিনা দ্বিধায় সেই মখমলের জামা পরা বুকে হাত রেখে মিষ্টি হেসে বলল, হামলোগ কাস্টোমার হ্যায়, কাস্টোমার। প্যায়সা দেব, খানাপিনা করব। তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছো কী?

হেড দারোয়ান তবু বলল, ভাগো, ভাগো। গেট কিলিয়ার করো!

ওস্তাদজী বলল, আরে দাদা, তুমি কাস্টোমারকে ফিরিয়ে দিচ্ছ কী? ডাক তোমার মালিককে। তার সঙ্গে বাৎ চিৎ হবে।

হোটেলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ততক্ষণে। স্টুয়ার্ট, ছোট ম্যানেজার, বড় ম্যানেজার সব সন্ত্রস্ত মুখে শলা-পরামর্শ করছে, এ কিসের হামলা? কী ভাবে এই উৎপাত রোখা যায়। হোটেলের নিজস্ব গার্ড আছে, তবু ফোন করা হল পুলিশকে। হোটেলে কত সাহেব-মেম আছে, কত শেঠ-আমির আছে, তাদের নিরাপত্তা চাই। এই হোটেলে কী এমন দোষ করল যে গাঁ থেকে গুণ্ডা-বদমাশরা এল হোটেল ঘেরাও করতে?

হোটেলের ছোট ম্যানেজার দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গার্ড ও পুলিশদের উদ্দেশে বলল, রিমুভ দেম। ক্লিয়ার দা গেটস।

ওস্তাদজী চেঁচিয়ে বলল, কী বলছেন ম্যানিজার সাব? ইংলিশ খ্যাচ ম্যাচ করছেন কেন? কোনো সাহেব কি আপনাকে পয়দা করেছে? আপনার গায়ের রংটি তো আমারই মতন।

ছোট ম্যানেজার বলল, টুম লোক ইধার সে চলে যাও। হল্লা মাট্ করো। নেহি তো পুলিশ তুম-লোগকো পুশ করে গা।

ওস্তাদজী বলল, ইয়ে ক্যা আজিব বাত বলছেন, ম্যানিজার সাব? আপনি কাস্টোমারদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন? আমি কানস্টিটিউশান পড়ে নিয়েছি, তাতে কোথাও লিখা নেই হোটেলে ঘুষতে গেলে পায়ে জুতা পরে আসতে হবে। পয়সা দিব, খাবো, ব্যাস।

—হোটেলে তুমলোগ খেতে পারবে না, দুসরা হোটেলে যাও।

—কেন্ন খেতে পারবো না? সব কাস্টোমারকে কি তোমরা বল, আগে রূপিয়া দেখাও? কানস্টিটিউশানে এ কথাও লিখা নেই।

ছোট ম্যানেজার তাড়াতাড়ি সরে গেল আরও বড় থানায় ফোন করতে।

চোখের নিমেষে এসে গেল গাড়ি গাড়ি পুলিশ। আর তাদের জাঁদরেল চেহারার কর্তারা।

এত পুলিশের সমারোহ দেখে গাঁও-এর লোকেরা একেবারে ঘাবড়ে-টাবড়ে অস্থির। তারা আর্ত চিৎকার করে বলছে, এ তুমি কী করলে ওস্তাদজী? তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমরা এতদূর এলাম। চা পিলাবার নাম করে তুমি কি আমাদের মার খাওয়াবে? পুলিশ আমাদের ফাটকে ভরে দিলে খেতির কাজ কাম কী করে হবে? বালবাচ্চারা কী খাবে?

ভাল্লুকওয়ালার হাত থেকে ডুগডুগিটা নিয়ে ডুগা-ডুগ, ডুগা-ডুগ করে বাজিয়ে এক হাত তুলে ওস্তাদজী বলল, শুনো ভাইয়ো আর বহেনো, মরদকা বাৎ হাঁতিকা দাঁত! আমি তুমাদের জবান দিয়েছি কি তাজমহল হোটেলমে চা পিলাবো। এমন বঢ়িয়া চা জীবনে খাওনি। যারা ডরপুক তারা পিছে হঠে যাও! যারা আমায় বিশওয়াস কর, তারা আমার সঙ্গে থাক!

একটা গুঞ্জন উঠে আবার থেমে গেল। একজনও পিছিয়ে গেল না। ডরপুক বদনাম কে নিতে চায়? ওস্তাদজী তাদের ভাল দেখে, সে ইচ্ছে করে তাদের বিপদে ফেলবে না। এও যেন সেই ঠিকাদারকে ঘেরাও করার মতন একটা মজাদার ব্যাপার!

পুলিশের এক কর্তা এগিয়ে এসে ওস্তাদজীকে বলল, তুমি এদের লিডার? তুমি এ পাশে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ওস্তাদজী বলল, তোমার মতন ছোটোমোটা দারোগার সঙ্গে কী কথা বলব? কমিশনার সাহেবকো বোলাও, নেহিতো প্রাইম মিনিস্টারজী কো বোলাও। যে-লোক কানস্টিটিউশান পড়েছে, তাদের সঙ্গে কথা হবে!

ছোট লোকের এই স্পর্ধা দেখে রাগে টকটকে হয়ে গেল পুলিশ কর্তার মুখ। একটু বাইরের দিকে হলে এদের পিটিয়ে শায়েস্তা করে দেওয়া যেত। দু-চারটে লাশ পড়লেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এটা রাজধানী, এখানে শত শত বিদেশি দূতাবাস, কত খবরের কাগজের লোক, কী থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক নেই। হোম মিনিস্টার খচাখচ সাসপেণ্ড করে দেবে!

পুলিশের কর্তার সঙ্গে হোটেলের ম্যানেজারদের আবার পরামর্শ হল। এই ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দেবার একটাই উপায় আছে। ভিখিরিগুলো বাগানোর শোভা নষ্ট করছে, যত তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করা যায় ততই মঙ্গল।

বড় ম্যানেজার এবারে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক হ্যায়, তুই লোগ চা খেতে এসেছো, এই হোটেল ম্যানেজমেণ্ট অ্যাজ এ গুড উইল জেস্‌চার তোমাদের চা খাওয়াবে। ফ্রি অফ কস্ট্‌। তোমরা গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, চা পাঠানো হচ্ছে।

গাঁয়ের লোকেদের মুখে হাসি ফুটল। ওস্তাদজীর জয় হয়েছে, সত্যিই তাদের চা খাওয়া হবে।

ওস্তাদজী হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে বিদ্রুপের সুরে ম্যানেজারকে বলল, আরে ছোঃ! আমরা কি ভিখারী নাকি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাব? স্বাধীন নাগরিক, পয়সা দিয়ে খেতে এসেছি, ভিতরে কুর্শীতে বসব, টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে আরাম করব, তবে না!

দলবলের উদ্দেশে ডাক দিয়ে সে বলল, চল্‌, চল, অন্দর চল!

সবাই হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওস্তাদজীর নেতৃত্বে।

ভেতরে টেবিলে টেবিলে বসে ছিল দেশ বিদেশের ফর্সা রং সাহেব মেমরা, আর পাক্কা সাহেবি পোশাক পরা কালো রঙের দিশি সাহেবরা। সবাই আঁতকে উঠল, হুড়োহুড়ি ঠ্যা[illegible] পা[illegible]। গাঁওয়ের মানুষ দখল করে নিল সব টেবিল চেয়ার।

ওস্তাদজী বলল, দে ধনিয়া, একটো বিড়ি ছাড়। দেখলি তো।

সবাই বলল, ওস্তাদজীকা জয়!

গলায় কালো বো বাঁধা একজন স্টুয়ার্ড ওস্তাদজীর সামনে এসে ভদ্রকঠিন গলায় বলল, দেখুন, আপনারা চা খেতে চান, ঠিক আছে, চা দিচ্ছি। কিন্তু একটা ভাল্লুক আর বাঁদর নিয়ে হোটেলে ঢোকার তো নিয়ম নেই। ওদের বাইরে রেখে আসুন।

ওস্তাদজী আলখাল্লার পকেট থেকে ফস করে খবরের কাগজটা বার করে সেই কর্মচারীর চোখের সামনে প্রথম পৃষ্ঠাটা মেলে ধরে বলল, এটা কিসের তসবির আছে? দেখ, আচ্ছা সে দেখ। চিনতে পার না!

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা ভাল্লুকের ছবি।

ওস্তাদজী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শুনো, ভাইয়ো আর বহেনো, এই ভালকোর ছবি দেখছে, এটার মালিক এই হোটেল! হাঁ, আমি ঠিক কথা বলছি। আখবরে সব লিখা আছে। এই হোটেল এই ভালকোটাকে পাঠিয়েছে ফরাসি সাহাবদের মুলুকে। সেখানে হোটেলে হোটেলে এই ভালকো খেল্‌ দেখাবে। আমি ঝুট বলি না, সাচ বাৎ বলি, এখানে সব লিখা আছে। এই হোটেল যদি আন্যকুনো হোটেলে ভালকো পাঠায়, তবে আমরা কেন এখানে আমাদের ভালকো আনতে পারব না? আলবাৎ আনব।

সবাই হা-হা হো-হো করে হেসে সমর্থন জানাল ওস্তাদজীকে। সাহেবদের হোটেলে যদি ভাল্লুক যায়, তবে দিশি হোটেলে কেন আসবে না?

পুলিশ চেষ্টা করছে টেলিফোনে হোম মিনিস্টারকে ধরতে। কিন্তু তিনি বেপাত্তা। লাঠি, টিয়ার গ্যাস, না গুলি— কোনটা চালানো হবে, সে নির্দেশ কেউ দিতে পারছে না। তার থেকে এদের চা খাইয়ে দেওয়াই ভাল।

টেবিলে টেবিলে দামি দামি অ্যাশট্রে আর ফুলদানি। এ ব্যাটারা নির্ঘাৎ ওগুলো চুরি করবে। ম্যানেজারের নির্দেশে বেয়ারারা সেগুলো সরিয়ে নিতে এল।

ওস্তাদজী একজন বেয়ারার হাত চেপে ধরে বলল, আরে নোকর! তুই বড় লোকের নোকর হয়েছিস বলে কি তোর জাত পাল্টে গেছে? তোর বাপ-দাদা কোনদিন খেতি-মজুরি করেনি? তুই আমাদের পছানতে পারছিস না? কানস্টিটিউশানের কোথায় লিখা আছে, যে হোটেলে এসে সিগ্রেটের ছাই ঝাড়া চলবে লেকিন বিড়ির ছাই ঝাড়া চলবে না? রাখ ওসব!

তারপর তুড়ি মেরে সে স্টুয়ার্ড ডেকে বললো, ওহি কাগজ লাও, যে কাগজে সব চিজের নাম আর দাম লিখা থাকে!

টেবিলে টেবিলে মেনু কার্ড পড়ে আছে, তার একখানা তুলে দেওয়া হল ওস্তাদজীর হাতে। সে মনোযোগ দিয়ে পড়ার ভান করে বিড়বিড় করে বলল, শালা ডাকু! একটা শুখা মুর্গা, তার কিম্মৎ দেড়শো রুপেয়া। এক পিলেট বাদাম, পচ্চিশ রূপেয়া! ডাকু! হারামখোর! নাঃ, আমরা শুধু চা খাবো। চা আনো চাল্লিশ কাপ।

দু-তিনটি সাহেব সাহস করে ভেতরে দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। তাদের হাতে ক্যামেরা। ওস্তাদজী তাদের ডেকে বলল, আও, আও, তসবির খিঁচো।

রোগা প্যাংলা দুখীরাম নামের একজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, ইনকা তসবীর লেও! রাজীবজী ফরাসি মুলুক আর আফ্রিকায় গেছেন ফাংকশান করনে কে লিয়ে। জাদুঘর থেকে সব পাথরের মূর্তি নিয়ে গিয়ে সাহেবদের ভারত দেখাচ্ছেন। উয়ো তো পুরানা জামানার ভারত হ্যায়! ইয়ে দুখীরামকে দেখো। ইয়ে হ্যায় নয়া জমানাকা ভারত।

পুলিশ এসে সাহেবদের সরিয়ে দিল। বিদেশিদের যখন তখন ছবি তোলার নিয়ম নেই। তাছাড়া কখন ভায়োলেন্স শুরু হয়ে যায়, তার ঠিক কি! ওই লোকগুলো টেবিল চাপড়ে হাসি মস্করা করছে। ওদের চা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

বড় বড় পটে করে চা এল। বেয়ারা সেই চা কাপে কাপে ঢালতে যেতেই ওস্তাদজী বললো, রোখো! তুম যাও।

তারপর সে ফুলসরিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, দেবী ফুলসরিয়া, আজ তুমিই এই তাজমহলের বেগম। তুমি নিজের হাতে সবাইকে চা বেঁটে দাও!

সকলেই এক একটা কাপ পাবার পর সুরুৎ সারাৎ শব্দে চা টানতে লাগল। কেউ কেউ বলল, আঃ! মজা আ গিয়া। কী সুন্দর বাস, এমন চা বাপের জন্মে খাইনি। ধন্য তুমি, ওস্তাদজী!

শুধু ফুলসরিয়ার চোখে জল।

ওস্তাদজী তাকে জিজ্ঞেস করলো, এ কী ফুলসরিয়া, তুম রোতে কিঁউ? কিসের দুঃখ হয়েছে তুমহার?

ফুলসরিয়া ধরা গলায় বলল, বড় আনন্দ হচ্ছে, ওস্তাদজী! আমি একটা বেহুদা কামিন। আমায় এত সম্মান কেউ কখনো দেয়নি।

—তুমি নিজে হাতে দিলে তাই চায়ে এত বেশি সুবাস, আরও যেন মিঠা লাগল! ঠিক কিনা!

সবাই বলল, ঠিক ঠিক।

ভাল্লুকওয়ালা বলল, আরে, তোমরা সব চা খেয়ে নিলে, আমার ভাল্লুক আর বান্দর দুটোকে একটু দিলে না?

তাই তো, তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। সবাই তাদের কাপ থেকে একটু একটু ঢেলে দিল প্লেটে। সেই চা ভাল্লুক আর বাঁদর দুটোকে খাওয়ানো হল।

চা খেতে খেতে চকচক করতে লাগল নির্জীব ভাল্লুকটার চোখ। এরকম ভাল জিনিস তো সে কখনো খায়নি। আবার যেন সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ওস্তাদজী ভাল্লুকটার সামনে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, নাচ ভালকো, নাচ। নাচ রে মুন্না নাচ!

সবাই মিলে হাততালি দিতে লাগল ভাল্লুকটাকে ঘিরে।

সাঁকো

ওরা আমার হাত দুটো পেছন দিকে মুড়ে বাঁধলো নাইলনের দড়ি দিয়ে। চোখে বেঁধে দিল নিরেট কালো কাপড়। মুখের মধ্যে একটা বেশ বড় তুলোর গোল্লা ভরে দিয়ে ঠোঁটে আটকে দিল স্টিকিং প্লাস্টার। তারপর বুঝতে পারলুম, দু-তিনজন লোক আমাকে উঁচু করে তুলে বেশ খানিকটা বয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল একটা কাঠের তক্তার ওপরে।

একজন খুব ঝকঝকে পালিশ করা গলায় বলল এবারে তুমি হাঁটো সামনের দিকে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, এক পা এক পা করে হাঁটো।

আমি এক পা বুলিয়ে দেখলুম, কাঠের তক্তাটা মাত্র বিঘতখানেক চওড়া, তলার দিকে শূন্যতা।

এটা একটা সাঁকো? নিচে কোনো পাহাড়ি নদী? জ্যোৎস্নাহীন রাতে আমরা আসছিলুম একটা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে, গাড়ি থেমেছিল একটা জঙ্গলের মধ্যে। এমন নিস্তব্ধতা যে বাতাসেরও কোনো শব্দ নেই।

যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই আততায়ীদের একজন হেসে বলল, হ্যাঁ, এটা তিস্তা নদীর ওপর একটা অস্থায়ী সাঁকো। জল প্রায় পাঁচ ছশো ফুট নিচে। যদি পা পিছলে পড়ে যাও সঙ্গে সঙ্গে ছাতু হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

আমি বুঁ বুঁ শব্দ করে বলতে চাইলুম, আমাকে এই সেতুটা পার হতে বলছো কেন?

সে ঠিক বুঝতে পেরে বলল, এটা একটা খেলা।

আমি ওইভাবেই আবার বললুম, এ খেলা যদি আমি খেলতে না চাই?

সকৌতুক উত্তর এল, তাহলে তোমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। তুমি গড়াতে গড়াতে পড়বে, আমরা সেটা টর্চ ফেলে দেখবো।

এরপর আমি নিজেই জিজ্ঞেস করলুম, আর যদি ওপারে পৌঁছোতে পারি?

আবার হাসির সঙ্গে উত্তর এল, তখন দেখবে কী হয়। নিশ্চয়ই একটা কিছু খুব মজার ব্যাপার হবে। নাউ স্টার্ট। আমরা ঠিক দশ গুনবো, তার মধ্যে এগোতে শুরু না করলে.....এক, দুই, তিন.....

প্রথম পা ফেললুম সামনের দিকে। খুব একটা শক্ত কিছু মনে হল না। কাঠের পাটাতনটা বেশ মজবুত। এক পা সামনে দিয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে তারপর দ্বিতীয় পা এগিয়ে ঠিক মতন বুঝে নিয়ে সেটা ফেলতে হবে। এই রকম ভাবে প্রত্যেকবার। একটুও অন্যমনস্ক হলে চলবে না। অসম্ভব কিছু নয়। এর থেকেও অনেক শক্ত খেলা আছে, পৃথিবীতে।

ওদের গোনা শেষ হবার আগেই আমি তিন পা এগিয়ে এসেছি। কী ভাবে ওরা আমাকে? ওরা গায়ের জোরে আমাকে ধরে এনেছে বলেই আমি ওদের কাছে হার স্বীকার করব? ওরা কি ভেবেছিল, আমি কেঁদে কেটে, প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়ে দয়া চাইব ওদর কাছে? আমাকে এখনো চেনে না।

এই সাঁকোটা কতখানি লম্বা? তিস্তা নদী তো কম চওড়া নয়। জুবিলি ব্রিজ পার হয়েছি অনেকবার। উঁচু পাহাড়ের ওপর হয়তো কিছুটা সরু। এ জায়গাটা কোথায়?

একী, আমার পা কাঁপছে কেন? মাথা ঠিক আছে, তবু পা কাঁপছে? সামনের দিকে এগোবার জন্য একটা পা তুলতেই অন্য পা-টা যেন শরীরের ভর রাখতে পারছে না। মানুষ তো এক পায়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সামনের দিকে পা বাড়ানোই দারুণ শক্ত। পাশের দিকে নয়, শুধু সামনের দিকে। একেবারে সোজা হাঁটতে মানুষ জন্ম থেকেই শেখে না।

ওদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হল, থামলি কেন? গুঁতো খাবি কিন্তু।

আমার মুখ বন্ধ, আমি উত্তর দেব কী করে? ওরা তা জানেনা? অবশ্য ওদের ওই প্রশ্নের কোনো উত্তরও হয় না।

আবার ওরা বলল, হয় গুঁতো খাবি, নইলে গুলি করা হবে। থেমে থাকা চলবে না। আবার দশ গুনছি, এক-দুই-তিন......

একটা যদি লাঠি দিত ব্যালান্স রাখার জন্য! হুঃ, লাঠি, হাত দুটোই খোলা রাখেনি। ছেলেবেলায় যখন কোনো পাঁচিলের ওপর দিয়ে কিংবা রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটেছি, হাত দুটো এমনিতেই দুপাশে সোজা হয়ে গেছে, হাত দুটো তখন ডানা হয়ে যায়।

অন্ধকার রাত্তিরে চোখ খোলা থাকলেও এরকম একটা সরু সাঁকো পার হওয়া কথার কথা নয়। তবু ওরা চোখ বাঁধতে গেল কেন? তেমন প্রয়োজন হলে মানুষ নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়। চোখ খোলা থাকলে, আর কিছু না হোক শুধু অন্ধকারও তো দেখা যেত। অন্ধকার কি দেখার জিনিস নয়। অন্ধকার কতরকম। পৃথিবীতে কোথাও খাঁটি কালো অন্ধকার নেই।

না, অসম্ভব পা কাঁপছে। আমি পারবো না। এরই মধ্যে একবার টলে পড়ে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে। এটা অন্যায় খেলা।

ওরা আর লাঠি-ফাঠি নিয়ে গুঁতো মারতে পারবে না। তার থেকে দূরে চলে এসেছি নিশ্চয়ই! গুলি করতে পারে। কিন্তু ওদের গুলি খেয়ে আমি কিছুতেই মরবো না। ওরা গুনতে শুরু করলে নয় পর্যন্ত গোনার পরই আমি ঝাঁপ দেব।

—নীলু! নীলু!

বাবার গলার আওয়াজ। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন আগে। বাবা এখানে এই নদীর ওপর এসে আমায় ডাকতে পারেন না। মানুষের আত্মা বলে কিছু যদি থেকেও থাকে, কিন্তু সেই আত্মা কি পাখি যে অন্ধকার নদীর ওপর এসে উড়বে? এটা আমার কল্পনা, গল্প-উপন্যাসে এরকম থাকে। অবচেতনে আমি কি শিশু হয়ে গিয়ে বাবার সাহায্য চাইছি?

—নীলু, নীলু, তুই পারছিস না? আমি তোর হাত ধরবো?

—বাবা, আমার হাত বাঁধা। তোমারও কি হাত আছে?

—না, আমার হাত নেই। কিন্তু তোকে থামলে চলবে না। তুই এগিয়ে আয়, আস্তে আস্তে, মনে কর, একটু সামনেই তোর মা বসে আছে।

—মা কি সামনে থাকে, না পেছনে? একটা দমকা হাওয়া দিল। এতক্ষণ বাতাসের অস্তিত্বও টের পাওয়া যাচ্ছিল না। বেশ গরম, কিন্তু বেশি জোর হাওয়া ভাল নয়। একটা পা তুললেই আমার শরীরটা যেন একটা শুকনো ফুলের পাপড়ির মতন পলকা হয়ে যাচ্ছে। বাতাসের ধাক্কাতেও পড়ে যেতে পারি।

আমি আর এগোতে পারছি না। না, পারবো না।

পেছন থেকে ওরা গুনছে, এক দুই তিন.....সাত আট.....

—নীলু, নীলু, ঝাঁপ দিও না।

মায়ের গলা? না তো, অন্যরকম, অথচ খুব চেনা চেনা। কে, তুমি কে?

—নীলু, ঝাঁপ দিও না। এস সামনে এস। তুমি আমায় চিনতে পারছো না নীলু?

—রিনি। সত্যি প্রথমটা চিনতে পারিনি। অথচ ভেবেছিলুম, সারা জীবনে তোমাকে ভুলবো না। আশ্চর্য।

—সত্যিই তুমি আমায় ভুলে গিয়েছিলে, নীলু?

—না, রিনি, ভুলে যাইনি, আবার অনেকদিন মনেও পড়েনি তোমার কথা। এতদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?

—আমি তো হারিয়ে যাইনি, তুমিই অনেক দূরে চলে গেলে।

—রিনি আমার চোখ বাঁধা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি আগের মতই আছো? ঘুঘু পাখির চোখের মতন অবাক অবাক ভাব, একটা উড়ন্ত পালকের মত তোমার শরীর।

—কথা বল না, নীলু, এগিয়ে এসে আমার হাত ধর।

—আমি পারছি না রিনি, আমি আর পারবো না, এই দ্যাখো, একটা পা তুলতে কতক্ষণ সময় লেগে যাচ্ছে।

—তুমি একসময় তোমার সবকিছু ছেড়ে আমার দিকে ছুটে এসেছিলে।

—আমি ছুটে গিয়েছিলুম না তুমি আমাকে চুম্বকের মতন টেনেছিলে? এখন আবার সেই রকম ভাবে টানতে পারো না?

—মাঝখানে কতগুলো বছর......নীলু, তুমি সামনাসামনি না এগিয়ে পাশ ফিরে হাঁটো। দ্যাখো, তাহলে পা তুলতে হবে না। একটা পা ঘষে ঘষে এগোবে। পা কাঁপবে না। আমি হাত বাড়িয়ে আছি তোমার দিকে।

—তাই তো, পাশ ফিরে হাঁটা কিছুটা সহজ লাগছে। রিনি তুমি কী করে জানলে? তোমাকে কি এরকম সাঁকো পার হতে হয়েছে কখনো?

আর কোনো উত্তর নেই। রিনি আসেনি। আবার অবচেতন? পাশ ফিরে হাঁটার বুদ্ধিটা রিনি দিয়ে গেল, না আমি নিজেই উদ্ভাবন করলুম? বহুদিন রিনির কথা মনে পড়েনি, রিনি হারিয়ে গেছে, না আমি দূরে চলে গেছি? এক

সময় রিনির খুব কাছে পৌঁছোনোর জন্য সাঙ্ঘাতিক ব্যাকুলতা ছিল। কত আছে? রোদ্দুর যেমন বহু লক্ষ মাইল দূর থেকে ছুটে এসে মানুষের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে ভেতরে চলে যায়, অন্ধকার মজ্জা-মাংস শিরা-রক্তে আলো জ্বালিয়ে দেয়, সেই রকম? না, আমি আলো জ্বালিনি, রিনিই জ্বালিয়েছিল, এক চিল-ডাকা দুপুর ওদের বাড়ির একতলায় বসবার ঘরে রিনি আমার চোখের সামনে ওর একটা হাত তুলে বলেছিল, এই আঙুলের ডগায় কী আছে বল তো? আমার মনে হয়েছিল, সেখানে থেমে আছে অনন্ত মুহূর্ত।

তবু আমরা পরস্পরকে হারিয়ে ফেললুম কী করে? আর রিনিকে ছাড়বো না, এবার রিনিকে পেতেই হবে। মনে করা যাক এখান থেকে ঠিক দশ পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে রিনি, সেই আঙুলটা তুলে, আমায় ওই পর্যন্ত যেতেই হবে।

—নীলু, আমি কিন্তু ঠিক দশ পা দূরেই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি গুনে গুনে পা ফেলে এস।

—রিনি তোমার কাছে পৌঁছোলে তুমি আমার চোখের বাঁধনটা অন্তত খুলে দেবে? তোমাকে একবার দেখবো।

—তোমার চোখ বাঁধা আছে, তাতে এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। নিচের দিকে তাকালে তোমার মাথা ঘুরে যেত। নদীর জলে একটু আলো চিকচিক করছে। অনেক নীচে।

—নিচের দিকে তাকাবো না, শুধু তোমার আঙুলের ডগাটা আর একবার ভালো করে দেখবো।

এই দশ পা যেতে আমার পা কাঁপলো না। রিনি সেখানে নেই। কিসের শব্দ, অনেক নিচের নদীর জলস্রোতের? ওহে অবচেতন, তুমি আরও শক্তিশালী হয়ে রিনিকে রক্তমাংসে তৈরি করতে পারলে না? কী গাধা আমি, মাত্র দশ পা দূরে রিনি থাকবে, কেন একথা বলতে গেলুম? যদি ভাবতুম পঞ্চাশ পা দূরে, কিংবা সাঁকোর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে রিনি, আকাশে কালপুরুষের দিকে তার কোমল আঙুলখানি তুলে, তাহলে সেই টানে হয়তো পৌঁছে যাওয়া যেত।

কৃপণের মতন আমি মাত্র দশ পা উচ্চারণ করে রিনিকে খরচ করে ফেলেছি। এখন অবচেতন তোলপাড় করলেও আর রিনি ফিরে আসবে না।

পেছন থেকে কর্কশ হুংকার ভেসে এল—এই হারামজাদা, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আমরা কি এখানে সারা রাত কাটাতে এসেছি? গুলি চালাবো?

ওরা কি টর্চ ফেলে দেখছে আমাকে? ওরা সব মিলিয়ে ছজন, আমি গুনেছি। ওদের বাধা দেবার কোনো উপায় ছিল না। ওরা কি অপেক্ষা করে আছে, কখন আমি পড়ে যাবো? কিংবা ওরা নিজেদের মধ্যে বাজি ফেলেছে? সিনেমায় এরকম দৃশ্যে থাকে, হঠাৎ একবার পা ফসকে পড়ে যায় নায়ক। দর্শকদের বুক ধড়াস করে ওঠে। নায়ক কিন্তু সত্যি সত্যি পড়ে যায় না, শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলে এক হাতে। ঝুলতে থাকে। তলায় হাঁ করে আছে কুমির। নায়ক সেই অবস্থাতেও উঠে আসে কায়দা করে।

আমি পড়ে গেলেও ধরতে পারবো না, আমার হাত বাঁধা। মুখ দিয়ে কাঠটাকে কামড়ে ধরারও উপায় নেই। আমার এক চুলও ভুল করলে চলবে না। তাছাড়া আমি নায়কও নই। এটা সিনেমা নয়, এটা বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা।

বাঁচতেই যে হবে, তার কী মানে আছে! একটা কুঁড়েঘরের চাল থেকে ঝুঁকে পড়া রোমশ, হালকা সবুজ লাউডগায় বসে আছে একটা লালচে রঙের ফড়িং, তিরতির করে কাঁপছে তার ডানা, কী নিশ্চিন্ত ও আনন্দময় তার বসে থাকার ভঙ্গি, যদিও যে-কোনো মুহূর্তে একটা শালিক তাকে ঠোঁটে চেপে নিয়ে যেতে পারে। কেন এই দৃশ্যটা মনে আসছে!

আর কত দূর যেতে হবে? অর্ধেক এসেছি কি? একটা মুহূর্ত, যদি লাফ দিয়ে পড়ি, তাহলে আর কোনো যাতনা করতে হবে না। অনেক উঁচু থেকে পড়লে বাতাসের চাপেই নাকি নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যায়। অন্য যে-কোনো মৃত্যুর চেয়ে নদীর বুকে হারিয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

দুলছে, দুলছে সেতুটা দুলছে। ওপার থেকে কি ওরা ইচ্ছে করে দোলাচ্ছে? তাহলে ওদের খেলাটা এই, আমাকে কিছুতেই পার হতে দেবে না। মাঝ নদীতে ফেলে দেবে।

কিংবা এত লম্বা কাঠের সেতু, নিচে যদি কোন সাপোর্ট না থাকে, তাহলে মাঝখানটা বেঁকে যেতে তো পারেই। এইখানটা ঢালু হয়ে গেছে, দুলছে। মানুষ নয়, এই কাঠের তক্তার দুর্বলতাই ফেলে দেবে আমাকে।

—নীলু, নীলু তুমিও তোমার শরীরটা দোলাও। নইলে ভারসাম্য রাখতে পারবে না।

—কে গগনদা? আপনি কোথা থেকে এলেন?

—কথা বলায় সময় নেই নীলু। নিজের শরীরটা দোলাও, তারই সঙ্গে একটু একটু করে এগিয়ে এস।

—আমি আর পারছি না, গগনদা। জল আমাকে টানছে। আর, গেলাম.......

—না, না, তুমি পারবে, তোমাকে পারতেই হবে, নীলু। কাঠের তক্তার দুলুনির সঙ্গে শরীরটা দোলাও সেই সঙ্গে একটা পা বাড়িয়ে দাও, মনের জোর আনো, শরীরে জোর আনো, নীলু—তুমি ঠিক জয়ী হবে।

আঃ, এসব কী হচ্ছে, অবচেতন! গগনদাকে কোথা থেকে এনে হাজির করলে? একই সঙ্গে শরীর দোলাবো, পা বাড়াবো, মনের জোর, শরীরের জোর আনবো, আমি কি ভেল্কিবাজি জানি? কলেজ জীবনে গগনদা আমাকে যত রাজ্যের ভুল জিনিস শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে গ্রামের ভাষায় কথা বলতে শেখো; বলেছিলেন, বিপ্লবের জন্য অস্ত্র তুলে নাও। বলেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম-ভালবাসা বিসর্জন দাও। বলেছিলেন আদর্শের জন্য বন্ধুর বুকেও ছুরি মারবার জন্য তৈরি হও। সবগুলো এক সঙ্গে, আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল, আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। যখন আমি চোখ মেললুম, তখন দেখলুম গগনদা নিজে এসব কিছুই মানেননি, নিজে দিব্যি ফুরফুরে জীবন কাটাচ্ছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই তিনি বললেন, তুমি কে, আমি তোমাকে চিনি না।

বাবা, রিনি, গগনদার কথা অবচেতন থেকে উঠে আসছে কেন? এটা কি রূপক নাকি? অন্ধকার রাত্তিরে একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর ওপরের বিপজ্জনক সাঁকো দিয়ে আমি একলা পার হচ্ছি, এটা কোনো প্রতীকের ব্যাপার। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতয়া.....ধারালো ক্ষুরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার নামই জীবন, উপনিষদ-ফুপনিষদে এরকম কিছু গালভরা কথা আছে না। যাঁড়ের পেচ্ছাপ। রূপক-টুপক কিছু না হলে বাঁচা যেত। ছ'খানা উৎকট আততায়ী জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে এল, কেন আমার ওপর তাদের রাগ তা জানি না, আমাকে এক গুলিতে খতম না করে তারা আমাকে এই বীভৎস তামাসায় নামিয়ে দিয়েছে, সামান্য পদস্খলন হলেই সোজা মৃত্যু, এটাই কঠোর বাস্তব। আমার জীবনে আজকের এই রাতটা শেষ হবে না বোধ হয়।

—এই দুই-তিন-চার পাঁচ......

—যাচ্ছিরে বাবা, যাচ্ছি। বাঁচতে কার না সাধ হয়? যে-কোনো উপায়ে, দাঁতে দাঁত কামড়ে সবাই বেঁচে থাকতে চায়। যাচ্ছি যাচ্ছি।

—কাঠের তক্তার দলুনিটা থেমে গেছে হঠাৎ। তাহলে সম্ভবত পেরিয়ে এসেছি মধ্যপথ। খুব গরম লাগছে। জামাটা খুলে ফেলতে পারলে ভাল হত। এই অন্ধকারে প্যান্টটা খুলে ফেললেই বা ক্ষতি কী ছিল, শরীরটা আরও হালকা হত। ওরা একটা ভাল কাজ করেছে, হয়তো ভুল করেই, আমাকে খালি পায়ে আসতে দিয়েছে। পায়ের আঙুলগুলো আমার বহুকাল আগের পূর্বপুরুষের মতন আঁকড়ে ধরেছে তলার অবলম্বনটা।

—নীলু তুই ভয় পাসনি, আমি সবসময় তোর সঙ্গে আছি।

—বাবা, তুমি আবার এসেছ? বাবা, তুমি যখন সঙ্গে থাকতে, তখনও কি আমি অনেক অচেনা রাস্তায় হারিয়ে যাইনি? আমি নিজেই তো শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে পেয়েছি।

—নীলু সেই সব সময়েও বাবা-মায়ের স্নেহ ঘিরে থাকে সন্তানকে। সন্তানেরা বোঝে না, স্নেহ নিম্নগামী বলেই তারা বোঝে না, তারা বাবা-মায়ের কথা ভুলে গিয়ে নিজের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে থাকে....

ভাই অবচেতন, কেন বাবাকে ফিরিয়ে আনলে? এতে যে আমি আরও দুর্বল হয়ে পড়বো। বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি, বাবার অনেক সঠিক নির্দেশ আমি মানিনি, বন্ধুবান্ধব সান্নিধ্যে, একটা অদ্ভুত ছটফটানির মধ্যে মত্ত হয়ে ছিলুম। কিন্তু এই কি সেই সব ব্যাপার নিয়ে অনুশোচনার সময়? যদি কারুকে আনতেই হয়, রিনিকে নিয়ে এসো। আর কিছু না হোক, রিনির কণ্ঠস্বরই আমাকে সঞ্জীবনী শক্তি এনে দেবে।

ওঃ হো আমার নিজেরই অবচেতন, অথচ আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। চাইলুম রিনিকে, নিয়ে এল গগনদাকে। ওগো প্রিয় অবচেতন, তুমিও কি ওই ছ'জন অপরাধ কর্মীর মতন মজা মারছো আমাকে নিয়ে? নইলে এখন গগনদাকে নিয়ে আসার কী মানে হয়? গগনদার মতন মানুষেরা চিরকালই এই রকম বড় বড় গালভরা বাণী দিয়ে যাবে। তা শুনে হয়তো দু'চারজন শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে মুক্তির দরজায়, আর বাকি যে কয়েক শো বা কয়েক হাজার টুপটাপ করে খসে পড়ে যাবে অতলে, তাদের হিসেব কে রাখবে? আমি ওই খসে পড়ার দলে। অথচ আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি, আমার ভীষণ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। যারা নেমন্তন্ন বাড়ির বাইরে বসে এঁটো পাতা চাটে, আমি তাদের একজন হয়েও বেঁচে থাকতে চাই। আমি নদীতে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হতে চাই না।

ডান পা, বাঁ পা, ডান পা, বাঁ পা ডান পা, বাঁ পা, আমার অবচেতন নেই। এখন সমস্ত মন শুধু আমার পায়ে। আমার চোখ বাঁধা, মুখ বাঁধা, আমার হাত বাঁধা। শুধু পা দুটো খোলা। এই পা নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে। আমি পিছিয়ে যেতে পারবো না। আমি থেমে থাকতে পারবো না। ওরা রাইফেল উঁচিয়ে টর্চ ফেলে কি এখনো দেখছে আমাকে? আর কত দূর, কত দূর, কত দূর, আমি কতক্ষণ ধরে হাঁটছি!

কাছেই যেন গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সত্যি সত্যি মানুষের গলা, অবচেতন নয়, পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল বাস্তব। আমি কি তাহলে পৌঁছে গেছি, বেঁচে গেছি। ব্রিজের এপারেও মানুষ আছে, তারা কথা বলছে। ভাগ্যিস ওরা আমার কানও বেঁধে দেয়নি। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

একজন বলল, বাক আপ! বাক আপ! এসে গেছে! এসে গেছে! আর কয়েক পা!

আর একজন বলল, মাই গড়, সত্যি হারামজাদাটা পৌঁছে গেল?

আরও একজন বলল, ওয়ান ইজ টু ফোর। আমি বলেছিলুম না, প্রাণের টান বড় টান। এ শালা ঠিক পার হয়ে যাবে। আমার বাজির টাকা দিতে হবে কিন্তু।

আমি থমকে গেলুম। কণ্ঠস্বরগুলো আমার চেনা। এরাই ওপারে ছিল, এরাই আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

কাছাকাছি আরও কোনো সুবিধেজনক, নিরাপদ, সংক্ষিপ্ত সেতু আছে নিশ্চয়ই, তা দিয়ে ওরা পেরিয়ে এসেছে। সেই সব সেতুরই সন্ধান, এমনকি এই অন্ধকার রাত্তিরেও ওরাই শুধু জেনে যায়। ওরা সব কিছু সহজে পায়।

ওদের একজন বলল, থামলি কেন রে। এবার জোর কদমে চলে আয়, আর কোনো ভয় নেই।

অন্য একজন বলল, এই লোকটা যে কামাল করবে, ভাবতেই পারিনি। একে একটা কিছু পুরস্কার-টুরস্কার দেওয়া উচিত।

আর একজন বলল, নিশ্চয়ই, আমরা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখাতে জানি। ও এপাশের মাটিতে পা দিলেই ওকে উইনার বলে ডিক্লেয়ার করব। ওরে, তুই কী চাস, দেড় বিঘে জমির ওপর বাড়ি, ফরেন ট্রিপ, ওষুধের এজেন্সি, রাস্তা তৈরির কন্ট্রাকটরি—কী চাস বল?

আমার পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে। ছেলেবেলায় একটা কথা শুনেছিলুম, খেজুর গাছের তিন হাত। সাধারণ লোকের পক্ষে খেজুর গাছ বেয়ে ওঠাই শক্ত, সবচেয়ে শক্ত শেষ তিন হাত ওঠা। তীরে এসে যেমন তরী ডোবে। আমি আর এগুতে পারছিনা। না, আর এক পাও বাড়ানো যাবে না।

আমার অবচেতন বলল, যাঃ, একী করছো মাইরি। এখানে সাঁকোর তলায় জল নেই, মাটি, তুমি এখন এক দৌড়ে পার হয়ে যেতে পার।

আমি হেসে পেছন ফিরলুম।

ওপারে পৌঁছোলেই লোকগুলো আমাকে কিছু পুরস্কার দেবে বলছে। এটা ওদের খেলা। সবাই বাঁচতে চায়, আমিও বাঁচতে চাই। কিন্তু বেঁচে থাকার মধ্যে একটা আত্মগরিমা থাকবে না? তা না হলে শুধু পোকামাকড়ের মতন......। শুধু একটা বাস্তব জীবন? কেউ সামনে একটা গাজরের টুকরো ঝুলিয়ে রাখবে, তাই দেখে ছুটে যাওয়া? আমাকে ওদের নিয়মে খেলতে হবে।

আমি উল্টো দিকে ফিরে পা বাড়াতেই এপারের লোকজন হৈ হৈ করে বলে উঠলো আরে আরে লোকটা পাগল হয়ে গেছে নাকি? ওরে গাধা, কোন দিকে যাচ্ছিস? এদিকে আয়, দৌড়ে আয়, তুই বেঁচে গেছিস......

আমার মুখ বন্ধ, তবু আমি বললুম, এবার শুরু হবে আমার নিজস্ব খেলা।

হরিদাসপুরে গাছের ছায়ায়

গাছটাকে দেখলে মনে হয় না দয়ালু। মনে হয়, বড়ো বেশি রাশভারী, যেন হঠাৎ ভুল জায়গায় এসে পড়েছে, আশপাশে সব ছোটখাটো গাছ, তার মাঝখানে বিশাল বিপুল গাছটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ভঙ্গি এমন যেন একদিন সে অন্য কোথাও চলে যাবে।

দয়ালু না হোক, তবু গাছের অনেকখানি ছায়া। সেই ছায়ায় দীননাথের চায়ের দোকান। চাস রোড এসে মিশেছে পুরুলিয়া রোডে, এখন দু-দিকে দুই রাস্তা, কে দুর্গাপুর যাবে কে বাঁকুড়া যাবে—এখানে এসে ভেবে নিতে হবে, অথবা, উল্টোদিক থেকে এলে, রাঁচি না বোকারো? দুর্দান্তবেগে ছুটে আসা গাড়িগুলো এখানে স্পীড কমিয়ে একটু আস্তে হয়, কেউ কেউ বা থেমে যায়, গাছের ছায়ায় বসে আধ গ্লাস চা খেতে লোভ হয়।

—কী বুড়ো? চা হল?

—এই যে, এই—

দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে তিনজন ওইরকম মোটর গাড়ির মানুষ। যুবা। তিনজনেরই মুখে সিগারেট, উষ্ণ বোধ হওয়ায় একজন কোট খুলে ফেলেছে, অন্যজন বুট জুতো মাটিতে ঠুকছে অসহিষ্ণুভাবে। রাস্তার বাঁ দিকে ওদের মোটর গাড়ি দাঁড় করানো। তিন গ্লাস চায়ে ঠং ঠং করে চামচে নাড়তে নাড়তে দীননাথের সন্দেহ হয়, বুঝি চা খুব কড়া হয়ে গেছে। আর একটু দুধ লাগবে। ঘটির দুধ ফুরিয়ে গেছে। দীননাথ ডাকল, বুলু? বুলু! —বুলু আশেপাশে নেই।

—কী বুড়ো, তুমি যে চা বানাতেই এক ঘন্টা লাগালে?

—এই যে, এই হয়ে গেল।

দীননাথ নিজেই দুধ আনার জন্য উঠল। বেশিক্ষণ বসে থাকলেই পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে, তখুনি হাঁটা যায় না, হাঁটতে গেলে কিরকম হাসি-হাসি লাগে। পিছনের রান্নাঘরে কড়াইতে দুধ বসানো। উনুনের পাশে বিড়ালটা দুঃখিতভাবে বসে আছে। কড়াই এমন গরম, মুখ দেওয়া যায় না, সেই সকাল থেকে দুধ ফুটছে। ঘন হলদেটে সর পড়ে আছে।

—আরে মাইরি, এক কাপ চা খেতেই যে দুপুর হয়ে গেল?

—দুর্গাপুর পৌঁছুতে এখনো দু-ঘন্টা। এখানে না থামলেই হত। খিদে পেয়ে যাচ্ছে।

—বুড়োটা গেল কোথায়?

—এই যে, এই আসছি।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দীননাথ সামান্য হাসে। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়েস, এখনই কি তাকে বুড়ো বলা যায়? যাক, যার যা ইচ্ছে বলুক। কড়াই থেকে ঘটিতে দুধ ভরার সময়, খানিকটা সর তুলে দীননাথ বেড়ালটাকে দেয়, বেড়ালটা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কী আনন্দে সরটুকু খাচ্ছে, দীননাথ জানে ঐ মোটর গাড়ির বাবুরা চায়ের মধ্যে দুধের সর পছন্দ করে না। বুলু কোথায় গেল? জানলা দিয়ে মাঠের বাইরে তাকায়। বুলু কোথাও নেই। গেছে হয়তো কোঁড়ামারির পুকুরে, ওখানে আজ বেড়া জাল ফেলেছে নাকি।

—মাইরি, মাগিটার যা তেজ ছিল না, ওফ্—

—আমি ওর সঙ্গের লোকটাকে বললুম, শালা তোমার গায়ে জল-বিছুটি দিয়ে নাচাবো, যদি আমার সঙ্গে এঁটেল বাজি করতে আস।

—মক্কেল ভেবেছিল, স্ক্রু দিয়ে আমাদের কাছ থেকে আরও টাকা খিঁচে নেবে।

—ভেবেছিল শালা শহরের বাবু, তায় মাতাল, যা ইচ্ছে—

—প্রদীপ, তুই-ই বা কেন তখন ও মেয়েটাকে—

দুঁধ মেশাবার পর দীননাথের মনে হল, তা হলে তো চিনি কম হবে। হাফ চামচ করে চিনি নিয়ে আবার ঠং ঠং করে নাড়তে লাগল। এবার রংটি বেশ ভাল হয়েছে। ইস, কত নিচু দিয়ে একটা এরোপ্লেন গেল, মাটিতে তার ছায়া দেখা গেল পর্যন্ত। আর একটু হলেই বোধহয় পিপুলগাছের মাথায় লাগতো। মুক্তোহাটায় একবার তালগাছে লেগে একটা এরোপ্লেন পড়ে গিয়েছিল না?

—এ কি চা রে? চা না শরবত?

—ও বুড়ো, এতক্ষণ বাদে এই দিলে? ধ্যাৎ!

—কেন বাবু কী দোষ হয়েছে!

—একে তো চিনি গোলা, তার ওপর এক গাদা দুধ।

—দুধ খুব ভাল দিয়েছি, খাঁটি গরুর দুধ।

ওরা তিনজন এবার একসঙ্গে হাসে। দীননাথ ঠিক বুঝতে পারে না, ওদের হাসির কারণটা কী। ওদের একজন অবহেলার সঙ্গে খানিকটা চা মাটিতে ছলাৎ করে ফেলে দিয়ে বলে, এরকম ম্যাড়মেড়ে চা আমার দ্বারা খাওয়া সম্ভব নয়। অন্য একজন এক বড়ো চুমুকে সবটা শেষ করে বলে—এখানে নামাই ভুল হয়েছিল। লোকটার চেহারাটাই দেখছিস না, কিরকম লেধড়ুস মার্কা। চল সুখেন্দু, ওঠ।

যার নাম সুখেন্দু, সে তখনও চায়ের গ্লাস হাতে দিয়ে বসে থাকে। মুখখানা শুকনো। কপালে অল্প ঘামে ধুলো মেশানো। অনেক দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে, গাড়িটা রাস্তার ওপাশে, কালো রঙের মোটর, খানিকটা গাছের ছায়ায়, খানিকটা রোদ্দুর লেগে আয়না হয়ে আছে। চায়ের গ্লাস ধরা সেই যার নাম সুখেন্দু, সে বললো, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমি আর ড্রাইভ করতে পারবো না—এখনো দু-ঘণ্টা।

—দীনুদা, এক কাপ চা খাওয়াবে নাকি গো?

এই কণ্ঠস্বর একজন খোঁড়া লোকের, লোকটির মুখে একরাশ কাঁচা-পাকা দাড়ি, রোগা চেহারার বুড়ো কিন্তু চোখদুটি প্রাণহীন নয়, খোঁড়া পা-টা তুলে বসল কাঠের বেঞ্চির একপাশে। হাতের মগটা ভিক্ষার ভঙ্গিতে তুলে। দীননাথ তার দিকে একবার চোখ মেলে বলল, দেই রোসো একটু।

—বুড়ো, তোমার দোকানে কিছু খাবার আছে?

—হ্যাঁ, আছে নিমকি, দরবেশ, সিঙ্গাড়া।

—ধ্যুৎ, ওগুলো তিনদিনের বাসি।

—আজ্ঞে না, দরবেশটা গতকালের, কিন্তু নিমকি সিঙ্গাড়া আজ সকালের ভাজা।

—না না, ওসব চলবে না। ডিম নেই?

—না। দুধ খান না। খাঁটি দুধ আছে, আমার নিজের গরুর দুধ।

—শুধু শুধু দুধ চুমুক দিয়ে কি খাব? বমি হয়ে যাবে।

—এ শালা গাঁয়ের লোকগুলো দুধ-দুধ করেই গেল। দুধ খেয়েও ওই তো চেহারা।

—দুধ আর তামাক। ডুডুও খাবো তামুকও খাবো—বুঝলি না। আরে দু-ই-ই-উ—

বলতে বলতেই প্রদীপ নামের ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে শিস দেয়। মুহূর্তে এক ঝলক চোখাচোখি হয় তিন বন্ধুতে, তিনজনেরই ঠোঁটের ওপরে সরু সরু গোঁফ, এখন তার নিচে সরু হাসি। ধামা মাথায় করে একটি মেয়ে হেঁটে আসে, ধামা ভর্তি শিম আর বরবটি, বয়স এখনো কুড়ি পেরোয়নি বলেই শরীরটা বুড়িয়ে যায় নি। হাঁটার মধ্যে ঠমক আছে, বুক ও নিতম্ব তালে তালে দোলে, বিশেষত একটা হাত তুলে মাথার ধামাটা ধরা, সুতরাং তার একদিকের স্তন কিছুটা স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়—সেখানে এখনো সন্তানের দাঁত ছোঁয়নি। সেই তিনজনের একজন বাকি সঙ্গীদের নিচু গলায় ইংরেজিতে বলে—যার সচ্ছল বঙ্গানুবাদ—কালকের চেয়েও ভালো মাইরি। স্নেহাংশু, যা না শিম বরবটি দর কর-না গিয়ে।

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে দুই পুরো-ফোটা চোখ মেলে ওদের দিকে তাকায়, কিন্তু থামে না, হাত নামায় না, বুক ঢাকবার চেষ্টা করে না, সেই রকমই ভাষাহীন চোখ মেলে রেখে হাঁটতে থাকে, দূরে চলে যায়।

খোঁড়া লোকটা ততক্ষণে কল্কে বের করেছে ও গুন গুন করে গান শুরু করে :

আকাশেতে আধা চাঁদা ফুটিয়ে উঠেছে,
আমার টুসুর আধা মুখ লুকায়ে রয়েছে,
টুসু বড়ো অভিমানিনী—

গান শুনে তিন যুবা উল্লাস প্রকাশ করে। প্রদীপ বলে, বাঃ, বুড়ো রসিক আছে তো! কী গানের কথাটা? আধা-চাঁদা? বাঃ —জোরে ধরো—

খোঁড়া লোকটি ওদের তিনজনকে গ্রাহ্যও করে না। গান থামিয়ে হাই তোলার ভঙ্গিতে বলে, বাবুরা চঞ্চল হয়েছে গো! দীননাথ এমন ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন শিশুদের বালি দিয়ে ঘর বানানো দেখছে।

—এখানে একদিন থেকে গেলে মন্দ হয় না। সিম্‌স টু বী এ গুড প্লেস ফর প্রসপেকটিং! আরও একদিন ছুটি আছে তো।

—তোমাদের এখানে হোটেল-ফোটেল আছে?

—আজ্ঞে না। সে তিন ক্রোশ দূরে, বাণীচকে।

—তোমার তো উনুনে আঁচ আছে, তুমিই রেঁধে দাও না! এখানে মুর্গি পাওয়া যাবে না? নিয়ে এসো—
—আমার দোকানে মাংস হয় না।
—হয় না, আজ হোক। ভালো পয়সা পাবে—ক্ষিদে পেয়েছে।
—আজ্ঞে, না। আমি ব্রাহ্মণ, ওসব ছুঁই না।
—ব্রাহ্মণ? ওঃ—নে, চল চল; এখানে সুবিধে হবে না।
—এখানে থামাই ভুল হয়েছে, এতক্ষণে আদ্দেক রাস্তা এগিয়ে যেতুম।
—ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে, এখন গাড়ি চালানো—

তিনজনে উঠে দাঁড়ায়, শরীর নিয়ে হেলায়-বেঁকায়, একজন একটা ইঁটের টুকরোয় বুট মারে, অন্যজন অকারণে লাফিয়ে পিপুলগাছের সবচেয়ে নিচের ডালটা ধরার চেষ্টা করে, পারে না। বলে, গাছটায় কতগুলো বক এসে বসেছে দেখেছিস? একটা বন্দুক থাকলে—

খোঁড়া লোকটি জিজ্ঞেস করে, বাবুদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
—তা দিয়ে তোমার দরকার? শুধু ফোঁপরদালালি।

দীননাথ বলল, চা নাও গো সখারাম।—

খোঁড়া লোকটি উঠে এসে হাতের মগটা নিচু করে ধরল, দীননাথ তাতে এমন ভাবে চা ঢেলে দেয়—দেখলেই বোঝা যায়, সেটা দান। দীননাথ তখন যুবক তিনটির দিকেই চেয়ে আছে। একজন গুনে পয়সা ছুঁড়ে দেয় তার দিকে, তারপর সব্বাই গাড়ির কাছে যায়। দরজা খোলে, দুজন একদিক থেকে উঠল, অন্যজন উল্টোদিকে। দুটো দরজাই বন্ধ হয়ে দড়াম শব্দে।

এই শব্দ শুনলেই দীননাথ বার বার চমকে ওঠে। সব মোটর গাড়ির দরজাই বন্ধ হয় এই রকম ভয়ংকর শব্দে। রাত্রে শোবার ঘরে লোকে যেরকম নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে মোটর গাড়ির দরজা কখনো সেরকম বন্ধ হয় না। ও শব্দ শুনলেই মনে হয় যেন রাগ করেছে। দীননাথের কাছে যারাই গাড়ি থামিয়ে চা খেতে আসে নেমে আসার সময় দরজা খোলে বিনা শব্দে, ফিরে যাবার সময় ওই রকম বিকট শব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে যায়। দীননাথের সন্দেহ হয়, সবাই কি রাগ করে চলে যায়? অথচ যাচ্ছে তো হাসতে হাসতে। অদ্ভুত ওই লোকগুলো, বড়ো ছটফটে, বড়ো চঞ্চল, সব সময় বড়ো ব্যস্ত। একটুও চুপ করে বসতে পারে না, অপেক্ষা করতে পারে না, সুস্থির হতে জানে না। গাড়ি চালায় কী জোরে? কোথা থেকে অত তাড়াহুড়া করে আসে, কোথায় এত ফেরার তাড়া? আশ্চর্য মানুষ, ক্ষিদে পেয়েছে বলল, অথচ দুধ রয়েছে—খেতে চায় না। দুধেও নাকি মানুষের অরুচি হয়, দুধেও নাকি বমি আসে। এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে? আহা! মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ছেলেটার।

গাড়ি স্টার্ট নিয়েও ওরা তিনজন কি জন্য অপেক্ষা করে, তারপর যেদিকে ওদের গাড়ি মুখ করা ছিল, সে দিকে না গিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে যে দিক থেকে এসেছিল, কি কারণে সেই দিকেই আবার চলে যায়।

দীননাথ বিড়বিড় করে বলল, দুগ্‌গাপুর যাবে বলেছিল। কিন্তুক যে দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই তো গেল?

সখারাম সামান্য হেসে বললে, তাইতো সবাই যায়। দীনদা, তোমার বুলু কোথায় গেল?
—কী জানি, সে ছোঁড়া সকাল থেকেই গেছে, বোধহয় কোঁড়মারির পুকুরে মাছ ধরছে আজ—
—পুকুর ধার দিয়েই তো এলুম। রহুত মাছ উঠেছে, কাতলা, চেতল, সোনা ট্যাংরা, বাঁশপাতা, দুটো বাঁশপাতা মাছ ভিক্ষে চাইনু তা সুপারিটেনবাবু এমন দাবড়ে উঠলেন গো।
—বুলুকে ওখানে দেখলে না?
—কত ছেলেই তো দাপাদাপি করছে জলে নেমে। নজর করে তো দেখিনি।

পরপর দুটো ভারী ট্রাক জগৎ-সংসার কাঁপিয়ে চলে যায়। পাঞ্জাবি ড্রাইভার, ওরা কখনো দীননাথের দোকানে আসে না, ওরা পাঞ্জাবি হোটেলে গিয়ে থামবে লক্ষ্মীনারায়ণপুরে। তারপরই আসে একটা জিপ গাড়ি, দুই সাহেব, এক মেম—মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, এক টাকমাথা বাঙালিবাবু। কিছুটা অন্যমনস্কভাবে, যেন থামার ইচ্ছে নেই—তবু জিপ গাড়িটা থামে। দীননাথ মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে ভাবে, আহা কি রং, ভগবানের আশীর্বাদ, পদীর মেয়েটার রংও অমনধারা হয়েছিল।

টাকমাথা বাঙালিবাবুটি মাথা বার করে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর, মহেশতলার দিকে চোখ পড়তেই শিকার ধরার মতন উৎফুল্ল মুখে বলে ওঠে, অ্যানাদার শিভ টেম্পল ওভার দেয়ার। ওয়ান্ট টু টেক এ ফোটোগ্রাফ? সবচেয়ে চওড়া সাহেবটি মহেশতলার দিকে কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ক্লান্তভাবে বলে, নো, নট সো ইন্টারেস্টিং। বাঙালিবাবুটি কিছুটা নিরাশ হয়, আবার এদিক ওদিক তাকায়, পুনশ্চ ইংরেজিতে বলে, তাহলে এক কাপ করে চা খেলে কেমন হয়? জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা।

লাল রুমাল পরা মেমসাহেবটি খিল খিল করে হেসে ওঠে। দমকে দমকে হাসি, হাসি যেন থামতেই চায় না। তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে, আবার সেই! আপনাদের একি রীতি, প্রত্যেকবার বলেন, এক কাপ চা, অথচ সব দোকানেই দেখি কাপের বদলে গেলাস। এক গ্লাস চা তবে বলেন না কেন?

অফুলি ফানি, ইজ নট ইট!

বাঙালিবাবুটি ঈষৎ অপ্রতিভ হয়েও মধুর হাস্য করে। বলে, অল রাইট, অল রাইট, বুঝেছি চা খাবেন না। গেয়র্গ, তাহলে এখন কী করা যায়? এখানে থামবে, না যাবে?

—ইয়ু ডিসাইড।

—জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা।

বাঙালিবাবু আবার খোঁজার চোখে এদিক ওদিক তাকায়। যেন কিছু না পেয়ে হাঁক ছাড়ে, ও বুড়ো এদিকে শোনো—।

দীননাথ বা সখারাম কোনো সাড়া দেয় না। তবু দীননাথ অকারণে গামছায় হাত মুছে পাটাতন থেকে নিচে এসে দাঁড়ায়। বাঙালিবাবুটি আবার বলে, ও বুড়ো, তোমাদের এদিকে দেখার কী আছে?

দীননাথ তাকায় সখারামের দিকে। দেখার কী আছে মানে? সখারাম কিন্তু বুঝতে পারে। খুব ঝটপট নিজের খোঁড়া পা-টা লাঠির সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সখারাম তরতর করে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ঝুঁকে হাসিমুখে বলে, অনেক কিছু দেখার আছে, আমি দেখিয়ে দেবো, উই দিকে নদী আছে, নতুন বিরিজ বানিয়েছে, ভারি সুন্দর, আপনার ওদিকে পাড়ার পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে আজ, মহেশতলায় নৈবেদ্য হবে বারোটার সময়, বলেন বাবু, আমি সব দেখাই দুবো, নতুন কলেজ বাড়ি, মিনসিপালিটি আমি সব চিনি, আমাকে আট গণ্ডা পয়সা দেবেন, আমি সব দেখাই দুবো।

—তোমার নাম কি?

—সখারাম, আজ্ঞা।

—তুমি সব দেখাতে পারবে?

মেমসাহেবটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই দরিদ্র লোকটি কি বলছে?

—ও বলছে, ও গাইড হয়ে আমাদের এই গ্রামটা দেখিয়ে দেবে।

মেমসাহেব আবার হাসিতে ভেঙে পড়লেন। নধর মুখে মুক্তো মালার মতন দন্তপঙক্তি, সোনালি চুল দুলছে হাসির তরঙ্গে, চওড়া সাহেবের উরুদেশে চাপড় মেরে তিনি বললেন ডিড ইয়ু হিয়ার ইট, ডার্লিং? এ লেম ম্যান ওয়ান্টস্ টু বী আওয়ার গাইড। ওপস—দিস ইজ ইণ্ডিয়া, আই লাভ ইট।

যে সিড়িঙ্গে সাহেবটি স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল, এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, এবার বলল, লেটস্ গো।

মেমের হাসি শুনে সখারাম বুঝেছিল, তার নিয়োগ হল না। গাড়ির আরো কাছে এসে বলল, বাবু, সাহেবদের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে এনে দিন না, সাহেবদের সিগারেট আমার বড় ভাল লাগে।

—যাঃ হারামজাদা।

—বাবু, চার আনা পয়সা, ফোর আনাস্—

গাড়ি হুশ করে ছেড়ে চলে গেল। সখারাম আবার ফিরে এসে দীননাথকে বলল, আজকাল সাহেবগুলো ভারি চালাক হয়ে গিয়েছে, ভিক্ষা দিতে চায় না। দীননাথ আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছিল, অপস্রিয়মান গাড়িটির দিকে তাকিয়ে তার হাসির রেশ লেগে থাকে, সখারামকে বলে, বাঙালিবাবুটি আমাদের বুড়ো বুড়ো বলছিল কেন. ও নিজেই তো বুড়ো। ওর বয়স কম করেও আমাদের থেকে দশ বছর বেশি।

—ওসব সাহেব-সুবোদের সঙ্গে যারা মেশে—তাদের কথাই আলাদা।

—না হয় আমরাও বুড়ো হলুম, নিজে বুড়ো হয়ে কি কেউ অন্যদের বুড়ো বলে? হারান জ্যেঠা কি ইছাই ঘোষকে কখনো বুড়ো বলে ডাকবে?

—দাদা, সাহেবদের সঙ্গে যারা থাকে, তারা কি তোমার আমার মতন বুড়ো হয়ে যায়? কত রকম অপথ্যি কুপথ্যি খায়। সেই কথায় বলে না, তুমি হইচ গোরাচাঁদ, তাইতো আমি চাঁদবদনি।

—আজকাল আবার নতুন করে এ-পথ দিয়ে এত সাহেব মেম যায় কেন হে? গত দশ-পনেরো বছর তো সাহেব দেখিনি ইদিকে?

—শোননি, বোকারোতে নতুন কারখানা হচ্ছে। খুব বড়ো ইস্টিলের কারখানা।

—ইস্টিল কি?

সখারাম অনেক জানে, শোনে, সে অভিজ্ঞভাবে হাসে, হেসে বলে, ইস্টিলও জানো না। ইস্টিল হলো গে তোমার শক্ত লোহা। কামান বন্দুক বানায়—কারখানায় ধোঁয়ার চোঙা বানায়, রেলের লাইন বানায়—বড়ো শক্ত ওসব বানানো—সাহেবরা ছাড়া কেউ পারে না। দুগগাপুরে দেখে এসো গে—কী প্রকাণ্ড, তুমি তো আর গেলে না কখনো।

দীননাথ বিস্মিত হয়ে বলে, বোকারোতে আবার ইস্টিল বানাবে? এত ইস্টিল লাগে? দুগগাপুরে এত বানালো শুনলুম, আবার বোকারোতে বানাবে, আমাদের হোরদাসপুরেও ওসব বানাবে না তো?

একটি খালি গায়ে ছোকরা মতন লোক এসে বলে, দীনদা, আধসের দুধ দাও তো।

দীননাথ ও সখারাম হঠাৎ চমকিত হয়ে ওঠে। কী ব্যাপার, দীননাথ জিজ্ঞেস করে, তুই দুধ কিনবি? কেন?

—বাবুরা চা খাবে।

—বাবুরা? কোন বাবু?

—গাড়ি করে তিনজন বাবু এল, আমার ঘরে এসে উঠেছেন।

—তোর বাড়িতে বাবুরা কেন? সেই কালো গাড়িতে তিনজন ছোকরা বাবু নাকি?

—বাবুরা গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে থাকার ঘর খুঁজছিলেন। পাঁচ টাকা ভাড়া দেবে বললেন, তাই আমার ঘরে...বললেন চা বানাতে, রান্না করতে।

—গাঁয়ের মধ্যে বাবুদের থাকার জায়গা দিয়ে ভাল করিস নি।

—না গো এ সেই পাঞ্জাবির নয়, এরা আমাদেরই বাংলা কথা বলে।

সখারাম অনেক জানে, শোনে, সে উদাসীন ভাবে বলে, বাংলা কথা বললেই আমাদের লোক হয় না। একটা বিড়ি দাও দীনদা।

একটা বড় গাড়ি থেকে পুরো একটা পরিবার নেমে চা খেতে আসে ও দীননাথ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভিক্ষে পাবার আশায় সখারাম অনায়াসে ভিখারির মতো মুখভঙ্গি করে গান ধরে, ভাবন চোপন আঁটি সাঁটি, এ সংসার ধোঁকার টাটি, তবু তুমি পুতুল খেলা খেলিলে—।

সগুম্ফ মধ্যবয়সি পরিবার-প্রধান যিনি, তিনি মনোযোগ দিয়ে গান শোনেন, গান ফুরোলেই ভিক্ষে দেবার বদলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গৃহিণীকে বলেন, আহা, জায়গাটা কি ঠাণ্ডা গো! মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই সব দেশ গাঁয়ে এসে থাকি। সেই ছেলেবেলায় ছিলুম। তোমার তো আবার পাড়াগাঁ পছন্দ নয়।

গৃহিণী ঝংকার দিয়ে বলেন, বৃষ্টি পড়লেই এমন কাদা প্যাচ প্যাচ করবে। এসব দেশে আবার ঘুঁটে পাওয়া যায় না, দেখলুম, কাঠ দিয়ে উনুন ধরানো, বাবাঃ যা ধোঁয়া!

—তা হলেও তরিতরকারি, মাছ কত টাটকা পাওয়া যাবে ভেবে দ্যাখো! এই পটলা, এই এই দ্যাখো ছেলের কাণ্ড, অত ঝোপঝাড়ে যাচ্ছিস কেন? সাপখোপ থাকতে পারে।

দুপুরে একটু ভাতমুখ না হলে দীননাথের শরীর ম্যাজম্যাজ করে। তাই দুপুরের দিকে সে দোকানের ঝাঁপ ফেলে রাখে। দোকানের পিছনেই দীননাথের শোবার ঘর, দশবছর আগে দুলুরানি স্বর্গে গিয়ে ঘরখানাকে একেবারে খালি করে রেখে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে দীননাথের ইচ্ছে হয়নি। দুলুরানির কনিষ্ঠ ভাই বুলুকে পুষ্যি নিয়ে দীননাথ সুখেই আছে। দুলুরানি যখন মারা যায়, তখনও এ রাস্তা হয় নি, তখন ছিল এখানে তামাকের ক্ষেত আর যেখানে এখন চৌমাথা, সেখানে ছিল একটা ডোবা, দিনদুপুরেও এখানে দাঁড়াস সাপে ব্যাং ধরলে ওঁয়াক ওঁয়াক ডাক শোনা যেত।

কিরকম মন্তরের মতন দেশকাল বদলে গেল, কোথা থেকে ছুটে এল পাকা পিচের রাস্তা, দাঁড়াস সাপের মতন দুটো রাস্তা এসে আড়াআড়ি পড়ে রইলো দীননাথের দাওয়ার সামনে। এ তল্লাটে এত মোটর গাড়ি আর ভিনদেশি মানুষ জন আগে কেউ দেখেছে নাকি? আগে তো শুধু মীর বকসি সাহেবের বাড়ির জেনানারা তামাক ক্ষেতের পাশের কাঁচা রাস্তা ধরে পাল্কি চেপে বাপের বাড়ি যেত। পাকা রাস্তা হবার পর, দুজন দাড়িওয়ালা জোয়ানমদ্দ পাঞ্জাবি এসে দীননাথের বাড়িখানা কিনতে চেয়েছিল, তারা এখানে হোটেল বানাবে। কিন্তু সাতপুরুষের বসতবাটি দীননাথ বেচতে যাবে কোন্ দুঃখে! গাঁয়ের পাঁচজন এসে তাকে উপদেশ দিয়েছিল, দীনু, তুমি নিজেই এখানে একটা দোকান কর, তাতেই তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। সত্যি, বেশ ভালোই দিন চলে যাচ্ছে তার। অবশ্য হোটেল সে করেনি, বামুনের সন্তান হয়ে ভাত বেচতে তার মন রাজি হয়নি। অন্ন বিক্রয় মহাপাপ, পারলে লোককে এমনি খাওয়ানো ভাল। সখারাম তার দোকানের সামনেই ভিক্ষের আস্তানা খুলেছে, দুপুরবেলা সখারামকে রোজই সে নিজের সঙ্গে খেতে ডাকে।

বুলুটার পাত্তা নেই। দুপুরে খেতেও এল না, ছেলেটা হয়েছে বিষম অবাধ্য। ছেলেটার কাজই শুধু দিনরাত টো টো করে ঘোরা। জগু ভট্টাচার্য মারা যাবার পর গাঁয়ের পাঠশালা উঠে গেছে, নতুন ইস্কুল হয়েছে দেড় ক্রোশ দূরে। ওইটুকু ছেলেকে সেখানে পাঠানো যায় না, দীননাথ নিজেই তাকে দুপুরের দিকে বর্ণপরিচয় পড়াবে ভাবে, কিন্তু ছেলের পাত্তা কোথায়? দোকান ফেলে কি সে এখন ওই ছেলের খোঁজে ছুটবে? দোকান ফেলে তার কোথাও যাবার যো আছে!

অবশ্য, বুলুর দোকানে না-থাকাই ভাল বেশিক্ষণ। বুলুর ওপরে ওইসব শহুরে লোকদের চোখ পড়েছে। বুলুর মুখখানি বেশ তকতকে, একেবারে ওর বড় মাসির মতন, এই পৌষে দশ পেরিয়ে এগোরোয় পড়লো, কিন্তু কথার

এখনো আড় ভাঙেনি, দুধকে বলে ডুড, গাড়িকে বলে গালি। বুলু যখন চা দিতে যায়, তখন ওইসব মোটব গাড়ির ব্যস্ত, ছটফটে মানুষরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, বাঃ, বেশ ছোঁড়াটা তো! এই খোকা, কোলকাতায় যাবি আমাদের সঙ্গে? চাকরি করবি? শুনে দীননাথের বুক কেঁপে ওঠে। বালাই ষাট, ও কেন কোলকাতায় যাবে? লোকগুলো তবু ছাড়ে না, দীননাথের আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে, বলে, চল-না ছোঁড়া! দশ টাকা মাইনে পাবি, নতুন জামা-কাপড় পাবি, দুবেলা খেতে পাবি, যাবি? দীননাথ তখন বুলুকে ঘরের মধ্যে ডেকে নেয়, চোখ রাঙিয়ে বলে, চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাক। খবর্দার, তুই খদ্দেরের সামনে যাবিনি। তুই আমার ছেলে, তুই চাকর?

কেন ওরা বুলুকে নিতে চায়? শুক্কুরবারের হাটে ছাগল কেনার মত ওরা বুলুকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তারিফ করার গলায় বলে, বাঃ, বেশ চটপটে ছেলেটা তো। চল-না দুর্গাপুরে আমাদের বাড়িতে কাজ করবি। তার পরই পাশের সঙ্গীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, একটা চাকর না হলে আর চলছে না, বুঝলেন মিঃ চক্রবর্তী, আমার ওয়াইফের আবার বাতের ধাত—

একবার তো বুলুকে ওরা প্রায়ই নিয়েই গিয়েছিল। শহরে বুঝি মানুষের খুব অভাব? ওরা শুধু মানুষ চায়। গাঁ থেকে অনবরত ছেলেছোকরারা শহরে যাচ্ছে, তবু শহরের ক্ষিধে মেটে না। ওরা বুলুকেও চায়। একবার সেই ছোট, নীল-রঙা মোটর গাড়িতে এসেছিল দুজন, স্বামী আর স্ত্রী। নিজেরা চা খেয়ে গাড়ির ইঞ্জিনকেও জল খাওয়াচ্ছিল, কী সুন্দর দেখতে ছিল সেই দুজনকে, স্বামীটির কার্তিকের মতো রূপ, বউটির একমাথা কোঁকড়া চুল, দুধে আলতা রং, গাড়ির মধ্যে এলিয়ে শুয়েছিল। দেখলেই মনে হয় মেয়েটি নরম, মন নরম, কথাগুলো কি মিষ্টি—হেন ইতু পুজোয় জলের টপটপে ফোঁটা পড়ছে। চায়ের কাপ কি আলতোভাবে ঠোঁটে ছোঁয়ালো। সখারামের গান শুনে চার আনা পয়সা দিয়ে দিল। বুলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি খোকা?

বউটিকে দেখে দীননাথের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। আহা, সোনার প্রতিমার মতো রূপ, দেবতার মতন স্বামী পেয়েছে. অন্তরে দয়ামায়া আছে, বেঁচে থাক, সুখে থাক, আরও ভাগ্যিমানী হোক। বউটি বুলুকে দেখিয়ে স্বামীকে বলে, কি মিষ্টি ছেলেটা না? ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না!

স্বামী তখনও ইঞ্জিনকে জল খাওয়াচ্ছিলেন, বললেন, বড়ই বাচ্চা।

—হোক বাচ্চা, ছেলেবেলা থেকে ট্রেনিং দিলে সব শিখতে পারবে। এখনো চুরিটুরি শেখেনি।

—ওইটুকু বাচ্চা থাকতে পারবে না।

—খুব পারবে। তোমরা এখন যে চাকর রেখেছ, তার দাঁত উঁচু। দাঁত উঁচু চাকর চোখের সামনে সব সময় দেখা যায় না। মা গো।

—কিন্তু এইটুকু ছেলে কী কাজ করবে?

—সব পারবে। কী-রে ঘরটর ঝাঁট দিতে পারবি না? খুব পারবে। আস্তে আস্তে আদব-কায়দা সব শিখে নিলে, ভালো সার্ভেন্ট হবে। বুঝলে না, বাড়িতে সাহেব-মেমরা আসে, একটা ভাল চাকর না থাকলে—।

—তুমি সব-কিছু শেখাবে, তারপর অন্য কেউ বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে।

—ইস নিলেই হল নাকি? আয় গাড়িতে উঠে আয়—

দীননাথ সব দেখে শিউরে উঠেছিল। ওরা এক্ষুনি বুলুকে নিয়ে যাবে নাকি? তাড়াতাড়ি দোকান থেকে নেমে এসে সে বলে, ও কোথায় যাবে? ও যাবে না। বউটি ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে বুলুর হাত ধরেছে, স্বামীটি প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে বলে, ও চলুক-না আমাদের সঙ্গে, ভাল থাকবে। বছরে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

—আজ্ঞে ও আমার ছেলে, ও কোথাও যাবে না।

—ছেলে তোমারই থাকছে। চাকরি করে তোমায় টাকা পাঠাবে।

—আজ্ঞে না, ও কোথাও যাবে না।

বউটি সোজা হয়ে উঠে বসে বলে, যাবে না তো এখানে থেকে কী করবে? আমার কাছে গেলে ভাল খেতে পরতে পাবে, চেহারা খুলে যাবে। আয় খোকা—

বউটি বুলুর একহাত ধরে গাড়ির মধ্যে টানার চেষ্টা করে, বুলুর মুখ ভ্যাবা-চ্যাকা, দীননাথ বুলুর আর-এক হাত ধরে বলে, না, মা, আমার ছেলেকে আমি চাকরি করতে পাঠাবো না।

বউটি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, এই বুড়োকে তুমি বুঝিয়ে বল না, ছেলেটাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

স্বামী একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, কিন্তু ওর বাবা না ছাড়লে, তুমি নেবে কি করে? জোর করে তো নেওয়া যায় না।

—ওকে তুমি ছ-মাসের টাকা আগাম দিয়ে দাও না।

—না বাবু, আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন।

—তুমি গাড়িতে স্টার্ট দাওতো! এই চাকরটাকে আমার চাই।

বউটির মুখের রেখা রুক্ষ হয়ে এসেছে, বুলুর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই বুলু গাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, এবং হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। দীননাথও গাড়ির জানলার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কান্না শুরু করে দেয়, বাবু আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন, আমার একমাত্র—

স্বামীটি হঠাৎ আঁৎকে উঠে বলে আরে, কাঁচের বাসনপত্র সব রয়েছে, ভাঙবে, ফ্লাস্কটা,—এই ছোঁড়া, এই—। বুলু তবু হাত-পা ছোঁড়া থামায় না, বউটি তাকে ঠেলে দেয়, স্বামী ঝটপট কাছে এসে বুলুর কান ধরে টেনে গাড়ির বার করে বলে, যা, ভাগ—এরকম বাচ্চা চাকর হাজার গন্ডা পাওয়া যাবে।

বউটি আফশোসের সুরে বলে, গ্রামের লোকদের এইজন্য কিছু হয় না। না খেয়ে মরবে, তবু কাজ করতে চাইবে না। ওরই ভালর জন্য বলছিলাম।

গাড়ি ছেড়ে যেতে দীননাথ বুলুর মাথাটা দু-হাতে চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনো তার বুকের দুরদুরানি থামেনি। জোর করে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। উফ্। সখারাম ঠিকই বলে, যারা বাংলা কথা বলে, তারা সবাই আমাদের আপন লোক নয়। আগে তো এ জেলাটাই ছিল বিহারে। এখন বাংলায় এসেছে, তাতে কী এমন সুখ হয়েছে? উফ্।

বাইরে সাইকেলের আওয়াজ শোনা যায়। ডাক্তারবাবু এসেছেন। দীননাথের তন্দ্রা এসেছিল একটু, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, ডাক্তারবাবু যখন এসেছেন, তখন বেলা তিন প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারবাবু বড় মিষ্টির ভক্ত। ডিসপেনসারি যাবার পথে প্রায়ই দীননাথের দোকানের সামনে সাইকেল থেকে নেমে গজা খেয়ে যান। কোনো-কোনোদিন নিয়ে যান বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যও। চারখানা খেয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে ডাক্তারবাবু তাকে বলেন, তোমার মিষ্টি বানাবার হাত সত্যিই ভালোই হে। শহরে গিয়ে দোকান খুললে পারতে।

ক্রমশ বিকেল হয়ে এলে পিপুল গাছের দীর্ঘ ছায়া পড়ে। বিয়েবাড়ির গোলমালের মতন ছত্রিশ জাতের পাখি এসে গাছটায় ভিড় জমায়, সারারাত ওদের চুপ করে থাকতে হবে তো—তাই বাসায় ফেরার আগে সবাই খুব এক দমকা গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি করে নেয়। এই সময় দীননাথের দোকানের সামনেও একটু ভিড় জমে। মোটর গাড়ির খদ্দের ছাড়াও, গ্রামের কিছু লোক আসে, সবাই অবশ্য চা খায় না—শহরে কাজ করতে গিয়েছিল যারা—সেই, পকেটে সবুজ চিরুনি গোঁজা ছোকরারাই চায়ের অর্ডার দেয়, বাকিরা রাস্তার পাশেই মাটিতে উবু হয়ে বসে গল্পগুজব করে। পরিষ্কার ঝকঝকে রাস্তা, অনেকে তার ওপরেই গিয়ে বসে, গাড়ি এসে পড়লেও কোনো ব্যস্ততা নেই, ধীরে-সুস্থে উঠলেও হয়, গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা গেছে—এটুকু রাস্তায় গাড়ির চেয়ে মানুষেরই বেশি অধিকার।

সখারামের দিনের রোজগার ছা-আনা, বিকেলবেলা গ্রামের লোকদের কাছ থেকে পয়সা পাবার আশা নেই, কিন্তু দুএকটা বিড়ি চেয়ে পায়। বিকেলবেলায় তার প্রতিদিনের প্রিয় গান, এসেছি এ ভবে, কাঁদিয়ে কি হবে—। গান শেষ করে সখারাম বিড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞেস করে, ছোকরা বাবু তিনজন কী করছে হ্যাঁ?

—আর বল না, জ্বালিয়ে খেলে, কে যেন উত্তর দেয়।

—কেন? কেন?

—নোকড়োকে দিয়ে চাকর খাটাচ্ছে। এটা দাও, সেটা দাও। পুকুর ঘাটে গিয়ে গান গাইতে লেগেছে।

—কি চায় কি? আমাদের গাঁয়ে কী আছে কী?

—ওসব কি বুঝবে বল? দিব্যি যাচ্ছিল মোটর গাড়ি করে, দুর্গাপুর মোটে দুঘণ্টার রাস্তা। সেখানে হোটেল আছে, বায়স্কোপ আছে—খাও দাও ফুর্তি কর, তা না গাঁয়ের মধ্যে থাকার কী শখ কে জানে।

দীননাথের কাছে ধমক খেয়ে বুলু কিছুক্ষণ মনমরা হয়ে ছিল। কচু পাতায় করে অনেকগুলো কুচো মাছ এনেছিল—দীননাথ সেগুলো টান মেরে ফেলে দিয়েছে। বুলু এখন চা বানাচ্ছে, দীননাথ পাটাতন থেকে নেমে এসে রাস্তার ধারে গল্পে যোগ দিয়েছে। দীননাথ ভাবল, ছোকরা বাবু তিনজন বড় ক্লান্ত ছিল, ক্ষুধার্ত ছিল তাই বুঝি শহরে যেতে চায় নি, এখানে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিতে চেয়েছে। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম, ওরা কি চুপ করে বসতে জানে? ওদের পায়ের তলায় সর্ষে, ওরা স্থির থাকতে পারে না, সব সময় ছটফট করছে, ঘুরছে দৌড়াচ্ছ, একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতেও জানে না, বসে থাকলেও পা দোলায়। দীননাথ শুনলো, ছোকরা তিনজন পুকুর তোলপাড় করে সাঁতার কেটেছে, ক্যামেরা কাঁধে ঘুরছে জারুলের জঙ্গলে, রতন সাঁপুইয়ের বাগানের ঢুকে এক এক জনায় চারটে করে ডাব খেয়েছে, সাঁওতাল পাড়া থেকে মুরগি কিনে এনে রাঁধিয়েছে নকুড়কে দিয়ে। সারা গ্রাম ওদের জন্য তটস্থ, তিনটি মাত্র ছেলে, কতই বা বয়েস—নকুড়ের সমানই হবে।

একজন বলল, এসব ব্যাপার-স্যাপার দেখতেও খারাপ লাগে হে। ভদ্দর লোকের ছেলে দিন দুপুরে বাগ্দীপাড়া দিয়ে ঘুরছে। লজ্জা-ঘেন্না নেই।

—রসের খোঁজ পেয়েছে গো।

—এই তুই চোপা সামলিয়ে কথা ক। তোর অত কথায় দরকার কী রে?

—এই বলছিলুম? বাগ্দীপাড়ায় রস পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—কেন শহরে কি ও রস নেই? শহরেই তো রসের মচ্ছব। টাকা ফেলো, যা চাও—

—গাঁয়ের মধ্যে এরকম...বলাও যায় না। কিছু, যা সব তেজী ছোকরা।

—কেন বলা যাবে না? গাঁয়ের মধ্যে আমরা বিদেশি ঢুকতে দিব না।

—মনে নেই, সেবার সেই তিনজন মদো মাতাল পাঞ্জাবি এসে কী কাণ্ড!

—তুমি ওদের কি বলবে বাপু? পয়সা দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছে। নোকড়োটা ঘর ভাড়া দিল কেন?

—নোকড়োটাই হারামজাদা। বেশি নোলা হয়েছে। শালাকে এমন ধাতানি দেব—

দীননাথ হাসতে হাসতে বলল, নকুড় যখন আমার কাছ থেকে দুধ কিনতে এলো আমি তো অবাক—হাঁ হয়ে গেছি, বুঝলে? ভাবলুম গে, হল কি? নকুড়েরও দুধ কিনতে আবার শখ হয়েছে! সেবার নামচেবুনের হাটে সবাই একখানা করে লটারির টিকিট কিনেছিলুম মনে আছে? ভাবলুম গে, নকুড়ই লটারি মেরে দিলে নাকি?

সখারাম বলল, সেবার সেই লটারিওলা তোমাদের কি মারই মারলো! চার আনা করে টিকিট কাটিয়ে সটকে গেল, অ্যাঁ।

তিন-চার বছর আগের কথা, পয়সাঠকার শোকটা সকলেরই কমে গেছে। একজন স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গিতে বলল, সেই লটারিওলাটার পেচ্ছাপের অসুখ ছিল, মনে আছে দীনদা? দুটো কথা বলতে-না-বলতেই পেচ্ছাব করতে উঠে যেত? হা-হা-হা। অন্যরাও হাসিতে যোগ দেয়। লটারিওয়ালা লোকটা সত্যিই বড় শেয়ানা ছিল। তবে ভগবান ওকে মেরেছে। ওর ওইরকম পেচ্ছাবের রোগ না থাকলেও শহরেও খুব উন্নতি করতে পারত, গ্রামে গ্রামে ফেরেববাজি করে ঘুরতে হত না—সকলেই এই অভিমত জানায়। কেননা, শহরে তো আর যখন তখন পেচ্ছাব করা যায় না। সেখানে চেপে চুপে থাকতে হয়। একবার কলকাতা শহরে ভবানীপুরে এসে বায়োস্কোপের মধ্যে ঢুকে পেচ্ছাব পাবার পর মহেন্দ্রের কী রকম মুশকিল হয়েছিল, সেই গল্প সে সবিস্তারে শুরু করে।

মাঝদিয়ায় আজ হাট ছিল, হাট থেকে মানুষজন ফিরতে শুরু করেছে, নেমে এসেছে অন্ধকার, অন্ধকারে মানুষজনের মুখ ভালো দেখা যায় না, শুধু বোঝা যায় চলমান স্রোত, কেউ কেউ বিড়ি ধরাবার জন্য ওখানে থামে, বসে থাকা কেউ কেউ হাঁক দিয়ে ও-হাটে তামাক পাতার দর জিজ্ঞেস করে, কেউ কেউ অযাচিত মন্তব্য করে, লাউটা কিনলেন বড় খুড়ো, কিন্তু ও লাউয়ের তো বিচি কালো হয়ে গিয়েছে মনে হয়? মেয়েদের গলার আওয়াজ আলাদাভাবে শুনতে পাওয়া যায়, হাসির শব্দ শুনলেই বোঝা যায়, ওরা খালপাড়ের সাঁওতাল মেয়েরা।

রাত্রের দিকে মোটর গাড়ি কম চলে, তাই সন্ধের পর আর দীননাথ দোকান খোলা রাখে না। তাছাড়া কেরোসিন এখানে বড় আক্রা, বাতি জ্বালার খরচ পোষায় না, রান্নাঘরে সে শুধু রেড়ির তেলের পিদিম জ্বেলে রাখে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এর মধ্যেই বড় বেশি অন্ধকার হয়ে গেল। আড্ডা ছেড়ে দীননাথ রান্নার জোগাড় করতে উঠে পড়ে।

সেই রাতে দীননাথের দোকানের সামনে একটা দুর্ঘটনা হয়। রাত তখন নিশুতি, বুলুকে নিয়ে দীননাথ অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে ছিল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে তার ঘুম ভাঙে, প্রথমে শব্দটা কিসের বুঝতে পারে না। তারপর মানুষের গলার ভয়চকিত শব্দে শুনতে পায়। দীননাথ উঠে পিদিমটা জ্বেলে বাইরে আসে।

রাস্তার পাড়ে একটা কালো ছোটো গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। আর একটু হলেই পিপুলগাছটায় ধাক্কা মারতো। মোড়ের মাথায় একটা লরি দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে, দীননাথের আলো দেখেই লরিটা হঠাৎ আবার স্টার্ট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। দীননাথ মোটর গাড়িটার কাছে এগিয়ে এল। সকালের সেই মোটর গাড়ি, সেই তিনজন ছোকরাবাবু।

একজন বেরিয়ে এসেছে, আরেকজনকে হাত ধরে টেনে বার করার চেষ্টা করছে, গলার আওয়াজ ভীত, তোর কিছু হয়নি তো?

—না, আমি ঠিক আছি। লরিটা পালিয়ে গেল? নম্বর নিয়েছিস?

—না, তোকে এত করে বললুম সাইড দিতে—

—সুখেন্দুকে দ্যাখ।

—সুখেন্দু অজ্ঞান হয়ে গেছে। কোথায় লাগল ভাল করে দ্যাখ।

গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দীননাথ আঁৎকে উঠল। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে, গাড়ির পিছনের সিটেও কে-একজন শুয়ে আছে, সম্ভবত মেয়েমানুষ, মৃত বা অজ্ঞান। দীননাথের শরীর কাঁপছিল, ওদের একজন বলল, এক বালতি জল নিয়ে এস তো। তাড়াতাড়ি—আলোটা রেখে যাও।

নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে কিছু ভাববার আগেই দীননাথ ছুটে যায়, অন্ধকারে ধাক্কা খেতে খেতে ও জলের কলসি ধরে নিয়ে আসে। ততক্ষণ ওরা দুজনে—বাকি দুজনকে নামিয়ে এনেছে। শক্ত পিচের রাস্তায় টান টান করে শোয়ানো হয়েছে ওদের, একজন নারী, একজন পুরুষ। দীননাথ আতঙ্ক মিশ্রিত অস্পষ্ট গলায় বলল, গিরি? নন্দ ধোপার মেয়ে—একে আপনারা কোথায় পেলেন?

—ওর অসুখ হয়েছিল, ওকে আমরা ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

—গিরির অসুখ? আপনারা?

একজন তীব্র কণ্ঠে বলল, আগে সুখেন্দুকে দ্যাখ। এখন ওসব নিয়ে বকবক করার সময় নেই। সুখেন্দুর নাড়িটা দ্যাখ আগে।

সুখেন্দুর সারা বুক রক্তে ভেজা। সে স্টিয়ারিং-এ বসেছিল, আঘাতটা তারই বেশি লেগেছে। স্টিয়ারিং-এর একটা দিক তার বগলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, সেখানটা অনেকটা ছিঁড়ে গেছে, একটা হাত পুরো জখম। বাকি দুজনের গলায় ভয়ের চেয়ে উত্তেজনা বেশি এখন, একজন বলল, গাড়িটা দ্যাখ, আগে গাড়িটা ঠিক করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—তুমি একটু হাত লাগাও না ভাই। গাড়িটা যদি সোজা করা যায়—

দীননাথ এসে ওদের দুজনের সঙ্গে হাত লাগাল। খুব বেশি চেষ্টা করতে হল না, গাড়িটা সহজেই সোজা করা গেল।

—ইঞ্জিনটা দ্যাখ একেবারে গেছে কিনা।

—স্টার্ট নিচ্ছে না। বনেটটা খোল।

—সেল্‌ফটা গেছে বোধ হয়। হ্যাণ্ডেল মেরে দেখবো?

—ওদের কি করা যায়? এরকম ভাবে রাস্তায় শুয়েই রাখা ঠিক না। অন্য গাড়ি এলে—

—প্রদীপ তুই দ্যাখ না, ওদের যদি বুড়োর দোকানে শুইয়ে রাখা যায়।

—তুই গাড়িটা ঠিক কর। গাড়ি ঠিক না হলে মহা বিপদ হবে।

প্রদীপ দীননাথের দিকে ফিরে বলল, ভাই, তোমার দোকানে ওদের একটু শুইয়ে রাখবো? এর রক্তটা বন্ধ করতে হবে—

তেমন হাওয়া নেই, তাই দীননাথের আলোটা এখনো নেবেনি। ওরা একজন টর্চ ও প্রদীপের মিশিত আলোয় শায়িত মূর্তি দুটোকে বীভৎস দেখায়। দীননাথের বুকের মধ্যে কাঁপ'তে থাকে। তবু সে বিনা বাক্যব্যয়ে সাহায্য করে ওদের তুলতে।

প্রথমে সুখেন্দুকে রেখে আসা হয়। ফিরে এসে প্রদীপ বলে, মেয়েটা পেল্লায় ভারী মাইরি, ওকে কী করবো। গাড়ির অন্ধকার থেকে তীব্র কণ্ঠে জবাব আসে। ভিতরে নিয়ে যা না। তখনই বলেছিলাম, এসব ঝঞ্ঝাটে দরকার নেই। এখানে দেরি করছিস কেন? এক্ষুনি অন্য গাড়ি আসবে—মেয়েটাকেও ধরাধরি করে আনা হয়। প্রদীপ নামে ছেলেটি ফরফর করে সুখেন্দুর জামাটা ছিঁড়ে ফেলে রক্ত মুছতে থাকে। মোছা যায় না, অনবরত গলগল করে বেরোয় রক্তের ধারা, অবশ্য বোঝা যায় যে ক্ষতটা খুব বড় নয়। প্রদীপ মুখ তুলে বলে, তোমার কাছে তুলো-টুলো আছে?

—তুলো? বালিশ আর তোষকে তুলো আছে, তাছাড়া এমনি তুলো আর কে রাখে? দীননাথ বলল, বালিশ ছিঁড়ে দেব?

—নাঃ, ও ময়লা তুলো। প্রদীপ নিজের জামাটাও খুলে ফেলে, জামা দিয়ে রক্ত মুছে ব্যাণ্ডেজের মতন বাঁধার চেষ্টা করে। দীননাথ বলল, ডাক্তারবাবুকে খবর দেবো? ক্রোশ খানেকের মধ্যেই ওনার বাড়ি।

—না।

—নন্দ ধোপাকে খবর দেব?

—না। সকালের আগে কিছু না। তুমি চুপ করে বসে থাকো।

দীননাথ চুপ করেই চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। বুলু না জেগে উঠলেই হয়, তবে ওর যা ঘুম, জাগবে না বোধ হয়। এই মিসমিসে অন্ধকার রাত্রে তার ঘরে একজন রক্তাক্ত পুরুষ, একজন অজ্ঞান মেয়েমানুষ—ওদের দুজনের জন্যই দীননাথের খুব দুঃখ হয়—সে দুঃখের কারণও সে বুঝতে পারে না, এবং সব মিলিয়ে একটা দারুণ অস্বস্তিকর ভয়ও তাকে জুড়ে থাকে। কী করবে, কিছুই বুঝতে না পেরে দীননাথ চুপ করে বসে থাকে।

প্রদীপ দ্রুত চটপটে হাতে সুখেন্দুর রক্ত মুছে দিয়ে নিজের জামা ব্যাণ্ডেজের মতন বেঁধে দেয়। সে জামাটাও দেখতে দেখতে রক্তে ভিজে ওঠে। মেয়েটার মুখেও সে অনবরত জলের ঝাপটা দিতে থাকে। মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছে, মুখের পাশে ফেনা, খোলা বুকে বমির দাগ, কোমরের কষি আলগা। তাকানো যায় না। এমন ভার ভরন্ত স্বাস্থ্য মেয়েটার, এখন কেমন নেতিয়ে পড়ে আছে। অত জলের ঝাপটাতেও চোখ খুলল না।

প্রদীপ একবার বাইরে গিয়ে গাড়িটার কাছে ঘুরে এল। বাইরে একজন তখনো গাড়িটাকে চালু করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রদীপ ফিরে এসে বলল, গাড়িটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কাছে দুধ আছে? গরম দুধ একটু পেলে ভাল হতো—

এক কড়াই দুধ ছিল সকালে, তখন খেতে চায়নি। দুধ খেলে বমি আসে বলছিল। এখন তো দুধ নেই, বাকি দুধটা সন্ধেবেলা সে দই পেতে রেখেছে। বাসি দুধ সে রাখে না। সে ঘাড় নাড়লো।

প্রদীপ তখন কাঁধের একটা ভঙ্গি করে নিজেও এক কোণে বসে পড়ল, তারও কনুয়ের কাছটা অনেকটা ছড়ে গেছে, সে দিকে হুঁশ নেই। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালো। কিছুক্ষণ চুপচাপ। আস্তে আস্তে দীননাথ নিজেকে ফিরে পেয়ে একবার কাশলো। তারপর ধীরস্বরে বললে, এ মেয়েটাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন?

—আমরা কোথাও নিয়ে যাইনি। নিজেই আমাদের সঙ্গে শহরে যাবে বলে বায়না ধরেছিল। নিজে থেকে গাড়িতে উঠে বসেছিল।

—অজ্ঞান হল কী করে?

—নিজেই অজ্ঞান হয়েছে।

—নিজে নিজে কি আর অজ্ঞান হয়? ওর অমন স্বাস্থ্য, আগে কখনোও অজ্ঞান হয় নি—

—জেরা কর না, চুপচাপ বসে থাক।

দীননাথ অবাক হয়ে যায়। তারই ঘরে বসে তাকে কীরকম ধমকে কথা বলছে। কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে, ফর্সা রঙ, কুঁচকোন চুল, টিকালো নাক, কতই বা বয়স, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, অথচ গলায় কী তেজ। বিশ্বসংসারে যেন কারুকে গ্রাহ্য নেই, যা খুশি তাই করতে পারে।

দীননাথ তবু ভয় পায় না। আস্তে আস্তে বলে, বাবু, আমরা গাঁয়ের মধ্যে নিরিবিলিতে থাকি, আঁপনারা, বিদেশি লোকেরা এসে কেন আমাদের এমন অনর্থক কষ্ট দেন?

—বিদেশি লোক? আমরা বিদেশি কে বললে তোমায়? এটা বাংলাদেশ না?

—অন্য জায়গার লোক তো বটে। গ্রামের তো না। তবু গ্রামের মধ্যে এসে, আপনারা—

—গ্রাম কি তোমার কেনা নাকি? অন্য কেউ আসতে পারে না?

—না, সে কথা না। আপনারা তো শহর-বাজারে থাকেন, সেখানেই যা ইচ্ছে তাই পান, তবু কেন আমাদের গাঁয়ের সুখ-শান্তি নষ্ট করতে আসেন?

প্রদীপ খানিকটা ক্লান্তভাবে হাসে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে তারপর বলে, কেন আসি শুনবে? শুনেই বা তোমার লাভ কি? কিছু তো বুঝবে না। তবু বলি শোনো, আমরা তো শহরে কলকারখানার মধ্যে থাকি, কলকারখানার বানানো জিনিস খাই, তাই মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগলে ছুটি কাটাতে গ্রামে-ট্রামে আসি—যা কলকারখানায় বানানো নয়—সেই সেই-সব স্বাভাবিক জিনিস ভোগ করতে। বুঝলে কিছু?

—আজ্ঞা না।

—আমরা শহরে থাকি, আমরা তো আর তোমাদের মতন শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাই না। আমাদের খাটতে হয়, আমরা কাজ করি, মাথা খাটাই, সেসব শুধু আমাদের নিজেদের জন্যে তো নয়—তোমরাও ফল পাচ্ছো—এই যে তোমাদের গ্রামে ইলেকট্রিক আসছে, রাস্তা বানানো হচ্ছে, এসব আমরাই তো বানাচ্ছি, শহরের মানুষরা—এজন্য তোমাদের কিছু দাম দিতে হবে না? তাই মাঝে মাঝে আমরা এসে একটু-আধটু দম নিয়ে যাই। কাঁচা জিনিস খেতে মাঝে মাঝে আমাদের ইচ্ছে হয়, হাত দিয়ে ছুঁতে, ভাঙতে ইচ্ছে হয়। এবার বুঝলে?

—আজ্ঞা না। আমি শুধু বুঝি, গাঁয়ের মানুষ নিজেদের ধম্ম-কম্ম নিয়ে আছে—সেখানে আপনারা আপনাদের অধম্ম নিয়ে আসেন। আপনারা বাপের কাছ থেকে ছেলে, মায়ের কাছ থেকে মেয়ে কেড়ে নিতে চান। এসব কি ভাল?

—ও-ফ্। গাঁয়ের সব ধর্ম-কর্ম করে, আর শহরে বুঝি সব অধর্ম? ওসব ভণ্ডামি আমি ঢের জানি। গাঁয়ে তোমাদের ঘরে ঘরে বজ্জাতি—তা আমরা জানি না ভেবেছ?

—বাবু, আমি নিজের উপার্জনে খাই, কারুকে ঠকাই না, আমি ওসব বজ্জাতির খবর জানি না। আমরা আধপেটা একপেটা খেয়েও সুখে শান্তিতে আছি, শুধু মাঝে মাঝে আপনারা এসে অশান্তি ছড়িয়ে যান। নন্দ ধোপা কি আপনাদের কাছে কোনো দোষ করেছিল? আপনারা ভাল খান-দান, ভাল পরেন, আপনারা গাড়ি চড়েন, তবু—

—গাড়ি চড়বো না? আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছি—আর তোমরা গাছতলায় বসে দিনরাত গুলতানি করছো—আমি গাড়ি চড়বো না তো কি তুমি চড়বে? তোমাদের তো কাজের মধ্যে একমাত্র কাজ ধান চাষ করা। তাও তো কিস্যু পার না আজকাল। আবার অত কথা কিসের? আমরা গাড়ি চড়লেই তোমাদের গা জ্বালা করে? কেন তোমাদেরও তো বাসে চড়াচ্ছি। এ রাস্তা দিয়ে বাস যায় না?

—না বাবু, আমি গাড়ি চড়তে চাই না। আমি খালি ভাবছিলমু যে ওই মেয়েটার ধম্ম—

—ধর্ম? জানো, তোমাদেরই গাঁয়ের একজন লোক এসে বলেছে, আমাদের মেয়েছেলে চাই কি না। তোমাদেরই গাঁয়ের দু-তিনজন মেয়ে—

—একটা ন্যাকড়া আছে? বাইরে যে ছিল, সে হঠাৎ ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করে। এবং ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে কি একটা তুলে নেয়। দীননাথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ওটা ন্যাকড়া নয়। ওটা আমার গামছা।

—ঠিক আছে, এতেই আমার হবে। এই বলে সে বেরিয়ে যায়। দীননাথ বাধা দিতে পারে না, কারণ সেই মুহূর্তেই সুখেন্দু চোখ মেলে ধড়ফড় করে উঠে বসতে গিয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে। প্রদীপ তার কাছে গিয়ে চেপে ধরে বলে, উঠিস না, উঠিস না।

সুখেন্দু চোখ দুটো বড় বড় করে নিজের শরীর ও রক্তে-ভেজা জামার দিকে চায়। তারপর ফিসফিস করে বলে, খুব বেশি লেগেছে নাকি রে? হাতখানা ঠিক আছে?

—বেশি কিছু হয়নি, সামান্য একটু কেটে গেছে।

—ঠিক আছে, আমায় ছেড়ে দে, আমার বেশি ব্যথা করছে না। সুখেন্দু আস্তে আস্তে উঠে বসে, তারপর পাশে গিরির দিকে চোখ পড়তেই বলে, এ মাগিকে এখনো রেখেছিস কেন? আপদ বিদায় করিসনি?

—অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—অজ্ঞান হয়ে গেছে তো আমাদের কি? বিদায় কর।

কী অসীম মানসিক শক্তি তার, সুখেন্দুর একটা হাত এরকম জখম, তবু সে বাঁ হাতটা দিয়ে গিরিকে একটা ধাক্কা দেয়। গিরি একদিকে গড়িয়ে পড়েই চোখ মেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে উদভ্রান্তের মতন তাকাতে থাকে। দীননাথের দিকে চোখ পড়তেই সে অসহায়ের মতন কেঁপে কেঁপে ওঠে এবং ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, আমায় জোর করে ধরে নে যাচ্ছিল গো—

প্রদীপ বক্র হাস্য হেসে বলে, মিথ্যে কথা বলবি তো এক থাপ্পড় কষাবো।

—আমায় জোর করে ধরে নে যাচ্ছিল গো।

—ইঃ, জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল? বিলিতি খাবার শখ। আমাদের আধ বোতল ব্রাণ্ডি শেষ করে দিয়ে এখন আবার—

গিরি তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, আমায় মিছিমিছি লোভ দেখিয়ে—উ-হু-হুঁ আমায় তিনবাবু—

বুলু কখন জেগে উঠেছে। এই সব কাণ্ড দেখে সে-ও ভ্যাঁ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। দীননাথ বুলুর মাথাটা বুকে চেপে হাত বুলোতে থাকে। এসব কী তার অদৃষ্টে ছিল? সে কী করবে, কী বলবে কিছুই ভেবে পায় না আর, তারও কান্না আসে, সে মুখ নিচু করে বলে, বুলু, চুপ কর, ভয় নেই।

সুখেন্দু বলে, উঃ—অসহ্য এখানে থাকা। চল বাইরে যাই।

—তুই উঠতে পারবি?

—পারবো। গাড়িটার কী অবস্থা?

—স্নেহাংশু দেখছে—কাল তোদের ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেকশন হবে, তুই কী করবি।

—আগে তো বেঁচে পৌঁছোই।

এমন সময় স্নেহাংশু ঘরে ঢুকে বলে, চল, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। অত্যন্ত পরিশ্রমে স্নেহাংশুর মুখ কঠোর, সে আর এক মুহূর্তও দেরি করতে চায় না। সে বলল, নে, সুখেন্দুকে ধরে তোল। মেয়েটারও জ্ঞান ফিরেছে দেখছি। ওকে নিয়ে কী করবি? সুখেন্দু তীব্রভাবে বলে, ওর আবার কি হবে, পড়ে থাকবে এখানে। নে, আমাকে ধর।

সুখেন্দুকে দু-দিক থেকে ধরে ওরা দাঁড় করায়। প্রদীপ দীননাথের দিকে তাকিয়ে বলে, শোন বুড়ো, এখানে চুপচাপ বসে থাক। আমরা যতক্ষণ না চলে যাচ্ছি, চুপচাপ বসে থাকবে। যদি লোকজন ডাকার চেষ্টা করো, তোমার দোকানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যাব।

দীননাথ বাহুতে চোখ মুছে বলে, না, আপনারা নিরাপদে গিয়ে পৌঁছোন, ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করি।

ওরা তিনজন ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়। একটু বাদেই প্রদীপ আবার ফিরে এসে দীননাথের দিকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলে, এই নাও।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিয়ে বলে, এ আমার টাকা, এ আমার টাকা।

মনীষার দুই প্রেমিক

আমি মনীষাকে ভালবাসি। মনীষা আমাকে ভালবাসে না। মনীষা অমলকে ভালবাসে।

বাপারটা এরকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এখন বিশাল সন্ধেবেলা দিকচিহ্নহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা, সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে—আমি তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক, একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি। অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড় হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর! অমল, তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করব।

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী সুন্দর দেখায়! দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারি পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানলার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুল উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটর গাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু একথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ নিতে হবে তো। সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকূট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রি জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচবো এমন আশা ছিল না। তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি, এসব আমি কি ভাবছি! আমি কি গর্ব করব নাকি এ নিয়ে? সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না। ও তো কত হেঁজি পেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ, অমল নীলিমার বুক চিরে রুপালি বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বুল কিংবা সাও পাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে।

সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়ল সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। আমি ছুটে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলো, গাড়ি-ঘোড়া অচল হল, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দুজন সখীর সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয়নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে প্রথম দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন আসুন চলে আসুন। আজ বৃষ্টিতে ভিজব।

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হল হাঁটু গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখী দুজন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝ রাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি। সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দুজনে। মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়ল। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা অন্য কারুর মত নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়ালছানা—এসবের মধ্য থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কি করে? বেড়াতে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনীষার কাছে সবকিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে

বলে, আসুন। যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরবো কিন্তু।

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নিচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফর্সা পেট আমার চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি, দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ, যা ভাল লাগছে আজ। এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল। বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভাল লাগে তোমার?

—ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার কক্ষনো ঠাণ্ডা লাগে না।

—তুমি তাকাও তো আমার দিকে। তোমাকে ভাল করে দেখি।

—ভাল করে দেখবেন? আমি পাগল না, আপনি পাগল?

—তা হলে দুজনেই।

—মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজি নাই। এ কথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। নির্নিমেষে আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নিচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইটালির শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়ানো ডানার মতো ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। একথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রঙ ভেদ করে জেগে ওঠা রুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে হাত দিতে ইচ্ছে করেনি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশায় আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক-এক সময় হয় এ রকম, তখন সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের পাশে আমার লোমে ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কী করে ওকে আরও খুশি করবো—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হল, নইলে আমি বোধ হয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বলল, দেখুন, দেখুন, কি রকম ঢেউ দিচ্ছে, ঠিক নদীর মতন।

—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরির দুখানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

—কেন তুমি রিসার্চ করবে না?

—ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

—তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

চোখে চোখ রাখল, একটু হাসল, হাসি মিশিয়েই বলল, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন? আপনি যা অহংকারী।

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ির পরে থাকে। আমি নয়, সত্যিকারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ওই রকম অহংকার দেখতে ভালবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে, নটা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নিচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধপধপে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাত গোটানো, পথের দু-পাশে না তাকিয়ে অমল হাজরা মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষজন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয়নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়।

একদিনে নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লী থেকে কয়েক দিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি—সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কিরকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হাল্কা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগাননি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাব না। ওই বিশালা বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দুজনকে দেখছিলাম—আমরা দুজনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দুজনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়বো পড়বো—অথচ খসে নি, কি এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনো অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, কী—মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখবো।

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজ-পোশাক, কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হুঁ।

—কোথায়?

—ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে পৌঁছলো। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হল—সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বলল, কি ভাল আছেন?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বলল, আরেঃ আপনি? আপনি ব্যাংকক গিয়েছিলেন না? কবে ফিরলেন?

—কাল সন্ধেবেলা।

—পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন?

অমল সংযতভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?

—একটু লেক মার্কেটের কাছে যাব।

—চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায়নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকিনি কেন? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেত—অমলের সঙ্গে যেত না—অমলের সঙ্গে ওর তখনও তেমন গাঢ় চেনা ছিল না। কিন্তু আমি ডাকিনি কেন? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনো পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমলকে সরে যেতে হবে না। ওদের দুজনকে বড় সুন্দর মানায়। বুকটা টনটন করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, ধ্যাৎ। চেহারাই কি সব নাকি? আমি একটু বেশি রোগা—কিন্তু রোগা মানুষরা কি ভালবাসার যোগ্য হতে পারে না?

জি. এম. আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করনি, সন্ধেগুলো কাটাও কী করে?

অফিসে জি. এম.-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, আর করব, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

—সে কি হে? আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়াংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট।

—স্যার, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—শোনো, দিল্লি অফিস থেকে মিঃ চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা আজ গ্র্যান্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকবে। মিঃ চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়ে ওকে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

—নাইট লাইফ মানে?

—সে আমি কি বলবো? তোমরা ইয়ংম্যান, যা ভাল বুঝবে। চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে।

—স্যার, আমি পারবো না। অন্য কাউকে এ ভার দিন।

—সে কি? পারবে না কি? চোপরার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফট পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

—না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবি তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

—পারবে না? ঠিক আছে। দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজি উচ্চারণটা ভাল নয়—

সন্ধের পর স্বয়ং জি. এম. গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে—সে আসতে পারবে না। নাও নাও, তাড়াতাড়ি আটটায় ডিনার।

—কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভাল লাগে না। ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাব না কিন্তু।

—বাজে বোকো না। তোমারই ভালর জন্য বলছি—চোপরাকে খুশি করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেব—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু...

—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি পারব না।

—শুধু শুধু দেরি করছ। চটপট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই। চাকরি করতে গেলে বড় কর্তাদের খুশি করতেই হয়—তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের...

জি. এম.-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পাল্টে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হল। জি. এম. আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ওঁর সঙ্গে নিচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি। সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হল, আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে ওঠার বদলে আরও নিচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাটকা তৈরি ঘিয়ের মত মনীষার গায়ের রঙ, ঠোঁট দুটি একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজিতে বলে 'লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেড়াতে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে। ওই যে বললুম, মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীতে সে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এ পৃথিবীর কোনো কিছুই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারো দিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি, কিংবা দেখা হয়নি, কিংবা মনীষা আমাকে খুঁজে পায়নি। তারপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভাল লাগে।

সেদিন চোখে পড়লো ওর পা-দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে, কী সুন্দর ওই পা-দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধূলি-মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না। মনে হল, মনীষার ওই পা-দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাব।

মনীষা হাসলো, অবাক হল এবং অভিমানের সুরে বলল, যান, আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

—কেন? আমি কী দোষ করেছি?

—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না।

—মণি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মণি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? আমার সঙ্গে চল—

—এখন? কটা বাজে? ওমা, সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে।

—একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তা হলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারল না, একটা অন্যমনস্কভাবে বলল, আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না—তুমি আমার সঙ্গে চল। দেখাই যাকনা এ কথা বলার কি ফল হয়! কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না। আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য। কিন্তু অমল তুমি মনে কর না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছ। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমলই বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছে—আমার কল্পনা করতে ভাল লাগে—সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়া, ওরা দুজন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইস্তাম্বুলের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে—ইস ওদের দুজনকে কী সুন্দর মানায়—শিল্প এরই নাম।

আমার হাত টনটন করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরুবে, আমি আর পারছি না...। না—। আমার ছোট ভাই টাপু ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে, ন্যাড়া ছাদে, পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিশ ধরে ফেলে ঝুলছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না। চোদ্দ বছরের টাপু এত ভারি, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না, আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে—টাপু একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে আর পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে, আমিও একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি—এবার দুজনেই পড়বো—তিনতলা থেকে শান বাঁধানো ফুটপাথে—প্রাণভয়ে একবার আমার ইচ্ছে হল টাপুকে ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব টাপুকে—এখান থেকে পড়লে টাপুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—টাপু আমাকে টানছে, জলে-ডোবা মানুষকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই অনেক সময় যেমন মরে—আমিও পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলুম—সেই সময় পিছন থেকে কারা যেন তিন-চারজন আমাকে ধরল—টাপুকেও টেনে তুলল। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে মা টাপুকে বুকে চেপে ধরলেন। সেই তিন-চারজন আমার পিঠ চাপড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল। কিন্তু ওরা জানে না, আমি এক সময় টাপুকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। টাপুকে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এমন কিছু অস্বাভাবিক কি? জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বেশিরভাগ মানুষই শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। টাপুকে মেরে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বেশিরভাগ মানুষই তাই করতো। আমি বেশিরভাগ মানুষের দলে। এই সব স্বার্থপর, বর্ণকানা, অন্ধ মানুষ কেউ প্রেমিক হতে পারে না। নাঃ, আমি মনীষার যোগ্য নই সত্যিই। অমল—মনীষাকে তুমিই নাও। আমি বিনা দ্বিধায় সরে দাঁড়াচ্ছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করব না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোন করলাম। আগে কখনো ওকে এমনভাবে ডাকিনি! মণি, তুমি আগামী কাল ঠিক ছটার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসতেই হবে। অন্য হাজার কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দাও।

মনীষা খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, আসব আসব, ঠিক আসব, কেন কি ব্যাপার?

—দেখা হলে বলব, কালই দেখা হওয়া চাই, ঠিক আসবে, উইদাউট ফেইল। কথা দাও আমাকে।

মনীষার গলা কি একটু কেঁপে গেল? একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবল কিছু? দু-তিন মুহূর্ত বাদে মনীষা বলল, বলছি তো যাব। আপনি একটা পাগল।

কাল এল। অফিস যাইনি। অফিসে গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি। আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকেই যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠল অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসাবে এটা অসার্থক। আমি সরে গেলাম সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এল সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি। অমল, মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম।

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দুজনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রীক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত। প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা? তাকে দেখলে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে অমলকে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশি সিনেমা দেখি। সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেই রকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা আন্দাজ চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কি সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হল কি করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু মদ খেয়েছে, তা খাক না, পাইলটের কাজ করে—ওকে কত দেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভাল ছিল। অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হল কি করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বড়লোকের ছেলেদের বখানই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বড় বড় হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেইসব ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে, আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলুম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়াজড়ি করে দুজনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠল। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে আমি হাজির হলুম। দরজা খুলল অবনীশের শয়তানী কাজের যোগ্য সঙ্গিনী। তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে আমি অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি. সি. ডি. ডি. আমার মেসোমশাই হন। আমি আপনার এই বেআইনী জুয়ার আড্ডা এক্ষুনি ধরিয়ে দিতে পারি। লোক্যাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়াতে পারবেন না। কিন্তু সেসব আমি করব না একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। তার ছায়াও মাড়াবেন না। সে এখানে আসতে চাইলেও তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা, অমল রায়কে কোনোদিন আমি এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজি? অবনীশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আচ্ছা রাজি। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয়?

—আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনো বাজার করতে যাই না। দু-একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হল। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হল। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমলও নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না। বাজার করা টাইপই ও নয়। যে-লোক এক-একদিন এক-এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে গিয়ে খুব ঠকছে ও বিষয়ে আমি নিশ্চিত, এবং বেশ মজা লাগল। অলক্ষ্যে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচ প্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কী একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। অমল একবার তারকারিওয়ালাকে বলল, এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেব। অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি-ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না। তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক। যাক, হয়তো অমল বেশি রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে দাঁড়ালুম, মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবে না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকাল, চেনার ভাব দেখাল না, কিন্তু আমাকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বলল, বুঝলেন তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম, তরকারিওয়ালারও একটা আত্মসম্মান আছে, সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এসব ছোটখাট ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য, অমলের তো এসবের অভ্যেস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইস তরকারিওয়ালা উল্টে যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসত।

অন্ধ ভিখারিকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা ঝুঁকে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশি আছে যে অমলের ছোটখাট দোষ তাতে সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিন আরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারিনি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি—অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখ। তোমাকে নিচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হল দুপুরবেলা। মিঃ চোপরা দিল্লি ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফ্‌ট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রামবাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়ল। একটা মোটর গাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই যাবো ভাবছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কীরকম সন্দেহ হল—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ওই তো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মাথা দেখা যাচ্ছে। পাইলটের পোশাকে—অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কী সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তাহলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোককে রোককে। ঘ্যাচ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, অমল, অমল।

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কী যেন বলল। অমলের টাইয়ের গিঁট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটি যুবতি বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতিটির সাজপোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এয়ার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়েনি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পড়ার মতনই উত্তেজিত। অমল চেঁচিয়ে বলল, যার ছাগল সে সামলাতে পারেনি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরাবার জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বলল, অত তেজ দেখাবেন না, মোটর গাড়ি আছে বলে ভারি ফুটানি...দে না শালাকে দু-ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেড়ায়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না-না, আমাদের আর-একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটার দাম যদি দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেননা, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তক্ষুনি বার করে দিতে পারতুম। কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয় অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করব। আমাকে না-চেনার ভান করলে কি হয়, অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাড়ার লোক হিসেব চেনে, অমল রুক্ষ গলায় বলল, কেন, দাম দেব, কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

—ইঃ, উনি হর্ন দিয়েছেন। ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন!

—ক্যারদানি কত। পাশে মেয়েছেলে নিয়ে, দিন-রাত্তির জ্ঞান নেই।

আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না-না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের। যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই। কত দাম? ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বলল, একশো টাকা।

অমল বলল, একশো টাকা? একটা ছাগলের দাম একশো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলেছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসতের হাটে বেচলে—

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বলল, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। তারা ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে। শুরু হয়েছে গালাগালি। এসব সময়ে কি সাংঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বলল, ঠিক আছে, কত টাকা দিতে হবে? কত টাকা? আমি বললুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের দু-তিনজন লোক একসঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর ধর।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না—একদল লোক হই হই করে ছুটে গেলো সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরল। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি-দুবার শুধু অমল অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না। এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করবো কী করে? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না! তাহলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।

মহাপৃথিবী

প্রত্যাশা কম, তাই ওর দুঃখও কম। কিন্তু আজকাল সুবলকে খুশি-খুশিই দেখায়। বাজার যা আক্রা তাতে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়, গুঁড়োগাড়া মাছ ছাড়া বড় বড় মাছ যেন সব পালিয়েছে এ-তল্লাট থেকে, জাল দু-খানা ঘরের কোণে পড়ে পচে—পাইকারদের কাছ থেকে কিনে এনে বাজারে বেচতে হয় তাকে—তিন টাকা সাড়ে-তিন টাকার বেশি মুনাফা তুলতে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যায়—তবু এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বুকখানা সব সময় ছমছম করে সুবলের। সাড়ে চার হাজার টাকা! এই তার বুড়ো আঙুলখানা কালিতে লেপ্টে কাগজের উপর একখানা ছাপ দিলেই সে সাড়ে চার হাজার টাকা পেতে পারে। সুবল আজকাল মাঝে-মাঝেই তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। যেন নিজেকেই সে কলা দেখাচ্ছে। সাড়ে চার হাজার টাকা তাদের বংশে কেউ বাপের জন্মে দেখেছে একসঙ্গে? সেই বলে না, ঠোঁট ঢাকতে পেছন আলগা—এই তো হল গিয়ে অবস্থা।

আড়াইশো গ্রামটাক বেলে মাছ তখনও পড়েছিল, আস্তে আস্তে হলদেটে হয়ে আসছে মাছগুলো, উড়ে বসছে নীল ডুমো মাছি—দর কমাতে কমাতে সুবল দু-টাকা চার আনা কিলোয় নেমেছে—তবু ও-কটা আর কাটছে না—একটি বুড়ো ঘুরঘুর করছে অনেকক্ষণ থেকে—তার মতলব সুবল যদি শেষ পর্যন্ত দেড়টাকায় নামে; হঠাৎ দিলদরিয়া ভাবে সুবল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ও-কটা বেলে মাছ আর বেচবে না, বাড়ি নিয়ে যাবে। নিতাই অনেকক্ষণ থেকে ঝাড়া হাত-পা হয়ে বসে আছে, ওর সঙ্গেই বাড়ি ফিরবে। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে সুবল বলল, চল, নিতাই, চল। বসে বসে কোমর টাটিয়ে গেল। বিড়ি আছে নাকি?

নিতাই বলল, না, দাদা, কিনতে হবে। চল, এক কিলো চালও কিনে নেব।

—এ-বাজারে চাল কত করে যাচ্ছে আজ?

—দু-টাকা তিরিশ, তাও ভাঙা—

—তবে চ, বাগুইআটির বাজারে অন্তত পনেরো নয়া সস্তা হবে।

নিতাই একটু শৌখিন, সে জামা পরে। প্লাস্টিকের ব্যাগে টাকা রাখে। সুবল ওসব ধার ধারে না, লাল কাপড়ের গেঁজে তার কোমরে ধুতির নিচে বাঁধা, চকচকে খালি গা। গেঞ্জি জামা হলেই তার আবার কাচাকাচির ঝামেলা—শরীরের তো আর কাচাকাচি নেই। পুকুরে একটা-দুটো ডুব দিলেই—ব্যস। নিতাই চাল কিনলো, আর শুকনো লঙ্কা। সুবলের বাড়িতে কালই র‍্যাশন তোলা হয়েছে—এখন দুদিন আর চাল কিনতে হবে না—সে কিনে নিল পাঁচশো নুন—বিড়ি কিনতে গিয়েও কিনলো না। এই সুযোগে একটু চালাকি খেলে নিল—নিতাই বিড়ি কিনেছে—এখন সে নিজে কিনলে আর নিতাইয়ের থেকে নেওয়া যাবে না। তার থেকে, নিতাই কেষ্টপুরের রাস্তায় বেঁকলে তারপর সে তার নিজেরটা কিনে নেবে।

বড় রাস্তায় এসে বিড়ি ধরিয়ে নিতাই বলল, দিন দিন ধাঁ ধাঁ করে বাড়ি উঠে যাচ্ছে এ-জায়গায়। কি ছিল আর কি হল!

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে সুবল একটু গর্বের সুরে বলল, দিনকাল কি আর চিরকাল এক থাকে? আমি নিজের চক্ষে দেখেছি এখানে কামট ভাসতে—এই অ্যাত-তো বড় হাঁ—

—কামট?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কামট। আর শালার মাছও ছিল, ইয়া ইয়া বোয়াল-চেতল, আর এখন দেখ দিনি—সে-সব বুজিয়ে কি-রকম বাস যাচ্ছে।

—সোবলদা, তোমার জমিটা ছাড়বে না? সাড়ে তিন হাজার টাকা দর উঠেছে শুনছি?

সুবল বিজ্ঞভাবে বলে, সাড় তিন কি, দেখবি একদিন দশ হাজার উঠবে। আমি এখন ছাড়ছি না, অত কাঁচা পায় নি আমাকে।

কেষ্টপুরের অনেক ভেতরে দেড়মাইল দূরে নিতাইয়ের বাড়ি। সুবলের বাড়ি এই এখান থেকেই দেখা যায়। তাল গাছটার মাথায় দুটো শকুন বসে আছে। শালারা রোজ বসে থাকবে। রাস্তার দু-পাশ বরাবর খাল চলে গেছে। বাঁদিকের খালটা বরাবরের পুরোনো-ডানদিকেরটা নতুন। নতুন রাস্তা বানালেই তারপাশে খাল থাকবে। খাল কেটে সেই মাটি দিয়েই তো রাস্তা উঁচু করলো, তবে ডানদিকের খাল বরাবর একটানা নয়—মাঝে মাঝে ফাঁক আছে; আছে, মানে ছিল, এ বছরের বৃষ্টিতে সব ভেসে একাকার হয়ে গেছে। ছলছল করে বইছে বৃষ্টির নতুন টাটকা জল, এই জলে

বাগদা-চিংড়ি খুব বাড়ে। রাস্তা থেকে নেমে কাপড় গুটোল সুবল। কোন জায়গায় জল কম, তার জানা আছে। কাপড় গুটোতে গুটোতে কোমর পর্যন্ত তুলতে হলো, হড় হড় করে জল ঠেলে সুবল এসে পৌঁছলো বাড়িতে—তার উঠোন পর্যন্ত ডুবে গেছে এবার—তার কুমড়ো আর কাঁচা লঙ্কাগাছগুলো সব পচিয়ে দিয়েছে। মাইরি, এ-রকম বৃষ্টি বাপের জন্মে কেউ কখনো দেখে নি।

কিন্তু এত বৃষ্টির জন্যও খানিকটা খুশি-খুশি বোধ করে। উঠোন ভেসেছে ভাসুক, রান্নাঘরে জল ঢুকেছে ঢুকুক—কিন্তু মাঠ-খাল ডোবা-পুকুর সব একাকার হয়ে গেছে—সেনগুপ্ত বাবুদের গ্যারেজে জল ঢুকেছে—মোটর গাড়িটা ইস্তক ডুবে গেছে গলা পর্যন্ত, বাবুরা সব ঠেঙের কাপড় তুলে ছপছপিয়ে হেঁটে আপিস যাচ্ছে—তাই দেখে সুবল কম হেসেছে নাকি! ও-বাড়ির ঝি মাগি পর্যন্ত দেমাকি, সে পর্যন্ত পাছার কাপড় তুলে—। তাছাড়া সুবলের লাভও হয়েছে। তার পুকুরে বড় বড় মাছ ভেসে এসেছে—সুবল চুপি চুপি বস্তায় গোবর ভরে ডুবিয়ে রেখেছে মাঝডোবায়—গোবরের গন্ধ পেলে বড় মাছ আর কোথাও যাবে না। জলটা একটু নামুক—সুবল তখন জাল বার করবে। এত বৃষ্টিতেও কিন্তু তুলসীগাছটা মরে নি—তুলসীমঞ্চটা বেশ উঁচু।

ওই তুলসীগাছের জন্যই তো সব। ছিল জলা-জংলা জায়গা, নলখাগড়ার ঝোপ আর মাছের ভেড়ি। সুবলরা ক পুরুষ ধরে এখানে বাস করছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সুবলের ঠাকুর্দার আমলে তো বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছিল তাদের, সুবলের একটু একটু মনে আছে। পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়িতে রোজ মাছ যোগান দিত তার ঠাকুর্দা। মহিষবাথানে একটা নতুন ভেড়ি কিনতে গিয়েই তো একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল—জমি-জিরেত সব বেচে ফতুর হয়ে গেল। আর জমিরই-বা কি দাম—এ-সব জল-জমি কিনতই-বা কে—সত্তর টাকা পঁচাত্তর টাকা বিঘে—তারও কোনো ঠিকঠাক মাপজোক নেই। কোথা থেকে কি হল—গরমেন্টের লোক এসে তাঁবু গাড়ল—মোটা মোটা লোহার পাইপে করে গঙ্গামাটি এনে ভরিয়ে ফেলল জলা—নাম হয়ে গেল লবণহ্রদ। এ-পাশে তৈরি হল রাস্তা-ভি. আই. পি. রোড—দু-পাশ দিয়ে আনাগোনার জন্য আলাদা ব্যবস্থা। যে দু-চার ঘর বাড়ুই-সাপুই থাকত এখানে —হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘের দর পেয়ে ডগমগ হয়ে ঝটাঝট জমি বেচে চলে গেল। সুবলও কি আর থাকত? সুবলরা ছ-ভাই, বাকি ভাইরা যে-যার ভাগের জমি বেচে পকেট ভর্তি টাকা বাজিয়ে চলে গেল হাতিয়াড়া আর কৈখালির দিকে। সুবলের যাওয়া হল না ওই তুলসীগাছ আর তার মায়ের জন্য। সুবলের ভাগে শুধু পড়েছিল বসতবাড়িটুকু—সুবলের মা বগলা তুসলীতলায় আছড়ে পড়ে ডুকরে উঠেছিল; বসতবাড়ি বেচবি শেষ পর্যন্ত। অ্যাঁ, তোরা ভেবেছিস কি? বসতবাড়ি বেচলে বাড়ির বড় ছেলে মুখে রক্ত উঠে মরে—তা জানিস না। আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফ্যাল আগে—পেটে বাবলার ঝাড় ধরেছিলাম—টাকার গরমাই—তুলসীগাছ উপড়ালে হাতে কুষ্ঠ হয়—। সুবল অবশ্য মায়ের এসব কান্নাকাটিতে গলে যাবার লোক নয়—সাড়ে চার হাজার টাকার কাছে ও-সব কান্নাকাটি তো ছেঁড়া জালে মাছ ধরা। কিন্তু তার বউও ভয় পেয়ে বেঁকে বসল—শেষ পর্যন্ত বগলা এসে সুবলের পায়ে পড়তে সুবল একটু থমমত খেয়ে গেল—হাজার হোক মা হয়ে ছেলের পায়ে হাত দিয়েছে, বগলা পাগলের মতন সুবলের পায়ে মাথা কুটেছিল।

সুবলের বাড়ি রাস্তার এ-পাড়ে, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। গরমেন্ট যদি চাইত তাহলে সুবলকে আর ট্যাঁ-ফোঁ করতে হত না। বগলার হাজার কান্নাকাটিতেও কিছু আসত-যেত না—ওই তো হরিদাস সাপুই বেচতে চায় নি গরমেন্টের কাছে, মারোয়াড়িরা তাকে বেশি দাম দিতে চেয়েছিল—কিন্তু রাস্তার মাঝখানে তার জমি, শেষ পর্যন্ত সেই কম দামেই তো গরমেন্টকে বেচতে হল। সুবলের জমি গরমেন্ট চায় নি, কিন্তু আর-পাঁচজনা এসে ধরাধরি করেছে তাকে, সাইকেল কোম্পানি রাস্তা বানাতে চেয়েছে, সেনগুপ্ত বাবুরাও চেয়েছিলেন তাঁদের জমির সঙ্গে একলপ্তে জুড়ে নিতে, দর উঠেছিল সাড়ে চার হাজার—তার তো মোটে এক কাঠা ন-ছটাক জমি, সুবল দেয় নি। মা আর ক-দিন! ও-বুড়ি চোখ বুজলেই তারপর যে-কোনোদিন সুবল বুড়ো আঙুলের টিপছাপ, দিয়ে সাড়ে চার হাজার টাকা পেতে পারবে—এই চিন্তা তাকে সব সময় একটা সুখ দেয়। এর মধ্যে দর আরও চড়বে না কি আর?

সুবলের বয়স একচল্লিশ। তার ন-টি ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে সাতটি বেঁচে-বর্তে আছে। বড় ছেলেটা হাতিবাগানের সবজি বিক্রি করে, ওখানেই ঘর ভাড়া করে বউ নিয়ে আছে—বাপ-মার খোঁজ খবর নেয় না। সুবলের বউটা একেবারে বছর বিয়োনি—মাঝখানে দুটো বছর ক্ষ্যান্ত দিয়েছে একটু, তাও বিশ্বাস নেই, আবার কোনোদিন পেটে একটা বাধিয়ে বসবে তার ঠিক কি। ছেলেমেয়েগুলো উঠোনের জলে খল খল করছে—এদিকে যে শোবার ঘর পর্যন্ত জল ছলাকে উঠছে, সেদিকে খেয়াল নেই দেখেই সুবলের রাগ চড়ে গেল। সবচেয়ে পাজি ওই সেজো-মেয়ে কুসীটা, ভাইবোনগুলোকে কোথায় একটু সামলাবে তা নয়, নিজেই হারামজাদি ধিঙ্গিপনায় মেতেছে। মেয়েটা একেবারে হাড় বজ্জাত—রান্নাঘর থেকে চুরি করে খাবে, ভাই-বোনের খাবার ঠকিয়ে খাবে—রাক্ষুসীর মতন নোলা, ঝুড়িটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে সুবল কর্কশভাবে ডাকল—এই কুসী, শোন ইদিকে।

শাড়িটা উরু পর্যন্ত তোলা ছিল, জলের মধ্যেই শাড়িটা ছেড়ে দিল, বুকের আঁচল ঠিক করে ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। সুবল খপ করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, কি করছিলি ওখানে ? অ্যাঁ?

কুসীর মাথাটা হেলে পড়েছে, ক্যানক্যানে গলায় বলল, একটা ল্যাটা মাছ, ওই তুলসীতলায়—

সুবল ঠাস ঠাস করে কুসীর গালে চড় কষাতে কষাতে বলল, ল্যাটা মাছ? তোর মুখে গুঁজে দেব হারামজাদী, খানকীর বাচ্চা, সংসারের একটু সুরাহা নেই ওকে দিয়ে, মরিস্ না কেন? মর না! মর! জল হ্যাদাচ্ছে? ও ছেলেটার জ্বর, ওকে সুদ্ধু জলের মধ্যে নিয়ে—

সুবলের বউ বেরিয়ে এসে সে-ও কুসীর পিঠে গুম গুম করে কিল মারা শুরু করল এবং চ্যাঁচাতেও লাগল, গুখাকি আমার একটা কথা শোনে না, বললুম নক্কাগুলো বেটে রাখতে—। কুসীর বেশ ভর-ভত্তি চেহারা, বোঝাই যায় না তার বয়েস মোটে ষোলো—আর সব ভাইবোনগুলো রোগা-রোগা, সুতরাং কুসীকে মেরেই বাপ-মা দু-জনেই খানিকটা হাতের সুখ পায়। মার খেয়েও কুসী কাঁদে না, মুখ গোঁজ করে চলে যায় রান্নাঘরে।

সুবল প্রত্যেকদিন সূর্য ওঠার আগেই পায়ে হেঁটে চলে যায় দত্তবাগানে মাছের আড়তে। সেখান থেকে মাছ কিনে আসে নাগের বাজারে বেচতে। বিক্রিবাটা সেরে অতখানি রাস্তা হেঁটে যখন বাড়ি ফেরে তখন রোদ মাথার ওপরে। বাড়ি ফিরেই ছেলেমেয়েদের মারধোর করা তার নিত্য তিরিশ দিনের অভ্যেস। এতগুলো পেটের জন্যই তো তাকে খেটেখুটে মরতে হয়। মাথায় একটু সর্ষের তেল থাবড়া মেরে সুবল খালে দু-চারটে ডুব দিয়ে আসে। তারপর দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে। সুবল নিয়ম করে দিয়েছে, সে আগে খাবে—ছেলেমেয়েরা তারপর খাবে! তার নিজের শরীরটা ঠিক না রাখলে এত বড় রাক্ষসের সংসারটা চালাবে কে? সে অসুখে পড়লে তো কেউ কুটো নেড়ে সাহায্য করতে আসবে না! কলাই-করা থালা ভর্তি করে ভাত এনে দেয় তার বউ। মাঝখানে গর্ত করে সেখানে ডাল ঢেলে দিয়ে সুবল পুরো ভাতটা একসঙ্গে মেখে ফেলে—তারপর যেদিন যা টাকনা থাকে—মাছের ঝাল কিংবা কুমড়োর শাক—যাই হোক—তা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চেটেপুটে খায়। থালাখানা সে এমন চকচকে করে চেটেপুটে শেষ করে যে তারপর আর না মাজলেও চলে। খেয়ে উঠে সুবল একটা লম্বা ঘুম দেয়। শেষ বিকেল নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একটু গড়িমসি করে, কোনোদিন আর-এক দফা ছেলেমেয়েদের মারধোর দেয়, কিংবা ঘরের ছ্যাচার বেড়ার ফুটোফাটা ছাইবার চেষ্টা করে, কিংবা চালায় উঠে কচি লাউগুলো গুনে-গেঁথে দেখে—কোনোটায় পোকা লাগলে আদর করে চুন মাখিয়ে দেয়। কোনো-কোনোদিন এ-সবে আর মন যায় না—অন্ধকার হয়ে এলেও তাদের ঘরে লণ্ঠন জ্বলে না—ভি. আই. পি. রোডের আলোর বাঁকা রেখা এসে খালের জলে খেলা করে—তখন সে উসখুস করে কিছুক্ষণ—তারপর গুটিগুটি পায়ে চলে যায় কেষ্টপুরের দিকে, দু-চারজন পুরোনো স্যাঙাতের সঙ্গে তাড়ি খায় পাঁচ ছ-আনা খরচ করে, নিতাইয়ের সঙ্গে বড়রকমের একটা মাছের ব্যবসা ফাঁদার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। বাড়ি ফিরে এসে আগে গুড় দিয়ে গুটিকয়েক রুটি গিলে গলা ভর্তি জল ঢেলে পেট ভরায়, তারপর শুয়ে ঘুম! যে-সব দিন তাড়ি খেতে যায় না—সে-সব দিন আর সময়ই কাটে না—শিগগির খাওয়া সেরে নেবার জন্য তাড়া দেয়—কেরোসিন বেশি খরচ হল বলে গজগজ করে, বাতি নিবিয়ে কতক্ষণে শোবে সেই তার চিন্তা। শোবার ঘর মোটে একখানিই—মাটির মেঝেতে চট করে কাঁথা বিছিয়ে সার বেঁধে শোয় ছেলেমেয়েরা—সুবল শোয় একেবারে দরজার ধারে। বাইরের দাওয়াটার একপাশ ঘেরা—বগলা শোয় সেইখানে। সেই সব দিন সুবল শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন বিড়ি টানে, ঘুম আসবার আগে অন্য ধরনের উসখুসানি পেয়ে বসে তাকে—রান্নাঘর ধোওয়া মোছা করে তার বউ যখন শুতে আসে—দরজার কাছেই খপ করে তাকে টেনে আনে সুবল—ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে কিনা গ্রাহ্য করে না—কিছুক্ষণ বউয়ের শরীরটা ঘাঁটাঘাঁটি করে, চটকায়, রোগা চিমসে চেহারা নিয়ে বউটা হাপরের মতন হাঁপায়—তারপর কোনোদিন মরাকান্না কাঁদার মতন গুনগুনিয়ে বলে, আবার একটা শত্তুর এসেছে পেটে, তোমাকেও বলিহারি—বুড়ো বয়সে এখনো এ-সব ভাল লাগে বাপু? সুবল হ্যা-হ্যা করে বোকার মতন হাসে।

সুবল যখন বাড়িতে থাকে না তখন ছেলেমেয়েগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে—মাঝে মাঝে রাস্তায় মোটরগাড়ি থামলে ওরা সেখানে ঘেঁষে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে—ফরসা, সুন্দর সাজগোজ করা বাবু আর দিদিমণিদের মুখ থেকে চোখ ফেরায় না—ছেলেদুটো পোড়া সিগারেটের টুকরো, সোডার ছিপি আর পাঁউরুটির মাথা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে যায়। বারো বছরের ছেলে হারাণ—সে-ই শুধু কিছুদিন ধরে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে। সুবলের বউ ছেলেমেয়েগুলোকে সামলাতে পারে না—শুধু সেজো মেয়ে কুসীকেই একটু চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠে, এই কুসী-ই, এই হারামজাদি, কোথায় গেলি রে? কুসীর সাড়া না পেলে হাতের কাছে অন্য যে ছেলেমেয়ে থাকে—তাকেই বলে—ওরে দ্যাখ না, সে আবাগীর বেটি কোথায় গেল? যা না মুখপোড়া! কুসী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, তখন থেকে অত চেল্লাচ্ছো কেন? এই তো ভ্যাইপি রোডে ডাঁড়িয়েছিলুম! কুসীর মা অঙ্গভঙ্গী করে বলে, চেল্লাবো না কি কেত্তন গাইবো? আসুক আজ তোর বাপ—অত রোডে তোর যাবার দরকার কি লা? আমি বুঝি না কিচ্ছু? শাড়ি পরেছে দ্যাখো না—মাই-টাই সব বেইরে পড়েছে, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে—কুসী আঁচল টেনেটুনে বলে, একটা তো জামা কিনে দিলে না! সবাই জামা পরে—

—জামা কিনে দেব না ঝাঁটা দেব। ন্যাংটো করে রাখিনি এই ঢের, বলে পেটে ভাত জোটে না—আর গিলতেও পারে একেকজন!

দু-খানা গাড়ি থেমে আছে, চার-পাঁচজন ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে ওদের বাড়ির দিকে দেখিয়েই কী যেন বলছে। সুবলও সেখানে দাঁড়িয়ে। বগলা চোখদুটে বঁড়শির মতন তীক্ষ্ণ করে চেয়ে রইল। আবার বুঝি ছেলেটাকে লোভ দেখাতে এসেছে ড্যাকরারা। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বগলা চেঁচাতে লাগল, ও সোবল, সোবল, আবার কি কথা বলছিস?

সুবল গ্রাহ্য না করে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লোকগুলো ভি. আই. পি. রোডের পাশ দিয়ে ছড়ছড় করে অনেকখানি নেমে এল। খালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল বাড়িটা। কুসী দাঁড়িয়েছিল ঠাকুমার পাশে—একটা লোক বার বার চোখ বুলোচ্ছে কুসীর শ্যাওলার মতো শরীরে। বগলা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, ও সোবল, আগে শুনে যা, আগে আমার কথা শুনে না। আমি কিন্তু কুরুক্ষেত্তর করব বলে রাখচি, আমার ভাতার শ্বশুরের ভিটে—

সুবল মুখ ফিরিয়ে একবার মাত্র দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল, আঃ, থামো না। নইলে জন্মের মতন চেঁচানি বন্ধ করে দেব বলচি। সুবল আবার মনোযোগ দিয়ে লোকগুলোর কথা শুনতে লাগল।

বেশ খানিকটা বাদে সুবল প্রায় আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফিরে এল। তার হাত ভর্তি টাকা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে বগলার, তলার ঠোঁটটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে—সুবলের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, ও কি রে, কি করে এলি? টিপসই দিয়ে এলি?

সুবল রহস্যভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ দিলুম তো।

—অ্যাঁ, আমি মরার আগেই?

—ও কি, ও কি, মাটিতে বসে পড়েছ কেন? আগে সবটা শোনো। মেয়েমানুষ একেই বলে। আগে থেকেই হেদিয়ে মরে। তোমায় তো কথা দিইচি—তুমি মরার আগে বাড়ি বেচব না। সহজে তো মরবেও না—গরিবের ঘরে মেয়েছেলেরাই বেশি বাঁচে।

—কি হয়েছে বল না? ও লোকগুলো এসেছিল কেন? টাকা দিল কেন?

—বাড়ি বেচিনি বাবা বাড়ি বেচিনি। মুফৎসে তিরিশটা টাকা লাভ হয়ে গেল। ওরা এখানে একটা ছবি টাঙাবে—সেজন্য মাসে মাসে আমায় পোঁয়েঁরো টাকা করে দেবে।

—ছবি টাঙাবে বলে টাকা দেবে? কি ছবি?

—কি ছবি তো কী জানি। সে যা হোক। বিজ্ঞাপন বলে একে।

—বিগকাপন আবার কি?

—বললুম তো ছবি—মাস মাস পোঁয়েঁরো টাকা—আজ শালা কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, ভগবান একেবারে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, এই নে—দেখি যাই একবার নেতায়ের কাছে।

—মাস মাস দেবে!

—সুবল দিলদরিয়া হয়ে হঠাৎ মাকে একটা সওয়া চার টাকা দামের কম্বল কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে। হারাণ দাবি জানায়—এবার তাকে কাগজ আর পেনসিল কিনে দিতেই হবে—নইলে ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। সুবলের বউ বলে, হ্যাঁ গা, কুসীর জন্য এবার একটা বেলাউজ কিনে দিয়ো—গতরখানা তো খুব হয়েছে। লোকে হ্যাবুলার মতন তাকায়। হঠাৎ যেন এমন হল মাসে পনেরো টাকা আয় বেড়ে যাওয়ায় সুবলের সংসারের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

তিন-চারদিন বাদেই ট্রাকে করে সব জিনিসপত্র এসে উপস্থিত হল। কয়েকটি প্যান্ট শার্ট পরা বেশ চটপটে ছোকরা ডোবার পাশ দিয়ে সুবলের বাড়িতে উপস্থিত হল। সুবলের বাড়ির দুধারে পোঁতা হল দুটো শক্ত লোহার পাল্লা। সুবলদের মাটির বাড়িতে বাঁশ আর শালবল্লার খুঁটি, এ জমিতে এই প্রথম লোহা ঢুকল, তারপর সেই লোহা দুটোর মাথায় বসান হল বিশাল একটা ছবি। বিমান কোম্পানির বিজ্ঞাপন। পুরো ছবিটাই সুন্দর মাদক নীল রঙের, ডানদিকের কোণে একটা উড়ন্ত বিমান, বাঁদিকে দূর শহরের দৃশ্য, মন্দিরের মতন বাড়ির চূড়া, মনে হয় দেবভূমি অমরাবতীর ছবি যেন, নিচে হাত ধরাধরি করে ছুটছে সাহেব-মেম যুবক-যুবতি, মেমটির স্কার্ট উড়ে গেছে অনেকখানি, কী সুন্দর তার পা দুখানি, তার বুকের ডৌলও বড় মনোরম। ছবিটির মাঝখানে বড় বড় ইংরিজি অক্ষরে লেখা ঃ

FLY QUANTAS TO THE WORLD

সুবলের বাড়ির এ-দিক থেকে ও-দিক পর্যন্ত জুড়ে সেই ছবি—ছোকরারা ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সব ঠিক-ঠাক লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। ছবিখানা এমনিই ঝকঝকে রকমের নতুন এবং চোখ জুড়োনো যে ছেলেমেয়েরা তো দূরের কথা, সুবলও অনেকক্ষণ সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তার বাড়ির শোভাই যেন বদলে গেছে। এখন ভ্যাইপি রোড

দিয়ে যাবার সময় সবাই তার বাড়ির দিকে তাকাবে। ইস ছবিখানা কি, ঠিক যেন জ্যান্ত। ব্যাটাছেলেটার হাত ধরে মেমটা এইমাত্র যেন দৌড় শুরু করেছে, দৌড়চ্ছে, এখনো দৌড়চ্ছে। এরোপ্লেনটার গোঁ গোঁ শব্দ এক্ষুনি যেন শোনা যাবে ! আর ওই বাড়িগুলো? ঠিক যেন আকাশ ফাঁক হয়ে দৈবাৎ স্বর্গের একটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। সুবল লোহার খুঁটি ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখল, শক্ত করে পোঁতা হয়েছে কিনা। তারপর ছবির দিকে চেয়ে সে খুঁটির গায় আদর করে হাত বোলাতে লাগল। অত বড় ছবিতে বাড়ির পাশের তালগাছটাও যেন অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। তালগাছটার মাথায় দুটো শকুন বসে আছে। এ-শালাদের কিছুতেই তাড়ানো যাবে না। সুবল ঠিক করল, তালগাছটা না-হয় সে কেটেই ফেলবে। তা হলে কি এই ছবির ওপরেও শকুন বসবে! না-না। এইটুকু সময়েই ছবিটা যেন সুবলের নিজের সম্পত্তি হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েদের কাছে সেদিনটা একটা বিরাট উত্তেজনার দিন। কুসীও বার বার ঘুরে ঘুরে ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে। এত ভাল লাগছে তার, সে বুঝতে পারছে না কী করবে, কাকে গিয়ে এ কথা বলবে। কী সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে, আর ছেলেটাও কী সুন্দর! সাহেব-মেম অনেক দেখছে কুসী—এ রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি এয়ারপোর্টে যায় আসে, তাতে সাহেব-মেম থাকে—কিন্তু এই ছবির মতন সুন্দর তারা কেউ নয়। ছেলেটার ঘাড় কীরকম চওড়া, আর মেয়েটার পা, মুখটা একেবারে গোলাপি গোলাপি টুসটুসে—ওরকম জামার দাম অনেক, তা আর বলতে!

এ বাড়িতে হারাণই সবেমাত্র লেখাপড়া শিখছে, আর কেউ ইংরিজি বাংলা কিছুই পড়তে জানে না। মাঝখানে কী লেখা আছে কেউ বোঝেনি। হারাণই গম্ভীরভাবে বানান করে পড়লো, এফ. এল. ওয়াই. ফ্লাই, ফ্লাই মানে মাছি। বাকি সবাই সমস্বরে বলল, যাঃ মাছি না হাতি। মাছি আবার কোথায়। হারাণ গম্ভীরভাবে বললে, লেখা আছে, আমি তার কী করব। হারাণের ছোটো ভাই নবু সবচেয়ে এঁচোড়ে পাকা—সে বলল, মা, দ্যাখ দ্যাখ মেয়েটার পোঁদ দেখা যাচ্ছে, হি-হি-হি। কুসী অকারণে তাকে এক চড় কষাতেই তার মা খেঁকিয়ে উঠল, তুই এই ভর সন্ধেবেলা ছেলেটার গায়ে বিনা দোষে হাত তুললি যে বড়। তোর বড় বাড় বেড়েছে, না রে? তোর পিঠে আমি চ্যালা ভাঙব।

আজ বাড়িতে এ-রকম একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে গেল, কুসী তাই আশা করেছিল সেই উপলক্ষে আজ রাত্রে ভাত রাঁধা হবে। তার মা সেদিক দিয়ে গেলই না। সুবল আনন্দ করার জন্য আজ তাড়ি খেতে চলে গেছে। কুসীকে আটা মাখতে বসতে হল। দু-খানা দু-খানা করে রুটিতে পেটও ভরে না, খিদে আরও বাড়িয়ে দেয়, তার থেকে ভাত এক গেরাশ খেলেও শান্তি। রান্নাঘরের দোরের কাছে বসে কুসী আটা মাখছে, ঝুপ ঝুপ করে নেমে আসছে অন্ধকার, কটকট করে ব্যাঙ ডাকছে, একটা ব্যাঙের ডাক ঠিক ছোটো ছেলের কান্নার মতন ট্যাঁ ট্যাঁ—ওটাকে নিশ্চয়ই সাপে ধরেছে। এই বর্ষাকালটায় ঢোঁড়া সাপের বড্ড উপদ্রব এদিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে কুসী দেখল এখন আর অন্ধকারে ছবিটা দেখা যায় না, তালগাছের মাথায় শোনা যায় শকুনের ডানার ঝটপটানি।

কাঠবিড়ালির ডাকের মতন সরু শিসের শব্দ হতেই কুসী চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখ তীক্ষ্ণ করে রাস্তার দিকে তাকালো। তাড়াতাড়ি হাত ডলে ডলে আটাগুলো পরিষ্কার করে বলল, ঠাকমা, আমি আটা মেখে তো রেখেছি, তুই রুটিগুলো বেলে দে-না রে।

রান্নাঘরে থেকে মা ঝংকার দিয়ে উঠল, কেন, তুই কোথায় যাবি?

—আমি একটু আসছি।

—আসছিস মানে? এই রাত্তিরে যাবি কোথায়?

কুসীও ঝংকার দিতে জানে। সে-ও ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, বাবারে বাবা, একটু পাইখানাতেও যেতে পারব না।

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে কুসী চুপিচুপি ভি. আই. পি. রোডে চলে এল। সাট সাট করে গাড়ি যাচ্ছে, কুসী চট করে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল ও পাশে, তারপর রাস্তার ধার দিয়ে নেমে ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে জলের পাড় ঘেঁষে একটা আসশ্যাওড়া ঝোপের পাশে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে তার শক্ত জোয়ান হাতে কুসীকে তার কোলে টেনে নিল। একটা ঠোঙা কুসীর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বলল, এই নে, তোর জন্য এনেছি। তুই তো আলুর চপ ভালবাসিস।

বাড়ির সবার কাছ থেকে সারাদিন লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছে কুসী, উপরন্তু খাবার যা পায় তাতে তার একটুও পেট ভরে না। সারাক্ষণ খিদে থাকে। এই একজন, তাকে শুধু আদর করে, তাকে কত ভাল ভাল জিনিস খেতে দেয়। টাবু এর নাম। সাইকেলের কারখানায় ফিটারের কাজ করে। তেলেভাজা আলুর চপ বেগুনিগুলো কুসী হাম হাম করে খেতে লাগল। আর সেই ফাঁকে ওর আঁচলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে টাবু ওর কচি স্তন দুটো ডলতে লাগল। খানিকটা খাওয়া হলে তারপর কুসী বলল, টাবুদা, তুমি খাবে না? এই-ইঃ মাইরি, যা, সুড়সুড়ি লাগছে, হি-হি-হি।

—চুপ চুপ, চ্যাঁচাসনি।

—ওখানে না, ওখানে না, তাহলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি চেঁচাবো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, পাগলি একটা।

কুসীর উরুর তলা থেকে হাত সরিয়ে এনে টাবু সেই হাত কুসীর নিতম্বে রাখলো দু-এক মুহূর্ত, তারপর সেই হাত আবার ইতিউতি যাত্রা করল। শরীর মুচড়ে ছটফটিয়ে কুসী মাটিতে শুয়ে পড়তেই পাশাপাশি শুয়ে পড়ল টাবু।

ঢালু জমিতে অন্ধকারে দু-জনে শোওয়া—বেশ খানিকটা ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে অনবরত। ওদের কেউ দেখছে না। কুসী ফিসফিস করে বলল, জানো, আজ আমাদের বাড়িতে একটা ছবি টাঙিয়েছে।

—কি ছবি?

—তুমি দ্যাখোনি? উরেঃ সাবাস, এত সুন্দর না—না দেখলে বিশ্বাস হবে না, এখন অন্ধকার, কাল দিনের বেলা এসো।

হঠাৎ উত্তেজনায় কুসী দারুণ ভয় পাওয়ার মতন চমকে গেল। যেন সে একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখেছে। ফ্লুরোসেন্ট রঙে আঁকা তাদের বাড়ির বিজ্ঞাপনটায় কোনো চলন্ত মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়তেই সমস্ত দৃশ্যটা একবার ঝকঝক করে উঠল, আলো সরে যেতেই আবার অদৃশ্য। কুসী বলল, দেখেছ? দেখেছ? দেখোনি?

—কি? কি দেখব? তুই আস্তে কথা বল না, কোন শালা আবার—

—ওই যে, ওই যে, দ্যাখো, আমাদের বাড়িতে। আবার আলো পড়তেই আবার দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। টাবু সেটা দেখতে পেয়ে বলে, ও অ্যাডভ্যাটাইজ।

—তার মানে কি?

—কবে টাঙালো? বেশ সুন্দর তো।

—সুন্দর না। দেখতে পেয়েছো, ছেলেটা আর মেয়েটা—

এক-একটা গাড়ির আলো পড়ছে, আর আলোতে ছবিটা দেখার জন্য কুসী প্রত্যেকবার উন্মুখ হয়ে ওঠে। টাবুর ব্যস্ত হাত তার শরীরের নানা জায়গায় ঘুরছে, সে আর বাধা দিচ্ছে না। টাবু তার মুখের কাছে মুখ আনতেই তড়বড়ানিতে দাঁতে লেগে ঠোঁট কেটে যায়। জিভ দিয়ে নোনতা রক্ত চুষতে চুষতে কুসী বলে টাবুদা, ওই ছেলেটা-মেয়েটা ছুটছে কেন?

—এরোপ্লেনে উঠে ওরা বুঝি ওই বাড়িগুলো যেখানে, সেখানে যাবে?

—হ্যাঁ, উম্-ম্-ম্—

—ওই জায়গাটা কোথায়?

—কে জানে? লন্ডন হবে বোধহয়, মানে বিলেত।

—ও ছবিটা আমাদের বাড়িতে টাঙালো কেন?

—চুপ কর না, উঃ, তোকে এত ভালবাসি আমি মাইরি, সত্যি উম্ম-ম সোনা সোনা, কাল তোকে মাংসের কাটলেট খাওয়াবো।

—ওদের দু-জনের মুখদুটো কী সুন্দর, না বলো? শরীরময় অনির্বচনীয় পুলক নিয়েও কুসী বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে হঠাৎ ঝলসে ওঠা সেই ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে।

পলাতক ও অনুসরণকারী

—তুমি?

রবি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ। চকিতে একবার পেছন দিকে তাকাল। এক পা এগিয়ে এসে বলল, পিসেমশাই বাড়িতে আছেন? অশোকদা আছেন?

জয়ন্তী দু-দিকে মাথা নেড়ে জানালো, ওঁরা নেই।

—পিসিমা আছেন তো?

—হ্যাঁ।

জয়ন্তী রবির সর্বাঙ্গে চোখ বোলাল। তারপর বলল, তোমার পায়ে এত কাদা। উঠোনের ওই কলে পা ধুয়ে নাও ভাল করে।

জয়ন্তী নিজেই কলটা খুলে দিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, এতদিন কোথায় ছিলে?

—বৌদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আছে? মুড়িটুড়ি হলেই চলবে।

—ওপরে এস।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সিঁড়ির মুখেই পিসিমা। চোখে ভাল দেখতে পান না।—কে এসেছে বৌমা?

—আমাদের রবি।

আবছা দৃষ্টিময় দুটি চোখ রবির দিকে। একটি শিশু এখন যৌবন পেয়েছে, তবু শিশুটিকে দেখে ওই চোখ।

—আয় দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

—সেজো পিসি, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

প্রৌঢ়ার পা দুখানি প্রণাম নেবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ক্ষুধার্তের কি ও-সব মনে থাকে? সে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি—

পিসি জিজ্ঞেস করলেন, এক্ষুনি চলে যাবি নাকি? আজ থাকবি না?

—অশোকদা আসুক। অশোকদার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

—বড়দা কেমন আছে এখন?

—একই রকম।

—আর তোর মা? অনেকদিন চিঠি পাইনি।

রবি রেগে গিয়ে কড়া গলায় বলল, বলছি না, আমার খিদে পেয়েছে? খাবার-টাবার কিছু দেবে কিনা বল, নাকি শুধু জেরাই করবে?

—ছেলের মেজাজ কি। কদিন ধরে খাসনি?

একবাটি মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ, লঙ্কা, চানাচুর মিশিয়ে মোটামুটি সুখাদ্যে পরিণত করে নিয়ে এল জয়ন্তী। রবির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এখন এটা খাও। লুচি ভাজছি এক্ষুনি—

—এতেই হবে। লুচি-টুচি ভাজতে হবে না।

—চায়ের জল বসাই?

—বসাও।

—এই এক মাসেই তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। নিজের ওপরেও কি একটু মায়াদয়া নেই?

—অশোকদা দিন দিন মোটা হচ্ছে। তুমি তোমার স্বামীর শরীরের যত্ন নিতে পার না?

—চোখদুটো তো একেবারে বসে গেছে। ক রাত্তির ঘুমোওনি।

—যাও, তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাও।

রবি মুড়ি চিবোতে চিবোতে চলে এল জানলার কাছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। চোখ সরু করে চেয়ে রইল বাইরে। একটুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল তিনজন লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছে, নিজেদের মধ্যে গল্পে মত্ত। এ বাড়ির কাছাকাছি এসে তারা একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর যেন একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। এই বাড়ির দিকে।

রবি হাতের অর্ধসমাপ্ত মুড়ির বাটিটা ঠক করে নামিয়ে রাখল নিচে। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়ির কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে নেমে এল নিচে, বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বেরিয়েই সে দৌড়তে লাগল।

সেই তিনজন লোক এ বাড়ি পেরিয়ে এসে এক পলক দেখতে পেল অপসৃয়মাণ রবির চেহারা। তারা ব্যস্ত হল না, কোনো রকম চাঞ্চল্যও প্রকাশ পেল না।

এক নং অনুসরণকারী বলল, এবারেও চলে গেল।

দু নং অনুসরণকারী বলল, ঠিক আছে।

তিন নং অনুসরণকারী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চোখের সামনে রেখে বলল, এবার কোথায় দমদম না শ্রীরামপুর?

১নং বলল, দমদম।

২নং বলল, তাহলে এখানকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।

৩নং কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, শীতটা বেশ জমিয়ে পড়েছে আজ। মোড়ের দোকানে দেখে এলাম গরম চপ ভাজছে।

১নং তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বোমা বার করে ছুঁড়ে মারল বাড়িটার দরজার ওপরে।

২নং বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, বাঃ আওয়াজটা বেশ।

৩নং বলল, তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই। চল কয়েকটা চপ খাওয়া যাক।

রবি একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় ডাকল, চন্দন, চন্দন।

কেউ সাড়া দিল না। রাত প্রায় সাড়ে নটা। মফস্বল পাড়া নিঝুম। মাঝে মাঝে শোনা যায় সাইকেল রিকশার শব্দ, অনাবশ্যক কুকুরের ডাক।

রবি এবার জোরে ডাকল, চন্দন—

দোতলার বারান্দা থেকে একটি অল্পবয়েসি মেয়ে শরীর ঝুঁকিয়ে বলল, কে?

—চন্দন আছে?

—দাদার জ্বর।

—বিছানা থেকে উঠতে পারবে না?

—ঘুমোচ্ছে।

—একবার দরজাটা খুলে দাও।

—আপনার নাম কি?

—দরজাটা আগে খুলে দাও।

রবি ঝট করে পিছনে ঘুরে দাঁড়াল। দুটো সাইকেল রিকশা তখন বড় রাস্তায় সদ্য থেমেছে। দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না রবি, দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেই তিনজন এসে দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। ১নং বলল, ভেতরে ঢোকেনি আমি দেখেছি।

১নং কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। সে ধাক্কা মারবার আগেই দরজা খুলে গেল। একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে সদ্য শাড়ি পরা ধরেছে, এখনো ভাল করে শেখেনি।

২নং শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, চন্দনের সত্যি জ্বর হয়েছে? মেয়েটি বলল, আজ একশো চার উঠেছিল। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—রবিবাবুর কাছ থেকে, তোমার দাদাকে একটু দেখে আসব?

—এখন তো ঘুমোচ্ছে।

—আচ্ছা থাক।

—কিছু বলতে হবে?

—বলে দিয়ো রবিবাবুর খোঁজ করতে তিনজন লোক এসেছিল। তাহলেই বুঝতে পারবে।

২নং দরজার কাছ থেকে সরে আসার পর ৩নং জিজ্ঞেস করল, এখানে কি আর ওটার দরকার আছে?

১নং বলল, আমার তো মনে হয়—

৩নং বলল, আমারও ছোটো ভাইটার জ্বর। আমিও মনে হচ্ছে জ্বরে পড়ব এবার।

২নং তার কপালে হাত দিয়ে বলল, কই টেম্পারেচার নেই তো।

—ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছি। আঃ, যদি এখন একটু লেপের তলায় শোওয়া যেত।

১নং বলল, এখানকার কাজটা সেরে ফেলা যাক। দেরি করে লাভ নেই।

৩নং বলল, কদিন ধরে এক ফোঁটা ঘুম নেই। আর শীতও পড়েছে তেমনি। ভগবানের একটু মায়াদয়াও নেই।

২নং বলল, হারামির বাচ্চাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

১নং থলে থেকে বার করে আর একটা বোমা ছুঁড়ল বাড়ির দরজায়। নিস্তব্ধ নিশীথ কেঁপে উঠল সেই শব্দে। কুকুরগুলো তারস্বরে ডেকে উঠল।

রবি সারারাত্রি গঙ্গার ঘাটে শ্মশানে গিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে ঘুমের ঢুলুনি আসতেই সে উঠে একটু পায়চারি করে নিচ্ছিল, কখনো দাঁড়াচ্ছিল চিতার ধারে। সারারাত ধরেই চারটে চিতা জ্বলছে, লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই, কারো তাকে কোনো প্রশ্ন নেই। চিতার ধোঁয়ায় সর্বক্ষণ তার চোখ ছলছলে, অনায়াসেই তাকে শ্মশানযাত্রীদের অন্যতম মনে করা যায়। বহুদিন কারুর মৃত্যুতে তার চোখ দিয়ে জল পড়েনি। বিশেষত শ্মশানে এলে মনে হয়, মৃত্যু নিছক একটা নির্লিপ্ততার ব্যাপার—এর কোনো ভাল বা মন্দ দিক নেই। রবি তার গেঞ্জিহীন বুকে হাত রাখে। হঠাৎ তার নিজেকে আদর করতে ইচ্ছে হয়। নিজের বুকটা অন্যের বুক মনে করে সে হাত বুলোয়।

ভোর হবার পর স্নানের পুণ্য অর্জনকারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাওড়া স্টেশনে। শ্রীরামপুরের ট্রেন ধরে।

সুশান্ত তখন বাজারের থলে হাতে বেরুচ্ছিল, রবি তাকে বলল, আমি আজ এখানে থাকব।

সুশান্ত ইতস্তত করে বলল, দিল্লী থেকে আমার বাবা আসছেন এখানে।

রবি বলল, আজকের দিনটা অন্তত থাকতেই হবে আমাকে।

—খোকন আছে গোঁসাই পাড়ায়। ওদের কাছে খবর পাঠাব?

—না, কোনো দরকার নেই।

সারাদিনটা রবি পড়ে পড়ে ঘুমোল। অনেক দিনের ঘুম পাওনা ছিল তার। মাঝখানে উঠে একবার শুধু স্নান করে খেয়ে নিল। স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে, খেতে বেশি সময় লাগল না।

তার শার্ট আর প্যান্ট এতদূর অপরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে স্নান করে উঠে ওই পোশাক আর পরা যায় না। সুতরাং তাকে পরে নিতে হল সুশান্তর ধুতি ও পাঞ্জাবি। এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে। সে বলল, অন্যরকম পোশাক পরার মতন আমি যদি অন্য একটা মানুষ হয়ে যেতে পারতাম। এই বলেই সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা জাহাজের স্বপ্ন দেখল।

ঘুম ভেঙে উঠে রবি দেখল বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্ধে এখন গাঢ়। সে আশ্রয় পেয়েছে ছাদের একটা ছোটো ঘরে, চটপট উঠে ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল চতুর্দিক। কেউ নেই।

তখন সুশান্তর স্ত্রী রূপা তার জন্য চা নিয়ে এসেছে। চায়ের চুমুক দিয়ে রবি জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ওই জাতীয় কিছু আছে?

—না তো। আনিয়ে দেব?

—থাক। সন্ধ্যের পর রোজই একধরনের মাথার যন্ত্রণা, আবার কমেও যায় আপনি আপনি। সুশান্ত ফেরেনি অফিস থেকে?

—আর একটু বাদেই ফিরবে।

—আপনি এখন নিচে যান। সুশান্ত এলে পাঠিয়ে দেবেন।

—আপনি এখন কিছু খাবেন?

—আমাকে সাধাসাধি করে কেউ কখনো খাওয়ায় না। খিদে পেলে আমি চাইবো। বাড়িতে মুগের ডাল আছে? এ বেলা রাঁধতে পারবেন? বহুদিন খাইনি।

—আপনার বাড়িতে—

—আপনি নিচে যান। আমি একটু একা থাকতে চাই।

ঘরের আলো না জ্বালিয়ে রবি গুম হয়ে বসে রইল দেয়ালের দিকে। একবারও দৃষ্টি ফেরালো না। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে একটু নড়ে উঠে দু-হাতে চেপে ধরল কপালের দু-পাশের রগ।

সুশান্ত এসে বলল, কি রে, আলো জ্বালিসনি যে?

রবি বলল, অনেকক্ষণ ধরে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। ছেলেবেলায় আমি একটা কুকুর পুষেছিলাম— তার ডাক ছিল ঠিক এইরকম। অবিকল এইরকম।

—সে কুকুরটা এখন কোথায়?

—তখন আমরা শিবসাগরে থাকতাম। কুকুরটা ছিল আমার সব সময়ের সঙ্গী, খুব বাধ্য ছিল আমার। হঠাৎ কী হল, সেটা খুব অবাধ্য আর রাগী হয়ে গেল। সবাইকে ভয় দেখায়। মা-বাবা বললেন, কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই মানতে চাইনি—কিন্তু ওঁরা কুকুরটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস করলেন না। একদিন ভুলিয়ে

ভালিয়ে নৌকায় চাপিয়ে নদীর একটা চরায় রেখে আসা হল। সেই চরটা মাঝে মাঝে জলে ডুবে যায়। সেই থেকে কোনো নির্জন জায়গায় কোনো কুকুরের ডাক শুনলেই—

—তুই এখান থেকে কোথায় যাবি?

—জানি না।

—এখানে থাকতে পারিস দু-একদিন। এই ঘরটা তো কাজেই লাগে না।

রবি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুশান্তর দিকে। হঠাৎ সদর্পে বলল, মাথার ওপর ছাদ না-থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। ঘরের কথা চিন্তা করে আমি রাস্তায় বেরোইনি—

সুশান্তও কড়া গলায় বলল, এবার আমাদের রাস্তা বদলাতে হবে। তুই যে পথে যাচ্ছিস, সেটাকে রাস্তা বলে না, এঁদো গলি।

—তোর বাড়িতে গ্রামোফোন আছে নিশ্চয়ই?

—হঠাৎ!

—সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামোফোন—এ না হলে মানায় না।

—এর নাম বোকা অহংকার।

রুপা এসে সুশান্তকে বলল, তোমাকে তিনজন লোক ডাকতে এসেছেন।

রবি তড়াক করে চলে গেল ছাদের পাঁচিলের কাছে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, তোমাদের বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা আছে?

—সুশান্ত রবির হাত চেপে ধরে বলল, তুই চলে যাবি?

—একদম সময় নেই।

—তোকে যেতে হবে না। আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছি। অত ভয়ের কি আছে?

—ভয় না, ঘৃণা। একদম সময় নেই।

রূপা বলল, আপনি এ-রকম করছেন কেন? পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে, আমি থানায় খবর দিচ্ছি।

রবি রূপার দিকে একবারও তাকাল না পর্যন্ত। সে ছাদের উল্টো দিকের পাঁচিল টপকে পাইপ ধরে ঝুলে পড়লো। একটু দূরে প্রবল ট্রেনের শব্দ।

১নং অনুসরণকারী বলল, এদিকে রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলো একেবারে উল্টোপাল্টা। সাঁইত্রিশের পর বাহান্ন—বিচ্ছিরি ব্যাপার।

২নং অনুসরণকারী বলল, কোনো কোনো বাড়িতে নম্বর প্লেটই নেই।

৩নং বলল, হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল মাইরি।

১নং বলল, গত বছর এই সময় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তাতে থ্রিল বেশি।

২নং বলল, বর্ধন যেদিন মারা যায়—

৩নং বলল, আমার মামাবাড়িতে একটা পেয়ারা গাছ আছে—ভেতরটা লাল রঙের। ছেলেবেলায় সেই পেয়ারা গাছ থেকে একবার পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকে আমার একটা পা কমজোরি হয়ে গেছে।

২নং বলল, পেয়ারার ভেতরটা লাল?

১নং বলল, দেওঘরেও ও-রকম পেয়ারা পাওয়া যায়। আমি অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম দাদা-বৌদির সঙ্গে
।

২নং বলল, এখানকার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক।

৩নং বলল, তারপর বাড়ি গিয়ে ভাল করে ঘুমোবো। বাড়ির গরম গরম ভাত, মুসুরির ডাল আর আলুসেদ্ধ—

১নং এগিয়ে গেল দরজার কাছে সুশান্তর সঙ্গে কথা বলতে। অন্য দু-জন ছড়িয়ে গেল বাড়ির দু-পাশে।

রবি ছুটতে ছুটতে একজন অচেনা লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করল, স্টেশনটা কোনদিকে?

লোকটি বলল, এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কেন? ওই তো, ওইদিকে রাস্তা।

—মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে না?

—যাওয়া যেতে পারে, আপনি রাস্তা চিনতে পারবেন না।

রবি এক ধমক দিয়ে বলল, ঠিক চিনতে পারব। কোনদিকটা আপনি দেখিয়ে দিন না।

ধমক খেয়ে দমে না গিয়ে লোকটি বলল, আপনি যখন অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়েই যেতে চান—তখন নিজেই রাস্তা খুঁজে নিন।

রবি লোকটির দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কথা না বলে দৌড়তে লাগল। সে মেপে মেপে নিশ্বাস নিচ্ছে, তাকে সহজে ক্লান্ত হলে চলবে না। সে এখন একা—কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ায় বহু মানুষের নিশ্বাস মিশে থাকে। এমন-কি যাঁরা বেঁচে নেই—তাদেরও নিশ্বাস বাতাস থেকে হারিয়ে যায় না।

পেছন দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে রবি।

শীতের রাত্তিরেও তার শরীরে ঘাম। হঠাৎ সে সামনের একটা দেওয়ালে ধাক্কা খেল।

দেয়াল নয়, তিনজন মানুষ। নিপুণ হাতে তারা রবিকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল করে দিল। রবিও ছটফট করল না, দু-হাতে মুখ চাপা দিল শুধু।

১নং রবির মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, কি করে, রবি, চিনতে পারিস?

২নং বলল, বর্ধনকে তোরা তিনজন—

৩নং বলল, শালা অনেক ভুগিয়েছিস—

রবি কোনো কথা বলল না। আকস্মিকভাবে তার মনে পড়ল, তার ছোটো বোনকে ছবি আঁকার এক বাক্স রং পেন্সিল পাঠাবার কথা ছিল দু-তিনবার চিঠি লিখেছে—

ছুরি চালাবার কাজটা সমাধা হল নিঃশব্দে। মাটিতে পেড়ে ফেলে রবির বুক পেট ফালা ফালা করে দিয়েও ওরা তিনজন রবির শেষ নিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চাইলো। পৃথিবীর বাতাস ব্যবহার রবির ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।

এই সময় দূরে একটা কলরব শোনা গেল। আট-দশজন লোক এই দিকেই ছুটে আসছে।

এই তিনজন সেই দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে তাকাল। ওরা কি তাদের অভিনন্দন জানাতে আসছে, না ধরতে? উভয় ক্ষেত্রেই চিৎকারটা প্রায়ই একই রকম হয়। এই তিনজন কোনো ঝুঁকি নিল না। তৎক্ষণাৎ এরা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল, পালাবার সুবিধের জন্য, তিনজন তিনদিকে।

অবিলম্বে সেই দলটি এখানে এসে পৌঁছল। ভূতপূর্ব রবির দিকে এক পলক তাকাল শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।

এই দলে ছিল ন-জন ব্যক্তি। এরা তিনজন করে তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটতে শুরু করল তিন দিকে।

একটু আগে যে ছিল এক নং অনুসরণকারী, এখন সে এক নং পলাতক—তাকে যারা তাড়া করে আসছে তাদের মধ্যে এক নং অনুসরণকারী তিন নং অনুসরণকারীকে বলল, যাবে কোথায়? পকেট থেকে কাগজটা বার কর। দেখে নে।

নদীতীরে

তারপর আমি ইন্দিরা গান্ধিকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি বই পড়তে ভালবাসেন?

উনি একটু হেসে বললেন, ছেলেবেলায় আমি বইয়ের পোকা ছিলুম।

—এখন বই-টই পড়ার সময় পান না বোধহয়?

—সে-রকম সময় পাই না, তা, ঠিকই। তবে, যেটুকু সময় বাঁচানো যায়...যেমন ধরো, যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হয়—এ-রকম প্রায়ই যেতে হয়, বিমানে বসে আমি কারুর সঙ্গে কথা বলি না, শুধু বই পড়ি। একবার আসামে যাবার সময় আঁদ্রে মলরোর 'অ্যান্টি মোয়ার্স' বইখানা পড়ছিলাম, মাত্র আটচল্লিশ পাতা পড়া হল, সেখানে পেজ-মার্ক দিয়ে রাখলাম, আর সুযোগই পাইনি, তারপর লুক্সেমবার্গ যাবার পথে আবার উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা থেকে—

—এই বইটাতে আপনার বাবার সম্পর্কে চমৎকার লিখেছেন।

—হুঁ।

কথা থামিয়ে আমি পাশ থেকে একটা কাগজের রুমাল তুলে নিলাম। সেটাতে সুগন্ধ রয়েছে। বিমানযাত্রার সময় এ-রকম কাগজের রুমাল দেয়, আমি দেখেছি, একটু ভিজে ভিজে থাকে—মুখ মুছে নিলে পরিষ্কারও হয়, এবং গন্ধের জন্য মন ভাল হয়। এয়ার-হোস্টেস যখন ট্রে-টা বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন আমি একটার বদলে তিনটে তুলে নিয়েছিলাম। এ-রকম নিয়ম নয়, তবে আপত্তি করে না।

ইনি কি একটার বদলে তিনটে তুলে নেন কখনো? তারপর মনে পড়ল, ওঁর দরকার হয় না। ওঁকে এ-রকম দ্বিধায় পড়তে হয় না।

উনি পায়ের ওপর পা তুললেন। উরুর কাছে শাড়ি প্লেন করলেন এক হাত দিয়ে, শিশুর মতন চিবুকটি উঁচু করে একপলক চিন্তা করে নিলেন অন্য কিছু।

তারপর উদাসীনভাবে বললেন, সবাই আমার কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন করে। আমি কাউকে কোনো প্রশ্ন করি না। আমার কাজ শুধু উত্তর দেওয়া।

—এবং অধিকাংশই অবান্তর প্রশ্ন।

—প্রায়।

—আমার আর একটাই প্রশ্ন আছে। কিরকম লাগে জীবনটা? এর নাম কি সুখ?

—সুখ?

—হ্যাঁ।

—সুখের কথা চিন্তা করিনি। জীবনে যখনই কোনো সংকট এসেছে, তখনই ভেবেছি আমায় যেন কেউ হারাতে না পারে। কখনো তো হারিনি আমি। অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ আছে। কিন্তু হেরে যাইনি।

—আপনি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' পড়েননি। সেখানে তিনি এই কথাই দুর্যোধনের মুখে বসিয়েছেন :

> 'সুখ চাহি নাই মহারাজ—
> জয়। জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
> ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা—'

—তুমি আমার সঙ্গে দুর্যোধনের তুলনা করলে?

—এবার আপনি প্রশ্ন করছেন।

—এটা পাল্টা প্রশ্ন। উত্তরটাকেই পরিষ্কার করে নেবার জন্য।

—না, তুলনা করিনি। কাব্যের সঙ্গে জীবনের তুলনা চলে না। তাছাড়া, মহাভারতে দুর্যোধন আর রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধন এক নয়। আমি বলতে চাইছিলাম, যাদের হাতে শাসনভার থাকে, তাদের কাছে জয়টাই প্রধান। 'রাজধর্মে, ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে—'

—আমি ওটা আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলছিলাম।

—আপনার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। আপনি কতদিন একা কোথাও যাননি, কতদিন কোনো নদী দেখেননি।

—নদী দেখিনি?

—সেতু উদ্বোধন করার সময় দেখে থাকতে পারেন বটে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল।

আমি মনে করলাম, সময় হয়ে গেছে, তাই উনি আমাকে যেতে বলছেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি আবার বললেন, চল, তোমার সঙ্গে কোনো নদী দেখে আসি।

আমি বললাম, আপনার বয়েসি কোনো নারীর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য আমার প্রলুব্ধ হবার কথা নয়। তবে আপনার একটা আলাদা আকর্ষণ আছেই। শুধু রাষ্ট্রপ্রধান বলেই নয়, বয়স হওয়া সত্ত্বেও আপনি এখনো যেন যৌবনের প্রতীক। আপনার হাবভাব চলাফেরা ও পোশাকের মধ্যে এখনো যৌবনসুলভ ব্যাপার আছে। শুনেছি আপনি খুব নিষ্ঠুর, কিন্তু আপনার মুখে তার কোনো রেখা পড়েনি।

—আমরা নদী সম্পর্কে কথা বলেছিলাম, যাবে?

—সঙ্গে আপনার সাতান্নজন দেহরক্ষীও যাবে নিশ্চয়ই!

উনি একটু হেসে বললেন, সাতান্নজন! তুমি গুনেছো নাকি? আমি তো জানি না।

—একবার রবীন্দ্রসদনে একটা উৎসবে আপনাকে দেখেছিলাম, তখনই গুনেছিলাম, সর্বসমেত সাতান্নজন ব্যক্তি আপনাকে পাহারা দিচ্ছে। বাইরে জল খেতে গেছি, সেখানেও দেখি কলের কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে। দেখলেই বোঝা যায়, প্রহরী। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলে কেউ জল খেতে আসছে না। অথচ, আমার এখানেই দাঁড়াবার কথা।

—এইরকম হয় বুঝি? যাই হোক, চল, আজ আমি একাই গঙ্গার ধারে যাব। এ কথা ঠিক, আমি পৃথিবীর সর্বত্র গেছি, করতলের মতনই পৃথিবীটা চিনি। অনেক অনেকদিন কোনো নির্জন নদীতীরে দাঁড়াইনি। কলকাতার গঙ্গার ধার খুব সুন্দর?

—পৃথিবীর বিখ্যাত দৃশ্যগুলির একটি। কিন্তু আপনি সেখানে যেতে পারবেন না। আপনি নিষেধ করলেও রক্ষীরা শুনবে না। একটু দূরে থেকে অনুসরণ করবে। তাছাড়া—

—তাছাড়া কি?

—বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে। অভয় পেলে বলতে পারি।

—বল।

—গঙ্গার ধারের সেই আততায়ী যে রয়েছে।

—তার মানে?

—পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গাতেই কি আপনার জন্য একজন আততায়ী অপেক্ষা করে বসে নেই? নইলে এত রক্ষী কেন?

—উনি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তা আছে। এটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই স্বার্থ আছে। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রেই এ-রকম হয়।

—জানি। কিন্তু সব সময়ই আমাকে কেউ হত্যা করতে চায়, এই চিন্তাটা কেমন লাগে।

—সবসময় মনে থাকে না।

—সবসময় রক্ষী থাকা মানেই চেতনে হোক অবচেতনে হোক এটা মেনে নেওয়া।

—অভ্যেস হয়ে যায়। এটাও পার্ট অব দি গেম।

—রবীন্দ্রসদনের বাইরে জলখাবার জায়গায় যে লোকটি একা দাঁড়িয়ে ছিল, তার সেই দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু ছিল। সেইজন্য আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে ছিলাম। তার ভঙ্গি অলস অথচ সতর্ক। অন্যমনস্কের ভান অথচ নজর তীক্ষ্ণ। নিশ্চয়ই ওর কাছে কোনো অস্ত্র ছিল। ওই লোকটিকেও আমি আততায়ী ভাবতে পারতাম। কিন্তু ও ছিল প্রহরী। ভেবে দেখতে গেলে, আততায়ী ও প্রহরীর মধ্যে বেশ মিল আছে।

উনি আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হলেন মনে হল। বিখ্যাত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, কথায় কথা বাড়ে। আমি নদীর কাছে যেতে চেয়েছিলাম একা।

—একা।

—হ্যাঁ। এবং তুমি আমায় রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে। জানো বোধহয়, আমি কোনো শহরেরই রাস্তা চিনি না। হঠাৎ ভিড়ের কলকাতা শহরের মাঝখানে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাচ্চা মেয়ের মতন হারিয়ে যাব।

—কিন্তু তার আগে গঙ্গার ধারের সেই আততায়ীর ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার নয় কি?

—মনে হয়, সেখানে কোনো আততায়ী নেই। তুমিই তো বললে, সেটা খুব সুন্দর জায়গা।

—আব্রাহাম লিঙ্কন যখন মুগ্ধ হয়ে নাটক দেখছিলেন, তখন মঞ্চের ওপর থেকেই লাফিয়ে এসেছিল আততায়ী। খুনীর সৌন্দর্যবোধ নেই।

—কিন্তু আমাকে মারতে চাইবে কেন? আমি কি এই দেশটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি না।

—দেশটাকে বাঁচানো বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে, কে তাকে বাঁচাবে। সবকিছুর থেকেই বড় হচ্ছে সেই আমি। মৃত্যু না হলে কিংবা নিহত না হলে কেউ তো দেশের পরিত্রাতার ভূমিকা ছাড়তে চায় না।

—আমরা কথা বলছিলাম নদী সম্পর্কে।

—নদী নয়, নদীর তীরে একা দাঁড়ানো সম্পর্কে।

—ঠিক, তুমি হঠাৎ এ-কথাটা বলেছিলে কেন? আমি কতদিন কোনো নদী দেখিনি!

—আপনি বলেছিলেন আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কে কিছু একটা—

আমি বলেছিলাম, আপনার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। সেইজন্যই নদীর কথা আসে। আপনার এরোপ্লেন আছে, হুকুম আছে, সেই উদ্বোধনের তারিখ আছে, কিন্তু আপনার কোনো নদী নেই।

—তাতে কিছু যায় আসে?

—না।

—তাহলে?

—তবু হঠাৎ আপনি নদী দেখতে চাইলেন।

—চল। আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। কেউ বিশ্বাসযোগ্য মনে করবে না আমার চেহারা। বড়জোর বলাবলি করবে, ওকে ঠিক ইন্দিরা গান্ধির মতন দেখতে। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধি হতেই পারে না।

—এ-রকম বিভ্রম কোনো চিত্রতারকা সম্পর্কে হতে পারে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণই নেই—প্রতিদিন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার অসংখ্য ছবি ছাপা হয়।

—কথায় কথা বাড়ে।

—চলুন তাহলে দেখা যাক পরীক্ষা করে।

রাজভবনের গেটের বাইরে আমি অপেক্ষা করছিলাম, উনি একটা সাদা শাল জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমাকে দুটো সিগারেট পোড়াতে হয়েছিল।

—উনি এসে বললেন, কোনোদিন আমি এখানে পায়ে হেঁটে ঢুকিনি কিংবা বেরোইনি, তাই আমাকে কেউ লক্ষ করেনি। সবাই আমার গাড়িটা পাহারা দিচ্ছে।

—নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর আরও অসংখ্য লোকের দেখা করার কথা ছিল; অনেক দাবি, অনেক অনুগ্রহ, অনেক প্রতিবাদ।

—তা ছিল। কিন্তু যুবক, তুমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করো না। মনে রেখো, তুমি আমার পথপ্রদর্শক মাত্র।

—অদূরে গঙ্গা, আপনি সোজা চলে যান।

—তুমি রাগ করলে?

—আপনাকে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে নারীর সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে আমি কখনো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি বটে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সে-কথা আসে না।

ইংরেজিতে যাকে বলে ফুল থ্রোটেড লাফটার, তিনি সেইভাবে হাসলেন। এ-কথা ঠিক সমস্ত প্রবীণ পুরুষ ও নারীর মধ্যেই কখনো কখনো একটি শিশুকে খুঁজে পাওয়া যায়।

রেডিও-ভবনের পাশ দিয়ে, স্টেডিয়ামের গা ঘেঁষে আমরা হাঁটছিলাম। আবছা অন্ধকারের রাত্রি, পথে অনেক মানুষজন, কিন্তু কেউ আমাদের লক্ষ করছে না। অল্পবয়সি যুবক ও যুবতিরা নিজেদের নিয়েই মত্ত। একটি ভিখারি শিশু অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল, উনি একটু বিব্রত বোধ করলেন, উনি সঙ্গে পয়সা আনেননি—খুব সম্ভবত কোনোদিনই ওঁর নিজের কাছে টাকা-পয়সা থাকে না—অন্তত গত কয়েক বছর।

উনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, খুচরো পয়সা আমার কাছে আছে, কিন্তু ভিক্ষে দেওয়াটা কি ঠিক নীতি!

—নিজের বিবেককে প্রশ্ন কর।

—আমার বিবেক এক-একরকম নির্দেশ দেয়, সেইজন্যই আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম।

—আমি মানুষকে নীতিবোধ শেখাই না।

আমি ভিখারি শিশুটিকে দশ পয়সা দিলাম। সে চলে যাবার পর আমি বললাম, ওর প্রতি দয়াবশত আমি পয়সা দিইনি, আমি চাইছিলাম, ও যেন আর বিরক্ত না করে।

—কলকাতায় ও-ই কি একমাত্র ভিখারি?

—না, এখানে ভিখারির সংখ্যা তিনলক্ষ একজন।

—একজন মানে?

—আমাকে নিয়ে।

—তুমি কিসের ভিখারি?

আমি একটু চুপ করে রইলাম। তারপর উত্তর দিলাম, বলতে যাচ্ছিলাম, ভালবাসার, তারপর মনে হল, এটা একটা ক্লিশে, আবার মনে হল, ক্লিশে হলেও সত্যি—অথচ এ-সব মুখে বলা যায় না।

—তুমি ভালবাসা পাওনি?

—তা পেয়েছি, তবু একটা ভিখারিপনা থেকেই যায়।

—যাদের ও-রকম থাকে, তারা জীবনে কোনো বড় কাজ করতে পারে না।

—আপনার ওই দুর্বলতা নেই?

—ছিল একসময় খুবই। যখন আমার মায়ের খুব অসুখ...থাক।

—ছেলেবেলায় একটা লেখা পড়েছিলাম, সক্রেটিস ইন অ্যান ইণ্ডিয়ান ভিলেজ—

—আমার ক্ষেত্রে সেটা খাটে না।

ইডেন উদ্যানের কোণটায় এসে আমরা দাঁড়াই। রাস্তার মাঝখানে গোল একটা স্থাপত্য—একসময় ওখানে বিদেশি কোনো রাজপুরুষের মূর্তি ছিল, এখন শূন্য পেডেস্টাল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মনোরম হাওয়া দিচ্ছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পথপ্রদর্শক, এবার কোন দিকে?

আমি বললাম, রাস্তা পার হতে হবে। পারবেন?

সট সট করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বিশালকায় ট্রাক। উনি বহুদিন একলা এইভাবে ট্রাফিকের মধ্যে হেঁটে রাস্তা পার হননি। কিন্তু সব ব্যাপারেই ওঁর একটা সপ্রতিভতা আছে। ডান দিক ও বাঁ দিকে তাকিয়ে ধীরে পদক্ষেপে রাস্তা পার হয়ে এলেন, এই গতিভঙ্গিতে একটা আভিজাত্য আছে। ব্যস্ততা ওকে মানাতো না।

তখনই কিন্তু গঙ্গার দিকে না গিয়ে আমি ওঁকে নিয়ে কেল্লার দিকের রাস্তা ধরে আরও একটু হাঁটলাম। হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। বেশ শীতের শিরশিরে ভাব। উনি শালটা ভালভাবে জড়িয়ে নিলেন শরীরে। আপনমনেই বললেন, কলকাতায় আছি, অথচ এতখানি সময় আমার নিজস্ব, এটা যেন ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছি না। কলকাতায় অভিযোগ অনেক বেশি থাকে।

আমি চুপ করে রইলাম। আমার দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেছে, সিগারেট ধরাতে পারছি না, এইটাই আমার একমাত্র চিন্তা। উল্টোদিকে থেকে একজন লোক হেঁটে আসছিল, মুখে সিগারেট, আমি তাকে বললাম, দাদা, একটু আগুনটা দেবেন? লোকটি থমকে দাঁড়াল। আমার সিগারেট ধরাতে যেটুকু সময় লাগল, সেই সময় লোকটি তাকাল ভারত কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত নারীটির দিকে। চিনতে পেরেছে কিনা কে জানে, তবে নিশ্চিত অবাক হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আমার দিকে এবং তাঁর দিকে দু-বার তাকাল।

উনি একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন এদিকে।

হঠাৎ আমার একবার মনে হল, এই লোকটিই কি গঙ্গার ধারের সেই আততায়ী? এরা ঠিক খবর পেয়ে যায়।

আমি লোকটিকে বললাম, ধন্যবাদ।

না, লোকটি চিনতে পারেনি। আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। আমি ওঁকে বললাম, আমি একটু বেশি সিগারেট খাই, আপনি কিছু মনে করছেন না তো?

উনি হাতের ভঙ্গিতে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমরা নদীর দিকে যাচ্ছি না কেন?

আমি বললাম, ঠিক কোন্ জায়গায় আপনাকে মানাবে, ঠিক বুঝতে পারছি না। পথপ্রদর্শকের অনেক দায়িত্ব।

উনি বললেন, আমি নদী দেখতে এসেছি। আমাকে সবচেয়ে বেশি মানায় উঁচু মঞ্চে, সেটা আলাদা কথা।

আবার রাস্তা পার হবার একটা ব্যাপার হল। ছোটো রেল লাইন পেরিয়ে আমরা এলাম স্ট্র্যান্ডে। জায়গাটা নির্জন।

নদী এখন কালো এবং গম্ভীর। একটি আলো-ঝলমলে বিদেশি জাহাজ খুব কাছেই। জলে পড়েছে লম্বা লম্বা আলোর রেখা। দূরে কয়েকটা ডিঙি নৌকার লণ্ঠনকে এখান থেকে জোনাকি বলে ভ্রম হয়।

উনি মুখ তুলে তাকালেন নদীর দিকে। বললেন, কই কিছুই হলো না তো?

—কি?

—আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম মনে হবে। কিন্তু আমার মনে পড়ছে ফরাক্কার কথা, কলকাতা বন্দরের সমস্যা, বাংলাদেশের প্রয়োজনের কথা, এবং দ্বিতীয় সেতু—

আমি বললাম, আপনি এখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন কিংবা রাজভবনে প্রতিনিধি সম্মেলনে। আপনি নদীর কাছে আসেননি।

উনি চোখ বুজে আবার চোখ খুললেন। বললেন, এবার তো ভাল করে দেখতে পাচ্ছি নদীকে।

—জয় না সুখ, কোনটা?

—প্রশ্ন করো না।

—কী অসহায় মনে হচ্ছে আপনাকে।

একটু দর্পিত ভঙ্গিতে আমার দিকে ঘুরে বললেন, অসহায় কেন?

—জয় না সুখ আপনি বুঝতে পারছেন না।

—আমি আত্মচিন্তা করি না। আমাকে সারা দেশের কথা চিন্তা করতে হয়।

—এখানে কোনো দেশ নেই। এখানে শুধু নদী, চিরকালীন।

উনি খানিকটা অহংকার ও অভিমান মিশ্রিত মুখে তাকিয়ে রইলেন নদীর দিকে। ওঁর ঠোঁট কাঁপছে। কিছু যেন বলতে চান।

তারপর নিজেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন জলের কাছে। নিচু হয়ে জলে হাত দিলেন।

আমি ভাবলাম, উনি নিশ্চয়ই নদীর জল মাথায় ছেটোতে চান। পরক্ষণে মনে হল, হয়তো, নদীর কাছে গেলেন কোনো গোপন কথা বলার জন্য। আর তো কেউ নেই।

দ্বিতীয় মোনালিসা

এবার বোম্বাইতে গিয়েছিলাম প্রায় বছর পাঁচেক বাদে। ওখানে বাঙালি ও মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছে। অনেকদিন পরে গেছি বলে প্রায় সকলের সঙ্গেই একবার করে দেখা করতে হয়। নেমন্তন্ন খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিরাট ছড়ানো শহর বোম্বাই, এক মহল্লা থেকে আর এক মহল্লায় আমি ছুটোছুটি করে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতে লাগলুম।

ফেরার দিন ঘনিয়ে এল। আরো অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি। টেলিফোনে যাকে বলে ফেলেছি, অথচ হাতে আর সময় নেই। এই জন্যই খুব বড় কোন জায়গায় আমার যেতে বিশেষ ইচ্ছে করে না। সে সব জায়গায় শুধু চেনা লোকেদের সঙ্গেই দেখা হয়, আর কিছু দেখা হয় না। এর চেয়ে কোন নাম-না-জানা ছোটখাটো জায়গায় আমার একা একা বেড়াতে ভাল লাগে।

তবু এর মধ্যে একবার সুমিতাদির বাড়ি যেতেই হবে। উনি অনেক আগে বলে রেখেছেন। ওর ওখানে একদিন খেতে হবে। প্রায় রাজনৈতিক নেতাদের মতন ব্যস্ত ভঙ্গিতে আমি এক সকালে অন্য দুবাড়ি ঘুরে তারপর হাজির হলাম সুমিতাদিদের বাড়িতে। ওর স্বামী ডাক্তার, ওরা বহু বছর ধরে আছেন বোম্বাইয়ে, সুতরাং বোম্বাইয়ের আশেপাশের কোন্ কোন্ জায়গা আমার দেখা উচিত তা ওরা খুব ভাল জানেন, সেই সব জায়গার কথা আমাকে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু আমার আর সময় নেই। আগামী কাল ভোরবেলায় আমায় প্লেন ধরতে হবে।

সুমিতাদির ছেলের নাম আনন্দ, সে ছবি আঁকে। বছর কুড়ি-একুশ বয়েস, বেশ সুদর্শন এবং উৎসাহে ভরপুর ছেলেটি। তার দু-একটি ছবি এখানকার প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছে। সে তার ছবিগুলো দেখাতে লাগল। আমি ছবির খুব একটা সমঝদার নই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ভাল বলাই নিয়ম, তাই বেশ ভাল ভাল বলে যাচ্ছিলাম। চোখে দেখতে ছবিগুলো ভালই লাগছিল।

একটি বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি বার করে সে বলল, দেখুন আমার এই ছবিটা একজিবিশনে প্রাইজ পেয়েছে।

আমি বললাম, বাঃ এটা তো দারুণ!

ছবিটি লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা'র একটি কপি। রং অবশ্য অন্যরকম। কালো আর নীল রংয়ের ব্যবহারই বেশি। অনেকটা যেন ফটোগ্রাফের নেগেটিভের মত।

আমি প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বলল, আপনি এই ছবিটা নেবেন?

সুমিতাদিও অমনি বললেন, হ্যাঁ, ছবিটা সুনীলকে উপহার দে।

আমি প্রবল আপত্তি করে উঠলুম। কারুর বাড়িতে গিয়ে কোন কিছুর প্রশংসা করা মানেই সেই জিনিসটি নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা নয়। এরকম ভাবে কোন জিনিস নেওয়া আমার কাছে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার।

আমি যত না না করতে লাগলুম, ওরাও ততই জোর করতে লাগলেন। তখন আমাকে দৃঢ়ভাবে বলতেই হল যে, ছবিটা নিয়ে আসার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ, এখান থেকে আমাকে আরও তিন জায়গায় যেতে হবে, সব জায়গায় আমি এতবড় একটা ছবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারব না। তা ছাড়া আমি কলকাতায় ফিরব বিমানে, এই সাইজের একটি ছবি হাতে করে নিতে দেবে না। লাগেজ হিসাবে বুক করলেও ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আসল কথাটা হচ্ছে এই, কলকাতায় আমার বাড়িতে অতবড় একটা ছবি টাঙানোর জায়গা নেই। তা ছাড়া, মোনালিসার একটি কপি সম্পর্কেও আমার আগ্রহও প্রবল নয়।

সেদিন নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম।

কলকাতায় ফেরার মাস দেড়েক বাদে একদিন একজন অপরিচিত লোক এলেন আমার কাছে। লোকটি বললেন যে, তিনি বোম্বাই থেকে আসছেন এবং তাঁর হাত দিয়ে সুমিতাদি আমার জন্য একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।

বিশাল প্যাকেটটি দেখেই আমি বুঝলাম, ওটা সেই মোনালিসার ছবি।

সুমিতাদির ছেলে খুব যত্ন করে বাঁধিয়েছে ছবিটি। এঁকেছেও অনেক পরিশ্রম করে। ছবিটির বেশ কিছু গুণও রয়েছে। সুতরাং এমন একটা জিনিস আমাকে শুধু শুধু উপহার দেওয়ায় আমি তখনও একটু লজ্জা বোধ করলুম।

আমার ছোট ঘরটি বইয়ের র‍্যাকে ভর্তি। দেয়ালে অতবড় একটি ছবি টাঙানোর খুবই অসুবিধে। তা ছাড়া, বড় ছবি দেখতে হয় অনেকটা দূর থেকে, এত ছোট ঘরে এই ছবি মানায় না। কিন্তু উপায় তো নেই। ছবিটা রাখলাম আমার শোয়ার খাটের পাশেই মাটিতে।

খাটে শুয়ে শুয়ে আমি লিখি বা বই পড়ি। প্রায়ই চোখ চলে যায় ছবিটার দিকে। প্রত্যেকদিন দেখতে দেখতে ছবিটা আমার মুখস্ত হয়ে গেল। কোথায় কোন রং ঠিকমত মিশেছে বা মেশেনি, সব আমি এখন ধরতে পারি।

প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে মূল মোনালিসা ছবিটি রাখা আছে। সাহেবরা এখন উচ্চারণ করে মোনালিজা। কিন্তু বাংলাতে মোনালিসাই চলে গেছে। একদিন সকাল দশটা থেকে আমি ল্যুভর মিউজিয়াম দেখতে শুরু করেছিলাম। অতবড় বিরাট মিউজিয়াম একদিনে দেখা শেষ হয় না। চতুর্দিকে বিশ্ববিখ্যাত সব ছবি ও মূর্তি। বিকেলবেলা গেট বন্ধ হয়ে যাবার ঘন্টা পড়েছে, তখন খেয়াল হয়েছিল, আরে, এখনো তো মোনালিসাই দেখা হয়নি! গাইডদের জিজ্ঞেস করে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মোনালিসার ছবির সামনে দাঁড়ালাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমি হতাশই হয়েছিলাম তখন!

যে-কোন ব্যাপার সম্পর্কেই আগে থেকে অনেক কিছু শোনা থাকলে সত্যি চোখে দেখার পর সেটা আর ঠিক মেলে না। কল্পনার কাছে বাস্তব হেরে যায়। এই জন্যই অনেকে তাজমহল দেখতে গেলেও হতাশ হয়।

আসল মোনালিসা ছবিটি খুব একটা বিরাট আকারেরও নয়। আরো অনেক ছবির মধ্যে একটি মাঝারি আকারের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, ওমা, এই সেই বিখ্যাত ছবিটা! কী জন্যে এর এত নাম-ডাক।

এই মৃদুহাস্যমুখী নারীটিকে নিয়ে কতরকম জল্পনা-কল্পনাই হয়েছে এতকাল ধরে। অনেকের মতে, যে-মহিলাটিকে দেখে লিওনার্দো এই ছবিটি এঁকেছিলেন, সে সময় মহিলাটি ছিল গর্ভিণী। পিছনের পাহাড়ের পটভূমিকায় এক চিরকালের নারী। তার মুখের হাসিটির মধ্যে রয়ে গেছে সৃষ্টির রহস্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুমিত্রাদির ছেলে আনন্দ অবশ্য পুরো ছবিটি আঁকেনি। পিছনের পটভূমিকা সে বাদ দিয়েছে, তার বদলে জুড়ে দিয়েছে একটা কালো রঙের চাঁদ। ঠোঁটের পাতলা হাসিটিই নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে এক ধরনের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। কিন্তু মুখের আদলটি ঠিক মোনালিসারই মতন। আর আসল মোনালিসার চেয়েও এই ছবিটি আকারে বড়।

এক একসময় চমকে উঠি। আমার শিয়রের কাছে একটি মেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ মনে হয় জীবন্ত। এত কাছে কেউ ছবি রাখে না। কিন্তু আমাকে রাখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কোন কোনদিন রাত্রে আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়ি, একসময় ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয় মোনালিসা আমার মাথার ওপর ঝুঁকে আছে। এক্ষুনি যেন বলবে, এই ওঠ, অন্ধকার কর ঘর!

বাড়িতে যে-সব লোকজন আসে, তারা ছবিটা দেখে নানারকম মন্তব্য করে।

কেউ বলে, বাঃ বেশ ভাল ছবিটা তো। কোথায় পেলে?

এটা কার ছবি? মোনালিসা না? ঠিক ধরেছি কি না বল?

কেউ কেউ প্রথমেই খুব সতর্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, এটা কার আঁকা?

অর্থাৎ যদি এটা আমার নিজের আঁকা হয়, কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের আঁকা হয়, তা হলে ভাল বলবে। আর যদি শোনে কোনো নতুন শিল্পীর, তা হলে বলবে মন্দ না।

একজন আমাকে বলেছিল, মাথার কাছে অত বড় একটা ছবি রেখেছ, তোমার ভয় করে না?

না, করে না। ছবি দেখলে ভয় করবে কেন? কিন্তু প্রত্যেকদিন দিনের অনেকখানি সময় ওই ছবিটা দেখার ফলে মুখটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায়। যখন তখন চোখ বুজলেও আমি ওই মুখটা দেখতে পাই।

এরপর একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। কোন একটা জরুরি কাজে আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিলাম, গড়িয়াহাট মোড় পেরুবার সময় বাঁ দিকের ফুটপাতের ওপর দাঁড়ানো একটি মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। মুখখানা খুব চেনা-চেনা। কোথায় যেন দেখেছি।

গোলপার্কে আসবার আগেই আমার মনে হল, ওই মুখ তো ঠিক মোনালিসার মত। সাঙ্ঘাতিক মিল আছে। এরকম কখনো হয়!

আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি-চালককে বললাম, ট্যাক্সিটা ঘোরাও তো! সে একটু অবাক হল।

পুরো গোলপার্কটি ঘুরে, গড়িয়াহাট মোড়ের লাল বাতি পেরিয়ে আরও সামনে খানিকটা গিয়ে বাঁক নিয়ে যখন বাঁ দিকে এলাম, তখন সেখানে মেয়েটি নেই। হয়তো এর মধ্যেই কোন বাসে উঠে পড়েছে, কিংবা রাস্তা পেরিয়ে গেছে। তাকে আর দেখা গেল না।

যেতে যেতে আমি ভাবতে লাগলাম, এ কি আমার মনের ভুল? আমি বাড়িতে সব সময় মোনালিসার মুখ দেখছি বলেই পথে-ঘাটেও এখন মোনালিসা দেখতে শুরু করেছি! কিন্তু রাস্তায় তো আরও অনেক মেয়ে দেখি, আর তো কখনো মনে হয়নি এরকম।

ব্যাপারটা সেখানেই ভুলে গেলাম।

কিন্তু দিন পনেরো পরেই, খুব সম্ভবত সেই মেয়েটিকেই আমি দেখলাম আবার। এবার আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তায়, মেয়েটি চলে গেল ট্যাক্সিতে। একবার মুখ ফিরিয়েছিল আমার দিকে, তাতেই আমি কেঁপে উঠেছিলাম। একেবারে অবিকল সেই মুখ। মোনালিসার মতনই খানিকটা ভারী চেহারা, প্রায় গোল ধরনের মুখ, এই রকম গালে সাধারণত টোল পড়ে, খোলা চুল।

ট্যাক্সিটার দিকে আমি সতৃষ্ণ ভাবে চেয়ে রইলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখা গেল না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে আমি ছবির মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করলাম, বল তো, সুন্দরী, তোমার মতন দেখতে আর কেউ আছে? থাকতে পারে?

ছবির মোনালিসা যেন স্পষ্ট উত্তর দিল, না, নেই, না নেই, থাকতে পারে না, থাকতে পারে না।

আমার ঘরে প্রতি মাসেই বইপত্র বাড়ে। নানান জায়গা থেকে বই পাই। এত ছোট ঘরে রাখবার জায়গা হয় না। ছুটির দিনে বই গুছোতে গিয়ে সারাদিন কেটে যায়। ছবিটাকে এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রাখি, একবার রাখলাম দরজার পাশে।

সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জ্বেলে দেখলাম, দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা ছবিটা আছড়ে পড়ে গেছে মাটিতে। বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। উঠে গিয়ে ছবিটাকে দাঁড় করালাম। মনে হল ছবির মোনালিসার মুখে যেন একটা অভিমানের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি তাকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে দরজার পাশে রেখে দিয়েছি। সেই জন্য।

যত্ন করে ছবিটার গায়ে হাত বুললাম। পড়ে যাবার জন্য ছবিটার কোন ক্ষতি হয়নি অবশ্য। কিন্তু এরকম ভাবে বার বার পড়ে গেলে ফ্রেমটা ভেঙে যাবে।

ছবিটা আবার নিয়ে এসে রাখলাম শিয়রের কাছে। মোনালিসা সুন্দরীর গালে হাত দিয়ে বললাম, রাগ কোর না লক্ষ্মীটি! আর তোমায় কক্ষনো অন্য জায়গায় রাখব না।

পরদিন সকালে উঠে মনে হল, ছবিটার বড় অযত্ন হচ্ছে। আমার ঘরে এভাবে ফেলে না রেখে বরং কারুকে দিয়ে দেওয়া উচিত। কাকে দিই?

চেনা-শোনা অনেকেই ছবি ভালবাসে, কেউ বা রীতিমত ছবির বোদ্ধা। তাদের যে-কোন একজনের কাছে প্রস্তাবটা তোলা যায়। কিন্তু ঠিক কাকে যে প্রথমে বলব, সে বিষয়েই মনস্থির করতে পারলাম না।

আজ হঠাৎ মনে পড়ল দেবেশদার কথা। দেবেশদা একজন নাম-করা ডাক্তার, কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত একটি ব্যতিক্রম। তিনি দারুণ ভালবাসেন গান, ছবি, কবিতা—এইসব। সারাদিন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু রাত আটটার পর আর রোগী দেখতে চান না পারতপক্ষে। নেহাত কোন মরণাপন্ন কেস এলে তিনি দেখেন, নইলে বলে দেন, এখন আমার ছুটি। সারাদিন অসুস্থ লোকের সঙ্গে কাটালে আমি নিজে বেঁচে থাকার আনন্দটা পাব কখন? কলকাতা শহরে একমাত্র দেবেশদার চেম্বারেই আমি রবীন্দ্র-রচনাবলী দেখেছি। রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি একটু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে নেন।

রাত আটটার পর দেবেশদার চেম্বারে খুব জোর একটা আড্ডা হয়। মাঝে মাঝে সেখানে গেছি আমি। তখন সেখানে একদম অসুখের কথা আলোচনা হয় না। হয় শুধু সুখের কথা। কেউ এসে গান গায়, কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে। দেবেশদা নিজেও প্রায়ই আমাদের মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ স্বরচিত কবিতা শোনান। সেগুলি অবশ্য কবিতা হিসেবে এমন কিছু নয়, কিন্তু তাঁর উৎসাহটা দেখবার মত।

একদিন দেবেশদার আড্ডাখানায় কথায় কথায় বললাম, দেবেশদা, তুমি, একটা ছবি নেবে? তোমার চেম্বারের এই দিকের দেয়ালটা ফাঁকা আছে, এখানে ছবিটা মানাবে।

কী ছবি?

আমি ছবিটার পরিচয় দিলাম। দেবেশদা সব শুনে আবেগের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই। রোগী দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ছবিটার দিকে তাকালে আমার মন ভাল হবে। রোগীদেরও মন ভাল লাগবে। যা, যা, নিয়ে আয়।

দু-একদিনের মধ্যেই আমি ছবিটা পৌঁছে দিলাম।

তারপর থেকে আমার ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। ঘরে ঢুকেই মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই। তবু এতদিন একটি নারীসঙ্গ পেতাম এখন ঘরটা শূন্য মনে হয়। এক-একদিন বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে আমার ঘরের আলো জ্বেলে হঠাৎ মনে হয়, আমার খাটের মাথার সামনে মোনালিসাকে দেখতে পাব। কিন্তু সেখানে একটা বইয়ের গাদা জমে গেছে। একটু একটু মন খারাপ লাগে।

হয়তো ওই ছবিটার টানেই আমি দেবেশদার, আড্ডায় ঘন ঘন যেতে লাগলাম। কথা বলতে বলতে প্রায়ই ছবিটার দিকে তাকাই। মনে হয় মোনালিসা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যেন তার মুখে একটু অভিমানের পাতলা ছায়া নতুন করে লেগেছে। আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, সেই জন্য অভিমান? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার তো আর কিছু করার ছিল না। এখানে ছবিটা পাঠিয়ে দিয়ে বরং অনেক ভাল হয়েছে। দেখছে অনেকে। মোনালিসা যদি একজন জীবন্ত মেয়ে হত, তবে সে শুধু একজনের হত। কিন্তু শিল্পকীর্তি সকলের জন্য।

দেবেশদা ছবিটা পেয়ে খুব খুশি। আমাকে প্রায়ই বলেন, জানিস প্যারিসে একবার একটা কনফারেন্সে গিয়ে আমি আসল ছবিটা দেখেছিলাম। এই ছবিটা অবশ্য সেটার মতন নয়, অনেক কিছু বাদ গিয়েছে।

আমি বললাম, একজন আধুনিক শিল্পী এঁকেছে তো, সে তো খানিকটা নিজস্ব চিন্তা মেশাবেই।

দেবেশদা বললেন, ঠিক। একালের কোন ছেলে যদি পুরনো কালেরই অনুকরণ করে তা হলে আর সে আধুনিক কেন? সে তো নতুন কিছু করবেই। ওই যে কালো রঙের চাঁদটা এঁকেছে ওটা সত্যি দারুণ!

আমি অবশ্য ওই চাঁদের ব্যাপারটা খুব একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ভাল মনে করিনি। তবু চুপ করে রইলাম।

দেবেশদা বললেন, আমার কাছে যখন রোগীরা আসে, আমি প্রথমেই এ ছবি সম্পর্কে একটা লেকচার দিই। রোগীদের মন যদি কিছুক্ষণের জন্য অন্তত রোগ থেকে সরানো যায়, তা হলেই অর্ধেক চিকিৎসা হয়ে যায়, বুঝলি না? সবাইকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, এই মুখটা কার বলুন তো? বেশির ভাগ লোকই বলতে পারে না। সব ইডিয়েট তো! এদেশের লোকের তো ছবি দেখার চোখ নেই। স্কুল-কলেজে যারা লেখাপড়া শেখে তারাও শিল্প সম্পর্কে কিছু জানে না। অথচ আমরা ভারতীয়রা নাকি দারুণ সংস্কৃতিবান।

দেবেশদা শিল্প সম্পর্কে এক লম্বা লেকচার দিলেন, আর ততক্ষণ আমি মোনালিসার দিকে চেয়ে রইলাম। যেন আমি আমার এক পুরনো প্রেমিকাকে দেখছি।

দেবেশদা আবার বললেন, বিশেষ করে এই ছবিটা নিয়ে আমি বেশিক্ষণ কথা বলি প্রেগনেন্ট মেয়েদের—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেবেশদা, আপনিও তাহলে বিশ্বাস করেন যে মোনালিসা একটি গর্ভবতী মেয়ের ছবি?

দেবেশদা জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! এই চোখের নিচের জায়গা দুটো দ্যাখ, ঠিক প্রেগনেন্ট মেয়েদের এরকম হয়। তারপর দ্যাখ মেয়েটির যা বয়স, সেই তুলনায় তার বুক দুটো অনেক বড়। তার মানে প্রায় ন'মাস। আর এর যে পোশাক, ইয়োরোপে পোয়াতি মেয়েরাই এরকম পোশাক পরে।

আমি বললাম, তা ঠিক।

দেবেশদা বললেন, সবচেয়ে বড় হচ্ছে এর হাসিটা। আহা! এ যেন বিশ্বপ্রকৃতি! যে প্রকৃতি মানুষের জীবন-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রাণ সৃষ্টির যে কী অপূর্ব আনন্দ! সেইজন্যই আমি আমার কাছে যে সব পোয়াতি মেয়েরা আসে, তাদের বলি, আপনাদের যা কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে সব ভুলে যান। এরকম ভাবে একটু হাসতে শিখুন তো!

আমি বললাম, দেবেশদা জান, কলকাতার রাস্তায় আমি একটি মেয়েকে দেখেছি, তাকে দেখতে ঠিক মোনালিসার মতন!

দেবেশদা হা হা করে হেসে উঠলেন। আমার কাঁধে একটা প্রবল চাপড় মেরে বললেন তোরা কবিরা বড্ড রোমান্টিক! এরকম মুখ বাস্তবের কারুর সঙ্গে কক্ষনো মেলে না! ইয়োরোপেই এরকম মুখ আর একটিও দেখা যায় না, কিন্তু তুই দেখতে পেলি কলকাতা শহরে? হা-হা-হা!

সব গল্পের শেষেই একটা চমক থাকে। আজকাল চমক ছাড়াও অন্য রসের গল্প লেখা হয়, কিন্তু এর মধ্যে আমি নিজেই একটা দারুণ চমক খেলাম বলেই সেটা লিখতে হবে আমাকে।

একদিন বিকেলের দিকে দেবেশদার চেম্বারে যেতে হল আমাকে। আমার ছোটমাসির একটা ব্লাড রিপোর্ট দেখবার জন্য। এই সময়ে দেবেশদার চেম্বারে বেশ ভিড় থাকে। অন্তত দুঘন্টা আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমার তো এতসময় অপেক্ষা করলে চলবে না। ভেতরে একজন রোগী আছে বলে আমি দেবেশদার অ্যাসিস্ট্যান্ট কানাইয়ের হাত দিয়ে একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে বসে রইলাম।

ডাক্তারদের চেম্বারের বাইরে ওয়েটিং রুমে অনেক রকম পুরনো পত্র-পত্রিকা থাকে। সেরকম একটি পত্রিকা আমি তুলে নিতে যাচ্ছি এমন সময় পাশ থেকে আর একজন মহিলাও ঠিক সেই পত্রিকাটি নেবার জন্যই হাত বাড়ালেন।

আমি তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, নিন না আপনি, নিন।

মহিলাটি আমার দিকে তাকালেন। তখনই আমি আমূল চমকে উঠলাম। এই মহিলাটিকেই আমি একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে আর একদিন চলন্ত ট্যাক্সিতে দেখেছিলাম। সেই মোনালিসার মুখ।

বেশ স্বাস্থ্যবতী, সচ্ছল চেহারার মেয়েটি। মুখে আধুনিক আভিজাত্যের চিহ্ন। সে কোন কথা না বলে পত্রিকাটি তুলে নিল। সে কিংবা তিনি। মেয়েটির চেহারার মধ্যে তুমির বদলে আপনি আপনি ভাব আছে। আমার ঠিক পাশেই বসে আছেন বলেই আমি তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিলাম না। একটু দূরে বসলে ভাল হত!

একটু পরেই দেবেশদা আগের রোগীটিকে ছেড়ে দিয়ে চেম্বারের দরজা খুলে বললেন, আয় সুনীল, ভেতরে আয়!

আমি ভেতরে ঢুকেই নিজের কাজের কথা বলবার বদলে উত্তেজিত ভাবে ফিসফিস করে বললাম, দেবেশদা আপনাকে বলেছিলাম না, একটি মেয়েকে ঠিক মোনালিসার মতন দেখতে!

দেবেশদা খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, কোন মেয়েটি!

আমি বললাম, আমি যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার পাশের মেয়েটি।

দেবেশদা চেম্বারের দরজা খুলে উঁকি মেরে এলেন। ফিরে এসে বললেন, তোর মাথা খারাপ! ও তো রুচিরা সান্যাল, জ্যাস্টিস পি সান্যালের মেয়ে। ওর সঙ্গে তুই মোনালিসার কোন মিল খুঁজে পেলি?

—কেন, আপনি পেলেন না?

—কিসের মিল? কোন মিল নেই!

আমি ছবির মোনালিসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনেকটা মিল আছে। একই রকম থুতনি, একই রকম চাহনি, একই রকম ওষ্ঠের রেখা।

দেবেশদা বললেন, ডাকব ওকে? তুই ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাস?

আমি বললাম, না, না, আমি আর কী কথা বলব!

দেবেশদা মোনালিসার ছবিটার দিকে তাকালেন একবার। তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই যখন কথাটা তুললিই তখন তোকে একটা কথা বলি। বলা উচিত নয়, তবুও বলছি। রুচিরা এখানে কেন আসে জানিস?

আমি কৌতূহলী চোখে তাকালাম।

দেবেশদা বললেন, ও গর্ভপাত করাতে চায়। আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে ছিলাম, ও শোনেনি। ও করাবেই। আমারও কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে, ওর যুক্তিটাই ঠিক। বোধহয় ওর গর্ভপাত করানোই উচিত।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কেন?

দেবেশদা বললেন, তুই রুচিরা সান্যালের নাম শুনিস নি? কাগজে একবার-বেরিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে গত বছর ওকে পুলিশে অ্যারেস্ট করেছিল। জেরা করার সময় নানারকম বীভৎস অত্যাচারে ও অজ্ঞান হয়ে যায়। সে সব অত্যাচারের কথা আর তোকে শোনাতে চাই না। তারপর যখন ও বেল-এ ছাড়া পেল তখনই টের পেল যে ও গর্ভবতী। ওর গর্ভে এক চরম অন্যায়ের সন্তান। বাবা কে, তাও জানে না। এই সন্তানকে ও কোনোদিনই ভাল মনে নিতে পারলে না। তাই ও চায়...এ সম্পর্কে তুই কী বলিস?

আমার কিছু বলার নেই, আমি চুপ করে রইলাম।

দেবেশদার কাছে কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার সময় আমি সেই মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালাম। একটি পত্রিকা আড়াল করে সে বসে আছে। হ্যাঁ, এখন দেখলে বোঝা যায়, মেয়েটি গর্ভবতী। কিন্তু এর মুখে কী রাগ না দুঃখ না ঘৃণা না উদাসীনতা? অথবা সব মিলিয়ে অন্য একটি রূপ? আমি শিল্পী নই। আমার একটুও ক্ষমতা নেই ছবি আঁকবার। তবু আশা করে থাকব, নতুন কালের কোন শিল্পী নিশ্চয়ই একদিন এই মেয়েটির ছবি শাশ্বত করে রেখে দেবে।

পুরী এক্সপ্রেসের রক্ষিতা

বড় বড় গাছের মতন সব রেল স্টেশনেরই কয়েকটা পরগাছা থাকে। রোদ বৃষ্টি ধুলো কাদা মেখেও তারা বেড়ে ওঠে লকলকিয়ে। বেঁচে থাকার দুর্দমনীয় নেশায় তারা ঠিক প্রাণরস টেনে নেয়।

বানপুর স্টেশনের লাটু এইরকম এক পরগাছা। বছর এগারো বারো বয়েস, স্বাস্থ্যটি বেশ টনকো। অনেক পরগাছার ফুল আর পাতা মূল গাছের পত্রপুষ্পের চেয়েও বেশি সুন্দর আর উজ্জ্বল হয়। এই শ্রীহীন স্টেশনটির অধিবাসী লাটুরও এইরকম একটা সৌন্দর্য আছে, সেটা হল তার হাসি। জীববিজ্ঞানীদের মত হাসি হল শৈশবের অস্ত্র। ওই হাসির অস্ত্র সম্বল করে এই শত্রু-সঙ্কুল পৃথিবীতে মানবশিশু একটু একটু করে এগোয়। তা লাটু অনেকটা এগিয়েছে। প্রথম যখন তাকে এই স্টেশনে দেখা যায়, তখন তার বয়েস সাত-আট বছরের বেশি নয়। ন্যাড়া মাথা, ন্যাংটো, ঠিক একটা পেতনির বাচ্চার মতন দেখতে ছিল। এখন তার পরনে খাঁকি প্যান্ট ও গেঞ্জি, শীতকালে কী করে যেন সে একটা দুটো জামাও পেয়ে যায়, কম্বলের গরম স্বাদও তার অজানা নয়। এবং কী আশ্চর্য, মাঝে মাঝে সে গানও গায়।

লাটুর আর কোনো নাম নেই, পদবী নেই, পূর্ব পরিচয় নেই। চায়ের দোকানের বনমালীর মনে আছে, প্রথম যেদিন লাটুকে দেখা যায়, সেদিন সে বাবা-বাবা বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে সারা প্ল্যাটফর্ম ছোটাছুটি করছিল। তখন কিন্তু কোনো ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল না। ফাঁকা স্টেশন। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় লেগেছিল অনেকের কাছে। ট্রেন ছেড়ে গেল, ছেলে উঠতে পারল না, এমন হয়। কিন্তু ট্রেন নেই, তবু ছেলেটা বাবা বাবা বলে ডাকছে কাকে। আগের ট্রেন চলে গেছে অন্তত দু'ঘন্টা আগে। তবে কি ছেলেটা ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ? আগে তাকে কেউ লক্ষ্য করেনি। যাই হোক সেই ডাকের জন্য বোঝা গিয়েছিল যে তার একটি বাবা ছিল। হয়তো একজন মা-ও ছিল।

লাটু যে কারুর হারানো ছেলে নয় তা তার ন্যাংটো কঙ্কালসার চেহারা দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল। রাস্তার ছেলেরা কখনো রাস্তা হারায় নাকি? পুলিশের লোকেরা এইসব ছেলেদের খোঁজখবর করে তাদের বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসে না। পুলিশ তো শুধু বড়লোকদের দারোয়ান।

লাটুর খোঁজ করতেও কেউ কখনো আসেনি বানপুর স্টেশনে। স্বাভাবিক কারণে এ ছেলের নাম হওয়া উচিত ছিল ন্যাড়া বা নেড়ু কিন্তু তার ওই লাটু নাম দিয়েছে বনমালী। এ টুকু তার কল্পনা শক্তির পরিচয়। লাটু লাট সাহেবের অপভ্রংশ। বানপুর ধরনের জায়গায় এটা বেশ আদরের নাম। প্রথম দিন তার কান্না থামাবার জন্য বনমালী বলেছিল, আয় রে, লাটু, আয়, চুপ কর, একখানা বিস্কুট খা। ন্যাড়া মাথা ছিল বলে লাটুর বিষয়ে বনমালী একটা তত্ত্বও তৈরি করেছে। এ ছেলেটাকে ওর বাপ-মা মা কালীর কাছে উচ্ছুগ্যু করে গেছে। বানপুরে জাগ্রত রক্ষাকালীর বড় মন্দির আছে বটে।

ট্রেন এলে লাটু ভিক্ষে করে। প্রকৃতিই তাকে একটা বিশেষ কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে। সে অন্য ভিখিরিদের মতন ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদুনি গায় না। তার মুখখানাই হাসি হাসি। যাত্রীদের সঙ্গে সে কৌতুকের সুরে কথা বলে। ও বাবু, দাও না দশটা নয়া, এক্ষুনি তো একটা সিগ্রেট খেলে দশ নয়া খরচ হয়ে যাবে। দাও না! ও মা, কুড়িটা নয়া দেবে, জিলিপি খাব? বড্ড ইচ্ছে করছে। তা শুনে যাত্রীরা বলে, এ ছেলেটা তো বেশ মজার। মজা পেলেও সবাই পয়সা দেয় না, যেমন গান শুনলেও দেয় না। কেউ কেউ দেয়।

তাতে দেড় টাকা দু-টাকার বেশি হয় না। বড় ট্রেন একটাই আসে, তাও রাত দশটার পর, সেটা ভিক্ষে দেবার সময় নয়। আর সারাদিনে দু'টো লোকাল ট্রেন থাকে। লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা কঞ্জুসও হয়, ভিখিরিদের সব কায়দাকানুনও তাদের জানা হয়ে যায়।

বানপুর স্টেশনের সেরকম জৌলুশ নেই। একটা মাত্র চায়ের স্টল। তাই নিয়ে টিমটিম করে টিকে আছে বনমালী। মাঝে মাঝে আরও কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী সিঙ্গারা মিষ্টি বা ফলটলের ঝুড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে, বিশেষ সুবিধে হয়নি, তারা সরে পড়েছে অন্য স্টেশনে।

ডাউনে খড়গপুর, আপে ভদ্রক। এই দুটো বড় স্টেশনই যাত্রীদের সব আকাঙ্ক্ষা পুরিয়ে দেয়, মাঝখানের বানপুরের তাই সর্বক্ষণই একটা ঝিমোনো ভাব। এর মধ্যে লাটুই যা দৌড়াদৌড়ি করে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে খানিকটা প্রাণের স্পন্দন দেখায়।

ভিক্ষের ব্যাপারে লাটুর দু-তিনজন প্রতিযোগী আছে। কানা বুড়ো আর তার বউ, আর নুলো হরি। তবে এরা কেউই লাটুর মতন স্থায়ী নয়। ট্রেনের সময়ে আসে, অন্য সময়ে কালীমন্দিরে চলে যায়, সেখানেই তাদের আস্তানা। এদের মধ্যে কানা বুড়ো আর তার বউ নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, একখানাই মাত্র গান তারা জানে, "কেমনে পার হব

ভবের তরী, দীনবন্ধু দাও কানাকড়ি"। সেটাই একঘেয়ে সুরে দুজনে মিলে গেয়ে যায়। নুলো হরিটা একটু ত্যাঁদোড়, সে প্রায়ই লাটুর পেছনে লাগে, বয়েসেও সে কিছু বড়। নুলো হরির মুখে একটা হিংস্র ভাব আছে। যখন সে কারুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকায়, তখন তার চোখের মণিদুটিতে যেন দেখতে পাওয়া যায় এক ভবিষ্যৎ খুনিকে।

নুলো হরি যখন লাটুকে তাড়া করতে করতে প্রায় ধরে ফেলে, সেই সময় লাটু এসে লুকোয় বনমালীর পেছনে। সেখান থেকে সে অঙ্গভঙ্গি করে বলে, শালা, তোর আর একখানা হাতও আমি কেটে দুবো। শালা খানকির বাচ্চা।

নুলো হরি ক্রুর চোখে তাকিয়ে থাকে, ঠোঁটটা বেঁকে যায়, সে বিড়বিড় করে বলে, কুত্তা, শালা, রাস্তার কুত্তা, তোর যদি আমি ঘাড় না ভাঙি তো শালা আমি বেজন্মা!

লাটু আর নুলো হরির মধ্যে একটা শ্রেণী বৈষম্য আছে। কারণ, সবাই জানে নুলো বেজন্মা নয়, তার একটি মা আছে এবং একজন আইনসঙ্গত বাবাও ছিল, অনেকের চোখের সামনেই সে মরেছে। আর তুলনায় লাটু একটা রাস্তার কুকুর।

ওদের এই ঝগড়ার সময় বনমালী একটাও কথা বলে না। মিটিমিটি হাসে।

খানকি কাকে বলে তা কি এগারো-বারো বছরের ছেলে লাটুর জানবার কথা? যোগ-বিয়োগও শিখেছে। দুটাকা কুড়ি নয়া থেকে আটআনা বাদ গেলে কত থাকে, তা সে ঝড়াকসে বলে দিতে পারে। দূর থেকে আওয়াজ শুনেই সে জেনে যায় এটা প্যাসেঞ্জার না মালগাড়ি। স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে মন দিয়ে টরেটক্কা শোনে, এক একদিন সেই টরেটক্কা শুনেই সে বুঝতে পারে। দৌড়ে এসে বনমালীকে বলে, এখন চায়ের জল চাপিও না, আজ ভদ্রক লোকাল লেট আছে।

এক একটা ট্রেন পাশ হয়ে গেলে বনমালী হাঁক দেয়, লাটু লাটু, এই লাট-সাহেবের বাচ্চা, এদিকে আয়।

লাটু সাড়া দেয় না, সহজে তার পাত্তা পাওয়া যায় না। বনমালীর দোকান গেটের কাছেই, সে সেদিকে চোখ রাখে যাতে লাটু বেরিয়ে যেতে না পারে। কয়েকবার ডাকাডাকির পর লাটু গুটিগুটি এসে হাজির হয়।

—কোথায় ছিলি? ডাকছি কানে যায় না?

—পাগলির কাছে বসেছিলুম।

—কেন? সেখানে কিসের আঠা?

—আমায় ডেকেছিল। এই র'ম ভাবে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল।

—লাথি খাবি?—চুলকোচ্ছে?

ভিজে হাতটা গামছায় মুছে লাটুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দে।

লাটু হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে পাঁচ পয়সা দশ পয়সা মিলিয়ে চল্লিশটা পয়সা বার করে বনমালীর হাতে দেয়। তারপর মিটিমিটি হাসে।

—মোটে এই ক-টা? বার কর।

—আর পাই নি, মা কালীর দিব্যি বলছি, বনোদা।

—বার কর বলছি।

—মাইরি বলছি, বনোদা, আর পাইনি।

লাটুকে লাইনের ধারে ঠেলে নিয়ে গিয়ে বনমালী ডান পা-টা তুলে দেয়। লাথি মারে না, অদ্ভুত কায়দায় সে পায়ের আঙুল দিয়ে লাটুর পেটে চিমটি কেটে ধরে? লাটু হেসে ওঠে খিলখিল করে।

হারামি, তুই পাগলির পয়সা চুরি করতে যাস?

—না, বনোদা, সত্যি বলছি।

—দোব, ঠেলে ফেলে দোব লাইনে?

—আর একটা দশ নয়া আছে শুধু। জিলিপি খাব।

—দে।

লাটু আর একটা দশ নয়া বার করে দিয়ে ছাড়া পায়। পয়সাগুলো একটা কৌটোয় রাখতে রাখতে বনমালী বলে, কেটলিতে একটু চা আছে খাবি তো খা।

—একটা লেড়ো বিস্কুট নেব, বনোদা।

—মুখে ইয়ে গুঁজে দোব।

এই ধরনের কথা বললেও লাটুর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বনমালীর। লাটুর যা রোজগার, তা সব সে নিজের কাছে রাখতে চায়। এটা যেন তার অধিকার। প্রথম দিন সে লাটুকে একটা বিস্কুট দিয়েছিল, তার পরেও প্রায়ই কিছু কিছু খেতেটেতে দিয়েছে। লাটু তার পোষ্য, সুতরাং লাটুর উপার্জন তো বনমালীরই হবে। লাটুর প্যান্ট-গেঞ্জি অবশ্য সে-ই কিনে দেয়।

মাস ছয়েক ধরে একটা ব্যাপারে লাটুর খাওয়ার চিন্তা ঘুচে গেছে। দু-বেলার খাওয়া সে বিনেপয়সায় পায়। তবু

লাটুর নোলা বড় বেশি, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার খরচও বেড়েছে। যখন তখন সে স্টেশনের বাইরের দোকানে জিলিপি কিনে খেতে ছুটে যায়। ছেলেটা একেবারে মিষ্টির পোকা। আগে আগে সে ওই দোকানটার সামনে হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়ে থাকত ঘন্টার পর ঘন্টা। ভাঙা টুকরো টাকরা চেয়েচিন্তে নিত। এখন সে পয়সা দিয়ে কেনে। আর এটাই তো বনমালীর চক্ষুশূল। একটা উচ্ছুগ্যু করা হা-ঘরে ছেলে, সে পয়সা দিয়ে জিলিপি কিনে খাবে?

বনমালীর সন্দেহ, সে লাটুর সব পয়সা কেড়ে রাখলেও লাটু কিছু কিছু পয়সা লুকিয়ে রাখে। প্রায়ই সে স্টেশনের বাইরে ছুটে যায়। মিষ্টি খেয়ে খেয়ে চেহারাটাও খোলতাই হচ্ছে দিন দিন। কালো, তেল-চকচকে ল্যাটা মাছের মতন পিচ্ছিল শরীর, এক মাথা হুড়োকুড়ো চুল। ছেদীলালের দেখাদেখি ইয়ার্ডের নিমগাছের ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে শিখেছে, ঝকমকে সাদা দাঁত। ওই দাঁতের জন্য তার হাসিটা এখন আরও সুন্দর হয়েছে, সেই জন্য ইদানীং ভিক্ষে একটু বেশি পায়।

বনমালীর কাছ থেকে লাটু পয়সা লুকোতে শিখেছে ঠিকই, সে দুরকম ভাবে লুকোয়। কিছু পয়সা এমন জায়গায় লুকোয়, যা বনমালী কোনোদিন খুঁজে পাবে না। আর কিছু পয়সা সে একটু আলগা ভাবে লুকোয়, বনমালী খানিকটা চাপ দিলেই যা বেরিয়ে আসে। গোপনে জমানো পয়সাটা সে রেখে আসে পাগলির কাছে।

এই স্টেশনের তিনজন কুলির মধ্যে কেলুচরণের সঙ্গেই লাটুর ভাব বেশি। ছেদীলাল আর গজা এই দুজন কেমন যেন কাঠখোট্টা ধরনের। যখন কাজ থাকে না, তখন পড়ে পড়ে ঘুমোয় শুধু। ওদের জীবনে কথাবার্তা বিশেষ নেই। কেলুচরণের বয়েস ওদের দুজনের চেয়ে অনেক বেশি, শরীরটাও বুড়িয়ে গেছে, হাঁটে আস্তে আস্তে, বেশি মাল বইতে পারে না, তবু তার মনটা খুব সজাগ। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজার পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে বসে থাকে, এই ছোট্ট জগতটাকে সে অনবরত পর্যবেক্ষণ করে আর বিড়বিড় করে কী সব বলে যায়।

কেউ জানে না, বানপুর স্টেশনের এই বৃদ্ধ মালবাহক কেলুচরণ মহান্তি আসলে একজন দার্শনিক। মানব জীবন সম্পর্কে তার একটা নিজস্ব দর্শন আছে। ওড়িয়া-বাংলা-হিন্দি মেশানো এক বিচিত্র ভাষায় সে কথা বলে। কোনো যাত্রী তাকে সামান্য কারণে বকাঝকা করলে কিংবা দশ-বিশ পয়সার জন্য মুখ ঝামটা দিলে সে রাগ করে না, কেশ-বিরল ছোট্ট মাথাটি নুইয়ে সে বিনীত ভাবে বলে, আপোনকার যা মনে হয়, তাই দিন। যাত্রীটি চলে যাবার পর সে আপন মনে বলে, মরিবার পরে যখন আপুনি আর আমি দুই জনাই চিতার কাঠে পুড়িব, তখন কিন্তু বাবু বলে আগুন আপোনার দেহটাতে মোলায়েম হবেনি।

আবার কখনো সে বলে, রাজাবাবু রাজভোগ আহার করে অম্বলের ঢেঁকুর তুলিলেন আর তুই ছাতু মন্ডা খেয়ে আরামে নিদ গেলি, তবে ভগবান কারে বেশি সুখী করিলেন?

এই কেলুচরণ লাটুকে দূরের হাতছানি দেখায়। কেলুচরণ কখনো-সখনো লাটুকে একটা-আধটা বিড়ি দেয়, তারপর বলে, ছোঁড়া, তুই কেন এইখানে রহিবি? যা যা, চলে যা, বড় জায়গায় যা, খড়্গপুরে যা, বালেশ্বরে যা, কটকে যা, সেখানে কত মানুষ দেখিবি, কত শিখিবি! যত বেশি রুপেয়া কামাবি, তত বেশি তাগত বাড়িবে।

লাটু জিজ্ঞেস করে, তুমি কেন যাও না? তুমি কেন এখানে থাক? ছেদীলাল তোমার চেয়ে কত বেশি মাল বয়, বেশি পয়সা পায়। তোমায় তো কেউ ডাকতেই চায় না!

কেলুচরণ হেসে বলে, আমি কত ঘাট ঘুরিছি, পুরী, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, লাখনৌ। মোর নিয়তি এইখানে আনিয়া ফেলিছে এখনে, এইখানে মোর অন্ন বান্ধা আছে।

প্রায়ই কেলুচরণ লাটুকে সাবধান করে বলে, গুটে কথা তোরে বলি শোন লাটু, পাগলের পয়োসা চুরি করিলে পরজনমে তুই চামপোকা হইবি। ঐসা কাম মাৎ কর। ওই ধান্দা ছেড়ে দে।

চামপোকা মানে কী তা লাটু জানে না। জিজ্ঞেস করলেও কেলুচরণ আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় না। কথাটা শুনলে লাটুর ভয় ভয় করে। সে জিভ কেটে বলে, মা কালীর দিব্যি বলছি—।

সকলেরই ধারণা, পাগলির সঙ্গে ভাব করার ছুতোয় লাটু ওর পয়সা হাতায়।

পাগলি থাকে উলটো দিকের প্ল্যাটফর্মে। ওদিকে প্রায় কোনো ট্রেনই থামে না, তাই ওদিকটা সর্বক্ষণ নির্জন, নোংরা। তবু ছাউনি আছে, আর একটা টিউবওয়েল। সন্ধের দিকে বানপুরের অনেকে রেলস্টেশনে বেড়াতে আসে, তাদের কেউ কেউ উলটো দিকের ঐ প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে বসে মদ-গাঁজা খায়। পাগলি সেখানে থাকলেও কোনো অসুবিধে নেই।

নামের অভাবে ওকে পাগলি বলেই ডাকা হয়, কিন্তু সবাই জানে ও পাগল নয়। চুপ করে ঠায় এক জায়গায় বসে থাকা ছাড়া ওর পাগলামির আর কোনো লক্ষণ নেই। চুপ করে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলে না, অনেকে হাজার চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে একটাও উত্তর আদায় করতে পারেনি। বোবা যে নয় তাও বোঝা যায়, কারণ বোবারাও মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করে, এই পাগলি একেবারেই নীরব।

বছর চল্লিশেক বয়েস, নিঙড়নো, ছিবড়ে হয়ে যাওয়া চেহারা, মুখে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার ছাপ। ও এই বানপুরে এসেছে মাত্র চার-পাঁচ মাস আগে। সেই দিনটির কথা লাটুর খুব ভাল মনে আছে—।

সেদিন রাত একটায় এসেছিল একটা অজ্ঞাতকুলশীল ট্রেন। এত রাতে বানপুরে কক্ষনো কোনো ট্রেন থামে না। মালগাড়ি হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু সেই ট্রেনে গরু-ছাগলের মতন গাদাগাদি করা মানুষ। কোনো চেনা ট্রেন লেট করে এসেছে, তাও হয়। লাটুর বড় অবাক লেগেছিল। স্টেশনে ট্রেন থামার শব্দ হলেই সবাই জেগে ওঠে। অভ্যেসবশত লাটু ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল, কেউ কিছু দেয়নি। এটা কোন্ ট্রেন গো? জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয়নি কেউ। লাটুর ছোট জীবনে সেই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এখানকার সব ট্রেনের নাড়ী-নক্ষত্র তার জানা। তার অভিজ্ঞতার বাইরের কিছু এসে তার মনটাকে ঝাঁকিয়ে দেয়। স্টেশন মাস্টারের ঘরে কেউ নেই। তিনি জানেন না, এমন ট্রেনও আসে?

ট্রেনটা প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সিগন্যাল পেয়ে ছাড়ল। প্ল্যাটফর্ম যখন প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বস্তার মতন কী যেন একটা এসে পড়ল ধুপ করে।

সবচেয়ে আগে ছুটে গিয়েছিল ছেদীলাল। জিনিসটার গায়ে হাত দিয়ে আঁতকে উঠে সে বলেছিল, সীয়া রাম! সীয়া রাম! এক জেনানা! আভি ভি জিন্দা হ্যায়।

স্টেশন মাস্টারের ঘরে তখন তালা। তিনি কোয়ার্টারে চলে গেছেন অনেক আগে। বাবুরা কেউ এ সময় থাকে না। আছে দুজন গার্ড আর স্টেশন মাস্টারের আরদালি নকুড়। এ স্থলে নকুড়ই বাবুসমাজের প্রতিনিধি। সকলের চ্যাঁচামেচি শুনে সে এল পর্যবেক্ষণ করতে।

স্ত্রীলোকটির সারাগায়ে ক্ষত চিহ্ন, পরনের শাড়িটা অত্যন্ত ময়লা ও ছিন্নভিন্ন, আর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সে ভদ্দরলোকদের বাড়ির বৌ-ঝি নয়। ভিখিরি-টিখিরি হবে নিশ্চয়ই। এর জন্যে কী আর এই মাঝরাত্তিরে মাস্টারবাবুদের খবর দেওয়া উচিত?

স্ত্রীলোকটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কেলুচরণ বলেছিল, এখনো প্রাণ আছে। তুমি কেন স্ত্রীহত্যার দায়ে পাতকি হবে নকুড় দাদা? বাবুদের ডাক। ওরে লাটু, পানি আনি দে! চোখে-মুখে ছিটা!

এ এস এম অসুস্থ, তাই বড়বাবুকেই ডেকে তুলতে হল। বড়বাবু মাত্র মাস দু-এক আগে বদলি হয়ে এসেছেন, ছোকরা বয়েসি। প্রথম দিনেই তিনি স্টেশন সাফাই না রাখার দায়ে দুই ঝাড়ুদারকে খুব ধাতানি দিয়েছিলেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক। এমনকি বনমালীর দোকান থেকে চা আনালে তিনি পয়সাও দিয়ে দেন ঠিকঠাক।

বড়বাবুর নাম পরমেশ। তিনি সুখনিদ্রা থেকে উঠে এসেও বিরক্ত না হয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখালেন। স্ত্রীলোকটি চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেও অজ্ঞান হয়নি; আহত, ভয়ার্ত জন্তুর মতন চেয়ে আছে ড্যাবডেবিয়ে।

বড়বাবু বললেন, একে তুলে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে নিয়ে চল—

কয়েকজন তাকে তুলতে যেতেই সে হাত-পা ছুঁড়ে বাধা দিল প্রাণপণে। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যেতে চাইল লাইনের দিকে। সবাই তো ভ্যাবাচ্যাকা। মেয়েছেলের গায়ে তো সেরকম জোর করে হাত দেওয়াও যায় না।

বড়বাবু বললেন, থাক, থাক। ছেড়ে দাও। আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? সঙ্গে কে ছিল? পড়ে গেলেন কী করে?

এরকম অনেকগুলো প্রশ্নেরও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তবু বড়বাবু ব্যাপারটাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। ডাকা হল রেলের ডাক্তারকে। খবর দেওয়া হল থানায়। অনেক রাত পর্যন্ত শোরগোল চলল। বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে ফোন করেছিলেন পরের স্টেশনে, কিন্তু সেই রহস্যময় ট্রেন সেখানে থামেনি, ভদ্রকেও থামেনি, বালেশ্বরেও থামেনি, সেটা যেন চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

পরদিন বিকেলে নকুড় মারফৎ অনেক খবর চলে এল বনমালীর কাছে। ওই ট্রেনটি ছিল রিফিউজিদের জন্য স্পেশাল ট্রেন। দণ্ডকারণ্য থেকে লাখখানেক না কত যেন রিফিউজি পালিয়ে চলে এসেছিল, তারা থাকতে চেয়েছিল পশ্চিম বাংলায়, সুন্দরবনে কোন্ একটা দ্বীপে তারা আস্তানা গেড়েছিল। সেখান থেকে তাদের আবার ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। দণ্ডকারণ্যে তাদের বাড়ি, জমি, গরু, ক্যাশ ডোল দেওয়া হয়েছে, তবু কেন তারা এখানে এসে ভিড় বাড়াবে? তারা ওই হাড়-বজ্জাত লোকগুলো কি সহজে আসতে চায়, চেয়েছিল বাংলার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে, পুলিশ-টুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়েছিল বনে জঙ্গলে। সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে এনে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে ওই ট্রেনে।

ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওই স্ত্রীলোকটির শরীরে নাকি ধর্ষণের চিহ্ন আছে। অন্তত তিন-চারজন। ওই শরীরের আছেই বা কী, তবু সে নিস্তার পায়নি। সুন্দরবনের বাঘে তাকে খায়নি, মানুষ তাকে কামড়ে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর ধারণা, ওই কুলটা, নষ্ট মেয়েমানুষকে তার স্বামী আর সঙ্গে করে ফেরত নিয়ে যেতে চায় নি। গরিব ঘরের মেয়েছেলের আর কিছু থাক বা না থাক, অন্তত সতীত্বটুকু তো থাকবে? সেটাও যদি চলে যায়, তবে তার বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। তাই ওর স্বামী বা নিকট আত্মীয়রা ওকে এখানে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত সে পার হতে পারেনি। কারণ পশ্চিম বাংলার মানুষই তো চেয়েছিল তার দেহটা।

সেই থেকে পাগলি এখানেই আছে। সে তো জানেই না, এমনকি বনমালীরাও জানে না যে এই একটা পাগলিকে নিয়ে সরকারি মহলে চিঠি চালাচালি হয়েছে আঠারোটা। পাগলি নির্বাক বলে সেই চিঠিপত্রে তার নাম উল্লেখ নেই। সেখানে তার পরিচয়, ওয়ান ডেসটিটিউট উয়োম্যান, অ্যালেজ্‌ড টু বী এ রেফিউজি অ্যান্ড এ ডেজার্টার ফ্রম দা ডি ডি এ সেটেলমেন্ট।

ভিখিরি আর রিফিউজি এক নয়, কারণ খবরের কাগজে লেখালেখি হয় শেষোক্তদের নিয়ে। সুতরাং বানপুরের বড়বাবু পরমেশ সরকার এই ঘটনাটি উপেক্ষা না করে বিস্তৃত বিবরণ পাঠিয়েছিলেন খড়্গপুরে। এরপর রেলদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের মধ্যে চলেছে পত্রযুদ্ধ। কে এর দায়িত্ব নেবে?

দন্ডকারণ্য ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি জানিয়েছে যে স্পেশাল ট্রেনে প্রত্যাবর্তিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেউ-ই এখনো পর্যন্ত তার স্ত্রী-হারানো বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেয় নি। কিছু বাচ্চা ছেলে নিখোঁজ হবার কথা শোনা গেছে বটে। দন্ডকারণ্যের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ঠিক কতলোক চলে গিয়েছিল এবং কতজন ফিরে এসেছে তার হিসেব নিকেশ করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। বানপুর স্টেশনের উক্ত মহিলার যদি ভ্যালিড রিফিউজি কার্ড থাকে, তবেই ডি ডি এ কর্তৃপক্ষ তাকে ফেরত নিতে পারে। নচেৎ কোনো নতুন লোক নিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ লাগবে। এমতাবস্থায় স্থিতাবস্থাই শ্রেয়।

যদি পরনের শাড়িটা একটু দামি হত, গায়ের রং ফর্সা হত, মুখে চোখে একটা ভদ্রলোক শ্রেণীর চাকচিক্য থাকত, তা হলে মানবতার খাতিরে তাকে নিশ্চয়ই কোনো হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হত। সব হাসপাতালেই আজকাল স্থানাভাব, নিছক ভিখিরি বা রেফিউজিদের সেখানে রাখার সুযোগ কোথায়?

তবু যে এই স্ত্রীলোকটি বেঁচে গেল আর সেরেও উঠল, তার কারণ রেল স্টেশনের পরগাছারা চট করে মরে না। সেই স্ত্রীলোকটি এখন বানপুর স্টেশনের পাকাপাকি পরগাছা। প্রথম দুদিন সে ছিল প্রায়োপবেশনে। শেডের বাইরের ছাতিম গাছটায় ঠেসান দিয়ে বসে মুচড়ে মুচড়ে কেঁদেছে শুধু। রোদে পুড়েছে, রাত্তিরের হিমে ভিজেছে। স্টেশান মাস্টারের কনটিনজেন্সি ফান্ড থেকে কিছু খাবার কিনে রেখে দেওয়া হয়েছিল তার সামনে, তা সে ছুঁয়েও দেখেনি। তার রক্তাক্ত শরীরে ভনভন করেছে মাছি। তবু সে বাঁচলো।

এক হিসেবে এক পাগলিকে সৌভাগ্যবতীই বলতে হবে। কারণ সে আসার ঠিক এক মাস আগে টাইম-টেবল বদলের সুবাদে পুরী এক্সপ্রেস রাত সোয়া দশটায় বানপুর স্টেশনে থামে। সেই ট্রেন থেকে নামে ক্যাটেরারের লোকজনেরা।

খড়্গপুরে ডিনার দেওয়া হয় যাত্রীদের। মাঝখানে আর কোনো স্টেশন নেই। বানপুরে ক্যাটেরারের লোকজনেরা এঁটো বাসনপত্র নিয়ে নেমে যায়। এখানেই তারা থাকে রাত্তিরে, ভোরবেলা সেই সব বাসনপত্র মেজে তারা ফার্স্ট ট্রেন ধরে ফিরে যায় খড়্গপুরে।

সব যাত্রীই তো হ্যাংলা রাক্ষস নয়, কারুর কারুর থলিতে পড়ে থাকে দু-একখানা চাপাটি, কিছু ঝোল-মাখা ভাত, পেঁয়াজের টুকরো বা আচার। যেদিন ঢ্যাঁড়শের তরকারি থাকে, সেদিন তা অনেকেই খায় না। কেউ কেউ খায় না বেগুন।

ক্যাটেরারের লোকেরা প্রথম কয়েকদিন এঁটো পাতের অক্ষত চাপাটিগুলো স্টেশনের বাইরে রামশংকরের হোটেলে বেচে দেবার একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল। অবিলম্বে সে খবর পৌঁছোলো বড়বাবু পরমেশ সরকারের কাছে। তিনি চটে লাল হলেন। নতুন পোস্টিং-এর পর তিনি নিজেও কিছুদিন ওই রামশংকরের হোটেলে খেয়েছেন। সেখানে এই রকম কারবার। ক্যাটেরারের লোকদের ডেকে তিনি প্রচণ্ড চোটপাট করে হুমকি দিলেন যে হেড কোয়ার্টারে লিখে তিনি ওদের কনট্রাক্ট বাতিল করে দেবেন।

সুতরাং এখন সেই সব এঁটো খাবার দেওয়া হয় টিউবওয়েলের পেছনের আঁস্তাকুড়ে। এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে লাটুর। কুলিরা উচ্চশ্রেণীর মানুষ, তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তারা ঝুটো খাবার খাবে না। লাটুর প্রতিযোগী শুধু তিনটে কুকুর, আর কোনো কোনোদিন নুলো হরিও এসে সেখানে জোটে।

চাপাটিগুলো লাটু রেখে দেয় পরদিন দুপুরের জন্য। ঝোল মাখা ভাত সে রাত্তিরেই খেয়ে নেয়। তার মুখের হাসি এবং মজার কথাবার্তার জন্য ক্যাটেরারের লোকেরা তাদের নিজেদের খাবারের থেকে দু-এক টুকরো মাংস কিংবা আধখানা ডিমও দেয় কখনো-সখনো। লাটুর এখন মহা আনন্দ। সে এখন স্বাধীন, তার আর খাওয়ার চিন্তা নেই, ভিক্ষের পয়সায় সে যত খুশি জিলিপি খেতে পারে।

একদিন লাটুর পেছনে একটি প্রেতিনীর মতন ছায়ামূর্তি দাঁড়াতে দেখে ক্যাটেরারদের একজন ভয় পেয়ে বলে উঠল, ওরে বাবা এ কে?

তখন বানপুরের মালবাহক দার্শনিক কেলুচরণ মহান্তি কাছেই টিউবওয়েলে মুখ ধুচ্ছিল। সে বলে উঠলে, দ্যাখো, দ্যাখো, জীবাত্মার কেমন লীলা। বদ্ধ পাগলেরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপো না পায়। কার কোথায় অন্ন বান্ধা থাকে কে জানে।

কেলুচরণের এই ধরনের শক্ত কথার অর্থ কেউ বোঝে না। ক্যাটেরারের লোকেরা সাধারণত ধূর্ত ও বিষয়ী ধরনের মানুষ হলেও স্ত্রী জাতি সম্পর্কে একটা ভারতীয়-দুর্বলতা তাদেরও আছে। হ্যাট হ্যাট বলে কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে তারা ফেলে দেওয়া কয়েকখানা ডাল-ঝোল মাখানো রুটি তুলে নিয়ে পাগলির দিকে বাড়িয়ে বলে, এই নাও গো। পাগলি কিন্তু হাত পেতে নেয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রুটিগুলো তার পায়ের কাছে ফেলে দেয় ওরা। পাগলি তখন নিচু হয়ে তা কুড়িয়ে নেয়, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় ছাউনির বাইরের অন্ধকারে।

তারপর থেকে এই রকমই চলছে। দিনের বেলা পাগলিকে স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় কদাচিৎ। তিন-চারদিন অন্তর একবার সে টিউবওয়েলের জলে স্নান করে। তা ছাড়া অন্য সব সময় সে বসে থাকে একটা নিস্তব্ধতার আবরণ নিয়ে। বস্তুত সে বসেই থাকে, দিনের বেলা কক্ষনো তাকে শুয়ে থাকতে দেখা যায় না, বসে বসে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে। তাই এই একাগ্রতার মধ্যে একটা ছমছমানির ভাব আছে। সেই জন্যই পাগলিকে কেউ ঘাঁটাতে আসে না।

পাগলি কোনোদিন কারুর কাছে ভিক্ষে চায় নি, তবু তার সামনে পাঁচটা-দশটা পয়সা পড়ে। কেউ কেউ সংস্কারবশত দিয়ে যায়। ভিখারিদের দান করলে পুণ্য কেনা যায় এমন সংস্কার এখনো আছে, বানপুরের জাগ্রত কালীমন্দিরে পুজো দিতে অনেক পুণ্যলোভীরা এই স্টেশনে নামে।

পাগলি সেই সব পয়সার দিকে কোনোদিন ভ্রূক্ষেপও করেনি। পয়সাগুলো এমনিই পড়ে থাকত। স্টেশনের বাইরে থেকে একটা মর্চে পড়া ডালডার টিন কুড়িয়ে এনে লাটু রেখে দিয়েছে পাগলির পাশে। এক-একটা ট্রেন চলে যাবার পর সে এসে উবু হয়ে বসে পাগলির সামনে। যা পাঁচ-দশটা পয়সা এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে তা সে কুড়িয়ে ওই টিনের মধ্যে রাখে, তার মধ্যে নিজের ভিক্ষালব্ধ কিছু পয়সাও মিশিয়ে দেয়। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানে সে বুঝতে পারে, এর কাছে তার পয়সা জমা রাখা নিরাপদ।

লাটু একদিন দুখানা জিলিপি কিনে এনে শালপাতা সমেত পাগলির সামনে রেখে বলেছিল, এই, খাও! খাও না।

তখন বেলা তিনটে বেজে দশ। একটু আগে একটা মেল ট্রেন পাস করে গেছে। কোনো মেল এখানে থামে না, শুধু প্রচণ্ড আওয়াজ ও উত্তেজনা দিয়ে যায়। লাটু এই আওয়াজ ভালবাসে। যে-সব ট্রেন এই স্টেশনে থামে তাদের কারুর শব্দই এমন জোরালো নয়। মেল ট্রেনের এই প্রবল ঝংকার শুনলেই লাটুর খিদে পায়। সে একছুটে চলে যায় স্টেশনের বাইরে।

আজকাল লাটু জিলিপির দোকানে ধারও পেতে শুরু করেছে। দোকানি জানে, লাটু পয়সা শোধ করে দেবার ক্ষমতা রাখে।

তখন লাইনের ওপর ঝকঝক করছে রোদ। সেদিকে তাকালে চোখ ঠিকরে যায়। তবু পাগলি একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেদিকে। লাটুর অনুরোধ সে শোনে না জিলিপির দিকে সে চোখ ফেরায় না পর্যন্ত।

বেশ কয়েকবার অনুরোধ করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। তখন আর লাটু কী করে, শালপাতাটা তুলে নিয়ে জিলিপি দুটো খেতে খেতে সে চলে যায় ওভারব্রিজের দিকে। তার একটু একটু মন-খারাপ লাগে। এই মন-খারাপ কেন বা কিসের জন্য তা সে বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে একটা মালগাড়ি এসে দুদিকের প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে একটা পাঁচিল তুলে দাঁড়ায়। এই লম্বা ধাড়েঙ্গা নিরেট মালগাড়িগুলোকে লাটু একটুও পছন্দ করে না। এই সময় স্টেশনটা কেমন যেন বোবা মেরে যায়। যে-ট্রেনে যাত্রী নেই, সেটা আবার ট্রেন নাকি? মালগাড়িতে লাটু মাঝে মাঝে দু-একটা বগিতে দেখতে পায় ঘোড়া, গরু কিংবা মোষ। একবার কতকগুলো বাঁদরও দেখেছিল। মানুষের মধ্যে থাকে শুধু গার্ডবাবু, ইঞ্জিন ড্রাইভার, ফোরম্যান আর খালাসিরা। এরই মধ্যে লাটু জেনে গেছে যে রেল-কর্মচারীদের কাছে ভিক্ষে চাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ।

মালগাড়ির চেয়ে লোকাল ট্রেন অনেক ভাল। কত রকম লোক নামে। এর মধ্যে অনেক মুখই লাটুর চেনা হয়ে গেছে। লাটু অচেনা মুখ খোঁজে, তাদের কাছেই ভিক্ষে চায়। অবশ্য চেনা লোকদের কাছে ভিক্ষে চাইবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সে-রকম চেনাদের পাশে যেতে যেতে সে আদর-কাড়া গলায় বলে ও বাবু, তুমি গত সোমবার দশ নয়া দিয়েছিলে, আজ আবার সোমবার, আজ কিছু দাও। ফড়ে বা ব্যাপারিদের কাছ থেকে সে পয়সা চায় না, বিড়ি চায়।

এ স্টেশনের সেরা ট্রেন অবশ্যই পুরী এক্সপ্রেস। তার ধরনধারণই আলাদা। রাত্তিরবেলা পুরী এক্সপ্রেস যেন গোটা একটা উৎসব নিয়ে আসে। লাটু ঘড়ি চেনে না, কিন্তু পিঁপড়ে যেমন টের পায় বৃষ্টির সংকেত, মুরগিরা যেমন জেনে যায় আসন্ন ভূমিকম্পের কথা, সেই রকম ভাবেই লাটু ঘণ্টা বাজবার আগেই বুঝতে পারে। তার শরীর চঞ্চল হয়, সে ছুটে যায় স্টেশনের অন্য প্রান্তে। ওই আসছে পুরী এক্সপ্রেস, তার অন্নদাতা।

একদিন লাটু দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বলে, ও বনোদা, বনোদা, দেখবে এসো, পাগলি নাচছে।

বনমালী তার ছোট চোখ দুটি বিস্ফারিত করে বলে, অ্যাঁ? ছোঁড়ার রস হয়েছে দেখছি। অ্যাঁ? পাগলির নাচ? মারবো ইয়েতে লাথ।

লাটু তবু উত্তেজিতভাবে বলে, মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি, দেখবে এসো, সত্যি পাগলি নাচছে, ওভারব্রিজের ওপর।

বনমালীর দোকান থেকে ওভারব্রিজের সবটা দেখা যায় না। সেডের জন্য খানিকটা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু এখন দোকান ছেড়ে অন্য কিছু দেখার শখ তার নেই। পুরী এক্সপ্রেস এলে তার বেশ কিছু মাল কাটে। সে লাটুকে সস্নেহ একটা গালাগালি দিয়ে বলে, যা ভাগ—!

লাটু একাই দৌড়ে যায় ওভারব্রিজের দিকে। সে স্পষ্ট দেখতে পায়, নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসেছে পাগলি। লাইনের ওপর, ওভারব্রিজের ঠিক মাঝখানটায় সে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার পেছনে গোল চাঁদ। লাটু স্পষ্ট দেখতে পায় পাগলি নাচছে।

সে-ও দৌড়ে উঠে যায় ওভারব্রিজের ওপরে। দূরে দেখা যাচ্ছে পুরী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের সার্চলাইট, সদ্য বাঁক ঘুরলো। এইবার শোনা গেল শব্দ। শব্দটা ক্রমশই বাড়ছে। পাগলি নাচছে না বটে, তবে ওভারব্রিজের রেলিং ধরে তার শরীরটা সামনে পেছনে দুলছে। সেই দুলুনি ক্রমশ দ্রুত হতে থাকে। প্ল্যাটফর্ম এলাকায় ঝমঝমিয়ে ঢুকলো পুরী এক্সপ্রেস, যেন এক প্রবল বলশালী পুরুষ বাতাস ভরে যায় তার তেজস্বী নিঃশ্বাসে। সেই সময় পাগলি এমন করে যেন সে ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

প্রত্যেকদিন তো ওভারব্রিজের ওপর চাঁদ থাকে না, এক একদিন থাকে শুধু মিশমিশে অন্ধকার। প্রায়ই সন্ধের পর গোটা বানপুর স্টেশনের আলোগুলো নিবে যায়। পুরী এক্সপ্রেসের সার্চলাইট বেশি দূর থেকে দেখা যায় না, কাছেই এ দিকের লাইনের বাঁক আছে। অন্ধকারের মধ্যে প্রথম উষার আলোর মতন সেই সার্চলাইট ফুটে উঠলেই লাটু ওভারব্রিজের ওপর দিকে তাকায়। ঠিক পাগলি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, অস্পষ্টভাবে দেখা যায় তাকে, কোনো অলৌকিক প্রাণীর মতন। পিঁপড়ে কিংবা মুরগির মতন এই পাগলিও তা হলে টের পায়।

ক্যাটেরারের লোকদের মধ্যে একজনের নাম নিরাপদ। সে খবরের কাগজ পড়ে, দু-চারটে ইংরিজি কথা জানে, বেশ বুঝদার লোক। পাগলির দিকে সে একটু বেশি মনোযোগ দেয়। লাটু কিংবা নুলো হরিকে দেবার আগে সে এক গোছা বাছাই করা রুটি রাখে পাগলির পায়ের কাছে। একদিন একটা প্ল্যাস্টিকের গেলাসে করে খানিকটা ডালও দিয়েছিল।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে নিরাপদ তার সঙ্গীদের বলেছিল, রিফিউজি! কতদিন আগে দেশ স্বাধীন হল, তবু এখনো রিফিউজি। আমার বাড়ি হাসনাবাদে, আমি জানি ওরা ইছামতী নদী সাঁতরে মরিচঝাঁপি দ্বীপে উঠেছিল। সেখানে ঘর বেঁধে ছিল, নৌকা বানিয়েছিল কত। মেয়েমানুষরাও খাটত-পিটত, সে এক দেখার মতন ব্যাপার। তারপর মোরারজী দেশাই বলল ওদের তাড়িয়ে দিতে! কে সাহেব রাজকুমার বললে, ওরা থাকলে জঙ্গলের বাঘের নাকি ক্ষতি হবে, তাই একদিন পুলিশ গিয়ে ওদের ঘরের খুঁটি উপড়ে, দিলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, কতকগুলো গিয়ে সেঁধিয়েছিল বনবাদাড়ে, কটা জলে ডুবে মলো, কে তার হিসেব রাখে।

নিরাপদর এক সঙ্গী জিজ্ঞেস করল, ওরা দন্ডক ছেড়ে মরতে এসেছিলই বা কেন এধারে?

নিরাপদ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়ি টানে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ওরে, মেয়েমানুষ কখনো সাধ করে ঘর ছাড়ে? মাটির ঘর, চ্যাঁচার বেড়া হলেও তারই মধ্যে মেয়েমানুষের সংসার। তা ছেড়ে কেউ রাস্তায় নামতে চায় না, ওরা তিনবার ঘর ছেড়েছে, একবার ওদের বাঙালদেশের নিজেদের বাড়ি-ঘর, দ্বিতীয়বার দণ্ডকারণ্যের ক্যাম্পের ঘর, আর এই সেদিনকে সোঁদরবনের ঘর। তিনবার যার ঘর ভাঙে তার কপাল আর কখনো জোড়া লাগে না।

বড়বাবুর আরদালি নকুড়ের মামাবাড়ি বসিরহাট। সুতরাং সে নিরাপদর সঙ্গে খানিকটা আত্মীয়তা বোধ করে। সে বলল, রিফিউজিরা চলে আসার পর তোমাদের ওদিকে নৌকো নাকি খুব সস্তা হয়ে গেছে?

নিরাপদ অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ, সস্তা, খুব সস্তা। মানুষের জীবনই যখন সস্তা, তখন আর.....। ওরা প্রায় শ' তিনেক নৌকো বানিয়েছিল, বড় বড় নৌকো, বিশ মনি, পঞ্চাশ মনি, সব জলের দরে বিকিয়েছে। যে যা পারে ছিনিমিনি করে নিয়েছে ওদের জিনিসপত্তর। আমাদের ওদিকে এখন ঝি-চাকরও খুব সস্তা। যে-সব ছুটোছাটা ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক ছিটকে গিয়েছিল, ট্রেনে উঠতে পারেনি, সেগুলোন এখন এর ওর বাড়িতে খাই-খোরাকি কাজ করে।

তারপর দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিরাপদ বলল, আমার বাবাই তো রিফিউজিদের একখানা নৌকো হাতিয়ে নিয়েছে। আমার বাপ অতি ঘুঘু লোক।

একদিন নিরাপদ একটা পুরনো শাড়ি এনেছিল সঙ্গে করে। লাটুকে ডেকে বলেছিল, এই ছোঁড়া, এটা ওই পাগলিকে দিয়ে দিস। অমন ঝুলি ঝুলি ছেঁড়া কাপড় পরে থাকে, দেখলে লজ্জা লাগে। আমাদের ঘরেও তো মা-বোন আছে।

লাটু বলেছিল, তুমি নিজেই দাও না।

নিরাপদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমরা পাজী, মতলববাজ মানুষ, আমাদের হাত দিয়ে এসব দিতে নেই। আমি দিতে গেলেও বোধহয় আমায় কামড়ে দেবে। তুই ছেলেমানুষ, তুই দিলে দোষ হয় না।

আশ্চর্য, তার পরদিন থেকে নিরাপদ আর এখানে আসেনি। সে নাকি অন্য ট্রেনে বদলি হয়ে গেছে।

পাগলি তো লাটুর কথা শুনবে না, তাই লাটু সেই শাড়িটা ওর কাছে রেখে আসে। একদিন যায়, দুদিন যায়, তবু সেটা পড়ে থাকে যেমন তেমন, পাগলি সেটা ছুঁয়েও দেখে না। সে তার সেই ছেঁড়া শাড়ি পরেই টিউবওয়েলের জলে স্নান সেরে নেয়, নিজেই পাম্প করে প্লাস্টিকের গেলাসে জল ধরে মাথায় ঢালে, তারপর সেই ভিজে কাপড় তার গায়েই শুকোয়। হাতের কাছেই একটা আস্ত শাড়ি থাকতেও পাগলি যে কেন সেটা নেয় না, সেটা লাটুর মাথায় ঢোকে না।

কয়েকদিন পরে শাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্য কেউ নিয়ে নিয়েছে নিশ্চয়। লাটুর খুব সন্দেহ হয়, এটা নুলো হরির কাজ। কারণ নুলো হরির মা আছে। লাটুর তো মা নেই, সে শাড়ি নিয়ে কী করবে? লাটু বনমালীর কাছে এই ঘটনা জানিয়েও কোনো পাত্তা পায়নি। ক্যাটেরারের লোকদের কাছেও লাটু নালিশ জানাল, কিন্তু এখন আর নিরাপদ নেই, অন্য কেউ পাগলিকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

লাটুর ধারণা, পাগলির শাড়িখানা যে-ই চুরি করুক পরের জন্মে সে নিশ্চয়ই চামপোক হবে।

কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে খুব। এক একবার একটু থামতে না থামতেই ঝেঁকে ঝেঁকে বৃষ্টি আসে। সেডের দু-এক জায়গায় ফুটো আছে, তা ছাড়া প্রবল বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ে, প্ল্যাটফর্ম একেবারে জলকাদায় থিকথিকে। এরই মধ্যে ট্রেন আসছে, যাচ্ছে। আর কদিন পরেই দুর্গাপুজো, তাই যেন যাত্রীদের আনাগোনা বেড়েছে। কালীপুজোর সময় বানপুরে বিরাট উৎসব হয়। গত বছর সেই সময় লাটুর প্রচুর রোজগার হয়েছিল। আবার সেইরকম দিন আসছে, লাটুর বুক ধক ধক করে। রাশি রাশি খুচরো পয়সা, গুনে শেষ করা যায় না।

লাটু বনমালীকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁগো বোনোদা, কালীপুজোর আর কদিন বাকি গো?

বনমালী সস্নেহে লাটুর ঘাড়ে হাত বুলতে বুলতে বলে, তুই উচ্ছুগ্যু করা ছেলে রে, এবারে মায়ের কাছে তোকে বলি দেব!

লাটু পিছলে সরে গিয়ে হি-হি করে হাসে। প্রায়ই বনমালী তাকে উচ্ছুগ্যু করা ছেলে বলে, সেই জন্য লাটু ভুলেও কখনো কালী মন্দিরের দিকে যায় না।

সেদিন খড়গপুর লোকালের এক প্যাসেঞ্জারের মাল বইতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল কেলুচরণ। মাল বেশি না, একটা সুটকেস আর দুটো বেতের ঝুড়ি। একটা ঝুড়ির মধ্যে ভর্তি শুধু নারকেল, তার কয়েকটা গড়িয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে। লাটু কাছেই ছিল, সে দৌড়ে এসে ধরে তুলল কেলুচরণকে।

যাত্রী ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, ধুর, এসব বুড়োধুড়োকে কে লাইসেন্স দেয়? আর কেন বাবা, এবার রিটায়ার কর, দেশে ফিরে গিয়ে নাতি-পুতিদের আদর কর গে। যথেষ্ট হয়েছে।

কেলুচরণের হাঁটুতে চোট লেগেছে। সে অপরাধীর মতন মুখ নিচু করে বসে থাকে।

ভদ্রলোক লাটুকে বললেন, এই ছোঁড়া, তুই পারবি? আমি একটা ঝুড়ি ধরছি, নারকেলগুলো তোল।

কুলির রেট এক টাকা, কিন্তু লাটু বয়েসে ছোট বলে ভদ্রলোক রিকশায় ওঠার পর লাটুকে আটআনা দিয়ে চলে গেলেন।

আধুলিটা হাতে নিয়ে লাটু একটুক্ষণ দোনামনা করল। কাছেই জিলিপির দোকান। তবু সে ফিরে এল প্ল্যাটফর্মে। কেলুচরণের কাছে এসে বলল, এই ন্যাও কেলুদা, আটআনা দিয়েছে, মাইরি বলছি, বেশি দেয়নি—। কেলুচরণ এমনভাবে লাটুর দিকে চেয়ে থাকে, যেন সে তার হন্তারককে দেখতে পাচ্ছে। দিন দিন শশিকলার মতন বৃদ্ধি পাচ্ছে লাটু। যতই কেলুচরণের জোর কমে আসবে, শরীরটা ভিজে ন্যাতার মতন নরম হয়ে যাবে, ততই লাটুর তাকত বাড়বে। অনতিবিলম্বেই তার জায়গা নিয়ে নেবে লাটু, সে হয়ে যাবে বাতিল, আঁস্তাকুড়ের মাল। তখন লাটু নিজের রোজগারে খাবে আর কেলুচরণ হবে ভিখিরি।

এরকম চিন্তা সত্ত্বেও কেলুচরণ ম্লান হেসে বলল, ও তুই নিয়ে নে।

লাটু আর দ্বিরুক্তি না করে আধুলিটা ভরে ফেলে পকেটে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কেলুদা, তোমার দেশ কোথায়?

কেলুচরণ আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই হোথা। ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নিবো।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানে শেষ হয় না। একটু পরেই ছেদীলাল এসে লাটুর সামনে চোখ গরম করে দাঁড়ায়। মুখখানা কুঁকড়ে সে বলল, এ কুত্তো আওলাদ, তু কাঁহে মাল উঠোয়া? বোল শালে—।

ঝাঁ করে সে তার লোহার মতন হাতটা বাড়িয়ে লাটুর একটা কান মুচড়ে ধরে। লাটু যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেও ছেদীলাল সহজে ছাড়ে না, খানিকটা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে শাসিয়ে বলে যে, ফের যদি লাটু কোনো মালে হাত দেয়, তা হলে তাকে সে ম্যাড্রাস মেলের সামনে ঠেলে ফেলে দেবে।

লাটু গুমরোতে গুমরোতে গিয়ে বনমালীর কাছে নালিশ জানালো। বনমালী তাকে একটুও প্রশ্রয় না দিয়ে বলল, বেশ করেছে মেরেছে; তুই ভিখিরির বাচ্চা, তুই কেন ওদের কাজে মাথা গলাতে গেছিস?

লাটু ঝাঁঝালো গলায় বলল, আমি কি নিজে তুলিছি, লোকটা বলল—

বনমালী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কোনো লোক যদি বলে, যা, বনমালীর উনুনটা ভেঙে দিয়ে আয়, তুই তাই দিবি?

লাটু তার নিজস্ব যুক্তিতে বুঝতে পারে, তার প্রতি ওরা অন্যায় করছে। সে এখনো ছোট, তাই সে মার খাবে, বকুনি খাবে। আচ্ছা, বড় হলে সে-ও দেখে নেবে!

অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে সেদিন ফিরতি খড়গপুর লোকালে উঠে পড়ল। এর আগে সে দু বার ভদ্রক গেছে বটে, কিন্তু খড়গপুর যায়নি, শুনেছে সেটা অনেক বড় জায়গা।

সব ট্রেনেই কিছু চলন্ত ভিখিরি থাকে, লাটুও গলা মিলিয়ে দিল তাদের সঙ্গে। পেয়েও গেল কিছু পয়সা। কিন্তু খড়গপুরে নামতেই কয়েকজন ঘিরে ধরল তাকে। একজন হিংস্র গলায় বলল, কোথাকার নতুন মাল রে?

দু-চারটে চড়-চাপাটি খেতেই লাটু হাতের পয়সাগুলো ফেলে দিয়ে পালায়। নাঃ, আজকে তার দিনটাই খারাপ। কিছুক্ষণ শুকনো মুখে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করল। এই স্টেশনে ঘন ঘন ট্রেন আসে, সেই শব্দে লাটুর খিদে পেয়ে যায়। আর খিদে পেলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায় আরও।

এরই মধ্যে একসময় সে একটা আশার আলো খুঁজে পেল। কেটারারের লোকদের একজনকে দেখতে পেয়ে গেল সে। এই অচেনা জনসমুদ্রে একজন চেনা মানুষ। সেই লোকটিও চিনতে পেরেছে লাটুকে। সে বলল, কী রে, তুই এখেনে? ওখান থেকে চলে এলি? থেকে যা, এখেনে থেকে যা, রোজগার ভাল হবে। দ্যাখ না, খড়গপুরের কুকুরগুলোও কত মোটাসোটা!

কেটারারদের লোকদের সঙ্গে পুরী এক্সপ্রেসেই ফিরে এল লাটু। মুখে বেশ একটা গর্বের ছাপ, যেন সে দিগ্বিজয় করে এসেছে। আজ তাকে এঁটো খাবার খেতে হবে না, খড়গপুরের ক্যান্টিনে সে অনেক গেলাস ধুয়ে দিয়েছে বলে ওখানেই তাকে খেতে দিয়েছে।

প্ল্যাটফর্মে নেবেই লাটু ওভারব্রিজের দিকে তাকিয়ে পাগলিকে দেখল। সন্ধে থেকেই অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়ে আছে পাগলি। লাটু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, যেন আজ তার দাতার ভূমিকা।

সেই বৃষ্টি আর তিনদিনেও ছাড়ল না, বরং বাড়তেই লাগল। পুজোর আগে এত বৃষ্টি কেউ বাপের জন্মে দেখেনি। যেন গোটা আকাশটাই গলে গলে পড়ছে।

পরদিন রাত্তিরে পুরী এক্সপ্রেস হল না যথাসময়ে। এই ট্রেন কদাচিৎ লেট করে, হলেও বড়জোর আধ ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট। কিন্তু মাঝরাত পার হয়ে গেল, তবু সেই জোরালো সার্চ লাইটের দেখা নেই। চারদিকে শুধু বৃষ্টির শব্দ আর অন্ধকার।

স্টেশন মাস্টারের ঘরে ব্যস্ততা দেখা গেল অনেকক্ষণ। অনেক টেলিফোন আর টরেটক্কা। তারপর বড়বাবু এক সময় বাড়ি চলে গেলেন। নকুড়কে জিজ্ঞেস করেও বনমালী কোনো খবর জানতে পারল না।

সেই খবর এল পরের দিন। একটা লোকাল ট্রেন বানপুর পর্যন্ত এসে আবার ফিরে চলে গেল, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গেল অনেক কাহিনী। দারুণ বর্ষায় চতুর্দিকে ঘর-বাড়ি সব ডুবে গেছে, ভেসে গেছে রেললাইন, রাস্তা-পুকুর-নদী সব একাকার, ট্রেনের জানলা দিয়ে নাকি দেখা গেছে যে জলে ভেসে যাচ্ছে মরা গরু-ছাগল, গাছের মাথায় উঠে বসে আছে মানুষ।

তার পরদিন আর কোনো ট্রেনই এল না। এমনকি এই বৃষ্টিতে পাখিরাও ওড়াউড়ি করে না। স্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে নকুড় খবর দিয়ে গেল যে কোথায় যেন অনেকখানি রেললাইন জলের তোড়ে বেঁকে তুবড়ে গেছে, এখন কতদিন ট্রেন চলবে না, তার ঠিক নেই।

সারাদিন শুনশান করতে লাগল স্টেশনটা। কুলিদের মধ্যে ছেদীলাল আর জগা কোথায় যেন চলে গেছে। কেলুচরণের কোনো যাবার জায়গা নেই, সে এখানেই পড়ে রইল। স্টেশন মাস্টারের ঘর খোলা, কিন্তু বাবুরা প্রায়ই থাকেন না। বনমালীও তার দোকান বন্ধ রেখে দেশে চলে যাবে কিনা ভাবছে। তার দেশ এখান থেকে মাইল তিরিশেক ভেতরের দিকে, সে রাস্তায় বাস চলছে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য বানপুরে বন্যার প্রকোপ বিশেষ বোঝা যায় না। এত বৃষ্টিতেও সেরকম জল জমেনি কোথাও। দুপাশের খালের জল ছাপিয়ে গেছে বটে, কিন্তু রেললাইন বেশ উঁচুতে। দূরে দেখা যায় রেললাইন ধরে মানুষজন হাঁটছে।

যাত্রী নেই বলে স্টেশনের বাইরের হোটেলটা বন্ধ। মিষ্টির দোকানেও ঝাঁপ ফেলা। আধ মাইল দূরে বাজার, সেটা খোলা আছে।

ট্রেনের শব্দ না শুনলে লাটুর একদম ভাল লাগে না। প্রথম রাত্তিরে পুরী এক্সপ্রেস না আসায় তাকে সারা রাত না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। ওঃ, সে কি বিভীষিকা! কিছুতেই ঘুম আসে না, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি ট্রেন এসে পড়ল সমস্ত দুনিয়া কাঁপিয়ে।

পরদিন লাটু ভয়ে কাঁপতে থাকে। আর যদি কোনোদিন কোনো ট্রেন না আসে, তা হলে সে খাবে কী? রেললাইন ধরে সোজা হেঁটে হেঁটে খড়গপুরে চলে যাবে? ওখানে তো সেই লোকগুলো আছে!

বনমালীকে বলল, বনোদা, আমার জমানো টাকাগুলো দেবে?

বনমালীর চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। রেগে চিৎকার করে বলল, জমানো টাকা? নিমকহারাম কোথাকার?

কতদিন তোকে খাইয়িছি পরিয়িছি, জামা-গেঞ্জি কিনে দিয়েছি, আমার নিজের কম্বলখানা পর্যন্ত দিয়িছি, আজ তুই আমার কাছে টাকা চাইছিস? রাস্তার কুকুর বলে একেই। আজ তোর ডানা গজিয়েছে না? মেরে তোর খাল খিঁচে দোব, হারামির বাচ্চা!

লাটু চুপ করে গালমন্দ শোনার পর কাঁচুমাচু মুখে বলে, বাঃ, পয়সা না পেলে আমি খাব কী?

—আঁস্তাকুড়ের পোকা, যা আঁস্তাকুড় থেকে খুঁটে খেগে যা!

—সেখানেও কিছু নেই বনোদা!

—তা হলে মরগে যা, যেখানে খুশি যা, দূর হয়ে যা!

এর কোনোটাই অবশ্য বনমালীর মনের কথা নয়। একটু পরেই লাটুকে নিয়ে সে বাজারে যায়। চাল-ডাল-আলু কিনে আনে বেশ খানিকটা, তারপর প্ল্যাটফর্মেই চায়ের উনুনে ডেকচি চাপিয়ে ফুটিয়ে নেয় খিচুড়ি।

তারপর দুজনে মুখোমুখি খেতে বসে। একটু দূরে কেলুচরণও ছাতু গুলে খাচ্ছে। বৃষ্টি ধরে এসেছে অনেকটা, আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। বেশ কয়েকদিন বাদে দুটো কাক সেডের তলা থেকে বেরিয়ে কা-কা করে কয়েকবার ডেকে মুক্ত হাওয়া থেকে ফিরে এল।

খেতে খেতে লাটু আর বনমালী একসময় থমকে গিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখে কথা হয়। তারপর দুজনেই মুখ ফিরিয়ে তাকায় উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মের কোণের দিকে।

পাগলি সেখানে স্থির হয়ে বসে আছে। রাত্তিরবেলা পাগলি ঠিক ওভারব্রিজের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল দূরের দিকে চেয়ে। তার দয়িত আসে নি, সে কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিল কে জানে। সকালবেলা থেকে তাকে লাটু ঠিক আগের মতনই একরকমভাবে বসে থাকতে দেখেছে।

একটা শালপাতায় দুহাতা খিচুড়ি তুলে বনমালী বলল যা, ওকে দিয়ে আয়।

হাত-মুখ ধুয়ে শালপাতাটা দুহাতে ধরে লাটু ওভারব্রিজ পেরিয়ে এল পাগলির কাছে। সেটা পাগলির পাশে রেখে বলল, এই, খেয়ে নাও। তোমার খিদে পায় নি?

পাগলি আগের মতনই শুধু রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে, মুখটাও ফেরায় না।

দু-তিনবার অনুরোধ করার পর লাটু উঠে পড়ল। তার সামনে বোধহয় খেতে চায় না। একটু পরেই ঠিক খাবে।

খানিক পরে লাটু আবার সেখানে ফিরে এসে রাগে-দুঃখে প্রায় কাঁপতে থাকে। এত সাধের খিচুড়ি! কতকগুলো ধেড়ে ইঁদুর লুটোপুটি খাচ্ছে সেই শালপাতাটার ওপরে। সেটাকে তারা অনেকখানি দূরে টেনে নিয়ে গেছে, মাটিতেও খিচুড়ি ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে সব গর্ত ডুবে যাওয়ায় মেঠো ইঁদুরগুলো প্ল্যাটফর্মের ওপরেই ঘুরে বেড়ায় এখন। লাটু ল্যাফিয়ে লাইনের ওপর নেমে কতকগুলো খোয়া তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারতে লাগল ইঁদুরগুলোর দিকে। পাগলির দিকে সে তাকায় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। না খাবি তো না খাবি, যাঃ শুকিয়ে মর।

পর পর চারটে দিন কেটে যায় ঠিক একভাবে। তারপর ঝকঝকে রোদ ওঠে। এতদিনে দেখা যায় শরতের নীল আকাশ। বড়বাবু পরমেশ সরকার দুপুরবেলা নিজে তদারকি করে প্ল্যাটফর্মের ময়লা-কাদা সাফ করান ঝাড়ুদারদের দিয়ে। লাটুর আশা হয়, আজ আসবে, আজ আবার স্টেশন কাঁপিয়ে ঢুকবে পুরী এক্সপ্রেস।

বনমালী বড়বাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, স্যার, আজ কি ট্রেন চলবে?

বড়বাবু অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেন, না। আজ তো নয়ই, কবে লাইন মেরামত হবে ঠিক নেই, ওদিকে এখনো জল নামে নি।

তারপর বড়বাবু উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শীর্ণা তপস্বিনীর মতন ঠিক একই জায়গায় বসে আছে পাগলি। তার খুব কাছে আস্তানা গেড়েছে তিনটে কুকুর। কুকুরগুলোও পাগলিকে দেখছে একদৃষ্টে, ওরা কী ভাবছে কে জানে!

বড়বাবু হাঁক দিয়ে বললেন, নকুড়, ওই কুকুরগুলো তাড়িয়ে দিয়ে এস তো! এ আর চোখে দেখা যায় না! ওই পাগলিটা কি ওখানেই বসে বসে না খেয়ে মরবে? এই কদিন ও খেয়েছে কিছু?

নকুড় বলল, ওর সামনে কেউ যায় না, বড়বাবু। কেমন যেন ডাইনির মতন তাকায়। দেখলে ভয় লাগে।

কৃতিত্ব দেখাবার এই সুযোগটা লাটু ছাড়ে না। সে বলল, আমি যাই ওর কাছে, আমি ভয় পাই না।

বনমালী বলল, কিছু দিলেও ও খায় না। আমি তো ক'দিন খিচুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। যেমনকার তেমন পড়ে থাকে। ইঁদুরে খেয়ে যায়।

—দিলেও খায় না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ও শুধু ট্রেনের খাবার খায়, আর কেউ দিলে খায় না।

বড়বাবু কথাটার পুনরুক্তি করলেন, শুধু ট্রেনের খাবার খায়, আর কেউ দিলে খায় না।

তাঁর ভুরু কুঁচকে গেছে। কথাটার অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না। বেশি বোঝার চেষ্টাও করলেন না। পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে তিনি বললেন, ওকে কিছু খাবার কিনে দিয়ে আয় তো। বলবি, বড়বাবু পাঠিয়েছেন।

লাটুর চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন, তুই তো ওকে ভয় পাস না। তুই নিয়ে যা, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাওয়াবি। মা বলে ডাকবি। বলবি মা, তুমি খেয়ে নাও! তুমি না খেলে আমরাও খাব না।

কাছেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে কেলুচরণ। দুদিন ধরে তার জ্বর হয়েছে, চোখ দুটো লাল। পা দুটো সামনে ছড়ানো, উরুর ওপর ডান হাতের করতল উলটো করে মেলে ধরা।

সে বেশ জোরে, টেনে টেনে বলল, বড়বাবু, দুঃখিনী, অনাথিনী মেয়েছেলেদের মা বলে ডাকতে নেই। তাতে তাদের কষ্ট আরও বাড়ে। সন্তানই তো মায়েরে বেশি লাঞ্ছনা দেয়। আমি কত স্থান ঘুরি আসিছি, সব জাগাতে দেখিছি, মা-ই সন্তানদের লাথি মারিছে।

বড়বাবু কেলুচরণের দিকে ফিরে তাকালেন। যেন তিনি এই লোকটিকে এই প্রথম দেখছেন।

কেলুচরণ আবার বলল, ডাক্তারবাবু বলিছিলেন কি ওর স্বামী ওরে লাথি মারকিরি ফেলায়ে দিয়ে গেছে। যদি ধরেন ওর স্বামী নাই? ওর সন্তানেরা ওরে আপদ মনে করি বিদায় করি দিছে?

বড়বাবু চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। এসব কথা তিনি শুনতে চান না। পকেট থেকে আর একটা টাকা বার করে দিয়ে তিনি লাটুকে বললেন, যা, পাগলিকে খাইয়ে আয়।

তারপর তিনি হনহন করে চলে গেলেন কোয়ার্টারের দিকে।

কেলুচরণ আরও কী সব বলতে থাকে, কিন্তু কেউ আর সেদিকে মনোযোগ দেয় না, ছোট দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

স্টেশনের বাইরের হোটেলে আজ আঁচ পড়েছে। নকুড় লাটুর হাত থেকে টাকা নিয়ে বলে, দে, আমি খাবার কিনে আনছি।

অল্প পরেই সে একটা শালপাতার ঠোঙা নিয়ে ফিরে আসে। সেটা নিয়ে লাটু ওভারব্রিজের দিকে না গিয়ে রেললাইনে লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর কোনাকুনি হাঁটে। ভদ্রকের দিকে লাইনটা সোজা বহুদূর দেখা যায়, যেন একেবারে আকাশে মিশে গেছে। এদিকে তো জল নেই, তবু কেন ট্রেন আসে না! কদিন ধরে খিচুড়ি খেয়ে লাটুর অরুচি ধরে গেছে, ঠিক মতন পেটও ভরে না। বনমালী নিজে বেশি খেয়ে তাকে কম দেয়। দিনেরবেলা লাটুর রুটি খাওয়া অভ্যেস। তা ছাড়া দু-একখানা জিলিপি না খেলে তার মনে সুখ হয় না। একটাও পয়সা নেই তার কাছে।

ঠোঙার ওপরের শালপাতাটা একটুখানি তুলে দেখল লাটু। পাঁচ-ছখানা পুরী আর আলু-বেগুনের তরকারি। বেশ গরম আছে। লাটুর জিভে জল এসে যায়।

টি ট্রি টি ট্রি করে কী যেন একটা পাখি ডাকছে অনেকদিন পরে। এত বৃষ্টির জল শুষে খোয়াগুলো পর্যন্ত যেন নরম হয়ে গেছে। লাটুর পায়ে লাগে না। রোদ্দুরেরও কোনো তাপ নেই।

এদিকের প্ল্যাটফর্মে এসে কনুইয়ের ভর দিয়ে লাটু অবলীলাক্রমে উঠে এল। পাগলির কাছে এসে ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে সে চঞ্চল চোখে কিছু একটা খুঁজল। কুকুরগুলো এগিয়ে আসছিল, লাটু দাপটের সঙ্গে বলল, হুস। হুস। যাঃ।

পাগলিকে বলল, এই যে, খাও, তোমার জন্য বড়বাবু পাঠিয়েছেন।

তারপরই তার মনে পড়ে গেল বড়বাবুর শেখানো কথা। সে বলল, ও মা, খাও, তোমার জন্য খাবার এনিছি।

এতদিন পর পাগলি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল লাটুর দিকে। আজই লাটু ভয় পেয়ে গেল। বুক ছমছম করছে। এই কদিনে চেহারা আরও বদলে গেছে পাগলির, চুপসে গেছে গাল, জ্বলজ্বল করছে কোটরে-বসা চক্ষু দুটো। সে যেখানে বসে আছে, সেখানে থকথক করছে রক্ত, এক ঝাঁক মাছি ভন ভন করছে সেখানে। আজ সত্যিই ওকে ডাইনির মতন দেখাচ্ছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় লাটু বলল, ও মা, খাও! তুমি না খেলে আমরা খাব কী করে?

পাগলি তবু কটমট করে দেখছে লাটুকে। লাটুর ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যেতে, কিন্তু সে পারছে না।

সে আবার বলল, এই দ্যাখ, আমিও খাচ্ছি, তুমিও খাও! বড়বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একখানা পুরীতে তরকারি মাখিয়ে লাটু প্রথমে নিজে কপ কপ করে খেয়ে ফেলল। তারপর আর একখানা পুরী সে এগিয়ে দিল পাগলির দিকে।

পাগলি তা নিল না। সেই মুহূর্তে সে দু হাতে মুখ ঢাকল। তার শীর্ণ শরীরটা কাঁপতে লাগল কান্নার ঝোঁকে। সে কান্নার কোনো শব্দ নেই। এমন কান্না সব মানুষের জীবনে ঘটে না।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লাটু বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। প্রথম থেকেই যেটা সে খুঁজছিল, সেটা সে দেখতে পেয়ে গেছে। পয়সা-রাখা ডালডার কৌটোটা কী করে যেন চলে গেছে পাগলির পেছন দিকে।

লাফিয়ে উঠে সেই কৌটোটা তুলে নিয়েই লাটু ছুট লাগালো। তাকেও বাঁচতে হবে তো! অন্যদিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বনমালী আর নকুড়রা তাকে দেখছে। সেইজন্য লাটু প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল, ওরে বাবারে, পাগলি আমায় কামড়ে দিয়েছে। ওরে বাবারে—।

কাহিনীর স্রষ্টা

কুরুক্ষেত্র রণভূমি থেকে এক ক্রোশ উত্তরে এক বিশাল হ্রদ, তার তীর নানা প্রকার বৃক্ষে শোভিত। এখন সময় গাঢ় অপরাহ্ন, সমস্ত আকাশ জুড়ে রক্তিম আভা।

সেখানে একটি অর্ক গাছের নিচে বসে আছেন এক অতি বৃদ্ধ ঋষি। ইনি যেমন কুরূপ তেমনই অপরিচ্ছন্ন। মুখখানি রোম-দাড়িতে এমনভাবে ঢাকা যে চক্ষু দুটি ছাড়া আর প্রায় কিছুই দেখা যায় না। চক্ষু দুটি খুবই উজ্জ্বল। এই ঋষি যদৃচ্ছগামী, এঁর সঙ্গে থাকে শুধু একটি ঝোলা। এখানে এই বৃক্ষতলে বসে ঋষি গভীর মনোযোগ দিয়ে ভূর্জপত্রে খাগের কলম দিয়ে খস খস করে কী সব লিখে চলেছেন। ইনি সত্যবতী নন্দন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

একটু পরেই অরণ্য ভেদ করে এক বলশালী প্রৌঢ়পুরুষ ছুটতে ছুটতে এলেন সেখানে। তাঁর অঙ্গে রাজভূষা, কিন্তু ছিন্নভিন্ন, মাথায় মুকুট নেই, সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত। তার অহংকারী মুখখানি সম্প্রতি গভীর বিষাদময়। ইনি হৃতগৌরব রাজা দুর্যোধন।

শ্লোক রচনায় নিমগ্ন প্রাচীন ঋষিকে দেখে দুর্যোধন থেমে গিয়ে হাতের গদাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ঋষি তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন না, অতি দ্রুত লিখেই চলেছেন তিনি। দুর্যোধন কয়েকবার চঞ্চলভাবে পশ্চাতে তাকিয়ে তারপর ঋষির মনোযোগের জন্য গলা খাঁকারি দিলেন।

বেদব্যাস এবারে মুখ ফিরিয়ে দুর্যোধনকে দেখে রীতিমতন চমকিত হলেন। সেই বিস্ময়ের সঙ্গে যেন ক্ষীণ আশঙ্কার ছায়াও ফুটে উঠল তাঁর ভুরুদ্বয়ে।

দুর্যোধন শ্লেষযুক্ত স্বরে বললেন, ভগবন্, আপনাকে প্রণাম। আমায় চিনতে পারেন?

ব্যাস বললেন, বৎস দুর্যোধন। তুমি এখানে? রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে এলে? তুমি এই বিশাল ধ্বংস যজ্ঞ শুরু করে শেষ পর্যন্ত পলায়ন করছ? তোমার আর যত দোষই থাক, ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যের তো অভাব ছিল না। ভ্রাতা ও সুহৃদগণের নিধন-বার্তা জেনেও তুমি নিজে বাঁচতে চাইছ?

দুর্যোধন বললেন, সে প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি! কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি কি আমাকে অনুমানে চিনলেন? আপনার সঙ্গে তো পূর্বে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। আজ এই শেষসময়ে অকস্মাৎ আমরা মুখোমুখি হলাম।

ব্যাস বললেন, এ কী কথা বলছ, হে ধার্তরাষ্ট্র! রণপরিশ্রমে কি তোমার মতিভ্রম হল? এই যে আমি মহাভারত রচনা করছি, তুমিই তো তার মুখ্য চরিত্র। তুমি সর্বদা আমার মন জুড়ে আছ। তোমার অসূয়া, তোমার স্পর্ধা, তোমার দুঃসহ তেজই তো ঘটনা পরম্পরাকে তীব্র গতি দিয়েছে। তোমাকে আমি চিনব না? তা ছাড়া তোমার জন্ম থেকেই তোমাকে আমি দেখে আসছি। আমি যে তোমার সাক্ষাৎ পিতামহ।

গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে ক্রোধচঞ্চল নয়নে দুর্যোধন বললেন, রক্তের সম্পর্কে আপনি আমার পিতামহ তা জানি। কিন্তু এ পর্যন্ত কখনই আপনার সঙ্গে আমার একটিও বাক্য বিনিময় হয়নি। এমনকি বাল্যকালে আমি যখন অবোধ শিশু ছিলাম, তখনও আপনি কখনো সস্নেহে আমার মস্তক আঘ্রাণ করেননি, কোনো একদিনও আপনি আমার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করেননি। আমি শুনেছি, আপনি প্রায়ই বলে থাকেন যে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষ আপনার চক্ষে সমান, কারণ আপনি যেমন পাণ্ডবদের তেমন কৌরবদেরও পিতামহ। অথচ যৌবন প্রাপ্তির পর যুধিষ্ঠিরাদি অন্তত আটবার আপনার দর্শন ও উপদেশ পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে একবারও একটি কথাও বলেননি।

—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার আটবার সাক্ষাৎ হয়েছে?

—কেন, আপনার মনে নেই? মহাতেজা ঋষি, আপনার কি স্মৃতিবিভ্রম ঘটছে?

—তা মাঝে মাঝে বিস্মরণ হয় বৈকি। সেইজন্যই তো তোমাদের এই মহাযুদ্ধের কাহিনী যখনই সময় পাই তখনই কিছু কিছু লিখে রাখি।

—তা হলে আমি বিবরণ দিচ্ছি, শুনুন। আপনার রচনাতে এ বিবরণও যেন স্থান পায়। বারণাবত থেকে পাণ্ডবরা যখন পলায়ন করে বনে বনে ভ্রমণ করছিল, তখন অকস্মাৎ আপনি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং তাদের একচক্রা নগরীতে নিয়ে গেলেন। আবার সেখানেই কিছুদিন পরে এসে ওদের পাঞ্চাল নগরীতে যাবার পরামর্শ দিলেন, যাতে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে পারে। বিবাহ বাসরে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বিষয়ে যে সংকট উপস্থিত হয়েছিল তখন আপনিই এসে তা সমাধান করে দেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞতে আপনি এসেছিলেন, কিন্তু আমার বৈষ্ণব যজ্ঞে আপনি আসেন নি। পাণ্ডবরা যখন দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাসে যায়, তখনও আপনি দ্বৈতবনে গিয়ে

যুধিষ্ঠিরকে মহোপকারী প্রতিস্মৃতি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন। এমনকি কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের মধ্যেও আপনি তিনবার গেছেন পাণ্ডব শিবিরে, অভিমন্যু বধের পর, ঘটোৎকচ বধের পর এবং গুরুপুত্র অশ্বত্থামা যখন নারায়ণ অস্ত্র মোচন করেছিলেন, তখন আপনিই নির্জীব অর্জুনকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষের বড় বড় বীরের পতন হলেও কিন্তু আপনি একবারও আসেননি। এ কি পক্ষপাতিত্ব নয়? এমনকি ভীষ্ম, যিনি আপনার ভ্রাতৃ-প্রতিম, তিনি ভূমিশয্যা নিলেও আপনি তাঁকে একবার দেখতে এলেন না।

ব্যাস বললেন, বৎস, তুমি দেখছি পরিসংখ্যানে বেশ সুনিপুণ। কিন্তু এখন এই শেষ সময়ে এসব কথা আলোচনা করে আর কী লাভ? তোমরা দুই দলই আমার পৌত্র, কিন্তু পাণ্ডবরা চির দুঃখী ও নির্যাতিত, তোমাদের চেয়ে তারা দুর্বল। জানো তো, অনেক সন্তান সন্ততির মধ্যে যে সন্তান অন্যদের তুলনায় দুর্বল তার প্রতিই জনক-জননীর অধিক স্নেহ থাকে। এ বিষয়ে আমি তোমাকে সুরভির উপাখ্যান বলছি শোন—

দুর্যোধন বললেন, সে উপাখ্যান আমি জানি। আমি বেশি সময় পাব না, সেইজন্য অপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতেই চাই। বুঝলাম, পাণ্ডবরা দুর্বল, তাই আপনার বেশি স্নেহ পেয়েছে। কিন্তু বলুন তো আমার জননী আপনার কাছে কী দোষ করেছেন? আপনি যে কাহিনী রচনা করেছেন, তাতে আমার জননী কি দুঃশীলা রমণী বলে চিত্রিত হবেন!

—আরে না না ছি ছি! তোমার জননী-গান্ধারী অতি পূত চরিত্রা, ধর্মশীলা নারী। তাঁর কোন দোষই কেউ দেখাতে পারবে না।

—তবে কেন আপনি তাঁকে নির্দয়ের মতন বঞ্চিতা করছেন? তিনি কখনো কারু কাছে কিছু চান না। আপনি একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বর দিতে উদ্যত হলেন। কোনো ঋষি বর দিতে চাইলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় বলেই তিনি আপনার কাছে গুণবান পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। তার বদলে আপনি কী দিলেন? তাঁর গর্ভে এল এক লৌহশিলার মতন মাংসপিণ্ড।

—দুর্যোধন, তুমি সে ঘটনা সঠিক জানো না। তোমার জননী শতপুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। সেই বরই দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু সুশীলা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের জন্মের খবর পেয়ে উতলা হয়ে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি। দুই বৎসর পার না হতেই তিনি সেই গর্ভের মাংসপিণ্ড মোচন করেন! সেই জন্যই তো—

—আমায় বলতে দিন, পিতামহ! আমার মা শতপুত্র চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেজন্য এক গর্ভে ওই কঠিন বস্তু ধারণ করা তো নরক যন্ত্রণা তুল্য! জননী কুন্তীর আগে জননী গান্ধারীর গর্ভাধান হয়েছিল, যদি মানবিক নিয়মে যথাসময়ে তাঁর সুপ্রসব হত, তবে আমিই হতাম যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। আপনি সে অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করেছেন। কেন?

বেদব্যাস মৃদু হাস্য করে বললেন, তার কারণ ছিল। এ এক অভূতপূর্ব নাট্য কৌশল, বাল্মীকি আদি অন্যান্য কবিগণ কোনোদিন এমন কৌশল কল্পনাও করতে পারবে না। রাজা আমি এক অমর কাহিনী রচনার জন্য তোমাদের জন্ম ও বংশ বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম আগে থেকেই।

—কাহিনী রচনার জন্য?

—হ্যাঁ। মানুষ মরণশীল। তুমি এবং অন্য সব রথী মহারথী কালপ্রবাহে একদিন তো বিনষ্ট হতই, কিন্তু আমি তোমাদের জীবন এমন ভাবে সাজিয়েছি যাতে সেই সব ঘটনাবলী এক চমকপ্রদ অথচ সুগভীর ইতিহাসের রূপ নিতে পারে। পাণ্ডবগণ দৈব অনুগৃহীত, তাদের জন্ম নিয়ে আমার করণীয় কিছু ছিল না। কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে তোমাদের গড়ে তোলার ক্ষমতা ছিল আমার। কবিরা প্রজাপতি অর্থাৎ শ্রষ্ঠা, আমার কল্পনাতেই তোমরা রক্ত মাংসের শরীরে বাস্তবিক সৃষ্ট হয়েছ।

—ঠিক বুঝলাম না।

—তুমি বুঝবেও না। ভবিষ্যৎ কালই শুধু এটা বুঝবে!

—আরও জানতে চাই, পিতামহ, আমাদের জন্মের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের নামগুলিও কি আপনি রেখেছেন? আমার ও ভ্রাতাদের অনেকের নামই দু দিয়ে। দুঃশাসন, দুঃসহ, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, দুর্বিসহ, দুর্বিমোচন, দুরাধর....এমনকি আমাদের একমাত্র বোনের নামও দুঃশলা। কোনো মাতা-পিতা কি সন্তানদের এমন কুশ্রী নাম রাখে? আপনি ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়ের কথা বলেন। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্মাচরণের সুযোগ দিলেন কোথায়? এই সব নাম দিয়ে আপনি তো জন্ম থেকেই আমাদের ভয়াবহ ও বিকট করে রেখেছেন। অথচ আমার জননী আপনার কাছে গুণবান পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি কোনোদিন অধর্মাচরণ করেননি, তবু সারাজীবন তিনি দুঃখ পেয়ে গেলেন! এই তো ধর্মের পুরস্কার!

বেদব্যাস বললেন, কুরুরাজ, দুঃখের ভূষণেই তোমার জননী মহিয়সী হয়েছেন। তিনি অনন্য। যাই হোক, এখন তুমি কী করবে বলে মনঃস্থির করেছ? দ্যাখো, সায়াহ্নকাল ঘনিয়ে এসেছে, তির্যগযোনিরা কুলায় ফিরছে, রক্তাক্ত আকাশের পটভূমিকায় সেগুলিকে দেখাচ্ছে যেন স্বর্গাভিমুখী আত্মার মতন। তুমিও এই স্থূল দেহত্যাগ করে স্বর্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হও, সমস্ত ক্ষোভ বিস্মৃত হও।

—আমার স্বর্গে যাবার তাড়া নেই।

—সে কি! তোমাকে হত্যা না করলে তো যুধিষ্ঠির নিষ্কণ্টক সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবে না! তুমি যেখানেই থাক, পাণ্ডবপক্ষ তোমাকে খুঁজে বার করবেই। তোমার এগারো অক্ষৌহিনী সৈন্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্মা আর সঞ্জয় ছাড়া তোমাদের পক্ষে আর কেউ জীবিত নেই, এখনো তুমি কোন আশায় বেঁচে থাকতে চাও?

—পিতামহ, পাণ্ডবরা এখনো আমার সম্পূর্ণ তেজের প্রমাণ পায় নি। কৃষ্ণ যেমন জাদুবিদ্যা জানে, আমিও সে রকম কুহক প্রদর্শন করতে পারি। আমি এই হ্রদের মধ্যে জল স্তম্ভিত করে তার মধ্যে অবস্থান যদি করি, তবে পাণ্ডবেরা কোনোদিন আমার সন্ধান পাবে না। আমি দেশান্তরে চলে গিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসবো। আমি জয়াশা ছাড়ি নি।

—না, না। কুরুরাজ, তোমাদের যে জীবন-ইতিহাস আমি রচনা করছি তার এমন অকিঞ্চিৎকর পরিসমাপ্তি হতেই পারে না। তুমি পরিপূর্ণ খল, তুমি মূর্তিমান অধর্ম, তবু তোমার মৃত্যুদৃশ্য এমন গাঢ় বেদনার রঙে চিত্রিত হবে যে তোমার জন্য স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হবে, সে কাহিনী যে পাঠ করবে তারই চক্ষু সজল হয়ে উঠবে। সেই অসাধারণ পরিণতির উপযোগী করেই তো আমি তোমার জীবন গড়ে তুলেছি।

—আপনি গড়েছেন, অর্থাৎ আমি আপনার হাতে-গড়া দানব? তা হলে সত্যি করে বলুন তো আপনি কি মনে মনে আমাকে ভয় পান? সেইজন্যই কখনো আমার সামনে আসেন নি? একবার সে রকম উপক্রম হয়েছিল, তবু যেন আপনি দ্রুত সরে পড়লেন। সে কি ভয়ের কারণে নয়?

—আমি সরে পড়েছিলাম? কবে বলো তো? এমন তো মনে পড়ে না। তোমাকে আমি ভয় পাব কেন?

—আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় দ্যুতপণে পরাজিত হয়ে বনবাসে যাবার সময় পাণ্ডবরা ভয়ংকর শপথ উচ্চারণ করে গিয়েছিল। তারা আমাদের সবংশে নিধন করার প্রস্তাব প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। তারা চলে যাবার পর বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ আমাকে একটি অতি যুক্তিযুক্ত, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য, অপমানিত, রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবগণ বনবাসের শেষে ফিরে এসে প্রতিশোধের স্পৃহায় সমরাগ্নি জ্বালবেই। তাই যদি হয় তা হলে পাণ্ডবদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আর সময় দেবার প্রয়োজন কী? এখনই তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ দাবি করে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি করা যায়, সে কথা শুনে আমরা সকলে যুদ্ধার্থে রথে আরোহণ করতে যাচ্ছি, এমন সময় আপনি এসে উপস্থিত হলেন।

—হ্যাঁ, তা সত্য।

—আপনি আমাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে দ্রুত গেলেন আমার পিতার সমীপে। গ্রীষ্মকালীন দীঘির মতন যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ের উপরিতল উষ্ণ ও গভীরে রয়েছে শৈত্য, সেই রাজাকে আপনি নানাপ্রকার ভয় দেখিয়ে আমাদের নিবৃত্ত করতে বললেন। পিতা তা শুনে বললেন, ভগবন্ আমি দুর্বলতা বর্জন করতে পারি না। পুত্রেরাও আমার কথা শোনে না। আপনি স্বয়ং দুরাত্মা দুর্যোধনকে উপদেশ দিন। আপনি আমার পিতার সেই অনুরোধ তো রক্ষা করলেন না। আপনি যেন শশব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, আমার সময় নেই, মৈত্রেয় ঋষি আসছেন, তিনিই উপদেশ দেবেন দুর্যোধনকে। এই বলেই আপনি অন্তর্ধান করলেন মনে পড়ে?

ব্যাসদেব কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসতে লাগলেন। দুর্যোধনের এ অভিযোগের সত্যতা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

দুর্যোধনও বিদ্রূপ হাস্য করে বললেন, সেই মৈত্রেয় ঋষি কী উপদেশ দিলেন আমাকে? তিনি শুধু পাণ্ডবদের বল প্রশংসা করতে লাগলেন বলে আমি কোনো উত্তর করিনি, ঊরুতে চাপড় মারতে মারতে আমি অধোবদনে পায়ে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটছিলুম। সেটাই আমার এমন মহা অপরাধ হয়ে গেল যে তিনি তৎক্ষণাৎ অভিশাপ দিলেন, মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ভীম আমার উরুভঙ্গ করবে! ব্রহ্মতেজের অপব্যবহার আর কাকে বলে। অপরপক্ষের বল দর্প শুনে হাস্য পরিহাস করা ক্ষত্রিয়দের স্বভাব ধর্ম, তার জন্যও অভিশাপ? সেই ক্রুর ঋষিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আপনি কেন পলায়ন করেছিলেন, পিতামহ?

ভূর্জপত্র ও কলম ঝোলায় ভরে নিয়ে বেদব্যাস বললেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবারে তোমাকে যেতে হবে, আমাকেও যেতে হবে। তবু তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটি কথা বলছি। সেদিন তোমাদের আমি নিবৃত্ত করতে এসেছিলুম তার কারণ, সেই সময় যুদ্ধ হলে তা হত অতি সংক্ষিপ্ত। ধনুর্ধর—অগ্রগণ্য কর্ণ যে মহাস্ত্রে নিহত হবেন, সেই আঞ্চলিক অস্ত্র তখনো অর্জুনের আয়ত্তে ছিল না। পাণ্ডব পক্ষের অন্যান্যরা যতই স্পর্ধা করুক, একমাত্র যুধিষ্ঠির আর আমি জানতাম সম্মুখ ন্যায় যুদ্ধে কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণকে বধ করার সাধ্য তখনো অর্জুনের ছিল না। অর্জুনের আরও আয়ুধ-সাধনার প্রয়োজন ছিল। সেইজন্যই তখন অস্ত্র সংগ্রহ এবং দেবানুগ্রহের কারণে মহাদেব এবং

ইন্দ্রাদির কাছে অর্জুনকে পাঠাবার জন্য আমি যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম। তোমাকে সে সময় আমি কোনো উপদেশ দিতে যাই নি, কারণ কী উপদেশ দেব! তোমাকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে সত্যিই তো আমি চাই নি। ভারত ইতিহাসের সর্ববৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হবে একমাত্র তোমারই হঠকারিতায় এবং সেই যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করব আমি! সেই উদ্দেশেই তো আমি তোমাদের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে চালিত করেছি! দ্যাখ তো, শেষ পর্যন্ত কী মহান, বর্ণাঢ্য' মহাপ্রলয়ের মতন যুদ্ধই তো হল! সপ্তদ্বীপা এই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়ই আজ প্রায় নির্মূল।

—তাতে আপনাকে খুব উল্লসিত দেখছি! জামদগ্নি-পুত্র পরশুরামের মতন আপনিও পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করতে চেয়েছিলেন বুঝি? আপনি ব্রাহ্মণ.....

—না, না, ওটা ঠিক নয়। সে রকম কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি কারুরই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিনি। কালই মানুষের আয়ুর একমাত্র নিয়ন্ত্রা। তুমি বা যুধিষ্ঠির, অর্জুন বা রাধেয় কেউই তো কালগ্রাস থেকে অব্যাহতি পাবে না! আমি কাহিনীকার হিসেবে ঘটনাগুলির মনোমতন বিন্যাস করেছি মাত্র। দ্রৌপদীর অমন বিবাহ যদি আমি না দিতাম!

—হ্যাঁ, দ্রৌপদীর বিবাহ-ব্যাপার আপনি অত্যুৎসাহী ছিলেন কেন বলুন তো! এক রমণীর পঞ্চস্বামী, এমন বেদ বিরুদ্ধ কাজ আপনি শুধু যে সমর্থন করেছেন তা-ই নয়, আপনিই প্রায় জোর করে বিবাহ দিয়েছেন! এজন্য কুযুক্তির অবতারণা করতেও পিছুপা হননি! পূর্ব জন্মে কোনো এক তাপসী মহাদেবের কাছে উত্তম স্বামী প্রার্থনা করতে গিয়ে সেই বাক্যটি সে পাঁচবার উচ্চারণ করেছিল বলে মহাদেব তাঁকে পঞ্চস্বামীর বর দিলেন! অতি দ্রুত এই আজগুবি কাহিনীটি বানিয়েছেন বলে এই তাপসীর একটা নাম পর্যন্ত দিতে পারেননি। ঋষিরা যে সব কাহিনী বলেন তাতে পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতা চতুর্দশ পুরুষের বর্ণনা করতেও ভোলেন না। আপনি কোথা থেকে এই তাপসীকে পেলেন?

—দ্রুপদের কাছে আমি বলেছিলাম। দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশে জন্ম, তিনিই ওই তাপসী, পর জন্মে দ্রৌপদী।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার! দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং নারায়ণের ভার্যা, তাকে কিনা আপনি ধর্ম, পবন, ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারের ঔরসজাত পুত্রদের শয্যা সঙ্গিনী করলেন! এ কাহিনীও নির্ঘাত অলীক, নইলে নারায়ণ আপনার রক্ষা রাখতেন না!

ব্যাসদেব উঠে দাঁড়িয়ে দুর্যোধনের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে বললেন, মূর্খ, তুমি এসব বুঝবে না! বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে যখনই আমি পঞ্চস্বামী দিলাম, সেই মুহূর্তে সে ভারত ইতিহাসে তুলনাবিহীনা, অনুপমা এক রমণী হয়ে গেল! ওই বাল্মীকির সাধ্য ছিল এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করার? বৎস, ভূমি জয়ের জন্য রাজারা পরস্পরের প্রতি দ্বেষ করে, তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। রমণীরত্নকে জয় করবার জন্যও পৃথিবীতে ঢের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে। সে সব ইতিহাস রচনার জন্য কোনো বেদব্যাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দ্যূত সভায় পরাজিত মহাবীর পরম গুণবান পঞ্চস্বামীর সামনে আকুল মুর্ধজা দ্রৌপদীর যে সরোষ বিলাপ, সে রকমটি আর কখনো কোথাও ঘটেছে! দ্যূতপণে পঞ্চপাণ্ডব তোমাদের দাস হয়েছিল, পাঞ্চালীর কারণেই তারা মুক্তি পায়। সেই নারী হল মূর্তিমতী তেজ, তার প্রতিটি বাক্যেই স্ফুলিঙ্গ। যার রূপের প্রভায় অন্য সব রমণীদের বানরী বলে মনে হয় সে কখনো একজন মাত্র পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে? সেইজন্যই আমি দ্রৌপদীর বিবাহের সময় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সে আমার এই কাহিনীর প্রাণ প্রতিমা। পুরুষের ঈর্ষা পৌরুষ বর্ধন করে, তাতে জ্বলে ওঠে আগুন! প্রতিবেশী রাজাদের পরস্পরের যুদ্ধের চেয়েও ভ্রাতৃ-বিরোধের অনেক বেশি মহান বেদনার উদ্রেক করে। তুমি জানো বোধ হয়, ঋষি বাল্মীকি রামায়ণ নামে একখানি লঘু কাব্য রচেছেন। তাতেও এই ভ্রাতৃ-বিরোধের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে-গ্রন্থ কিছুটা অগ্রসর হতে না হতেই ওই ভরতটা কিরকম অলাবু ঘন্টের মতন নিরামিষ হয়ে গেল। সেইজন্যই তো কাহিনী জমাবার জন্য বেচারি বাল্মীকিকে ওই কিম্ভুতকিমাকার দশটা মাথা আর বিংশতিটা হাতওয়ালা রাবণ নামে এক রাক্ষসকে নিয়ে আসতে হল। হুঁঃ! রাবণের তুলনায় তুমি তো প্রায় দেবতুল্য, তুমি বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য এমনকি তোমার পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয় নি। বৎস দুর্যোধন তোমাদের মৃত্যু নিয়তি নির্দিষ্ট, কিন্তু তোমাদের জীবন ছিল আমার হাতে। খেদ কর না। আমার কাহিনীর মধ্যে তোমরা চিরকাল বেঁচে থাকবে। যাও, সময় হয়েছে দূরে আমি শুনতে পাচ্ছি অস্ত্রের ঝনঝনা, নিশ্চয়ই পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধকুল তোমার সন্ধানেই এদিকে আসছে।

দুর্যোধন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গদাটি তুললেন শূন্যে। মেঘ গম্ভীর স্বরে বললেন, খেলা! আপনার কাহিনীর স্বার্থে আপনি আমাদের জীবন নিয়ে খেলা করেছেন! জারজ ব্রাহ্মণ, আপনার সেই খেলার শখ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি! এই দুর্লভ মানব জীবন, আপনি আমাদের ইচ্ছে মতন সে জীবন ভোগ করতে দেননি; এবারে আমার শেষ খেলাটা দেখুন। এই পদাঘাতে আমি আপনার মস্তক চূর্ণিত করে এখনি শমন সদনে পাঠাব, তারপর দেখি পাণ্ডবদের কী সাধ্য আমাকে বন্দি করে!! আমার বাকি জীবন আমি আপনার ইচ্ছায় নয়, স্বেচ্ছায় কাটিয়ে যেতে চাই।

দুর্যোধন গদা তুলে বেদব্যাসের দিকে ধাবিক হতেই বেদব্যাস দুহাত তুলে বললেন, আরে রও, রও, কর কী! কর কী! ওহে চপলমতি, তোমার এখনো দুরাকাঙ্ক্ষা গেল না! আমাকে তুমি তো হাজার গদাঘাতেও মারতে পারবে না! তুমি জানো না আমি অমর? অশ্বত্থামা, বলি, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম আর আমি এই সাতজন চিরজীবী!

তোমার চঞ্চল স্বভাবের কথা আমি জানি, পাছে কোনো সময় হঠাৎ আমার মাথায় গদার ঘা বসিয়ে দাও তাই আমি তোমাকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলেছি এতকাল!

গদা নামিয়ে বিমর্ষভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্যোধন বললেন, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে আপনি অমর! আপনাকে মারবার সাধ্য আমার নেই। তাহলে আপনার ইচ্ছাক্রমেই আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে?

বেদব্যাস বললেন, যাও বৎস, সমস্ত পূর্ব বন্ধন ছেদন করে তোমার ভূমিকা পালন করতে চলে যাও। তোমার প্রতি আমি একেবারে অবিচার করিনি। তুমি অবিলম্বে স্বর্গে গিয়ে চির সুখ ভোগ করবে। আর যুদ্ধজয়ী পাণ্ডবেরা এই মহাশ্মশানে রাজত্ব করার নামে প্রতিদিন শোক সন্তাপে জীবন্ত দগ্ধ হবে! একে একে অন্তর্হিত হবে তাদের মহিমা, বৃদ্ধ অশক্ত দেহে তারা যখন সহ্য করবে এই পৃথিবীর প্রতিদিনের ধরা বাঁধা জীবনের ক্লান্তি তখন তুমি থাকবে স্বর্গে দেদীপ্যমান। পাণ্ডবরা এখানে বান্ধবহীন আর তুমি স্বর্গে তোমার সমস্ত প্রিয়জনকেই ফিরে পাবে! যাও আর মায়া রেখ না।

দুর্যোধন বললেন, তবে তাই হোক। আপনিও রইলেন এখানে। লোভী, আপনি অমরত্ব পেয়েছেন বটে কিন্তু স্বর্গের নাগরিকত্ব পাবেন না কোনোদিনও!

বেদব্যাস বললেন, আমি স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা করিনি। আমার এই ইতিহাস কাহিনী যুগে যুগে কালে কালে মানুষের মন কেমনভাবে আন্দোলিত করে তা দেখার ইচ্ছেতেই আমি এই পৃথিবীতে থেকে যেতে চাই। এই ধরাধামে আর কোনো কবি কি এই সুযোগ পেয়েছে? তুমি ঠিক বলেছ, আমি লোভী।

এই কথা শেষ করেই বেদব্যাস অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

জগন্নাথের হাত

স্টেশনের বাইরে, শিমূল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ভবানী সাউ। কপাল কুঁচকে গেছে, চোখ দুটি চঞ্চল। লম্বা-চওড়া, মাঝবয়েসি পুরুষ ভবানী সাউ, ধুতির ওপর হলদে হাফ-শার্ট পরা, বাম বাহুতে বাঁধা বড় রুপোর তাবিজটা স্পষ্ট দেখা যায়। দূর থেকে যে-কেউ তার মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, মানুষটা এই মুহূর্তে খানিকটা অসহায়।

রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছে, তারা অনেকেই চেনে ভবানী সাউকে। তবে, অকারণে কেউ ডেকে কথা বলে না। দূর থেকে শুধু একজনই লক্ষ করছে তাকে। চায়ের দোকানে সাইকেল থামিয়ে চা খাচ্ছে সুখেন্দু, মাঝে মাঝে আড়চোখে সে দেখছে ভবানী সাউকে। লোকটা ওখানে একা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কেন, সেটা অনুমান করার চেষ্টা করছে। এখন ভবানীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার ইচ্ছে নেই তার। চা-টা শেষ করেই তাকে যেতে হবে শাল ডুংরিতে। সেখানে জঙ্গলে তার কাজ চলছে। চায়ের দোকানের মালিক বটুক বলল, সুখেন্দুদা, আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।

বটুকের বয়স সুখেন্দুর প্রায় দ্বিগুণ, তবু সে সুখেন্দুকে দাদা বলে। এ অঞ্চলে সবাই সুখেন্দুর কাছে কিছু না কিছু উপকার চায়।

সুখেন্দু চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে চোখ নাচাল।

বটুক বলল, ডি এফ ও সাহেবের বাংলোয় লখা কাজ পেয়েছে আজ দুমাস হল। কিন্তু মাইনের টাকা ঘরে আনতে পারে না। ওই শালা ধীরুটা ওর টাকা কেড়ে নেয়।

পাশে দাঁড়ানো ইস্কুল-মাস্টার যোগেন সিকদারের দিকে তাকিয়ে সুখেন্দু হাসল। তারপর বলল, বুঝলেন ব্যাপারটা? ধীরু হল এই বটুকের আপন মামাতো ভাই, তাকে ও বলছে শালা। আর লখাই ওর সত্যিকারের শালা, তার জন্য ওর দরদ বেশি।

বটুক বলল, এ সংসারে কেউ কারোর আপন নয়, বুঝলেন সুখেন্দুদা। সুখেন্দু বলল, ভাই যদি আপন না হয়, তা হলে শালাও আপন নয়। ও তোমাদের নিজেদের ঝগড়া, ওর মধ্যে আমি মাথা গলিয়ে কী করব?

বটুক বলল, আপনি ডি এফ ও সাহেবের সঙ্গে তাস খেলেন—

সুখেন্দু হাতের কাপটা নামিয়ে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে বলল ঠিক আছে, আমি ধীরুর সঙ্গে কথা বলব।

সুখেন্দু সাইকেলে পা দিতেই তাকে দেখতে পেয়ে গেল ভবানী সাউ। সে হাত তুলে ডাকলেও সুখেন্দু না-দেখার ভান করে জোরে চালিয়ে দিল প্যাডেল। বড় রাস্তায় পড়ে সুখেন্দু স্পীড বাড়িয়ে দিল। সে ভবানী সাউয়ের কথা ভাবছে। এখন সিজ্‌নের সময় পুরো দস্তুর ফেলিং চলছে, এখন তো ভবানী সাউয়ের ওরকম এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। ভবানী কাজের মানুষ। ঘুম থেকে উঠেই ও পান মুখে দেয় আর টাকা রোজগারের ধান্দা শুরু করে। আজ তার মুখে পান নেই; স্টেশনের কাছে বেলা দশটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

রাস্তার চেনা লোকরা কেউ কেউ সুখেন্দুর দিকে হাত তোলে, সুখেন্দু হাসি মুখে ভুরু নাচায়। এ ছোট শহরটিতে সুখেন্দু বেশ জনপ্রিয়। একটু বাদেই সে শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

সুখেন্দু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ একটা জিপ হুড়মুড় করে এসে পড়ে তার পাশে তার পেছনের চাকাটা সামান্য একটু ছুঁয়ে দিতেই সুখেন্দু সাইকেল সমেত গড়িয়ে যায় মাঠের দিকে, তারপর উলটে পড়ে।

জিপটা জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। চেনা কারুর জিপ হলে নিশ্চয়ই থামত। সুখেন্দু মুখ থুবড়ে পড়েছিল, উঠে দাঁড়াতে তার দেরি হল, তাই সে জিপের নাম্বারটা দেখতে পেল না।

কাল রাত্তিরে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই মাটি নরম। সুখেন্দু উঠে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল, তার চোট লাগেনি। সাইকেলটাও ভাঙে নি। অনেকটা টাল খেয়েছে। সুখেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে মাঝ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, জিপটা হর্নও বাজায় নি। কোন্ শুয়োরের বাচ্চা চালাচ্ছে?

এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার অ্যাকসিডেন্ট। তিন দিন আগে, রাত্তির তখন সাড়ে নটা; পিয়ারীলাল চৌধুরীর কাছ থেকে ফিরছিল সুখেন্দু, সেদিন ছিল মোটর সাইকেল। খানিকটা নেশা ছিল, কিন্তু এমন কিছু নয়, মোটর সাইকেলে উঠলেই সুখেন্দুর মাথা ঠিক হয়ে যায়, বাজপোড়া তলার মোড়টাতে সুখেন্দু টার্ন নিতে যাবে, এমন সময় পাশ দিয়ে একটা লরি এসে তাকে চেপে দিল যে আর একটু হলেই তাকে চাকার তলায় চলে যেতে হত। শেষ মুহূর্তে সুখেন্দু

বাঁ দিকে পাশের নালায় নেমে পড়ে, তার পরেই একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা। মাথায় খানিকটা চোট লাগলেও বড় কিছু ক্ষতি হয় নি। মোটর সাইকেলটা বেশ জখম হয়েছে। সেই লরিটাও দাঁড়ায় নি।

পরদিন ঘটনাটা শুনে সবাই বলেছিল, মদ খেয়ে মোটর সাইকেল চালানো একদম উচিত নয় সুখেন্দুর। সবাই তো কতবার বারণ করেছে। কিন্তু সুখেন্দু নিজে ভালই জানে যে তার সে রকম নেশা ছিল না, লরিওয়ালারই দোষ।

লরিওয়ালাটা কি সুখেন্দুকে মারতে চেয়েছিল? না, তা মনে হয় না। মারতে চাইলে লরিটা আরও বাঁদিকে চেপে আসত। ব্যাটা নিজেই বোধহয় মাতাল ছিল, টাল সামলাতে পারেনি।

আজকের জিপটা, যদি ইচ্ছে করত তো সুখেন্দুকে একেবারে পিষে দিয়ে যেতে পারতো। নির্জন রাস্তা, কেউ দেখবার নেই। তা নয়, শুধু একটু ছুঁয়ে গেছে।

সাইকেলটা ঠিক করে নিয়ে সুখেন্দু আবার উঠে পড়ল। মাইল খানেক পরেই শুরু হল শালের জঙ্গল, সুখেন্দু ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

সুখেন্দুর নতুন কাজটা মায়ার পছন্দ নয়। মায়া চেয়েছিল, সুখেন্দু ভদ্রলোক হোক, লাইব্রেরি কমিটির সেক্রেটারি থাকুক, ইস্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ড সংগ্রহ করার জন্য ফাংশানের ব্যবস্থা করে যাক। তার বদলে সুখেন্দু জংলি হয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলের রাস্তায় জিপের চাকা দাগ। টাটকাই তো মনে হয়েছে। সেই জিপটা জঙ্গলে ঢুকেছে?

ভবানী সাউ বলেছিল, সুখেন্দু, তুমি জঙ্গলে একেবারে এস না। তুমি হচ্ছ আলো চাল, পুঁই শাক খাওয়া বামুন বাড়ির ছেলে। এসব কাজ তোমাদের জন্য নয়।

সুখেন্দু ঠাট্টা করে বলেছিল, কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ বুঝি? তুমি ভাবছ তোমার লাভের গুড় আমি খেয়ে নেব?

ভবানী সাউ কথা বলার সময় ভুরু নাচায়। ঠোঁটের কষ দিয়ে পানের রস গড়ায়। ভোগী পুরুষ। বয়েসে বেশ খানিকটা বড় হলেও সে সুখেন্দুর সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করে।

দূরে গাছ কাটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে পড়ে আছে কয়েকটা গাছ। একটা গাছের গুঁড়ি দেখে সুখেন্দুর ভুরু কুঁচকে গেল। গাছটার পাতা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সেই ছাঁটা পাতাগুলোও এখানে নেই। তাহলেও চেনা কিছুই শক্ত নয়, ওটা সেগুন গাছ।

সুখেন্দু আপন মনেই বললে, শালা।

সেগুনগাছ কাটা এখন নিষেধ। জঙ্গল জমা নেবার জন্য শর্তই ছিল, এখানে শুধু শালা আর কেঁদ, কুসুমগাছ কাটা হবে, সেগুন বাদ থাকবে। একটা কনট্রাক্টর বদমায়েশি করে। সবার নামে দোষ পড়ে।

তিন নম্বর ব্লকের শ খানেক মেয়ে-পুরুষ খাটছে সেখানে পিয়ারীলাল নিজে উপস্থিত। সে নিজে তো সাধারণত আসে না। পেমেন্টের দিনেও পিয়ারীলালের ভাই লছমনবাবু আসে। একটা জিপ কাছে দাঁড়ানো।

পিয়ারীলাল চৌধুরীকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় না। সাইকেল থেকে নামতে হয়। কপালে হাত ঠেকিয়ে সুখেন্দু বলল, রাম রাম চৌধুরীজী।

পিয়ারীলালের বিশাল চেহারা। হরিয়ানার খাঁটি ঘি-দুধ খেয়েছে যৌবনে, এক সময় নাকি কুস্তিও করেছে। সে সুখেন্দুকে একেবারে ভীম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে সুখেন্দু....তুম ইতনা দের করে এলে? সূরযদেও মাথার উপপ্র উঠে এল, এত বেশি ঘুমালে কামকারবার কিছু হয়? হামকো দেখ তো, হামি সাড়ে পাঁচ বাজনেসে উঠে পড়ি, আস্নান করি।

সুখেন্দু বলল, চৌধুরীজী, আপনার কথাই আলাদা। তা আপনি আজ নিজে এলেন যে এদিকে?

পিয়ারীলাল বলল, ডিজেল নেই, ট্রাক্ সব বনধো হয়ে আছে, উধার বসে বসে কী করব?

সুখেন্দু বলল, আজও পামপে ডিজেল আসে নি? এ তো বড়ি মুসিব্বৎ কি বাত।

জিপটার দিকে আড়চোখে দেখছে সুখেন্দু। এটা পিয়ারীলালের নিজের জিপ নয়, অন্য জিপ। কার এটা? ড্রাইভারটার মুখ চেনা, কোথায় দেখেছে মনে পড়ছে না। সুখেন্দু এগিয়ে গিয়ে ঝট্ করে ড্রাইভারটার কলার চেপে ধরে বললে, শুয়োরের বাচ্চা। আমার সঙ্গে দিললাগি করছিলি? গাড়ি থামাস নি কেন?

লোকটার মুখ শুকিয়ে গেছে। ফ্যাসফেসে গলায় বললে, কী বলছেন বাবু? আমি তো......

সুখেন্দু দুর্দান্ত জোরে ধমক দিয়ে বলল, চোপ্। তুই আমায় চিনিস না? আমার সাইকেলে ধাক্কা মেরে পালিয়ে এলি—

পিয়ারীলাল কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আরে কেয়া হুয়া, সুখেন্দু বাবু? এ বুদ্দুবাক কী করেছে? সুখেন্দু সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল। পিয়ারীলাল চৌধুরীর কপালে তিন চারটে ভাঁজ পড়ল।

—তুমহার সাইকিলে ধাক্কা মার দিয়া? এই বুদ্দুবাক? কব্?

—এই তো একটু আগে।

—এ জিপ তো দো ঘন্টা ভর ইধারই খাড়া হ্যায়। আমি এই জিপে এসেছি। আর কুথাও তো যায় নি।

—আপনি এই জিপে এসেছেন? আপনার নিজের জিপ কী হল?

—হামার জিপ ডিজেলসে চলতা...ইটা পেড্‌রোলে চলে, লছমন পরশু এই জিপ খরিদ করেছে।

—চৌধুরীজী, আপনি এই জিপে এসেছেন?

—হ্যাঁ! দো ঘন্টা হয়ে গেল!

সুখেন্দু বুঝল, তা হলে এই জিপ নয়। ড্রাইভারের কলার ছেড়ে দিল সে, কিন্তু তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল না। আগের মতনই কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, এদিকে আর কোন্ জিপ চলে? কোন্ হারামজাদা ড্রাইভার আমাকে ধাক্কা মেরে পালাবে। তুই জানিস?

লোকটি বলল, না স্যার! পালিয়ে গেল? থামল না?

—হঠাৎ একটু লেগে যেতে পারে, তা বলে থামবে না? আমি যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতুম?

ড্রাইভার জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এই জিপ ড্রাইভারটি অপরাধী বোধ করে। লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

পিয়ারীলাল বলল, শালে লোগ গাড়ি চালাতে কুছু জানে না, স্টিয়ারিং হাথে নেয়। লো, সুখেন্দুবাবু, সিগ্রেট পিলো। শুন, একটা জরুরি বাত হ্যায়।

দুজনে একটা কাটা গাছের গুড়িতে বসল। সিগারেট ধরাল। গাছে গাছে টাঙ্গির কোপ পড়ার অবিরাম শব্দ। গাছ কাটা পুরুষদের কাজ, মেয়েরা পাতার বাণ্ডিল বাঁধছে। দুটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ের দিকে আপনিই সুখেন্দুর চোখ চলে যায়।

পিয়ারীলাল জিজ্ঞেস করল, তুমকো কঠো বগ্‌গি মিলা?

সুখেন্দু বলল, বগি? এখনো তো বুক করিনি।

পিয়ারীলাল এমন ভাবে হাসল যেন একটি বালকের আধো আধো কথা শুনছে। সুখেন্দুর পিঠে একটা পেল্লায় চাপড় মেরে হাসতে হাসতে বলল, আরে সুখেন্দু, তুম্ অ্যাইসা বেহোঁস হোকে বিজনিস্ করো গে? বগ্‌গি নেহি বুক্ কিয়া তো মাল কী করে ভেজ্‌বে? আঁ? ডিজেল মিলছে না, ট্রান্সপোর্টের সব গাড়ি বন্ধ আছে, ট্রেনের বগ্‌গি ভি মিলবে না, হেভি রাশ্ হবে.... তুম কেয়া নিদ্ যাচ্ছ কি?

সুখেন্দু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কথাটা ঠিকই বলেছে পিয়ারীলাল। ডিজেলের সংকট, এখন সবাই ট্রেনে মাল পাঠাবার জন্য ঝুঁকবে। ওয়াগন পাওয়া শক্ত হবে। এই দিকটা আগে চিন্তা করেনি সে।

পিয়ারীলাল বলল, ঘাবড়াও মাৎ। ইন্তেজার কর! মাস্টার বাবুকো দু' পানশো রুপেয়া খিলাও। তবৃভি না মিলে তো হাম হ্যায়।

সুখেন্দু পিয়ারীলালের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

পিয়ারীলাল এক গাল হেসে বলল, পুরুষকা জবান্, হাঁথিকা দাঁত। হামি বলছি তো, বগি না মিলে তো হামার কোটা থেকে তুমক দে দেঙ্গে! ঠিক হ্যায়!

সুখেন্দু সেই রকম ভাবেই চেয়ে থেকে পিয়ারীলালকে বোঝবার চেষ্টা করল। পিয়ারীলাল গোড়া থেকেই তাকে সাহায্য করছে। দু মাস আগে এক কথায় ছাব্বিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল, তার জন্য কোনো সুদ নেয় নি। আজকাল এরকম কে দেয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনও দিতে চায় না।

পিয়ারীলাল বলল, ঘাবড়াও মাৎ! এইসা মানো কি, তুমি সমুন্দরে নেমে পড়েছ। এখন তো সাঁতার দিতেই হবে। ঠিক সে সাঁতার চালাও, কাঁহা না কাঁহা তো ঠিক পঁহুছে যাবে। আপনা হাত জগন্নাথ!

সুখেন্দু হঠাৎ বলে ফেলল, চৌধুরীসাহেব আপনি সেগুন কাটাচ্ছেন?

পিয়ারীলাল ব্যাপারটায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, সেগুন কাঠো হ্যায় ইধার? দশ-বিশ-পঁচিশ? ইস্‌মে কেয়া হর্যা হ্যায়? আমি সব কাটাচ্ছি, তুম ভি কাটাও।

তারপর হে হে করে হেসে উঠে বলল, আবে, তুমহার তো বহৎ সুবিধা আছে। তুমি ডি এফ ও সাহেবের সঙ্গে তাস খেল। এক রোজ হামারা ঘরপে লে তে আও উনকো।

ডি এফ ও সাহেবের সঙ্গে তাস খেলার কথাটা অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। নতুন ডি এফ ও তরুণ সেনগুপ্ত সুখেন্দুর সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। তুই-তুকারির সম্পর্ক। এখানে ট্রান্সফার হবার পর সুখেন্দুকে দেখেই চিনেছে, যদিও প্রায় বাইশ বছর পরে দেখা। সুখেন্দুকে সে বাড়িতে ডাকে, তার তাস খেলার নেশা, সুখেন্দুকে সে তাসের পার্টনার করে নেয়। তার জন্যই জঙ্গলের কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে রটে গেছে যে ডি এফ ও সাহেব সুখেন্দু ভট্টাচার্যের বন্ধু, এবার সে অনেক সুবিধে খিচে নেবে। যদিও জঙ্গলের ডাক হয়ে গেছে নতুন ডি এফ ও আসবার অনেক আগেই, অ্যালটমেন্ট, টাকা জমা দেওয়াও হয়ে গেছে। নতুন ডি এফ ও সুখেন্দুর বন্ধু বলেই তার কাছ থেকে সে কোনো সুযোগ নিতে চায় না। এটা একটা সূক্ষ্ম ভদ্রতার ব্যাপার, যা ভবানী সাউ কিংবা পিয়ারীলাল বুঝবে না।

যদিও মায়াকে বলেছিল সুখেন্দু, সে আর ভদ্রলোক থাকতে চায় না, সে জংলি হয়ে যেতে চায়!

সেগুন গাছ কাটার প্রসঙ্গটা এখন আর টানতে চাইল না সুখেন্দু। পিয়ারীলাল তাকে ওয়াগন দিয়ে সাহায্য করবে বলেছে।

নিজের সাইটে এসে দেখল কাজ-কর্ম চলছে ঠিকঠাক। তার এলাকা ছোট, জন খাটছে জনা পনেরো। রোদ্দুর বাঁচাবার জন্য মাথায় একটা টুপি চাপিয়েছে পরেশ। এই ছেলেটা অন্নপূর্ণা হোটেলে বেয়ারার কাজ করত। খুব বুদ্ধিমান, মুখে মুখে চটপট হিসেব করতে পারে। রোগা বাঁশের মতন চেহারা। ছেলেটাকে দেখে সুখেন্দুর মনে হয়েছিল এমন একটা চালাক চতুর ছেলের সারাজীবন হোটেলের বেয়ারা হয়ে কাটানো ঠিক নয়। তাই ব্যবসা শুরু করার পর সে পরেশকে সুপারভাইজারের চাকরি দিয়েছে। শুধু বাঁধা মাইনে নয়, লাভের পাঁচ পার্সেন্টও পাবে।

সুখেন্দু এসেই কুলি-কামিনদের বকাবকি শুরু করে দিল। মুখখানা তার হিংস্র হয়ে উঠেছে, মুখে খারাপ ভাষা। বেলা বারোটা বাজে, এতক্ষণে এত কম কাজ হয়েছে। কেন? একজন সামান্য প্রতিবাদ করতে এলে সুখেন্দু তার ঘাড় ধরে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, কাম করবি তো কর, নইলে পেছনে লাথ কষিয়ে ভাগিয়ে দেব! হারামজাদা, পয়সা বেশি চিনেছিস? হাতে তাগদ নেই, মুখে ধার!

এই সময় মায়া তাকে দেখলে কী ভাবত? সুখেন্দুর এরকম মূর্তি সে কল্পনাই করতে পারে না। মায়া রবি ঠাকুরের উপন্যাসের নায়িকাদের ভাষায় কথা বলে।

ব্যবসা শুরু করার আগে সুখেন্দু প্রায় এক বছর ধরে ভবানী সাউ আর পিয়ারীলালের সঙ্গে জঙ্গলের কাজ দেখতে এসেছে। সেই সময় শিখে নিয়েছে সব ঘাতঘোঁত।

কুলি-মজুরদের সঙ্গে সব সময় ভাই-দাদা বলে গায়ে হাত বুলোলে কোনো কাজ হয় না। ওরা পেয়ে বসে। ওরা ভাবে মালিকটা দুর্বল, কলিজার জোর নেই, খুঁটির জোর নেই, এ ব্যাটাকে যত পার ঠকাও, কম কাজ করে বেশি পয়সা লোটো।

যে প্রথমেই নরম সে পরে আর কড়া হতে পারে না। সুখেন্দু তাই উলটো পদ্ধতি নিয়েছে। প্রথমেই উগ্রমূর্তি, গালাগাল, দরকার হলে চড়-চাপড়। তারপর হঠাৎ এক সময় দয়ালু। যাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, তাকে সিগারেট অফার করে। মজুরি নিয়ে প্রচণ্ড দর কষাকষির পর আচমকা সুখেন্দু আট আনা, এক টাকা বাড়িয়ে দেয়। সন্ধেবেলা ওদের সঙ্গে বসে হাড়িয়া খায়।

পরেশকেও ছেড়ে কথা বলে না সুখেন্দু। এক সময় তার দিকে ফিরে মুখ খিঁচিয়ে বলে, কী রে, শালা, বাবু হয়ে গেছিস না? মাথায় টুপি, ঠোঁটে সিগারেট, এক ঝাপড় মেরে তোর বাপের নাম খগেন করে দেব, শালা! হাত লাগা!

সুখেন্দু নিজেই একটা কাটা গাছের গুঁড়ি সরাতে শুরু করে। পরেশ ছুটে এসে ধরে অন্য দিকটা।

এই জিনিসটা সুখেন্দু শিখেছে পিয়ারীলালের কাছ থেকে। কত টাকার মালিক লোকটা। যখন তখন পাঁচ-দশ লাখ টাকা ক্যাশ বার করে দিতে পারে, তবু সাইটে এসে সে নিজে কাজে হাত লাগায়। মজুরদের সমান খাটে। পিয়ারীলাল প্রায়ই বলে, আপনা হাত জগন্নাথ। যে নিজের হাত দুটোর ওপর ভরসা রাখে, সে-ই জেতে।

বাঙালি ব্যবসায়ীরা এটা জানে না। তারা গায়ে খাটতে চায় না, শুধু বুদ্ধি খাটাতে চায়। কত বুদ্ধি বাঙালিদের! দিন দিন সব ঝুনো নারকেল হয়ে যাচ্ছে। পশুপতি সিকদারদের অতবড় ব্যবসা ছিল, তিনটে পেট্রোল পাম্প, সাতখানা ট্রাক। সব নিয়ে নিয়েছে পিয়ারীলাল! যাবে না কেন? পশুপতি সিকদার মাসের মধ্যে কুড়ি দিন বসে থাকবে কলকাতায়, এমনি এমনি ব্যবসা চলবে।

গুঁড়িগুলোকে ঠেলে ঠেলে জড়ো করা হচ্ছে এক জায়গায়, সেই কাজে যোগ দিয়ে সুখেন্দুর গা থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। পরিশ্রম করলে তার আনন্দ হয়। শরীরটা ঝরঝরে লাগে। বাবু কাজে হাত লাগালে কুলি-কামিনরাও বেশি খাটে।

যে ভগ্লু মাহাতোকে সুখেন্দু ঘাড় ধাক্কা দিয়েছিল, সে-ই এসে তার কাছে একটা সিগারেট চাইল। ওরা সুখেন্দুকে ভালবাসে। মনে মনে জানে, বাবুটা ভাল। পরেশকে পয়সা দেওয়া থাকে, সে ওদের জন্য বিড়ি নিয়ে আসে। আশ্চর্য এদের স্বভাব, প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর একটা বিড়ি খেলে নাকি ওদের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়! সুখেন্দু অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে এই সময় বিড়ি খেলে বেশি ক্ষতি হয়, একটু জিরিয়ে নিয়ে খা। তা ওরা শুনবে না।

সুখেন্দু মাঝে মাঝে ওদের প্যাকেট থেকে সিগারেট দেয়। ওরা জানে, এই বাবুর কাছে চাইলে না বলবে না। তবে কেউ একটার বেশি দুটো চাইলে সুখেন্দু ধমক লাগায়।

ভগ্লুকে সিগারেট দিয়ে সুখেন্দু জিজ্ঞেস করল, তোর বউ আসেনি? বাচ্চাটা কেমন আছে?

ভগ্লু বলল, শরীর শুখা হয়ে গিছে। কিছু খেত্যে চায় না। জ্বর ছাড়ে নাই তিনদিন।

কিছু দাওয়াই দিস নি? হেল্‌থ সেন্টারে তো দেখাতে পারিস।

—কী হবে, বাবু-উ! যদি বাঁইচবার হয় তো বাঁইচবে, আর না তো মইরবে!

ভগ্‌লুরামের কণ্ঠস্বর উদাসীন। এরকম দার্শনিকতা পছন্দ হয় না সুখেন্দুর। ভগ্‌লুর ছেলেটাকে সে দেখেছে, খুব রিকেট, খুব সম্ভবত বাঁচবে না। তবু চেষ্টা তো করতে হবে।

সে বলল, পরেশ, তুই কাল সকালে ভগ্‌লুর বাড়ি যাবি। ওর ছেলে আর বউকে নিয়ে যাবি হেল্‌থ সেন্টারে। সামন্ত ডাক্তারকে আমার নাম করে বলবি।

ভগ্‌লু এই প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য করে না। যেন এতে কিছুই যায় আসে না তার। এক পাশে ফিরে সে গাঁজায় দম দেবার ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে থাকে।

মাথার ওপর দিয়ে ট্রি ট্রি করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল এক ঝাঁক টিয়াপাখি। সুখেন্দু ওপরের দিকে তাকিয়ে সেই পাখিদের দেখল না। দেখল, আকাশে মেঘ জমেছে। এর মধ্যেই বর্ষা এসে গেল নাকি? তা হলেই মুশকিল। খুব তাড়াতাড়ি ফেলিং শেষ করতে হবে।

২

হাতে-গড়া রুটি আর আলু পেঁয়াজের ঝাল ঝাল তরকারি সুখেন্দুর প্রিয় খাদ্য। সে লুচি-পরটা পছন্দ করে না। দোকানের চপ বা রাধাবল্লভি জাতীয় জিনিস খেতে পারে না। সেইজন্য সন্ধেবেলা তাকে একবার বাড়িতে আসতেই হয়। খুব খিদে পায়।

সামনের ঢাকা বারান্দায় ছ-সাতটি বাচ্চাকে গান শেখাচ্ছে মায়া। সামনে হারমোনিয়াম। মায়া গানের ইস্কুল খুলেছে, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা নেয় না। এটা তার শখ। এই ছোট মফস্বল শহরে সে রবীন্দ্র কালচার ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। রবিঠাকুর মায়ার মাথায় ভূত হয়ে চেপে আছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব সময় সে রবীন্দ্রনাথের লাইন নিয়ে কথা বলে।

উঠোনের কদম গাছটাতে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে সুখেন্দু বারান্দায় ছেলেমেয়েদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল।

গান থামিয়ে মায়া বলে উঠল, বিন্নি, দাদাবাবু এসেছে, রুটিগুলো সেঁকে দে।

প্রথমেই কুয়োর জলে স্নান সেরে নয় সুখেন্দু। সন্ধেবেলা তাকে আবার বেরুতে হবে। বিকেলে ফেরার পথে ভবানী সাউ তাকে ধরেছিল, খুব নাকি জরুরি কথা আছে। সাঁওতাল পাড়াতে একটা নেমন্তন্ন আছে সুখেন্দুর, সেখানেও একবার যাওয়া দরকার। ওয়াগনের ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে সুখেন্দু, গানের ক্লাস ছেড়ে উঠে এল মায়া। সুখেন্দুর বাহুতে হাত রেখে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, তোমার নাকি আজ আবার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?

—কে বলল?

—ধনীরাম দুধ দিতে এসেছিল বিকেলে, সেই তো বলল।

এই ছোট শহরে সব খবরই ছড়িয়ে যায়। কার বাড়িতে দরজা জানালা বন্ধ করে কে কার বউকে মেরেছে তা পর্যন্ত গোপন থাকে না।

—এমন কিছুই হয় নি, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

—একটা জিপ তোমায় ধাক্কা মেরেছিল বলল যে?

—ধ্যাৎ! দ্যাখ না, সাইকেলের কোনো ক্ষতি হয়েছে? আমার গায়ে কোথাও কেটে ছড়ে গেছে?

—সাইকেল থেকে তুমি এমনি এমনি পড়ে গেলে?

—তোমার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

মায়ার বড় বড় চোখ দুটিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। এই ধরনের কথা সে সুখেন্দুর মুখ থেকে বড় একটা শোনে না। হোক না মিথ্যে, তবুও মধুর লাগে।

একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে মায়া বলল, বুঝি গো আমি বুঝি গো তব ছলনা, যে কথা তুমি বলিতে চাও, সে কথা তুমি বলো না।

সুখেন বলল, এটা কি তুমি এইমাত্র বানালে? না, এটাও রবীন্দ্রনাথের?

—আমি বানাব? আমার কি সে সাধ্য আছে? আমরা যা যা বলতে চাই, সবই তো রবীন্দ্রনাথ লিখে রেখে গেছেন।

—আমি কি ওসব বুঝি? আমি জংলি মানুষ, কুলির সর্দার। আমাকে একটু একটু শেখালেও তো পার?

—তোমার সময় কোথায়? রাত্তিরে তুমি যে অবস্থায় ফের, তখন তো তোমার সঙ্গে কথা বলাই যায় না।

সুখেন্দুর বলতে ইচ্ছে করল, বিকেলে আমি যখন বাড়ি ফিরি, তখন তুমি তোমার গানের ঠাকুর নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখন কথা বলার সময় থাকে না তোমার।

কিন্তু একথা সে বলল না। মায়ার মনটা নরম, একটুতেই সে আঘাত পায়।

—তুমি আজও বেরুবে?

—আমি কি কেরানিবাবু যে দশটা পাঁচটা অফিস করে বাকি সময় বাড়ি থাকব? জঙ্গল নিয়ে আমাদের কারবার।

—রাত্তিরেও বুঝি জঙ্গলের কাজ হয়?

—জঙ্গল তো রাত্তিরেই জেগে ওঠে।......না, ঠাট্টা নয়, স্টেশনে যেতে হবে, জরুরি কাজ আছে, তারপর একবার সাঁওতাল পাড়ায়......

সুখেন্দু রুটি-তরকারি খাওয়ায় মন দেয়। মায়া আবার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ফিরে গেছে। বেরুবার সময় মায়া জিজ্ঞেস করবে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে তো? প্রত্যেক দিনের মতন আজও সুখেন্দু বলবে, হ্যাঁ।

সুখেন্দু কলকাতায় বিশেষ যেতে চায় না। বছর কয়েক আগে মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে যেতেই হয়েছিল, মামা বেঁচে নেই বলে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল অনেকখানি।

সেইখানে মায়ার সঙ্গে পরিচয়। শহুরে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার রীতি-নীতি জানে না সুখেন্দু, আগ্রহও বোধ করেনি কখনো। মায়াই যেন কেমন হয়ে গেল। মায়ার মাথাটি নানা রকম আজগুবি ধারণায় ঠাসা। ছোট্টবেলা থেকে সে শহুরে আবহাওয়ায় থেকেছে, বাইরের জীবন সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই, তবু তার স্বপ্ন জঙ্গলের ধারে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে থাকবে, রোজ বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে যাবে। সুখেন্দুর বলশালী চেহারা, রুক্ষ ধরনের মুখ, কথাবার্তা চাঁছাছোলা, তবু এই সুখেন্দুকেই তার গভীর ভাবে পছন্দ হয়ে গেল।

সুখেন্দু অনেক ভাবে এড়াবার চেষ্টা করেছিল, সে বলেছিল, সে রবীন্দ্রসংগীত বোঝে না, কবিতা-টবিতা পড়েনি কখনো, তার জীবিকার ঠিক নেই, কিন্তু ততদিনে মায়া জেদ ধরে বসেছে, সুখেন্দুর সামনে চোখের জল ফেলল সে। একদিন সে হঠাৎ এই জামঝরিয়াতে এসে হাজির। চৌতিরিশ বছরের প্রতিরোধ ভেঙে সুখেন্দু হঠাৎ খানিকটা নরম হয়ে পড়ল তখন, বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল।

তার আগেই অবশ্য সুখেন্দু ঠিক করে ফেলেছিল, স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে সে কাঠের ব্যবসায় নামবে। সে সিদ্ধান্ত সুখেন্দু বদলায় নি।

বিয়ের কয়েকদিন পর সেকথা শুনে মায়া দারুণ ভাবে আহত হয়ে বলেছিল, তুমি গাছ কেটে ফেলবে? গাছ তো মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। বনের পাশে পাশে থাকব বলে আমি এখানে এলুম, সেই বন তোমরা শেষ করে ফেলবে?

সুখেন্দু বলেছিল আমি না কাটলেও অন্য কেউ তো কাটবেই। সরকার ইজারা দিয়ে গাছ কাটাচ্ছে। বাইরে থেকে কত লোক এসে এই কাঠের ব্যবসা করে লাল হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যবসা আমরা করলেই দোষ?

স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে ভবানী সাউয়ের থাকার কথা ছিল, সেখানে পৌঁছে সুখেন্দু তাকে দেখতে পেল না। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় একটা ছোকরা এসে বলল, বাবু আপনাকে ঠেকায় যেতে বলেছে।

সুখেন্দু একটু ইতস্তত করল। ঠেকায় গেলে দেরি হয়ে যাবে, সাঁওতাল পাড়ায় নেমন্তন্ন রাখা যাবে না। আবার সাঁওতাল পাড়ায় গেলেও সহজে ছাড়বে না ভবানী। যা পাগল হয়তো রাত দুপুরে সুখেন্দুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।

বরং আগেই একবার ভবানী সাউয়ের ঠেকায় ঘুরে আসা যাক।

ভবানী সাউয়ের খান তিনেক বাড়ি আছে, একখানা বালেশ্বরে, একটা ঝাড়গ্রামে আর একটা এই জামঝড়িয়াতে। কিন্তু জঙ্গলের মাইল খানেক ভেতরে একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে সে প্রায়ই সন্ধে কাটাতে ভালবাসে। ওখানে ঘর বাঁধা বে-আইনী কিন্তু যতরকম কাজেই তো ভবানীর উৎসাহ। বছরে দুবার ঘর ভেঙে দেয়, আবার একটু দূরে ঘর তোলে।

আকাশে মেঘ কালো হয়ে এসেছে, হয়তো আজ রাত্তিরেই বৃষ্টি আসবে। অন্ধকার জঙ্গলে এর আগে কতবার ঢুকেছে সুখেন্দু। সেরকম কোনো জানোয়ারের ভয় নেই এখানে। কিন্তু আজ সুখেন্দু একটু সতর্ক হয়ে রয়েছে, এক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে অন্য হাতে টর্চ ঘোরাচ্ছে এদিক-ওদিক। এক সপ্তাহে দু'বার অ্যাকসিডেন্ট। যদিও গুরুতর কিছু নয়, দুবারই মনে হতে পারে যে দুপক্ষেরই ভুল। কাকতালীয় ব্যাপার? সুখেন্দুকে ইচ্ছে করে মারবার চেষ্টা করবে কে? এখানে কেউ কারুকে খুন করার চেষ্টা করলে সে কাজটা খুবই সহজ। কিন্তু এখানে সবাই জানে সুখেন্দু ভট্চাজ-কে মেরে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। এখানকার এম এল প্রভাত মুর্মু তাকে বলেছিল, আপনি দাদা ইলেকশনে দাঁড়ালে আমাদের জামানত মারা যাবে! কংগ্রেস-কমুনিস্ট সবাই আপনাকে ভালবাসে।

সুখেন্দুর কোনোদিন মৃত্যুভয় ছিল না। কিন্তু এখন মায়ার কথা চিন্তা করতে হয়।

ঠেকার সামনে একটা আগুন জ্বলছে। সেখানে গোল হয়ে বসে আছে তিনটি ছায়া মূর্তি। সুখেন্দুর সাইকেলের আওয়াজ পেয়েই ভবানী চেঁচিয়ে উঠল, কে?

গলার আওয়াজ পেয়েই সুখেন্দু বুঝল, ভবানীর যথেষ্ট নেশা হয়ে গেছে।

সুখেন্দু সাইকেল থেকে নামতে না নামতেই টলতে টলতে কাছে এগিয়ে এল ভবানী, তার হাতে একটি ভর্তি গেলাস। সেটা সে সুখেন্দুর মুখের সামনে তুলে বলল, এত দেরি করলি? খা শালা খা!

আপত্তি করে লাভ নেই, সুখেন্দু একটা চুমুক দিয়ে বলল, এর মধ্যেই টং?

—খরগোশ ঝলসাচ্ছি। বসো, ইয়ার, বসো!

—ভবানীদা, কী জন্য ডেকেছ, বলো তো? আমায় একবার সাঁওতাল পাড়ায় যেতে হবে!

—বিয়ে করে রস মরে নি? এখনো সাঁওতাল পাড়ায়....

—ওদের একটা পরব আছে, আমায় নেমতন্ন করেছে!

—আরে, সে নেমতন্নেতে আমিও যাব, তোকে কি একলাই নেমতন্ন করে? বোস্! খড়ের ঘরটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি যুবতী, লাল পাড় ধপধপে শাদা শাড়ি পরা, মাথায় ফুল গোঁজা। এক নজর তাকিয়েই মেয়েটিকে চিনতে পারল সুখেন্দু। বড়কা মাঝির এই মেয়েটি কিছুদিনের জন্য চলে গিয়েছিল ঘাটশিলায়, আবার ফিরে এসেছে। এই রকম এক একটা মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝেই ভবানী সাউয়ের বিয়ে হয়। কোন নিয়মে যে বিয়ে হয় কে জানে! নকশাল আন্দোলনে কত ঝড় উঠল। ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন প্রায়ই মাঝে মাঝে চাড়া দেয়, তার মধ্যেই ভবানী সাউ এসব দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে, কেউ বাধা দেয় না। ভবানী সাউয়ের পাশে যে লোকটি বসে আছে সেও একজন আদিবাসী, কিন্তু তাকে ঠিক সুখেন্দু চিনতে পারল না। মেয়েটির বেশ নেশা হয়েছে। সুখেন্দুর দিকে রঙ্গিলা চাহনি দিয়ে সে বলল, আরে মাস্টারবাবু, তুই মহুল খাঁইছিস? আগে তো খেতিস না! তু খাঁ, খাঁ, বেশি করে খাঁ। জঙ্গলে কাম করতে এসে যদি মহুল না খাঁস তো জঙ্গলই তোকে খেঁয়ে ফেলবে!

মেয়েটি হাসতে হাসতে ভবানীর উরুর উপর গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ মায়ার কথা মনে পড়ে যায় সুখেন্দুর। মায়ার যে রাবীন্দ্রিক জগত, তার সঙ্গে এখানকার পরিবেশ কি কোনো ভাবে মেলানো যায়? মায়া যদি জানতে পারে যে ভবানীর মতন একটা দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে বসে সে এখানে মদ খাচ্ছে, তাহলে.....।

কিন্তু একথাও ঠিক, ভবানী সাউ মায়ার তুলনায় জঙ্গলকে অনেক বেশি ভালবাসে। ভবানী সাউ জঙ্গল বোঝে। ওর যথেষ্ট টাকা আছে, ইচ্ছে করলেই রোজ বিলিতী মদ খেতে পারে, ভালো হোটেলে থাকতে পারে, পরিচ্ছন্ন, ফরসা চেহারার স্ত্রীলোকদেরও জোটাতে পারে। কিন্তু ভবানী তবু জঙ্গলেই পড়ে থাকে, মহুয়া বা হাঁড়িয়া খায়, আদিবাসী মেয়েদের দিকেই তার টান। মেয়েরাও যে-কোন কারণেই হোক ভবানীকে পছন্দ করে। সুখেন্দু লক্ষ্য করেছে, অনেক কামিনই ভবানীর সঙ্গে রসের গল্প-কথা করে। জঙ্গলের প্রতিটি গন্ধ চেনে ভবানী, ফুলের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে গাছের বয়েস। বৃষ্টি বাদলার মধ্যেও গাছতলায় খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকতে দেখা যায় ভবানীকে। এরকম কজন পারে?

কিন্তু ভবানী বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। বড়কা মাঝিকেও বলে দিতে হবে, তার মেয়েটাকে যেন এভাবে প্রশ্রয় না দেয়। ভবানী যদি সত্যিই ওকে বিয়ে করে থাকে, তবে মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখুক। সবাই জানুক। জঙ্গলের মধ্যে এরকম বেলেল্লাপনা কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

সুখেন্দু কড়া গলায় বলল, তোমার মাতলামি দেখবার জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?

ভবানী তার উত্তরে হুংকার দিয়ে বলল, শালা পিয়ারীলালকে আমি খুন করব।

—কেন, কী করেছে পিয়ারীলালজী?

—আমার পেছনে লেগেছে! শালা, সাপের ল্যাজ দিয়ে কান চুলকাঁইছে।

—কী হল, খুলে বল না।

—একখানা ওয়াগন নাই শালা! এস্টেশন মাস্টার ছুটি লিয়ে বসে আছে, ওই পিয়ারীলালই ওকে ছুটি লিয়াইছে, আর দশখানা ওয়াগান ওই শালা তিনটা বেনামিতে বুক করে রেইখেছে। আমি সব খবর লিয়েছি। বেইমান শালা! কত ডিজেল ওর এস্টকে আছে তাও আমি জানি।

সুখেন্দু অপ্রস্তুত বোধ করলো। ওয়াগন এমনিতেই কম, নিজেদের মধ্যে সমঝাওতা করে ভাগাভাগি করে নিতে হয় প্রতি বছর। জঙ্গলের কাজ এখন পুরোদস্তুর চলছে, বর্ষা শুরু হবার আগেই মাল পাঠাতে হবে। ওয়াগান না পেলে ক্ষতি হয়ে যাবে খুব।

কিন্তু পিয়ারীলাল নিজের কোটা থেকে **সুখেন্দুকে ওয়া**গন দেবে বলে কথা দিয়েছে। ভবানীকে সে কী ভাবে সাহায্য করবে?

এবারে সুখেন্দু বুঝতে পারল পিয়ারীলালের আসল উদ্দেশ্যটা। সে সুখেন্দুর সঙ্গে জোট বেঁধে ভবানী সাউকে প্রতিযোগিতা থেকে হটিয়ে দিতে চায়।

৩

এখানে সিনেমা হল নেই। ভ্রাম্যমাণ সিনেমা কোম্পানি এসে মাঝে মাঝে, ইস্কুলের মাঠে খোলা আকাশের নিচে সন্ধেবেলা ফিল্ম দেখায়। সেই সব দিনে সিনেমা দেখা একটা উৎসবের মতন, শহর শুদ্ধু সবাই ছুটে যায়, বিশেষত কেউ বাদ থাকে না।

পাশের বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে মায়াও গিয়েছিল। খুবই পুরনো বাংলা ছবি।

সিনেমা দেখার পর সবাই ফেরে হাসি মুখে, নানা রকম গল্প করতে করতে। মায়ার মুখখানা অন্ধকার। বেদনা মাখা।

সামান্য জ্বর হয়েছে বলে সুখেন্দু আর সন্ধের পর বাড়ি থেকে বেরয় নি। জ্বরের চেয়েও মাথার যন্ত্রণা বেশি। একটা দিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

একলা থাকলেই নানারকম চিন্তা আসে। কয়েকদিন ধরেই সুখেন্দু ভবানী সাউকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। যদিও তার বিবেকে খোঁচা লাগছে বারবার। ভবানীর সঙ্গে তার অনেক দিনের চেনা। লোকটার চরিত্রে অনেক রকম দোষ থাকলেও গুণও আছে। ভবানী যাকে যাকে বন্ধু মনে করে, তাদের যে-কোন বিপদ-আপদে ভবানী একেবারে বুক দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। নিজের যত টাকা-পয়সাই খরচ হোক, তা সে গ্রাহ্য করে না।

ভবানীর সঙ্গে সুখেন্দুর এতদিন কোনো স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না। এখন হয়েছে। মাস্টারি ছেড়ে সুখেন্দু যখন ব্যবসায় নামে তখন ভবানী বলেছিল, দ্যাখ বাপু, তুমিও লড়বে, আমিও লড়বো। তুমি যদি জেত, তা হলে আমি রাগ করে মাথা চাপড়াব না। কিন্তু তুমি যদি হেরে যাও, মাইরি তখন আমার দোষ দিও না।

এই অঞ্চলে আর কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, শুধু কাঠের কারবার। অন্য রাজ্য থেকে লোকেরা এসে এই কারবার কুক্ষিগত করে রেখেছে। বিড়ি পাতার কারবার সিন্ধিদের একচেটিয়া। পিয়ারীলাল এসেছে হরিয়ানা থেকে। ভবানী উড়িষ্যার লোক। বাঙালিরা ব্যবসা জানে না। সুখেন্দু তাই ঠিক করেছিল, সারাজীবন সে মাস্টারি করে কাটাবে না। সে একবার লড়ে দেখবে।

ভবানীকে সে বলেছিল, যদি হেরে যাই, তবে হার স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। মনকে সান্ত্বনা দেব, চেষ্টা তো করেছিলুম।

পিয়ারীলাল আর ভবানী দুজনেই সুখেন্দুকে আগে থেকে চেনে। সুখেন্দু জনপ্রিয় মানুষ, তাকে ওরা দুজনেই হাতে রাখতে চায়। এর মধ্যে ভবানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের মতন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল।

এখন ভবানী আর পিয়ারীলালের রেষারেষির মধ্যে সুখেন্দু কোন্ পক্ষ নেবে? তার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাও সম্ভব নয়। পিয়ারীলাল তাকে দারুণ একটা টোপ দিয়েছে।

ভবানী হার-জিতের কথা বলেছিল। ভবানীর যা অবস্থা তাতে একটা সিজন মার খেলেও সে একেবারে ডুবে যাবে না, পরের বার আবার লড়বে। কিন্তু সুখেন্দুর পুঁজি অতি সামান্য, তার যা কিছু ছিল সবই এই কারবারে ঢেলেছে। একবার মার খেলে সে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। পিয়ারীলালের সাহায্যই তার নেওয়া উচিত, কিন্তু তাতে ভবানী তাকে মনে করবে বিশ্বাসঘাতক।

মায়া ঘরে ঢুকেও সুখেন্দুর সঙ্গে একটাও কথা বলল না। হঠাৎ জানলার সামনে গিয়ে উদাসীন ভাবে চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

—কেমন দেখলে সিনেমা? মাঝখানে রিল ছিঁড়ে যায় নি?

মায়া কোনো উত্তর দিল না। সামান্য একটা শব্দ শুনে সুখেন্দু বুঝল যে মায়া কাঁদছে। অবাক হয়ে উঠে এসে বলল, কী হল? খুব দুঃখের ছবি বুঝি?

মায়া কান্না আর রাগ জড়ানো গলায় বলে উঠল, আমি আর যাব না, কোনোদিন বাইরে যাব না! বাড়ি থেকে বেরুতে চাই না।

—কেন কী হয়েছে? তোমাকে কেউ অপমান করেছে?

—মানুষ কেন এতো খারাপ হয়?

—কী ব্যাপার খুলে বলো তো?

মায়া যা বলল, তাতে সুখেন্দুর হাসি পাবার মতন অবস্থা। মায়াকে কেউ অপমান করেনি। সিনেমাটা দুঃখের ছিল না, মনে দাগ কাটবার মতনও কিছু না। শুধু দুটি সাইকেল রিক্সাওয়ালা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছে, কুৎসিত, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়েছে, যেমন ওরা দেয়। মায়াকে সেইসব কুৎসিত কথা শুনতে হয়েছে, এটাই সাংঘাতিক ব্যাপার।

সুখেন্দু বলল, তুমি শুনলে কেন? পাশ কাটিয়ে চলে আসতে পারলে না?

তার উপায় ছিল না। সাইকেল রিক্সাওয়ালা দুটি পথ আটকে দিয়েছিল। ওদের সেইসব অশ্লীল কথা বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত শুনেছে। তবু, আশ্চর্যের ব্যাপার, একটা লোক প্রতিবাদ করল না? কেউ ওদের বাধা দিল না?

আজকাল রাস্তা-ঘাটে খুনোখুনি হলেও কেউ বাধা দিতে যায় না। দুজন লোক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করলে কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়; এ রকম তো সব সময়ই চলছে।

মায়ার রাবীন্দ্রিক জগতে এরকম খারাপ ভাষার কোন স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ কি এই রকম মফঃস্বল শহরের কোনো সাইকেল রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে লিখেছেন? সুখেন্দু জানে না, রবীন্দ্রনাথ কোনো জঙ্গলের কন্ট্রাকটরকে নিয়ে লিখেছেন কি না।

মায়া যদি জানতে পারে যে তার স্বামী রেলবাবুদের নিয়মিত ঘুষ দেয়, ফরেস্ট গার্ডদের মহুয়া কিনে দিতে হয়, কুলি-কামিনদের চড়-চাপড় মারতে হয়, পিয়ারীলালের অসৎ কাজের সমর্থন করে যেতে হয়, তা হলে কি মায়া তাকে আর ভালবাসবে? মায়াকে বিয়ে করা তার ভুল হয়েছে। অথচ, মায়ার কথা ভাবলেই তার মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। মায়াকে সে হারাতে পারবে না।

সারাজীবন মাস্টারি। একদল লোক অন্যদের ঠকিয়ে সব টাকা-পয়সা লুটে-পুটে নিয়ে যাবে, আর মাস্টাররা শুধু আদর্শের নামে সারাজীবন চিমসে হয়ে থাকবে? এসব জায়গায় লেখাপড়াও তো হয় কাঁচকলা, দু-চারটি ছেলে মাত্র কেরানি হবার যোগ্যতা লাভ করে।

সুখেন্দু মায়ার দুবাহু ধরে নরম গলায় বলল, মায়া, তুমি কি কলকাতায় গিয়ে থাকতে চাও? আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

মায়া বলল, কলকাতা না, আমি তো শহর ভালবাসি না, সেখানে সবাই শুধু স্বার্থ বোঝে...আমি তো প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি, যেখানে সরলতা আছে।

—সরলতা? হুঁ। কে বলল, এসব জায়গায় লোক সরল হয়?

—চলো, আমরা এ জায়গাও ছেড়ে বনের মধ্যে একটা ছোট্ট ঘর বেঁধে থাকি।

—জঙ্গল তো সব সরকারের। সেখানে আমাদের থাকতে দেবে কেন? তা ছাড়া ডাকাতের উপদ্রব আছে।

—আমাদের কোনো দামি জিনিস থাকবে না। টাকা-পয়সাও থাকবে না। তাহলে ডাকাতেরা আর কী নেবে?

—তুমি নিজেই তো একটা অত্যন্ত দামি জিনিস। ডাকাতরা তোমাকে কেড়ে নিতে আসবে। রবীন্দ্রনাথ ডাকাতদের নিয়ে কিছু লিখেছেন?

—হ্যাঁ। এই তো, ধর, বাল্মীকি প্রতিভা।

—সে তো আসল ডাকাত নয়, বাল্মীকি....মানে যে ডাকাতটা পরে ভাল হয়ে ঋষি হয়ে গেল, তাই তো? এখনকার ডাকাতরা কিন্তু ভাল হয় না, তারা খুব খারাপ ভাষায় কথা বলে, মানুষ খুন করতে তাদের একটু আটকায় না।

পরদিন খবর পাওয়া গেল, ভবানী সাউ একটা বিশ্রী গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছে। সে লাথি মেরেছে স্টেশন মাস্টারকে। পুলিশ কেস হয়েছে তার নামে।

ভবানী সাউয়ের মাথা গরম। এটা খুব কাঁচা কাজ হয়েছে তার। পুলিশ কেস থেকে বেরিয়ে আসতে তার অসুবিধে হবে না ঠিকই। কিন্তু ওয়াগন নিয়ে ঝগড়াটা এরকম প্রকাশ্য করে দিয়ে তার কোনো লাভ হবে না। বরং স্থানীয় এম এল এ-কে ধরার চেষ্টা করলে পারতো।

এসময় ভবানী সাউয়ের সঙ্গে সুখেন্দুর দেখা করা উচিত। গত বছর এরকম একটা ঝামেলায় সে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিল। এখানে একটি মাত্র রেশনের দোকান, তার মালিক কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দিনের পর দিন দোকান বন্ধ। গ্রাম থেকে আসা গরিব মানুষেরা প্রত্যেকদিন এসে সেই বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার ফিরে যায়। দোকানের মালিকের খেয়াল-খুশিমতন লোকজন চাল-গম পাবে। ক্রমশ সবাই ক্ষেপে উঠছিল, এরপর দোকান লুট হয়ে যেত, সুখেন্দু একদিন নিজের দায়িত্বে সেই দোকানের তালা ভেঙে ফেলল। দোকানটার একজন কর্মচারীকে ডেকে এনে বলল, তুমি হিসেব করে পয়সা নিয়ে সবাইকে রেশন দাও। মালিকটা ঠিক তার পরদিন ফিরে এসে পুলিশ কেস করে দিয়েছিল সুখেন্দুর নামে। তখন ভবানী সাউ এসে দাঁড়িয়েছিল সুখেন্দুর পাশে। থানায় গিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, সুখেন্দু ভট্‌চাজ নিজে কি এক দানা চাল-গম লিখেছে? এ তল্লাটে কুন্ লোকটা তার বিপরীতে সাক্ষী দিবে? ডাকি দেখান তো!

তখন ভবানীর সঙ্গে কোনো স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না সুখেন্দুর, তাই বন্ধুত্ব ছিল। ব্যবসায় নামার পর সুখেন্দু ঠিক করেছিল, সে আলাদা থাকবে, অন্য কারুর সঙ্গে কিছুতে জড়াবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না জড়িয়ে পড়ে কোনো উপায় নেই। পিয়ারীলাল ঘন ঘন সুখেন্দুকে নেমন্তন্ন করছে তার বাড়িতে।

ভবানী সাউয়ের সঙ্গে সুখেন্দু একবার দেখা করতে গেল বটে, কিন্তু দিনেরবেলা নয়, বেশি রাত করে। এই সময়টায় ভবানী সাউ মাতাল থাকে, রাগের চোটে চিৎকার চেঁচামেচি করে, কোনো কাজের কথা হয় না। সুখেন্দুকে কোনো চুক্তির মধ্যে আসতে হয় না। সুখেন্দু তার বিবেক পরিষ্কার করে নেয় এই ভেবে যে দেখা তো করেছে। ভবানী পরে বলতে পারবে না যে সে এড়িয়ে ছিল।

পিয়ারীলাল তিনখানা ওয়াগনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সুখেন্দুকে, মালপত্তর সব পাঠিয়ে সে নিশ্চিন্ত। ভবানী ট্রাক জোগাড় করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রাণপণে। খরচ অনেক বেশি পড়ে যাবে, ঠিক সময়ে পৌঁছবে কিনা তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। সময় মত মাল না পৌঁছোলে অর্ডারের টাকা পাওয়া যায় না।

মায়া একবার শান্তিনিকেতনে যেতে চায়। সুখেন্দু কথা দিয়েছে নিয়ে যাবে। এরপর কিছুদিন হাতে কোনো কাজ থাকবে না। অর্ডারের টাকাটা এসে গেলেই সুখেন্দু এদিককার সব ধার মিটিয়ে দেবে। তারপর বেড়াতে যাবে মায়াকে নিয়ে।

পিয়ারীলালের বাড়ির সামনের দিকে দুটো বড় বড় ঘর রয়েছে শুধু অতিথিদের খাতির করবার জন্য। প্রায়ই সে দু-চার জনকে ডাকে। পিয়ারীলাল খাওয়াতে ভালবাসে। মাছ-মাংস-বিরিয়ানী-পরটা ইত্যাদি অঢেল খাবার। বোতলের পর বোতল হুইস্কি-রাম। অন্যরা যত খায়, পিয়ারীলাল তার চেয়ে বেশি খায়। কিন্তু পিয়ারীলালের নারীঘটিত দোষ নেই। আদিবাসী মেয়ে তো দূরের কথা, ভদ্দরলোকদের বাড়ির মেয়েদের দিকেও সে চোখ তুলে থাকায় না। মেয়েদের কথা সে উচ্চারণই করে না। নিজের বাড়িতে ছাড়া অন্য কোথাও সে মদ্যপানও করে না। পিয়ারীলালের চরিত্রে কেউ দোষ দিতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে সুখেন্দুর উরুতে চাপড় মারে পিয়ারীলাল। হাসতে হাসতে বলে, আরে সুখেন্দুবাবু, আভি খাও দাও মৌজ করো। কাম তো ঠিকঠাক হোয়ে গেছে!

পিয়ারীলালের তুলনায় সুখেন্দু একটু চুনোপুঁটি। তবু সে তাকে এত খাতির করছে কেন? দুবার তাকে গাড়ি চাপা দেবার ভর দেখিয়েছিল কে? কেউ কি তাকে এই লাইন থেকে সরিয়ে দিতে চায়? সুখেন্দু ভট্চাজকে যে চেনে সে কি এরকম ছেলেমানুষি করতে পারে?

পিয়ারীলাল বলল, শুনো সুখেন্দুবাবু, হামি যব পাকিস্তানসে সব ছোড়কে চলে আসি, তখুন হামার কী ছিল? কুচ্ছু না, কুচ্ছু না। স্রিফ এই দো হাঁথ। হামার পিতাজী হামায় বলেছিল কী, মরদ হো তো হাঁথ সে কাম করো। তুমার হাঁথ আছে, তুম্ এ সন্সারকা সাথ লড়ো। তো হামি লড়িয়ে গিয়েছি। আপনা হাত জগন্নাথ। আজ ইয়ে দেখো, এই এত্তো বড় মকান বানিয়েছি, কাঠের কারবার, পেড্রোল পাম্প, দো-দশঠো ট্রাক, সব আপনা হাঁথ সে বনায়া। ঠিক কি না!

নিজের অজ্ঞাতসারেই সুখেন্দু বলে ফেলল, তা তো বটেই!

একটু নেশা হলেই পিয়ারীলাল দার্শনিক হয়ে যায়। বিচিত্র তার দর্শন। খাটো আর টাকা রোজগার করো, খাটো আর টাকা রোজগার করো। এ ছাড়া জীবনে যেন আর কিছুই নেই। বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা, এরপর এত টাকা নিয়ে সে কী করবে? ওর এখন যা আছে তাই তো যথেষ্ট তবু ভবানী সাউকে ল্যাঙ মেরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে কেন?

সুখেন্দু ভবানী সাউয়ের নাম উচ্চারণ করে না।

পিয়ারীলাল একটা মাংসের ঠ্যাং জোর করে সুখেন্দুর মুখে ভরে দেয়। গেলাসে গপ গপ করে মদ ঢালে। তারপর জাঠ ভাষায় কী একটা দুর্বোধ্য ছড়া বলে, তার একবিন্দু মর্ম বুঝতে না পারলেও সুখেন্দুকে মাথা নাড়তে হয়।

শান্তিনিকেতন যাবার তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। বাঁধা-ছাঁদা শুরু করেছে মায়া। সুখেন্দু আগে কখনো শান্তিনিকেতন যায় নি শুনে মায়া প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে কতই বা দূর, বড়জোর দেড়শো মাইল, তবু কোনোদিন কবিগুরুর শান্তিনিকেতন দেখার ইচ্ছে হয়নি সুখেন্দুর? এরকম মানুষও আছে?

মায়া বলল, তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে, তাহলে এরকম ভাবে জঙ্গলের গাছ কেটে শেষ করতে পারতে না। চলো, শান্তিনিকেতন চলো, দেখবে গুরুদেব গাছ কত ভালবাসতেন!

সুখেন্দু হাসতে হাসতে বলল গাছ না কাটলে তোমাদের চেয়ার-টেবিল খাট আলমারি তৈরি হবে কি করে? ইলেট্রিকের খুঁটি পুঁততেও শালবল্লা লাগে।

মায়া এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে কি পৃথিবী থেকে সব গাছ শেষ হয়ে যাবে?

সুখেন্দু অন্যমনস্কভাবে বলল, নতুন গাছও লাগানো হচ্ছে!

একটা চিন্তা সুখেন্দুর মনে খরখর করে বিঁধছে কদিন ধরে। অর্ডারের টাকাটা এখনো এল না। আর .ফরত আসেনি। টেলিগ্রাম পাঠিয়েও জবাব পাওয়া যায় নি। এখানে টাকার বিলি ব্যবস্থা না করে সুখেন্দু মায়াকে নিয়ে শান্তিনিকেতন যাবে কী করে?

মোটর সাইকেলে রাস্তা কাঁপিয়ে সুখেন্দু একবার রেলস্টেশন, একবার পোস্ট অফিস ঘুরে বেড়ায়। দুপুরবেলা হঠাৎ ভবানী সাউয়ের সঙ্গে দেখা।

শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে পারেনি ভবানী, তার সমস্ত মাল কলকাতার পাইকারদের কাছে জলের দামে বেচে দিতে হয়েছে।

সুখেন্দুর কাঁধে বাঘের মতন একটা থাবা দিয়ে কর্কশ গলায় ভবানী বলল, ক্যাঁকড়া বিছের ল্যাজে চুমো খেলে কী হয় জানিস না?

সুখেন্দু বুঝতে না পেরে অস্বস্তির সঙ্গে হাসল।

ভবানী আবার বলল, আমি শালা ডিগবাজি খেয়েও আবার উঠে দাঁড়াব। তুই বামুনের পো, তুমি কোথায় যাবি? মন্দিরে গিয়ে ঘন্টা লাড়বি?

সুখেন্দু বলল, কী হয়েছে, খুলেই বলো না।

এর উত্তরে ভবানী কয়েকটি অতি অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল।

সুখেন্দু আবার বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলার জো নেই দেখছি। রাত্তিরবেলা পেঁচি মাতাল হয়ে থাকবে আর দিনেরবেলা দেখা হলে মুখ খিস্তি করবে।

ভবানী বলল, আমি মাতাল-দাঁতাল হই আর যা হই, তুই কী করছিস তার সব ঠিকই জানি। তুই পিয়ারীলালের.... চাটতে গিইছিলি।

—আবার। আবার ওই সব বাজে কথা। তোমার কী খবর বলো?

—আমি বেঁইচি আছি, বেঁইচেই থাকব। তুই মরবি। তিনখানা ওয়াগান পেয়ে ভাবছিলি রাজা হুঁছিস? কোথায় পাঠিয়ে ছিলি ওয়াগন? কোথায় পৌঁছাইছে?

হঠাৎ সুখেন্দুর মুখটা শুকিয়ে যায়। অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে। এসব বলছে কি ভবানী সাউ?

সুখেন্দু ভবানীর হাত চেপে ধরল। ভবানী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ক্যাঁকড়া-বিছেকে তুই যতই আদর কর, সে হুল ফুটাবেই। এই হল নিয়ম, বুঝলি? যা স্টেশানে যা নিজের কানে তোর সর্বনাশের খপরটা শুনে আয়।

স্টেশনে পৌঁছবার আগেই সুখেন্দু খবরটা আন্দাজ করতে পারল। এরকম যে হয় সে আগে শুনেছে। কিন্তু তার বেলাতেই এটা ঘটবে, তা সে স্বপ্নেও আশঙ্কা করেনি।

সুখেন্দু মাল বুক করেছিল পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। কোন অজ্ঞাত কারণে সেই ওয়াগন গিয়ে পড়ে আছে বোম্বইতে। পার্টির কাছে মাল পৌঁছায়নি, তারা তো অর্ডারের টাকা দেবেই না, উলটে এখন সুখেন্দুকে ডেমারেজের টাকা গুণতে হবে।

ভবানী সাউয়ের মতন মাথা গরম করে এখন স্টেশন মাস্টারকে লাথি মেরে কোন লাভ নেই। সে এখন যতই হম্বি-তম্বি করুক তার মালের কোনো সুরাহা হবে না। পিয়ারীলাল তার এরকম সর্বনাশ করল? কেন? ক্যাঁকড়া বিছে তার হুল ফোটাবেই, এটা তার স্বভাব বলে?

ঠান্ডা মাথায় বাড়ি ফিরে এল সুখেন্দু, মায়াকে কিছু বলে লাভ নেই। মায়া এসব কিছুই বুঝবে না। সে এসব নিয়ে কখনো মায়ার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না।

খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে তার থেকে একটা জিনিস বার করল সুখেন্দু। পাঞ্চ। একবার খড়্গপুরে এক গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি করে সুখেন্দু এটা কেড়ে নিয়েছিল। কখনো কাজে লাগায়নি, এবার কাজে লাগাবে। এটা হাতে জড়িয়ে ঠিক মতন ঝাড়তে পারলে অনায়াসে একজন মানুষকে অন্ধ করে দেওয়া যায়।

সুখেন্দু হার মানবে না। সে বদলা নেবে। মার খেলে মার ফিরিয়ে দিতে হবে।

পিয়ারীলাল প্রায়ই বলে, জোয়ান মরদের হাত দুখানা থাকলেই যথেষ্ট। তা দিয়েই সে উন্নতি করতে পারে। না, তা যথেষ্ট নয়। পিয়ারীলালের আরও কয়েকটা হাত আছে, সেই সব হাত দিয়ে সে কলকাঠি নাড়ে। সেই অদৃশ্য হাতগুলোই আসল। এবারে একটা একটা করে সেই অদৃশ্য হাত ভাঙতে হবে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মায়া আপনমনে গান গাইছে। "মধ্য দিনে যবে গান, বন্ধ করে পাখি। হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী...."।

দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে সুখেন্দু সেই গান শুনলো। মায়া বেশ ভাল গায়। মায়ার মনটা এখন কোথায় কে জানে।

সুখেন্দুর হাতে এবার রক্ত লাগবে। সেই রক্তমাখা হাত নিয়ে সে কি মায়ার সঙ্গে কোনোদিন যেতে পারবে শান্তিনিকেতনে?

যদি

বাইরের বাচ্চাদের গলায় চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনে বেগম জাহানারা ইমাম বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বেগমের বয়েস এখন সত্তর বছর, কিন্তু মুখে এখনও তেমন বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি, শ্বেত কমলের মতন তাঁর গায়ের রং, তাঁর মুখে সন্ধ্যা সূর্যের লাল আভা। আজ উৎসবের দিন বলে তিনি একটি সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছেন।

হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। উঠোনে তাঁর নাতি-নাতনি ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা বাজি পোড়াচ্ছিল, তারা উঠে এসেছে বারান্দায়। উঠোনে একটা ঝুড়িতে অনেক বাজি রাখা ছিল, হঠাৎ বৃষ্টিতে সেগুলো ভিজে গেছে, সেইজন্য ছেলে-মেয়েদের ক্ষোভ।

সবচেয়ে ছোট নাতনি মিলি এসে জাহানারা বেগমকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, দাদিমা, আমার রংমশাল জ্বলছে না! বৃষ্টি খুব পাজি! বিচ্ছিরি!

জাহানারা বেগম হাসলেন। বৃষ্টি দেখে তাঁর মন প্রসন্ন হয়েছে। সারাদিন অসহ্য গরম ছিল। শবে-বরাত-এর দিন বৃষ্টি না হলেই মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগে। আজ রাতে বেহেস্ত থেকে ফেরেস্তারা নেমে আসবেন, তার আগে বৃষ্টির জলে এই পৃথিবী পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া দরকার। জাহানারা বেগমের যতদূর মনে পড়ে, প্রত্যেক শবে-বরাত-এর বিকেলেই তিনি বৃষ্টি হতে দেখেছেন।

তিনি মিলির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, অনেক বাজি পুড়িয়েছিস মা। এবার চল সন্দেশ খাবি। খিদে পায়নি?

মিলি বলল, না। রেহানা তিনটে রংমশাল জ্বেলেছে। আমি মোটে একটা!

জাহানারা বেগম তাঁর আর এক নাতিকে ডেকে বললেন, ফিরোজ, মিলিকে আর দু-একটা বাজি দে।

ফিরোজ বলল, আর নেই, দাদিমা, পয়সা দাও, দোকান থেকে কিনে আনব।

—এই বৃষ্টির মধ্যে কী করে দোকানে যাবি?

—ছাতা নিয়ে যাব। পয়সা দাও, দাদিমা!

আজকের দিনে বাচ্চারা আনন্দ করবেই। বৃষ্টিতে ভিজবে, কিছুটা অনিয়ম হবে, এই বয়েসে সবই মানায়। আজ কেউ কিছু চাইলে না বলা যায় না। তিনি মিলিকে জোর করে কোলে তুলে নিলেন, মিলি ছটফট করতে লাগল, সেও ফিরোজদের সঙ্গে বাজি কিনতে দোকানে যেতে চায়। জাহানারা বেগম বললেন, তুই ভেতরে গিয়ে আমার পাশে বসে বাজি পোড়াবি। ফিরোজ, তুই কামরুদ্দীনের কাছ থেকে আমার নাম করে কুড়ি টাকা চেয়ে নিয়ে যা, অনেকগুলি বাজি মিলিকে দিবি।

বাতাসে ভেসে এল মাগরেবের আজানের ধ্বনি। নতুন মুয়াজ্জিনের গলাটি অতি সুরেলা, জাহানারা বেগম একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই আজান শুনলেন। আজকের দিনটি বড় সুন্দর।

মিলিকে নিয়ে জাহানারা বেগম উঠে এলেন দোতলায়। সাদা রঙের বেশ বড় বাড়ি। এক সময় এই অঞ্চলটি বেশ ফাঁকা ছিল, এ বাড়ির পেছন দিকেই ছিল ধান জমি, বাঁ দিকে পুকুর, ডান দিকে চৌধুরীদের আমবাগান। কিন্তু ইদানীং কলকাতা শহর লকলকে জিভ বার করে চারপাশের মফস্বল গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসছে। বারাসত পর্যন্ত চলে এসেছে পাতালরেল, চৌধুরীদের আমবাগান ধ্বংস করে সেখানে তৈরি হয়েছে টেলিফোন-এর কারখানা। অন্যপাশের পুকুরটি ভরাট করে তৈরি হচ্ছে কর্মচারিদের কোয়ার্টার্স।

পাঁচ বছর আগে জাহানারা বেগমের স্বামীর ইন্তেকাল হয়েছে। কাজী হাসান হাবিব রিটায়ার করেছিলেন বেঙ্গল পুলিশের ডি আই জি হিসেবে। তারপরেও তিনি কয়েকটি প্রাইভেট ফার্ম থেকে চাকরির প্রস্তাব পেয়েও নেননি, সারাজীবন পুলিশের চাকরি করার পর তাঁর খুব শখ হয়েছিল বাগান করার। বাড়ির সামনের ছোট্ট জমিটিতে নানা রকম ফুলগাছ লাগিয়ে তিনি তাই নিয়েই মেতে থাকতেন, চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তাঁর, ভোরবেলা উঠে এক হাতে একটি শাবল ও অন্য হাতে জলের বালতি নিয়ে চলে আসতেন বাগানে। একদিন সকালে তাঁর সেই প্রিয় ফুলগাছগুলির ওপরেই তিনি হঠাৎ হার্টঅ্যাটাকে ঢলে পড়লেন।

তারপর থেকে জাহানারা বেগমই এতবড় সংসারটির হাল ধরে রেখেছেন। তাঁর চার ছেলে আর তিন মেয়ে, সবাই এখন বিবাহিত। বড় ছেলে চাকরি করে লাহোরে, সম্প্রতি সেখানে সে একটি বাড়ি কিনেছে, তার খুব ইচ্ছে আম্মাকে সেখানে একবার নিয়ে যাওয়ার। এ বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট বেশি দূর নয়, প্লেনে দু-ঘণ্টায় লাহোরে পৌঁছোনো

যায়। কিন্তু জাহানারা বেগম জীবনে একবারই মাত্র প্লেনে চেপেছেন, স্বামীর সঙ্গে আজমীর শরীফ-এ তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, সে প্লেন-যাত্রা তাঁর পছন্দ হয়নি, কানে খুব চাপ লেগেছিল, সেইজন্য প্লেনে চাপতে তাঁর ইচ্ছে হয় না। লাহোরে ট্রেনে যেতে দেড় দিন লেগে যায়....আসলে এই বাড়ি, এই সংসার ফেলে জাহানারা বেগমের কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না।

মেজ মেয়ে সেলিনা থাকে লন্ডনে, সেখানেই সে সিলেটের এক ডাক্তারকে বিয়ে করেছে। বাচ্চাদের নিয়ে তারা এখানে এসে পৌঁছেচে পরশুদিন। ছোট মেয়ে নীলুফার গত বছর বিধবা হবার পর দুটি বাচ্চা নিয়ে ফিরে এসেছে মায়ের কাছে। বড় মেয়ে হামিদা থাকে বেনারসে, সে এ বছর আসতে পারবে না। তার শরীর খারাপ। অন্য ছেলে ও ছেলের বউরা সবাই এসেছে, বাড়ি ভর্তি এখন অনেক লোকজন।

ছোট ছেলে সিরাজ একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে। এই ছেলেটিকে নিয়ে জাহানারা বেগমকে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে। সিরাজ যখন স্কুলের ছাত্র, তখনই সে একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যায় হরিদ্বারে, সে নাকি একা একা হিমালয়ের কোনো একটা চূড়ায় উঠবে ঠিক করেছিল। কলেজ জীবনে সে যোগ দেয় উগ্রপন্থী রাজনীতিতে। যার বাবা পুলিশের বড় অফিসার, সে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে বেড়ায়। কাজী হাসান হাবিব একদিন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, জাহানারা বেগম, একদিন আমাকেই হয়তো তোমার ছেলেকে অ্যারেস্ট করে জেলে ভরতে হবে। বাবার হাতে অবশ্য গ্রেপ্তার হতে হয়নি সিরাজকে, কিন্তু বিহারে কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তিনমাস হাসপাতালে কাটিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।

বিয়ের পর অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে সিরাজ। এখনও সে রাজনীতি করে বটে কিন্তু একটা চাকরিও করে। তার স্ত্রী দীপা বারাসত কলেজে পড়ায়। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী আলাদা বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু জাহানারা বেগম এক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ওসব চলবে না। এ বাড়িতে এত ঘর খালি পড়ে আছে, তবু তোদের অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে কেন?

সিরাজ ও দীপার একমাত্র মেয়ে এই মিলি, ভাল নাম মিলিতা। এই নাতনিটি জাহানারা বেগমের বড় প্রিয়। অতি দুরন্ত মেয়ে, কিন্তু বকুনি খেয়ে খিলখিল করে হাসে। কয়েকদিন ধরে একটু একটু সর্দি-কাশিতে ভুগছে, আজ বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাত অসুখে পড়বে মেয়েটা, তাই জাহানারা বেগম ওকে নিজের কাছে রাখতে চান। মিলির মা একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে ঢাকা গেছে, ফিরবে দুদিন বাদে। নিজের ঘরে এসে জাহানারা বেগম মিলির দুহাতে দুটো নারকেলের সন্দেশ ধরিয়ে দিলেন। মেয়েটা এমনি সন্দেশ রসগোল্লা খেতে চায় না, কিন্তু নারকেলের মিষ্টি খুব ভালবাসে।

এবারে জাহানারা বেগম একটি ছোট জলচৌকির সামনে কোরান শরীফ খুলে বসলেন। শবে-বরাতের দিনে বারবার কোরান শরীফ পাঠ করে মনটাকে শুদ্ধ রাখতে হয়। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে খুব জোরে, আজ ছেলে-মেয়েদের বাজি পোড়াবার আনন্দটাই নষ্ট।

এক পাতা পড়তেই জাহানারা বেগমের মন নিবিষ্ট হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাপ-দাদার মুখে কোরান শরীফ পাঠ শুনেছেন। তিনি নিজেও পড়েছেন অধিকাংশ সূরা-ই তাঁর মুখস্থ। তবু যতবার পড়েন, ততবার ভাল লাগে।

এই কোরান শরীফটি তাঁর বাবা তাঁকে দিয়েছেন। ছাপা বই নয়, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, প্রত্যেক পাতায় সোনার জলের বর্ডার।

নারকেলের মিষ্টি দুটি শেষ করে মিলি তাঁর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, দাদিমা কী পড়ছো তুমি?

জাহানারা বেগম বললেন, আমি কোরান শরীফ পড়ছি মা। তুমি ততক্ষণ একটু খেলনাপাতি নিয়ে খেলা কর, আমি আর একটু পড়ে নিই.....

মিলি আদুরে সুরে বলল, ওরা এখনো বাজি নিয়ে এল না। দাদিমা, তুমি আমাকে গল্প বল।

—আচ্ছা গল্প বলছি। চুপ করে বোস!

—ওইটা কী বই, ওতে কি রাজা-রানির গল্প আছে?

—হ্যাঁ, তাও আছে। আমার পিঠ থেকে নেমে পাশে এসে বোস। এই তো ভাল মেয়ে! এক দেশে নোমরুদ নামে এক রাজা ছিল। সেই রাজা খুব অহংকারী, সে ছিল ঈশ্বরদ্রোহী।

—ঈশ্বরদ্রোহী কী দাদিমা?

ঈশ্বর হলেন আল্লা, ভগবান। যে ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করে, সে হল ঈশ্বরদ্রোহী। এই রাজা নোমরুদ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে না মেনে নিজেকেই ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছিল। তার প্রজারা তাকেই ঈশ্বর বলে পুজো করত, কিংবা তার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করত। সেটা খুব খারাপ কাজ।

—কেন, খারাপ কেন?

—রাজা তো আর ঈশ্বর নয়। তারপর শোন, এব্রাহিম বলে সেই রাজ্যে একজন প্রজা ছিল। সে কিন্তু রাজাকে মানেনি, সে রাজাকে পুজোও করেনি। রাজা একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন আমার পুজো কর

না? এব্রাহিম বলল, আমি নিজের ঈশ্বর ছাড়া আর কারুকেই পুজো করি না। রাজা তখন খুব গর্বের সঙ্গে বল, আমিই তো ঈশ্বর! তখন এব্রাহিম বলল......

দরজার কাছে জুতোর শব্দ হল। জাহানারা বেগম মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, তাঁর ছেলে সিরাজের সঙ্গে একটি দম্পতি এদিকেই আসছে। বই পড়তে চশমা লাগে, সেই চশমায় দূরের মানুষদের চেনা যায় না। চশমা খুলে জাহানারা বেগম চিনলেন, সিরাজের সঙ্গে এসেছে দীপার দাদা আর বৌদি, জয় ও ভাস্বতী।

জাহানারা বেগম তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই জয় ভাস্বতী এসে তাঁর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন, মাসিমা?

জাহানারা বেগম দুজনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সিরাজ কিন্তু তার মাকে প্রণাম করল না, সে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে, সে এসব আদিখ্যেতা পছন্দ করেন না। দীপার দাদা জয় একজন নামকরা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, গত বছর চীনের সরকার তাকে মাও জে ডং স্মৃতি পুরস্কার দিয়েছে, কিন্তু তার চালচলনে একটুও অহংকার নেই। এ বাড়িতে এলেই সে জাহানারা বেগমকে প্রণাম করে।

জাহানারা বেগম নিজের হাতে তাদের মিষ্টি পরিবেশন করে বাড়ির সকলের কুশল-সংবাদ নিলেন। ভাস্বতী বলল, মাসিমা, আপনি কোরান পড়ছিলেন? ইস, আমরা এসে আপনাকে ডিসটার্ব করলুম। এই চলো, আমরা অন্য ঘরে গিয়ে বসি।

জয় বলল, মাসিমা, আপনি তো জানেনই, প্রতি বছর এই সময় আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয়। অনেক কালের পারিবারিক ব্যাপার, চলে আসছে। দীপা তো এখানে নেই, মিলিকে আর অন্যান্য বাচ্চাদের, মানে, মা আপনাদের সবাইকেই নেমন্তন্ন করেছেন, কিন্তু আপনাকে তো আর যেতে বলতে পারি না......

জাহানারা বেগম বললেন, তোমরা কিন্তু রাত্তিরে খেয়ে যাবে। শবে-বরাতের দিন অতিথিদের না খেয়ে যেতে নেই।

জয় বলল, খেয়ে যাব তো নিশ্চয়ই, একতলায় যা সুন্দর মাংস রান্নার গন্ধ পেলাম।

ভাস্বতী বলল, আপনাদের বাড়িতে চালের গুঁড়ো দিয়ে যা চমৎকার রুটি হয়.....

সিরাজ মেয়েকে ডেকে বলল, এই মিলি, আয়, আমাদের ঘরে আয়।

মিলি বলল, আমি এখন যাব না। দাদিমা আমাকে বই পড়ে গল্প বলছে।

ওরা চলে যেতে না যেতেই মিলি জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

নাতনির উৎসাহ দেখে খুশি হয়ে জাহানারা বেগম আবার গল্প শুরু করলেন।

—হ্যাঁ, কতদূর যেন বলেছি? নোমরুদ রাজা আর এব্রাহিম। নোমরুদ রাজার সেই অহংকারের কথা শুনে এব্রাহিম বলল, 'আমি কোনো রাজাকে ঈশ্বর বলি না। তিনিই ঈশ্বর, যিনি মানুষের প্রাণ দিতে পারেন আর প্রাণ নিতে পারেন! রাজা বলল, এ তো আমিও পারি! দেখবে? তিনি কয়েকখানা থেকে দুজন বন্দিকে আনালেন। তাদের একজনের পরদিনই ফাঁসি হবার কথা। রাজা তাকে মুক্তি দিয়ে দিল, আর এব্রাহিমকে বলল, দেখলে আমি, প্রাণ দিতে পারি? আর অন্য যে বন্দিটির পরের দিনই মুক্তি পাবার কথা, এক কোপে তার মুণ্ডু কেটে নিয়ে বলল, দেখলে আমি প্রাণ নিতেও পারি।

—তখন ওই প্রজাটা কী বলল?

এব্রাহিম এবার আসল কথাটা বলল। সে বললে রাজা আমার ঈশ্বর প্রত্যেকদিন সূর্যকে আকাশের পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসে। তুমি কি সকালবেলা সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে আনতে পারবে? সেই কথায় রাজা হেরে গিয়ে মুখ নিচু করল। বুঝলি মা, আল্লার শক্তিকে যারা প্রশ্ন করে.....

আবার দরজার কাছে জুতোর শব্দ। দীপার দাদা ও বৌদিকে নিজের ঘরে বসিয়ে একা ফিরে এসেছে সিরাজ। প্যান্টের ওপর টি-শার্ট পরা, সুপুরুষ দীর্ঘদেহী সিরাজের মুখখানা এখন দারুণ গম্ভীর।

ঘরের মধ্যে এসে যে হুকুমের সুরে বলল, মিলি, তোর মামাবাবু তোকে ডাকছে, একবার শুনে আয়।

গল্প শোনা শেষ হয়ে গেছে, তা ছাড়া বাবার এই ধরনের গলার আওয়াজ শুনে সে ভয় পায়, মিলি তাই দৌড়ে চলে গেল। মায়ের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরাজ কঠিন গলায় বলল, আম্মা, তুমি মিলিকে কোরান শরীফ পাঠ করাচ্ছিলে?

জাহানারা বেগম বেশ অবাক হয়ে বললেন, না তো! মিলির বাজি বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে, নানারকম আবদার করছিল, তাই আমি ওকে গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখছিলাম। কেন, কী হয়েছে?

মাকে প্রায় ধমক দেবার ভঙ্গিতে সিরাজ বলল, কী হয়েছে মানে? দীপার দাদা-বৌদি এসে দেখে গেল, তুমি মিলিকে কোরান শরীফ শেখাচ্ছো। দীপা বাড়ি নেই, সেই সুযোগে তুমি ওকে ইসলামী শিক্ষা দিচ্ছো! ছি ছি ছি আম্মা, তোমাকে আমি কতবার বলেছি, এসব চলবে না!

জাহানারা বেগম এবারও খানিকটা সরল বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুই কি বলছিস সিজু? মিলি তো এ বাড়িরই মেয়ে, বাপ-দাদার ধর্মকথা একটু আধটু জানবে না? ও নিজেই আমাকে গল্প বলতে বলেছিল।

—আম্মা, দীপার সঙ্গে আমার বিয়েতে প্রথম শর্তই ছিল, কেউ কারুর ধর্ম বিশ্বাস পরস্পরের ওপর চাপিয়ে দেব না। দীপাকে বিয়ে করে আমি যেমন হিন্দু হইনি, তেমনি দীপাও মুসলমান হবে না। আর ছেলেমেয়েরাও সাবালক না হওয়া পর্যন্ত......

—আমি কি দীপাকে কখনো মুসলমান হবার জন্য জোর করেছি?

—দীপাকে করনি, কিন্তু মিলিকে তুমি.....আম্মা, কেন তুমি মনে রাখতে পার না যে ধর্মান্তর করা এখন সারা দেশে বে-আইনী?

—পাগলের মতন চ্যাচামেচি করছিস কেন, সিজু? আমি তো কিছুই করি নি!

—আলবাৎ করেছ। তুমি চুপিচুপি ওইটুকু মেয়েকে কোরান মুখস্থ করাচ্ছো। ওই যে, ওই যে তুমি দেওয়ালে জিন্নার ছবি টাঙিয়ে রেখেছ....সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট জিন্না যখন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন, সেদিন তিনি কী বলেছিলেন মনে নেই, তোমার? লালকেল্লায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন জিন্না আর গান্ধী, একটু দূরে জওহরলাল, মৌলানা আজাদ আর অন্যরা, গান্ধী যখন জিন্নাকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন, তখন জিন্না সাহেব কী অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন! তিনি বলেছিলেন আজ থেকে হিন্দু শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান শুধু মুসলমান নয়, সবাই স্বাধীন ভারতের সমান অধিকার সম্পন্ন নাগরিক। এখন থেকে যে-যার নিজস্ব ধর্মমত, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শুধু পালন করবে নিজের নিজের বাড়িতে, যদি কেউ অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে.....

সিরাজের কথার মধ্যে একটা বক্তৃতার তোড় এসে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে এবারে জাহানারা বেগম কঠোরভাবে বললেন, তুই চুপ করতো। খুব সবজান্তা হয়ে গেছিস, তাই না? মাঠে ময়দানে চ্যাচামেচি করে তুই ভেবেছিস এ সব কথা আমাকেও শোনাবি? দীপা বৌমাকে আমি কোনোদিন কোনো ব্যাপারে জোর করেছি? এ বাড়িতে থেকেও সে যদি হিন্দু মতে পুজো-আচ্চা করতে চাইত.....

—দীপা কোনো রকম পুজো টুজোয় বিশ্বাস করে না, তা তুমি ভালই জানো।

—না করলেও, দীপাদের বাড়িতে লক্ষ্মী ঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুরের পুজো হয়, সেইসব ঠাকুর দেবতা বিষয়ে কী সে জানে না? সে কি মেয়েকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনায় না। আমিও তো রামায়ণ মহাভারতের গল্প জানি। তা হলে মিলিই বা কেন কোরান শরীফের গল্প, বিষাদ সিন্ধুর গল্প জানবে না? ধর্ম বদল না করেও বুঝি অন্য ধর্মের কথা জানতে নেই! সিজু, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে তুই কি শেষ পর্যন্ত জরুর গোলাম হয়ে গেলি?

—আম্মা, আম্মা, তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে?

জাহানারা বেগমেরও হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সিরাজের বিহ্বল মুখ দেখে এবার থমকে গেলেন। না, সিরাজ সম্পর্কে এ কথা খাটে না। দীপাকে বিয়ে করলেও সিরাজ তার শ্বশুরবাড়িতে প্রায় যেতেই চায় না। সে একেবারেই হিন্দু ঘেঁষা হয়নি। ছাত্র বয়েস থেকেই এ ছেলেটা নাস্তিক, সে রোজা রাখে না, নামাজ পড়ে না, আবার দীপাদের বাড়ির পুজো টুজোতেও কক্ষনো যায় না।

উঠে এসে ছেলের মাথায় হাত রেখে জাহানারা বেগম বললেন, কেন মাথা গরম করছিস, সিজু? শবে-বরাতের দিনে এমন করতে নেই। তোর মেয়েকে আমি রাজ-রাজড়াব গল্প শোনাচ্ছিলুম শুধু।

—জয় আর ভাস্বতী দেখে গেল, তুমি মিলিকে কোরান শরীফ পড়তে শেখাচ্ছো।

—ওরা বলেছে সে কথা?

—না বলেনি। কিন্তু ওরা নিজের চোখে তো দেখল!

—দেখলেই বা, মিলি যদি কোরান শরীফ পড়তে শেখে, তার মধ্যেই বা দোষের কী আছে? সবই পড়ুক, শিখুক, জানুক।

—আম্মা, তুমি ওদের আজ শবে-বরাতের জন্য দাওয়াত করলে। ওরা খেয়ে যেতে রাজিও হয়েছে। আজ বাড়িতে রান্না হয়েছে বড় গোস্ত, ওরা খাবেও ঠিক। কিন্তু তুমি কি ওদের বাড়িতে গিয়ে কোনোদিন লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেতে পারবে! যেখানে মূর্তি পুজো হয়, সেখানে তুমি কোনোদিন ভুলেও পা দেবে না। তবে কেন তুমি আমাদের বাড়ির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে ওদের খেয়ে যেতে বললে?

—বলাটা কি আমার ভুল হয়েছে? আজকের দিনে অতিথিকে না খাইয়ে ছাড়তে নেই।

—ওরাও ওদের পুজোর দিনে হয়তো সেরকমই বিশ্বাস করে।

—ঠিক আছে, তুই জয় আর ভাস্বতীকে বলে দে, ওদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর দিন আমি যাব। দীপা এখানে নেই, মিলিকে আমিই সঙ্গে নিয়ে যাব।

লক্ষ্মীপুজো ঠিক নদিন পর। বাড়ির সাতটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হলেন জাহানারা বেগম। অনেকদিন পর তিনি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। বেশি দূর অবশ্য যেতে হবে না। দীপার বাপের বাড়ি যশোরের সাতক্ষিরা শহরে

সিরাজুল একটা স্টেশন ওয়াগন জোগাড় করে এনেছে, বারাসত থেকে সাতক্ষিরা মাত্র ঘণ্টা দু-একের পথ।

মাঝখানে পড়ে ইচ্ছামতী নদী। সদ্য সেখানে একটি অত্যাধুনিক সেতু তৈরি হয়েছে। সেতুটির দুপাশে ঝুলছে সারিসারি দেশি-বিদেশি ক্যাকটাসের টব, মাঝখানে রয়েছে পথচারীদের জন্য কনভেয়ার বেল্ট। উনিশ শো সাতান্ন সালে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হবার পরেও অনেক বছর সেটা অসমাপ্ত হয়ে পড়েছিল। তার কারণ আছে। চীন এবং ভারত দুধরনের সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করছে বলে এই দুই দেশের রেষারেষি চলছিল বেশ কয়েক বছর। প্রতিবেশী দুই বিশাল দেশ, প্রায় সমান সমান জনসংখ্যা, এই দুই দেশের রেষারেষিতে ইন্ধন জুগিয়েছে পৃথিবীর অন্য দু-একটি বিরাট শক্তি। এর মধ্যে একবার ভারত-চীন যুদ্ধও হয়ে গেছে। মাত্র চার বছর আগে এই দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা কাশ্মীরে এক আলোচনা সভায় এমন এক সিদ্ধান্তে এসেছেন, যা শিশুরাও বোঝে। এই দুটো দেশ যদি আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য একটা সন্ধি চুক্তি করে, সীমান্ত থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেয়, তা হলে প্রতিরক্ষা বাজেটে হাজার হাজার কোটি টাকা বেঁচে যায়। চীন আর ভারত যদি সমান তালে পাশাপাশি পা ফেলে চলে, তা হলে রাশিয়া-আমেরিকাও ভয়ে কাঁপবে।

সেই সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতে শুরু হয়েছে রাস্তা বানানো ও সেতু নির্মাণের ব্যাপক তোড়জোড়। কলকাতার কাছে গঙ্গার ওপর এখন তিনটে ব্রিজ, সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের ওপর প্রতি কুড়ি মাইল অন্তর ব্রিজ, তৈরি হয়েছে বম্বে-করাচী সুপার হাইওয়ে, এদিকে কলকাতা থেকে ঢাকা পৌঁছতে গাড়িতে লাগে মাত্র চার ঘণ্টা।

ইচ্ছামতী সেতুর ওপর দিয়ে যখন স্টেশান ওয়াগনটা চলছে, তখন ফজল বলল, দাদিমা দ্যাখ, দ্যাখ, এখানে মানুষ জন হাঁটছে না, রাস্তাটাই চলছে!

জাহানারা বেগমও এই চলন্ত রাস্তা দেখে বেশ অবাক হয়েছে। এই সত্তর বছরের জীবনে তিনি কত পরিবর্তনই তো দেখলেন। তাঁর নিজের বড় ভাই ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে। সেই সময় তাঁরা ভেবেছিলেন ভারত ভাগ হবেই। কলকাতায় কিংবা বারাসতে আর থাকা যাবে না। চলে যেতে হবে কোথায়! স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স কমিশন ব্যর্থ হল। তারপর মাউন্ট ব্যাটন এল.....জাহানারা বেগম তখন একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ হলেও লেখাপড়া জানতেন, খবরের কাগজ পড়তেন, একদিকে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা, অন্যদিকে মুসলিম লীগের আস্ফালন দেখে তাঁর রক্ত গরম হতো, হিন্দুদের তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ গান্ধী জিন্নার সমঝোতা হয়ে গেল, দু'জনে এক যোগে ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশের ফোঁপর দালালি মানব না, দেশ বিভাগ হতে দেব না....প্রথম কয়েকটা বছর কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে তা থেমে গেল, গান্ধী-জিন্না একসঙ্গে শপথ করেছিলেন যে কোনো রাজনৈতিক বক্তৃতায় কিংবা ভোটের সময় কেউ ঘুণাক্ষরেও ধর্মের কথা উচ্চারণ করতে পারবে না, সংবিধানেও সেই ধারা যুক্ত হয়েছে। এখন তো দেখা যাচ্ছে, মন্দির মসজিদ, গীর্জাগুলো খালি পড়ে থাকে, বিশেষ কেউ যায় না, সরকার থেকে বলা হচ্ছে, ওগুলোকে ন্যাশনাল মনুমেন্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে...

জাহানারা বেগম একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, ফজলের কথা শুনে বললেন, তোরা তোদের জীবনে আরও কত কী দেখবি। এখন তো দেখছিস মানুষ থেমে আছে রাস্তা চলছে, একদিন হয়তো দেখবি, মানুষ আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জাদু-কার্পেটে, আরব্য উপন্যাসে যেমন ছিল.....

একটু পরে তিনি আবার বললেন, ওরে ছেলেমেয়েরা, শোন। আমরা তো মিলির মামাবাড়িতে যাচ্ছি লক্ষ্মীপুজোর দাওয়াত খেতে। লক্ষ্মীপুজোটা কি তা জানিস তো? ও মিলি, তুই একটু বলে দে না, মা।

মিলি তাঁর কোলের কাছে মাথা রেখে বলল, তুমি গল্প বলো, দাদিমা।

অগত্যা জাহানারা বেগমই শুরু করলেন। তিনি বললেন, হিন্দু ধর্মে শিবঠাকুর নামে একজন দেবতা আছেন। তাঁর চার ছেলেমেয়ে। গণেশ-কার্তিক আর লক্ষ্মী-সরস্বতী।

ফজল বলল, ও দাদিমা, একটা শুঁড়ওয়ালা হাতির মতন লোককে হিন্দুরা বলে গণেশ ভগবান, তাই না? হি-হি-হি!

জাহানারা বেগম চোখ গরম করে বললেন, ফজল চুপ কর, বোকার মতন কথা বলিস না। কুটুমবাড়িতে গিয়ে বেয়াদপি করবি না।

সিরাজু বসে আছে ড্রাইভারের পাশে। সে সব শুনছে ও মজা পাচ্ছে। ফজলের কথায় সে দোষের কিছু পেল না। প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা তখনই আসবে, যখন এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মেরও খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারবে। একটা শুঁড়ওয়ালা দেবতা সম্পর্কে যদি ফজলের হাসি পায়, তা হলে জোর করে তার হাসি থামিয়ে দেবার তো কোনো কারণ নেই। যেমন, শবে-বরাতের সেই গল্প শোনার পর রাত্তিরবেলা বাবার কাছে শুয়ে মিলি জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, একটা দুষ্টু রাজা যখন একটা লোকের মাথা কেটে ফেললো, তখন ভগবান কেন তাকে বাঁচিয়ে দিল না? সিরাজ বলেছিল, মানুষ যখন মানুষকে মারে, তখন তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা ভগবান বা আল্লার নেই রে, মামণি। মানুষকেই শিখতে হবে যে অন্য মানুষদের এমনভাবে বিনা দোষে মারতে নেই।

সিরাজ ভাবল দীপার বাড়িতে গিয়ে ফজল বা অন্য বাচ্চারা যদি লক্ষ্মীপুজোর ধুমধাড়াক্কা দেখে হাসি ঠাট্টা করে,

তাতে বেশ একটা মজাই হবে। দেখাই যাক না, তাতে ওদের কী প্রতিক্রিয়া হয়। যদি ওরা রেগে যায় বা বিরক্ত হয়, তা হলে সিরাজ নিজেই বলবে, আপনারা মুসলমানবাড়ির ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন করেছিলেন কেন? কে আপনাদের মাথার দিব্যি দিয়েছিল? দীপা তো কখনো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না!

ঢাকায় সেমিনার শেষ করে দীপা সোজা চলে আসবে সাতক্ষিরা, সে কথা জাহানারা বেগম এখনও জানেন না। শাশুড়ি আসছেন শুনে দীপা রাঙামাটি, কক্সবাজার ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসছে।

সাতক্ষিরায় দীপাদের বাপের বাড়িটি বেশ কয়েক পুরুষের পুরনো। বাড়ি তো নয়, প্রায় প্রাসাদ। সামনের নহবৎ খানায় সানাই বাজছে।

জাহানারা বেগমের বুকটা টিপটিপ করছে। মূর্তি পূজা তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। ছেলের কথার পিঠে কথা রাখতে গিয়ে তিনি এখানে আসতে রাজি হয়েছেন। খুব অল্প বয়েসে তিনি হিন্দু পাড়ার পুজো টুজো দেখেছেন বটে, স্কুলের হিন্দু মেয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প শুনেছেন, কিন্তু সতেরো বছর বয়েসে জ্ঞান হবার পর আর কখনো যাননি। এদের নিয়ম কানুন কী রকম কে জানে! একটা মাটির প্রতিমার সামনে প্রণাম করতে হবে। মরে গেলেও তিনি তা পারবেন না। এই বয়সে তিনি তাঁর বিশ্বাসকে বলি দিতে পারবেন না।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই জয় এগিয়ে এসে বলল, আসুন আসুন, মাসিমা আপনি আসবেন শুনে এমন অবাক হয়েছি!

সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় জয়, তখন সে সাহেবি পোশাক পরে, আজ সে পরে আছে কুঁচনো ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। এতবড় বৈজ্ঞানিক সে, কিন্তু পারিবারিক প্রথা ঠিক ঠিক মেনে চলে। সিরাজের মতন তিরিক্ষি স্বভাবের নয়।

সাদা শাড়ির আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে তিনি পায়ে পায়ে এগোলেন। হিন্দুদের পুজোর একটা মণ্ডপ থাকে। সেখানে মাটির ঠাকুর থাকে। কোথায় সে মণ্ডপ?

জাহানারা বেগমের মুখের দিকে চেয়ে, যেন তাঁর চোখের ভাষা বুঝেই জয় বলল, মাসিমা এ বছর আমরা ঠাকুর আনিনি। আমরা ভাইরা সব বাইরে বাইরে থাকি, বাড়িতে আসার সময় পাই না, সামনের বছর থেকে আর পুজো হবে কিনা ঠিক নেই। এ বছর তাই শুধু ঘট পুজো করে কোনোরকমে নমো নমো করে সারা হয়েছে।

কথা নেই বার্তা নেই, জাহানারা বেগম প্রথমে বসে পড়লেন সেখানে, তারপর শুয়ে পড়লেন মাটিতে। পর মুহূর্তেই অজ্ঞান। হঠাৎ ইসকিমিয়ার ব্যথা মাথা চাড়া দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিরাট চ্যাঁচামেচি, হৈ চৈ, ডাক্তার ডাকার আবেদন। জাহানারা বেগমকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল ভেতরের ঘরে। সিরাজই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেশি। তার শ্বশুরবাড়িতে তার মা কোনোদিন আসেন না। আজই প্রথম এলেন, তাও একটা উৎসবের দিনে, আজই যদি তাঁর একটা ভালমন্দ ঘটে যায়....

জাহানারা বেগমের জ্ঞান ফিরল আধ ঘণ্টার মধ্যেই। তিনি লজ্জায় প্রায় অবশ হয়ে গেলেন। কুটুম বাড়িতে এসে....উৎসবের বাড়ি...ইসকিমিয়ার ব্যথা ওঠার আর কি সময় হল না? তাঁর জন্য যদি উৎসব পন্ড হয়ে যায়, ছি ছি ছি, এরকম নাটকীয় ঘটনা কোনোদিন তাঁর জীবনে ঘটেনি......

ভাল করে চোখ মেলার পর তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ দীপাকে। একটা লাল পাড় সিল্কের শাড়ি পরা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কপালে একটা টিপ.....। জাহানারা বেগমের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তিনি হিন্দু পাড়ায় গিয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি দেখেছিলেন, বাঙালি মেয়েদেরই মতন গড়ন, জড়িপাড় শাড়ি পরানো, মাথার চুল দীপার মতন, অর্ধেকটা ঘোমটা টানা, ঠাকুর দেবতার মতন নয়, ঠিক বাঙালি মেয়েদের মতনই দেখতে, বেশ লাগত কিন্তু.......

দীপা ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলো, এখন কী রকম ফিল করছেন, মা? কষ্ট হচ্ছে?

জাহানারা বেগম দুদিকে মাথা নাড়লেন।

দীপা তাঁর পায়ের তলা ঘষতে ঘষতে বলল, আপনার কিছু হয়নি, ভয় পাবেন না, ডাক্তার এসে দেখে গেছে।

জাহানারা বেগম ফিসফিস করে বললেন, মিলি কোথায়?

দীপা বলল, মিলি এতক্ষণ আপনার মাথার কাছে বসেছিল। এই মাত্র উঠে গেল। ডাকছি, মিলিকে ডাকছি। মা আপনি কিছু খাবেন? একটু গরম দুধ এনে দেব? দুধ খেলে ভাল লাগবে।

জাহানারা বেগম আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। এটা কার বিছানা কে জানে। তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দীপার মুখের দিকে। তার ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি প্রায় ফিসফিস করে, লাজুক গলায় বললেন। তোমাদের পুজো ঠিকঠাক শেষ হয়েছে তো? আতপ চাল, কলা আর বাতাসা দিয়ে তোমাদের একটা পুজোর প্রসাদ হয় না? ছেলেবেলায় খেয়েছি, খুব ভাল লাগত, সেই প্রসাদ একটু এনে দিতে পার?

দময়ন্তীর মুখ

আজকের সকালটি সোনার মতন উজ্জ্বল। কুয়াশা নেই, মেঘ নেই। বরফমাখা পাহাড় শৃঙ্গগুলিতে রোদ ঠিকরে পড়ছে, সেদিকে চোখ রাখা যায় না। বাতাসের তরঙ্গ একমুখী নয়, কেমন যেন এলোমেলো, যেন বাতাস আপন মনে কোনও খেলায় মেতে আছে। একটা কাঠঠোকরা পাখি উড়ে এসে বসল খুব কাছে। এখানে কাছাকাছি বড় গাছ নেই, তবু পাখিটা কোথা থেকে যেন আসে মাঝে মাঝে। পাখিটা রাজকুমারের মতন রূপবান। মাথায় মুকুটের মতন চূড়া, অঙ্গে চিত্রিত মখমলের মতন পোশাক, গর্বিত পা ফেলে সে আস্তে আস্তে হাঁটে। তার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন অর্চিষ্মান। পাখিটাকে যতবার দেখেন, ততবারই তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

গুহা থেকে বাইরে এসে এই সুন্দর সকালটি দেখে অর্চিষ্মানের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। যদিও শরীরটা ভাল নেই, সারা রাত ভাল করে ঘুম হয়নি। মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। উঠে বসে বুকে হাত বুলিয়েছেন। ওষুধ খাওয়ার প্রশ্ন নেই, গত প্রায় চল্লিশ বছর তিনি ওষুধ কাকে বলে জানেন না। এই পাহাড়ের রাত্রির বিশাল নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি নিজের প্রাণবায়ুকে ফিসফিস করে বলেছেন, শান্ত হও, শান্ত হও। যদি চলে যেতে হয়, শান্ত ভাবে যাও।

আজ সকালেও বুক ভার হয়ে আছে, পা দুটি দুর্বল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার ঊর্ধ্বে উঠে গেল তাঁর মন, দৃশ্য সৌন্দর্যের মহিমা তাঁকে আপ্লুত করে দিল। কাঠঠোকরা পাখিটির চরণ-ছন্দের দিকে চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। কম্বলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বসলেন গম্ভুর সিংহাসনে। সেটি আসলে একটি বড় পাথরের চাঁই। এখানকার প্রত্যেকটি পাথরের তিনি নিজস্ব নাম দিয়েছেন। আর দুটি পাথরের নাম মহাকূর্ম এবং থিরবিজুরি। কোনও রহস্যময় কারণে থিরবিজুরি পাথরটিকে তাঁর মনে হয় নারী, সে জন্য তিনি ওই পাথরটির ওপরে কখনো বসেন না।

এরপর এল দুটি প্রজাপতি। এরকম রৌদ্র ঝলমল সকালেই ওরা আসে। কুয়াশা, বৃষ্টি, তুষারপাত আর হিমেল হাওয়ার দিনে ওরা কোথায় থাকে কে জানে! প্রজাপতি দুটি একটুক্ষণ ওড়াউড়ি করে বসল ঘাস ফুলে। কী অপূর্ব ওদের ডানার রঙের বিন্যাস। এতগুলি বছরেও প্রজাপতি সম্পর্কে অর্চিষ্মানের বিস্ময়বোধ কাটেনি। কেন ওরা এত সুন্দর, উত্তর পাননি সে প্রশ্নের। ওদের শরীরের বুঝি ওজন নেই, ছোট্ট একটা ফুলের ওপরেও সাবলীল ডানা মেলে বসে, বাতাসের সঙ্গে দোল খায়।

চোখ মুখ ধুতে যেতে হবে নদীতে। বেশি দূর নয়। এই গুহামুখ থেকেই শোনা যায় নদীর কলকল ধ্বনি, সেই শব্দ ঢেকে দেবার মতন আর কোনও শব্দ এখানে নেই। ওইটুকু হেঁটে যেতেই অর্চিষ্মান আজ আলস্য বোধ করছেন। তবু একটু পরে উঠে দাঁড়ালেন, কোমরে একটা ব্যথার মোচড় দিয়ে গেল। আগে কখনো এরকম ব্যথা অনুভব করেননি। বয়েসের থাবা। এবার বুঝি সত্যি বার্ধক্য এল। অর্চিষ্মান আবার প্রজাপতি দুটির দিকে চোখ ফেরালেন, নিজেকে ভুলে ওদের দিকে মনোযোগ দিলেন, অস্ফুট স্বরে বললেন, সুন্দর, সুন্দর!

নদীর পথটা ঢালু, নামা সহজ, তবু যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে যান, সেই জন্য অর্চিষ্মান একদিকের পাথর ধরে ধরে এগোতে লাগলেন। প্রতিদিন সকালে নদীটিকে প্রথম দর্শনে তাঁর ভাল লাগে। অর্চিষ্মানের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই, তবু নদীটিকে দেখলেই তাঁর বলতে ইচ্ছে করে, আমার, আমার।

পাহাড়ের বরফ গলা জল থেকে নেমে এসেছে খুবই ছোট নদী, একটু দূরেই গিয়ে মিশেছে অন্য নদীতে। এ নদীর কোনও নাম ছিল না, অর্চিষ্মান নাম দিয়েছেন খরসা। খরস্রোতা থেকে খরসা। মুখে মুখে নামটা চালু হয়ে গেছে। অর্চিষ্মান যখন থাকবেন না, তখন তাঁর দেওয়া নামটা থেকে যাবে।

যেমন স্রোত, তেমনই ঠাণ্ডা জল। এতগুলো বছর কেটে গেল, তবু এখনো জলে হাত দেবার আগে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়। ছেলেবেলায় শীতকালে পুকুরে স্নান করতে গেলে যেমন জলে নামতে ইচ্ছে করত না, একসময় গামছাটা ছুঁড়ে দিয়ে, সেটা ডুবে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত, এখানেও সেরকম ইচ্ছে হয়। কিন্তু অর্চিষ্মানের গামছা নেই, স্নানের পর গায়েই জল শুকয়।

জলে অর্চিষ্মান নিজের মুখের ছায়া দেখলেন। মুখের দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে সামান্য অংশই দেখা যায়, আজ যেন অনেকদিন পর নিজেকে দেখলেন, কেমন যেন অচেনা লাগল। চক্ষু দুটির জ্যোতি কমে এসেছে, এটাও অসুস্থতার লক্ষ্মণ। কিছুতেই শরীরকে গুরুত্ব দেবেন না বলে অর্চিষ্মান আকাশের দিকে তাকালেন। এমন ঝকঝকে নীলাকাশ বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মেঘশূন্য এখন নীলিমা এখানেও খুব দুর্লভ, কখন যে মেঘ এসে যাবে, চতুর্দিক অন্ধকার করে ঝড় বইবে তার ঠিক নেই। এই তো গত পূর্ণিমায় এমন ঝড় উঠেছিল যে তিনদিন টানা চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

অর্চিষ্মান সেই নিবিড় নীলের দিকে তাকিয়ে শরীরের কষ্টের কথা ভুলে গেলেন। তাঁর মনে হল, কালস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবু আকাশে তার কোনও রেখা পড়ে না। আকাশ চিরতরুণ।

নমস্তে বাঙালিবাবা!

নদীর ওপার দিয়ে একটা ভেড়ার বাচ্চা কোলে করে নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একজন মাঝবয়েসি মানুষ। ভেড়াটা কোনও ভাবে আহত হয়েছে। খুব সম্ভবত শীর্ষিবাবার আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছে। শীর্ষিবাবা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে অনেক রুগ্ন মানুষ, এমনকি পশু-পাখিও সুস্থ হয়ে ওঠে।

অর্চিষ্মান হাত তুলে বললেন, জিতা রহো। লোকটির অবশ্য আর কথা বলার সময় নেই। সে ছুটছে।

এত বছরেও বাঙালিবাবা নামটা ঘুচল না। তাঁর গুরু যোগত্রয়ানন্দ অর্থাৎ যোগীবাবা অর্চিষ্মানের একটা অন্য নাম দিয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গে গেরুয়া জড়িয়ে দিয়ে নাম দিয়েছিলেন বসভেশ্বরস্বামী, কিন্তু সে নাম চলেনি। অর্চিষ্মান হিন্দি ভালই শিখেছেন, এই হিমালয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে হিন্দি ভাষাই লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা, কিন্তু তাঁর উচ্চারণে বাংলা টান যায়নি। দু-তিনটি বাক্য শুনলেই অন্যরা বুঝে যায়, বাঙালি।

অর্চিষ্মানের পূর্বাশ্রমের নামটাও একেবারে ঘুচে যায়নি, কেউ কেউ যে মনে রেখেছে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। এইতো গতবছরই ডিসেম্বর মাসে দু জন যুবক খুঁজে খুঁজে পাহাড়ের এতদূরে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন চালায়, তারা অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার সাক্ষাৎকার ছাপাতে আগ্রহী। অর্চিষ্মান খুব হেসেছিলেন। লোকালয় থেকে বহুকাল বিচ্যুত, গুহানিবাসী এক সাধুর সাক্ষাৎকার পাঠ করে কার কী লাভ হবে? মানুষকে জানাবার মতন তো তাঁর কিছু নেই। নিজেই এখনো অনুসন্ধানী।

ছেলে দুটি এত কষ্ট করে, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এসেছে বলে মায়া হয়েছিল অর্চিষ্মানের, তিনি ওদের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর না দিলেও আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।

ওরা ওদের পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রায় জোর করেই রেখে গেছে। অর্চিষ্মান পড়ে দেখতে চান না। কত বছর যে ছাপার অক্ষর পড়েননি। তার হিসেব নেই। এখানে সাল-তারিখের খেয়াল রাখারও প্রয়োজন হয় না। ওই পত্রিকার মলাটে লেখা আছে, ইংরেজি পঁচানব্বই সাল। তাতেই অর্চিষ্মানের খেয়াল হল যে, এই পাহাড়ে কেটে গেল ছত্রিশ বছর।

ছেলে দুটি বলেছিল, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির ইনডেক্স কার্ডে এখনো অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার নাম আছে। সেখান তাঁর কবিতার বইটি এখনো পাওয়া যায়। একজন সাহিত্যিক সম্প্রতি আত্মজীবনী লিখেছেন, তাতে আড়াই পৃষ্ঠা জুড়ে আছে অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার কথা, সেই অংশটি পড়েই যুবা-দুটি ছুটে এসেছে। এসব শুনেও অর্চিষ্মান শুধু হেসেছিলেন। তাঁর মনে কোনও কৌতূহল জাগেনি।

আপনি কেন সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে এলেন এই পাহাড়ে? ওদের এবার এই প্রশ্নের উত্তরে অর্চিষ্মান বলেছিলেন, নিয়তি!

মানুষের নিয়তি কি মানুষ নিজেই নির্ধারণ করে? অথবা মনের অনেক গভীরে, অতলান্ত প্রদেশে এমন কিছু প্রক্রিয়া চলে, যেখানে মানুষের যুক্তিগ্রাহ্য জীবনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

উনিশশো উনষাট সালে চন্দননগর থেকে এগারোজনের একটি অভিযাত্রী দল এসেছিল সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ অভিযানে। সেই দলের ম্যানেজার ছিল এক তরুণ কবি। পাহাড়ে চড়া কিংবা ট্রেকিং-এর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, সে অনেকটা জোর করেই দলে ঢুকে পড়েছিল। লোকে বলে, পাহাড় নাকি মানুষকে টানে। অর্চিষ্মানকেও টেনে এনেছিল নগাধিরাজ হিমালয়? ঠিক তা নয়।

বেস ক্যাম্প ছিল উমলায়। রোমান্টিক তরুণ কবিটি কাহিল হয়ে গিয়েছিল শীতে, বা হাঁটুতে খানিকটা চোটও লেগেছিল, উমলা থেকে আর সে এগোতে পারেনি। সুন্দরডুঙ্গা ও পিণ্ডারি অভিযান সার্থক করে দলটি ফিরে এল, এক রাত সহর্ষে নাচ-গান করে কাটাল, তারপর নিচে নেমে আসার উদ্যোগ করতেই তরুণ কবিটি জানাল, সে ওখানে আরও কিছুদিন থেকে যেতে চায় একা একা। বন্ধুদের অনেক অনুরোধ ও পেড়াপিড়িতেও সে ফিরতে সম্মত হল না।

প্রথমে ভেবেছিল, সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত পাহাড় প্রকৃতির মধ্যে অন্তত মাসখানেক থাকবে, কিন্তু কেটে গেল মাসের পর বছর, যুগ, এই তিনযুগ পেরিয়ে গেছে।

কলকাতা ছেড়ে আসার আগে এরকম কোনও বাসনা বা সিদ্ধান্ত তার মনের কোণেও ছিল না। কোন রকম আধ্যাত্মিক টানও আগে কখনও অনুভব করেনি অর্চিষ্মান। কবিদের সাহচর্য, শহুরে জীবনের উত্তেজনাই তার পছন্দ ছিল, প্রকৃতির রূপের আকর্ষণ তার চেয়ে বেশি হল কী করে?

কারুর প্রতি অভিমান? নারী?

সে রকম একটা গৌণ কারণ ছিল বটে। খুব গৌণই বলা উচিত।

ছত্রিশ বছর আগে, অভিযাত্রী দলের সঙ্গে জুটে যাবার সময়, দময়ন্তী আর তার স্বামী এসে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল

অর্চিষ্মানদের বাড়ির খুব কাছাকাছি। জানলা খুললে এ বাড়ি ও বাড়ি দেখা যায়। দময়ন্তীদের বাড়ির দোতলায় প্রশস্ত, ঢাকা বারান্দা, সেখানে চায়ের টেবিল পাতা, অর্চিষ্মানের ঘর থেকে স্পষ্ট দেখা যেত, ওরা স্বামী-স্ত্রী সকালে সেখানে চায়ের ট্রে নিয়ে বসেছে। এই দৃশ্য অর্চিষ্মানের অসহ্য বোধ হত।

সেই জন্যই সে আর ফিরল না? এটা একেবারে ছেলেমানুষির পর্যায়ে পড়ে। তখন কৃষ্ণনগর কলেজে চাকরি পেয়েছে অর্চিষ্মান, বাড়ি থেকে রোজ ট্রেনে যাতায়াতের ক্লান্তি কম নয়, সে তো কৃষ্ণনগরেই বাড়ি নিয়ে সেখানে থেকে যেতে পারত। কৃষ্ণনগর জায়গাটি বেশ, সাহিত্যের পরিবেশ আছে। দময়ন্তীর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য তাকে হিমালয়ের গিরিকন্দরে আশ্রয় নিতে হবে কেন?

নিয়তি, না খেয়াল? প্রথম দিকে খানিকটা খেয়ালের বশেই কি সে থেকে যেতে চায়নি? বুকের মধ্যে সেরকম কিছু অভিমানের তীব্র কুয়াশা ছিল না, বরং তার কবিসত্তা এই পরিবেশে স্পন্দিত হয়েছিল। মাসখানেকের বেশি এরকম ভাল লাগার বোধ থাকে না, তারপর ফিরে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

এখানকার একজন মানুষ তাকে আকৃষ্ট করেছিল। উমলা থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল যোগত্রয়ানন্দের আশ্রম। অনেকেই সেখানে যায়, তরুণ কবি অর্চিষ্মানও সেখানে গিয়েছিল কৌতূহলবশে। ধর্ম সম্পর্কে তার মন ছিল মুক্ত, নিজে কোনও ধর্মাচরণ না করলেও অপরের ধর্মাচরণের ব্যাপারে অশ্রদ্ধা ছিল না। যার যা ভাল লাগে। ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পরিচালক একজন কেউ আছে না নেই, তা স্পষ্টভাবে বলা খুব দুষ্কর। এক এক সময় তার মনে হত, ঈশ্বর এক অলীক কল্পনামাত্র। আবার কখনো মনে হত, এই বিশ্বের সৌন্দর্য, কল্যাণ প্রবহমানতার জন্য যদি ঈশ্বর দায়ী হন, তাহলে কুশ্রীতা, হানাহানি, অশুভ শক্তির অভ্যুত্থান, এসবের জন্যও কি তিনিই দায়ি?

যোগত্রয়ানন্দ বা যোগীবাবার আশ্রমের বাইরে বেশ বড় একটা বাগান। নানা বর্ণের, কত বিচিত্র সব ফুল। আশ্রমে প্রবেশ করার আগে অর্চিষ্মান সেই বাগানে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরেছিল। ফুলের বাহার দেখতে দেখতে অর্চিষ্মানের হঠাৎ মনে হয়েছিল, প্রতিটি গাছের ফুল আলাদা, এক একটি ফুলের কী অপূর্ব ডিজাইন, কতরকম রঙের তরঙ্গ এবং তা একেবারে নিখুঁত। এত রকম ফুলের সৃষ্টি করল কে? প্রকৃতি? এই সৃষ্টির পেছনে কি কোনও চিন্তাশীল মন কাজ করেনি? চিন্তা না করলে সব আলাদা আলাদা হবে কী করে? শুধু তো ফুল নয়, এতরকমের গাছ, মানুষ, পশু পাখি, কীট-পতঙ্গ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখ আলাদা। কারখানায় প্রস্তুত সব জিনিস একরকম হয়, প্রকৃতির কারখানার পেছনে কি তা হলে ঈশ্বর নামে একজন শিল্পী আছেন? কিন্তু একা সেই ঈশ্বর বসে বসে এত কোটি কোটি ফুল-গাছ-মানুষ-জন্তু-কীট-পতঙ্গেও ডিজাইন আঁকছেন, এও তো অবাস্তব ব্যাপার!

যোগীবাবা বসেছিলেন উন্মুক্ত স্থানে, একটি বাঘের চামড়ার ওপরে। মোটাসোটা, দীর্ঘকায় মানুষটি, কোনো রকম উগ্রভাব নেই, বরং মুখখানি দেখলেই ভাল লাগে। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন, নিজেকে জাহির করার ভাব নেই। প্রথম দিন অর্চিষ্মান যোগীবাবার সঙ্গে কোনো কথা না বলে, কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে এল।

অর্চিষ্মানের আগে ধারণা ছিল সাধুগিরি এক ধরনের নিরাপদ ব্যবসা। মূলধন লাগে না, কোনো খাটাখাটনি করতে হয় না, কিছু চটকদার কথা বলার ক্ষমতা থাকলেই হল। তাতেই কিছু চ্যালা জুটে যায়, তারা সেবা করে, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায় সচ্ছন্দে। সবাই জানে, উপমা আর যুক্তি এক নয়, কিন্তু সব সাধুই কথায় কথায় উপমা দিয়ে ভক্তদের মাত করে। মানুষের গূঢ় জিজ্ঞাসার উত্তরে সাধুরা একটা গল্প শুনিয়ে দেয়।

যোগীবাবার আশ্রমের পরিবেশটা অর্চিষ্মানের পছন্দ হয়েছিল। হৈ চৈ নেই, দাও দাও ভাব নেই, পেছন দিকে একটি গম্ভীর পাহাড় চূড়া, সামনে সযত্নে রক্ষিত বাগান। যোগীবাবা নিজে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

দিন তিনেক যাবার পর অর্চিষ্মান একদিন যোগীবাবাকে প্রশ্ন করল, সাধুজী, আপনি যে এখানে আশ্রম করে আছেন, তা কিসের জন্য? আপনি কী পেয়েছেন?

ফুলবাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যোগীবাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ওই পেয়েছি।

অর্চিষ্মান চমকে গেল। এত সহজ উত্তর? অনেক বড় বড় যোগী-সাধকও ঈশ্বরকে পেয়ে যাওয়ার কথা সরাসরি স্বীকার করেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য কথা বলেন। এই লোকটা ভণ্ড, মিথ্যেবাদী নাকি?

সে জিজ্ঞেস করল, আপনার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে? এর উত্তরে যোগীবাবা যদি হ্যাঁ বলতেন, তা হলে অর্চিষ্মান হয়তো আর কখনো ও আশ্রমে আসত না।

যোগীবাবা সামান্য হেসে বললেন, ঈশ্বর আকাশে থাকেন কি না তা আমি জানি না। না, আমার আজও ঈশ্বর দর্শন হয়নি, আমি আকাশের দিকে দেখলাম, তার মানে আমি আকাশকে পেয়েছি। গাছের দিকে তাকিয়ে গাছকে পাই, মানুষের দিকে তাকিয়ে মানুষকে পাই, সব কিছুর ওপরে আকাশ।

এমন স্নিগ্ধস্বরে যোগীবাবা কথাগুলি বলছিলেন, অর্চিষ্মান মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই মানুষটিও কবি।

যোগীবাবার সঙ্গে ভাব জমে যাবার পর তিনি অর্চিষ্মানকে এই আশ্রমে এসে থেকে যাবার জন্য আহ্বান জানালেন।

এর আগে অর্চিষ্মান ছিল পাহাড়িদের গ্রামের একজনের বাড়িতে। দৈনিক মাত্র দুটি টাকা দিলে তারা রুটি, ডাল, সবজি বানিয়ে দিত। ঘর ভাড়া কিছু লাগত না। খানিকটা যোগীবাবার ব্যক্তিত্বের টানেই সে চলে এল আশ্রমে।

এখানে তাকে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম মানতে হয়নি। যোগীবাবা তাকে কোনো পুজো-আচ্চা বা ধ্যানের অনুজ্ঞা দেননি। বলেছিলেন যা মন চায় তাই করবি, পাহাড় দেখবি, নদী, গাছপালা দেখবি, খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখবি, সব কিছুর অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখবি, তাতেই হৃদয় পবিত্র হয়ে যাবে।

সেই অল্প বয়সের অস্থিরতায় অর্চিষ্মান বেশ কিছুদিন যোগীবাবাকে নানান প্রশ্ন করে জব্দ করতে চেয়েছে, পারেনি।

একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল, যোগীবাবা, আপনি তো বলেন ঈশ্বর মঙ্গলময়। পৃথিবীতে যে অমঙ্গল, এত হানাহানি, তা কি ঈশ্বর দেখতে পান না? আপনি কি জানেন, জাপানে অ্যাটাম বোমা ফেলে একদিনে লক্ষ লক্ষ লোক মারা হয়েছিল। সেইসব নিরীহমানুষ কি সবাই পাপী ছিল? তারা মরল কেন? হত্যাকারীরাও কোনো শাস্তি পাননি। এটা ঈশ্বরের কোন্ লীলা।

যোগীবাবা সরল ভাবে বলেছিলেন, আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানিনা। ঈশ্বরের হয়ে ওকালতি করার দায়িত্বও কেউ আমাকে দেয়নি। আমি ঈশ্বরকে খুঁজি আমার নিজস্ব শান্তির জন্য। জানি না কোনোদিন তাঁর দর্শন পাব কি না। তবে মাঝে মাঝে যেন আভাস পাই। একদিন শুধু তাঁর জ্যোতির্ময় প্রভাটুকু অন্তত দেখতে পাব আশা করে আছি।

আর একদিন অর্চিষ্মান বলেছিল, মানুষের জীবনে ঈশ্বরকে খুঁজতেই হবে কেন? ঈশ্বর যদি থাকেন তো থাকুন। আমি এমন কিছু কিছু মানুষকে জানি, যাঁদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরকে নিয়ে মাথাও ঘামান না। তারা লোক ঠকান না। অযথা মিথ্যা কথা বলেন না, সৎ ভাবেই জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

যোগীবাবা বলেছিলেন, ভাল, খুব ভাল। যার যা ভাল লাগে। আমি দেখেছি, অবিশ্বাসে বড় অশান্তি, বিশ্বাসে শান্তি। অবিশ্বাস নিয়েও যদি কেউ শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে তা কাটাক না। তারাও শ্রদ্ধেয়।

একটু থেমে তিনি আবার বলেছিলেন, অবিশ্বাস থেকেও কেউ কেউ বিশ্বাসে পৌঁছে যায়। মাঝখানে সুদীর্ঘ কষ্টকর পথ। পৌঁছবার পর সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, তারপর বড় শান্তি রে, বড় শান্তি। অপার, সুগভীর শান্তি। না পৌঁছলে বোঝা যায় না। আমার মনে হয়, তুই পারবি, তুই পৌঁছে যাবি।

অর্চিষ্মানের সেদিন খানিকটা কৌতুকের সঙ্গেই মনে হয়েছিল, তাই নাকি? আচ্ছা দেখাই যাক।

মাস দেড়েক কেটে যাবার পর ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলেন বাবা। অল্প বয়েসে মাকে হারিয়েছে অর্চিষ্মান। বাবা, দুই দাদা, এক দিদি ও পিসিমাকে নিয়ে সংসার। বাবার শত অনুরোধ, আদেশ, কান্নাকাটিতেও বিচলিত হয়নি অর্চিষ্মান, সে ফিরে যেতে চায়নি। বাবাকে বলেছিল, আমার ইচ্ছে হলে ঠিক ফিরে যাব, আমি দেখতে চাই আর কতদিন এখানে ভাল লাগে। আমি চিঠি লিখব মাঝে মাঝে।

এর পরেও বড়দাদা এসেছিল একবার, দু তিনজন বন্ধুও এসেছিল দেখা করতে। অর্চিষ্মান তখন মোহমুগ্ধ হয়ে আছে, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না।

যোগীবাবা তাকে বলেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য হন্যে হয়ে চোখ বুজে তপস্যা করে কোনো লাভ নেই। চোখ খুলেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীর সব সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের দিব্যজ্যোতির স্পর্শ। সেই জন্য, গাছপালা, ফুল, পাখি, নদী, পাহাড় এই সবকেই আগে চিনতে হয়। একদিন না একদিন এদের মধ্যেই দেখা যাবে সেই জ্যোতি।

সেই জন্য অর্চিষ্মান প্রকৃতিকে ভালভাবে চেনবার চেষ্টা করছিল। কোনো কোনো ফুলগাছের সামনে তো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে থেকেছে। দেখেছে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা। দেখেছে, মৌমাছি, প্রজাপতিদের খেলা। দেখেছে জীবনের স্রোত।

ফুলগুলি কেন এত সুন্দরভাবে সেজে পাপড়ি মেলে ধরে তা বোঝা যায়। ভ্রমর বা মৌমাছিদের অমন সাজগোজ করার দরকার নেই। কিন্তু প্রজাপতিরা কেন এত সেজে আসে? ওদের ডানায় কেন এত রঙের কারুকাজ। প্রকৃতির যে এত রূপ, তার সব কিছুর মধ্যেই কোনো না কোনো প্রয়োজনের কথাও লেখা আছে। এত স্বল্পজীবী প্রজাপতির ডানার শিল্পকীর্তির মধ্যে কোন্ প্রয়োজন? পাখিরা ওদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।

ফুলগাছের কাছে কিংবা নদীর ধারে বসে থাকাই ছিল অর্চিষ্মানের ধ্যান। সেই ধ্যানে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটাত দময়ন্তীর মুখ।

খানিকটা অভিমান থাকলেও দময়ন্তীর জন্য তার বুকে তেমন গভীর কোনো বেদনাবোধ ছিল না। দময়ন্তীর কাছ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল দময়ন্তীর বিয়ের অনেক আগে।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় নাগরদোলায় চাপতে গিয়ে আলাপ। অর্চিষ্মানের সঙ্গে ছিল কয়েকজন বন্ধু, দময়ন্তীর সঙ্গেও ছিল কয়েকজন বান্ধবী। চোখাচোখির টান। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, ঠিকানা বিনিময়। দময়ন্তী থাকে আসানসোলে, অর্চিষ্মান থাকে দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছে। ঠিকানা নিলেও অর্চিষ্মান প্রথমে চিঠি লেখেনি। দময়ন্তী অর্চিষ্মানের একটি কবিতা পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চিঠি পাঠিয়েছিল। তারপর শুরু হয়েছিল চিঠির বন্যা। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একটা দুটো, তারপর প্রতিদিন, এমন কি একদিনে দুটি চিঠিও লিখেছে অর্চিষ্মান।

নতুন দাঁত ওঠা শিশু যেমন সব কিছু কামড়াতে চায়, একজন তরুণ কবিরও সে রকম সব সময় আঙুল নিশপিশ করে! ভাষার মাধ্যমে জীবন যাপন। ভাষার মাধ্যমে মুক্তি। ভাষা নিয়ে আত্মরতি। অর্চিষ্মান তখন শুধু কবিতাই লেখে না, পুস্তক সমালোচনা, ছোটখাটো প্রবন্ধ, রম্যরচনাও লিখেছে বেশ কিছু। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাকে পছন্দ করেন, তার একটি কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনী পড়ে সাগরময় ঘোষ একদিন বলেছিলেন, তোমার গদ্যের হাতও বেশ ভাল, তুমি একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করবে নাকি, অর্চি? সে লাজুকভাবে মাথা নিচু করে বলেছিল, ওরে বাবা, উপন্যাস কি লিখতে পারব, সাগরদা! সে যে খুব শক্ত! মুখে এই কথা বললেও 'দেশ' সম্পাদকের এই প্রস্তাবে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল অর্চিষ্মান।

টানা তিন বছর ধরে চলেছিল চিঠি লেখালেখির পালা। এর মধ্যে দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাত্র একবার। মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে আসানসোল থেকে দময়ন্তী এসেছিল কলকাতায়, চিঠিতে আগেই ঠিক করা ছিল, বিয়ে বাড়ি থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে এসে দময়ন্তী দাঁড়িয়েছিল ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরের ধারে। দুজনে পাশাপাশি হেঁটেছে, চিঠিপত্রে পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এলেও কথাবার্তায় সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেউ কারুর অঙ্গ স্পর্শ করেনি। না, তা ঠিক নয়। একবার শুধু দময়ন্তীর চাঁপা ফুলের মতন একটি আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছিল অর্চিষ্মান। সেইটুকুই যথেষ্ট।

এতদিনে অর্ধেক ছাপার খরচ দিয়ে একটা ছোট প্রকাশনী থেকে অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বই পেয়ে দময়ন্তী লিখেছিল, তুমি প্রত্যেকটি কবিতা ছাপার আগে কপি করে আমার কাছে পাঠাবে। আমি প্রথম পড়তে চাই। তুমি আমার কবি। আমি জানি, আমার কবি একদিন নোবেল প্রাইজ পাবে।

তিন বছর পর দময়ন্তী এম-এ পড়তে এল কলকাতায়। টালিগঞ্জে তার মামার বাড়িতে উঠল। দমদম থেকে টালিগঞ্জ, দূরত্ব অনেকখানি। দময়ন্তীর মামার বাড়িটি মস্ত বড়, অনেক লোকজন, ছেলেমেয়েদের মেলামেশার কোনো বাধা নেই। সে বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছে অর্চিষ্মান, একতলাতে দুখানা বৈঠকখানা, দুপুরের দিকে গেলে নিরিবিলিতে কথা বলা যায় অনায়াসে।

এক মেঘলা দুপুরে ওরা ছোট বসবার ঘরটায় বসেছিল অনেকক্ষণ। এক পাশে পুরনো আমলের একটি সোফা পাতা, আর একদিকে একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার। দময়ন্তী বসে আছে সোফায়, ধূপের ধোঁয়া রঙের শাড়ি পরা, মাথার সব চুল খোলা। প্যান্ট শার্ট পরা অর্চিষ্মান বসে আছে একটু দূরের চেয়ারে, হাতে সিগারেট। এক মাথা চুল, গালে দু-তিন দিনের দাড়ি, পাশের খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা করবী গাছের ঝোপ। আকাশে মাঝে মাঝে গুরুগুরু শব্দ হচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা। কথাবার্তা থামিয়ে ওরা চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। এক এক সময় নীরবতাই বাঙ্ময়। চোখে চোখে প্রবাহিত হচ্ছে ওদের হৃদয়। এতদিন পরে এই প্রথম ওদের শরীর জেগে উঠেছে, চুম্বকের মতন পরস্পরকে টানছে, দুজনেরই ঠোঁটে দারুণ তৃষ্ণা, যে-কোনো মুহূর্তে অর্চিষ্মান উঠে যেতে পারে দময়ন্তীর কাছে।

সেই মুহূর্তটা এল না। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওপর থেকে নেমে এল দময়ন্তীর মামাতো দাদা তপন, সঙ্গে তার এক বন্ধু। বন্ধুটির নাম অভিজিৎ, সে এয়ারফোর্সের অফিসার। লম্বা, ফর্সা অত্যন্ত সুদর্শন যুবা, পোশাকের ভাঁজ নিখুঁত, মাথার চুল কপালে এসে পড়ে না।

তারপর থেকে অভিজিৎকে প্রায়ই দেখা যায় ও-বাড়িতে। একসঙ্গে গল্প, হাসিঠাট্টা হয়। বাংলা কবিতার ধার ধারে না অভিজিৎ কিন্তু সে অশিক্ষিত নয়, বিদেশি বই পড়েছে অনেক। মোটামুটি জার্মান ভাষা জানে।

আইশ স্কেটিং রিংকে একটি বিলিতি দলের নাচের অনুষ্ঠান চলছে, অভিজিৎ একদিন প্রস্তাব দিল, সবাই মিলে সেটা দেখতে যাওয়া হোক। তার চেনাশুনো আছে, ভেতর থেকে সে টিকিট জোগাড় করতে পারবে। দময়ন্তীর খুব উৎসাহ, সে বলল, হ্যাঁ চল, চল। তপন যেতে পারবে না, বৈষয়িক ব্যাপারে তাকে যেতেই হবে উকিলের বাড়িতে। দময়ন্তীর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অর্চিষ্মান বলল, আমিও যেতে পারব না, সন্ধেবেলা আমার বিশেষ কাজ আছে। দময়ন্তী তবু আবদারের সুরে বলল, চল চল, দেখ, গেলেই তোমার ভাল লাগবে। অর্চিষ্মান তবু রাজি হল না। এর পরেও কি দময়ন্তী একলা যাবে অভিজিতের সঙ্গে? হ্যাঁ, ওরা দুজনেই গেল।

সেই দিন থেকেই সম্পর্কের শেষ। এর আগেও অভিজিৎ একবার দময়ন্তীকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে চিনে খাবার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন অবশ্য তপন ছিল সঙ্গে। ওসব জায়গায় যাবার সাধ্য ছিল না অর্চিষ্মানের।

একদিন অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে নাচ-গান দেখতে গেলে কী এমন আসে যায়? ব্যাপারটা তা নয়। অর্চিষ্মান বুঝে গেল, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই যুদ্ধে সে অংশ নেবে না। অভিজিৎ একজন অস্ত্রধারী যোদ্ধা, আর অর্চিষ্মান কবি। এদের মধ্যে কি লড়াই হতে পারে? কবিরা কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায় না। কাপুরুষতা নয়, অরুচি, উপেক্ষা। লোকে মনে করবে পরাজয়। তা করুক। এই স্বেচ্ছা-পরাজয় কবির অহংকারকে উস্কে দেয়, তার সৃষ্টি ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেকখানি।

অর্চিষ্মান আর কোনোদিন দমদম থেকে টালিগঞ্জে যায়নি।

পনেরো দিন পর দময়ন্তী চিঠি লিখেছিল: উত্তর না পেয়ে আর একটি। অর্চিষ্মান কী উত্তর দেবে? সেদিন দময়ন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে অর্চিষ্মান যে তাকে যেতে নিষেধ করেছিল, তা কি সে বোঝেনি? চোখের ভাষাই যদি বুঝতে ভুল করে, তাহলে আর চিঠি লিখে কী হবে?

ছ-মাসের মধ্যে অভিজিতের সঙ্গে দময়ন্তীর বিয়ে হয়ে গেল। চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অভিজিৎ বিয়ে করবে ঠিক করে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে ঘুরছিল। তারপর সে যখন দময়ন্তীকে নির্বাচন করল, তখন এ বিয়ে হবেই। জয়ী হবার জন্যই সে এসেছে।

অর্চিষ্মান তাতে আঘাত পায়নি, এটা সত্যি কথা। নিজের হাতে গড়া একটা মূর্তি হঠাৎ ভেঙে ফেললে সেই শিল্পী যেমন নিজেকেই দোষ দেয়, তার মনোভাব হয়েছিল সে রকম।

কিন্তু অভিজিৎ দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছেই বাড়ি নিতে গেল কেন? সে হয়তো অর্চিষ্মানের বাড়ি কোথায় তা জানত না, কিন্তু দময়ন্তীর তো জানা ছিল। আসতে যেতে প্রায়ই দেখা হয়ে যাবে। পাড়া-প্রতিবেশী হিসেবে ভাব হবে, দু'বাড়িতে আসা-যাওয়া, অর্চিষ্মানের পিসিকে দময়ন্তী পিসি বলে ডাকবে, অভিজিৎ চায়ের নেমন্তন্ন করবে, চোখের সামনে গর্ভবতী হবে দময়ন্তী, এই চিন্তাই অসহ্য বোধ হয়েছিল অর্চিষ্মানের।

কিন্তু সে জন্যই সে হিমালয়ে পালিয়ে আসেনি। হয়তো তার মনের গভীরে প্রকৃতির প্রতি জোরাল টান ছিল। পাহাড়ের গম্ভীর নীরবতা দেখে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল। মানুষের জীবনে ভাল লাগাটাই তো আসল। কেউ প্রভুত্ব ভালবাসে, কেউ পছন্দ করে একাকিত্ব।

যোগীবাবার সান্নিধ্যে তার মনের ব্যাপ্তি বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। একটা গাছকেও তীব্র ভাবে ভালবাসা যায়। একগুচ্ছ ফুল, একটা স্বচ্ছতোয়া নদীও হতে পারে ভালবাসার সামগ্রী। মাঝে মাঝে সে একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিও বোধ করে। এই দৃশ্যমান সব কিছুর আড়ালে যেন রয়েছে একটা শক্তি। বিকেলের আকাশের রং ফেরা দেখে মনে হয়, এটাই কি ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ।

দময়ন্তীকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তা সম্ভব নয়। এক-এক সময় বিশাল পাহাড়কেও আড়াল করে দময়ন্তীর মুখ ভেসে ওঠে। তারপরই সেই মুখখানি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

সে আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেনি, পরেও না। একদিন শুধু চুম্বনের জন্য উদ্যত হয়েছিল, তাও শেষ পর্যন্ত হল না। নারী তার কাছে অনাঘ্রাতাই রয়ে গেল। কোনও আফশোস নেই। নারীর চেয়ে প্রকৃতিও কম কিছু দেয় না। আর যদি ঈশ্বরের জ্যোতির সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে আর কোনও দিকেই মন যায় না।

অর্চিষ্মান একদিন খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সেই মেঘলা দুপুরে পরস্পর গাঢ় চোখাচোখির দৃশ্যটা মনে পড়তেই তার পুরুষ লিঙ্গের উত্থান হল। উত্তপ্ত হয়ে উঠল শরীর। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

এ কী হল তার? সে তো দময়ন্তীকে আর কামনা করে না, তবে কেন শরীরের এই চাঞ্চল্য? শরীর কি মনের অধীন নয়? নিজেকে খুব অপরাধী মনে হল। অনেকক্ষণ ঠায় বসে থেকে এক সময় উঠে গেল যোগীবাবার কাছে।

যোগীবাবার সঙ্গে তার অনেক বিষয়েই খোলাখুলি কথা হয়। বিনা দ্বিধায় তাঁকে সব ঘটনাটা জানিয়ে দিল। যোগীবাবা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। যেন ধ্যানস্থ হলেন চোখ বুজে। তারপর এক সময় তিনি অর্চিষ্মানের হাত ধরে বললেন তুই আমারটা ধরে দেখ।

অর্চিষ্মান সবিস্ময়ে দেখল, যোগীবাবার পুরুষাঙ্গ লোহার মতন শক্ত।

তিনি বললেন, বেটা, আমি কখনও যোষিৎ সঙ্গ করিনি। তোর মতন কোনও প্রেমিকাকে পিছনে ফেলে আসিনি। ছোটবেলা থেকেই আমার মিলনেচ্ছা ঈশ্বরের সঙ্গে। তীব্র মিলনেচ্ছাতে এ রকম হয়। এটা শরীরের নিয়ম। দেখবি, এমন দিন আসবে, যখন কোনও নারীর কথা চিন্তা না করলেও ঈশ্বর অনুভূতি হলে পুরুষার্থ জাগ্রত হবে।

যোগীবাবার কথা একদিন ফলে গিয়েছিল। মন থেকে মুছে গেছে দময়ন্তী, আর তার মুখ মনে পড়ে না। সে অনেক পরের কথা।

যোগীবাবার মৃত্যুর পর সাধক অর্চিষ্মান সেই আশ্রম ছেড়ে পাহাড়ের অনেক ওপরে উঠে গিয়ে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। যোগীবাবার ইচ্ছে ছিল, অর্চিষ্মান এই আশ্রমের ভার নিয়ে নেয়, কিন্তু বাবার অন্য শিষ্যদের মধ্যে ঈর্ষার ভাব দেখে তিনি সরে এসেছেন। সব সাধু তো এক হয় না। অনেক সাধুর টনটনে স্বার্থজ্ঞানও অর্চিষ্মানের চোখে পড়েছে।

এখানে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্তা নেই। অর্চিষ্মান নিজের জন্য কিছুই কখনও রান্না করেন না। মাইল পাঁচেক দূরে পোটালা গ্রামে একটি লঙ্গরখানা আছে, গুজরাটের এক সমিতি সেটা চালায়। সেই লঙ্গরখানায় যেতেও হয় না, সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা এসে রুটি গুড়, ছাতু, বাতাসা দিয়ে যায়। খুব ঝড় বৃষ্টির সময় তারা আসতে পারে না, তাতেই বা কী, দু-তিন দিন না খেয়ে থাকলেও কিছু ক্ষতি হয় না শরীরের। অবশ্য মনটা ছটফট করে, কখন আসবে, এই বুঝি এল, এরকম অনুভূতি হয়।

মৃত্যুর আগের দু'দিন যোগীবাবার বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্চিষ্মানের খুব জানতে ইচ্ছে করেছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের জ্যোতি দেখতে পেলেন কি না। শেষ দিনটিতে যোগীবাবার মুখে লেগেছিল অপূর্ব এক হাসি। কী পেয়েছেন তিনি?

কিছু একটা আছে, কোনও এক সময় সেই অনির্বচনীয়কে পাওয়া যাবে, এই বোধটাই জীবনকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে। সারাদিন পাহাড়ের রং বদলায়, মেঘ এসে গুম গুম শব্দ করে, এই সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা রহস্য আছে। এতগুলি বছরের মধ্যে একটি দিনও অর্চিষ্মানের একঘেয়ে লাগেনি। তাঁর শাস্ত্র পাঠ করার দরকার হয় না, নিজের উপলব্ধিতেই তিনি এই বিশ্ব বিন্যাসের মধ্যে এক চৈতন্যের সন্ধান পেয়েছেন।

নদীতে স্নান করে ভিজে গায়ে রোদ্দুরে দাঁড়ালেন অর্চিষ্মান। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার মতন শব্দ হচ্ছে। শরীরটা আজ এত গণ্ডগোল করছে কেন? তিনি কাঠঠোকরা পাখিটিকে খুঁজলেন, পেলেন না। সে উড়ে গেছে। প্রজাপতিরাও নেই। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন, হে সুন্দর, আমাকে শরীর ভুলিয়ে দাও!

আজ যেন বেশি শীত লাগছে। মেঘলা দিনের চেয়ে রৌদ্র ঝলমলে দিনে শীত বেশি পড়ে। এতগুলি বছরে শরীর তীব্র শীতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাতে একটা কম্বলেই চলে যায়।

ভিজে গায়েই কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে অর্চিষ্মান এক পা এক পা করে এগোলেন গুহার দিকে। এখন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। কাঠের আগুন জ্বেলে গা সেঁকতে পারলে ভাল হয়।

গুহা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না অর্চিষ্মান। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। কপালটা ঠুকে গেল পাথরে।

আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। সর্বাঙ্গ একেবারে অবশ। তিনি ভাবলেন, এই কি তাঁর শেষ মুহূর্ত? তবে আসুক সেই মুহূর্ত, কোনও খেদ নেই।

হঠাৎ যেন অর্চিষ্মানের শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা চলে গেল। শরীরই যেন নেই, শুধু মন, একেবারে নির্ভার। তাঁর চোখে ফুটে উঠল প্রগাঢ় মুগ্ধতা। দৃশ্যের পর দৃশ্য ঢেউ খেলে যেতে লাগল। পাহাড় চূড়া থেকে গড়িয়ে এল তরল সোনা। তারপর সেই সোনা বদলে গিয়ে হল সাদা রঙের স্নিগ্ধ ধোঁয়া। কোথায় যেন অনেকগুলি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। একরাশ ফুলের পাপড়ির মতন প্রজাপতি ঢেকে দিল সামনের পাথরটা। তারপর সেই ধোঁয়া ভেদ করে এগিয়ে এল একটা আলোর রেখা।

এই কি সেই ঈশ্বরের জ্যোতি? ধন্য, ধন্য এই জীবন। এই আলোর মতন পরম সুন্দর আর কিছু নেই।

সেই আলোর রেখায় ফুটে উঠল একটি মুখ। সেই মুখ দময়ন্তীর।

অর্চিষ্মান প্রথমে চিনতে না পেরে চমকে উঠলেন। এই কি ঈশ্বরের রূপ? না, না, এ তো দময়ন্তী, সেই যৌবনের দময়ন্তী, একদিন যার শুধু একটা আঙুল স্পর্শ করেছিলেন অর্চিষ্মান। শেষের দিকে বছরের পর বছর আর দময়ন্তীকে মনে পড়েনি। অথচ এখন অবিকল সেই মুখ, সেই মুখে মাখা রয়েছে বিষাদ।

ভারি ক্লান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, অর্চি, তুমি আমাকে কোনও দিন ভালবাসনি।

অর্চিষ্মান বললেন, এখন আর সে কথা কেন? কেন এখন এলে? আমি তো আর সেই অর্চিষ্মান নই। তুমি কেন ঈশ্বরের জ্যোতি আড়াল করে দাঁড়ালে?

দময়ন্তী যেন সে কথা শুনতে পেল না। সে আবার বলল, তুমি আমাকে ভালবাসনি, তুমি ভালবেসেছিলে তোমার গড়া এক নারীকে। আমাকে যত চিঠি লিখেছ, সে সব চিঠি তোমার নিজেকেই লেখা। তোমার ভাষার সাধনা। তুমি আমাকে গ্রহণ করতে চাওনি, তাই প্রথম সুযোগেই একজন পুরুষের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তুমি দূরে সরে গেলে।

অর্চিষ্মান কাতরভাবে বললেন, না, না, তা ঠিক নয়। যে ক'টা বছর আর কেউ আসেনি, আমি তোমাকেই শুধু ভালবেসেছি। তাতে কোনও মিথ্যে ছিল না।

দময়ন্তী বলল, এই তোমার ভালবাসা? আমি চিঠি দিয়ে তোমাকে ডেকেছি, তুমি সাড়া দাওনি। আমাকে ফেলে কত দূরে চলে গেলে, এতগুলি বছরে আমার কথা একবারও ভাবনি।

অর্চিষ্মান বললেন, এ জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কোনও নারীকেই আমি চিনিনি। পাছে তোমার কথা ভুলে যাই, তাই আর কোনও নারীর সঙ্গে মিশিনি। আমার সেই ভালবাসা অটুটভাবে রেখে দিয়েছি বুকের মধ্যে। প্রথম প্রথম তোমার কথা মনে পড়লে কী কষ্ট যে হত, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। সেই জন্যই আমি আস্তে আস্তে তোমার মুখচ্ছবিখানি বদলে দিয়েছি। এই যে পাহাড়, এই যে ছোট নদী, ফুলের সমারোহ, প্রজাপতি, এমনকি কাঠঠোকরা পাখিটির মধ্যেও ভাগ ভাগ করে দিয়েছি তোমাকে। আকাশের রং-ফেরা তুমি, বাতাসের সুগন্ধ তুমি, পাথরের ডৌল তুমি। সবই তুমি। দময়ন্তী, এই বার এস, আমাকে তুলে ধর।

সেই আলোর রেখাটি অর্চিষ্মানের নিস্পন্দ শরীরে মিশে গেল।

যৎসামান্য

একজন বসে প্রায় সর্বক্ষণ ক্যাশ মেলায়, আর একজন খবরের কাগজ পড়ে। বংশীবদন আর মুরলীধর, দু'জনেরই বয়েস উনচল্লিশ, ওদের নামের মানেও যে এক তা অবশ্য অনেক লোকই খেয়াল করে না। নাম একটা নাম, তার অর্থ নিয়ে ক'জন মাথা ঘামায়! চেহারা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বংশীবদনের মোটাসোটা ঘি খাওয়া চকচকে চেহারা, এর মধ্যেই মাথায় টাক পড়েছে, পেছনের চুল সামনের দিকে টেনে আঁচড়ায়। আর মুরলীধর ছিপছিপে ঢ্যাঙা, মাজা মাজা রং, মাথার ঝাঁকড়া চুল, ছ'মাসে ন'মাসে একবার কাটে। দু'জনের কারুকেই কলির কেষ্ট বলা যায় না।

ওরা দু'জন কাঠের কারবারের অংশীদার। বাগবাজারের খালের ধারে ওদের অফিস কিংবা দোকান কিংবা গুদাম সব একসঙ্গে। লোকে বলে ঠেক। বংশীবদন রোজ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বলে, দোকানে যাচ্ছি। আর মুরলীধর খেয়েদেয়ে, পান চিবুতে চিবুতে অফিসে বেরোয়। দোকান কথাটা তার স্ত্রী যমুনার পছন্দ নয়। অবশ্য কোনোটাই ভুল নয়। খালধারে অনেকখানি জায়গা তার দিয়ে ঘেরা, বড় বড় গাছের গুঁড়ি থেকে নানারকম কাঠ, তক্তা এক এক জায়গায় জড়ো করা। মস্ত বড় একটা দাঁড়িপাল্লাও মাটিতে গাঁথা আছে। এগুলো সব খোলা জায়গায়। তারপর টালি-ছাউনির বেশ বড় শেড। সামনের দিকটায় কয়েকখানা চেয়ার বেঞ্চ পাতা, পাইকার-খদ্দেররা এসে বসে, তারপর ক্যাশ কাউন্টার। একেবারে পেছন দিকে পুরনো আমলের কয়েকটা আরামকেদারা, তিনটি আলমারি ও একটা ছোট টেবিলের ওপর টাইপ রাইটার। এই অংশটাকে অনায়াসেই অফিসঘর বলা যায়।

খদ্দেরদের জন্য কাঠ বাছাবাছি বা মাপামাপি করার জন্য দু'জন কর্মচারি আছে, মালিক দু'জনকে ওসব কাজে হাত লাগাতে হয় না। বংশীবদন বসে ক্যাশ কাউন্টারের উঁচু চেয়ারে, আর মুরলীধর পেছন দিকের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে থাকে, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে না। দু'জনেই সমান অংশীদার, কিন্তু দায়িত্বভাগ অসমান। বংশীবদন স্থূল চেহারা নিয়েও ছটফটে স্বভাবের, প্রথমে এসেই সে কুলুঙ্গিতে গণেশের মূর্তির সামনে ধূপধুনো দেয়, চৌকাঠে গঙ্গাজল ছিটোয়, ফুলঝাড়ু বুলোয় কাউন্টারে, সব খদ্দেরদের সঙ্গে সে-ই দরদাম করে, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে স্টক মেলায়। আর প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে ক্যাশের টাকা গোনে, পাঁচ টাকা-দশ টাকা পঞ্চাশ-একশো টাকার নোটগুলো আলাদা করে রাখে। টাকা ঘাঁটাঘাঁটি করতেই সে ভালবাসে। দুপুরবেলা চা আনবার সময় সে অনেক বেছে বেছে সবচেয়ে ময়লা নোটটা বার করে দেয়। আর মুরলীধরের একমাত্র দায়িত্ব বড় বড় কোম্পানির অর্ডার এলে বিল টাইপ করা। তখন সে টাইপ মেশিনে বসে, আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না। সে কাজও থাকে না প্রায় দিনই। সে ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে আধশোওয়া হয়ে একটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে তন্ন তন্ন করে। সমস্ত বিজ্ঞাপন, কর্মখালি, পাত্র-পাত্রী সংবাদ কিছুই বাদ দেয় না। একবার শেষ হয়ে গেলে আবার।

এই সামান্য কাজের জন্য মুরলীধরের তো রোজ না এলেও চলে। কিন্তু রোজ দুপুরে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়লে মান থাকে না। পাড়া-পড়শিদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ মানুষই অফিসে যায় কিংবা কাজে যায়। যমুনা তার স্বামীকে এক আধদিন ছুটি নিতেও দেয় না। সে রোজ না গেলে বংশীবদন যদি কারবারটা হাতিয়ে নেয়? মুরলীধরের তুলনায় বংশীবদন অনেক বেশি ধুরন্ধর, কাঠের কারবারের অন্ধিসন্ধি সব সে জানে। সব সময় চোখে-চোখে না রাখলে যে কোনোদিন সে মুরলীধরকে গলাধাক্কা দিতে পারে।

মুরলীধর প্রথম প্রথম যমুনাকে বোঝাবার চেষ্টা করত যে বংশীবদন তার ন্যাংটো বয়েসের বন্ধু দু'জনে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে, এক ইস্কুলে পড়েছে। সে কখনো মুরলীধরকে ঠকাবে না। তা শুনে যমুনা হেসেছে। টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে কত বন্ধু যে বন্ধুকে পেছন থেকে ছুরি মারে, তাও মুরলীধর জানে না? বন্ধুকে বেশি বেশি বিশ্বাস করলে একদিন হয়তো পথে বসতে হবে!

কারবারটা শুরু করেছিলেন অন্য দুই বন্ধু। এদের দু'জনের দুই বাবা। মুরলীধরের বাবা হরিদাস নিজে সুন্দরবনে নিয়মিত যাতায়াত করে বড় বড় নৌকো ভরে কাঠ নিয়ে আসতেন। তখন বাগবাজারের খাল চালু ছিল। এই খাল দিয়ে লঞ্চ চলত। এখন সে খাল মরে হেজে গেছে। নামই শুধু খাল। বংশীবদনের বাবা মধুসূদন অফিসপাড়া ঘুরে ঘুরে জোগাড় করে আনতেন অর্ডার। অক্লান্ত পরিশ্রমে দুই বন্ধু ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে গেছেন কেউ কারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তখনকার পুরুষরা বউদের কর্ণপাত কথায় করত না।

দুই বাবাই গত হয়েছেন। আগেকার মতন কারবারের রমরমা আর নেই। কাঠের দাম খুবই বেড়েছে, সেই তুলনায় চালানি কম। একটা করাত বসান হয়েছে, গুঁড়ির চেয়ে তক্তা বেচে মুনাফা বেশি। সারা মাসে যা লাভ হয়, তাতে মোটামুটি দুটো সংসার চলে যায়। প্রতিদিন ক্যাশ বন্ধ করার সময় মুরলীধর একবার জিজ্ঞেস করে, আজ কত হল রে বংশে? উত্তরটা শোনা না শোনা একই কথা। বংশীবদন যদি কমিয়ে বলে, তা সে ধরতেও পারবে না।

একদিন দুপুরবেলা আড়াইটের সময় মুরলীধরের জীবনে ওলটপালট ঘটে গেল।

মুরলীধর যথারীতি কাগজ পড়ছে, বংশীবদন বাইরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথার মারপ্যাঁচ সেরে সবে ফিরে এসেছে ক্যাশকাউন্টারের কাছে। এই সময় কোম্পানির খরচে চা ও দুটি করে বিস্কুট আনান হয়, খদ্দেরটির জন্যও চা আনাবে কি আনাবে না ভাবছে, বংশীবদন, হঠাৎ মুরলীধর উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, ওরি ব্বাস, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! বংশে, একবার এদিকে আয়, এদিকে আয়।

বংশীবদন চমকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে সে দিকে গিয়ে বসল, কী হয়েছে, কী ব্যাপার?

মুরলীধর খবরের কাগজটা তুলে ধরে বলল, এই জায়গাটা একবার পড়।

বংশীবদন ভুরু কুঁচকে তাকাল। খবরের কাগজটাও কেনা হয় কোম্পানির পয়সায়। বাবাদের আমল থেকেই চলে আসছে। বংশীবদন একবার শুধু হেডলাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, বেশি পড়ার ধৈর্য তার নেই। মুরলীধরই কাগজের দাম উসুল করে নেয় সুদে আসলে।

বংশীবদন বলল, কোন্ জায়গাটা পড়ব? কী আছে?

মুরলীধর এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, শুধু এই লাইনটা পড়।

বংশীবদন পড়ল, 'ইন্দিরা গান্ধি দৃঢ়ভাবে বললেন, আমি আমার পিতাকে চিনি না, কে কে তেল দিয়ে ঘুমোয় অথচ সবজান্তার ভাব করে, তা আমি তাঁর থেকে বেশি বুঝি। দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য......"

মুরলীধর বলল, ব্যস, ব্যস, আর পড়তে হবে না। ওতেই হবে।

বংশীবদন বিমূঢ়ভাবে বলল, তুই এটা হঠাৎ আমায় পড়তে বললি কেন?

মুরলীধর মুচকি হেসে বলল, কী বুঝলি?

বংশীবদন বলল, কী বুঝলুম মানে? যা লেখা আছে।

মুরলীধর বলল, এতে লেখা আছে, ইন্দিরা গান্ধি বলছেন, তিনি তাঁর বাপকে চেনেন না। এ কখনো হয়?

বংশীবদন চোখ বড় বড় করে একটুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, তাই তো, নিজের বাপকে চিনি না, এ কথা তো কেউ বলে না। মেয়ে হয়ে বাপকে চেনে না? নিশ্চয়ই কিছু ছাপার ভুল হয়েছে।

মুরলীধর বলল, ভুল তো হয়েছেই। কিন্তু কী ভুল বল তো! আসল কথাটা কী হবে?

বংশীবদন কাগজটায় আর একবার চোখ বুলোল। বুঝতে পারল না। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তার মাথা ঘামাতেও ইচ্ছে করে না।

সে চঞ্চল হয়ে বলল, মুরুলি, তুই এখন চা খাবি তো? চা আনাই।

মুরলীধর বলল, হ্যাঁ, চা খাব। আমি পনেরো মিনিট ধরে ভাবছি, কী ছাপার ভুল হয়েছে। এই মাত্তর বুঝতে পারলুম। আসল সেন্টেন্সটা কী হবে জিনিস? ইন্দিরা গান্ধি দৃঢ়ভাবে বললেন, আমি আমার পিতাকে চিনি, নাকে কে তেল দিয়ে ঘুমোয়—'

বংশীবদন বলল, ঠিক ঠিক। আমি আমার পিতাকে চিনি।

মুরলীধর হো হো করে হেসে উঠে বলল, কমা, একটা ছোট্ট কমা এদিক ওদিক হয়ে গেছে! তাতেই এই কাণ্ড!

বংশীবদন ফিরে গিয়ে ক্যাশ থেকে একটা জিরজিরে পাঁচ টাকার নোট বার করে হেঁকে বলল, জগুয়া, চায়ের কেটলিটা নিয়ে যা—

মুরলীধর একটু বাদে আবার বলল, দ্যাখ বংশে, একটা কমা, একতিলের মতন, কতটুকুই বা জায়গা নেয়, তার কী শক্তি! বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে।

বংশীবদন একটু হে হে হাসি দিয়ে টাকা গোনায় মন দিল।

চা পর্ব শেষ হতে না হতে কাঠের চালানি এল এক ট্রাক ভর্তি। বাইরে চলে গেল বংশীবদন, এখন সব মিলিয়ে নিতে হবে। মুরলীধরের ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আবার কাগজ পড়ায় মন দিয়েছে।

বিকেলের দিকে মুরলীধর কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, জানিস বংশে, আজ আমি যত কাগজ পড়ছি, তত মজা লাগছে। একটা কমা এদিক ওদিক হয়ে গেলে পুরো মানে বদলে যায়! হ্যাঁ-টা না হয়ে যায়; ভেরি ডেঞ্জারাস!

বংশীবদন বলল, হুঁ হুঁ।

মুরলীধর বলল, আর একটা কথা মনে পড়ল। আমাদের ছেলেবেলায় যে-কোনো লেখার মধ্যে কয়েকটা সেমিকোলন থাকত মনে আছে? সেই সেমিকোলনটা কোথায় গেল? খবরের কাগজের লেখায় তো আর সেমিকোলন দেখি না!

বংশীবদন বলল, তা বটে!

মুরলীধর বলল, সেমিকোলনের দপ্তরটা কি ফুরিয়ে গেছে?

বংশীবদন বেগুনভাজার মতন মুখ করে বলল, ওরে মুরলি, আমার অনেক কাজ, ভাউচারগুলো সব মেলাতে হবে। কথা বলার সময় নেই। তুই কাগজটা মুখস্থ করগে যা।

মুরলীধর বলল, আকাশে কোদালি মেঘ করেছে। চ আজ শিগগির শিগগির বাড়ি যাই। আমাকে একশোটা টাকা দে তো!

বংশীবদন বলল, আবার অ্যাডভান্স? সোমবার নিয়েছিস, হপ্তায় একবারের বেশি অ্যাডভান্স নেওয়া চলবে না। আমরাই নিয়ম করেছি। আজ তো ভাই হবে না!

মুরলীধর বলল, ধুত্তোর নিকুচি করেছে তোর নিয়মের। ক্যাশে যদি দুশো টাকা থাকে, তার হাফ আমি যে-কোনো সময় নিতে পারি। আমি হাফ-পার্টনার না?

বংশীবদন এবার কান এঁটো করা চওড়া হেসে বলল, তোর মাথায় একটা কথা কিছুতেই ঢোকে না মুরুলি! ক্যাশে যা থাকে, তার সবটাই প্রফিট নয়। মূলধন খেয়ে ফেললে ব্যবসা দু'দিনেই ডকে উঠবে। আজ যে মাল ডেলিভারি দিয়ে গেল, তার জন্য কাল সকালেই পেমেন্ট করতে হবে না? ব্যাঙ্ক থেকে আরও তুলতে হবে।

মুরলীধর একটু দুর্বল হয়ে গিয়ে মিনমিনে গলায় বলল, একশোটা টাকা দিবি না, যমুনা যে এক কৌটো পাউডার, কোয়ার্টার পাউণ্ড মাখন আর আড়াই শো চা কিনে নিয়ে যেতে বলেছে। হাতে কিছু নেই।

এক তাড়া নোটের থেকে একটা ময়লা একশো টাকার নোট টেনে বার করে বংশীবদন বলল, এই নে, খাতায় সই কর।

কলমটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুরলীধর বলল, সেমিকোলনটা কেন উঠে গেল বল তো?

বংশীবদন এবার ধৈর্য হারিয়ে বিকৃত গলায় বলল, ওরে শালা, আমি এসব কী জানি? কেন আমায় জ্বালাচ্ছিস!

মুরলীধর বলল, তোর নাম বংশীবদন। যদি ভুল করে মাঝখানে একটা কমা পড়ে যায়, তা হলে দুটো মানুষ হয়ে যাবে। বংশী আর বদন! কী ডেঞ্জারাস!

বংশীবদন বলল, ওরে ক্ষ্যামা দে! ক্ষ্যামা দে! আমি আর পারছি না।

মুরলীধর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, না, না, সিরিয়াস ব্যাপার, পুঁচকে ব্যাঙাচির মতন একটা কমা, তার কী ক্ষমতা রে বাপ রে বাপ!

ঠিক ছ'টার সময় ঝাঁপ বন্ধ হয়। দুটো তালা দেবার পর এক গোছা প্যাঁকাটি জ্বেলে সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বংশীবদন একটুক্ষণ কী যেন বিড় বিড় করে। একজন নেপালি দারোয়ান বাইরে খাটিয়া পেতে শোয়। দামি দামি কাঠ তো বাইরেই থাকে। পাশে পাশে আরও তিনটি এরকম কাঠের ঠেক, সব জায়গাতেই বন্দোবস্ত আছে পাহারার।

দু'জনে খানিকটা হেঁটে যাবার পর পথ আলাদা হয়ে যায়। বংশীবদন যায় শ্যামপার্কের দিকে, মুরলীধরের বাড়ি হাতিবাগান পেরিয়ে ভীম ঘোষ লেনে। প্রায়ই যমুনার কিছু না কিছু ফরমাস থাকে, শ্যামবাজারের মোড় থেকে কেনাকাটি করে মুরলীধর হেঁটেই বাড়ি যায়।

আকাশে গুম গুম করে মেঘ ডাকল।

স্টার থিয়েটারের কাছে কিসের যেন একটা জটলা বেঁধেছে, থেমে গেছে ট্রাম বাস। মুরলীধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ভিড় পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল, ও মুরুলিবাবু, ও মুরুলিবাবু! তবু মুরলীধর মুখ ফেরাল না, কোনো লোকের সঙ্গেই তার এমন কিছু জরুরি বিষয়ের সম্পর্ক নেই, যাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। ভিড় তার সহ্য হয় না।

বাড়ি ফিরতে দেরি করলে যমুনা মুখ ভার করবে।

বউয়ের কাছে নানা ব্যাপারে মুরলীধর অপরাধী হয়ে আছে। কিংবা অপরাধ বোধ করাই তার স্বভাব। অনেক সময়েই মনে হয় কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করা উচিত ছিল, সেটা মনে পড়ছে না।

যমুনা প্রায়ই বলে, তুমি যে সারাদিন বাড়িতে থাক না, আমি সময় কাটাই কী করে বল তো?

মুরলীধর এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না, মা-মাসি-পিসিদের মুখে সে এরকম কথা কখনো শোনেনি। কর্তারা বাড়ির বাইরেই বেশিক্ষণ সময় কাটাতেন, আর মা-মাসি-পিসিরা সকাল থেকে রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ঘোর দুপুরে ডাঁটা-চচ্চড়ি আর মাছের মুড়ো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক ঘুম, বিকেলে একটু ঝগড়াঝাঁটি, ছেলেমেয়েদের একটা চড়-চাপড়, তারপর আবার রান্নার তোড়জোড়। বাড়ি থেকে বেরুতেন কালেভদ্রে।

এখন দিন কাল পালটেছে। পরিবারটি ছোট হয়ে গেছে অনেক। মুরলীধরের ভাই নেই, দুই বোন ছিল, একজনের বিয়ে হয়েছে কানপুরে, আর একজন, মুরলীধরের বড় আদরের ছোটবোন বীণাপাণি মারা গেছে গাড়ি চাপা পড়ে। তার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল।

এখন বাড়িতে শুধু মা আর বউ। মা বড় বেশি বুড়িয়ে গেছেন। চোখে প্রায় দেখতেই পান না। বীণাপাণির শোক সামলাতে পারেননি, এখন প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করেন, কান পাতলে বোঝা যায়, বীণাপাণির সঙ্গে কথা বলছেন। যমুনাকে রান্নাবান্নার ঝামেলা বেশি পোহাতে হয় না, একজন ঠিকে মেয়ে মায়ের রান্না করে দিয়ে যায়, যমুনাকে শুধু মাছের ঝোল বা মাংস করে নিলেই চলে। দুপুরে ঘুমোয় না যমুনা, বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়।

যমুনা গরিব বাড়ির লেখাপড়া জানা মেয়ে। বাপের বাড়ির দিকে সবাই বাঙাল, এ বাড়ির ধারার সঙ্গে অনেক কিছুই মেলে না। বিয়ের পর বছরখানেক বাদেই সে বায়না ধরেছিল চাকরি করবে। তখনো মুরলীধরের বাবা বেঁচে, তিনি এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকে চাকরি করতে যায় অভাবে পড়লে। এ বাড়িতে ভাত-কাপড়ের অভাব নেই, তবু ঘরের বউ ট্রামে-বাসে গুঁতোগুঁতি করে চাকরি করতে যাবে কেন? তা ছাড়া, এ দেশে তো অঢেল চাকরি নেই। যমুনা শখের চাকরি করতে গেলে আর একটি অভাবী মেয়েকে বঞ্চিত করা হবে।

বাবার মৃত্যুর পর নতুন করে যমুনা আবার দাবি তুলেছিল। মুরলীধর আপত্তি করেনি। কিন্তু যমুনা অনার্সহীন গ্র্যাজুয়েট, ভদ্রগোছের চাকরি জোটানো সহজ নয়। একটা সাবানের কোম্পানিতে কেরানির চাকরি পেয়েছিল কোনওক্রমে, মাস তিনেক পরে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। কী যে হয়েছিল কে জানে, আর যায়নি।

যমুনার আসল অভাবটি অবশ্য অন্য। বংশীবদন প্রায়ই বন্ধুকে বলে, ওরে মুরলি, বউ সামলানো কি সোজা কথা? ওদের সব সময় খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হয়। শাড়ি কেনার টাকা দিবি, গয়না গড়িয়ে দিবি। মাঝে মাঝে বায়স্কোপ-থিয়েটারে নিয়ে যাবি, আর দু'তিন বছর পর পর কোলে একটা বাচ্চা দিবি। ওই শেষের উপহারটাই কিছুতে দেওয়া যাচ্ছে না। বারো বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো যমুনার কোনও সন্তান হয়নি। মুরলীধরের দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

বাড়ি ফিরে মুরলীধর দেখল, বৈঠকখানায় দু'জন অতিথি বসে আছে। খুশি হয়। যমুনা তবু কথাবার্তা বলার মানুষ পায়। যেদিন কেউ আসে না, সেদিন যে-কোনও ছুতোয় মুরলীধরের খানিকটা বকুনি প্রাপ্য থাকে।

বসবার ঘরে না ঢুকেও পাশের একটা দরজা দিয়ে ওপরে ওঠা যায়। ছোট বাড়ি, একতলায় ওই বসবার ঘর আর রান্নাঘর, কলঘর, দোতলায় দু-খানি বেডরুম, তিনতলায় একটা ঘর আর ঠাকুর ঘর একসঙ্গে, মা থাকেন সেখানে। সেখানেও একটা বাথরুমের ব্যবস্থা করা আছে, মাকে আর নিচে নামতেই হয় না।

মুরলীধর আড়চোখে দেখে নিল যমুনার বাপের বাড়ির লোক এসেছে, তার মাসতুতো বোন শ্যামলী আর তার বর জগদীশ, যমুনা তাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। মুরলীধর ওদের অলক্ষে দোতলায় উঠে গেল।

প্রতিদিন বাড়ি ফিরে সে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে। সে যা জিজ্ঞেস করে আর মা যা উত্তর দেন, তার মধ্যে কোনও সঙ্গতি নেই, তবু তো দু-চারটে কথা হয়। তারপর সে কলঘরে হাতমুখ ধুতে যায়।

চৌবাচ্চায় জল ধরা থাকে, ঢুকলেই শ্যাওলার গন্ধ পাওয়া যায়। মুরলীধর জল ঢালতে ভুলে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকের খবরের কাগজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে। তার একটা বাক্য অনবরত ঘুরছে মুরলীধরের মাথায়। খুব খটকা লেগে আছে। 'দেবতার পায়ের কাছে শুধু গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, দিও না নিজের অন্তরের সব ভক্তি উজাড় করে, বরং নিজেকেই প্রস্ফুটিত করে তোল।' এ বাক্যটার মানে কী? রামকৃষ্ণদেব দেবতাকে শুধু ফুল দিয়ে অন্তরের ভক্তি উজাড় করে দিতে নিষেধ করছেন? এ কখনও হতে পারে? নিশ্চয়ই কমার গোলমাল আছে। কিন্তু গোলমালটা কোথায়?

হঠাৎ সব সরল হয়ে গেল। প্রথম কমাটা ফুলের পর বসবে না, দিও না'র পরে হলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। দেবতার পায়ের কাছে শুধু গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল দিও না, নিজের অন্তরের সব ভক্তি উজাড় করে, বরং নিজেকেই প্রস্ফুটিত করে তোল। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। কী অলক্ষুণে কাণ্ড, অ্যাঁ? রামকৃষ্ণদেবের কথা পর্যন্ত উলটে দেবার শক্তি ধরে একটা ওই একরত্তি কমা! দ্বিতীয় কমাটা না হলেও চলত। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ছাপাখানার লোকেরা অতি সাবধান না হলে যে একটা কমার জন্য উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপতে পারে।

সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবার পর বেশ প্রফুল্ল বোধ করল মুরলীধর। তখনই বাথরুমের টিনের দরজায় ধাক্কা। যমুনা বলল, জলের শব্দ নেই, কোনও শব্দ নেই, বাথরুমে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে কী করছ?

দরজা খুলে মুরলীধর বলল, এই তো হয়ে গেছে।

প্রতিদিন সন্ধেবেলা যমুনা একটু সেজেগুজে থাকে। গা ধুয়ে পাউডার মাখে, খোঁপা বাঁধে, পাট ভাঙা শাড়ি পরে। শরীরের গড়ন ভাল, এখনো তাকে নতুন বউটির মতন দেখায়।

ধারাল জিভে সে জিজ্ঞেস করল, চা আনতে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই ভুলে গেছ?

মুরলীধর বলল, না গো, এনেছি। চা, তোমার পাউডার, মাখন।

যমুনা বলল, জগদীশরা এসেছে, তাদের সঙ্গে একবার দেখাও করলে না? কী আক্কেল গো তোমার?

মুরলীধর অপরাধীর মতন বলল, যাচ্ছি গো, এই এখনই যাচ্ছি। জামাটা ঘেমে হয়ে গেছে, পালটে নিয়ে—

যমুনার বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে কী যে কথা বলবে তা ভেবে পায় না মুরলীধর। জগদীশ কী একটা ওষুধ কোম্পানির দালালি করে, কথায়-বার্তায় অতি তুখোড়। সারা শহর চষে বেড়ায়, মফস্বলেও যায়। রোজগারপাতি ভালই মনে হয়। জগদীশের তুলনায় তার বউ শ্যামলী যেন নিষ্প্রাণ ধরনের। কথা বলতে চায় না, মুখখানা ফ্যাকাসে, হাসতেও যেন তার কষ্ট হয়।

মনে হয়, বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছে ওরা। সামনে দুটি প্লেট, আধভাঙা সিঙ্গাড়া আর সন্দেশের গুঁড়ো পড়ে

আছে, একবার চা-ও দেওয়া হয়ে গেছে। জগদীশ সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিন, কাঠের কারবার কেমন চলছে বলুন?

মুরলীধর যে ধূমপান করে না, এতবার এসেও তা মনে রাখতে পারে না জগদীশ।

মুরলীধর বলল, মন্দ না। দিনকাল যে-রকম পড়েছে, তারই মধ্যে কোনও রকমে—। তা আপনার কাজ-কর্ম সব চলছে ঠিকঠাক?

এর মধ্যে যমুনা ঘরে ঢুকে তার কোন্ মাসি বেহালায় জমি কিনছে, সেই আলোচনা শুরু করল। এ বিষয়ে মুরলীধরের কিছু বলার নেই। সে চুপ।

খানিকক্ষণ বাদে যমুনা বলল, তুমি কোনও কথা বলছ না কেন?

মুরলীধর যেন ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে উঠে বলল, ও হ্যাঁ। এই তো? আচ্ছা জগদীশবাবু আপনার মনে আছে আগে বাংলা লেখার মধ্যে অনেক কমা আর সেমিকোলন থাকত। এখন সেমিকোলন প্রায় দেখাই যায় না, তাই না!

জগদীশ চোখ সঙ্কুচিত করে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল মুরলীধরের দিকে। তারপর বলল, হ্যাঁ, তা যা বলেছেন!

মুরলীধর বলল, সেমিকোলন মানে আদ্ধেক কোলন। ফুটকি আর কমা। আর কোলন হচ্ছে দুটো ফুটকি। সেই কোলনও কি আজকাল চোখে পড়ে? আজকের আনন্দবাজার খুলে দেখুন, একটাও সেমিকোলন নেই, শুধু কমা, অনেক কমা। কমা ওদের হঠিয়ে দিয়েছে।

জগদীশের এবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ তো মশাই খুব জ্ঞানের কথা। আপনি লার্নেড লোকে। ওগো, ওঠো, বাড়ি, যাবে না? শ্যালদায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

জগদীশরা বিদায় নেবার পর যমুনা জিজ্ঞেস করল, তুমি কমা, সেমিকোলন এসব কী বলছিলে?

মুরলীধর গম্ভীরভাবে বলল, কোলন, সেমিকোলন উঠিয়ে দিয়ে শুধু কমা দিয়ে সব কাজ চালান খুব ডেঞ্জারাস, কখন যে কী হয়ে যায়!

সেদিন থেকে মুরলীধরের মাথায় যেন ভূত চাপল। সর্বক্ষণ ওই এক চিন্তা। অন্য যে-কোনও প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কমা-সেমিকোলনের কথা এসে পড়ে। তার মনে অনেক প্রশ্ন, কেউ তার উত্তর দিতে পারে না। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কমার ব্যবহার ঠিক হয়েছে কিনা। অকালমৃতা ছোটবোন বীণাপাণির খুব বই পড়ার শখ ছিল, তার সংগৃহীত বইগুলি এখনও রয়ে গেছে, মুরলীধর সেইসব বইও বারবার পড়ে।

রূপবাণী সিনেমার পাশের বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন বাংলার অধ্যাপক চারুচন্দ্র মিত্র। মুরলীধরের সঙ্গে চেনা আছে। একদিন বাস স্টপে চারুচন্দ্রকে দেখে মুরলীধর বিনীতভাবে বলল, চারুবাবু আপনার শরীর গতিক ভাল আছে তো? একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

চারুচন্দ্র উদারভাবে বলল, হ্যাঁ ভাল আছি। তবে মশাই, যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিন্তু ছেলেকে কলেজে ভর্তি করাবার অনুরোধ করবেন না। ওটা আমি পারব না। মুরলীধর লজ্জা পেয়ে বলল, না, সেরকম কিছু না। আমি জানতে চাইছিলুম, কমা আর সেমিকোলনের মধ্যে আজকাল আর কেউ সেমিকোলন ব্যবহার করে না কেন?

চারুচন্দ্র পান চিবুতে চিবুতে অবহেলার সঙ্গে বলল, ওটা আর তেমন কাজে লাগে না।

মুরলীধর বলল, আগে কাজে লাগত। আচ্ছা, কমা আর সেমিকোলনের মধ্যে তফাত কী? কোথায় কমা আর কোথায় সেমিকোলন বসান উচিত?

চারুচন্দ্র বলল, এই আর কী। মানে, কোথাও কমা, কোথাও সেমিকোলন বসালেই হল। তবে, ওই যে বললাম, সেমিকোলনটা এখন আর তেমন দরকার লাগে না।

মুরলীধর বলল, তবু দুটো যখন আলাদা চিহ্ন, তখন ব্যবহার করারও তো একটা নিয়ম থাকবে?

চারুচন্দ্র বলল, সেমিকোলনটা বাদ দেওয়াই ভাল। আমি তো ব্যবহার করি না। কমাতেই কাজ চলে যায়।

মুরলীধর বলল, ইংরিজিতে যেটা ফুল স্টপ, বাংলার পূর্ণচ্ছেদ। এখন সবাই দাঁড়ি বলে। প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্নও আছে। কিন্তু কমা আর সেমিকোলন আর কোলন এগুলোর বাংলা নাম হল না কেন?

চারুচন্দ্র বলল, কী জানি! দরকার হয়নি। কী ব্যাপার বলুন তো মুরলীবাবু, কাঠের কারবার ছেড়ে এখন কি সাহিত্য রচনা শুরু করেছেন না কি?

মুরলীধর লজ্জা পেয়ে বলল, কী যে বলেন! কিছুই শিখিনি। দু'লাইন চিঠি লিখতে গেলে কলম ভেঙে যায়। এমনিই নানা কথা মনে আসে। রোজ কাগজ পড়তে গিয়ে আমি আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি জানেন। খবরের কাগজে অনেক প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে, কিন্তু বিস্ময়বোধক চিহ্ন তো দেখি না! খবরের কাগজে বুঝি বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহার করতে নেই?

চারুচন্দ্র পানের পিক ফেলে হাত তুলে বলল, ওই যে আমার বাস এসে গেছে। আজ চলি, কেমন?

মুরলীধর একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে অনেক প্রশ্ন, একজন বাংলার অধ্যাপকও তার উত্তর দিতে পারল না, অন্য কেউও পারে না। মনের মধ্যে এত সব প্রশ্ন গজগজ করলে কি ভাত হজম হয়?

বাজার থেকে ফেরার পর শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করতে লাগল। আজ কাঠগোলায় না গেলে কী হয়? যমুনা তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে কপালে হাত দিল, বুকে দিল। না, জ্বর নেই। একটা দুপুর বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। যমুনা বলল, অফিসে গিয়ে তুমি তো ইজিচেয়ারেই শুয়ে থাক। সেটাও বিশ্রাম। আজ হেঁটে না গিয়ে রিকশায় যাও! তোমার ওই বংশীবাবুর ওপর থেকে একটু নজর সরালেই কী যে করবে তার ঠিক নেই! ওই ব্যবসা চলে গেলে তুমি কি আর কিছু করতে পারবে?

সত্যিই জ্বর এল না, বিকেলের দিকে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেল। কাঠগোলা থেকে বাড়ি ফেরার পর মুরলীধর বৈঠকখানায় হালকা সিগারেটের গন্ধ পেল। ঘরে অ্যাসট্রে নেই, সিগারেটের টুকরোও পড়ে নেই। জীবনে কখনও ধূমপান করেনি বলে মুরলীধরের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ, বাতাসে অনেকক্ষণ আগে ছড়ান সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধও সে পায়। কেউ এসেছিল।

ওপরে গিয়ে দেখল, টেবিলের ওপর সাজানো গোটা তিনেক ওষুধের ফাইল। সেদিকে সে নজর দিল না। আজও খবরের কাগজে দুটো কমার ভুল পেয়েছে। একটা কমার এদিকে ওদিকে একজনের নামে খুনের অভিযোগ চলে গেছে অন্য একজনের নামে।

যমুনাই বলল, আজ দুপুরে জগদীশদা এসেছিল। হাতিবাগানে কী যেন কাজ ছিল। তোমার জন্য কয়েকটা ওষুধের স্যাম্পল শিশি চেয়ে রেখেছি। তোমার শরীরটা খারাপ হচ্ছে, টনিক খেলে গায়ে জোর বাড়বে।

বেশ, বেশ। জগদীশ মাঝে মাঝে এলেই তো পারে। যমুনার সময় কাটবে। মুরলীধর আজকাল বাড়ি ফিরেই বীণাপাণির ঘর থেকে এক একখানা বই নিয়ে পড়তে বসে। খবরের কাগজে বিস্ময়চিহ্ন থাকে না, গল্পের বইতে থাকে। খবরের কাগজের লোকেদের অবাক হতে নেই?

একদিন কাঠগোলায় বসে থাকতে থাকতে মুরলীধর জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, বংশো, তুই বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনেছিস?

বংশীবদন টাকা গুনতে গুনতে বলল, হ্যাঁ শুনেছি। মানস সরোবরের অনেক ছবি তুলেছে। বাগবাজার জিমনেশিয়ামে সেই বুদ্ধ বোস ফিলিম দেখাল, আমি দেখেছি।

মুরলীধর বলল, ওই বুদ্ধ বোস না, রাইটার বুদ্ধদেব বসু। অনেক বই আছে। এই রাইটার যা কমা ব্যবহার করে না, তোকে কী বলব। এক একটা সেন্টেন্সে চারটে পাঁচটা, কখনও ছ'টাও হয়। এত কমা আর কোনও রাইটার দেয় না! যদি একটা এদিক ওদিক হয়ে যায়—

বংশীবদন বলল, দ্যাখ মুরুলি, আমরা ছাপোষা লোক, ব্যবসাটা চালু রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের কি আর ওইসব বইটই নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে? ওসব কলেজের ছেলেছোকরা আর বেকারদের জন্য। তুই খবরের কাগজে খবর পড়বি, তোর অত কমা ফুলস্টপ গোনার দরকার কী? তুই বরং এক কাজ কর, গোটা কতক বিল আছে, টাইপ করে ফ্যাল।

মুরলীধর টাইপ মেশিনে গিয়ে বসল। এ কাজ সে ভাল পারে। সাত-আটখানা বিল-ভাউচার জমে গেছে। ফিতেটা বদলানো দরকার, যা হোক আজ চলে যাবে।

বংশীবদন ক্যাশ কাউন্টার থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁরে মুরুলি, বউমাকে ডাক্তার দেখাবি না? বলিস তো, আমি ঠিক করে দিতে পারি, আমার চেনা ডাক্তার আছে।

মুরলীধর চমকে উঠে বলল, কেন? ডাক্তার দেখাতে হবে কেন?

বংশীবদন বলল, এত বছরেও খোকা-খুকু এল না, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না?

মুরলীধর লজ্জা পেয়ে বলল, না, না, সেসব ঠিক আছে। ডাক্তারের দরকার নেই।

বংশীবদন বলল, তুই কি বংশ রক্ষার কথাও ভাবিস না? কী যে আজকাল ফেশিয়ান হয়েছে। তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকে, তখনও লোকে ছেলেমেয়ে চায় না! তোর বউমাকে আমি নিজে গিয়ে একদিন বলব।

মুরলীধর মুখ নিচু করে রইল। ডাক্তার দেখাবার কথা আরও কেউ কেউ বলেছে। মুরলীধর রাজি নয়। ডাক্তার যদি বলে দেয়, যমুনার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, তা হলে কী বিচ্ছিরি হবে। কোনও স্ত্রীলোক বাঁজা, এ কথা যদি একবার রটে যায়, তা হলে সেটা তার পক্ষে বড় লজ্জার কথা। আর ডাক্তার যদি মুরলীধরকেই বলে যে সে পুরুষত্বহীন, তা হলে সে-ই বা লোকের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? তার থেকে, যেমন চলছে তাই চলুক। ভাগ্যে যদি থাকে, সন্তান একদিন আসবেই।

কত সামান্য একটা বিন্দু থেকে মানুষের জন্ম! লক্ষ লক্ষ শুক্রবীজ, কমা-ফুলস্টপের চেয়েও ছোট, তারই একটা থেকে আসে মানুষের প্রাণ, আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। বটগাছের ফল কত ছোট, তারও মধ্যে থাকে ক্ষুদে ক্ষুদে বীজ, সেই বীজ থেকে অতবড় একটা বটগাছ আবার জন্মায়। ছোট জিনিসের কী ক্ষমতা!

বিলগুলো টাইপ হয়ে যাবার পর বংশীবদন বলল, একবার দে তো দেখি।

মুরলীধর বলল, দেখতে হবে না। কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।

দেরাজের মধ্যে রাখা বিলগুলোতে তবু চোখ বুলোতে লাগল বংশীবদন। দেখতে দেখতে তার নাকের ফুটো স্ফীত হল, চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। সে বলে উঠল, এ কী করেছিস!

মুরলীধর বলল, কেন রে, কিছু ভুল হয়েছে?

বংশীবদন বলল, ভুল মানে? মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হবে টাকা 795.85, আর তুই টাইপ করেছিস 795,85! ওপরে ফুটকির বদলে তলায় কমা? এর মানে কী হয় তুই জানিস না? আর এটা? ৪189.00 হবে, তুই সেটা করেছিস ৪18,900! তুই আমাদের পথে বসাবি? কাজে একটুও মন নেই?

মুরলীধর হাসতে হাসতে বলল, এই রে, কমার উৎপাত! তোকে বলেছি না, কমাগুলো খুব ডেঞ্জারাস, কী করে উড়ে এসে জুড়ে বসে। ফুটকিগুলোকে হটিয়ে দিয়েছে। ফুটকি দিলে টাকাটা কম যাচ্ছে, আর কমা দিলে বেড়ে যাচ্ছে।

বংশীবদন এখন সত্যিকারের রেগে গেছে। গর্জন করে সে বলল, তুই হাসছিস? তোর লজ্জা করে না! ব্যবসাটার জন্য আমি খেটে খেটে মরি, তুই শুধু লেজ নাড়িস বসে বসে! শুধু বিল টাইপ করা, তাতেও এরকম ভুল? দিন রাত কমা আর সেমিকোলন আর গুষ্টির পিণ্ডি! মাথাটা খারাপ করে দিলে একেবারে! তোকে এই বলে রাখছি মুরুলি, তুই খবরদার আর কমা ফমার কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। চল আজ তোর বাড়ি যাব, বউমাকে সব বলব। নির্ঘাত তোর মাথার রোগ হয়েছে।

বংশীবদনের গজগজানি আর থামেই না। চুপসে গিয়ে মুরলীধর থুতনি ঠেকিয়ে রাখল বুকে। এবং সত্যিই ছুটির পর বংশীবদন চলে এল মুরলীধরের বাড়িতে।

দু'জনের একই বয়েস, একই কারবারের সমান অংশীদার, এমনকি দু'জনের নামের অর্থও এক। তবু জীবনযাপনের কত তফাত। বংশীবদনের পর পর তিনটি ছেলে-মেয়ে, তারা এক রকম পোশাক পরে কী সুন্দর ইস্কুলে যায়। বংশীবদন নিজের বাড়ির ছাতে একখানা ঘর তুলেছে। শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটায়। মুরলীধর এসব কিছুই পারে না।

দু'জনেই দু'জনের স্ত্রীকে বউমা বলে। যমুনা বংশীবদনকে তেমন পছন্দ না করলেও এখন তার অভিযোগের সঙ্গে গলা মেলাল। বাড়িতেও মুরলীধর কমা-সেমিকোলনের কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। অতিথি এলে বেমক্কা প্রশ্ন করে। এটা মাথার গোলমাল ছাড়া আর কী? যমুনা কতবার তাকে টনিক খেতে বলে, তবু সে খায় না।

বংশীবদন যমুনার সামনে মুরলীধরকে দিয়ে শপথ করাল, সে আর ওই সব এলোবেলো কথা একদম উচ্চারণ করতে পারবে না। ফের ওই প্রসঙ্গ তুললেই তাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন কিছুদিন বইটই পড়াও বন্ধ। কাঠগোলাতেও আর খবরের কাগজ রাখা হবে না।

মুরলীধর বাধ্য ছেলের মতন সব মেনে নিল।

দিন কাটতে লাগল আগের মতন। কাঠগোলাতে নিয়মিত যায় মুরলীধর, ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে, ঘুমোয় না; কী যে চিন্তা করে তা সে-ই জানে। বিল টাইপ করার সময় সে আর ভুল করে না।

বাড়িতে ফিরে সে মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পায়। একদিন একটা চিঠিও দেখতে পেল।

যমুনা ঘুমিয়ে আছে, মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে এল মুরলীধর। পরিষ্কার আকাশ, অসংখ্য তারা ফুটে আছে। রাত্তিরের আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে তার ভাল লাগে। যমুনা মাঝে মাঝে সিনেমা দেখার জন্য বায়না ধরে। নাইট শো-তে নিয়েও যায় মুরলীধর, এ পাড়ায় সিনেমা হলের অভাব নেই। কিন্তু সিনেমার পর্দায় মানুষজনের নড়াচড়া বেশ কিছুক্ষণ দেখলে তা চোখ ব্যথা করে। ফিরে আসার পর, পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে তার চোখ জুড়োয়।

এই আকাশ মহাকাশের যাত্রা পথ। মহাকাশের কোথায় শুরু, কোথায় শেষ কেউ জানে না। অনন্ত কাল ধরে চলেছে কালের এই যাত্রা, মাঝখানে এই গ্রহ নক্ষত্রগুলো কি কমা-সেমিকোলনের মতন যতি চিহ্ন? অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়, এক একটা ওই ক্ষুদে চিহ্ন যেন সাঁ করে সরে যাচ্ছে, জায়গা বদলাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসে মুরলীধর চিঠিটা আবার দেখল। আলমারিতে একটা লম্বা সাবানের বাক্সের নিচে লুকোনো ছিল। মুরলীধর ইচ্ছে করে দেখেনি, একটা পুরোনো ইলেকট্রিকের বিল খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ে গেছে।

চিঠিখানা সিগারেটের ধোঁয়াকেই লেখা। যমুনা লিখেছে,......অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার কাছেই আমি সব কথা বলতে পারি। মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ি আমি। একটা সন্তানের জন্য আমার লোভ আছে, ঠিকই, তুমি তা আমাকে দিতে পার তাও জানি। ও মনে আঘাত পাবে। না, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। তুমি কিন্তু আসা বন্ধ করবে না। তোমাকে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা আসতেই হবে, না হলে আমি মরে যাব—।

বার বার চিঠিখানা পড়তে লাগল মুরলীধর। একটা কথাই তার মাথায় ঘুরছে। একটা মাত্র দাঁড়ি। সেটা সরে গেলেই পরের কমাটা কত শক্তিশালী হয়ে যায়। পুরো চিঠিটার অর্থই পালটে যাবে। পূর্ণচ্ছেদের কী দরকার? জীবন গতিময়, আরও কত বাকি আছে এ জীবনের, মাঝে মাঝে কমা বা সেমিকোলনের মতন ছোটখাটো বিরতি হতে পারে। যমুনার মনে দুঃখ রেখে লাভ কী? 'ও মনে আঘাত পাবে', এর পর দাঁড়িটা তুলে দিলেই তো হয়! পরের কমাটাই আসল, 'ও মনে আঘাত পাবে না'—

চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে মুরলীধর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

রক্ত এবং অশ্রু

আকাশপথে মাত্র পঁয়তিরিশ মিনিট, বিমানটি নামল ঠিক সময়ে। ঢাকা থেকে কলকাতা। মজার কথা এই, দু'দিকের এয়ারপোর্টে চেকিং, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস ইত্যাদির জন্য সব মিলিয়ে সময় লাগে অনন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টা। এসব আধুনিক জীবনের অঙ্গ। একদিকে দ্রুত গতিশীল যানবাহন, অন্যদিকে হরেক রকম অবান্তর ফর্ম ভর্তি করা, বেড়ার পর বেড়া, সময়ের অপব্যয়।

ট্রলিতে মালপত্র চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল প্রকাশ, বিকেল সাড়ে চারটে। ঢাকাতে বৃষ্টি পড়ছিল, এখানেও টিপি টিপি বৃষ্টি। কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই, থাকার কথাও ছিল না। প্রকাশ বহুবার বিদেশ যায়, এবার সামান্য দূরত্বে বাংলাদেশ ঘুরে আসা, তাও অফিসের কাজে, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়, এয়ারপোর্টে তাকে কে নিতে আসবে?

অফিসের গাড়ি এসেছে অবশ্য। মালপত্র তোলার পর ড্রাইভার তাকে একটা চিঠি দিল। বিদিশা লিখেছে, আসবার পথে মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করে এস। ওঁর শরীরটা ভাল নেই। ভুলে যেও না কিন্তু। আমি মাকে বলে রেখেছি, উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তুমি না গেলে খুব খারাপ হবে।

পঁয়তিরিশ মিনিটের যাত্রায় জেট-ল্যাগের কোনো প্রশ্ন নেই। এর থেকে বম্বে-দিল্লি অনেক দূর, মাসে তিন-চারবার যেতে হয় প্রকাশকে। ঢাকায় এক বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে এসেছে, পাঁচ রকমের মাছ, তিন রকম মাংসের রান্না, সব একটু একটু করে চাখতে গেলেও পেট ভরে যায়। শরীরে ক্লান্তি নেই, কিন্তু এখন একটু বিছানায় গড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হত। তাছাড়া, যে-কোনো বিমানযাত্রার পর সরাসরি বাড়ি পৌঁছোতেই ইচ্ছে করে।

তা বলে কি মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া যায়?

মা থাকেন নাগেরবাজারের কাছে, পথেই পড়বে। বাবা এক টুকরো জমি কিনে রেখে গিয়েছিলেন, অনেকদিন জমিটা এমনিই পড়েছিল। এখন প্রকাশরা তিন ভাই মিলে সেখানে একটা বাড়ি বানিয়েছে। মেজ ভাইয়ের সঙ্গে মা এখন সেই বাড়িতে থাকেন। যোধপুর পার্কে প্রকাশের কোম্পানির ফ্ল্যাট বেশ বড়, মা সানন্দেই থাকতে পারতেন সেখানে। কিন্তু প্রকাশের বাড়িতে প্রায়ই নানারকম পার্টি হয়, মদ তো থাকবেই, অনেক সময় হইচই হয়, মা তাতে স্বস্তি বোধ করতেন না। সেইসব সন্ধেগুলোতে কোণের ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। অন্য দিনগুলোতেও প্রকাশ বেরিয়ে যায় সকাল নটায়, সরকারি অফিস নয়, ঠিক সাড়ে ন'টায় পৌঁছোতে হয়, ফিরতে ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা, মায়ের সঙ্গে কথাই হত না প্রায়। বিদিশা কিছু কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, কোনো দুপুরেই বাড়ি থাকে না। ওদের একটি মাত্র ছেলে খড়্গপুরে হস্টেলে থাকে। মা কথা বলার সঙ্গী পেতেন না সারাদিন। একে সানন্দে থাকা বলে না।

বরং নাগেরবাজারে নতুন বাড়িতে মা এখন বেশ খোশমেজাজে আছেন। তাঁর স্বামীর কেনা জমি, অর্থাৎ এটাই তাঁর স্বামীর ভিটে। এর আগে বহু বছর কেটেছে ভাড়া বাড়িতে, নিজস্ব ভিটে কিছু ছিল না। এ বাড়িতে থাকার আর একটা খুব বড় সাচ্ছন্দ্যের কারণ, আশেপাশের সব বাড়িগুলিই আত্মীয়-স্বজনদের। মামাতো ভাই, পিসতুতো বোন, জ্যাঠতুতো দাদা কিংবা প্রাক্তন গ্রামের লোক। সকাল-বিকেল একসঙ্গে বসে গল্প-গুজব হল। মা-ই অন্য মহিলাদের চেয়ে বয়েসে সবচেয়ে বড় বলে আপদে-বিপদে ঝগড়া-ঝাঁটিতে উপদেশ, পরামর্শ, বকুনি দিতে পারেন।

এখন ন'মাসে ছ'মাসেও মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না প্রকাশের। বিদিশাই যোগাযোগ রাখে, অন্তত দু'বার এসে মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে যায়। তাছাড়া টেলিফোনে কথা হয় প্রায় প্রতিদিনই। প্রকাশ খুব ব্যস্ত। অফিস যদি তাকে দুবাই কিংবা সিঙ্গাপুরে ট্রান্সফার করত, তাহলে কি মায়ের সঙ্গে দেখা হত? কলকাতার ব্যস্ততা বরং বেশি।

মায়ের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে গেল, তার মানে, গাড়ির শব্দের জন্য মা উৎকর্ণ হয়েছিলেন।

পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে ডানদিকের ঘরটি মায়ের শয়নকক্ষ। খাটের ওপর দু মিনিটে বালিশ উঁচু করে আধ শোওয়া হয়ে রয়েছেন মা, আর তিনটি মোড়ায় বসে আছেন তিনজন মহিলা, এক পাশে একটি খালি চেয়ার।

প্রকাশ পুরোদস্তুর স্যুট পরা, পায়ে জুতো-মোজা। জুতো পরে এ ঘরে ঢোকা ঠিক হবে কি না, এই ভেবে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, মা বললেন, জুতো খুলতে হবে না, তুই আয়, বোস।

অনেকদিন পরে পরে আসে বলে প্রকাশ প্রত্যেকবারই মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এখন, আজ যে তিনজন মহিলা বসে আছেন। এঁদেরও প্রণাম করা উচিত। এ এক ঝামেলা। প্রকাশের এখন পঞ্চাশ বছর বয়েস। যে ধরনের জীবন সে যাপন করে, তার সঙ্গে প্রণাম-টনামের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু মাকে প্রণাম করতে তার আপত্তি নেই কিন্তু অন্য বয়স্কা মহিলারা কেউ পিসি, কেউ মামি তাও দূর সম্পর্কের, এঁদেরও পায়ে হাত দিতে হবে? উপায় নেই, প্রকাশ জানে, মা ঠিক চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করবেন।

শেষ মহিলাটির দিকে ঝুঁকতেই তিনি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, থাক থাক, আমাকে না, আমাকে না তুমি পাকিস্তানে গিয়েছিলে?

এঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগ করে চলে এসেছেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক পরিবর্তন এঁদের মনে এখনো ঠিক দাগ কাটেনি। ওদিককার খোঁজ-খবরও কেউ রাখে না বিশেষ।

প্রকাশ বলল, না, পাকিস্তান তো অনেক দূরে। আমি গিয়েছিলাম কাছেই, এই বাংলাদেশে।

মা বললেন, একটু আগে একটা এরোপ্লেনের শব্দ পেলাম। তুই সেই প্লেনটাতেই এলি, তাই না?

প্রকাশ নেমেছে প্রায় দেড়ঘণ্টা আগে। তারপর নিশ্চয়ই আরো প্লেন উঠেছে নেমেছে। তবু সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ, মা?

মা বললেন, ভাল আছি। কেন, বিদিশা বুঝি কিছু বলেছে সে কিছু না, একটু জ্বর হয়েছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছি।

মা অসুখ নিয়ে আদিখ্যেতা করতে চান না। তা ছাড়া, অসুস্থ হয়েছেন বলেই ছেলে দেখতে এসেছে, না হলে আসত না, এটা তিনি অন্যদের সামনে বোঝাতে চান না।

প্রকাশকে ডাক নাকে ডাকবার মানুষ অনেক কমে গেছে। এই তিন মহিলার মধ্যে দু'জন প্রকাশকে শুধু ডাক নামে নয়, তুই তুই বলতেন-এখন প্রকাশের ভারিক্কি চেহারা ও সাজ-পোশাকের জন্য সমীহ করে তুমি সম্বোধন করছেন।

তৃতীয় মহিলাটির দিকে প্রকাশ আর একবার তাকাল। এই অমলা কাকিমাকে সে দেখছে প্রায় সাত-আট বছর পর। সে রকম কোনো আত্মীয়তা নেই, ক্ষীণ সম্পর্কের এক কাকার স্ত্রী, এঁরা নতুন বাড়ি করে উঠে গেছেন বেহালায়। নাগেরবাজারে আজ বেড়াতে এসেছেন।

প্রকাশের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। মাত্র দু'দিন আগে, বাংলাদেশের এক গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এই অমলা কাকিমার কথা সে একজনের মুখে শুনেছে বেশ কয়েকবার। তখন প্রকাশ ঠিক খেয়াল করেনি। ভেবেছিল, সে অমলা অন্য কোনো মহিলা। না তো, ইনিই। অদ্ভুত যোগাযোগ। কাকতালীয় বলা যেতে পারে।

অন্য দুইজন মামিমা। মেজ মামি আর নতুন মামি। নতুন মামি এখন রীতিমতন বৃদ্ধা। যাদের নাম তরুণ, তারাও তো এক সময় বৃদ্ধ হয়। অনেক ঝড়ঝাপটায় নতুন মামির মুখের চামড়া কিছুটা অকালেই মলিন হয়ে গেছে। সে তুলনায় মেজ মামি এখনো অনেকটা আঁটোসাঁটো। বাল্যকালে প্রকাশ এই নতুন মামির বেশ ন্যাওটা ছিল। তিলের নাড়ু খেতে দিতেন। সে যেন গত জন্মের কথা। এখন প্রকাশ তিলের নাড়ু মুখেও ছোঁয়াবে না। মিষ্টি খাওয়া তার বারণ।

মেজ মামি জিজ্ঞেস করলেন—অ কুশু, কেমন দ্যাখলা ওই দ্যাশটা? আগেকার মতনি আছে? আমাগো বাড়ি ঘরগুলান আছে না কিছু নাই?

মা তাড়াতাড়ি বললেন, ওই সব গ্রাম-ট্রামে কি ও যায় নাকি? ওর কাজ তো ঢাকায়।

প্রকাশ ভেবেছিল, মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, এক কাপ চা খেয়ে, মিনিট পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই চলে যাবে। সন্ধেবেলা একটা পার্টি আছে। বাড়ি ফিরে স্নান-টান করে, পোশাক বদলে বেরতে হবে সাতটার সময়। কিন্তু এখানে এই প্রাচীন আত্মীয়াদের সামনে তাড়াহুড়ো করা ভাল দেখায় না।

তা ছাড়া এই মহিলাদের খানিকটা চমকে দেবার ইচ্ছেটাও তাকে পেয়ে বসলে।

সে বলল, না, মা। এবার আমাকে গ্রামেও যেতে হয়েছিল। অন্যান্য বার ঢাকা আর চট্টগ্রামেই যাই শুধু। এবার যেতে হয়েছিল বরিশাল। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের একটা কোম্পানির জয়েন্ট ভেঞ্চার কারখানা হবে ঝালোকাঠিতে। সেই সাইট দেখতে গিয়েছিলাম।

তারপর অন্য মহিলাদের দিকে ফিরে বলল—বরিশাল কী করে গেলাম, শুনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। ঢাকা থেকে সোজা গাড়িতে। টানা রাস্তা।

নতুন মামিমা চোখ কপালে তুলে বললেন, সে কী? গাড়িতে? রাস্তা হইল ক্যামনে? নদীগুলা গেল কোথায়?

এই মহিলারা এখন ট্রামে-বাসে, দোকানে-বাজারে আর বাঙাল ভাষায় কথা বলে না। কলকাতার ভাষা শিখে নিয়েছেন। শুধু নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই গ্রামের ভাষা বেরিয়ে পড়ে।

বরিশাল পুরোপুরি জল ঘেরা জেলা। চতুর্দিকে নদী-নালা, খাল-বিল। নৌকা বা স্টিমার ছাড়া আসার কোনো উপায় ছিল না। নতুন মামিমার বাপের বাড়ি ছিল বরিশালে। তিনি সেই ছবিটাই ধরে রেখেছেন। তারপর কত যে পরিবর্তন হয়েছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ঢাকা থেকে কংক্রিটের মসৃণ রাস্তা। নদীগুলো উধাও হয়ে যায়নি। সব নদীই আছে। কিন্তু প্রত্যেক নদীতেই গাড়ি সমেত ফেরিতে পার হওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। প্রকাশকে এরকম ছ'খানা নদী পার হতে হয়েছিল। পদ্মা পার হতে সময় লেগেছিল পৌনে দু'ঘণ্টা, অন্য নদীগুলোতে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না।

বরিশাল সম্পর্কে কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রকাশ বার করল তার তুরুপের তাস। মায়ের দিকে ফিরে সে সহাস্যে বলল, জানো মা, ফেরার সময় এক জায়গায় চা খাওয়ার জন্য গাড়ি থামানো হয়েছিল। দেখি যে সেই জায়গাটার নাম ট্যাকের হাট।

অচলা কাকিমা ছাড়া আর তিন মহিলাই রুদ্ধশ্বাসে বললেন—ট্যাকের হাট?

মা জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনতে পারলি না? রজনী হালদারের কত বড় দোকান।

প্রকাশ বলল, আমার কি মনে আছে নাকি? তখন কত ছোট ছিলাম। রজনী হালদারের দোকান এখনো আছে কি না জানি না। তবে আরও অনেক দোকানপাট হয়েছে। বাস চলে।

নতুন মামি ম্লান গলায় বললেন। ট্যাকের হাট থেকে সুবুদ্ধিগঞ্জ মাত্র আট-নয় মাইল।

প্রকাশ বলল, আমার মনে আছে। ছোটবেলায় মনে হত, অনেক দূর। নৌকায় যেতে হত।

মেজ মামি বললেন, নৌকোয় ছাড়া যাবি ক্যামভায়?

প্রকাশ নিজে আর ফরিদপুরের ভাষা বলতে পারে না। কিন্তু শুনে বুঝতে পারে। 'ক্যামভায়' অর্থাৎ কেমন ভাবে। মেজ মামিরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এসেছিলেন পঁয়ষট্টি সালে, সেই সময়কার ছবি, তাঁদের মনে একটুও বদলায়নি।

প্রকাশ বলল, আমার সঙ্গে ঢাকার তিনজন লোক ছিল। আমি চা খেতে খেতে তাদের বললাম, এই দিকেই সুবুদ্ধিগঞ্জ নামে একটা গ্রাম আছে না? সেখানে আমার মামার বাড়ি ছিল। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় আসতাম। তা শুনে আনিজ নামে একজন বললে, হ্যাঁ, সুবুদ্ধিগঞ্জ বেশ বড় গ্রাম। যাননা, দেখে আসুন না, ওখানে এখনো কিছু কিছু হিন্দু আছে।

মা বললেন, গেলি? তুই গেলি?

প্রকাশ বলল, যাওয়া খুব সহজ, দুটো নদীর ওপর ব্রিজ হয়ে গেছে, গাড়িতেই যাওয়া যায়। বেশিক্ষণ লাগে না। আগে নৌকোয় অনেক ঘুর পথে যেতে হত। আমাদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল, অন্যরা দ্বিতীয় গাড়িটায় ঢাকায় ফিরে গেল, আমার সঙ্গে বীরেন সরকার নামে একজন হিন্দু ভদ্রলোককে দেওয়া হল। ওই দিকেই আর একটা গ্রামে বীরেন সরকারের শ্বশুরবাড়ি।

নতুন মামি গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, সুবুদ্ধিগঞ্জে ফিরে যাওয়া যায়? সত্যি নাকি?

এ যেন গতজন্মে ফিরে যাওয়ার মতন এক অসম্ভব প্রস্তাব।

মা বললেন, আমাদের বাড়িটা তো আর নেই, তাই না?

প্রকাশ বলল, শোন না। অনেকক্ষণ তো মামার বাড়ি খুঁজেই পাইনি। লোককে জিজ্ঞেস করি, রায় বাড়ি কেউ বলতে পারে না। মেজ মামিমা, আপনাদের তো চ্যাটার্জি বাড়ি ছিল? তাও কেউ চেনে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে, ওইসব নাম আর কে মনে রাখবে? তখন আমি ড্রাইভারকে বললাম, ইস্কুলটা খুঁজে বার কর। ইস্কুলটার কথা আমার বেশ মনে আছে। অন্যান্য গ্রামের তুলনায় সুবুদ্ধিগঞ্জের ইস্কুল বেশ বড়। সামনে খেলার মাঠ, পেছন দিকে মস্ত একটা দিঘি। লাল সিমেন্টের ঘাট বাঁধানো।

মা বললেন, আমার ঠাকুরদার ওই ইস্কুল করে দিয়েছিলেন। আমাদেরই এক পূর্ব-পুরুষের নামে গ্রামের নাম। সুবুদ্ধিনারায়ণ রায়। তাঁর প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

প্রকাশ বলল, ইস্কুলটা দেখেই চিনতে পারলাম। তখনই মনে পড়ল, দিঘিটার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতাম ইস্কুলে। আসার পথে চৌধুরীদের একটা বড় বাড়ি ছিল। লোহার গেটওয়ালা বাড়ি। সেই বাড়ির সামনে দিয়ে আসতে রোজ ভয় ভয় করত। সে বাড়িতে একটা মস্ত বড় কুকুর ছিল। আমরা বলতাম ডালকুত্তা। তার মেঘের ডাকের মতন ঘাউ ঘাউ শুনলে বুক কাঁপত।

মেজ মামি বললেন, হ্যাঁ, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের বাড়ি। ওই গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ি। সেখানে কেউ আছে এখনো?

প্রকাশ বলল, ভুতুড়ে বাড়ির মতন পড়ে আছে, অতবড় বাড়ি ওঁরা এক্সচেঞ্জ করেননি কেন, কে জানে। দরজা-জানলা সব চোরেরা খুলে নিয়ে গেছে। লোহার গেট নেই, বাগান ভর্তি আগাছা, তবু বাড়িটা দেখলে চেনা যায়।

মেজ মামি বললেন, সব বাড়িগুলারই ওই দশা?

প্রকাশ বলল, হিন্দুদের কিছু কিছু বাড়ি এদিককার মুসলমানদের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করা হয়েছে, সেগুলোতে লোক থাকে। অনেকটা আগের মতনই। কিছু বাড়ি জবরদখল হয়েছে শুনলাম। ছোট ছোট বাড়িগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে। সেই জমি যে পারে সে নিয়ে নিয়েছে, ফাঁকা জমি কি পড়ে থাকে? পশ্চিমবাংলা থেকেও অনেক মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সেগুলো কি আর ফাঁকা পড়ে আছে?

মেজ মামি বললেন, এদিকে ওরা বিক্রি করতে পেরেছে, ওদিকে বিক্রি করতে দেয়নি!

নতুন মামি কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্ষোভের কারণ তাঁরই বেশি। তাঁদের বাড়িটা বিশেষ বড় ছিল না। কিন্তু ফুলের বাগান, পুকুর সমেত সম্পত্তি ছিল অনেকখানি। সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে, কিছুই পাননি। পশ্চিমবাংলায় আসার পর বেশ কিছু বছর তাদের দিন কেটেছে চরম দারিদ্র্যে, এক মেয়ের সারাজীবন বিয়েই হল না। এখন অবশ্য ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, শেষপর্যন্ত আমাদের বাড়ি খুঁজে পেলি?

প্রকাশ বলল, হ্যাঁ পেলাম কিন্তু সে বাড়িকে আর কেউ রায় বাড়ি বলে না। ওটা মুস্তাফা সাহেবের বাড়ি। বড়মামা ওই বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে বর্ধমানের গ্রামের একটি বাড়ি পেয়েছিলেন না? এখন সেখানে মুস্তাফা সাহেবের পরিবার থাকে। দোতলা বাড়িটা প্রায় এক রকম দেখতে আছে। শুধু তিনতলায় একটা ঘর উঠেছে। পাশের শিবমন্দিরটা ভেঙে ফেলেনি, তবে প্রকৃতিই সেটাকে আর কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। বড় বড় অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে মন্দিরের দেওয়াল ফাটিয়ে ফেলেছে। মাথাটা হেলে গেছে খানিকটা। দরজা নেই, ভেতরে মনে হয় মা মনসার চ্যালাদের বাসা। মন্দিরের চাতালে ঘুঁটে শুকোচ্ছে দেখলাম।

—রোজ সকালে ওই মন্দিরে আমরা তিন বোন পুজো দিতে যেতাম। শিউলি গাছ দুটো নেই?

—চোখে পড়ল না। একটা বড় বেল গাছ আছে।

—তখনো ছিল।

—আর একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ ছিল, সেটা নষ্ট হয়নি। তুলসী গাছ এখনো আছে। ও বাড়ির কেউ রোজ সেখানে প্রদীপ জ্বালে।

—মুসলমানরাও তুলসীমঞ্চ মানে।

—হয়তো ভাবে তুলসীমঞ্চ ভাঙলে অমঙ্গল হয়। এটা একটা বাঙালি সংস্কার।

—তোকে বাড়ির মধ্যে যেতে দিল?

—দেবে না কেন? এটা আমার মামার বাড়ি ছিল শুনে মুস্তাফা সাহেব খাতির করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। বললেন একরাত থেকে যেতে। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জোর করে অনেক মিষ্টি খাওয়ালেন। সবচেয়ে ভাল লাগল কী দেখে জান তো মা। তোমাদের বাড়ির পাশে যে বিশাল দিঘি, যার নাম ছিল কমল দিঘি, সেটা এখনো একই রকম আছে। সেই বিশাল ঘাট, যেখানে কুড়ি-পঁচিশজন লোক বসে গল্প করতে পারে, সেই ঘাটের পৈঠায় বসে রইলাম বেশ খানিকক্ষণ। অনেক পদ্মফুল ফুটে আছে। ওই দিঘিতেই তো আমি সাঁতার শিখেছিলাম, তাই না?

মা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। এই দিঘিরই অন্য পাড়ে ছিল মেজ মামি আর নতুন মামিদের বাড়ি। আমার মা কুমারী অবস্থায় ওই দিঘিতে সাঁতার দিয়েছেন। মেজ মামি আর নতুন মামি পনেরো-ষোলো বছর বয়েসে নববধূ হয়ে গিয়েছিলেন ওই গ্রামে, তাঁরাও স্নান করেছেন ওই দিঘিতে। হয়তো এই তিন রমণী স্নানের আগে ঘাটটায় বসে অনেক গল্প করতেন। স্মৃতিমেদুর হয়ে গেল তাঁদের মুখ।

শুধু অমলা কাকিমার সেরকম প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি সুবুদ্ধিগঞ্জে কখনো যাননি। ওই গ্রামেরই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু তা কলকাতায় আসবার পর।

একটু পরে মা জিজ্ঞেস করলেন, রফিকুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হল?

প্রকাশ বলল, না তিনি মারা গেছেন অনেকদিন আগে। তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে বিদেশে চলে গেছে। তাঁর বাড়িতেও বিশেষ কেউ নেই।

মা বললেন, আহা, মানুষটা বড় ভাল ছিলেন।

এই রফিকুল সাহেবের কাহিনী আমি অনেকবার শুনেছি। পঁয়ষট্টি সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় গ্রাম-গঞ্জে মুসলিম লিগের দৌরাত্ম্য খুব বেড়েছিল। সে দলের ছেলেরা থানা-পুলিশ কিছুই গ্রাহ্য করত না। তাদের উৎপাতে অনেক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিল। নতুন মামিদের বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল, কারণ ও বাড়িতে ছিল দুটি কুমারী মেয়ে। একবার মেয়ে দুটিকে লুট করবার চেষ্টাও হয়েছিল। নতুন মামিরা তাই একদিন ভোরবেলা চুপি চুপি সবাই পালালেন। ঘরে ঘরে মশারি টাঙানো, রান্নাঘরে উনোন জ্বলছে, বাইরে কয়েকখানা শাড়ি ঝুলছে,

যেন সবাই মনে করে সবাই বাড়িতেই আছে। হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করলে কেউ বাধা দিত না, তবু ওই রকম গোপনীয়তার কারণ এই যে পালাবার খবর জানতে পারলে রাস্তায় হামলা করে গয়নাগাঁটি, টাকা-পয়সাও কেড়ে নিত, অল্পবয়েসি মেয়েরাও নিস্তার পেত না। ওই গ্রামের রফিকুল ইসলাম ছিলেন সৎ, উদার হৃদয় মানুষ। হিন্দুরা দেশ ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দুঃখ পেতেন, অসহায় অবস্থার কথাও বুঝতেন। তিনি নিজে নৌকো এনে নতুন মামিমার পরিবারের সবাইকে নিরাপদে মাদারিপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়েছিলেন।

নতুন মামিমাদের বাড়িটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা আর প্রকাশ বলল না। সে বরং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়াও, তোমাদের একটা জিনিস দিচ্ছি।

বীরেন সরকার জোর করে দু'খানা পাটালি গুড় দিয়েছিলেন। সুবুদ্ধিগঞ্জের গুড় নাকি বিখ্যাত। প্রকাশ গাড়ি থেকে একটা গুড় এনে বলল, এই দ্যাখ, তোমাদের গ্রামের জিনিস। একটু করে খেয়ে দেখ।

কেউই সেই গুড় খাবার জন্য ব্যগ্র হল না। শুধু গন্ধ শুঁকে দেখল।

নতুন মামিমা বলল, আমাগো একুইশটা খাজুর গাছ আছিল। কত রস হইত। পোলাপানরা গাছে উইঠ্যা চুরি কইরা রস খাইত!

মেজমামি বলল, আমি তো আর গুড়ই খাই না। এইখানকার গুড় আমার মুখেই রোচে না।

মেজ ভাই বা তার স্ত্রী বাড়িতে নেই, কাজের মেয়েটি এর মধ্যে লুচি আর বেগুন ভাজা করে ফেলেছে। এসব এখন প্রকাশকে খেতে হবে। পেট ভর্তি, তবু না বলার উপায় নেই। মা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অনেকদিন পর ছেলে দেখা করতে আসছে, মা তাকে কিছু খেতে দেবেন না, তা কি হয়? প্রকাশের পেটের মধ্যে যে এখনো বাংলাদেশের চিংড়ি, কই, চিতল মাছের পেটি, পাঙাস মাছের পেটি হজম হয়নি, সে কথা মাকে বোঝানো যাবে না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে অমলা কাকিমার মুখের দিকে কয়েকবার চকিতে তাকাল। তার মনে পড়ল বীরেন সরকারের কথা।

বীরেন সরকার একজন মধ্যবয়স্ক, মাঝারি ধরনের অফিসার শ্রেণীর মানুষ, প্যান্ট-শার্ট পরা। মাথায় অল্প টাক, এমনি কথাবার্তা শুনে বোঝা যাবে না এর জীবনকাহিনীটি সাঙ্ঘাতিক রোমাঞ্চকর। সুবুদ্ধিগঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে বীরেন সরকার শুনিয়েছিল সেই গল্প।

একসময় গায়ের জামাটা তুলে বীরেন সরকার বলল, এই যে দেখুন পাকিস্তানের মিলিটারি আমাকে গুলি করেছিল। তবু বেঁচে গেছি। এখনো এক এক সময় বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি বেঁচে আছি।

বীরেনের বুকের ডান পাশে একটা গাবলা মতন বেশ বড় গর্ত। একজন হাতুড়ে ডাক্তার অপারেশন করে গুলিটা বার করে দিয়েছিল, তবু ওই রকম গর্ত হয়ে আছে।

একাত্তর সালের সাতাশে মার্চের ঘটনা। বীরেন তখন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বটে কিন্তু তার প্রধান ভূমিকা ছিল গায়কের। মিছিলে সে গান নেতৃত্ব দিত।

পঁচিশে মার্চের গণহত্যা শুরুর কারণটাই প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি আরও অনেকের মতন। শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলাপ-আলোচনা চলছে, এর মধ্যে সামরিক বাহিনী হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করবে কেন? পরিস্থিতির গুরুত্ব তখনো বীরেনদের মগজে ঢোকেনি। কিছু বোঝবার আগেই তার ছোট ভাই মারা গেল। মিছিল থেকে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে সে দেখল তার বাবা কনিষ্ঠ সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে আছেন। একটু আগে বাড়ির সামনেই পাক বাহিনী ছোট ভাইটিকে গুলি করে ফেলে রেখে গেছে। সেই অবস্থায় বাবা-মায়ের কোনো দায়িত্ব নেওয়াও সম্ভব হল না তার পক্ষে। বাবা-মাই কাঁদতে কাঁদতে জোর করে বীরেনকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বললেন।

বীরেনের মতন আরও কিছু যুবক গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল একটা গির্জায়। সেখান থেকেও নিষ্কৃতি পেল না। পাকিস্তানি সৈন্যরা গির্জার মধ্যে ঢুকে ধরে নিয়ে গেল সবাইকে।

শুধু যে হিন্দুদেরই ধরছে মারছে তা নয়। যুবকদের দেখলেই ধরে আনছে। বিশেষত আওয়ামি লিগের কর্মীদের। যতীনদের সমবয়েসি বাইশ জনকে টেনে হিঁচড়ে এনে ফেলে রাখা হল জগন্নাথ হলের একটা ঘরে। সে ঘরের দেওয়ালে তখনো রক্তের ছিটে লেগে আছে। এদের মধ্যে ছিল যতীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদ। ফরহাদও ভাল গান গায়, গানের টিউশানি করে; দারুণ প্রাণবন্ত যুবক। বাইরে তখন কী ঘটছে জানে না। ফরহাদের ধারণা, শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর একটা কিছু সমঝোতা হবেই, তখন তারা ছাড়া পেয়ে যাবে। একজন কর্নেল এসে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলে যায়, প্রত্যেককে জেরা করে, তার ব্যবহার কর্কশ নয়, সে শুধু প্রত্যেকের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চায়। ফরহাদের পরামর্শে যতীন নিজের নাম লিখেছিল ফজলুর রহমান। সে রসুলের নাম বলতে পারে, নামাজ পড়তে পারে, সেদিকে কোনো খুঁত ছিল না। তাদের কিছু খাবার দেওয়া হত না বটে, কোনো শারীরিক অত্যাচারও হয়নি।

দু'দিন পর ভোরবেলা সবাইকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল সামনের মাঠে। সার বেঁধে তাদের দাঁড় করিয়ে দেবার পর দেখা গেল রাইফেল হাতে নিয়ে মার্চ করে আসছে কয়েকজন পাক-সৈন্য। চোখের সামনে মৃত্যু দেখলেও বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, এখনো কোনো অলৌকিক ঘটনায় সব কিছু বদলে যাবে। সৈন্যরা অন্য সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই কয়েকজন নিরীহ যুবক, যারা কোনোদিনও বোমা-বন্দুক ছোঁড়েনি, তাদের শুধু শুধু মেরে ফেলবে?

সেই মিষ্টভাষী কর্নেলটিই সৈন্যদের রাইফেল তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিচ্ছে। এখনো মনে হচ্ছে, সবটাই তামাশা, নিছক ভয় দেখবার জন্যই এই আয়োজন।

রাইফেলধারী মাত্র তিনজন, তারা সত্যিই গুলি চালাল, তিনটি লাশ পড়ে গেল মাটিতে। এইভাবে তিনজন তিনজন করে মারবে? বীরেন আর ফরহাদ দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি, চোদ্দ পনেরো জনের পরে। তাদের মৃত্যুর আর কয়েক মিনিট বাকি। ফরহাদ নিজের বুকে হাত বুলিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বীরেন কাঁদতেও ভুলে গেছে। সত্যিই মরে যেতে হবে?

ফরহাদ বীরেনের হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল, ভাই—তুই যদি বাঁচিস আমার জন্য একটা কাজ তোকে করতে হবে।

সবটা না শুনেই বীরেন বলল, আর তুমি যদি বাঁচিস, আমার বাবা-মাকে দেখবি কথা দে? বুড়ো-বুড়ির আর কেউ নেই, আমার ভাইটাও নেই ।

ফরহাদ বলল, আমি বাঁচলে তোর বাবা-মাকে নিজের জান দিয়েও বাঁচাব। আর তুই, তুই যদি বেঁচে যাস, তাহলে অমলাকে একটা কথা বলাবি? তোদের পাশের বাড়ি থাকে অমলা, তাকে গান শিখিয়েছি। ভাই বীরেন, আমি অমলাকে ভালবাসি। তার সঙ্গে আমার বিয়ের সব কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতেও রাজি ছিল। কথার খেলাপ হয়ে গেল। অমলা যদি আমার খবর না পায়, ভাববে, আমি বেইমান, আমি পালিয়ে গেছি। বলিস, অমলাকে ছাড়া জীবনে আর কারুকে ভালবাসিনি। মরার আগে শুধু তার কথা—অমলা, অমলা।

অন্যরা অনেকে চেঁচিয়ে কাঁদছে, ওদের কথা আর কেউ শুনতে পেল না। গুলি লাগল দু'জনের বুকে। ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এর মধ্যেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছিল, কাজ শেষ করে পাক-সৈন্যরা চলে গেল। সব মৃতদেহগুলো পড়ে রইল সেখানে, কেউ কেউ সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে কিছুক্ষণ গুঙিয়ে গুঙিয়ে তারপর মরল। বৃষ্টি হল সারাদিন।

সন্ধের সময় বীরেনের জ্ঞান ফিরে এল। বুকের ডান দিকে অসহ্য ব্যথা, কিন্তু সে ব্যথাই প্রমাণ করে দিল সে মরেনি। গুলি তার বুক ফুঁড়ে গেছে তবু তার প্রাণ আছে। তার গায়ের ওপরই পড়ে আছে ফরহাদ, তার শরীর একেবারে শক্ত, ঠাণ্ডা।

কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই। বন্ধুর মৃতদেহটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বীরেন উঠে দাঁড়িয়েছিল। বুকের মধ্যে বুলেটটা ঢুকে আছে, সেই জায়গাটা চেপে ধরে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে বীরেন। এখন চাকরি করছে সংসারী মানুষ। কাহিনীটা শোনাবার পর সে বলেছিল, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদের শেষ অনুরোধটা আমি রাখতে পারিনি। অমলা ছিল আমাদের পাশের বাড়ির ভট্টাচার্যিদের মেয়ে। তাকে চিনতাম। বেঁচে ওঠার পর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম ইণ্ডিয়ার ত্রিপুরায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকায় ফিরে এসে আর সেই ভট্টাচার্যিদের দেখতে পাইনি। তাদের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শুনেছি, অমলা আর তার দুই কাকা পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। অতবড় শহর কলকাতা, সেখানে অমলাকে কোথায় খুঁজব? কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজন সেরকম নেই। আমার বিশেষ যাওয়া হয় না। তবু মাঝে মাঝে অপরাধবোধ হয়। অমলাকে ফরহাদের শেষ কথাটা জানান হল না, ফরহাদ পালিয়ে যায়নি। অমলার নাম বলতে বলতে সে প্রাণ দিয়েছে।

মা

জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল দীপ। সকাল থেকেই ঝুরঝুর বরফ পড়ছে। বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারেই পার্ক। ওয়াশিংটন স্কোয়ার। এর মধ্যেই পার্কটা প্রায় সাদা হয়ে এসেছে তুষারে।

শুরু হল সুদীর্ঘ শীতকাল। কঠিন শীতকাল। সব সময়ে এক গাদা পোশাকে জবরজং হয়ে থাকতে হবে।

এই সোমবারটাও ছুটি ছিল। শুক্রবার বিকেল থেকে সোমবার রাত্তির পর্যন্ত টানা ছুটি, ভাবাই যায় না। লং উইক-এণ্ড। যেন এক অত্যাশ্চর্য উপহার।

কিন্তু সোমবার বিকেল হতেই মনে হয়, ছুটি ফুরিয়ে এল। কাল থেকে আবার কাজ। কাজ আর কাজ। ধরাবাঁধা রুটিন। ভাবলেই জ্বর আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে খানিকটা দেখল দীপ। তারপর জানলার কাচের একটা পাল্লা খুলে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল তার বুকে। সে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল পেঁজা তুলোর মতন তুষারের স্পর্শ অনুভব করার জন্য। প্রত্যেক বছরই প্রথম তুষারপাতের দিনটায় খানিকটা উত্তেজনা আসে। দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল, তবু এখনো এই দিনটাকে একটা বিশেষ দিন বলে মনে হয়। এখন মোটে সাড়ে চারটে, হিসেব অনুযায়ী বিকেল, কিন্তু এর মধ্যেই আলো কমে এসেছে খুব। শীতকালের বিকেলটা টেরই পাওয়া যায় না। দুপুরের পরেই সন্ধে।

কাপের চা পুরো শেষ হয়নি। দীপের হঠাৎ ইচ্ছে হল সব সুদ্ধু রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে। সে প্রায় ছোঁড়ার মতন করে তুলে ধরে কেঁপে উঠল।

এ কী করছে সে?

তার অ্যাপার্টমেন্ট সাততলায়। এখান থেকে রাস্তায় একটা কাপ ছুঁড়ে ফেলার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। ব্রুকলিনের একটা ব্যস্ত রাস্তা। এদেশের রাস্তা দিয়ে লোকজন প্রায় হাঁটেই না। সবাই গাড়িতেই যায়। কিন্তু কাছেই কিছু দোকান-পাট রয়েছে, কেউ কেউ খানিক দূরে গাড়ি পার্ক করে এখানে হেঁটে আসে, দীপ দেখতে পাচ্ছে ছাতা-মাথায় কিংবা রেন-কোট গায়ে কয়েকজন যাওয়া-আসা করছে।

তবু দীপের অদম্য ইচ্ছে হতে লাগল কাপটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলার।

দীপ যেন নিজের ওপর প্রবল জোর খাটিয়ে সরে এল সেখান থেকে। কাপটা রাখল রান্নাঘরের টেবিলে। একটা সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে!

বাথরুমের দরজাটার পেছনে একটা মানুষ-সমান আয়না লাগান। আগে থেকেই ছিল। এই অ্যাপার্টমেন্টটা দীপ কিনেছে দেড়বছর। আগে এখানে থাকত দুবার বিয়ে ভাঙা এক ইটালিয়ান মহিলা। দীপের বন্ধু বাল্লু বলেছিল, তুই ওই অ্যাপার্টমেন্টটা যার কাছ থেকে কিনেছিস। সে মেয়েটার তো মাফিয়া-কানেকশন আছে শুনেছি। সে বেচল কেন, কোনো গোলমাল নেই তো? সে যাই হোক, মহিলাটি এই আয়নাটা লাগিয়েছিল। স্নান করার সময় সে কি নিজের সর্বাঙ্গ দেখতে ভালবাসতো? কিংবা অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল?

সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীপ জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার তোমার? হঠাৎ কাপটা রাস্তায় ছোঁড়ার ইচ্ছে হল কেন?

আয়নার ভেতরের দীপ একটু হাসল।

তারপর বাঁকা সুরে বলল, আজকাল প্রায়ই তো দেখছি, তোমার এরকম এক-একটা উদ্ভট ইচ্ছে হচ্ছে। পরশুদিন কী করেছিলে? পরশু মানে গত শনিবার। দীপ তার পাড়ার সুপার মার্কেট থেকে সপ্তাহের বাজার করতে গিয়েছিল।

ট্রলিটা নিয়ে ঘুরছে। এক প্যাকেট মাখন তুলতে গিয়ে আর একটা মাখনের প্যাকেট পড়ে গেল মাটিতে। কোনো কিছু চিন্তা না করেই দীপ সেই প্যাকেটটা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। চেপে পিষে দিল প্রায়। তারপর ঠেলে দিল র‍্যাকের নিচে।

সে তো চুরি করেনি। একটা মাখনের প্যাকেটের ওপর পা পড়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। কেউ দেখতে পেলেও কিছু বলত না। কিন্তু ইচ্ছে করে সে কেন একটা প্যাকেট মাখন নষ্ট করল? কোনো যুক্তি নেই এর।

আয়নার ভেতরের দীপ বলল, আরও বলব?

খোলা জানলাটা দিয়ে হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে এখন। ঘরের হিটিং চালু আছে, তার মধ্যে এই হাওয়া ঢুকে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে। বাথরুমের দরজাটা না বন্ধ করে দীপ দৌড়ে গেল জানলার কাছে।

সেটা তক্ষুনি বন্ধ করে দীপ মাথা বাড়িয়ে দেখল।

কাপটা ছুঁড়লে রাস্তা পর্যন্ত পড়ত না। তাদের বিল্ডিং-এর সামনের দিকে একটা চত্বর রয়েছে। এক চিলতে বাগান। ওখানেই পড়ত এমন কি ক্ষতি হত তাতে? ওখানে তো সে মাঝে মাঝে বিয়ার-ক্যান পড়ে থাকতে দেখে। সিগারেটের প্যাকেট, পেপার গ্লাস। বাইরে জিনিস ফেলা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদেশে এদের পরিষ্কার-বাতিক আছে বটে, আবার কেউ কেউ ইচ্ছে করে নোংরাও করে। গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তায় বোতল ছুঁড়ে দেয়।

নিচে কেউ নেই। এখন কাপটা ছুঁড়ে ফেললে মন্দ হয় না, কেউ দেখবে না। তাহলে ফেলাই যাক না।

দীপ আবার কাপটা আনবার জন্য ফিরেও থমকে গেল। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? আস্ত একটা কাপ, চারখানার সেটের মধ্যে একটা, এটা শুধু সে ভাঙবে কেন? এই চিন্তাটা আসছে কোথা থেকে?

লম্বা উইক-এন্ডের ছুটিতে অনেকেই বাইরে যায়। বীরেনদা-সুরূপাবৌদিরা গেল ওয়াশিংটন ডি. সি.। দীপকেও সঙ্গে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিল। চয়ন আর বাল্লু গেল হারভার্ড, ওদের গাড়িতে জায়গা ছিল। জুডিও গেল কানেটিকাট, ওর দিদির কাছে। দীপকে নিয়ে যাবার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সবাইকে সে বলেছিল, এই ছুটিতে সে তার ঘরগুলোর ওয়াল পেপার পাল্টাবে।

কিছুই করেনি দীপ। শুক্রবার সন্ধে থেকে স্রেফ শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিল ছুটিটা। কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। এদেশে এমন একাকিত্ব অতি মারাত্মক।

কাল থেকে অফিস। আজ সন্ধের মধ্যে সবাই ফিরবে। আজ রাত্তিরে কেউ আর আড্ডা দেবে না। তবু দীপ একটু পরেই ফোন করল বাল্লুকে। পেয়েও গেল। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, বাল্লু, আমার আজ রাত্তিরে রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, তোর ওখানে গেলে খেতে দিবি? কিংবা, ডাউন টাউনে আমার সঙ্গে খেতে যাবি কোথাও?

বাল্লু বলল, আমার এখানেই চলে আয়! দীপ এইরকম একা থাকে বলে সবাই অবাক। অত ভাল একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে কেন তবে? বিয়ে করবার ইচ্ছে যদি তার নাও থাকে, একজন সঙ্গিনী তো পেতেই পারে। জুডি নামের মেয়েটির সঙ্গে দীপ স্টেডি যাচ্ছে অনেকদিন। জুডির ভারি মিষ্টি স্বভাব। অন্য সবাই পছন্দ করে তাকে।

দীপ বিয়ের কথা একেবারেই ভাবে না।

জুডিকে সে পছন্দ করে খুবই, জুডির ব্যবহারে কোনো মালিন্য নেই, জুডি তার মন বোঝে। শারীরিক সম্পর্কও বেশ পরিষ্কার। কিন্তু জুডির সঙ্গে লিভ টুগেদার করার ইচ্ছে নেই দীপের। জুডির মনে মনে ইচ্ছে আছে তা সে বোঝে, কিন্তু জুডি মুখ ফুটে কথাটা বলেনি। জুডিকে অন্য একটি মেয়ের রুম শেয়ার করে থাকতে হয় কুইন্‌সে, দীপ একবার বললেই সে চলে আসবে।

কিন্তু দীপ সর্বক্ষণ জুডিকে চায় না।

জুডি তার এখানে এসে একসঙ্গে থাকলে অন্য বাঙালিরা বা তার বন্ধুরা কী বলবে, তা গ্রাহ্য করে না দীপ। যেদিন ইচ্ছে করবে, সেদিনই সে জুডিকে ডাকবে। কিন্তু এখনো তার একা থাকতে ভাল লাগে মাঝে মাঝে।

পরদিন সকালবেলা পুরো সাজপোশাক করে অফিসে বেরুতে গিয়ে দীপ একবার ভাবল, গাড়ি নেবে, না সাবওয়েতে যাবে? বরফের মধ্যে গাড়ি চালান এক ঝকমারি। দীপের বাড়ির কাছেই স্টেশন, তিন মিনিটে হেঁটে যাওয়া যায়।

তারপর মনে পড়ল, জুডি গাড়ি আনে না, ওদের অফিসের কাছে পার্কিং-এর কোনো জায়গাই পাওয়া যায় না। তিনদিন পর দেখা হবে, আজ জুডিকে নিয়ে কোথাও খেতে যাওয়া এবং তারপর তার নিজের বাড়িতে ওকে কিছুক্ষণের জন্য আনা কিংবা জুডিকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া তার উচিত।

গাড়ির চাবিটা সে নিয়ে নিল।

আজই ব্রুকলিনে ব্রিজের ওপর সাঙ্ঘাতিক জ্যাম।

এখান থেকে নিউইয়র্ক শহরটা অপূর্ব দেখায়, এতবার দেখে দেখেও দীপ মুগ্ধতা হারায়নি, কিন্তু আজ তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, কেন সে গাড়িটা আনতে গেল?

রেডিওটা খুলে সে ট্রাফিক পোজিশান জানার চেষ্টা করল।

বিশ্রী খবর, সামনের তিন-চার জায়গায় গাড়ির জটলা। কখন ঠিক হবে, তার কোনো ঠিক নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছটফট করতে লাগল দীপ। অফিসের দেরি হয়ে যাবে, এটা সে সহ্য করতে পারবে না। অথচ ট্রাফিক জ্যাম কি নতুন কিছু? অফিসের লোকেরাও জেনে যাবে ব্রুকলিন ব্রিজের অবস্থা।

দীপের ইচ্ছে হল, গাড়ির দরজা খুলে নেমে চাবিটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। তার পর সে হেঁটে চলে যাবে। গাড়িটা থাক এখানে পড়ে। পেছনের লোকগুলো চেঁচামেচি করুক। পুলিশ এসে গাড়িটা টো করে নিয়ে যাক, যত ইচ্ছে ফাইন হোক, যা খুশি হোক, তবু দীপ কিছুতেই এখানে বসে থাকতে পারবে না।

গাড়ি থেকে নেমে দীপ আবার ধাতস্থ হল। এটাও পাগলামির লক্ষণ। এভাবে গাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা চলে না।

দীপ অফিসে পৌছল ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে।

বিভিন্ন সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে সে হাই ল্যারি, হাই বার্ট, হাই লিন্ডা এইসব বলতে বলতে এগোল। তার দেরি বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। সে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এসেছে। ছুটির পর আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে যাবে, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

নিজের ঘরে ঢুকে দীপ তার ওভারকোট, জ্যাকেট এমনকি সোয়েটার পর্যন্ত খুলে ফেলল। ভেতরটা বেশ গরম, এক বলবে যে বাইরের তাপমাত্রা এখানে শূন্যের নিচে সাত ডিগ্রি। হঠাৎ শীত এসেছে। অথচ শীতকালেই অফিসের মধ্যে দীপের বেশি গরম লাগে। কাজে ডুবে রইল তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে দু'বার বসের ঘরে যেতে হল, টেলিফোন ধরল এগারোবার, দু'কাপ কফি খেল, দু'জন সহকর্মী ও একজন সহকামিনী গল্প শোনাল উইক-এন্ডের ছুটিতে কী কী মজা হয়েছে। দীপ কী ভাবে ছুটি কাটিয়েছে তা অন্যরা জানতে চাইলে সে অম্লান বদনে বলল তিনখানা ঘরের ওয়ালপেপার বদল করেছি, খুব খাটুনি গেছে।

এর পর সামান্য একটা ঘটনা ঘটল।

টেবল থেকে একটা পেপার ওয়েট পড়ে গেল নিচে। সেটা তোলার বদলে দীপ প্রায় যেন নিজের অজান্তেই সেটাকে এটা শট লাগাল। খুব জোরে। এত জোরে যে ফাইবার গ্লাসের পার্টিশানে সেটা লেগে বোমা ফাটার মতন দড়াম করে একটা শব্দ হল। পাশের ঘর থেকে তার সহকর্মী ল্যারি উঠে এসে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল, হোয়াট হ্যাপন্‌ড?

দীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, নাথিং।

ল্যারিও বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল।

পেপার ওয়েটটার দিকে তাকিয়ে দীপ দাঁতে দাঁত চেপে খুব খারাপ একটা গালাগালি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, এনাফ ইজ এনাফ। ঠিক পরের মুহূর্তেই তার ঘরে এল বার্ট আর লিন্ডা।

বার্ট দীপেরই সমবয়সি, লিন্ডা বছর দু-একের ছোট। কিন্তু পদমর্যাদায় লিন্ডা একটু ওপরে। লিন্ডা বিয়ে করেনি, তার মন-প্রাণ সব কিছু সে অফিসের কাজে ঢেলে দেয়।

তেমন লম্বা নয় লিন্ডা, একটু ভারি দিকে গড়ন, কিন্তু মুখে একটা শ্রী আছে। সে কেন বিয়ে করেনি, সেটা একটা রহস্য, তার কোনো বয় ফ্রেন্ডও নেই। লিন্ডার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, কখনো সেরকম প্রসঙ্গ উঠলেই সে এড়িয়ে যায়। বার্ট বেশ খোলামেলা, হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। শুধু যে দীপের সহকর্মী নয়, তার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুর মতন। বার্ট বিবাহিত, লিন্ডার সঙ্গে তার হৃদয়-ঘটিত কোনো গোলযোগ নেই।

লিন্ডা বসলো একটা চেয়ার টেনে, বার্ট বসলো টেবিলের এক কোণে। দীপের সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলল, আবার তুমি সিগারেট খাচ্ছো? বলেছিলে যে অফিসে একটাও খাবে না?

দীপ ক্লিষ্ট ভাবে হেসে বলল, ছাড়তে পারছি না যে।

লিন্ডা বলল, সিগারেট ছাড়ার প্রথম স্টেপ হল, কাছাকাছি সিগারেট না রাখা। চোখের সামনে একদমই প্যাকেট রাখবে না। যাই হোক, তুমি আজ লাঞ্চ খেতে কোথায় যাচ্ছো? যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, আমাদের সঙ্গে চল। তোমার মিনিয়াপোলিস ট্রিপটা সম্পর্কে সব কিছু ব্রিফ করে দেব।

দীপ অবাক হয়ে বলল, মিনিয়াপোলিস ট্রিপ মানে?

বার্ট বলল, তোমাকে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে। মনে নেই? গত সপ্তাহে কথা হয়েছিল। মিঃ জ্যাকসন তোমাকেই পাঠাতে চাইছেন। একটা ইনস্টলেশানের ব্যাপার আছে। বোধহয় দিন চারেক লাগবে তোমার।

দীপ দূরের পেপার ওয়েটটার দিকে আবার তাকাল।

যেমন ভাবে পেপার ওয়েটটা আচমকা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, সেই রকমই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দীপ বলল, আমি তো মিনিয়াপোলিস যেতে পারব না। আমি বাড়ি যাবো, ইন্ডিয়ায়।

বার্ট বলল, হোম, সুইট হোম। বাড়ি যেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু মাই ডিয়ার, তুমি তো জানুয়ারির আগে তোমার অ্যানুয়াল ছুটি নিতে পারছ না। জর্জ আর জিমি দুজনেই ছুটিতে। লিন্ডা বলল, তুমি জানুয়ারিতে চার-পাঁচ সপ্তাহ ছুটি নিতে পার। তখন ইন্ডিয়ার ওয়েদার কী রকম?

দীপ বলল, অ্যানুয়াল ছুটি নয়। আমি একেবারে দেশে ফিরে যাব। লক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল!

বার্ট ভুরু তুলে বলল, হোয়াট? আর ইউ কিডিং?

দীপ দু দিকে ঘাড় নাড়ল।

না সে ঠাট্টা করছে না। একবার মুখ ফসকে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে, তখন আর নড়চড় হবে না সে কথার। এনাফ ইজ এনাফ। তার আর ভাল লাগছে না। সে সব কিছু ছেড়ে দেশে চলে যাবে।

সারা অফিসে রটে গেল যে ডীপ রে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে শুনে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। সেখানকার একটা ফ্যাকট্রিতে কয়েকটা মেশিন ইনস্টলেশান নিয়ে ঝঞ্ঝাট হচ্ছে কিছুদিন ধরে। একটা বয়লার বাস্ট করে দুজন লোক আহত হয়েছে পর্যন্ত।

আসল নাম ছিল দীপক রায়চৌধুরী। ও নাম উচ্চারণ করতে এখানকার লোকের দাঁত ভেঙে যায়, তাই দীপক হয়েছে ডীপ। আর রে পদবীটা এদের অনেকেরই চেনা।

একটু পরে দরজায় নক করে আবার ঘরে এসে ঢুকল লিন্ডা। হাসি মুখে বলল, ওকে ডীপ, তোমার মিনিয়াপোলিস যেতে হবে না। মিঃ জ্যাকসনকে আমি কনভিন্স্ করিয়েছি, তোমার বদলে ল্যারি যেতে পারে। দীপ খানিকটা চটে উঠে বলল হোয়াট? কে তোমাকে বলেছে যে ওখানে যাবার ভয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি! ওখানে যেতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। আমার মনে হয় না, কাজটা খুব ডিফিকাল্ট! আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, তার কারণ, দু একদিনের মধ্যেই আমি দেশে ফিরে যেতে চাই!

লিন্ডা খুব নরম ভাবে জিজ্ঞেস করল, দেশে ফেরার জন্য তোমার এত আর্জেন্সি কিসের তা কি জানতে পারি? এই কোম্পানির কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? তুমি কি কোম্পানির কাছ থেকে আরও কিছু আশা করেছিলে?

লিন্ডা নিজের ব্যক্তিগত কারণ কারুকে বলে না। তবে সে দীপের ব্যক্তিগত কারণ জানতে চায়। দীপের মতন একজন অশ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, তাতে কোম্পানির কী আসে যায়? তার বদলে আরও অনেককে পাবে। তবু লিন্ডার মতন মেয়ে এরকম একটা প্রশ্ন করেছে বলেই একটা উত্তর দিতে হয়। দীপ লিন্ডার চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বলল, কারণটা শুনলে বোধহয় তোমরা হাসবে! এদেশে কেউ এরকম কথা বলে না। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক পুরোনো ট্র্যাডিশান, পুরোনো ভ্যালুজ রয়ে গেছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মায়ের জন্য!

—তোমার মায়ের জন্য?

—হ্যাঁ। কয়েকদিন ধরে আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। আমাকে ছেড়ে থাকতে মায়ের খুব কষ্ট হয়। প্রায়ই কান্নাকাটি করেন। চোখে ভাল দেখতে পান না। তাই আমার ইচ্ছে হচ্ছে, শেষের কয়েকটা বছর মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে!

লিন্ডা যেন এরকম কথা কখনো শোনেনি। সে প্রায় হাঁ করে চেয়ে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মার কাছে থাকবে? কোথায় থাকে তোমার মা?

—কলকাতা শহর থেকে কিছুটা দূরে। একটা গ্রামে। একা।

—উনি কোন কাজ-টাজ করেন?

—না, লিন্ডা। আমরা মা এখন কোনো কাজ করেন না। করতে পারেন না। তবে প্রায় সারা জীবন উনি একটা স্কুলে পড়িয়েছেন। এখন চোখে ভাল দেখতে পান না বলে রিটায়ার করেছেন।

—তোমার মা সম্পর্কে আরও কিছু বল, ডীপ। তোমার বাবা বেঁচে নেই নিশ্চয়ই।

—না, আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন বাবা মারা যান। আমার মায়ের বয়েসও তখন মাত্র ছাব্বিশ।

উনি কি আবার বিয়ে করেছিলেন?

—না, লিন্ডা, আমাদের দেশের বিধবারা চট করে বিয়ে করেন না। কোনো বাধা নেই। তবু অনেকেই.....আমার মা অবশ্য বিয়ে করতে পারতেন, আমার গ্র্যান্ড ফাদার খুব লিবারাল ছিলেন, মায়ের অত কম বয়েস, দেখতেও সুন্দরী ছিলেন বেশ। কিন্তু মা আমার জন্য সব কিছুই স্যাক্রিফাইস করলেন। মা রঙিন পোশাক পরতেন না, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতেন না। শুধু আমাকে মানুষ করে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মা দুপুরে স্কুলে পড়াতেন, আর সকাল-সন্ধে আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। মায়ের জন্যই আমি বরাবর ভাল রেজাল্ট করেছি। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি।

—আরও বল। আরও বল তোমার মায়ের কথা।

—আমি যখন আমেরিকায় পড়তে আসি, তখন প্লেন ভাড়ার টাকা জোগাড় করাই এক সমস্যা হয়েছিল। আমি বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করব ভেবেছিলাম, তার আগেই মা তাঁর গয়না সব বিক্রি করে দিলেন। গয়না বেশি ছিল না, কিন্তু শেষ টুকরোটা পর্যন্ত বিক্রি করে.......আমার জন্য মা সব কিছু করতে পারতেন। পরে আমি জানতে পেরেছি, এক সময় যখন আমাদের খুবই টাকার টানাটানি ছিল, তখন মা নিজে না খেয়ে আমাকে সব কিছু ঠিকঠাক দিতেন, অভাব-অনটনের কথা আমাকে টেরই পেতে দিতেন না।

—তোমার মাকে এখন এদেশে নিয়ে এস তাহলে। এখানে ভাল থাকবেন। তুমি চাকরি ছাড়বে কেন, ডীপ। তোমার মাকে এনে তোমার কাছে রাখ।

—এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। মা চোখে দেখতে পান না ভাল, এখন আর অতদূর ট্র্যাভেল করতে পারবেন না। আমাকেই যেতে হবে।

লিন্ডা চুপ করে দীপের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখখানি করুণ। দীপ সম্পর্কে লিন্ডার এতখানি আগ্রহ দেখাবার কারণটা যেন দীপ খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে। এ অফিসে আর একজনও অশ্বেতাঙ্গ নেই। কেউ দীপকে কখনো অপমান করেছে কি না, কিংবা দীপের ওপর কোনো অবিচার হয়েছে কি না, সেসবই বোধহয় লিন্ডা জানতে চায়।

দীপের অবশ্য সে রকম অভিজ্ঞতা অন্য দু'এক জায়গায় হলেও এই অফিসে হয়নি। অফিস সম্পর্কে তার কোনো ক্ষোভ নেই। টাকাকড়ি ভালই তো দেয়।

লিন্ডা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আর তোমাকে বাধা দিতে চাই না দীপ। তুমি যখন মন স্থির করে ফেলেছো, হয়তো ঠিকই করেছো। অফিস থেকে রিলিজ পেতে তোমার যাতে অসুবিধে না হয়, সেটা আমি দেখব।

ছুটির পর জুডিকে তার অফিস থেকে তুলে নিল দীপ। পার্ক অ্যাভেনিউ-এর এক দামি রেস্তোরাঁয় খেতে গেল। প্রথমে কিছুই জানাল না। জুডি আজ একটা গাঢ় লাল রঙের স্কার্ট পরে এসেছে। তার ব্লন্ড চুলের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে পোশাকটা।

কানেটিকাটে জুডির দিদির বাড়ির গল্প শুনতে শুনতে একসময় ফস করে দীপ বলল, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি, জুডি। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

অফিসের সহকর্মীদের যা যা বলেছিল সবটাই শুনিয়ে দিল ও জুডিকে।

জুডি ঈষৎ ম্লান গলায় বলল, কদ্দিন ধরে কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। তবু আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি, ডীপ। অন্য কোনো মেয়েকে তোমার ভাল লেগেছে?

—আরে না, না, আমি এ দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছি। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

—কেন ছেড়ে দিচ্ছ?

—বললাম, যে, আমার মায়ের জন্য। মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।

—তোমার মায়ের কথা আগে আমাকে কখনো বলনি তো। একবারও উল্লেখ করনি।

—বান্ধবীর কাছে মায়ের গল্প করে নির্বোধরা, তাছাড়া এমন ভাবে মায়ের কথা মনেও পড়েনি আগে।

—তোমার মায়ের সঙ্গে তো আমার প্রতিযোগিতা চলে না। একমাত্র এই কারণটার জন্যই আমি তোমাকে বাধা দিতে পারি না। অন্য কোনো কারণ হলে বলতাম, তুমি চলে যেও না, থাক।

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি, জুডি। আমার মন আর এখানে টিকছে না। আর বেশিদিন থাকলে আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাবে। আমাকে যেতেই হবে।

—আজ রাত্তিরটা আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি? তোমার বাক্স গুছিয়ে দেব?

দু-দিনের মধ্যেই ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, নিউজার্সির সমস্ত পরিচিতরা জেনে গেল যে দীপ হঠাৎ এদেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে। বুড়ি মায়ের কাছে গিয়ে থাকবে শুনে হাসাহাসি করতে লাগল অনেকে। কেউ কেউ বলল, আহা দুধের বাছারে! মায়ের আঁচলের হাওয়া খাবে! কেউ কেউ বলল, ওসব আদিখ্যেতা ঘুচে যাবে দুদিনেই। একবার কলকাতার গরম, লোডশেডিং আর মিছিলের মধ্যে গিয়ে পড়ুক না! বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। কোনো চাকরি-বাকরি পাবে না, সবাই খারাপ ব্যবহার করবে, টাকাপয়সা ফুরিয়ে এলে ওর মা-ই আবার বলবেন, যারে খোকা, আমেরিকায় গিয়ে কিছু রোজগার করে নিয়ে আয়।

বাল্লু সিনহা অবাঙালি, বিহারের ছেলে, কিন্তু দীপের অন্যান্য বাঙালি বন্ধুদের চেয়েও বাল্লু তার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। দুজনে এক সঙ্গে অনেকদিন পড়েছে, দেশে ও এখানে।

আরও দু একদিন বাদে বাল্লু হঠাৎ হাজির হয়ে বলল, সবাই যেটা জানে, সেটা তুই আমাকে বলিসনি কেন রে, রাস্কেল?

দীপ মুচকি হেসে বলল টিকিটটা কাটার আগে তোকে জানাতে চাইনি। তুই নির্ঘাৎ বাধা দিতিস। আজই বুকিং কনফার্মড হয়ে গেছে। আমি শনিবার যাচ্ছি।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—প্রায় খারাপ হয়ে যাচ্ছিল রে! এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে। যেই ফাইনাল ডিসিশানটা নেওয়া হয়ে গেল, তারপর থেকেই মাথাটা সুস্থির হল।

—কেন ফিরে যেতে চাস, আমায় বুঝিয়ে বলবি?

—আমার ভাল লাগছিল না রে, একদম ভাল লাগছিল না।

—তোর অফিসের লিন্ডা বলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল ট্রেনে। তার মুখে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। তুই নাকি তোর মার জন্য ফিরে যাচ্ছিস? মার কাছে গিয়ে থাকবি? দীপ এবার কোনো উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

বাল্লু চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কাবার্ড খুলে একটা স্কচের বোতল খুঁজে বার করল। দুটো গেলাসে খানিকটা করে ঢেলে এনে, নিজে প্রথমে এক চুমুক দিয়ে বলল, তুই কবে থেকে এরকম গুলবাজ হয়েছিস রে, দীপু? সবাইকে বলেছিস তোর মায়ের জন্য ফিরে যাচ্ছিস। তোর মা, দাঁড়া, তারিখটা মনে করি। ফোর্থ ডিসেম্বর, চার বছর আগে ওই দিন টেলিগ্রাম এল তোর মা মারা গেছেন। আমার মনে নেই ভেবেছিস? চার বছর আগে তোর মা মারা গেছেন, তুই তাঁর কাছে ফিরে যাবি?

দীপ চুপ করে রইল।

বাল্লু বলল, বীরেনদা, সুরূপাবৌদি, রণজয়, স্বপন আরও অনেকেই জানে যে তোর মা বেঁচে নেই, তুই তাদের কী করে ধাপ্পা দিবি?

দীপ তবু কোনো কথা বলল না। বাল্লু আবার এক চুমুকে গেলাস শেষ করে বলল, এটা কি ফর অফিস কনজাম্পশন? কেন, অফিসকে এরকম একটা মিথ্যে কথা না বললে কি তোকে ছাড়ত না? এমনিই ছেড়ে দিত। বড় জোর তিন মাসের নোটিশ দিতে বলত! ও বুঝেছি, এটা রটিয়েছিস জুডিকে বোঝাবার জন্য। মা মা বলে কেঁদে ফেলে তুই জুডির কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিস! সে একটা ভাল মেয়ে। তার কাছে এরকম একটা বাজে মিথ্যে কথা বলাটা আমি মোটেই পছন্দ করছি না!

দীপ এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হঠাৎ মায়ের কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল, তা ঠিকই। কিন্তু পুরোটাই কি মিথ্যে? মা বেঁচে না থাকলেও কি মায়ের কাছে ফেরা যায় না? বাল্লু ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে? দীপ বলল ভাল করে ভেবে দ্যাখ। দু'বার বলতে হবে কেন?

আবার খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বাল্লু বলল, অ্যাবস্ট্রাক্ট মাদার! নিজের মা নয়, দেশমাতৃকা! তুই দেশ জননীর কাছে ফিরে যেতে চাস? হঠাৎ তোর এরকম পেট্রিয়টিক ফিলিং কী করে জেগে উঠল রে?

দীপ বলল, না, না, ওসব কিছু নয়। আমি সাধারণ মানুষ, দেশ-টেশ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। অত বড় দেশ তোর আমার মতন কয়েকজনকে বাদ দিয়েও দিব্যি চলবে। এখনো তো চলছে। আমি শুধু ভেবেছি আমার মায়ের কথা। আমার মা চাপা স্বভাবের ছিলেন, মুখে কিছু বলতেন না, চিঠিতেও পীড়াপিড়ি করেন নি। কিন্তু মনে মনে খুব চাইতেন আমি ফিরে যাই। মা খুব কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তারপর তাঁর ইচ্ছে ছিল, বিলেত-আমেরিকা থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে আমি তাঁর কাছাকাছি থাকব। দেশে চাকরি তো একটা পেতামই।

—ইডিয়েট, তাহলে তোর মা যখন বেঁচে ছিল, তখন ফিরলি না কেন? তখন তোর এই বোধটা হয়নি। তাহলে তো কিছুদিন অন্তত খুশি করতে পারতিস।

—তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

—ঘোর মানে? চার বছর আগে জুডির সঙ্গে তো তোর আলাপ হয়নি!

—সে ঘোরের কথা বলছি না। ধর, তুই আর আমি একসঙ্গে এম. এস. পড়তে এলাম। প্রথম বছরটা আমাদের কী সাঙ্ঘাতিক কষ্ট করতে হয়েছিল মনে আছে? গুনে গুনে পয়সা খরচ করতাম। ভাল করে কিছু খেতাম না পর্যন্ত। তারপর তো এম. এসটা. হল। তখন তুই-ই বললি, আর পি-এইচ-ডি-টাও করা যাক, আরও তিন বছর, তারপর কি করলাম, এতদিন পড়াশুনার কষ্ট করেছি, এবার চাকরি করে সবটা উশুল করা যাক। ঝট করে পেয়ে গেলাম চাকরি। একটা ছেড়ে আর একটা। বেশি টাকা। নতুন গাড়ি। বাড়ি কেনা। বান্ধবী। এইগুলোই তো ঘোর।

—কেন, আমরা দেশে টাকা পাঠাইনি? প্রত্যেক মাসে দুশো ডলার, নট আ ম্যাটার অফ জোক।

—হ্যাঁ, আমি মনে করলাম, টাকা পাঠালেই সব দায়িত্ব চুকে যায়। এটাও একটা ঘোর।

—দ্যাখ, দীপু, দেশে ফিরে যাওয়া মানে কি বেকারের সংখ্যা বাড়ানো নয়? তুই বা আমি চাকরি পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার ফলে আর দুটো ছেলে তো বেকার হবে। চাকরির সংখ্যা তো বাড়বে না? আমি তো মনে করি, দেশে ফিরে গাদাগাদি না করে, এখানে থেকে যে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ পাঠাচ্ছি, তাতেই দেশের যথেষ্ট উপকার করা হচ্ছে।

—তোর কথা খানিকটা আলাদা রে বাল্লু। তোর আরও ভাই-বোন আছে। মা-বাবা দুজনেই বেঁচে। তুই এখানে বিয়ে করেছিস, তোর একটা বাচ্চা ইস্কুলে যায়। তোর পক্ষে এক্ষুনি ফেরা মুশকিল। না ফিরলেও ক্ষতি নেই। কিংবা তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। কিন্তু আমার এখনো এখানে শেকড় গাড়েনি!

—শেকড় আমারও গাড়েনি। আমিই বরং ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিন ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তোর যুক্তিটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তোর বাবা-মা কেউ নেই। খুব কাছের আত্মীয় কেউ নেই। তুই ফিরতে যাবি কোন্ দুঃখে? তুই-ই বরং এখানে মজাসে থাকতে পারিস।

—আমার ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

—সাময়িক ডিপ্রেশন। তুই বরং এক কাজ কর। ছুটি নিয়ে কিছুদিন দেশ থেকে ঘুরে আয়। যাসনি তো অনেক দিন। দেশের অবস্থা দেখলেই তোর এই ঘোরটাও কেটে যাবে। ওখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে? যারা বাধ্য হয়ে পড়ে আছে, তাদের কথা আলাদা। ব্লাডি পলিটিশিয়ানরা দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে। পরিমলের কথা মনে আছে? দেশে ফিরে গিয়ে নিজের টাকায় একটা কারখানা খুলল। বেশ ভালই চলছিল, তারপর হঠাৎ কিছু বদমাশ এসে স্ট্রাইক করে কারখানাটা তুলে দিল। গভর্নমেন্ট কোনো সাহায্যই করল না। পরিমল আবার ফিরে এসেছে, এখন দেশের নাম শুনলে চটে যায়।

—আমার মায়ের হঠাৎ স্ট্রোক হল, আমি যখন খবর পেলাম, তখন সব শেষ! গিয়ে শেষ দেখাটাও হল না।

—ডোনট বি সেন্টিমেন্টাল দীপু। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। চার বছর আগে। এখন আর তা নিয়ে আফশোস করে কী হবে?

—মা নেই, কিন্তু মায়ের ইচ্ছেটা তো রয়ে গেছে! মা চেয়েছিলেন.....। আরও তো অন্য মা আছে। আরও কোনো বুড়ি, চোখে ছানি পড়ে গেছে, ভাল দেখতে পায় না, তার ছেলে চলে গেছে কোথায়। সেরকম একটা বুড়ির পাশে বসব, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলব, মা, দ্যাখো, আমি ফিরে এসেছি!

দিস ইজ আটারলি রিডিকুলাস। তোর কি সত্যি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি রে দীপু?

—বোধহয় তাই!

এরকম তর্ক-বিতর্ক চলল অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু দীপ গোঁয়ারের মতন জেদ ধরে আছে, সে কিছুতেই মত পালটাবে না। সে যাবেই। সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে।

বাল্লু খুব রাগ করে চলে গেল।

শনিবার দিন দীপের ফ্লাইট সন্ধেবেলা। সকাল নটার সময় লিন্ডা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করল দীপ, তোমার কাছে একবার আসতে পারি? তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না।

দীপ বলল, অফ কোর্স, অফ কোর্স। ইউ আর ওয়েলকাম। আমি মোটেই ব্যস্ত নই!

টেলিফোন রেখে দীপ গালে হাত দিয়ে বসে রইল।

লিন্ডা হঠাৎ আসতে চাইছে কেন? লিন্ডার সঙ্গে তার কোনো রকম ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়নি কখনো। লিন্ডা সব সময়েই তার সঙ্গে ভদ্র ও ভাল ব্যবহার করেছে, কিন্তু সবটাই ফর্মাল! অফিসের বাইরে কক্ষনো যোগাযোগ হয়নি তাদের। অফিসের সঙ্গে তো সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে দীপ। লিন্ডা অবশ্য সাহায্য করেছে সে ব্যাপারে।

আধ ঘণ্টা পরে উপস্থিত হল লিন্ডা। দীপ তাকে দরজা খুলে ভেতরে এনে বসাল। শয়নকক্ষ ও বসবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লিন্ডা জিজ্ঞেস করল, তোমার এখানে আর কেউ নেই?

দীপ বলল, না। এখন কেউ নেই। বন্ধুরা আসবে দুপুরে।

এতে যেন বেশ স্বস্তিবোধ করল লিন্ডা। দীপ তার ওভারকোটটা খুলে দিল। একটা হালকা নীল পোশাক পরে এসেছে লিন্ডা। হাতে সাদা রঙের গ্লাভস। তার মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব।

গ্লাভস দুটো খুলতে খুলতে লিন্ডা বলল, তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছ? তোমাকে একটা কথা জানাতে এলাম। সেটা শুনলে তুমি আরও চমকে যাবে। কিংবা অবিশ্বাস করবে? তবু বলি!

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

—কী করে শুরু করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রথম থেকেই বলি, সেদিন তোমার কথা শুনে আমি বাড়িতে গিয়ে খুব কেঁদেছিলাম।

—সে কি! কোন কথা শুনে লিন্ডা? আমি কি কোনো কারণে তোমাকে আঘাত দিয়েছি?

—হ্যাঁ, আঘাত দিয়েছ তো বটেই। আমার মনের খুব ভেতরের একটা জায়গায় খুব জোরে আঘাত দিয়েছ! অবশ্য, তুমি না জেনেই।

—আমি এখনো বুঝতে পারছি না লিন্ডা।

—সেদিন তুমি তোমার মায়ের কথা বললে! আমি জানি, ইণ্ডিয়া গরিব দেশ। এখানে তুমি ভাল চাকরি করতে, দেশে গিয়ে এরকম আরামে থাকতে পারবে না। তোমার অনেক কষ্ট হবে। তবু তুমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমার মায়ের জন্য। তোমার মায়ের কাছে থাকবে বলে। এটা আমার চেতনাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

—কেন? কেন?

—মা আর সন্তানের এই রকম সম্পর্কের কথা আমি জানতাম না। কখনো দেখিনি, শুনিও নি। আমার মা নেই, কোনোদিন ছিলও না!

—তার মানে? কোনোদিন ছিল না মানে?

—বড় বেশি ব্যক্তিগত কথা হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু মনে করবে না তো?

—মোটেই না। তুমি বল।

—আমার জন্মের ছ'মাস পরেই আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি আনওয়ান্টেড চাইল্ড। মা অ্যাবরশন করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত করেনি। আমি আমার সেই জননীর স্বামীরও সন্তান নই, অন্য একজনের। তাই নিয়ে দু'জনের ঝগড়া হয়। তারপর সেপারেশন, ডিভোর্স। মা আমাকে ফেলে পালায়। আর কোনোদিন আমার খোঁজ করেনি।

—আই অ্যাম সরি টু হিয়ার দ্যাট। ভেরি সরি, লিন্ডা!

—আমাকে যে জন্ম দিয়েছিল, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে এই পৃথিবীতে আনতে চায়নি। আমার সম্পর্কে তার কোনো টান ছিল না। আমি তার ছবি দেখিনি। তার মুখ কেমন দেখতে তাও জানি না। যার ঔরসে আমার জন্ম, তার পরিচয়টাও জানাজানি হয়নি। সুতরাং আমার বাবাকেও আমি চিনি না। আইনত যিনি আমার পিতা, তিনি অবশ্য দয়ালু মানুষ ছিলেন, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, আমার জন্য ওয়েট নার্স রেখেছিলেন, একটু বড় হলে আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর্যন্ত আমার পড়ারও খরচ দিয়েছেন। আমি ভাগ্যিস লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম, তাই এ পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছি। নইলে সমাজের অনেক নিচু স্তরে আমার স্থান হত। গোটা মাতৃজাতির ওপর আমার ঘৃণা আছে। নিজে বিয়ে করার কথা ভাবি না সেইজন্য!

—তোমার কথায়, ব্যবহারে কোনোদিন সেই তিক্ততা ফুটে ওঠেনি!

—পৃথিবীতে আমি একা। সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু একজন মা আমাকে জন্ম দিয়ে ফেলে চলে গেছে, কোনোদিন আমায় আর দেখা দিল না। এটাও ভুলতে পারি না কিছুতে! সেদিন তুমি বললে, তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাও। তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। এটা যেন একটা অন্য জগতের কথা। এমন স্নেহের টান, পরস্পরের জন্য ব্যাকুলতা, আমার মনটা হু হু করতে লাগল, দীপ। আমি এসব কখনো পাইনি। তবু যে আমার ভেতরে একটা হাহাকার ছিল......

লিন্ডা হঠাৎ চুপ করে গেল।

দীপও মাথা নিচু করে রইল।

খানিকটা বাদে রুমাল দিয়ে নাক মুছে লিন্ডা বলল, আমি আর তোমার বেশি সময় নেবো না। তোমাকে একটা অনুরোধ জানাবো?

দীপ মাথা তুলে বলল, বলো!

লিন্ডা বলল, আমি তোমার মাকে একটা কিছু দিতে চাই। কী দেবো, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ফুল দেওয়া যেত কিন্তু তুমি ইণ্ডিয়ায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে ফুল শুকিয়ে যাবে। কিছু খাবারও পাঠাবার কোনো মানে হয় না। তোমার মা এদেশি পোশাক নিশ্চয়ই পরে না। তাই ভাবলাম......

লিন্ডা তার হাত-ব্যাগ থেকে একটা সুন্দর বাক্স বার করলো। সেটা খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে একটা মুক্তোর মালা।

দীপ আঁতকে উঠে বলল, এ কী, এত দামি জিনিস? না, না!

লিন্ডা কুণ্ঠিত ভাবে বলল, সেদিন তুমি বলেছিলে, আমেরিকায় আসবার সময় তোমার টিকিট কাটার পয়সা ছিল না। তোমার মা নিজের সব গয়না বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আমার মা নেই, আমি কি আমার দেশের পক্ষ থেকে তোমার মাকে এই গয়নাটা দিতে পারি না? তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না প্লিজ! যদি নাও, আমার খুব ভাল লাগবে, আমার প্রাণ জুড়োবে! তাঁকে বোলো, আমেরিকার এক অনাথিনী মেয়ে এক আদর্শ মাতৃত্বকে এই সামান্য উপহারটুকু দিয়েছে!

দীপ তখনো চুপ করে আছে দেখে লিন্ডা আবার বলল, আমার শিগগির ইণ্ডিয়ায় যাবার কথা আছে। তখন তোমার বাড়িতে যাব। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। তোমার মায়ের হাতের রান্না খেতে চাইলে তিনি খাওয়াবেন? দীপ মনে মনে বারবার বলে যাচ্ছে, না, আমি মিথ্যে বলিনি, মিথ্যে বলিনি। মিথ্যে বলিনি। লিন্ডাকে ঠকাইনি। আমার মা সত্যিই আমার জন্য এক সময়.....হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে আমার, কিন্তু মায়ের ইচ্ছেটা মিথ্যে হয়ে যায়নি।

একটু পরে মুখ তুলে, লিন্ডার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দীপ বলল, হ্যাঁ, এস তুমি ইণ্ডিয়াতে, মাকে দেখতে। ভারতীয় মা। গ্রামে, মাটির ঘরে বসে আছেন। চোখে ভাল দেখতে পান না। বসে আছেন তাঁর সন্তানের প্রতীক্ষায়। তুমি এই মালাটা এখন রেখে দাও, যখন যাবে, নিজের হাতে তাঁকে দিও!

খিদে

রাস্তাটা কাঁপে দুপুরবেলার রোদ্দুরে। দুপাশের গাছগুলো ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায়। মাত্র দেড় মাস আগে এই রাস্তাটায় পিচ ঢেলে পাকা করা হয়েছে, নতুন-নতুন গন্ধ পাওয়া যায়। আগে যখন মাটির রাস্তা ছিল, বড় জারুল গাছটার কাছে ছিল একটা বিরাট খোঁদল, একবার বর্ষার জলে ওর মধ্যে খলাৎ খলাৎ করতে দেখা গিয়েছিল দুটো কই মাছকে, কোথা থেকে তারা এসেছিল কে জানে।

এখন সেই গর্তটা একেবারে নিশ্চিহ্ন।

রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করে বিজুর। এই চাঁদি ফাটা রোদে কেউ বাইরে বেরোয় না, চতুর্দিক একেবারে শুনশান। খাল পাড়ে বাস থামে, বাস থেকে নামা যাত্রীরা এই পথেই হেঁটে আসবে, কেউ আসে না। তবু বিজু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এক একসময় তার মনে হয় আসছে, একজন আসছে, পা-জামার ওপর হাফ শার্ট পরা, কাঁধে একটা ঝোলা, দুহাতে দুটি পুঁটলি, সেই পুঁটুলি দুটোর ভারে যেন নুয়ে পড়ে হাঁটছে। একেবারে চাল-ডাল আরও কত খাবার কিনে নিয়ে ফিরছে দাদা। কিন্তু কয়েক পলকের মধ্যেই সেই দৃশ্য মিলিয়ে যায়, রাস্তা আবার ফাঁকা।

একটা গাছের ছায়ায় মাটিতেই পা ছড়িয়ে বসে থাকে বিজু, তার খাঁকি, হাফ প্যান্টের রং এখন ধুলো ধুলো, খালি গা, গলায় একটা সুতোয় বাঁধা মাদুলি। তার তের বছরের শরীরটা একবার ঘামে ভিজে জবজব করছে। একবার শুকোচ্ছে, আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে ভূতের ছবি আঁকছে বিজু, সেও মরে গিয়ে ভূত হবে।

তিন দিন হয়ে গেল, দাদা এখনো ফিরল না।

এক সময়ে জল তেষ্টায় বিজুর বুক শুকিয়ে যায়, সে উঠে এক দৌড়ে চলে আসে কলতলায়। সেখানেও কেউ নেই।

কিছুদিন আগেও সবাই পুকুরের জল খেত, ঘোষদের পুকুরটার নাম মিষ্টিপুকুর, সেখানে কেউ গরু-মোষ নামায় না, পদ্মদামে ভরা, ওই পুকুরের জল আনতো সব বাড়ির মেয়েরা। এখন মহাদেব সাউ তার মায়ের নামে টিউবওয়েল বানিয়ে দিয়েছে এ গ্রামের মানুষের জন্য, যেমন তেমনভাবে দান নয়, বেশ মজবুত টিউবওয়েল, চারপাশে অনেকখানি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। একটা নয়, তিনটে তিন জায়গায়।

টিউবওয়েলের ধার ঘেঁসে শুয়ে আছে ভুলি নামে কুকুরটা। ওর পেটের কাছে ঢুঁসোঢুঁসি করছে চারটে ছানা, ভুলির জিভ বেরিয়ে পড়েছে অনেকখানি, মাথাটা নাড়ছে, ও বেচারারও তেষ্টা পেয়েছে খুব।

এক হাতে পাম্প করে জল খাওয়ার খুব অসুবিধে। টিউবওয়েলের মুখটা চেপে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে পাম্প করতে লাগল বিজু। তারপর হাতটা একটু ফাঁক করতেই পিচকিরির মতন জল বেরুতে লাগল। সেখানে মুখ লাগিয়ে সে পেট ভরিয়ে ফেলল। তারপর আবার দুহাতে পাম্প করতে করতে বলল, নে ভুলি, খা, জল খা।

ভুলির বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটে গেছে অনেকদিন, তবু ওরা মায়ের দুধ ছাড়েনি। ভুলির পেটের তলাটা ফোলা ফোলা, এখনো দুধ আছে বোঝা যায়, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিজুর মনে হয়, কতদিন দুধ খায়নি সে। কবে খেয়েছিল, কবে? সেই যেবারে বিজু ক্লাস থ্রিতে উঠেছিল, বাবার সঙ্গে গিয়েছিল সোনামুখী শহরে। একটা মিষ্টির দোকান থেকে কাঁচাগোল্লা কিনেছিল বাবা, একটা বিরাট কড়াইতে ফুটছিল দুধ, যেন একটা দুধের পুকুর। বিজুর দৃষ্টি দেখেই বাবা বুঝতে পেরেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, খাবি!

দুটো মাটির ভাঁড়ে দিয়েছিল গরম গরম দুধ, একটুখানি সর ফাউ, সেই দুধে চুমুক দেবার পর বাবার গোঁফটা সাদা হয়ে গিয়েছিল, বিজুর স্পষ্ট মনে আছে। তারপর কি আর কখনো দুধ খেয়েছে বিজু? নাঃ, বাড়িতে দুধ আসবে কোথা থেকে। তাদের গরু নেই। সোনামুখীর দোকানের সেই দুধ, আঃ ঠিক যেন অমৃত!

জল খেলেই পেট ব্যথা করবে বিজু জানতো। হ্যাঁ, ঠিক শুরু হয়েছে। যেদিন থেকে ভাত খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই এরকম। শুধু জল খেয়ে যদি পেট ভরানো যেত, তা হলে কী মজাই না হত। খালি পেটে অনেকখানি জল খেলে পেটটা ভর্তি হয়ে ফুলে যায় বটে, তারপরই ব্যথা শুরু হয়। পেট ব্যথা হলেই মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়।

পেটে থাবড়া মারতে মারতে বাড়ির দিকে এগোল বিজু।

গ্রামের এক টেরে দুটি মাত্র বাড়ি। ধরণীকাকার বাড়ির লোকদের সঙ্গে বিজুদের কথা বন্ধ। কী নিয়ে ধরণীকাকার সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হয়েছিল। ও বাড়ির উঠোনে বিজুদের পা দেওয়াও নিষেধ। মা আর এ বাড়ির মেয়েরা একই পুকুরে স্নান করতে যায়, কিন্তু কেউ কারুর দিকে তাকায় না।

বাবার সঙ্গে এ-গ্রামের অনেকেরই ঝগড়া, বাবা যে খুব রাগী। সবাই নাম দিয়েছে রগচটা পশু। বাবার আসল নাম পশুপতি, কিন্তু সবাই পশু পশুই বলে। এত রাগী বলেই তো বাবা এখন জেল খাটছে।

মঙ্গলবারের হাটে বাবা একজন পুলিশকে মেরেছিল। পুলিশ যাকে ইচ্ছে মারতে পারে। কিন্তু পুলিশকে কখনো মারা চলে না, রাগের মাথায় বাবা সে-ই ভুলটাই করে ফেলেছিল। এ গ্রামে অনেকেই বাবাকে পছন্দ করে না। তবু তারাও স্বীকার করেছে, সেদিন বাবার কোনো দোষ ছিল না। মুরুলিজ্যাঠা তো এই সেদিনও বললেন, পশুপতিটা দুর্মুখ, চাঁছাছোলা কথা বলে, সামনে আড়ালে মানে না, তা বলে সে চোর-ছ্যাঁচোড় নয়, এটা মানতেই হবে। পুলিশ কেন ওকে আগে মারতে গেল? পুলিশের কোনো দোষ তো গভর্নমেণ্ট দেখে না!

বাবা জেল খাটছে, তা বলে কেউ বিজু কিংবা তার দাদা বাসুকে চোর-ডাকাতের ছেলে বলে না। বরং পুলিশকে মেরেছে বলে লোকের চোখে বাবার সম্মান হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। পুলিশের ওপর কার না রাগ আছে? কিন্তু কেউ তো পুলিশের মুখের ওপর কিছু বলতেই সাহস পায় না।

ধরণী বর্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিজু দেখল এই ভর দুপুরে তুলসীমঞ্চে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ননীপিসি। একটা হলুদ শাড়ি আলুথালু ভাবে পরা, মাথার চুল পেছন দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে ছড়ানো আছে বুকের ওপর। বড় বড় চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শূন্যের দিকে।

সেদিকে তাকিয়েই বিজুর বুকটা ছমছম করে উঠল।

দুই পরিবারের ঝগড়া হলেও ননীপিসি কিন্তু বিজুর সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে। ননীপিসি তো এখানে থাকে না, বিয়ের পর চলে গেছে পুরুলিয়া। তার বিয়ের আগে বিজুদের সঙ্গে ভাব ছিল, তাই ননীপিসি আগের সম্পর্কটাই রাখতে চায়।

কিন্তু ননীপিসিকে দেখলে বিজুর ভয় ভয় করে। বাচ্চা হবার জন্য ননীপিসি বাপের বাড়ি এসেছিল। দুমাস আগে ননীপিসি একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছে। বিয়ের দশ বছর পর প্রথম সন্তান, সেও বাঁচল না। তার পর থেকে ননীপিসির কেমন যেন পাগল পাগল ভাব, যখন তখন হু হু করে কাঁদে, কথা বলতে বলতে উৎকট গম্ভীর হয়ে যায়, হঠাৎ হঠাৎ ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। সাঁতার জানে অবশ্য, ডোবে না।

ওই পাগল-পাগল ভাবের জন্যই শুধু নয়, এক একসময় তো ননীপিসি বেশ ভালভাবেই কথা বলে বিজুর সঙ্গে, তবু ননীপিসি সামনে এলেই কেন যে বিজুর বুক কাঁপে, তা সে জানে না। বিয়ের আগের তুলনায় ননীপিসির শরীরটা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। উরু দুটো অনেক চওড়া, বুক দুটো বাতাবি লেবুর মতন, হাঁটার ভঙ্গিটাও অন্যরকম। ননীপিসির দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাতে বিজুর লজ্জা করে, আবার তাকাতে ইচ্ছেও করে। সে আড়াল থেকে দেখে।

তের বছর বয়েস হয়ে গেল বিজুর, সে মেয়েদের সম্পর্কে একেবারে অবোধ নয়। সে জানে যে সন্তান-সম্ভবা হলে মেয়েদের বুক দুধে ভরে যায়। ভুলি কুকুরটার যেমন হয়েছে। ননীপিসিমার ছেলে বেঁচে নেই কিন্তু বুকে দুধ আছে, তাই বুক দুটি এখনো অত বড়।

ননীপিসি তুলসীমঞ্চে ঠেস দিয়ে মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিজুকে দেখতে পেল না। বিজুও সাড়া শব্দ না করে সে বাড়ির সামনেটুকু পেরিয়ে চলে এল, তবু তার মনে হল, ননীপিসি একবার তাকে ডাকলে কী ভালই না লাগতো!

বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। বিজুর ঠিক পরের বোন ওর মাত্র এক বছরের ছোট। রং ফর্সা বলে বাবা ওর নাম রেখেছে পুতুল। বাইরে অত রাগী হলেও বাবা কখনো পুতুলকে কিংবা বিজুকে মারে না। শুধু দাদাকে একদিন বেদম পিটিয়েছিল। দাদা ইস্কুলে কিছু একটা গণ্ডগোল করেছিল, সেই জন্য। দাদাও জেদি কম নয়। বিজু আর দাদা এক ঘরে শোয়, মার খাবার পর রাত্তিরবেলা দাদা বলেছিল, বাবা যদি ফের আমার গায়ে হাত তোলে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

পুতুল মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, চোখ বোজা। একটা ঝ্যালঝেলে সবুজ ফ্রক পরা, ভাই-বোনদের মধ্যে পুতুলই সবচেয়ে রোগা। পুতুল একেবারে খিদে সহ্য করতে পারে না।

মা ঘুমোয়নি, মহাভারত বইখানা খুলে বসে আছে পেছনের বারান্দায়। কাছেই সন্ধ্যামালতী ফুলগাছের বড় একটা ঝাড়। উঠোনের এক পাশে দুটো কলাগাছও রয়েছে, একটাতেও মোচা ধরেনি।

মায়ের পাশে বসে পড়ে বিজু মিনমিন করে বলল, মা, আমার পেট ব্যথা করছে।

মহাভারত থেকে চোখ তুলে মা বলল, জল খা। কলসিতে জল আছে।

বিজু এবার ঝাঁঝালোভাবে বলল, জল খেয়েই তো পেট ব্যথা করতে আরম্ভ করল!

ছেলের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল অভয়া। এ পেট ব্যথার কোনো ওষুধ তার জানা নেই। তবু সে বলল, বোনের পাশে পেট চেপে শুয়ে থাক, দ্যাখ যদি কমে।

বিজুও তাকিয়ে রইলো মায়ের দিকে। তার চোখ ভরা অভিমান। সে জানে, মায়ের কোনো সাধ্য নেই, তবু তার কষ্টের কথা আর কার কাছে বলবে? তার যে বিষম খিদে পাচ্ছে। সে যেন খিদের চোটে মরেই যাবে।

সারাদিন সে কিছুই খায়নি। কথাটা একেবারে সত্যি নয় যদিও। পুতুল আর সে গুচ্ছের কলমি শাক তুলে এনেছিল, তাকে সেদ্ধ করে খেতে দিয়েছিল মা। বাড়িতে এক ফোঁটা তেল নেই, শুধু নুন আর কাঁচালংকা। তা দিয়ে আর কতখানি কলমি শাক খাওয়া যায়? যা খেয়েছিল, তা কখন হজম হয়ে গেছে। বিজু বলল, মা, রাত্তিরে কী খাব?

মা চুপ করে রইল।

কলমি শাক সেদ্ধ এখনো অনেকটা রয়ে গেছে। রাত্তিরে আবার তাই খেতে হবে? বিজুর তা হলে বমি হয়ে যাবে।

বিজু আবার বলল, রাত্তিরে কী খাব, বল না।

মা বলল, ওই মাদুলিটা চেপে ধরে ভগবানকে ডাক। তিনি যেন আজই তোর দাদাকে ফিরিয়ে দেন।

বিজু বলল, সকালে তো কতক্ষণ ডাকলাম!

মা বলল, বারবার ডাকতে হয়। ভগবান কত কাজে ব্যস্ত থাকেন......বাসু ফিরে এলে......ও নিশ্চয়ই চাল কিনে আনবে, গরম গরম ভাত খাবি।

একটা কথা আজ সকাল থেকেই বিজুর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে কথাটা মাকেও বলা যায় না।

জেল থেকে ছাড়া পেতে বাবার এখনো ন'মাস একুশ দিন বাকি। কে যেন বলছিল এক মাস কমিয়েও দিতে পারে। তা হলেও তো আরো আট মাস একুশ দিন। বাবা ফিরে এলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধার করেই হোক, আর যে করেই হোক, বাবা কখনো ছেলেমেয়েদের না-খাইয়ে রাখেনি। কিন্তু আরও আট মাস একুশ দিন ওরা বেঁচে থাকবে কী করে?

থানার সেপাই রণছোড় সিং হাটের ছোট ছোট দোকানদারদের কাছ থেকে তোলা নিত। অনেক কাল ধরেই এরকম চলে আসছে, রণছোড়ের আগে অন্য সেপাই নিত। কেউ তোলা দিতে আপত্তি করলে তার দোকানটাই উঠে যায়। বাবার রণছোড় সিংকে বাধা দিতে গিয়েছিল, তাই নিয়ে গণ্ডগোলের শুরু। একে বলে পরের ব্যাপারে নাক গলানো। এক পুলিশকে পয়সা দেবে কি না দেবে, তা নিয়ে পশুপতি দাসের মাথাব্যথার কী দরকার ছিল।

পশুপতি দাস আট-দশ বছর কাজ করেছে যাত্রা দলে। এক সময় সেখানেও ঝগড়া মারামারি করে কাজ ছেড়ে চলে আসে। এখানে গণাবাবুর কাপড়ের দোকানে একটা চাকরি পেয়েছিল। জমি-জিরেত নেই কিছু, চাকরিটাই সম্বল। বড় ছেড়ে বাসুদেব ক্লাস টেন-এ পড়ে, কোনোক্রমে পাশটা করতে পারলে তাকেও গণাবাবু একটা কাজ দেবেন বলে রেখেছিলেন। গণাবাবু পশুপতির চোটপাটও সহ্য করতেন, কারণ লোকটা বিশ্বাসী। এই ভাবে তো চলছিল। কিন্তু কিছু লোকের যে পরের ব্যাপারে মাথা গলানোর অভ্যেস। নিজের স্বার্থে ঘা না লাগলেও অন্যের প্রতি অন্যায়ও সহ্য করতে পারে না। হাটের তোলা নিয়ে রণছোড়ের সঙ্গে বচসা। পশুপতিকে একটা খুব খারাপ গালাগালি দিয়ে রণছোড় তার পাছায় একটা লাথি কষিয়েছিল। আর যায় কোথায়। হাটের মধ্যে অত লোকজনের মাঝখানে রণছোড়কে বেধড়ক মারতে শুরু করে দিয়েছিল পশুপতি। যাত্রাদলের সেনাপতির পার্ট করেছে সে একসময়ে, তার গায়ের জোর কম নয়, রণছোড়ের তিনখানা দাঁত ভেঙে দিয়ে সে হাতের ধুলো ঝেড়েছিল।

পুলিশকে মেরে কে কবে পার পেয়েছে?

পশুপতিকে যখন দারোগাবাবু এসে ধরে নিয়ে যায়, তখন আলুবেচো দামু আর এক ডিমওয়ালি বুড়ি ছাড়া কেউ তার হয়ে একটাও কথা বলেনি। রণছোড় যাদের কাছ থেকে তোলা নেয়, তারা দূরে বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল। ওই দুজনের কথা গ্রাহ্য করেননি দারোগাবাবু পশুপতির চুলের মুঠি চেপে ধরেছিলেন। থানায় নিয়ে গিয়ে সব কটা সেপাই মিলে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলেছিল পশুপতিকে।

জজ সাহেব পশুপতির দেড় বছর কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন।

জজ সাহেবের কী সুন্দর চেহারা, একটা দারুণ সিল্কের জামা পরেছিলেন। সেদিন মা, দাদা, বিজু তিনজনেই গিয়েছিল আদালতে, শুধু পুতুল ছিল বাড়িতে। জজ সাহেব কয়েক পলক তাকিয়েছিলেন এই তিনজনের দিকে। বিজুর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখিও হয়েছিল, তবু তিনি এই দণ্ড উচ্চারণ করে হাতুড়ি ঠুকে দিলেন টেবিলে।

জজ সাহেব কি একবারও ভাবলেন না, রাগের মাথায় পশুপতি একটা কাণ্ড করে ফেলেছে বলে তাকে শাস্তি দেওয়া হল, কিন্তু এরপর তার সংসার চলবে কী করে? তার বউ-ছেলেমেয়েরা খাবে কী? তারা কি কোনো দোষ করেছে? আইন এসব মানে না। একজনকে শাস্তি দেয়। বিজুর খুব অভিমান হয়েছিল সেদিন।

ওদের পক্ষের উকিল বরদাবাবু বলেছিলেন, আমার জন্যই তোমরা বেঁচে গেলে, বুঝলে? পুলিশের গায়ে হাত তোলার কেস, এক সঙ্গে আরও অনেক কেস ঝুলিয়ে দিয়ে অন্তত সাতটি বছর ঘানি ঘোরাবার ব্যবস্থা করে দিত। আমার সওয়াল শুনেই তো হাকিম শাস্তি অত কমিয়ে দিলেন। আমি নিজে দুদিন আসামীকে দেখতে গেছি, নইলে হাজতেই ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলে সেপাইরা গায়ের ঝাল মেটাতো। ঠিক কি না?

অন্য উকিলরা মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন।

হয়তো উকিলবাবুর কথাই ঠিক। মায়ের দুখানি সোনার চুড়ি বেচে তাঁকে ফি দেওয়া সার্থক হয়েছে!

মায়ের আর কোনো গয়না নেই। আরও আট মাস একুশ দিন বাকি!

রাত্তিরে কী খাবে, সেটাই বিজুর প্রধান চিন্তা। দিনের বেলা তবু চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাত্তিরে পেট খালি থাকলে তো ঘুম আসে না।

ঘুম না এলে যত রাজ্যের ভয় এসে মাথা জুড়ে বসে। অনেক দূরে অশ্বত্থ তলায় শ্মশান। সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলে চিতার আগুন, ঘরে শুয়েও যেন দেখতে পাওয়া যায়।

—মা রাত্তিরে কী খাবো?

—দুটো বড় বড় পেঁপে আছে। সেদ্ধ করে নুন মরিচ দিয়ে মেখে দেব, দেখবি খুব ভাল লাগবে।

—শুধু পেঁপে সেদ্ধ? ভাত খাব না?

—বোকার মতন কথা বলিস না, বিজু। বড় হয়েছিস, এখনো বুঝিস না কেন? ঘরে এক দানা চাল না থাকলে কেউ ভাত খায়? বাসু ফিরে আসবে, চাল কিনে নিয়ে আসবে, হয়তো আজ সাড়ে সাতটার বাসেই.....।

বাবা জেলে যাবার আগে মাকে বলেছিল চোখ পাকিয়ে, যদি না খেয়ে মরতে হয়, তাও সই, তবু খবরদার কারুর কাছে ভিক্ষে করবে না। ফিরে এসে যদি শুনি আমার ছেলে-মেয়েরা ভিখিরি হয়ে গেছে, তা হলে তোমাকেই আগে খুন করবো।

এখন অবশ্য ওদের কেউ ভিক্ষেও দেবে না। প্রথম প্রথম গ্রামে কিছু লোক ওদের সাহায্য করেছে। কিন্তু মানুষের দয়া-মায়া বেশিদিন থাকে না, শুকিয়ে যায়। ছমাস ধরে কে ওদের সংসার টানবে। ঘটি-বাটি পর্যন্ত সব বিক্রি হয়ে গেছে, এখন কেউ ধারও দিতে চায় না। ধরণীকাকার বাড়িতে ভাত রান্না হয়, এ বাড়িতে সেই গন্ধ আসে। একটা বেড়াল ও বাড়ি থেকে মাছের কাঁটা মুখে করে এনে এ বাড়ির উঠোনে বসে খায়। ঊষা কাকিমা একদিন পুতুলকে এক বাটি চিঁড়ে দিয়েছিলেন, তারপর ধরণীকাকার কী চ্যাঁচামেচি!

বীণাপাণি অপেরা থেকে বাবা যখন ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে চলে আসে, তখন বাবার দু'শো সাতাশ টাকা মাইনে বাকি ছিল। বাবা বলতো, ও চশমখোরটার মুখও আমি দেখতে চাই না, তাই সেই টাকা আদায় করতে যায়নি কোনো দিন। বীণাপাণি অপেরার মালিক আবার মায়ের পিসতুতো দাদা হয় সম্পর্কে। মায়ের ধারণা তার সেই দাদাটি মানুষ খারাপ নয়, কিন্তু স্বামীর উগ্র মেজাজ দেখে সে কথা উল্লেখ করার সাহস হয়নি এতদিন। এখন বাঁকুড়ায় সেই দাদার কাছে একটা চিঠি লিখে বাসুকে পাঠানো হয়েছে। এ তো ভিক্ষে নয়, ধারও নয়, ন্যায্য পাওনা আদায়। বাসু যেখানে গেছে, সেটা তো এক হিসেবে তার মামাবাড়ি, ওরা বাড়ির দরজা থেকে বাসুকে ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু বাসু ফিরছে না কেন? একদিন যায়, দু'দিন যায় পাঁচদিন কেটে গেল। বাসুই তাদের শেষ আশা-ভরসা। দু'শো সাতাশ টাকা পেলে এই ক'টা মাস স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। বাসু অবশ্য বলে গেছে, মা, তোমাদের জন্য আমি একশো টাকার চাল কিনে দেব, তার বাকি টাকায় আমি ব্যবসা করবো। এই তো নতুন আলু উঠতে শুরু করেছে, গ্রাম থেকে আলু কিনে হাটে বিক্রি করলে কিছু লাভ থাকবেই। গনাবাবু তাঁর দোকানে পশুপতির ছেলেদের যেতে বারণ করে দিয়েছে, পুলিশ মারার কেস, এখন তাঁর দোকানের ওপরেই না পুলিশের কোপদৃষ্টি পড়ে। বাসু বসবে হাটের অন্য এক কোণে।

বাসু আসছে না, তার কি কোনো দুর্ঘটনা হল? কেই-বা খবর আনতে পারে, বাস ভাড়া দেবার মতন আর একটা পয়সাও নেই।

দুপুর থেকে পুকুর ধারে ছিপ ফেলে বসে আছে বিজু। এ পুকুরে মাছ নেই। পাঁচ শরিকের পুকুর, যে-যখন পারে বেড়া জাল টেনে দেয়। আগের গ্রীষ্মে এ পুকুরের জল কমে কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল, মাছ থাকবে কী করে?

তবু বিজু ফাৎনার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মনে মনে জপ করতে থাকে, হে ভগবান, একটা মাছ দাও। একটা বড় দেখে কাৎলা, অন্তত দেড় কেজি, একটা মাছ কি এই পুকুরে লুকিয়ে থাকতে পারে না? সে রকম একটা

মাছ পেলে, নিজেরা খাব না, মাছটা দৌড়ে মহাদেব সাউয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই অনেক চাল দেবে। ঝ.ন দুলে একবার নদীতে একটা দু'হাত লম্বা মৃগেল মাছ ধরেছিল, অতবড় মাছ কেনার খদ্দের হাটেও থাকে না। সে মহাদেব সাউয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলে ওরা খুশি হয়ে কিনে নিয়েছিল।

গলার মাদুলিটা চেপে ধরে বিজু বারবার বলতে লাগল, হে ভগবান, হে ভগবান, একটা মাছ দাও।

সকাল থেকে কিছুই খায়নি বিজু। এ পুকুর ধারে কলমি শাকও হয় না। ঘোষদের মিষ্টি পুকুরের পাড়ের কলমি শাকও ফুরিয়ে এসেছে। তারপর কী হবে? পুতুল সারাদিনে পাঁচবার বমি করেছে। পুতুলই কলমি শাক তুলে আনে, কিন্তু সে বেচারি নিজে কলমি শাক কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

এই গরমের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ একটা ভয়ের কাঁপুনিতে বিজুর শীত করছে। তারা সত্যি সত্যি মরে যাবে? যে-কথাটা মাকেও বলা যায় না, সেই কথাটাই বেশি ভয় ধরিয়ে দেয়। দাদা কি ইচ্ছে করে ফিরছে না? টাকাটা নিয়ে অন্য কোথাও সরে পড়েছে। দাদা ব্যবসা করতে চায়। ভাই-বোন-মায়ের জন্য বাজে খরচ না করে দাদা যদি পুরো টাকাটা নিয়ে অন্য কোথাও ব্যবসা করতে বসে যায়? বাবার ওপর দাদার রাগ ছিল, কিন্তু মাকে তো সে ভালবাসতো। তবু দাদা ফিরছে না কেন?

দাদা যদি সত্যিই না ফেরে তা হলে আর বাঁচার আশা নেই। সে আগে মরবে? মা প্রায়ই বলে, আমি মরলে তোরা আর এখানে থাকিস না। অন্য গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষে করিস। কোনো মন্দিরের চাতালে পড়ে থাকবি, কেউ তাড়িয়ে দেবে না।

রোগা হতে হতে মা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে চামড়ার তলার সব হাড়গুলো দেখা যায়। চোখ দুটো বেশি জ্বলজ্বল করে। তবু মা কাঁদে না কখনো, মহাভারত খুলে বসে থাকে। বিজুর ধারণা, আগে মরবে পুতুল। ও সব সময় কাঁদে, কোনো শব্দ করে না, অনবরত চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

জেলখানায় বিনা পয়সায় খেতে দেয়, বাবা দু'বেলাই খাচ্ছে। বেশ মজায় আছে। বাবা বেঁচে থাকবে। দাদা অতগুলো টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে, দাদা বেঁচে থাকবে। শুধু হারিয়ে যাবে, মা, পুতুল, আর বিজু। না না, না, বিজু কিছুতেই মরতে চায় না। হে ভগবান, বাঁচিয়ে দাও, তুমি এত কাজে ব্যস্ত, তবু আমাদের দিকে একবার তাকাও।

পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুঁড়িও যেন সব হজম হয়ে গেছে। তারপরেও আগুন জ্বলছে। শ্মশানের আগুনের মতন। মাঝে মাঝে মাথাটা ঝিম ঝিম করে, ঘুম পায়। বিজুর ধারণা, দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়লেই সে মরে যাবে। খিদের সময় সব কিছু খাওয়া যায় না কেন? গতকাল সে চুপি চুপি অনেকগুলো ঘাস তুলে চিবিয়ে খেয়েছিল, একটু পরেই বমি হয়ে গেল। গরু তো ঘাস খায়, তাদের বমি হয় না। আম গাছের পাতা খাওয়া যায়। তাতেও যদি বমি হয়! বমির সময় বড় কষ্ট, যেন গলার কাছটা কেউ মুচড়ে ধরে।

বিজু মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ নেই, রোদ্দুরে ঝকমক করছে। আকাশ খাওয়া যেত যদি। আকাশ খেলে বমি হতো না। তরমুজের ফালির মতন এক টুকরো আকাশ কেটে আনা যায় না?

হে ভগবান, আমাদের মেরো না, মেরো না, দাদাকে ফিরিয়ে দাও। দাদা কি মামাবাড়ি দুধ ভাত খাচ্ছে! না দাদা নিজেই হঠাৎ মরে গেছে। যদি টাকা নিয়ে ফেরার সময় ডাকাতে ধরে দাদাকে?

একটা মাছ, একটা মাছ, বড়-ছোট যে-কোনো মাছ, আয়, আয় আয়, মাছ আয়, মাছ আয়।

মহাদেব সাউয়ের মেয়ের বিয়েতে গ্রাম সুদ্ধু মানুষকে কত খাইয়েছিল। দাদা আর বিজু বসেছিল পাশাপাশি, শেষ পাতে একখানা লুচি আর সে খেতে পারেনি। দাদা বলেছিল ফেলিস না, খেয়ে নে, খেয়ে নে, বিজুর মুখে তখন রসগোল্লা, সে মাথা নেড়েছিল। কেন নষ্ট করেছিল সে দিন। সেই একখানা লুচি এখন যদি পেতো.......আর কোনোদিন সে লুচি খাবে না, ভাত খাবে না, কলমি শাক খেতে খেতে বমি করে মরে যাবে।

ঝপাস করে একটা শব্দ হল। ননীপিসি ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। উপুড় হয়ে ভাসছে, চুলগুলো কিলবিল করছে সাপের মতন, আর উঠছে না কেন? ননীপিসিও মরে গেল নাকি? বিজু জানে, সাঁতার শিখলে কেউ জলে ডোবে না। উপুড় হয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে কী করে ননীপিসি!

ভাসতে ভাসতে মাঝপুকুর পর্যন্ত গিয়ে ননীপিসি চিৎ হল। চিৎ সাঁতার কেটে ননীপিসি ফিরে এল ঘাটের কাছে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে আপন মনে ওঃ ওঃ শব্দ করছে। ননীপিসির কষ্ট হচ্ছে খুব। আজ সকালে বিজু পাশের বাড়িতে ঝগড়া শুনতে পেয়েছে, ননীপিসিকে কী জন্য যেন বকাবকি করছিল খুব ওর মা। এ গ্রামেও সবাই জেনে গেছে, ননীপিসিকে ওর স্বামী আর ফিরিয়ে নেবে না। সে দুর্গাপুরে চাকরি করে, মৃত সন্তানের জন্ম দেবার পর একবারও ননীপিসিকে দেখতে আসেনি।

এই ঘোর দুপুরে আর কেউ পুকুরে আসে না। ননীপিসি জলে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একা একা। এক একবার ডুব দিলে উঠছে না অনেকক্ষণ। কেউ জল তোলপাড় করলে তখন আর মাছ ধরার কোনো আশাই থাকে না। বিজু

এখন আর ফাৎনার দিকে তাকাচ্ছে না, ননীপিসিকে দেখছে। খিদের কথাটা এখন আর মনে করছে না। ননীপিসির মসৃণ ঘাড় আর কাঁধ, পাশ ফিরলে দেখা যায় দুধে ভরা দুই বুক। ননীপিসি লক্ষ্যই করেনি বিজুকে।

একটু পরে ননীপিসি ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে বসল। ওখানে বাটনা বাটা শিলের চেয়ে একটু বড় একটা পাথর রাখা আছে। মেয়েরা ওই পাথরটায় আছড়ে কাপড় কাচে, অনেকে জল ভর্তি ঘড়া রাখে, মাঝখানটায় একটু গর্ত মতন।

ননীপিসি সারা শরীর মুচড়ে মুচড়ে কাঁদছে তো কাঁদছেই। স্বামী না নিলে ননীপিসি কি সারাজীবন বাপের বাড়িতে থাকবে? ওর বাবা যে দারুণ কৃপণ সবাই জানে। ননীপিসিকে সবাই কষ্ট দেবে। ননীপিসির এত বড় শরীর, আস্তে আস্তে রোগা হয়ে যাবে। ঘোষেদের বাড়ির চারুপিসিকেও তার স্বামী নেয় না, তার খুব শুচিবাই, সবাইকে গালাগালি করে, এমনকি বাতাসকেও বকুনি দেয়। ননীপিসিও কি সেই রকম......

বিজু দারুণ চমকে উঠে দেখল ননীপিসি আঁচল সরিয়ে নিজের একদিকের বুক চেপে ধরলো এক হাতে। তারপর সেই বুক থেকে ছরছরিয়ে ঝরে পড়তে লাগল দুধ। ননীপিসি নিজের বুকের দুধ ফেলে দিচ্ছে। একবার এই বুক, একবার আর এক বুক। চোখ ঠিকরে আসছে বিজুর।

পাথরের খোঁদলে ঝরে পড়ছে সেই বুকের দুধ।

একটু পরে থেমে ননীপিসী এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পাথরটার দিকে। আর একটু কেঁদে উঠে দাঁড়াল।

বিজুর মনে পড়ে গেল ভুলি কুকুরটার কথা। সেটা যদি আশেপাশে থাকে, অমনি এসে চকাস চকাস করে ওই দুধটুকু চেটে খেয়ে নেবে। ননীপিসি ঘাট থেকে চলে যেতেই বিজু আর দেরি করল না। ছিপ ফেলে রেখে দৌড়ে সেখানে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। জিভ দিয়ে চাটতে লাগল সেই দুধ। নোনতা নোনতা লাগছে, তবু যেন তার শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা শব্দ পেয়ে মুখ তুলে দেখল। ননীপিসি ফিরে এসে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কুকুর হয়ে গেছে বিজু। এ তো ভিক্ষের চেয়েও খারাপ। ধরা পড়া চোরের মতন সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলতে লাগল, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি মরে যাচ্ছি, আমি মরে যাচ্ছি,

ননীপিসি কাছে এসে বসে পড়ল। যেন আগের কথাটা শুনতে পায়নি। সেইরকমভাবে জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে রে বিজু?

বিজুর ঠোঁটে লেগে আছে দুধ। সে আবার বলল, আমি কিছু খাইনি, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি, এবার ঠিক মরে যাবো।

ননীপিসির নিজেরই এখন খুব কষ্ট। অন্যের দুঃখের দিকে মন দেবার সময় নেই। তবু সে বলল, কেন, কিছু খাসনি কেন?

বিজু বলল, আমাদের কিছু নেই।

ননীপিসি বলল, আয়, আমাদের বাড়িতে আয়, এক বাটি মুড়ি দেব এখন।

বিজু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, তোমার বাবা বকবে। আমার মা-ও বকবে আমাকে।

ননীপিসি করুণ চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিজুর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বুকের আঁচলটা আবার সরিয়ে বলল, খিদে পেয়েছে, খা।

বাসনা

মাদারিপুর শহর থেকে পিতার সঙ্গে বাড়ি ফিরছে মহাদেব ঘোষাল। ব্রিটিশ আমলের পূর্ববঙ্গ, এই সব অঞ্চলে ট্রেন লাইন তো নেই-ই, বাসও চলে না, বর্ষাকালে নৌকোপথেই যাতায়াত করতে হয়। গ্রীষ্মকালে পায়ে হাঁটা বা গরুর গাড়ি। ঘোষালদের নিজস্ব নৌকো ও গরুর গাড়ি দুই-ই আছে। মহাদেব ঘোষাল কলকাতায় পড়াশোনা করে। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে সদ্য আবার গ্রামে ফিরেছে, তার বাবা তাকে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মাদারিপুর যেতে হয়েছিল জমি-জমা সংক্রান্ত একটি মামলার তদারক করতে।

নৌকোটি বেশ প্রশস্ত, ঠিক বজরা নয়, মাঝের অংশটি ছই-ঘেরা। আকাশ মেঘলা, গরম তেমন নেই, তাই মহাদেবের বাবা জগদিন্দ্র ঘোষাল ছই-এর বাইরে একটি বেতের চেয়ারে বসে হুঁকো টানছেন। কোঁচানো ধুতির ওপর হলুদ বেনিয়ান পরা, মাথার চুল তেল চপচপে, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হলেও জগদিন্দ্র ঘোষালের চুল পাকেনি, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, নাকের নিচে পাকানো গোঁফে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, কিছু মানুষের ওপর আধিপত্য করাই তাঁর স্বভাব।

মহাদেব নবীন যুবক, ফর্সা দোহারা চেহারা, চুলে অ্যালবার্ট কাটা। ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরে আছে, হাতে ঘড়ি। চটি খুলে সে নৌকোর গলুইতে বসে জলে পা ডুবিয়ে আছে। এ নদীতে কখনও সখনও কুমির দেখা যায় বটে, কিন্তু নৌকো থেকে মানুষ টেনে নেবার মতো ঘটনা কখনও শোনা যায়নি।

আড়িয়াল খাঁ নদীতে খানিকটা যাবার পর নৌকো একটা খালে ঢুকল। ঘোষালদের গ্রাম খুব বেশি দূরে নয়। খালপথে খানিকটা যাবার পর সোনাদিঘির বাঁধ। সোনাদিঘি এক মস্ত বড় জলাশয়। প্রায় একটা হ্রদের মতন। এই দিঘির গা ঘেঁষে খালটা চলে গেছে, কিন্তু খালের জল আর দিঘির জল যাতে মিশে না যায়, সেই জন্য এক জায়গায় বাঁধ দেওয়া আছে। প্রয়োজনে সেই বাঁধ খোলাও যায়, সেইখান দিয়ে নৌকো ঢোকে দিঘিতে।

এই দিঘিতে অনেকগুলি ঘাট, এক একটি বাড়ির নিজস্ব। কারও ঘাট বেশ বড় করে বাঁধানো, সিঁড়ি ও দু পাশে বসবার জায়গা, কারও ঘাটে শুধুই কয়েকটি তালগাছের গুঁড়ি ফেলা। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, কোনও ঘাটে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে, কোনও ঘাটে স্নান করছে নারী-পুরুষ। স্ত্রীলোকেদের জন্য আলাদা ঘাট নেই, তবে পুরুষ ও নারীরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্নান করতে আসে, যেন একটা অলিখিত নিয়ম আছে।

চক্রবর্তীদের ঘাটে এখন শুধু মেয়েরা স্নানে নেমেছে। বিভিন্ন বয়সের সাত-আটজন। মহাদেব জল থেকে পা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, জগদিন্দ্র ঘন ঘন হুঁকোয় টান দিচ্ছেন, একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে ঘোষালদের ঘাট, সেখানে দাপাদাপি করছে কয়েকটি কিশোর। মেয়েদের স্নানের দৃশ্যে পুরুষদের তাকাতে নেই। ব্লাউজ বা সায়া সেমিজ পরে মেয়েরা স্নান করতে আসে না, শুধু গায়ে একটি শাড়ি জড়ানো থাকে। জলে ভিজলে শরীরের রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং সেদিক থেকে পুরুষদের মুখ ফিরিয়ে রাখাই নিয়ম। তবে, আড়চোখে দু-একবার দেখবে না, এমন পুরুষও এ জগতে দুর্লভ।

জগদিন্দ্র, মহাদেব ও এই নৌকোর দাঁড়ি-মাঝি সকলেই চক্রবর্তীদের ঘাটের দিকে বেশ কয়েকবার চকিতে দৃষ্টিপাত করল। তার কারণ, সেখানে এক যুবতীকে দেখা যাচ্ছে, যাকে কেউ চেনে না। নতুন মুখ। কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, অন্যদের থেকে একটু আলাদা হয়ে। ষোড়শী বা সপ্তদশী হবে, বেশ স্বাস্থ্যবতী, এরই মধ্যে মাথার ঘন চুল চোখে পড়ার মতন, সেই চুলের পটভূমিকায় মুখখানি দেখলে রজনীগন্ধা ফুলের কথা মনে পড়ে।

জগদিন্দ্র তাঁর গোমস্তা হরিচরণকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই ছেমরিটা কে?

হরিচরণ দু দিকে মাথা নেড়ে বললেন, জানি না।

২

মহাদেব ঘোষালের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য ঘটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে পাত্রী দেখাও হয়ে গেছে তিন জায়গায়। মহাদেবের বয়স শিগগিরই তেইশ হবে। আর অপেক্ষা করা যায় না। জগদিন্দ্রর ইচ্ছে, তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান গ্রামে থেকে বিষয়-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। মহাদেব কলকাতা শহরের স্বাদ পেয়েছে, সে তার মাকে চুপি চুপি জানিয়ে রেখেছে যে, তার ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে চাকরি নেবে। কলকাতায় একটা আশ্রয়স্থল থাকলে ছোট ভাইবোনেরা সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। তার কাকা বিনয়েন্দ্র জমিদারির কাজ ভাল বোঝেন, তিনিই

এখানকার সব কিছু দেখাশোনা করতে পারবেন। তাছাড়া জগদিন্দ্রর স্বাস্থ্য এখনও যথেষ্ট ভাল আছে। অন্য কারও ভার নেবার প্রশ্নই ওঠে না আপাতত। প্রজারা জমিদারবাবু বলে সম্বোধন করলেও ঘোষালদের জমিদারি এমন কিছু বড় নয়। লাঠিয়াল নেই, বন্দুক পিস্তলও নেই।

আরও দুটি পাত্রী দেখা হল, পছন্দ আর হয় না কিছুতেই। একটি মেয়েকে যদি বা কিছুটা চোখে ধরেছিল, কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখা গেল, দুজনের একই রাশি। তা হলে তো আর প্রশ্নই ওঠে না।

চক্রবর্তীদের ঘাটের সেই তরুণীটি জলকন্যার মতন অদৃশ্য হয়ে যায়নি, তাকে চর্মচক্ষে আরও কয়েকবার দেখা গেছে। দিগম্বর চক্রবর্তীর বোন কিরণময়ীর বিয়ে হয়েছিল পাবনাতে, সম্প্রতি বিধবা হয়ে সে তিনটি সন্তান নিয়ে ফিরে আসে পিত্রালয়ে। তার বড় মেয়েটির নাম পুষ্পময়ী। স্নানের ঘাটে সেই কন্যাকে দেখার পর থেকে মহাদেবের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে, নানা ছুতোয় সে চক্রবর্তীদের বাড়ির পাশ দিয়ে দিনে দু-তিনবার হেঁটে যায়। কিন্তু তার এই দুর্বলতার কথা সে মা-বাবার কাছে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না, এ রকম বেয়াদপি ঘোষালবংশে কেউ কখনও করেনি।

মহাদেবের মা ছেলের বিয়ের জন্য উতলা হয়েছিলেন, পুষ্পময়ীর কথা তাঁরও কানে গেল। মেয়েটির শশীকলার মতন রূপ আছে তো বটেই, পাবনার স্কুলে সে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে, গানের গলাটিও বেশ। পাত্রী হিসেবে একেবারে আদর্শ বলা যেতে পারে। মহাদেবের মাকে পড়শিনীরা জনে জনে এসে বলে যেতে লাগল, ঘরের কাছেই এত ভাল মেয়ে থাকতে মহাদেবের জন্য আর পাঁচ জায়গায় পাত্রী খোঁজাখুঁজি করার দরকার কী? মহাদেবের মা দ্রবময়ীও একদিন চক্রবর্তীদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মেয়েটিকে দেখলেন, তার সহজ-সরল ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলেন, তার মুখে 'হৃদি বৃন্দাবনে বাস' গানটি শুনে বললেন, আহা কলের গানও এত মিষ্টি শোনায় না।

কিন্তু বাধা আছে কয়েকটা। দিগম্বর চক্রবর্তী তার বিধবা বোনকে পুত্রকন্যা সমেত আশ্রয় দিতে পারে বটে, কিন্তু ভাগনির বিয়েতে টাকাপয়সা বিশেষ খরচ করতে পারবে না। মহাদেব বি. এ. পাস পাত্র, তার জন্য যে-কোনও মেয়ের বাপই বিশ-পঁচিশ ভরি সোনার গয়না দিতে প্রস্তুত, তার ওপর পণের টাকা তো আছেই। দরাদরি করেও হাজার পাঁচেক পাওয়া যাবেই, সে সব কি ছাড়া যায়? জগদিন্দ্র রাজি না হলেও দ্রবময়ীর এতই পছন্দ হয়েছে মেয়েটিকে যে তিনি ওসব ছাড়তেও রাজি। এর পরেও বিভিন্ন দূত মারফত জানা গেল যে পুষ্পময়ীর মা এই মেয়ের বিয়ের জন্য পনেরো ভরির গয়না আলাদা করে রেখেছেন, প্রণামীর কুড়িখানা শাড়ি ধরা আছে, পণের টাকাও হাজার দু-এক জোগাড় করা যাবে, পঞ্চাশজন বরযাত্রী খাওয়াবার ব্যবস্থা হবে। আর কী চাই? দ্রবময়ী স্বামীকে ধরে বসলেন, তুমি রাজি হয়ে যাও।

জগদিন্দ্র রাজি নন। দ্বিতীয় বাধাও আছে। দিগম্বর চক্রবর্তীর বোনের বিয়ে হয়েছিল ভট্টাচার্য পরিবারে। ভট্টাচার্যরা ব্রাহ্মণ হলেও ঘোষালদের সমতুল্য নয়। দিগম্বর চক্রবর্তী নিজেই ভঙ্গকুলীন, তাদের সঙ্গে ঘোষালদের বিবাহ সম্পর্ক হয় না।

দ্রবময়ী এই বাধাটিকেও গুরুত্ব দিলেন না। ছেলে যে কলকাতা শহরে গিয়ে হুট করে নিজের পছন্দ মতন কোনও খেঁদি-পেঁচিকে বিয়ে করে আসেনি, সেই তো যথেষ্ট। ভঙ্গকুলীন নিয়ে অত খুঁতখুঁতুনি আর এ যুগে চলে না। জগদিন্দ্রর আপন জ্যাঠা তাঁর এক মেয়েকে ভঙ্গকুলীনের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, তা মনে নেই?

জগদিন্দ্র তবু দৃঢ়ভাবে দু দিকে মাথা নাড়ালেন।

ইতিমধ্যে চারি চক্ষুর মিলন ঘটে গেছে। একবার চক্রবর্তীদের বাড়ির পিছনের সুপুরি বাগানে, কোনও কথা হয়নি অবশ্য, দুজনেরই বুক ধক ধক করেছিল। আর একবার সীতাপতি রায়ের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নির দিনে। গ্রামসুদ্ধ সবার নিমন্ত্রণ ছিল, মহাদেব পুষ্পময়ীর খুব কাছে চলে এসেছিল, এত কাছে যাতে ওর শরীরের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তবু কথা বলতে পারেনি। পুষ্পময়ী চোখ তুলে তাকিয়েছিল, সে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল কোমল আলো।

সোনালি স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিল মহাদেব। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নেবে মহাদেব, সে বাড়ির সঙ্গে একটা বাগান থাকবে। সওদাগরি অফিসের চাকরি সেরে প্রতিদিন সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে আসবে মহাদেব, বাগানে দাঁড়িয়ে থাকবে পুষ্পময়ী, বনদেবীর মতন দু হাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করবে...। মহাদেব জানে, মায়ের যখন পছন্দ হয়েছে, তখন আর মহাদেবকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না। বাবা বাইরে যতই প্রতাপ দেখান, অন্দরমহলে মায়ের কাছে তাঁর বিশেষ জারিজুরি খাটে না।

কিন্তু জগদিন্দ্র ঘোষাল আপত্তিতে অনড় হয়ে রইলেন। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে কারুকে কিছু না জানিয়ে তিনি কোটালিপাড়া গ্রামে গিয়ে এক চাটুজ্যেবাড়ির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এলেন। চাটুজ্যেরা বেশ গরিব, চোদ্দ ভরির বেশি সোনা দিতে পারবে না, পণ মাত্র তিন হাজার। প্রণামী দশখানা, সে মেয়েও এমন কিছু ডানাকাটা পরী নয়।

পাকা কথা দিয়ে এসেছেন, তার ওপর কোনও কথা চলে না। মহাদেব কাঁদল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে খালপাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তবু বাবার ইচ্ছের প্রতিবাদ করতে পারল না। জগদিন্দ্রর জেদ বজায় রইল, সতেরো দিনের মাথায় মহাদেবের সঙ্গে বীণাপাণির পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল।

সকলেই আড়ালে বলতে লাগল, বীণাপাণির চেয়ে পুষ্পময়ীর সঙ্গেই মহাদেবকে মানাত ভাল। বীণাপাণির গায়ের রঙ মাজামাজা হলেও চোখ দুটো ছোট, সে কখনও প্রাণ খুলে হাসে না, কারণ সে বেচারির ডান পাশের একটা দাঁত ভাঙা, সেই ভাঙা দাঁত দেখাতে সে লজ্জা পায়। গয়না বা টাকাও বেশি পাওয়া যায়নি, তবু পুষ্পময়ীকে বাদ দিয়ে ওই চাটুজ্যেবাড়ির মেয়েকে বউ করে আনার জন্য জগদিন্দ্র কেন জেদ ধরে রইলেন, তা বোঝা গেল না, সেটা রহস্যই রয়ে গেল।

আসল কারণটা জগদিন্দ্র ছাড়া কেউ কোনও দিনই জানবে না।

সেই প্রথমদিনে নৌকো করে আসার সময় সোনাদিঘিতে চক্রবর্তীদের ঘাটে নতুন মেয়েটিকে দেখে সহসা মুগ্ধ হয়েছিলেন জগদিন্দ্র। এক কোমর জলে দাঁড়ানো সেই কন্যার ঝলমলে যৌবনের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই জগদিন্দ্র কামমোহিত হয়েছিলেন, তাঁর পৌরুষ দপ করে জ্বলে উঠেছিল। তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। জগদিন্দ্র মান্যগণ্য ব্যক্তি। পরের বাড়ির কুলবালার প্রতি কুনজর দেওয়া তাঁকে মানায় না। কাম প্রবৃত্তি বশে সজ্ঞানে পরনারী হরণ করাও তাঁর স্বভাব নয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে একাধিক বিবাহ করা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, তাঁর বাপ-জ্যাঠার তিনটি করে স্ত্রী ছিল, কিন্তু জগদিন্দ্র সে চিন্তা কখনও মনে স্থান দেননি। কিন্তু কোনো নারীকে দেখে মুগ্ধ হওয়াটা তো দমন করা যায় না। শরীর যদি উত্তেজিত হয়, সেটাও শরীরের ধর্ম। তবু শরীরের তাড়নায় জোর করে সেই নারীকে ভোগ করার জন্য কখনও ছুটে যাননি জগদিন্দ্র, কেউ তাঁকে বর্বর, লম্পট বলতে পারবে না।

যে যুবতীকে দেখে তিনি মনে মনে কামবোধ করেছিলেন, তাঁকে কি নিজের পুত্রবধূ করে ঘরে আনা যায়? বাড়ির মধ্যে ঘুরতে ফিরতে তাকে দেখা যাবেই, যদি আবার বিচলিত হয় শরীর? পুত্রবধূ তো কন্যাসমা, কিন্তু পুষ্পময়ীকে সেই চক্ষে দেখেননি জগদিন্দ্র। না, ও মেয়েকে বাড়িতে আনা চলে না। মাঝে মাঝে তামাক টানতে টানতে একলা বসে অন্যমনস্ক হয়ে যান। লজ্জায়, অনুতাপে, ধিক্কারে তাঁর মন ভরে যায় তখন। তিনি নিজেও খুব ভালই বুঝেছিলেন যে ওই পুষ্পময়ীর সঙ্গেই মহাদেবের বিয়ে দিলে অনেক ভাল হত। রাজযোটক হত। তাঁর নিজের দোষেই তা হতে পারল না।

৩

মহাদেবের বিয়ের দেড়মাস পরেই পুষ্পময়ীরও বিয়ে হলে গেল এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে। ছেলেটির নাম ভবানীপ্রসাদ, বাড়ি কুমিল্লায়, এই গ্রামে সে এসেছিল তার দিদিকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে। ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে পুষ্পময়ী চলে গেল কুমিল্লায়, যাবার সময় সে খুব কেঁদেছিল। তাদের নৌকো যখন সোনাদিঘি ছেড়ে যায়, সেই সময় ঘোষালদের ঘাটে দাঁড়িয়েছিল মহাদেব। পাথরের মূর্তির মতন স্থির। দুজনেরই শরীর থেকে বেরিয়ে বিদেহী আত্মার মতন তাদের বাসনা জড়াজড়ি করে রইল শূন্যে।

কলকাতা শহরে আর যাওয়া হল না মহাদেবের, হঠাৎ শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন শহর ছেড়ে অনেকেই গ্রামে পালাচ্ছে। মহাদেব ঘোষাল মাদারিপুর ট্রেজারিতে একটা চাকরিও পেয়ে গেল। বীণাপাণিকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে কি অসুখী হয়েছে মহাদেব ঘোষাল? তা ঠিক বলা যাবে না। স্বামীর সেবাযত্নে বীণাপাণির কোন ত্রুটি নেই। সে ভাল লেখাপড়া জানে না, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়তে গেলে মানে বোঝে না, মহাদেব শেকসপিয়র আবৃত্তি করে শোনালে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে, সে গানও জানে না, কিন্তু তার রান্নার হাত চমৎকার। অচিরেই সে সুগৃহিণী হিসেবে এই সংসারে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করল। পর পর তিনটি সন্তানের জন্ম দিল সে।

মহাদেব মাদারিপুরে বাসা ভাড়া করে একলা থাকে, সপ্তাহান্তে বাড়িতে আসে। কিন্তু পুষ্পময়ীকে নিয়ে দেখা তার সোনালি স্বপ্নটা কিছুতেই মুছে যায় না। ভবানীপুরের সেই কল্পিত বাড়িটি সে এখনও দেখতে পায়, সেখানে বাগানের ঘন গাছপালার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পময়ী, দুটি হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে।

অফিসের কাজে তাকে একবার যেতে হয়েছিল কুমিল্লায়। ইস্কুলমাস্টার ভবানীপ্রসাদের বাড়ি খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন নয়। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন দেখা সাক্ষাতে কোনও দোষ নেই। গ্রাম সম্পর্কে কুটুমের বাড়িতে তো লোকে যায়ই। মহাদেব তবু গেল না। পুষ্পময়ীকে পরস্ত্রী হিসেবে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। ডাকবাংলায় সারা রাত তার ঘুম এল না। ছটফট করল বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে সে ফিসফিস করে ডাকতে লাগল, পুষ্পময়ী, পুষ্পময়ী।

পুষ্পময়ী সম্পর্কে আকর্ষণের এই তীব্রতায় নিজেই অবাক হয়ে যায় মহাদেব। বিয়েটা নিয়তির ব্যাপার। যার সঙ্গে যার কপালের লেখা থাকে, তার সঙ্গেই বিয়ে হয়।

পুষ্পময়ীকে ভাল লেগেছিল, কিন্তু কপালে নেই। তাকে স্ত্রী হিসেবে পাবে কী করে? তার নিজের স্ত্রী এখন গর্ভবতী। পুষ্পময়ীর সঙ্গে হয়তো আর কোনওদিনই দেখা হবে না। তবু মনে পড়ে। তার কথা কেন এত মনে পড়ে?

পুষ্পময়ীর জীবনও সুখের হল না। ভবানীপ্রসাদের সংসারটি সচ্ছল নয়, তাও পুষ্পময়ী মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তার স্বামীটি একেবারেই রসকষহীন। ভবানীপ্রসাদ বেশি কথা বলে, সর্বক্ষণ কথা বলে, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বললেও সে কিছুতেই থামতেই চায় না। সে গানবাজনার ধার ধারে না। ইস্কুলে সে অঙ্ক পড়ায়, বাড়িতেও সে দু-চার পয়সা খরচ করতে হলেও অঙ্ক কষে। অন্যদিক দিয়ে অবশ্য মানুষটি খারাপ নয়। মায়া দয়া আছে, সচ্চরিত্র। পুষ্পময়ীর অসুখী হবার কারণটি তার নিজস্ব।

সবাই ধরেই নিয়েছিল, মহাদেবের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তার এক মামাতো বোন বলেছিল, তুই কী ব্রত করেছিলি রে পুষ্প, একেবারে সাক্ষাৎ মহাদেবের মতন স্বামী পাবি! মহাদেবের সঙ্গে সামনাসামনি কখনও কথা বলেনি পুষ্পময়ী, দূর থেকে অনেকবার দেখেছে। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, গম্ভীর, লেখাপড়া জানার ছাপ আছে তার মুখে। একদিন দুপুরে সে দেখেছিল, মহাদেব একটা আমলকি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আপনমনে কবিতা আবৃত্তি করছিলঃ 'কে যেন আমারে এনেছে ডাকিয়া ভুলে...।' দূর থেকে দাঁড়িয়ে পরম তৃষিতের মতন শুনেছিল পুষ্পময়ী। সেদিনই সে মহাদেবকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল। সেই মানুষটি তাকে এতবড় আঘাত দিল? তার বাবা অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করলেও সে একবারও প্রতিবাদ করল না? যাক, যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফেরানো যাবে না! হিন্দুর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মেছে, যে পুরুষ সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গেই সারা জীবন কাটাতে হবে। গর্ভে ধারণ করতে হবে তার সন্তান।

বিয়ের পর পরপুরুষের কথা চিন্তা করতে নেই। পুষ্পময়ীও মহাদেবকে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করল। শুধু অপমানের কাঁটাটা বুকে বাজে। মহাদেব ঘোষাল তাকে অবহেলা করে অন্য নারীকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিল বাপের সুপুত্র হয়ে? না, ও নাম আর সে মনে করবে না।

কিন্তু মনকে শাসন করার কোনও উপায় আজ অবধি বেরিয়েছে কি? এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল যাতে পুষ্পময়ী ভয়ে কেঁদেকেটে অস্থির। বিয়ের কয়েকদিন পরে, স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়েছে, ঘর অন্ধকার, সেই রতিক্রীড়ার সময় পুষ্পময়ীর হঠাৎ মনে হল, ভবানীপ্রসাদ নয়, যেন মহাদেব ঘোষাল তার সঙ্গে সঙ্গম নিরত। অন্ধকারেও পুষ্পময়ী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মুখ।

একথা কি কারুকে বলা যায়? ছি ছি, কী পাপ, কী পাপ! পুষ্পময়ী নিভৃতে কেঁদে ভাসাল, দেয়ালে মাথা ঠোকে। তবু এর পরেও আর একদিন, অবিকল সেইরকম, তার বুকের ওপর ভবানীপ্রসাদের বদলে সে দেখতে পায় মহাদেবকে। ভবানীপ্রসাদ ফিসফিস করে কী সব বলছে, অথচ পুষ্পময়ী শুনতে পাচ্ছে মহাদেবের কণ্ঠস্বর।

পুষ্পময়ী লজ্জা, আত্মগ্লানি, অপরাধবোধে একা একা ভোগে। তার আর একটা ভয় হল, এরপর যদি তার একটি ছেলে জন্মায়, যদি তার মুখে মহাদেবের আদল আসে? যে আসবে, সে কি মহাদেবেরই সন্তান হবে? এই লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা।

যথাসময়ের একটু আগেই পুষ্পময়ীর সন্তান প্রসব হল, ছেলে নয়, মেয়ে। পুষ্পময়ীর আর আত্মহত্যা করা হল না। তার পাপ গোপনই রয়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার এক বছর পরেই শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। তারপর খুব হুড়োহুড়ি করে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা। কারা কোথায় বসে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে দেশ ভাগ করল, তা এই সব গ্রামের মানুষ কিছু জানলই না। দেশ বিভাগ এমনকি স্বাধীনতারও তাৎপর্য প্রথম প্রথম বোঝা যায়নি। চতুর্দিকে নানারকম গুজব। কারা যেন রটিয়ে দিতে লাগল, পূর্ববাংলা এখন পাকিস্তান, এটা মুসলমানদের দেশ হয়ে গেছে। এখানে হিন্দুরা আর থাকতে পারবে না। তাই শুনে জগদিন্দ্র ঘোষাল চোটপাট করে বলেন, কী, আমাদের সাতপুরুষের বসতবাড়ি, এখান থেকে কে আমাদের তাড়াবে? আসুক দেখি! কয়েকখানা বর্শা ও একটা তলোয়ার আছে বাড়িতে, তিনি সেগুলোকে শান দিতে লাগলেন। স্বাধীনতার পরে দাঙ্গা আরও বেড়ে গেল। পশ্চিমবাংলায়, বিহারে দাঙ্গা হয়, তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানে। শহর থেকে ক্রমশ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। বাইরে থেকে একদল দাঙ্গাকারী যখন এ গ্রামে হামলা করতে এল, স্থানীয় মুসলমানরাই ঘোষালদের বাড়ি ঘিরে রক্ষা করল।

দূর-দুরান্ত থেকে নানারকম খবর আসে। কুমিল্লার ভয়াবহ দাঙ্গার খবর শুনে মহাদেব দারুণ আশঙ্কায় মুষড়ে পড়ে। পুষ্পময়ীরা কেমন আছে? মহাদেবের ইচ্ছে করে কুমিল্লায় ছুটে যেতে। যাওয়া হয় না অবশ্য। কয়েক বছর টিকে থাকার পর পঞ্চাশ সালে অবস্থা মারাত্মক হল। গ্রামের শুভার্থী মুসলমানরাই একদিন জগদিন্দ্র ঘোষালকে বলল, কর্তা, আর বুঝি ঠেকানো যায় না। কারা গ্রামে গ্রামে আগুন ছড়াচ্ছে বুঝি না—চক্রবর্তীরা, রায়েরা, ব্যানার্জিরা, চৌধুরিরা এর মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। গ্রাম প্রায় ফাঁকা। প্রতি রাতেই দূরে দূরে দেখা যায় আগুনের শিখা, মানুষের গর্জন আর আর্ত চিৎকার। আর ভরসা করা যায় না। একদিন সকালে দুটি বড় বড় নৌকোয় জিনিসপত্র ও কাচ্চাবাচ্চা

সমেত তেরো জনকে তুলে ঘোষাল পরিবার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি দিল অনিশ্চয়তার দিকে। সোনাদিঘির বাতাস ভরে রইল কান্নায়।

জগদিন্দ্রর ছোট ভাই বিনয়েন্দ্র শুধু রয়ে গেলেন। তিনি বিয়ে করেননি, তিনি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নন। মরতে হয়, এখানেই মরবেন।

নৌকো দু খানি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছতে পারল না। লুট হয়ে গেল মাঝপথে। তখনকার মতন সবাই প্রাণে বাঁচলেও বেনাপোলে এসে কলেরায় মারা গেল মহাদেবের একটি ভাই। ভারতের মাটিতে পা দেবার পরেও মহাদেব দেখলে, তার সামনে গভীর অন্ধকার।

৪

রিফিউজি কলোনিতে কিছুতেই থাকতে রাজি নন জগদিন্দ্র ঘোষাল। বারো জাতের লোকের সঙ্গে মিশে, সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে ভিখিরিদের মতন লাইনে দাঁড়িয়ে ডোল নিতে হবে, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। হুন্ডি করে আগে থেকে দু হাজার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুটপাট হবার পরেও বীণাপাণি কিছু গয়না বাঁচিয়ে রেখেছে, তা দিয়ে যে কটা দিন ভদ্রলোকের মতন বাঁচা যায় বাঁচবে। তারপর সবাই মিলে গলায় দড়ি দেবে।

ভবানীপুরের সেই বাগানওয়ালা স্বপ্নের বাড়ি নয়। দু খানা মাত্র ঘর ভাড়া নেওয়া হল নারকেলডাঙায়। পাকা বাড়ি, ওপরে টালির ছাদ, পাশেই বিশাল বস্তি। লোকসংখ্যা যেমন হু হু করে বাড়ছে কলকাতায়, তেমনই বাড়ছে বাড়িভাড়া। নারকেলডাঙার এই বাড়িটাতে আরও তিনটি পরিবার ভাড়া থাকে, একটিমাত্র টিউবওয়েল, জলের জন্য প্রতিদিন ঝগড়া হয়।

সাড়ে তিন মাস ঘোরাঘুরি করার অতি কষ্টে একটা চাকরি জোগাড় করল মহাদেব ঘোষাল, মার্চেন্ট অফিসে কেরানিগিরি, একশো বত্রিশ টাকা মাইনে। পাঁচটি ভাইবোন, নিজের তিনটি ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা, স্ত্রী, এতগুলি মানুষের সংসার। জমানো টাকা এর মধ্যেই প্রায়ই ফুরিয়ে এসেছে, বাড়ি ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হবে। মাথা উঁচু করে, বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এরকম অনেক পরিবারই বেশিদিন টিকতে পারেনি। নীচে নেমে গেছে। দারিদ্র্য বড় চরিত্র নষ্ট করে দেয়। এসব পরিবারের ছেলেরা ছিঁচকে চোর কিংবা গুণ্ডা মাস্তান হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়পুষ্ট হয়ে খুন-টুন করতেও শেখে, বোমা-পাইপগান তৈরিতে হাত পাকায়। মেয়েগুলো রাতারাতি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মহাদেব প্রথমেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, একবেলা না খেয়ে থাকবে তবু সই, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের কিছুতেই অধঃপাতে যেতে দেবে না। এই অচেনা জায়গায় নির্বান্ধব পরিবেশে সসম্মানে টিকে থাকার একটা উপায় আছে, লেখাপড়া শিখতে হবে, লেখাপড়া শিখে অন্যদের ওপর টেক্কা দিতে হবে।

কঠোর শাসন প্রবর্তন করল মহাদেব। ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া কেউ যখন তখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না। বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা সে নিজে তাদের পড়াশুনো দেখবে। একটা চাবুক জোগাড় করে রেখেছে। অবাধ্য সন্তানদের সে চাবুক মারতেও দ্বিধা করে না। ভাইবোনরাও তাকে যমের মতন ভয় পায়।

এত শাসন সত্ত্বেও মহাদেবের একটা বোন পালিয়ে গেল বস্তির এক ড্রাইভারের সঙ্গে। দুটি বোনই বিবাহযোগ্যা, তার মধ্যে ছোট বোনটাই এই কীর্তি করল। অন্য বোনটির বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই। সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে মহাদেবের বাবা জগদিন্দ্র ঘোষালের। অত দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি একেবারে চুপসে গেছেন, ছ-মাসের মধ্যেই রোগা হয়ে গেছেন দারুণ, কথাবার্তাও প্রায় বলেন না। তাঁর মেয়ে কোন অজাত-কুজাতের সঙ্গে পালাল, তা নিয়ে তর্জন-গর্জন না করে তিনি নিঃশব্দে কাঁদলেন কয়েকটা দিন। দুটি মাত্র ঘরে এতজনের ঠাসাঠাসি, তিনি সারাদিন বাড়ির বাইরের রকে বসে থাকেন। তামাক খাওয়া বন্ধ, তাঁরই বয়সি আর একজন বৃদ্ধ তাঁকে মাঝে মাঝে এক-আধটা বিড়ি দেয়। সেই বিড়ি ধরাবার সময় তাঁর হাত কাঁপে।

লালবাজারের কাছে মহাদেবের অফিস। পয়সা বাঁচাবার জন্য সে ট্রামে বাসে চড়ে না, হেঁটে বাড়ি ফেরে। একদিন ছুটির পর খুব বৃষ্টি নামল। রাস্তায় একটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে মহাদেব, ধুতির ওপর একটা মলিন পাঞ্জাবি পরা, পায়ে রবারের চটি, আগেকার মতন স্বাস্থ্যও তার নেই। ভিড়ের মধ্যে সে অতি সাধারণ, কেউ তার দিকে চেয়েও দেখবে না। কেউ বিশ্বাসও করবে না, মাত্র কয়েক বছর আগে সে ছিল এক গ্রামের জমিদারপুত্র, রাস্তা দিয়ে গেলে প্রজারা তাকে নমস্কার ও সেলাম জানাত।

হঠাৎ মহাদেবের বুকটা ধক করে উঠল। ছাতা মাথায় দিয়ে এক মহিলা একটি শিশুর হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাম স্টপেজের দিকে। পুষ্পময়ী না? মহাদেবের ইচ্ছে হল দৌড়ে যেতে, তক্ষুনি মহিলাটি একবার মুখ ফেরাল না, চেহারার কিছুটা মিল থাকলেও অন্য নারী। মহাদেব তবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে দিকে। কোথায়, কেমন আছে

পুষ্পময়ী? কুমিল্লার কোনও খবর পাওয়া যায় না। বুক মুচড়ে মুচড়ে মহাদেব অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, পুষ্পময়ী, পুষ্পময়ী!

এত দারিদ্র্য, হতাশা, এত তিক্ততা, তবু যৌবনের স্বপ্ন একেবারে হারিয়ে যায় না। পুষ্পময়ীর কোমল মুখখানি ফিরে ফিরে আসে তার কাছে।

পুষ্পময়ীরও মুখ অবশ্য তেমন কোমল আর নেই। কুমিল্লা ছেড়ে তারাও চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবে ভবানীপ্রসাদ কলকাতার দিকে না এসে, আশ্রয় নিয়েছে ত্রিপুরায়। ওদিক থেকে কাছাকাছি হয়। ভবানীপ্রসাদের এক আত্মীয় আগরতলায় আগেই গিয়ে একটা মনোহারি দোকান খুলেছিল। ভবানীপ্রসাদ সেখানে হিসেব রাখার কাজ পেল। অতি সামান্য কাজ। সেই আত্মীয়ের বাড়িতেই আশ্রয়। এর মধ্যে তার তিনটি সন্তান জন্মেছে, কিন্তু তার পুত্রভাগ্য নেই, তিনটিই মেয়ে। পুষ্পময়ীর রূপ ঝরে গেছে। বিবর্ণ শালিখ পাখির মতন চেহারা। মাঝে মাঝে তার মাথার গোলমালও দেখা দেয়। তখন সে পাগলের মতন মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁদে, মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়। আবার পরপর বেশ কিছুদিন সে ভাল থাকে। রান্নাবান্না তো করেই, মেয়েদের গান শেখাতে বসে।

ভবানীপ্রসাদকে সারাদিন দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে পুষ্পময়ী তার পা টিপে দেয়।

রাত্তিরের দিকে পুষ্পময়ীর পাগলামি বাড়ে। বিশেষত যে সব রাতে ভবানীপ্রসাদ তার সঙ্গে উপগত হতে চায়। এই শারীরিক প্রক্রিয়াটি পুষ্পময়ীর কাছে তখন বিভীষিকা। অন্য সময়-ভুলে গেলেও ওই সময় মহাদেবের মুখ তার মনে পড়বেই। দিনের পর দিন এই পাপ সে সহ্য করতে পারে না, আবার মরতেও পারে না মেয়েদের মুখে চেয়ে। অন্ধকারে মশারির মধ্যে ভবানীপ্রসাদ যখন তাকে বুকে টেনে নিতে চায়, তখনই পুষ্পময়ী ছটফট করে বিছানা থেকে নেমে আসে। দৌড়ে বাইরে চলে যায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদে। ভবানীপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারে না। তবু নিজের স্ত্রীকে সে ছাড়বে কেন? আর একটি সন্তান তার চাই-ই চাই। সে সন্তান নিশ্চয়ই ছেলে হবে। ভবানীপ্রসাদ স্ত্রীকে পাগলামির ওষুধ খাওয়ায়।

পুষ্পময়ীর মেয়ে তিনটি বেশ ভাল হয়েছে। তারা মাকে খুব ভালবাসে। মায়ের পাগলামির উপক্রম দেখা দিলে তারা মাকে জড়িয়ে ধরে। তারা লেখাপড়া শিখছে, গান শিখছে।

বছর তিনেক বাদে একটা খুব ভাল ব্যাপার ঘটে গেল। পুষ্পময়ীর বড় মেয়ের নাম শুভ্রা। গানে ও নাচে তার বেশ নাম হয়েছে। মেজ মেয়ে দীপালি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করে। স্থানীয় লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হবে, সেখানে শুভ্রাকে একটা নৃত্যনাট্যে অংশ নিতে হবে। শুভ্র অনেকটা মায়ের রূপ পেয়েছে, তার গান ও নাচ দেখে সবাই মুগ্ধ। একটা মেডেলও দেওয়া হল তাকে।

দু দিন পর তাদের বাড়ির সামনে একটা জিপ গাড়ি থামল। তার থেকে নামল এক পুলিশ সাহেব। পুলিশ দেখলেই সবাই ভয় পায়। কিন্তু পুলিশ সাহেবটি বিনীতভাবে ভবানীপ্রসাদকে বললেন, শুভ্রার গান শুনে তাঁর স্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে, শুভ্রাকে তাঁরা ছেলের বউ হিসেবে চান। তাঁদের ছেলে সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, ছেলেরও অমত নেই।

ভবানীপ্রসাদ আকাশ থেকে পড়লেন। পুলিশরা বড়লোক হয়, ভবানীপ্রসাদ দারিদ্র্যের একেবারে নীচের তলায়। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র মানে আকাশের চাঁদ। শুভ্রার বয়েস মাত্র পনেরো, আজকাল এই বয়েসের কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না।

তবু বিয়েটা হয়ে গেল। পুলিশ সাহেবের কোনো দাবিদাওয়া নেই, তাঁরা শুধু মেয়েটিকে চান। বিয়ের দিনে তাঁরাই সোনা মুড়ে শুভ্রাকে সাজিয়ে দিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর শুভ্রা স্বামীর সঙ্গে চলে গেল জামশেদপুর। সঙ্গে নিয়ে গেল একেবারে ছোট বোনটিকে। সেখানে সে তাকে পড়াবে। পুষ্পময়ী বারান্দায় পা ছড়িয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে উদাস চোখে। যেন সে বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। মেজ মেয়ে দীপালি এসে তার গা ঘেঁসে বসে জিজ্ঞেস করে, মা, তুমি কী ভাবছ? পুষ্পময়ী ঘোর ভেঙে বলে, আয়, তোকে একটা কবিতা শেখাই।

'কে যেন আমারে এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে—'

৫

মহাদেবের বড় ছেলের নাম অনঙ্গ। স্কুল ফাইনালে সে নবম স্থান অধিকার করে নারকেলডাঙার ধনপতি বিদ্যালয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ফেলল। গত দু বছর এই স্কুল থেকে একটি ছেলেও ফার্স্ট ডিভিসন পায়নি। অনঙ্গের সাফল্যের জন্য স্কুলের কৃতিত্ব অবশ্য কিছু নেই প্রায়, কোনও প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ্যও তার ছিল না, সে পড়েছে তার বাবার কাছে। পুরনো আমলের বি. এ. পাস মহাদেব, অঙ্ক আর ইংরিজি গ্রামার খুব ভাল জানে। অনঙ্গ আই এসসিতে তৃতীয় এবং বি এসসিতে কেমিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট হল। এখন আর তার পড়াশুনোর কোনও খরচ লাগে না, বরং স্কলারশিপের টাকা থেকে কিছু কিছু সংসারকে দেয়। মহাদেব যা চেয়েছিল, তা মোটামুটি পূর্ণ হতে চলেছে, তার

কড়া শাসনে এই ঘোষাল পরিবারটি নীচের দিকে নেমে যায়নি, ছেলেমেয়েরা কেউ লুচ্চা লুমপেন হয়নি। আধপেটা খেয়ে ছেঁড়াজামা গায়ে দিয়েও পড়াশোনা আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

পরিবারটি ছোট হচ্ছে ক্রমশ। জগদিন্দ্র নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন কিছুদিন আগে। মহাদেবের পরের দুটি ভাই আই এসসি পর্যন্ত পড়ে চাকরি পেয়েছে খিদিরপুর কারখানায়। তারা আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে গেছে। মহাদেবেরও চাকরিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে এর মধ্যে, নারকেলডাঙার বস্তির পরিবেশ ছেড়ে সে এখন চলে এসেছে মানিকতলার কাছে। অনঙ্গ এম এসসি পড়তে পড়তে তার এক সহপাঠিনীকে বিয়ে করল, তার নাম দীপ্তি। দীপ্তির বাবা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল, তাঁরা ব্রাহ্মণ নন, কিন্তু মহাদেবের দিক থেকে আপত্তি জানাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাদের আমলের চেয়ে এখনকার কলেজ ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বদলে গেছে। মহাদেবের আমলে মেয়েরা আগে ক্লাসে ঢুকত না, প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে আসত, প্রফেসরের সঙ্গেই দল বেঁধে বেরিয়ে যেত, সহপাঠিনীদের সঙ্গে কথা বলারই রেওয়াজ ছিল না। এখন ছাত্রছাত্রীরা জোড়ায় জোড়ায় মাঠে বসে থাকে।

দীপ্তি প্রথম থেকেই যৌথ পরিবারে থাকতে চায়নি। শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি সে ভক্তি শ্রদ্ধা কম দেখায়নি, কিন্তু ঘোমটা টেনে বাড়ির বউ হয়ে থাকবার পাত্রী সে নয়। অনঙ্গ চাকরি পেল দুর্গাপুরে, সুতরাং তাদের তো সেখানে চলে যেতেই হবে, পরিবারটি ভাগ হয়ে গেল আবার। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনঙ্গ-দীপ্তির প্রথম সন্তান জন্মাল। এতদিন পর এই প্রথম কলকাতার বাইরে সস্ত্রীক বেড়াতে এল মহাদেব। দুর্গাপুরে তার ছেলের মস্ত বড় কোয়ার্টার। কী সুন্দর ফুলের বাগান। সেই বাগান দেখে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। যুদ্ধ না লাগলে, দেশ ভাগ না হলে, কলকাতায় এরকম বাগানওয়ালা বাড়িতে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না।

নাতির মুখ দেখে মহাদেব জিজ্ঞেস করল, ওর নাম কী রাখবি রে? আমি তো ভেবেছি, গৌরাঙ্গ রাখলে কেমন হয়।

অনঙ্গ হেসে বলল, কী যে বল বাবা। ওরকম সেকেলে নাম আজকাল চলে? দীপ্তি বলল, ঠাকুর-দেবতার নাম আমার খুব অপছন্দ। বিয়ের আগে থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি, ছেলে হলে নাম রাখব ধীমান।

মহাদেব বলল, বাঃ বেশ নাম!

দিন সাতেক দুর্গাপুরে কাটিয়ে বীণাপাণিকে নিয়ে ফিরে এল মহাদেব। বীণাপাণি এর মধ্যে অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গেল। এখন সে সুখী ঠাকুমা।

অনেক উদ্বাস্তু পরিবার ছিন্নভিন্ন, নষ্ট, অধঃপতিত হয়ে গেলেও ঘোষাল পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিই হতে লাগল দিন দিন। প্রথম দশটা বছর খুবই কষ্টে গেছে। এর মধ্যে মহাদেব তার অন্য বোনের বিয়ে দিয়েছে, ছোট বোনটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিয়ে করে সেই যে বোম্বে চলে গেল, আর তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। নিজের অন্য ছেলেমেয়ে দুটোও মানুষ হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে এখন মহাদেবের হাঁপ ধরে। রিটায়ার করার আর মাত্র এক বছর বাকি। হঠাৎই সে চোখ বুজলেও পরিবারটা আর ভেসে যাবে না, অনঙ্গ নিশ্চয়ই দেখবে। অনঙ্গর ছেলে ধীমান এই ঘোষাল পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল সন্তান হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। যেমন সে সুপুরুষ, তেমনই সে সব বিষয়ে চৌখস। লেখাপড়ার ব্যাপারেও বংশের ধারা পেয়েছে। যদিও সে ভাল রেজাল্ট করে, কিন্তু বাবার মতন ফার্স্ট হয় না। তার খেলাধুলোর দিকেও ঝোঁক। প্রেসিডেন্সি কলেজের সে ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। মেয়েরা সব সময় তাকে ঘিরে থাকে।

ধীমান এদেশে জন্মেছে, পূর্ববাংলার কোনও স্মৃতি নেই, টানও নেই। বংশগৌরব নিয়েও সে মাথা ঘামায় না। সে অর্থনীতির ছাত্র, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনও বিতর্ক সভায় ধীমান ঘোষাল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ধীমানের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দীপ্তির খুব দুশ্চিন্তা। সে নিজেও যদিও সহপাঠীকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার ছেলে কোনও সহপাঠিনীকে বিয়ে করুক, এটা সে চায় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের খানিকটা ব্যবধান থাকা ভাল। অনঙ্গর তুলনায় এখন দীপ্তিকে বেশি বয়স্কা দেখায়। অনেক দেখেশুনে ধীমানের একটা ভাল বিয়ে হওয়া দরকার। ধীমানের সঙ্গে রোজই নতুন নতুন মেয়ে ঘোরে, হুট করে ওদের মধ্যে কাকে বিয়ে করে ফেলবে ঠিক নেই। দীপ্তি এ ব্যাপারে ধীমানকে কিছু বোঝাতে গেলে, সে হেসে উড়িয়ে দেয়। তার কত বান্ধবী, এর মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে সে বিয়ে করবে? বিয়ে না করলেই বরং সবাই বান্ধবী থাকবে!

মহাদেব হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে তিন বছর আগে। নাকে অক্সিজেন লাগানো অবস্থায় সে ভেবেছিল, আমি মরে যাচ্ছি। পুষ্পময়ী কি এখনও বেঁচে আছে? আর দেখা হল না তার সঙ্গে। কোনওদিন একটা কথাও বলা হল না।

মহাদেব জেনে গেল না যে পুষ্পময়ী আরও আগে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে সে ভবানীপ্রসাদের হাত চেপে ধরে বলেছিল, তুমি আর একটা বিয়ে করো। তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে।

অনঙ্গ ভাইবোনদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মাকে এনে রেখেছে নিজের কাছে। বীণাপাণির সঙ্গে প্রায়ই দুপুরে বসে দীপ্তি ধীমানের বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করে। দীপ্তির ওই একমাত্র সন্তান, আর হয়নি, কিংবা সে চায়নি।

জি আর ই পরীক্ষা দিয়ে ধীমান আমেরিকায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. করার সুযোগ পেয়ে গেল। দীপ্তির তাতে ঘোর আপত্তি। একমাত্র ছেলেকে সে দূরে যেতে দিতে চায় না। আজকাল আমেরিকায় গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। সে ছেলেকে বলল, তোর বাবা এম. এসসি-তে ফার্স্ট হয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে বিদেশে যেতে পারত না? আমারও রেজাল্ট খারাপ ছিল না। আমরা দুজনেই বিদেশে সেটল করতে পারতাম। আমরা স্যাক্রিফাইস করেছি, আর তুই—

ধীমান হেসে বলল, কী যে বল মা! তোমরা স্যাক্রিফাইস করেছ বলে দেশের কি উন্নতি হয়েছে? আমি কি থাকতে যাচ্ছি নাকি? ফিরে আসব, অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আসব, তাতে দেশের উপকার হবে।

এয়ারপোর্টে দীপ্তি চোখের জল সামলাতে পারল না। ধীমান টারম্যাক দিয়ে যাবার সময় একবারও পেছনে তাকাল না। অনঙ্গ ভাবল আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছি, পশ্চিম আমাদের টানতে টানতে নিয়ে চলেছে আরও পশ্চিমে।

প্লেনে ধীমানের ঠিক সামনের সিটে বসেছে একটি বাঙালি তরুণী। ধীমানের সঙ্গে আলাপ হল, ওর নাম সুনেত্রা সান্যাল, যাদবপুর থেকে ইংরিজিতে এম. এ. পাস করেছে, সেও যাচ্ছে আমেরিকায়। এরকম অনেক মেয়ের সঙ্গেই ধীমানের ভাব হয়। গল্প, ইয়ার্কি-ঠাট্টা চলে। কিন্তু প্লেনে যখন রাত হল, পাশের লোকটিকে অনুরোধ করে জায়গা বদল করে, সুনেত্রার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর একবার হাতে হাত ছোঁয়ার পরই ধীমানের বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগল। সে তার কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না।

তারপর থেকে সুনেত্রার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই একটুক্ষণ ওরা কোনও কথা না বলে চুপ করে যায়।

নিউইয়র্কে নামার পর, সুনেত্রা যাবে মেরিল্যাণ্ড, ধীমান যাবে ইণ্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে, দুজনকেই একটা দিন অপেক্ষা করে প্লেন ধরতে হবে। সুনেত্রাকে তার বাবার এক বন্ধু নিউইয়র্কে রিসিভ করবে, ধীমানের চেনাশোনা কেউ নেই। সুনেত্রা বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন? আমার বাবার বন্ধুকে বলে দেখতে পারি, নিশ্চয়ই তাঁদের বাড়িতে জায়গা হয়ে যাবে।

ধীমান বলল, না। আমি হোটেলে থাকব। আমার হোটেল বুক করা আছে। সুনেত্রার বাবার বন্ধুর নাম বিশ্বদেব, অতিশয় ব্যস্তসমস্ত মানুষ। ধীমানের সঙ্গে আলাপ হবার পর সে হোটেলে থাকবে শুনে বললেন, পাগল নাকি? আমার অত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে, আমার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে গেছে, তোমরা দুটিতে বেশ গল্প করবে—

নিউজার্সিতে আস্ত একটা দোতলা বাড়ি, সেখানে আর কেউ নেই। বিশ্বদেব ওদের পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর অফিসের পার্টি আছে, ফিরতে রাত হবে। একালের ছেলেমেয়েরা ফাঁকা বাড়িতে থাকলেই পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। ধীমান ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও বান্ধবীর সঙ্গে নিজের ঘরে বসে গল্প করেছে, কখনও চুমু খাবারও চেষ্টা করেনি। সুনেত্রাকে দেখলেই বোঝা যায়, তাদের বাড়িরও একটা বিশেষ সহবত আছে, সে নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখতে জানে। কিন্তু আজ তার কী হল? ধীমান তাকে চুম্বকের মতন টানছে। ধীমানেরও মনে হল তা কোনও বান্ধবীর সঙ্গেই সুনেত্রার তুলনা হয় না। সে যেন এই মেয়েটির জন্যই এতকাল অপেক্ষা করে ছিল।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মুখে কিছু বলতে হল না, তাদের দুজনের দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছে, পরস্পরকে তারা তীব্রভাবে চায়, এক্ষুনি।

ধীমানের মুখখানা যেন এখন অবিকল মহাদেবের মতন। আর সুনেত্রার সঙ্গে তার দিদিমা পুষ্পময়ীর কী আশ্চর্য মিল। এরা কেউ জানে না যে এদের ঠাকুরদা, দিদিমা পরস্পরকে চিনতেন। পূর্ব বাংলার সেই গ্রাম থেকে কত দূরে এসে, তিন প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত দুজন নারী-পুরুষের অতৃপ্ত বাসনা আজ পূর্ণ হতে চলেছে।

ওরা পরস্পরের কাঁধে হাত রাখল।

আশ্রয়

প্রভা জানলা দিয়ে দেখতে পেল, সামনের গলি দিয়ে তার মেয়ের পাশাপাশি হেঁটে আসছে একটি তরুণ। শিখার পাশে সেই ছেলেটিকে বেশ ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে, প্যান্টের ওপর কলার দেওয়া পাঞ্জাবি পরা, মাথায় বড় বড় চুল। ছেলেটিই হাত-পা নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে, শিখার মুখ নিচু।

তাহলে এই কি সেই ছোকরাটি? অন্তত দুজনের কাছে প্রভা শুনেছে যে শিখা নাকি স্টেশনের পাশে চায়ের দোকানে একটা লম্বা ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে বসে। পাশের বাড়ির বেলা একদিন ওই রকম একটা ছেলের সঙ্গে শিখাকে সাইকেল রিকশা করে যেতে দেখেছে, বাড়ির দিকে নয়, লগার মাঠের দিকে।

এসব শুনে প্রভা অবশ্য আতঙ্কিত হয়নি। মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখে চাকরি পেয়েছে, ট্রেনে চেপে রোজ ভিড় ঠেলে অফিস যায়, সে পুরুষ মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করবেই। এসব নিয়ে কথা বলতে যাওয়াই বোকামি।

কিন্তু এ পর্যন্ত কারুকে বাড়িতে নিয়ে আসেনি শিখা।

কলকাতা থেকে শিখা ছটা পঞ্চাশের ট্রেনে ফেরে, স্টেশান থেকে হেঁটে আসতে লাগে বড় জোর মিনিট দশেক। তাই সাতটা বাজলেই প্রভা জানলার ধারে এসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। প্রায়ই দেরি হয়, ট্রেনের গোলমাল তো লেগেই আছে, ছুটির পর প্রথম ট্রেনটা ধরতে না পারলে শিখার ফিরতে ফিরতে এক একদিন নটাও বেজে যায়। প্রভার মনের মধ্যে উদ্বেগ থাকে, ছটফটানি থাকে, কিন্তু মেয়েকে তা জানাবার উপায় নেই। শিখা একদিন বলেছিল, তোমার যদি মেয়ের বদলে ছেলে অফিস্ যেত, সেকি রোজ এক সময়ে বাড়ি ফিরত? আমি তো একা ফিরছি না। ট্রেন ভর্তি লোক।

ছেলেটিকে কি বাড়ির মধ্যেই নিয়ে আসবে, না দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ছেলেটি বিদায় নেবে?

ছোট্ট দোতলা বাড়ি, একতলাটা পাকা, ওপরে একটি মাত্র ঘরে টালির ছাদ। সেটাই বড় ঘর, মা ও মেয়ের শোবার ঘর। একতলাটা স্যাঁতেসেঁতে, বর্ষার সময় জল ঢুকে আসে, বাথরুমে ব্যাঙ দেখা যায়, একদিন ভাঁড়ার ঘরে মস্ত বড় একটা তেঁতুল বিছে বেরিয়েছিল।

দোতলা থেকে নিচে এল প্রভা। উঠোনের পাশে ছোট বারান্দা। তার পাশে একটা ঘর শিখার নিজস্ব। সে ওখানে শোয় না বটে, তবে ওঘরেই তার সব জিনিসপত্র থাকে, ওই ঘরে পড়াশোনা করেই সে পরীক্ষায় পাস করেছে। বাইরের কোনো লোক এলে ওই ঘরেই বসাতে হয়, আর তো জায়গা নেই। বাইরের লোক আর কটাই বা আসে।

রান্নাঘরে টিমটিমে আলোয় বামুন দিদি ছ্যাঁকছোঁক শব্দে কী যেন ভাজছে। বামুনদিদি প্রায় সারাদিন ওই রান্নাঘরেই কাটায়। রাত্তিরে ওই ঘরেই শোয়। পোকা-মাকড়, আরশোলা, ইঁদুর, মশা কিছু গ্রাহ্য করে না। রান্নাঘরটা অবশ্য বেশ চওড়া।

সদর দরজায় ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে প্রভা তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে চলে এল। মেয়ে তার একজন পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে আসছে, মায়ের সঙ্গে তার আলাপ করাতে চায় কি না কে জানে! দেখা যাক! প্রথমে আড়ালে থাকাই ভাল।

ভাঁড়ার ঘরে গুচ্ছের বাজে জিনিস জমে আছে। শিখা দেখতে পেলেই বলে, ফেলে দাও, ভাঙা হাঁড়িকুড়ি সব ফেলে দাও! সে আর হয়েই ওঠে না। একটা ভাঙা তিন চাকার সাইকেল পর্যন্ত রয়ে গেছে এক কোণে। খোকার বাবা ওটা শখ করে কিনে দিয়েছিল। খোকাও নেই, তার বাবাও নেই, তবু কি সাইকেলটা ফেলে দেওয়া যায়?

সদর দরজা ঠেলে ঢুকল শিখা, তার পেছনে চটির শব্দ। হ্যাঁ, দুজনেই এসেছে।

শিখা নিজের ঘরের দরজাটা খুলে ছেলেটিকে বসাল। তারপর ডাকল, মা, মা—

প্রভা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কী মধুর শোনালো ওই ডাকটা। চাকরি-করা মেয়ে, সে বাইরের লোকের সামনে তার মাকে গুরুত্ব দিতে নাও পারত।

ময়লা, আটপৌরে শাড়ি পরা, এই অবস্থায় কি কোনো বাইরের লোকের সামনে যাওয়া যায়? হয়তো ভাববে বাড়ির ঝি। কিন্তু শিখা তো এমন ভাবে কারুকে আগে আনেনি, প্রভা সেজেগুজে থাকবে কী করে? বড়লোকদের কথা আলাদা, সাধারণ গেরস্ত ঘরের মা-মাসিরা তো এইরকম ভাবেই থাকে।

আঁচল দিয়ে মুখের তেলতেলে ভাবটা মুছে প্রভা বেরিয়ে এল।

শিখা বলল, মা, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি তপন চাকলাদার, আমরা প্রায়ই ট্রেনে এক সঙ্গে আসি—

ছেলেটি ঝপাস করে প্রভার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলল। প্রভা ত্রস্তে সরে যাবারও সময় পেল না।

তারপর ছেলেটি সাবলীল ভাবে বলল, মাসিমা, আপনার বাড়িতে এক কাপ চা খেতে এলাম। আমি খুব চা খাই। দিনে দশ-বারো কাপ তো হবেই।

শিখা বলল, মা, তুমি তাহলে একটু বসো, আমি চা-টা করে আনি?

প্রভা ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, তোরা গল্প কর। আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।

রান্নাঘরে এসে প্রভা দেখল বামুনদিদি উনুনে আলুপটলের তরকারি চাপিয়েছে। একটাই উনুন। সে বলল, ও বামুনদিদি, কড়াইটা যে একবার নামাতে হবে। চায়ের জল বসাব।

শেলাই-ফোঁড়াই করার সময় প্রভার চশমা লাগে। বামুনদিদির বয়েস অনেক বেশি, তবু চশমা টশমার বালাই নেই। কানেও ভাল শোনে।

দুজন মাত্র প্রাণীর জন্য রান্নার লোক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। সে সাধ্যও এদের নেই। বামুনদিদিকে সে জন্য রাখা হয়নি, সে এ পরিবারের কেউ নয়। প্রভা একদিন এই বুড়িকে স্টেশনের ধারে বসে অঝোরে কাঁদতে দেখেছিল। বাংলাদেশের রিফিউজি, ওর সঙ্গের লোকেরা ওকে ফেলে চলে গেছে। এ রকম একটা বুড়ির দায়িত্বের বোঝা কেই বা বইতে চায়। বনগাঁর বর্ডার দিয়ে অনবরত ওরা আসে, বড় রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির জমিতে ঝুপড়ি বেঁধে থেকে যায়। এই বুড়ির একা একা সে সেরকম একটা আস্তানা তৈরি করারও সামর্থ্য নেই। প্রভা দুটো একটা সহানুভূতির প্রশ্ন করতেই বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে বলেছিল, ওগো, আমি বামুনবাড়ির বিধবা, কখনো ভিক্ষা করতে শিখি নাই।

পরিত্যক্ত হওয়ার বেদনা কী, তা প্রভা জানে। তাই সে বুড়িকে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিয়েছিল। এর আগেই এরকম দুজন নিরাশ্রয় মহিলাকে বাড়িতে স্থান দিয়েছিল প্রভা। তারা কিছুদিন পরেই চলে গেছে, এই বামুনদিদি যায়নি। আর যাবে না, এই বাড়িতেই সে মরবে।

কড়াইটা নামিয়ে বামুনদিদি বলল, একটা পুরুষ মানুষ আসল না? অর সাথে শিখার বিয়ে হবে?

প্রভা বলল, চুপ, চুপ, ওরকম বলো না। শিখা রাগ করবে।

বামুনদিদি তবু বেশ জোরে জোরেই বলল, ইদিকের মাইয়া, পোলারা তো নিজেরা নিজেরাই বিয়া করে দেখি। ছেলেটা চাকরি করে?

বামুনদিদি তার সরল-সোজা কথার জন্য শিখার কাছে প্রায়ই বকুনি খায়। কিন্তু এই বয়সে মানুষ কি তার স্বভাব বদলাতে পারে? বামুনদিদির ধারণা, বিয়ে না করে শিখার বাইরে একা একা চলাফেরা করা মহা সর্বনাশের ব্যাপার। পুরুষ নামের বাঘরা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুমারী মেয়ে দেখলেই টপ করে গিলে ফেলতে চায়। একমাত্র স্বামী নামের বাঘটিই নিরাপদ।

প্রভা এক নজরেই দেখে নিয়েছে, তপন নামের ছেলেটির পাঞ্জাবিটা ডান কাঁধের কাছে সেলাই করা, মুখে দু-তিনদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায়ে বড় বড় নোখ, চটিজোড়ায় বহুদিন পালিশ পড়েনি। এই সব দেখেই ছেলের অর্থনৈতিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

চা দিতে গিয়ে প্রভা দেখল, তপন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, আর শিখা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। প্রভার দিকে আর তারা মনোযোগ দিল না।

ঘন্টাখানেক ধরে তপন প্রায় একাই কথা বলে গেল। বাইরে থেকে প্রভা একটু আধটু শুনতে পেল, মধ্যপ্রদেশে কী একটা জঙ্গলের কথা শোনাচ্ছে সে।

প্রভা ওপরে গিয়ে সেলাই মেশিনে বসল। সিঁড়ির মুখে খানিকটা জায়গা আছে, সেখানে মেশিনটা বসানো, পা দিয়ে চালাতে হয়। এই মেশিনে বসলে তার মনের চঞ্চলতা দূর হয়ে যায়।

ছেলেটি চলে যাবার পর শিখা ওপরে এসে শাড়ি বদলাল, রেডিও খুলে কিছুক্ষণ শুনল, প্রভা তাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না। শিখা নিজে থেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু বেশি কৌতূহল প্রকাশ করলে চটে যায়।

রাত্তিরে খাওয়ার সময় সাড়ে নটা। বছরখানেক আগে পর্যন্ত মেঝেতে আসন পেতে খেতে বসার ব্যবস্থা ছিল, চাকরি পাবার পর শিখা একটা সানমাইকা বসানো টেবিল ও চারটে চেয়ার কিনে এনেছে। রান্নাঘরের মধ্যে এক পাশে রাখা, সেই টেবিলে বসে খাওয়া হয় এখন। বামুনদিদি প্রথম প্রথম ঘোর আপত্তি তুলেছিল, ম্লেচ্ছদের মতন এঁটো কাঁটার জ্ঞান নেই, খেতে খেতেই বাঁ-হাত দিয়ে, ডাল তুলে নেওয়া হচ্ছে, এরকম সে কখনও দেখেনি। শিখা বলেছিল, তুমি তা হলে নিচে বসে খেও, তোমার ডাল-তরকারি সরিয়ে রেখো আগে থেকে যাতে এঁটো না হয়—। বেশ কয়েকমাস গজগজ করার পর এখন বামুনদিদি দিব্যি টেবিলে বসেই খেতে শিখে গেছে।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতেই বামুনদিদি জিজ্ঞেস করল, ওই ছেলেটা কে?
শিখা মুখ না তুলে বলল, আমার বন্ধু।
বামুনদিদি চোখ বিস্ফরিত করে বলল, বন্ধু? কও কি খুকি? মাইয়া-মানুযের আবার ব্যাটাছেলে বন্ধু হয় নাকি?
শিখা গম্ভীরভাবে বলল, শোনো বামুনদিদি, 'মাইয়া মানুষ', 'ব্যাটাছেলে' এ ধরনের শব্দ তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। ভাল করে কথা বলতে পার তো বলবে। নইলে চুপ করে থাকবে।
বামুনদিদি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রভার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী খারাপ কথা বললাম? মাইয়া-মানুষেরে মাইয়া-মানুষ কওয়া যায় না?
প্রভা একটু হেসে বলল, তোমাকে এত করে শেখানো হয়, তবু তুমি বাঙাল ভাষা ছাড়তে পারলে না?
তারপর মেয়ের সমর্থনে সে আবার বলল, মেয়েদের কোনো পুরুষ বন্ধু হতে পারবে না কেন? তুমি ছিলে পূর্ব বাংলার কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে, সেকেলে ধারণা নিয়ে পড়ে আছ। সময় কত বদলে গেছে তাও জান না। এখন মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তাল রেখে এক অফিসে চাকরি করে। পাশাপাশি বসে, গল্প করে। তাদের বন্ধুত্ব হবে না?
বামুনদিদি বলল, কী জানি বাপু, আমি এসব বুঝি না।
শিখা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে আস কেন?
প্রভা বলল, আহা, রাগ করিস কেন? বুড়ো মানুষ, ওর কথা অত ধরতে নেই। ওই তপন কি তোর অফিসে কাজ করে?
শিখা বলল, না। আমার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ।
—রোজ দেখা হয়?
—প্রায় রোজই। ও থাকে নৈহাটি।
বামুনদিদির বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। সে ফস করে বলে ফেলল, ওমা, রেলের কামরায় দেখা, সেই মানুষকে কেউ বাড়িতে আনে? যদি চোর-ছ্যাঁচোড় হয়?
শিখা খাওয়া থামিয়ে চোখ গরম করে বলল, মা, বামুনদিদি যদি এই ধরনের কথা বলে, তা হলে আমি আর খাব না বলে দিচ্ছি!
বামুনদিদি যা বলল, প্রভার মনেও সেই কথাটা এসেছিল। শুধু ট্রেনের কামরায় যার সঙ্গে আলাপ, তাকে বাড়িতে আনার কী দরকার। তপন থাকে নৈহাটিতে, সে শ্যামনগরে নামে কেন?
তবু মেয়েকে খুশি করার জন্য সে বামুনদিদিকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, তুমি কী উলটো-পালটা কথা বলো! শিখা এত বড় হয়েছে, সে কি মানুষ চেনে না? লোকে তো লোকের বাড়ি যায়ই। ছেলেটি চা খেতে এসেছিল।
বামুনদিদি বলল, ও শিখা, আমারে তুই তাড়ায়ে দিতে চাস? তুই আমারে সহ্য করতে পারোস না, না?
শিখা আরও চটে গিয়ে বলল, দেখেছ, দেখেছো, কী বাজে কথা! আমি কোনোদিন তোমাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলেছি? তুমি নিজের মনে থাকতে পার না? আমার সব ব্যাপারে অত মাথা গলাও কেন?
বামুনদিদি বলল, ওই ছেলেটা কি তোরে বিয়া করবে? কিছু কইছে?
প্রভা হেসে ফেলল। বামুনদিদিকে চুপ করানো একটা অসাধ্য ব্যাপার।
শিখা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বলল, বুঝেছি, তুমিই আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চাও। আমি বিয়ে করে চলে গেলে, তোমার সুবিধে হয়। যত ইচ্ছে বকবক করবে, কেউ বাধা দেবে না। আমার মা তো কানে কালা হয়ে গেছে।
বামুনদিদি এই ধমক সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, আমার আর কয়দিন? ভগবান যে কোনোদিন আমারে কাছে টেনে নেবে। তোর বিয়াটা দেইখ্যা গেলে মনে শান্তি হয়।
শিখা বলল, ওই যে মোড়ের মাথায় স্যাকরা বুড়ো থাকে। তার বউ মরেছে অনেকদিন। তুমি ওকে বিয়ে কর না, তা হলে আরও বেশি শান্তি পাবে!
বামুনদিদি এক গাল হেসে বলল, কি যে কস! আমি বিধবা মাগি, ছি ছি ছি।
শিখা বলল, বিধবাদেরও বিয়ে হতে পারে। তোমাদের বাঙাল দেশে হয় কি না জানি না, এখানে হয়।
বামুনদিদি বলল, হায় আমার কপাল! কত সোমত্থ মাইয়ারই বিয়া হয় না দেখি। ও শিখা, চাকলাদার কারো পদবি হয় রে, কোন জাত?
শিখা বলল, কারো সঙ্গে পরিচয় হলে কেউ তার জাত জিজ্ঞেস করে না। সেটা অসভ্যতা। তোমাদের আমলে ওই সব অসভ্যতা চলত। আর একটা কথা বলবে না বলছি। মুখ বুজে থাক।
প্রভা মনে মনে বেশ খুশিই হচ্ছে। তার নিজের প্রশ্নগুলোই বামুনদিদি করে ফেলছে, বকুনি বামুনদিদিই খাচ্ছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর প্রভা ওপরে গিয়ে আবার সেলাই মেশিনে বসল। ঘুমোবার আগে শিখা কিছুক্ষণ ক্যাসেটে গান শোনে। নিজের গলা মিলিয়ে গুনগুনিয়ে গায়। সুর জ্ঞান আছে, কিন্তু গলাটা তার সুরেলা নয়।

একটু পরে শিখা বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, মা, তোমাকে বারণ করেছি না, রাত্তিরে সেলাই করবে না? চোখ যে যাবে।

প্রভা বলল, আর, দুটো মাত্র বাকি আছে। রথীন কালই নিতে আসছে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

শিখা বলল, মা, তুমি এবার সেলাইয়ের কাজ বন্ধ করে দাও। আর কী দরকার।

প্রভা বলল, সেকি। সারাদিন তা হলে আমি বাড়িতে বসে কী করব? তা ছাড়া আমার তো কষ্ট হয় না কিছু। এতদিন তো এই করেই সংসার চালিয়েছি।

শিখা বলল, হ্যাঁ, এতদিন তুমি চালিয়েছ। এবার আমাকে চালাতে দাও। লোকে কী বলবে? সবাই জানে, আমি এখন চাকরি করছি, তবু মাকে খাটাচ্ছি! আমি যা পাই, তাতে আমাদের কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে।

লোকে কি মনে করবে? লোক মানে কারা? শিখা যখন স্কুল-কলেজে পড়েছে, তখন তার মা তো শায়া-ব্লাউজ-ফ্রক সেলাইয়ের পয়সাতেই সব খরচ চালিয়েছে। তখনো লোকে অনেক কিছু বলেছে। রথীনের বাপ হেমেন ছিট কাপড় দিয়ে সেলাই করিয়ে নিত, ঘন ঘন আসত এ বাড়িতে। তার নাম জড়িয়ে প্রভাকে কেউ কেউ বদনাম দেয়নি? সে সব গ্রাহ্য করেনি প্রভা। লোকের কথায় কান দিলে কি সংসারটাকে এতদূর টেনে আনতে পারত সে?

পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে শিখা। কলকাতায় সরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছে। সরকারি চাকরি মানে সোনার চাকরি। কোনোদিন হারাতে হবে না।

তবে, একটা কথা প্রভার মনে হয় প্রায়ই। লোকে কি বলবে, সেটা সে তুচ্ছ করে এসেছে এতদিন। কিন্তু নিজের মেয়ে কি ভাবছে, সেটা কি তুচ্ছ করা যায়? মা এখনো সেলাই-ফোঁড়াই করে টাকা রোজগার করে, এতে কি চাকরি করা মেয়ের অপমান বোধ হয়? শিখা যদি কখনো বিয়ে করতে চায়, তা হলে এই পরিচয়টা মুছে না ফেললে সে ভাল পাত্র পাবে কী করে?

২

তপন চাকলাদার এখন প্রায়ই আসে। শিখার সঙ্গে সে এক সঙ্গে ফেরে, অনেকক্ষণ গল্প করে, তিন চারবার চা খায়। তার ব্যবহার অত্যন্ত সাবলীল। প্রভাকে সে মাসিমা বলে ডাকে, বামুনদিদিকেও চিনে ফেলেছে, রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একদিন সে বলল, ও বামুনদিদি, এক রোববারে আসব, তোমার হাতের রান্না খাওয়াবে না?

রবিবারে নয়, সপ্তাহের মাঝখানে একটা দিন সে এল বিকেল চারটের সময়। শিখা যথারীতি অফিসে গেছে। প্রভার বিস্মিত ও কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে তখন বলল, আমি দু-দিন অফিস যাচ্ছি না, আমার ছুটি চলছে। শ্যামনগরে একটা কাজে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম, আপনার বাড়িতে একটু বসে যাই, শিখার সঙ্গেও ক দিন দেখা হয়নি। ও তো এসে পড়বে।

প্রভা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ...বস।

এক কাপ চা এনে দেবার পর তপন বলল, মাসিমা, আপনি কি খুব ব্যস্ত? আপনার সঙ্গেই গল্প করতে ইচ্ছে করছে। অন্যদিন তো বেশি কথাই হয় না।

এক ডজন ফ্রক সেলাই করার অর্ডার আছে, কাল সকালের মধ্যেই শেষ করার দরকার। এই রকম ভাবে কারুর সঙ্গে গল্প করার অভ্যেসই নেই প্রভার। তবু সে বসল।

চেয়ারে, গা এলিয়ে তপন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, জানেন মাসিমা, আপনাদের এখানে একটা জমি দেখতে এসেছিলুম। ভাবছি নিজে একটা আলাদা বাড়ি করে থাকব। আজ যে-জমিটা দেখলুম, ঠিক পছন্দ হল না। দেখবেন তো, আপনার সন্ধানে এদিকে ভাল জমি যদি থাকে, এই সাত-আট কাঠার মতন।

কথাটা শুনেই প্রভার মনে হল, তা হলে কি ছেলেটি বিবাহিত? বাবার বাড়ি ছেড়ে একা এই বয়েসি ছেলে তো সাধারণত আলাদা বাড়ি করে না।

তপন নিজেই আবার বলল, নৈহাটিতে বাজারের কাছেই আমাদের বেশ বড় বাড়ি। আমরা সাত ভাই-বোন, বাবা ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন, তবু তাঁর কাছে এখনো অনেক লোকজন আসে, সব সময় বাড়িতে হই হট্টগোল চলে। তাই বাড়িতে আমার মন টেঁকে না।

প্রভা জিজ্ঞেস করল, তোমার মা—

তপন বলল, মা তো অনেকদিনই নেই। আমার তখন চোদ্দ বছর বয়েস, দুই দাদা বিয়ে করেছে, বউদিদের মধ্যে সব সময় ঝগড়া—

—তুমি কি শিখার অফিসের কাছেই কোথাও চাকরি কর?

না, না। আপনার মেয়ে যায় ওয়েলিংটনে, সেখানে একটা বাড়িতে অনেকগুলো সরকারি অফিস...আমি, মানে একটা ওষুধের কোম্পানিতে, ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর কাজ। ট্রেনে পরপর কয়েকদিন শিখার সঙ্গে একটি কামরায় জার্নি করে ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। জানেন তো অফিস ভাঙার পর কেমন ভিড় হয়। একদিন এক ব্যাটা শিখার ব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ার মতলবে ছিল, আমি খপ করে ধরে ফেলি। এসব ব্যাপারে লাইফের রিস্ক থাকে, ওদের অনেক বড় দল থাকে, একজনকে ধরলে অন্যরা রিভেঞ্জ নেবার চেষ্টা করে, আমি ওসব পরোয়া করি না।

—বাবা, শুনলেই ভয় করে। মেয়েটা একা একা যায়।

—একা কোথায়? আরও কত মেয়ে যায়। মেয়েরা দল বেঁধে একদিকে বসে। একদিন মেয়েরাই একজন ছিনতাইবাজকে ধরে খুব ঠ্যাঙানি দিয়েছিল। মেয়েরা আজকাল অনেক কিছু পারে, বুঝলেন। আমার বাবা খুব গোঁড়া, আমার এক দিদি বি. এ. পাস, তাকে চাকরি করতে দেয়নি। বিয়ের কিছুদিন পরেই দিদি বিধবা হল, তখন বয়েস হয়ে গেছে, তখন আর দিদিকে কে চাকরি দেবে। দিদির জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। আপনি শিখাকে চাকরিতে পাঠিয়ে খুব ভাল করেছেন।

—আমি শিখাকে কখনো কিছু বারণ করিনি। ওর বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, নিজে যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

—আপনাদের এ বাড়িটা বেশ নিরিবিলি।

—হ্যাঁ, মোটে তিনটি প্রাণী।

—মাসিমা, খুব ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি। হাজারিবাগ, ডাল্টনগঞ্জ, জলদাপাড়া....আপনি জলদাপাড়া গেছেন?

না।

একবারও বেড়াতে যাননি? বড় অপূর্ব জায়গা।

—আমাদের আর বেড়ানো। কোথাও যাওয়া হয়নি।

—আমি নিয়ে যেতে পারি। একবার চলুন আমার সঙ্গে।

তুমি নিশ্চয়ই আর এক কাপ চাপ খাবে? নিয়ে আসি চা—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রভা স্বস্তি বোধ করল। তপনের কথাবার্তা একটু যেন অসংলগ্ন। হঠাৎ হঠাৎ এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যায়, প্রভা ঠিক তাল রাখতে পারছিল না।

ছেলেটি কি সামান্য ট্যারা? কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকায়, মনে হয় যেন অন্য দিকে তাকিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছে।

বামুনদিদি রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। ভাবনাচিন্তা না থাকলেই মানুষ এমন নিশ্চিন্তে দিনেরবেলা ঘুমোতে পারে।

চায়ের জল বসাতে বসাতে প্রভা ভাবল, শিখার ফিরতে আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। ততক্ষণ বসে ওই তপনের সঙ্গে গল্প করতে হবে নাকি?

ট্রেনের কামরায় আলাপ, তবু তপন এ বাড়িতে কেন ঘন ঘন আসছে?

মেয়ে যৌবনে পা দিলে মায়ের মন তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করবেই। নিরাপত্তা মানে বিয়ে। এই ছেলেটি কি শিখাকে বিয়ে করতে চায়?

প্রভা জানে, স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধ করে তার মেয়ের বিয়ে হওয়া শক্ত।

প্রথম কথা, শিখার রূপ নেই। গুণ আছে অনেক, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে লোকে তো মেয়ের রূপটা আগে দেখে। প্রভার নিজের রং মাজা মাজা, শরীরের বাঁধুনি আছে, মেয়েটা যে কী করে কালো আর বেঁটে হল কে জানে। ওর বাবা বেশ লম্বা ছিল। শিখার পরে প্রভার আর একটি ছেলে জন্মেছিল, সে ছিল টুকটুকে ফর্সা। সবাই তাকে বলত সোনার গৌরাঙ্গ। ভগবানের কী বিচার, ছেলেটাকে কালো করে মেয়েটাকে ফর্সা করতে পারতেন না? পুরুষ মানুষ কালো হোক, ফর্সা হোক, বেঁটে হোক, লম্বা হোক কিছু আসে যায় না।

সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই তারা জিজ্ঞেস করবে, মেয়ের মা সেলাই করে এতদিন সংসার চালিয়েছে কেন? মেয়ের বাবা নেই।

মেয়ের বাবা যে থেকেও নেই।

মানুষ কত বিচিত্র হয়। অদ্ভুত মানুষের সংসার। শিখার বাবা বিশ্বেশ্বর ছিল মেকানিক, যে-কোনো রেডিও, ঘড়ি, সেলাইকল, জলের পাম্প সারিয়ে দিতে পারত চোখের নিমেষে। গম্ভীর ধরনের মানুষ, বাড়িতেও কথাবার্তা বলত খুব কম। দমদমে একটা বড় দোকানে কাজ করত, কোনোদিন তাকে কেউ বেচাল দেখেনি।

এই বিশ্বেশ্বর একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। সবাই বলে, পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে বিবাগী হয়ে গেছে। একেবারে নিরুদ্দেশ। সবাই তা বিশ্বাস করলেও প্রভা কোনোদিন বিশ্বাস করেনি। শিখারও ধারণা তার বাবা হরিদ্বার.......লছমনঝোলার ওদিকে কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে আছে। প্রভা সে ধারণা ভাঙতে চায় না।

ছেলের নাম ছিল গৌর। বড় প্রাণবন্ত, সুন্দর ছেলে, তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। বিশ্বেশ্বরের ছিল ছেলে অন্ত প্রাণ। শিখাকে সে কখনো তেমন ভাবে আদর করেনি, কিন্তু ছেলেকে নিয়ে তার আদিখ্যেতার শেষ ছিল না। প্রায় দিন ছেলের জন্য কিছু না কিছু কিনে আনত মাত্র দু-দিনের জ্বরে সেই ছেলে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল, কী যে অসুখ তা বোঝারও সময় ছিল না। গৌরের তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েস, শিখার এগারো।

ছেলের শোকে বিশ্বেশ্বরের একেবারে উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল। মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদত। তারপর ঠিক তিন দিনের মাথায় কারুকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল চিরকালের মতন।

মায়ের চেয়ে বাবার শোক বেশি হয়? পুত্রহারা পত্নী আর অল্প বয়েসি কন্যাকে অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে যে পালায়, সে কি মানুষ না অমানুষ? এরকম স্বার্থপর লোকেরা সন্ন্যাসী হয়?

সবাই জানত, বিশ্বেশ্বর এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছে, সঙ্গে কিছুই নেয়নি। তার মানিব্যাগটি পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল দেরাজে। কয়েকদিন খানিকটা সামলে উঠে একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে দারুণ অবাক হয়েছিল প্রভা। আর কিছুই নিয়ে যায়নি বিশ্বেশ্বর, কিন্তু বাড়িতে যে তার কয়েকটা ছবি ছিল, সেগুলো নেই। একটা ছিল তার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, একটা বিয়ের পরপরই প্রভা ও বিশ্বেশ্বরের এক সঙ্গে, আর একটা অল্প বয়েসে ফুটবল খেলার টিমের এগারোজনের মাঝখানে। মোট এই তিনটি ছবি, সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর কে নেবে সেই ছবি?

তখনই প্রভার সন্দেহ হয়েছিল, বিশ্বেশ্বরের আলাদা কোনো গোপন জীবন আছে। অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। মাঝে মাঝে সে দোকানের কাজে পাটনা যেতে হবে, জামশেদপুর যেতে হবে, এই বলে দু-তিনদিন বাড়ি ফিরত না। গৌরকে সে সত্যি ভালবাসত, গৌরের টানে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। গৌর চলে যাবার পর সেই দ্বিতীয় সংসারই তাকে টেনেছে। ছবি নেই বলে পুলিশেও তার খোঁজ পাবে না।

প্রভার এই সন্দেহ পরে অনেকটা দৃঢ় হয়েছিল। সে পাঁচ বছর পরের কথা। বিশ্বেশ্বর চলে যাবার পর সে কারুর দয়া-দাক্ষিণ্য চায়নি, শিখাকে নিয়ে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে টিকে থাকার চিন্তাটাই তার কাছে প্রধান ছিল। যে-কোনো উপায়ে হোক মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে, কিছুতেই আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে না। দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গেছে প্রভা, নিজে একবেলা না খেয়ে থেকেছে, তবু মেয়ের বই-খাতা-কলমের কোনো অভাব বুঝতে দেয়নি। সেলাইয়ের কাজ সে আগেই ভাল জানত, এই সেলাই-ই তাকে বাঁচিয়েছে। যত অর্ডার পেয়েছে, সে কখনো না বলেনি, দিন-রাত পাগলের মতন সেলাই করে গেছে।

বছর পাঁচেক পর প্রভার এক মাসতুতো ভাই একটা খবর দিয়েছিল। রতন নামে সেই ভাইটি আসত মাঝে মাঝে, সে কিছু কিছু সেলাইয়ের কাজও জোগাড় করে দিয়েছে।

সেই রতন বলেছিল, এখান থেকে অনেক দূরে, সিউড়ি শহরে নাকি সে বিশ্বেশ্বরকে দেখেছে। সেখানে সে রেডিও সারাবার ছোট্ট দোকান করেছে, একটা বাড়িতে তার বউ ছেলেমেয়েও আছে। দিদি, তুই আমার সঙ্গে সিউড়ি চল, চাক্ষুষ প্রমাণ হয়ে যাবে, দাড়ি রেখেছে অবশ্য, তাও তুই কি চিনতে পারবি না? কেস ঠুকে দিলে জামাইবাবুকে জেলে ঘানি ঘোরাতে হবে।

প্রভা যেতে রাজি হয়নি। পাঁচ বছর লড়াই করার পর সে তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতে বসেই যে-কোনো দরজির চেয়ে তার রোজগার বেশি। কেউ বলতে পারবে না, সে কখনো নারীত্বের অবমাননা করেছে। এখন কি সে আবার তার স্বামীকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনতে যাবে? তাকে সে শাস্তি দিতেও চায় না, তাতে সব জানাজানি হয়ে যাবে, শিখা মনে আঘাত পাবে। নাঃ, বিশ্বেশ্বর মুছে যাক তাদের জীবন থেকে।

শুধু এক একবার প্রভার ইচ্ছে হয়েছে, কারুকে কিছু না বলে, রতনকেও সঙ্গে না নিয়ে, সে একা একা গোপনে সিউড়ি ঘুরে আসবে। বিশ্বেশ্বরের জন্য নয়, বিশ্বেশ্বর যে স্ত্রীলোকটির জন্য এই সংসার ছেড়ে চলে গেছে, একবার দেখে আসবে তাকে। কী তার আকর্ষণ। প্রভার চেয়ে তার রূপ, গুণ কোনটা বেশি! বরাবরই প্রভার শরীরের গড়ন ভাল, অনেক মেয়ের তুলনায় তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল, এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসেও অনেকে তাকে যুবতী বলে মনে করে। শিখার সঙ্গে সে যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন লোকে শিখার বদলে প্রভার দিকেই প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তাতে প্রভা খুব লজ্জা পায়। সেই জন্যই প্রভা কখনো হাত-কাটা ব্লাউজ পরে না, রঙিন শাড়ি ব্যবহার করে না, খোঁপা বাঁধে না। মেয়ের জন্যই নিজের রূপ সে ঝরিয়ে ফেলতে চায়, শরীরের দাবিকে সে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

তের-চোদ্দ বছর ধরে এ বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। স্বামী পরিত্যক্তা রমণীকে ছিঁড়ে খাবার জন্য শেয়াল, শকুনি, নেকড়ের অভাব নেই এ সমাজে। প্রথম প্রথম দরদ দেখাবার জন্য অনেকে আসত, প্রভা প্রথম দিনেই বুঝিয়ে

দিত, এ বড় শক্ত ঠাঁই। জীবনে যাদের দেখেনি, এরকম কয়েকজন বিশ্বেশ্বরের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে উদয় হয়েছিল, প্রভা তাদের সঙ্গে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, ঢুকতেই দেয়নি বাড়িতে। প্রভার নিজের বাবা-মা চলে গেছেন অনেকদিন, দাদা-কিংবা ভাই নেই, আছে তার তিন বোন, তারা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মাসতুতো ভাই রতন এসে থাকতে চেয়েছিল এখানে, তাকেও পাত্তা দেয়নি প্রভা। রতনের নির্দিষ্ট কোনো উপার্জন নেই, সে গলগ্রহ হয়ে থাকত। কোনো পুরুষ রক্ষীর দরকার নেই প্রভার, সে অবলা নয়।

একজন পুরুষ নিঃস্বার্থভাবে তাকে সাহায্য করেছে বেশ কয়েকবছর। এই বাড়ির বাড়িওয়ালা। দ্বিজেন কর্মকার ছিলেন সত্যিকারের ভাল মানুষ। কিন্তু তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড় দুটি ছেলে বখাটে ধরনের, দুজনে দুটো রাজনৈতিক দলে ভিড়েছিল বাপের অন্ন ধ্বংস করে।

বিশ্বেশ্বর অন্তর্হিত হবার পর জানা গিয়েছিল যে এ বাড়ির তিন মাসের ভাড়া বাকি রয়ে গেছে। সংসারের খরচপত্র সব বিশ্বেশ্বরই চালাত, প্রভা বিশেষ কিছু জানত না। দ্বিজেন কর্মকার সেই সময় এসে বললেন, মা, তোমার তো এখন মহা বিপদ, মেয়েকে নিয়ে খেয়ে পড়ে থাকতে হবে, বাড়ি ভাড়া জোগাড় করবে কী করে?

প্রভার তখন দিশেহারা অবস্থা, সে চুপ করে ছিল।

দ্বিজেন কর্মকার বলেছিলেন, আমি না হয় কয়েক মাসের ভাড়া নাই-ই বা নিলুম। তাতেও কি চলবে? বুড়ো হয়েছি, হঠাৎ যদি চোখ বুজি, আমার ছেলেরা তো ছাড়বে না? মেয়েকে নিয়ে তুমি পথে বসবে? তোমার স্বামী নেই, মাথার ওপর একটা আশ্রয় থাকাই সবচেয়ে বড় কথা। বাড়ির মধ্যে তুমি কী খাও না খাও, তা কেউ দেখতে আসছে না। ভদ্রলোকের এই তো জ্বালা, পেটের ভাত না জুটলেও বাইরে মান-সম্মান বজায় রাখতে হয়।

দ্বিজেন কর্মকার তারপর পরামর্শ দিলেন, এই বাড়িতে থাকাটাই তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। মাসে মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া দিতে পারবে না, তুমি বরং এই বাড়িটা কিনে নাও।

প্রভা আঁতকে উঠেছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা বাড়িওয়ালার একটা কূট চক্রান্ত। কুড়িয়ে বাড়িয়ে সব মিলিয়ে আড়াইশো টাকার বেশি সঙ্গতি নেই, সে এখন বাড়ি কিনবে কী করে? এটা একটি নির্মম রসিকতা নয়?

দ্বিজেন কর্মকার বললেন, টাকার কথা ভাবছ তো? গয়না-গাটি কী আছে দেখ। গয়না বেচেও মাথার ওপর ছাদ কেনা অনেক ভাল। সোনাদানার চেয়েও জমি-বাড়ির দাম দিন দিন বেশি বাড়বে। আমি এই বাড়ি বেচে দেওয়ার কথা কিছুদিন ধরেই ভাবছি। আমি চোখ বুজলে আমার ছেলেরা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে লাঠালাঠি করবে, মামলা-মোকদ্দমায় সব উড়িয়ে দেবে আমি জানি। তাই আগেই আমি জমি-বাড়ি সব বেচে দিতে চাই। তোমাদের তাড়িয়ে এ বাড়ি অন্য কারুকে বেচলে ধর্মে সইবে না। পরপারে গিয়ে কী জবাব দেব?

দুদিন ধরে চিন্তা করে দেখল প্রভা। দ্বিজেনবাবুর যুক্তি সে বুঝল। বাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে ওর ছেলেরা এসে হামলা করবে। জোর করে তাড়িয়ে দিলে মেয়েকে নিয়ে সে কোথায় যাবে! বাড়িটা নিজস্ব হলে তবু দরজা বন্ধ করে দিলে ভেতরে বসে থাকা যাবে। তারপর নুন-ভাত জুটুক বা না জুটুক, কেউ জানতে পারবে না।

বাড়ির দাম চোদ্দ হাজার টাকা। প্রভার সব গয়না বেচলেও ন হাজার টাকার বেশি পাওয়া যাবে না। সে টাকা তাকে কে দেবে।

পৃথিবীতে অনেক অভাবনীয়, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এখনো ঘটে। বাকি টাকাটা দিলেন ওই বাড়িওয়ালা দ্বিজেন কর্মকার নিজেই। তিনি চুপিচুপি বললেন, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা ধার দেব। তুমি আস্তে আস্তে শোধ দিও। কেউ কিছু জানবে না। বাড়ি রেজিস্ট্রি করার সময় তুমি আমার ছেলেদের সামনে নগদ চোদ্দ হাজার টাকা গুনে দেবে।

পরে প্রভা বুঝেছিল, নিজস্ব বাড়ি হওয়ার জন্য তার কত না সমস্যা মিটে গিয়েছিল। দ্বিজেন কর্মকার একজন সামান্য অল্প শিক্ষিত লোক, বাজারের কাছে একটা কাঠের দোকান চালাতেন, অথচ কত মহৎ মানুষ ছিলেন। তাঁর ছেলেরা আর ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস পায়নি। তারপরেও দ্বিজেন কর্মকার বেঁচে ছিলেন সাত-আট বছর, প্রভাকে প্রায় পাহারা দিয়ে রাখতেন। সেই আমলে চোদ্দ হাজার টাকার দাম ছিল, এখন এ বাড়ির মূল্য লক্ষ দেড়েক টাকা তো হবেই।

ওই দ্বিজেন কর্মকারই এক দর্জির দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্যামনগর আর কাঁকিনাড়ায় হেমেন ঘোষের দু খানা বড় বড় দোকান। সেলাই মেশিনটা কিনে দিয়েছিল সে। অর্ডার দিতে, ডেলিভারি দিতে হেমেন নিজেই আসত। দ্বিজেন কর্মকারের সঙ্গে হেমেন ঘোষের তফাত আছে। তা তো থাকবেই, দুটো মানুষ এক হবে কী করে? হেমেনের বয়স বেশি নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিল সে। হেমেন কাজের জন্য আসত, তার ঘন ঘন আসার জন্য পাড়ার লোক কেউ কেউ কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি। অনেকেই একটা রসের গল্প খোঁজে। দু-জন নারী-পুরুষকে দু-চারবার কাছাকাছি দেখলেই একটা অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করতে চায়। নিজেদের গোপন বাসনা অন্যের ওপর চাপায়।

হেমেন কখনো কু-প্রস্তাব দেয়নি, কখনো অসৎ ব্যবহার করেনি। টাকা-পয়সা যেমন ঠিকঠাক দিত, তেমনি তার ব্যবহারটাও ছিল মাপা, প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও সে বলত না। তবে মাঝে মাঝে সে প্রভার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। মুখের দিকে, শরীরের দিকে নয়। সে দৃষ্টির একটা ভাষা আছে, মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। হেমেন যেন বলতে চাইত, তুমি পুরুষ সঙ্গ বঞ্চিত একা রমণী, তুমি আমাকে পছন্দ করে আমার সঙ্গী হতে চাও, আমি রাজি আছি। আর যদি না চাও, তা হলে ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।

দু-তিন বছর এরকম চলেছিল, হেমেন ওই ভাবে তাকালে প্রভাও চোখ সরাত না। হেমেন মুখে কিছু না বললে সেও প্রত্যাখ্যানের ধমক দিতে পারে না। শুধু দৃষ্টিতে তো দোষ নেই। ততদিনে হেমেনের ওপর নির্ভরতা অনেক কমে গেছে, সেলাইয়ের জন্য বেশ নাম হয়েছে প্রভার। হেমেন গণ্ডগোল করলে সে হেমেনের বদলে অন্য দোকানের কাজ পেয়ে যাবে অনায়াসে।

হেমেন কিছুই বলল না, বছর তিনেক কেটে যাবার পর সে তার দৃষ্টি বদলে ফেলল। তারা দুজনেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সংযমের দিক থেকে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়। তারপর থেকে দুজনে আর নারী-পুরুষ হিসেবে আলাদা রইল না, হেমেনের ব্যবহার হল প্রকৃত বন্ধুর মতন, সহজ, স্বাভাবিক। নানান বিষয়ে গল্প করত। শিখাকে কলেজে ভর্তি করার সময় সেই তো সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

বছর খানেক আগে একটা দুর্ঘটনায় হেমেনের কোমরে এমন চোট লেগেছে সে আর হাঁটা-চলা করতে পারে না, বাড়ি থেকে বেরয় না। এখন তার ছেলে রথীন আসা-যাওয়া করে। প্রভাই মাঝে মাঝে হেমেনকে দেখতে যায় তার কাঁকিনাড়ার বাড়িতে, নিকট আত্মীয়ের মতন তার বিছানার কাছে বসে থাকে। হেমেনের বউ বেঁচে নেই, তার জন্য লাউ-চিংড়ি, মোচার ঘণ্ট রেঁধে নিয়ে যায় প্রভা।

এতগুলো বছর শিখার গায়ে কোনো আঁচ লাগতে দেয়নি, এখন প্রভার মনে একটা চিন্তা কাঁটার মতন খচখচ করে। শিখা এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। চাকরি পেয়েছে। সে প্রায়ই বলে মা তুমি সেলাই ছেড়ে দাও। তার মানে, এখন মেয়ের উপার্জনে সংসার চলবে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না? বিয়ে হলে শিখা অন্য সংসারে চলে যাবে, তখন প্রভা একা হয়ে পড়বে। সে আর বামুনদিদি। তাতেও কি একাকিত্ব ঘুচবে? দুজনে মিলে একা।

কিন্তু তখনো তো খাওয়া-পরার সমস্যা থাকবে। সেলাই ছেড়ে দিলে কে খাওয়াবে এই দুজনকে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও শিখা চাকরি করবে কি না কে জানে। যদি করেও, তার কাছ থেকে তখন টাকা নেওয়া যায় নাকি? ছি ছি।

খুব সহজে শিখার বিয়ে দেওয়া যাবে না। তার রূপ নেই। এ দেশে কালো মেয়েদের বিয়ে কি সহজে হয়? অনেক টাকা খরচ করলে, ঝনঝন করে টাকা বাজালে পাত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রভা অত টাকা পাবে কোথায়?

একমাত্র এই বাড়িটা সম্বল। বাড়ি বিক্রি করলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। এ বাড়ি তো শিখারই প্রাপ্য। কিন্তু বাড়ি বিক্রি করে দিলে বাকি জীবনটা প্রভা কাটাবে কোথায়?

ওমা, তা বলে কি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করতে হবে না? সে যে চরম স্বার্থপরতা।

৩

হাট-বাজার প্রভাকেই করতে হয় বরাবর। শিখা ওসব শেখেনি। বৃষ্টি-বাদলা শুরু হয়েছে। ছাতাটা খুঁজে পাচ্ছে না প্রভা। বামুনদিদি ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা পুরনো ছাতা এনে দিল। তারপর বলল, ও প্রভা, তুমি ছেলেটার বাড়ি একবার যাবে না।

প্রভা ভুরু কুঁচকে বলল, কোন ছেলেটা?

বামুনদিদি বলল, যে খুকির কাছে ঘন ঘন আসে, খালি চা খায় আর চা খায় আর বকবক করে। খুকির নাকি বন্ধু। হুঁঃ। তার খোঁজখবর নিতে হবে না?

প্রভা বলল, তপনের বাড়ি কোথায় আমি কী করে জানব?

—বলেছিল না নৈহাটিতে থাকে?

—নৈহাটিতে গিয়ে আমি কোথায় খুঁজব, একা একা হঠাৎ যাওয়া যায় নাকি?

—মেয়ের বাবা যখন নাই, তখন আর কে যাবে? ছেলের বাড়ি থিকা কি কেউ সম্বন্ধ করতে আসে? মাইয়া পক্ষকেই যেতে হয়।

—দাঁড়াও, আগে শিখা কি চায়, বুঝে নিই।

—ওরা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের মধ্যে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে, আমার কিন্তু বাপু এসব ভাল ঠেকে না। ঘি আর আগুন অত কাছাকাছি বেশিদিন থাকে?

—বামুনদিদি, ওসব কথা বলো না। এখন যুগ পাল্টে গেছে। ছেলে-মেয়েরা গল্প করলেই খারাপ ভাবতে নেই।

—ওসব আমারে বুঝায়ো না। একটা কিছু বিপদ হয়ে গেলে তখন কেন্দেও কূল পাবে না।

প্রভা হাসল। বামুনদিদিকে সত্যি বোঝানো যাবে না। বামুনদিদি এমনকি নিজের অধিকারের সীমাটাও বোঝে না। উলটোপালটা কথা বলতে গিয়ে শিখার কাছে বকুনি খায়।

বিপদ আবার কী? রেলস্টেশনে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, গর্ভপাত? মারি স্টোপস ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা রোজ ওই বিজ্ঞাপন দেখছে না? বামুনদিদিদের আমলে কুমারী বা বালবিধবাদের গর্ভ সঞ্চার হলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি ছিল না। এখন গর্ভপাত আইনসঙ্গত। কেউ ও নিয়ে বিশেষ মাথায় ঘামায় না। সমাজ বলে কিছু নেই, এমনকি এই মফস্বলেও।

তপন আর শিখা যখন গল্প করে, তখন প্রভা যে ঘরে যায় না বটে, কিন্তু কৌতূহল তো থাকেই। জানলা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চোখ যায়। ওরা দুজনে কখনো খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে না, হাত ধরাধরি করে না, বিসদৃশ কিছুই চোখে পড়েনি। তপন অনবরত চা আর সিগারেট খায়, চুমু টুমু খেতে চায় বলে তো মনে হয় না।

এখনকার ছেলে-মেয়েরা এটা পারে।

বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রভা, বামুনদিদির কথাটা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। ওরা দুটিতে যখন পরস্পরকে এত পছন্দ করে, তখন বিয়ে করলেই তো পারে। তা হলে প্রভাকে অবশ্যই একবার পাত্রপক্ষের বাড়িতে যেতে হয়। সে একা যাবে? আর তো কেউ নেই। এই সময় রতন এলে তাকে সঙ্গে নেওয়া যেত। কিন্তু সে যে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়।

বাজারে প্যাচপ্যাচ করছে কাদা, বৃষ্টি পড়েই চলেছে। প্রভা ইচ্ছে করেই বেলা করে আসে। সকালের দিকে ভিড় হয় বেশি, লোকজনের গা ঘেঁষাঘেঁষি সে সহ্য করতে পারে না। দেরি করে এলে মাছ পাওয়া যায় না ইচ্ছে মতন। এমনিতেই বেশি মাছ ওঠে না। সব ভাল মাছ চলে যায় কলকাতায়। সত্যি কথা, ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা কেউ কেউ কলকাতা থেকে ফেরার সময় মাছ কিনে নিয়ে আসে।

শিখা মাংস ভালবাসে না, ডিম তো ছুঁয়েই দেখে না, মাছই বেশি পছন্দ করে। এখন যা মাছ রয়েছে, তার ওপর মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। তেলাপিয়াগুলো পর্যন্ত সরু। আজ শিখার অফিস ছুটি, বেশিক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোবে, আজ ওকে ভাল মাছ কিছু খাওয়ানো যাবে না? এক জায়গায় কাটা পোনা পাওয়া যাচ্ছে, ওপরের চামড়ার ম্লান ভাব দেখলেই বোঝা যায় তেমন টাটকা নয়, তবু তাই-ই নিতে হবে।

শিখাকে কখনো বাজারে পাঠায়নি প্রভা। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে রান্নাও শেখায়নি। বাড়ির কাজ বিশেষ কিছু জানে না। যদি বিয়ে করে, শ্বশুরবাড়ি কেমন হবে কে জানে। যদি ওকে মোচা কিংবা থোড় কুটতে বলে? চাকরি করা মেয়েদের আজকাল এসব শিখতে হয় না।

হঠাৎ প্রভার বুকটা কেঁপে উঠল। সত্যি সত্যি শিখা চলে যাবে পরের বাড়িতে? তারপর প্রভা কী নিয়ে বাঁচবে? বিশ্বেশ্বর চলে যাবার পর তার একটা জেদ ছিল, কারুর সাহায্য না নিয়ে, নিজের চেষ্টায় সে মেয়েকে শিক্ষায়-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলবে। বাবা যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, মা একা পারবে না কেন? সেই জেদের বশে সে এতদিন চলেছে।

এখন মেয়ে বড় হয়েছে, সে নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে। এখন যদি সে অন্য বাড়িতে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চলে যায়, তা হলে প্রভা কী নিয়ে বাঁচবে?

মা হয়েও প্রভা একদিন ভেবেছিল শিখার বিয়ের আশা কম। মায়েরা সব সময় নিজের সন্তানদের সুন্দর দেখে। শিখা যখন ছোট ছিল, তখন প্রভারও মনে হত রং কালো তো কী হয়েছে, তার মেয়ের মুখখানি ভারি মিষ্টি। কালো মেয়ে কি সুন্দর হয় না? কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেছে শিখার মুখের গড়নটাও তেমন সুন্দর নয়, অনেকটা পুরুষালি, বাবার ধরনের। মেয়েটা যদি আর একটু লম্বা হত।

সম্বন্ধ করা বিয়ের বাজারে শিখার বর জোটানোর সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু প্রেমের বিয়েও তো হতে পারে। ভালবাসার চোখে কে যে কাকে সুন্দর দেখে, যা অন্য কেউ বুঝবে না। তপন নিশ্চয়ই শিখাকে পছন্দ করেছে, নইলে এত ঘন ঘন আসবে কেন? তপনের চেহারা টেহারা তো মন্দ নয়, তার কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হতে পারত না?

আবার প্রভার বুক কেঁপে উঠল।

তপন বিশেষ কোনো মতলবে আসে না তো? তপন কী ছাই চাকরি করে বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে দুপুর বিকেলেও এসে বসে থাকে। বিনি পয়সায় চায়ের লোভে আসে? ও নিজে বোধহয় বেকার, কিংবা খুব সামান্য রোজগার, একটা চাকরি-করা বউ চায়। বাড়িটার ওপর লোভ করেনি তো? কয়েকবার এসেই নিশ্চয়ই তপন বুঝেছে, শিখাই এ বাড়িটার মালিক হবে।

তার মেয়েকে ওই তপন যদি ঠকায়? কাগজে প্রায়ই বেরয়, সম্পত্তির লোভে, গয়না-টাকা-পয়সার লোভে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তারপর স্বামীটা বউকে মেরে ফেলে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

একটা চেনা রিকশাওয়ালাকে ডেকে প্রভা বলল, ও ফটিক, তুমি আমার এই বাজারের থলেটা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস তো। আমি একটা কাজে যাব।

স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল প্রভা। তপন বলেছিল, নৈহাটি স্টেশনের কাছেই বাজারের পাশে ওদের বাড়ি। চাকলাদার পদবি আর ক-জনের হয়। একটু খোঁজ করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

নৈহাটি লোকাল এল সতেরো মিনিট পর। উলটোদিকের ট্রেন এইসময় একটু ফাঁকা থাকে। দৌড়াদৌড়ি না করে সামনের কামরাটাতেই উঠে পড়ল প্রভা। উঠেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

সেই কামরারই এক কোণে তপন বসে আছে, তার পাশে একটি শিখারই বয়েসি মেয়ে। এ মেয়েটিও দেখতে ভাল নয়, গায়ের রং শুধু কালো নয়, চামড়া খসখসে, বেশ রোগা, মাথায় চুল কম। তার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে গল্প করে যাচ্ছে তপন, মেয়েটা মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর নেমে পড়ার উপায় নেই।

ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, দরজার ধারে বসল প্রভা। পরের স্টেশনেই নেমে যেতে হবে। মাসিক টিকিট কেটে তপন কি ট্রেনে ট্রেনেই ঘুরে বেড়ায়? বেছে বেছে অসুন্দর মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে। যে-সব মেয়েদের বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই, তারা তপনের মতন একজন বন্ধু পেয়ে বর্তে যায়।

না, না, প্রভা এসব কী ভাবছে? এরকম কিছু নাও হতে পারে। হয়তো এই মেয়েটি তপনের আত্মীয় কিংবা পাড়ার মেয়ে। শিখার সঙ্গে ভাব করেছে বলে তপন কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে না?

কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রভা একবার আড় চোখে তাকাল। সাধারণ কথাবার্তা আর প্রেমের কথাবার্তার ধরনই আলাদা। চাহনি অন্যরকম হয়ে যায়। শিখার সঙ্গে যেমন মগ্ন হয়ে কথা বলে, তপন এখনো ঠিক সেইভাবে বলছে। টুকরো টুকরো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশের কোনো জঙ্গলের গল্প।

তপন ঠিক দেখতে পেয়ে গেল। উঠে এসে বলল, একী, মাসিমা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

প্রভা এমন মুখের ভাব করল যেন তপনকে সে এইমাত্র দেখেছে। সে বলল, আমি মোটে এক স্টেশন যাব। তুমি, তুমি আজ অফিস যাওনি?

তপন অবহেলার সঙ্গে বলল, আমার রোজ না গেলেও চলে।

প্রভার পাশে বসে পড়ে বলল, আপনি নৈহাটি চলুন না, আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন।

প্রভা ত্রস্তে বলে উঠল না, না, আমার একটা কাজ আছে। আর একদিন, শিখা যদি যেতে চায়।

তপন বলল, শিখা দুদিন আমাদের বাড়ি ঘুরে গেছে।

তপনের ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। ট্রেনের গতি কমে এসেছে, প্রভা উঠে দাঁড়াতেই সে বলল, শিখাকে বলবেন, কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমি ওর জন্য শিয়ালদা স্টেশনে অপেক্ষা করব।

প্রভার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ধরা-পড়া চোরের মতন। সে গোপনে তপনের বাড়ি দেখে আসতে চেয়েছিল, তপন কি তা বুঝে গেছে, সেইজন্যই বলল, চলুন আমাদের বাড়ি?

প্রভা ঠিক করল, এবার একদিন শিখার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতেই হবে।

তার আগে শিখাই একটা সাঙ্ঘাতিক খবর দিল।

পরদিন তপন সঙ্গে আসেনি, ট্রেন লেট হওয়ার জন্য দেরি করে ফিরল শিখা। একতলার বাথরুমে গা ধুতে গিয়ে একটা গিরগিটি দেখতে পেয়ে চ্যাঁচামেচি করল খানিকক্ষণ। বামুনদিদির সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে কথা কাটাকাটি হল একবার। ওপরে সেলাই মেশিন চালাতে চালাতে প্রভা সব শুনছে।

শিখা দোতলায় এসে কাপড় বদলাল, চুল আঁচড়াল, একটুক্ষণ রেডিও শুনল। তারপর বাইরে এসে প্রভার সেলাই মেশিনটা থামিয়ে দিয়ে বলল, মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

প্রভার বুকটা ধক করে উঠল। আজই কি শিখা ওর বিয়ের কথা বলবে? তপন ঠিক কেমন ছেলে, এখনো যে বোঝা গেল না।

শিখা বলল, মা, অফিস থেকে আমাকে দুর্গাপুর ট্রান্সফার করছে।

প্রভা প্রায় আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? সে কি? তোকে যেতে হবে নাকি?

শিখা বলল, ট্রান্সফার অর্ডার হলে যেতে হবে না? বাসন্তী আমাদের সঙ্গে কাজ করে, তোমাকে বলেছি তো বাসন্তীর কথা, আসলে টান্সফার করেছিল ওকে। কিন্তু বাসন্তীর দুটো ছেলেমেয়ে দমদমে ইস্কুলে পড়ে। ওর পক্ষে যাওয়া খুব মুশকিল। সেইজন্য আমাকে যেতে হবে। আমার তো ওসব ঝঞ্ঝাট নেই।

—কেন, তোকেই যেতে হবে কেন? আরও পুরুষ মানুষও তো কাজ করে তোদের অফিসে।

—কেউই কলকাতা ছেড়ে সহজে যেতে চায় না। যারা বিয়ে টিয়ে করেছে, তাদের পক্ষে যাওয়াও অনেক অসুবিধের। আমার তো কেউ নেই।

—তোর কেউ নেই?

—তুমি আছ! কিন্তু মা-বাবা থাকার ব্যাপারটা অফিস বোঝে না। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী একথাও তো বলতে পারব না। ভালই হবে কিন্তু, ওখানে কোয়ার্টার দেবে, তুমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে পারবে। তোমার তো কোথাও যাওয়া হয় না।

—আমি এ বাড়ি ফেলে যাব কী করে?

—বামুনদিদিকে রেখে যাবে। দু-চারদিনের জন্য লোকে বাইরে যায় না! এখানে রোজ রোজ ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিস যাওয়া, ভিড়ে যা কষ্ট হয়! ওখানে কোয়ার্টারের পাশেই অফিস, হাঁটা পথ। বেশ খোলামেলা জায়গা।

—তুই অতদূরে একা একা থাকবি?

—প্রথম কথা, দুর্গাপুর এমন কিছু দূর নয়। ইচ্ছে করলে শনি-রবিবার বাড়ি ঘুরে যেতে পারি। আর একা একা মানে—

—তুই তো আগে কোনোদিন বাইরে বাইরে থাকিসনি।

—মা, মানুষের যত বয়েস বাড়ে, ততই আগে করেনি এমন অনেক কিছু করতে হয়।

—একা থাকতে তোর ভয় করবে না?

—একটু একটু করবে। সে ব্যাপার ভেবেছি। তপন দুর্গাপুরে গিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে চায়।

যেন একটুক্ষণের জন্য প্রভার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

মনে পড়ল, রেলের কামরায় সেই দৃশ্য। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে তপন। বেলা সওয়া দশটায়। এ কথাটা শিখাকে জানাতেই হবে।

শিখার চোখে চোখ রেখে প্রভা প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুই তপনকে বিয়ে করছিস?

আস্তে আস্তে দু দিকে মাথা দুলিয়ে শিখা বলল, না।

প্রভার আবার সব কিছু গুলিয়ে গেল। নিজের মেয়ে, এতকাল ধরে তাকে দেখছে, অথচ এখন শিখার কথাবার্তা যেন সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগছে।

প্রভা বলল, তুই কী বলছিস, খুকি। ওকে বিয়ে করবি না, অথচ দুর্গাপুরে নিয়ে যেতে চাস।

ফিক করে হেসে ফেলে শিখা বলল, তাতে কী হয়েছে? ও বেচারার চাকরি নেই, নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেছো, দুর্গাপুরে আমার কাছে থেকে একটা কিছু খুঁজে নিতে পারবে। ওখানে কন্ট্রাক্টরদের কাছে বলে কয়ে চাকরি করিয়ে দেওয়া যায়।

—তোর বাড়িতে থাকবে?

—হ্যাঁ। তুমি যেমন বামুনদিদিকে আশ্রয় দিয়েছ, সেই রকম আমি একজনকে আশ্রয় দিতে পারি না?

—বামুনদিদি আর একজন পুরুষ মানুষ কি এক হল? তোর যদি তপনকে পছন্দ হয়, তা হলে ওকে বিয়ে করবি না কেন? তপন রাজি নয়?

—তপন রাজি হলেও আমি রাজি নই।

—কেন রে খুকি, কেন এই কথা বলছিস?

—এই জন্য রাজি না, বাবা যেমন তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, সেইরকম তপনও যদি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে যায়? ওকে আমি সে সুযোগ দেব কেন? তপনের পক্ষে সেটা অসম্ভব কিছু নয়, ওর মধ্যে একটু উড়ু উড়ু ভাব আছে। ওর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন।

—অ্যাঁ? আগে একটা বিয়ে হয়েছিল? আমাকে কখনো বলেনি তো।

—সে দোষ তুমি ওকে দিতে পার না, মা। তুমি কি ওকে জিজ্ঞেস করেছ? কেউ কি নিজে থেকেই বলে যে, আমি আগে একটা বিয়ে করেছিলুম, এখন আমার সে বউ নেই।

প্রভার মনে পড়লো, অনেকবার এই প্রশ্নটা মনে এসেছে, তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা হয়নি। তপনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল সে অবিবাহিত। এই বয়সেই সে একটা বিয়ে চুকিয়ে ফেলেছে।

প্রভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, ওর উড়ু উড়ু ভাব আছে জেনেও তুই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিস?

শিখা বলল, মা, আমি তো রোজ আয়নায় নিজেকে দেখি। নিজের সম্পর্কে আমার কোনো ভুল ধারণা নেই। যাদের সবাই আদর্শ স্বামী বলে, সেরকম কেউ আমাকে বিয়ে করবে না আমি জানি।

—আহা, রং ময়লা হলে বুঝি তার বিয়ে হয় না। তুই-ই তো এতদিন না না করেছিস। এবার তোর জন্য পাত্র খুঁজব, তপনের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিস না।

—তুমি কী করে পাত্র খুঁজবে মা? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, মাঝে মাঝেই একটি করে বরপক্ষ আসবে আমাকে দেখতে, চপ-কাটলেট-মিষ্টি খাবে, তারপর আমাকে অপছন্দ করে চলে যাবে। তুমি কি মনে কর, সেই অপমান সহ্য করতে আমি রাজি হবো? তাহলে আমাকে লেখাপড়া শেখালে কেন? যদি বা ওইসবে রাজি হই, তা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো বুড়োহাবড়া, কানাখোঁড়া বা দোজবরে বা আধপাগলা বর জুটবে আমার। বিয়ে করে আমাকে দাসী-বাঁদী করে রাখতে চাইবে। কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছল পরিবারের লোক আমার মতন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? আমার চেয়ে অনেক ভালো চেহারার মেয়ে সে পেয়ে যাবে।

—তুই অমন করে বলিস না তো খুকি। আমার সহ্য হয় না।

—যেটা সত্যি, সেটা তো মেনে নিতেই হবে মা! আমার ভাগ্য ভাল যে তপনের মতন একটা বন্ধু হয়েছে! ও মানুষটা খুব খারাপ নয়। মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে দু-দশ টাকা নেয়। তাতেই খুশি।

—তোর কাছ থেকে টাকা নেয়?

—ভয় পাচ্ছ কেন, বেশি নেয় না। কখনো বেশি চাইলেও দেব না। জোর করার শক্তি ওর নেই। আমি তো ভেবে রেখেছিলুম, সারাজীবন আমাকে একাই কাটাতে হবে। মনে মনে তার জন্য তৈরিও ছিলুম। হঠাৎ তপনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ভিড়ের ট্রেনে একজন পুরুষ সঙ্গী থাকলে মেয়েদের কত যে সুবিধে হয়! তপন বেশিদিন হয়তো টিকবে না। যদি এক-দুবছরও থাকে আমার কাছে, সেটাই বা মন্দ কী! দুর্গাপুরে ও আমার কাছে হাত-পাতা অবস্থায় থাকবে। আমি ওকে খাওয়াব, পরাব। যেমন স্বামীরা বউকে খাওয়া-পরা দেয়, আমার বেলায় সেটা হবে উলটো। তাতে যে আমার কতটা আনন্দ হবে, বুঝতে পারছ না?

—তা বলে তুই বিয়ে না করে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকবি, লোকে কী বলবে, সেটা তুই ভেবে দেখছিস না?

—লোক কোথায় মা? আজকাল কে কাকে নিয়ে মাথা ঘামায়? দুর্গাপুরে কে জানবে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে কি না? সেইজন্যই তো দুর্গাপুরে যাওয়াটা আমার পক্ষে বেশি দরকারি। এখানে থাকলে বরং...অনেক চেনাশোনা...তারা নাক গলাত।

—আমি এখনো মানতে পারছি না, খুকি! এ কখনো হয়? এ যে ব্যভিচার!

—খুব ভাল করে ভেবে দ্যাখ মা। ব্যভিচার আবার কী? ধর, আমি তপনকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলুম, তখন সে আইনসঙ্গতভাবে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারবে, তাই তো? দু বছর বাদে সে যদি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়, আমি তাকে আটকাতে পারব? বাবাকে তুমি আটকাতে পেরেছিলে? পুরুষরা ইচ্ছে করলেই পালাতে পারে। তা হলে ওই রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা শুধু শুধু একটা ফার্স না? এটাও বুঝি ব্যভিচার না?

—তুই দুর্গাপুর যাবিই ঠিক করেছিস?

—হ্যাঁ মা। চাকরি করতে গেলে অফিসের কথা তো শুনতেই হবে। তপনকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

—তুই বামুনদিদিকে বলিস না, তপনের কথাটা বলিস না।

শিখা এবার হেসে ফেলল। কাছে এসে প্রভার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার মা-টা কত সুন্দর। পৃথিবীতে এত ভাল মা আর নেই। আমি কেন তোমার মতন রূপ পেলুম না। বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গেল, তোমাকে ছেড়ে, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতুম, তোমাকে কখনো ছেড়ে যেতুম না।

মেয়ের কাছ থেকে আদর পেয়ে চোখে জল এসে গেল প্রভার।

একটু পরে শিখা আবার বলল, মা, একটা কথা আমি আগে কখনো ভাবিনি, তপনের সঙ্গে আলাপ হবার পরই প্রায়ই মনে হচ্ছে। আচ্ছা মা, বাবা চলে যাবার পর তুমি কেন আবার বিয়ে করলে না? তোমার বয়েস তখন মাত্র ত্রিশ-একত্রিশ, চেহারা ভাল ছিল।

ছিটকে সরে গিয়ে প্রভা বলল, যাঃ কী বলছিস, ছি ছি, ওসব বলতে নেই।

শিখা জোর দিয়ে বলল, কেন বলতে নেই? ভাই মরে গিয়েছিল, সেটা তো তোমার দোষ নয়। একজন পুরুষ মানুষ ইচ্ছে মতন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে, আর তুমি সারাজীবন সে জন্য কেন বঞ্চিত থাকবে? পুরুষদের সঙ্গে আর কিছু হোক বা না হোক, নিরালায় বসে কথা বলতেও ভাল লাগে। সেটা আমি এখন বুঝেছি। আর বিয়ে না হয় করনি, তোমার একজন ঘনিষ্ঠ পুরুষ বন্ধুও তো থাকতে পারত। সেরকমও তো কারুকে দেখিনি।

প্রভা বলল, ওসব কথা আমি কখনো ভাবিওনি। ভাবার সময়ও ছিল না রে।

—বাবা চলে যাবার পরেও কি তুমি তাকে ভালবাসতে? স্বামী হিসেবে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে?

—নাঃ, ওসব আর ছিল না।

—আমার সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে যদি দেখা হতো, তাকে আমি জিজ্ঞেস করতুম—

—কী জিজ্ঞেস করতিস?

—সে আমার সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হত। তুমি কেন নিজেকে বঞ্চিত করলে মা? এতগুলো বছর, শুধু সংসার আর খাটুনি আর সেলাই ফোঁড়াই, তোমার জীবনটা বৃথাই গেল!

—ওসব কথা বলিস না তো খুকি! মোটেই আমার জীবন বৃথা যায়নি।

—কেন তুমি নিজেকে বঞ্চিত করেছে তা আমি জানি। আমার জন্য। অন্য পুরুষের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে দেখলে পাছে আমি কিছু মনে করি, আমি দুঃখ পাই, তাই তুমি অন্য সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখেছ। অল্প বয়সে সেরকম কিছু দেখলে আমি দুঃখ পেতুমও হয়তো। তুমি আমার জন্য আত্মত্যাগ করেছো। মা, আর আমার জন্য তোমার কিছু করতে হবে না। এখন থেকে তুমিই হবে আমার মেয়ের মতন। আমি দুর্গাপুরেই যাই আর যেখানেই যাই, আসলে কিন্তু তোমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না। তোমাকে আমি কখনো ছেড়ে যাবো না।

৪

আগে কাজের মধ্যে এক একটা দিন কেটে যেত খুব তাড়াতাড়ি, সোমবার শুরু হতে না হতেই এসে যেত শনিবার। এখন দিন আর কাটতেই চায় না।

শিখা চলে গেছে, প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে তার পাঁচখানা চিঠি এসেছে। প্রত্যেকটা চিঠিই যে কতবার করে পড়েছে প্রভা, তার ঠিকই নেই। মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু আশা মেটে না, আবার পড়তে ইচ্ছে হয়।

শিখা ভাল আছে, দুর্গাপুরে কোয়ার্টার গুছিয়ে নিয়েছে। সব চিঠিতেই লেখে, মা তুমি কবে আসবে? আসবে না?

তপনের কথা একবার উল্লেখ করেছে মাত্র। আর কিছু লেখে না। কিন্তু তপন ওখানেই আছে, প্রভা বুঝতে পারে। শিখা লিখেছে, 'তুমি আমাকে বাজার করতে শেখাওনি, ভাগ্যিস এখানে এসেও আমাকে বাজার করতে হয় না।' বোঝাই যাচ্ছে কে বাজার করে দেয়। আর এক জায়গায় লিখেছে, 'ছোটবেলা থেকেই মেঘলা দিনে বাজের গর্জন শুনলে আমার ভয় করে। বড় হয়েও সেই ভয়টা গেল না। গত শনিবার এখানে দারুণ দুর্যোগ, সারাদিন ঝড় আর বৃষ্টি, আমার কোয়ার্টারের খুব কাছেই একটা গাছতলায় বাজ পড়ে একটা ছেলে মারা গেছে। সেই সময় আমার ঘরের দরজা-জানলা ঝনঝন করে কেঁপে উঠেছিল। সেই সময় একলা থাকলে আমি বোধহয় ভয়েই মরে যেতুম।'

বিয়ে হলে মেয়ে দূরেই চলে যেত। চাকরির জন্যও দূরে যেতে হয়। কিন্তু দুটোতে তফাত আছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে মা গিয়ে থাকতে পারে না। ছেলের বাপ-মা সঙ্গে থাকতে পারে, মায়ের বাপ-মা সঙ্গে থাকতে পারে না, আমাদের দেশে এটাই নিয়ম।

মেয়ে চাকরি করতে দুর্গাপুরে গেছে, সেখানে নিজস্ব কোয়ার্টার পেয়েছে, সেখানে মা তো যেতেই পারে। প্রভার মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে যেতে। দুর্গাপুরে সে কখনো যায়নি। শিখার কোয়ার্টারটা কী রকম একবার দেখে আসতে পারলে পরে মানসচক্ষে দেখা যেত শিখা কোন ঘরে ঘুমোয়, কখন রান্নাঘরে যায়, জানলা দিয়ে বাইরের কী কী দেখে।

আগে ভেবেছিল, এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন মনে হয়, দু-চারদিনের জন্য বামুনদিদির ওপর ভার দিয়ে গেলেও চলে। বামুনদিদি আপনজনের মতনই হয়ে গেছে, অবিশ্বাসের কিছু করবে না। চোর-ডাকাতরাই বা এ বাড়িতে এসে কী পাবে, সেরকম দামি জিনিস তো কিছুই নেই। সেলাইকলটাও অনেক পুরনো হয়ে গেছে।

তবু, মনের দিক থেকে একটা বাধা আছে। সেটা কিছুতেই কাটাতে পারছে না প্রভা। বিয়ে করেনি শিখা, কিন্তু তার সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকে। আগেকার দিনে এটা কল্পনাও করতে পারত না। শিখা একটুও গোপন না করে কী রকম অবলীলাক্রমে মাকে জানিয়ে দিল। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, এতে কোনো পাপ নেই। পাপ-পুণ্য নিয়ে কেই বা আজকাল মাথা ঘামায়। বিয়ে করার পর নারী আর পুরুষ একসঙ্গে থাকলে পাপ হয় না, কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীকে ছেড়ে কোনো স্বামী যদি চলে যায়, সেটাকে তো কেউ পাপ বলে না! স্বামীকে ছেড়ে যদি স্ত্রী চলে যায়, তাকে পাপীয়সী, কুলটা কত কী বলে!

যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মন মানে না। শিখার ওখানে গেলে তপন চোখের সামনে ঘুরবে-ফিরবে, রাত্তিরে শিখার সঙ্গে এক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা কি প্রভা সহ্য করতে পারবে?

লেখাপড়া জানা মেয়েকে শাসন করা যায় না। তার ওপর জোর ফলান যায় না। প্রভা যদি তপনকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানাত, তা হলেও কি শিখা সেটা মানত?

স্বামী নয়, আশ্রিত, এই ব্যাপারটা অবশ্য প্রভার খুব পছন্দ হয়েছে। তখন শিখার ওপর কোনো অধিকার ফলাতে পারবে না। তার চাকরি নেই, তাকে খাওয়াবে শিখা, জামা-কাপড় কিনে দেবে, বিড়ি-সিগারেট খাবার জন্য তপনকে শিখার কাছেই হাত পাততে হবে। শিখা যে-রকম তেজী মেয়ে, তপন কখনো বাড়াবাড়ি রকম অবাধ্যপনা করলে সে স্রেফ তপনকে বলে দেবে, তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও।

বেশ হয়েছে! পুরুষরা বুঝুক, অন্যের অধীনে থাকতে কেমন লাগে!

বামুনদিদি মাঝে মাঝে বলে, আহা খুকিটা একা একা অতদূর গেল, ও জইন্য খুব চিন্তা হয়। মাইয়া-মানুষ কি বিদেশে একা থাকতে পারে?

শিখা যে দুর্গাপুরে একা নেই, এ কথাটা বামুনদিদিকে বলা যায় না। শিখাকেও প্রভা বারবার অনুরোধ করেছিল, বামুনদিদিকে তপনের কথাটা বলিসনি!

বামুনদিদি কে? একটা অসহায় রিফুইজি বিধবা। এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে তাকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে। এতই বয়েস যে কেউ তাকে ঝি বা রাঁধুনির চাকরিও দেবে না। তবু তাকেই ভয় পায় কেন প্রভা? লোকলজ্জা এমনই জিনিস। যতই ঝগড়া করুক, বামুনদিদি শিখাকে খুব ভালবাসে, নিজের নাতনির মতন। তবু শিখা-তপনের সম্পর্কটা প্রভা মেনে নিতে পারলেও বামুনদিদি কিছুতেই পারবে না। কষ্ট পাবে, শুধু শুধু বুড়িকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

সেলাই করতে বসে প্রভা মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। থেমে যায় পা। এই সংসারটা চালাবার জন্য টাকা-পয়সার প্রয়োজন আছে ঠিকই, তাহলেও শিখা নেই বলে সব কিছুই অর্থহীন মনে হয়। মেয়ের টাকায় অন্ন জোটানোর কথা সে একবারও চিন্তা করে না। এখনো প্রভার চোখ একটুও নষ্ট হয়নি, শরীরে জোর আছে, আরও অনেকদিন সে সেলাই চালিয়ে যেতে পারবে। তার সুনাম আছে, সবাই তাকে কাজ দিতে চায়।

বাড়ির সামনে একটা রিকশা থেমেছে, দরজার কড়া নাড়ছে কে যেন।

বামুনদিদিকে বলা আছে, সে কখনো দরজা খুলবে না। দিনকাল ভাল নয়। বড় রাস্তায় দুই রাজনৈতিক দলে প্রায়ই বোমাবাজি হয়। পুলিশ এসে তাড়া করলে সেই বোমাবাজরা দৌড়ে গলিতে ঢুকে যে-কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ে। দ্বিজেনবাবুর ছেলেদুটো ওই সব কারবারে আছে। প্রভা তাদের বলে দিয়েছে, তোমরা দেখ, আমার বাড়িতে যেন কেউ ঢুকতে না চায়। আমি পুলিশের ঝঞ্ঝাট সামলাব কী করে? তারা জানিয়েছে, না, মাসিমা, আপনাকে কেউ ডিসটার্ব করবে না। আপনি কোনো পার্টিকেই ঢুকতে দেবেন না।

সততার একটা সম্মান আছে। পাড়ার প্রায় সবাই প্রভাকে সমীহ করে। শিখা তেমন সুন্দরী বা আকর্ষণীয়া নয় বলেই ছেলে-ছোকরারা কখনো উপদ্রব করেনি। তপন ছাড়া আর কোনো ওই বয়েসি ছেলেই বাড়িতে ঢোকার অধিকার পায়নি এ পর্যন্ত।

তবু বলা তো যায় না। যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে, বামুনদিদি সামলাতে পারবে না। প্রভাকেই দরজা খুলতে হবে। সেলাইয়ের অর্ডার দেবার জন্য রথীন আসে নিয়মিত। আজ তার আসবার দিন নয়।

প্রভা তরতর করে নিচে নেমে এসে দরজার এক পাল্লা খুলে দাঁড়াল।

সাইকেল রিকশায় বসে এক বৃদ্ধ, মলিন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা, সারা মুখে দাড়ি, একটা চোখ কানা, অন্য চোখটাও মিটমিট করছে। এরকম চেহারা দেখলেই কেমন যেন অবজ্ঞার ভাব হয়। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলে নেমে দাঁড়িয়েছে রিকশা থেকে, সে-ই কড়া নেড়েছে।

ছেলেটি প্রভাকে কিছু বলে বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞেস করল, কী, এই বাড়ি তো? ঠিক আছে?

বৃদ্ধটি ভাঙা গলায় বলল, হ্যাঁ, এই বাড়ি।

ছেলেটি বলল, তা হলে আমি পৌঁছে দিয়ে গেলুম। এবার চলি!

বৃদ্ধটিকে হাত ধরে রিকশা থেকে নামিয়ে সে নিজে তড়াক করে চেপে বসল। চালককে বলল, ঘুরিয়ে নাও।

প্রভা পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে আছে। বামুনদিদি তার পাশে এসে বলল, কে আইল? অ্যাঁ? এ কেডা?

বৃদ্ধ এক পা এগিয়ে এসে কান্না কান্না ভাব করে বলল, প্রভা, আমাকে চিনতে পার না? কতদিন পর—

এক নজর দেখামাত্র প্রভা চিনতে পেরেছে। এ কখনো ভুল হয়। কিন্তু এতটা তো বুড়ো হবার কথা নয়। প্রভার চেয়ে এগোরো বছরের বড়। সেই বয়সের অনেক পুরুষ মানুষই মাথা উঁচিয়ে টকটকিয়ে হাঁটে। অকাল বার্ধক্যে এই লোকটা কুঁজিয়ে গেছে।

কঠিন মুখ করে প্রভা বলল, তুমি এখানে কী মনে করে?

বৃদ্ধ বলল, বলব, সব বলব। আমাকে একটু ভেতরে গিয়ে বসতে দাও।

প্রভা বলল, না, ভেতরে গিয়ে বসবার দরকার নেই। তোমার সব কথা আমি শুনতেও চাই না।

বামুনদিদি আবার জিজ্ঞেস করল, কে? এই লোকটা কেডা?

প্রভা বলল, বামুনদিদি, তুমি ভেতরে যাও।

কিন্তু বামুনদিদি রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, সে এখন যাবে কেন?

বৃদ্ধ বলল, ট্রেন এক জায়গায় অনেকক্ষণ থেমে ছিল, গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছি। এক গেলাশ জল খাওয়াবে?

প্রভা বলল, না। মোড়ের মাথায় টিউবওয়েল আছে—

যে-কোনো ভারতীয় গৃহস্থের বাড়িতে কেউ এসে খাবার জল চাইলে প্রত্যাখ্যান করার প্রথা নেই। বামুনদিদি চোখ কপালে তুলে বলল, ওমা, সে কী কথা, একটা মানুষ খাওনের জল চাঁইল, জল না দিয়া কি পারা যায়?

প্রভা বলল, ওটা ওর ভেতরে ঢোকার ফন্দি। জল খাওয়ার আর জায়গা পায়নি? আমার বাড়িতে ও সব চলবে না।

গৃহকর্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করে বামুনদিদি জল আনতে চলে গেল।

বৃদ্ধ বলল, সত্যি খুব তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমার আলসার আছে তো, তাই বেশি তেষ্টা পায়। প্রভা, তুমি আমাকে চিনতে পারনি, আমি বিশ্বেশ্বর।

প্রভা বলল, ও নামে যে কেউ একজন ছিল, তা আমি মনে রাখতে চাই না। এতদিন পরে এসে তোমার কোনো সুবিধে হবে না।

বিশ্বেশ্বর বলল, প্রভা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গৌর মারা যাবার পর আমার আর কিছু মনে ছিল না। এতদিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি পাগলের মতন, লোকে দয়া করে দুটি খেতে দিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে এক সাধুর দেওয়া ওষুধ খেয়ে আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।

প্রভা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আর সিউড়িতে তোমার যে ঘড়ি-রেডিওর একটা দোকান ছিল, সেটা কী হল?

এবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বিশ্বেশ্বর।

একটা স্টিলের গেলাশে জল নিয়ে এসে বামুনদিদি বলল, আহা রে, মানুষটা বড় দুঃখী।

প্রভা বলল, তোমার ওই মায়াকান্না আমি শুনতে চাই না। জল খেয়ে বিদেয় হও।

বামুনদিদি বলল, ও প্রভা, মানুষকে অমন কথা বলতে নাই। কানা মানুষ, অমন চোখের জল ফেলছে।

ঢক ঢক করে সব জলটুকু শেষ করে বিশ্বেশ্বর বলল, আমি আর কোথায় যাবো? ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দোকানটা নেই। চোখ গেছে, আর কাজ করতে পারি না। ওরা আমাকে দুটি খেতেও দেবে না। প্রায় দেড়দিন কিছু খাইনি, হাতে একটা পয়সাও নেই। খালি পেটে থাকলে আলসারের ব্যথা হয়।

বিশ্বেশ্বর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটিতে।

প্রভা বলল, তুমি এখানে বসলে যে! বলেছি না, এখানে তোমার জায়গা হবে না! না গেলে পাড়ার ছেলেদের ডাকব। তারা আমাকে মানে। তোমাকে মারতে মারতে দূর করে দেবে!

বিশ্বশ্বর বলল, তাই দাও। আমি আর যাব কোথায়? দেখলে না বিড়াল পার করার মতন আমাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেল। নিজে নিজে আর ফিরেও যেতে পারব না। গেলেও আমাকে মারবে। ছেলেমেয়ে দুজনেই মারে। তুমিও তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরে পড়ে থাকব।

বামুনদিদির চোখে জল এসে গেল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল, ইস, মানুষের কত কষ্ট। ও প্রভা, এমন কইরা কি কেউ দরজা থিকা অতিথিরে তাড়ায়। তাতে নিজেগো পাপ হয়। সংসারের অকল্যাণ হয়। আমার ভাগের থিকা দুগগা ভাত অরে দেব? অন্তত একটা বেলা খাইয়া বাঁচুক।

অনুমতির অপেক্ষা না করে বামুনদিদি বিশ্বেশ্বরকে বলল, আসো, তুমি ভিতরে আসো।

বিশ্বেশ্বর ভাল করে হাঁটতে পারে না। একেবারে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে গেছে সে। একসময় তার জোরালো ব্যক্তিত্ব ছিল, তাও নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। এ যেন বিশ্বেশ্বর নয়, তা প্রেতচ্ছায়া।

একজন পঙ্গু বৃদ্ধকে দেখে দয়া হয়েছে বামুনদিদির।

যদি বলা যায় এই লোকটা আমার ভূতপূর্ব স্বামী ছিল, তখন কী বলবে? তখন শুধু একবেলার ভাত নয়, মাথায় করে রাখতে বলবে। স্বামী তো ভূতপূর্ব হয় না, যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিনই স্বামী।

ভেতরে এসে এদিক ওদিক চেয়ে বিশ্বেশ্বর বলল, সব কিছু একই রকম আছে। শিখা মা কোথায়?

প্রভা বলল, না, সব কিছু এক নেই। এটা ভাড়া বাড়ি নয়, এ বাড়ির মালিক এখন আমি। তোমার মাথায় গোলমাল হয়েছিল, সব ভুলে গিয়েছিলে, এই ধরনের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলবে ভেবেছিলে। তোমার সব কীর্তিকাহিনী আমি জানি। তোমাকে আমি এখন ইচ্ছে করলে পুলিশ ধরিয়ে দিতে পারি।

বিশ্বেশ্বর বলল, আমার আর বেশিদিন আয়ু নেই, প্রভা। যে দোষ করেছি, তারও ক্ষমা নেই, জানি। আমি কোনো অধিকার চাইতেও আসিনি। শরীরে ক্ষমতা নেই, কোথাও যাবারও জায়গা নেই। ওরা মেরে মেরে আমার পিঠে কালশিটে ফেলে দিয়েছে। শেষ কয়েকটা দিন যদি একটু মাথা গোঁজার জায়গা দাও, আর দু-মুঠো ভাত, গলাগলা ভাত ছাড়া আর পেটে কিছু সহ্যও হয় না। একটু দয়া কর, একটু দয়া কর—

প্রভা বলল, বামুনদিদি, ভাঁড়ার ঘরটা একটু খালি করে দাও, থাকতে চায় ওখানে থাকুক। ও কোনোদিন ওপরে উঠবে না।

বিস্ফারিত চোখে বামুনদিদি বলল, ও প্রভা, ও কি তোমার সেই—

প্রভা বলল, না, আমার কাছে সে মরে গেছে। তুমিই তো বললে, একটা দুঃখী কানা মানুষকে তাড়িয়ে দিতে নেই। সেইজন্যই রইল। ওকে দুটো খেতে দিও।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে প্রভা ভাবল, শিখা বলেছিল, ওর বাবার সঙ্গে যদি কখনো আবার দে[illegible] তা হলে ওর একটা বোঝাপড়া আছে। শিখা এবার এলে, সেটা বুঝে নিত।

শিখা আরও বলেছিল, পুরুষ মানুষকে আশ্রয় দিতে এক ধরনের অহংকার বোধ করা যায়। প্রভাই বা সেই অহংকার ভোগ করবে না কেন?

হাসি-কান্না

স্টেজের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন প্রৌঢ় রাজা। অঙ্গে ঈষৎ মলিন, লম্বা, ঢোলা, জরি বসানো মখমলের জোব্বা। গলায় সাতনরী ঝুটো মুক্তোর মালা, দু কানে ক্রিস্টালের দুল, তাতেই আলো পড়লে হীরের মতন দেখায়। মাথায় মোগল-বাদশাদের মতন একটা সাদা পালক বসানো মুকুট। কোমরবন্ধে তলোয়ার। মুশকিল হয়েছে দু-পায়ের জুতো নিয়ে, লাল রঙের শুঁড় তোলা নাগরার একটা পাশ দিয়ে ছিঁড়তে শুরু করেছে, অন্যটায় পেরেক উঠেছে। পেরেকের দংশন সহ্য করে যাচ্ছেন ইন্দ্রনাথ, কিন্তু বাঁ পায়ের সুতোর ছেঁড়া অংশটা যাতে দর্শকদের চোখে না পড়ে, সেজন্য সচেতন থাকতে হচ্ছে সব সময়।

মঞ্চে রাজা একা, এখানে তাঁর দীর্ঘ স্বগত সংলাপ।

শুধু কণ্ঠস্বর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন ইন্দ্রনাথ, গলা ইচ্ছে মতন ওঠে-নামে, তিনি ফিসফিস করলেও একেবারে শেষের সারির দর্শকরা পর্যন্ত শুনতে পায়। গলা তৈরি করার জন্য তাঁকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে, দিনের পর দিন ভোরবেলা উঠে, দাঁত না মেজে, চ্যাঁচাতে হয়েছে বরানগরের গঙ্গার ধারে। তবু এগারো মিনিটের টানা একা একা কথা বলায় যদি দর্শকদের ধৈর্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই কিছু কিছু 'বিজনেস' ঠিক করে নিয়েছেন ইন্দ্রনাথ। এগারো মিনিট কম সময় নয়। প্রজা বিদ্রোহের ফলে কালকেই এই রাজাকে সিংহাসন ছেড়ে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তাই ভগ্নহৃদয় রাজা স্মৃতিচারণ করতে করতে এক একবার এক একটা প্রিয় জিনিস তুলে দেখবেন, কখনো তাঁর পিতার ছবির কাছে বসবেন হাঁটু গেড়ে, কখনো ফুট লাইটের একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে দর্শকদেরই সম্বোধন করবেন প্রজা হিসেবে।

দৃশ্যটি গাম্ভীর্য-বিষাদে মেশা, তবে ইন্দ্রনাথ দুঃখের কথা উচ্চারণ করেন খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে।

দর্শকদের সংখ্যা আড়াই-তিন হাজার তো হবেই, একটা স্কুলের মাঠে প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। যাত্রা নয়, একটি জার্মান নাটকের ভাবানুবাদ, প্রয়োগরীতি পুরোপুরি আধুনিক, আজকাল মফস্বলের দর্শকরাও এসব ভাল ভাবে নেয়। অডিয়েন্সের মধ্যে একেবারে পিন ড্রপ সাইলেন্স যাকে বলে।

মনোলগ শেষ হবার পর রাজা কয়েক মুহূর্ত থামবেন, তারপর অনুপস্থিত বিদ্রোহী প্রজাদের উদ্দেশে বলবেন, আজকের রাতটা অন্তত আমাকে শান্তিতে ঘুমোতে দাও।

এবার ঘুরে দাঁড়াতে গেলেই তার মাথা থেকে খসে পড়বে মুকুটটা। এটা একটা প্রতীক। মঞ্চের ওপর মুকুটটা গড়াবে, তিনি লোভীর মতন ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরবেন। ঠিক তক্ষুনি নেপথ্যে শোনা যাবে প্রচণ্ড কোলাহল, তারপর গুলির শব্দ। তিনি উদভ্রান্তের মতন তাকাবেন, আধ মিনিট পরে ডান দিকের উইংস দিয়ে ঢুকবে ভগ্নদূত। সে এসে খবর দেবে, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবদত্ত খুন হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ এমনভাবে ওই ঘুরে দাঁড়ানোটা প্র্যাকটিস করেছেন যে মুকুটটা ঠিক মঞ্চের একটু দূরে ছিটকে পড়ে খানিকটা গড়ায়। মাথাটা ঝাঁকাবার একটা কায়দা আছে। তারপর তিনি মুকুটটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকে তুলবেন, তখন নেপথ্যে চ্যাঁচামেচি ও গোলাগুলির শব্দ শুনে মুহূর্তে মুহূর্তে তার মুখের এক্সপ্রেশান বদলাবে, এই জায়গায় প্রত্যেক শো-তে ইন্দ্রনাথ হাততালি পান।

মুকুটটা ঠিকমতনই গিয়ে পড়ল, রাজা গিয়ে সেটা বুকেও তুলে নিলেন। যদিও ঘোরার সময় জুতোর পেরেকটা খুব জোর কামড়ে দিল আবার, কিন্তু নেপথ্যের কোলাহল কিংবা গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল না।

ওসব আজকাল টেপ করা থাকে, ঠিক সময় একজন উইংসের পাশে একটা মাইক্রোফোনের সামনে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দেয়। এর আগে এই নাটকের সাতাশটা শো হয়ে গেছে, একবারও এরকম গণ্ডগোল হয়নি।

ইন্দ্রনাথ মুকুটটা বুকে চেপে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু মুখের এক্সপ্রেশান দিতে পারছেন না। প্রতি মুহূর্তে ভাবছেন এবার শব্দগুলো হবে। মঞ্চের ওপর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এক্সপ্রেশান দেবার জন্য টাইম নেওয়া আর পার্ট ভুলে যাওয়া নীরবতার তফাত দর্শকরা ঠিকই বুঝতে পারে। ম্যানেজ করার জন্য ইন্দ্রনাথ মুকুটটা আবার ফেলে দিলেন মঞ্চে, আবার হুমড়ি খেয়ে সেটা কুড়লেন। যাতে মুকুটটা যে তাঁর কাছ থেকে চলে যেতে চাইছে, এটা দর্শকরা ভাল করে বোঝে।

তবু সেই কোলাহল আর গোলাগুলির শব্দ হল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথ একবার তাকিয়ে ফেললেন বাঁ দিকের উইংসে। তখনই ডান দিকের থার্ড উইংস থেকে ঢুকে পড়ল ভগ্নদূতবেশী তপন।

আগের সেই এক্সপ্রেশানটা আর দেওয়া হল না, ভগ্নদূতের মুখে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন মূর্তির মতন হয়ে গেলেন রাজা। এখানে তাঁর হাহাকারের সুরে দু বার দেবদত্ত, দেবদত্ত নাম উচ্চারণ করার কথা ছিল। তার বদলে নতুন সংলাপ দিলেন ইন্দ্রনাথ, দেবদত্তকে ওরা কেড়ে নিল?

একটু থেমে তিনি বললেন, আমি সহ্য করতে পারব, আমার বুকটা পাথর, কিন্তু ওর মা কি পারবে? ওরে, তোরা রানিকে এখন কিছু বলিস না।

বলতে বলতে শেষের দিকে ইন্দ্রনাথের গলা ভেঙে যায়। যেন তীব্র একটা কান্না তিনি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজ তেমন জমল না।

মঞ্চ অন্ধকার হতেই এক লাফে ভেতরে এসে ইন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলেন, কী হল? টেপ বাজল না কেন? হরষিত কোথায়?

ইন্দ্রনাথের গলার আওয়াজ দর্শকরা শুনে ফেলতে পারে বলে তপন তার হাত ধরে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, আস্তে ইন্দ্রদা, দাঁড়ান সব বলছি।

ইন্দ্রনাথ তপনকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, টেপ বাজাল না কেন আমি জানতে চাই। কোথায় গেল সেই শুয়োরের বাচ্চা হরষিত?

তপন বলল, হরষিত মাইকের সামনেই বসেছিল। কিন্তু....

কথা শেষ করতে দিলেন না ইন্দ্রনাথ। আবার ধমকে উঠে বললেন, কিন্তু? কিসের কিন্তু? শো-এর সময় কোনো কিন্তুর স্থান নেই। সাউণ্ড এফেক্ট কেন হল না আমি জানতে চাই।

উইংসের কোনো পাশেই হরষিত নেই, তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও দু তিনজন এসে ভিড় করল ইন্দ্রনাথের পাশে। একটু দূরে, বুকের সামনে হাত দুটো জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে রুমা, তার অঙ্গে রানির সাজসজ্জা, সে একদিকে একবার তাকালও না।

ধুত বলে পা থেকে নাগরা-জোড়া খুলে ফেলে ইন্দ্রনাথ রক্তচক্ষে অন্যদের মুখে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে হারামজাদা কোথায় গেল? আই ওয়ান্ট অ্যান এক্সপ্লানেশান। সে কী ভেবেছে, এটা গ্রুপ থিয়েটার না পাড়ার ফাংশান?

কেউ কিছু উত্তর দিল না। ইন্দ্রনাথ দৌড়ে চলে গেলেন খুঁজতে।

সবাই জানে, রাগলে ইন্দ্রনাথের মাথায় রক্ত চড়ে যায়, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হরষিত একটা দোষ করে ফেলেছে বটে, তার জন্য সে অন্যদের কাছে বকুনি খেয়েছে। ইন্দ্রনাথ শাস্তি দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলবেন। তা ছাড়া এখনো শেষের পাঁচটা ভাইটাল সিন বাকি আছে, তার মধ্যে ঝামেলা করা ঠিক নয়। শো-টা শেষ হয়ে যাক না।

তপন এসে রুমাকে অনুরোধ করল, তুমি একটু ইন্দ্রদাকে ডাক না। ওর মাথা গরম হয়ে গেছে তুমি ডাকলে শুনবে।

রুমা কোনো উত্তর দিল না, তপনের দিকে তাকালও না। তার চোখ দুটি যেন অশ্রুভারে নত।

তপন আবার ডাকল, এই রুমা।

রুমা তবু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

রুমার একটু পরেই এন্ট্রান্স। রুমার এই একটা অদ্ভুত স্বভাব, যতক্ষণ শো চলে সে কারুর সঙ্গে একটাও অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না, যে-দিন যে-ভূমিকাটা করে, সেদিন অবিকল সেই চরিত্রটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উইংসের পাশে। এই নিয়ে ইন্দ্রনাথও হাসাহাসি করেছেন অনেক সময়। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে এতটা ইনভলমেণ্ট ভাল নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন, তুমি যখন রাজার ভূমিকায় অভিনয় করবে, তখন তুমি নিজেকে একজন রাজা ভাববে না, কারণ আসল রাজারা যে মঞ্চে রাজার ভূমিকায় ভাল অভিনয় করতে পারবে, তার কোনো মানে নেই। তুমি সব সময় মনে রাখবে, তুমি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করছ, অভিনয়টাই বড় কথা।

তপন বুঝল, রুমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ইন্দ্রনাথ মঞ্চের পেছনের অন্ধকারে বাঘের মতন গজরাতে গজরাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মঞ্চে এখন দশ-বারোজন একসঙ্গে, বিদ্রোহীদের নেতা বক্তৃতা দিচ্ছে, প্রচুর চ্যাঁচামেচি, তাই দর্শকরা অন্য আওয়াজ শুনতে পাবে না।

অন্য সব জায়গা, এমন কি বাথরুম পর্যন্ত খুঁজে এসে ইন্দ্রনাথ উঁকি মারলেন গ্রীনরুমে। মেক-আপ ম্যান জামালুদ্দিনের পাশে একটা টুলে বসে আছে হরষিত। তার মুখে নকল দাড়ি, ভুরুতে গভীর কাজল, সে মাথার চুলে এক হাত ডুবিয়ে বসে আছে মাটির দিকে চেয়ে।

ইন্দ্রনাথ তার সামনে এসে বললেন, এই শালা, টেপ বাজাসনি কেন? কী হয়েছিল? প্লেয়ারটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

হরষিত কোনো উত্তর দিল না। কোনো একটা মিথ্যে কৈফিয়ত দেবার ক্ষমতাও তার নেই। একটা গভীর লজ্জার কুয়াশা যেন ঘিরে আছে তাকে।

ইন্দ্রনাথ আবার হুংকার দিয়ে উঠলেন, কী হয়েছিল বল। আজ আবার মাল খেয়েছিস? নেশা করে বসে আছিস?

জামালুদ্দিন বলে উঠল, না না, ইন্দ্রদা, মাল খায়নি!

ইন্দ্রনাথ বললেন, শো-এর দিন কেউ মাল খেলে আমাদের গ্রুপে তার জায়গা নেই, এ কথা কতবার বলেছি?

জামালুদ্দিন জোর দিয়ে বলল, আজ ও মাল খায়নি!

ইন্দ্রনাথ বললেন, মাল খায়নি তবে ও কী করছিল? প্লেয়ারটা সামনে নিয়ে বসে, ওরকম একটা ক্রুশিয়াল মোমেন্টে, এই শুয়োরের বাচ্চা, কথা বলছিস না কেন?

হরষিত তবু মুখ নিচু করে আছে, জামালুদ্দিন এগিয়ে এসে কাচুমাচু ভাবে হেসে বলল, মাল খায়নি হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, নতুন বিয়ে করেছে তো।

যেন হঠাৎ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন, এমন বিস্ময়ের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিল? শো চলার সময় যে ঘুমোয়, সে আমার গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট করতে আসে! আমার সিনটা ওই নষ্ট করে দিল। ওকে আমি নিজে এই দলে এনেছি, কাজ শিখিয়েছি।

ইন্দ্রনাথ খপ্ করে হরষিতের চুলের মুঠি চেপে ধরে বললেন, হারামির বাচ্চা, বাঞ্চোৎ

তাতেও না থেমে ইন্দ্রনাথ প্রথমে হরষিতের গালে একটা প্রবল চড় কষালেন, তারপর কঁ্যাত করে একটা লাথি মারলেন। টুলসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হরষিত।

জামালুদ্দিন দু হাতে জড়িয়ে ধরল ইন্দ্রনাথকে। ততক্ষণে তপনও এসে গেছে। কিন্তু তারা দুজনেও ইন্দ্রনাথকে সামলাতে পারছে না। ইন্দ্রনাথ দীর্ঘকায় পুরুষ, শরীরে বেশ শক্তি আছে, দুর্দমনীয় রাগে তাঁর জোর অনেক বেড়ে গেছে।

সারা গ্রীনরুম জুড়ে এরকম ধস্তাধস্তি চলছে, এর মধ্যে একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ইন্দ্রদা, আপনি এখানে? এক্ষুনি আপনার এন্ট্রেন্স, কোরাস গানটা শেষ হয়ে গেলেই একটা জ্বলন্ত স্টোভের সুইচ যেন পট করে অফ করে দেওয়া হল। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে চোখ ঘষলেন ইন্দ্রনাথ। তারপর লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ব্যাক স্টেজের দিকে।

তপনও সঙ্গে এসেছে। ইন্দ্রনাথ প্রৌঢ় রাজায় রূপান্তরিত হয়ে ডান দিকের উইংস দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন, তপন তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, ইন্দ্রদা, খালি পা!

প্রোডাকশানের একটি ছেলে নাগরাজোড়া কুড়িয়ে নিয়ে এল। ইন্দ্রনাথের একটা পা প্রায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তবু সেই পেরেকওঠা জুতোয় পা গলিয়ে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করলেন।

এরপর দুটো সিন ঠিকঠাক হয়ে গেল।

পরের সিনটায় ইন্দ্রনাথের কিছু নেই, প্রায় তেরো মিনিট গ্যাপ। ইন্দ্রনাথ আলোর সুইচবোর্ডের পাশে পাশে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন জুতো খুলে ফেলে প্রোডাকশনের ছেলেটাকে ডেকে বললেন, ফার্স্ট এড কিটের মধ্যে ডেটল আছে কি না দ্যাখ তো! আমার পা-টা বোধহয় গেল! ড্রেসাররা কী পোড়ারছাই জুতো দিয়েছে, ওদের পেমেন্ট বন্ধ রাখবে!

তপন কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, ইন্দ্রদা, একটা কেলেংকারি হয়ে গেছে!

ইন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কী হল?

তপন বলল, হরষিত হাওয়া হয়ে গেছে।

একটু আগে হরষিতকে নিয়ে যে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে সেটা যেন ইন্দ্রনাথের মনেই নেই। তিনি অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, হাওয়া হয়ে গেছে মানে? কোথায় গেছে?

তপন বলল, রাগ করে কোথায় যেন চলে গেছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রনাথের মনে পড়ল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, চুলোয় যাক! দূর হয়ে যাক! নিমকহারাম, কুত্তার বাচ্চা! ছিল একটা লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক, আমি তাকে হাতে ধরিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে।

তপন বলল, লাস্ট সিনে হরষিতের পার্ট আছে যে। কী হবে?

ইন্দ্রনাথ বললেন, বাদ দে! বাদ দে!

তপন বলল, ওর ঘাতকের পার্ট। বাদ দেওয়া হবে কী করে? কী বলছেন, ইন্দ্রদা?

ইন্দ্রনাথ তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। তার মুখে বেদনা ও অভিমানের ছায়া সরে সরে যেতে লাগল। মঞ্চে নাটক চলছে, একজন অভিনেতা সেই সময় নিজের পার্ট ছেড়ে যে চলে যেতে পারে, এটা যেন তিনি কল্পনাই করতে পারছেন না। অনেক কষ্ট করে একটা দল গড়তে হয়।

ঘোর ভেঙে তিনি বললেন, ঠিক আছে। তুই মেক-আপ নে। তুই পার্টটা চালিয়ে দে।

তপন বলল, আমি? ওই সিনের প্রথম দিকে আমারও যে অ্যাপিয়ারেন্স আছে!

ইন্দ্রনাথ বললেন, তোর ক্রাউড সিন, দুটো ডায়ালগ। সেটা বাদ দিলে ক্ষতি নেই। হরষিতকে ওই রোল থেকে আমি সরাবই ভাবছিলাম। হারামজাদাটা ভাল করে কাঁদতেও জানে না।

তপন তবু একটু ইতস্তত করে বলল, আমাকে বয়েসে ঠিক মানাবে না। উইগ পরব?

ইন্দ্রনাথ বললেন, কিছু দরকার নেই। চুলে একটু কালো ব্রাশ চালিয়ে নে। যা, যা, জামালকে বল জলদি দাড়ি সেঁটে দেবে।

তপন হাসল। সে এই গ্রুপের ঝালে-ঝোলে সব কিছুতেই আছে। নামে সে সহকারি পরিচালক এবং স্টেজ ম্যানেজার। প্রত্যেক নাটকে সে তিন-চারটে ছোটখাটো পার্টও করে। লোকবল কম, এক একজনকেই দু-তিন রকম কাজ সামলাতে হয়। প্রত্যেক রিহার্সালে উপস্থিত থাকে বলে নাটকের সংলাপই তপনের মুখস্থ।

তপন বেশ বেঁটে, সেই জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ, বড় ভূমিকা তাকে ঠিক দেওয়া যায় না। তাতে তপনের কোনো আফশোস নেই, সে মঞ্চের অন্তরালের কাজকর্মেই বেশ খুশি।

ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক এবং সাউণ্ড এফেক্ট দেওয়াই হরষিতের কাজ। তা ছাড়া সে শেষ দৃশ্যে ঘাতকের ভূমিকায় মঞ্চে নামে। ঘাতক মানে প্রৌঢ় রাজার বাল্যবন্ধু। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ভগ্নহৃদয় রাজা জঙ্গলের পথে পালাচ্ছেন, বিদ্রোহীরা তাঁকে তাড়া করে আসছে। এই সময় বাল্যবন্ধু মনোজিতও যে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে, রাজা তা জানেন না। মনোজিতের ভূমিকাটা জুলিয়াস সিজারের বন্ধু ব্রুটাসের মতন।

মনোজিতকে দেখে রাজা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, বন্ধু আমাকে আশ্রয় দাও। আমি সিংহাসন চাই না, রাজত্ব চাই না, শুধু আর কিছুদিন বাঁচতে চাই। এই রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না; আমাকে সাধারণ মানুষের মতন কিছুদিন বেঁচে থাকতে দাও।

মনোজিত বললে, রাজাকে বাঁচিয়ে রেখে রাজতন্ত্র খতম করা যায় না।

তারপর সে রাজার বুকে আমূল বিদ্ধ করবে ছুরি। ঘুরে পড়ে যাবে রাজা। একটুক্ষণ তার শরীরটা ছটফট করবে, তখন হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে মনোজিত। রাজা নয়, নিজের বাল্যবন্ধুর মৃত্যু দেখে কান্না।

এরপরে বিদ্রোহীদের নেতা এসে মনোজিতকে অভিনন্দন জানাবে, তখনও মনোজিত কান্না থামাতে পারবে না। কান্নাটাই তার আসল অভিনয়।

তপন মনোজিতের মেক-আপ নিয়ে এসে বলল, নাঃ হরষিতটা চলেই গেছে। জামাল বলল, ও বোধ হয় স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে।

ইন্দ্রনাথ তপনের মেক-আপটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন, ঠিক আছে, চলে যাবে। আমি বাঁ দিকে ঘুরে দাঁড়াব, তুই ছুরিটা আমার বগলের নিচ দিয়ে চালিয়ে দিবি। আমি মাটিতে পড়ে যাবার পর দশ গুণে তারপর কান্না শুরু করবি, ওইটুকু টাইম না দিলে এফেক্ট হবে না।

মঞ্চে তখন বিদ্রোহীদের উল্লাস ও হাসি-ঠাট্টা চলছে, উইংসের পাশ দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন ইন্দ্রনাথ। বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে সুকুমার খুব ফাটাচ্ছে। এর পরের সিনটাই রুমার। রুমা আজ দু বার ক্ল্যাপ পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত নাটকটা উৎরে গেল ভাল ভাবে। দর্শকদের অনুরোধে, পর্দা ফেলে দেবার পরেও আবার পর্দা তুলে, সবাই একসঙ্গে মঞ্চে এসে দাঁড়ালো, তারপর রুমা আর সুকুমারকে দু পাশে নিয়ে ইন্দ্রনাথকে এগিয়ে যেতে হল ফুটলাইটের সামনে।

ইন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু আজকের পারফরমেন্সে খুশি নন। কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। গোমড়া মুখে তিনি গ্রীনরুমে গিয়ে মেক আপ তুলতে লাগলেন। সেই অবস্থাতেই নির্দেশ দিতে লাগলেন কয়েকজনকে, এই, ড্রেসগুলো সব ঝটপট প্যাক করে ফ্যাল.....বাস রেডি আছে তো? খাবারের ব্যবস্থা কী হল? ঠিক দেড়টার সময় স্টার্ট দেব, এক মিনিট দেরি না হয়...

মফস্বলে নাটক শুরু করতে হয় দেরিতে। শো-এর পর খাওয়া দাওয়া। সব কিছু গোছ-গাছ করে নিয়ে বাস ভর্তি করে বেরিয়ে পড়তে হবে মাঝরাতে। সকালবেলা ফিরেই অফিস। গ্রুপ থিয়েটারের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই জীবিকার জন্য কিছু একটা চাকরি-বাকরি করতে বাধ্য হয়। বাইরে কল শো-তে এলে ধকল যায় অনেক। কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম কল শো না নিলে প্রোডাকসানের খরচ তোলা যায় না।

প্রত্যেকটা শো শুরু হবার আগে থাকে টেনশান, শেষ হয়ে যাবার পর এসে যায় সার্থকতার অবসাদ। সুকুমার আর দু-তিনজন এই সময়টায় কোথাও অন্ধকার ঘুপচি খুঁজে একটু আধটু রাম-হুইস্কি পান করে। ইন্দ্রনাথ নিজে এক ফোঁটাও মদ খান না, তাঁর গ্রুপে মদ খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু এই সময়টায় সুকুমাররা লুকিয়ে চুরিয়ে যে খায়, তা ইন্দ্রনাথ ঠিক টের পেয়ে গেলেও না-দেখার, না-জানার ভান করেন। এর পর বেচারারা সারারাত চলন্ত বাসে ঘুমোতে ঘুমোতে যাবে।

রুমার আগেই মেক-আপ তোলা হয়ে গেছে সে এখন পরে নিয়েছে শালোয়ার আর ঢোলা কামিজ। সুকুমারদের কাছে এসে সেও দু-ঢোঁক রাম খেল, একজনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে দিল কয়েকটা টান। গ্রুপের সকলের সঙ্গেই রুমার ভাব। অনেকেরই গায়ে গা ঠেকিয়ে সে বসে, কয়েকজনের গলা জড়িয়ে ধরে সে কথা বলে। এর পেছনে একটা গূঢ় কারণও আছে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তা সে অন্যদের জানাতে চায় না। এই গ্রুপটাকেই সে আর সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসে। কিছুদিন আগে রুমা তার কলেজে পড়াবার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। সেই জন্য সে গ্রুপের জন্য বেশি সময় দিতে পারে। রুমা বিয়ের কথাও চিন্তা করে না। তার ধারণা, সার্থক অভিনেত্রী হতে হলে সংসার-টংসারের ঝামেলা নেওয়া চলে না।

শো-এর সময় থমথমে মুখ করে থাকে রুমা, শেষ হয়ে যাবার পর এই সময়টায় সে ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর হাসাহাসিতে মেতে উঠে হাল্কা হতে চায়। প্রত্যেক শো-তেই কিছু না কিছু মজার ব্যাপার ঘটেই।

কিন্তু আজ সবাই ফিসফিস করে হরষিতের কথা আলোচনা করছে। ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভও ফুটে উঠছে অনেকের কথায়। নিরীহ, ভালমানুষ গোছের হরষিতকে অনেকেই পছন্দ করত। টিমের একজন কেউ অভিমান করে চলে গেলে সকলেরই খারাপ লাগে। হরষিত কিছু খায়নি, সে কখন নিঃশব্দে সরে পড়ল, শুধু জামাল নাকি তাকে জোর করে আটকাবার চেষ্টা করেও পারেনি।

রুমা আর এক চুমুক রাম খেয়ে চলে এল গ্রীনরুমে।

ইন্দ্রনাথের সামনের ডেক্সটার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, ইন্দ্রনাথের হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে সে ঝাঁঝালো গলায় বলল, তুমি আজ হরষিতকে মেরেছ?

ইন্দ্রনাথ দপ করে জ্বলে উঠে বললেন, সে হারামজাদার নামও কেউ আর উচ্চারণ করবে না আমার সামনে। সে বিদায় হয়েছে, আমি বেঁচেছি! অপদার্থ একটা!

রুমা পা দোলাতে দোলাতে খুব শান্ত গলায় বলল, এত চেঁচিয়ে কথা না বললেও চলবে। এখানে এক হাজার অডিয়েন্স নেই। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তুমি হরষিতকে মেরেছ? ইয়েস অর নো?

ইন্দ্রনাথ গলা নামালেও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন না মারিনি। মারা বলতে কী বোঝায়? গুণ্ডামি! আমি হরষিতকে মোটেই মারিনি, আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। এই গ্রুপের ফাউণ্ডার-প্রেসিডেন্ট হিসেবে কারুর কাজের গাফিলতি দেখলে তাকে শাস্তি দেবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে। সে কী করেছে তুমি জান?

রুমা বলল, বিচার না করেই শাস্তি। তাকে তুমি কিছু বলার সুযোগ দিয়েছ?

ইন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ, আমি তাকে অন্তত দু বার জিজ্ঞেস করেছি, সে ম্যাদামারার মতন ঠোঁট বুজে ছিল। উত্তর দেবার মতন তার কিছু ছিল না, বুঝলে! সে শুয়োরের বাচ্চা কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল! ক্যান ইউ বীট ইট? বাঞ্চোৎকে আমি মেরেছি মানে কী, তখন যে ওকে খুন করে ফেলিনি....

রুমা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল, বাঃ বাঃ, কী চমৎকার ভাষা! বিচারকের ভাষা! তুমি বিচারক না জল্লাদ?

ইন্দ্রনাথ রুমার দিকে কয়েক মুহূর্ত কটমট করে তাকিয়ে থেকে বললেন, এখান থেকে ফোট তো! এখন আমার বাজে বকবক করতে ইচ্ছে করছে না। খাবারটা কখন দেবে? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

রুমা বলল, আমি এখন বকবক করার মুডে আছি। তুমি তোমার ওই অনার্য ভাষা যত ইচ্ছে আমার ওপর চালাতে পার।

ইন্দ্রনাথ বললেন, আমি সবাইকে মোটেই খারাপ গালাগাল দিই না। যারা আমার মেজাজ গরম করে দেয়....তুমি সুজন, জামাল, মধুদের জিজ্ঞেস কর, ওদের আমি কখনো খারাপ ভাষায় ধমকেছি? যারা ঘড়ির কাঁটা ধরে, মন দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক করে....

রুমা বলল, কেউ যদি একটু দোষ করেও ফেলে, তা হলেই তুমি তাকে ওই সব বিশ্রী কথা বলবে? তোমার নিজেরও তো একটা সম্মান আছে। একজন নাট্য পরিচালকের নিজস্ব ডিগনিটি থাকবে না?

ইন্দ্রনাথ এক টান দিয়ে রাজার পরচুলাটা খুলে ফেলে দূরে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন, আমি শুধু পরিচালক না, আমি একজন একটর। আমাকে সব রকম ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। শেক্সপীরিয়ান নাটকে রাজার ডায়ালগ থেকে খুনে-গুণ্ডা বদমাশের মুখখিস্তি পর্যন্ত সবই আমার মুখে আসে গড়গড়িয়ে। একজন অভিনেতার কাছে আবার খারাপ ভাষা, ভাল ভাষা কী? একজন সাধুর ডায়ালগ আর একটা খুনে-গুণ্ডার ডায়ালগ একজন অভিনেতার কাছে সমান ইম্পর্টেন্ট, ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। ইন্দ্রনাথ উত্তেজিত হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছে রুমা। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে সে খুব মিষ্টি করে বলল, তুমি স্টেজে খুনে-গুণ্ডার রোলে যত্খুশি মুখখিস্তি করতে পার, কিন্তু তা বলে সব সময়, স্টেজের বাইরেও তুমি যে অন্যদের যা তা বলো, সেগুলোও কি নাটকের ডায়ালগ? এটা তোমার কী ধরনের আরগুমেন্ট, ইন্দ্র?

একটুখানি তোতলাতে শুরু করলেন ইন্দ্রনাথ। ঘামে চকচক করছে কপাল। এ ঘরের পাখাটা ঘুরছে আস্তে আস্তে, তাতে আবার ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে মটমট করে রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। তাতেও কোনো কাজ হল না। আরও বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, জীবনটাই নাটক, এ কথাটা খুব ক্লিশে আর মানডেন শোনাবে, তবু এটাই সত্যি, অন্তত আমার জীবনে। নাটকের জন্য, গ্রুপ থিয়েটারের জন্য আমি যত রক্ত জল করেছি, সে রকম তোমরা কেউ করনি? আমি যাত্রায় যাইনি, বম্বে ফিলিমেও যাইনি, কতবার ডেকেছে তোমরা জানো না! আমার কাছে এই গ্রুপের স্বার্থটাই সবচেয়ে বড়, সেই জন্যই কারুর গ্রস নেগলিজেন্স দেখলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়।

দরজার কাছে তপন, রবি, তনিমা, জয়শ্রী ফিরোজদের একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। ইন্দ্রনাথের মুখের ওপর কথা বলতে এরা কেউ সাহস পায় না, এদের চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এদের সমর্থন রুমার দিকে।

রুমা একবার ওই দলটিকে দেখে নিল, তারপর বলল, তুমি যখন তখন লঘু পাপে গুরু দণ্ড দাও, ইন্দ্র। হরষিত বেচারা নতুন বিয়ে করেছে, কাল রাত্তিরে ও বোধ হয় ঘুমোতে পারেনি, আজ দুপুর থেকে সেই সাজানো থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের লাইন টানা, কত রকম খাটাখাটুনি করেছে, তারপরে যদি হঠাৎ একটু ঘুম পেয়ে যায়...

ইন্দ্রনাথ বোমা ফাটার মতন শব্দ করে বলে উঠলেন, নতুন বিয়ে করেছে বলে শো-এর সময় ঘুমোবে? এটা লঘু অপরাধ? মাগছেলেপুলে নিয়ে যারা সংসার করতে চায়, তারা করুক-না। তাদের কে গ্রুপে আসতে বলেছে? ওই হরষিতকে কী রকম হাতে ধরে ধরে আমি কাজ শিখিয়েছি তা জান? একটা গেঁয়ো ভূত ছিল, ভাল করে কথাই বলতে পারত না। নিজে যেচে সাউন্ড এফেক্টের দায়িত্ব নিয়েছিল, বউয়ের সঙ্গে যদি রাত জাগতে চায় তো ওই দায়িত্ব আজ অন্য কারুকে দিলেই পারত। ওর আবার অভিনয় করার শখ! লাস্ট সিনে ওই ঘাতকের পার্টটা, রিহার্সালে কী রকম ধ্যাড়াতো মনে নেই! আমি নিজে ওর বাড়িতে গিয়ে আলাদা করে রিহার্সাল দিইয়েছি, অন্তত পঞ্চাশ বার, সেই পার্ট না করে সে আজ চলে গেল? কত বড় নিমকহারাম সে! পণ্ডশ্রম করেছি ওকে নিয়ে। ওঃ!

দরজার কাছের ভিড়টা থেকে তনিমা বলল, ইন্দ্রদা, আমি একটা কথা বলব?

রুদ্র মূর্তিতে সে দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন, ইয়েস? প্রত্যেকেরই কথা বলার রাইট আছে। কী বলতে চাও বল।

তনিমা বলল, আমার তো ফার্স্ট সিনের পরই ছুটি। তাই আমি মেক-আপ তুলে দর্শকদের মধ্যে গিয়ে বসেছিলুম। অডিয়েন্স বি-অ্যাক-শান দেখছিলুম। আপনার ওই জায়গাটাই কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। মানে, নাটকটা যারা আগে দেখেনি, তারা তো জানেই না যে ওইখানটা চ্যাঁচামেচি আর গুলিগোলার আওয়াজ হবার কথা ছিল। সেই জন্য কেউ কিছু ধরতেই পারেনি।

ইন্দ্রনাথ সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে তারপর রুমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে বললেন, কেউ কিছু বুঝতে পারে নি?

রুমা জোর দিয়ে বলল, কেউ বোঝেনি। একটুও গোলমাল হয়নি, কেউ হাসেনি। তুমি ভাল ম্যানেজ করে দিয়েছ।

ইন্দ্রনাথ আবার বললেন, কেউ বোঝে নি। তোমরা দর্শকদের খুব বোবা ভাব, তাই না? দর্শকদের যারা বোকা মনে করে, তারা কোনোদিন নাটকের অভিনয়টাকে সত্যিকারের আর্টের স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। কলকাতায় স্টেজ কিংবা যে-কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে কল শো-তে গেলেও মনে রাখবে, দর্শকদের মধ্যে অনেকগুলো লোক থাকে ঠিকই, তাদের তুমি যা দেবে তাই-ই হাঁ করে গিলবে, কিন্তু, সব সময় মনে রাখতে হয় যে দর্শকদের মধ্যে অন্তত একজন আছে, যে সব কিছু বোঝে, সে আমাদের প্রতিটি মুভমেণ্ট খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, তাকে খুশি করতে না পারলে অভিনয় করার কোনো মানেই হয় না।

রুমা বলল, সেরকম কেউও পরে আপত্তি জানায় না।

চোখ কুঁচকে, দু-হাত ঝাঁকিয়ে ইন্দ্রনাথ দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আঃ! সেই আলটিমেট দর্শক মুখে কখনো আপত্তি জানায় না। সেটা ফিল করতে হয়। আমি ফিল করেছি। হরষিত সাউণ্ড এফেক্ট দিল না, অমনি আমার সুর কেটে গেল, তারপর অভিনয় চালিয়ে যেতে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল...আমার পায়ে....আমার পায়ে যদি একটা জুতোর পেরেক ফুটত, আমাকে, আমাকে যদি একটা কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিত, তা সত্ত্বেও আমি ঠিক অভিনয় চালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু বেসুরো মন নিয়ে অভিনয় করা, ওঃ, তার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই!

রুমা বলল, তবু যাই বল, তুমি গ্রুপের একজনকে লাথি মারবে?

টেবিলে এক ঘুষি মেরে ইন্দ্রনাথ বললেন, বেশ করেছি!

জামাল দু-হাত তুলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন এসব কথা থাক। কলকাতায় ফিরে এ সব আলোচনার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

রুমার দিকেও সে চোখের ইঙ্গিতে অনুরোধ জানাল। এখন তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই, ইন্দ্রনাথের রাগ ক্রমশই চড়বে।

রুমা তবু নিবৃত্ত হল না। মুখের হাসি এই প্রথম মুছে ফেলে সে বলল, তুমি এটা খুব ভুল করছ, ইন্দ্র। তুমি এই গ্রুপের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছ, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, তা আমরা মানি সবাই, কিন্তু তা বলে যখন তখন তুমি মাথা গরম করে এক একজনকে কুচ্ছিত গালাগাল দেবে, কিংবা চড়-লাথি মারবে, এটা কিছুতেই টলারেট করা যায় না। এই করে দল ভাঙে। আজ হরষিত চলে গেছে, কাল অন্য কেউ চলে যাবে। গ্রুপ থিয়েটারগুলো অনবরতই ভাঙছে, এক থেকে দুই হচ্ছে, দুই থেকে চার দল হচ্ছে, এইভাবে গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্টটাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে না? তুমি চাও, তোমার দলটাও ভেঙে যাক?

প্রবল অহঙ্কার ও অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, ভাঙে তো ভাঙুক! আই ডোন্ট কেয়ার। কেউ যদি ইনসিনসিয়ার হয়, কাজে মন না থাকে, তাকে আমি টলারেট করতে পারব না। আমি যাদের হাতে ধরে কাজ শেখাই, দরকার হলে তাদের আমি শাস্তিও দেব!

অন্য সকলের দিকে মুখ তুলে তিনি বললেন, যার ডেডিকেশান নেই, গ্রুপকে যে ভালবাসে না, কিংবা আমার ব্যবহার যার পছন্দ না হয় সে ইচ্ছে করলেই গ্রুপ ছেড়ে চলে যেতে পারে। নো ওয়ান ইজ ইনডিস্‌পেনসেব্‌ল। আমি ভাঙা দল নিয়েই চালাব।

একটু থেমে, মুখ নিচু করে তিনি আবার বললেন, অবশ্য তোমরা সবাই মিলে জোট বেঁধে আমাকেও গ্রুপ থেকে তাড়িয়ে দিতে পার, আমিও ইনডিস্পেনসেবল নই।

দরজার কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, খাবার এসে গেছে! খাবার এসে গেছে!

তপন হাঁক দিল, রুমা, তুমি আগে খাবারটা নিয়ে নাও।

ইন্দ্রনাথ তখনও খেতে না গিয়ে মঞ্চে চলে এলেন। সেটা সব ঠিকমতন খোলা হয়েছে কি না তার তদারকি করা দরকার। তাঁর মাথার দু-পাশের শিরা দপদপ করছে। জুতোর পেরেক ফোটা-পা-টা টনটন করছে খুব, সেপটিক হল কি না কে জানে!

প্রত্যেক কল শো-তে নিজেদের সেট নিয়ে যেতে হয়। সেট নষ্ট হয়ে গেলেই আবার খরচের ধাক্কা। সেটগুলো বানানই হয় এমনভাবে যাতে চটপট খুলে ফেলা যায়, বা ভাঁজ করা যায়। সব ঠিকঠাক ভরে নিতে হবে বাসে।

শো-এর পর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও ইন্দ্রনাথ একটা নিয়ম করে দিয়েছেন। মফস্বলের কল শো-এর উদ্যোক্তারা খাওয়া নিয়ে অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে। মাঝরাত্রিরে এক গাদা খাবার আনে, দলের ছেলেরাও ক্ষুধার্ত থাকে খুব, লোভের চোটে বেশি বেশি খেয়ে নেয়। পরে অনেকেরই শরীর খারাপ হয়। গ্রুপের অভিনেতা-অভিনেত্রী, এমন কি টেকনিশিয়ানদেরও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে হয় পরিচালককে। তাই ইন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছেন, মফস্বলে এসে শো-এর পর মাঝরাত্তিরে বিরিয়ানি-পোলাও কিংবা কব্জী ডুবিয়ে মাংস ভাত আর গাদা গুচ্ছের সন্দেশ-রসগোল্লা গেলা চলবে না। লাইট ফুড খাওয়া উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় প্যাকেট-ডিনার দিলে। কিন্তু উদ্যোক্তারা এ নির্দেশ মানতে চায় না। মফস্বলের লোকদের ধারণা, পাত পেড়ে না খাওয়ালে অতিথিপরায়নতাই দেখানো হয় না।

তপন এসে বলল ইন্দ্রদা, সবাই খাবার নিয়ে বসে আছে, আপনি না গেলে খেতে পারছে না।

সবাইকে এক ঘরে বসানো যায়নি। স্কুলের আলাদা আলাদা ঘরে এক-একটা দল বসেছে। একটা ঘরে রীতিমতন হাপুস হুপুস শব্দ শোনা যাচ্ছে। রুমা, তনিমা, রুবি, ফিরোজরা অন্য এক ঘরে বেঞ্চের ওপর খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে ইন্দ্রনাথের জন্য।

উদ্যোক্তাদের যিনি প্রধান, তিনি এখানকার একটি হোটেলের মালিক। এক গাল হেসে বললেন, স্যার, আজ থিয়েটার একেবারে ফাটিয়েছেন। অডিয়েন্স খুব প্লিজড। সবাই ধরেছে, আপনাদের আবার আসতে হবে। এই শীতকালে আসবেন তো?

ইন্দ্রনাথ বেঞ্চিতে বসে প্রথমে জলের গেলাসটা খালি করলেন। তারপর খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না তোমরা খাও।

হোটেলের মালিক বললেন, সে কি স্যার, আপনাদের জন্য স্পেশাল খাবার, একটু মুখে দিয়ে দেখুন।

রুমা বলল, এই যে খানিক আগে তুমি বলছিলে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বললেন, তখন পেয়েছিল, এখন খিদে মরে গেছে।

রুমা বলল, একটু কিছুই খাবে না?

ইন্দ্রনাথ বললেন, না।

রুমা বলল, তা হলে আমিও কিছু খাব না।

তপন আর ফিরোজ বলল, ইন্দ্রদা, তাহলে আমরাও কেউ কিছু খাব না কিন্তু।

এই কথায় গলে যাবার পাত্র ইন্দ্রনাথ নন। তিনি উদাসীন ভাবে বললেন, ইচ্ছে না হলে খেয় না।

তারপর গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তপন, বাসটা নাকি গোলমাল করছে? ড্রাইভার কী বলল?

তপন জানাল, গিয়ার ঠিকমতন লাগছে না। একজন মেকানিককে ডাকা হয়েছে, আমাদের স্টার্ট করতে খানিকটা দেরি হবে।

ইন্দ্রনাথ বললেন, কত দেরি হবে? কাল সকাল সাড়ে ন টায় কলকাতায় আমার জরুরি কাজ আছে, পৌঁছতেই হবে, মহা ঝামেলা করল দেখছি!

গোঁয়ারের মতন, অন্যদের শত অনুরোধে কর্ণপাত না করে ইন্দ্রনাথ খাবারের জায়গা ছেড়ে গেলেন বাসের অবস্থা দেখে আসতে।

ফিরে এসে বললেন, এ যা দেখেছি রাত তিন-চারটের আগে কিছুতেই বাসটা রেডি হবে না। আমার দরকারি কাজ আছে, আরও অনেকের তো কাল অফিস আছে। যার যার অফিস না গেলে চলবেই না, তাদের ট্রেনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আড়াইটের সময় ট্রেন আছে না একটা?

রুমা এখনো খাবারে হাত না দিয়ে বসে আছে।

রুমা বলল, এস, একটুখানি খেয়ে নাও আগে। বিকেল থেকে কিছু খাওনি!

ইন্দ্রনাথ ধমক দিয়ে বললেন, খাব না তো বলে দিয়েছি। তপন, তুই জামাল-রবিদের বল ওদের বাসেই ফিরতে হবে, যত দেরিই হোক। মালপত্রের চার্জ ওদের ওপর। যারা ট্রেনে যেতে চায়, আমার সঙ্গে আসুক, আমি এখুনি স্টেশানে চলে যাব!

শেষ পর্যন্ত এগারোজন ট্রেনে ফিরবে ঠিক হল। বেশি দূর নয়, স্টেশান এখান থেকে হাঁটা পথ। জামাল-রবিদের সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ রওনা হলেন স্টেশানের দিকে। রুমা-তপনরাও শেষ পর্যন্ত কিছু খায়নি, হোটেলের মালিক ওদের খাবারগুলো প্যাকেট করে দিয়েছে।

সন্ধের পর আর কোনো ট্রেন নেই, একটা দূরপাল্লার ট্রেন থামবে রাত আড়াইটের সময়। স্টেশান একেবারে নিঝুম। কয়েকটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে, ভেণ্ডার কুলিরা ঘুমোচ্ছে এখানে সেখানে। আড়াইটে বাজতে অনেক দেরি আছে।

রুমা-তপনরা অনেক ফাঁকা বেঞ্চে বসার জায়গা পেয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে লাগলেন সারা প্লাটফর্ম। কেউ তাঁকে বসতে বলতে সাহস করছে না, জানে যে কিছু বললেই ধাতানি খেতে হবে। ইন্দ্রনাথের মেজাজ এখনো আগুন হয়ে আছে। তাঁর হাতে একটা টর্চ। সেটা আপন মনে একবার জ্বালাচ্ছেন, একবার নেবাচ্ছেন।

আসার পথে রুমা শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি একটু খোঁড়াচ্ছ মনে হচ্ছে? পায়ে কী হয়েছে?

ইন্দ্রনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, কিচ্ছু হয় নি। হবে আবার কী! পরের শো-তে রাজার ভূমিকায় আমি খোঁড়াব ঠিক করেছি, তাতে আর একটা এফেক্ট আসবে। সেই খোঁড়ানোটা প্র্যাকটিস করছি।

ইন্দ্রনাথকে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে দেখে রুমা-তপনরা বলাবলি করছে, পরের শো-এর জন্য ইন্দ্রদা সত্যিই এখন খোঁড়ানো প্র্যাকটিস করছে? এটা এক ধরনের পাগলামি না নিষ্ঠা?

প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা গাছের নিচে অন্ধকার বেঞ্চে বসে আছে একজন মানুষ। সে হরষিত। ইন্দ্রনাথ এক সময় ক্লান্ত হয়ে সেই বেঞ্চটায় এসে বসলেন। তিনি হরষিতকে চিনতে পেরেই সেখানে বসলেন, কিংবা না জেনে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তিনি অবশ্য একটাও কথা বললেন না হরষিতের সঙ্গে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে তপন সেখানে এসে দাঁড়ালো।

শো-এর সময় খুব জরুরি মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল হরষিত, কিন্তু এখন তার চোখ খোলা। সেও টেনে যাচ্ছে একটার পর একটা সিগারেট।

তপন বলল এই হরষিত, তুই তো কিছু খেয়ে আসিস নি? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

হরষিত কোনো উত্তর দিল না।

তপন বলল, খাসনি বলে ইন্দ্রদাও একটুও মুখে দেয় নি। আমরাও খাইনি। প্যাকেট এনেছি, একটু খেয়ে নে।

তপন একটা প্যাকেট রাখলো হরষিতের কোলে। হরষিত সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল লাইনের ওপর।

তপন বলল, এখনো তোর রাগ যায়নি। তোর জন্য আজ ইন্দ্রদাকে কত বকুনি দিয়েছি, তা জানিস? ইন্দ্রদা আমাদের যদি মাথা গরম করে কিছু বলেই ফেলে তাহলে...

ইন্দ্রনাথ দাপটের সঙ্গে ধমকে উঠলেন, শাট আপ। কেন বকবক করে আমাকে এখানে ডিসটার্ব করতে এসেছিস। যা ভাগ।

তপন এক-পা এক-পা করে পিছু হটে গেল। সে বুঝেছে, এখনো এই আগ্নেয়গিরিতে জল ঢালা যাবে না।

এরপর আবার সবাই চুপচাপ।

রেল স্টেশন বলতেই একটা ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ির ছবি ফুটে ওঠে, তাই সেখানকার নির্জনতা, নীরবতাকেও বেশি বেশি মনে হয়। একটা শুকনো পাতা খরখর করে উড়ে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে সেই শব্দটাও। দূরে জ্বলছে সিগনালের লাল আলো।

বসে থাকতে থাকতে রুমা-তপনদের ঢুলুনি এসে গেল। একটা পুরো খালি বেঞ্চ পেয়ে শুয়ে পড়েছে সুকুমার। বাতাস এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে।

হরষিতের চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নেই। ইন্দ্রনাথের জেগে থাকা বোঝা যায় তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেট দেখে। পরস্পরের দিকে একবারও তাকায়নি ওরা। হরষিত প্রতিমুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে আছে, ইন্দ্রনাথ তাকে কিছু বলবেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথ সে ধাতুতে গড়াই নন। তাঁর মুখখানি কঠোর হয়ে আছে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই।

ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি, তার শরীর থেকে নির্গত তরঙ্গ যেন একসময় আর সহ্য করতে পারল না হরষিত। সে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল দু-পা। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না চাপবার জন্য সে মুখ ঢাকল দু হাতে।

ইন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে সেদিকে তাকালেন। তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল কঠোর রেখা। যেন বেশ অবাক হয়েছেন।

তারপর আজ সারা সন্ধের পর এই প্রথম মৃদু হেসে বললেন, এই তো, এইবার ঠিক হয়েছে। লাস্ট সিনে ঘাতকের কান্না ঠিক এই রকম হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হরষিতের ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, স্টেজে এই কান্নাটা বেরোয় না কেন, স্টুপিড? আর একবার দেখা। আমি মাটিতে পড়ে যাচ্ছি। মুখটা ঢাকবি না, তাতে চোখের এক্সপ্রেশান দেখা যায় না।

ইন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি নিহত হবার ভঙ্গিতে দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

হরষিত কান্না থামাতে পারেনি এখনো, যদিও বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে।

ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বেঞ্চ থেকে টর্চটা নিয়ে এসে হরষিতের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, মনে কর, এটা তোর ছোরা। এটা দিয়ে আমার বুকে মার। আমি মাটিতে পড়ে যাবার পর ঠিক দশ গুনবি, তারপর কান্না শুরু করবি।

হরষিতের হাতটা ধরে উঁচু করে ইন্দ্রনাথ বললেন, ছোরা চালিয়ে দে।

যন্ত্রচালিতের মতন হরষিত টর্চ দিয়ে ইন্দ্রনাথের বুকে একটা খোঁচা মারল। ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন মাটিতে।

ফের উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কান্নাটা প্রথমে আস্তে হবে, তারপর জোরে। তুই দশ পর্যন্ত গুনিস নি, আগেই কাঁদতে শুরু করলি কেন? নে, আবার টর্চটা ধর ঠিক করে।

অন্যরা সবাই জেগে উঠেছে। রুমা কাছে এসে বলল, এরপর আমার যে ডায়ালগ আছে সেটাও বলব?

তপন বলল, ইন্দ্রদা, ক্রাউড সিনে আমার ডায়ালগটা বাদ গেছে, সেখান থেকেই শুরু হোক তা হলে।

সুকুমার, জয়শ্রী, তনিমারা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে খলখল করে হেসে, হাততালি দিতে দিতে বলল, হয়ে যাক, পুরো লাস্ট সিনের রিহার্সালটা এখানে একবার হয়ে যাক।

ছাদ

বাড়ি। একটা নিজের বাড়ি!

সুমিতের ঠাকুরদার একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল বটে, কিন্তু তার বাবার কোনো বাড়ি ছিল না। বাবার আমল থেকেই ওরা শিকড়হীন, স্রোতের শ্যাওলার মতন কলকাতার নানান পাড়ায় ভাড়াটে হিসেবে কাটিয়েছে। ঠাকুরদার বাড়িটা অবশ্য বিক্রি করা হয়নি, সেটা হারিয়ে গেছে র‍্যাডক্লিফির ছুরিতে।

কোনো ভাড়া বাড়িই মায়ের পছন্দ হত না। প্রথম দিকে তো থাকতে হয়েছিল উত্তর কলকাতার তেলীপাড়া লেনে, একতলায় মাত্র দেড়খানা ঘর। দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে অন্ধকার। সে বাড়িটা ছিল পাখির বাসার মতন। মাত্র দোতলা বাড়ি, তাতেই পাঁচটা ভাড়াটের সংসার, সব সময় মানুষের কলকোলাহল। সুমিত খুব ছোট ছিল, তার মনে আছে, জল নিয়ে প্রত্যেকদিন ঝগড়া হত, মেয়েরা গামছা পরে দাঁড়িয়ে থাকত বাথরুমের বাইরে। বাথরুম না, ওরা বলত কলঘর। চৌবাচ্চার ভেতরটায় ময়লা জমে জমে এমনই অবস্থা যে জলের রং-ও কালো মনে হত।

মা প্রায়ই বলতেন, ভাড়া বাড়িতে থাকলে মন ছোট হয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরাও যদি জল নিয়ে ঝগড়া করতে শেখে, তবে তারা এক সময় ভুলেই যাবে যে তারা একটা ভদ্র বংশে জন্মেছিল।

বাবাকে এ জন্য প্রায়ই গঞ্জনা শুনতে হত। মা চাইতেন, খাওয়ার কষ্ট হয় হোক, জামা-কাপড় ছেঁড়া পরলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা বাড়িতে থাকতে হবে। কিন্তু তখন কোনোরকম শৌখিনতার কোনো প্রশ্নই ছিল না। বাবার তবু একটা চাকরি ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই সপরিবারে ওপার থেকে চলে এসেছিলেন, কোনো উপার্জনই ছিল না তাঁর। সেই সংসারের খরচও বাবাকে টানতে হত। সুমিতের জ্যাঠাইমা আর তার মা, এই দুই জায়ের মধ্যে ভাব ছিল না কখনো। দেশের বাড়িতে জ্যাঠাইমা-ই ছিলেন কর্ত্রী, মাকে খুব দাবিয়ে রাখতেন। সেই জ্যাঠাইমা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এসে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন, ছোট জায়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মা এটা সহ্য করতে পারতেন না। আগেকার দুর্ব্যবহারের শোধ তুলতেন যখন তখন। শেষ পর্যন্ত জ্যাঠামশাইরা উঠে গিয়েছিলেন গোয়াবাগানের এক বস্তিতে। বাবা অবশ্য নিজের দাদাকে ফেলতে পারেননি। প্রত্যেক মাসে তাঁর মাইনের অর্ধেক তুলে দিয়ে আসতেন জ্যাঠামশাইয়ের হাতে।

সেইসব দিনের কথা সুমিতের ইদানীং বেশি করে মনে পড়ছে।

বছর দশ-পনেরো বাদে অবস্থা কিছুটা ফিরেছিল। সুমিতের দিদি অর্চনা গ্র্যাজুয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মাইনে ভাল, বাবা এতদিন ধরে সরকারি কেরানির চাকরি করছেন, আর নতুন চাকরিতে ঢুকেই দিদির মাইনে প্রায় তাঁর সমান। বিয়ের আগে টানা পাঁচ বছর দিদি তার মাইনের টাকা দিয়ে এই সংসারের সাহায্য করে গেছে।

সেই সময়টায় ভবানীপুরের একটা তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটে উঠে আসা হয়েছিল। বেশ ভাল বাড়ি, জলের কোনো অসুবিধে নেই, তবু মায়ের পছন্দ হয়নি। বাড়িওয়ালারাও থাকত ওই বাড়ির তিনতলায়। ভাড়াটেদের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের ব্যবহারের মধ্যে কখনো সূক্ষ্মভাবে জমিদার-প্রজার সম্পর্কের মতন একটা ভাব ফুটে বেরোয়ই। পরের বাড়িতে থাকাটাই মা মেনে নিতে পারতেন না।

দিদির বিয়ের পর বিপর্যয় এল দু-রকম ভাবে।

অর্চনা অবশ্য বিয়ে করেছে নিজে পছন্দ করে, তার বিয়েতে পণ-টন কিংবা বেশি গয়নাগাটি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। তবু মেয়ের বিয়েতে কয়েক হাজার টাকা তো খরচ হয়ই। অনেক কষ্টে বাবা সেই টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। প্রতি মাসে কিছু ঋণ শোধের ব্যাপার ছিল। সংসার থেকে দিদির উপার্জনটাও বাদ হয়ে গেল, তখন ভবানীপুরের ওই বড়ো ফ্ল্যাটটার ভাড়া টাকাও কষ্টকর মনে হত।

অর্চনা বিয়ের পরেও চাকরি ছাড়েনি এবং সে তার মাইনের খানিকটা অংশ অন্তত বাপের বাড়ির জন্য দিতে চেয়েছিলেন। মা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির কাছে কিছুতেই তিনি ছোট হতে পারবেন না!

এরই মধ্যে মা আবার একটা জেদ ধরলেন।

পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলার কাছ থেকে জানা গেল যে বারুইপুরে খুব সস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছে। সেই মহিলারা সেখানে এক বিঘে জমি কিনেছেন, সেখানে একটা বাড়ি বানিয়ে তাঁরা শিগগির উঠে যাবেন।

মা অমনি ধরে বসলেন, বাবাকেও ওখানে জমি কিনতে হবে!

একেবারে অসম্ভব প্রস্তাব, বাবার হাতে কোনো টাকাই নেই, বরং রয়েছে ধার। এখন জমি কেনা নিছক দিবা স্বপ্নেই সম্ভব।

মা তবু বেঁকে বসে রইলেন, কান্নাকাটি করলেন, শেষ পর্যন্ত বার করে দিলেন তার গয়না। এতদিনের অভাব আর টানাটানির মধ্যেও কী করে ওই গয়না বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তা কে জানে। সেই গয়না বিক্রি করে বারুইপুরের কাছে কেনা হল সাড়ে চার কাঠা জমি। বেশ সস্তাই বলতে হবে, তিন হাজার টাকা করে কাঠা। কলকাতার মধ্যে জমির দাম আগুন, মধ্যবিত্তরা দ্রুত সরে যাচ্ছে মফস্বলের দিকে!

জমি কেনার পরেই মায়ের মেজাজ বেশ প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি না থাক, তবু তো এক টুকরো জমির মালিক। পশ্চিমবাংলায় নিজস্ব একটা পা রাখার জায়গা।

ঠিক হল, বাবার ধার-টার একটু শোধ হলেই ভিত খুঁড়তে হবে ওই জমিতে। কোনোরকমে একটা ঘর হলেই চলবে রান্নাঘর আর বাথরুম। মা তাতেই রাজি, কোনোক্রমে সেই একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে পারলে মাঝে মাঝে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা বাঁচানো যাবে, সেই টাকা সাশ্রয় হলে বাড়ানো যাবে আরও দু-একটা ঘর। আস্তে আস্তে হবে, তাতে ক্ষতি কি।

সুমিতের তখন পনেরো বছর বয়েস। সবেমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছে। সে দেখত, মাঝে মাঝেই রাত্তিরের দিকে বাবা আর মা তাঁদের কাল্পনিক বাড়ির নক্সা নিয়ে আলোচনা করছেন। কাল্পনিক বাড়িটি দোতলা, তার ঘরগুলির আকার ও অবস্থান বদলে যাচ্ছে অনবরত। বাবা ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলতেন, দোতলার বড়ো ঘরটা হবে ওই ডানদিকে। মা-ও আঙুল তুলে বলতেন, ডানদিকে তো একটা কারখানা দেখা যাবে, বরং পুবদিকটায় একটা পুকুর আছে....।

হঠাৎ এক সন্ধেবেলা বাবার হৃদযন্ত্রটি বন্ধ হয়ে গেল। তখনও তাঁর রিটায়ার করার পাঁচ বছর বাকি। নিজের বাড়ি আর দেখা হল না। বাবাকে এই পৃথিবীটাই ছাড়তে হল।

এরপর আর বাড়ি বানাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রায় আট-ন-বছর অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কেটেছে। মাঝে মাঝে বারুইপুরের জমিটা বিক্রি করে দেবার কথা উঠত, সুমিতই তখন এ সংসারের প্রধান পুরুষ, সে বলত, এখন থাক জমিটা। এর থেকেও যদি খারাপ অবস্থা হয় কখনো....।

সুমিত চাকরি পাবার পর অবস্থা কিছুটা সামলাল। আর তিন বছরের মধ্যেই তার ছোট ভাই অমিত চাকরি পেল বম্বেতে। মাকে সে নিয়ে গেল তার কাছে। দু বছর পর অমিত চলে গেল কানাডায়। মা ফিরে এলেন সুমিতের কাছে। অর্চনা তার স্বামীর সঙ্গে থাকে কানপুরে, সে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার ছেলে-মেয়েদের সামলাবার জন্য মাকে সেখানে গিয়ে থাকতে হল টানা আট মাস।

অফিস থেকে সুমিত এখন ভাল ফ্ল্যাট পেয়েছে বালিগঞ্জ প্লেসে।

চব্বিশ ঘন্টা জল, প্রচুর আলো-হাওয়া। বড়ো বড়ো তিনটে বেড রুম, তাছাড়া লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস। দুটো বারান্দা। মায়ের একটা ঘর আলাদা করে রাখা আছে। বারুইপুরের জমিটা পড়ে আছে, তা নিয়ে সুমিত মাথা ঘামায় না।

মা-ও আর কক্ষনো বাড়ির কথা বলেননি। একবারও না।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, খালি জমি ফেলে রাখলে জবর দখল হয়ে যেতে পারে। জমির দাম বারুইপুরেও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সুমিত তার অফিস এবং লেখালেখি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে ওসব নিয়ে চিন্তা করারও সময় পায় না।

সুমিতের স্ত্রী রূপালি অবশ্য মাঝে মাঝে জমিটা দেখতে যায়। গত বছর সে জমিটার একটা ভাল ব্যবস্থাও করেছে। রূপালির খুব গাছপালার শখ, সে অনেকগুলো গাছের চারা লাগিয়ে এসেছে সেই জমিতে। বাড়ি না হোক, ওই জমির ফুল-ফল উপভোগ করা যাবে।

গাছ লাগালেই গাছ বড় হয় না। জমির চারপাশে বেড়া লাগাতে হয়। নিয়মিত গাছে জল দেবার ব্যবস্থা করাও দরকার। রূপালি নিজের উদ্যোগেই রাধেশ্যাম নামে স্থানীয় একজন লোককে ঠিক করে এসেছে। সে নিয়মিত গাছে জল দেবে, বাগান দেখবে। মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে। রূপালি নিজেও দেখাশোনা করবার জন্য নিজেও প্রায়ই যায় সেখানে, মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মা গড়িমসি করেন, তাঁর কোনো আগ্রহ নেই মনে হয়।

অমিত তিন বছর অন্তর একবার কানাডা থেকে দেশে ফেরে। খুব হৈ চৈ করে কয়েকটা দিন খরচ করে দু-হাতে। প্রত্যেকবার এসেই সে মাকে নিয়ে যেতে চায় কানাডায়, কিন্তু মা সাগর পাড়ি দিতে একেবারেই রাজি নন।

এবারে অমিত এসে বৌদির সঙ্গে একদিন জমিটা দেখতে গিয়েছিল। চারা গাছগুলো এখনো ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়নি, তবে বেঁচে গেছে কিছু কিছু। রাধেশ্যাম নামে লোকটি তেমন যত্ন নেয়নি; গরু-ছাগল ঢুকে খেয়ে ফেলেছে কিছু গাছ। অমিত তাকে বকুনি দিয়েছে আবার একটা ঘড়িও উপহার দিয়ে এসেছে।

অমিত হঠাৎ বলল, দাদা, জায়গাটা এমনি এমনি পড়ে আছে। ওখানে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেললেই তো হয়। তুই একটা এস্টিমেট করে ফ্যাল, আমি আর্দ্ধেক টাকা দিচ্ছি।

সুমিত বলল, তোর মাথা খারাপ নাকি? ওখানে বাড়ি বানিয়ে কী হবে? কে থাকবে? আমি কি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে ওই ধ্যাদ্ধারা গোবিন্দপুরে থাকতে যাব নাকি?

অমিত বলল, তবু একটা নিজেদের বাড়ি থাকবে! আমি যখন দেশে ফিরে আসব, তখন ওই রকম একাটা ফাঁকা জায়গায় থাকতে ভাল লাগবে। কলকাতার বাতাসে আমার চোখ জ্বালা করে।

সুমিত হেসে বলল, তুই তিন-চার বছর অন্তর আসবি, তার জন্যে একটা বাড়ি করে ফেলে রাখতে হবে? ভাড়া দিলেও রিস্কি, একবার দিলে আর ভাড়াটে উঠবে না!

অমিত বলল, ভাড়া দিতে হবে কেন? মা গিয়ে থাকতে পারে।

এই কথাটা অবশ্য সুমিত উড়িয়ে দিতে পারল না।

মা আজকাল খুব কম কথা বলেন। তা শুধু বয়সের জন্যই না। মায়ের কোনো নিজস্ব সংসার নেই। কখনো অর্চনার কাছে, কখনো বড়ো নাতির কাছে জামসেদপুরে, কখনো থাকেন সুমিতের বাড়িতে। এ বাড়িতে রূপালিই এখন গৃহিণী, মা-ও পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ মাথা গলান না।

বারুইপুরে একটা বাড়ি করলে মা সেখানে আবার একটা সংসার পাততে পারেন।

অমিত বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বলল, আমি কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি, তুই এক্ষুণি কাজ সুরু করে দে দাদা।

সুমিত বলল, টাকা দিলেই হল? বাড়ি তৈরির ঝঞ্ঝাট আছে না? কণ্ট্রাক্টরকে দিয়েও নিজেরা দাঁড়িয়ে না দেখলে চুরি করে ফাঁকা করে দেবে। আমার একদম সময় নেই।

রূপালি ফস করে বলল, আমি দেখাশুনো করতে পারি।

দেখা গেল একটা নতুন বাড়ির ব্যাপারে রূপালিরও খুব উৎসাহ। দেওর আর বৌদি মিলে শুরু হয়ে গেল জল্পনা কল্পনা।

এক সময় অমিত বলল, দাদা, তোমার চেনা কোনো আর্কিটেক্ট আছে তাহলে একটা প্ল্যান করিয়ে ফেললে হয়। আমি যাবার আগেই দেখে যেতে চাই।

তখন অনেকদিন আগেকার একটা দৃশ্য মনে পড়ল সুমিতের। সে একটুক্ষণ দেয়াল দেখল। রাত্তিরবেলা মা আর বাবা আঙুল তুলে তুলে একটা কাল্পনিক দোতলা বাড়ির ছবি আঁকতেন। অমিত তখন বেশ ছোট, সে এসব জানে না।

মা এ-ঘরে এলে সুমিত জিজ্ঞেস করল, মা তোমার মনে আছে, তুমি আর বাবা মিলে একটা বাড়ির নক্সা বানিয়েছিলে? সেটা তোমরা এঁকে রেখেছিলে কোথাও।

মা উদাসীন ভাবে বললেন, সে কি আর মনে আছে। কতদিন আগেকার কথা।

অমিত বলল, মা, বাবার জায়গাটায় আমরা এবার একটা বাড়ি বানাব ঠিক করেছি।

মা বললেন, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ওখানে বাড়ি বানিয়ে কি করবি? কে থাকবে?

অমিত বলল, আমরা সবাই যখন ইচ্ছে করবো থাকবো। দিদি কলকাতায় এলে থাকতে পারে। তুমি থাকবে।

মা তবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। কখন তিনি উঠে গেলেন তা আমরা খেয়ালও করলাম না।

একটু পরে রূপালি ফিসফিস করে বলল, এই, মায়ের কী যেন হয়েছে। বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমি দু-তিনবার ডাকলুম। কোনো উত্তরই দিলেন না।

অমিত অবাক হয়ে বলল; কেন, মা কাঁদছে কেন? এই তো এখানে ছিল।

অমিত খুব ছোট ছিল, তার সেইসব দুঃখের দিনগুলোর কথা মনে নেই। মা যে তাঁর শেষ গয়নাগুলো বিক্রি করতে দিয়েছিলেন জমিটা কেনার জন্য, সে কথাও বোধহয় অমিত জানে না।

সুমিতের সব মনে পড়ে যায়। মায়ের কান্নার কারণটাও সে আন্দাজ করতে পারল। স্বামীকে তিনি বাড়ি তৈরি করবার জন্য জোর করতে পারতেন, ছেলেদের পারেন না। ইচ্ছেটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন এতদিন, কিন্তু এখন তাঁর বাড়ির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

সুমিত গল্প-উপন্যাস লেখে, তাতে অনেক মাতৃচরিত্র থাকে। কিন্তু নিজের মায়ের সঙ্গে তার যোগসূত্রটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। আগের মতন সে মায়ের সামনে বসে প্রাণ খুলে গল্প করতে পারে না।

অমিত থাকে বিদেশে, মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় খুব কম, তবু মায়ের সঙ্গে তারই বেশি বন্ধুত্ব। সে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে।

অমিতের উৎসাহেই দু-সপ্তাহের মধ্যে একটা বাড়ির নীল-নক্সা তৈরি হয়ে গেল। অমিতের ফেরার দু দিন আগে ভিত পুজো হয়ে গেল পর্যন্ত। ডলার ভাঙিয়ে গুচ্ছের টাকা সে রেখে গেল বৌদির কাছে।

রূপালির প্রধান নেশা রবীন্দ্রসঙ্গীত। সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে অনেকদিন, মাঝে দু-একটা অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসেও গান গায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বাজে। তার যে বাড়ির তৈরির ব্যাপারেও এত আগ্রহ থাকতে পারে, তা সুমিত আগে কখনো বুঝতে পারেনি। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই বুঝি একটা নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা থাকে।

সুমিত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তবু তাকে প্রত্যেকদিনই এখন ইট, সিমেন্ট, বালির কথা শুনতে হয়। রূপালি তার এক মাসতুতো ভাইয়ের সাহায্য নিচ্ছে, ওরা দুজনে মিলে মিস্তিরিদের কাজ তদারক করতে যায় প্রায় প্রত্যেকদিনই। বাড়ি ফিরে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। যে-সব মিস্তিরিদের চোখেও দেখেনি সুমিত, তাদের নাম এখন তার মুখস্থ। কোন্ মিস্তিরি ফাঁকিবাজ আর কে খুব ভাল কাজ জানে অথচ প্রায়ই ডুব মারে, তাও সুমিত জানে। রাধেশ্যাম নামে যে-লোকটিকে গাছে জল দেবার জন্য রাখা হয়েছিল, সে আর তার স্ত্রী সুবালা খুব গোলমাল করছে। কাজ কিছু করে না, কিন্তু প্রায়ই এটা সেটা চায়, তাদের ছেলে-মেয়েরা এসে ঘুর ঘুর করে। রূপালিকে এর মধ্যেই দু খানা শাড়ি ও বাচ্চাদের জন্য কয়েকটা প্যান্ট শার্ট দিতে হয়েছে। ওদের ছাড়ানোও যাচ্ছে না, এমন নাছোড়বান্দা!

ছোট ভাই টাকা দিয়ে গেছে, সেইজন্য সুমিতকেও এখন টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে। কিন্তু শুধু দিয়েও তো তার নিষ্কৃতি নেই, ইট সিমেন্টের কথা শুনতে শুনতেও তার কান ঝালাপালা হয়। বাড়ির প্ল্যানও বদলাচ্ছে ঘন ঘন, রূপালি এখন মাকেও যুক্ত করে নিয়েছে।

কয়েক মাস বাদে রূপালি একদিন বলল, এই শোন, সামনের রবিবার কিন্তু তুমি কোনো কাজ রাখবে না। সেদিন তোমাকে বাড়ির ওখানে যেতে হবে।

সুমিত আঁতকে উঠে বলল, সে কি, এর মধ্যে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল নাকি? কমপ্লিট?

রূপালি বলল, ধ্যাৎ; তুমি কিছু বোঝ না। বাড়িটা কি আলাদিন বানাচ্ছে নাকি? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি হয়? জানলা-দরজার এখন অর্ডার দিয়েছি?

সুমিত বলল, তা হলে আমি এখন গিয়ে কী করব?

রূপালি বলল, সেদিন ছাদ ঢালাই হবে।

সুমিত বলল, তুমিই তো বললে আমি বাড়ির কাজ কিছু বুঝি না। ছাদ ঢালাইয়ের সময় গিয়েই বা কী করব? সে তো শুনেছি অনেকক্ষণ লাগে!

রূপালি বলল, ছাদ ঢালাইয়ের সময় থাকতে হয়। মিস্তিরিদের মিষ্টি খাওয়াতে হয় সেদিন, বাড়ির লোকজন সেদিন না থাকলে চলে?

সুমিত হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও রূপালি জেদ ধরে রইল। শেষ পর্যন্ত অভিমান করে বলল, বাড়ির জন্য আমি খেটে মরছি, গায়ের রং কালো হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি একদিনও যেতে পারবে না। টাকা দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ?

শনিবার রাত্তিরে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল এক চোট। রবিবার সকালেও আকাশ মেঘলা। এ সবই নাকি ভাল লক্ষণ। বিকেলের আগে ঢালাই শেষ হবে, তারপর বৃষ্টি নামলে ছাদ মজবুত হবে। সিমেন্ট ঢালাই দশ-পনেরো দিন এমনিতেই জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।

সুমিত আর রূপালি যখন পৌঁছল, তার আগেই ঢালায়ের কাজ শুরু গেছে। রূপালির ভাই বিমল তদারকি করছে সব কিছুর। সিমেন্ট আর বালি মিশ্রণের পরিমাণ বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান আছে। বালিগুলো চালুনি দিয়ে ছেঁকে নেবার নির্দেশ দিচ্ছে সে মিস্তিরিদের।

আজ এক সঙ্গে বেশ কয়েকজন মিস্তির ও জোগাড়ে এসেছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তলা থেকে তরল ঢালাইয়ের জিনিস ভরা পাত্র বাঁশের ভারা দিয়ে হাতে হাতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। এরকমই চলতে লাগল। একঘেয়ে ব্যাপার।

এখানে সুমিত কী করবে?

একটা বারান্দা তৈরি হয়ে গেছে আগেই, খোলসটা খানিকটা সাফ-সুতরো করে সুমিত বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল।

একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে ঠিকই। ভাড়া বাড়ি নয়, নিজস্ব বাড়ি, এতদিন পর। মাঝখানে কত কিছু ঘটে গেল! জমি কেনার সময়কার দিনগুলি বারবার মনে পড়ছে সুমিতের। বাবার অনেক আপত্তি ছিল, মায়ের গয়না বিক্রি করতে চাননি কিছুতেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জমিটা কেনা হল, বাবা সত্যিই খুশি হয়েছিলেন খুব। আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না। জমি কেনার পর বাড়ি বানাবার স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছিলেন।

বাবা কষ্টই করে গেলেন সারাটা জীবন, কিছু উপভোগ করার সুযোগ পেলেন না। আজ তাঁর ছোট ছেলে কানাডার বহু টাকা রোজগার করে, বড়ো ছেলেও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় যদি একখানা ঘরেরও বাড়ি বানানো যেত, তাহলে যে তৃপ্তি ও সুখ পাওয়া যেত, তার সঙ্গে এখনকার অবস্থাটার তুলনাই হয় না।

একজন স্ত্রীলোক মাথায় আধ ঘোমটা টেনে সুমিতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, দাদাবাবু, একটা কথা বলব?

সুমিত অসহায় বোধ করল। এ আবার কী বলতে চায়? বাড়ির কোনো জিনিসপত্র যদি লাগে, সে ব্যাপারে সে কিছুই বলতে পারবে না। সে ডাকল, রূপালি, ঝিমল...

স্ত্রীলোকটি বলল, বৌদিকে আগে বলেছি...আপনি যদি একটু শোনেন...আমার এই জমির গাছে জল দিই, আমার নাম সুবালা।

আগে দেখেনি একে সুমিত, তবু এই চরিত্রটি তার চেনা। রাধেশ্যামের বউ, এর পরনের শাড়িটা বেশ চেনা লাগছে। বোধহয় রূপালিই দিয়েছে।

সুমিত তার দিকে তাকিয়ে রইল।

স্ত্রীলোকটি বলল, ঝড়ে আমাদের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে। যদি কিছু সাহায্য দেন আমাদের। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে।

সুমিত ঠিক যেন শুনতে পায়নি, জিজ্ঞেস করল, কী বললে?

স্ত্রীলোকটি বলল, আমাদের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে, দাদাবাবু?

এখনও কথাটা বিশ্বাস হল না সুমিতের। এটা কি গল্প নাকি? তার নিজের বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে, বিকেলের মধ্যেই পাকা ছাদ তৈরি হয়ে যাবে আর ঠিক এই সময় একজন বলছে, তার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে।

এটা বড্ড অতি নাটকীয়। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে সুমিত নিজে কখনো গল্প লিখবে না। প্যাচপেচে, সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার।

ঠিক এই সময় রূপালি এসে উপস্থিত। সে বলল, কী হয়েছে, সুবালা?

সুবালা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল, দাদাবাবুকে আমাদের ঘরটার কথা বলছিলুম।

রূপালি ধমক দিয়ে বলল, তোমাকে দিলাম যে পঞ্চাশ টাকা।

সুবালা বলল, ওতে হবে না। যদি আর কিছু দেন।

রূপালি বলল, দ্যাখ, এই সময় আমাদের অনেক খরচ। আমরা আর দিতে পারব না। তোমরা অন্য জায়গা থেকে জোগাড় কর।

সুবালা চলে যাবার পর সুমিত জিজ্ঞেস করল, সত্যি সত্যি ওদের ছাদ উড়ে গেছে? নাকি বানিয়ে বলছে?

রূপালি বলল, না, বানায় নি। এই কাছেই ওরা থাকে, মাটির ঘর একখানা, তার ওপর খড়ের চাল উড়ে গেছে কালকের ঝড়ে। আমি দেখে এলুম তো। কিন্তু আমরা আর কত দেব? ওর স্বামীটা একটা অপদার্থ।

সুমিতের ইচ্ছে করল হো-হো করে হেসে উঠতে। তাহলে এরকম সত্যিই ঘটে। একজনের ছাদ ঢালায়ের পাশে আর একজনের ঘরের ছাদ উড়ে যায়! একজন কিছু পেলেই আর একজনকে কিছু হারাতে হবে।

আশেপাশে আরও কিছু পাকা বাড়ি উঠেছে। কিছু খালি জমিও আছে। পেছন দিকে খানিকটা দূরে বোধহয় জবর দখলের জমি, সেখানে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা মাটির বাড়ি। তারই একটা সুবালাদের।

কোনো কাজ নেই, সুমিত হাঁটতে হাঁটতে গেল সেই দিকটায়। কারুর বাড়ির ছাদ যদি ঝড়ে উড়ে তার জন্য ঝড় দায়ী, সেই খরচ রূপালি বহন করতে যাবে কেন? খড়ের ছাউনি দিতে কত লাগে, তাও সুমিত জানে না।

কাছাকাছি গিয়ে সুমিত দেখল সুবালা আর রাধেশ্যাম ছড়ানো খড়গুলো জড়ো করছে এক জায়গায়। মাটির দেওয়ালও ধসে যায়নি ভাগ্যিস। কয়েকটা বাচ্চা ছুটোছুটি করছে তার মধ্যে। একটি মেয়ে, আর দুটি ছেলে। মেয়েটিই বড়ো, একটা বেখাপ্পা ফ্রক পরে আছে সে, তার শাড়ি পরার বয়েস এসে গেল বলে।

সুমিত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার আবার হাসি পাচ্ছে। গরিবের দুঃখ-কষ্ট দেখে হাসা যায় না, সেটা অমানবিক ব্যাপার। সুমিতের হাসি পাচ্ছে অন্য কারণে। সে একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পাচ্ছে। এরা তিন ভাই বোন, যেন অবিকল সুমিতদের এক সময়কার পারিবারিক ছবি। বড়ো মেয়েটি অর্চনা, তারপর সুমিত আর অমিত।

মাথার ওপর একটা নিজস্ব ছাদ তুলতে এদের এখনো কত দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে!

কান্না

ওভারকোটটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বিভু জিজ্ঞেস করল, টিঙ্কু এল না এখনো? আর একবার ফোন করবে?

জয়া গলায় একটা স্কার্ফ বেঁধে নিয়েছে, বাইরে আজ কনকনে বাতাস। সেপ্টেম্বরেই তাপমাত্রা এত কমে যায় না এখানে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। জানলার পর্দা সরিয়ে একটু বাইরেটা দেখে নিয়ে জয়া বলল, টিঙ্কু আসবে না। আমি ওকে বারণ করে দিয়েছি।

বিভু রীতিমতন অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, তুমি ওকে বারণ করে দিয়েছ? কেন?

জয়া বলল, ও কেন শুধু শুধু এখানে এসে থাকতে যাবে। ওর ছেলেমেয়ের স্কুল অনেক দূর হয়ে যায় না?

বিভু বলল, টিঙ্কু নিজেই তো অফার করেছিল...তা হলে তুমি বাসু-সুমনাদের ফোন কর, ওদের বাচ্চাকাচ্চা নেই, কোনো অসুবিধে হবে না।

জয়া বলল, কোনো দরকার নেই। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

ওয়ালেটে ক্রেডিট কার্ড দুখানা আছে কি না দেখে নিল বিভু। প্লেনের টিকিটটা ওভারকোটের ভেতরের পকেটে রাখল। তার মাথায় ঘুরছে অফিসের কাজের চিন্তা, তবু সে অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি একা থাকবে?

জয়া বলল, তুমি এমন করছ যেন কেউ এখনো একা থাকে না।

বিভু বলল, থাকে, অনেকেই থাকে। কিন্তু তুমি তো আগে কখনো একা থাকনি!

দরজা খুলে বাইরের পর্চে এসে দাঁড়াতেই হাওয়ার ধাক্কায় কেঁপে উঠল দু জন। মরুভূমির হাওয়া।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বার করে পাশের সিটে সরে বসল বিভু। পকেটে হাত দিয়ে কী যেন খুঁজলো, না পেয়ে হাসল। জয়াকে বলল, তুমিই চালাও।

চার মাস আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে জয়া। তবু বিভু যেন তার ওপর খুব ভরসা রাখতে পারে না। হাইওয়ে দিয়ে এখনো সে চালাতে দেয় না জয়াকে।

কিন্তু আজ বিভুকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে জয়াকেই গাড়িটা ফেরত আনতে হবে।

—এই, সিট-বেল্ট বাঁধলে না?

জয়া হেসে বলল, তুমি যে-কদিন থাকবে না, আমি ইচ্ছে মতন গাড়ি চালাব। ক্যাকটাস ডেজার্টে একা যাব। আই উইল এনজয় মাই ফ্রিডম!

বিভু বলল, বেশি বেশি কেরদানি দেখাতে যেও না। বাসু সুমনারা তোমাকে এই উইক এণ্ডে ডেজার্টে নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে আলবুকার্কি থেকে প্রত্যেকদিন পাঁচ ছ বার ফোন করব। এই, গ্যাস বন্ধ করেছ?

—হ্যাঁ রে বাবা, করেছি।

—রাত্তিরে বার্গলার্স অ্যালার্ম অন করে দিতে ভুলে যাবে না?

—না।

—না দেখে ফ্রন্ট ডোর দিনেরবেলাতেও খুলবে না। রিসেন্টলি ফিনিক্স-এ একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে, একটা লোক এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি করার ছুতোয় এসে—

—তুমি এত চিন্তা করছ কেন, আমি কি ছেলেমানুষ?

—সাতাশ বছর বয়েস হলেও তুমি আসলে একটা বাচ্চা! এই, ডানদিকের ইনডিকেটর দিলে না, হঠাৎ টার্ন নিচ্ছ—

হাইওয়েতে পড়ার পর বিভু প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে জয়াকে নির্দেশ দিতে লাগল। কখনো তার মনে হচ্ছে, জয়া পঞ্চান্ন মাইলের বেশি স্পিড তুলে ফেলেছে। এক্ষুনি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ ধরবে। কখনো মনে হচ্ছে, জয়া অকারণে লেন বদল করছে।

জয়া কিন্তু বিভুর কোনো নির্দেশই মানছে না।

ওদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট বেশ দূরে। পৌঁছতে চল্লিশ মিনিট লাগল। পার্কিং লটের দিকের জয়া যখন গাড়ি ঢোকাতে যাচ্ছে, তখন বিভু স্বস্তির হাসি দিয়ে বলল, পার্ক করার দরকার নেই। স্ট্রেট ড্রাইভ অন। আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও।

জয়া বলল, কেন? আমি তোমাকে সি অফ করে যাব।

বিভু বলল, আবার তোমাকে এতটা আসতে হবে। আমি তো চেক-ইন করেই ভেতরে ঢুকে যাব। সময় নেই আর।

পাঁচ নম্বর গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাল জয়া। বিভু তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, আই মাস্ট অ্যাডমিট, তোমার হাত অনেকটা স্টেডি হয়ে গেছে। তবু ফেরার সময় সাবধানে যেও!

এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি রাখার উপায় নেই। বিভুর সঙ্গে একটা ছোট সুটকেস, ডিকি খুলতে হবে না। বিভুকে এক্ষুনি নেমে ভিড়ে মিশে যেতে হবে।

দেশে থাকতে যা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় এখানে সেটাতে বেশ মজা পায় বিভু। প্রকাশ্যে চুম্বন। নানা লোকের চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে চুমু খেতেও একটু অন্যরকম লাগে। প্রত্যেকটি গাড়ির দিকে পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর, এক মিনিটও থামতে দেবে না, কিন্তু তারা চুম্বনের জন্য সময় দেয়।

জয়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরে একটা প্রগাঢ় চুম্বন দিয়ে বিভু বলল, তোমার জন্য আমার সব সময় চিন্তা থাকব। ফেরার সময় সাবধানে যেও। প্লিজ, প্লিজ, ঘুমোতে যাবার আগে রান্নাঘরের গ্যাস নেভানো আছে কি না চেক করবে... আমি ঠিক চারদিন পরে ফিরে আসব, তুমি এয়ারপোর্টে এসে মঙ্গলবার...আমি পৌঁছেই ফোন করব...

জয়া বলল, তুমি কথা দিয়েছ, আর সিগারেট খাবে না। মনে থাকে যেন!

বিভু নেমে যেতেই জয়াকে স্টার্ট দিতে হল গাড়িতে। একবার শুধু সে পেছন ফিরে তাকাল, বিভু ঠোঁটে হাত ছুঁইয়ে উড়ন্ত চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছে তার দিকে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার পরেই জয়ার মনটা হালকা ফুরফুরে হয়ে গেল। বিভু অফিসের কাজে মাত্র চারদিনের জন্য বাইরে থাকবে, এতে মন খারাপ করার কিছু নেই। এই চারদিন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এখন এই গাড়িটা তার নিজস্ব, বাড়িতে সে একা, যখন খুশি ঘুম থেকে উঠবে।

ক্যাডিলাক গাড়িটা বিভু নতুন কিনেছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবার পর জয়া বলেছিল তাকেও একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনে দিতে। সে ইচ্ছেমতন নিজের গাড়িতে সে ইউনিভার্সিটি যাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন থাকে, মাত্র আড়াইশো-তিনশো ডলারে পুরনো ফোর্ড কিংবা টয়োটা পাওয়া যায়।

কিন্তু বিভু নানা ছুতোয় এড়িয়ে যায়, দ্বিতীয় গাড়ি কিনতে চায় না। জয়াকে সে ড্রাইভিং শিখিয়েছে এমার্জেন্সির জন্য। বাড়ির কাছ থেকেই ইউনিভার্সিটির বাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক উইক এণ্ডে জয়াকে সুপার মার্কেটে বিভু-ই নিয়ে যায়। বিভুর নিজেরও বাজার করার খুব শখ।

হাইওয়েতে পড়ে একসিলারেটারে চাপ দিল জয়া। বেশি স্পিড দিলে পুলিশ কীভাবে এসে ধরে, তা একবার সে দেখতে চায়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সে কতরকম গল্প শুনেছে। বিভু খুব সাবধানী। পুলিশ ধরলে আর কী হবে, প্রথমবার বড়ো জোর একটা টিকিট দেবে।

এ দেশের পুলিশগুলো কী স্মার্ট। বেছে বেছে সুন্দর চেহারা নেয়। সব সময় ইয়ার্কি-ঠাট্টার সুরে কথা বলে। রাস্তায় কখনো কোনো পুলিশ ঘুস নিয়েছে এমন শোনা যায় না।

ষাট...পঁয়ষট্টি...আটষট্টি...পঁচাত্তর...দারুণ আরাম লাগছে জয়ার। তাকে বারণ করার কেউ নেই। সে স্বাধীন, যা খুশি করতে পারে।

ওপরে লাল-নীল আলো জ্বেলে একটা পুলিশের গাড়ি আসছে পেছনে। আসুক! জয়ার টিকিট পাবার ঘটনা শুনলে বিভু অস্থির হয়ে কীভাবে নাচানাচি করবে, তা ভেবেই হাসি পেল জয়ার।

পুলিশের গাড়িটা পাশের লেন দিয়ে আরও জোরে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে একজন পুলিশ জয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল, কিন্তু কিছু বলল না তো? যারা স্পিড লিমিট ছাড়িয়ে যায়, পুলিশ এসে তাদের গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করে। কিংবা সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। কিন্তু সেরকম কিছুই করল না। বোধহয় আরও কোনো গুরুতর প্রয়োজনে ওরা ছুটে যাচ্ছে। জয়া বেশ নিরাশ হল।

জয়া আরও বেশি নিরাশ হল বাড়ি পৌঁছে। তার গেটের সামনে দু খানা গাড়ি।

ভেতরে ঢুকতে পারেনি, গাড়ির মধ্যেই বসে আছে দুটি দম্পতি। বাসু-সুমনা আর সুভদ্র-আইরিন। সুমনার দুই মেয়েও এসেছে।

সুভদ্র বলল, ব্রাভো! তুমি গাড়ি চালিয়ে বরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এলে? তোমার তো অনেক ইনপ্রুভমেণ্ট হয়েছে দেখছি! আমি ভেবেছিলুম, আইরিনকে তোমার কাছে রেখে আমিই বিভুকে ছেড়ে দিয়ে আসব!

আইরিন বলল, হাই জয়া। উই মিস্‌ড বাই ফাইভ মিনিটস! সুভোড্রো ইজ অলওয়েজ লেট, ইউ নো। খুব ওলস!

সুমনা বলল, হাইওয়ে দিয়ে তুই একা চালিয়ে ফিরলি?

বাসু বলল, দ্যাখ, মাত্র দেড় বছর হল এসেছে জয়া, এর মধ্যেই ড্রাইভিং শিখে কত স্মার্ট হয়ে গেছে। আর তুমি সাত বছরের ভেটারান হয়েও কিছুতেই শিখতে চাইলে না।

সুমনা বলল, আমি গাড়ি-ফাড়ি চালাতে পারব না।

গ্যারাজে গাড়ি ঢুকিয়ে জয়া সবাইকে ভেতরে এনে বসাল। এখন কত রাত পর্যন্ত আড্ডা চলবে তার ঠিক নেই। সুভদ্র তো রাত দুটো-তিনটের আগে ড্রিঙ্ক শেষ করতেই চায় না। যত ইচ্ছে মাতাল হলেও ওর অসুবিধে নেই। আইরিন মদ স্পর্শ করে না, ফেরবার সময় সে গাড়ি চালায়।

টিভি-তে আজ জেনারাল হসপিটাল ধারাবাহিক আছে। জয়া সেটা কোনোদিন মিস করে না। ডালাসের চেয়েও এই সিরিয়ালটা তার বেশি ভাল লাগে। এত লোকজন এসে পড়লে আর টি ভি দেখার কোনো আশা নেই!

সুমনা বলল, টিঙ্কু ফোনে জানাল, ও থাকতে পারছে না তোর কাছে। আমার মেয়েদের এখন ছুটি। আমি তিন চারদিন থাকতে পারি তোর কাছে। কোনো অসুবিধে নেই। তুই তো কখনো একা থাকিসনি এদেশে।

জয়া একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল।

অন্যরা কেউ সাত বছর, কেউ দশ বছর আগে এসেছে, আর জয়া মাত্র দেড় বছর আগে এসেছে, সেইজন্য সবাই তাকে অসহায়, ছেলেমানুষ মনে করে। অথচ এদেশে কত মেয়ে একা থাকে! কলকাতাতেও আজকাল মেয়েরা ইচ্ছে করলে একা থাকতে পারে।

এখানে কে কত বছর আগে এসেছে, সেটা সব সময়েই নানা কথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায়। জয়া এখানকার কোনো ব্যাপারে মতামত দিতে গেলেই কেউ বলে ওঠে, তুমি তো মোটে দেড় বছর এসেছ, তুমি এ সব এখনো ঠিক বুঝবে না। অথচ জয়া অনুভব করে, সে আগে থেকেই বই, পত্র-পত্রিকা পড়ে যতটা জেনে এসেছে, এদেশে দশ বছর থেকেও কেউ কেউ আমেরিকার জীবন সম্পর্কে ততটা জানে না। সুমনা এখনো স্কেজিউলকে শিডিউল বলে।

সুমনার মেয়ে দুটি টি ভি খুলে বিভিন্ন চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। জয়া এল রান্নাঘরে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে। সুমনা পেছনে এসে বলল, এই, তোকে কিছু করতে হবে না, আমরা আসবার সময় গাদাখানেক ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই আর হ্যামবার্গার নিয়ে এসেছি।

আইরিন এনেছে কেণ্টাকি ফ্রায়েড চিকেন। সুভদ্র এনেছে বার্বন-এর বোতল।

জয়া ফ্রিজ থেকে বাচ্চাদের জন্য সফ্‌ট ড্রিঙ্ক বার করল।

সুভদ্র নিজেই গেলাস-টেলাস যোগাড় করে নিয়ে প্রথম চুমুকটা সেবার পর বলল, জয়া, এই প্রথম বিভুকে ছেড়ে একা থাকছ, তা বলে মুখখানা অমন কাঁদো কাঁদো করে আছো কেন? আমরা কি কেউ না?

আইরিন তার স্বামীর দিকে তাকালেই সুভদ্র বাসুকে বলল, এই তুই আমার বউকে এই কথাটা ইংরাজিতে বুঝিয়ে দে। কাঁদো কাঁদো-র ইংরিজি কী হবে রে?

সুমনা বলল, বিভুর প্রমোশন হয়েছে, এখন তো ওকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হবে।

আড্ডা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ সুমনার ছোট মেয়ে রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, মাম্‌মি, লুক! অ্যানাদার ডিজাস্টার!

সবাই চমকে টি ভি-র দিকে তাকাল।

বাসু বিড়বিড় করে বলল, আবার প্লেন ক্র্যাশ! এয়ারপোর্টের মধ্যেই?

সুভদ্র বলল, কী করে ছবিটা তুলল? লাইভ দেখাচ্ছে।

জয়ার বুকটা একবার ধক করে উঠলেও সে বিশেষ ভয় পেল না। বিভুর প্লেন ছেড়ে গেছে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে।

সুভদ্র বলল, এটা কোন্ এয়ারপোর্ট? প্লেনটা টেক অফ করার সঙ্গে সঙ্গে আইরিন বলল, ওহ্ বয়, দিস ইজ টুসন্ এয়ারপোর্ট? আওয়ার এয়ারপোর্ট!

বাসু বলল, তাই তো! জিসাস! এখানে হয়েছে? প্লেনটা টেক অফ করার সঙ্গে সঙ্গে।

সুমনা বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাল করে দেখতে দাও।

টিভির পর্দায় ফুটে উঠল, ফ্লাইট নাম্বার এ এল ২৭২। তারপর নিহতদের তালিকা।

২

একটা সাদা রঙের পাতলা নাইটি পরে জয়া নেমে এল বেজমেন্টে। খুট খুট করে দু বার কিসের যেন শব্দ হয়েছে। জয়া ভয় পায়নি। ইঁদুরই হবে। গতকাল সে বাগানে একটা ইঁদুর দেখেছিল। মরুভূমি থেকে আসে।

সিঁড়ির আলো, বেজমেন্টের সব আলো জ্বেলে দিল জয়া। সারা বাড়ি এখন পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ। একটা টিভি-র ভেতরের কলকব্জা সব উন্মুক্ত করে উপুড় হয়ে আছে। বিভু এই টিভিটা নিজেই সারাচ্ছিল। টুল বক্সটা বিভু ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই রয়েছে। একটা সিগারেটের প্যাকেটের ওপর লাইটার।

চার দিন পর ফিরে আসবে বলেছিল বিভু, আজ ঠিক চার মাস কেটে গেল।

বিভুর দাদা-বৌদি এসেছিলেন খবর পেয়েই। তারপর জয়ার বাবা আর মা। এই চার মাস এ বাড়িটা শোকের বাড়ি ছিল না, অনবরত হুড়োহুড়ি চলছিল। সব সময় লোকজন। দূর দূর থেকে যে-যখনই সময় পাচ্ছে, একবার এ বাড়িতে এসে জয়ার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে। বিভু বেশ জনপ্রিয় ছিল এদেশে, প্রচুর তার বন্ধুবান্ধব।

আজ সকালে বাবা-মাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এসেছে জয়া। প্লেনে-ওঠার আগেও মা খুব কান্নাকাটি করেছিলেন, জয়ার চোখ একবারও ভেজেনি। বাবা-মা খুব করে চেয়েছিলেন জয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। জয়া কিছুতেই রাজি হয়নি। শেষের দিকে বাবা-মায়ের সঙ্গে তার প্রায় ঝগড়ার মতন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম উপদেশ। জয়া এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। সব সময় এত লোকজন যে সে বিভুর কথা চিন্তা করারও সময় পায়নি।

আজই সে সম্পূর্ণ একা। টিঙ্কু, সুমনাদের সে প্রায় কিছুটা অভদ্রভাবেই বলেছে, মা-বাবা চলে যাবার পর কারুকে এসে থাকতে হবে না তার সঙ্গে। শি উইল টেক কেয়ার অফ হারসেলফ।

কেউ কেউ কুকুর পোষার কথা বলেছিল। জয়া কুকুর পছন্দ করে না। বার্গলার্স অ্যালার্ম আছে, ভয়ের কিছু নেই। কেউ দরজা-জানলা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করলেই এখানে ও থানায় এক সঙ্গে বেল বেজে উঠবে, তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে।

প্রায় দু বছর আগে এ দেশে পৌঁছবার পর জয়া আর কখনো এমন একা থাকেনি। শুধু ভালবাসা দিয়ে নয়, বিভু তাকে সর্বক্ষণ স্নেহমমতায় ঘিরে রাখত। প্রথম বিদেশে এসেছে জয়া, সে অনেক কিছু জানে না, সে ভুলোমনা, সে বড়ো বেশি রোমান্টিক। এ দেশে একটু অন্যমনস্ক হলেই পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে। প্রথম যখন ইউনিভার্সিটির ক্লাশ শেষ হবার পরে বিভু নিয়ে আসত জয়াকে, জয়ার লজ্জা করত। সে কি বাচ্চা মেয়ে? সে বিভুকে বলত, আমি কি কলকাতায় একা একা কলেজে যাওয়া-আসা করিনি? এ দেশে কত রকম সুবিধে।

সারা সপ্তাহে অফিসে প্রচণ্ড খাটুনি, আর প্রত্যেক উইক এণ্ডে প্রচণ্ড উদ্দাম আড্ডা। উইক ডেইজেও ষাট-সত্তর মাইল দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে আসত কেউ কেউ।

বিভু হাসতে হাসতে বলত, এ আর কী দেখছ? সুভদ্র, বাসু আমি, কল্যাণ, আমরা সবই যখন ব্যাচিলর ছিলাম, আমরা এক-একদিন চব্বিশ ঘন্টা আড্ডা দিয়ে, একটুও না ঘুমিয়ে অফিস করতে গেছি!

এই শহরের পাশেই পৃথিবী-বিখ্যাত ক্যাকটাস মরুভূমি। এত দিনের মধ্যেও সেখানে একবারও ভাল করে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। গাড়ি করে এক চক্কর ঘুরে এসেই বিভুরা আবার আড্ডা দিতে বসেছে। জয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, ওই মরুভুমির মধ্যে দু-এক রাত ক্যাম্প করে থাকার।

সে প্রস্তাব শুনে বিভুরা হেসেছে।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে যাওয়ার প্রোগ্রামই করা হয়েছে, শুধু আজও যাওয়া হয়নি।

জয়া দেশ থেকে এসেছিল জাপানের পথে। লস অ্যাঞ্জেলেস হয়ে সে অ্যারিজোনায় পৌঁছেছে। আজও তার শিকাগো-নিউইয়র্ক দেখা হয়নি। নায়েগ্রার কথা কত বইতে সে পড়েছে। বস্টন-কেমব্রিজশহর দেখার খুব শখ তার।

বিভুর কাছে সে প্রসঙ্গ তুললেই সে বলত, হবে, হবে, এদেশে অনেকদিন থাকতে তো হচ্ছেই, এক এক করে সবই দেখা হবে। এত ব্যস্ততা কিসের।

সে সব কিছুই জয়াকে না দেখিয়ে বিভু চলে গেল।

এ দেশের দিনগুলোকে জয়ার মনে হত শুধু ধারাবাহিক নেমতন্ন। হয় অন্যের বাড়িতে খেতে যাওয়া, অথবা নিজেদের বাড়িতে অন্যদের থাকা। তার ওপর দেশ থেকে কেউ না কেউ প্রায়ই আসে। এমনকি অচেনা মানুষও। ছোট কাকার বন্ধু কিংবা বড়দার শালার অফিসের সহকর্মী এ দেশে হোটেলের খরচ বাঁচাবার জন্য একটা চিঠি নিয়ে আসে। তাদের নিয়ে গাড়িতে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাতে হবে। বিভু অবশ্য সে ব্যাপারে খুব কড়া ছিল, বাড়িতে এসে থাক, খাও-দাও, সেসব ঠিক আছে, কিন্তু তাদের নিয়ে সে কোথাও যেতে পারবে না। অর্থাৎ যত ঝক্কি সব জয়াকে পোহাতে হয়েছে। প্রত্যেকের শপিং-এর জন্য জয়াকে সঙ্গে যেতে হয়েছে ডাউনটাউনের বিভিন্ন দোকানে।

বেজমেন্টে ইঁদুরটাকে খুঁজে পেল না জয়া।

ভাঙা টি ভি-টার সামনে সে একটা টুলে বসল। এই ঘরের সর্বত্র এখনো কিছু জিনিসপত্র বিভুর দাদা-বৌদি নিয়ে গেছে। বন্ধুরা, অতিথিরা এসে বিছানাগুলোতে শুয়েছে।

আজ আর বাড়িতে কেউ নেই, এখন এই মাঝরাত্রির নিস্তব্ধতায় বসে বিভুর কথা ভাববে জয়া। অনেকের চিন্তা ছিল, জয়া তেমন কিছু কান্নাকাটি করেনি সে যেন অনেকটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রথম ক-দিন। তারপর অন্যদের সঙ্গে খানিকটা ঝাঁঝালো গলায় কাটা কাটা কথা বলত। এরকম ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক নয়। সে বুক খালি করে কাঁদলে অন্যদের পক্ষে সান্ত্বনা দেওয়া অনেক সহজ হত।

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর জয়া নিজেই বেশ অবাক হল। বিভুর মুখ তার মনে পড়ছে না, তার চোখে এখনও জল আসছে না। বরং তার শরীরে একটা চাপা আনন্দের স্রোত। মা-বাবা চলে গেছেন বলে সে এমন একটা স্বস্তি পেয়েছে যে সেই কথাই তার বার বার মনে পড়ছে। মা-বাবা কেন এখনো তাকে বাচ্চা মেয়ের মতন ট্রিট করবেন? সে কি নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না? সে কলকাতায় ফিরে যাবে, না এখানেই থাকবে, সেটা জয়া নিজেই কোনো এক সময় ঠিক করবে। এত ব্যস্ততার কি আছে?

কিন্তু মা-বাবার চেয়েও বিভু তার জীবনের অনেকখানি বেশি অংশ জুড়ে ছিল, তাদের ভালবাসার মধ্যে কোনো কাঁটা ছিল। বিভু হঠাৎ তাকে একেবারে শূন্য করে চলে গেছে। তবু বিভুর জন্য তার বুকে তেমন কষ্ট হচ্ছে না কেন?

জয়ার খালি মনে হচ্ছে, মা বাবা চলে গেলেন, আপাতত দেশ থেকে আর কেউ আসবে না। বিভুর বন্ধুরাও সবাই একবার করে ঘুরে গেছে। সব ফর্মালিটি শেষ। কাল থেকে সে একেবারে স্বাধীন। এ দেশে আসার আগে জয়ার এই কথাটাই বেশি করে মনে হত, এ দেশে মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীনতা পায়! ইচ্ছে মতন কাজ, ইচ্ছে মতন ভ্রমণ। কিন্তু গত দেড় বছর, আর পরের চার মাস, সেই স্বাধীনতা তো পায়নি জয়া। আগামীকাল থেকেই সে শুধু খাঁটি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

সেই জন্যই কি শোকের বদলে তার আনন্দ হচ্ছে? ভালবাসার চেয়েও স্বাধীনতার স্বাদ বেশি মধুর?

জয়া ফিসফিস করে বলে উঠল, বিভু, বিভু, আমি তোমাকেও চেয়েছি, স্বাধীনতাও চেয়েছি কিন্তু তুমি—

বিভুর জন্য কাঁদতে পারছে না ভেবেই জয়া লজ্জায়, অনুতাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা

স্বাস্থ্যবান বাঁধাকপি, সবুজ মটরশুঁটি ও অবিকল টোমাটো রঙের টোমাটোর পাশে বসে থাকে একটি পাংশু মুখ। থুতনিতে রুখুদাড়ি, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, হাতের আঙুলগুলো ভূতের আঙুলের মতন লম্বা। কী তার নাম কে জানে! নারকেল বিক্রি করে স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকেরা। এ পর্যন্ত সুপ্রকাশ বাড়ি বদলের কারণে তিন চারটি বাজার বেশ ভালই চেনে, সব বাজারেই দেখেছে, মেয়েরাই বিক্রি করে নারকেল, পুরুষরা নয়। এর কোনো আলাদা কারণ আছে কি?

সুপ্রকাশ বাজার করতে যায় দুটি পলিথিনের ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে। একটিতে মাছ, অন্যটিতে তরকারি। একবার, বাজার প্রায় শেষ করার মুহূর্তে, তরকারির ব্যাগে জায়গা ছিল না বলে নারকেল কিনে মাছের ওপরেই রাখতে গিয়েছিল। তাতে নারকেল-স্ত্রীলোকটি হা-হা করে হাঁটু মুড়ে এগিয়ে বলেছিল, না, না, না, ওতে রাখবেন না, অমন রাখতে নেই, বরং হাতে করে নিয়ে যান।

বাজার থেকে আনবার পর সব জিনিস ধুয়ে নিতে হয়। মাছের ওপর আস্তে নারকেল রাখায় কী দোষ, তা সুপ্রকাশ আজও জানে না।

তিনজন কাঁকড়াওয়ালার মধ্যে একজন সব সময় গুনগুনিয়ে গান করে। শুধু একজন লোকই বিক্রি করে পমফ্রেট মাছ, তার মুখখানি হামফ্রে বোগার্টের মতন। এ রকম মুখ আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। একজন কই-মাগুরওয়ালা একদিন তিন টাকা বারো আনা ফেরত দেবার বদলে সুপ্রকাশকে দিয়েছিল তের টাকা বারো আনা, খানিকবাদে সুপ্রকাশ তা বুঝতে পারে। ঘুরে এসে দশ টাকা ফেরত দেবার পর লোকটি এমনভাবে তাকিয়েছিল, যেন সে চোখের সামনে তার বাল্যকালে হারানো মাকে দেখতে পেয়েছে। তখন সুপ্রকাশের মনে হয়েছিল, তা হলে তো এ লোকগুলো খুব বেশি লাভ করে না! দশ টাকার জন্য এত? তারপর থেকে সুপ্রকাশ লোকটির কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্য দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেও এই লোকটি তাকে জোর করে ডেকে আনে। একদিন সুপ্রকাশ তার কাছে মাগুর মাছ কিনতে চাইলেও লোকটি বলেছিল, আজ অন্য লোকের থেকে অন্য মাছ নিয়ে যান বাবু, এই শীতের শেষটায় কই-মাগুর খাওয়া ভাল নয়।

বাড়িতে সুপ্রকাশ শ্রীমতীকে বলে, জানো, গুড পিপল অলওয়েজ অ্যাট্রাক্ট গুড পিপল। তোমরা ভাবো, বাজারে সবাই ঠকাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে। আমায় কেউ ঠকায় না। আমি জিনিসপত্র বাছি না, মানুষ বাছি।

মাত্র দু-তিন বছর হল সুপ্রকাশ হঠাৎ একজন ছোকরা থেকে মধ্যবয়স্ক বাবা-কাকা শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে গেছে। এক ইংরেজ কবি লিখেছে, 'মাই সান্, মাই এগজিকিউশনার......' লাইনটা প্রায়ই আওড়ায়। ছেলেমেয়েরাই পিতার আয়ুর জল্লাদ। সুপ্রকাশের মেয়ের বয়েস উনিশ, এর মধ্যেই তার দুটি ব্যর্থ প্রেম এবং একটি নিষিদ্ধ প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ছেলের বয়েস সতেরো, উচ্চতায় সে সুপ্রকাশকে প্রায় ছাড়িয়ে যায় আর কি। তা বলে যে সুপ্রকাশ সত্যিকারের বাবা-কাকাদের মতন লুঙ্গি পরে বাজারে যেতে শুরু করেছে তা নয়, প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট ছাড়া সে বাড়ি থেকে বেরয় না, তার স্বাস্থ্যটি এখনো যুবকের মতো, পথে-ঘাটে অচেনা মেয়েরা তার দিকে দুবার তাকায়। তবু সুপ্রকাশ মাঝে মাঝে বলে ফেলে, আমাদের সময়ে......।

ছেলে বাজার করা একদম পছন্দ করে না। তাকে জোর করে বাজারে পাঠিয়েও লাভ নেই, সে বক ফুল চেনো না, আড় মাছ আর চিতল মাছের তফাত বোঝে না, থোড় কাকে বলে তা সে জানেই না, জানতে চায়ও না। বাড়ির কাজের লোকটিকে পাঠিয়ে বড় জোর আলু-পেঁয়াজ আর মুর্গি আনা যায়, কিন্তু প্রতিদিনের খাবারের জিনিস যদি নিজের পছন্দ মতন না হয়, তা হলে তো রোজ হোটেলে খেলেই হয়, এই সুপ্রকাশের অভিমত।

তা ছাড়া, নিজে পছন্দ মতন কোনো মাছ বা তরিতরকারি কিনলে, সেগুলির সঙ্গে খানিকটা ইচ্ছাশক্তি মিশে যায়, তার ফলে সেই সব জিনিসের রান্না হজমও হয় খুব সহজে। রিডার্স ডাইজেস্ট বা ওই ধরনের পত্রিকায় এইসব চুটকি জ্ঞানের কথা থাকে, সুপ্রকাশ জেনেছে। বাজার করতে সুপ্রকাশের খারাপ লাগে না। এটাকে সুপ্রকাশ সোসাল সায়েন্স হিসেবেও নিয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর চলতি বাজার দর না জানলে দেশটাকেও চেনা যায় না; খবরের কাগজ পড়ে এ সব জানলেও তেমন লাভ নেই। দশ টাকার সর্ষের তেল আঠারো টাকা কেজিতে কেনবার সময় পকেট থেকে টাকা বার করতে কেমন লাগে, সেটাই আসল অনুভূতি। এই অনুভূতি নেই বলেই তো আজকের পলিটিশিয়ানদের বাস্তবজ্ঞান......., সুপ্রকাশের এটা প্রিয় আলোচ্য বিষয়।

একদিনে চার-পাঁচ দিনের বাজার সেরে নেয় সুপ্রকাশ। কোনো রকমে তাড়াহুড়োতে বাজার করাও তার পছন্দ নয়। সারা বাজারটা এক চক্কর ঘোরে, পরিবেশটা বুঝে নেয়। প্রত্যেক দিনের পরিবেশ এক নয়। আজ যে মাছওয়ালাটি অঢেল চকচকে বড় বড় পারশে নিয়ে বসে থাকে, পরের দিন এসে দেখা যাবে, তার সামনে পড়ে আছে কয়েকটি মাত্র করুণ, রংজ্বলা বেলেমাছ। আজকের ফুলকপিওয়ালা পরের দিনের কুমড়োওয়ালা।

সারা বাজার ঘুরলেও নির্দিষ্ট কয়েকজনের কাছ থেকেই প্রধানত জিনিসপত্র কেনে সুপ্রকাশ। মুখ বা ব্যবহারের বিশেষত্ব দেখে সে এদের পছন্দ করেছে। নাম না জানলেও এদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার বেশ চেনা। অফিসের কাজে বাইরে কোথাও যেতে হলে, ফেরার পর বাজারের এই সব পুরুষ-নারীরা তাকে জিজ্ঞেস করে, অনেকদিন আসেননি, বাবু, কলকেতায় ছিলেন না বুঝি? এই আত্মীয়তাটুকু সুপ্রকাশের ভাল লাগে।

যে তরকারিওয়ালাটির হাতের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা, তাকে দেখে সুপ্রকাশের মনে হয়েছিল, এই লোকটি সেতার বাজানো শিখলে জীবনে উন্নতি করতে পারত। এর রুখু দাড়িওয়ালা বিষণ্ণ মুখটির ছবি খবরের কাগজে ছাপিয়ে তলায় যদি লিখে দেওয়া যায়, বিখ্যাত সেতারি ওস্তাদ বন্দে আলি খান, কেউ অবিশ্বাস করবে না। সেইজন্যই, সুপ্রকাশ এই তরকারিওয়ালার নাম দিয়েছে সেতারি। প্রত্যেক নারী-পুরুষ বিক্রেতার নামই সে আলাদা করে রেখেছে মনে মনে। কখনো প্রকাশ্যে এইসব নামে ডাকবার প্রশ্নই ওঠে না অবশ্য। এ সবই সুপ্রকাশের মনুষ্য চরিত্র পর্যবেক্ষণ নামে একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটি।

দু-তিন রকম সবজি-তরকারি কেনার পর সুপ্রকাশ একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছে। আগে মাছ কিনলেই টাকা ভাঙানো যেত, কিন্তু এর দুটি মাত্র বাঁধাকপিই আজকের বাজারের সবচেয়ে টাটকা মনে হওয়ায় সুপ্রকাশ আগে নিয়ে নিতে চায়।

সুপ্রকাশ অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, লোকটি বাকি টাকা পয়সা দিতে দেরি করছে দেখে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হল?

—বাবু, একটা কথা বলব?

সেতারির রুখু দাড়িওয়ালা মুখটিতে আজ যেন কেমন অন্য রকমের হাসি। বালকের মতন আদুরে।

—কত হয়েছে?

কোনো দিন দরাদরি করে না সুপ্রকাশ। এটাও তার একটা কায়দা। মোটামুটি বাজার দর তার জানা। দোকানির চোখে চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করে, ঠিক বলছ তো? নিজের হাতে সে কোনো দিন বাঁধাকপির দৃঢ়ত্ব কিংবা পটলের পাকামি টিপে দেখেনি, সে বলে, তুমি নিজের হাতে বেছে দাও। সে দেখেছে, এ কথা শুনলে দোকানিরা খুশি হয়, কখনো নিজের হাতে খারাপটা দেয় না।

—বাবু, একটা কথা বলব?

—কী ব্যাপার?

—আপনার টাকাটা আজ জমা রাখবেন? দু-তিন দিন পরেই শোধ করে দেব।

সুপ্রকাশ আরও কিছু শোনার জন্য তাকিয়ে রইল। এরকম অভিজ্ঞতা তার নতুন।

—মহাজনের টাকাটা গচ্চা গেছে কাল। সকাল থেকে বসে বসে ভাবছি, কিছু টাকা জোগাড় করতে না পারলে.....কাল থেকে আর.....ঘরেরও কিছু খরচাপাতি আছে।

—মহাজন?

সুপ্রকাশের ধারণা ছিল না যে এইসব আনাজ-তরকারিওয়ালাও কোনো এক অদৃশ্য মহাজনের ওপর নির্ভরশীল। মহাজনের টাকায় মালপত্র কিনে আবার সুদ সমেত ফেরত দেবার পর যা বাঁচে, সেটাই ওদের একদিনের রোজগার।

শৌখিন সমাজবিজ্ঞানী সুপ্রকাশ আগ্রহের সঙ্গে ব্যাপারটা শোনে।

লোকটি খুব একটা করুণ গল্প ফাঁদে না। প্রায় হাসতে হাসতেই জানায় যে গতকাল ট্রেনে তার পঞ্চাশটি টাকা গচ্চা গেছে। নিশ্চয়ই তার চেয়েও গরিব কোনো শালা জোচ্চোর পকেটমারি করেছে টাকাটা। এ দিকে যে আমার ঘরে শালার ইয়ে, মানে পোয়াতি বউ........

—বাবু, সকাল থেকে বসে বসে ভাবছি, আর কারুর কাছে চাইতে ভরসা হয়নি, এই আপনাকেই প্রথম বলে ফেললুম, যদি রাগ করেন তো....।

বাজারের এত লোকের মধ্যে শুধু সুপ্রকাশকেই ধার চাইবার জন্য নির্বাচন করেছে লোকটি, এটা একটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার নিশ্চিত। এই জন্য এবং লোকটির মুখের হাসি দেখে সুপ্রকাশ উদার হয়ে গেল।

—তোমাকে সব টাকা দিলে আমি বাজার করবো কী করে?

—আপনি ইচ্ছে করলে পারেন, আপনাকে কে না ধার দেবে।

আসলে সুপ্রকাশের কাছে আর একটি পঞ্চাশ টাকার নোট আছে এবং আজ সকালে তার মেজাজ বেশ ভাল আছে।

—আপনার চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা রইল, বাবু এরপর যে দিন আসবেন......।

বাড়ি ফেরার পথে একটা বেশ হালকা মতন গর্ব সুখ খেলা করে সুপ্রকাশের বুকের মধ্যে। সে কি অন্যদের তুলনায় একটু বেশি মহৎ নয়? লোকটি হয়তো আরো অনেকের কাছে ধার চেয়েও পায়নি, কিংবা শুধু যে তার কাছেই চেয়েছে.........

অন্তত একজনের কাছে আত্মশ্লাঘা করতে না পারলে পুরো ব্যাপারটার কোনো মানেই থাকে না।

—তুমি দিয়ে দিলে? পঞ্চাশ টাকা এক কথায়?

—তার মধ্যে এই একজোড়া বাঁধাকপির দাম পাঁচ টাকা চার আনা বাদ! কেমন, ভাল নয় বাঁধাকপি? শীত শেষ হয়ে এসেছে, তবু এরকম স্বাদ......

—তুমি যে বলো, তুমি মানুষ চেনো। আসলে, তোমাকেই ওরা চিনে ফেলেছে।

—ঠিক তাই।

—ওরা চিনে ফেলেছে, কাকে ঠকানো যায়।

—হা-হা-হা। শ্রীমতী, তুমি কিছুই জানো না। জানো, আজকাল ফুটপাথের হকারদেরও ব্যাঙ্ক টাকা লোন দেয়? লোকটা বাজারে রোজ বসে, পালিয়ে তো যাবে না।

—নিপুদা যে সেই তিনশো টাকা নিয়ে গেল, তখনও তুমি বলেছিলে.....

মেয়েরা পুরনো প্রসঙ্গ টেনে আনতে ভালবাসে। এক সপ্তাহ বাদে দিয়ে যাচ্ছি বলে নিপুদা তিনশো টাকা সুপ্রকাশের কাছ থেকে নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর দেড় মাস আর এলেন না। পরে যখন দেখা হল, নিপুদা একবারও তুললেন না টাকাটার কথা। ওঁর মনে নেই। গত ছ মাসে নিপুদা চার পাঁচবার এসেছেন, সাবলীল হাসি-ঠাট্টা ও গল্প করে গেছেন, সুপ্রকাশ ও শ্রীমতী পরস্পর চোখাচোখি করেছে কয়েকবার।

নিপুদা এমনিতে এত ভাল লোক, অথচ সুপ্রকাশ আর শ্রীমতীর মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা কাঁটা। ভুলে গেছেন, এমন আর অস্বাভাবিক কী ব্যাপার। যে দিয়েছে, তার পক্ষে এ রকম মনে করে রাখা কি একটা নীচতার লক্ষণ নয়?

একদিন সুপ্রকাশ মনস্থির করে বলেছিল, শোনো শ্রীমতী, মনে করো, টাকাটা আমার হারিয়ে গেছে। কলকাতায় শহরে পথেঘাটে এমন তো যায়, যায় না? হারিয়ে গেলে আর কী করতে পারতে? সুতরাং ভুলে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল।

তবু ছেলেমেয়ের পোশাক কেনার বাজেট থেকে সুপ্রকাশ কখনো একটু কমাতে চাইলেই শ্রীমতী বলে ওঠে, তুমি তো যাকে তাকে তিনশো টাকা দাতব্য করতে পারো, আর আমার......।

শ্রীমতী আর তার মেয়ে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে গেলে অনেকেই দুবোন বলে ভুল করে। মেয়েদের জীবনে কোনো একটা সময়ে যৌবনকে আটকে রাখাই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে, তার জন্য কিছু বেশি টাকা খরচ হয়। পুরুষরা প্রায় নিঃশব্দে প্রৌঢ় হয়ে যায়। সুপ্রকাশ প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলে, খবরদার, কক্ষনো টাকার চিন্তা করবে না, তা হলে কপালে ভাঁজ পড়বে। ওটা আমাকেই একমাত্র ভাবতে দাও।

পাঁচদিন পর বাজারে গিয়ে সুপ্রকাশের মনে হল, বাজারের দৃশ্যে কী যেন একটা গরমিল আছে, কোথায় যেন একটু রঙের তফাত আছে, সেতারি অর্থাৎ সেই লম্বা-আঙুলে তরকারিওয়ালা নেই।

সুপ্রকাশের অবস্থা তত সচ্ছল নয়, যাতে যে চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনাকে অতি তুচ্ছ, ধুলো জ্ঞান করতে পারে। আবার তত অসচ্ছলও নয় যাতে ওই টাকাটার জন্য তার দারুণ টানাটানি পড়ে যাবে। মাসের শেষে বাজারে এসে তাকে একটু হাত গোটাতে হয়, ইলিশ বা পোনার দিকে সে ঘেঁষে না।

সেতারির পাশেই বসে আছে পেঁয়াজওয়ালা, সুপ্রকাশের মনে তার নাম বিদ্যাসাগর। লোকটির কপাল মাথার মাঝখান পর্যন্ত এবং বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, সম্ভবত বাঙাল বলেই। এত বড় চওড়া কপাল নিয়েও লোকটি জীবনে বেশি দূর যেতে পারেনি।

বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করবে? একটু ইতস্তত করে সুপ্রকাশ অন্যদিকে চলে যায়। এরকমভাবে খোঁজখবর করা তার পক্ষে মানায় না।

হামফ্রে বোগার্টের চোখে চোখ রেখে সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল, টাটকা?

সে বলল আমি পচা মাছ ছাড়া বেচি না। আমার কাছ থেকে কিনতে হলে পচা পমফ্রেট পাবেন, ওজনে কম নিতে হবে, আর যদি বড় টাকা ভাঙান, তা হলে ময়লা নোট দেব। এবার বুঝে নিন।

—আচ্ছা, তোমরা কি রোজ আস?

—কেন?

—প্রত্যেক দোকানদার রোজ বাজারে বসে? আমি তো রোজ আসি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের ছুটি নেই?

—আমি ঘুমের মধ্যেও মাছ বেচি।

এর কাছ থেকে সোজা উত্তর আশা করা যায় না। এর ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশের সঙ্গে টক্কর দেয়।

যে-গেট দিয়ে ঢোকে, সেই গেট দিয়েই রোজ বেরোয় সুপ্রকাশ। আজ ব্যতিক্রম হল, কারণ, শ্রীমতী জল-জিরার প্যাকেট নিয়ে যেতে বলেছে। সুপ্রকাশ সে দিকে যেতেই দেখল, কেউ একজন সামনের বাঁক দিয়ে সাঁ করে ছুটে মিলিয়ে গেল। ঢোঙা, ধুতি ছেঁড়া ফতুয়া, কোমরে সবুজ গামছা বাঁধা। যে-কোনো ব্যাপারিরই এরকম চেহারা হতে পারে, কিন্তু মুখটা না দেখতে পেলেও সুপ্রকাশ জানে, ও সেই সেতারি।

একটা কঠিন জিনিস আটকে গেল সুপ্রকাশের গলায়। রাগ আর দুঃখ এক সঙ্গে মিশে গেলে তার এরকম হয়।

সেতারি তাকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল কেন? ও তার দোকান নিয়ে বাজারের অন্য কোথাও বসেছে? সুপ্রকাশের জন্য?

সুপ্রকাশের রাগ ও দুঃখ হল এই জন্য নয় যে, লোকটি তাকে ঠকাতে চাইছে। লোকটি কেন ভাবলো যে, সুপ্রকাশ ঠকতে রাজি নয়? একজন মানুষকে বিশ্বাস করে সুপ্রকাশ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা গচ্চা দিতে রাজি আছে। তবু সে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবে না।

এরা কি ভাবে সুপ্রকাশের মতন লোকেরা লেখাপড়া শেখে ঘাস-মাটি খেয়ে। শিক্ষিত লোকদের বুদ্ধি অনেক বেশি হয়, সুপ্রকাশ ইচ্ছে করলেই লোকটিকে এক্ষুনি ধরে ফেলতে পারে, এমনকি এই বাজার থেকে ওর দোকানপাট একদম তুলে দিতে পারে। দুবার গরম নিঃশ্বাস ফেলে এই কথা ভেবেও সুপ্রকাশ কিছুই করল না, বাড়ির পথ ধরল।

শ্রীমতীকে এই ঘটনাটা জানানো চলবে না। তা হলেই শ্রীমতী আবার নিপুদার প্রসঙ্গ তুলবে। এখানে হারিয়ে যাবার ব্যাখ্যাটা ঠিক মনকে মানানো যায় না। নিপুদার কাছে কোনো দিন মুখ ফুটে চাইতে পারলেই উনি নিশ্চয়ই ঝকঝকে তিনশো টাকা ফেরত দেবেন, তার সঙ্গে উপহার দেবেন একটি অদ্ভুত, বিস্মিত দৃষ্টি।

এই লোকটা ধার না চেয়ে একেবারে দানের জন্য অনুরোধ করলে কি সুপ্রকাশ দিত? সুপ্রকাশ আত্ম-সমালোচনা করতে সব সময়ই প্রস্তুত। পাঁচ-দশ টাকা পর্যন্ত সাধারণ সাহায্য, বন্যাত্রাণে পঁচিশ, একবার মাদার টেরেজার নামে একশো, সেটা অবশ্য অফিসের অন্য সকলের সঙ্গে।

চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা....লোকটি চায়নি পর্যন্ত, খুচরো ফেরত না দিয়ে......যেন জবরদস্তি....। অথচ রুখু দাড়িওয়ালা সেতারিকে বেশ পছন্দই করত সুপ্রকাশ।

—তুমি আজ টকের আম আনোনি?

—অ্যাঁ?

আজ নিমপাতা কিংবা উচ্ছেও আনোনি। এরকম ভুল তো তোমার হয় না।

মুখ তুলে শ্রীমতীকে পরস্ত্রীর মতন সুন্দর মনে হল সুপ্রকাশের। সে যেন অন্য কোনো বাড়িতে অতিথি।

পরমুহূর্তে তার ইচ্ছে হল, ভাতের প্লেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে সদর্পে উঠে দাঁড়াতে।

এরকম ইচ্ছে মানুষের প্রায়ই নানা রকম হয়, মনেই থেকে যায়। সুপ্রকাশ তার বদলে হাসল।

—আজ সকালবেলাতেই এত সাজগোজ, কোথাও যাবে বুঝি?

—কাল নীতার বিয়ে, একটা শাড়ি-টাড়ি কিনতে হবে না? কত'র মধ্যে কেনা যায় বলো তো?

—মাসের শেষ।

—তা বলে নীতার বিয়েতে শাড়ি দেবে না?

—তা তো দিতেই হবে।

—একশো দশ পনেরো?

—একশোর মধ্যে হলে হয় না?

—কী রকম দাম বেড়েছে তুমি জানো? যেগুলো আশি-পঁচাশি ছিল......চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনার চিন্তাটা সুপ্রকাশকে আর একবার কামড়ে দেয়।

.....সিনেমায় যেমন প্রথমে পায়ের জুতো, তারপর পা, হাঁটু, বুক ইত্যাদির পর পুরো মানুষটি দেখায়, প্রায় সেই ভঙ্গিতে সেতারি দেখালো সুপ্রকাশকে। একটুও চমকাল না, মুখে কোনো অপরাধী ভাব নেই, চোখ দুটি স্থির। বাজারের পেছন দিকটায় এসে বসেছে সে। আজ তার সামনে শুধু কাঁচা লঙ্কা আর শিম। কোমরের গেঁজেতে হাত দিয়ে টাকা বার করল সেতারি। বেশ গম্ভীরভাবে বলল, পুরো টাকাটা দিতে পাচ্ছি না বাবু, আজ সুদটা নিয়ে যান।

—সুদ?

—টাকায় দশ পয়সা দিই, আপনি বাবু পাঁচ পয়সা হিসেবে নিন। তা হলে কত হয়?

সুপ্রকাশের মুখে যেন কেউ চাবুক মেরেছে। এ রকম অপমান তাকে কেউ কখনো করেনি।

মুসলমানদের মতনই মধ্যবিত্ত বাঙালিদের কাছে সুদ জিনিসটা হারাম। সুপ্রকাশ কথা বলতে সময় নিল অনেকটা।

—কত হয়, বাবু?

—তুমি এর মধ্যে একদিন আমায় দেখে পালিয়েছিলে?

—কবে? আপনাকে দেখে পালাব কেন? অ্যাঁ? হে হে।

এইটাই সুপ্রকাশের বেশি করে মনে লাগছে যে, তার মানুষ চিনতে এত ভুল হল? লোকটির উপকার করতে চেয়েছিল সুপ্রকাশ, এখন সে তার সঙ্গে অবজ্ঞার সুরে কথা বলছে?

গলায় যথাসম্ভব ব্যক্তিত্ব এনে সুপ্রকাশ বলল, তুমি আমায় সুদ দিতে চাইছ?

—তা হলে এক কাজ করুন, বাবু। আমার জিনিস নিয়ে যান কিছুটা। তা হলেই ক্রমে ক্রমে আপনার টাকা শোধ হয়ে যাবে।

এই লোকটার স্পর্ধা কতখানি? কোনো মাছওয়ালা এই কথা বললে তবু মানাত। চার আনার কাঁচা লঙ্কায় চার পাঁচদিন চলে যায়। আর শিম কেউ খায় না সুপ্রকাশের সংসারে।

এইভাবে ধার শোধ হবে?

লোকটা যা কাঁচালঙ্কা আর শিম নিয়ে বসেছে, তার সবটার দামই পনেরো-কুড়ি টাকার বেশি না। বাকি টাকা নিয়ে ও কী করল? বাঁধাকপি থেকে কাঁচা লঙ্কায় নেমে যেতে ওর লজ্জা করল না?

খানিকটা অভিমান নিয়েই বাজার থেকে ফিরল সুপ্রকাশ। এইসব অভিমান যে ঠিক কার বিরুদ্ধে তা ঠিক করা শক্ত। তবু হয়। একটা লোককে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল, একজন মানুষকেও যদি হাত ধরে তুলে দাঁড় করানো যায়.....কিন্তু এরা যদি নিজেই না চায়......।

সেই অভিমানবশেই এর পরদিন সুপ্রকাশ আর বাজারের সেই দিকটায় গেলই না। সেতারির মুখ আর সে দেখতে চায় না। তা বলে যে চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনার কথা সে ভুলতে পেরেছে, তাও না, কাঁটা হয়ে ফুটছে। আর একটা ব্যাপার এই যে, এ বিষয়টা নিয়ে সে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারছে না পর্যন্ত। শ্রীমতীর কাছে উল্লেখ করা মাত্রই....। অন্য যে-কেউ শুনলেই তাকে বোকা বলবে........

হয়তো এটা কল্পনাও হতে পারে যে, কেউ যেন দূর থেকে বাবু বাবু বলে ডাকছে সুপ্রকাশকে। সেতারি নিশ্চয়ই। কিন্তু সুপ্রকাশ ফিরে তাকাবে না। লোকটা দৌড়ে পালাতে পারে, আর দৌড়ে তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না? ভারী ভারী পা ফেলে বাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সুপ্রকাশ; প্রতি মুহূর্তে ভাবছে, সে এসে তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াবে। কেউ এল না।

......বাজারের বাইরে রাস্তার ওপর বসেছে সেতারি, তার ঝুড়িতে শুধু উচ্ছে। সব মিলিয়ে দশ টাকার মাল। সুপ্রকাশ চোখ সোজা রেখে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, সে তাকাবে না। সেতারি তাকে দেখতে পেয়েছে নিশ্চিত, তবু ডাকল না তো। সুপ্রকাশ এক লাথি দিয়ে লোকটার ঝুড়ি উলটে দিতে পারে এক্ষুনি, ও জানে না? সুপ্রকাশ নিতান্ত ভদ্রলোক, ও তার সুযোগ নিচ্ছে। টিরানি অব দা উইক। দশ টাকার উচ্ছে বেচে, ক'টাকা লাভ হয়? তা দিয়ে সংসার চলে? লোকটা জুয়া-ফুয়া খেলে নিশ্চয়ই। যা খুশি করুক।

—ইরা সিদ্ধার্থর ছেলের পৈতে সামনের সোমবার। কিছু একটা তো দিতে হয়।

—আমি পৈতের নেমন্তন্নতে যাই না। তোমার তো সে দিন অন্য জায়গায়—।

—তা হলেও কিছু একটা দিতে হবে তো।

—না গেলেও দিতে হবে?

—কিছু যদি না দাও, তা হলে সবাই ভাববে, কিছু দিতে হবে বলেই তুমি গেলে না। ওরা একবার সুমির জন্মদিনে শাড়ি দিয়েছিল।

—কেন দিয়েছিল?

—কী আবোল-তাবোল বকছ? ওরা দিয়েছিল, ফেরত দেব নাকি? সুমিকে ওরা দিয়েছে।

—কত? পৈতের জন্য কত।......

বাজারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেতারি। হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। একটু দূর থেকে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল সুপ্রকাশ। ও হতচ্ছাড়াটার মুখ দেখতেও আর ইচ্ছে করে না। সুপ্রকাশ কি অন্য গেট দিয়ে যাবে? কিন্তু সামান্য একটা দোকানির জন্য সুপ্রকাশ চক্রবর্তী রাস্তা বদলাতে যাবে কেন? থাক না দাঁড়িয়ে ও।

—বাবু!

এটা কল্পনা নয়, সত্যিই ডাকছে সেতারি। সুপ্রকাশকেই। উদাসীন বাঘের মতন মুখ করে তাকাল সুপ্রকাশ। ভাল করে চেয়ে দেখল হঠাৎ যেন বেশি রোগা হয়ে গেছে লোকটা। চোখ দুটো বেশি জ্বলজ্বলে, রুখু দাড়িওয়ালা মুখখানা অন্য রকমের ছুঁচোলো।

বিড়ি টানতে টানতে নির্লজ্জের মতন হাসছে লোকটা।

আবার টাকা চাইবে? থাপ্পড় কষাবে সুপ্রকাশ। যতই নাটকীয় হোক। এরকম একটা কিছু সে করবেই।

—বাবু, কাল থেকে আপনাকে খুঁজছি।

—কেন?

—আমি সব বেচে দিইছি, বাবু, সব বেচে দিইছি। হে হে!

—কী বেচে দিয়েছ?

—সব। সংসারটাই তুলে দিয়েছি!

—বেশ করেছ!

ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট বার করল সে। আবার বলল, সব বেচে দিইছি, হে-হে। এই নিন।

সুপ্রকাশের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে তার মধ্যে সে বেশ কয়েকখানা নোট গুঁজে দেয়। সুপ্রকাশ আঁতকে উঠে বলে, এ কী করছো? অ্যাঁ, কী হচ্ছে!

—আপনার টাকা।

—তুমি......সব টাকা এক সঙ্গে........তোমার কাছে কি আমি চেয়েছি? কোনোদিন চেয়েছি? তোমার যদি অসুবিধা হয়।

—না, বাবু, আপনি ভাল মনে করে দিয়েছিলেন, আমি শালা অমন নিমকহারাম নয়।

—তুমি এখন রাখো, তোমার দোকান কোথায়? তুমি বরং আবার—

—সব বেচে দিইছি.....

লোকটি হঠাৎ হন হন করে হেঁটে মিশে যায় বাজারের ভিড়ে। সুপ্রকাশ প্রথমে একটু হতবুদ্ধি বোধ করে। অন্যান্য দোকানদাররা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুপ্রকাশ বাজারে ঢুকে পড়ে। এখন সে লোকটাকে কোথায় খুঁজে পাবে? লোকটা হাতের লম্বা আঙুল নাড়তে নাড়তে চলে গেল কোথায়? এখন সুপ্রকাশ ওর জন্য.....

হাতের টাকাটা কেমন যেন অপবিত্র, ময়লা মনে হচ্ছে সুপ্রকাশের। পকেটে ভরতে ইচ্ছে করছে না। তার নিজেরই প্রাপ্য টাকা, অথচ, এটা যেন, ঠিক কী রকম যে। টাকাটা সুপ্রকাশ ফেলে দেবে? অন্য কেউ যদি চায় এক্ষুনি দিয়ে দিতে পারে.....।

নতুন ইলিশ উঠেছে, তিরিশ টাকা দর, সুপ্রকাশ ঝট্ করে দেড় কেজির একটা বেশ চ্যাপটা মাছ কিনে ফেলল। নোংরা টাকাগুলো মাছওয়ালাকে দিয়ে তার বেশ স্বস্তি হয়। তার ছেলে ইলিশ ভালবাসে। আজ খুব খুশি হবে।

কেষ্টপুরের জামাইবাবু

ভেবেছিলুম আমাদের জন্য কেউ থাকবে স্টেশনে। জয়দীপ আর আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে এ দিক ও দিক তাকাতে লাগলুম। অবশ্য আমাদের যদি কেউ নিতেও আসে, সে আমাদের চিনবে কী করে? আমরা দুজনেই তো এই প্রথম এলুম ব্যাঁকা কেষ্টপুরে।

অবশ্য পেন্টুলন পরা যাত্রী শুধু আমরাই দুজন, আর বাকি সব ধুতি-লুঙ্গি-পায়জামা। সুতরাং আমরা একটু সাহেব-সাহেব ভাব করে থুতনি উঁচিয়ে রইলুম।

গেটে টিকিট নেবার জন্য কোনো কালো-কোট বাবু নেই, গেট দিয়ে কেউ যায়ই না, অন্য যাত্রীরা ডান দিক-বাঁ দিক-পেছন দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা, শুধু পাজামার ওপর ফতুয়া পরা একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক এক জায়গার দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে আর আমাদের দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছে।

জয়দীপ বলল, তা হলে ওই লোকটাই হবে।

এগিয়ে গেলুম সে দিকে। কাছাকাছি যেতেই লোকটা মুখটা ঘুরিয়ে নিল। জয়দীপ বলল, এই যে, শুনছেন!

লোকটা আবার মুখ ফেরাল। তারপর ভুরু উঁচু করল, তারপর কয়েক সেকেন্ড পজ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, মোশাইদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বর্ধমান থেকে ট্রেন বদলে ব্র্যাঞ্চ লাইনে এ দিকে আসতে হয়, সুতরাং এরকম প্রশ্ন স্বাভাবিক। তাই আমরা বললুম, কলকাতা থেকে।

লোকটি বলল, অ।

জয়দীপ ওর সুটকেসটা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তা কলকাতা থেকে হঠাৎ এখানে.........কোনো কারবার আছে বুঝি!

এ লোক আমাদের জন্য নয় বুঝতে পেরে জয়দীপ সুটকেসশুদ্ধু হাতটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে বলল, না, এমনিই....বেড়াতে।

লোকটি বলল, অ! তা কলকাতাতে এখন চটার দর কত চলছে?

আমি আর জয়দীপ চোখাচোখি করলুম। চটা জিনিসটা কী তাই-ই আমরা জানি না, তার দরের খবর জানাব কী করে? কিন্তু লোকটি এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যেন কলকাতার সব লোকেরই চটার খবর রাখা উচিত।

জয়দীপ আন্দাজে বলল, এখন দর বেশ তেজি!

লোকটি বলল, মাঝখানে একটু মন্দা গিয়েছিল না?

—হ্যাঁ, গত মাসে বেশ মন্দা ছিল, তারপরই আবার হু হু করে উঠতে লাগল......

—তবে কট্‌কার দর নিশ্চয় আরও অনেক চড়েছে....

জয়দীপ আবার আমার চোখের দিকে তাকাল। এবার আমি ওকে সাহায্য করার জন্য বললুম, ওরে বাবা, কট্‌কার যা দাম, তা তো ছোঁয়াই যায় না। ক'টা লোক কিনতে পারে!

এরকম কথাবার্তা আর বেশি চালানো যায় না বলে আমি জয়দীপের হাত ধরে টেনে রওনা দিলুম। আমাদের নিজেদেরই পৌঁছতে হবে।

বাইরে খান চারেক সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। চালকরা বিড়ি খেতে খেতে গল্প করছিল, আমাদের তারা প্যাসেঞ্জার হিসেবে পছন্দ করল না। তারা কেউ যেতে রাজি নয়, প্রত্যেকেরই নাকি সওয়ারি ঠিক করা আছে।

আমি বললুম, এখানকার রিকশা যে কলকাতার ট্যাক্সির মতন!

জয়দীপ একটু গোঁয়ার ধরনের। সে হার স্বীকার করতে চায় না কোথাও। সে একজনকে একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন, যাবে না কেন? আর তো কোনো প্যাসেঞ্জার দেখছি না।

একজন এবার অবহেলার সঙ্গে প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন?

—থানায়!

চারজন রিকশাচালক এবার একসঙ্গে হেসে উঠল। থানার নাম শুনলে যে কারুর হাসি পায় এই প্রথম দেখলুম।

একজন রিকশাচালক অন্যদের উদ্দেশ করে বলল, দারোগাবাবুর জামাই এসেছেন, রিকশা করে থানায় যাবেন। হে-হে-হে!

আমি বুঝতে পারলুম, জয়দীপের অ্যাপ্রোচটা ভুল হয়েছে। হুট করে কারুকে থানার কথা বলতে নেই। রিকশাচালকটি আন্দাজে কিন্তু প্রায় ঠিক কথা বলে ফেলেছে। আমরা কেউ দারোগার জামাই নই, কিন্তু এখানকার দারোগা জয়দীপের জামাইবাবু। ওরা ভেবেছে আমরা বুঝি ভয় দেখাবার জন্য থানার নাম বলেছি।

আমি মোলায়েম করে বললুম, ভাই আমরা দারোগাবাবুর আত্মীয়, আমাদের একটু থানায় পৌঁছে দিন না, যা ভাড়া লাগে দেব।

একজন রিকশাচালক বেশ মৌজ করে বলল, আজ অব্‌ধি কেউ এখানে এ স্টেশন থেকে রিকশা চেপে থানায় যায়নি। না কিনা?

অন্য একজন বলল, কানা-খোঁড়া হলেও কথা ছিল!

এদের সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। ব্যাঁকা কেষ্টপুরের লোকদের কথাও দেখছি ব্যাঁকা ব্যাঁকা। রিকশায় চেপে কেউ থানায় যায় না, ঠিক ভাড়া দিলেও?

মালপত্তর বেশি নেই, আমরা হেঁটেই চলে যাব।

জয়দীপকে বললুম, চল।

স্টেশনের বাইরে একটাই মাত্র দোকান, সেখানে পান-বিড়ি আর রসগোল্লা বিক্রি হয়। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলুম, ভাই, এখানকার থানাটা কদ্দূর?

সে হাত দেখিয়ে রাস্তার উলটো দিকের বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

এরকম একটা বিচ্ছিরি বাড়িতে থানা? একতলা একটা টালির চালের বাড়ি, বাইরে পুলিশের পাহারা-টাহারা কিচ্ছু নেই।

রাস্তা পার হয়ে সেদিকে যাবার সময় রিকশাওয়ালাদের খিক খিক হাসি শুনতে পেলেও আর সে দিকে তাকালুম না। না হয় স্টেশনের পাশেই থানা তা বলে থানা সম্পর্কে ওদের একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা নেই?

থানার ভেতরে ঢুকে মনে হল সেখানে শোকসভা বসেছে, একটা বড় টেবিলে বসে আছেন বড়বাবু, একটা মাঝারি টেবিলে বসে আছেন মেজোবাবু, আর যিনি শুধু একটা টুলের ওপর বসে আছেন তিনি নিশ্চয়ই ছোটবাবু। দু দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুখানা বেঞ্চিতে বসে আছে দুজন দুজন চারজন কনস্টেবল।

বড়বাবু একদৃষ্টে চেয়ে আছেন টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে। বেশ চকচকে নতুন টেলিফোন।

আমরা ঢুকতেই বড়বাবু যেন বেশ চমকে উঠে বললেন, কে? কী চাই?

জয়দীপ বলল, ছোটজামাইবাবু, আমরা! আপনি আমার চিঠি পাননি?

থানার বড়বাবুর পক্ষে ছোট জামাইবাবু হওয়াটা যেন ঠিক মানায় না। বড় জামাইবাবু হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু উনি বিয়ে করেছেন জয়দীপের ছোড়দিকে।

বড়বাবু বললেন, ও, জয়ন্ত!

—জয়ন্ত না, জয়দীপ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়দীপ। তোমার চিঠি পেয়েছি বইকী! তোমাদের তো বানপুর লোকালে আসবার কথা!

—সেই ট্রেনেই তো এলুম!

—বানপুর লোকাল তো কোনোদিন সাড়ে তিনটের আগে আসে না। এক একদিন সাড়ে পাঁচটা ছটাও হয়!

—আজ তা হলে রাইট টাইমে এসেছে। একটা চল্লিশই তো রাইট টাইম!

—আশ্চর্য ব্যাপার, বানপুর লোকাল রাইট টাইমে? বলো কি?

জয়দীপ বলল, স্টেশনের এত কাছে থানা, আপনারা ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পাননি?

বড়বাবু বললেন, ট্রেনের আওয়াজ শুনলেই যে সেটা বানপুর লোকাল হবে, তার কোনো মানে আছে? কোনোদিন যে ট্রেন ঠিক টাইমে আসে না.....তা যাক গে যাক......ভাল মতন এসে পৌঁছেছো এই যথেষ্ট......ইটি তোমার বন্ধু বুঝি? তা তোমরা ভেতরে যাও, আমি তো এখন ডিউটিতে আছি, উঠতে পারছি না। দরোয়াজা! সাহেবদের নিয়ে যাও!

বড়বাবুর কোয়ার্টার থানার পেছন দিকেই। একজন কনস্টেবল সেখানে পৌঁছে দিল আমাদের।

ছোড়দি ঘুমোচ্ছিলেন, আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, ওমা, তোরা এর মধ্যেই পৌঁছে গেছিস? আমি তো ভেবেছিলুম, বেলা গড়িয়ে যাবে! যা পোড়ার দেশ, কোনোদিন ঠিক সময়ে ট্রেন আসে না.....মুখ শুকিয়ে গেছে কেন, খেয়ে আসিসনি বুঝি?

আমরা আমতা আমতা করতে লাগলুম।

ছোড়দি বললেন, জামাকাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে নে. আমি তোদের পরোটা করে দিচ্ছি। মা কেমন আছে রে? কতদিন চিঠি পাই না—

কোয়ার্টারে তিনখানা ঘর, তার মধ্যে একখানা আমাদের জন্য আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছিলেন ছোড়দি। একটা বড় খাটে দুজনের বিছানা। জয়দীপ উঠোনের কুয়োতলায় স্নান করতে গেল, আমার অত চান করার বাতিক নেই, বিশেষত শীতকালে, তাই আমি গড়িয়ে পড়লুম বিছানায়।

একটি ছ-সাত বছরের মেয়ে আর একটি ন-দশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল খাটের পাশে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়লুম। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার একটা কায়দা আছে, কেউ কেউ পারে, কেউ পারে না।

আমি প্রথমে তাদের নাম জিজ্ঞেস করলুম। তারপর কোন্ ইস্কুলে পড়ো, কোন্ ক্লাসে, আজ ইস্কুলে যাওনি কেন.....এই ক'টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরই আমার স্টক ফুরিয়ে গেল। আর কিছু মনে পড়ছে না।

ছেলেটির নাম চিররঞ্জন আর মেয়েটির নাম অম্বাপালিকা। আমার প্রশ্নের তারা কাটাকাটা উত্তর দেয়। আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

আমি চুপ করতেই ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, আমাদের জন্য কী এনেছ?

মেয়েটি বলল, আমাদের জন্য কলকাতার চকলেট আনোনি?

লজ্জায় আমার একেবারে কুঁকড়ে যাবার মতন অবস্থা। ছি, ছি, ছি, জয়দীপের ছোড়দির যে দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে, তা আমার আগে মনেই পড়েনি! সত্যিই তো, ওদের জন্য কিছু আনা উচিত ছিল। জয়দীপ কি কিছু এনেছে? ওর বাড়ি থেকে আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি, পথে তো ওকে কিছু কিনতে দেখিনি। তবে জয়দীপের মা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাঠিয়েছেন নাতিদের জন্য।

সময় নেবার জন্য আমি বললুম, হ্যাঁ, আনা হয়েছে, মানে তোমাদের জয়দীপ মামার সুটকেসে আছে, সে আসুক—

—কোনটা ছোটমামার সুটকেস?

একটু আগেই জয়দীপ তার সুটকেস খুলে তোয়ালে বার করে নিয়ে গেছে। ডালাটা খোলা। ছেলেমেয়ে দুটি ঝাঁপিয়ে পড়ে সুটকেসটা একেবারে তছনছ করে দিল।

জয়দীপের মা নাতি-নাতনির জন্য প্যান্ট আর ফ্রক পাঠিয়েছেন।

ছেলেটি বলল, কই, চকলেট নেই তো? লজেঞ্চুসও নেই!

মেয়েটি বলল, তোমার বাক্স কোন্‌টা?

আমি সুটকেস আনিনি, একটা বড় হ্যান্ডব্যাগ, তাতে তালা-ফালা কিছু নেই। হ্যান্ডব্যাগটা খাটের নীচে রাখা ছিল, ওরা সেটা বার করে টেনে খুলে শুরু করে দিল ঘাঁটাঘাঁটি।

এইসময় জয়দীপ এসে পড়ায় আমি বাঁচলুম।

জয়দীপ বলল, এই হাঁদু আর কাঁদু, তোরা কেমন আছিস রে?

আমি বললুম, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে। বাচ্চাদের জন্য টফি বা চকলেট কিছু আনা উচিত ছিল।

জয়দীপ লজ্জা পেল না। সে বলল, হ্যাঁ, আনা হয়নি বটে.....ঠিক আছে, এখান থেকে কিনে দেব।

—এখানে চকলেট পাওয়া যায় না।

—আমরা তো যাব সিউড়ির দিকে, সেখানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে নিয়ে আসব।

তারপর ভাগনে-ভাগনীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে জয়দীপ বলল, এই কাঁদুকে কিন্তু খুব সাবধান। কখন যে কাঁদতে শুরু করবে তার ঠিক নেই। একবার মেজবৌদি বলেছিলেন, কাঁদুকে ঠিক পুতুলের মতন দেখতে। তাই শুনেই ও হাত-পা ছুঁড়ে কী কান্না, কেউ থামাতে পারে না.....কী রে, তুই এখনো সেই রকম ছিঁচকাঁদুনে আছিস?

হাঁদু বলল, হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। ও কাঁদে, আমি কাঁদি না।

একটু বাদে জয়দীপ যেই রান্না ঘরে ছোড়দির সঙ্গে গল্প করতে গেছে, অমনি ছেলেমেয়ে দুটো আবার খাটের দুপাশে এসে উপস্থিত।

হাঁদু বলল, এখানে ছানার গজা পাওয়া যায়।

কাঁদু বলল, পয়সা না দিলে দেয় না। তিরিশ পয়সা দিলে একটা দেয়।

হাঁদু বলল, তোমার কাছে পয়সা আছে?

ছোট ছেলের হাতে টাকা পয়সা দেওয়া উচিত নয় বলে আমি বললুম, ওই স্টেশনের পাশের দোকানটায় তো? আমি বিকেলে কিনে এনে দেব।

হাঁদু বলল, আমরাও কিনে আনতে পারি। পয়সা দাও!

ততক্ষণে কাঁদু আলনায় ঝোলানো আমার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি হা-হা করে উঠতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে পড়ল, এ মেয়ে ছিঁচকাঁদুনে। এ যদি এখন ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে তা হলে আমি নাজেহালের একশেষ হব!

ভাগ্যিস জামার পকেটে দুটো টাকা আর আট দশ আনার বেশি পয়সা ছিল না। সেই সব পয়সা চেটেপুটে নিয়ে দুই ভাইবোন একছুটে বেরিয়ে গেল।

এ যে বর্গির এলাকায় এসে পড়লুম দেখছি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিষয়ে বাবা-মায়ের কাছে নালিশ করা চলে না। জয়দীপকেও কি বলা যায়?

একটু পরে খাবারের ডাক এল।

মেঝেতে আসন পেতে ছোড়দি আমাদের পরোটা আর বেগুন ভাজা দিলেন। বেশ খিদে পেয়েছিল, সবে খেতে শুরু করেছি, এর মধ্যে ছোট জামাইবাবু এসে উপস্থিত।

—ঘিয়ের গন্ধ পেলুম! ঘি দিয়ে পরোটা ভেজেছ, ঘি কোথায় পেলে!

ছোড়দি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, সে যেখানেই পাই না কেন? তুমি তো আর জোগাড় করে দেবে না!

—খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ! এর তো অনেক দাম! টাকা কোথায় পেলে? নিশ্চয়ই তোমার কাছে লুকোনো টাকা ছিল!

—থাকলেই বা, তাতে তোমার দরকার কী!

—কাল এক প্যাকেট সিগ্রেট কেনার জন্য তোমার কাছে পয়সা চাইলুম, তুমি দিলে না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দারোগাবাবু পায়ে বুট জুতো এবং কোমরের বেল্টে বাঁধা রিভালবার সমেত মেঝেতে বসে পড়ে বললেন, দাও, আমায় দুখানা দাও, অনেকদিন খাঁটি ঘিয়ের জিনিস খাইনি। আজ তবু শালার দৌলতে......।

ছোড়দি বললেন, দুখানার বেশি পাবে না। এই তো কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছ!

ছোট জামাইবাবুর শরীরটা গামা পালোয়ানের মতন না হলেও তার তিন-চতুর্থাংশ বলা যায়। দারোগাবাবুদের চেহারা একটু ভারিক্কি না হলে মানায় না।

দুখানা পরোটা এক সঙ্গে নিয়ে তার মধ্যে দুখানা বেগুনভাজা নিয়ে মুড়ে রোল বানিয়ে ছোট জামাইবাবু প্রায় চোখের নিমেষে শেষ করে বললেন আর দুখানা দেবে না?

ছোড়দি বললেন, ওই তো তোমার দোষ। ও বেচারিরা না খেয়ে এসেছে...

—হাঁদু-কাঁদু কোথায়, তাদের তো দেখছি না?

হাঁদু আর কাঁদু যে কোথায় তা একমাত্র আমিই জানি। কিন্তু এখানে আমার কিছু বলা শোভা পায় না।

ছোড়দি বললেন, আছে কোথাও এ দিকে ও দিকে। ওরা তোমার মতন অত লোভী নয়। পরোটা দিলেও খেত না......দুপুরে পেট ভরে খেয়েছে.....। হ্যাঁ, শোনো, আজ কিন্তু ও বেলা মাছ আনতে হবে, দীপু আর নীলু এই প্রথম এসেছে, আজ তো ছোট গোলোকপুরে হাট আছে, না?

ছোট জামাইবাবু বললেন, মাছ? অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, ওরা এসেছে, মাছ তো আনাতেই হবে, তোমার লুকোনো টাকা থেকে কিছু দিও—

—মাছ কেনার টাকাও আমায় দিতে হবে?

কথাবার্তা একটু অপ্রিয় দিকে চলে যাচ্ছে দেখে কথা ঘোরাবার জন্য জয়দীপ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ছোট জামাইবাবু, চটা আর মটকা মানে কী?

আমি সংশোধন করে দিয়ে বললুম, মটকা নয়, কটকা।

দারোগাবাবু অবাক হয়ে চোখ গোল করে তাকালেন আমাদের দুজনের দিকে। তারপর বললেন, এ আবার কী রকম প্রশ্ন, ভাই? আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, চংক্রমণ কিংবা অকৈতব মানে কী, তোমরা বলতে পারবে? এ তো লোক ঠকানো প্রশ্ন?

জয়দীপ বললেন, না, না, সে জন্য বলিনি। স্টেশনে একটা লোক জিজ্ঞেস করল কিনা, কলকাতায় চটা আর কটকার দর কত.....

—স্টেশনে একটা লোক? কী রকম চেহারা বলো তো? বেশ লম্বা-চওড়া, ডান হাতে রুপোর তাগা?

—চেহারা ওই রকমই, তবে হাতে রুপোর তাগা ছিল কি না লক্ষ করিনি।

—মাথায় অল্প টাক?

—হ্যাঁ।

—হলদে ফতুয়া?

—তাও ঠিক।

—ও তো দাসু! ও শালা তো নামকরা ডাকাত!

আমি আর জয়দীপ দুজনেই চমকে উঠলুম। জলজ্যান্ত একটা ডাকাত দিন-দুপুরে রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে! আগে জানলে আর একটু ভাল করে দেখে নিতুম। এর আগে আমি কোনো ডাকাতকে স্বচক্ষে দেখিনি।

জয়দীপ বললে, লোকটা ডাকাত? আপনারা ওকে ধরবেন না?

ছোট জামাইবাবু বললেন, ব্যাটা মহা ধড়িবাজ! ওকে ধরা কি সহজ!

—বুঝলুম না ঠিক। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু তাকে ধরতে পারছেন না কেন?

—হারামজাদা কি কম শয়তান! আমার সঙ্গে চালাকি করবার জন্য গত তিন বছরের মধ্যে একটাও কেস করেনি! সেই আমি এখানে বদলি হওয়া এস্তক! সবাই জানে ও ব্যাটা এক নম্বরের ডাকাত, এখন যেন একেবারে সাধু হয়ে গেছে!

আমি একটু রসিকতা করবার জন্য বললুম, সব ডাকাতদেরই মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল থাকে। ওর মাথায় টাক পড়ে গেছে বলেই বোধহয় ও ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে।

আমার রসিকতা দারোগাবাবুর পছন্দ হল না। তিনি হতাশভাবে বললেন, চোর-ডাকাতরা যদি চুরি-ডাকাতি বন্ধ করে তা হলে আমরা কোথায় যাই বলো তো? ওই দাসু হারামজাদা যে ডাকাতি ছেড়ে দিল, ও এখন সংসার চালাচ্ছে কী করে তাই বা কে জানে।

ছোড়দি বললেন, আর আমি যে কী করে সংসার চালাচ্ছি, তাই-ই বা ক'জন বোঝে? দু-আড়াই বছর ধরে একটা কেস নেই, এতে সংসার চালানো যায়? থানা না যেন নাটমন্দির, বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে!

দারোগাবাবু বললেন, একটা খুন পর্যন্ত হয় না! আমি কী করব বলো, রাধু হালদারকে দাসু ভুঁইমালির এগেনস্টে কত করে তাতালুম, তা পরশু দিন রাধু এসে কী বলল জানো? বললে স্যার, আমি দাসুকে ক্ষমা করে দিয়েছি! একেবারে চৈতন্য অবতার!

আলোচনা আর বেশিদূর গড়াল না। এই সময় একজন কনস্টেবল মহা উত্তেজিতভাবে দৌড়ে এসে খবর দিল, স্যার, টেলিফোন বেজেছে, টেলিফোন, স্যার, এক্ষুনি আসুন।

টেলিফোন! বলেই জামাইবাবু অতবড় চেহারাটা নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তড়িৎ গতিতে ছুটে গেলেন।

জয়দীপ ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করল, খুব জরুরি কল আসবার কথা আছে বুঝি?

ছোড়দি বললেন, ছাই! গত তিন মাস আগে টেলিফোনটা বসিয়ে দিয়ে গেছে, এই প্রথম বাজল!

ছোট জামাইবাবু ফিরে এসে বললেন, রং নাম্বার! চাল কলের নাড়ু দাসকে চাইছে। দাও, আর একখানা পরোটা আর বেগুন ভাজা দাও।

হাঁদু আর কাঁদুও ফিরে এল এই সময়। হাত ফাঁকা। কেউ সদ্য কোনো জিনিস খেয়ে এলে মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। অন্তত আমি ঠিকই বুঝতে পারলুম যে আড়াই টাকার ছানার গজা ওরা বাইরে বসেই সাবাড় করে দিয়ে এসেছে।

আমাদের খেতে দেখে ওরা হুড়মুড়িয়ে এসে মায়ের দুপাশে বসে পড়ে বলতে লাগল, আমাদেরও দাও! আমাদের পরোটা দাও!

ব্যাঁকা কেষ্টপুরের মতন এমন শান্তিপূর্ণ জায়গা আর হয় না। একেবারে রাম-রাজ্য বললেও চলে। খুন বা ডাকাতি তো দূরের কথা, এখানে সামান্য ছিঁচকে চুরি পর্যন্ত হয় না। কেউ অন্যের বউকে ফুসলে নিয়ে পালায় না, অপরের জমিতে কেউ জোর করে ধান কাটে না।

এই তল্লাটে সবাই খুব সুখী। একমাত্র থানার বড়বাবু এবং তাঁর অধস্তন কর্মচারী ক'জনের, পরিবারই অতি কষ্টে রয়েছে। কনস্টেবল চারজন রোগা হয়ে গেছে একেবারে, তাদের গলার আওয়াজ চিঁচিঁ করে। এস আই, দুজনের মধ্যে একজন কীর্তন গান করে মনের দুঃখ ভুলে থাকে আর একজন সর্বক্ষণ গুম, যেন কথা বলতেই ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু সে রোষকষায়িত লোচনে বড়বাবুর দিকে তাকায়। যেন বড়বাবুই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী।

অথচ বড়বাবুর অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। সামান্য টাকা মাইনে, তাতে কি এতবড় সংসার চলে? ছেলেমেয়ের পড়াশুনো, বউয়ের শাড়ি-গয়না, লাইফ ইনসিওরেন্স, ভাল-মন্দ খাওয়া, ডাক্তার-কবরেজ এ সব মেটাতে গিয়েই মাসের মাঝখান থেকে টানাটানি। কাজকর্ম নেই বলে বড়বাবু এ-বছর থেকে কোয়ার্টারের সামনের উঠোনে আলু-বেগুনের চাষ শুরু করেছেন। যতদূর বুঝতে পারলুম, এ বাড়িতে মাছ-মাংস খুব কম আসে, আমরা এসেছি বলে ছোড়দি আধুলি জমাবার মাটির ভাঁড়টা ভেঙেছেন। এই লজ্জাতেই বোধহয় ছোড়দি গত তিন বছরে একবারও বাপের বাড়ি যাননি।

পাশের থানা রাধিকাপুরেই তো কত রবরবা। খবরের কাগজে রাধিকাপুরের প্রায়ই নাম বেরোয়। জোতদার-খুন, নাবালিকা-ধর্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষকের কানকাটা, পোস্ট-অফিসে ডাকাতি, পুকুর চুরি এরকম কত কী লেগেই আছে। রাধিকাপুরে বড় বড় কাগজের রিপোর্টার আসে, পুলিশের বড় কর্তারা আসে, এমনকি মন্ত্রীরাও আসে। এ জন্য রাধিকাপুরের লোকদের কত গর্ব। দু-এক মাস একটু ঝিমিয়ে পড়লেই রাইফেল লুট কিংবা হরিজন বস্তিতে আগুনের মতন রোমহর্ষক কিছু আবার ঘটিয়ে দেওয়া হয়। আবার মন্ত্রী ও রিপোর্টারদের আগমন, আবার কাগজে বড় বড় অক্ষরে নাম।

সেই তুলনায় ব্যাঁকা কেষ্টপুরের নাম কেউ জানে? একেবারে ম্যাড়মেড়ে, নিরীহ জায়গা, কোনো ঘটনা নেই। জয়দীপের ছোট জামাইবাবুর ধারণা, এ সবই তাঁকে জব্দ করবার জন্য এখানকার লোকদের ষড়যন্ত্র। জায়গাটা তো বরাবর এরকম ছিল না, এক সময় ব্যাঁকা কেষ্টপুরও টগবগে, তেজি ছিল, ছুরি-ছোরা রক্তারক্তির কারবার হত, তখন এখানে থানা ছিল না, পাশের থানা এত বড় এলাকা সামলাতে পারত না বলেই বছর তিনেক আগে নতুন থানা বসেছে। ব্যাস, অমনি সবাই ঘাপটি মেরে সাধু সেজে বসে আছে।

শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এরা থানার সঙ্গে ফেরেব্বাজিও করে।

এই তো গত মাসেই একজন লোক চুপি চুপি এসে বড়বাবুকে খবর দিয়ে গিয়েছিল, স্যার আজ সন্ধেবেলা হরি মণ্ডলের বাড়ি লুট হবে।

তাই শুনে মহা উৎসাহে বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু আর কনস্টেবলরা অর্থাৎ গোটা থানাই পুরো দস্তুর সাজগোজ করে গিয়ে হরি মণ্ডলের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে রইল। সন্ধেবেলা দলে দলে লোকও ধেয়েও এল সে বাড়ির দিকে, চিৎকার চ্যাঁচামেচিও শোনা গেল। তারপর বড়বাবু যেই সদলবলে সেখানে হানা দিলেন, অমনি ব্যাটাদের কী হাসি, কেউ কেউ গড়াগড়ি দিতে লাগল মাটিতে।

হরি মণ্ডলের বাড়িতে সে দিন হরির লুট। প্রথম নাতি হয়েছে বলে হরি মণ্ডল ফুটকড়াই আর বাতাসা বিলোচ্ছে। দারোগাবাবুরাও কয়েকখানা বাতাসা খেয়ে ফিরে এলেন।

রাধিকাপুরের থানার বড়বাবুর তিন নম্বর ছেলের পৈতেতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন ছোড়দিরা। সেই গল্প শোনালেন ছোড়দি।

—জানিস, সে কী এলাহি ব্যাপার! অন্ততশ' পাঁচেক লোক এসেছে, অথচ একটা পয়সা খরচা নেই। কেউ দিয়েছে মাছ, কেউ দিয়েছে দই-মিষ্টি, কেউ দিয়েছে মুরগি, ওখানে তিন তিনটে চালের কল, চাল-ডালের তো কোনো ভাবনাই নেই। উঠোনে দেখলুম তিনটে ছাগল বাঁধা, ওগুলোও একজন দিয়েছে, কিন্তু একস্ট্রা হয়েছে, অত মাংস কে খাবে? তোদের জামাইবাবু আজ অবধি আমাকে একটা সিল্কের শাড়ি কিনে দিলে না, অথচ ও থানার বড়বাবুর গিন্নি নাইলন জর্জেট ছাড়া পরেই না। আমায় হ্যাটা করার জন্য মুক্তোর সেট দেখাল। তিনটে রিস্টওয়াচ। ওর ছেলেমেয়েদের মুখে নাকি সন্দেশ রসগোল্লাও রোচে না। বলে কিনা কেক চাই!

—রাধিকাপুরে কেক পাওয়া যায়?

—না পাওয়া গেলেই বা, লোকে সিউড়ি থেকে নিয়ে আসে। খাতিরের যোগ্য লোক তাই সবাই খাতির করে। পরেশ হালদারের সঙ্গে ডি এস পি, এস পি-র পর্যন্ত দহরম মহরম। প্রায়ই সদরে ডাক পড়ে। তাদের জামাইবাবুকে কে পোঁছে? কেউ নয়!

—জামাইবাবু ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা করেন না?

—করবে না কেন? চেষ্টা করে করে তো হেদিয়ে গেল। কেউ কানে তোলে না ওর কথা।

আমি বললুম, ছোট জামাইবাবু নিজের এলাকা এতদিন শান্তিপূর্ণ রেখেছেন, এটা ওঁর কৃতিত্বও তো বটে। সেইজন্যই গভর্নমেন্ট ওঁকে এখান থেকে সরাতে চায় না।

ছোড়দি মুখ নাড়া দিয়ে বললেন, কৃতিত্ব না ছাই! এই থানার কথা ভুলেই গেছে ওপরওয়ালারা। বড় বড় দু-একটা কেস এলে তবে না নাম হয়! রাধিকাপুরের পরেশ হালদারের প্রথম নাম ছড়াল কিসে জানিস! চৌধুরীরা ওখানকার পুরনো জমিদার বংশ, এখনো দু-তিনটে মাছের ভেড়ি আছে, সেই বাড়ির এক ছেলে খুনের মামলায় জড়াল। একটা খুন না, জোড়া খুন!

জয়দীপ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে পড়েছিলুম বটে। হাইকোর্টেও কেস উঠেছিল।

—শেষ পর্যন্ত সেই জমিদারের ছেলে বেকসুর খালাস পেল আর পরেশ হালদারেরও আঙুল ফুলে কলাগাছ হল। লোকে বুঝল যে, হ্যাঁ, ক্ষমতা আছে বটে দারোগার, অতবড় মামলার আসামিকেও খালাস করতে পারে। আর তোমার জামাইবাবু? আগে যে থানায় ছিলুম, সেখানে এক পার্টি ওয়ার্কারকে ধরে একটা ফালতু খুনের দায়ে চালান করে দিল! গ্রামের লোক ভাবল দারোগাবাবুর কোনো মুরোদ নেই। পার্টির লোকেরাও চটল, এস পি সাহেব ডেকে বললেন,

চুরি-ডাকাতির বদলে এ দিকে তোমার নাক-গলানো কেন! ব্যাস, করে দিল এই পচা জায়গায় ট্রান্সফার! তোদের জামাইবাবুর ঘটে তো এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই। এর চেয়ে আমি দারোগা হলে ঢের ভাল কাজ চালাতে পারতুম!

জয়দীপ বলল, এখানে চুরি-ডাকাতি না-ই বা হল। এমনিই দু-চারটে লোককে ধরে মাঝে মাঝে চালান করে দিলে হয় না? দু-চারদিন জেলে থাকলে ঠিকই ও সব শিখে যাবে। একটু ট্রেনিংও তো দরকার।

ছোড়দি বললেন, তার কি উপায় আছে এখানে। একবার হাটের দিনে একটা ছোঁড়া একজন পেয়ারাওয়ালার কাছ থেকে দুটো পেয়ারা নিয়ে পালিয়েছিল। তাকে ধরে নিয়ে এসে রাখা হল থানায়। ওমা, একটু পরেই একদঙ্গল মানুষ এসে উপস্থিত, সঙ্গে সেই পেয়ারাওয়ালা। সে এক ধামা পেয়ারা নামিয়ে রেখে বলল, ওকে ধরবার কী এক্তিয়ার আছে আপনাদের? ইচ্ছে হয়েছে, ছেলেটা খাক না যত খুশি পেয়ারা। যদি লাগে তো আরও এক ধামা দেব! তবেই বোঝ! ব্যাঁকা কেষ্টপুরের মানুষগুলো একেবারে হাড়-বজ্জাত!

তিন-চারদিন থেকেই আমি জয়দীপের ছোড়দির বাড়ির নিরানন্দ পরিবেশে একেবারে হাঁপিয়ে উঠলুম। এ দিকে আমারও নিরানন্দ হবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আমার দুটো কলম হাত-সাফাই হয়ে গেছে, তিনটে রুমাল অদৃশ্য, প্যান্টের বেল্ট খুঁজে পাচ্ছি না, বুট জুতোর ফিতে নেই, পকেটে খুচরো পয়সা রাখলেই হাওয়া। পারতপক্ষে আমি হাঁদু আর কাঁদুর সঙ্গে একা থাকতে চাই না, কিন্তু ওরা ঠিক সুযোগ খুঁজে নেয় আর ফিসফিস করে আমাকে নানান কুপ্রস্তাব দেয়। একদিন মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে গোপনে হাঁদুকে একটা রাম চিমটি দিতেই কাঁদু এমন জোরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল যে তক্ষুনি ওকে চুপ করবার জন্য আমার দুটো টাকা খসাতে হল।

যতদূর বুঝতে পারছি, গোটা ব্যাঁকা কেষ্টপুরে দুষ্কৃতকারী বলতে এই দুজনই আছে, কিন্তু তাদের গ্রেফতার করবার কোনো উপায় নেই।

ছোট জামাইবাবু একদিন আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল, রাস্তার লোকজনরা আমাদের দেখে আড়ালে মুচকি মুচকি হাসছে। সামনা-সামনি অবশ্য কেউ কিছু বলে না। দারোগাকে দেখে কেউ শরীর বাঁকিয়ে নমস্কার পর্যন্ত করে না। এ সত্যি বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

এক একজন লোকের দিকে চোরা ইঙ্গিত করে ছোট জামাইবাবু বলেছিলেন, ওই লোকটাকে দ্যাখ, চোখের চাউনিটাই চোর চোর নয়? ও ব্যাটা নির্ঘাত চোর, কিন্তু সাধু সেজে আছে। আর ওই লোকটার গোঁফ দেখেছিস? ওই রকম লোকেরা বরাবর পরের বউদের ফুঁসলে এসেছে, আমি মানুষ চিনি। কিন্তু তোরা গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ, একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। এ-সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!

ছোট জামাইবাবুর খুব ভরসা ছিল দাসু ডাকাতের ওপর। সে এ-পর্যন্ত ছবার ডাকাতি করে মাত্র একবার ধরা পড়ে ছ বছর জেল খেটেছে। একবার জেল খাটলেই আগের অপরাধগুলো তামাদি হয়ে যায়। এখন ওর চুপচাপ থাকবার কোনো মানে হয়? যে ছবার ডাকাতি করেছে, সে কি ইচ্ছে করলে সাতবার পারে না?

সে-সব না করে দাসু থানার সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়।

আমরা থাকতে থাকতেই ভগবান বোধহয় ছোট জামাইবাবুর কাতর প্রার্থনা শুনে দাসুকে সুমতি দিলেন।

একজন কনস্টেবল পাকা খবর এনে দিয়েছে, গত দুদিন ধরে দাসুকে নাকি দেখা গেছে সন্ধের পর চুপি চুপি একটা শাবল হাতে নিয়ে গ্রামের এক প্রান্তের একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকতে। নিশ্চয়ই সেখানে তার ডাকাতির মাল লুকোনো আছে। আজ সন্ধেবেলাতেও একটু আগে সে সেখানে ঢুকেছে।

ছোট জামাইবাবু ধড়া-চুড়ো পরে রেডিই ছিলেন, তক্ষুনি নিজের বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। আমি আর জয়দীপ সঙ্গে যাবার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিলুম, কিন্তু ছোট জামাইবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। এরকম গুরুত্বপূর্ণ গভর্নমেন্ট ডিউটিতে ছেলেমানুষি চলে না!

পুরো বিবরণটি আমরা পরে জেনেছিলুম।

ছোট জামাইবাবু আগে পুরো বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেললেন সেই পোড়ো বাড়িটা। তারপর এক হাতে রিভলভার, এক হাতে টর্চ নিয়ে তিনি নিজে একা ঢুকলেন বাড়ির মধ্যে। টর্চের আলোয় দেখলেন, সেখানে সত্যি অন্ধকারের মধ্যে একা বসে আছে দাসু। একটা পেয়ারা গাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে বসে হাঁটু দোলাতে দোলাতে বিড়ি টানছে।

ছোট জামাইবাবু বললেন, হ্যান্ডস্ আপ্। হাতে যা আছে ফেলে দাও, আমায় গুলি চালাতে বাধ্য কোরো না দাসু!

দাসু বলল, আসুন বড়বাবু, আসুন! ভাবছিলুম বুঝি আপনার দেরি হবে। এখানে বড্ড মশা!

—তুমি এখানে কী করছ দাসু?

—আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি বললুম যে! আমি লোক লাগিয়েছিলুম, যাতে ঠিক সময়ে আপনার কানে খপর তোলে।

—চালাকি কোরো না, দাসু। তুমি পরের বাড়িতে ট্রেসপাস করেছ, তোমায় আমি গ্রেফতার করতে বাধ্য।
—তা তো করবেনই। আপনার সঙ্গে কি মসকরা করবার জন্য এখানে ডেকে এনেছি!
—তোমার যা পাস্ট রেকর্ড, তাতে তোমার হাতে হাত-কড়াও পরাতে হবে।
—তা যদি ইচ্ছে হয়, পরান!
—মালপত্তর কোথায় রেখেছ?
—মালপত্তর? এর মধ্যে আবার মালপত্তরের কথা এল কোথা থেকে?
—তুমি এমনি এমনি এখানে এসেছ? শাবল এনেছো সঙ্গে?
—শাবল এনেছি.....এখানকার ঝোপঝাড়ে গন্ধবাদালির গাছ আছে শুনেছিলুম। আমার গন্ধবাদালির শেকড় দরকার, কিছুদিন ধরে পেটটা ভাল যাচ্ছে না।
—ফের চালকি? আমি কিন্তু তোমায় টর্চার করে পেট থেকে কথা আদায় করব।
—পেটে কথা থাকলে তো আদায় করবেন! বললুম না পেট খারাপ। নিন চলুন!
—তুমি হয় এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছ, অথবা তোমার ডাকাতির মাল এখানে কোথাও পুঁতে রেখেছ!
—গুপ্তধন আছে নাকি এখানে? তা হলে আসুন, আপনাতে-আমাতে দুজনে মিলে খুঁজি।
ছোট জামাইবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। কোথাও কোনো খোঁড়াখুড়ির চিহ্ন নেই। সরকারদের এই বাড়িটা প্রায় বছর দশেক ধরে এরকম জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কোনো ঘরের দরজা-জানলা নেই, বারান্দায় পর্যন্ত আগাছা। এখানে সাপ-খোপ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়।
ছোট জামাইবাবু গর্জন করে বললেন, লায়ার! তুমি যে বললে গন্ধবাদালির শেকড় খুঁজতে এসেছ, তা-ই বা খুঁড়েছ কোথায়?
দাসু বলল, পরে ভাবলুম, অত ঝঞ্ঝাট দরকার কী, সিউড়িতে যাচ্ছিই যখন, ওখানে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাব।
—সিউড়ি যাচ্ছ মানে?
—বাঃ, আমাকে ধরার পর আপনি সদরে চালান করবেন না? চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখলে আপনিই ফ্যাসাদে পড়বেন।
—সদরে তো পাঠাবই। তোমায় এমন কেসে জড়াব যে জেলের ঘানি তোমায় ঘোরাতেই হবে।
—আজকাল আর জেলে গেলে ঘানি ঘোরাতে হয় না। অন্তত সিউড়ি জেলে সে ব্যবস্থা নেই, সেটা আমি ভালই জানি।
—তুমি তা হলে জেলেই যেতে চাও?
—আজ্ঞে হ্যাঁ।
—কেন?
—সে আমার ব্যাপার আছে। আপনি আপনার কাজ করুন।
ছোট জামাইবাবু টর্চ নিভিয়ে কাছে এসে দাসুর কাঁধে হাত রেখে গাঢ় গলায় বললেন, শোনো দাসু, তুমিও আমায় একটু দ্যাখো, আমিও তোমায় দেখি। এসে পড়েছি যখন, তোমায় গ্রেফতার তো আমায় করতেই হবে। আবার আমিই ইচ্ছে করলে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি। কি, পারি কি না বলো? তুমি দেখতে চাও, আমি তোমায় ছেড়ে দিতে পারি কি না?
—কী মুশকিল, আমি তো ছাড়া পেতে চাইছি না এবারে। আমায় সিউড়ি জেলে পাঠিয়ে দিন।
—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। তুমি নিরপরাধ, তোমায় কেন জেলে পাঠাব? আমি শুধু বলছি, একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে। তোমায় না হয় হাতকড়া দিয়ে ধরেই নিয়ে গেলুম থানায়। তুমি ইদানীং কোন্ পার্টির সঙ্গে আছ, সেটা বলো, আমি পার্টি অফিসে খবর পাঠাই, তারা এসে তোমায় ছাড়িয়ে নিয়ে যাক। তাতে তোমারও নাম হল, আর আমারও তো একটু পার্টির নেকনজরে আসা চাই!
—পার্টি-ফার্টি কী বলছেন। ও সব ঝক্কি ঝামেলায় আমি নেই। দু-চার দিনের জন্য একটু জেলে যাব, তার জন্য আবার অত!
—দু-চার দিনের জন্য জেলে যাবে? মুখের কথা বললেই হল! জেলে যাওয়া অত সোজা? ঠিক মতন কেস সাজাতে না পারলে হাকিম তোমায় তো খালাস দেবেনই, উলটে আমাদেরও বকুনি দেবেন। বামাল কোথায়?
—বামাল আবার কোথায় থাকবে? দেখছেন, কতদিন হল হাতে কোনো কাজকম্ম নিইনি।
—তা হলে জেলে যেতে চাইছ কেন? বাড়িতে ভাত জুটছে না?

—আসল কথাটা তা হলে বলি, শুনুন। সিউড়ি জেলে আমার মেজো ভায়রা আছে, তার সঙ্গে গোটা কতক ব্যাপারে আমার পরামর্শ করার দরকার। সাতদিন কিংবা এক মাসের জন্য আমায় ঠুসে দিন।

—ঠুসে দেব? অমনি অমনি?

—তা হলে আর কী করতে হবে, বলুন না ছাই?

—উঠোনে গর্ত খোঁড়োনি, মালপত্তরও ছড়িয়ে রাখোনি! হাকিমদের মেজাজের কথা বললুম না? অন্তত দু-চারবার চ্যালা সঙ্গে নিয়ে মশাল জ্বেলে হইহই করে ছুটে আসতেও তো পারতে—।

—তা হলে তাদের আবার মজুরি দিতে হবে। ও সব খরচ-খরচার মধ্যে আমি নেই।

—তা হলে অন্তত আমার রিভলবারটা কেড়ে নাও! কিছু একটা করো। আমি তোমায় হেল্‌প করব, আর তুমি আমার জন্য কিচ্ছু করবে না?

—না, না, না। ও-সব আমি পারব না। কিসে কী হয়ে যায় বলা যায় না, এক মাসের বদলে যদি দু-বছর ঠুকে দেয়? তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

—তুমি কি তা হলে কিছুই করবে না? এই তোমার উচিত হল?

—ভাল জ্বালা। আমি সেধে ধরা দিচ্ছি, তার ওপর আপনি বায়না ধরেছেন এটা করো, সেটা করো।

এই সময় মেজোবাবু মুখ বাড়িয়ে বললেন, স্যার, স্যার, বড্ড দেরি করে ফেললেন! গ্রামের লোক খবর পেয়ে বাইরে এসে জমায়েত হয়েছে। তারা জানতে চাইছে, কোন্ দোষে দাসুকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে।

বড়বাবুর আগেই গলা ধরে এসেছিল, এবারে আর সামলাতে পারলেন না। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বললেন, এবারেও হল না। আমার কপাল! সবই আমার কপাল! কেউ আমার ভাল চায় না, কেউ আমার জন্য চিন্তা করে না....।

দাসু পর্যন্ত বিচলিত হয়ে বলল, এ কি বড়বাবু, আপনি কাঁদছেন! আরে রাম, আপনি ব্যাটাছেলে হয়ে......শুনুন, আমার কথাটা......।

বড়বাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলতে চাই না, তোমরা সবাই বিশ্বাসঘাতক.......।

দাসু বলল, কী মুশকিল, আপনি অমন করে কাঁদলে......আচ্ছা দিন, আপনার মালটা দিন। না হয় আমার এক মাসের বদলে ছ-মাসই হবে, দেখবেন যেন তার বেশি না হয়......।

বড়বাবুর কাছ থেকে রিভলভারটা নিয়ে দাসু চলে এল বাইরে। সেখানে শ'খানেক গ্রামের লোক হল্লা শুরু করে দিয়েছে।

দাসু হাতটা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ভাইসব, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। দারোগাবাবু অন্যেয্য কিছু করেননি। আমাকে গ্রেফতার করার ওনার হক আছে। এই দেখুন আমি ওনার পিস্তল কেড়ে নিয়েছি, এই দেখুন আমি এবার দৌড়ে পালাচ্ছি—।

এরপর সে পুরোনো কালের মতন একটা হুংকার দিল, ইয়া হু! হা-রে-রে-রে।

তারপর ছুট লাগাল দাসু তার পেছনে পেছনে পুরো পুলিশবাহিনী।

দাসুই আগে এসে পৌঁছে গেল থানায়।

রিভলভারটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে ধপাস করে মেজোবাবুর চেয়ারে বসে পড়ে বলল, ওঃ, দম ছিটকে গেছে একেবারে, এতখানি রাস্তা.....কই, এক গেলাস জল খাওয়ান।

বড়বাবু ততক্ষণে চোখের জল মুছে ফেলেছেন। একগাল হেসে বললেন, শুধু জল কেন, ওরে, দাসুবাবুর জন্য ছানার গজা নিয়ে আয়, চা বসাতে বল, আজ এমন শুভদিন.....।

সর্বক্ষেপী

একটি পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। অনেক পাখি নয়, একটিই পাখি। জানলার বাইরে তন্দ্রার মতন কুয়াশা। সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি বোঝা যায় না। আর কোনোও প্রাণে সাড়া শব্দ নেই, শুধু ওই পাখির ডাক। যেন ওই একটি পাখিই জেগেছে।

ডাকটা অচেনা। টু-টু-টু! টু-টু-টু! অন্যদিন সাধারণ দোয়েল বা বুলবুলির ডাক শোনা যায় কিংবা ডাহুক। নতুন পাখিও তো আসে। পালঙ্ক থেকে নেমে রবি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। খালি গায়ে শোওয়া অভ্যেস, কিন্তু এখন ভোরের দিকে একটু শীত শীত লাগে। একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে নিল।

অনেক পাখি বেশ কাছাকাছি এসে পুচ্ছ নাচায়। দু-এক জাতের পাখি কিছুতেই দেখা দিতে চায় না। যেমন কোকিল, যেমন চোখ গেল। ডাক শোনা যায় ঘন পাতার আড়াল থেকে।

এ পাখিটাকেও দেখা গেল না। পর পর দুটো কদম গাছ, তার পরেরটা জামরুল। ডান পাশের বড় গাছটার সঠিক নাম জানা নেই, এ অঞ্চলে কেউ কেউ জারুল পাখিটা কোনোও একটা কদম গাছেই লুকিয়ে আছে মনে হয়।

নদীর ওপরে কুয়াশা দুলছে, তা যেন নদীর জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস। কয়েকটা অস্পষ্ট নৌকো। পূর্ব দিগন্তে এখনও রক্তিম আভা ফোটেনি।

কাল অনেক রাত জেগেছিল, এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলেও রবির শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতেই আরও বেশ তাজা ভাব অনুভব করল, এরপর আর বিছানায় ফিরে যাওয়ার কোনোও মানে হয় না।

কিছু ঠিক না করেই নীচে নেমে এল রবি। দোতলায় আর কেউ থাকে না। কিন্তু একতলায় পাঁচ-সাতজন শোয়। সবাই ঘুমন্ত। খুব সাবধানে, যেন কোনোও শব্দ না হয়, সদর দরজাটা খুলল রবি, সে কারও ঘুম ভাঙাতে চায় না।

সামনে একটা বাগান, গাছ ও ফুলগুলি শিশিরসিক্ত। ছেলেবেলার অভ্যেস অনুযায়ী সে ফুলের ওপর হাত বুলিয়ে আঙুলে শিশির তুলে নিয়ে চোখে মাখাল। এতে নাকি চোখ ভাল থাকে।

ফুলগুলোকে কি বঞ্চিত করা হল শিশির থেকে। না, একটু পরেই তো সূর্য উঠে সব শিশির শুষে নেবে।

লাল সুরকি বেছানো রাস্তা বাগানের মধ্য দিয়ে। তারপর একটা বাঁশের গেট।

খুলতে গেলে একটা ক্যাঁচ করে শব্দ হয়।

নদীর ঘাটটা সর্বক্ষণই ব্যস্ত থাকে। স্নান করতে আসে গ্রামের মানুষ, জেলে নৌকোর আনাগোনা বিরাম নেই, দূর দূর থেকে গয়নার নৌকো আসে যাত্রী নিয়ে, ছেলের দঙ্গল দাপাদাপি করে। এখন ঘাটটি একেবারে জনশূন্য। এর রূপ এখন একেবারে অন্য রকম। শূন্য ঘাট আর পূর্ণ ঘাট যেন দুটি আলাদা চরিত্র, পরস্পরকে চেনে না।

নদীর ঘাটের দিকে যেতে গিয়েও রবি থমকে দাঁড়াল। পাশের গ্রামটার ভেতরে ঢুকে কখনও দেখা হয়নি। ভেতরে যাবার কোনোও কারণ ঘটেনি কখনও। গ্রামের কোনোও মানুষ এখনও জাগেনি, এই সময় একবার ঘুরে দেখে এলে হয়। ভরা দিনের বেলা গ্রামের মধ্যে যেতে গেলেই কেউ না কেউ সঙ্গ নেবে, নানান অবান্তর কথা বলবে।

ছাড়া ছাড়া গাছপালা, সরু পায়ে চলা পথ। এদিকে বাড়ি ঘর নেই। তারপর একটা মস্ত বড় দিঘি। দিঘি না জ ভূমি, ঠিক বোঝা যায় না, পারের কাছে অনেকটাই অগভীর, বিন্নি ঘাস ও শর হয়ে আছে, তারপর শালুক ফুটে আ হে অনেক, শ্যাওলা ভাসছে। পরিষ্কার টলটলে দিঘি তো অনেক দেখা আছে, এই জলাভূমিটার কেমন যেন একটা আদিম রূপ। ওপারের রেখা অস্পষ্ট।

সেই পাখিটা এখানেও ডাকছে। টু-টু-টু! টু-টু-টু! রবি সকৌতুকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। পাখিটা তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নাকি?

এবারেও দেখা গেল না। সরু ঘাসের ওপর দিয়ে এগোতে এগোতে রবি বেশ আরাম বোধ করল পায়ে। সে চটি পরে আসেনি। খেয়াল হয়নি। খালি পায়ে অনেক দিন পর হাঁটছে।

একটু পরে রবি মানুষের গলার গান শুনতে পেল : নারী কণ্ঠ। কৌতূহলী হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেল, একটা ঝোপের আড়াল দিয়ে একজন স্ত্রীলোক হেঁটে যাচ্ছে, গোলাপি রঙের শাড়ি, মাথায় আধ-ঘোমটা, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

গ্রাম দেশে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই আগে জাগে। ঘর-দোর নিকোনো, উঠোনে গোবর ছড়া দেওয়া, জল তোলা, কত কাজ। পুরুষদের আগেই অনেকে পুকুর বা নদীতে স্নান সেরে নেয়।

রবি একটু সঙ্কোচ বোধ করল। এবার বোধহয় তার ফিরে যাওয়া উচিত। গ্রামের মেয়েরা প্রকাশ্যে গান গায় না। এখানে আর কোনোও জন-মনুষ্য নেই জেনে স্ত্রীলোকটি আপন মনে গলা খুলেছে। গানের কলি বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সুরটি বেশ।

স্ত্রীলোকটি হঠাৎ পেছন ফিরল। কোনোও শব্দ না হলেও মেয়েরা পুরুষদের উপস্থিতি যেন বাতাসের তরঙ্গে টের পেয়ে যায়। চোখাচোখি হল দুজনের।

কয়েক পলক পর স্ত্রীলোকটি ডাকল, গৌর, গৌর!

গৌর কে ? স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই অন্য কারও সঙ্গে তাকে ভুল করেছে। রবি মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করতেই স্ত্রীলোকটি আবার ডাকল, গৌর, গৌর, শোনো। চলে যাচ্ছ কেন?

এবারে স্ত্রীলোকটিই এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। রবি ভাল করে দেখল। মধ্য যৌবনা, গায়ের রং বেশ ফর্সা, অধিকাংশ বাঙালি মেয়ের তুলনায় বেশ লম্বা, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। গলায় বেশ কয়েক ছড়া পুঁতির হার, দু হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, আর বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতন কী যেন বলছে। যেন সে পুজো করছে পায়ে চলা পথকে।

রবি বলল, আমার নাম তো গৌর নয়! আপনার ভুল হয়েছে।

কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল স্ত্রীলোকটি। রবির চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

রবি লক্ষ করল, এ রমণীর চোখের মণি দুটি নীল।

দেখেই বোঝা যায় সাধারণ কোনোও গৃহস্থ ঘরের বধূ নয়। এর গতিবিধি স্বাধীন।

রবি মনে মনে ভাবল, ও, এই তা হলে সেই! ভবনাথবাবু এর গল্পই করছিলেন। গ্রামের যত অলীক গল্প। এই গ্রামে নাকি এক ডাকিনী থাকে। সে অপরূপ সুন্দরী। সারা গায়ে গয়না পরে থাকে সব সময়। সে আসলে পিশাচ সিদ্ধা। তার চোখের মণিতে জাদু আছে। ওই দৃষ্টি দিয়ে কত যুবককে যে বশ করেছে, তার ঠিক নেই, মন্ত্রবদ্ধের মতন সেই যুবকরা তার পিছু পিছু যায়, তারপর কোথায় যে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, তা কেউ জানে না। এখন ওকে দেখলেই সবাই চোখ ঢেকে ভয়ে পালায়। ওই ডাকিনী শ্মশানতলার একটেরেয় থাকে, গ্রামে ঢুকতে গেলেই ছেলেরা ইট মেরে তাড়িয়ে দেয়।

রমণীটিকে দেখার পর রবি বুঝল, সে সব কিছুই নয়। এর বোধহয় মাথায় একটু দোষ আছে, ভাব-উন্মাদিনীও হতে পারে, তাই ঘরছাড়া। এর চোখের মণির রং বাঙালিদের মতন না, তাই এখানকার লোক মনে করে, ওই দৃষ্টিতে জাদু আছে। আসলে একে ভয় পাবার কোনোও কারণ নেই।

রবি আবার বলল, আপনার ভুল হয়েছে, আমার নাম গৌর নয়।

দৃষ্টি না সরিয়ে সে বলল, ভুল আমার হয় না। ঠিক চিনেছি, তুমিই সেই গৌর!

রবি হেসে বলল, সেই গৌর মানে কী? গৌর-নিতাইয়ের গৌর? না, না, আমি একজন সাধারণ মানুষ!

রমণীটি বলল, আমার চোখে ধুলো দেবে? তুমি গৌরহরি নও তা জানি, মনে মনে আর এক গৌর বানিয়েছি, তুমি সে-ই। অবিকল মিলে গেছে।

তারপরই সে এক হাতে অনেকখানি ফুল ছড়িয়ে গান গেয়ে উঠল :

তুমি যেমন সাজেই সাজো না
তোমায় চিনতে পারি, ঠিক ঠিক চিনতে
পারে। কয় জনা....

যে-রমণী পাগলিনী, সে কী করে এমন সঠিক সুরে গান গায়? রীতিমতন তাল জ্ঞান আছে, শক্ত আড়ে ঠেকা।

রবি জিজ্ঞেস করল, এ কার গান? আপনি নিজে বানিয়েছেন?

ওপরের দিকে হাত ঘুরিয়ে সে বলল, আকাশ থেকে পেয়েছি।

তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, হ্যাঁ গো। আকাশ থেকে গান ঝরে পড়ে। সত্যিই ঝরে পড়ে। মন শুদ্ধ করে শুনতে হয়। এসো—

রবি তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে আবার বলল, এসো—! এসো—

রবি বলল, কোথায় যাব?

সে বলল, আমার সঙ্গে। আমি যেখানে নিয়ে যাব। তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করব। তুমি আমার রাজা হবে। আমার চুল দিয়ে তোমার পা মোছাব। কত ফুল তুলে রেখেছি তোমার জন্য। তোমাকে চরু রেঁধে খাওয়াব। আঁচল ভিজিয়ে বাতাস করব। এসো—

এমনভাবে কোনোও স্ত্রীলোক ডাকতে পারে? এ যে বাংলাদেশ, এখানে মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। এখানে চিরকাল পুরুষরাই নারীদের বন্দনা করে।

এ যদি পাগলের প্রলাপও হয়, তবে এমন মধুর প্রলাপ কেউ কখনও আগে শুনেছে?

স্ত্রীলোকটি চলতে শুরু করতেই রবি অনুসরণ করতে লাগল তাকে। কয়েক পা যাবার পর তার মনে হল, তা হলে কি ভবনাথবাবুর কথাই ঠিক? রবিও ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছে? ওর দৃষ্টিতে সম্মোহিত হয়ে পেছন পেছন যাচ্ছে?

হাসির কথা। রবি এক্ষুনি ফিরে যেতে পারে। নীলনয়না নারী সে অনেক দেখেছে। সম্মোহন করার জন্য চোখের মণি নীল হবার দরকার হয় না, অনেক বাঙালি মেয়ের কালো চোখের মণিতেও জাদু থাকে।

রবি ওর সঙ্গে যাচ্ছে নিছক কৌতূহলে। এমনভাবে তাকে আগে তো কেউ ডাকেনি।

বেশি দূর যেতে হল না। দিঘির দক্ষিণ পাড় ছাড়িয়ে ডান দিকে কোনাকুনি গেলে শ্মশানতলা। কিন্তু ভয়াবহ কিছু নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক পাশে একটা পুরনো কালী মন্দির। তার পেছনে শ্মশানবন্ধুদের জন্য একটা চালা ঘর। এখানে এখন কেউ নেই।

শ্মশানের শেষ প্রান্তে একটা সরু নদী কিংবা খাল। তার ধারে একটা মাটির ঘর। সামনেটা উঠোনের মতন, গাছ পালায় ছাওয়া, অনেক কলকে ফুল, জবা আর ভুঁইচাপা ফুটে আছে।

আসবার পথে রমণীটি অনবরত ফুল ছড়াচ্ছিল দেখে রবি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি.......মানে, তুমি এ রকম ফুল ছড়াচ্ছ কী জন্য?

মুখ ফিরিয়ে সে বলেছিল, আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। ফুল ছড়ানো ভাল, নাকি না-ছড়ানো ভাল?

উত্তর দেবে কি, রবি এমন কথা কখনও শোনেইনি। আমরা সব সময় কার্য-কারণ খুঁজি। আর কেউ রাস্তায় ফুল ছড়ায় না, শুধু একজন ছড়ালে মনে হয় সেটা অসঙ্গতি। অথচ পথে পথে ফুল ছড়িয়ে যাওয়া, তার চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে?

আপনি বলে দুবার ধমক খেয়েছে বলে এখন তুমি বলাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

রমণীটি বলল, আমার নাম এক সময় ছিল রাধা। তারপর কমলা, তারপর হল গিয়ে রাসেশ্বরী। ও না, এর মধ্যে আর একটা নাম ছিল, অনঙ্গমোহিনী।

রাসেশ্বরীর পর হল গোলাপি, তারপর বিন্দুবাসিনী, তারপর মহামায়া.....মেয়ে মানুষের কি একটা মোটে নাম হয় গো? নাকি একটা নাম মানায়? মেয়েমানুষের যে একটা জন্মেই অনেক জন্ম!

আবার আপন মনে হেসে উঠে বলল, গ্রামের লোক আমাকে কী নাম দিয়েছে তাও আমি জানি। তারা বলে সর্বক্ষেপী। তুমিও আমাকে ওই নামে ডাকতে পারো।

রবি বলল, না। আমি তোমাকে মহামায়া বলে ডাকব।

রমণীটি ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, সকালবেলা ওই নাম ঠিক আছে, কিন্তু সন্ধেবেলা মানাবে না। সন্ধের পর আমার নাম চারু।

রবি ভাবল, মানুষের এক এক বেলায় এক এক রকম নাম হলে মন্দ হয় না।

উঠোনে এসে মহামায়া একটা গাছের শুকনো ডাল নিয়ে মাটিতে একটা ছবি আঁকল।

তারপর বলল, এই আমার সিংহাসন। তুমি এখানে বসো।

রবি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে এলে, আমি কে, তা তো তুমি জানো না। জানতে চাইলে না?

রমণীটি বলল, আমি কি তোমার কাছে কিছু চেয়েছি? চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক না থাকলে অত জানাজানির কী আছে?

সূর্যের রং লাল, কিন্তু ভোরবেলায় আলোর রং নীলচে ধরনের। সেই আলোয় একটু একটু দৃশ্যমান হচ্ছে জগৎ সংসার। শোনা যাচ্ছে নানা রকমের পাখি ডাক।

রবির পরনে গত রাত্রির ধুতি গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়ানো, পা দুটি ধুলোয় মাখা। মাটিতেই সেই ছবির ওপর বসে পড়তে সে দ্বিধা করল না।

রমণীটি বলল, আমি মনে মনে গৌরসুন্দরের একটা মূর্তি গড়েছি। জানতাম, একদিন গাছতলায় তার দেখা পাব। আজ এই সাতসকালে সূর্য ওঠার আগেই একটা শিমুল গাছের নীচে তোমায় দেখলাম। আজ এই জীবনটা ধন্য হল গো!

রবি বলল, আমি একজন সামান্য পথিক। তুমি এখানেও ভুল করছ। তোমার গান শুনে ভাল লাগল। তুমি প্রথমে কী গান গাইছিলে?

রমণীটি বলল, কী জানি! তখন কী মনে এসেছিল। আরও অনেক গান আছে। গান দিয়েই তো তোমার পুজো হবে। আগে ফুলের মালা গেঁথে নিই।

রবি বলল, মানুষ মানুষকে পুজো করবে কেন? তার কোনোও দরকার নেই। তুমি শুধু গান শোনাও।

রমণীটি বলল, মানুষ যদি তেমন হয়, তবেই তো তার পুজো হয়। নিবেদন মানেই তো পুজো। যখন মনে হয় বুক চিরে সর্বস্ব দিতে পারি....গৌর, তুমি আমায় পরীক্ষা করছ? দেখবে, সত্যি সত্যি আমার বুকটা চিরে দিতে পারি কি না তোমার সামনে—

কাছেই পড়ে আছে একটা মাটি কোপানোর খুরপি, রমণীটি সেটা তুলে নিতেই রবি হা-হা করে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, ও কী, ও কী, না। ও সব না, আমি গান শুনতে এসেছি।

রমণী তার নীল চক্ষুদুটি তরল করে বলল, "কার গান শুনবে? বিন্দুবাসিনী, না রাসেশ্বরীর? গোলাপি না মহামায়ার? কিংবা অনঙ্গমোহিনীর?

রবি বলল, তা তো জানি না। তুমি যে-কোনোও একজনের শোনাও।

রমণী বলল, সব গান তো সব সময়ে হয় না। কোনোওটা ভোর-ভোর, কোনোওটা বেলা হলে। কোনোওটা স্নানের পর, অনঙ্গমোহিনীর গান ঘোর দুপুরে, আর চারুর গান সন্ধেবেলা....। সব গান এক জায়গাতেও হয় না। এই খালের ওপারে একটা বেশ জঙ্গল আছে, খুব বড় বড় গাছ, আলো ঢোকে না। ভরদুপুরেও ছায়া ছায়া, মাটিতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সেখানে গেলেও আপনা-আপনি গান বেরোয়, তোমাকে নিয়ে যাব।

রবি হাসতে হাসতে বলল, আমি তো অতক্ষণ থাকব না। চলে যেতে হবে। তা হলে ঠিক এখনকার যে গান, সেটিই শুনিয়ে দাও।

বিস্ময়ের ভুরু তুলে সে রমণী বলল, থাকবে না? কোথায় যাবে?

রবি বলল, বাঃ, আমার কাজ নেই? অনেক দায়িত্ব আছে, অনেকের কথা শুনতে হবে, কত রকম হিসেব পত্তর.........

রমণীটি বলল, ছিঃ, শুনলেও গা জ্বালা করে। হিসেব পত্তর আবার কী? তুমি বসে থাকবে আমার সিংহাসনে, আমি সারাদিন তোমাকে গান শোনাব, কাঁদব, তুমি মুছিয়ে দেবে চোখের জল.....শীত আসছে, সারাদিন টুপ টাপ করে খসে পড়বে গাছের পাতা, রোদ্দুরের রং বদলাবে, সূর্য অস্ত গেলে উঠবে একটা মস্ত বড় চাঁদ, পূর্ণিমার আর দেরি নেই যে, দিনের পাখিরা ঘুমুতে গেলে শুনতে পাবে রাত-চরা পাখির ডাক, খিদে পেলে আমি তোমাকে চরু রেঁধে খাওয়াব...........

শুনতে শুনতে রবির যেন ঘোর লেগে গেল। মনে হল, এমন একটি অবেগবতী নারী, এমন শান্ত নির্জন স্থান, ফুলের সুগন্ধ, এ সব ছেড়ে সাংসারিক রুক্ষু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফিরে যাওয়ার কী দরকার?

রবির খুব কাছেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে সেই রমণী। কোঁচড়ের বাকি ফুল রবির গায়ে ছুড়ে ছুড়ে দিয়ে তো গান গেয়ে উঠল ঃ

> এ ভরা নদীর দু-কূল ভেসে যায়
> আয় রে আয় আমার সাথে কে ভাসবি রে আয়
> এমন স্রোতে উথালপাথাল
> নাই ইহকাল নাই পরকাল
> অন্তরে হাত ধরাধরি বাহিরে নাগাল কে বা পায়........

রবি এখানকার অনেক নৌকোর দাঁড়ি-মাঝি, ডাক হরকরা,

ভিখিরি-বৈষ্ণবীদের গান কিছু কিছু শুনেছে, কিন্তু এই রমণীর গান তাদের কারুর মতন নয়। যেন স্বতঃস্ফূর্ত, যেন আগে কথা রচিত হয়নি, কেউ সুর যোজনা করেনি, সহজ ভাবে কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

গানের সময় রমণীটির নীল নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে অশ্রু।

একটার পর একটা গান সে গেয়ে চলল। রবি ভুলে গেল তার কাজের কথা, দায়িত্বের কথা, স্ত্রী-পুত্রর কথাও মনে পড়ল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধও চলে গেছে। তার চোখের সামনে এই বিহ্বল নারী-মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই।

এক সময় দূরে শোনা গেল কয়েকটি পায়ের শব্দ। তারপর কারা যেন ডাকল বাবুমশাই, কর্তাবাবু!

রমণীটি গ্রাহ্যই করল না। রবি সামনের দিকে তাকাল।

তার নায়েব আর দুজন পাইক তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। দেখতে পেয়ে প্রায় ছুয়ে এল কাছে।

নায়েব বলল, বাবুমশাই, কতক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে লোক এসেছে, জরুরি খবর আছে। আপনি এখানে কী করছেন? ওদিকে অনেক লোক আপনার জন্য বসে আছে।

রবির মনে পড়ল, আজ সকালে কাছাকাছি গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দেখা করতে আসার কথা ছিল বটে। এতক্ষণ মনেই পড়েনি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লোক পাঠিয়েছেন যখন, নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।

রমণীটি রবির হাতের ওপর হাত রেখে বলল, গৌর, তুমি যেও না। তোমাকে আমি চরু রেঁধে খাওয়াব, তারপর খালের ওপারের সেই আঁধারমানিক জঙ্গলে যাব।

রবির সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে উঠল। তা হলে কি এ রমণীর দৃষ্টিতে সত্যিই জাদু আছে? এতক্ষণ সে সব কিছু ভুলে ছিল কী করে? এখান থেকে উঠতে তার একবারও ইচ্ছে করেনি।

নায়েব ধমক দিয়ে বলল, এই হারামজাদি, বাবুমশাইকে তুই ছুঁয়ে দিলি কোন সাহসে? এখান থেকে একেবারে দূর করে দেব।

একজন পাইক লাঠি তুলল ওর মাটির ঘরটা ভেঙে দেবার জন্য। রবি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, থাক, ওকে কিছু বোলো না।

তারপর রমণীটিকে বলল, আমাকে যে যেতেই হবে!

রমণীটি মাটিতে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল হুহু করে।

রবি তবু আর ফিরে তাকাল না। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল নায়েবদের সঙ্গে।

কুঠিবাড়িতে ফিরে এসে স্নান সেরে, পোশাক-পরিচ্ছদ করে নিতে হল অল্প সময়ের মধ্যে। অনেক কাজ, কাজের পর কাজ। শুধু তাই নয়, বিশেষ কারণে আজ রাতেই ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। সুতরাং অনেক কিছুর বিলি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

এই সব কাজের মধ্যে পাখির ডাক নেই, ফুলের সুগন্ধ নেই, স্নিগ্ধ বাতাস নেই, আলোর রং বদল নেই, গান নেই। মানুষের পর মানুষ, তাদের সকলেরই মুখের রং এক। সেই রঙের নাম স্বার্থ। তাদের বিনয়, তাদের ভক্তিভাব, তাদের তোষামোদের মধ্যেও স্বার্থ।

খুঁটিনাটি সব কাজের প্রতি মনোযোগ দিয়েও মাঝে মাঝে কয়েক পলকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে রবি। মনে পড়ছে সেই রমণীটির কথা, যার অনেক নাম। সে কিছু চায়নি। সে রবিকে মন গড়া সিংহাসনে বসিয়ে গান শোনাচ্ছিল, তার মধ্যে স্বার্থের কোনোও নামগন্ধ ছিল না। সে রবির পরিচয় জানত না, আগে কখনও দেখেওনি। তবু রবিকে তো তার কল্পনার পুরুষের সঙ্গে মিলিয়ে বন্ধনা করেছে। নারীর পুরুষ-বন্দনা!

এক একবার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে, এই সব অসার বিষয়কর্ম ফেলে তার কাছে ছুটে যেতে। হ্যাঁ। সেই নীল নয়নার দৃষ্টিতে জাদু আছে, সে তাকে টানছে। ওই শ্মশান প্রান্তে, ফুল গাছ ঘেরা মাটির উঠোনে বসে ওই মোহময়ীর গান শোনা ও তাকে গান শুনিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়াই বা মন্দ কী! সে চরু রান্না করে খাওয়াবে বলেছিল, কেমন তার স্বাদ কে জানে!

কিন্তু ইচ্ছে হলেও কর্তব্যের দায় দেখিয়ে ইচ্ছেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়।

নায়েব মশাই মৃদু ভর্ৎসনার সুরে মনে করিয়ে দিয়েছে যে জমিদারের পক্ষে ওরকম একটা উন্মাদ রমণীর সঙ্গে ঘোরাফেরা মোটেই শোভন নয়। খালি পায়ে খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে মাটিতে বসা......প্রজাদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে জমিদারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ওই সর্বক্ষেপিটাকে গ্রাম ছাড়া করে দেওয়াই দরকার।

ট্রেন মাঝরাত্রে, এখান থেকে নৌকো করে স্টেশনে পৌছোতে অন্তত দুঘন্টা লাগবে। রাত নটা থেকেই যাত্রার তোড়জোড় শুরু হল।

নায়েবমশাই হিসেবের খাতাপত্র সই করিয়ে নিচ্ছে, আর রবির মনে পড়ছে, সকালবেলা একজন তার হাতে হাত রেখে অসম্ভব কাতর গলায় বলেছিল, গৌর যেও না।

অথচ রবিকে যেতেই হবে। বাবামশাই অসুস্থ, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পরশু সকালে একটা জনসভা আছে বাগবাজারে বোসেদের বাড়ি, সেখানে না গেলেই নয়। পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি লেখা হয়নি, শেষ করতে হবে দুদিনের মধ্যে। মহাজনের কাছে টাকা ধার আছে, তার সুদ মাস পয়লার মধ্যে দিতে না পারলে মামলা হবে। অনেক পিছুটান। এক নারীর কোমল হাতের ছোঁয়ার চেয়ে এই সব টান অনেক জোরালো।

যথাসময়ে নৌকো ছাড়ল। একটুক্ষণ যেতে না যেতেই কী কারণে যেন কোলাহল করে উঠল মাঝিরা। কাকে যেন ধমকাচ্ছে।

রবি কামরা থেকে বেরিয়ে এল। মাঝিরা মশাল জ্বেলেছে, সেই আলোতে জলের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সে। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কেটে আসছে এক রমণী। সেই সর্বক্ষেপি!

গোরাই নদীতে যারা স্নান করে, তারা ঘাট ছেড়ে বেশি দূর যায় না। সদ্য দুটো কুমির দেখা গেছে। রাত্তিরবেলা জলে নামার তো প্রশ্নই ওঠে না।

সেই রমণী আকুল কণ্ঠে বলল, গৌর, গৌর, তুমি যাচ্ছ? তোমার জন্য রেঁধে রেখেছি, তুমি একটু খাবে না? রাত্তির বেলায় গান......

রবি বলল, এ কী করছ, তুমি ফিরে যাও! নদীতে অনেক বিপদ আছে।

রমণী বলল, তুমি ফিরে এস। ঝাঁপ দিয়ে পড়, আমি তোমায় নিয়ে যাব।

মাঝিরা আর কোনোও কথা বলতে দিল না। ঝপ ঝপ করে বৈঠা ফেলতে লাগল জলে। একজন লগি তুলে বলল, এই ডাকিনী, কাছে আসবি তো মাথা ফাটাব! একজন পাইক বলল, এবার বেটিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

রবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নৌকো দ্রুতগতিতে চলে এল অনেকটা দূরে। সর্বক্ষেপিকে আর দেখা গেল না। নদীর সঙ্গে সে নদী হয়ে গেছে।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে আকাশ। নদীর জলেও দুলছে চাঁদ।

ওই নীল-চক্ষু রমণী তাকে আটকে রাখতে পারেনি। জাদু-বন্ধ ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে রবি। হয়তো ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। এই গ্রামে আর ওকে টিকতে দেবে না অন্যরা। কোথা থেকে ও এসেছিল, কোথায় চলে যাবে, কে জানে! নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটছিল, এমন তীব্র এবং টান। বলছিল, জলে ঝাঁপ দাও।

এই নদী ছেড়ে আর এক নদীতে যেতে হবে রবিকে। তারপর আরও অনেক নদী।

ওর প্রথম গানটা কী যেন ছিল? কথাগুলো পুরো মনে নেই, সুরটা মনে আছে। অনেকটা কীর্তনাঙ্গের।

সুরটা গুনগুন করতে করতে কামরার মধ্যে ফিরে গেল রবি। সেই সুরে বসাতে লাগল নিজস্ব বাণী। পুরো গানটা তৈরি হলে, সেই গানের মধ্যে স্মৃতি হয়ে থাকবে ওই রমণী।